

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

□□ সতর্কতা: এই বইটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে অনুবাদ করা হয়েছে

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস (৫ খণ্ড)

(এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি)

লেখক : মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

অরজিনাল বই ডাউনলোড : [link](#)

বিনীত সতর্কতা: এই অনুবাদটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা তৈরি, তাই এতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আকিদা বা ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল বই যাচাই করার অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার অনুরোধ রইল। এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার পাঠকের নিজের। যদি যাচাই করে বা বুঝে-শুনে পড়া সম্ভব না হয়, তবে বইটি না পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

□□ পাঠকের প্রতি সতর্কতা

এই অনুবাদটি সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বা স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে এর শব্দচয়ন, বাক্য গঠন কিংবা ভাবানুবাদে অনিচ্ছাকৃত ভুল বা অসংগতি থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

বইটি পড়া শুরু করার আগে দয়া করে মনে এই বিষয়টি গেঁথে নিন যে— “আমি বইটি কেবল জানার ও শেখার উদ্দেশ্যে পড়ছি। পড়ার সময় কোনো কথায় সন্দেহ বা খটকা লাগলে, তা আমি যাচাই না করে গ্রহণ করব না।”

বিশেষ করে আকিদা, ফতোয়া বা স্পর্শকাতর কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই অনুবাদের ওপর অন্ধভাবে নির্ভর করবেন না। যেকোনো আমল বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আগে অবশ্যই মূল বই মিলিয়ে দেখবেন অথবা বিজ্ঞ আলেমদের শরণাপন্ন হবেন।

এই অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া যেকোনো আমল বা সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ দায়ভার একান্তই পাঠকের। তাই বিনীত অনুরোধ, নিজে যাচাই-বাছাই করে পড়ার মানসিকতা থাকলেই কেবল বইটি অধ্যয়ন করবেন।

প্রথম সংস্করণ

পঞ্চম খণ্ড

উন্মত্তে মুসলিমার ইতিহাস

উসমানীয় খিলাফত

প্রথম খলিফা সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে শেষ খলিফা আব্দুল মাজিদ সানি পর্যন্ত

ইসলামী আন্দালুস:

প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে গ্রানাডার পতন (৮৯৭ হিজরি পর্যন্ত)

উপমহাদেশের ইতিহাস:

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম শাসনসমূহ

অভিমত:

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক ইস্কান্দার সাহেব

ভূমিকা:

শায়খুল হাদীস মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী সাহেব

প্রচেষ্টা:

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক, জামিয়া আর-রশীদ করাচি

আল-মাশাল পাবলিশার্স

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

উসমানীয় খিলাফত

প্রথম খলিফা সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে শেষ খলিফা আব্দুল মাজিদ সানি পর্যন্ত

ইসলামী আন্দালুস:

প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে গ্রানাডার পতন (৮৯৭ হিজরি পর্যন্ত)

উপমহাদেশীয় ইতিহাস:

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম শাসনসমূহ

পঞ্চম খণ্ড

গবেষণা:

মুয়াররিখ-এ-ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মাদাজিল্লাহ

আল-মানহাল পাবলিশার্স

ব্লক এ-১ গুলিস্তান-ই-জোহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

সূচিপত্র

পাঠকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা ৩৫

প্রথম অধ্যায়: উসমানীয় খিলাফত

প্রথম সেলিম থেকে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত ৪০

উসমানীয় খিলাফতের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ৪১

উত্থানের যুগ - প্রথম সেলিম থেকে দ্বিতীয় সেলিম ৪১

পতনের যুগ - তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমদ ৪২

দুর্বলতা, আধুনিকায়ন ও সংগ্রাম - মাহমুদ খান থেকে দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ৪২

প্রগতিশীলদের আধিপত্য - সুলতান রাশাদ থেকে দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ ৪৪

উসমানীয় খিলাফত: প্রথম পর্যায় ৪৫

সুলতান ইয়াভুজ প্রথম সেলিম বিন দ্বিতীয় বায়েজিদ ৪৬

সাফাভী কারা ছিল? ৪৬

শাহ ইসমাইলের কেন্দ্র তাবরিজ দখল ৪৯

চালদিরানের যুদ্ধ ৫০

মিশরের মামলুকদের সাথে উত্তেজনা - সিরিয়া বিজয় ৫১

পবিত্র হিজাজের তত্ত্বাবধান ৫২

মামলুকদের পরাজয়ের কারণ ৫৩

ওয়ারদানের যুদ্ধ এবং কায়রো দখল ৫৪

সিরিয়া ও মিশর বিজয়ের সুফল - নতুন ব্যবস্থা ৫৫

যখন খিলাফত আব্বাসীয়দের থেকে উসমানীয় বংশের কাছে স্থানান্তরিত হলো ৫৫

দ্রুজ সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ৫৬

ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের সাথে প্রথম সেলিমের সাক্ষাৎ ৫৭

পর্তুগিজদের শক্তি চূর্ণ করার প্রচেষ্টা ৫৭

প্রথম সেলিমের ইন্তেকাল ৫৮

প্রথম সেলিমের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সময়কাল ৫৮

নৌ-সেনাপতি উরুজের সংকল্পের কাহিনী ৫৯

নৌ-সেনাপতি খাইরুদ্দিন পাশার বিজয়সমূহ ৬৫

প্রথম সেলিম এবং ভাইদের হত্যা ৬৬

সুলতান সুলাইমান খান প্রথম আল-কানুনি বিন সুলতান প্রথম সেলিম, যিনি সুলাইমান

আলিশান নামে পরিচিত ৬৭

বেলগ্রেড বিজয় ৬৭

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ৬৮

রোডস বিজয় ৬৮

স্পেনের ওপর চরম আঘাত, ফ্রান্সের সাথে মৈত্রী ৬৯

হাঙ্গেরিতে সামরিক অভিযান ৭১

মোহাকসের যুদ্ধ ৭১

বিদ্রোহ - হাঙ্গেরিতে পুনরায় সামরিক অভিযান ৭২

অস্ট্রিয়ার ওপর হামলা - ভিয়েনা অবরোধ ৭২

অস্ট্রিয়ার ওপর দ্বিতীয় হামলা, জার্মানি যুদ্ধ ৭৩

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে শান্তি চুক্তি ৭৪

খায়রুদ্দিন বারবারোসার অবিস্মরণীয় কীর্তিসমূহ ৭৫

বারবারোসা, আলজেরিয়ার শাসক ৭৭

বারবারোসা ও উসমানি নৌবাহিনী ৭৮

তিউনিস বিজয় ৭৮

তিউনিসের ওপর স্পেনের হামলা ৭৮

ভেনিস ও ইতালির যুদ্ধ ৮০

বগদান (মোলদাভিয়া) যুদ্ধ ৮১

প্রিভিজার যুদ্ধ ৮১

আলজেরিয়ায় স্প্যানিশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ৮২

জান জাপোলির মৃত্যু, অস্ট্রিয়ার সাথে পুনরায় লড়াই - বুদাপেস্ট যুদ্ধ ৮৩

এস্টারগন বিজয় ৮৪

খায়রুদ্দিন পাশার মৃত্যু ৮৫

অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতি ৮৬

বিশ্বব্যাপী খিলাফত ও বৈশ্বিক অভিযানসমূহ ৮৬

পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে গুজরাট অভিযান ৮৬

গুজরাট দরবারে ষড়যন্ত্র ও তুর্কিদের প্রত্যাবর্তন ৮৭

ভারত মহাসাগরীয় অভিযানসমূহ ৮৮

আফ্রিকান মুসলমানদের সহায়তা ৮৮

বাব-আল-মান্দাবের সুরক্ষা ৮৯

দিল্লির মুঘল সম্রাটদের সাথে সম্পর্ক ৮৯

হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার ওপর সৈন্য চালনা ৯০

ইতালির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাথে যৌথ অভিযান ৯০

খায়রুদ্দিনের উত্তরসূরিদের কীর্তিসমূহ ৯০

হাসান পাশা ও জেরবা যুদ্ধ ৯২

হাসান পাশা ও ওরান যুদ্ধ ৯৩

মাল্টা অবরোধ ৯৩

ভূমধ্যসাগরীয় যুদ্ধসমূহের ফলাফল ৯৪

সুলাইমান আলিশানের পক্ষ থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা ৯৪

সুলাইমান আলিশানের সফলতা ৯৫

ইরানিদের সাথে দ্বন্দ্ব ৯৫

তাবরিজ পুনরায় বিজয়, বাগদাদ দখল ৯৬

ইরানের ওপর দ্বিতীয় হামলা ৯৬

ইরানের ওপর তৃতীয় হামলা ৯৭

বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ ৯৭

ইয়ানি চেরি বাহিনীর অবাধ্যতা ও তার প্রতিকার ৯৮

তাতার রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তি, উসমানি খিলাফতের মাসকোভিক সীমানা ৯৮

সুলাইমান আলিশানের মৃত্যু ৯৮

সুলাইমান আলিশানের কীর্তিসমূহ ও সংস্কারসমূহ ৯৯

সুলাইমান আলিশানের কিছু কঠোর পদক্ষেপ যার সমালোচনা করা হয়েছে ১০১

সুলতান সেলিম খান সানি বিন সুলাইমান আউয়াল ১০৪

ইয়েমেন ইস্যু ১০৪

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ১০৭

ক্রিট দ্বীপ অভিযান - উসমানীয় নৌবাহিনীর পরাজয় ১০৭

ক্রিট যুদ্ধে পরাজয়ের প্রভাব ১০৯

পরাজয় পুষিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা ১১০

দ্বিতীয় সেলিমের মৃত্যু ১১০

উসমানীয় খিলাফত: দ্বিতীয় পর্যায় ১১১

সultান মুরাদ সালিস বিন সেলিম সানি ১১২

মদ্যপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সমস্যা ১১২

পাঁচ ভাইকে হত্যা ১১২

নারীদের আধিপত্য এবং পদের বিনিময়ে ঘুষ গ্রহণের সূচনা ১১৩

পোল্যান্ডের ওপর আধিপত্য - অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি ১১৩

ফ্রান্স, ভেনিস এবং ব্রিটেনের সাথে উন্নত সম্পর্ক ১১৪

সাফাভিদের সাথে যুদ্ধ ১১৪

খান তাতার-এর সাথে যুদ্ধ ১১৪

সাফাভিদের পরাজয় - তাবরিজ বিজয় ১১৪

স্পেনের সাথে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিরতি ১১৫

আফ্রিকা অভিযানসমূহ ১১৫

ইয়াজ্জিদিদের ষড়যন্ত্র ১১৬

ইয়েনি চেরি বাহিনীর হাঙ্গামা - অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ ১১৬

সultান মুহাম্মদ খান সালিস বিন মুরাদ সালিস ১১৭

ভাইদের হত্যা ১১৭

কারজাত-এর ঐতিহাসিক যুদ্ধ ১১৮

বিদ্রোহ দমন ১১৯

সultান মুহাম্মদ খান সালিসের চরিত্র ১১৯

সultান আহমদ আউয়াল বিন মুহাম্মদ সালিস ১২০

অস্ট্রিয়ার সাথে সন্ধি ১২০

ইরানের সাথে যুদ্ধ ও সন্ধি ১২০

স্পেনে মুসলমানদের উচ্ছেদ এবং হল্যান্ডের উত্থান ১২১

ভূমধ্যসাগরের সংঘর্ষসমূহ ১২২

অভ্যন্তরীণ সমস্যাবলি ১২২

সultান আহমদের মৃত্যু ১২৩

সultান আহমদের কীর্তি ও জীবনী ১২৩

নাতিয়া কবিতা ১২৩

মুস্তফা খান আউয়াল বিন মুহাম্মদ খান সালিস ১২৪

অযোগ্যতা ও পদচ্যুতি ১২৪

সultান উসমান সানি বিন আহমদ আউয়াল ১২৫

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ১২৫

উসমান সানির পরিণতি ১২৫

মুস্তফা খান (পুনরায়) ১২৬

সultান মুরাদ রাবে বিন আহমদ আউয়াল ১২৭

সাফাভিদের সাথে দ্বন্দ্ব ১২৭

ইয়েনি চেরি বাহিনীকে শাসন ১২৮

দ্রুজ সম্প্রদায়ের ইমামের গ্রেফতারি ১২৮

বাগদাদ বিজয় ১২৮

সultান মুরাদের মৃত্যু ১২৯

সultান ইবরাহিম খান আউয়াল বিন আহমদ আউয়াল ১৩০

শান্তি ও উন্নতি ১৩০

ক্রিট অভিযান ১৩০

সাহসী তুর্কি কমান্ডার হোসেন পাশার ছবি ১৩১

ইউরোপে ১৩১

আড়াই হাজার খ্রিস্টান বন্দী ১৩১

আগা গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং সুলতান হত্যা ১৩১

সুলতান মুহাম্মদ রাবে বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১৩২

মালিকা কোসেমের শাসনকাল ১৩২

মালিকা খাদিজার যুগ ১৩৩

পবিত্র জোট এবং ইউরোপীয় শাসকদের যুদ্ধ ঘোষণা ১৩৩

মালিকা খাদিজার বুদ্ধিমত্তা ১৩৩

কোপরলু শাসনের যুগ ১৩৪

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আক্রমণ এবং সুলতান মুহাম্মদ রাবের অপসারণ ১৩৫

সুলতান সুলাইমান খান সানি বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১৩৬

সুলতান আহমদ সানি বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১৩৭

সুলতান মোস্তফা সানি বিন মুহাম্মদ রাবে ১৩৮

কার্লোভিটস চুক্তি, উসমানীয়দের বড় পশ্চাদপসরণ ১৩৮

সুলতান আহমদ সালেস বিন মুহাম্মদ রাবে ১৩৯

রাশিয়ার উত্থান ১৩৯

পিটার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ১৩৯

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সন্ধি ১৪১

ইউরোপীয় রণাঙ্গনে সাফল্য ১৪১

আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ ১৪২

রাশিয়া ও ইরানের সাথে দ্বন্দ্ব ১৪২

ইব্রাহিম পাশার সংস্কার এবং এর প্রভাব ১৪৩

উসমানীয় খিলাফত: তৃতীয় পর্যায় ১৪৫

সুলতান মাহমুদ খান আউয়াল বিন মোস্তফা সানি ১৪৬

ইরানের সাথে যুদ্ধসমূহ ১৪৬

আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রচেষ্টা ১৪৬

প্রতিক্রিয়াশীলতার ফলাফল ১৪৭

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ এবং বেলগ্রেড চুক্তি ১৪৮

ফ্রান্সের প্রস্তাব যা থেকে ফায়দা নেওয়া হয়নি ১৫০

ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় অবহেলা ১৫০

মাহমুদ আউয়ালের মৃত্যু ১৫১

সুলতান উসমান সালেস বিন মোস্তফা সানি ১৫১

সুলতান মোস্তফা সালেস বিন আহমদ সালেস ১৫২

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং চুক্তি ১৫২

উন্নয়নমূলক কাজ ১৫২

পিটার দ্য গ্রেটের উইল বা অসিয়তনামা ১৫২

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এবং পরাজয় ১৫৪

রুশ যুদ্ধজাহাজ, দার্দানেলিসের কাছে ১৫৪

রুশদের পশ্চাদপসরণ, জুলুম এবং কাপুরুষতা ১৫৫

রাশিয়ার ইন্ধনে মিশরে বিদ্রোহ ১৫৫

সুলতান মোস্তফা সালেসের মৃত্যু ১৫৬

সুলতান আব্দুল হামিদ আউয়াল বিন আহমদ সালেস ১৫৭

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এবং কাইনারজা চুক্তি ১৫৭

শান্তির সমাপ্তি এবং পুনরায় যুদ্ধ ১৫৮

সুলতান সেলিম খান সালেস বিন মোস্তফা সালেস ১৬০

জাতির উদ্দেশ্যে উদ্দীপনামূলক ভাষণ ১৬০

প্রতিরক্ষামূলক বিন্যাস এবং কৌশল ১৬০

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ - শান্তি চুক্তি ১৬১

চুক্তিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আগ্রহের কারণ ১৬২

রাশিয়া ও ইউরোপের প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ১৬২

ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ১৬৩

ফ্রান্সে গণতন্ত্র ১৬৪

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান ১৬৪

নেপোলিয়নের মিশর দখল ১৬৫

মুসলিম বিশ্বে নেপোলিয়নের কৌশল ১৬৬

নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বাব-ই-আলীর জিহাদ ঘোষণা এবং এর প্রভাব ১৬৭

কায়রোতে ফরাসিদের অত্যাচার ১৬৮

সিরিয়ার উপকূলে নেপোলিয়নের দখল - আক্কা ফ্রন্ট ১৬৮

জামেয়াতুল আজহারের জিহাদ ঘোষণা ১৬৮

মিশরে আফ্রিকান মুজাহিদদের কৃতিত্ব ১৬৯

আক্কা ফ্রন্টে নেপোলিয়নের পরাজয় ১৬৯

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ১৬৯

কায়রোর জিহাদি আন্দোলন, ফরাসি গভর্নর জেনারেলের হত্যাকাণ্ড ১৭০

ফরাসি বাহিনীর পরাজয়, প্রত্যাহার ও সন্ধি ১৭০

মিশরে নেপোলিয়নের আক্রমণের প্রভাব ১৭১

রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার দিকে মনোযোগ, পতনের কারণসমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনার আহ্বান ১৭১

নেজামে জাদিদ বাস্তবায়ন ১৭২

নেজামে জাদিদ প্রয়োগের সমস্যাগুলি ১৭২

সৈন্যবাহিনীর নতুন প্রশিক্ষণের প্রচেষ্টা ১৭৫

ইয়েনি চেরি সংস্কারের প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহ ১৭৫

সংস্কার ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ ১৭৫

মুসলমানদের টিকে থাকার রহস্য এবং এর বিরুদ্ধে ইউরোপের কৌশল ১৭৬

সুলতান মোস্তফা রাবে বিন আব্দুল হামিদ আউয়াল ১৭৭

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ, ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ এবং ব্যর্থ চুক্তি ১৭৭

বিদ্রোহ ও ক্ষমতাচ্যুতি ১৭৮

সুলতান মাহমুদ সানি বিন আব্দুল হামিদ আউয়াল ১৭৯

সদরে আজমের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং ইয়েনি চেরি বিদ্রোহ ১৭৯

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ ১৮০

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে সফলতা ১৮০

নেপোলিয়নের বিজয়সমূহ এবং রাশিয়ার ওপর আক্রমণ ১৮০

রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সন্ধি - বুখারেস্ট চুক্তি ১৮০

তুরস্কের ওপর নেপোলিয়নের অভিযোগ ১৮১

নেপোলিয়নের পরিণতি ১৮১

মুহাম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহ এবং মিশরের বিচ্ছিন্নতা ১৮২

মুহাম্মদ আলী পাশার ব্যক্তিত্ব ১৮২

মুহাম্মদ আলী পাশার উত্থান ১৮২

মিশরের স্বায়ত্তশাসন ১৮৩

মুহাম্মদ আলী পাশার মিশর ১৮৩

জাজিরাতুল আরব এবং শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১৮৪

সার্বিয়ার বিদ্রোহ ও আধা-স্বায়ত্তশাসন ১৮৬

পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা - গ্রিসে বিদ্রোহ ১৮৭

ইয়েনি চেরি নির্মূল ১৮৮

রাশিয়া ও ব্রিটেন গ্রিসের পক্ষে ১৮৯

তুরস্কের ওপর ইউরোপীয় জোটের ঐক্যবদ্ধ চাপ ১৯০

এড্রিয়ানোপল চুক্তি ১৯০

তুরস্ক ও রাশিয়ার যুদ্ধ ১৯১

আদ্রিয়ানোপল চুক্তি (এড্রিয়ানোপল চুক্তি) ১৯১

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারিত্ব ১৯১

আমীর আব্দুল কাদির আল-জাজাইরির সংগ্রাম ১৯২

মুহাম্মদ আলী পাশার সিরিয়া আক্রমণ ১৯৩

মুহাম্মদ আলী পাশা ও সিরিয়ার শাসন ১৯৪

সিরিয়ায় মিশরের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং তুর্কিদের পুনরায় পরাজয় ১৯৪

দ্বিতীয় মাহমুদের মৃত্যু ১৯৫

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের চরিত্র, কৃতিত্ব ও ভুলসমূহ ১৯৫

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়াল বিন দ্বিতীয় মাহমুদ ১৯৮

সিরিয়ায় তুরস্ক ও মিশরের বিরোধ ১৯৮

সিরিয়া থেকে মিশরীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ১৯৯

“হ্নকার ইসকেলেসি চুক্তি” বাতিলকরণ ২০০

বাল্টা লিমান চুক্তি ২০০

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ২০০

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম বৈদেশিক ঋণ ২০১

তুরস্ক ইউরোপীয় শক্তিশক্তিগোষ্ঠীর সদস্য হলো ২০১

প্যারিস চুক্তি ২০২

রাশিয়ার ওপর প্যারিস চুক্তির প্রভাব ২০২

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর প্যারিস চুক্তির প্রভাব ২০৩

বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা ২০৩

সার্বিয়ার বিদ্রোহ এবং ইউরোপীয় শক্তিশক্তিগোষ্ঠীর দ্বিমুখী নীতি ২০৩

লেবাননে দ্রুজ ও ম্যারোনাইটদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ ২০৪

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের মৃত্যু ২০৪

টেলিগ্রাফ ও রেললাইন ২০৪

তানজিমাত যুগ, মোস্তফা রশিদ পাশা এবং আধুনিক সংস্কারসমূহ ২০৫

এক পিতার সন্তান ২০৬

মানবাধিকার ও শরীয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই ২০৬

মোস্তফা রশিদ পাশার বিরোধিতা, বরখাস্ত ও পুনর্বহাল ২০৭

১৮৫৬ সাল, বিচার ব্যবস্থা স্থগিত ২০৭

তুরস্কে আধুনিক ও প্রাচীনের দ্বন্দ্ব ২০৮

নতুন আইন থেকে ইসলামের শত্রুরা কীভাবে ফায়দা লুটেছে? ২০৮

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের কিছু জনহিতকর কাজ ২০৯

সুলতান আব্দুল আজিজ বিন দ্বিতীয় মাহমুদ ২১০

সংস্কার ও আধুনিক শিক্ষার প্রচেষ্টা ২১০

ক্রিটের ব্যর্থ বিদ্রোহ ২১১

ইউরোপ সফর ২১১

দুনমাহ ইহুদি, মুসলিমরূপী ইহুদি ২১২

সাবাতাই জেভির আন্দোলন ২১৩

মিদহাত পাশার উত্থান ২১৪

তাগুতি সংগঠনগুলোর গঠন ২১৪

তুর্কিদের নতুন প্রজন্মের ওপর পশ্চিমা চিন্তাবিদদের প্রভাব ২১৫

আধুনিক উসমানীয় ও মিদহাত পাশা ২১৬

প্যান-তুর্কিজম (উসমানীয় ঐক্য) ২১৭

জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি - সদস্যপদ তৈরির পদ্ধতি ২১৭

সুলতান আব্দুল আজিজের পদক্ষেপসমূহ ২১৮

সুলতান আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং আপনজনদের বিশ্বাসঘাতকতা ২১৯

সুয়েজ খালের উদ্বোধন ২২০

টেলিগ্রাফ এবং রেলওয়ে লাইন ২২০

সুলতান মুরাদ খামিস বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল ২২১

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল ২২২

ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি ২২২

ইউরোপ সফর ২২২

সিংহাসন আরোহণ ২২৩

সুলতান আব্দুল হামিদের সম্মুখীন হওয়া পরীক্ষাসমূহ ২২৩

সুলতান আব্দুল হামিদের কৌশল ২২৪

পাশ্চাত্যপন্থী গোষ্ঠীর সাথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ২২৫

মিদহাত পাশার উত্থান ২২৫

তুরস্কের নতুন সংবিধান ২২৬

মিদহাত পাশার লক্ষ্যসমূহ ২২৭

মিদহাত পাশার অপরাধসমূহ ২২৭

বলকান যুদ্ধ ২২৮

মিদহাত পাশার ষড়যন্ত্রসমূহ ২২৯

মিদহাত পাশার পতন ২২৯

পার্লামেন্ট গঠন ২৩০

বলকানে পুনরায় রক্তপাত এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর ষড়যন্ত্র ২৩১

বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ ২৩১

রাশিয়ার আক্রমণ, ক্রিমিয়া যুদ্ধ এবং তুরস্কের পরাজয় ২৩২

পার্লামেন্ট স্থগিতকরণ ২৩৬

সান সিফানো চুক্তি এবং বার্লিন চুক্তি ২৩৭

বার্লিন চুক্তির প্রভাব ২৩৯

ব্রিটিশ ইশারায় ইস্তাম্বুলে বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা ২৩৯

গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা ২৪০

মিদহাত পাশার পরিণতি ২৪০

তিউনিসিয়া, মিশর ও সুদানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখল ২৪১

মিশরের পতন ২৪২

সুদান ২৪৩

আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও ইয়েমেনের বিদ্রোহ ২৪৩

গ্রিসের সাথে যুদ্ধ ২৪৫

কুর্দিস্তান ও ইয়েমেন ২৪৬

মেসিডোনিয়ার বিদ্রোহ ২৪৭

মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের তুলনা ২৪৭

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ২৪৯

সুলতান আব্দুল হামিদ, প্রাচীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং নতুন লক্ষ্যসমূহ ২৫০

সুলতান আব্দুল হামিদের আন্দোলন “আল-জামিআতুল ইসলামিয়া” ২৫০

ইসলামি জাগরণের জন্য সুলতানের খিদমতসমূহ ২৫১

জামালুদ্দিন আফগানি ও সুলতানের ঘনিষ্ঠতা এবং মতপার্থক্য ২৫২

খানকাহসমূহের আন্তর্জাতিক বলয় ২৫৪

ইউরোপীয় এজেন্টদের পক্ষ থেকে হজ্জের ফরয রহিত করার ফতোয়া কেন দেওয়া হয়েছিল?	২৫৫
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোকাবিলা	২৫৫
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অনন্য ব্যবস্থা	২৫৬
তৈল সম্পদ এবং সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের পরিকল্পনা	২৫৬
হিজাজ রেলওয়ে পরিকল্পনা	২৫৮
দেশের অভ্যন্তরে গোপন বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর তৎপরতা	২৫৯
বিশ্বব্যাপী জায়নবাদ এবং সুলতান আব্দুল হামিদ	২৬০
ইহুদি বিশ্বকে সুলতান আব্দুল হামিদের দ্ব্যর্থহীন জবাব	২৬১
হার্জেলের সাথে সুলতানের সাক্ষাৎ	২৬১
সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র	২৬২
ঘাতক হামলা	২৬৩
জায়নবাদী লক্ষ্য পূরণে প্রগতিশীলদের ভূমিকা	২৬৪
বিদ্রোহী অফিসার এবং খেলাফত কেন্দ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব	২৬৫
খেলাফত প্রাসাদ অবরোধ। খলিফার ক্ষমতা হরণ	২৬৫
প্রগতিশীলদের শাসন এবং ইস্তাম্বুলে দাঙ্গা	২৬৬
দেয়ালের লিখন পড়ে নিলেন	২৬৭
সুলতান আব্দুল হামিদ পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত	২৬৮
প্রগতিশীলদের প্রতারণা ও চাতুরি	২৬৮
ইস্তাম্বুলে সেনাবাহিনীর দখল	২৬৯
সুলতানের পক্ষ থেকে অস্ত্র ধারণে নিষেধাজ্ঞা	২৬৯
মিথ্যা অভিযোগ এবং জাল ইস্তিফতা	২৭০
ফ্রিম্যাসন গ্র্যান্ড মাস্টারের হাতে সুলতান আব্দুল হামিদের অপসারণ	২৭১
সুলতানের গ্রেফতারি, কারাবরণ এবং ইন্তেকাল	২৭৩
সুলতানের শাসনামলের ওপর পর্যালোচনা	২৭৪
বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তি	২৭৪
সুলতানের লিখিত অবদানসমূহ	২৭৪
সংস্কারসমূহ কেন সফল হয়নি	২৭৫
এখন আফসোস করে কী লাভ	২৭৫
উসমানীয় খেলাফত: চতুর্থ পর্যায়	২৭৭
সুলতান রাশাদ, মুহাম্মদ খামিস বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল	২৭৮
জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির প্রতিশোধ	২৭৮
ফ্রিম্যাসন লজসমূহের আধিক্য	২৭৯
আলবেনিয়া সফর	২৭৯
নির্বাচন এবং নতুন পার্লামেন্ট	২৮০
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনসমূহ	২৮০
প্রথম বলকান যুদ্ধ	২৮২
ভারতের মুসলমানদের কোরবানি	২৮৩
তুরস্কের ক্ষয়ক্ষতি	২৮৩
ত্রিপোলি (লিবিয়া)-র পতন	২৮৪
সানুসি মুজাহিদদের জিহাদ আন্দোলন এবং শহীদ উমর মুখতার	২৮৬
জমিয়তে হুররিয়াত ওয়া ইতিলাফের সাফল্য, কামিল পাশার সরকার	২৮৬

সামরিক অভ্যুত্থান - কামিল পাশা অপসারিত - মাহমুদ শওকত পাশার হত্যাকাণ্ড ২৮৭

সামরিক ত্রয়ী (মিলিটারি ট্রায়াঙ্গেল)-এর একাধিপত্য ২৮৭

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ ২৮৮

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো? ২৮৯

যুদ্ধের আগে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য ২৮৯

যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ ২৯০

বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ভূমিকা ২৯১

তুরস্কের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণ কী ছিল? ২৯৩

বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের রহস্যময় কাহিনী ২৯৩

মুসলিম বিশ্ব কেন তুরস্ককে সমর্থন করেনি? ২৯৫

ভারতের মুসলমান এবং দেওবন্দের আকাবিরদের কোরবানি ২৯৬

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ২৯৭

পূর্ব রণাঙ্গন ২৯৭

এডেন রণাঙ্গন ২৯৭

আর্মেনিয়ায় মুসলিম গণহত্যা ২৯৮

দার্দানেলেস প্রণালী ২৯৮

সুয়েজ খাল রণাঙ্গন ২৯৯

ইরাক রণাঙ্গন ৩০০

জাজিরাতুল আরব ৩০০

নজদ সরকার এবং সুলতান আব্দুল আজিজ বিন সউদ ৩০২

সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ৩০২

দার্দানেলেস প্রণালী ও ককেশাস ৩০৩

মদিনা মুনাওয়ারার অবস্থা ৩০৩

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ৩০৪

সাইকস-পিকো চুক্তি - বেলফোর ঘোষণা ৩০৫

বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্য ৩০৫

তুর্কি জাতীয়তাবাদের তথাকথিত স্লোগান ৩০৮

মহাযুদ্ধের নেপথ্যে ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্র ৩০৯

ষষ্ঠ মুহাম্মদ, ওয়াহিদউদ্দীন ৩১৬

ট্রায়াঙ্গেলের পলায়ন ও পরিণতি ৩১৭

একটি মন্তব্য ৩১৭

মোস্তফা কামাল পাশা ৩১৯

মোস্তফা কামাল সম্পর্কে আর্মস্ট্রং-এর বক্তব্য ৩১৯

শিক্ষা ও উন্নতি, কর্মদক্ষতা এবং খ্যাতি ৩২০

মুদ্রোস চুক্তি এবং খলিফার কৌশল ৩২২

খলিফার চাল উল্টে গেল ৩২৪

জাতীয় নেতার বেশে মোস্তফা কামাল ৩২৫

নির্বাচনে কামালের বিজয় - খলিফার সাথে দ্বন্দ্ব ৩২৬

মোস্তফা কামাল সম্পর্কে সারসংক্ষেপ ৩২৭

ইস্তাম্বুলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ৩২৭

নির্বাচনে মোস্তফা কামালের জয় ৩২৮

সেভ্রেস চুক্তি কী ছিল? ৩২৯

এক দেশ, দুই সরকার ৩৩০

তুরস্ক-গ্রিস যুদ্ধ এবং গোপন সত্যসমূহ ৩৩১

শেষ খলিফা - দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ এবং খেলাফতের পতন ৩৩৫

লোজান চুক্তি - তুর্কিদের ইসলামি পরিচয়ের সমাপ্তি ৩৩৫

লোজান চুক্তির পর ৩৩৭

উসমানীয় তুর্কিদের তালিকা ৩৪০

উসমানীয় খিলাফত: উত্থানের যুগ ৩৪১

উসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনের কারণসমূহ ৩৪৪

(১) ঈমানি অবক্ষয় এবং ইসলামি শিক্ষা থেকে বিমুখতা ৩৪৪

(২) জিহাদের চেতনার দুর্বলতা ৩৪৪

(৩) ক্ষমতার রাজনীতি ৩৪৪

(৪) ইয়েনিসারি বাহিনীর বিশৃঙ্খলা ৩৪৫

(৫) শাহজাদাদের হত্যা ৩৪৫

(৬) উজির-এ-আজম ও মন্ত্রীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ৩৪৬

(৭) অন্যদের সাথে চুক্তি ও সম্পর্ক ৩৪৬

(৮) বিলাসপ্রিয়তা ৩৪৭

(৯) বিদেশি নারীদের সাথে সম্পর্ক ৩৪৭

(১০) উচ্চ লক্ষ্য সামনে না থাকা ৩৪৮

(১১) আয়তনের বিশালতা, ব্যবস্থার স্থবিরতা ৩৪৮

(১২) কিছু খলিফার অযোগ্যতা ৩৪৯

(১৩) ক্রুসেডারদের বিদ্বেষ ও হিংসা ৩৪৯

(১৪) জ্ঞান ও কারিগরি দুর্বলতা ৩৪৯

(১৫) যোগ্য ব্যক্তির অভাব ৩৪৯

(১৬) একটি ঈমানি ও নৈতিক দাওয়াত এবং ইসলামি আন্দোলনের অভাব ৩৫০

(১৭) বিদ্রোহী আন্দোলনসমূহ ৩৫০

(১৮) গোপন দল ও সংগঠনসমূহ ৩৫০

(১৯) প্রেসের স্বাধীনতা এবং ইসলামি সাংবাদিকতার দুর্বলতা ৩৫০

(২০) আরবিকে সরকারি ও জ্ঞানচর্চার ভাষা না করা ৩৫১

(২১) বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩৫১

উসমানীয় সুলতানগণ এবং ভ্রাতৃহত্যা ৩৫২

উসমানীয় যুগের প্রখ্যাত আলিম ও সাহিত্যিকগণ ৩৫৫

শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া বিন মুহাম্মদ আনসারি রহ. ৩৫৫

কাযী ইবনে কামাল পাশা রহ. ৩৫৬

শাইখ আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দি রহ. ৩৫৬

আল্লামা তাশ কুবরি জাদাহ রহ. ৩৫৮

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. ৩৫৯

শাইখ আব্দুল ওয়াহাব শারানি রহ. ৩৫৯

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কি হাইতামি রহ. ৩৫৯

মোল্লা আলী কারী রহ. ৩৬০

শাইখ মুস্তফা সাবরি রহ. ৩৬০

আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি রহ. ৩৬১

শাইখ মুহাম্মদ জাহিদ আল-কাওসারি রহ. ৩৬৩

শাইখ আবুল হুদা আস-সাইয়াদি রহ. ৩৬৩

আমির শাকিব আরসালান ৩৬৪

মুস্তফা কামিল ৩৬৫

আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানি ৩৬৫

শাইখ মুহাম্মদ আবদুহ ৩৬৬

মুহাম্মদ রশিদ রিদা ৩৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: আন্দালুসের ইতিহাস

মুসলমানদের আগমন থেকে আন্দালুসের পতন পর্যন্ত ৩৬৭

আন্দালুসের ভূগোল ৩৬৮

তারিখ মিল্লাতে ইসলামিয়া - দ্বিতীয় খণ্ড

দক্ষিণ উপকূল ৩৬৮

পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ৩৬৯

মধ্যাঞ্চলীয় এলাকা ৩৬৯

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা ৩৭০

উত্তরাঞ্চলীয় এলাকা ৩৭০

স্পেন থেকে ফ্রান্সের পথসমূহ ৩৭১

পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা ৩৭১

ইসলামী আন্দালুসের বিভিন্ন যুগ ৩৭১

প্রথম যুগ: বেলায়েত যুগ ৩৭২

দ্বিতীয় যুগ: বনু উমাইয়া আমিরাত ৩৭২

তৃতীয় যুগ: মুলুকুত তাওয়ায়েফ ৩৭২

চতুর্থ যুগ: মুরাবিতুন ৩৭২

পঞ্চম যুগ: মুওয়াহহিদুন ৩৭২

ষষ্ঠ যুগ: আন্দালুসে সগির - গ্রানাডার বনু নাসর ৩৭৩

আন্দালুসের প্রাচীন ইতিহাস ৩৭৪

এই দেশে মুসলিম শাসনের প্রভাব ৩৭৭

আন্দালুসের বেলায়েত যুগ ৩৭৮

আন্দালুসে আমিরদের ধারাবাহিকতা ৩৭৯

আবদুল আজিজ বিন মুসা ৩৭৯

আইয়ুব বিন হাবিব ৩৭৯

হুর বিন আবদুর রহমান ৩৭৯

সামহ বিন মালিক খাওলানি ৩৮০

আনবাসা বিন সুহাইম কালবি ৩৮০

১০৭ হিজরি থেকে ১১২ হিজরি পর্যন্ত শাসকগণ ৩৮১

আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ গাফিকি ৩৮১

উকবা বিন হাজ্জাজ সালুলি ৩৮১

আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরি ৩৮২

বালজ বিন বিশর ৩৮২

সালাবা বিন সালামা ৩৮৩

হুসাম বিন দিরার আবুল খাত্তার ৩৮৩

গৃহযুদ্ধের যুগ এবং ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরি ৩৮৩

এক নজরে বেলায়েত যুগ ৩৮৪

আন্দালুসের নতুন খ্রিস্টান রাষ্ট্র - আস্তুরিয়াস ৩৮৫

আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণ ৩৮৮

প্রথম আবদুর রহমান ৩৮৯

বনু উমাইয়ার পতন এবং আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ৩৮৯

আফ্রিকায় আত্মগোপন ৩৯০

আন্দালুসের আমিরদের সাথে যোগাযোগ ৩৯১

আন্দালুসে প্রবেশ, আমিরাত ঘোষণা ৩৯১

ইউসুফ বিন আবদুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ ৩৯১

আব্বাসীয়দের হাত থেকে দেশ রক্ষা ৩৯২

ফ্রান্সের রাজার আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ ৩৯৩

ইন্তেকাল ৩৯৪

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র ৩৯৪

উন্নয়নমূলক কাজ ৩৯৫

জ্ঞান-সাহিত্য ও কবিতা ৩৯৫

প্রথম হিশাম আর-রাজি ৩৯৮

ভাইদের সাথে সংঘর্ষ ও সদ্যবহার ৩৯৯

শরয়ী বিধান জারি করা ৩৯৯

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩৯৯

জিহাদের দ্বিতীয় অভিযান ৪০১

তৃতীয় অভিযান ৪০১

ইমাম মালিক রহ.-এর হিশামের প্রতি পরোক্ষ মহব্বত ৪০২

আন্দালুসে মালিকি ফিকহের প্রসার ৪০২

শিক্ষা ও ইসলামের প্রচার ৪০২

ন্যায় ও ইনসাফ ৪০৩

কুধারণা নির্মূল করার জন্য নিজের নফসের ওপর কঠোরতা ৪০৩

আল-হাকাম আল-আউয়াল, আর-রাব্বি ৪০৫

চাচাদের বিদ্রোহ ৪০৫

ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ৪০৬

আন্দালুসের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান শক্তির জোট ৪০৬

মালিকি উলামাদের বিদ্রোহ ও মৃত্যুদণ্ড ৪০৮

তোলেদোর অধিবাসীদের সাথে আচরণ ৪০৮

মেরিদার বিদ্রোহ ৪০৯

জিহাদি অভিযানসমূহ ৪০৯

উত্তর স্পেনে আব্দুল করিমের আক্রমণ ৪১০

দুর্ভিক্ষের বছরগুলো ৪১০

আফ্রিকান দাসদের নিয়োগ ৪১১

কর্ডোভাবাসীদের বিদ্রোহ ৪১১

মৃত্যু ৪১২

আল-হাকামের চরিত্রের ওপর এক নজর ৪১২

আব্দুর রহমান আস-সানি ৪১৪

কাস্তিল রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন ৪১৪

উত্তর আন্দালুসের অভিযানসমূহ ৪১৫

মেরিদা ও তোলেদোর বিদ্রোহসমূহ ৪১৫

উত্তর আন্দালুসে বার্ষিক অভিযানসমূহ ৪১৬

নরমানদের আক্রমণ ৪১৬

নৌবাহিনীর ওপর গুরুত্বারোপ ৪১৭

কায়সারের দূতগণ ৪১৭

মালিকি মাযহাবের প্রসার ৪১৮

জিরইয়াব - আলী বিন নাফে ৪১৯

রাসূলের অবমাননার অপবিত্র প্রচারণা ৪২০

আব্দুর রহমান সানির মৃত্যু ৪২০

মুহাম্মদ আউয়াল ৪২২

সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের নিয়োগ ৪২২

রাসূলের অবমাননা প্রচারণার পরিণতি ৪২২

নরমানদের আক্রমণ ৪২৩

আন্দালুসে বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী ৪২৩

মুওয়াল্লাদদের বিদ্রোহ ও তার কারণসমূহ ৪২৪

তোলেদোর অভিযানসমূহ ৪২৪

উত্তরের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধ ৪২৫

তোলেদোর আধা-স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর ৪২৫

ইবনে মারওয়ানের বিদ্রোহ ৪২৫

উমর বিন হাফসুনের উত্থান ৪২৬

মৃত্যু ৪২৭

إمام بقی بن مخلد رحمه الله (ইমাম বাকি বিন মাখলাদ রহ.) ৪২৮

মুনজির বিন মুহাম্মদ ৪২৯

আব্বাস বিন ফিরনাসের উদ্ভাবনসমূহ ৪২৯

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ৪৩১

কর্ডোভার বাইরে উমর বিন হাফসুনের সাথে ঐতিহাসিক যুদ্ধ ৪৩২

তৃতীয় আলফোনসো এবং খ্রিস্টান রাজ্য “লিওন”-এর উত্থান ৪৩৩

আব্দুর রহমান আন-নাসির ৪৩৪

সংস্কারহীন ব্যবস্থার সংশোধন ৪৩৫

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান ৪৩৫

ইশবিলিয়া বিজয় ৪৩৬

উমর বিন হাফসুনের আত্মসমর্পণ ৪৩৬

উমর বিন হাফসুনের উত্তরসূরিদের অবসান ৪৩৭

খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ ৪৩৮

ইবনে আবি আবদাহর খ্রিস্টানদের কাছে পরাজয় ৪৩৮

খ্রিস্টানদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ ও সফলতা ৪৩৯

বিজয়সমূহের পূর্ণতা ৪৩৯

শত্রুদের মধ্যে বিভেদ ৪৪০

খিলাফত ঘোষণা ৪৪০

বাতলিয়ুস ও মারদাহ জয় ৪৪১

তলাইতুলা (মাদ্রিদ) বিজয় ৪৪১

সারাকুস্তা বিজয় ৪৪২

আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ মাহদী ও তার উত্তরসূরিদের ফিতনা-ফ্যাসাদ ৪৪২

আবদুর রহমান আন-নাসিরের আফ্রিকা বিজয়সমূহ ৪৪৩

খন্দকের ভয়াবহ যুদ্ধ ৪৪৪

পাল্টা ব্যবস্থা ও ধারাবাহিক বিজয়সমূহ ৪৪৬

কুরতুবা দরবারে ইউরোপীয় শাসকদের প্রতিনিধি দল ৪৪৬

খ্রিস্টান শাসকরা ফরিয়াদি হয়ে এল ৪৪৮

আন্দালুসের জ্ঞানতাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ৪৪৯

কাব্য ও সাহিত্যের চরম শিখর ৪৫০

আন্দালুসের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ৪৫১

সালিম ও আলমেরিয়ার নির্মাণ ৪৫৩

কাজী মুনজির বিন সাঈদ বাল্লুতির নসিহত ৪৫৫

দুর্ভিক্ষের সময় আবদুর রহমান আন-নাসিরের দোয়া ৪৫৬

কুরতুবা জামে মসজিদ ৪৫৭

আবদুর রহমান আন-নাসিরের অসুস্থতা ও মৃত্যু ৪৫৯

আল-হাকাম সানি মুসতানসির বিল্লাহ ৪৬০

জ্ঞানতাত্ত্বিক খিদমত ৪৬০

জ্ঞানীদের কদর করা ৪৬২

উলামা ও ফুকাহাদের কুরতুবার দিকে প্রত্যাবর্তন ৪৬২

ব্যক্তিগত পাঠাগার ৪৬৩

হাকাম সানির জিহাদি তৎপরতা ৪৬৪

কুরতুবা দরবারে চতুর্থ অর্ডোনোর উপস্থিতি ৪৬৪

আরও একবার জিহাদি সফর ৪৬৫

আফ্রিকা অভিযান ৪৬৫

হাকাম সানির মৃত্যু ৪৬৬

হিশাম আল-মুয়ায়্যিদ বিল্লাহ ও মুহাম্মদ বিন আবি আমির (হাজিব আল-মানসুর) ৪৬৭

মুসহাফির ষড়যন্ত্র ও মুগিরা বিন আন-নাসিরের হত্যাকাণ্ড ৪৬৭

দ্বিতীয় হিশামের রাজ্যাভিষেক ও ইবনে আবি আমিরের ক্ষমতা লাভ ৪৬৯

আয-যাহিরার নির্মাণ ৪৭০

জাফর বিন উসমানের বেদনাদায়ক পরিণতি ৪৭০

খ্রিস্টানদের ওপর ইবনে আবি আমিরের প্রভাব-প্রতিপত্তি ৪৭০

লিওন রাজ্যের ওপর আক্রমণ ৪৭১

রাজত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া - জাফর বিন উসমানের হত্যাকাণ্ড ৪৭১

স্বায়ত্তশাসন ৪৭২

আরও বিজয়সমূহ ৪৭২

লিওন ও জালিকিয়া অভিযানসমূহ ৪৭২

সেন্ট ইয়াকুবের অভিযান ৪৭২

আফ্রিকায় সাফল্যসমূহ ৪৭৪

খলিফার শোভাযাত্রা ৪৭৪

ওফাত ৪৭৪

ধর্মীয় আবেগ ৪৭৫

মনসুর আজমের গোয়েন্দা ব্যবস্থা ৪৭৫

সহনশীলতা ৪৭৬

ন্যায়বিচারের এক অদ্ভুত ঘটনা ৪৭৬

হায়! যদি এই তীরন্দাজ....! ৪৭৭

সেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিচয় যাদের সাথে জিহাদ অব্যাহত ছিল ৪৭৭

আবদুল মালিক হাজিব আল-মুজাফফর ৪৭৯

খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়্যাদের সিংহাসন আরোহণ ৪৭৯

জিহাদি কীর্তিসমূহ ৪৭৯

সানচে গ্রিভের সাথে বিরোধ এবং দ্বিতীয় অভিযান ৪৮০

অন্যান্য অভিযান এবং কালোনিয়া যুদ্ধ ৪৮০

এই যুগে ইসলামী আন্দালুসের অবস্থা ৪৮০

উজির ঈসা বিন সাঈদের পরিণতি ৪৮০

শেষ অভিযান এবং ওফাত ৪৮১

আবদুল মালিকের চরিত্র ও শাসনকালের ওপর এক নজর ৪৮১

আন্দালুসের উমাইয়্যাদ... পতনের মুখে ৪৮২

১. হাজিব আবদুর রহমান শানজুল ৪৮২

২. মুহাম্মদ সানি বিন হিশাম আল-মাহদি ৪৮৩

৩. সুলাইমান বিন আল-হাকাম মুস্তাইন বিল্লাহ ৪৮৫

২. মুহাম্মদ সানি আল-মাহদি, দ্বিতীয়বার ৪৮৬

৫. হিশাম আল-মুয়াইয়্যাদ, দ্বিতীয়বার ৪৮৬

বার্বারদের হাতে আল-জাহরার ধ্বংসযজ্ঞ ৪৮৭

হিশাম আল-মুয়াইয়্যাদ নিখোঁজ ৪৮৯

৬. মুস্তাইন বিল্লাহ, দ্বিতীয়বার ৪৮৯

কর্ডোভা - বনু হাম্মুদ এবং বনু উমাইয়া পর্যায়ক্রমে ৪৯১

৭. আলী বিন হাম্মুদ ৪৯১

৮. কাসিম বিন হাম্মুদ ৪৯২

৯. ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হাম্মুদ ৪৯২

১০. কাসিম বিন হাম্মুদ - দ্বিতীয়বার ৪৯৩

১১. আবদুর রহমান বিন হিশাম আল-মুস্তাজহির ৪৯৩

১২. আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-মুস্তাকফি ৪৯৪

১৩. ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হাম্মুদ - দ্বিতীয়বার ৪৯৪

১৪. হিশাম বিন মুহাম্মদ আল-মু'তাদ বিল্লাহ ৪৯৫

পতনের কারণসমূহ ৪৯৫

আন্দালুসের (কর্ডোভা) শাসকদের তালিকা ৪৯৮

মুলুকুত তাওয়াইফ ৫০১

চরম বিশৃঙ্খলা ও বিকেন্দ্রীকরণ ৫০২

মুলুকুত তাওয়াইফের আত্মপরিচয় ৫০৪

কবিতা ও সাহিত্যের ময়দান ৫০৪

কাসিদা রচনার চরম উৎকর্ষ ৫০৫

কর্ডোভা এবং বনু জাহহুর শাসন ৫০৭

সেভিল রাষ্ট্র এবং বনু عبّাদ ৫০৮

মু'তাদিদ-এর যুগ ৫০৮

মু'তাদিদ-এর সিংহাসন লাভ ৫০৯

মু'তাদিদ-এর বিজয়সমূহ এবং বিরোধীদের ওপর জুলুম ৫১০

গ্রানাডা রাষ্ট্র এবং বাদিস বিন হাবুস ৫১১

গ্রানাডার ইহুদি উজির ৫১১

ইহুদি উজিরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবিদের প্রতিবাদ ৫১২

পূর্ব আন্দালুসিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ ৫১৩

বালানসিয়া ৫১৪

আল-মেরিয়া ৫১৪

ফার্ডিনান্ড প্রথম এবং কাস্টিলের বিপজ্জনক পরিকল্পনা ৫১৪

তুলাইতুলাহ এবং বনু জুল-নুন ৫১৫

ইশবিলিয়াও করদ রাজ্যে পরিণত ৫১৬

বনু আফতাস রাষ্ট্র - বাতালইউস ৫১৭

সারাকুস্তা রাষ্ট্র এবং বনু হুদ ৫১৮

পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয় কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা এবং নরম্যানদের আক্রমণ ৫১৯

বারবাস্ত্রো পুনরুদ্ধার - একটি সাহসী পদক্ষেপ ৫১৯

খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভেদ এবং মুলুকুত তাওয়াইফদের মূর্খতা ৫১৯

মুতাদিদের প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ এবং মৃত্যু ৫২০

মুহাম্মদ মুতামিদ, ইশবিলিয়ার কবি রাজা ৫২১

কবিতার প্রাচুর্য ৫২১

ইবনে আন্নারের কাহিনী ৫২১

উজির পদে ইবনে আন্নার ৫২২

ইবনে আন্নারের প্রতি মুতামিদের ভালোবাসা ৫২২

মুতামিদের নতুন ভালোবাসা, রুমাইকিয়া ৫২৪

মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার মনোরম দিনরাত ৫২৪

কর্ডোভায় মুলুকুত তাওয়াইফদের বিশৃঙ্খলা ৫২৫

ইবনে উকাশার কর্ডোভা দখল এবং বেগী ৫২৬

আল-মামুনের পরিণতি ৫২৭

ইয়াহইয়া আল-কাদির ৫২৮

আলফনসো ষষ্ঠের আক্রমণ ৫২৯

ইশবিলিয়ার ওপর আলফনসো ষষ্ঠের আক্রমণ - আলফনসোর সাথে আলোচনা এবং দাবার
ছক ৫৩১

ইবনে আন্নারের উত্থান ৫৩১

ইবনে আন্নার ও মুতামিদের মধ্যে দূরত্ব এবং তারপর শত্রুতা ৫৩২

ইবনে আন্নারের পরিণতি ৫৩৪

তুলাইতুলাহ এবং ইশবিলিয়া লক্ষ্যবস্তুতে ৫৩৪

ইশবিলিয়া রাষ্ট্রের শহরগুলোর ওপর আক্রমণ ৫৩৫

তুলাইতুলাহর পতন ৫৩৬

আন্দালুসিয়ার পূর্ব উপকূল পর্যন্ত আলফনসো ষষ্ঠের পৌঁছানো ৫৩৭

আন্দালুসিয়ার অন্যান্য শহর বিপদে ৫৩৭

মুসলমানদের ঐক্যের জন্য উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ৫৩৮

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ. ৫৩৮

আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরী রহ. ৫৩৯

কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী রহ.-এর আন্দোলন ৫৪১

মুরাবিতুন ৫৪২

ইউসুফ বিন তাশফিন ৫৪২

ইউসুফ বিন তাশফিনের ইমারত ৫৪৩

মুলুকুত তাওয়াইফদের জন্য মুরাবিতুনদের থেকে বিপদ এবং পারস্পরিক পত্রবিনিময়
৫৪৩

কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী রহ. এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পত্রাবলি
৫৪৪

আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন ৫৪৪

উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিলের আলফনসো ষষ্ঠকে জবাব ৫৪৫

আলফনসোর পত্র এবং মুতামিদের ঈমানদীপ্ত জবাব ৫৪৬

মুতামিদের সিদ্ধান্ত ৫৪৬

ঐকমত্যের জন্য মুতামিদের ভাষণ ৫৪৭

আমীর ইউসুফের নামে আন্দালুসিয়ার শাসকদের পত্র ৫৪৭

ইউসুফ বিন তাশফিনের আন্দালুসিয়ায় আগমন ও অভ্যর্থনা ৫৪৮

আলফনসো ষষ্ঠের পত্র এবং ইউসুফ বিন তাশফিনের জবাব ৫৪৮

নিজেই দেখে নেবে ৫৪৯

আলফনসো ষষ্ঠের স্বপ্ন ৫৪৯

মুরাবিতুনদের অগ্রযাত্রা ৫৫০

যাঙ্লাকার যুদ্ধ ৫৫০

সুস্পষ্ট বিজয়ের অভিনন্দন ৫৫৫

ইউসুফ বিন তাশফিনের প্রত্যাবর্তন এবং এর কারণসমূহ ৫৫৫

খ্রিস্টানদের পুনরায় আক্রমণ - সিড ক্যাম্পিডোরের উত্থান ৫৫৭

হিসনুল লাইত: আলফনসোর নতুন সামরিক শিবির ৫৫৭

ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে পুনরায় হস্তক্ষেপের আবেদন ৫৫৮

হিসনুল লাইতের যুদ্ধ এবং মুলুকুত তাওয়ায়েফদের নীচতা ৫৫৮

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ৫৬০

আগামাতের কারাগার ৫৬৩

কারাগারে মুতামিদের আত্ননাদ ৫৬৫

মুতামিদের কন্যার ঘটনা ৫৬৫

মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার মৃত্যু ৫৬৬

আগামাতে দুটি কবর ৫৬৬

পূর্ব আন্দালুসিয়ার মুলুকুত তাওয়ায়েফদের পতন ৫৬৭

বনু আফতাস রাষ্ট্রের পতন ৫৬৮

মুলুকুত তাওয়ায়েফ - তালিকা ৫৬৮

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ এবং তাদের প্রধানগণ ৫৬৯

আন্দালুসিয়ায় মুরাবিতুনদের যুগ ৫৭৮

আন্দালুসিয়া মুরাবিতুনদের শাসনাধীনে ৫৭৯

ভ্যালেন্সিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন ৫৮০

ভ্যালেন্সিয়ার ওপর সিডের দখলদারিত্ব ৫৮০

মুহাম্মদ বিন তাশফিনের আগমন, ভ্যালেন্সিয়া পুনরুদ্ধার এবং সিডের মৃত্যু ৫৮০

আব্বাসীয় খিলাফত সম্পর্কে মুরাবিতুনদের দৃষ্টিভঙ্গি ৫৮২

আন্দালুসিয়া সম্পর্কে ইউসুফ বিন তাশফিনের রণকৌশল ৫৮২

ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যু ৫৮৩

আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের ওপর মুরাবিতুনদের আধিপত্যের প্রভাব ৫৮৩

আলী বিন ইউসুফ ৫৮৪

মুরাবিতুন সাম্রাজ্যে ইমাম গাজালীর ‘এহয়াউল উলুম’-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা ৫৮৪

হাফতের যুদ্ধে বিজয় - আলফনসো ষষ্ঠের মৃত্যু ৫৮৪

তলেতোলার শহরতলিতে দখলদারিত্ব ৫৮৫

টলেডো দখলে ব্যর্থতা ৫৮৫

সারগোসা বিজয় ৫৮৬

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধার ৫৮৬

পর্তুগালে অগ্রযাত্রা ৫৮৬

অষ্টম আলফনসোর উত্থান ৫৮৬

কুতান্দার যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ৫৮৭

দক্ষিণ আন্দালুসে রডমির - গ্রানাডায় আক্রমণ ৫৮৭

গ্রানাডার নাসারাদের বহিষ্কার ৫৮৮

কিলা-এর ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় ৫৮৮

আফরাগার যুদ্ধ, নাসারাদের পরাজয়, রডমিরের মৃত্যু ৫৮৯

আল-বাকার যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্য ৫৮৯

একটি ঐতিহাসিক বিচ্যুতি, নাসারাদের আক্রমণ অব্যাহত ৫৯০

আলী বিন ইউসুফের ইন্তেকাল ৫৯০

তাশফিন বিন আলী ৫৯১

আন্দালুসে মুরাবিতুনদের সাফল্য ৫৯১

মুওয়াহহিদুনদের সাথে যুদ্ধে তাশফিনের পরাজয় ৫৯১

আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন তাশফিন ৫৯২

মুরাবিতুনদের যুগের ওপর একটি মন্তব্য ৫৯২

মুরাবিতুনদের পতনের কারণসমূহ ৫৯২

মুরাবিতুন আমিরদের তালিকা ৫৯৩

আন্দালুসে মুওয়াহহিদুনদের যুগ ৫৯৪

ইবনে তুমারত ৫৯৫

বদদোয়ার বর্ণনার ওপর পর্যালোচনা ও দৃষ্টিভঙ্গি ৫৯৬

ইবনে তুমারতের আন্দোলন ৫৯৭

আবদুল মুমিন ৫৯৯

আন্দালুসে নাসারাদের লুটতরাজ ৬০০

আন্দালুসে মুরাবিতুনদের ওপর মুওয়াহহিদুনদের প্রাধান্য ৬০০

মুওয়াহহিদুনদের বিজয়সমূহ ৬০১

আবদুল মুমিনের চরিত্রের ওপর এক নজর ৬০২

আবু ইয়াকুব ইউসুফ আউয়াল বিন আবদুল মুমিন ৬০৩

পর্তুগাল সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য নতুন সমস্যা ৬০৩

আবু ইয়াকুবের আন্দালুস আগমন এবং জিহাদি অভিযানসমূহ ৬০৪

আন্দালুসে আবু ইয়াকুবের শেষ অভিযান এবং শাহাদাত ৬০৪

আবু ইউসুফ ইয়াকুব, আল-মানসুর ৬০৫

ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ, নাসারাদের অত্যাচার এবং আবু ইউসুফের পর্তুগাল আক্রমণ ৬০৫

আলার্কের যুদ্ধ ৬০৬

আন্দালুসে আল-মানসুরের আরও বিজয়সমূহ ৬০৮

আবু ইয়াকুব আল-মানসুরের ইন্তেকাল ৬০৯

আবু ইয়াকুবের যুগের ওপর এক নজর ৬০৯

মুওয়াহহিদুন এবং ফকিহদের তাকলিদ ৬০৯

কাজী ইবনে রুশদের দেশান্তর এবং নজরবন্দি ৬০৯

মুহাম্মদ আন-নাসির বিন ইয়াকুব ৬১১

উকাবের যুদ্ধ ৬১১

আন-নাসিরের মৃত্যু ৬১৩

আবু ইয়াকুব ইউসুফ সানি, মুস্তানসির বিল্লাহ ৬১৪

আবদুল ওয়াহিদ বিন ইউসুফ ৬১৫

আল-আদিল ৬১৫

আন্দালুসে আবদুল্লাহ আল-বায়ানির বিদ্রোহ ৬১৬

খ্রিস্টানদের মোকাবিলায় মুওয়াহহিদুনদের পরাজয় ৬১৬

আল-আদিলের আফ্রিকায় প্রত্যাভর্তন ৬১৬

আন্দালুসে খ্রিস্টানদের আধিপত্য বিস্তারে আল-বায়াসির ভূমিকা ৬১৭

বায়াসির পরিণতি ৬১৮

আবুল আলা এবং লাইস আল-মামুন ৬১৯

তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে অপমানজনক চুক্তি ৬১৯

বিদ্রোহী শাহজাদা ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয় ৬১৯

ইবনে তুমারতের মাহদি দাবি ও নিষ্পাপ হওয়ার খণ্ডন ৬২০

সেউতায় বিদ্রোহ ৬২০

মারাক্কেশে ইয়াহইয়া মুতাসিমের দখল - মামুনের মৃত্যু ৬২০

মামুনের শাসনামলের ওপর এক নজর ৬২১

আর-রশিদের বায়আত ৬২২

ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয় ও হত্যা ৬২২

মারাক্কেশে আর-রশিদের দখল ৬২২

মুওয়াহহিদুনদের ওপর এক নজর ৬২২

আন্দালুস থেকে মুওয়াহহিদুনদের বহিষ্কারের কারণসমূহ ৬২৩

আন্দালুস সুগরা (ক্ষুদ্র আন্দালুস) ৬২৪

মুওয়াহহিদুনদের পর ৬২৫

মুরসিয়ার বনু হুদ ৬২৫

বাতালইউসের পতন ৬২৬

জিয়ানের ওপর ফার্ডিনান্ডের আক্রমণ এবং লিওনের রাজত্ব ৬২৭

মুস্তানসির বিল্লাহ আব্বাসির পক্ষ থেকে শাসনের সনদ ৬২৭

ফার্ডিনান্ডের মোকাবিলায় পরাজয় এবং কর প্রদানের চুক্তি ৬২৭

ইবনুল আহমারের সাথে সন্ধি ৬২৭

তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের ধূর্ততা এবং ইবনে হুদের অদূরদর্শিতা ৬২৮

হনুর দেশ এবং আবু জামিল ৬২৮

মুওয়াহহিদুন শাহজাদা আবু জায়েদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ৬২৯

আবু জামিল এবং ইবনে হুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ৬২৯

বনু নাসর ৬২৯

আন্দালুস কুবরার পতন ৬৩১

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের পতন ৬৩১

মেয়োর্কার পতন ৬৩২

অবশিষ্ট দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা ৬৩২

কর্ডোভার পতন ৬৩২

অজেয় কর্ডোভা কীভাবে বিজিত হলো? ৬৩৩

ভ্যালেন্সিয়ার পতন ৬৩৪

আনিশার যুদ্ধ ৬৩৪

ইবনে হুদের পরিণতি ৬৩৫

ভ্যালেন্সিয়ার ওপর আক্রমণ ৬৩৬

আবু জামিল এবং ইবনুল আব্বারের পরিণতি ৬৩৭

ইশবিলিয়া ও গ্রানাডায় ইবনুল আহমারের শাসন ৬৩৭

ইশবিলিয়ার পতন ৬৩৮

একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় ইশবিলিয়াবাসীর অবস্থা ৬৩৯

ইশবিলিয়ার শোকগাথা ৬৩৯

বনু নাসর রাষ্ট্র ৬৪১

১. মুহাম্মদ ইবনুল আহমার, মুহাম্মদ আউয়াল, আল-গালিব বিল্লাহ ৬৪১

মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের উত্তরসূরিদের শাসনকাল ৬৪৩

৩. আল-ফকিহ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ সানি ৬৪৪

৪. মুহাম্মদ সালিস, আল-মাখলু, আবু আব্দুল্লাহ ৬৪৭

৫. আবুল জুইউশ, নাসর বিন মুহাম্মদ ৬৪৮

৬. আবুল ওয়ালিদ, ইসমাইল আউয়াল বিন ফারাজ ৬৪৯

মানজারা বিয়ুনসের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ৬৪৯

৮. মুহাম্মদ রাবে, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ফারাজ ৬৫২

৯. আবুল হাজ্জাজ, ইউসুফ বিন ইসমাইল, ইউসুফ আউয়াল ৬৫৩

১০. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ খামিস, গনি বিল্লাহ ৬৫৫

১১. ইসমাইল বিন ইউসুফ, ইসমাইল সানি ৬৫৬

১২. আবু আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ফারাজ, মুহাম্মদ সাদিস ৬৫৬

৬৫৬

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, গনি বিল্লাহ, মুহাম্মদ খামিস (পুনরায়) ৬৫৮

আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব রহ. ৬৫৮

বনু নাসরের পতনকাল ৬৬০

১৬. ইউসুফ সানি, আবুল হাজ্জাজ ৬৬০

১৭. মুহাম্মদ সাবি, আবু আব্দুল্লাহ মুস্তাইন বিল্লাহ ৬৬০

১৮. ইউসুফ সালিস, আন-নাসির ৬৬২

১৯. মুহাম্মদ সামিন, আবু আব্দুল্লাহ, আল-আইসার ৬৬৩

২০. মুহাম্মদ তাসি, আজ-জাগির ৬৬৩

মুহাম্মদ সামিন, আল-আইসার - পুনরায় ৬৬৪

২২. ইউসুফ রাবে, ইবনুল আহমার ৬৬৫

মুহাম্মদ সামিন, আল-আইসার - তৃতীয়বার ৬৬৫

২৪. মুহাম্মদ আল-আহনাফ বিন নাসর, মুহাম্মদ আশির ৬৬৭

১৮. সাদ বিন আলী বিন ইসমাইল, ইউসুফ খামিস, মুস্তাইন বিল্লাহ ৬৬৭

মুহাম্মদ আল-আহনাফ বিন নাসর, মুহাম্মদ আশির, পুনরায় ৬৬৭

ইবনে ইসমাইল, ইউসুফ খামিস, মুস্তাইন বিল্লাহ ৬৬৮

তারিখে আন্দালুসের শেষ বেদনাদায়ক অধ্যায় ৬৭০

১৯. সুলতান আবুল হাসান আলী, আল-গালিব বিল্লাহ ৬৭০

ভয়াবহ বন্যা ৬৭১

শাসকদের উদাসীনতা ৬৭১

আবুল কাসিমের মন্ত্রণালয় ৬৭২

আবু হাসান ও বেগমগণ ৬৭২

উজির আবুল কাসিমের দুর্নীতিসমূহ ৬৭২

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম ও ইসাবেলা ৬৭৩

আবু হাসান আলীর কর দিতে অস্বীকার ৬৭৩

আরাগন ও কাস্টিলের একত্রীকরণ ৬৭৩

জিহাদ ঘোষণা, আস-সাখরার বিজয় ৬৭৩

আল-হামার যুদ্ধ ৬৭৩

লোশার রণাঙ্গন ৬৭৪

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের বিদ্রোহ ৬৭৫

মালাগায় খ্রিস্টানদের পরাজয় ৬৭৫

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের গ্রেপ্তার ও পদচ্যুতি ৬৭৬

সুলতান আবুল হাসান আলীর মৃত্যু ৬৭৭

২০. সুলতান মুহাম্মদ বিন সাদ আজ-জাগাল, মুহাম্মদ আশির ৬৭৭

ফার্ডিনান্ড ও রানী আয়েশার মধ্যে গোপন চুক্তি ৬৭৮

আবু আব্দুল্লাহর মুক্তি ও লোশার ওপর খ্রিস্টানদের দখল ৬৭৯

আজ-জাগাল ও আবু আব্দুল্লাহর চুক্তি ৬৭৯

লোশার ওপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ। আবু আবদুল্লাহর পুনরায় গ্রেফতারি ৬৭৯

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং আবু আবদুল্লাহর মধ্যে বিবেচনাধীন গোপন চুক্তি ৬৮০

আবু আবদুল্লাহর গ্রানাডা দখল ৬৮১

মালাগার পতন ৬৮২

মিশরের বাদশাহর পত্র এবং ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের উত্তর ৬৮৩

পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোর পতন। আল-জাগালের আত্মসমর্পণ ৬৮৩

(২১) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ একাদশ ৬৮৫

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ এবং মুসা বিন আবি আল-গাসসান ৬৮৫

আবু আবদুল্লাহর সাহস এবং ফার্ডিনান্ডের সাথে যুদ্ধ ৬৮৬

আল-জাগালের আফ্রিকা যাত্রা ৬৮৮

আবু আবদুল্লাহর কয়েকটি দুর্গ এবং অস্ত্রাগার দখল ৬৮৮

ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের গ্রানাডা আক্রমণ ৬৮৮

অসহায় মুসলমানদের আফ্রিকা ও গ্রানাডায় স্থানান্তর ৬৮৯

গ্রানাডার পতন ৬৯০

মুসার স্লোগান ৬৯০

গেরিলাদের সফল অভিযানসমূহ ৬৯০

তুষারপাত এবং গ্রানাডায় দুর্ভিক্ষ ৬৯১

শেষ যুদ্ধ ৬৯১

আলহামরা প্রাসাদের বৈঠক ৬৯২

গ্রানাডার পতনের সন্ধিপত্র ৬৯৪

এই পরিস্থিতি আমাদের মেরে ফেলবে, চলো ঘুমিয়ে পড়ি ৬৯৬

মুসা বিন আবি আল-গাসসানের চোখ খুলে দেওয়ার মতো ভাষণ ৬৯৭

গ্রানাডার শেষ সকাল ৬৯৮

আবু আবদুল্লাহর পরিণতি ৭০১

আবু আবদুল্লাহর অশ্রুসিক্ত পত্র ৭০১

মুসলিম আন্দালুস সগিরার (ক্ষুদ্র আন্দালুস) দীর্ঘকাল টিকে থাকার কারণসমূহ ৭০৩

মুসলমানদের সহনশীলতার বিপরীতে খ্রিস্টানদের সংকীর্ণমনা মনোভাব ৭০৫

গ্রানাডার বনু আল-আহমার সুলতানদের তালিকা ৭০৫

আন্দালুসে দাসদের দিনরাত ৭০৭

ফার্ডিনান্ডের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ৭০৭

অন্ধকার বাড়তে থাকল ৭০৮

একটি রোমহর্ষক কাব্যিক পত্র ৭০৯

স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলন এবং এর পরিণতি ৭১১

পশ্চিম আন্দালুসে স্বাধীনতার সংগ্রাম ৭১১

লাইব্রেরিগুলোর ধ্বংসসাধন ৭১২

পর্তুগালের মুসলমানদের পরিণতি ৭১২

আন্দালুসের মরিসকো এবং ইনকুইজিশন (তদন্তকারী) প্রতিষ্ঠানসমূহ ৭১২

জবরদস্তিমূলক খ্রিস্টান বানানোর অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা ৭১৪

ফকিহদের ফতোয়া ৭১৪

কলম্বাস এবং আমেরিকা আবিষ্কার ৭১৫

ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের উত্তরসূরি এবং স্প্যানিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ৭১৫

মরিসকো মুসলমানদের ওপর নির্যাতন ৭১৬

শেষ স্ফুলিঙ্গ ৭১৮

মুসলমানদের সম্পূর্ণ বহিষ্কার ৭২২

পতনের কারণসমূহ ৭২৭

মুসলিম যুগে স্পেনের খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহ ৭২৭

লিওন ও আন্তুরিয়াস রাজ্য ৭২৭

নাভারে রাজ্য ৭২৮

কাস্তিল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ৭২৮

গ্রানাডা রাজ্যের সমসাময়িক কাস্তিলের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ৭২৯

আরাগন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ৭২৯

গ্রানাডা রাজ্যের সমসাময়িক আরাগনের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ৭৩০

পর্তুগাল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ ৭৩০

তৃতীয় অধ্যায়: সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ৭৩১

ইসলাম-পূর্ব উপমহাদেশ ৭৩২

ইসলামের পূর্বে উপমহাদেশের অবস্থা ৭৩৩

বৌদ্ধধর্মের প্রসার ৭৩৪

জৈনধর্ম ৭৩৪

আলেকজান্ডারের আক্রমণ ৭৩৫

মৌর্য বংশের শাসন ৭৩৬

অশোক ৭৩৭

বিভিন্ন বিদেশী শাসন ৭৩৭

চীনা তুর্কিস্তানের ইউয়েঝি উপজাতি ৭৩৭

কুশান বংশ ও কনিষ্ক ৭৩৮

গুপ্ত শাসকগণ ৭৩৮

নতুন রাজ্যসমূহ ৭৩৯

কনৌজ ৭৩৯

দিল্লি ৭৩৯

তামিল ৭৪০

বাংলা ও বিহার ৭৪০

দক্ষিণ ভারত ৭৪০

সিন্ধুর অমুসলিম শাসকগণ ৭৪১

রায় সাহিরাসের শাসন ৭৪১

চচ ৭৪১

দাহির ও রাজ চন্দ্রের রাজত্বকাল ৭৪১

দাহির ও দহর সিং-এর রাজত্বকাল ৭৪২

খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে উপমহাদেশ ৭৪৪

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগের অভিযানসমূহ ৭৪৪

মাকরান বিজয় ৭৪৫

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে ৭৪৭

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে কান্দাবিল ও কিকান বিজয় ৭৪৮

উমাইয়া যুগে উপমহাদেশ ৭৪৮

রাশিদ বিন আমর আল-জুদাইদি - প্রথমবার ৭৪৯

আবদুল্লাহ বিন সাওয়ারের অভিযান, কিকান পুনঃবিজয় ৭৪৯

মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা (রা.)-এর অভিযানসমূহ ৭৪৯

আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.)-এর পুনরায় আমীর নিযুক্ত হওয়া ৭৫০

বেলুচিস্তান ৭৫০

সিনান বিন সালামা (রা.)-এর বিজয়সমূহ ৭৫১

রাশিদ বিন আমর আল-জুদাইদির পুনরায় আমীর নিযুক্ত হওয়া ৭৫১

সিনান বিন সালামা (রা.)-এর নেতৃত্ব ৭৫২

সিনান বিন সালামা (রা.)-এর পর ৭৫৩

মুনজির বিন জারুদ ৭৫৩

সাইদ বিন আসলাম ৭৫৪

মুজ্জাআ বিন সি'র ৭৫৪

মুহাম্মদ বিন হারুন বিন জারা’ ৭৫৫

মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭৫৭

দেবল-এর মন্দির ৭৫৭

দেবল বিজয় ৭৫৮

মেহরান উপত্যকার পূর্ব অংশ বিজয় ৭৫৯

নিরুন্ন কোট বিজয় ৭৫৯

উত্তর সিন্ধু বিজয় ৭৬০

নিরুন্ন-এ প্রত্যাবর্তন ৭৬০

সিন্ধু নদ কীভাবে পার হওয়া হয়েছিল? ৭৬০

রাজা দাহিরের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ ৭৬২

প্রথম দিনের যুদ্ধ ৭৬২

রাওয়ার বিজয় ৭৬৯

বাহরুর ও দাহলিলা বিজয় ৭৬৯

ব্রাহ্মণাবাদ ৭৬৯

অরোর বিজয় ৭৭১

মুহাম্মদ বিন কাসিম ও পাঞ্জাবিরা ৭৭২

ব্রাহ্মণ পক্ষের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ৭৭৩

অরোরবাসীর প্রতি দয়া ৭৭৩

ভাট্টিয়া বিজয় ৭৭৪

ইসকান্দা বিজয় ৭৭৪

সিন্ধা বিজয় ও ধ্বংস ৭৭৪

মুলতান বিজয় ৭৭৪

মূর্তিগৃহের ধনভাণ্ডার ৭৭৫

মুলতানের ব্যবস্থাপনা ৭৭৬

নতুন ফ্রন্ট ৭৭৭

কাশ্মীর সফর ৭৭৭

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু - গুজরাট অভিযান ৭৭৭

রাজপুতানা অভিযান ৭৭৮

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপসারণ ৭৭৯

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপসারণের কারণ ৭৭৯

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারি ও কারাবাস ৭৮১

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিণতি ৭৮২

দাহিরের কন্যাদের গ্রেফতারির বর্ণনা ৭৮৩

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর সিন্ধুর উমাইয়া আমিরগণ ৭৮৫

ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ ৭৮৫

হাবিব বিন আবি কাবশাহ ৭৮৫

ইমরান বিন নুমান কালাই ৭৮৫

হাবিব বিন মুহাল্লাব ৭৮৫

আমর বিন মুসলিম বাহিলি ৭৮৫

হিলাল বিন আহওয়াজ তামিমি ৭৮৬

জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান মুররি ৭৮৬

তামিম বিন জাইদ উতবি ৭৮৭

হাকাম বিন আওয়ানা কালবি ৭৮৮

মুহাম্মদ বিন আরার কালবি ৭৮৮

আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭৮৮

মুহাম্মদ বিন আরার কালবি ৭৯০

মনসুর বিন জুমহুর ৭৯০

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা ৭৯০

আব্বাসীয় যুগে সিন্ধুর প্রতিনিধিগণ ৭৯১

আবুল আব্বাস সাফফাহ-এর যুগে ৭৯১

মুসা বিন কাব তামিমি ৭৯১

মনসুরের যুগে ৭৯২

উয়াইনাই বিন মুসা ৭৯২

উমর বিন হাফস বিন আবি সুফরা আতাকি, আল-মা'রুফ হাজার মারদ ৭৯২

হিশাম বিন আমর তাগলিবি ৭৯৩

মা'বাদ বিন খলিল ৭৯৪

মাহদী আব্বাসীর যুগে ৭৯৪

মুহাম্মদ বিন মা'বাদ বিন খলিল ৭৯৪

রাওহ বিন হাতিম ৭৯৪

বিসতাম বিন আমর ৭৯৪

রাওহ বিন হাতিম ৭৯৫

নাসর বিন মুহাম্মদ আল-আশ'আস খুজাই ৭৯৫

মুহাম্মদ বিন সুলাইমান এবং আব্দুল মালিক বিন শিহাব ৭৯৫

নাসর বিন মুহাম্মদ - পুনরায় ৭৯৫

জুবায়ের বিন আব্বাস ৭৯৫

মুতি' বিন আমর আজলি ৭৯৫

লাইস মাওলা মাহদী ৭৯৬

হারুনুর রশিদের যুগে ৭৯৬

সালিম ইউনুসি ৭৯৬

ইসহাক বিন সুলাইমান হাশেমি ৭৯৬

তাইফুর বিন আব্দুল্লাহ বিন মনসুর হিময়ারি ৭৯৭

কাসীর বিন মুসলিম ৭৯৭

মুহাম্মদ বিন আদি ৭৯৭

দাউদ বিন ইয়াজিদ বিন হাতিম মুহাল্লাবি ৭৯৭

মামুনুর রশিদের যুগ ৭৯৮

বিশর বিন দাউদ ৭৯৮

গাসসান বিন আব্বাদ ৭৯৮

মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকি ৭৯৮

বনু আব্বাসের উত্থান যুগে সিন্ধুর শেষ শাসকগণ ৭৯৯

ইমরান বিন মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকি ৭৯৯

আনবাসা বিন ইসহাক দাবি ৮০০

হারুন বিন আবি খালিদ আল-মারওয়াজি ৮০১

সিন্ধুর স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহ ৮০২

দৌলতে মাহানিয়া, সাঞ্জান (গুজরাট) ৮০৪

দৌলতে মাহানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, ফজল বিন মাহান ৮০৪

মুহাম্মদ বিন ফজল ৮০৫

মাহান বিন ফজল ৮০৫

দৌলতে হাব্বারিয়া, মানসুরা ৮০৬

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারির উত্থান ৮০৬

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারির ইমারত ৮০৭

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারির স্বায়ত্তশাসন ৮০৭

আব্দুল্লাহ বিন উমর হাব্বারি ৮০৭

মুসা বিন উমর হাব্বারি ৮০৮

উমর বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর হাব্বারি ৮০৮

ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ এবং তার নিজের নামে খুতবা জারি করা ৮০৮

দৌলতে হাব্বারিয়ায় বুয়াইহি শাসক আদুদ দৌলার খুতবা ৮০৮

দৌলতে হাব্বারিয়ার সমাপ্তি ৮০৮

দৌলতে হাব্বারিয়া ধ্বংসকারী ইসমাইলিদের ওপর সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণ ৮০৯

দৌলতে সামিয়া (বনু মুনাবিহ) মুলতান ৮১০

এই পরিবারটি কারা ছিল? ৮১০

আসাদ বিন মুনাবিহ ৮১২

মুলতানের ইসমাইলি শিয়া শাসন ৮১৩

জলম বিন শিবান ৮১৩

শেখ হামিদ লোধি ৮১৪

দাউদ বিন নাসর ৮১৫

মাদানিয়া রাষ্ট্র, মাকরান ৮১৬

বেলুচ গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি ৮১৬

হযরত আলী (রা.)-এর যুগে কান্দাবিল ও কাইকান বিজয় ৮১৭

উমাইয়া যুগে ৮১৭

আব্বাসীয় যুগে ঈসা বিন মাদানের স্বাধীন শাসন ৮১৯

মাকরানে বনু উমাইয়ার আক্রমণ ৮১৯

মাদান বিন ঈসা ৮১৯

ঈসা বিন মাদান সানি ৮২০

আবুল আসাকির হুসাইন বিন মাদান ৮২০

মুশকি রাষ্ট্র ৮২১

সুমরা ৮২২

খাফিফ ৮২২

সুমরা আউয়াল ৮২৩

রাজা পাল বিন সুমরা ৮২৩

সুমরা দুয়াম ৮২৩

ভুঙ্গার ৮২৩

দুদা আউয়াল ৮২৩

বাই ৮২৪

সাংঘার ৮২৪

হেমু-খাফিফ ৮২৪

আনার (উমর সুমরা আউয়াল) ৮২৪

দুদা দুয়াম ৮২৫

ভুট্টো ৮২৫

ঘান রা ৮২৫

রাজা জয় সিং ৮২৫

মুহাম্মদ তুর সুমরা ৮২৬

ঘান রা দুয়াম ৮২৬

দুদা সুয়াম ৮২৬

বাই ৮২৬

চানেসার ৮২৭

ভুঙ্গার দুয়াম ৮২৭

খাফিফ দুয়াম ৮২৭

দুদা চাহারুম ৮২৭

দালুরাই ৮২৭

উমর সুমরা দুয়াম ৮২৮

ভুঙ্গার সুয়াম ৮২৮

আমির আরমাইল ৮২৯

সান্মাদের শাসনকাল ৮৩০

প্রথম সান্মা শাসক - জাম আফরাহ ৮৩০

জাম জুনা ৮৩০

জাম মানি বিন জাম জুনা ৮৩০

জাম তমাচি বিন মানি ৮৩১

জাম সালাহউদ্দিন ৮৩১

জাম নিজামুদ্দিন বিন সালাহউদ্দিন ৮৩১

জাম আলী শের বিন নিজামুদ্দিন ৮৩১

জাম কারান বিন জাম তমাচি ৮৩১

জাম সিকান্দার বিন ফাতাহ খান ৮৩১

জাম তুঘলক বিন জাম সিকান্দার ৮৩১

জাম মুবারক ৮৩১

জাম ইস্কান্দার বিন জাম ফাতাহ বিন জাম সিকান্দার ৮৩১

জাম সাঞ্জার ৮৩২

জাম নিজামুদ্দিন ওরফে নন্দা ৮৩২

জাম ফিরোজ ৮৩২

উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রভাব ৮৩৩

দক্ষিণ ভারতে ইসলাম ৮৩৪

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা - ইসলামী শাসনের পতন এবং শিয়া মতবাদের প্রসার

৮৩৪

পৃষ্ঠা - ৩১

এই পৃষ্ঠায় কোনো পাঠ্য নেই, শুধুমাত্র একটি আলংকারিক নকশা রয়েছে।

<https://t.me/BoierSomahar>

পৃষ্ঠা - ৩২

এই পৃষ্ঠায় কোনো পাঠ্য নেই, শুধুমাত্র একটি আলংকারিক নকশা রয়েছে।

<https://t.me/BoierSomahar>

পৃষ্ঠা - ৩৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

<https://t.me/BoierSomahar>

উসমানীয় খিলাফত

প্রথম খলিফা সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে শেষ খলিফা আব্দুল মাজিদ সানি পর্যন্ত

ইসলামী আন্দালুস:

প্রথম হিজরি শতাব্দী থেকে গ্রানাডার পতন (৮৯৭ হিজরি পর্যন্ত)

উপমহাদেশের ইতিহাস:

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম শাসনসমূহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

পাঠকদের প্রতি কিছু কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

‘তারিখে উম্মতে মুসলিমা’-র চারটি খণ্ডে প্রায় নয়শ বছরের ইসলামী ইতিহাসের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই নয় শতাব্দীতে মুসলমানদের ওপর উত্থান-পতনের বিভিন্ন যুগ এসেছে। খিলাফতে রাশেদার সোনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে। খিলাফতে বনু উমাইয়ার উত্থানের তিন দশকে বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। এরপর বনু হাশিমের বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় যার ফলে বনু আব্বাস ক্ষমতায় আসে এবং বাগদাদ খিলাফতের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই শহর সোয়া পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত আব্বাসী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। এই সময়ের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী খিলাফতের যুগ শেষ হয় এবং বিভিন্ন দেশে আলাদা আলাদা রাজবংশ এসে শাসন করতে থাকে।

আব্বাসী খিলাফতের পতনের পর হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগ থেকে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরাক, সিরিয়া এবং আফ্রিকায় শিয়া শাসনকর্তাদের আধিপত্য ছিল, যা গজনবী, সেলজুক এবং আইয়ুবী শাসকরা খতম করেন।

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী থেকে সপ্তম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুসেড যুদ্ধ চলতে থাকে এবং সিরিয়া ও মিশরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে তাতারীদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্বের মানচিত্র বদলে যায়। এরপর এই জাতি এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে ইরাক, ইরান, খোরাসান, মধ্য এশিয়া এবং খাজার অঞ্চলের শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকে।

এই সময়ে ভারতের দাস বংশ এবং মিশরের মামলুকরা ইসলামের প্রতিরক্ষার হক আদায় করেছেন। তারা তাতারীদের নিজেদের অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে দেননি এবং ইসলামী জ্ঞান ও সংস্কৃতির শতাব্দী প্রাচীন কেন্দ্র ও গ্রন্থাগারগুলোকে সুরক্ষিত রেখেছেন। এই দেশগুলোর উলামায়ে কেরাম পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে উম্মতের ইলমি উত্তরাধিকার রক্ষা করেছেন এবং ইসলামের আসল রূপকে টিকিয়ে রেখেছেন।

মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পর খিলাফতের কেন্দ্রও পরিবর্তিত হয়ে মিশরে স্থানান্তরিত হয়। এখানে নতুন আব্বাসী খলিফারা মামলুক বাদশাহদের তত্ত্বাবধানে উম্মতের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে টিকে ছিলেন।

অন্যদিকে এশিয়া মাইনরে উসমানীয়রা একটি নতুন রাষ্ট্র কায়েম করে ইউরোপে বিজয়ের ধারা শুরু করে। নবম হিজরি শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা কুসতুনতুনিয়া জয় করে ইউরোপের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের সময় মুসলমানদের সৌভাগ্যের সূর্য মধ্যগগনে ছিল। তারিখে উম্মতে মুসলিমা-র চতুর্থ খণ্ডের শেষে আমরা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ...

...এর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এই গৌরবময় বিজয়ের পর্যালোচনা করেছি। সামগ্রিকভাবে এখন পর্যন্ত আমরা নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও বিষয়সমূহ সম্পন্ন করেছি:

- প্রাক-ইসলামী ইতিহাস
- সীরাতে নববী
- খিলাফতে রাশেদা (১১ হিজরি থেকে ৪০ হিজরি পর্যন্ত)
- উমাইয়া খিলাফত - বনু সুফিয়ান যুগ (৪১ হিজরি থেকে ৬৪ হিজরি)
- জুবাইরি খিলাফত (৬৪ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি)
- উমাইয়া খিলাফত - বনু মারওয়ান যুগ (৭৩ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি)
- আব্বাসীয় খিলাফত বাগদাদ (১৩২ হিজরি থেকে ৬৫৬ হিজরি)
- বনু উবাইদ রাষ্ট্র - মিশর ও আফ্রিকা (২৯৭ হিজরি থেকে ৫৬৭ হিজরি)
- আইয়ুবী সালতানাত - শাম ও মিশর (৫৬৭ হিজরি থেকে ৬৫৮ হিজরি)
- সেলজুক সালতানাত - খোরাসান, মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনর (৪২৯ হিজরি থেকে ৭০৭ হিজরি)
- খোয়ারিজম শাহী সালতানাত - মধ্য এশিয়া ও খোরাসান (৫৩৮ হিজরি থেকে ৬২৮ হিজরি)
- মঙ্গোল সালতানাতসমূহ (সপ্তম হিজরি শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্টম হিজরি শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত)
- মামলুক রাষ্ট্র মিশর ও শাম (৬৪৮ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি)
- আব্বাসীয় খিলাফত কায়রো (৬৫৯ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি)
- উসমানীয় সালতানাত, সুলতান বায়েজিদ সানির পদচ্যুতি পর্যন্ত (৬৯৯ হিজরি থেকে ৯১৮ হিজরি)

এখন আমরা পঞ্চম খণ্ড শুরু করছি উসমানীয় সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে, যার শাসনামলে শাম ও মিশরের ভূমির সাথে সাথে খিলাফতের পদমর্যাদাও আব্বাসীয়দের থেকে উসমানীয়দের কাছে স্থানান্তরিত হয়। সুলতান বায়েজিদ সানি পর্যন্ত উসমানীয়রা কেবল সুলতান ছিলেন, কিন্তু সুলতান সেলিম আউয়ালের সময় থেকে বাবে আলী [১] খিলাফতের কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত এই সম্মান তাদের কাছেই ছিল।

+++

ইতিহাসের এই দীর্ঘ ও গভীর অধ্যয়নের সময় আমরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামী বিশ্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সাথে খুব বেশি সংশ্লিষ্ট হইনি। একটি আন্দালুস এবং অন্যটি উপমহাদেশ। এই দুটি অঞ্চল সেই সব সালতানাত ও খিলাফত থেকে অনেক দূরে ছিল যা মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। খিলাফত বাগদাদে থাকুক বা কায়রোতে, সেখানকার বিপ্লবসমূহ আন্দালুস এবং উপমহাদেশের ওপর...

[১] উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসে “বাবে আলী” বা “আস্তানা” (রাজধানী) বিশেষ পরিভাষা, যা দ্বারা উসমানীয় দরবার বা খিলাফতের দরবার বোঝানো হয়।

কিছু বিশেষ প্রভাবশালী ছিল না। তা সত্ত্বেও এগুলো ছিল ইসলামি বিশ্বের দুটি অত্যন্ত জনবহুল, উৎপাদনশীল এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত উন্নত অঞ্চল, যেখানে তাওহীদের সম্ভ্রানরা শতাব্দীকাল ধরে শাসন করেছে। এখানে বহু শাসক রাজবংশ এসেছে, ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে বড় বড় যুদ্ধ হয়েছে এবং বাকি ইসলামি বিশ্ব থেকে এক প্রান্তে হওয়া সত্ত্বেও এই স্থানগুলো মুসলমানদের জন্য নিজেদের মধ্যে ‘পৃথিবীর স্বর্গ’ হিসেবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং এখানকার ধন-সম্পদ ও শান্তি-শৃঙ্খলার কাহিনী সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল। সুতরাং আমরা খিলাফতে উসমানিয়ার অধ্যায় সম্পন্ন করে প্রথমে ইসলামি আন্দালুস এবং তারপর উপমহাদেশের ইসলামি সরকারগুলোর পর্যালোচনা করব। সেই ভিত্তিতে এই অংশের বিন্যাস নিম্নরূপ হবে:

- প্রথম অধ্যায়: খিলাফতে উসমানিয়া (সুলতান সেলিম আউয়াল থেকে খিলাফতের পতন পর্যন্ত)
- দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামি আন্দালুস (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত)
- তৃতীয় অধ্যায়: উপমহাদেশের ইতিহাস (সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম সরকারসমূহ)

+++

এই অংশে (পঞ্চম খণ্ড) খিলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাস লেখার সময় আমি অনেক নতুন উৎসও পেয়েছি যা চতুর্থ খণ্ডে উসমানীয় সালতানাতের অবস্থা (আরতুগ্রুল থেকে দ্বিতীয় বায়েজিদ পর্যন্ত) সংকলন করার সময় সহজলভ্য ছিল না। আমি এই বইগুলো সরবরাহকারী দয়ালু বন্ধুদের জন্য অন্তর থেকে দোয়া করছি। বিশেষ করে ভাই আসলাম আফতাব সিদ্দিকী (কানাডা)-র কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি তুরস্ক থেকে অত্যন্ত দরকারী বই কিনে আমার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। জাযাহ্‌মুল্লাহ্‌ খাইরাল আহসানাল জাযা।

উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাস সংকলন করার সময় একটি সমস্যা দেখা দিচ্ছিল যে, উৎসগুলোতে ঘটনার তারিখ কোথাও কেবল হিজরি আবার কোথাও কেবল সৌর তারিখ লেখা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে লেখক কিছু ক্যালেন্ডার সফটওয়্যার ব্যবহার করে হিজরি ও সৌর উভয় তারিখই বের করেছেন। তবে উদ্ধৃতি এবং গবেষণার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য উদ্ধৃত তারিখটিকে মূল বর্ণনা হিসেবে রাখা হয়েছে এবং গবেষণালব্ধ তারিখটিকে বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে আপনি কোথাও হিজরি তারিখের সাথে বন্ধনীতে সৌর তারিখ এবং কোথাও সৌর তারিখের সাথে বন্ধনীতে হিজরি তারিখ দেখতে পাবেন। এর কারণ হিজরি তারিখকে গৌণ মনে করা নয় বরং উল্লিখিত বাধ্যবাধকতা।

উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসের শেষ পাতাগুলোতে লেখক সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের অবস্থা কিছুটা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন, যার কারণ হলো তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর যুগের বিশেষ গুরুত্ব। লেখকের এই মুজাহিদ ব্যক্তির জীবনের ওপর স্থায়ীভাবে কাজ করারও ইচ্ছা আছে। আল্লাহর কাছে তাওফিকের দোয়া রইল।

+++

এই অংশের দ্বিতীয় অধ্যায় “ইসলামি আন্দালুস”-এর ইতিহাস সম্পর্কিত। এই অধ্যায়টি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি প্রাচীন আরবি বই সামনে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে আল্লামা ইবনুল আসীরের “আল-কামিল ফিত তারিখ”, হাফিজ ইবনে কাসীরের “আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া”, হাফিজ যাহাবীর “তারিখুল ইসলাম” ও “সিয়ারু আলামিন নুবালা”, আল্লামা যিরিকলীর “আল-আলাম” এবং ইবনে...

ইবনে খালদুনের বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এছাড়া বিশেষ করে আন্দালুস ও আফ্রিকার ইতিহাসের ওপর লেখা অনেক প্রাচীন কিতাব সামনে ছিল, যার মধ্যে ইবনে ইয়ারি আল-মাররাকুশির “আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল মাগরিব”, ইবনুল আব্বারের “আল-হুলা আস-সিয়ারা”, আল্লামা মাক্কারির “নাফহত তিব”, আন্দালুসি আলেমদের সংকলিত “আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব”, আল্লামা যাব্বির “বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালি আহলিল আন্দালুস”, আল্লামা মুহিউদ্দিন তামিমি মাররাকুশির “আল-মু’জাম ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব” এবং আরও অনেক কিতাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সৌভাগ্যবশত এই সময়ে লেখকের হাতে মিশরের প্রখ্যাত গবেষক শেখ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান মরহুমের কালজয়ী কিতাব “দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস” এসে যায়, যা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এই বান্দা এই কিতাবটি লিখে আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর এমন এক চমৎকার কাজ করেছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের সমস্ত কিতাবের সারসংক্ষেপ ও খুঁটিনাটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সর্বোত্তম বিন্যাসে একত্রিত করে দিয়েছেন। যদি আমার সামনে এই কিতাবটি না থাকত, তবে শুধু আন্দালুসের ওপর কাজ করতেই তিন-চার বছর ব্যয় হয়ে যেত এবং তবুও হয়তো বিজ্ঞ লেখকের মতো এমন গবেষণা করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ মরহুমকে তাঁর শান অনুযায়ী প্রতিদান দান করুন যে, তাঁর বছরের পর বছর পরিশ্রম আমাদের মতো ছাত্রদের অনেক বছর বাঁচিয়ে দিয়েছে। ফলে আমি আন্দালুসের পতন যুগের ইতিহাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর কিতাবের ওপরই নির্ভর করেছি। এছাড়া ডক্টর আবদুর রহমান আলীর অত্যন্ত উপকারী রচনা “আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা”-ও অনেক কাজে এসেছে।

+++

উসমানীয় সালতানাত এবং ইসলামি আন্দালুসের কাহিনী সেই শেষ অধ্যায় ও পাতাগুলোর শোকগাথা, যা থেকে আমরা আজ পর্যন্ত বের হতে পারিনি। এতে অনেক বেদনাদায়ক মোড় রয়েছে যেখানে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে আপনজনদের স্বার্থপরতা, অজ্ঞতা ও পাষণ্ড হৃদয়ের ওপর বিলাপ করতে ইচ্ছে করে। ঘটনা ও দুর্ঘটনার ওপর ব্যর্থতার এক দীর্ঘ সিলসিলা যা আজ পর্যন্ত জারি রয়েছে। এই পাতাগুলো পড়ার সময় পাঠক বারবার ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত হবেন, তবে আশ্চর্যের কিছু নেই যে খোদ লেখকের অবস্থাও ভিন্ন ছিল না। কলমের অশ্রু তো আপনি দেখতে পাবেন না, তবে কিছু জায়গায় যে বিষাদময় পঙ্কক্তিগুলো কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে, তা পাঠক ও লেখকের অনুভূতির অভিন্ন বহিঃপ্রকাশ।

+++

তৃতীয় অধ্যায়টি উপমহাদেশে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের হুকুমতগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এই ইতিহাস মূলত ছোট ছোট হুকুমতগুলোর, যা হয় কোনো বড় সালতানাতের অধীনে ছিল অথবা বড় সালতানাতগুলোর পতন যুগে তারা স্বাধীনতা লাভ করেছিল। মূল উৎসগুলোতে এগুলোর অবস্থা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তাই পাঠকরা হয়তো এই অধ্যায়ে বিশেষ কোনো আকর্ষণ ও আগ্রহ বোধ করবেন না, তবে পরবর্তী যুগগুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য এই তথ্যগুলো যাই হোক উপকারী। উপমহাদেশের মহান শাসক...

পরিবারগুলোর বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমার ষষ্ঠ খণ্ডে হবে, যার কাজ শুরু হতে যাচ্ছে।

+++

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমার পঞ্চম খণ্ডের এই কাজ ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল এবং এখন সেপ্টেম্বর ২০২২-এ এটি সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে এতে প্রায় সোয়া দুই বছর সময় লেগেছে। এই খণ্ডটি প্রস্তুত করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে যার একটি কারণ ছিল কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎসের দুস্প্রাপ্যতা। যতক্ষণ সেগুলো পাওয়া যায়নি, কাজ সামনে এগোতে পারেনি। বিদ্যুৎ সংকট এবং অতিরিক্ত লোডশেডিংও কয়েক মাস পর্যন্ত কাজের গতি ধীর করে রেখেছিল। এছাড়া তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমার প্রকাশিত চারটি খণ্ডের পরিমার্জন এবং সেগুলোকে আরও উন্নত করার কাজও পাশাপাশি চলমান রয়েছে, তাই আমার সময়ের একটি অংশ সেখানেও ব্যয় হয়েছে।

লেখক মাঝখানে অসুস্থও ছিলেন। ডান হাত নাড়ানো এবং দাঁড়ানো বা বসা খুব কঠিন হয়ে পড়েছিল। কয়েক সপ্তাহের চিকিৎসার পর আলহামদুলিল্লাহ সুস্থতা লাভ হয়েছে, তবে এর কিছু না কিছু প্রভাব এখনও রয়ে গেছে। যা-ই হোক, এসব কারণে কাজে বিলম্বও হয়েছে এবং বিন্যাস ও সম্পাদনায় এমন কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা সম্ভব হয়নি, যা পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোতে বজায় রাখা হয়েছিল।

+++

হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিদিন আমার কাছে অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রশ্ন সম্বলিত বার্তা আসতে থাকে, যার অধিকাংশের উত্তর আমি তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমার প্রকাশিত চারটি খণ্ডে (বিশেষ করে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে) দিয়ে দিয়েছি। তাই পাঠকদের প্রতি অনুরোধ যে, নতুন প্রশ্ন করার আগে তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমার সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলো অধ্যয়ন করে নিলে ভালো হবে। যদি কোনো প্রশ্ন জরুরি হয়, তবে লেখকের ই-মেইলে পাঠাবেন। গত দুই-তিন বছরে হোয়াটসঅ্যাপে আসা বিষয়গুলোর পরিমাণ এত বেশি হয়ে গেছে যে, সেগুলোর ওপর একবার চোখ বুলানোও বেশ সময়ের ব্যাপার এবং তার চেয়ে বড় কথা হলো, বিচিত্র বার্তার এই প্লাবন একাগ্রতায় অবশ্যই বিঘ্ন ঘটায়। কাজের গতি এবং মানের ওপরও এই বিষয়গুলো প্রভাব ফেলে।

যা-ই হোক, এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লেখক নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টার মাধ্যমে যা কিছু করতে পেরেছেন, তা আপনাদের সামনে রয়েছে। এই কাজের সমাপ্তি ও উৎকর্ষ এবং এই অধর্মের সুস্থতা ও নিরাপত্তার জন্য আপনাদের কাছে দোয়ার দরখাস্ত রইল।

মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান

(rehanbhai@gmail.com)

রাত ১১টা ২৫ মিনিট

শুক্রবার ১২ সফর ১৪৪৪ হিজরি (৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)

ইদারা উলুমুল কুরআন, তহশিল হাসান আবদাল, জেলা অ্যাটক

+++

প্রথম অধ্যায়

উসমানীয় খিলাফত

প্রথম সেলিম থেকে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত

৯২৩ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ

৪১৯ বছর

উসমানীয় খিলাফতের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

উসমানীয় তুর্কিদের স্বাধীন রাজত্বের সূচনা হয়েছিল উসমান খানের মাধ্যমে, যিনি ৬৯৮ হিজরিতে আনাতোলিয়ায় সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যদিও তিনি ৬৯৯ হিজরিতে বাদশাহ উপাধি লাভ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে ওরখান, প্রথম মুরাদ, প্রথম বায়েজিদ (ইলদিরিম) বাদশাহ হন। ইলদিরিম ৮০৫ হিজরিতে তৈমুরের কাছে পরাজিত হয়ে বন্দি হন। এগারো বছরের বিকেন্দ্রীকরণ ও গৃহযুদ্ধের পর ইলদিরিমের পুত্র মুহাম্মদ চেলবি ৮১৬ হিজরিতে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। এরপর দ্বিতীয় মুরাদ, দ্বিতীয় মুহাম্মদ আল-ফাতিহ এবং দ্বিতীয় বায়েজিদ একে একে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯১৮ হিজরিতে দ্বিতীয় বায়েজিদের মৃত্যু হয়। এভাবে ৬৯৯ হিজরি থেকে ৯২৩ হিজরি পর্যন্ত অর্থাৎ ২২৪ বছর উসমানীয়রা বাদশাহ হিসেবে শাসন করেন।

প্রথম সেলিম ৯১৮ হিজরিতে (১৫১৩ খ্রি.) বাদশাহ হন। তিনি ৯২৩ হিজরিতে (১৫১৭ খ্রি.) খিলাফতের পদও লাভ করেন। তখন থেকে এই খিলাফত ১৩৪২ হিজরি (১৯২৪ খ্রি.) পর্যন্ত কয়েক ছিল। এভাবে উসমানীয়দের খিলাফতের সময়কাল (হিজরি হিসেবে) ৪১৯ বছর দীর্ঘ ছিল। এই সময়কালকে আমরা চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি:

- ১. উত্থানকাল: প্রথম সেলিম থেকে দ্বিতীয় সেলিম পর্যন্ত: ৯২৩ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি (১৫১৭ খ্রি. থেকে ১৫৭৪ খ্রি.) ৫৯ বছর [১]
- ২. পতনকাল: তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমদ পর্যন্ত: ৯৮৩ হিজরি থেকে ১১৩২ হিজরি (১৫৭৫ খ্রি. থেকে ১৭৩০ খ্রি.) ১৪৯ বছর
- ৩. দুর্বলতা, আধুনিকায়ন ও সংগ্রামের কাল: মাহমুদ খান থেকে দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ পর্যন্ত: ১১৩৩ হিজরি থেকে ১৩২৮ হিজরি (১৭৩০ খ্রি. থেকে ১৯০৯ খ্রি.) ১৮৮ বছর
- ৪. প্রগতিশীলদের আধিপত্যের কাল: সুলতান রাশাদ থেকে দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত: ১৩২৮ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি (১৯০৯ খ্রি. থেকে ১৯২৪ খ্রি.) ১৪ বছর

(১) উত্থানকাল: প্রথম সেলিম থেকে দ্বিতীয় সেলিম পর্যন্ত: ৯২৩ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি (১৫১৭ খ্রি. থেকে ১৫৭৪ খ্রি.)

এই যুগে উসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামি খিলাফতের গৌরবও অর্জন করে। এর সীমানা একদিকে সিরিয়া, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অন্যদিকে ইরানের বিশাল অংশও এর অধীনে চলে আসে। এই যুগে সুলাইমান কানুনির মতো প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং তুর্কিদের অভিযান অস্ট্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। প্রথম সেলিম ও সুলাইমান কানুনির যুগে চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং খায়রুদ্দিন বারবারোসার মতো নাবিকরা ইউরোপে নৌ-বিজয়ের প্রভাব বিস্তার করেন। এই যুগে উন্মত-ই-মুসলিমার স্বার্থ রক্ষা, মিল্লাতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ ছিল উসমানীয় সুলতানদের মূল লক্ষ্য।

[১] মনে রাখতে হবে যে, প্রথম সেলিমের সিংহাসন আরোহণ ৯১৮ হিজরিতে (১৫১৩ খ্রি.) হয়েছিল। এরপর পাঁচ বছর পর্যন্ত তিনি বাদশাহ ছিলেন, খলিফা নন।

এদিকে ভারতে সেই দিনগুলোতে মুঘলদের এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল।

(২) পতন যুগ... তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমদ: ৯৮৩ হিজরি থেকে ১১৩৩ হিজরি (১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

দুপুরের পর যেমন সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করে, তেমনি দ্বিতীয় সেলিমের পর খুব শীঘ্রই মুসলমানদের পতনের সূচনা হয়। যদিও পতনের এই প্রবণতা ছিল ধীরগতির, উসমানীয় তুর্কিরা এই সময়েও বেশ কিছুদিন শান-শওকতের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং ইউরোপের শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখে। তবে দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বদের স্থলে একে একে দুর্বল চিত্তের শাসকরা আসতে শুরু করেন। রাষ্ট্রীয় কাজে রাজপরিবারের নারীদের হস্তক্ষেপ অনেক বেড়ে যায়। নতুন শাসক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে গৌণ মনে করা হতে থাকে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। শাসকরা বারবার পরিবর্তিত হতে থাকেন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর একটি রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে।

এই সময়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধরন দ্রুত বদলাতে শুরু করে। আগে উসমানীয় তুর্কিরা একটি প্রভাবশালী পক্ষ হিসেবে ছিল। এরপর তারা সমতার ভিত্তিতে আলোচনা করত, তবে এই আলোচনাগুলোতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের চতুরতা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার কারণে প্রভাবশালী থাকত, যেখানে মুসলিম শাসকরা অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে বিষয়ের সূক্ষ্ম দিকগুলো এবং ভবিষ্যতের ওপর সেগুলোর প্রভাব উপেক্ষা করতেন। এ ধরনের চুক্তিগুলো পরবর্তীতে তাদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতো, কিন্তু যেহেতু চুক্তি রক্ষা করা ছিল ইসলামি ঐতিহ্য, তাই তারা সেই ক্ষতি সহ্য করে যেতেন। অন্যদিকে ইউরোপীয়দের জন্য যদি কোনো চুক্তি ক্ষতিকর হতো, তবে তাদের বাধ্যবাধকতা দূর হওয়া মাত্রই তারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই তা থেকে সরে আসত। পতন যুগে উসমানীয়দের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং সামরিক শক্তি এতটাই কমে গিয়েছিল যে, ইউরোপীয়রা তাদের ওপর নিজেদের ইচ্ছেমতো শর্তে চুক্তি চাপিয়ে দিতে শুরু করে এবং তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধ্য হতে থাকে। তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধীরে ধীরে কেড়ে নেওয়া হতে থাকে।

যদিও সেই সময়ে একদিকে উসমানীয় তুর্কি এবং অন্যদিকে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্যের বাহ্যিক শান-শওকত দেখে কেউ বলতে পারত না যে মুসলমানদের দাসত্বের যুগ সন্নিকটে, তবে এটুকু নিশ্চিত ছিল যে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ধীর হয়ে গিয়েছিল, যেখানে ইউরোপ তাদের পেছনে থাকা সত্ত্বেও এই সময়ে জ্ঞান-সভ্যতা, শিল্প-কারখানা, অস্ত্র নির্মাণ, ভূগোল এবং বিজ্ঞানে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন তারা তাদের শত বছরের ঘুমের কাফফারা আদায় করতে চায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিস্থিতির আরও পরিবর্তন ঘটে। এখন মুসলমানরা স্থবির ও নিশ্চল ছিল এবং ইউরোপ রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, সামরিক শক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তিতে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

(৩) দুর্বলতা, আধুনিকতা ও সংগ্রাম... মাহমুদ খান থেকে দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ: ১১৩৩ হিজরি থেকে ১৩২৮ হিজরি (১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর (দ্বাদশ হিজরি শতাব্দী) শুরুতে উসমানীয় তুর্কি এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে সমপর্যায়ের মনে হতো, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ইউরোপ মুসলিম বিশ্ব থেকে শুধু যে অনেক এগিয়ে গিয়েছিল তাই নয় বরং...

বরং বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতিসমূহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট ছিল। যেন মুসলমানদের সেই পতন যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে অলক্ষ্যে শুরু হয়েছিল, তা এখন এক অত্যন্ত তিক্ত বাস্তবতা হয়ে সামনে এসেছিল এবং প্রতিকারের সময় হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এই যুগে উসমানীয় সুলতানদের বহিঃঅভিযান প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারা কেবল নিজেদের এলাকা রক্ষায় বাধ্য ছিল।

এই সময়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের অনেক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উসমানীয়দের বিরুদ্ধে পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। রাশিয়াও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। তবে এই যুগেই সময়ের ডাক শুনে কিছু উসমানীয় সুলতান পুনরায় উসমানীয় সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছিলেন, যাদের মধ্যে সুলতান আব্দুল আজিজ এবং সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে পরিস্থিতি এমন ছিল যে, আফগানিস্তান ও তুরস্ক ব্যতীত প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অধীনে ছিল। আফগানিস্তানের ওপর ব্রিটিশ বাহিনী একের পর এক হামলা চালাচ্ছিল, অন্যদিকে উসমানীয় খিলাফতের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তা ধ্বংস করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর জন্য উসমানীয় প্রদেশগুলোতে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ঘটানো হচ্ছিল এবং খোদ মুসলমানদের মধ্য থেকেই এমন লোক তৈরি করা হয়েছিল যারা উসমানীয়দের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের সহায়ক হয়ে উঠেছিল, যাদের মধ্যে মুহাম্মদ আলী পাশার নাম তালিকার শীর্ষে। তাছাড়া ইহুদি সংগঠনগুলো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় ছিল এবং ফ্রিম্যাসনদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তুর্কি যুবকদের সংগঠন জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি তুর্কি সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেছিল। দেশে ধর্ম এবং প্রাচ্যের মূল্যবোধ থেকে স্বাধীনতার প্রবণতা সাধারণ হয়ে গিয়েছিল।

এই দীর্ঘ সময়ে বিশ্বের সাংস্কৃতিক, তুর্কনিক, সামরিক এবং ভৌগোলিক দৃশ্যপটও দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছিল। যুদ্ধে তলোয়ার, বল্লম, তীর-ধনুক এবং মিনজানিকের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে আসছিল। কামান, বন্দুক এবং পিস্তলের প্রচলন বাড়তে থাকে। আগ্নেয়াস্ত্রকে আরও বেশি ধ্বংসাত্মক করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল, যাতে ইউরোপীয়রা মুসলমানদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। এর চেয়েও বেশি যোগাযোগ, পরিবহন এবং প্রকাশনা ও প্রচারের মাধ্যমে ইউরোপের অগ্রগতি বিশ্বের ওপর এক অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিল। যান্ত্রিক বিপ্লবের কারণে পশ্চিমা মাসের কাজ দিনে করতে শুরু করেছিল, যেখানে মুসলমানরা এই মাধ্যমগুলোর ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে ছিল। যে জিনিসটি পশ্চিমে পুরনো হয়ে যেত, তা মুসলমানদের কাছে আধুনিক হিসেবে গণ্য হতো।

এই দুই শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি যা সমস্ত ক্রটির কারণ হয়েছিল, তা হলো মুসলমানরা তাদের দীন এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল। আধুনিক উদ্ভাবনসমূহ, বিশেষ করে পরিবহন এবং তথ্যের আধুনিক মাধ্যমগুলো যখনই পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব কমিয়ে আনছিল, তখনই মুসলমানরা পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল। ইউরোপীয়রা অধ্যয়ন, গবেষণা, শিক্ষা ও পাঠদান, রচনা ও সংকলন, সাহিত্য এবং ললিতকলার সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শিক যুদ্ধ শুরু করেছিল যাতে মুসলমানরা পিছু হটতে থাকে এবং তারা কেবল বিজ্ঞান ও কলায় নয় বরং সমাজব্যবস্থা, আদর্শ এবং মূল্যবোধেও পশ্চিমের অনুসরণ শুরু করে দেয়। তুরস্ক এই পরিবেশের দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত দেশ ছিল যার জনসংখ্যায় খ্রিস্টান, ইহুদি এবং অন্যান্য জাতি...

প্রচুর পরিমাণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বড় শহরগুলোতে, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে, বিপুল সংখ্যক মানুষকে তাদের পোশাক-আশাক এবং চালচলনে ইউরোপীয় বলে মনে হতো। কেবল তুর্কি টুপিই তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। এই পরিস্থিতি বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়েও বেশি মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যে আধুনিকতাবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সেখানকার যুবকরা তাদের ধীন, শিক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ব্যাপারে তীব্র হীনম্মন্যতায় ভুগছিল এবং পশ্চিমা জীবনধারাকে মুক্তির উপায় মনে করতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই মানসিক দেউলিয়াত্বই তাদের ডুবিয়ে দিল।

৪. প্রগতিশীলদের আধিপত্য। সুলতান রাশাদ থেকে দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ পর্যন্ত: ১৩২৮ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি (১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র সামরিক কমান্ডারদের বিদ্রোহের কারণে ১৯০৯ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। এরপর দুইজন সুলতান: সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ এবং সুলতান ওয়াহিদ উদ্দিন মুহাম্মদ সীমিত ক্ষমতার সাথে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল জেনারেলদের হাতে। শেষ খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদের খিলাফত ছিল কেবল নামমাত্র।

দুর্গ নির্মাণ এবং অবরোধমূলক যুদ্ধের ধারা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উড়োজাহাজ আবিষ্কার, যুদ্ধে এর ব্যবহার এবং বিমান হামলার ভয়াবহ প্রচলন দুর্গ নির্মাণকে কার্যত অকেজো করে দেয়। ফলে সমস্ত পুরনো দুর্গ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে পরিণত হয়, বড়জোর সেগুলোকে সেনাবাহিনীর আবাসন হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে। সীমান্ত রক্ষার জন্য ভূগর্ভস্থ বাস্কার, গোলন্দাজ বাহিনী এবং কাঁটাতারের সাহায্য নেওয়া শুরু হয়।

এই সময়ে বলকান যুদ্ধ শুরু হয়, যাতে ইউরোপের অবশিষ্ট এলাকাগুলোও তুর্কিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং এতে পরাজয়ের পর উসমানীয় খিলাফত কার্যত স্থগিত হয়ে যায়। নতুন চুক্তিগুলোতে বিশ্বশক্তিগুলো তুর্কিদের অবশিষ্ট খিলাফতও বিলুপ্ত করতে বাধ্য করে। অবশেষে সামরিক প্রধান মোস্তফা কামাল পাশা খিলাফতের পদ বিলুপ্ত করে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্রে পরিণত করেন। এটি ছিল মুসলমানদের পতনের যুগের চরম সীমা। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো এই কয়েকটি লাইনেরই ব্যাখ্যা।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

উসমানীয় খিলাফত

প্রথম পর্যায়

উত্থানকাল

প্রথম সেলিম থেকে দ্বিতীয় সেলিম পর্যন্ত

৯১৮ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি

(১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৬২ বছর

সুলতান ইয়াওজ সেলিম আউয়াল বিন বায়েজিদ সানি

৯১৮ হিজরি থেকে ৯২৬ হিজরি

(১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ)

নবম হিজরি শতাব্দীর শেষে এবং দশম হিজরি শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে বায়েজিদ সানির শাসন ছিল। এরপর তার পুত্র সেলিম আউয়াল নিজের ভাইদের সাথে তীব্র সংঘাতের পর ৯১৮ হিজরিতে (১৫১২ খ্রিষ্টাব্দে) পিতার সম্মতিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তার ক্ষমতার শুরুতে মুসলিম বিশ্ব এক বৈপ্লবিক যুগে প্রবেশ করছিল। আন্দালুস থেকে ইসলামি শাসনের অবসান ঘটেছিল, পুরো উপদ্বীপে কটুরপন্থী খ্রিস্টানরা দখলদার ছিল, মুসলমানদের গণহত্যা এবং তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযান চলছিল। খ্রিস্টানদের তদন্ত আদালত মুসলমানদের বেছে বেছে নির্মূল করছিল। স্পেনের ইহুদি নাবিক কলম্বাস নতুন বিশ্ব আমেরিকা আবিষ্কার করেছিল। সেখানে ইউরোপীয় জাতিগুলোর উপনিবেশ স্থাপনের ধারা শুরু হয়েছিল এবং আমেরিকা থেকে অর্জিত সোনা দিয়ে ইউরোপের সম্পদে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটছিল। অন্যদিকে পর্তুগিজ অভিযান যা ভাস্কো দা গামা হিন্দুস্তানের উপকূলের পথ দেখে এসেছিল। এভাবে ইউরোপীয় দেশগুলোর লুটতরাজের ধারা অনেক বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। পোপের নির্দেশে স্পেন ও পর্তুগালের খ্রিস্টান সরকারগুলো মুসলমানদের ধমক দিতে শুরু করেছিল এবং তাদের নৌবহর আফ্রিকা ও হিন্দুস্তানের উপকূলে হানা দিচ্ছিল। মিশরের মামলুক শাসকরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং ভূমধ্যসাগরে পর্তুগালের নৌবহর তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

এর সাথে সাথেই পূর্বে শাহ ইসমাইল সফবি একটি কটুরপন্থী শিয়া রাষ্ট্র কায়েম করে ইসলামি বিশ্বে এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এবং ব্যাপক রক্তপাতের ধারা শুরু করেছিলেন। ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মিশরের ওবায়দি শাসনের অবসানের পর প্রায় তিন শতাব্দী এমন অতিবাহিত হয়েছিল যে দুনিয়াতে শিয়াদের কোনো সরকার ছিল না। কিন্তু ইসমাইল সফবি যে শিয়া সরকার কায়েম করেছিলেন তা কেবল গোঁড়ামিতেই নয় বরং সামরিক শক্তি এবং আয়তনের দিক থেকেও অতীতের শিয়া সরকারগুলোর চেয়ে এগিয়ে ছিল। [১]

সফবি কারা ছিল?

সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে হলাকু খান কর্তৃক আব্বাসীয় খিলাফতের পতনের পর ইরান, ইরাক এবং এর আশপাশের এলাকায়...

(১) তারিখু দাওলাতিল আলিয়া আল-উসমানিয়া আজ ফরিদ বেক মুহাম্মি: ১৮৭/১৮৮।

অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা দেড় শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। এরপর এই সাম্রাজ্য বিভিন্ন মুঘল সরদারদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। নবম হিজরি শতাব্দীতে তৈমুর লং এই সমস্ত অঞ্চল পদানত করেন কিন্তু তার উত্তরসূরিরা এখানে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে অনেক তুর্কমেন গোত্র সুযোগ বুঝে দজলা ও ফোরাত নদীর উপকূলীয় অঞ্চলে নিজেদের ছোট ছোট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এটিই ছিল সেই সময় যখন সফবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল সফবি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হন।

শাহ ইসমাইল সফবির বংশধারা নবম হিজরি শতাব্দীর শেখ সফিউদ্দিন নামক একজন সুফির সাথে গিয়ে মিলেছে, যিনি আজারবাইজানে সফবি তরীকার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তৈমুর লং-ও তার খানকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। শেখ সফিউদ্দিন ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে (৭৩৪ হিজরি) ইন্তেকাল করেন। এটি ছিল সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর যুগ যখন তৈমুর বংশীয়রা পতনের শিকার হয়েছিল এবং ইরান প্রায় দশটি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এগুলোর মধ্যে তুর্কমেনদের রাষ্ট্র “আক কুইউনলু” সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। তাবরিজ থেকে দিয়ার বকর পর্যন্ত এই তুর্কমেনদের রাজত্ব ছিল।

এই রাষ্ট্রের সুন্নি শাসক উজুন হাসান উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সময়ে ইসনা আশারিয়া প্রচারকরা পীর-ফকিরদের বেশে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কেবল ইরান ও খোরাসানেই নয়, বরং এশিয়া মাইনরের তুর্কমেনদের মাঝেও নিজেদের আকিদা প্রচার করছিল এবং কিছু সরলমনা আর কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই বলয়ে প্রবেশ করছিল। ফলে শেখ সফিউদ্দিনের উত্তরসূরিদের পঞ্চম স্তরে শেখ জুনাইদ নামক সুফিও ইসনা আশারিয়া মতবাদ গ্রহণ করে নেন। হাজার হাজার অস্ত্র তুর্কমেন তার চারপাশে সমবেত হয় এবং এই লোকেরা সফবি নামে পরিচিত হতে থাকে।

উজুন হাসান শেখ জুনাইদের জনপ্রিয়তা দেখে নিজের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিজের বোন খাদিজাকে তার সাথে বিবাহ দেন। উজুন হাসান এই আত্মীয়তা করার সময় মোটেও ভাবেননি যে, এই আত্মীয়তা ভবিষ্যতে ইসলামি বিশ্বের জন্য কতটা ক্ষতিকর প্রমাণিত হবে। শেখ জুনাইদ ছিলেন ইসনা আশারিয়া প্রচারক, অথচ তার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত সুন্নি হানাফি ছিলেন।

শেখ জুনাইদের মৃত্যুর পর তার ছেলে হায়দার খানকায় তার খলিফা হন। তিনি তার পিতার মতোই শিয়া ছিলেন। তার বিবাহ উজুন হাসানের মেয়ে অর্থাৎ তার মামাতো বোন হালিমার সাথে হয়।

হায়দারের পর তার ছেলে ইসমাইল সফবি খানকার গদিনশীন হন। তিনি ৮৯৩ হিজরিতে (১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সময় তার বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। তার মুরিদদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

এই সময়ে ৮৮২ হিজরিতে (১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ) তার নানা উজুন হাসান মারা যান এবং তার রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসমাইল সফবি ৯০৩ হিজরিতে (১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দ) তার রাজধানী তাবরিজ দখল করে নিজের শাসনের সূচনা করেন এবং “আক কুইউনলু” বংশের সুন্নি শাসনের অবসান ঘটান। পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি দক্ষিণে শিরাজ ও ইয়াজদ, পূর্বে আস্তারাবাদ এবং পশ্চিমে বাগদাদ ও মোসুল পর্যন্ত এলাকা জয় করে নেন। হেরাতের তৈমুরি শাসক হুসাইন বাইকরার মৃত্যুর পর সেখানে উজবেক সরদার শিবানি খান শাসক ছিলেন। শাহ ইসমাইল ৯০৬ হিজরিতে (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) মার্ত-এর কাছে শিবানি খানকে এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর পরাজিত করেন।

এবং খোরাসানও দখল করে নিল। এভাবে ইরান, ইরাক এবং খোরাসানের বিশাল এলাকা তার দখলে চলে এল।

ইসমাইল ছিল অত্যন্ত কট্টর শিয়া এবং আহলে সুন্নাতকে হত্যা করা ওয়াজিব মনে করত। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, এই হতভাগা নিজের মা হালিমাকেও শিয়া ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু যখন তিনি রাজি হননি, তখন তাকেও নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

ইসমাইল সফবি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল না। তবে তার সময়ের নামকরা কবিদের মধ্যে তার গণনা করা হয়। কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতার পোশাককে সফল রাজনীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তার মুরিদদের মধ্যে অনেকেই তাকে “খোদা” মনে করত। তার একটি ইশারায় হাজার হাজার মাথা কাটা পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকত।

ইসমাইল সফবি নিজে তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিল এবং তার মুরিদদের একটি বড় অংশও ছিল তুর্কি। এই সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে সে তার খলিফাদের এশিয়া মাইনরে পাঠিয়েছিল, যারা গ্রামীণ মানুষের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রচার করে তাদের ইসমাইল সফবির অনুগত বানাচ্ছিল। তুর্কিরা আকিদার দিক থেকে সুন্নি হানাফি হিসেবে পরিচিত হলেও তাদের একটি বড় অংশ ছিল মুর্খ এবং তারা যেকোনো মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ত। প্রতি বছর হাজার হাজার এমন মানুষ তুরস্ক থেকে ইরানে যেত এবং ইসমাইল সফবির কাছে বাইয়াত গ্রহণ করত। এভাবে সুন্নি হানাফি তুর্কি জাতি দুই ভাগে: সুন্নি ও শিয়াতে বিভক্ত হতে লাগল।

এগুলো ছিল সেই দিন যখন উসমানীয়দের বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু পূর্বে সফবি সাম্রাজ্যও একইভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল এবং এর সীমানা পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর এবং ফোরাত নদী থেকে আমু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। উসমানীয় ও সফবিদের সীমানা একে অপরের সাথে মিলে যাওয়ায় উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধও দেখা দেয়। সুন্নি-শিয়া উত্তেজনা ছাড়াও এই ধরনের রাজনৈতিক সমস্যাগুলো উভয় দেশের মধ্যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

শাহ ইসমাইল সফবি নিছক ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং মিশরের মামলুক সালতানাত উভয়কেই ধ্বংস করতে চেয়েছিল। মামলুক সালতানাত তখন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই আসল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য। এই দুইয়ের মধ্যে উত্তেজনাও চলছিল, যার সুযোগ নিতে শাহ ইসমাইল আগ্রাণ চেষ্টা করেছিল। সে মামলুক সুলতানদের সাথে যোগাযোগ করেছিল যে, যদি মিশর সাথে দেয় তবে উসমানীয়দের উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলা সম্ভব। কিন্তু মামলুক শাসকরা তার চালে পা দেয়নি, তারা জানত যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পর শাহ ইসমাইল মিশর দখল করতেও দ্বিধা করবে না।

শাহ ইসমাইল তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করতেও কোনো কুণ্ঠাবোধ করেনি। সে ইউরোপীয় শাসকদের কাছে দূত পাঠিয়ে তাদের এই বিশ্বাস জুগিয়েছিল যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করা তার প্রধান লক্ষ্য; যদি ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাকে সমর্থন করে তবে এই অভিন্ন শত্রুকে নির্মূল করা সম্ভব। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকেও কোনো ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে উসমানীয় সাম্রাজ্যের শান্তি চুক্তি চলছিল এবং তারা পুনরায় তাদের বাহিনী মাঠে নামানোর আগে দেখতে চেয়েছিল যে ইসমাইলের নিজের কতটুকু শক্তি আছে।

শাহ ইসমাইল বেশি অপেক্ষা করেনি। সেই সময়ে উসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদ এবং তার পুত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা চলছিল...

হয়ে গিয়েছিল এবং প্রতিটি পুত্র নিজ নিজ এলাকার স্বায়ত্তশাসিত শাসক হয়ে গিয়েছিল। শাহ ইসমাইল এই বিশৃঙ্খলার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন, তিনি শাহজাদা আহমদকে সমর্থন দিয়ে তাকে বায়াজিদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সাহায্য করেন। এই পরিস্থিতিতে শাহ ইসমাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকারী একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন শাহজাদা সেলিম, যিনি এশিয়া মাইনরের আমির ছিলেন।

৯১৩ হিজরি (১৫০৭ খ্রিষ্টাব্দ) সালে শাহ ইসমাইল এশিয়া মাইনরের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত উপজাতীয় রাষ্ট্র “ফিল কদর”-এর সর্দার “আলাউদ্দৌলা বেগ”-এর সাথে সামান্য মতপার্থক্যকে অজুহাত বানিয়ে সেখানে সৈন্য পরিচালনা করেন, আলাউদ্দৌলাকে হত্যা করে তার পূর্বপুরুষদের কবর পর্যন্ত পদদলিত করেন এবং মারআশ থেকে আলবিস্তান পর্যন্ত পুরো এলাকা ধ্বংস করে দেন।

শাহ ইসমাইলের চতুরতা এমন ছিল যে, সীমান্ত লঙ্ঘনের পর তিনি তুর্কি সরকারকে পত্র পাঠিয়ে এই কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং একে নিজের সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি অনিবার্য পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেন। কিন্তু নিহত আলাউদ্দৌলা ছিলেন সুলতান বায়াজিদ সানির স্বশুর এবং শাহজাদা সেলিমের নানা। তাই তুর্কিরা চুপ থাকতে পারত না। শাহজাদা সেলিম এক লক্ষের বেশি সৈন্য নিয়ে সীমান্তে পৌঁছে যান এবং শাহ ইসমাইলকে পালিয়ে যেতে হয়। শাহজাদা সেলিম একেই যথেষ্ট মনে করে জর্জিয়া বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। সম্ভবত ভাইদের সাথে বিরোধ এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সেই সময় সেলিমের কাছে সফবিদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের সুযোগ ছিল না। [১]

শাহ ইসমাইলের কেন্দ্র তাবরিজ দখল:

সেলিম আউয়ালের সিংহাসন আরোহণ ৮ সফর ৯১৮ হিজরি (২৫ এপ্রিল ১৫১২ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে কনস্টান্টিনোপলে সম্পন্ন হয়। এরপর তিনি নিজের পুত্র সুলাইমানকে সেখানে নায়েব নিযুক্ত করেন এবং নিজে ভাইদের সাথে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়েন যারা বিভিন্ন স্থানে স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করে রেখেছিল। এক বছর পর্যন্ত তিনি ভাইদের সাথে মোকাবিলা করতে থাকেন এবং অবশেষে সফর ৯১৯ হিজরি (এপ্রিল ১৫১৩ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে তিনি তাদের সকলকে দমন করে অবসর হন।

যখন তিনি এড্রিয়ানোপলে ফিরে আসেন, তখন ভেনিস, হাঙ্গেরি এবং মস্কোর দূতগণ তার অপেক্ষায় ছিলেন। সেলিম আউয়াল তাদের সবার সাথে শান্তি চুক্তি করেন যাতে শাহ ইসমাইল সফবির সাথে যুদ্ধের জন্য একাগ্র হতে পারেন। তার সামনে যে পরিস্থিতি ছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং ইসলামি বিশ্বে তাদের সমর্থকদেরও শান্তি দেওয়া তার জন্য আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। এই চিন্তার ফলস্বরূপ চালদিরানের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

চালদিরানের যুদ্ধের বর্ণনা শুরু করার আগে আমরা এর প্রধান কারণগুলোর ওপর এক নজর দেখে নিই:

- উসমানীয়দের মতো ইরানিদের সাম্রাজ্যও বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই সময়ের রাজনীতি অনুযায়ী এর অনিবার্য ফলাফল সংঘাত ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না।
- বায়াজিদ সানির আমল থেকেই উসমানীয় এবং সফবিদের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ চলে আসছিল, শাহ ইসমাইল কিছু তুর্কি সর্দারকেও পরাজিত করেছিলেন যারা আনাতোলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের শাসক ছিলেন।

(১) তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২০৬/১-২০৭।

- দীর্ঘকাল ধরে ইসমাইল সাফাভির প্রচারকরা পূর্ব আনাতোলিয়ায় শিয়া মতবাদ প্রচার করে আসছিলেন এবং তাদেরকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করছিলেন।
- প্রথম সেলিমের সিংহাসন আরোহণের এক বছর আগে, ইসমাইল সাফাভি তার বিশেষ বিশ্বস্ত শাহ কুলিকে আনাতোলিয়ায় পাঠান, যিনি স্থানীয় লোকদের মধ্যে কেবল শিয়া মতবাদ প্রচার ও বিদ্রোহে উস্কানিই দেননি, বরং দ্বিতীয় বায়েজিদের পুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই উসকে দিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- ইসমাইল সাফাভি সেলিমের তিন ভতিজাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সেলিমের ভাই শাহজাদা আহমদের ছেলে মুরাদ। ইসমাইল তাকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে প্রথম সেলিমকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিলেন যাতে নিজের হাতের পুতুলকে ইস্তাম্বুলের সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে নিজে শাসন করতে পারেন।
- ইসমাইল সাফাভি ছিলেন একজন উগ্র শিয়া, অন্যদিকে প্রথম সেলিম ছিলেন কটর সুন্নি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও সমর্থনের জন্য যুদ্ধকে অনিবার্য মনে করতেন।

চালদিরানের যুদ্ধ:

সেলিম আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে সাফাভিদের কেন্দ্র তাবরিজের দিকে রওনা হন। সীমান্তরক্ষী ইরানি বাহিনী পিছু হটতে থাকে যাতে কোনো উপযুক্ত স্থানে উসমানীয়দের সাথে শত্রুভাবে লড়াইতে পারে। ২ রজব ৯২০ হিজরি (২৩ আগস্ট ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ) তাবরিজের বাইরে চালদিরান উপত্যকায় উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। এই স্থানটি পশ্চিম আজারবাইজানের সীমান্তে অবস্থিত, যাকে ‘কারা আইন’ বা ‘সিয়াহ চশমা’ও বলা হয়। উভয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ করে। তুর্কিদের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী প্রথম সেলিম বাহিনীর কেন্দ্রে ছিলেন, অর্থাৎ ইয়েনি চেরি বাহিনীর দশ হাজার পদাতিক যুবক ছিল তার সবচেয়ে বিপজ্জনক অস্ত্র। তার প্রধানমন্ত্রী সিনান বেগ ডান পার্শ্বে মোতায়েন ছিলেন। বাম পার্শ্ব ছিল অন্যান্য বেগ (প্রধান সেনাপতি) হাসান পাশার অধীনে।

ইসমাইল সাফাভি বাহিনীর ডান পার্শ্বে ছিলেন। তার সাথে ছিল চরমপন্থী ও উৎসাহী শিয়া অশ্বারোহীদের এক বিশাল জনশ্রোত যারা তাদের শাহের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল। তারা বিশ্বের কোনো বাহিনীকেই তাদের সমকক্ষ মনে করত না। তুর্কিদের আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হয় যা এতটাই তীব্র ছিল যে সামনের সারিতে শিয়াদের পা টলতে শুরু করে। শাহ ইসমাইল এটি দেখে তার ডান ও বাম পার্শ্বকে অর্ধবৃত্তাকার রূপ দেন এবং অশ্বারোহীদের এগিয়ে দেন। তুমুল যুদ্ধ চলছিল এমন সময় সেলিম স্বয়ং সাফাভিদের ডান পার্শ্বে এক জোরালো আক্রমণ করেন যেখানে শাহ ইসমাইল উপস্থিত ছিলেন। এই আক্রমণে শাহ ইসমাইলের হাত ও পায়ে গুরুতর জখম হয়, তার মতো দেখতে এক তুর্কমেন রাজকীয় পোশাক পরে তার স্থলাভিষিক্ত হন, উসমানীয়রা তাকে শাহ মনে করে গ্রেপ্তার করে, অন্যদিকে শাহ ইসমাইল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পালিয়ে যান। উসমানীয় বাহিনী এক গৌরবময় বিজয় লাভ করে। প্রথম সেলিম ১৪ রজব ৯২০ হিজরি (৪ সেপ্টেম্বর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ) বিজয়ী বেশে তাবরিজে প্রবেশ করেন।

শাহ ইসমাইলের ধনভাণ্ডার ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করা হয়। উসমানীয়রা জর্জিয়ার আরাস নদী পর্যন্ত শাহ ইসমাইলের পশ্চাদ্ধাবনে লিপ্ত ছিল।

কিন্তু শীতের শুরু এবং তুষারপাত তাদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেয়। প্রথম সেলিম ইস্তাম্বুলে ফিরে যান এবং তাঁর বাহিনী আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে মারদিন, রাক্কা, মসুল, দিয়ার বকর এবং কুর্দিস্তানের বিশাল এলাকা জয় করে নেয়। এরপর ২০ বছর পর্যন্ত সাফাভিরা তুরস্কের সাথে শক্তি পরীক্ষার সাহস করতে পারেনি। তবে শাহ ইসমাইল প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। [১]

মিশরের মামলুকদের সাথে উত্তেজনা। সিরিয়া বিজয়:

মিশর, সিরিয়া এবং আরব উপদ্বীপের বড় একটি অংশে তিন শতাব্দী ধরে কায়রোর মামলুকরা শাসন করছিল। তারা পূর্বের তাতার এবং পশ্চিমের ক্রুসেডারদের ক্রমাগত পরাজিত করে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছিল। তৈমুর লং তাদের কাছ থেকে কেবল সিরিয়া ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই মামলুকরা তা পুনরুদ্ধার করে নেয়।

কিন্তু এটি ছিল তাদের পতনের যুগ। উসমানীয় এবং মামলুকদের সম্পর্ক শুরুতে ঠিক ছিল। উত্তেজনার শুরু তখন হয় যখন দ্বিতীয় বায়েজিদের আমলে শাহজাদা জমশিদ মিশরে পৌঁছান এবং মামলুকরা দ্বিতীয় বায়েজিদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে; বিষয়টি এতটাই গড়ায় যে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

প্রথম সেলিমের বিজয়সমূহ মামলুক সালতানাত এবং উসমানীয় সালতানাতের সীমানাকে সংযুক্ত করে দিয়েছিল, যার ফলে মামলুকদের আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ইরানি বাদশাহ ইসমাইল সাফাভি, যিনি উসমানীয়দের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ক্ষোভে জ্বলছিলেন, নিজের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গকে যুদ্ধের আগুনে পরিণত করে দেন। তিনি মিশরের সুলতান কানসুহ আল-গাউরিকে বিশ্বাস করান যে, সাফাভি এবং মামলুকরা ঐক্যবদ্ধ না হলে উসমানীয়রা উভয়কে পদদলিত করবে। কানসুহ দূরদর্শিতার অভাব প্রদর্শন করে শাহ ইসমাইলের সাথে জোটবদ্ধ হন। যদিও শাহ ইসমাইল উসমানীয়দের মনোযোগ নিজের দিক থেকে সরিয়ে নিতে এবং দুই মুসলিম দেশের মধ্যে যুদ্ধের তামাশা দেখতে চেয়েছিলেন।

ইসমাইল এবং মিশরের সুলতান কানসুহর মধ্যকার চুক্তির খবর প্রথম সেলিমের কাছে গোপন থাকেনি, মিশর ও তুরস্কের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কানসুহ আল-গাউরি সিরিয়ার উত্তরে একটি বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেন যাতে উসমানীয় বাহিনীর গতিবিধির খবর রাখা যায় এবং সুযোগ পেলে এশিয়া মাইনরের কোনো শহর দখল করে নেওয়া যায়।

এশিয়া মাইনরের সীমান্তে মোতায়েন তুর্কি জেনারেল সিনান পাশা প্রথম সেলিমকে এই বিপদের খবর দেন। প্রথম সেলিম ইস্তাম্বুলে সমস্ত মন্ত্রীদের সভা ডাকেন এবং পরামর্শ নেন। মীর মুন্সি মুহাম্মদ পাশা মত দেন যে, সুলতানের উচিত কেবল দেরি না করে সিরিয়া ও মিশর দখল করা নয়, বরং খাদেমুল হারামাইন আশ-শারিফাইন হওয়ার অধিকারও নিজে অর্জন করা। সভার অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, এই সময়ে প্রথম সেলিমই মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সঠিক হকদার, এবং এই অধিকার অর্জন করা উচিত।

[১] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, মুনজিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ: পৃষ্ঠা ২২৫ থেকে ২২৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ১৯১-১৯২; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ৫২১৭/১-২১৯

করার জন্য হিজাজ, শাম এবং মিসর থেকে মামলুকদের বিতাড়িত করে সেখানে দখল করা জরুরি। মজলিসে শূরা এই সিদ্ধান্তও দিল যে, প্রথমে কানসুহ আল-গাউরিকে বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব দেওয়া হবে, যুদ্ধ কেবল অস্বীকারের ক্ষেত্রে হবে। অবশেষে প্রথম সেলিমের দূত এই বার্তা নিয়ে মিসর গেল কিন্তু কানসুহ আল-গাউরি কেবল অস্বীকারই করল না বরং তুর্কি দূতকে কারারুদ্ধ করল। মোটকথা মামলুকদের শান্ত করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো এবং অবশেষে প্রথম সেলিম মামলুক সুলতানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য শামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কানসুহ ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে সেলিমের মোকাবিলার জন্য বের হলো এবং শামের উত্তর সীমান্তে পৌঁছাল। প্রথম সেলিম শামের সবচেয়ে বড় শহর আলেপ্পোতে ছিল। প্রথম সেলিমের বিশাল বাহিনী দেখে কানসুহ নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে সেলিমের দূতকে মুক্তি দিল এবং সন্ধির প্রস্তাব দিল কিন্তু সেলিম তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে মারজ দাবিকের ময়দানে যুদ্ধ হলো। মামলুকরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ল কিন্তু তাদের কিছু অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতা তাদের দুর্বল করে দিল এবং মাত্র আট ঘণ্টার লড়াইয়ের পর তারা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। কানসুহ আল-গাউরি পলায়নরত অবস্থায় নিহত হলো। তার বয়স ছিল ৭৬ বছর। এটি ২৫ রজব ৯২২ হিজরি (২৩ আগস্ট ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা। প্রথম সেলিম বিজয়ী হিসেবে আলেপ্পোতে প্রবেশ করলেন যেখানে শহরের অধিবাসীরা তার আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিল। [১]

পবিত্র হিজাজের অভিভাবকত্ব:

প্রথম সেলিম এই বিজয়ের পর শামের অন্যান্য শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। প্রতিটি স্থানে স্থানীয় প্রতিনিধিরা শহরের দরজা খুলে তুর্কিদের স্বাগত জানাল। এভাবে তুর্কিরা অত্যন্ত সহজে হামা, হোমস এবং দামেস্কসহ পুরো শামের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করল। প্রথম সেলিম স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন। শামের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ওলামাদের সম্মানের জন্য এবং মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাতা নির্ধারণ করলেন এবং দামেস্কের জামে উমাবীর সংস্কার ও সাজসজ্জার জন্য অর্থ বরাদ্দ করলেন। [২]

পবিত্র হিজাজের সুরক্ষা সেই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। পর্তুগাল, যারা স্পেনের পর ইউরোপের দ্বিতীয় শক্তিশালী শক্তি ছিল, পূর্ব সাগরগুলোতে ক্রমাগত নৌবহর পাঠাচ্ছিল। পর্তুগিজরা ইসলামের চরম শত্রু ছিল, তারা মক্কা ও মদিনা দখল করার (নাউযুবিল্লাহ) এবং নবী (সা.)-এর পবিত্র দেহ বের করে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছিল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরত না দেওয়ার কথা বলছিল যতক্ষণ না তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দাও। মামলুকদের এত শক্তি ছিল না যে তারা পর্তুগিজদের আক্রমণ প্রতিহত করে পবিত্র হিজাজকে সুরক্ষিত রাখতে পারে। পর্তুগিজদের এই কথা কেবল ফাঁকা হুমকি মনে করা যেত না কারণ তারা ইসলামি বিশ্বে নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী পেয়ে গিয়েছিল। ইরানের সফবীরা পর্তুগিজদের সাথে জোট করে নিয়েছিল। এই দুই শক্তি মিলে হিজাজের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারত। [৩]

[১] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, মুনজিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ, পৃষ্ঠা ২৩৯ থেকে ২৪৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২২৫ থেকে ২২৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২২৫, ২২৬।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/৯৮।

সুলতান সেলিম আউয়ালের মতে এই পরিস্থিতিতে সিরিয়ার সাথে সাথে হিজাজকেও নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া জরুরি ছিল যাতে পশ্চিমা শক্তিগুলোর অপবিত্র ষড়যন্ত্রের পথ বন্ধ করা যায়। সেলিম আউয়ালের এই সংকল্পের কথা জানতে পেরে মক্কার আমির শরীফ বারাকাত সানি নিজের ছেলেকে মক্কায়ে মুকাররমা, মদিনায়ে মুনাওয়ারা, বাইতুল্লাহ এবং রওজায়ে আতহারের চাবিগুলো সুলতান সেলিমের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পাঠান। সেলিম আউয়াল জুমার খুতবায় নিজের নামের সাথে “খাদেমুল হারামাইন আশ-শারিফাইন” [১] উপাধি যোগ করেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত হিজাজের প্রত্যেক শাসকের সাথে এই উপাধি চলে আসছে।

মামলুকদের পরাজয়ের কারণ:

মামলুকদের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল তারা আল্লাহর সাহায্য এবং জনগণের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল। মানুষের অধিকার হরণ করা হচ্ছিল এবং মজলুম মানুষ বদদোয়া দিচ্ছিল। আল্লামা আসায়ি রহ. এর বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে সে সময়ের মিশরের অবস্থার আন্দাজ করা যায়। আল্লামা লিখছেন:

“আউলিয়াদের মধ্যে একজন মুস্তাজাবুদ দাওয়াত বুজুর্গ এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আমি কানসুহ গুরির আমলে একজন চেরাগ বিক্রেতা সিপাহিকে দেখলাম যে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মালামাল নিল কিন্তু তাকে সেই দাম দিল না যাতে ফেরিওয়ালার রাজি ছিল। ফলে ফেরিওয়ালার তার পিছে পিছে চলতে লাগল এবং নিজের হক চাইতে লাগল। সিপাহি কোনো ভ্রক্ষেপ করল না। অবশেষে ফেরিওয়ালার বলল: আমার এবং তোমার মাঝে আল্লাহর শরীয়ত ফয়সালা করবে।”

এই কথা শুনে সিপাহি রেগে গেল এবং সে নিজের জুতো দিয়ে ফেরিওয়ালার মাথায় মারল এবং বলল: “এই হলো আল্লাহর শরীয়ত।” ফেরিওয়ালার মাথা ফেটে গেল এবং সে বেহঁশ হয়ে পড়ে গেল। সেখানে উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে কারো সাহস হলো না যে ওই সিপাহিকে বাধা দেয়। এই অবস্থা দেখে আমার খুব দুঃখ হলো এবং আমি হাত তুলে আল্লাহর দরবারে এই জালেম সিপাহি, তার বাদশাহ এবং তার সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলাম। আর তা ছিল কবুলিয়াতের সময়।

আমি সেই রাত পবিত্র অবস্থায় (ইবাদত করতে করতে) কাটালাম এবং ভাবছিলাম যে এই হুকুমত কীভাবে শেষ হতে পারে যখন এর সিপাহিরা জমিনকে জুলুম দিয়ে ভরে দিয়েছে? মুসলমানদের কীভাবে দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নসিব হতে পারে? এই ভাবতে ভাবতে চোখ লেগে গেল। স্বপ্নে দেখলাম যে আকাশ থেকে ফেরেশতারা নামছে যাদের হাতে ঝাড়ু রয়েছে। তারা ওই ঝাড়ু দিয়ে মিশর থেকে ময়লা পরিষ্কার করছে এবং সেগুলোকে নীল নদে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তারপর আমার চোখ খুলে গেল তখন কোনো ফারীর আওয়াজ আসছিল:

ফান্তাক্বামনা মিনহুম ফা-আগরাব্বনাহুম ফিল ইয়াম্মি বি-আল্লাহুম কাযযাবু বি-আয়াতিনা ওয়া কানু আনহা গাফিলিন।

“অতঃপর আমি তাদের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম, এই কারণে যে তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত এবং তারা এ থেকে একেবারেই উদাসীন ছিল।” [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া লি ইয়ালমাজ: ১/২৩৪-২৩৫

[২] সূরা আল-আরাফ: আয়াত ১৩৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আমি বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ শীঘ্রই এই (শাসকদের) কঠোর জবাবদিহিতা করবেন। এই ঘটনার অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছিল যখন কানসুহ আল-গাউরি তার সেনাবাহিনী, ধন-সম্পদ, কোষাগার, সৈন্য এবং সমর্থকদের নিয়ে মিশর থেকে বের হলেন যাতে সুলতান সুলাইমান খান (বর্ণনায় এই শব্দই আছে, যদিও সঠিক নাম সুলাইমান নয় বরং সেলিম) এর সাথে আলেপ্পোতে যুদ্ধ করতে পারেন। কয়েক দিন পর খবর এল যে মারজ দাবিক-এ কানসুহ পরাজিত হয়েছেন, তার অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়েছে এবং তিনি নিজে ঘোড়ার খুরের নিচে পিষ্ট হয়েছেন। [১]

ওয়ারদান যুদ্ধ এবং কায়রো দখল

কানসুহ আল-গাউরির মৃত্যুর সংবাদ মিশরে পৌঁছালে সেখানে তুমান বাইকে বাদশাহ নির্বাচিত করা হয়। সেলিম আউয়াল দূত পাঠিয়ে তাকে বাব-এ আলী (উসমানীয় সাম্রাজ্য)-এর বশ্যতা স্বীকার করার প্রস্তাব দেন কিন্তু তুমান বাই তা প্রত্যাখ্যান করে মোকাবিলার জন্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। সিরিয়ার সীমান্তে আবারও তুর্কি ও মামলুকদের মধ্যে যুদ্ধ হলো। তুর্কিরা এবারও বিজয়ী হলো এবং মামলুকরা পিছু হটে গেল, তুর্কি বাহিনী ধাওয়া করে কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

এখানে আবারও যুদ্ধ হলো যাকে ওয়ারদান যুদ্ধ বলা হয়। তুমান বাই দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করলেন। ২৯ জিলহজ ৯২২ হিজরি (২২ জানুয়ারি ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) তিনি তার বিশেষ সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে তুর্কিদের ব্যূহের কেন্দ্রে ঢুকে পড়লেন। এখানে সেলিম আউয়ালের উজির সিনান বেগ উপস্থিত ছিলেন। এই হামলায় তিনি নিহত হন। মামলুকরা মনে করেছিল যে তারা সেলিম আউয়ালকে হত্যা করেছে এবং এখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের ভুল ভেঙে গেল। আট দিন পর উসমানীয় বাহিনী মামলুকদের পিছু হটিয়ে কায়রোতে প্রবেশ করল। মামলুকরা শহরের গলি ও মহল্লাগুলোতেও মোকাবিলা করতে থাকল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লাশ পড়ার পর তাদের প্রতিরোধের শক্তি ভেঙে গেল। তুমান বাই পালিয়ে গেলেন কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়লেন। সেলিম তাকে নিজের সাথে একটি আলাদা সিংহাসনে বসালেন।

তুমান বাই আলোচনার সময় বললেন:

“তোমরা তোমাদের বীরত্বের কারণে নয়, বরং বন্দুক ও অস্ত্রের জোরে আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছ।”

সেলিম জবাবে সূরা আল-আনফালের আয়াত ‘وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ’ পাঠ করলেন যাতে মোকাবিলার জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং বললেন: “তুমি এত বড় একটি রাষ্ট্রের মালিক হয়েও অস্ত্র নির্মাণের দিকে কেন মনোযোগ দিলে না?”

সেলিম তুমান বাইকে তার সেনাপতি আলী পাশার হাতে সোপর্দ করলেন। মামলুকরা ৪৫ বছর আগে আলী পাশার পিতাকে গ্রেপ্তার করে কায়রোর বাব-এ জুয়াইলাতে হত্যা করেছিল। আলী পাশা তুমান বাইকে একইভাবে, সেই একই স্থানে ফাঁসি দিলেন। এটি ২১ রবিউল আউয়াল ৯২৩ হিজরি (১৩ এপ্রিল ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা। তিনি ছিলেন মামলুকদের শেষ শাসক, তার মৃত্যুর মাধ্যমে মিশরে মামলুক রাজত্বের অবসান ঘটে। সেলিম আউয়াল তার শেষকৃত্যের জন্য একটি বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং তিন দিন পর্যন্ত ঈসালে সওয়াবের জন্য দরিদ্রদের মাঝে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন। তিনি এক মাস পর্যন্ত কায়রোতে অবস্থান করেন, তিনি নাগরিকদের সাথে সদ্যবহার করে তাদের

[১] সিমতুন নুজুমিল আউয়ালি: ৪/ ৬৪ থেকে ৬৬

বাব আলী-কে অনুগত করার পূর্ণ চেষ্টা করেছেন। [১]

শাম ও মিসর বিজয়ের সুফল। নতুন ব্যবস্থাপনা:

উসমানীয় সাম্রাজ্য শাম ও মিসর বিজয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুফলগুলো লাভ করে:

১. হালব বিজয়ের পর শহরের জামে মসজিদের খতিব খুতবার সময় প্রথম সেলিমের নামের সাথে খাদিমুল হারামাইন আশ-শারিফাইন উপাধি যোগ করেন, যা পরবর্তীতে প্রত্যেক উসমানীয় শাসকের নামের অংশ হয়ে যায়। একে ভবিষ্যতের বিজয়ের সুসংবাদ হিসেবেও গণ্য করা হতো।

২. কোনো যুদ্ধ ছাড়াই পবিত্র হিজাজ উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩. দামেস্কের বিশাল ধনভাণ্ডার উসমানীয়দের হস্তগত হয়, যা পরবর্তী অভিযান ও বিজয়গুলোতে কাজে আসে।

৪. কায়রোর আব্বাসীয় খিলাফতের অবসান ঘটে এবং খিলাফতের পদ উসমানীয় তুর্কিদের কাছে স্থানান্তরিত হয়।

শাম ও মিসর বিজয়ের পর সেখানে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সেখানে উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি সুসংহত রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। এই উভয় প্রদেশকে ‘১২’টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলায় একজন করে শাসক নিযুক্ত করা হয়। এই জেলা শাসকদের কেন্দ্রকে দেওয়ান-ই-কাবীর বলা হতো। দেওয়ান-ই-কাবীরের প্রধানকে পুরো শাম ও মিসরের ওয়ালী ঘোষণা করা হয়। কায়রোতে একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়, যার ফলে মামলুকদের পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

যখন খিলাফত বনু আব্বাস থেকে আলে উসমানের কাছে স্থানান্তরিত হলো:

মিসরে আড়াই শতাব্দী ধরে বনু আব্বাসের খলিফাগণ মামলুক সুলতানদের তত্ত্বাবধানে খিলাফতের আসনে আসীন ছিলেন। কিছু আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ছাড়া মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রথম সেলিম ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, একজন ক্ষমতাহীন খলিফা উম্মাহর সামনে আসা পরীক্ষাগুলোতে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারেন না। খিলাফতকে শক্তিশালী করার একটি উপায় হতে পারত বর্তমান খলিফাদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা, যারা বংশগতভাবে কুরাইশ ছিলেন। কিন্তু তারা এত বড় দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কি না, তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

দ্বিতীয় উপায়টি ছিল এই যে, মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক, যিনি কার্যত রাজনীতি পরিচালনা করছেন, তিনি নিজেই খলিফা উপাধি গ্রহণ করবেন। এতে সমস্যা ছিল এই যে, উম্মাহর অধিকাংশ আলেম নববী হাদিস: ‘আল-আইম্মাতু মিন কুরাইশ’ (শাসকগণ কুরাইশ থেকে হতে হবে) [২]-এর কারণে খলিফা হওয়ার জন্য কুরাইশ হওয়ার শর্তকে আবশ্যিক মনে করতেন। প্রথম সেলিম কুরাইশ তো দূরের কথা, আরবও ছিলেন না। মুসলিম বিশ্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক থেকে ওই সময় পর্যন্ত ৭৩ জন খলিফা অতিক্রান্ত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে ৫৩ জন খলিফা...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ১৯৩ থেকে ১৯৫; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২২৯, ২৩০।

[২] মুসনাদে আহমাদ, হা: ১২৩০৭, মুহাক্কিক বলেছেন: হাদিসটি এর বিভিন্ন সূত্র ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সহীহ, এবং ইবনে আবি শায়বাহ ও অন্যান্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন।

বনু আব্বাসীয়রা বাগদাদ ও কায়রোতে সামগ্রিকভাবে প্রায় ৯০০ বছর অতিবাহিত করেছিল। তারা সবাই কুরাইশ ছিল। কিন্তু প্রথম সেলিম অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে তাদের কাছ থেকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঐ সকল উলামায়ে কেরামের মত থেকে ফায়দা নেওয়া হয়েছে যারা ঐ হাদীসকে ঐ সময়ের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন যখন মুসলমানদের শাসন জাজিরাতুল আরবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ইজতিহাদ অনুযায়ী প্রথম সেলিমের জন্য খলিফা উপাধি গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়।

প্রথম সেলিম শেষ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাওয়াঙ্কিল আলান্নাহ এবং মিশরের কাজীউল কুজাতকে নিজের সাথে ইস্তাম্বুলে নিয়ে যান। সেখানে জামে আবু আইয়ুব আনসারী-তে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় যাতে কায়রোর জামে আজহার এবং ইস্তাম্বুলের প্রথিতযশা উলামায়ে কেরাম শরিক হন। তাদের উপস্থিতিতে খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল রাসুলুল্লাহ-এর তাবাররুকাত, পতাকা, তলোয়ার এবং চাদর মুবারক, যা খেলাফতের প্রতীক ছিল, প্রথম সেলিমের হাতে তুলে দেন। ঐ সময় সেলিমের চোখ থেকে অশ্রু বারছিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এই তাবাররুকাত গ্রহণ করেন। এরপর থেকে উসমানীয় সুলতান আমিরুল মুমিনীন এবং খলিফা হিসেবে অভিহিত হতে থাকেন। [১]

দুরুজ সম্প্রদায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা:

ঐ সময়ে লেবাননের সীমান্তে দুরুজ নামক একটি সম্প্রদায় খুব দ্রুত বিস্তার লাভ করছিল। এই সম্প্রদায়ের বর্তমান নেতা “ফখরুদ্দীন আল-মানী আল-আউয়াল” একটি বিশাল ভূখণ্ডের ওপর দখলদার ছিল। প্রথম সেলিম ৯২২ হিজরি (১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সিরিয়া বিজয়ের সময় ফখরুদ্দীনের আনুগত্য গ্রহণ করাকে সেই সময়ের জন্য যথেষ্ট মনে করেছিলেন। প্রথম সেলিম মিশর এবং তারপর ইউরোপের অভিযানে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাকে আরও সময় দেওয়া হয়েছিল, অন্যথায় “দুরুজদের” নির্মূল করা ছাড়া উপায় ছিল না।

দুরুজ হলো ইসমাইলি শিয়াদের একটি শাখা যারা মিশরের ওবায়দী শিয়া শাসক আল-হাকিম বি-আমরিলাহকে খোদা মানত। হাকিম বি-আমরিলাহ পঞ্চম হিজরি শতাব্দীতে মিশরের অত্যন্ত অদূরদর্শী শাসক ছিল, যার বোকামিতে সাধারণ ও বিশিষ্ট সবাই অতিষ্ঠ ছিল। আল-হাকিমের মৃত্যুর পর নাশতাকিন আদ-দারাজি নামক এক দুর্ভাগা ব্যক্তি তাকে খোদা ঘোষণা করে এবং অনেক ইসমাইলি শিয়াকে নিজের সাথে ভিড়িয়ে নেয়। তার এটাও দাবি ছিল যে আমাদের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলো হামজা দায়ী যে মূলত মসীহ ছিল এবং তারই মধ্যে এই বাস্তবতা ছিল যে আল-হাকিমই খোদা।

আদ-দারাজি শিয়াবাদ, খ্রিষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মের কিছু কুফরি আকিদা মিশিয়ে একটি নতুন দ্বীন উদ্ভাবন করে, যা তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে “দুরুজ” নামে পরিচিত হয়। যদিও এর মধ্যে অনেক আকিদা ইসমাইলি শিয়া ধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছিল, তবে যেসব আকিদা একে একটি আলাদা ধর্মের রূপ দিয়েছে তা নিম্নরূপ:

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী, পৃষ্ঠা: ১৯৪-১৯৫; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা, ১/২২৩-২২৪। ইলমাজ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম সেলিম মিশর থেকে ফেরার পথে সিরিয়ার হালাবে অবস্থান করেছিলেন যেখানে ২৪ আগস্ট ১৫১৬ (১৮ রজব ৯২২ হিজরি শুক্রবার) জুমার নামাজে খতিব তাকে খলিফা হিসেবে সম্বোধন করেন। সুলতান এটি শুনে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর তিনি খতিবকে মূল্যবান উপহার প্রদান করেন এবং ঐ দিন থেকেই খেলাফতের পদ গ্রহণ করেন। তবে ইস্তাম্বুলে খেলাফতের হস্তান্তরের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়েছিল যাতে তাকে তাবাররুকাত প্রদান করা হয়।

- এই ফিরকার নিকট আল-হাকিম হলো খোদা, সে কেবল দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে এবং শীঘ্রই পুনরায় আবির্ভূত হবে।
- এর নিকট ইসলামসহ পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে।
- এই ফিরকা সকল আশ্বিয়ায়ে কেরামকে অস্বীকার করে এবং (নাউযুবিল্লাহ) তাঁদেরকে শয়তান বলে গণ্য করে।
- এটি কুরআন মাজীদকে অস্বীকার করে এবং একে হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর রচনা বলে দাবি করে।
- এটি জান্নাত, জাহান্নাম এবং আখেরাতের সওয়াব ও আযাবকে অস্বীকার করে।
- হিন্দুদের মতো এটিও এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, মৃত্যুর পর মানুষ বিভিন্ন রূপে বারবার জন্মগ্রহণ করতে থাকে।
- এই ফিরকা গর্বের সাথে নিজেদেরকে মিশরের ফেরাউন এবং হিন্দুস্তানের প্রাচীন দার্শনিকদের উত্তরসূরি বলে দাবি করে।
- এই ফিরকা সকল ধর্মের, বিশেষ করে মুসলমানদের ঘোর শত্রু এবং তাদের জান-মালের ওপর হস্তক্ষেপ করাকে বৈধ মনে করে।
- তাদের নিকট কিয়ামতের অর্থ হলো আল-হাকিম পুনরায় দুনিয়াতে আসবে, কাবা ধ্বংস করবে এবং সারা বিশ্বের মুসলমান ও নাসারাদের পরাজিত করার পর চিরকাল এই মহাবিশ্বের ওপর রাজত্ব করতে থাকবে।
- তাদের নিকট সত্য নবী ছিলেন কেবল পাঁচজন দ্রুজ দাঈ (হামজা, ইসমাইল, মুহাম্মদ কালমা, আবুল খায়ের এবং বাহা), যাদেরকে আল-হাকিম দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন।
- তারা রোজা বা বাইতুল্লাহর হজ মানে না। তাদের হজ লেবাননের “হাসবিয়া” নামক জনপদে অনুষ্ঠিত হয়।
- দ্রুজ ধর্মে প্রবেশের জন্য একটি বিশেষ চুক্তি করা হয় এবং প্রত্যেক সদস্যের লিখিত নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। [১]

প্রথম সেলিমের সাথে ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎ:

প্রথম সেলিম সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে অবস্থান করে রজব ৯২৪ হিজরি (জুন ১৫১৮ খ্রি.)-তে ইস্তাম্বুল পৌঁছান। কয়েকদিন পর তিনি আদ্রিয়ানোপলে স্পেনের রাষ্ট্রদূতদের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যারা এই আবেদন নিয়ে এসেছিল যে, তুর্কিরাও যেন মামলুক শাসকদের মতো তাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস ঘিয়ারতের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে এবং তাদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে; তারা মামলুকদের মতো তুর্কিদেরকেও এর বিনিময়ে বার্ষিক মোটা অংকের ট্যাক্স প্রদান করতে থাকবে। রাষ্ট্রদূতরা সুলতানকে এই নিশ্চয়তাও প্রদান করে যে, স্পেনের মুসলমানরা নিজেদের ইচ্ছায় নাসারা হয়েছে এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হচ্ছে না। সুলতান তাদের আবেদন মঞ্জুর করে নেন। [২]

পর্তুগিজদের শক্তি চূর্ণ করার প্রচেষ্টা:

সেই সময়ে পর্তুগিজরা হিন্দুস্তানের উপকূলে নিজেদের দুর্গ নির্মাণ করে ফেলেছিল। ৯১৭ হিজরি (১৫১১ খ্রি.)-তে গুজরাটের শাসক বিপদ অনুভব করে তাদের বিরুদ্ধে তুর্কি নৌবাহিনীর জেনারেল আয়াজ বেগের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন, যিনি গুজরাটের একদম দক্ষিণে অবস্থিত “দিউ” দ্বীপকে নিজের সামরিক কেন্দ্র বানিয়ে পর্তুগিজদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ফলাফল আসেনি। সেই সময় তুর্কি বাহিনী এটি দেখে...

[১] আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ লিল-আদইয়ান: ১/৪০০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: ১৯৬

এটি উপলব্ধি করা হয়েছিল যে, সীমিত শক্তির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের ওপর বিজয় লাভ করা কঠিন। [১]

প্রথম সেলিমের ইন্তেকাল

প্রথম সেলিম এই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে প্রথমে ভূমধ্যসাগরে পর্তুগিজদের শক্তি চূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই তিনি তাঁর শেষ দিনগুলোতে রোডস দ্বীপ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, যার জন্য ১৫০টি নতুন যুদ্ধজাহাজ তৈরির কাজ পুরোদমে চলছিল। এদিকে শাহ ইসমাইলের দূতগণ সন্ধির জন্য উপস্থিত হন, কিন্তু সেলিম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তিনি ইরানের বিরুদ্ধেও সামরিক অভিযানের সংকল্প করেছিলেন।

কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের সুযোগ আসেনি। ৯ শাওয়াল ৯২৬ হিজরি (২২ সেপ্টেম্বর ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান ইন্তেকাল করেন। তিনি ৮ বছর ৫ মাস শাসন করেন এবং ৫১ বছর বয়স পেয়েছিলেন। [২]

প্রথম সেলিমের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর যুগ

প্রথম সেলিম একজন পেশাদার সৈনিক এবং মেজাজের দিক থেকে কঠোর ছিলেন, তাই তাঁকে “ইয়াভুজ” (কঠোর) বলা হতো। তবে তিনি রুচিশীলতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন না, বরং কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিল। ফারসি কবিতায় তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ দিওয়ান ছিল। ইসলামি জ্ঞান ছাড়াও তিনি সমকালীন বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, বিশেষ করে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং বেশ কয়েকটি এশীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। [৩]

মিসর বিজয়ের পর তিনি সেখানকার নৌবহরকে অপরাজেয় করে তোলার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন যাতে ভূমধ্যসাগরে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ নৌবাহিনীকে নাস্তানাবুদ করা যায়। মিসরে নতুন যুদ্ধজাহাজ তৈরির একটি বিশাল কারখানা স্থাপন করা হয়, যার পেছনে সুলতান সেলিম এবং উজির ইব্রাহিম পাশা মুক্তহস্তে ব্যয় করেন।

মিসরীয় নৌবাহিনীকে লোহিত সাগরে সক্রিয় করে পবিত্র হিজাজের প্রতিরক্ষা মজবুত করার পরিকল্পনাও প্রথম সেলিমের মাথায় ছিল। এর জন্য তিনি ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে নৌ চলাচলের উপযোগী একটি বড় খালের মাধ্যমে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ আসেনি। [৪]

তিনি তাঁর উজির ও উপদেষ্টাদের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করতেন কিন্তু নিজের সংকল্প কারো কাছে প্রকাশ হতে দিতেন না। তিনি তাড়াহড়ো ও অস্থিরতা থেকে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, সাহসী ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন তাঁর পছন্দ ছিল না। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাঁর বাকি সময় অধ্যয়ন এবং জ্ঞানীদের সান্নিধ্যে কাটত।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ও তুনা: ১/৩২৩-৩২৪

[২] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, মুন্জিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ - ২৫০; আত-তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃ. ১৯৬-১৯৭; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ ও তুনা: ১/২৩৭

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃ. ১৯৬-১৯৭; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, ইলমাজ ও তুনা: ১/২৩৭

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ও তুনা: ১/২৪৫। ঊনবিংশ শতাব্দী ঈসায়ীর মাঝামাঝি সময়ে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সুয়েজ খাল নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই ৮ বছরে তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা কোনো অলৌকিক ঘটনার চেয়ে কম নয়। তাঁর সিংহাসন আরোহণের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল ২৩ লক্ষ ৩৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার। তাঁর মৃত্যুর সময় এই আয়তন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ লক্ষ ৫৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার হয়ে গিয়েছিল। ভূগোল ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। পুরো পৃথিবীর একটি মানচিত্র সফর ও অবস্থানে সবসময় তাঁর সাথে থাকত। পড়ার সময় তিনি চশমা ব্যবহার করতেন [১]।

তিনি ছিলেন প্রথম উসমানীয় শাসক যিনি ‘খাদেমুল হারামাইন আশ-শারিফাইন’ উপাধি লাভ করেন এবং তিনি এই উপাধির মর্যাদা রক্ষা করেন। তিনি হিজাজের শাসক যাকে “শরীফে মক্কা” বলা হতো, তাকে সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং তাঁর ভাতায় পাঁচশ দিনার বৃদ্ধি করেন। হারামাইনে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইবাদতকারীদের প্রত্যেকের জন্য একশ দিনার নির্ধারণ করেন; এই ভাতাগুলো মিসরের কোষাগার থেকে দেওয়া হতো। হারামাইনবাসীদের জন্য প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। মক্কা ও মদিনায় প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করান।

উলামায়ে কেরাম তাঁর চরিত্রের মাত্র দুটি দিক অপছন্দ করেছেন: একটি হলো তিনি কঠোর মেজাজের ছিলেন। দ্বিতীয়ত, উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি দাড়ি মুগুন করতেন এবং লম্বা ও ঘন গোঁফ রাখতেন।

যাই হোক, তিনি সঠিক আকিদাহ সম্পন্ন এবং সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। ইরানকে শিয়া মতবাদ থেকে মুক্ত করা ছিল তাঁর বড় আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে সেই অবকাশ দেয়নি [২]। তিনি উসমানীয় রাষ্ট্রকে তিন মহাদেশে বিস্তৃত একটি বিশ্বজনীন সরকারে পরিণত করেছিলেন।

আমীরুল বাহর আরুজের সংকল্পের কাহিনী

প্রথম সেলিমের যুগের ইতিহাস আমীরুল বাহর আরুজের বীরত্বগাথার উল্লেখ ছাড়া অপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহ: তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া এবং মরক্কো অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার শিকার ছিল। অধিকাংশ আমীর স্পেনীয় বা পর্তুগিজ শাসকদের কর দিয়ে নিজেদের গর্দান বাঁচিয়ে চলতেন। সেখানে ছোট ছোট সরকার ছিল যারা নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতাও রাখত না। মরক্কোর আমীররা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। সিউটা, টাঞ্জিয়ার এবং ওরানের মতো অনেক উপকূলীয় শহরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো পৌঁছে গিয়েছিল। পর্তুগাল ফাসের উপকূলে দুটি দুর্গও নির্মাণ করেছিল। আলজেরিয়ার পশ্চিমাঞ্চল এবং রাজধানী তিলিমসান এমন আমীরদের অধীনে ছিল যারা উপকূলীয় এলাকাগুলোকে ইউরোপীয় ভাগ্যসন্ধানীদের চারণভূমিতে পরিণত করেছিল। তিউনিসিয়ায় হাফসি বংশের শাসন ছিল, যাদের শাসনকাল দুই শতাব্দী পূর্ণ হতে চলেছিল। খ্রিস্টানদের শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র সিসিলি দ্বীপ এখান থেকে খুব কাছে ছিল, তাই তিউনিসিয়া সবসময় বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় থাকত।

[১] মুসলিম বিজ্ঞানীরা এই যুগের এক শতাব্দী আগেই চশমা আবিষ্কার করেছিলেন। তৈমুর লং-ও চশমা ব্যবহার করতেন। ইউরোপীয়রা এটি প্রথমবার তখন দেখেছিল যখন তাদের একটি প্রতিনিধি দল তৈমুর লং-এর দরবারে পৌঁছেছিল।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ১/২৩৮, ২৩৯।

থাকত। ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্র বিশ্বে রাজত্ব করার জন্য বিভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা করছিল যারা জাহাজ চালনায় পারদর্শী ছিল। কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা এবং ম্যাগেলানের মতো নাবিকরা এই ধরনের স্বাধীন গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন যারা বিভিন্ন সরকারের আর্থিক সহায়তায় সামুদ্রিক অভিযানে লিপ্ত থাকতেন। তাদের কাজ জলদস্যুতা থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। এরা ছিল যোদ্ধা লুটেরা এবং কুখ্যাত ডাকাত যাদের সাজা মওকুফ করে সামুদ্রিক অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। শুধু রাজাদের পক্ষ থেকেই নয়, বরং রোমের পোপের পক্ষ থেকেও এই জলদস্যুদের উপকূলীয় মুসলিম জনপদগুলো লুণ্ঠন ও ধ্বংস করার পূর্ণ অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই নাবিকরা আপাতদৃষ্টিতে ব্যবসায়ীদের ছদ্মবেশে অভিযানে বের হতো কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল নতুন শিকারের ক্ষেত্র খুঁজে বের করা।

পর্তুগালের ভাস্কো দা গামা আফ্রিকা ও ভারতের উপকূলে মুসলমানদের অনেক বসতি ধ্বংস করেন এবং শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করেন। কলম্বাস স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদকে আমেরিকার পথ দেখিয়েছিলেন যেখানে স্থানীয় বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানদের নতুনভাবে গণহত্যা করা হয়েছিল। একইভাবে ম্যাগেলান ফিলিপাইনকে স্পেনের উপনিবেশে পরিণত করেছিলেন।

৯১৩ হিজরি (১৫০৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে স্পেনের জেনারেল জন পেড্রো নাভারো পনেরটি যুদ্ধজাহাজে চৌদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে আসেন এবং তিউনিসের আমিরের কাছ থেকে বেজাইয়া বন্দরটি ছিনিয়ে নেন। মে ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে (মুহাররম ৯১৫ হিজরি) স্পেনের ৩৩টি জাহাজ কার্থেজে পৌঁছায়। স্প্যানিশরা পশ্চিম দ্বীপ ওয়ারানের বন্দর দখল করে নেয় এবং চার হাজার মুসলমানকে জবাই করার পর হাজার হাজার মানুষকে গোলাম বানিয়ে সাথে নিয়ে যায়। এভাবে তিউনিস পশ্চিম ও পূর্ব উভয় দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ডন পেড্রো আলজিয়াস বন্দর থেকে আধা কিলোমিটার দূরে একটি দ্বীপে নিজের দুর্গ নির্মাণ করেন যার ফলে আলজিয়াস বন্দরে যাওয়া প্রতিটি জাহাজ ইউরোপীয় কামানের আওতায় চলে আসে। স্প্যানিশ গোলন্দাজরা তাদের দূরপাল্লার অস্ত্র দিয়ে আলজিয়াসের মসজিদের মিনারগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু বানাত। এই অপবিত্র কাজটি সাধারণত আযানের সময় করা হতো। তিউনিস ও আলজিয়াসের কোনো বন্দরে স্পেনের অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ নোঙর করতে পারত না।

স্প্যানিশ জলদস্যুদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের মোকাবিলায় জাহাজ চালনায় পারদর্শী কিছু সাহসী মুসলমানও বাধ্য হয়ে প্রতিরোধে এগিয়ে আসেন। মিশর ও উসমানীয় সরকারগুলো নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য তাদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। এই বিভাগকে “হারফাতুল কারাসিনাহ” (حرفة القراصنة) নাম দেওয়া হয়েছিল, যার অর্থ সমুদ্রে খ্রিস্টান নাবিকদের নাভিশ্বাস তোলা।

সুলাইমান আলিশানের পিতা প্রথম সেলিমের আমলে তুর্কি নাবিক: খায়রুদ্দিন পাশা এবং তার ভাই আরুজ এই ধরনের অভিযানে বিস্ময়কর কৃতিত্বের কারণে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাদের পিতা নুরুল্লাহ আগা এবং দাদা আবদুল্লাহ আগা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন। ৮৬৬ হিজরি (১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ) সালে মিডলিনি দ্বীপ জয়ের পর তারা সেখানে বিশাল জায়গির লাভ করেন। নুরুল্লাহ আগা সেখানেই এক স্থানীয় রোমান নারীকে বিয়ে করেন, যার গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মায় যাদের মধ্যে ইলিয়াস, ইসহাক, আরুজ এবং খায়রুদ্দিন খিজির পাশা চিরস্থায়ী খ্যাতি লাভ করেন। লাল চুলের এই ভাইয়েরা ইতিহাসে “বারবারোসা ব্রাদার্স” নামে পরিচিত হন। (বারবারোসা রোমান ভাষার শব্দ যার অর্থ লাল দাড়িওয়ালা।)

এই ভাইয়েরা জাহাজের মাধ্যমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের পেশা গ্রহণ করেন এবং বছরের পর বছর এই কাজ করতে থাকেন। প্রায়ই তাদের...

তুরস্ক ও গ্রিসের মধ্যে যাতায়াত ও ব্যবসা চলত। পরে তারা মিশরেও যাতায়াত শুরু করেন। এক বাণিজ্যিক সফরের সময় রোডস দ্বীপের জলদস্যুদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে তার বড় ভাই ইলিয়াস শহীদ হন, জাহাজটি ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং ওরুজকে বন্দী করা হয়। খায়রুদ্দিন পাশা তার ভাইকে মুক্ত করার জন্য অনেক মুক্তিপণ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু জলদস্যুরা তা মানেনি।

সেই দিনগুলোতে ১০০ জন উসমানীয় তুর্কির বিনিময়ে ১০০ জন খ্রিস্টান বন্দীর বিনিময়ের একটি চুক্তি হয়েছিল। খ্রিস্টানরা ১০০ জন মুসলমানকে একটি জাহাজে করে তুরস্কে নিয়ে যাচ্ছিল। খ্রিস্টানরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ওরুজকে মুক্তি দেওয়া হবে না, কিন্তু তিনি বন্দীদের বহনকারী জাহাজে লুকিয়ে পড়েন। জাহাজটি যখন তুরস্কের উপকূলের কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং সাঁতরে তীরে পৌঁছান। এটি ৯১২ হিজরি (১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

ওরুজ তখন ৩৬ বছর বয়সী যুবক ছিলেন। তিনি নিজের চোখে খ্রিস্টান জলদস্যুদের লুটতরাজ ও তাদের জুলুম দেখেছিলেন। তাই তিনি তার বাকি জীবন মুসলমানদের সুরক্ষায় উৎসর্গ করার সংকল্প করেন। তিনি বোদরুমে তুর্কি কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করেন যারা ভূমধ্যসাগরে খ্রিস্টানদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের কারণে অত্যন্ত উদ্বেগে ছিলেন। ওরুজের অনুরোধে তারা তাকে দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রদান করেন যাতে তিনি খ্রিস্টান জলদস্যুদের প্রতিরোধ করতে পারেন। ওরুজ এই জাহাজগুলো নিয়ে দক্ষিণ ইতালির দিকে চলে যান এবং বছরের পর বছর ধরে সিসিলি, ইতালি ও স্পেনের যুদ্ধজাহাজগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে যান।

৯১৬ হিজরিতে (১৫১০ খ্রিস্টাব্দ) আলজেরিয়ার শাসক সালিম আল-তুমি স্পেনের রাজা ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর দরবারে আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাকে আলজেরিয়ার উপকূলে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। সেই দিনগুলোতে ওরুজের নৌবহর সিসিলির কাছে নোঙর করা ছিল। আলজেরিয়ার মুসলমানরা তাকে সাহায্যের জন্য ডাকেন। ওরুজ দ্রুত আলজেরিয়ার উপকূলে পৌঁছান। সালিম আল-তুমি তাকে স্বাগত জানান কিন্তু জুমার নামাজের সময় ওরুজকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সৌভাগ্যবশত সময়মতো ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। ওরুজ সালিমকে হত্যা করেন এবং আলজেরিয়ার উপকূল থেকে স্প্যানিশদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে দেন।

এই সময়ে স্পেনের মুসলমানরা ভয়াবহ জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন। খায়রুদ্দিন পাশা তাদের সাহায্যের জন্য তার নৌবহর উৎসর্গ করেন, যাতে ৩৬টি যুদ্ধজাহাজ ছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে স্পেনে সাতটি চক্রর দেন। স্প্যানিশ নৌবাহিনী তাকে থামানোর জন্য আগ্রাণ চেষ্টা করত কিন্তু পাশা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে স্পেনের উপকূলে পৌঁছে যেতেন। একবার স্প্যানিশ নৌবাহিনী তাকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু মুসলিম নাবিকরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করেন, তিনটি স্প্যানিশ জাহাজ ডুবিয়ে দেন এবং সাতটি দখল করে নেন। পাশা প্রতিটি চক্রের দশ হাজার মুসলমানকে আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে দিতেন। এভাবে এই অভিযানে সত্তর হাজার মুসলমানকে মৃত্যুর মুখ থেকে বের করে আনা হয়।

৯১৯ হিজরিতে (১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ) তুর্কিদের সাথে ওরুজের সম্পর্কের টানাপোড়েন সৃষ্টি হয় এবং তিনি তার চারটি ব্যক্তিগত যুদ্ধজাহাজ নিয়ে মিশরে চলে যান। মিশরের সুলতান কানসুহ আল-ঘুরি উপকূল রক্ষার জন্য তার সেবা গ্রহণ করেন। ওরুজ ত্রিপোলি (লিবিয়া) ও তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী “জেরবা” দ্বীপকে নিজের কেন্দ্র বানান। কিছুদিন পর তার ভাই খায়রুদ্দিনও তার সাথে যোগ দেন।

মানুষ এবং নিজস্ব যুদ্ধজাহাজসহ মিডলটি দ্বীপ থেকে সেখানে পৌঁছে গেলেন। এখন তাদের কাছে সামগ্রিকভাবে ১২টি যুদ্ধজাহাজ এবং এক হাজার মুজাহিদ ছিল। তারা দুজনে মিলে খ্রিস্টান নাবিকদের নাভিস্থাস তুলে দিলেন।

সুলতান কানসুহ আল-গাউরি আরুজের সাহসিকতা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে “বেটা” বলে সম্বোধন করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন: “আমার পুত্র আরুজ একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যার কল্যাণ ও গুণাবলী সারা বিশ্বে সুপরিচিত।”

আরুজ এবং খিজিরের কেন্দ্র ছিল তিউনিসিয়ার নিকটবর্তী জারবা দ্বীপ, তাই দুই ভাই তিউনিসের আমির আবু আবদুল্লাহ হাফসির সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। আমির তাদের উপসাগরের একটি দুর্গ প্রদান করেন। ৯২০ হিজরি (১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে তাদের সেই অভিযানগুলো শুরু হয় যা ইউরোপে তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। ইউরোপীয়দের ছোট থেকে ছোট নৌকা এবং বড় থেকে বড় জাহাজও এখন আর নিরাপদ ছিল না। রোমের পোপ ভূমধ্যসাগরে তার দুটি বিশেষ যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছিলেন যার উদাহরণ সারা বিশ্বে ছিল না। আরুজ এক আক্রমণেই উভয়টি দখল করে নেন।

এই সময়ে আরুজ নিরন্তর চিন্তা-ভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি আলজেরিয়ার সেই আমিরদের ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেন যারা গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং স্পেনের করদরাজ্য ছিল। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রথমে আলজেরিয়ার উপকূল থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বেজাইয়া দ্বীপটি স্প্যানিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, যাতে তারা তাদের করদরাজ্যগুলোকে সাহায্য করতে না পারে।

আরুজ একদিন হঠাৎ চারটি জাহাজ নিয়ে বেজাইয়া উপকূলে পৌঁছে গেলেন। স্পেনের ৯টি জাহাজ তার পথ রোধ করতে আসে, কিন্তু আরুজ তাদের একটি ধ্বংস করেন এবং দুটি দখল করে নেন, বাকি ছয়টি জাহাজ পালিয়ে যায়। আরুজ মুজাহিদদের নিয়ে বেজাইয়ার প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং কামান দিয়ে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করেন। শহরটি প্রায় বিজিত হতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ প্রাচীর থেকে আসা একটি গুলি আরুজের বাম হাতে বিদ্ধ হয়। এটি ৯২০ হিজরি (১৫১৪ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। জখমের তীব্রতার কারণে আরুজকে ফিরে যেতে হয় এবং এই অভিযানটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চিকিৎসার মাধ্যমে ক্ষত শুকিয়ে গেলেও হাতটি সারা জীবনের জন্য অবশ্য হয়ে যায়।

যা-ই হোক, নৌ অভিযানগুলো পুরোদমে চলতে থাকে এবং এই বীরেরা খ্রিস্টানদের মনে করিয়ে দিতে থাকেন যে, মুসলিম বিশ্বে এখনও আত্মরক্ষার শক্তি অবশিষ্ট আছে। ৯২১ হিজরি (১৫১৫ খ্রিস্টাব্দ) সালের মাত্র চারটি শীতকালীন মাসে খ্রিস্টানদের ২০টি জাহাজ ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং ৩৮০০ খ্রিস্টানকে বন্দি করা হয়। গ্রীষ্মকাল শুরু হলে আরুজের স্বাস্থ্যও পুনরুদ্ধার হয় এবং তিনি কেবল আক্রমণের নেতৃত্বই দিতে শুরু করেননি, বরং তার তৎপরতার পরিধি স্পেনের উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি মায়োর্কা দ্বীপে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন এবং স্পেনের হাজার হাজার নির্যাতিত মুসলমানকে, যাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হচ্ছিল, উত্তর আফ্রিকায় পৌঁছে দিতে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে হাজার হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশু নিরাপদে সুরক্ষিত স্থানে পৌঁছে যায়।

আরুজ এবং খায়রুদ্দিন তাদের অভিযানের পরিধি আরও বাড়াতে চেয়েছিলেন, তাই তারা ইস্তাম্বুলে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে সুলতান সেলিম আউয়ালের সাথে যোগাযোগ করেন। সুলতান তাদের উৎসাহিত করেন এবং এই দুই ভাইকে “লালা” (বাদশাহর পালিত) উপাধিতে ভূষিত করেন।

উপাধি দিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুটি জাহাজ ছাড়াও উভয়কে একটি করে রাজকীয় তলোয়ার পাঠানো হলো যা বিশেষ অনুগতদের দেওয়া হতো। এটি ৯২২ হিজরি (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। খলিফার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের পর আরুজ ও খায়রুদ্দিন আরও বেশি জনপ্রিয়তা পেলেন। তাঁদের খতিব ও দাঈগণ আফ্রিকার মসজিদগুলোতে গিয়ে গিয়ে জিহাদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। উসমানীয় সালতানাত থেকে তুর্কি ও আরবদের এক বিশাল সংখ্যা আরুজের পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করল। খলিফার পক্ষ থেকেও সাহায্য আসছিল। ৯২৩ হিজরি (১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে তাঁকে আরও চারটি জাহাজ দেওয়া হলো। এখন আরুজের নৌবহর ২৮টি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং তিনি যেকোনো দেশের নৌবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে পারতেন। তিনি সর্বপ্রথম উত্তর আফ্রিকায় একটি শক্তিশালী ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেন। ৯২৩ হিজরি (১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে ৮০০ নৌ-সৈনিক এবং পাঁচ হাজার আরব স্বেচ্ছাসেবকের সাথে আলজিয়ার্স বন্দরে অবতরণ করলেন এবং কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই আলজিয়ার্স তাঁর দখলে চলে এল এবং এই এলাকা উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হলো। আরুজকে স্থানীয়ভাবে “সুলতান” বলা হতে লাগল। তিনি স্থানীয় আমিরদের ঐক্যবদ্ধ করে সেখানে স্পেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা জাগ্রত করলেন।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস আরুজের শক্তি চূর্ণ করার জন্য ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর (৯২৩ হিজরি শাবান) মাসে চল্লিশটি যুদ্ধজাহাজ এবং পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে আলজিয়ার্স আক্রমণ করলেন এবং উপকূলে আরুজের নির্মিত একটি নতুন দুর্গ ঘেরাও করলেন। আরুজ জবাবে এত তীব্র আক্রমণ করলেন যে স্প্যানিশরা ৫০০ লাশ ফেলে পালিয়ে গেল।

ওরান দখলকারী স্প্যানিশরা তখন তিলিমসানের মুসলিম শাসক পঞ্চম মুহাম্মাদকে পুরোপুরি চাপে রেখেছিল। তিলিমসান তখন বিশ্বের বড় শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। এর জনসংখ্যা সোয়া লাখের বেশি ছিল। [১] পঞ্চম মুহাম্মাদের কাছে কোনো শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল না। নিজের গর্দান বাঁচাতে তিনি স্পেনের সাথে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে মৈত্রীর চুক্তিও করেছিলেন। প্রতি বছর তিনি স্পেনকে কর হিসেবে দশ হাজার লিরা স্বর্ণ, দশ হাজার ছাগল এবং দশ হাজার গরু-বলদসহ প্রচুর পরিমাণে শস্য পাঠাতেন। তিলিমসানে স্পেন থেকে বিতাড়িত হাজার হাজার মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না যে, তাঁদের শাসক সেই কাফেরদের সাথে মৈত্রী করবেন যারা স্পেন থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে দিচ্ছে।

সেখানকার ওলামায়ে কেরাম আরুজকে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। আরুজ সেনাবাহিনী নিয়ে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তিলিমসানে পৌঁছালেন। পঞ্চম মুহাম্মাদ মোকাবিলা করলেন কিন্তু পরাজিত হলেন। স্থানীয় জনগণ আরুজকে চমৎকারভাবে স্বাগত জানাল। তিলিমসানের পর আরুজ ফাসের দিকে অগ্রসর হলেন এবং এর পূর্বে অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহর “ওয়াজদা” দখল করে নিলেন। এভাবে তিনি طرابلس (লিবিয়া) থেকে আলজিয়ার্স পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের শাসক হয়ে গেলেন।

এত বড় এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য ইস্তাম্বুল থেকে নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আরুজ প্রত্যাশা অনুযায়ী জনবল ও অর্থনৈতিক সাহায্য পেলেন না। তাঁর সেনাবাহিনীর বড় অংশ এখন নৌ-অভিযানের চেয়ে বিজিত এলাকাগুলোর পাহারায় বেশি ব্যস্ত ছিল।

[১] সেই যুগে লন্ডনের জনসংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার এবং ইউরোপের বৃহত্তম শহর প্যারিসের জনসংখ্যা ছিল তিন লাখ ৮০ হাজার।

এতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে “ওরান”-এর স্প্যানিশ জেনারেল ডন মার্টিন দশ হাজার সৈন্য এবং দশ হাজার আরবের সাথে ওরান থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে সেই দুর্গটি ঘেরাও করে ফেলেন যেখানে উরুজের বড় ভাই ইসহাক অবরুদ্ধ ছিলেন। ইসহাক ২৫ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু উরুজ এবং খাইরুদ্দিন খিজির অন্যান্য রণাঙ্গনে ব্যস্ত থাকার কারণে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারেননি। দুর্গে খাদ্যের মজুদ খুব কম ছিল যা দ্রুত শেষ হয়ে যায় এবং অনাহার অবরুদ্ধদের কাহিল করে ফেলে, তাদের অধিকাংশ শহীদ হয়ে যান এবং ৩১ জানুয়ারি ১৫১৮ (৭ মহরম ৯২৪ হিজরি) ডন মার্টিন দুর্গটি দখল করে নেন। যখন তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন জখমে জর্জরিত ইসহাক তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারা সবাই লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

এর পরপরই ডন মার্টিন সাড়ে এগারো হাজার খ্রিস্টান এবং ৩৫ হাজার আরবকে নিয়ে তিলিমসানে পৌঁছান এবং উরুজের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। উরুজ ছয় মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ফাসের সুলতানের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করেছিলেন যা পূর্ণ হয়নি। আলজেরিয়ায় তার ভাই খাইরুদ্দিন খিজিরও সৈন্য স্বল্পতার কারণে সাহায্য পাঠাতে পারেননি।

উরুজের কাছে বাঁচার কেবল একটি পথই ছিল যাতে জীবন ও মৃত্যুর সম্ভাবনা সমান ছিল। তা হলো দুর্গ থেকে বের হয়ে খ্রিস্টানদের ঘেরাও ভেঙে আলজেরিয়ার দিকে রওনা হওয়া। তিনি একদিন স্প্যানিশদের ওপর জোরালো আক্রমণ চালান এবং তাদের ৭০০ জনকে হত্যা ও ১০০ জনকে বন্দী করেন। এই আক্রমণের মাধ্যমে তিনি ঘেরাও ভাঙার সম্ভাবনার আন্দাজ করে নেন।

এক-দুই দিন পর তিনি সুবহে কাজিবের সময় তার অবশিষ্ট চল্লিশজন সৈন্য নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করেন এবং খ্রিস্টান গ্রহরীদের ছত্রভঙ্গ করে ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যান। [১]

স্পেনের জেনারেল গার্সিয়া ডি টলগো তার পিছু ধাওয়া শুরু করেন, সালাডো নদী পর্যন্ত তিনি ছায়ার মতো উরুজের পেছনে লেগে ছিলেন। উরুজ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে নিরাপদে ওপাড়ে পৌঁছালে তার সাথে মাত্র বিশজন লোক ছিল। বাকি বিশজন সঙ্গী পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং নদীর তীরে পশ্চাদ্ধাবনকারী ৪৫ জন খ্রিস্টান সৈন্যের সাথে লড়াই করছিলেন।

উরুজ চাইলে প্রাণ বাঁচিয়ে সহজেই পালিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত সাথে থাকা বন্ধুদের ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করেননি এবং তাদের বাঁচাতে পুনরায় নদীতে ঝাঁপ দেন। কিন্তু তিনি যখন ঢেউ চিরে তীরে উপস্থিত হলেন, তখন খ্রিস্টানরা সেই ২০ জন মুজাহিদকে—যারা কয়েকদিন ধরে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত ছিলেন—খতম করে দিয়েছিল। উরুজকেও ওপাড়ে পৌঁছানো মাত্রই শহীদ করে দেওয়া হয়। তার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে স্পেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে জায়গায় জায়গায় তা প্রদর্শন করা হয়। এই সময়ে প্রথম সেলিম দুই হাজার সৈন্য, গোলাবারুদ ও কামানের বিশাল চালান ছাড়াও নৌযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য চার হাজার তরুণকে আলজেরিয়ার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু এই সাহায্য উরুজের শাহাদাতের পর আলজেরিয়ায় পৌঁছায়।

এই মুজাহিদ পুরুষের বয়স ছিল ৪৪ বছর, তিনি সারাজীবনে বিয়ে করেননি এবং পুরো জীবন জিহাদে কাটিয়ে দিয়েছেন।

জীবন দিয়ে এই পুরনো ধরনী পরিপূর্ণ... মৃত্যুতেও জীবনের স্পন্দন লুকিয়ে আছে।

তাঁর কোরবানি বৃথা যায়নি। তাঁর শাহাদাত উসমানীয় সাম্রাজ্যকে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে, যতক্ষণ উত্তর আফ্রিকাকে স্পেনের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা না হবে, ততক্ষণ দেশ ও জাতির নিরাপত্তার দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে থাকবে।

ডক্টর ইলমাজ উরুজের ব্যক্তিত্বের চিত্র তুলে ধরে লিখেছেন:

“তাঁর উচ্চতা কিছুটা দীর্ঘ ছিল। রোদে তাঁর গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গিয়েছিল। দাড়ি ছিল লাল। চোখগুলো ছিল কালো ও উজ্জ্বল, কাঁধ ছিল চওড়া এবং শরীর অত্যন্ত মজবুত ছিল। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। দয়ালু ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। নিজের কাজে অত্যন্ত গম্ভীর ও পরিশ্রমী ছিলেন। নৌবাহিনীতে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রিয় ছিলেন। সাহসী, বীর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান পরিচালনায় তাঁর কোনো সমকক্ষ ছিল না। অস্ত্র চালনা এবং নৌযুদ্ধের কৌশলে তিনি অনেক বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন।” [১]

আমিরুল্লাহ বাহর খায়রুদ্দিন পাশার বিজয়সমূহ

সুলতান সেলিম আউয়াল উরুজের শাহাদাতের বিস্তারিত বিবরণ শোনার পর আলজেরিয়াকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা দেন। সেই সাথে খায়রুদ্দিন পাশাকে বেইলার বে, নৌ (আমিরুল্লাহ বাহর, অ্যাডমিরাল) নিযুক্ত করে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে ভূমধ্যসাগর থেকে বিতাড়িত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

খায়রুদ্দিন পাশা তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে দেরি করেননি। তাঁকে স্প্যানিশ বাহিনীর কাছ থেকে উরুজের শাহাদাত এবং আন্দালুসীয় মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে হতো। তিনি ৯২৫ হিজরি (১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজের নৌবহর নিয়ে স্পেনের বন্দর ভ্যালেন্সিয়ায় পৌঁছে যান। তাঁর আকস্মিক হামলায় বন্দরে থাকা সমস্ত স্প্যানিশ জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

স্পেন এই অভিযানের জবাবে সিসিলির স্প্যানিশ শাসক মনকাডাকে আলজেরিয়া আক্রমণের নির্দেশ দেয়। তিনি ১৭০টি যুদ্ধজাহাজ এবং ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে আলজেরিয়ার উপকূলে অবতরণ করেন। রাজধানীতে খায়রুদ্দিন পাশা তিন হাজার তুর্কি এবং বিশ হাজার আরবের সাথে উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে তিলিমসান শহরে ৭০০ তুর্কি এবং দুই হাজার আরব তাঁর বড় ছেলে হাসান বেগের কমান্ডে ছিল। মনকাডা প্রথমে তিলিমসান দখলের চেষ্টা করেন এবং হাসান বেগকে বার্তা পাঠান যে তিনি রক্তপাত চান না, মুসলিম সৈন্যরা তাদের জীবন ও সরঞ্জাম নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তিলিমসান ছেড়ে চলে যেতে পারে।

হাসান বেগের পরিবর্তে এই বার্তার জবাব খায়রুদ্দিন পাশা দেন এবং তাও কামানের মুখ খুলে দিয়ে। এভাবে ২৩ আগস্ট ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ (১৫ শাবান ৯২৫ হিজরি) উপকূলে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণ এবং অগ্নি ও লোহার বৃষ্টির পর হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুদ্ধের ফয়সালা হলো না। এমন সময় পাশা পাঁচশ অভিজ্ঞ সৈন্যকে উপকূলে নোঙর করা স্পেনের সেই জাহাজগুলোতে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। নিজের বাহিনী নিজের জাহাজ...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১ / ২৫২

রক্ষা করার জন্য সেদিকে মনোনিবেশ করলেন, তখন পাশা তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তাদের পশ্চাৎভাগ থেকে এক চূড়ান্ত আক্রমণ করলেন। এই আক্রমণে অধিকাংশ স্প্যানিশ মারা গেল। অবশিষ্ট ক্লান্ত ও আতঙ্কিত সৈন্যেরা জাহাজে করে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পালিয়ে গেল।

এই বিজয়ের পর মুসলমানদের মনোবল অনেক বেড়ে গেল। খাইরুদ্দিন পাশা হাসান বেগকে পুনরায় স্পেনের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। তিনি নৌবহর নিয়ে ভ্যালেন্সিয়ায় পৌঁছালেন এবং সেখানে এমন হাজার হাজার খ্রিস্টানকে বন্দী করলেন যারা আলজেরিয়ার ওপর আক্রমণে শরিক ছিল। এই নৌবহর যুদ্ধবন্দী ও গনিমতের মাল ছাড়াও বিপুল সংখ্যক আন্দালুসিয়ান মুসলমানকেও মুক্ত করে নিয়ে এল।

৯৩৬ হিজরি (১৫৩০ খ্রিষ্টাব্দ) বসন্তকালে স্পেন তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আলজেরিয়ায় একটি নৌবহর পাঠাল যাতে ১৮টি জাহাজ ছিল। খাইরুদ্দিন পাশা তাদের মধ্যে ১৫টি দখল করে নিলেন এবং স্প্যানিশদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন।

এর পর ১১টি জাহাজ নিয়ে স্পেনের দ্বিতীয় একটি নৌবহর পৌঁছাল যা অ্যাডমিরাল ফার্নান্দোর কমান্ডে ছিল। খাইরুদ্দিন তাঁর সমস্ত জাহাজ একত্রিত করে এর মোকাবিলা করলেন এবং একে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। স্পেনের অধিকাংশ সৈন্য মারা গেল, ৩৬ জন অফিসার এবং ৩৬০০ সৈন্য বন্দী করা হলো। খোদ অ্যাডমিরাল ফার্নান্দোও বন্দী হলেন।

খাইরুদ্দিনের এই বিজয় অভিযানগুলো চলছিল এমন সময় সুলতান সেলিম আউয়াল ইন্তেকাল করলেন। [১]

সেলিম আউয়াল এবং ভাইদের হত্যা:

সেলিম আউয়ালের ওপর সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হলো তিনি তাঁর ভাই ও ভতিজাদের হত্যা করেছেন। বাস্তবিকভাবে এটি সঠিক, তবে এর প্রেক্ষাপট হলো যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর দুই ভাই আহমদ ও কোরকুদ প্রথমে আনুগত্য প্রকাশ করার পর পুনরায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। আহমদ, যিনি আনাতোলিয়ার আমাসিয়া জেলার গভর্নর ছিলেন, বুরসা দখল করে নেন এবং নিজের দুই ছেলেকে শাহ ইসমাইল সাফাভির কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। পরিশেষে ৯১৯ হিজরির সফর মাসে আহমদ পরাজিত হন, তাঁকে বন্দী করা হয় এবং তাঁর গলা টিপে হত্যা করা হয়। এই সময়ে মানিসা (সারুখান জেলা) এর গভর্নর কোরকুদও বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। সেলিম আউয়াল খবরটি নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। তিনি পালিয়ে যান কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েন এবং তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিদ্রোহ দমনের সময় সেলিম আউয়ালের তিন মৃত ভাই শাহেনশাহ, আলম শাহ এবং মাহমুদের পাঁচ ছেলে কোথাও আত্মগোপন করেছিল। পরে তারা ধরা পড়ে। সেলিম আউয়াল এই আশঙ্কায় যে তারা কোথাও বিদ্রোহে যোগ না দেয় বা পরে সমস্যা সৃষ্টি না করে, তাদেরও হত্যা করিয়ে দেন। তাদের নাম নিম্নরূপ: মুহাম্মদ বিন শাহেনশাহ, উসমান বিন আলম শাহ, মুসা বিন মাহমুদ, ওরখান বিন মাহমুদ এবং আমির বিন মাহমুদ। [২]

বিদ্রোহী শাহজাদাদের দমন করা একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, কিন্তু নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শাহজাদাদের হত্যা করার কোনো শরয়ি বা নৈতিক অবকাশ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের আইনবহির্ভূত পদক্ষেপগুলোই অধিকাংশ সালতানাতের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[১] তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ১/২৫৩ থেকে ২৫৬।

[২] জামিউদ দুওয়াল, মুনজিম বাশি, পৃষ্ঠা ৬১৮ থেকে ৬২১।

৬৭ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান সুলাইমান খান আউয়াল আল-কানুনী

বিন সুলতান সেলিম আউয়াল, সুলাইমান আলী শান নামে পরিচিত

৯২৬ হিজরি থেকে ৯৭৪ হিজরি

(১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৫৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)

সেলিম আউয়ালের উত্তরসূরি সুলাইমান খানের জন্ম ১লা শাবান ৯০০ হিজরি (২৭ এপ্রিল ১৪৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর ৯২৬ হিজরির শাওয়াল মাসে (২৯ সেপ্টেম্বর ১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি এই মহান খিলাফতের মসনদে বসেন যা তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৬ বছর। তিনি ৪৬ বছর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন করেন। তাঁর যুগ কেবল তাঁর পিতার বংশের নয় বরং ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সমস্ত প্রদেশের শাসকদের কাছে ফরমান পাঠিয়ে তাদের আদল (ন্যায়বিচার), ইনসাফ এবং শৃঙ্খলা ও নিয়মের সাথে কাজ করার নির্দেশ দেন।

এই ফরমানগুলো এই আয়াত দিয়ে শুরু হতো: “ইম্মাহ মিন সুলাইমানা ওয়া ইম্মাহ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।” [১]

বেলগ্রেড বিজয়:

সুলাইমান খানের প্রাথমিক যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল হাঙ্গেরির সাথে যুদ্ধ। হাঙ্গেরি তুরস্ককে খেরাজ (কর) দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সুলাইমান খান সিংহাসনে আরোহণের পর হাঙ্গেরির রাজা দ্বিতীয় লুইসের কাছে দূত পাঠিয়ে খেরাজ আদায় করার নির্দেশ দেন এবং অনাদায়ের ক্ষেত্রে যুদ্ধের হুমকি দেন। হাঙ্গেরির রাজা খেরাজ দিতে অস্বীকার করেন এবং সুলাইমান খানের দূতকে হত্যা করেন।

সুলাইমান খান ব্যাপক প্রস্তুতির সাথে একটি বিশাল সেনাবাহিনী সাথে নেন যাতে তিন হাজার উট এবং দশ হাজার গরুর গাড়িতে বারুদ ও গোলার বস্তা বোঝাই ছিল। পঞ্চাশটি যুদ্ধজাহাজ দানিউব নদীর পথে তাঁর পেছনে আসছিল। সুলাইমান বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করে হাঙ্গেরির সীমান্তে প্রবেশ করেন। তিনি প্রথমে বেলগ্রেডের উত্তরে অবস্থিত সাবোটিকা (Sabotica) শহরে আক্রমণ করেন এবং ২১শে শাবান ৯২৭ হিজরি (১৬ আগস্ট ১৫২১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে তা দখল করে নেন।

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ১৯৮, ১৯৯।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

এর পর দানিউব নদী পার হয়ে বেলগ্রেড আক্রমণ করা হয়, যা ছিল হাঙ্গেরীয়দের রাজধানী এবং সবচেয়ে শক্তিশালী ও অপরাজেয় শহর। এটি সেই শহর যেখান থেকে সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকেও পিছু হটতে হয়েছিল। সুলাইমান খান স্থল ও জল উভয় দিক থেকে একে ঘিরে ফেলেন এবং এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ২৫ রমজান ৯২৭ হিজরি (২৯ আগস্ট ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ) এটিও জয় করে নেন। শহর দখলের পর প্রতিপক্ষের কোনো সৈন্য বা নাগরিককে হত্যা করা হয়নি, বরং সবাইকে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। এরপর আশেপাশের সাবাজ, আসলানকা এবং জালমান দুর্গগুলোও জয় করা হয়।

বেলগ্রেড এখন তুর্কিদের প্রধান সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হলো। ইউরোপ বিজয়ের জন্য এখান থেকেই সেনাবাহিনী রওনা হতে শুরু করল। [১]

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট:

সুলাইমান খানের সিংহাসন আরোহণের সময় বিশ্বে দুটি বিশ্বশক্তি মুখোমুখি হয়েছিল: একটি উসমানীয় সাম্রাজ্য, অন্যটি স্পেন। স্পেনে এর আগে আরাগন, সিসিলি এবং নেপলসের শাসক ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং কাস্টিলের রানী ইসাবেলা মিলে দীর্ঘকাল শাসন করেছিলেন। তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন তাদের কন্যা ‘জোয়ানা’, যার বিয়ে হয়েছিল বারগাভির শাসক ফিলিপের সাথে। ইসাবেলা ও ফার্ডিনান্ডের মৃত্যুর পর তাদের উত্তরসূরি নির্বাচনের বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। যদিও কাস্টিলে নারীর শাসন আইনত বৈধ ছিল, কিন্তু আরাগনের ঐতিহ্যে এর কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে ঐক্যবদ্ধ স্পেনের রাজা কোনো পুরুষই হতে পারতেন। অবশেষে ৯২২ হিজরি (১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ) সালে জোয়ানার অল্পবয়সী পুত্র পঞ্চম চার্লসের সিংহাসন আরোহণের বিষয়ে সবাই একমত হন। তিনি তার নানা ও নানীর পক্ষ থেকে একই সাথে আরাগন, কাস্টিল, নেপলস এবং সিসিলির রাজত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। এটি ছিল এক বিশাল শক্তি, যা কেবল বাব-ই-আলি নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য চরম হুমকি ছিল। কিন্তু পঞ্চম চার্লসকে সিংহাসনে বসার পরপরই ফ্রান্সের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। অন্যদিকে ইতালির ক্যাথলিক চার্চ পাদ্রী মার্টিন লুথারের নতুন দল প্রোটেষ্ট্যান্টদের মুখোমুখি হয়। হাঙ্গেরির স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে নতুন রাজা দ্বিতীয় লুইসের অল্প বয়সের কারণে আমির-ওমরাহরা অনৈক্যের শিকার ছিলেন।

ইউরোপের এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংকটের সুযোগ নিয়ে সুলাইমান খান পশ্চিমে নতুন বিজয়ের দৃঢ় সংকল্প করেন।

রোডস বিজয়:

এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আড়াই হাজার বর্গকিলোমিটার জুড়ে ভূমধ্যসাগরের গ্রিক দ্বীপ রোডস ছিল খ্রিস্টানদের অত্যন্ত শক্তিশালী একটি সামরিক কেন্দ্র। হযরত আমির মুয়াবিয়া ^{রা}-এর যুগে এটি জয় করা হয়েছিল, কিন্তু ৬০ হিজরিতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেই এটি স্বেচ্ছায় খালি করে দেন। এরপর মুসলমানরা এই দ্বীপটি আর জয় করতে পারেননি।

সাড়ে আটশ বছর ধরে এই দ্বীপটি মুসলমানদের গলার কাঁটা হয়ে ছিল। এর প্রাচীর ও দুর্গগুলোকে বিশ্বের শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গণ্য করা হতো। এটি জয় করার কোনো প্রচেষ্টাই সফল হতে পারেনি। এখানে সেন্ট জন চার্চের নাইটদের শাসন ছিল। যখনই মুসলমানরা এটি আক্রমণ করত, ইউরোপীয় নাবিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসত। সুলতান

[১] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, মুনজিম বাশি: পৃষ্ঠা ২৫৬, ২৫৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/২৬২.

মুহাম্মদ ফাতেহ এর ওপর তিনবার সৈন্য পরিচালনা করেন। ৮৮৫ হিজরিতে (১৪৮০ খ্রি.) তাঁর একজন সেনাপতি এই দ্বীপটি জয় করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অব্যবস্থাপনার কারণে মুসলমানদের পিছু হটতে হয়। ইস্তাম্বুল থেকে মিশর পর্যন্ত সমুদ্রপথ নিরাপদ করার জন্য রোডস দখল করা জরুরি ছিল। সুলতান সেলিম আউয়াল এটি জয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু সুযোগ পাননি।

সুলাইমান খান তাঁর পিতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাঁর নৌবহর নিয়ে রোডসের দিকে যাত্রা করেন। দ্বীপটির ওপর আক্রমণ ১৫২২ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট (২৬ শাবান ৯২৮ হিজরি) শুরু হয়েছিল।

এর আগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা রোডসে পৌঁছে খ্রিস্টানদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। রোডসের যুদ্ধে এই গোয়েন্দারা এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেন। বলা হয় যে, রোডসের পতাকাবাহী “ডন আমরাল”ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের একজন গোয়েন্দা ছিলেন।

সুলাইমান খান রোডসের নিকটবর্তী বারোটি দ্বীপ একে একে জয় করেন, অবশেষে রোডসের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত বোদরাম দ্বীপকেও পদানত করে রোডসের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। শহরের প্রাচীরে তুমুল যুদ্ধ হয়, অবরুদ্ধদের মহিলারাও লড়াইয়ে অংশ নেয়। এই আক্রমণে ২০ হাজার মুসলমান শহীদ হন, তা সত্ত্বেও প্রাচীরের ওপর আক্রমণ অব্যাহত থাকে। শহরে উপস্থিত গোয়েন্দারা রাতের বেলা আলোর সংকেতের মাধ্যমে প্রাচীরের দুর্বল স্থানগুলো চিহ্নিত করে দেন। গোলাবর্ষণে প্রাচীর ধ্বংস হতে দেখে খ্রিস্টানরা ঘাবড়ে যায়। অবশেষে ফরাসি শাসক নিরাপদ প্রস্থানের শর্তে দ্বীপটি হস্তান্তর করেন।

১ জানুয়ারি ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে (১৩ সফর ৯২৯ হিজরি) খ্রিস্টানরা নৌকায় চড়ে মাল্টা দ্বীপের দিকে চলে যায় এবং তুর্কিরা দ্বীপটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এখানে বন্দি থাকা চৌদ্দ হাজার মুসলমান মুক্তি পান। [১]

স্পেনের ওপর চরম আঘাত, ফ্রান্সের সাথে জোট, হাঙ্গেরিতে সৈন্য পরিচালনা

স্পেনে বিজিত মুসলমানদের ওপর যে জুলুম-নির্যাতন হচ্ছিল, তা সুলাইমান খানের কাছে গোপন ছিল না, তাই তিনি স্পেনকে সম্ভাব্য সব উপায়ে ক্ষতি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। স্পেন তখন বিশ্বের একমাত্র সাম্রাজ্য ছিল যার নৌবহর উসমানীয়দের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত ছেয়ে গিয়েছিল এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আমেরিকায় অবস্থিত সোনা ও রূপার খনির কারণে স্পেন এতটাই বিভ্রাটের মধ্যে পড়েছিল যে, স্প্যানিশ খ্রিস্টানরা পুরো বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখছিল। তাদের সামনে রুখে দাঁড়ানোর মতো যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে তিনি ছিলেন কেবল সুলাইমান আলিশান, যিনি এই শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার সংকল্প করেছিলেন।

তিনি স্পেনের ওপর দ্বিমুখী আঘাত হানার পরিকল্পনা তৈরি করেন। সমুদ্রে তিনি এই অভিযানের দায়িত্ব খাইরুদ্দিন বারবারোসার ওপর অর্পণ করেন...

[১] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, মুনজিম বাশি: পৃষ্ঠা ২৫৮, ২৬০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়া, আল-মুহাম্মি: পৃষ্ঠা ২০৬ থেকে ২০৯। রোডসের ওপর তুর্কিদের শাসন সোঁনে তিন শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশর দখলের সময় ১২১৩ হিজরিতে (১৭৯৮ খ্রি.) এটি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন।

যখন মধ্য ইউরোপের স্থলভাগের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিজেই যুদ্ধের কমান্ড করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্যদিকে স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ঘনিষ্ঠ আসতে দেখে ইরানের সফবীয়দের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের নিজের মিত্র বানিয়ে নেন যাতে উসমানীয় সালতানাতের ওপর পূর্বদিক থেকেও আক্রমণ করা যায়। এর ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে বাব-ই-আলীকে ইরানিদের চক্রান্তের মোকাবিলাও করতে হয়।

তুরস্কের জন্য এই সময়ে স্পেনের ওপর সরাসরি আক্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল কারণ এটি ছিল স্পেনের চরম উন্নতির সময়; জার্মানি, হল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকা এবং দক্ষিণ ইতালি ছাড়াও জেনোয়া, ভেনিস এবং সিসিলি পর্যন্ত তার অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতো। এমন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে কার্যকর উপায় ছিল স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রিস্টান দেশগুলোকে ব্যবহার করে তাকে দুর্বল করা।

স্পেনের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস (১৪৯৪-১৫৪৭ খ্রি.) একুশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সিংহাসন আরোহণের এক বছর পর স্পেন থেকে মুসলমানদের শাসন নির্মূলকারী বিখ্যাত রাজা পঞ্চম ফার্ডিনান্ড মারা যান এবং তার স্থলে তার ১৬ বছর বয়সী নাতি পঞ্চম চার্লস (১৫০০-১৫৫৮ খ্রি.) শাসক হন।

প্রথম ফ্রান্সিস ইতালির বিখ্যাত শহর “মিলান” (যেখানে ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্টরা মুসোলিনিকে ফাঁসি দিয়েছিল)-এর ওপর অধিকারের দাবিদার ছিলেন। পঞ্চম চার্লস জার্মানি বিজয়ের পর মিলানের ওপর নিজের অধিকারের দাবি করেন। এর ফলে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চার্লস একের পর এক বিজয় লাভ করতে থাকেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ জয় করে ফ্রান্সকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হন। কেবল সমুদ্রের দিকটি ফ্রান্সের জন্য খোলা ছিল। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৩১ হিজরি) পাভিয়া নামক স্থানে এক যুদ্ধে চার্লস প্রথম ফ্রান্সিসকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বন্দি করেন।

তার মা সুলাইমান আল-শানের কাছে আবেদন পাঠান যেন তিনি তার ছেলেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তার এই পত্র ৬ ডিসেম্বর ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ (৮ সফর ৯৩২ হিজরি) তারিখে খিলাফত দরবারে পড়ে শোনানো হয়। এটি ছিল তুরস্ক ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পর্কের সূচনাবিন্দু।

পঞ্চম চার্লস কয়েক মাস পর প্রথম ফ্রান্সিসকে অত্যন্ত কঠোর শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করে মুক্তি দেন যার ফলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা খর্ব হয়। প্রথম ফ্রান্সিস প্যারিসে ফিরে এসে দেখেন যে আল-ই-উসমান-এর সাথে মৈত্রী ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। তার দূত বাব-ই-আলী পৌঁছান এবং অনুরোধ করেন যে খলিফা ফ্রান্সের মিত্র হয়ে স্পেনের সহযোগী হাঙ্গেরির ওপর আক্রমণ করুন যাতে ফ্রান্স স্পেনের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পায়। সুলাইমান আল-শান যেকোনো মূল্যে স্পেনের শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন, তাছাড়া হাঙ্গেরির ওপর আক্রমণের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল:

- প্রথম সেলিমের শেষ যুগে উসমানীয় সালতানাত ও হাঙ্গেরির মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং সীমান্তে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। তাই এর দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া জরুরি ছিল।
- উসমানীয় সালতানাতের সীমান্ত সুরক্ষিত করাও সুলাইমানের নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। হাঙ্গেরির স্বাধীনচেতা শাসকরা সীমান্তের জন্য সর্বদা হুমকির কারণ ছিল। এসব কারণে সুলাইমান প্রথম ফ্রান্সিসের প্রস্তাবের ইতিবাচক উত্তর দেন। এভাবে ফ্রান্স ও উসমানীয় সালতানাত মিত্র হয়ে ওঠে।

ঐক্যের এজেন্ডায় এটি স্থির করা হয়েছিল যে উভয় পক্ষ মিলে কাজ করবে এবং এর অধীনে থাকা দেশগুলোকে জয় করবে। সুলাইমান আল-শান ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৩২ হিজরি) বেলগ্রেডে নোঙর ফেলেন এবং ৩০০টি কামান ও ৮০০টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে এক লক্ষ সৈন্যের সাথে সাভ নদী পার হয়ে হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করেন। সেই যুগে হাঙ্গেরি আজকের মতো ছোট দেশ ছিল না, বরং বাভারিয়া থেকে আড্রিয়াটিক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ার পুরো এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১]

মোহাকসের যুদ্ধ:

২৮ আগস্ট ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ (৭ জিলকদ ৯৩২ হিজরি) মোহাকস (Mohacs) উপত্যকায় হাঙ্গেরি ও তুরস্কের বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়। এই স্থানটি বেলগ্রেড থেকে ১৮৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বুদাপেস্ট থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ইস্তান্বুল থেকে এখানে পৌঁছানোর জন্য উসমানীয় বাহিনীকে ১৫০০ কিলোমিটার পথ ১২৮ দিনে পাড়ি দিতে হয়েছিল। হাঙ্গেরির বাহিনী দুই লক্ষ সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তাদের সাহায্যের জন্য জার্মানির ৩৮ হাজার সৈন্যও পৌঁছেছিল। রাজা লুই দ্বিতীয় নিজে তার বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

উসমানীয় বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল গাজী বালি বেগ এবং গাজী খসরু বেগের হাতে, তারা দুজনেই সুলাইমানের ফুফাতো ভাই ছিলেন। সুলাইমান আল-শান ফজরের নামাজের পর বাহিনীর সারিতে দাঁড়িয়ে এমন এক আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন যে বাহিনীর মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কিছু বাক্য এমন ছিল যে শাহাদাতের পাগল সৈন্যরা তাদের চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি।

উসমানীয়রা প্রথমে আক্রমণ করেনি এবং নিজ নিজ অবস্থানে অটল ছিল। সকাল থেকে দুপুর হয়ে গেল, এমনকি হাঙ্গেরীয় বাহিনীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং রাজা লুই আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করলেন। সুলাইমান আল-শান যুদ্ধের নকশা আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীকে টিলার পেছনে লুকিয়ে রেখে হাঙ্গেরীয় বাহিনীর মুখোমুখি হন কিন্তু শীঘ্রই বাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দেন, যা দেখে হাঙ্গেরীয়রা পূর্ণ উদ্দীপনায় তুর্কিদের পিছু ধাওয়া করতে শুরু করে।

হাঙ্গেরির ৩৫ জন নাইট এই শপথ নিয়েছিল যে তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত থামাবে না যতক্ষণ না তারা সুলাইমানকে হত্যা করে ফিরে আসে। তাদের মধ্যে থেকে তিনজন যোদ্ধা তুর্কিদের ব্যুহ ভেদ করে সুলাইমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একজন সুলাইমানকে লক্ষ্য করে বর্শা চালায়, লক্ষ্য সঠিক ছিল কিন্তু তা সুলাইমানের বর্মের গায়ে লেগে আলাদা হয়ে যায়। এখন এই তিন যোদ্ধা তলোয়ার নিয়ে সুলাইমানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সুলাইমানও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তলোয়ার চালিয়ে তাদের মোকাবিলা করে তিনজনকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে বাধ্য করেন।

উসমানীয় বাহিনী পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী পিছু হটে থাকে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর পেছনে চলে যায় আর হাঙ্গেরীয় বাহিনী সামনে এগিয়ে আসতে আসতে পুরোপুরি কামানের আওতায় চলে আসে। সুলাইমানের ইশারায় গোলাবর্ষণ শুরু হয়। একসাথে তিনশ কামানের গোলায় আঘাতে হাঙ্গেরীয় বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তুর্কিরা তাদের ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে এবং হাজার হাজার মানুষকে কচুকাটা করে।

বৃষ্টির কারণে এই উপত্যকার গর্তগুলো পুকুরে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য খ্রিস্টান পালানোর সময় সেগুলোতে ডুবে মারা যায়।

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২১১ ও ২০৯; তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২৭০/১।

মারা গেলেন। ২৩ হাজার লোক হারানোর পর হাঙ্গেরীয়দের প্রতিরোধের জোর ভেঙে গেল। হাঙ্গেরির রাজাও এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই একটি পুকুরে ডুবে মারা যান। তার লাশ পাওয়া যায়নি। আটজন বড় পাদ্রী এবং অনেক নামকরা নাইটস ও নবাবও নিহত হন।

পুরো লড়াই দেড় থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। আহত হওয়া মুসলমান ছিল হাজার হাজার, কিন্তু শহীদ হয়েছিল মাত্র ১৫০ জন।

১০ সেপ্টেম্বর ১৫২৬ (৩০ জিলকদ ৯৩২ হিজরি) তারিখে সুলেমান তাদের নতুন রাজধানী বুদাপেস্ট খুব সহজেই দখল করে নেন এবং ট্রান্সিলভানিয়ার শাসক জন জাপোলিয়াকে সেখানে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ছয় মাস পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত রাখার পর সুলেমান আলিশান নভেম্বর ১৫২৬ (মহররম ৯৩৩ হিজরি) এ ইস্তাম্বুলে ফিরে পৌঁছান। [১]

বিদ্রোহ। হাঙ্গেরির ওপর পুনরায় সৈন্য অভিযান:

এই বিজয়ের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ১৫২৭-এর শেষ দিকে (৯৩৪ হিজরির শুরুতে) স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের ভাই আর্চডিউক ফার্ডিনান্ড, যিনি জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার শাসক ছিলেন, এই বলে হাঙ্গেরির ওপর নিজের অধিকার দাবি করতে শুরু করেন যে তিনি হাঙ্গেরির নিহত রাজা লুইসের আত্মীয়। ফার্ডিনান্ড এই দাবির সাথে আক্রমণ করে জন জাপোলিয়াকে বিতাড়িত করেন।

জন জাপোলিয়া সুলেমান আলিশানকে অবহিত করেন, যার নির্দেশে উজির-এ-আজম ইব্রাহিম পাশা ফেব্রুয়ারি ১৫২৮ (জমাদিউল আউয়াল ৯৩৪ হিজরি) এ সৈন্য নিয়ে হাঙ্গেরির উদ্দেশ্যে রওনা হন। এরপর সুলেমান নিজে দুই লাখ সৈন্য এবং তিনশ কামানের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বের হন এবং পথের শহরগুলো জয় করতে করতে ৩ সেপ্টেম্বর ১৫২৯ (২৯ জিলহজ ৯৩৫ হিজরি) এ বুদাপেস্টে পৌঁছে যান।

সুলেমান আলিশানের সাথে এত বিশাল বাহিনী দেখে আর্চডিউক ফার্ডিনান্ড আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং পালিয়ে নিজের দেশ অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নেন। ৮ সেপ্টেম্বর ১৫২৯ (৪ জিলহজ ৯৩৫ হিজরি) এ শহরটি বিজিত হয়। [২]

অস্ট্রিয়ার ওপর আক্রমণ। ভিয়েনা অবরোধ:

হাঙ্গেরি বিজয়ের পর তুর্কিদের সীমানা অস্ট্রিয়ার (যাকে আরবিতে “আল-নিমসা” বলা হয়) সাথে গিয়ে মিলেছিল। অস্ট্রিয়ার রাজা ফার্ডিনান্ডকে শান্তি দেওয়া জরুরি ছিল, যিনি নিজের রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থান করছিলেন। তাই তুর্কিরা হাঙ্গেরি থেকে ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। পথে প্রবল বৃষ্টি ও কাদার কারণে সমস্ত কামান এবং বারুদের ভাণ্ডার সাথে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়ে অনেক ভারী অস্ত্রশস্ত্র হাঙ্গেরিতেই রেখে দেওয়া হয়।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৫২৯ (২১ মহররম ৯৩৬ হিজরি) তারিখে উসমানীয় বাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা অবরোধ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। কামানের গোলার আঘাতে শহরের প্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এরপর উসমানীয় বাহিনী টানা তিন দিন ধরে শহরের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু স্থানীয় বাহিনী কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে যাতে হাজার হাজার তুর্কি...

[১] জামিউদ দুওয়াল তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, মুনাজ্জিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ: পৃষ্ঠা ৬৬৩, ৬৬৪; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২০৯ থেকে ২১৪ টাকা সহ; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওরতানা: ১/ ২৭০ থেকে ২৭৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২১৫, ২১৬।

শহীদ হলেন। ১৪ অক্টোবর ১৫২৯ (২৭ মহররম ৯৩৬ হিজরি) তারিখে শেষ আক্রমণটি হয়েছিল, যার ব্যর্থতার পর সুলাইমান ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ভিয়েনার এই অবরোধ ব্যর্থ হওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল:

- ইউরোপীয়রা ভিয়েনাকে তাদের শেষ দুর্গ মনে করে এর সুরক্ষার জন্য অসাধারণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। তুর্কিদের এত শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ছিল না।
- বৃষ্টি এবং কাদার কারণে অধিকাংশ ভারী কামান হাঙ্গেরিতে ফেলে আসা হয়েছিল। রণক্ষেত্রে উপস্থিত কামানগুলো দুর্গ ভাঙার জন্য যথেষ্ট ছিল না।
- তুর্কি বাহিনী ইস্তাম্বুল থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত একটি অত্যন্ত দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল। কেন্দ্র এবং যুদ্ধক্ষেত্রের এই অস্বাভাবিক দূরত্ব লড়াইকে অত্যন্ত কঠিন করে তুলেছিল।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ভিয়েনার সেনাবাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছিল, কিন্তু তারা দীর্ঘ সময় শহরটিকে রক্ষা করতে পারত না। স্পষ্টতই, এত বড় এবং সুসংহত একটি শহর জয়ের জন্য ১৯ দিন কোনো গুরুত্ব রাখে না; বেলগ্রেড ৩ সপ্তাহ এবং রোডস ১৪৪ দিনের অবরোধের পর জয় হয়েছিল। যদি অবরোধ অব্যাহত থাকত তবে ভিয়েনা জয় অসম্ভব ছিল না, কিন্তু শীতকাল ঘনিয়ে আসছিল এবং অবরোধ দীর্ঘ হলে তুষারপাত তুর্কিদের ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারত।

কিছু ঐতিহাসিকের মতে, সুলাইমান আলিশান শত্রুকে তাড়া করে তাকে আতঙ্কিত করার জন্য ভিয়েনায় পৌঁছেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য অবরোধের মাধ্যমেই অর্জিত হয়েছিল। যদি তিনি যেকোনো মূল্যে শহরটি জয় করার পরিকল্পনা করতেন, তবে ভারী কামান ছাড়া যাত্রা করতেন না, বরং বর্ষা ও শীত শেষ হওয়া পর্যন্ত অভিযান স্থগিত রাখতেন।

যা-ই হোক, ইউরোপীয় ইতিহাসে ভিয়েনার এই ব্যর্থ অবরোধের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এটি ছিল ইসলামি বাহিনীর অগ্রাভিযানের শেষ সীমা। মুসলমানরা কখনো এই সীমার চেয়ে সামনে এগোতে পারেনি।

ফেরার পথে তুর্কি বাহিনী বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং চেকোস্লোভাকিয়ার বহু শহর ও দুর্গ জয় করে, যার মধ্যে অস্ট্রিয়ার গ্রাজ (Graz), চেকোস্লোভাকিয়ার মারিবোর (Maribor), বাভারিয়া রাজ্যের রাজধানী রেগেন্সবুর্গ (Regensburg) এবং মোরাভিয়া রাজ্যের রাজধানী ব্রুন (Brunn) উল্লেখযোগ্য। এভাবে এই পুরো অঞ্চলটি উসমানীয় বাহিনীর বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই অভিযানগুলোতে বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল; সামগ্রিকভাবে এই পুরো যুদ্ধপরম্পরায় ১৪ হাজার মুসলমান শহীদ হন। [১]

অস্ট্রিয়ার ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ, জার্মানি যুদ্ধ ১৫৩৪ (৯৩৮ হিজরি):

ভিয়েনা অবরোধে ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপে স্পেনের আধিপত্যে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এটি প্রমাণিত হয়ে যায় যে পঞ্চম চার্লস ইউরোপ রক্ষার যোগ্য নন এবং ইউরোপীয়দের স্পেন থেকে আলাদা হয়ে উসমানীয়দের সাথে বিষয়াদি মীমাংসা করতে হবে। এই কারণেই আর্চডিউক ফার্ডিনান্ডের দূত ১৫৩০ সালের জানুয়ারিতে (জমাদিউল আউয়াল ৯৩৬ হিজরি) ইস্তাম্বুলে পৌঁছান এবং

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ২১৬, ২১৭। তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৭৩, ২৭৪।

অনুরোধ করা হয়েছিল যে খলিফা ফার্ডিনান্ডকে নিজের প্রতিনিধি বানিয়ে জান জাপোলির পরিবর্তে তাকে হাঙ্গেরির অভিভাবকত্ব প্রদান করবেন এবং তিনি যে শর্ত চাইবেন তা মেনে নেবেন, কিন্তু এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সুলাইমান আলী শান জান জাপোলিকেই হাঙ্গেরির শাসক হিসেবে বহাল রাখেন।

১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৭ হিজরি) ফার্ডিনান্ড পুনরায় হাঙ্গেরিতে সৈন্য পাঠান এবং বুদাপেস্ট অবরোধ করেন, যা সেখানকার রক্ষীবাহিনী ব্যর্থ করে দেয়। সুলাইমান আলী শান এই সংবাদ শুনে রমজান ৯৩৮ হিজরিতে (এপ্রিল ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ) আরও একবার ইস্তাম্বুল থেকে অস্ট্রিয়ার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সাথে দুই লক্ষ সৈন্য ছিল। ফার্ডিনান্ড সন্ধির প্রস্তাব দেন কিন্তু সুলতান তা প্রত্যাখ্যান করেন। সার্বিয়ার নিশ (Nis) শহরে ফার্ডিনান্ডের দূতগণ আরও একবার সন্ধির বার্তা নিয়ে অপেক্ষমাণ ছিলেন। সুলতান সেখানেও তাদের তাড়িয়ে দেন। বেলগ্রেডে ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের দূতদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাদের অনেক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং ফ্রান্সের রাজার সাথে মৈত্রীর চুক্তি নবায়ন করে সেই দিকে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখেন যেখানে হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির সীমান্ত মিলিত হয়েছে, যাতে জার্মানির কিছু সীমান্ত দুর্গেও আক্রমণ করা যায়।

এই অভিযানে জার্মানির ১৫টি সীমান্ত দুর্গ জয় করা হয়। ফার্ডিনান্ড বা স্পেনের রাজা চার্লস কোথাও খোলা ময়দানে মুসলমানদের মোকাবিলা করার সাহস করেননি। অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সিকলোস (Siklos) এবং কানিজে (Kanije)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলো জয় করার পর সুলাইমান আলী শান ভিয়েনা থেকে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে “কোশ” (Koszeg) নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ঘেরাও করেন। এই শহরের রক্ষীবাহিনী দীর্ঘ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। অবশেষে শহরবাসী ২৮ আগস্ট ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে (২৬ মহররম ৯৩৯ হিজরি) এই শর্তে আত্মসমর্পণ করে যে উসমানীয় বাহিনী শহরে প্রবেশ করবে না।

যদি উসমানীয় বাহিনী সরাসরি ভিয়েনায় পৌঁছে যেত তবে গ্রীষ্মকালেই অবরোধ শুরু করা যেত, কিন্তু এখন শীতকাল নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল। আশঙ্কা ছিল যে অবরোধ দীর্ঘ হলে শীতের তীব্রতার কারণে অভিযান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে; সুলাইমান আলী শান এই সংবাদও পান যে স্পেন ও জার্মানির বাহিনী ভিয়েনায় পৌঁছে গেছে। ফলে তিনি ফিরে আসাকেই প্রাধান্য দেন।

সুলাইমান ইস্তাম্বুল পৌঁছানোর পর অস্ট্রিয়ার রাজা পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব দেন। সুলাইমান সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেন। স্থির হলো যে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির ওপর নিজের অধিকার দাবি করবে না এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার ওপর আক্রমণ করা হবে না। [১]

ডুয়াল ইউরোপের সাথে শান্তি চুক্তি

সুলাইমান খান স্পেনের আধিপত্য ধূলিসাৎ করার এবং ইউরোপকে অনেকটা দমিত করার পর শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেন। জুন ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে (জিলকদ ৯৩৯ হিজরি) জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার শাসক ফার্ডিনান্ডের সাথে সীমান্ত সম্মানের চুক্তি সম্পন্ন হয়, সেই সাথে স্থির হয় যে হাঙ্গেরিতে বাবে আলীর প্রতিনিধি জাপোলির সাথে অস্ট্রিয়ার কোনো চুক্তি বাবে আলীর অনুমোদন ব্যতীত বৈধ হবে না এবং এই চুক্তি ও সন্ধিনামার সাথে স্পেনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। এভাবে সুলাইমান আলী শান তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী স্পেনকে একটি বিশ্বশক্তি হওয়া থেকে রুখে দেন। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃ. ২১৮, ২১৯; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৭৫, ২৭৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃ. ২১৯; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৭৪, ২৭৫

সুলাইমান আলী শান ইউরোপে তাঁর মিত্রদের সাথে যোগাযোগ উন্নত করেছিলেন। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৪২ হিজরি) ফ্রান্সের সাথে ষোলোটি ধারার সমন্বয়ে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার অধীনে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য সুযোগ-সুবিধাসহ অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। [১]

খায়রুদ্দিন বারবারোসার অবিস্মরণীয় কীর্তিসমূহ

সুলতান সুলাইমান আলী শানের শাসনামলে আমীরুল বাহর খায়রুদ্দিনের পদ ও মর্যাদা অটুট ছিল। পরিস্থিতি ভালোই চলছিল, এমন সময় একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। আলজেরিয়ার প্রাক্তন আরব আমীরগণ এবং তিউনিসিয়ার বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর (বনু হাফস) ষড়যন্ত্র অনেক মুসলমানকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্ট দেখে খায়রুদ্দিন পাশা আলজেরিয়ার আমীরদের একত্রিত করে বললেন:

“আমরা এখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরাতে আসিনি, জিহাদের জন্য এসেছি। মুসলমানদের গর্দান কাটার পাপ তোমাদের ওপর বর্তাবে। দেখি তোমরা মুসলমানদের কাফেরদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করো।” এই কথা বলে সেই মহান ব্যক্তি রাজধানী বা শাসনকেন্দ্রের চাবিকাঠি স্থানীয় আমীরদের হাতে তুলে দিলেন এবং তাঁর নৌবহর নিয়ে অন্য কোনো গন্তব্যের দিকে রওনা হলেন।

খায়রুদ্দিনের কাছে চল্লিশটি জাহাজ ছিল, মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য তাঁর সমুদ্রে একটি শক্তিশালী বন্দরের প্রয়োজন ছিল। তিনি এটিও জানতেন যে, বিদ্রোহের পেছনে তিউনিসিয়ার আমীরের বড় হাত রয়েছে, যিনি স্পেনের করদরাজ্য ছিলেন।

খায়রুদ্দিন তিউনিসিয়ার আমীরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর দ্বীপ “জারবা” দখল করে নেন। তিউনিসিয়ার দূতরা আলোচনার জন্য এলে তিনি তাদের এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, তিনি এমন লোকদের সাথে কথা বলেন না যারা আন্দালুস এবং পূর্ব আফ্রিকায় মুসলমানদের হত্যাকারী কাফেরদের সহযোগিতা করছে।

আলজেরিয়া থেকে তুর্কিদের প্রস্থানের পর সেখানে স্প্যানিশরা আবার আক্রমণ শুরু করে। সমুদ্রপথ অনিরাপদ হয়ে যাওয়ায় দেশের বাণিজ্য মন্দার কবলে পড়ে। এভাবে চার বছর কেটে গেল। আলজেরিয়ার আমীরগণ খায়রুদ্দিনের কাছে আবেদন করতে থাকেন যেন তিনি ফিরে এসে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। প্রতিদিন কোনো না কোনো প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আসত।

অবশেষে চার বছর পর খায়রুদ্দিন পাশা পুনরায় আলজেরিয়ায় পৌঁছান যেখানে তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তিনি সহজেই স্পেনের অধীনে থাকা আলজেরীয় শহরগুলো: শারশাল, জাজিরা কুদ হারান এবং তিউনিসিয়াকেও মুক্ত করেন।

স্প্যানিশ বাহিনী “পেনিয়ন”-এ একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করে সেটিকে তাদের সদর দপ্তর বানিয়েছিল। বিখ্যাত স্প্যানিশ জেনারেল ডন মার্টিন, যিনি উরুজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন, এখানে অবস্থান করছিলেন। খায়রুদ্দিন পাশা এই দুর্গটি ঘেরাও করেন এবং বিশ দিন গোলাবর্ষণের পর ২৭ মে ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে (২ রমজান ৯৩৫ হিজরি) এর দুর্ভেদ্য প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। দুর্গটি দখলের সাথে সাথেই

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২২৫ থেকে ২৩০।

ডন মার্টিন এবং তার সাথে ৫০০ সৈন্যকে বন্দী করা হলো। পাশা খ্রিস্টান বন্দীদের কাজে লাগিয়ে শহরের বন্দরের চারপাশে একটি আকাশচুম্বী প্রাচীর নির্মাণ করালেন। এই সময়ে স্প্যানিশ নৌবাহিনী ৯টি যুদ্ধজাহাজে অবরুদ্ধদের জন্য সাহায্য ও রসদ নিয়ে আসে, তারা জানত না যে মুসলমানরা শহরটি জয় করে নিয়েছে। ইসলামী নৌবাহিনী সেগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং সবকটি জাহাজ দখল করে নেয়।

এই সময়ে পাশা সংবাদ পেলেন যে স্পেনের রাজা চার্লস এবং জার্মানির কর্মকর্তারা জেনেভায় সাক্ষাৎ করছেন। পাশা সুযোগ বুঝে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ করেন যার নেতৃত্বে ছিলেন রইস বিন আহমদ। তার নৌ-বিজয়সমূহের কারণে মুসলমানরা তাকে “যারেবুল কুফফার” বলত, অন্যদিকে স্প্যানিশরা তাকে “শয়তান” বলে অভিহিত করত।

রইস বিন আহমদ প্রথমে মাসেই, তারপর ভেনিস এবং সবশেষে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া বন্দরে আক্রমণ করেন। ভ্যালেন্সিয়া থেকে হাজার হাজার মজলুম মুসলমানকে নিয়ে তিনি উপকূল থেকে কিছুটা দূরে পৌঁছেছিলেন, এমন সময় স্পেনের অ্যাডমিরাল ফার্নান্দো ধাওয়া করে তাকে ঘিরে ফেলেন এবং দাবি করেন যে জাহাজে থাকা সমস্ত আন্দালুসিয়ান মুসলমানকে তার হাতে তুলে দিতে হবে, যাতে তাদের হত্যা করে বাকি আন্দালুসিয়ান মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। রইস বিন আহমদ এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তিনি এটাও জানতেন যে যাত্রীবোঝাই জাহাজ নিয়ে স্প্যানিশ নৌবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত নিলেন। জাহাজে ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে সমস্ত যাত্রী উপকূলে নামার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। এটি শুনে যাত্রীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। কেউ সেই জাহান্নামে পুনরায় ফিরে যেতে প্রস্তুত ছিল না যেখানে দেশ থেকে পালানোর চেষ্টার শাস্তি ছিল আগুনের চুল্লিতে উল্টো ঝুলিয়ে ধীরে ধীরে কাবাব বানানো ছাড়া আর কিছু নয়।

রইস বিন আহমদ কান্নারত যাত্রীদের অনেক কষ্টে শান্ত করলেন এবং বোঝালেন যে স্প্যানিশ নৌবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য তিনি এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। বিজয়ের পর তিনি তাদের পুনরায় জাহাজে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবেন।

তিনি দ্রুত জাহাজগুলোকে নিকটবর্তী উপকূলে নোঙর করলেন এবং সমস্ত যাত্রীকে তীরে নামিয়ে দিলেন। এরপর জাহাজগুলোকে যুদ্ধের বিন্যাসে সারিবদ্ধ করে স্প্যানিশ নৌবাহিনীর মুখোমুখি হলেন।

উপকূলের কাছে এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণের গর্জনের সাথে সাথে তীরে অবস্থানরত হাজার হাজার শরণার্থীর আত্নাদও মাইলের পর মাইল দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল, যারা উচ্চস্বরে আল্লাহর কাছে উসমানীয় বাহিনীর বিজয় এবং সুলাইমান আলিশানের সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করছিল। তুর্কি সৈন্যরা যারা পূর্ণ উদ্যমে লড়াই করছিল, তাদের কঠোর মেজাজ সত্ত্বেও এই আহাজারি শুনে বারবার অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ছিল এবং আগের চেয়েও বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে লড়াই করতে শুরু করল। অবশেষে আল্লাহ তুর্কিদের বিজয় দান করলেন। স্প্যানিশরা তাদের নয়টি জাহাজ তুর্কিদের দখলে রেখে পালিয়ে গেল। রইস বিন আহমদ পুনরায় নৌবহর নোঙর করলেন এবং শরণার্থীদের নিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা হলেন। যখন তিনি আলজেরিয়া পৌঁছালেন, তখন খায়রুদ্দিন...

পাশা এই অভিযানের অবস্থা শুনে এর পূর্ণ বিবরণ সুলাইমান আলিশানকে লিখে পাঠালেন, যেখানে এই সাফল্যকে অত্যন্ত প্রশংসা করা হলো। উত্তর আফ্রিকায় তখনও স্পেনের কিছু ঘাঁটি বাকি ছিল। সেগুলোর মধ্যে “মোস্টাগানিম” ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৪ হিজরি) পাশা আক্রমণ করে এটি জয় করে নেন। এরপর তিনি সেই অঞ্চলের দুর্গগুলো জয় করেন যেখানে তাঁর ভাই উরুজকে শহীদ করা হয়েছিল। পরবর্তী ধাপে তিনি তিলিমসান পৌঁছান এবং ২০ দিনের অবরোধের পর সেটিও জয় করে নেন। এই সমস্ত অঞ্চলে সুলাইমান আলিশানের নামে মুদ্রা জারি করা হলো।

সেই সময়ে ইউরোপে ক্যাপ্টেন আন্দ্রেয়া ডোরিয়া (Andrea Doria)-র খুব দাপট ছিল। তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর এবং নৌ-যুদ্ধে তাঁকে অতুলনীয় মনে করা হতো। তিনি রোমের পোপসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় সরকারের অধীনে চাকরি করেছিলেন এবং এখন মোটা অংকের পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের হয়ে অভিযান পরিচালনা করছিলেন।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৬ হিজরি) তিনি ২০টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আলজেরিয়ায় আসেন। পাশা ৩২টি জাহাজ নিয়ে বের হলেন এবং তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। পশ্চাদ্ধাবনের সময় ১৫০০ স্প্যানিশ নিহত এবং ৬৩০ জন বন্দি হলো। আন্দ্রেয়া ডোরিয়া কোনোভাবে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

এই অভিযান থেকে ফিরে আসতেই পাশা সুলাইমান আলিশানের একটি পত্র পেলেন যাতে ফ্রান্সের সাথে সন্ধির খবর জানিয়ে তাকিদ দেওয়া হয়েছিল যে ফরাসি জাহাজগুলোর সাথে যেন কোনো সংঘর্ষ না করা হয়। এর পাশাপাশি সুলাইমান আলিশান খায়রুদ্দিন পাশাকে ইস্তাম্বুলে তলব করলেন এবং তাঁকে পুরো উসমানীয় সাম্রাজ্যের আমিরুল বাহর নিযুক্ত করলেন। [১]

বারবারোসা, আলজেরিয়ার শাসক:

এটি ছিল ইস্তাম্বুলে খায়রুদ্দিন পাশার প্রথম উপস্থিতি। সেই সময় তাঁর বয়স ৬৩ বছর হয়েছিল কিন্তু জিহাদের জন্য তিনি যুবকদের চেয়েও বেশি প্রস্তুত ছিলেন। সুলাইমান তাঁর সাথে দীর্ঘ পরামর্শ করলেন যার মধ্যে নতুন নৌ-বহর তৈরি করা এবং স্পেনের ওপর মোক্ষম আঘাত হানা থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরে নতুন অভিযান পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খায়রুদ্দিন পাশা কোনিয়ায় মাওলানা রুমি রহ.-এর মাজারে হাজিরা দিয়ে আলেপ্পো পৌঁছালেন যেখানে সদরে আজম ইব্রাহিম পাশার সাথেও এই বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ হলো। ইব্রাহিম পাশার ধারণা ছিল যে আমাদের একটি নৌ-বহর আমেরিকায় পাঠিয়ে সেখান থেকে স্পেনের আধিপত্য খতম করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু খায়রুদ্দিন পাশার বক্তব্য ছিল যে এখন ভূমধ্যসাগরে আমাদের নৌ-বাহিনীর বেশি প্রয়োজন যাতে স্পেনকে আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা যায়, অন্যথায় স্পেন মরক্কো ও আলজেরিয়াসহ শুধু উত্তর আফ্রিকার সমস্ত দেশই নয় বরং মিশরের ওপরও দখলদারিত্ব কায়েম করবে এবং সেখানকার মুসলমানদের অবস্থাও তেমন হবে যা স্পেনে হয়েছে। সুলাইমান আলিশান পাশাকে পুনরায় ইস্তাম্বুলে ডেকে আলজেরিয়ার শাসনভার তাঁর নামে করে দিলেন। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৫৮ থেকে ২৫৯

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৬০

বারবারোসা এবং উসমানীয় নৌবাহিনী:

এই পদগুলোর পর খায়রুদ্দিন পাশার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়, তিনি সুলাইমান আলিশানের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং প্রভাবশালী আমীরদের অন্তর্ভুক্ত হন। এই বীর পুরুষ তার সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদ জাতির সেবা এবং দেশের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত করেন। তিনি জানতেন যে আমেরিকার সোনা-রূপার কারণে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্পেনের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে এবং জাহাজের সংখ্যার দিক থেকেও তাদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

তবে পাশা তার সম্পদকে চমৎকারভাবে ব্যবহার করেন। তিনি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেন নৌ-সৈন্যদের ওপর, তাদের কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাঁতার, ডুবুরিগিরি, জাহাজ চালনা, তলোয়ার চালনা, লক্ষ্যভেদ এবং গোলন্দাজি সহ নৌযুদ্ধের সমস্ত বিষয়ে দক্ষ করে তোলেন। তিনি পুরনো কামানের পরিবর্তে নতুন কামান বসান। পুরনো জাহাজগুলো বাদ দিয়ে নতুন জাহাজ তৈরি করান যা মজবুত হওয়া সত্ত্বেও ওজনে হালকা হওয়ার কারণে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল।

এভাবে সুলাইমান আলিশানের যুগে উসমানীয় খিলাফতের নৌবাহিনী এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে অতীতে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এর পরেও দীর্ঘ সময় ধরে উসমানীয় নৌবাহিনী মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো একে ভয় পেত। [১]

তিউনিস বিজয়:

সুলাইমানের নির্দেশে খায়রুদ্দিন পাশা একটি নতুন নৌবহর প্রস্তুত করেন যাতে একদিকে আন্দ্রেয়া ডোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় এবং অন্যদিকে তিউনিস জয় করা যায়। যেখানে হাফসি বংশের ২২তম শাসক মৌলে হাসান শাসন করছিলেন, যিনি পঞ্চম চার্লসের করদ দাতা এবং একজন দুর্বল শাসক ছিলেন। তার জুলুম ও অত্যাচারের অবস্থা এই ছিল যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণের জন্য নিজের ২২ জন ভাইকে হত্যা করেছিলেন।

১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৪০ হিজরি) গ্রীষ্মকালে পাশা ভূমধ্যসাগরে অবতরণ করেন এবং ইতালি ও দক্ষিণ মাল্টায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে হঠাৎ তিউনিসের দিকে অগ্রসর হন। তিউনিসবাসী মৌলে হাসানের চরিত্রের কারণে তার ওপর বিরক্ত ছিল, তাই তারা পাশাকে স্বাগত জানায়। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের (৯৪১ হিজরি) শুরুর দিকে পাশা অত্যন্ত সহজে তিউনিস দখল করে একে উসমানীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। [২]

তিউনিসে স্পেনের আক্রমণ:

পঞ্চম চার্লস এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। ওদিকে মৌলে হাসান তুর্কিদের আগমনে দক্ষিণ মরুভূমির দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি চার্লসের কাছে দূত পাঠিয়ে তিউনিস আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। ফলে চার্লস তিউনিস দখল করে মৌলে হাসানকে পুনরায় সিংহাসনে বসানোর পরিকল্পনা করেন। চার্লস এই অভিযানের জন্য নিজেই বের হন। পাঁচশ জাহাজ এবং ত্রিশ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে এই অভিযান গঠিত ছিল।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ২৯০, ২৯১।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩২; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ২৯৬, ২৯৭।

...এর নৌবহর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বাসেলোনা বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করল, ২৯ মে ১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দ (১৩ জিলকদ ৯৪১ হিজরি) তারিখে এই বাহিনী হঠাৎ তিউনিসিয়ার উপকূলে অবতরণ করল। এটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে উপকূলীয় দুর্গ “হালক আল-ওয়াদ” এবং তিউনিস শহরের ওপর একসাথে আক্রমণ চালান। “হালক আল-ওয়াদ” রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন সিনান পাশা, যাকে স্প্যানিশ বাহিনীর স্থলভাগের ১২০টি কামান দিন-রাত লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছিল। আমির সিনান তিনবার দুর্গ থেকে বের হয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাঁর এই অভিযানে ছয় হাজার আক্রমণকারী নিহত হয়, যাদের মধ্যে কিছু নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আক্রমণকারীরা খাদ্যাভাবের সম্মুখীন ছিল, যদি অবরোধ দীর্ঘ হতো তবে তাদের ফিরে যেতে হতো; কিন্তু মৌলায়ে হাসান তাদের জন্য আট হাজার উট এবং ষোলশ ঘোড়ায় করে খাদ্য ও রসদের এক বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে আসেন, যার ফলে তাদের সাহস বেড়ে যায়।

তিউনিসে খায়রুদ্দিন পাশা বারো হাজার সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলায় অটল ছিলেন। কিন্তু স্থানীয় লোকজন ভীত হয়ে পড়েছিল। তিউনিসের ছয় হাজার বারবার (Berber) স্বেচ্ছাসেবক স্পেনের বিজয় এবং মৌলায়ে হাসানের পুনরায় সিংহাসন লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা আক্রমণকারীদের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হওয়ার চেষ্টা করল এবং কারাগারে বন্দি দশ হাজার নাসারাকে মুক্ত করে তাদের সাথেই পালিয়ে গেল এবং নাসারা বাহিনীতে যোগ দিল। ওদিকে হালক আল-ওয়াদ দুর্গের পতন ঘটে, তবে সিনান পাশা ৯ হাজার ১০০ জন তুর্কি সৈন্যকে নিরাপদে বের করে খায়রুদ্দিন পাশার কাছে তিউনিসে পৌঁছাতে সক্ষম হন।

এটা স্পষ্ট ছিল যে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, এই দুই মুজাহিদ নেতা প্রতিপক্ষের ঘেরাও ভেঙে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আক্রমণাত্মক হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু চার্লস, যে যেকোনো মূল্যে খায়রুদ্দিন পাশাকে জীবিত গ্রেপ্তার করার সংকল্প করেছিল, অত্যন্ত কঠোর অবরোধ করে রেখেছিল। তাই খায়রুদ্দিন পাশা প্রথম হামলায় আড়াই হাজার জওয়ান হারিয়ে ফিরে আসেন। দ্বিতীয় হামলায় তিনি ২০০০ সৈন্য নিয়ে বের হলেন, কিন্তু এবারও শত্রুর ঘেরাও ভাঙা সম্ভব হলো না।

পাশা পিছু হটে শহরের দিকে ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখলেন যে শহরে বিদ্রোহ হয়ে গেছে। নাসারা বন্দিরা শহরের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে এর ফটকগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে পাশা উভয় দিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান।

খায়রুদ্দিন পাশা তবুও আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি জীবন-মৃত্যুর তোয়াক্কা না করে প্রতিপক্ষের ওপর এমন বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ করলেন যে লাশের পাহাড় জমে গেল। স্প্যানিশরা, যারা কারো কাছ থেকে এই পর্যায়ের সাহসিকতা আশা করেনি, তারা আতঙ্কিত হয়ে পিছু হটে শুরু করল এবং পাশা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাদের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে গেলেন। নাসারারা পিছু ধাওয়া করল কিন্তু পাশা তাঁর দলবল নিয়ে এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন যে মনে হচ্ছিল মাটি তাঁকে গিলে ফেলেছে। চার্লস এই মুজাহিদ ব্যক্তির বেরিয়ে যাওয়ায় রাগে ফেটে পড়ল এবং নিজের সেনাপতিদের গালিগালাজ করে ক্ষোভ ঝাড়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না।

বিজয়ের পর নাসারারা ত্রিশ হাজার নাগরিককে হত্যা করল, দশ হাজারকে দাস বানিয়ে বিক্রি করে দিল, অসংখ্য মসজিদে অগ্নিসংযোগ করল, পাঠাগারগুলো ধ্বংস করে দিল। জামে মসজিদের সামনে বইয়ের এত স্তুপ করা হয়েছিল যে সেগুলো মাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কেউ মসজিদে পৌঁছাতে পারত না। নানাভাবে নাগরিকদের ঈমান, সম্মান ও সম্মান ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করা হলো। চার্লস যখন তিউনিসে প্রবেশ করল তখন...

শহরটি কসাইখানার রূপ ধারণ করেছিল। পশ্চিমা ঐতিহাসিক হ্যামার লিখেছেন যে, সেই দিনগুলোতে সুলতান সুলাইমান তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর বাগদাদ ও তাবরিজে বিজেতা হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেখানে কোনো লুটতরাজ বা হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলা হতে দেননি।

মৌলে হাসানকে কর প্রদানের কঠোর শর্তে পুনরায় তিউনিসের একজন পুতুল শাসক বানানো হলো। চার্লস তিউনিসে কিছু সৈন্য মোতায়েন করে ১৭ আগস্ট ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে (৬ সফর ৯৪২ হিজরি) স্পেনে ফিরে গেলেন।

তিউনিসের পতনের পর খাইরুদ্দিন পাশা আলজিয়াস পৌঁছেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী শহীদ হয়েছিলেন, তবে কয়েক হাজার সৈন্য বেঁচে গিয়েছিল। সিনান পাশা ও বৃদ্ধ তুর্গুদ রেইসও নিরাপদ ছিলেন। [১]

ভেনিস ও ইতালির যুদ্ধ ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দ (৯৪৪ হিজরি):

খাইরুদ্দিন পাশা পরাজয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অস্থির ছিলেন, কিন্তু সুলতান সুলাইমান আল-শানের পরিকল্পনা ছিল এর চেয়েও সুদূরপ্রসারী। ভেনিস প্রজাতন্ত্র গত ৩৫ বছর ধরে শান্তিতে ছিল, কিন্তু কেন? কারণ ভেনিসের জনগণ জার্মানি ও স্পেনের সাথে আঁতাত করে তুর্কি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। দক্ষিণ ইতালি, যা স্পেনের শাসনাধীন ছিল, সুলাইমানের আক্রমণের জন্য একটি চমৎকার লক্ষ্যবস্তু হতে পারত।

তাই সুলাইমান ভেনিস ও দক্ষিণ ইতালিতে একটি বড় ধরনের আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের সাথে একমত হলেন যে, তিনি পশ্চিম দিক থেকে ইতালির দিকে অগ্রসর হবেন, আর উসমানীয় বাহিনী পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করবে।

মে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে (জিলকদ ৯৪৩ হিজরি) প্রথমে খাইরুদ্দিন পাশা এবং কয়েক দিন পর সুলতান সুলাইমান আল-শান পৃথক পৃথক নৌবহর নিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে রওনা হলেন। তাঁদের সাথে ১৬ বছর বয়সী শাহজাদা মুহাম্মদ এবং ১৩ বছর বয়সী শাহজাদা দ্বিতীয় সেলিমও ছিলেন।

সুলতান সুলাইমান আল-শানের নৌবহর ২৮০টি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। প্রথমে এটি আলবেনিয়ার ভলোনা বন্দরে নোঙর করে, তারপর ৯২ কিলোমিটার প্রশস্ত ওটরান্টো প্রণালী অতিক্রম করে দক্ষিণ ইতালির উপকূলে পৌঁছায়। ২৩ আগস্ট ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে (১৪ রবিউল আউয়াল ৯৪৪ হিজরি) ওটরান্টো পুনরায় জয় করা হয়, যেখান থেকে ৫৭ বছর আগে ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে (৮৮৬ হিজরি) তুর্কিদের বের করে দেওয়া হয়েছিল।

এই সময়ে খাইরুদ্দিন পাশা ত্রিট দ্বীপ ও সাইক্লোডসে অতর্কিত হামলা চালান, যার ফলে ভেনিস প্রজাতন্ত্র সন্ধির আবেদন করতে বাধ্য হয় এবং ফ্রান্সও এর সুপারিশ করে।

রাজা ফ্রান্সিস এই অভিযানে বাব-ই-আলীকে সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি যদি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন এবং পশ্চিম দিক থেকে ইতালিতে আক্রমণ করতেন, তবে রোম দ্বিমুখী আক্রমণের আওতায় চলে আসত। কিন্তু রাজা ফ্রান্সিস কেবল জার্মানির একটি দুর্গ জয় করেই ক্ষান্ত হলেন এবং উত্তর ইতালিতে প্রবেশের সাহস দেখালেন না। এর কারণ হিসেবে বলা হয় যে, যাজকদের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ আনা হচ্ছিল।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩৩; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ, ইলমাজ ওজতুনা:

আরোপিত হওয়ার এবং জনগণের তীব্র প্রতিবাদের ভয় ছিল। একে ফ্রান্সের রাজার ভীষণতা বলা হোক বা চতুরতা, যাই হোক, পুরো ইতালিকে পদানত করার সুলাইমান আলিশানের সেই মহান পরিকল্পনা সফল হতে পারেনি এবং উসমানীয় বাহিনী ফিরে আসে। ফ্রান্সের শীতলতা সত্ত্বেও সুলাইমান আলিশান কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট হতে দেননি। সম্ভবত তিনি ইউরোপে এমন কোনো মিত্র হারাতে চাননি যে আলাদা হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।

খিলাফত বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের পরও খায়রুদ্দিন পাশার অভিযানগুলো অব্যাহত ছিল, যার ফলে ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় জাহাজ চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধটি সংঘটিত হয় যার কথা আমরা সামনে আলোচনা করব। [১]

বগদান (মোলদাভিয়া) যুদ্ধ, ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ (৯৪৫ হিজরি):

সুলাইমান আলিশান ইস্তাম্বুলে ফিরে গিয়ে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করতে শুরু করেন। জুলাই ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে (সফর ৯৪৫ হিজরি) তিনি রোমানিয়ার বগদান (মোলদাভিয়া) অভিযুক্ত যাত্রা করেন। কারণ উসমানীয় সালতানাতের আনুগত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও সেখানকার শাসক জার্মানির সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সুলাইমান সিরত নদী পার হয়ে রোমানিয়ায় পৌঁছান। বগদানের শাসক পালিয়ে যায় এবং স্থানীয় নেতারা বাব-ই আলীর প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন।

১৫ অক্টোবর ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে (৯ জমাদিউল আউয়াল ৯৪৫ হিজরি) সুলাইমান ইস্তাম্বুলে ফিরছিলেন যখন খায়রুদ্দিন পাশার পুত্র হাসান বেগ এসে তাকে প্রেভেজা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানান। [২]

প্রেভেজা যুদ্ধ:

১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে (৯৪৪ হিজরি) সুলাইমান আলিশানের ইতালির উপকূল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পোপ পল তৃতীয় পুরো ইউরোপকে উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ফলে খ্রিষ্টানদের একটি বিশাল সম্মিলিত নৌবহর তৈরি হয়, যাতে ৩০৮টি যুদ্ধজাহাজ এবং ২৯২টি মালবাহী জাহাজ ছিল। নৌ-সেনার সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। এই বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিখ্যাত ইউরোপীয় নৌ-কমান্ডার আন্দ্রেয়া ডোরিয়ার হাতে। খায়রুদ্দিন পাশা রোডস এবং ক্রিটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত “কারবা” দ্বীপপুঞ্জ জয় করে নিয়েছিলেন। এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল যে ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্মিলিত নৌবহর তাদের ঘেরাও করার জন্য আসছে।

খায়রুদ্দিন পাশা তার আমিরদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা পরামর্শ দিলেন যে প্রেভেজার উপকূল পর্যন্ত পিছিয়ে যাওয়া উপযুক্ত হবে। সেখানে অবস্থান করে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করা উচিত যাতে শত্রু যখন সেখানে পৌঁছাবে তখন দুর্গে স্থাপিত কামান দিয়েও তাদের ওপর আক্রমণ করা যায় এবং পদাতিক বাহিনীও আমাদের সাহায্য করতে পারে।

খায়রুদ্দিন বললেন: “নৌ-যুদ্ধ সবসময় খোলা সমুদ্রে হওয়াই সমীচীন, উপকূলে নয়। যদি আমরা উপকূলের কাছাকাছি থাকি তবে আমাদের জাহাজগুলোর পক্ষে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করা এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলা সম্ভব হবে না।”

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ১/২৭৬, ২৭৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩৪ থেকে ২৩৬; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ১/২৭৮।

খায়রুদ্দিন পাশা ১২২টি যুদ্ধজাহাজ এবং ২২ হাজার সৈন্য নিয়ে এই বিশাল শক্তির মোকাবিলায় বের হলেন এবং উপকূল থেকে নয় কিলোমিটার সামনে এগিয়ে গেলেন। যখন শত্রুর যুদ্ধজাহাজগুলো দেখা গেল, তখন পাশা তার জাহাজের পালগুলো খুলে সেগুলোকে অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। প্রতিপক্ষকে ধাওয়ার মাধ্যমে ক্লান্ত করার পর তিনি গ্রিসের পশ্চিম উপকূলে “আমব্রাসিয়ান” উপসাগরের কাছে “প্রিভেজা” এর সীমানায় থেমে প্রতিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করলেন।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৫৩৮ (১৮ রবিউস সানি ৯৪৫ হিজরি) সকালে উভয় নৌবহর এত কাছে চলে এল যে দূরবীন ছাড়াই একে অপরকে দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে উভয় পক্ষ থেকে কামান গর্জে উঠল এবং উভয় নৌবাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। পাশা তার হালকা জাহাজগুলোকে দ্রুত ঘুরিয়ে শত্রুর গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচতে থাকলেন। ইউরোপীয়দের জাহাজগুলো ছিল অনেক বড় ও ভারী, যা পাল্টা গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য দ্রুত নড়াচড়া করতে অক্ষম ছিল। পাশা তার নৌবহরকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। তার যুদ্ধকৌশল এতই অদ্ভুত ছিল যে ইউরোপীয় ক্যাপ্টেনরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার যুদ্ধের পর ইউরোপের সম্মিলিত নৌ-শক্তি সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো এবং অবশিষ্ট বাহিনী চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে পালিয়ে গেল।

এই বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত পত্র যখন সুলাইমান আলিশান-এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দাঁড়িয়ে তা শুনলেন। ভেনিস প্রজাতন্ত্র এবং ইতালি এই পরাজয়ের পর ডালমাটিয়া (ক্রোয়েশিয়া) উপকূলসহ খায়রুদ্দিন পাশার জয় করা সমস্ত দ্বীপের দাবি ত্যাগ করল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন লক্ষ ডুকাত বাবে আলীকে পেশ করল। [১]

আলজেরিয়ায় স্প্যানিশ বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়:

খায়রুদ্দিন পাশা তার পুত্র হাসান বেগকে আলজেরিয়ায় ফেরত পাঠান এবং তিনি সেখান থেকে স্পেনের উপকূলে আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। তিনি আন্দালুসের মুসলমানদের আফ্রিকায় স্থানান্তরের কাজও চালিয়ে যান এবং সেখানকার মুজাহিদদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও পৌঁছে দিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি দুইবার জিব্রাল্টার দুর্গ দখল করেন।

স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস এই আক্রমণগুলোতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একটি চাল চাললেন এবং খায়রুদ্দিন পাশাকে আলজেরিয়ার রাজা বানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন, শর্ত ছিল যে তাকে উসমানীয় খিলাফতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। চার্লস তার বার্তায় পাশাকে এই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, তার কাছ থেকে সামান্য কর নেওয়া হবে এবং স্পেনের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা সর্বদা তার সাথে থাকবে।

খায়রুদ্দিন পাশা এই ঘৃণ্য প্রস্তাবটি ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এভাবে শত্রুর কাছে এটি স্পষ্ট করে দেন যে, আল্লাহর পথে যারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তারা এতই মূল্যবান যে দুনিয়ার কেউ তাদের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না।

পঞ্চম চার্লস তার প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় এতটাই রাগান্বিত হলেন যে, তিনি ১৫৪১ সালে (৯৪৮ হিজরি) আন্দ্রেয়া ডোরিয়াকে সাথে নিয়ে আলজেরিয়া আক্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। স্পেন, সিসিলি, মাল্টা এবং জার্মানির শাসকগণ, নামকরা নাইট এবং নবাবগণ তার সাথে ছিলেন। নৌবহরটি ৫১২টি জাহাজ এবং ৩৯ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আলজেরিয়ার নৌবহর অন্য কোনো ফ্রন্টে গিয়েছিল। খায়রুদ্দিন পাশাও উপস্থিত ছিলেন না...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৯৬-২৯৭।

ছিল। আলজেরিয়ার নায়েব হাকেম হাসান বেগের কাছে মাত্র ৬০০ নৌ-সৈন্য ছিল, এ ছাড়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে আরও দুই হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আশঙ্কা ছিল যে, এবার স্পেনকে আলজেরিয়া দখল করা থেকে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই।

তবে হাসান বেগ এই মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। স্প্যানিশ বাহিনী আলজেরিয়ার উপকূলে অবতরণ করে তাবু গেড়েছিল। তাদের অগ্রবর্তী দল একটি দুর্গ অবরোধ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। হাসান বেগ তাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালান, যাতে সিসিলির শাসক, মাল্টার ১৪০ জন নাইট এবং ৩০০ জন সাধারণ সৈন্য নিহত হয়। বাকিদের মধ্যে ছড়োছড়ি পড়ে যায় এবং তারা দুর্গের অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সেই রাতেই হাসান বেগ প্রতিপক্ষের মূল শিবিরের ওপর আরও একটি তীব্র আক্রমণ চালান, যাতে তিন হাজার খ্রিস্টান নিহত হয়। চার্লসের আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস হলো না। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, পুরো সেনাবাহিনী জাহাজে চড়ে ফিরে যাবে। সেনাবাহিনী যখন জাহাজে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল।

হাসান বেগ, যিনি আফ্রিকার ঝড়ের সাথে অভ্যস্ত ছিলেন, দূর থেকে এই পুরো দৃশ্য দেখছিলেন। নাসরাত ইলাহিয়া তাঁর সাথে ছিল, মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে অর্জিত সাফল্য তাঁর মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি স্প্যানিশ রাজাকে এমন এক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যাতে তিনি পুনরায় আলজেরিয়ার দিকে আসার সাহস না করেন। তিনি ঝড়ের ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আবারও অসতর্ক খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাদের কয়েক ডজন জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ডুবিয়ে দেন। জাহাজে থাকা শত্রুর গোলাবারুদের ভাঙার পানিতে ডুবে অকেজো হয়ে গেল। ত্রিশ হাজার স্প্যানিশ, জার্মান এবং ইতালীয় নিহত হলো, তুর্কিরা হাজার হাজার ঘোড়াও কেটে ফেলল যাতে শত্রুর সৈন্যরা স্থলপথে পালিয়ে যেতে না পারে। ইউরোপের অনেক নামী রাজপুত্র, নাইট এবং নবাব বন্দী হলেন। ১৩০টি জাহাজ মুসলমানদের হাতে অক্ষত অবস্থায় এল। ডুবে যাওয়া একটি জাহাজে মুসলিম বন্দীরাও ছিল, তাদের মধ্য থেকে ১৮০০ জনকে সমুদ্র থেকে জীবিত উদ্ধার করা হলো।

চার্লস দশ-পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন, কিন্তু পথে এই পরাজয় ও ক্ষয়ক্ষতির কারণে উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকলেন, দুঃখ ও ক্ষোভের আতিশয্যে তিনি নিজের রাজমুকুট মাথা থেকে খুলে সমুদ্রে ফেলে দিলেন।

সুলাইমান আলিশান ইস্তাম্বুলে এই বিজয়ের সংবাদ অত্যন্ত আনন্দের সাথে শুনলেন। খায়রুদ্দিন পাশা এর এক মাস পর আলজেরিয়ায় পৌঁছালেন এবং তাঁর সাহসী পুত্রকে এই গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য সাবাশ দিলেন। [১]

জান জাপোলির মৃত্যু, অস্ট্রিয়ার সাথে পুনরায় যুদ্ধ—বুদাপেস্ট যুদ্ধ:

১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে (৯৪৬ হিজরি) হাঙ্গেরিতে এক বড় পরিবর্তন আসে, সেখানকার নায়েব জান জাপোলি বাবে আলীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার পরিকল্পনা করেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রিয়ার রাজা ফার্ডিনান্ডের সাথে আঁতাত করেন যে, উভয়ই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং হাঙ্গেরিকে স্বাধীন করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩০০ থেকে ৩০৬।

এই ষড়যন্ত্র কার্যকর হওয়ার আগেই জন জাপোলি মারা যান। ফার্ডিনান্ড এই খবর পাওয়ামাত্রই হাঙ্গেরিতে সৈন্য পাঠিয়ে দেন, যারা দানিউব নদীর তীরের বেশ কিছু উপকূলীয় দুর্গ দখল করে নেয়। সেই সাথে তারা বুদাপেস্ট অবরোধ করে। সুলতান সুলাইমান এই খবর শোনামাত্রই হাঙ্গেরির দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ২৯ আগস্ট ১৫৪১ খ্রিষ্টাব্দে (২৩ রবিউস সানি ৯৪৮ হিজরি) বুদাপেস্টে পৌঁছে যান। অস্ট্রিয়ার সৈন্যরা অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যায়। জানিসারি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এই সময়ে অস্ট্রিয়ার রাজা সুলতান সুলাইমানের দরবারে উপহার পাঠিয়ে সন্ধির আবেদন করেন। এই উপহারগুলোর মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘড়িও ছিল যা দিন, মাস এবং নক্ষত্রের গতিবিধিও নির্ধারণ করত। সুলাইমান সন্ধির জন্য শর্ত দেন যে, অস্ট্রিয়ার রাজাকে হাঙ্গেরির সমস্ত দখলকৃত দুর্গ খালি করে দিতে হবে। অস্ট্রিয়ার রাজা এতে রাজি হননি এবং এভাবে আলোচনা ব্যর্থ হয়।

সেই দিনগুলোতে ফ্রান্স এবং স্পেনের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের এক নবাব ফ্রান্সের সেই দূতকে হত্যা করেছিলেন যিনি বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে ইস্তাম্বুল যাচ্ছিলেন।

ফ্রান্সের রাজা তার পরিবর্তে দ্বিতীয় একজন দূত পাঠান যিনি খলিফাকে স্পেনের বিরুদ্ধে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দেন। সুলতান সুলাইমান প্রথম ফ্রান্সিসের দুর্বল চিত্ত সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এর আগেও এমন একটি জোট হয়েছিল যাতে ফ্রান্সের রাজা কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। তবে এরই মধ্যে খবর আসে যে, পঞ্চম চার্লস আলজেরিয়া আক্রমণ করেছেন যা সেখানকার নৌবাহিনী ব্যর্থ করে দিয়েছে। চার্লসের এই কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান সুলাইমান আবারও ফ্রান্সকে মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হন। [১]

এস্তেরগোম বিজয়:

১৫৪৩ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে (৯৫০ হিজরির শুরুতে) সুলাইমান সতেজ বাহিনী নিয়ে পুনরায় হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করেন। তার সাথে ৭৩টি ছোট যুদ্ধজাহাজ কৃষ্ণসাগর থেকে দানিউব নদীর ব-দ্বীপে প্রবেশ করে যেগুলোতে রসদ বোঝাই ছিল। দানিউব নদীর সমান্তরালে এই সফর বুদাপেস্ট থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ‘এস্তেরগোম’ শহরে গিয়ে শেষ হয়।

এটি ছিল হাঙ্গেরির খ্রিস্টানদের ধর্মীয় কেন্দ্র। ক্যাথলিক চার্চের বিশপ এখানেই থাকতেন। ৩১৫টি কামানের সাহায্যে এই দুর্গে আক্রমণ করা হয় এবং বারো দিনে এটি জয় করা হয়। বেলগ্রেড থেকে কিছুটা দূরে ‘স্তলনি’ নামক শহরটিও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যেখানে হাঙ্গেরির রাজাদের সমাহিত করা হতো, কিন্তু তখন এটি জার্মানির দখলে ছিল। তুর্কিরা পনেরো দিনের যুদ্ধের পর এটিও জয় করে নেয়। এখানে হাঙ্গেরির রাজারা সোনার ত্রুশ এবং রত্নখচিত মুকুটসহ সমাহিত ছিলেন, কিন্তু তুর্কিরা এই মূল্যবান ধনভাণ্ডারে কখনো হাত দেয়নি।

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক মুহাম্মি: পৃষ্ঠা ২৩৫, ২৩৬।

ওট্রান্টো এবং এস্টোনি জার্মানির সীমান্তে অবস্থিত ছিল, তাই দীর্ঘকাল ধরে এটি উসমানীয়দের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শিবির ছিল। এখানে জার্মানির ওপর আক্রমণও হয়েছিল, যার পর ১৫৪৫ সালে জার্মানির সাথে শান্তি চুক্তি হয়। [১]

আমীরুল্লাহ বাহর খায়রুদ্দিন পাশা বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত উদ্যমী ও স্বীয় দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলেন। তিনি ফরাসি নৌবাহিনীর সাথে মিলে তাদের যৌথ ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সামুদ্রিক অভিযান শুরু করেন। নেপলস ও রোমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত “গায়েতা” দুর্গে স্প্যানিশ কমান্ডার ডন ডিয়েগো কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই মাত্র তিন জন সৈন্যের ক্ষতির বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করেন। খায়রুদ্দিন পাশা ডিয়েগোর মেয়েকে বিয়ে করে তাকে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি রোম থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে টাইবার নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত “অস্টিয়া” শহর জয় করেন।

খায়রুদ্দিন পাশা এরপর সরাসরি রোম আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার মিত্র ফরাসি কমান্ডার তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে অনুরোধ করেন যেন রোমের দিকে অগ্রসর না হন, অন্যথায় পুরো খ্রিস্টান বিশ্বের কাছে ফ্রান্সের বদনাম হবে।

পাশা ফ্রান্সের উপকূলীয় শহর “নিস”-কে স্পেনের দখল থেকে মুক্ত করে ফরাসি কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেন। এই অভিযানে তার ২০০ জন সঙ্গী কাজে আসেন। ফরাসি কর্মকর্তাদের কাছে খায়রুদ্দিন পাশা এক অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বের মর্যাদা লাভ করেন। ফ্রান্সের রাজা এই অভিযানগুলোর জন্য তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে থাকেন। ফ্রান্সের সাথে যৌথ অভিযান এক বছর ধরে চলতে থাকে। অবশেষে স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস ফ্রান্সের সাথে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হন। ১৫৪৪ সালের মার্চ মাসে (জিলহজ ৯৫০ হিজরি) দুই দেশের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যাতে স্পেনের অধীনস্থ অন্যান্য দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুঃখজনক দিকটি ছিল এই যে, ফ্রান্স উসমানীয় সালতানাতকে আস্থায় না নিয়েই শান্তি চুক্তি করে ফেলেছিল। এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে ফ্রান্স ও উসমানীয় সালতানাতের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। [২]

খায়রুদ্দিন পাশার মৃত্যু:

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৫৪৪ সালে (৯৫১ হিজরি) খায়রুদ্দিন পাশা ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। এরপর তিনি আর কোনো সামুদ্রিক সফর করেননি। শেষ জীবনে তিনি তার সম্পদ উসমানীয় সালতানাতের সেবা এবং তার সাহসী সঙ্গীদের সহযোগিতার জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত জাহাজগুলো উসমানীয় সালতানাতের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তিনি তার দাসদের সুলতান সুলাইমান আল-শান এবং উজির-এ-আজম রুস্তম পাশার কাছে পেশ করেন। তিনি তার প্রয়াত ভাই ইসহাক মরহুমের ছেলে মোস্তফা বে-কে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা (লিরা) উপহার দেন। বেশিকতাবে তিনি একটি জামে মসজিদ, কবরস্থান এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা বরাদ্দ করেন। তিনি তার শত শত সাহসী মুজাহিদদের নগদ অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি এবং অন্যান্য আসবাবপত্র এত বেশি পরিমাণে দান করেন যে তারা বাকি জীবন শান্তিতে কাটাতে পারতেন। রুস্তম পাশা তার কাছে দুই লক্ষ লিরার ঋণী ছিলেন। খায়রুদ্দিন পাশা তার নিজের ছেলে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ১/২৮২-২৮৩।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৮।

হাসানকে ওসিয়ত করলেন যে তিনি যেন রুস্তমের কাছে কখনো ঋণ ফেরতের দাবি না করেন। যদি সে দেয়ও, তবুও যেন তা গ্রহণ না করেন।

এই ওসিয়তগুলোর পর ৪ জুলাই ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে (২৪ রবিউস সানি ৯৫৩ হিজরি) মুসলিম বিশ্বের এই অতুলনীয় নৌ-সেনা, যিনি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের জন্য সমুদ্রের বুক সংকীর্ণ করে দিয়েছিলেন, পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর বয়স ছিল ৭০ বছর।

চোখের কোটরে ব্যথার প্রদীপ জ্বলে

কলিজার রক্তকে পুনরায় কলমের হাতে সাঁপে দাও

ক্ষতবিক্ষত দেহ দিয়ে পথের নিশানা তৈরি করে

যে হাতগুলো কাটা পড়েছে, সেগুলোকেই ঝাঙা বানিয়ে নাও [১]

ইস্তাম্বুলের বেশিকতাস উপকূলে তাঁর কবর আজও সাম্রাজ্যবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। আজও সেখানে তুর্কি নৌবাহিনীর অনুষ্ঠানাদি আয়োজিত হয় যেখানে এই সমুদ্রের সিংহকে অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। [২]

অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতি

এই সময়ে হাঙ্গেরির ময়দানে অস্ট্রিয়ার রাজা এবং সুলাইমান আলিশানের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। বেশ কয়েকবার আলোচনা হলেও কোনো ফলাফল আসেনি। প্রথম ফ্রান্সিস আবারও উসমানীয় সালতানাতের সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পর অস্ট্রিয়া এবং উসমানীয় সালতানাতের মধ্যে পাঁচ বছরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। [৩]

বিশ্বজনীন খিলাফত এবং বৈশ্বিক অভিযানসমূহ

সুলাইমান আলিশান ছিলেন একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন খলিফা এবং বিশ্বজনীন শাসক। তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সারা বিশ্বের মুসলিম শাসকরা তাঁর ওপর ভরসা করতেন এবং বিপদের সময় তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। সুলাইমান আলিশান সর্বদা এ ধরনের সমস্যাগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিতেন। উপরে খায়রুদ্দিন বারবারোসার যত অভিযানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সবই বিশ্বজনীন খিলাফতের বৈশ্বিক অভিযানেরই একটি অংশ ছিল। আরও কিছু অভিযানের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো।

পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে গুজরাট অভিযান:

সেই সময়ে গুজরাটের (ভারত) শাসক বাহাদুর শাহ পর্তুগিজ নাবিকদের অত্যাচারে অত্যন্ত অতিষ্ঠ ছিলেন যারা ভারতের উপকূলে লুটতরাজ চালিয়ে আসছিল। তিনি ইস্তাম্বুলে দূত পাঠিয়ে সুলাইমান আলিশানের কাছে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন। ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং পারস্য উপসাগরে পর্তুগিজদের দখলের হুমকি উপেক্ষা করার মতো ছিল না। পর্তুগাল ভারত মহাসাগর...

[১] সরফরাজ

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৪০২, ৪০৩

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ২৩৯

একচেটিয়া বাণিজ্যের মাধ্যমে স্পেন আমেরিকা থেকে সোনা ও রূপার খনি থেকে যে সম্পদ অর্জন করছিল, তা কোনো অংশেই কম ছিল না। পর্তুগাল ভারতীয় ও তুর্কি জাহাজগুলোকে ভারত মহাসাগরে চলাচলে বাধা দিয়েছিল। একইভাবে তারা দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল, কারণ এখানকার উচ্চমানের পণ্য ইউরোপে কয়েকগুণ দামে বিক্রি হতো। এই ধন-সম্পদের একটি বিশাল অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হচ্ছিল।

এই বিপদগুলো প্রতিরোধের জন্য ১৫৩০ সালে (৯৩৬ হিজরি) উসমানীয় নৌবাহিনী গুজরাট উপকূলে পৌঁছায়, যেখানে দিউ দ্বীপকে কেন্দ্র করে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। ৬ জানুয়ারি ১৫৩১ সালে (৫ জমাদিউল আউয়াল ৯৩৭ হিজরি) পর্তুগিজ কমান্ডার “নুনো দা কুনহা” তার কেন্দ্র “গোয়া” থেকে ৪০০ জাহাজ নিয়ে তুর্কিদের মোকাবিলায় বের হন। তার বাহিনীতে ৩৬০০ পর্তুগিজ ছিল, বাকিরা ছিল হিন্দু ও স্থানীয় লোক। পর্তুগিজরা দিউ দ্বীপ ঘেরাও করে ২০টি কামান দিয়ে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। তবে তুর্কিদের কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হলে পর্তুগিজরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এর পরপরই তুর্কি নৌবহর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পিছু হটতে থাকা পর্তুগিজ নৌবাহিনীকে গভীর সমুদ্রে ধরে ফেলে। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ৪০টি জাহাজ ডুবে যায়, ২০টি জাহাজ মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ১৫০০ পর্তুগিজ ও তাদের হাজার হাজার হিন্দু কর্মচারী নিহত হয়। [১]

গুজরাট দরবারে ষড়যন্ত্র এবং তুর্কিদের প্রত্যাবর্তন:

এই বিজয়ের পর গুজরাট দরবারে উসমানীয় আমিরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, বাহাদুর শাহ তুর্কি আমির মোস্তফা বেগকে সুরাটের গভর্নর নিযুক্ত করেন। গুজরাটের নৌ-শক্তি ছিল নগণ্য। উসমানীয় আমিররা নতুন জাহাজ তৈরি করে গুজরাটের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন।

যদি পরিস্থিতি অনুকূল থাকত, তবে গুজরাট উপকূলকে কেন্দ্র করে উসমানীয় নৌবাহিনী পর্তুগিজদের ভারত মহাসাগর থেকে পুরোপুরি বিতাড়িত করতে পারত। কিন্তু খোদ উসমানীয় আমিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। গুজরাটে উসমানীয় নৌবাহিনীর আমির মালিক দোগান তার বিজয়ের কারণে সবচেয়ে বড় নাম ছিলেন। তিনি ছিলেন আয়াজ বেগের পুত্র, যিনি সুলতান সেলিম আউয়ালের আমলে গুজরাট রক্ষার জন্য সবার আগে পৌঁছেছিলেন। মালিক দোগানের ক্রমবর্ধমান মর্যাদা দেখে কিছু তুর্কি আমির ঈর্ষান্বিত হন এবং তারা বাহাদুর শাহকে তার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলেন। ফলে বাহাদুর শাহ মালিক দোগানকে হত্যা করান। এরপর গুজরাটে উসমানীয় আমিরদের জন্য পরিস্থিতি এমন প্রতিকূল হয়ে ওঠে যে, পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে আর কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

অধিকন্তু, কয়েক বছর পর যখন বাহাদুর শাহ মুঘল শাসক হুমায়ূনের আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হন, তখন গুজরাটি নৌবাহিনী...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া (ইলমাজ ওজতুনা): ১/৩২৬।

জাহাজগুলোকে এই ভেবে পুড়িয়ে দেওয়া হলো যাতে সেগুলো হুমায়ূনের হাতে না পড়ে। এই পদক্ষেপের ফলে পর্তুগিজদের পোয়াবারো হলো এবং তারা হিন্দুস্তানের উপকূলে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অক্টোবর ১৫৩৫ (রবিউস সানি ৯৪২ হিজরি) সালে তারা পুনরায় দিউ দ্বীপে আক্রমণ করল। উসমানি আমিরগণ দীর্ঘ সময় প্রতিরোধ করলেন কিন্তু নৌজাহাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হলেন এবং এই ঘাঁটিতে পর্তুগিজরা দখলদারিত্ব কায়েম করল। [১]

ভারত মহাসাগরের অভিযানসমূহ:

সুলাইমান আলিশান ভারত মহাসাগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে গাফেল ছিলেন না। তিনি ১৫৩৮ (৯৪৫ হিজরি) সালে মিসরের আমির সুলাইমান পাশার নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে একটি বড় অভিযান শুরু করেন, যাতে প্রথমে এডেনসহ ইয়েমেনের বেশ কিছু উপকূলীয় শহর দখল করা হয় যাতে লোহিত সাগরের প্রবেশপথ নিরাপদ হয়। এরপর মাস্কাট ও হরমুজ প্রণালী দখল করে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরকে নিরাপদ করা হয়। এরপর এই নৌবহর ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং গুজরাটে পৌঁছায়। সুলাইমান পাশা গোকলা বন্দর ও কিট দখল করার পর “দিউ”-এর দিকে অগ্রসর হন। পর্তুগিজ নৌবাহিনী এক হাজার লাশ ফেলে রেখে “দিউ”-তে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

যুদ্ধ চলাকালীন সুলাইমান পাশার সামনে কিছু রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। গুজরাটে তখন মাহমুদ শাহের শাসন ছিল। কুচক্রীরা তাকে এই বিশ্বাস করাল যে তুর্কিদের নিয়ত ভালো নয় এবং তারা পর্তুগিজদের নির্মূল করার পর গুজরাট দখল করে নেবে। এই আশঙ্কার কারণে মাহমুদ শাহের ঝোঁক পর্তুগিজদের দিকে হয়ে যায়, যা সুলাইমান পাশার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্রুত বুঝতে পারেন। তবে তিনি মাহমুদ শাহকে গাদ্দারির শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলেন। কারণ খলিফা তাকে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠিয়েছিলেন, মুসলমানদের রক্তে হাত রাঙাতে নয়। ফলে সুলাইমান পাশার এই নৌবহর চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই ফিরে যায়। যদি সেই সময় তুর্কিদের আস্থায় আঘাত না দেওয়া হতো, তবে হিন্দুস্তানের ইতিহাস অনেক ভিন্ন হতো এবং কোনো পশ্চিমা শক্তির এখানে পা রাখার সুযোগ হতো না।

ফেরার পথে সুলাইমান পাশা সেনাবাহিনীর কামান ও বন্দুকগুলো ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়ার সেই মুসলমানদের হাতে তুলে দেন যারা পর্তুগিজদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের তীব্র মুখাপেক্ষী ছিল। [২]

আফ্রিকান মুসলমানদের সাহায্য:

ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া কিছুকাল ধরে উসমানি খিলাফতের অধীনে ছিল। বিখ্যাত উসমানি আমির ওজদেমির বেগ মিসর থেকে সৈন্য পরিচালনা করে শুধু এই দুই দেশই নয় বরং হাবশার কিছু অংশকেও খিলাফতের শাসনাধীনে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

তবে পর্তুগিজরা এই বিজিত এলাকা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য তখনও উদগ্রীব ছিল। এজন্য ১৫৪১ (৯৪৮ হিজরি) সালে পর্তুগাল হাবশার খ্রিস্টান রাজা গ্লাউডিডাসকে বন্দুক ও কামান সরবরাহ করে, যার পর গ্লাউডিডাস সোমালিয়ার শাসক...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩২৫, ৩২৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩২৮, ৩২৯

আহমদ গ্রানকে পরাজিত করে সোমালিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নিল। ইয়েমেনের উসমানীয় আমির মুহাম্মদ পাশা যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি দশটি কামান এবং নয়শ বন্দুকধারী তুর্কি সৈন্য সোমালিয়ায় পাঠালেন, যার ফলে আহমদ গ্রানের শক্তি বৃদ্ধি পেল। তিনি হাবশা এবং পর্তুগালের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে কাস এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। এই যুদ্ধে পর্তুগিজ সেনাপতি ক্রিস্টোফার ডি গামা বন্দী হন, তার শিরশ্ছেদ করে আহমদ পাশার কাছে পাঠানো হয়। [১]

বাব আল-মানদাব-এর সুরক্ষা:

লোহিত সাগরকে পর্তুগিজদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাব আল-মানদাব-এর ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি ছিল, যা লোহিত সাগরকে ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত করে। পর্তুগিজ জেনারেল ডন গার্সিয়া এডেন দখল করে বাব আল-মানদাব পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এডেনের শাসক আবদুর রহমান বেগের পাল্টা আক্রমণে তিনি জীবন্ত বন্দী হন এবং তাকে ইস্তাম্বুলে পাঠানো হয়। এরপর উসমানীয় সালতানাতের পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে ২৫টি জাহাজ এডেন থেকে ওমানের মধ্যে টহল দিতে শুরু করে, যার ফলে পর্তুগিজরা বাব আল-মানদাব-এর কাছে আসার সাহস করেনি।

অন্যদিকে আমির বেগ লোহিত সাগরকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য হাবশা ও সুদানের ওপর আক্রমণ করে তাদের বিশাল এলাকা দখল করে নেন এবং স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে শরীয়ত অনুযায়ী বার্ষিক জিজিয়া নির্ধারণ করেন। মনে রাখা দরকার যে, সুদানে তখন প্রচুর মূর্তিপূজারী গোত্র বাস করত, আর হাবশা ছিল অর্থোডক্স ইয়াকুবীয় খ্রিস্টানদের দেশ। [২]

দিল্লির মুঘল বাদশাহদের সাথে সম্পর্ক:

সুলাইমান আলিশানের যুগে হিন্দুস্তানে এক বিপ্লব ঘটে। তৈমুরি বংশের এক শাহজাদা বাবর দিল্লি দখল করেন এবং দেখতে দেখতে এক বিশাল সালতানাত কায়েম করেন। তৈমুরি এবং উসমানীয়রা তুর্কি ও একই বংশের হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। উসমানীয়রা আক্ষারার সেই যুদ্ধ কখনো ভুলতে পারেনি যাতে তৈমুর লং তাদের পূর্বপুরুষ বায়েজিদ ইলদিরিমকে পরাজিত করে চরম অপমানিত করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও সুলাইমান আলিশান হিন্দুস্তানের নবগঠিত মুঘল সরকারকে কখনো শত্রু মনে করেননি এবং খলিফা হিসেবে একটি মুসলিম সরকারকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানানো থেকে পুরোপুরি বিরত থাকেন।

বাবরের মৃত্যুর পর তার পুত্র হুমায়ুন এবং বাংলার সুবাহদার শেরশাহ সুরির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে ১৫৩৭ সালে শেরশাহ সুরি সুলাইমান আলিশানের কাছে দূত পাঠিয়ে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সুলাইমান আলিশান শেরশাহ ও হুমায়ুনের এই লড়াইয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করেননি যা হুমায়ুনের পরাজয় এবং সুরির ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। [৩]

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ ওজতুনা: ১/৩৩০ ও ৩৩২

[২] তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ ওজতুনা: ১/৩৩১-৩৩২

[৩] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া আজ ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩৯

এর শুভ ফল এই দাঁড়ালো যে, শের শাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন যখন পুনরায় ক্ষমতায় আসলেন, তখন তিনি খিলাফতে উসমানিয়ার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা পছন্দ করলেন। একবার ভারত মহাসাগরের তুর্কি আমির আলী রইস সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় হিন্দুস্তানে পৌঁছালে হুমায়ুন দিল্লিতে তাকে চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা জানান। আলী রইস এবং তার অফিসাররা হুমায়ুনের মৃত্যু পর্যন্ত দিল্লিতেই অবস্থান করেন। আকবরের সিংহাসন আরোহণের কিছুকাল পর তারা তুরস্কে ফিরে যান। সুলাইমান আলিশান হিন্দুস্তানের ঘটনাবলির প্রতি এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি আলী রইসকে হিন্দুস্তানের সফরনামা লেখার তাকিদ দিয়েছিলেন। [১]

হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার ওপর সামরিক অভিযান:

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হতেই অস্ট্রিয়ার ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরির রানী ইসাবেলার (জন জাপোলিয়ার বিধবা) সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন, যার ফলে ইসাবেলা ট্রান্সিলভানিয়া এলাকা অস্ট্রিয়ার হাতে তুলে দেন। সুলাইমান এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে সেপ্টেম্বর ১৫৫১ (রমজান ৯৫৮ হিজরি) সালে ৮০ হাজার সৈন্য হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করান, যারা দানিউব নদীর উত্তরে জার্মানদের অধিকৃত এলাকায় (যা ফার্ডিনান্ডের শাসনাধীন ছিল) বিলফারি, বানাত, আরদ, লিপোয়া এবং চানাডের দুর্গগুলো জয় করে নেন। কেবল তিমেশওয়ারের দুর্গ সফলভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, কিন্তু সেটিও জুলাই ১৫৫২ (রজব ৯৫৯ হিজরি) সালে বিজিত হয়। এই সময়ে আগস্ট ১৫৫২ (শাবান ৯৫৯ হিজরি) সালে জার্মান সেনাপতি এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় আসলে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং নিজে বন্দি হন। [২]

ফ্রান্সের সাথে ইতালির বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান:

ফেব্রুয়ারি ১৫৫৩ (সফর ৯৬০ হিজরি) সালে ফ্রান্সের নতুন রাজা হেনরি দ্বিতীয় স্পেন ও অস্ট্রিয়ার সাথে উত্তেজনার কারণে বাব-ই-আলীর সাথে শান্তি চুক্তি নবায়ন করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, শত্রুদের ওপর কার্যকর আঘাত হানার জন্য তুর্কি ও ফরাসি বাহিনী যৌথভাবে ক্রোয়েশিয়া ও ইতালির উপকূলে এবং বিশেষ করে “কোরসিকা” দ্বীপে আক্রমণ চালাবে।

এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের নৌবাহিনী সিসিলি এবং দক্ষিণ ইতালির কিছু উপকূলীয় এলাকায় আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই অভিযানের বিশেষ কোনো ফলাফল পাওয়া যায়নি কারণ উভয় বাহিনীর কমান্ডারদের মেজাজ মিলছিল না। ফ্রান্সের সাথে এটিই ছিল শেষ যৌথ নৌ অভিযান। [৩]

খায়রুদ্দিনের উত্তরসূরিদের কৃতিত্ব:

খায়রুদ্দিন পাশার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা ভূমধ্যসাগরে দখলদার হিস্পানি বাহিনীর নাভিশ্বাস তোলার অভিযান অব্যাহত রাখেন। তাদের মধ্যে তুরগুত বে-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি ওরুজ পাশার ছাত্র এবং খায়রুদ্দিন পাশার ডান হাত ছিলেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ৩৩৫, ৩৩৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪১, ২৪২। তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ৯ / ২৮৬, ২৮৯।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪১, ২৪৬।

ছিল, সে ত্রিপোলি (লিবিয়া) এর উপর বহু বছর শাসন করেছে এবং সেখানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে ভিড়তে দেয়নি। সে উসমানীয় সরকারের নির্দেশে ফরাসি বাহিনীর সাথে মিলে স্পেনের বিরুদ্ধে অভিযানেও অংশ নিয়েছিল, তবে এই যৌথ অভিযানে সে কখনোই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি।

এই বীরদের মধ্যে সালেহ পাশা এবং পিয়ালা পাশার নামও ভুলে যাওয়া যায় না, যারা খায়রুদ্দিন পাশার অত্যন্ত যোগ্য সাথীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদি শুধুমাত্র এই তিন মুজাহিদের বীরত্বগাথা বর্ণনা করা হয়, তবে অনেক পৃষ্ঠা ও সময়ের প্রয়োজন হবে। আমরা সংক্ষেপে তাদের ছেড়ে শুধুমাত্র খায়রুদ্দিন পাশার পুত্র হাসান পাশার বীরত্বগাথা বর্ণনা করছি।

খায়রুদ্দিন পাশার পর নৌবাহিনীর নেতৃত্ব এবং আলজেরিয়ার শাসনভার হাসান পাশাকে দেওয়া হয়। সে একদিকে সমুদ্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর পথ রুদ্ধ করে রাখে এবং অন্যদিকে আলজেরিয়ার আমির হিসেবে উসমানীয় খিলাফতের সীমানা বৃদ্ধি করতে থাকে। তিলিমসানে বনু আবদ আল-ওয়াদ এর শাসন তিন শতাব্দী ধরে চলে আসছিল। হাসান পাশা সেখানকার শেষ শাসক মৌলায় আব্দুল কাদিরকে পরাজিত করে তিলিমসানকে আলজেরিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

কয়েক বছর পর হাসান পাশাকে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং আলজেরিয়ার শাসনভার খায়রুদ্দিন পাশার বিশ্বস্ত সহযোগী সালেহ পাশাকে অর্পণ করা হয়। সালেহ পাশা আন্দালুসের মজলুমদের আফ্রিকায় স্থানান্তরের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ কাজ দেখিয়েছিলেন, তিনি একবার বন্দীও হয়েছিলেন এবং তিন বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। অবশেষে খায়রুদ্দিন পাশা বন্দি বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করেন। স্প্যানিশ কমান্ডার আন্দ্রেয়া ডোরিয়া খায়রুদ্দিনের পর সালেহ পাশাকে খুব ভয় পেতেন।

সালেহ পাশা আলজেরিয়ার আমির হওয়ার পর এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোকেও জয় করে উসমানীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। মরক্কোর শহর ‘রিফ’ এবং আলজেরিয়ার একটি দুর্গ যা দীর্ঘকাল ধরে স্পেনের দখলে ছিল, সালেহ পাশা যুদ্ধ করে এই উভয়টি পুনরুদ্ধার করেন। মরক্কোর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর ‘ওরান’ যা স্পেনের বন্দর আলমেরিয়া থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে ছিল, ১৫০৯ (৯১৫ হিজরি) থেকে স্প্যানিশ বাহিনীর দখলে ছিল। সালেহ পাশা এটি মুক্ত করতে যাচ্ছিলেন, পথেই তার মৃত্যু হয়। তার বয়স ছিল ৬৮ বছর। সুলাইমান আল-শান তার মৃত্যুর খবর শুনে হাসান পাশাকে পুনরায় আলজেরিয়ার আমির নিযুক্ত করেন।

এই দিনগুলোতে সুলাইমান আল-শান খবর পান যে, ফাসের বিদ্রোহী শাসক মুহাম্মদ সানি স্পেনের নতুন রাজা ফিলিপ দ্বিতীয়ের সাথে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে জোট গঠন করেছে। শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ সানি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে কিছু উচ্চপদস্থ তুর্কি কর্মকর্তার শিরশ্চেদ করে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সুলাইমান রাগান্বিত হয়ে হাসান পাশাকে এই বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। হাসান ২৩ হাজার সৈন্য নিয়ে ফাসে পৌঁছালে মুহাম্মদ সানি ৮৮ হাজার সৈন্য নিয়ে তার মোকাবিলায় আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। হঠাৎ হাসান পাশা খবর পান যে, ওরানের স্প্যানিশ শাসক কাউন্ট আলকৌডেট বারো হাজার সৈন্যের একটি নৌবহর নিয়ে তিলিমসানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

হাসান পাশা মুহাম্মদ সানি-এর সাথে যুদ্ধ স্থগিত করে অবিলম্বে স্প্যানিশ বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য ফিরে আসেন। এই সময়ে তার নৌবাহিনী স্প্যানিশ বাহিনীর চারটি জাহাজ দখল করে নেয়, যার ফলে কাউন্ট আলকাউডেট-এর মনোবল ভেঙে যায়। তিনি তিলিমসানের পরিবর্তে পথে অবস্থিত উপকূলীয় শহর “মোস্তাগানিম” অবরোধ করা যথেষ্ট মনে করেন।

অবরোধের বেশি দিন পার হয়নি যে হাসান পাশা নিজের বাহিনী নিয়ে তার মোকাবিলায় সেখানে পৌঁছে যান। কাউন্টের বাহিনীতে বারো হাজার আরব অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা হাসান পাশার মোকাবিলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কাউন্টের পালানোর কোনো পথ ছিল না, তাকে অবরোধ তুলে খোলা ময়দানে সারিবদ্ধ হতে হলো।

২৬ আগস্ট ১৫৫৮ (৯ জিলকদ ৯৬৫ হিজরি) মোস্তাগানিমের ময়দানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে কাউন্ট আলকাউডেট তার বারো হাজার সৈন্যসহ নিহত হন। তার ছেলে ডন মার্টিন বন্দী হন। একজন স্প্যানিশও নিরাপদে ফিরে যেতে পারেনি। স্পেনের ক্ষমতাচ্যুত রাজা পঞ্চম চার্লস তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এই শোচনীয় পরাজয় থেকে তাকে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা হয়েছিল যাতে তার অবস্থা আরও খারাপ না হয়। যাই হোক, তার জীবনের দিনগুলো ফুরিয়ে এসেছিল। ২১ সেপ্টেম্বর ১৫৫৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। [১]

হাসান পাশা এবং জেরবা যুদ্ধ (মে ১৫৬০, মোতাবেক শাবান ৯৬৭ হিজরি):

ভূমধ্যসাগরে জেরবা দ্বীপটি তুর্কি নৌবাহিনীর একটি চমৎকার আস্তানা ছিল যা তুরগুত বে-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। স্পেন এটি দখল করে নিজের হারানো গৌরব ফিরে পেতে চেয়েছিল। তাই আন্দ্রেয়া ডোরিয়ার ভতিজা জিয়ান আন্দ্রেয়া ডোরিয়ার নেতৃত্বে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নৌবহর প্রস্তুত করা হয় যাতে রোম, সিসিলি, ফ্লোরেন্স, জার্মানি, মোনাকো, মাল্টা এবং জেনোয়াসহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের নৌ ও স্থল বাহিনী অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩০ হাজার সৈন্যের এই বাহিনী ৪১ বছর আগের প্রজা যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলতে চেয়েছিল।

১৫৬০ সালের শুরুতে (রজব ৯৬৭ হিজরির শেষ দিকে) এই বাহিনী জেরবা উপকূলে অবতরণ করে যেখানে তখন মাত্র এক হাজার রক্ষী সৈন্য ছিল। তারা মোকাবিলা অসম্ভব দেখে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে ত্রিপোলির (লিবিয়া) দিকে চলে যায়।

সুলতানকে ইস্তাম্বুলে এবং হাসান পাশাকে আলজিয়ার্সে এই খবর পাঠানো হয়। এদিকে ইউরোপীয় বাহিনী দ্বীপে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করে এবং একে কেন্দ্র বানিয়ে ত্রিপোলির (লিবিয়া) ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে। এরই মধ্যে তারা খবর পায় যে তুর্কিরা তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

খায়রুদ্দিন পাশার শিষ্য পিয়াল পাশা, যার বয়স তখন ৩৫ বছর ছিল, তাকে এই অভিযানের আমির করা হয়েছিল। তার কাছে ১২০টি জাহাজ ছিল। তুরগুত বেগ, যার বয়স তখন ৭০ বছর ছিল, তার সাথে ছিলেন। তারা জেরবা থেকে তিন মাইল দূরে জাহাজ নোঙর করে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে তাদের ওস্তাদ খায়রুদ্দিন পাশার প্রজা যুদ্ধে অবলম্বন করা কৌশলগুলো ব্যবহার করা হবে। ১৪ মে ১৫৬০ (৬ শাবান ৯৬৭ হিজরি) সকালে জেরবা থেকে কয়েক মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে উভয়...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩০৮, ৩০৯, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: নিবন্ধ পঞ্চম চার্লস।

বাহিনীদের মধ্যে এমন এক প্রলয়ংকরী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যার কোনো নজির পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে, বিশ্ব ইতিহাসে এত বড় নৌযুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণে এক ছোট কিয়ামত সৃষ্টি হয়েছিল। তুর্কি নাবিকরা খাইরুদ্দিন পাশার রণকৌশলকে এমন দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছিলেন যে ইউরোপীয় নৌবাহিনীর সংখ্যাধিক্য একেজো প্রমাণিত হয়েছিল। জাহাজগুলোর একে অপরের সাথে সংঘর্ষে সমুদ্রে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল। মুসলমানরা হাতাহাতি লড়াইয়ে তলোয়ার চালনার এমন নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন যে ভূমধ্যসাগরের পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। কয়েক ঘণ্টার লড়াইয়ে হাজার হাজার খ্রিস্টান নিহত, হাজার হাজার নিমজ্জিত এবং হাজার হাজার বন্দি হয়েছিল। তাদের ৭০টি জাহাজ ডুবে গিয়েছিল এবং ২৬টি দখল করে নেওয়া হয়েছিল। ৩০ হাজারের মধ্যে মাত্র ১০ হাজার খ্রিস্টান জীবিত ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছিল। তুর্কিদের প্রায় এক হাজার জওয়ান শহীদ এবং কয়েকটি জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল।

ইউরোপীয় কমান্ডার আন্দ্রেয়া ডোরিয়া, যার বয়স তখন ৯৩ বছর হয়েছিল, জেনিভার একটি প্রাসাদে তার ভাতিজার বিজয়ের সুসংবাদ শোনার অপেক্ষায় ছিলেন। যখন তিনি এই শিক্ষণীয় পরাজয়ের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন এবং সেই বছরের ২৫ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করলেন। [১]

হাসান পাশা এবং ওরান যুদ্ধ:

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে (৯৬৮ হিজরি) হাসান পাশা আলজেরিয়ার আমীর পদ থেকে পদত্যাগ করে ইস্তাম্বুলে ফিরে যান, কিন্তু ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৭০ হিজরি) তাকে তৃতীয়বারের মতো এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। হাসান পাশার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তিনি স্পেনীয়দের কাছ থেকে ‘ওরান’ পুনরুদ্ধার করবেন। তাই আলজেরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে ওরান পৌঁছে যান। হাসান পাশার পূর্ণ চেষ্টা ছিল যেন স্পেন থেকে সাহায্য আসার আগেই শহরটি জয় করা যায়, কিন্তু ২৬ দিন পর্যন্ত তীব্র অবরোধ ও যুদ্ধ সত্ত্বেও সফলতা আসেনি এবং এই সময়ের মধ্যে স্পেন থেকে একটি বিশাল নৌবহর ‘ওরান’ পৌঁছে যায়। হাসান পাশা বাধ্য হয়ে অবরোধ ত্যাগ করে পিছু হটেন।

হাসান পাশা আরও দুই বছর আলজেরিয়ায় অবস্থান করেন। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৭৩ হিজরি) তিনি মাল্টা অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৭৪ হিজরি) তাকে ইস্তাম্বুলে ডেকে পাঠানো হয়। ৫ মার্চ ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে (১৮ অক্টোবর ৯৭৯ হিজরি) তার মৃত্যু হয়। তিনি তার মহান পিতা খাইরুদ্দিন পাশার পাশে সমাহিত হন। [২]

মাল্টা অবরোধ:

উসমানীয় সালতানাতের সাথে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার লড়াই এবং যুদ্ধবিরতি চলতে থাকে। ১৫৫৫, ১৫৫৭ এবং ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে (৯৬২, ৯৬৪, ৯৬৯ হিজরি) একের পর এক যুদ্ধ ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

স্পেনের বাহিনী আলজেরিয়ার ওপর বারবার আক্রমণ করছিল যাতে তা পুনরায় নিজেদের দখলে নিয়ে ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। সুলাইমান তাদের জবাব দেওয়ার জন্য তিউনিসিয়া ও দক্ষিণ ইতালির মাঝে অবস্থিত মাল্টা দ্বীপ বিজয়ের সংকল্প করেন এবং...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩১৪, ৩১৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩০৭, ৩০৯

১৫৬৫ (৯৭১ হিজরি) সালে দুইশত জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌবহর পাঠানো হয়েছিল, যা চার মাস পর্যন্ত মাল্টা অবরোধ করে রেখেছিল। এরপর প্রচণ্ড শীত যুদ্ধকে অত্যন্ত কঠিন করে তোলে এবং উসমানীয় বাহিনীকে ফিরে আসতে হয়। [১]

ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধের ফলাফল

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিজের সিংহাসনে আরোহণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সুলাইমান আলিশান স্পেনের আধিপত্য রোধে সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি এতে সফলও ছিলেন। স্পেনের তাগুত পঞ্চম চার্লসকে তার চরম উন্নতির যুগে চরম অপমান ও পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সুলাইমান আলিশানের নায়েব ও হুকুমরা মধ্য ইউরোপে তাকে বারবার নতজানু হতে বাধ্য করেছিলেন। খায়রুদ্দিন পাশা ভূমধ্যসাগরে তার জাহাজগুলোকে ক্রমাগত পরাজিত করেছিলেন।

যদি এই সাহসী ও মহান ব্যক্তিত্বরা মুসলিম বিশ্বকে রক্ষা না করতেন, তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না যে স্পেনের বর্বর রাজনীতিতে বাকি মুসলিম বিশ্বেরও একই পরিণতি হতো যা আন্দালুসের মুসলমানদের হয়েছিল। কারণ যে এলাকাগুলো এই তাগুতি শক্তির প্রতিরোধ থেকে মুক্ত ছিল, সেখানে তারা পশুর মতো আচরণ করেছিল। ১৪৯২ সালের আগে শুধুমাত্র আমেরিকার ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের আগমনের আগে ৫০ লক্ষ মানুষ বাস করত। কিন্তু তথাকথিত বীররা সেখানে মানবতার এমন ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছিল যে ২২ বছর পর ১৫১৩ সালে এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ হাজার। এই স্প্যানিশ জাহাজগুলোই আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ বাসিন্দাদের বন্দী করে দাস হিসেবে আমেরিকায় নিয়ে যেত। সেখানে তাদের দিয়ে চাষাবাদ করানো, রাস্তা তৈরি করা, ভবন ও দুর্গ নির্মাণ এবং খনি ও নালা খননের মতো অত্যন্ত কঠোর ও অপমানজনক কাজ করানো হতো। খোদ আমেরিকার স্থানীয় বাসিন্দা, যাদের রেড ইন্ডিয়ান বলা হয়, তারা ছিল একটি বিশাল জনসংখ্যা যাদের গোত্র সংখ্যা ছিল শত শত। স্প্যানিশ বাহিনী তাদের দাস বানিয়ে জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিয়োজিত করেছিল। তাদের পশুর মতো হত্যা করা হতো এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। এই অসহায়দের প্রাণ বাঁচানোর একমাত্র উপায় ছিল ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করা। [২]

সুলাইমান আলিশানের পক্ষ থেকে প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা

পুরো বিশ্বে ক্যাথলিক ধর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার তাদের অমানবিক প্রচেষ্টার বিপরীতে, পঞ্চম চার্লসের নিজের ঘর ইউরোপে প্রোটেষ্ট্যান্ট মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার এমন এক কণ্ঠস্বর তুলেছিলেন যা উপাসনালয়গুলোতে অর্থের বিনিময়ে ক্ষমা বিক্রির প্রথাকে ভুল ঘোষণা করেছিল, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছিল এবং ধর্মীয় নেতাদের একচেটিয়া আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

এই আন্দোলন ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য খতম করে খ্রিস্টান জগতকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়। যদিও স্পেন, পর্তুগাল এবং ইতালিতে এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কিন্তু ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ায় একে থামানো যায়নি, বিশেষ করে জার্মানিতে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির দলে দলে এতে যোগ দিতে শুরু করেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৬৪৯

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ইলমাজ ওজতুনা: ১ / ২৮৬-২৮৭

দলে দলে এই ফেরকায় দাখিল হতে লাগল, যাতে চার্লস অত্যন্ত দুঃখিত ও রাগান্বিত হলেন। প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণকারী শাহজাদারা চার্লসের ক্রোধ থেকে বাঁচতে সুলাইমান আলিশানের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলেন এবং সুলাইমান আলিশান অত্যন্ত হিকমতের সাথে কাজ নিয়ে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা কবুল করে নিলেন।

প্রোটেষ্ট্যান্ট শাহজাদাদের দূত ইস্তাম্বুল সফর করে ইউরোপে ফিরে গেলে তার কাছে বাব-এ-আলীর ফরমান ছিল যাতে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণকারীদের সমর্থনের ঘোষণা করা হয়েছিল। এভাবে চার্লস পঞ্চম, যিনি প্রোটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনকে পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, নিজের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হলেন কারণ কঠোরতা অবলম্বনের ফলে জার্মানি সহ অনেক প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

নিজের বিশাল সাম্রাজ্যকে বিভক্তির হাত থেকে বাঁচাতে ১৩ অক্টোবর ১৫৫৫ (১৩ জিলকদ ৯৬২ হিজরি) তারিখে তিনি বাধ্য হয়ে আইনে প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মের সুযোগ দেওয়ার আইন মঞ্জুর করলেন।

ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিতে এটি চার্লসের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আত্মহত্যা ছিল, যা চার্লস নিজেও অনুভব করেছিলেন। এর কিছুদিন পর ১৬ জানুয়ারি ১৫৫৬ (২১ সফর ৯৬৩ হিজরি) তারিখে তিনি নিজের মুকুট ও সিংহাসন ছেড়ে দিলেন এবং নিজের পুত্র ফিলিপকে শাসনভার অর্পণ করে নির্জনবাস গ্রহণ করলেন। [১]

সুলাইমান আলিশানের সাফল্য:

যদি বলা হয় যে সুলাইমান আলিশান চার্লসের সাথে লড়া ৩৫ বছর দীর্ঘ যুদ্ধে এমন স্পষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে খোদ চার্লসকে পরাজয় স্বীকার করে নিজের সিংহাসন ছাড়তে হয়েছিল, তবে তা ভুল হবে না।

প্রোটেষ্ট্যান্ট চার্চকে মান্যকারী সমস্ত খ্রিস্টান শাসকদের উসমানীয় সালতানাত এবং বিশেষ করে সুলাইমান আলিশানের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ তিনি যদি ক্যাথলিক স্পেন এবং রোমের পোপের জুলুম ও জবরদস্তির বিরুদ্ধে প্রোটেষ্ট্যান্ট ফেরকাকে সমর্থন না করতেন, তবে স্পেন ও জার্মানির রাজশক্তি অনায়াসেই এই আন্দোলনের গলা টিপে ধরত।

ইরানিদের সাথে সংঘাত

সফভী সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা শাহ ইসমাইল সফভী, সুলাইমান আলিশানের পিতা সেলিম আউয়ালের কাছে চালদিরানের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেছিলেন। এরপর তিনি দুঃখ ও কষ্টে দগ্ধ হয়ে ২৩ মে ১৫২৪ (৪ রজব ৯৩০ হিজরি) তারিখে ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তার স্থলে তার ১০ বছর বয়সী উত্তরসূরি শাহ তাহমাস্প আউয়াল সিংহাসনে বসেন। এটি সুলাইমান আউয়ালের শাসনামলের ঘটনা ছিল।

ইরানিরা ক্রমাগত উসমানীয়দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যখন ১৫৩২ (৯৩৯ হিজরি) সালে সুলাইমান আলিশান অস্ট্রিয়া অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, ইরানিরা পুনরায় তাবরিজ দখল করে নেয়। সুলাইমান ইরাকে সৈন্য পাঠিয়ে বাগদাদও দখল করে নেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৮৭, ২৮৮। নির্জনবাস গ্রহণের পৌনে তিন বছর পর সেপ্টেম্বর ১৫৫৮ সালে তার মৃত্যু হয়।

তারপর তিনি তুরস্কের উত্তর সীমান্তে সৈন্য নিয়ে আসেন এবং উসমানীয়দের সমর্থক গোত্রীয় সর্দারদের সাথে মেলান। সীমান্তবর্তী রাজ্য ‘বিতলিস’ (Bitlis)-এর শাসক শরীফ বেগ বিচ্যুত হয়ে ইরানের অনুগত হয়ে যান। সুলাইমান তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উজির-এ-আজম ইব্রাহিম পাশাকে দায়িত্ব দেন। তিনি আজারবাইজানের শাসক শামসুদ্দিনকে, যিনি ইরানের সমর্থক ছিলেন, নিজের সাথে মিলিয়ে নেন। শামসুদ্দিন বিদ্রোহী শরীফ বেগের কাজ শেষ করে দেন। [১]

তাবরিজ পুনরায় বিজয়, বাগদাদ দখল:

১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দ (৯৪০ হিজরি)-এর বসন্তকালে ইব্রাহিম পাশা বিদ্রোহী রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। অবশেষে তিনি তাবরিজের ওপর আক্রমণ করেন এবং কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই ১৩ জুলাই ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ (১ শাওয়াল ৯৪০ হিজরি)-এ তা জয় করে নেন। এরপর তাবরিজ আর কখনো ইরানের রাজধানী হতে পারেনি। কয়েক মাস পর সুলতান সুলাইমান আলিশানও, যিনি অস্ট্রিয়ার সাথে সন্ধির পর যুদ্ধ থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তাবরিজে পৌঁছে যান।

ইব্রাহিম পাশা লশকর সাথে নিয়ে উত্তর ইরানের সুলতানিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন যেখানে শাহ তাহমাস্পের শিবির ছিল। এটি গিলানের পূর্বে অত্যন্ত দুর্গম এবং পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। পথে প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয় এবং কাদা চলাচলের পথকে কঠিন করে তোলে। সুলাইমান বাধ্য হয়ে সুলতানিয়া ছেড়ে ইরাকের দিকে যাত্রা করেন এবং ৩১ ডিসেম্বর ১৫৩৪ খ্রিষ্টাব্দ (১৩ জমাদিউল আখিরা ৯৪১ হিজরি)-এ কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই বাগদাদ তুর্কিদের দখলে চলে আসে।

সুলতান সুলাইমান আলিশান এখানে চার মাস অবস্থান করে অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করেন। ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর মাজার ছাড়াও নাজাফে হযরত আলী আল-মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কারবালায় হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাজার জিয়ারত করেন। [২]

ইরানের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ:

সাফাভীরা এরপরও উসমানীয় সালতানাতেঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। শাহ তাহমাস্প তুর্কিদের বিরুদ্ধে স্পেন ও জার্মানির সাথে জোট গঠন করেছিলেন। উত্তর ইরানের ককেশাস, দাগেস্তান এবং শিরওয়ানের সুন্নি মুসলমানদের জোরপূর্বক শিয়া হতে বাধ্য করা হচ্ছিল। এই সুন্নি মুসলমানদের ফরিয়াদে উসমানীয় আমিররা সৈন্য পরিচালনা করে ইরানিদের পেছনে হটিয়ে দেন এবং ওই এলাকাগুলো উসমানীয় খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

অন্যদিকে শিয়া দাঈরা গোপনে তুরস্কে সক্রিয় ছিল এবং মানুষের কাছ থেকে তাহমাস্পের জন্য বায়আত নিয়ে তাদের উসমানীয় সালতানাতেঁর বিদ্রোহী বানাচ্ছিল। এই ফিতনা এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে তুরস্কের অনেক শহরের হাজার হাজার সহজ-সরল মানুষ এর শিকার হয়েছিল। এমনকি তাদের ওপর এটি আবশ্যিক করা হয়েছিল যে তারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ‘নজর-ও-নিয়াজ’ হিসেবে পেশ করবে। এই সমস্ত অর্থ ইরানে পাঠানো হতো। তুর্কি শাসকরা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের খবর পাচ্ছিলেন কিন্তু কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে আইনে কাউকে পাকড়াও করা সম্ভব ছিল না।

[১] আদ-দাওলাতুল আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২২২।

[২] আদ-দাওলাতুল আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২২২, ২২৪; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩৩৯, ৩৪৬।

শান্তি দেওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, তাই তুর্কি শাসকরা সতর্কতা অবলম্বন করছিলেন। অবশেষে যখন সেনাবাহিনীতেও শিয়া দাঈদের তৎপরতা শুরু হলো, তখন ধৈর্যের আর কোনো অবকাশ রইল না। সুলাইমান আলিশান এমন ৪০ জন সৈন্যকে, যাদের বিরুদ্ধে ইরানের শাহের প্রতি আনুগত্যের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল, হত্যা করালেন এবং এরপর ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে (৯৫৫ হিজরি) ইরানের দিকে অগ্রসর হলেন। তাহমাস্প মোকাবিলার সাহস করতে পারল না এবং পালিয়ে গেল। তুর্কি আমিররা তাবরিজ এবং এর আশপাশের কিছু দুর্গের ওপর দখল মজবুত করে নিলেন। এই অভিযান থেকে ফেরার পথে সুলাইমান আলিশান সিরিয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা জরুরি মনে করলেন এবং কিছু সময় আলেপ্পোতে অতিবাহিত করলেন। [১]

ইরানের ওপর তৃতীয় হামলা

উসমানীয়দের অসতর্ক মনে করে ইরানের শাহ সীমান্তবর্তী দুর্গসমূহ: আজমিশ, এরজুরুম এবং আখলাত দখলের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। এই খবর শুনে ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৬০ হিজরি) সুলাইমান আলিশান ইরানের ওপর তৃতীয়বারের মতো সসৈন্যে অভিযান চালান। এই সময় সুলাইমানের বয়স ছিল ৫৮ বছর। এই অভিযানে শাহজাদা সেলিম এবং বায়েজিদও শরিক ছিলেন। ইরানের শাহ এবারও মোকাবিলায় না এসে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর যে ফয়সালা হলো, তা “আমাসিয়া চুক্তি” নামে পরিচিত। এতে একে অপরের সীমানায় হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করা হলো। সীমান্তবর্তী সীমানা নির্ধারিত হলো যা আজও ইরান ও তুরস্কের মধ্যে বিদ্যমান। এই শান্তি পরবর্তী ৩৩ বছর পর্যন্ত বজায় ছিল। [২]

বিদ্রোহ এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যা

সুলাইমান আলিশানের শাসনকাল যদিও সামগ্রিকভাবে সফল এবং শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর সালতানাত ছিল অত্যন্ত বিশাল এবং শাসনকালও দীর্ঘ। তাই এই সময়ে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলাও করতে হয়েছে। অনেককে হত্যা করা হয়েছে।

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর জানবারদি আল-গাজালির বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। তবে তাঁর জেনারেল রাহাত পাশা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এই বিদ্রোহ দমন করেন। গাজালি দামেস্কে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ৭ সফর ৯২৭ হিজরি (২৭ জানুয়ারি ১৫২১ খ্রিস্টাব্দ) এর চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। [৩]

১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে (৯২৯ হিজরি) তিনি আহমদ পাশাকে মিসরের আমির নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুকাল পর আহমদ পাশা বিদ্রোহ করে মিসরকে স্বাধীন করার চেষ্টা করেন। ফলে তিনি কেন্দ্রের এক অনুগত জেনারেল মুহাম্মদ বেগের হাতে নিহত হন। তাঁর স্থলে কাসিম পাশাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। [৪] [৫]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩৪৪-৩৪৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩৪৬-৩৪৭; তারিখে উসমানি, উজুন চারশিলি: ২/৩৮৭।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ১৯৮।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২০৬।

[৫] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২০৭।

ইয়েনি চেরি বাহিনীর অবাধ্যতা এবং তার প্রতিকার:

ইয়েনি চেরি বাহিনী, যা উসমানীয় সুলতানদের তরবারি চালনাকারী বাহু ছিল, অত্যন্ত স্বাধীন ও অবাধ্য হয়ে উঠছিল। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৩০ হিজরি) সালতানাতের প্রধান উজির এবং সুলাইমান আলিশানের ভগ্নিপতি ইব্রাহিম পাশাকে মিশরে পাঠানো হয়েছিল যাতে সেখানকার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যায়। এই সময়ে ইস্তাম্বুলে ইয়েনি চেরি বাহিনী হাঙ্গামা শুরু করে এবং ইব্রাহিম পাশার প্রাসাদ ছাড়াও ইহুদিদের পাড়া এবং বেশ কিছু ভবন লুট করে। সুলাইমান নিজেই সেখানে পৌঁছে ইয়েনি চেরি জোয়ানদের থামান এবং একটি ভাষণ দিয়ে তাদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেন। তাদের শান্ত করার জন্য তাদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিতরণ করেন। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসার পর লুটপাটের সাথে জড়িত ইয়েনি চেরি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন যারা এই হাঙ্গামার মূল অপরাধী ছিল, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [১]

তাতারি রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্তি, উসমানীয় খিলাফতের সীমানা মস্কো পর্যন্ত:

কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ক্রিমিয়া অঞ্চলের এলাকাগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যের মর্যাদায় ছিল। সেখানকার শাসকরা চেঙ্গিস খানের বংশধর ছিলেন এবং বাব-ই-আলিকে খরাজ প্রদান করতেন। তারা রুশ বাহিনীর জন্য ছিল খাপমুক্ত তলোয়ার। তাদের শাসক কিরাই খান, যিনি ৩৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন, ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে (৯২০ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। তার উত্তরসূরিরা ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে (৯২৭ হিজরি) রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে মস্কো তখনই করে দেয়। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে (৯২৮ হিজরি) আস্ত্রাখান, ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৩০ হিজরি) “গোরকি” এবং ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৩ হিজরি) মস্কোর দক্ষিণ-পূর্ব শহর “রিয়াজান”কেও পদানত করে নেয়।

তবে এই উপজাতীয় সরদারদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বও বাড়ছিল। সুলাইমান তাদের বহাল রেখেই এই এলাকাগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। শাসনভার যদিও চেঙ্গিসীয় সরদারদের কাছেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তবে কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষমতা খলিফা নিজের হাতে নিয়ে নেন। এভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমানা মস্কোর উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [২]

উসমানীয় খিলাফত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ক্রমবর্ধমান হুমকির মোকাবিলায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং এই ধারাবাহিকতায় মধ্য আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে অবস্থিত এলাকাগুলোর দিকেও মনোযোগ দেয়। এই প্রচেষ্টার ফলে উত্তর নাইজেরিয়ার একটি বিশাল রাষ্ট্র বোর্নো (বোর্নোয়ান) উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়। এটি ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ (৯৫৭ হিজরি) সময়ের ঘটনা।

সুলাইমান আলিশানের মৃত্যু:

অস্ট্রিয়ার রাজা ফার্ডিনান্ড ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে (৯৭১ হিজরি) মারা যান। তার উত্তরসূরি ম্যাক্সিমিলিয়ান সিংহাসনে আরোহণের পর হাঙ্গেরিতে আক্রমণ শুরু করেন। সুলাইমান আলিশান গাঁটে বাত রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেই এই অভিযানে যান এবং “সিগেটভার” নামক শহর অবরোধ করে...

[১] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানিয়া, লেখক: মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ২০৮

[২] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানিয়া, লেখক: মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ২০৭, ২০৮; তারিখুদ দাওলাতুল উসমানিয়া, লেখক: ইলমাজ ওজতুনা: ২৬৫/১

অস্টিয়ার ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করলেন। এটি ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের (৯৭৩ হিজরির শেষভাগ) ঘটনা। [১]

এই অবরোধ পাঁচ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে সুলাইমানের অসুস্থতা বেড়ে যায়। অবশেষে রণক্ষেত্রেই ২০ সফর ৯৭৪ হিজরি (৫ সেপ্টেম্বর ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে এই মহান মুসলিম শাসক প্রাণ ত্যাগ করেন।

দুনিয়ায় ফাগফুরের প্রতাপ হোক বা কায়সারের শান-শওকত,
শত্রু মৃত্যুর আক্রমণ কখনো শেষ হতে পারে না।
বাদশাহদেরও জীবন-ফসলের প্রাপ্তি হলো কবর,
মহত্বের পথের শেষ গন্তব্য যেন এই কবর। [২]

শত্রুর সাহস বেড়ে যাওয়া এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে কোনো বিদ্রোহের আশঙ্কার কথা বিবেচনা করে তাঁর মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়। তাঁর ইন্তেকালের তিন দিন পর ৮ সেপ্টেম্বর সিগেটভার শহর বিজিত হয়। [৩]

সুলাইমান আলিশানের কীর্তি ও সংস্কারসমূহ:

সুলাইমান আলিশানের শাসনকাল প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যাপী ছিল। এই সময়ে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সুসংহতকরণে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর শাসনপদ্ধতি, সংস্কার, চরিত্র ও কীর্তিসমূহের একটি পর্যালোচনা নিচে তুলে ধরা হলো:

- ১. তিনি অমুসলিমদের ওপর জুলুম করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। যুদ্ধাবস্থা ছাড়া তিনি কারো বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করতেন না। নিজের সৈন্যদের এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত রাখতে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। মলদাভিয়া অভিযানে তাঁর দুই সৈন্য খ্রিস্টানদের একটি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। সুলাইমানের কাছে অভিযোগ পৌঁছালে তিনি উভয়কে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই ঘটনা ইউরোপের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। [৪]
- ২. সুলাইমান আলিশান তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন, যার জন্য তাঁকে সেনাবাহিনীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের সময় সৈন্য সংখ্যা তিন লাখে পৌঁছেছিল। তিনশ কামান এবং তিনশ যুদ্ধজাহাজ সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হতো।
- ৩. তিনি কেবল বিজয়ের ওপরই নয়, বরং রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ওপরও পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য প্রচুর নতুন আইন প্রণয়ন করেন, যার কারণে তাঁকে ‘সুলাইমান আল-কানুনী’ও বলা হয়।
- ৪. তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে ‘২১’টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন, প্রতিটি প্রদেশকে ‘বিলায়াত’ বলা হতো। প্রতিটি বিলায়াত আবার জেলায় বিভক্ত ছিল, প্রতিটি জেলাকে ‘সানজাক’ বলা হতো। তাঁর সময়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের জেলার সংখ্যা ছিল ‘২৫০’।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪৯, ২৫০।

[২] আল্লামা ইকবাল।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪৯।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়ায়হ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/২৭৭।

৫. তিনি নৌবাহিনীর জানবাজদের নতুন করে বিন্যস্ত করেন। পারফরম্যান্স ও সেবার ভিত্তিতে তাদের তিনটি স্তরে বিভক্ত করেন এবং এই বাহিনীর সংখ্যা বারো হাজারে উন্নীত করেন। [১]

৬. তিনি সেনাবাহিনীর একটি পৃথক বিভাগ গঠন করেন যেখানে বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত এবং অক্ষম সৈন্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হতো। তাদের হালকা দায়িত্ব অর্পণ করা হতো যাতে তারা একেবারে বেকার হয়ে না পড়ে এবং তাদের জীবিকার ধারাও অব্যাহত থাকে।

৭. তাঁর যুগে উসমানীয় সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধ শিল্প ইউরোপের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিল।

৮. জায়গির বণ্টনের ফলে অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। সুলাইমান এই ব্যবস্থাতেও সংস্কার সাধন করেন। ছোট ছোট জায়গির একত্রিত করে বড় জায়গির তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বড় জায়গির বণ্টনের ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন কঠোর করা হয়েছিল। কোনো জায়গিরদারের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য জায়গির বণ্টনের জন্য খলিফার অনুমতি নেওয়া আবশ্যিক ছিল। তিনি আইন করেছিলেন যে কোনো জায়গির একটি নির্দিষ্ট সীমার কম হবে না। এই সীমার বাইরে জায়গির বণ্টন অবৈধ হবে।

৯. স্থাপত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর আমলে সুউচ্চ সুলাইমানিয়া মসজিদ নির্মিত হয়, যা তুর্কি স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। ইস্তাম্বুল ছাড়াও তাঁর নির্দেশে বাগদাদ, কনিয়া এবং অন্যান্য শহরেও অনেক মসজিদ নির্মিত হয়। পুরাতন মসজিদগুলো মেরামত করা হয়, সকল শহরে চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল খোলা হয় এবং ইস্তাম্বুলে একটি খাল খনন করা হয়। নতুন সেতু নির্মাণ করা হয়।

১০. সুলাইমান কেবল একজন মহান সেনাপতিই ছিলেন না, বরং একজন বিজ্ঞ আলেম এবং শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি তাঁর দৈনন্দিন ঘটনাবলী ডায়েরি আকারে লিপিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই ধারা যুদ্ধের সময়ও অব্যাহত থাকত।

১১. তিনি সর্বদা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের কদর করতেন এবং তাঁদের উচ্চ পদে আসীন করতেন। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি আরও উন্নত করেন। মুফতির বেতন অন্যান্য সকল কর্মকর্তার চেয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

১২. তিনি নৌ শক্তিকে এতটাই বৃদ্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় জাহাজগুলোর চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৩. তিনি ‘আহলে সাইফ’-দের যোগ্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। খায়রুদ্দিন পাশা, সিদি আলী, পিরি রইস এবং উজির-এ-আজম ইব্রাহিম পাশা তাঁর প্রখ্যাত জেনারেল ছিলেন।

১৪. উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে মুহাম্মদ ফাতেহ-এর পর তাঁকে সবচেয়ে মহিমাম্বিত ও প্রভাবশালী শাসক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ইতিহাস তাঁকে সুলাইমান আলিশান এবং সুলাইমান আজম উপাধিতে স্মরণ করে। তিনি বেলগ্রেড, রোডস, হাঙ্গেরি, ইরান এবং অস্ট্রিয়ায় দুর্দান্ত বিজয় অর্জন করেন। ভিয়েনা অবরোধ ব্যতীত তিনি সবখানেই সফল হয়েছিলেন। তাঁর আমলে উসমানীয় খিলাফত সাতটি সমুদ্র জুড়ে বিস্তৃত ছিল, যার মধ্যে কৃষ্ণ সাগর, পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর, মারমারা সাগর, আরব সাগর এবং অ্যাড্রিয়াটিক সাগর অন্তর্ভুক্ত।

[১] ফী উসুল আল-তারিখ আল-উসমানি, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা, পৃষ্ঠা ৭৩, দার আল-শুরুক।

তিন মহাদেশ: এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে খিলাফতের পতাকা উড়ছিল। এই খিলাফত উত্তর-দক্ষিণে দানিউব নদী থেকে দজলা নদীর মোহনা পর্যন্ত এবং পূর্ব-পশ্চিমে আজারবাইজান থেকে আলজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [১]

সুলাইমান আলিশানের কিছু কঠোর পদক্ষেপ যার সমালোচনা করা হয়েছে:

সুলাইমান আলিশানের জীবনীতে এমন কিছু সিদ্ধান্তও রয়েছে যা একটি পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দামানের ওপর দাগের মতো। এই মহান মর্যাদাবান খলিফাকে দিয়ে এমন কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ানোর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা ছিল তাঁর ইউক্রেনীয় স্ত্রী হররামের, যার আসল নাম ছিল রোজ্জেলানা। [২]

তিনি ছিলেন নাস্তিক ইহুদি এবং জাতিগতভাবে রুশ (ইউক্রেনীয়)। ত্রিমিয়া প্রদেশের মুসলিম তাতাররা এক অভিযানের সময় তাঁকে বন্দি করেছিল এবং পরে দাসী হিসেবে উপহারস্বরূপ সুলাইমান আলিশানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সুলাইমান আলিশান তাঁকে বিয়ে করেন। এই রূপবতী ইহুদি বংশোদ্ভূত মেয়েটি সুলাইমান আলিশানের প্রিয় রানি হয়ে তাঁর মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। [৩]

হররামের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁর সন্তান ছাড়া আর কেউ যেন সালতানাতের উত্তরাধিকারী না হয়। তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা, অলক্ষ্য এবং গোপন কৌশলের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে এই লক্ষ্য সামনে রেখে চাল চালেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের উদ্দেশ্যে সফল হন। এটি ভিন্ন কথা যে, এর কারণে সুলাইমান আলিশানের মতো ব্যক্তির দামান কলঙ্কিত হয়েছে।

যে সময়ে এই খেলার সূচনা হয়, তখন সুলাইমানের বড় ছেলে মুস্তফা তাঁর যোগ্যতার কারণে পুরো দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও প্রিয় ছিলেন এবং খলিফা আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। হররাম তাঁর পরিবর্তে নিজের বড় ছেলে মুহাম্মদকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের সন্তানকে উত্তরাধিকারী বানানোর বেআইনি পরামর্শ দিয়ে খলিফার নজরে নিজেকে ছোট করতে চাননি। হ্যাঁ, উজির-এ-আজমকে বশীভূত করে তাঁর মাধ্যমে এই কাজ অবশ্যই করানো যেত, কিন্তু তখন উজির-এ-আজমের পদে খলিফার ভগ্নিপতি ইব্রাহিম পাশার মতো একজন সতর্ক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পুরো রাষ্ট্রের ব্যবস্থা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছিলেন। হররাম জানতেন যে, তিনি কখনোই তাঁর হাতের পুতুল হবেন না। তিনি এমন একজন ব্যক্তির সন্ধানে ছিলেন যাকে উজির-এ-আজম পদে বসিয়ে তাঁর মাধ্যমে খলিফাকে নিজের পছন্দমতো পথে পরিচালিত করা যায়। [৪]

তিনি রাজনীতির দাবার গুরুত্বপূর্ণ ঘূঁটি ‘সদরে আজম’-এর স্থলে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে আনার জন্য নিজের মেয়ের বিয়ে রুস্তম পাশা নামক এক আমিরের সাথে করিয়ে দেন। এভাবে রুস্তমের জন্য সর্বোচ্চ পদমর্যাদা এবং হররামের জন্য রাজনীতির বিষয়ে নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত নেওয়ানোর পথ সুগম হয়ে যায়। [৫]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫০, ২৫২; উসমানি তুর্ক: পৃষ্ঠা ৯৪ থেকে ৯৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩০।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ৫৩, তাবা আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৩০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওর্তায়লি: ৯/৩৭৮।

[৫] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ৫৩, তাবা আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত।

এরই মধ্যে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে যে খুররমের বড় ছেলে শাহজাদা মুহাম্মদ, যিনি মানিসার গভর্নর ছিলেন, মারা যান। এরপর খুররম খলিফার কাছ থেকে তার ছোট ছেলে সেলিমের জন্য উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার সংকল্প করেন।

তিনি উজির-এ-আজম ইব্রাহিম পাশার বিরুদ্ধে সুলতান সুলাইমানের কান ভারী করতে শুরু করেন। এভাবে সুলাইমান এই শ্রেষ্ঠ উজিরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েন। তিনি নিশ্চিত হন যে, সেনাবাহিনী ও প্রশাসনে ইব্রাহিম পাশার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতটাই বেড়ে গেছে যে তিনি যেকোনো সময় তার তখত উল্টে দিতে পারেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৪১ হিজরি) সফবিদের বিরুদ্ধে তাবরিজ অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ইব্রাহিম পাশার ক্ষমতা ও শান-শওকত আরও বৃদ্ধি পায়, যা সুলতান সুলাইমান আলিশানের সন্দেহকে আরও জোরালো করে। অবশেষে তিনি ইব্রাহিমকে হত্যা করান। এটি ২২ রমজান ৯৪২ হিজরি (৩০ মার্চ ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

ইব্রাহিম পাশার বারো বছরের উজিরতির পর মাত্র আট বছরে তিনজন উজির-এ-আজম: আয়াজ মুহাম্মদ পাশা, লুৎফি পাশা এবং সুলাইমান পাশা পরিবর্তিত হন। এরপর রানী খুররমের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার জামাতা রুস্তম পাশা এই পদে আসীন হন, যিনি তার প্রতিটি কথায় সায় দিতেন।

রানী তাকে ব্যবহার করে খলিফাকে উত্তরাধিকারী শাহজাদা মুস্তফার প্রতি আস্থাহীন করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। যদিও উত্তরাধিকারী তার সাহসিকতা ও সচ্চরিত্রের কারণে ইয়েনিচেরি বাহিনী এবং সাধারণ ও বিশিষ্টজনদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু খলিফাকে এই পর্যন্ত বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, তিনি ইরানের শাহের প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত এবং গোপনে শিয়া হয়ে গেছেন।

যখন ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৬০ হিজরি) ইরান আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত করা হয় এবং শাহজাদা মুস্তফাকে সেনাবাহিনীর একটি অংশের নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তখন রানী খুররমের কৌশল অনুযায়ী রুস্তম পাশা খলিফাকে এই বিশ্বাস করান যে, শাহজাদা মুস্তফা ইরানের শাহ এবং ইয়েনিচেরি বাহিনীর সহায়তায় তখত উল্টে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এই অভিযোগ জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে এবং সুলাইমান আলিশান শাহজাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন। এটি ৬ নভেম্বর ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দ (২৭ জিলকদ ৯৬০ হিজরি) এর ঘটনা। এতে পুরো দেশে শোক ও অস্থিরতার ঢেউ বয়ে যায়। ইয়েনিচেরি বাহিনী তীব্র প্রতিবাদ করে এই দুর্ঘটনার প্রধান অপরাধী রুস্তম পাশাকে পদচ্যুত করায়, কিন্তু রানীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারেনি।

মুস্তফার হত্যার পর সুলতান সেলিমের উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। এভাবে রানী খুররমের ইচ্ছা পূরণ হয়। [২]

খুররম তার জামাতা রুস্তম পাশার উজির-এ-আজম পদ থেকে বরখাস্ত হওয়াও সহ্য করতে পারেননি। তিনি সুলতানকে নতুন উজির-এ-আজম আহমদ পাশার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করেন, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সুলাইমান আলিশান আহমদ পাশাকেও হত্যা করান, এভাবে রুস্তম পাশা পুনরায় উজির-এ-আজম হন। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ২৩০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ৩৪৯, ৩৭৮

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ৩৪৯, ৩৫০, ৩৬১

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ২৫৭

কয়েক বছর পর সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র বায়েজিদের পরিণতিও অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল। সালতানাতের একজন প্রভাবশালী আমীর বায়েজিদকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে, সেলিম কোনোভাবেই উত্তরাধিকারী হওয়ার যোগ্য নন, কারণ তিনি ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকেন। সেই আমীর বায়েজিদকে প্ররোচিত করে তার কাছ থেকে এমন কিছু চিঠি লিখিয়ে নিয়েছিলেন যাতে কেবল সেলিমের বিরুদ্ধেই নয়, বরং সুলতানের বিরুদ্ধেও অশোভন উক্তি ছিল। সুলাইমানের কাছে এই চিঠিগুলো পৌঁছালে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান এবং বায়েজিদকে নিজের দরবারে তলব করেন।

বায়েজিদ মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে উপস্থিত হননি। যখন তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠানো হলো, তখন তিনি তার অনুগত সৈন্যদের নিয়ে মোকাবিলা করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে সপরিবারে ইরানে পালিয়ে যান এবং সফভী শাহ তাহমাস্পের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে সুলাইমান চাপ সৃষ্টি করে তাহমাস্পকে বাধ্য করেন যাতে তিনি বায়েজিদ ও তার পরিবারকে ইস্তাম্বুলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। বায়েজিদ যখন ফিরে এলেন, তখন তাকে তার চার পুত্র: ওরখান, মাহমুদ, আবদুল্লাহ এবং উসমানসহ ফাঁসি দেওয়া হয়। এটি ১৫ মহরম ৯৬৯ হিজরি (২৫ সেপ্টেম্বর ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

নিঃসন্দেহে এই ঘটনাগুলোতে সুলাইমান আলিশানের সিদ্ধান্তগুলো ভুল ছিল। কিন্তু এটিও বাস্তবতা যে, কোনো মানুষই গায়েবের খবর জানে না। শাসক হোক বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, তিনি তার কাছে থাকা তথ্যের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেন। মাঝে মাঝে তথ্য ভুল থাকে, তাই অনিবার্যভাবে সিদ্ধান্তও ভুল হয়ে যায়। সুলাইমান নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তার কাছে বিদ্রোহ ছিল একটি অমার্জনীয় অপরাধ যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। তাই তিনি নিজের পক্ষ থেকে ইনসাফেরই প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, নিজের সন্তানের বিদ্রোহকেও ক্ষমা করেননি। যদিও বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে এই সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল।

আমরা সুলাইমান আলিশান বা অন্য কোনো শাসকের ভুল পদক্ষেপের অহেতুক কোনো অজুহাত পেশ করতে চাই না। তা সত্ত্বেও এটি স্বীকার করতে হবে যে, এই কয়েকটি ঘটনা ছাড়া এই মহান খলিফার চরিত্রে খুঁত ধরার মতো আর কোনো অবকাশ খুঁজে পাওয়া যায় না।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৪৬।

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

পঞ্চম খণ্ড

সুলতান সেলিম খান সানি বিন সুলাইমান আউয়াল

৯৭৪ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি

(১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান সেলিম খান সানি তাঁর পিতা সুলাইমান আলিশানের মৃত্যুর পর খিলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি ৯৩০ হিজরি (১৫২৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন সুলাইমান আলিশানের ইহুদি বংশোদ্ভূত রুশ রানী রোকেলানা (খুররম), যাঁর কৌশল ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে সেলিম খান অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত হন।

সেলিম খান সানি ছয় বছর কারামান (লারেন্দা), চৌদ বছর সারুখান (মানিসা) এবং পাঁচ বছর কুতাহিয়ার ওয়ালি ছিলেন। সুলাইমান আলিশান যুবরাজ মুস্তফার হত্যার পর ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মৃত্যুর ২৩ দিন পর ৫ জমাদি-উল-আউয়াল ৯৭৪ হিজরি (৩০ সেপ্টেম্বর ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বছর।

সেলিম খান সানি যদিও মহিমা ও শৌর্যে তাঁর পিতার সমকক্ষ ছিলেন না, তবুও পূর্ববর্তী যুগের শাসনতান্ত্রিক প্রভাব ও প্রতাপ তখনও অবশিষ্ট ছিল। এই যুগের সাফল্যগুলো মূলত প্রধান উজির মুহাম্মদ পাশার কাছে ঋণী ছিল, যিনি অত্যন্ত যোগ্যতা, তৎপরতা ও সাহসিকতার সাথে সাম্রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। [১]

ইয়েমেনের সমস্যা:

শিয়াদের সমস্ত ফিরকার মধ্যে জাইদিরা মধ্যপন্থী। তারা সাহাবীদের গালিগালাজ করে না এবং তাদের ইমামদের নিষ্পাপ হওয়ার বিশ্বাসও পোষণ করে না। ইয়েমেনে শতাব্দীকাল ধরে জাইদি শিয়া ইমামদের শাসন ছিল, যাদের আহলে সুন্নাতের কাছেও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো। দীর্ঘকাল ধরে ইয়েমেন আইনত উসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি করদ রাজ্য ছিল। যেহেতু সেই দিনগুলোতে ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজ নৌবাহিনীর আধিপত্যের কারণে এই বিপদের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে, তারা যেকোনো সময় ইয়েমেন দখল করে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী তুর্কিদের পথ বন্ধ করে দেবে, তাই ইয়েমেনের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো তুর্কি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা জরুরি ছিল। কিন্তু ইয়েমেনের জাইদি ইমামরা তাদের এলাকায় তুর্কিদের হস্তক্ষেপের পক্ষে ছিলেন না। এ কারণে ইমাম আল-মুতাহার বিন শরফউদ্দিন বিদ্রোহ করেন। সেলিম সানির নির্দেশে উসমান পাশা ও সিনান পাশা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইয়েমেনে পৌঁছান। এক দীর্ঘ অভিযানের পর, জাইদি...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়ায়্যাহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫৫।

ইমাম আল-মুতাহার-এর বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে এডেন এবং সানআ জাইদিদের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হলো। ইমাম আল-মুতাহার উত্তর ইয়েমেন থেকে দক্ষিণের দিকে যেতে বাধ্য হলেন, যেখানে তিনি কুবান দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। অবশেষে ৯৭৮ হিজরি (৩১ মার্চ ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ) এই দুর্গটিও জয় করা হলো। যদিও জাইদিরা উসমানীয় বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করেছিল, কিন্তু ইমাম আল-মুতাহারের ধর্মীয় অবস্থান এবং সুখ্যাতির কথা বিবেচনা করে তাকে কোনো ক্ষতি পৌঁছানো হয়নি। ইমাম আল-মুতাহার খলিফার আনুগত্যের চুক্তি করেন এবং এই অভিযান সমাপ্ত হয়। [১]

সাইপ্রাস বিজয়:

ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সাইপ্রাস ৮২৮ হিজরি (১৪২৩ খ্রিস্টাব্দ) থেকে মিশরের মামলুকদের করদ রাজ্য ছিল। এখানকার শাসকরা ছিলেন খ্রিস্টান যারা মামলুকদের কর প্রদান করতেন। পরবর্তীতে এখানে ভেনিস প্রজাতন্ত্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এই সরকারও মামলুকদের কর প্রদান অব্যাহত রাখে। এরপর যখন প্রথম সুলতান সেলিমের যুগে উসমানীয়রা মিশরের মামলুকদের পতন ঘটাল, তখন সাইপ্রাসের শাসকরা বাব-ই আলীকে কর প্রদান করতে শুরু করল। তবে এর পরে যখন ভেনিসের সাথে যুদ্ধ শুরু হলো, তখন সাইপ্রাস ইস্যুটি উভয় দেশের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই খলিফা দ্বিতীয় সেলিম সাইপ্রাসকে আনুষ্ঠানিকভাবে দখল করা জরুরি মনে করলেন।

দ্বিতীয় সেলিমের নির্দেশে লালা মুস্তাফা পাশার নেতৃত্বে ৯৭৭ হিজরি জিলহজ (১৫ মে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এক লক্ষ সৈন্য, যার মধ্যে ৬০ হাজার পদাতিক ছিল, ইস্তাম্বুল থেকে সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। তুর্কি নৌবহর ২ মহরম ৯৭৮ হিজরি (১ জুলাই ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) সাইপ্রাসের উপকূল “লিমাসোল”-এ নোঙর করল। ৩০ মহরম (৩ জুলাই) লার্নাকা এবং ৫ সফর কাইরেনিয়া (গিরনে) দখল করা হলো।

এক সপ্তাহের অবরোধের পর ৮ রবিউস সানি (৯ সেপ্টেম্বর) দ্বীপের রাজধানী “নিকোসিয়া” জয় করা হলো। সাইপ্রাসের গভর্নর “নিকোলো ড্যাভোলো” যুদ্ধে নিহত হন। শক্তিশালী দুর্গ শহর “ফামাগুস্তা” দীর্ঘ অবরোধের পর ১০ রবিউস সানি ৯৭৯ হিজরি (১ সেপ্টেম্বর ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ) জয় করা হলো। সামগ্রিকভাবে তুর্কি বাহিনী এই দ্বীপে তেরো মাস পর্যন্ত যুদ্ধ করে। অবশেষে পুরো দ্বীপটি জয় করা হলো। সেখানে উসমানীয় খিলাফতের পক্ষ থেকে লালা মুস্তাফা পাশাকে আমির নিযুক্ত করা হলো। তিনশ বছর (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এই দ্বীপ তুর্কিদের অধীনে ছিল। [২]

ইন্দোনেশিয়ার বিষয়:

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে “আচেহ” নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্র ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ (৯২০ হিজরি) থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ (১৩২১ হিজরি) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা উত্তর সুমাত্রা এবং মালয়েশিয়ার বড় এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই রাজবংশের শাসকরা পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলের কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও শ্রীলঙ্কা এবং বাংলার কিছু হিন্দু রাজারাও বাব-ই আলীর কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চেয়েছিলেন যাতে পর্তুগিজদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া লি-ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩৬৪।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া আজ ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫৫-২৫৬।

ভারত ও সুদূর প্রাচ্যের এই দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলো অনেক দীর্ঘ দূরত্বে অবস্থিত ছিল। এই দেশগুলোতে পৌঁছানোর পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য প্রথম উসমানীয় খলিফা সেলিম ইয়াভুজ সুয়েজ খাল খনন করে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন, যাতে কোথাও স্থলপথ ব্যবহার করার প্রয়োজন না হয় এবং উসমানীয় নৌবহর ইস্তাম্বুল থেকে সরাসরি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

সেলিম আউয়াল এই পরিকল্পনা শুরু করার সুযোগ পাননি। সুলাইমান আলিশান তাঁর উজির-এ-আজম সেমিজ পাশাকে খালের খননের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উসমানীয় উজিরদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। সেলিম সানির যুগেও কিছু আমিরের পক্ষ থেকে এই পরিকল্পনা শুরু করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল এবং কারো কারো পক্ষ থেকে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল। ফলে ব্যবহারিকভাবে কাজ শুরু হতে পারেনি।

যাই হোক, এই পরিকল্পনা নির্বিশেষে সুলাইমান আলিশান আধুনিক কামান এবং নৌবহরের সাথে তাঁর সেরা জেনারেলদের আচেহ পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে সেখানকার শাসকরা বাবে আলীর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন।

সেলিম সানির যুগে অনেক সৈন্য, স্বেচ্ছাসেবক এবং ২২টি জাহাজের সমন্বয়ে একটি বড় বহর ইন্দোনেশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। সে সময় সেখানে হুসাইন শাহ (১৫৩৮ খ্রি. থেকে ১৫৭১ খ্রি./৯৭৮ হিজরি পর্যন্ত) শাসন করছিলেন। এই অভিযানের মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের ছায়াতলে চলে আসে। উসমানীয় নৌবাহিনী দীর্ঘকাল ধরে ইন্দোনেশিয়াকে ঔপনিবেশিক শক্তি থেকে রক্ষা করেছিল। তুর্কি অফিসার ও সৈন্যরা সেখানেই বসবাস শুরু করেন এবং স্থানীয়দের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। বলা হয় যে, সুমাত্রার বাসিন্দাদের একটি বড় অংশ এই তুর্কিদের বংশধর। [১]

মস্কো বিজয়:

সেলিম সানির যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মস্কো বিজয়। এই কৃতিত্ব বাবে আলীর অনুগত ত্রিমিয়া রাষ্ট্রের খানদের হাতে সম্পন্ন হয়েছিল। ত্রিমিয়ার খানরা তাতার বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তাঁদের “গেরায়” বলা হতো। তাঁরা রাশিয়ার জারদের অবাধ্যতার মোকাবিলা করতেন। অবশেষে ত্রিমিয়ার খান এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মস্কোর দিকে অগ্রসর হন।

এই অভিযানে আট হাজার রুশ নিহত হয় এবং বাকি বাহিনী পালিয়ে যায়। ২৭ জিলহজ ৯৭৮ হিজরি (২৪ মে ১৫৭১ খ্রি.) তারিখে খান তাঁর যুবকদের নিয়ে মস্কোতে প্রবেশ করেন। স্থানীয় রুশ বাহিনী কোনো প্রতিরোধ করতে পারেনি। খান ত্রিমিয়ায় পনেরো হাজার বন্দি নিয়ে ফিরে আসেন। এভাবে রুশদের রাজ্য বিস্তারের লালসায় প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ত্রিমিয়ার খানকে এই গৌরবময় কৃতিত্বের জন্য “তখত আলগান” (সিংহাসন দখলকারী) উপাধি দেওয়া হয়।

পরের বছর ত্রিমিয়ার তাতাররা পুনরায় ভলগা এবং ওকা নদীর সংযোগস্থলে পৌঁছে যায়। রুশ জার ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় আসলেও পরাজিত হন এবং কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা, ১/৩৬৬।

জারের রানী জারিনার দুই ভাই যুদ্ধে নিহত হন। ক্রেমলিনের রাজপ্রাসাদে মুসলমানদের হাতে জারের অমূল্য ধনভাণ্ডার হস্তগত হয়। পরিশেষে রুশরা বার্ষিক ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা (লিরা) কর প্রদানের চুক্তিতে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে। এভাবে এই যুদ্ধের মাধ্যমে রাশিয়ার শাসক পরিবার ‘রুরিক’-এর সম্মান ধুলোয় মিশে যায়। সুলতান সেলিম সানি খান ক্রিমিয়ার এই বিজয়ে আনন্দিত হয়ে তাকে অভিনন্দন বার্তার সাথে রত্নখচিত তলোয়ার এবং অন্যান্য রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী:

সেলিম খান সানির শাসনামলের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিম্নরূপ:

- ৯৭৭ হিজরি (১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ): বাব-ই-আলি একটি চুক্তির অধীনে বার্ষিক জিজিয়ার বিনিময়ে হাঙ্গেরির এলাকা অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়।
- ৯৭৭ হিজরি (১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দ): ফ্রান্সের রাজা নবম চার্লসের সাথে শান্তি চুক্তি নবায়ন করা হয়। ফ্রান্সকে অনুমতি দেওয়া হয় যে তারা সিরিয়ায় ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারবে এবং তাদের প্রতিনিধি দলগুলো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতে পারবে।
- ৯৮০ হিজরি (১৫৭২ খ্রিস্টাব্দ): স্পেনের সেনাপতি ডন জন তিউনিস দখল করে বনু হাফসের মাওলা হাসানকে আবারও পুতুল শাসক বানিয়ে দেন। সেখানে মোতায়েনকৃত উসমানীয় বাহিনী তাদের সংখ্যাগুরুতার কারণে সে সময় যুদ্ধ না করেই পিছু হটে। তবে আট মাস পর সিনান পাশার নেতৃত্বে উসমানীয়রা পুনরায় আক্রমণ করে এবং তিউনিস পুনরুদ্ধার করে।
- ৯৮১ হিজরি (১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ): বাগদাদে বিদ্রোহ দেখা দেয় কিন্তু তা দমন করা হয়। [১]

ক্রিট দ্বীপের অভিযান। উসমানীয় নৌবাহিনীর পরাজয়:

৯৭৯ হিজরি (১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ) সালে তুর্কি নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপে আক্রমণ চালায়। একই সাথে তারা আদ্রিয়াটিক সাগরের ‘দালানসিও’ এবং ‘আন্তিয়ারি’ উপকূলীয় শহরগুলো জয় করে নেয়। রোমের পোপ ইতালিকে উসমানীয়দের বিপদ থেকে বাঁচাতে ভেনিস প্রজাতন্ত্র এবং স্পেনের সাথে মিলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন।

ভেনিস এবং ইতালিতে সক্রিয় উসমানীয় সাম্রাজ্যের গোয়েন্দারা সময়মতো এই খবর বাব-ই-আলি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যার ফলে তুর্কি যুদ্ধজাহাজগুলো প্রতিপক্ষের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে।

বাব-ই-আলির পক্ষ থেকে বার্তা পাশা এবং মুয়াজ্জিনজাদা আলী পাশাকে এই অভিযানের আর্মির নিযুক্ত করে চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা যেখানেই ইউরোপীয় নৌবহর দেখতে পাবে, তাকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তারা দুজনেই বড় স্থলবাহিনীর জেনারেল ছিলেন, নৌযুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না।

তারা তাদের নৌবহরকে গ্রিসের বন্দর ‘আইন বাখতি’ (Lepanto)-তে নিয়ে যান যা উসমানীয়দের দখলে ছিল। এখানে এই জাহাজগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে টহল দিতে থাকে। যদিও এই জাহাজগুলোর সংখ্যা কম ছিল না, তবে ক্রমাগত...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/১৬৩ থেকে ১৬৫।

ব্যবহারের কারণে সেগুলোর মেরামতের প্রয়োজন ছিল। বার্তো পাশা এবং মুয়াজ্জিন পাশা এই দিকটি দেখতে পাননি।

এই সময়ে পোপ ইতালি, ভেনিস, মাল্টা এবং স্পেনের জোটের সাথে ২৩০টি জাহাজের একটি যৌথ নৌবহর গঠন করেছিলেন, যা স্পেনের রাজা ফিলিপ দ্বিতীয়-এর ভাই ডন জন চার্লসের নেতৃত্বে ইন বাখতি বন্দরের দিকে আসছিল। ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, ডন জন ছিলেন রাজা কার্লোস দ্বিতীয়-এর অবৈধ সন্তান।

প্রতিপক্ষের কাছে আসার খবর পেয়ে বার্তো পাশা এবং মুয়াজ্জিন জাদা উনিশ (১৯) জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার একটি পরামর্শ সভা ডাকেন এবং তাদের জানান যে, আমরা উপকূলের কাছে থাকব এবং শত্রুর ওপর একযোগে আক্রমণ করব।

নৌযুদ্ধের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, বিশেষ করে আলী বেগ উলুজ নামক একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এই রণকৌশলকে সম্পূর্ণ ভুল বলেন, কিন্তু বার্তো পাশা এবং মুয়াজ্জিন জাদার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি।

এটি দেখে নৌ কর্মকর্তারা বললেন যে, যদি উপকূলের কাছে থেকেই যুদ্ধ করতে হয়, তবে আমাদের আক্রমণে অগ্রণী হওয়া উচিত নয়; বরং দুর্গে স্থাপিত কামানের গোলার মাধ্যমে প্রথমে তাদের নৌবহরকে ছত্রভঙ্গ করা এবং তারপর তাদের ধাওয়া করা ভালো হবে।

কিন্তু উভয় জেনারেল এই রণকৌশলকে সময়ের অপচয় মনে করলেন। নৌ কর্মকর্তারা শেষ উপায় হিসেবে বললেন যে, আমাদের উপকূল ছেড়ে খোলা সমুদ্রে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বার্তো পাশা অত্যন্ত কঠোরভাবে উত্তর দিলেন:

“উপকূল থেকে দূরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই নৌবহরের দায়িত্ব আমার।”

তিনি বারবার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করলেন এবং ডন চার্লসকে উপহাস করে বললেন: “এই কাফের কুকুরকে আমি কেন ভয় পাব?”

তারপর তিনি কর্মকর্তাদের ধমক দিয়ে বললেন: “আমি আমার মাথা বা পদের কোনো পরোয়া করি না। খলিফার ফরমান পরিষ্কার বলছে যে আক্রমণ করা হোক। যদি আমাদের প্রতিটি জাহাজ থেকে পাঁচ-দশজন লোক মারা যায় তবে তাতে কী ক্ষতি? ইসলামী গায়রাত কি শেষ হয়ে গেছে? আমরা কি খলিফার সম্মান রক্ষা করব না?”

তার ধমকের সামনে সবাই চুপ হয়ে গেল। শুধু আলী বেগ উলুজ প্রতিবাদ করে বললেন:

“কোথায় সেই সব লোক যারা খাইরুদ্দিন পাশার নেতৃত্বে যুদ্ধ করত? তারা চুপ কেন? নৌযুদ্ধ কি কখনো উপকূলে লড়াই হয়?” কিন্তু তার এই চিৎকার অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো।

অবশেষে বার্তো পাশা নৌবহর সাজালেন এবং ইউরোপীয় নৌবহরের ওপর আক্রমণ করলেন, কিন্তু উসমানীয়রা এই যুদ্ধ কোনো রণকৌশল ছাড়াই লড়াই করছিল। যদিও সৈন্যরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই করছিল, কিন্তু ইউরোপীয় ক্যাপ্টেনদের দক্ষতার সামনে তাদের বীরত্ব কাজে আসেনি।

আলী বেগ উলুজ, যিনি ডান পার্শ্বের সেনাপতি ছিলেন, নিজের রণকৌশল অনুযায়ী লড়লেন এবং তিনি তার ৩২টি জাহাজের একটিও নষ্ট হতে দেননি এবং তার মোকাবিলায় আসা মাল্টার নৌবহরকে তার কমান্ডারসহ ডুবিয়ে দিলেন।

কিন্তু এই সময়ে উসমানীয় নৌবাহিনীর মধ্যভাগ এবং বাম পার্শ্বকে শত্রু তখনই ধরে দিল। তুর্কিরা প্রথমবারের মতো শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হলো।

তাদের ১৩২টি জাহাজ ডুবে যায় বা অকেজো হয়ে যায়। ১৭টি জাহাজ, ১৭টি গ্যালি এবং ২৫৬টি ছোট কামানসহ অক্ষত অবস্থায় শত্রুদের হাতে চলে যায়। শত্রুরা ত্রিশ হাজার খ্রিস্টান বন্দীকেও মুক্ত করে নেয়।

তুর্কিদের সাড়ে তিন হাজার সৈন্য বন্দী হয় এবং ষোল হাজারের বেশি শহীদ হয়। সামগ্রিকভাবে বিশ হাজার সৈন্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়। মুয়াজ্জিনজাদা আলী পাশা তার এক ছেলেসহ শহীদ হন, তার দ্বিতীয় ছেলে বন্দী হয়। পর্তু পাশার জাহাজও ডুবে যায়। আলী বেগ অবশিষ্ট জাহাজগুলো নিয়ে কোনোমতে রণক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। খ্রিস্টানদের ক্ষয়ক্ষতিও কম ছিল না। তাদের ৮ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং বিশ হাজার আহত হয়। তাদের এমন কোনো জাহাজ ছিল না যা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। [১]

পোপ এই বিজয়ে উৎসব পালন করেন এবং ডন জন-কে এই কৃতিত্বের জন্য সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, উসমানীয় খিলাফত ইউরোপের জন্য কেবল একটি রাজনৈতিক সমস্যা ছিল না, বরং তারা একে ক্ষতি পৌঁছানো এমনকি ইউরোপের ধর্মীয় নেতারা একে নির্মূল করাকে একটি ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করতেন। [২]

ক্রিট যুদ্ধে পরাজয়ের প্রভাব:

তুর্কিদের এই পরাজয়ে জান ও মালের ক্ষতির চেয়েও বেশি ক্ষতি ছিল সম্মান ও খ্যাতির। এ পর্যন্ত এটি প্রসিদ্ধ ছিল যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে কখনো পরাজিত করা সম্ভব নয়, কিন্তু এখন ইউরোপ জেনে গেল যে উসমানীয়রা অপরাজেয় নয়। এজন্যই এই লড়াইকে উসমানীয় খিলাফতের পতনের সূচনালগ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়।

যদি পরাজয়ের কারণগুলো বিশ্লেষণ করা হয়, তবে নেতৃত্বের অনভিজ্ঞতা এবং নিজের ভুল মতামতের ওপর অটল থাকাই ছিল এর বড় কারণ। তবে এর পাশাপাশি সেনাবাহিনীর নৈতিকতা ও চরিত্রের পর্যালোচনা করলে আরও কিছু কারণ সামনে আসে। যেমন—এই যুগে সেনাবাহিনীতে মদ্যপানের ব্যাধি সৃষ্টি হয়েছিল, বিশেষ করে ইনিচেরি বাহিনীতে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছিল। এ ধরনের বিষয়গুলো বড় বড় সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে ফোকলা করে দেয়। [৩]

ইনিচেরি বাহিনীর পতন সুলতান চতুর্থ মুরাদের যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। সে সময় এই বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের সন্তানদেরই ‘ইনিচেরি’তে নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ও তুনা: ৩৭৪ থেকে ৩৭৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫৭।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫৯।

দ্রষ্টব্য: ইনিচেরি বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে ‘আগা’ বলা হতো, উপ-সেনাপতিকে বলা হতো ‘সেকানবান বাশি’। (তারিখে উসমানীয়: ১/৯০ থেকে ৯৫) পরবর্তীতে যখন ইনিচেরি বাহিনীতে বাছাইকৃত যুবকদের পরিবর্তে সাধারণ নিয়োগ শুরু হলো এবং এর সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেল, তখন এর শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল। এমন পরিস্থিতিতে বাদশাহর অনুগ্রহভাজনদের আলাদা আলাদা পদ বা উপাধিগুলোও অনেক গুরুত্ব লাভ করল। যেমন—শোরজি বাশি (রান্নাঘরের কর্মকর্তা), সাক্কা আগাসি (পানি সরবরাহ প্রধান), বাওরা বাশি (রাজকীয় তাঁবুর কর্মকর্তা)। তবে নবম ও দশম হিজরি শতাব্দী পর্যন্ত এই ঐতিহ্য বজায় ছিল যে, পতনের যুগের ইনিচেরিরা যুদ্ধের সময় তাদের পতাকার মতো নিজেদের ডেকচিগুলোরও হেফাজত করত এবং তাদের কাছে যুদ্ধে ডেকচি পড়ে যাওয়া ছিল চরম অপমানের শামিল। এজন্যই ইনিচেরিরা যখন তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করত, তখন প্রতিবাদের চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ডেকচিগুলো উল্টে দিত। (তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ১২২, ১২৩)

[৪] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানীয়, আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা: পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪; দাওলাতে উসমানীয়াহ, ডক্টর আজিজ: ১/২৮।

এই পরিবর্তন ইয়েনিচেরিদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল, বিশেষ করে এই কারণে যে সেই সময় দুর্বল বাদশাহদের যুগ শুরু হয়েছিল যারা ইয়েনিচেরিদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না। আগে ইয়েনিচেরিরা কেবল সুলতানের অনুগত ছিল। অন্য কেউ তাদের ওপর হুকুম চালাতে পারত না এবং তারাও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কিন্তু এখন বিভিন্ন আমীর ও উজিরদের সাথেও তাদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা নিজেরাও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেছিল, যার ফলে তীব্র রাজনৈতিক ও সামরিক বিশৃঙ্খলা এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়েছিল। [১]

পরাজয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা:

উজির-এ-আজম মুহাম্মদ পাশা এই পরাজয় কাটিয়ে ওঠার জন্য যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া জাহাজগুলোর পরিবর্তে অবিলম্বে নতুন জাহাজ তৈরির নির্দেশ দেন। ফলে খ্রিস্টানরা যখন তাদের বিজয়ের খুশিতে মরিয়ম ও মসীহের মূর্তি তৈরি করছিল, তখন তুর্কিরা শীতের ছয় মাস দিনরাত কাজ করে ২৫০টি জাহাজের সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ নতুন নৌবহর প্রস্তুত করে এবং গ্রীষ্মকাল আসতেই তা সমুদ্রে নামিয়ে দেয়। এটি এই ঘোষণার শামিল ছিল যে, এই পরাজয় উসমানীয় খিলাফতের শক্তির ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি। [২]

দ্বিতীয় সেলিমের মৃত্যু:

৮ বছর ৫ মাস শাসন করার পর ২৭ শাবান ৯৮২ হিজরি (১২ ডিসেম্বর ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ) তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর বয়স ছিল ৫২ বছর। তাঁর ছয় পুত্র মুরাদ, মুহাম্মদ, সুলাইমান, মুস্তফা, জাহাঙ্গীর এবং আবদুল্লাহ তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন। [৩]

বলা হয় যে, দ্বিতীয় সেলিম উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একইভাবে উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যার মৃত্যু ইস্তাম্বুলে হয়েছিল। তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন। যুদ্ধ ও শিকারে পারদর্শী ছিলেন। তীরন্দাজির শৌখিন ছিলেন এবং নিজের হাতে চমৎকার ধনুক তৈরি করতেন।

[৪]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/৬৪

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৩৭৫

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৫৮

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৩৮২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

দ্বিতীয় অংশ

উসমানীয় খিলাফত

দ্বিতীয় পর্যায়

পতনের যুগ

তৃতীয় মুরাদ থেকে তৃতীয় আহমদ

৯৮২ হিজরি থেকে ১১৪৩ হিজরি

(১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

১৬১ বছর

সুলতান মুরাদ সালিস বিন সেলিম সানি

৯৮২ হি. থেকে ১০০৩ হি.

(১৫৭৪ খ্রি. থেকে ১৫৯৫ খ্রি.)

খলিফা সেলিম সানির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুরাদ সালিস ইস্তাম্বুলের খেলাফতের মসনদে আসীন হন। তিনি ৯৫৩ হিজরি (১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সিংহাসন আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং তুর্কি, ফারসি ও আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। [১]

মদ্যপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সমস্যা:

মুরাদ সালিস ব্যক্তিগতভাবে ভোগ-বিলাস থেকে দূরে থাকতেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাই সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তিনি সেনাবাহিনীতে মদ্যপানের অভ্যাস দূর করার চেষ্টা করেন, যা তাঁর পিতার আমলে সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জেনিসারি বাহিনী এই আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এই পরিমাণ মদ্যপানের অনুমতি আদায় করে নেয় যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে না। [২]

এই পরিস্থিতি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উসমানীয় সেনাবাহিনী থেকে সেই দৃঢ় ধর্মীয় মেজাজ বিদায় নিচ্ছিল যা কয়েক শতাব্দী আগে তাদের ঈমান, তাকওয়া এবং জিহাদের গুণে সজ্জিত করে এক অপরাজেয় শক্তিতে পরিণত করেছিল। এর মাধ্যমে এটিও স্পষ্ট হয় যে, নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল ছিল অথবা তাদের স্বভাবে শিথিলতা ছিল। সে কারণেই মদ্যপানের মতো কবির গুনাহর যথাযথ প্রতিরোধ করা হয়নি এবং সেনাবাহিনীর জন্য কোনো এক পর্যায়ে এর অবকাশ মেনে নেওয়া হয়েছিল।

পাঁচ ভাইকে হত্যা:

মুরাদ সালিসের শাসনামলের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনাটি ছিল এই যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁর পাঁচ ভাইকে (অর্থাৎ সুলতান সেলিম সানির পুত্রদের) মোস্তফা, উসমান, সুলাইমান এবং অন্য দুই শাহজাদাকে হত্যা করিয়েছিলেন। [৩]

বলা যায় না যে, এই ধরনের সিদ্ধান্তের পেছনে কী ধরনের ষড়যন্ত্র কাজ করছিল এবং সুলতানের মনে কী চলছিল, তবে এই কাজকে কোনোভাবেই বৈধ বলা যায় না। এ ধরনের পদক্ষেপের ফলে সালতানাতের ধর্মীয় ভাবমূর্তি এবং ইসলামি মর্যাদার চরম ক্ষতি হয়েছিল।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১০০, ত. মাকতাবাতুল ওবাইকান।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ২৫৯।

[৩] তারিখে উসমানি, হাক্কি: ২/১৭৯; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ, ফরিদ বেগ: পৃ. ২৫৯।

নারীদের আধিপত্য এবং পদের জন্য ঘুষ গ্রহণের সূচনা:

ঐতিহাসিক মুনজিম বাশির মতে, তৃতীয় মুরাদ খান বেগম ও দাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। [১] অধিকাংশ সময় হেরেমখানায় কাটাতেন। তাঁর চল্লিশজন দাসী ছিল যাদের থেকে তাঁর ১৯ জন পুত্র এবং ২৬ জন কন্যা ছিল। [২] এছাড়াও মুনজিম বাশির ভাষ্যমতে, তিনি সম্পদ সঞ্চয় করার লোভী ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম উসমানীয় সুলতান যিনি ঘুষ গ্রহণ করতেন। [৩] ঘুষ বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সালতানাতের আমীরগণ বড় পদ পাওয়ার জন্য মোটা অংকের অর্থ নজরানা হিসেবে পেশ করতেন এবং সুলতানগণ এই অর্থ গ্রহণ করে খুশি হতেন এবং তাঁদের বড় পদ দিয়ে দিতেন। ফলে অযোগ্য কর্মকর্তাদের দিন দিন পদোন্নতি হতে থাকে।

সুলতানের এই আচরণের প্রভাব অন্যদের ওপরও পড়ছিল। ফলে রাজদরবারে ঘুষ লেনদেন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক ওজুন হাঙ্কির বর্ণনা অনুযায়ী, সেই সময়ে চতুর প্রকৃতির প্রধানগণ, ওয়ালিদায়ে সুলতান (সুলতানের মা), সদরে আজম (প্রধানমন্ত্রী) বা সুলতানের ওপর প্রভাবশালী যেকোনো ব্যক্তিকে ঘুষ দিয়ে বড় বড় পদ হাসিল করে নিতেন, কারণ কর্মকর্তাদের নির্বাচন সাধারণত এই কয়েকজন ব্যক্তিত্বের মতামতের ভিত্তিতেই হতো। ঘুষের মাধ্যমে পদ লাভের কারণে এমন উজির ও আমীরদের সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যারা সালতানাতের কার্যক্রমে কোনো সাহায্যই করছিলেন না। সিনান পাশা নিজের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের জোরে পাঁচবার সদরে আজম নিযুক্ত হন। প্রথমবার ব্যতীত বাকি চারবারই তিনি মোটা অংকের অর্থ নজরানা দিয়ে এই পদ লাভে সফল হন। নাসুহ পাশা একবার সুলতানের খিদমতে আরজি পাঠিয়েছিলেন যে, যদি তাঁকে সুলতানি নায়েব (প্রতিনিধি) পদ প্রদান করা হয়, তবে তিনি চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পেশ করবেন এবং এগুলি ছাড়াও সেনাবাহিনীকে সব ধরনের অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্য ও রসদ সরবরাহের দায়িত্ব নেবেন। [৪]

পোল্যান্ডের ওপর আধিপত্য। অস্ট্রিয়ার সাথে চুক্তি:

পোল্যান্ডের [৫] শাসক হেনরি ডি ভ্যালোয়া নিজের পদ থেকে পদত্যাগ করে ফ্রান্সে চলে গিয়েছিলেন। মুরাদ সানি (তৃতীয় মুরাদ) এই খবর পেলে তিনি পোল্যান্ডের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শ দেন যেন তাঁরা ট্রান্সিলভানিয়ার শাসককে নিজেদের রাজা হিসেবে নির্বাচিত করেন, যিনি উসমানীয় খিলাফতের করদ দাতা ছিলেন। এভাবে ৯৮৩ হিজরিতে (১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) পোল্যান্ডও উসমানীয় খিলাফতের অধীনে চলে আসে।

অস্ট্রিয়ার সাথে অঘোষিত সীমান্ত সংঘর্ষের পর ৯৮৩ হিজরিতে (১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দে) ৮ বছর মেয়াদী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতেই অস্ট্রিয়া পোল্যান্ড এবং ট্রান্সিলভানিয়াকে উসমানীয় খিলাফতের অধীনস্থ হিসেবে মেনে নেয়। [৬]

[১] জামিউদ দুওয়াল, মুনজিম বাশি; পৃষ্ঠা ৩৩৭

[২] জামিউদ দুওয়াল, মুনজিম বাশি; পৃষ্ঠা ৩৩৬

কিছু সোশ্যাল মিডিয়া বুদ্ধিজীবী এটিকে এভাবে প্রচার করছেন যে সুলতানের ৪০ জন স্ত্রী ছিল, যদিও এখানে বেগমদের নয় বরং দাসীদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

[৩] জামিউদ দুওয়াল, মুনজিম বাশি; পৃষ্ঠা ৩৩৭

[৪] তারিখ-ই-উসমানি, ওজুন হাঙ্কি; ১৩৮/৩

[৫] পোল্যান্ড একদিকে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে এবং অন্যদিকে ইউরোপ ও রুশ সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল।

[৬] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি; পৃষ্ঠা ১০০, আল-উবাইকান প্রকাশনী।

ফ্রান্স, ভেনিস এবং ব্রিটেনের সাথে উন্নত সম্পর্ক

ফ্রান্স এবং ভেনিসের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ভেনিসকে বাদ দিয়ে সমস্ত বিদেশী প্রতিনিধি দলের জন্য ফরাসি পতাকা এবং ফরাসি রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথও বাবে আলীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল ও ব্যবসায়ীরা ইস্তাম্বুলে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল।

[১]

সফভীদের সাথে যুদ্ধ:

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৮৪ হিজরি) সফভী সাম্রাজ্যের শাসক তাহমাস্প মারা যান, তার উত্তরসূরি হায়দার সিংহাসনে আরোহণের পরপরই নিহত হন। এরপর ইসমাইল বিন তাহমাস্প সিংহাসনে বসেন কিন্তু পরের বছর (৯৮৫ হিজরি) তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এরপর তার ভাই খুদাবান্দা শাসক হন কিন্তু ইরানি অভিজাতরা তার ওপর একমত হতে পারেননি। ফলে সেখানে চরম রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়। সফভীদের সারিতে তীব্র বিশৃঙ্খলা দেখে উসমানীয়রা সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাদের সেনাবাহিনী সফভী সাম্রাজ্যের উত্তর প্রদেশ জর্জিয়ায় প্রবেশ করিয়ে ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে (৯৮৫ হিজরি) এর প্রধান শহর তিফলিস জয় করে নেয়। পরের বছর উসমানীয় বাহিনী উত্তর আজারবাইজানের শহর শিরওয়ানে প্রবেশ করে। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৯১ হিজরি) তারা দাগেস্তানও দখল করে নেয়। [২]

তাতার খানের সাথে যুদ্ধ

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৯২ হিজরি) তুর্কি জেনারেল উসমান পাশা অবগুনিয় কষ্ট সহ্য করে ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম করেন যাতে ক্রিমিয়ার গেরাই শাসক “خان” (খান)-কে এই বিষয়ে তিরস্কার করা যায় যে, খিলাফতের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি সফভীদের সাথে যুদ্ধের সময় উসমানীয়দের সাহায্য করা থেকে বিরত ছিলেন। ক্রিমিয়ার খান এক বিশাল সেনাবাহিনী সংগ্রহ করে উসমান খানকে ঘিরে ফেলেন, তিনি তাকে পিষে ফেলার উপক্রম করেছিলেন এমন সময় উসমান খান তার ভাইকে শাসনের আশা দেখিয়ে খানকে বিষ প্রয়োগ করান। খানের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। নতুন খান খিলাফতের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। এভাবে উসমান পাশা মৃত্যুর মুখ থেকে বিজয়ী হয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। এই কৃতিত্বের কারণে খলিফার দৃষ্টিতে তার মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তাকে সদরে আজম নিযুক্ত করা হয়। [৩]

সফভীদের পরাজয় - তাবরিজ বিজয়:

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে (৯৯৩ হিজরি) উসমান পাশা ইস্তাম্বুল থেকে দুই লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তর ইরানে আক্রমণ করেন। তিনি সফভীদের সেনাপতি হামজা মির্জাকে পরাজিত করে তাবরিজও দখল করে নেন। অবশেষে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে (রবিউল আউয়াল ৯৯৩ হিজরি) সফভী সাম্রাজ্য জর্জিয়া, শিরওয়ান, লুরিস্তান, আজারবাইজানের একটি অংশ এবং তাবরিজ ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬১

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬৩

খিলাফতে উসমানিয়ার সাথে সন্ধি করে নিল। [১]

স্পেনের সাথে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিরতি:

তুর্কি নৌবহর স্প্যানিশ নৌবাহিনীর মোকাবিলায় ভূমধ্যসাগরে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে। অবশেষে স্পেন প্রথমবারের মতো বাব-এ-আলীর সাথে সন্ধির ভিত্তি স্থাপন করে এবং পাঁচ বছরের জন্য সরকারিভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়, তবে তা সত্ত্বেও উভয় দেশের স্বৈচ্ছাসেবী যোদ্ধাদের মধ্যে সামুদ্রিক সংঘর্ষ চলতে থাকে। [২]

আফ্রিকার অভিযানসমূহ:

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে (৯৮৫ হিজরি) মরক্কোর একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী পর্তুগালের সহায়তায় মরক্কোর সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। তার অনুরোধে খলিফা ত্রিপোলির বাহিনীকে মরক্কোতে পাঠান, যারা তাঞ্জিয়ারের দক্ষিণে পর্তুগিজ ও বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং মরক্কোর সুলতানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এভাবে মরক্কো এবং উত্তর আফ্রিকা সম্পূর্ণভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

একই বছর বর্নুর শাসক সুলতান ইদ্রিস তৃতীয়কে আফ্রিকার পৌত্তলিক জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি ইস্তাম্বুলে নিজের দূত পাঠিয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার দৃঢ় করেন, যার জবাবে বাব-এ-আলী থেকে তাকে আধুনিক ধরনের কামান পাঠানো হয় যাতে সেগুলো জিহাদে ব্যবহার করা যায়। [৩]

কেনিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত “মোম্বাসা” রাষ্ট্রটি পর্তুগিজদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে (৯৯৯ হিজরি) নিজের নিরাপত্তার জন্য সেটিও খিলাফতে উসমানিয়ার অধীনে চলে আসে, যার ফলে তুর্কি নৌবহর আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে উন্মুক্ত পথ পেয়ে যায়। তবে মাত্র তিন বছর পর ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে (১০০১ হিজরি) পর্তুগিজরা তুর্কিদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

মরক্কোর সাদি রাজবংশের (ফাস রাষ্ট্র) শাসক মওলায়ে আহমদ আল-মানসুর রাহমানি নিজের রাষ্ট্রকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, ফাস রাষ্ট্রের বৈদেশিক বিষয়াবলি বাব-এ-আলীর ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফাসের কর ইস্তাম্বুলে যাবে, রাষ্ট্রে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা ও আইন কার্যকর হবে। তবে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মওলায়ে আহমদ স্বায়ত্তশাসিত থাকবেন। যদিও আলজেরিয়ার উসমানীয় কর্মকর্তারা ফাসের অভ্যন্তরীণ বিষয়েও কর্তৃত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মওলায়ে আহমদ এতে রাজি হননি। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬৬।

[৩] বর্নু রাষ্ট্র ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি ও ব্রিটিশ বাহিনী দখল করে নেয়।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৬০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১ / ৩৮৬ থেকে ৩৮৯। মওলায়ে আহমদের শাসনকাল ৯৮৬ হিজরি থেকে ১০১২ হিজরি (১৫৭৮-১৬০৩ খ্রি.) পর্যন্ত ছিল। ফাসের উসমানীয় সাম্রাজ্যের সাথে অন্তর্ভুক্তি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় স্থায়ী ছিল। মওলায়ে আহমদের নাতিদের আমলে ফাস রাষ্ট্র ও খিলাফতে উসমানিয়ার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে এবং ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে (১০৬৯ হিজরি) এই রাষ্ট্রটি পুনরায় স্বাধীন হয়ে যায়।

ইহুদিদের চক্রান্ত:

দীর্ঘকাল ধরে ইহুদিরা তাদের একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিল। তাদের একজন নেতা “আব্রাহাম” মুরাদ সালিস-এর আমলে সিনাই মরুভূমিকে ইহুদিদের কেন্দ্রে পরিণত করার চক্রান্ত করেন এবং সুয়েজ খালের পূর্ব তীরে অবস্থিত “তুর” শহরকে নির্বাচন করেন যাতে এই বন্দরের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ সহজ হয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আব্রাহাম তার পুরো পরিবারসহ সেখানে স্থানান্তরিত হন। এরপর চারদিক থেকে ইহুদিরা দ্রুত সেখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। এই আন্দোলনকে “হিজরত” নাম দেওয়া হয়। এখানে বসতি স্থাপনের পর ইহুদিরা গুপ্তামি শুরু করে এবং স্থানীয় খ্রিস্টানদের উত্যক্ত করতে থাকে। এই অভিযোগগুলো যখন বাব-ই-আলী পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং আব্রাহামসহ সমস্ত ইহুদিকে সিনাই থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের সেখানে ফিরে আসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। [১]

ইয়েনিচেরি বাহিনীর হাঙ্গামা। অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ:

পূর্ব ও পশ্চিমের দেশগুলোর সাথে শান্তি চুক্তির পর বৈদেশিক যুদ্ধগুলো কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এর ফলে ইয়েনিচেরি বাহিনী, যারা সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে অভ্যস্ত ছিল, তাদের কাছে শান্তির সময়টি অত্যন্ত কঠিন মনে হতে লাগল। তাদের জওয়ানরা ইস্তাম্বুল, কায়রো, তাবরিজ এবং হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরসহ প্রতিটি শহরে যেখানে তাদের সেনানিবাস ছিল সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে শুরু করে। এটি দেখে প্রধান উজির সিনান পাশা খলিফাকে পরামর্শ দেন যে, ইয়েনিচেরি বাহিনীকে পুনরায় অভিযানে নিয়োজিত করা উচিত যাতে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি বজায় থাকে। এই পরামর্শ অনুযায়ী অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ শুরু করা হয়, কিন্তু উসমানীয় বাহিনীর মধ্যে আগের মতো ঈমানি চেতনা অবশিষ্ট ছিল না এবং তাদের সামনে কোনো উচ্চ লক্ষ্যও ছিল না। ফলে তারা পরাজিত হয় এবং অনেকগুলো দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যায়। এভাবে উসমানীয়দের ভীতি দূর হয়ে যায়, যার ফলে বাগদান এবং ট্রান্সিলভেনিয়াসহ কিছু করদ ইউরোপীয় রাষ্ট্র অস্ট্রিয়ার সাথে জোটবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করে। অবশেষে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে (১০০৩ হিজরি) সিনান পাশা পুনরায় অভিযান চালিয়ে প্রথমে তাদের ছিনিয়ে নেওয়া দুর্গগুলো পুনরুদ্ধার করেন এবং এরপর “আফলাক” (রোমানিয়া)-এর কেন্দ্র বুখারেস্ট পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দানিউব নদীর তীরে তিনি পরাজিত হন এবং উসমানীয় বাহিনী পিছু হটে বেশ কিছু শহরের দখল ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। এই সংঘাত চলছিল এমন সময় ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে (১০০৩ হিজরি) মুরাদ সালিস-এর ইন্তেকাল হয়। তাঁর বয়স ছিল ৪৯ বছর। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ২৯৮।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/১২৬, ১২৭; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক: পৃষ্ঠা ২৬৪ থেকে ২৬৬।

সুলতান মুহাম্মদ খান তৃতীয় বিন মুরাদ তৃতীয়

১০০৩ হিজরি থেকে ১০১২ হিজরি

(১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

মুহাম্মদ খান তৃতীয় ছিলেন ভেনিসের এক দাসীর পুত্র, যিনি একটি নৌ-সংঘর্ষে বন্দী হয়ে খলিফা মুরাদ তৃতীয়-এর হারামে পৌঁছেছিলেন। তার আসল নাম ছিল বাফো; ইসলাম গ্রহণের পর খলিফা তার নাম রাখেন সাফিয়া। তিনি খলিফার প্রিয় এবং প্রভাবশালী বেগমদের মধ্যে গণ্য হতেন। তারই গর্ভ থেকে ৯৭৪ হিজরিতে (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর জন্ম হয়। তিনি ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে (১০০৩ হিজরি) সিংহাসনে আরোহণ করেন, সে সময় তার বয়স ছিল প্রায় ২৮ বছর। [১]

ভাইদের হত্যা:

সেই সময়ে রাজপ্রাসাদের মহিলারা রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতেন এবং একইভাবে আমির, উজির এবং জানিসারি কর্মকর্তারাও সুলতানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাদের অনেক ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতেন। এরই ভিত্তিতে এই যুগের কিছু উসমানীয় সুলতান অকারণে তাদের ভাইদের হত্যায় লিপ্ত হন। মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর শাসনামলে এর সবচেয়ে ঘৃণ্য উদাহরণ সামনে আসে যখন এই সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেই তার “১৯” জন ভাইকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করান। [২]

ঐতিহাসিক মুনেজ্জিম বাশির মতে, সুলতান এই কাজটি তার পিতার লাশ দাফন করার আগেই করেছিলেন। ফলে প্রাসাদ থেকে সুলতান মুরাদ তৃতীয় এবং তার সেই উনিশ জন পুত্রের জানাজা একসাথে বের হয়। [৩] এই ধরনের ঘৃণ্য পদক্ষেপের কারণে সালতানাত...

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফারিদ বে মুহাম্মাদ: পৃষ্ঠা ২৬৭।

[২] এবং তিনি কন্যা সন্তান ব্যতীত বিশ জন পুত্র সন্তান রেখে যান। যখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, তখন তিনি তার ভাইদের শ্বাসরোধ করার আদেশ দিলেন, ফলে তাদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হলো। (আখবার আদ-দুওয়াল ওয়া আসার আল-উওয়াল: পৃষ্ঠা ৭৯) এবং মুনেজ্জিম বাশি জামিউদ দুওয়াল-এ এটি উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ৩৩৯, ৩৮৮, ৩৮৯)।

স্মরণীয় যে, মহান উসমানীয় সুলতানদের যুগে শাহজাদাদের (ভাই বা পুত্রদের) হত্যার যে ঘটনাগুলো রয়েছে, সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের কারণে মৃত্যুদণ্ড হিসেবে গণ্য, কিন্তু পতনের যুগে কেবল সন্দেহ এবং বিদ্রোহের আশঙ্কাই হত্যার অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। এটিও মনে রাখা উচিত যে, “১৯” জন ভাইয়ের হত্যা সাধারণত মুরাদ তৃতীয়-এর দিকে নিসবত করা হয় যা সঠিক নয়। মুরাদ পাঁচজন ভাইকে হত্যা করেছিলেন যেমনটি আগে জানানো হয়েছে।

[৩] জামিউদ দুওয়াল, মুনেজ্জিম বাশি: পৃষ্ঠা ৩৩৯। এটি ইবরত বা শিক্ষার বিষয় যে, সুলতান মুরাদ তৃতীয় যেভাবে কয়েক বছর আগে তার পাঁচ ভাইকে হত্যা করেছিলেন, কর্মের প্রতিফল হিসেবে তার স্থানে তার নিজের কামরায় বিশটি জানাজা রাখা হলো এবং এই জুলুম স্বয়ং তার নিজের ছেলের হাতেই সংঘটিত হলো।

যদিও শাহজাদাদের বিদ্রোহ থেকে কিছুটা নিরাপদ হওয়া গিয়েছিল, কিন্তু অন্যদিকে যোগ্য উত্তরসূরিদের আকাল দেখা দিয়েছিল। এই কারণেই সালতানাত এখন দিন দিন পতনের দিকে যাচ্ছিল।

করজতের ঐতিহাসিক যুদ্ধ:

যদিও উসমানীয় খিলাফতে পতনের লক্ষণগুলো স্পষ্ট ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খলিফাগণ জিহাদ ত্যাগ করেননি এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সামনে একটি মজবুত বাঁধ নির্মাণের জন্য তারা তখনও চিন্তিত ছিলেন।

খিলাফতের দুর্বলতা বুঝতে পেরে আফলাক (রোমানিয়া)-এর বিদ্রোহী গভর্নর শাসক মিখাইল কেবল অস্ট্রিয়ার সাথে যোগসাজশ করে বাগদাদ এবং ট্রান্সিলভানিয়ার একটি বড় অংশ নিজের দখলে নিয়ে নেননি, বরং তার মোকাবিলায় আসা উসমানীয় বাহিনীকেও পিছু হটতে বাধ্য করেন।

এই পরাজয় সুলতান মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর হৃদয়ে আঘাত হানে এবং তিনি স্বর্ণযুগ পুনরুদ্ধারের জন্য কোমর বেঁধে নেন। তিনি দেখলেন যে, গত কয়েক দশকে উসমানীয় বাহিনীর পরাজয়ের একটি বড় কারণ ছিল খলিফাদের নিজেরা জিহাদে বের হওয়া ছেড়ে দেওয়া, যার ফলে বাহিনীর মনোবল ভেঙে গিয়েছিল।

বাহিনীকে সাহস জোগানোর জন্য মুহাম্মদ খান তৃতীয় নিজেই জিহাদে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে (১০০৫ হিজরি) এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে বের হন। জিহাদের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য বড় বড় উলামা ও মাশায়েখ সুলতানের সাথে বের হন। তাদের মধ্যে শেখ সাদউদ্দিন আফেন্দিও ছিলেন। তিনি ইস্তাম্বুল থেকে রওনা হওয়ার সময় বলছিলেন:

“আমি আপনার সাথে এই জন্য যাচ্ছি যাতে নিজেকে গুনাহ থেকে পবিত্র করতে পারি।”

করজতের ময়দানে জার্মানি, হাঙ্গেরি এবং অস্ট্রিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মোকাবিলা হয়। তুমুল যুদ্ধের সময় উসমানীয়দের কাতার ভেঙে যায় এবং খ্রিস্টানরা আক্রমণ চালিয়ে মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর তাঁবুর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ তৃতীয় যিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাদর পরিহিত ছিলেন এবং তাঁর ﷺ-এর বর্শা হাতে নিয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন, তিনি ঘোড়া থেকে নেমে তাঁবুতে চলে যান এবং কান্নাকাটি করে দোয়া করতে থাকেন। এমন সময় উজির-এ-আজম ইব্রাহিম পাশা ভেতরে প্রবেশ করেন এবং বলেন:

“এই মুহুর্তে আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া জরুরি, অন্যথায় ভয় হচ্ছে যে আপনি গ্রেফতার না হয়ে যান। এটি সালতানাতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হবে।”

মুহাম্মদ খান তৃতীয় এই পরামর্শ মেনে নিয়ে ঘোড়ায় জিন কষতে শুরু করেছিলেন, এমন সময় খাজা সাদউদ্দিন আফেন্দি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেলেন এবং বলেন: যদি সৈন্যরা দেখে যে সুলতান পেছনে নেই, তবে সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এখনও যুদ্ধ চলছে, আমাদের পরাজয় কখনোই হবে না। আপনি আপনার মওলার সাহায্যে বিজয়ী হবেন।

এই কথাগুলো মুহাম্মদ খান তৃতীয় এবং তাঁর আমিরদের এক নতুন সাহস জোগাল। মুহাম্মদ তৃতীয় ঘোড়াকে তাড়া দিলেন এবং সমস্ত অফিসার ও সৈন্যরা তাঁর নেতৃত্বে একযোগে এমন আক্রমণ করল যে, আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের কাতারগুলো লগুভগু হয়ে গেল।

পঞ্চাশ হাজার মিত্রবাহিনীর সৈন্য যুদ্ধে নিহত হয়, আর হাজার হাজার সৈন্য উপত্যকার কিনারায় গভীর পুকুরে ডুবে মারা যায়। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধটি ১৫৯৬ সালের ২৬ অক্টোবর (২৭ রবিউল আউয়াল ১০০৫ হিজরি) কারেজতেসে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ এই বিজয়কে ১৫২৬ সালের মোহাকসের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেন, যাতে সুলাইমান আল-শান ইউরোপীয় মিত্রবাহিনীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তবে উসমানীয়রা এই গৌরবময় বিজয় থেকে বিশেষ কোনো সুবিধা নিতে পারেনি। তারা সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে নিজেদের সীমানা সুরক্ষিত রাখাকেই যথেষ্ট মনে করেছিল। [১]

এরপরও উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ হয় যাতে কখনো একজন বিজয়ী হতো আবার কখনো অন্যজন।

বিদ্রোহ দমন:

মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর শাসনামলে কারায়াজিচি নামক একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা, যাকে যুদ্ধ থেকে পালানোর অপরাধে রাজধানী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, দাবি করেন যে তিনি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে আল-উসমানের বিরুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছেন। রাজধানীর প্রতি অসন্তুষ্ট অনেক সৈন্য তার চারপাশে সমবেত হয় এবং তারা আইনতাবকে তাদের কেন্দ্রে পরিণত করে। তবে সরকারি বাহিনী যখন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন তার কাজ শেষ হয়ে যায়। তার ভাই বিদ্রোহী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও তিনিও ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৬০১ সালে (১০১০ হিজরি) এই আন্দোলন নাম-নিশানাহীন হয়ে পড়ে।

এই সময়েই ইস্তাম্বুলের অশ্বারোহী সৈন্যরা দাঙ্গা শুরু করে। তাদের দাবি ছিল যে বিদ্রোহের সময় তাদের সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যখন খিলাফত দরবার এই দাবি পূরণ করেনি, তখন তারা মসজিদ এবং ওয়াকফ ভবনসহ যা কিছু হাতে পেয়েছে তা-ই লুট করে নেয়। অবশেষে বাব-ই আলী ইয়েনী চেরী বাহিনীর মাধ্যমে এই দাঙ্গা দমন করে। মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর শাসনামল ছিল নয় বছর। তিনি ১৬০৩ সালের ২১ ডিসেম্বর (১৮ রজব ১০১৩ হিজরি) ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। [২]

সুলতান মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর চরিত্র:

মুনাজ্জিম বাশি লিখেছেন যে সুলতান মুহাম্মদ খান তৃতীয় ছিলেন সুদর্শন, দয়ালু এবং জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ে যত্নশীল। যখনই তিনি নবী আকরাম ﷺ-এর নাম শুনতেন, সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি তুর্কি ভাষার কবি ছিলেন। তার ছদ্মনাম ছিল ‘আদলি’। [৩] যদি তার দামনে ভাইদের হত্যার কলঙ্ক না থাকত, তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই আল-উসমানের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে গণ্য হতেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৪৪৮, ৪৪৯; তারিখু আলি উসমান, কারমানি: ৬৩; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মদ: পৃষ্ঠা ২৬৮।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ৮/১২৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মদ: পৃষ্ঠা ২৭০, ২৬৯।

[৩] জামিউদ দুওয়াল, মুনাজ্জিম বাশি: পৃষ্ঠা ৩৮৮।

সুলতান আহমদ আউয়াল বিন মুহাম্মদ সালিস

১০১২ হিজরি থেকে ১০২৬ হিজরি

(১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান আহমদ আউয়াল চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁর ভাই মোস্তফা খানকে সব ধরনের ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম দিয়ে একটি প্রাসাদে নজরবন্দি করে রাখেন যাতে তিনি কোনো বিদ্রোহের কারণ না হন।

আহমদ আউয়ালের যুগে উসমানীয় খিলাফতকে আরও দুর্বলতা থেকে বাঁচানোর পূর্ণ চেষ্টা করা হয়। তিনি মুরাদ পাশার মতো যোগ্য উজির পেয়েছিলেন যাদের প্রচেষ্টায় সালতানাত ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা পায় [১]।

অস্টিয়ার সাথে সন্ধি:

অস্টিয়া চেষ্টা করছিল যাতে হাঙ্গেরির শাসক, যে উসমানীয়দের করদ দাতা ছিল, বিদ্রোহ করে স্বাধীন বাদশাহ হয়ে যায়। তবে এই চেষ্টা সফল হয়নি এবং হাঙ্গেরি পূর্বের ন্যায় খিলাফতের করদ দাতা হিসেবেই বহাল থাকে। ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে (১০১৫ হিজরি) অস্টিয়ার সাথে এই চুক্তিতে সন্ধি হয় যে, অস্টিয়া এককালীন দুই লক্ষ ডুকাত খিলাফতকে প্রদান করবে এবং বার্ষিক কর (যা ত্রিশ হাজার ডুকাত ছিল) দেওয়া থেকে অব্যাহতি পাবে [২]। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সামান্য বিষয় ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি একজন কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বাধীনতা দিয়ে ভবিষ্যতে তাকে এই যোগ্য করে তুলেছিল যে সে উসমানীয় খিলাফতকে আরও দুর্বল করতে থাকে। এই কারণেই কিছু ঐতিহাসিকের এই মতটি সম্পূর্ণ সঠিক যে, এই চুক্তিটি উসমানীয় সালতানাতের সেই পতনের ভিত্তি ছিল যা বার্লিন চুক্তিতে গিয়ে শেষ হয়।

ইরানের সাথে যুদ্ধ ও সন্ধি:

সেই সময়ে ইরানে শাহ আব্বাস সাফাভীর শাসন ছিল, যে তার পূর্বসূরি তাহমাস্পের তুলনায় অনেক বেশি চতুর ও শক্তিশালী ছিল। সে উসমানীয় খিলাফতকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের মধ্যে লিপ্ত রাখে এবং কিছু সামরিক অভিযান সত্ত্বেও উসমানীয় বাহিনী কোনো কার্যকর প্রতিরোধ করতে পারেনি এবং...

[১] জামিউদ দুওয়াল, মুনাজ্জিম বাশি, পৃষ্ঠা ৪৩৫; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক, পৃষ্ঠা ২৭১।

[২] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক, পৃষ্ঠা ২৭২।

নোট: ডুকাত (Ducat) একটি ইউরোপীয় মুদ্রা ছিল যা আন্তর্জাতিক লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হতো। এটি খাঁটি সোনার একটি মুদ্রা ছিল যার ওজন কমবেশি সাড়ে তিন গ্রাম হতো। এই মুদ্রার প্রচলন ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ছিল।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (১২১)

উত্তর ইরাক ও তাবরিজসহ একটি বিশাল এলাকা তুর্কিদের হাত থেকে চলে যায়। অবশেষে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে (১০২১ হিজরি) উভয় দেশের মধ্যে সন্ধি হয়, যার ফলে খলিফা সুলাইমান আলিশানের যুগে বিজিত ইরানের সমস্ত এলাকা সফবিদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। [১] সামনে এগিয়ে তুর্কিদের এই পরাজয়ের কারণে আরও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল উসমানীয় সালতানাতের পতনের দিকে দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

স্পেনে মুসলমানদের নির্মূল এবং হল্যান্ডের উত্থান:

আহমদ আউয়ালের যুগে যখন সতেরো শতক শুরু হয়, তখন এটি ছিল সেই সময় যখন স্পেনে মুসলমানদের অস্তিত্ব পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। সেই মুসলমানরা যারা আট শতাব্দী ধরে এই ভূখণ্ড শাসন করেছিল, যখন খ্রিস্টানদের অধীনে এল, তখন তাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের জীবনকে মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ করে তোলা হয়েছিল। এই দাসত্বের যুগ ১১৮ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে মুসলমানদের চার প্রজন্ম সব ধরনের জুলুম ও নিপীড়ন সত্ত্বেও নিজেদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করেছিল। এই মুসলমানরা গোপনে স্প্যানিশ জাহাজের গতিবিধির ওপর নজর রাখত এবং একে অপরকে সতর্ক করত। তাদের শেষ প্রজন্ম বহু বছর ধরে দক্ষিণ-পূর্ব স্পেনের পাহাড়ে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সবাইকে শহীদ করে দেওয়া হয়।

যখন সতেরো শতক শুরু হলো, তখন স্পেনের শাসক ফিলিপ তৃতীয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল যে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই সে ১৬০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (জমাদিউল আখিরা ১০১৮ হিজরি) স্পেনে বসবাসরত সমস্ত মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যে তারা যেন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যায়, অন্যথায় তাদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না।

এটা স্পষ্ট যে এই নির্দেশের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ধ্বংস করা, কারণ শত শত মাইল দূরত্বে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যার জন্য এত অল্প সময়ে দেশত্যাগ করা অসম্ভব ছিল। সেই সময় আন্দালুসে মুসলমানদের সংখ্যা ছয় লক্ষের কম ছিল না। তাদের একযোগে ঘরবাড়ি থেকে বের করে জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। আশ্রয়স্থলের সন্ধানে এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর এই ধারা দশ মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে খ্রিস্টানদের জন্য এই নিরস্ত্র ও অসহায় মানুষদের হত্যা করা অত্যন্ত সহজ ছিল, যাদের একটি বড় অংশকে আবহাওয়ার তীব্রতা এবং ক্ষুধা আগেই মেরে ফেলেছিল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, এক বছর পর স্পেনে একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না।

উসমানীয় সালতানাত এ বিষয়ে অনবহিত ছিল না। সুলতান আহমদ আউয়াল এই বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের চোখের পানি মোছার জন্য অসাধারণ আগ্রহ দেখান এবং ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে (১০১৯ হিজরি) লন্ডনে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ব্রিটিশ রাজমুকুটকে জানান যে, আমরা স্পেনের উত্তরাঞ্চল থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে ঠেলে দেওয়া মুসলমানদের নিজেদের কাছে বসতি স্থাপন করাতে চাই, তাই এই বিষয়ে সহযোগিতা করা হোক।

এই প্রচেষ্টা সফল হয় এবং পশ্চিম ইউরোপে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো হাজার হাজার মুসলিম পরিবারকে একত্রিত করে নৌ-জাহাজের মাধ্যমে তুরস্কে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তারা, যারা উত্তর স্পেনের জমিদারদের দাস ছিল এবং তাদের...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানীয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মি: পৃষ্ঠা ২৭৬।

জমির চাষাবাদের সমস্ত কাজ তারাই দেখাশোনা করত। তাদের পরে স্পেনের কৃষি সমৃদ্ধি দুর্দশায় পরিণত হয়। এটি সেই সময় ছিল যখন হল্যান্ড তিন দশকের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্পেনের অধীনতা থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মুসলিম বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তারের যুগে প্রবেশ করে। নিজেদের স্বাধীনতার মাত্র এক বছর পর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে হল্যান্ডের নৌবহর ইন্দোনেশিয়ার “জাভা” দ্বীপকে নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করেছিল। এর আগে ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগর পর্তুগিজদের হাতে ছিল, কিন্তু হল্যান্ড পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরকে নিজেদের জায়গিরে পরিণত করে। [১] কেউ জানত না যে এর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সমুদ্র ব্রিটেনের দখলে চলে যাবে।

ভূমধ্যসাগরের সংঘর্ষসমূহ:

১৬১১ থেকে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ (১০২০ থেকে ১০২৩ হিজরি) পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে উসমানীয় নৌবাহিনীর সাথে স্পেন ও ইতালির নৌবাহিনী এবং মাল্টা দ্বীপের খ্রিস্টান জলদস্যুদের মাঝেই সংঘর্ষ চলতে থাকে, যেগুলোতে অধিকাংশ সময় খ্রিস্টানদের পাল্লা ভারী থাকত। কারণ তখন আন্দালুসে এমন কেউ ছিল না যে উসমানীয় নৌবাহিনীকে স্প্যানিশ বাহিনীর গতিবিধির তথ্য প্রদান করত।

ভূমধ্যসাগরে নিজের নৌবাহিনীকে দুর্বল দেখে উজির-এ-আজম নাসুহ পাশা খলিফাকে পরামর্শ দেন যে কৃষ্ণসাগরের নৌবাহিনীকেও যেন ভূমধ্যসাগরে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার ফলে কৃষ্ণসাগরের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায় এবং সেখানে জলদস্যুরা লুটতরাজের তুফান বইয়ে দেয়। এতে আহমদ আউয়াল অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং এই পরিস্থিতির দায় নাসুহ পাশার ওপর চাপিয়ে দেন। কিছু চাটুকার এই বিষয়টিকে আরও উসকে দেয়, যার ফলে আহমদ আউয়াল নাসুহ পাশাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। [২]

অভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ:

আহমদ আউয়ালের শাসনামলে বেশ কিছু বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যা দমনে এই যুগের সবচেয়ে প্রবীণ ও রাজনীতিবিদ মুরাদ পাশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সুলাইমান আলিশানের সময় থেকে ইস্তাম্বুল দরবারের একজন কর্মী ছিলেন এবং সেই স্বর্ণযুগের শেষ নিদর্শন ছিলেন। তার বয়স ৮০ বছর অতিক্রম করেছিল, কিন্তু তিনি তার রাজনৈতিক দক্ষতা, সাহস, দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সালতানাতকে অনেক সংকট থেকে রক্ষা করেন। কুর্দিস্তানের একজন যোদ্ধা “জান পোলাদ” তার শক্তি ও যুদ্ধবিদ্যার মাধ্যমে সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, তখন মুরাদ পাশাই সেখানে গিয়ে তাকে দমন করেন এবং তাকে বাবে আলীর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। [৩]

দীর্ঘদিন ধরে আমীরদের একটি দল যারা “জালালী” নামে পরিচিত ছিল, তারা সরকারের ভেতরে একটি অঘোষিত সরকার গঠন করে শাসনব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। মুরাদ পাশা ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে (১০১৭ হিজরি) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন এবং প্রায় দুই বছর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পুরোপুরি দমন করেন। এই অভিযানের পর ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে (১০১৯ হিজরি) মুরাদ পাশার মৃত্যু হয়। [৪]

সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ ছিল দ্রুজ সম্প্রদায়ের নেতা ফখরুদ্দিন আল-মানি আস-সানি-এর (যিনি ফখরুদ্দিন আল-মানি আল-আউয়ালের নাতি ছিলেন)। [৫]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ: ১/ ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৫২, ৪৫৪।

[২] আদ-দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৭৪।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৭৬-২৭৭।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ: ১/ ৪৫১-৪৫২।

৯৯৯ হিজরিতে তিনি লেবাননের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। লেবাননে খ্রিস্টানদের পাশাপাশি নুসায়রি সম্প্রদায়ের কটুর শিয়াদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ছিল। ফখরুদ্দিন খেলাফতের বিরুদ্ধে তাদের সবার সহযোগিতা লাভ করেছিলেন, তবে তিনি এতটাই সতর্ক ছিলেন যে বাব-ই-আলিকে (উসমানীয় সরকার) তার সংকল্পের বিন্দুমাত্র আঁচ পেতে দেননি, বরং খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি সরকারিভাবে লেবানন পর্বতমালা, বৈরুত ও রোম উপকূল এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশের শাসনভারও লাভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজের শক্তি এতটাই বৃদ্ধি করেন যে বিভিন্ন স্থানে মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেন, যেখানে তার অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল। পূর্ণ প্রস্তুতির পর ১০৩২ হিজরিতে তিনি বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন, তবে উসমানীয় বাহিনীর সামনে তিনি বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত পালিয়ে ইতালিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। [১]

সুলতান আহমদের মৃত্যু:

সুলতান আহমদ চৌদ্দ বছর শাসন করার পর ২২ নভেম্বর ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে (২৩ জিলকদ ১০২৬ হিজরি) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল ২৮ বছর। এর আগে সর্বদা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করার প্রথা চলে আসছিল, কিন্তু সুলতান আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র উসমান তখন মাত্র ১৩ বছরের ছিল, তাই তিনি মৃত্যুর আগে নিজের ভাই মোস্তফা খানকে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন। [২]

সুলতান আহমদের কীর্তি ও চরিত্র:

সুলতান আহমদের স্মরণীয় কাজ হলো ইস্তাম্বুলের “সুলতান আহমদ মসজিদ”, যা স্থাপত্য শিল্পের এক অনন্য নিদর্শন। ছয়টি সুউচ্চ মিনার বিশিষ্ট এই বিশাল মসজিদটি স্থপতি মুহাম্মদ আগার তত্ত্বাবধানে সাড়ে সাত বছরে সম্পন্ন হয়েছিল। [৩]

ঐতিহাসিকদের মতে, আহমদ আউয়াল (প্রথম আহমদ) একজন ধর্মপ্রাণ ও পরহেজগার মানুষ ছিলেন। তিনি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজ নিজেই পরিচালনা করতেন। তিনি আলেম ও মাশায়েখদের সাথে পরামর্শ করতেন। নবী করীম (সা.)-এর পবিত্র সত্তার প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি ইস্তাম্বুল থেকে কাবার গিলাফ পাঠানোর সিলসিলা শুরু করেন। এর আগে কাবার গিলাফ মিশরে তৈরি করা হতো। [৪]

নাতিয়া কবিতা:

তিনি নাতিয়া কবিতাও লিখতেন। তার কবিতার একটি অংশ তার পাগড়ির নিচে থাকতো যাতে বলা হয়েছিল:

أَرْغَبُ دَوْمًا فِي حَمْلِ صُورَةٍ ... إِنْبِطَاعِ أَقْدَامِ النَّبِيِّ عَالِي الْمَقَامِ

“আমি সর্বদা উচ্চ মাকাম বিশিষ্ট নবী (সা.)-এর কদম মোবারকের ছবি বহন করতে আগ্রহী থাকব।”

مَنْ هُوَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ فَوْرَدَةٌ ... حَدِيقَةُ الْأَنْبِيَاءِ مَلِكَةٌ هَذِهِ الْأَقْدَامِ الشَّرِيفَةِ

“যিনি আশ্বিয়া কেরামদের সরদার, তিনি তো একটি গোলাপ; নবীদের বাগান এই পবিত্র কদম মোবারকের মালিক।”

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/১৬৮

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৭৩

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ১/৩৫২-৩৫৩

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সান্নাবি: পৃষ্ঠা ৩০৩

“হে আহমদ! এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করো না এবং তোমার চেহারা এই মহান কদমগুলোতে ঘষতে থাকো।” [১]

+++

প্রথম মোস্তফা খান বিন তৃতীয় মুহাম্মদ খান

যিলকদ ১০২৬ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ১০২৭ হিজরি

(নভেম্বর ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দ) মাত্র তিন মাস

প্রথম মোস্তফা খান তার ভাই প্রথম আহমদের শাসনামলে নজরবন্দি ছিলেন, তাই তিনি বুদ্ধি ও চেতনা বর্জিত এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পতনের এই যুগে সুলতানদের নিজ ভাইদের বন্দি করে রাখার উদাহরণ অনেক। যদি এর পরিবর্তে এই শাহজাদাদের জিহাদ, রাজনৈতিক পরামর্শ এবং জনসেবার মতো মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রাখা হতো, তবে ভবিষ্যতে ভালো নেতৃত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক উজ্জ্বল হতো। [২]

মোস্তফা ২৫ বছর বয়সে খিলাফতের মসনদে বসেন। তার শাসনকাল ছিল কেবল নামমাত্র। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে নিবুদ্ধিতা ও বোকামিপূর্ণ সিদ্ধান্ত দিতে শুরু করেন। তিনি প্রায়ই তার পূর্বপুরুষদের কবরে গিয়ে মানুষের ওপর হাজার হাজার আশরাফি বিলিয়ে দিতেন, কখনো মন চাইলে আশরাফি তুলে তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে শুরু করতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। চিকিৎসকরা তার অনেক চিকিৎসা করেছিলেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। [৩]

অযোগ্যতা ও অপসারণ:

তিনি ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতেন। রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। তার শাসনামলের কেবল একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য যে, তুরস্ক সফরে আসা ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত সরকারি হেফাজতে নজরবন্দি পোল্যান্ডের এক খ্রিস্টান নেতাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। এই খবর পেয়ে মোস্তফা খান ফরাসি রাষ্ট্রদূত, তার লেখক এবং অনুবাদককে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। তিন মাস পর তার অযোগ্যতায় অতিষ্ঠ হয়ে সালতানাতের আমীরগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার পরিবর্তে সাবেক শাসকের অল্পবয়সী পুত্র দ্বিতীয় উসমানকে সিংহাসনে বসানো হয়। [৪]

+++

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ: আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৩

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ১৩৪

[৩] জামিউদ দুওয়াল, মুনাজ্জিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ: পৃষ্ঠা ৪৬৮, তবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৭৬

সুলতান উসমান সানি বিন আহমদ আউয়াল

রবিউল আউয়াল ১০২৭ হিজরি থেকে রজব ১০৩১ হিজরি

(ফেব্রুয়ারি ১৬১৮ খ্রি. থেকে মে ১৬২২ খ্রি.)

টৌদ বছর বয়সী উসমান সানি তার চাচার পদচ্যুতির পর ১লা রবিউল আউয়াল ১০২৭ হিজরি (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৬১৮ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী:

উসমান সানির শাসনকাল ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, যার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নিম্নরূপ:

- ফ্রান্সের বাদশাহ তার কূটনৈতিক কর্মীদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ফলে তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- লেবাননের বিদ্রোহী ফখরুদ্দিন মানি সানিকে ক্ষমা করে তার স্বদেশ লেবাননে ফেরত পাঠানো হয়, কিন্তু সে পুনরায় বিদ্রোহী তৎপরতা শুরু করে।
- পোল্যান্ডের শাসকের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হয়ে তার দেশ দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যাতে মস্কোর বাদশাহ জার-এর ক্রমবর্ধমান শক্তির পথ রুদ্ধ করা যায়। এই যুদ্ধের আগে খলিফা আগাম সতর্কতা হিসেবে মুফতির প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করে তাকে কেবল ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দেন যাতে খলিফার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।

উসমান সানি জিহাদ ঘোষণা করে লস্করের নেতৃত্ব দিয়ে পোল্যান্ডে পৌঁছান। তিনি শত্রুর দুর্গে ক্রমাগত আক্রমণ করেন যা ফলপ্রসূ হয়নি। এর বড় কারণ ছিল এই যে, ইয়েনি চেরি সৈন্যরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই রণাঙ্গনে এসেছিল, তাই যুদ্ধের ক্লান্তি থেকে তারা দ্রুত ফিরে যাওয়ার দাবি জানায়। উসমান সানি তাদের ওপর জোর খাটাতে পারেননি, ফলে ১৬ অক্টোবর ১৬২০ (৯ জিলকদ ১০২৯ হিজরি) তারিখে শত্রুর সাথে সন্ধি হয়। উসমান সানি সেই ইয়েনি চেরি অফিসারদের প্রতি অত্যন্ত হতাশ ছিলেন যারা কেবল অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধ শেষ করার জন্য চাপ দিয়েছিল। তাই ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার সাথে সাথেই তিনি এমন অফিসারদের ফাঁসি দেন। [২]

উসমান সানির পরিণতি:

উসমান সানি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ইয়েনি চেরি বাহিনীকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে, কিন্তু ইয়েনি চেরি সৈন্যরা এর খবর পেয়ে যায়। তারা সুযোগ বুঝে উসমান সানির প্রাসাদে ঢুকে পড়ে এবং তাকে পরিবারের নারীদের সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে একটি দূরবর্তী দুর্গে হত্যা করে।

[১] জামে উদ-দুওয়াল, মুনজ্জিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ: পৃষ্ঠা ৪৬৫।

[২] আদ-দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ২৭৭, ২৭৮।

নিয়ে গেল এবং সেখানে চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার পর তাকে হত্যা করে ফেলল। [১] এটি ৭ রজব ১০৩১ হিজরি (২০ মে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [২] নিহত সুলতানের বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসে সেনাবাহিনীর হাতে কোনো সুলতান হত্যার এটিই ছিল প্রথম ঘটনা। উসমানীয়দের ইতিহাসে একে “আল-মাসাতুল উসমানীয়াহ” (উসমানীয় ট্র্যাজেডি) বলে স্মরণ করা হয়। [৩] উসমান সানি একজন যোগ্য যুবক ছিলেন। তার এই কবিতাটি তার আবেগের প্রতিফলন ঘটায়:

[৪] كَانَتْ نِيَّتِي الْخِدْمَةَ لِحُكُومَتِي وَدَوْلَتِي ... وَلِلْعَجَبِ أَنَّ الْحُسُودَ يَعْمَلُ لِكَيْفِي

“আমার নিয়ত ছিল সরকার ও রাষ্ট্রের সেবা করা... হিংসুকের ওপর বিস্ময় যে সে আমার ধ্বংসের জন্য সচেষ্ট।” [৫]

উসমান সানির হত্যাকাণ্ড উসমানীয়দের শান-শওকত ধূলিসাৎ করে দিল এবং এক চরম রাজনৈতিক সংকট রাজধানী গ্রাস করে নিল।

মোস্তফা খান (দ্বিতীয়বার)

রজব ১০৩১ হিজরি থেকে জিলকদ ১০৩২ হিজরি

(মে ১৬২২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ)

ইতিহাসের শিক্ষা এটাই যে, পূর্ববর্তী বাদশাহর হত্যাকারীরাই পরবর্তী বাদশাহর পৃষ্ঠপোষক হয় এবং তারা কোনো পুতুলকেই সামনে নিয়ে আসে। ফলে ইয়েনিচেরি অফিসাররা আবারও অযোগ্য মোস্তফা খানকে সিংহাসনে বসাল। [৬] শায়খুল ইসলাম আসআদ আফেন্দি, যিনি নতুন খলিফাদের বায়আত করাতেন, তার বায়আতকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এর ফলে সামরিক নেতৃত্ব তাকে পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইয়াহইয়া আফেন্দি-কে শায়খুল ইসলাম বানিয়ে বায়আতের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে। [৭] মোস্তফা খান আগে থেকেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। ইয়েনিচেরিদের হাতে তিনি আগের চেয়েও বেশি অকেজো ও অসহায় হয়ে পড়লেন। ইয়েনিচেরি অফিসাররা শুধু তার ওপরই নয়, বরং পুরো শাসন ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তার করল এবং নানা ধরনের বাড়াবাড়ি শুরু করল। তাদের অত্যাচারে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই অতিষ্ঠ ছিল। এক বছর চার মাস সময়ের মধ্যে সাতবার সদর-ই-আজম (প্রধানমন্ত্রী) পরিবর্তন করা হলো। প্রতিটি নতুন পদাধিকারী ব্যক্তি বড়জোর কয়েক সপ্তাহ টিকতে পারতেন। এই পরিস্থিতিতে সালতানাতের পুরো ব্যবস্থা ওলটপালট হতে শুরু করল। আরজ রুম, সিওয়াস, আঙ্কারা এবং ত্রিপোলিসহ বিভিন্ন স্থানে সুবাদাররা স্বাধীনতার দাবি করতে লাগল। [৮]

[১] আদ-দাওলাতুল আলিয়াতুল উসমানীয়াহ, লেখক মুহাম্মি: পৃষ্ঠা ২৭৭-২৭৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, লেখক ড. সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৪

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ আল-মাজহলাহ: পৃষ্ঠা ২৮৯

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, লেখক সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৪

[৫] আত-তারিখুল ইসলামি, লেখক মাহমুদ শাকির: ৮/১৩০

[৬] জামিউদ দুওয়াল, লেখক মুনজিম বাশি আহমদ বিন লুতফুল্লাহ: পৃষ্ঠা ৪৭৮

[৭] আত-তারিখুল ইসলামি, লেখক মাহমুদ শাকির: ৮/১৩০

সুলতান মুরাদ খান চতুর্থ বিন আহমদ প্রথম

১০৩২ হিজরি থেকে ১০৪৯ হিজরি

(১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ)

উসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের গভীর গহ্বরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহর সাহায্য সাথে ছিল এবং সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা দেখে কিছু একনিষ্ঠ, প্রভাবশালী এবং দূরদর্শী আমীর একত্রিত হলেন এবং তারা মোস্তফা খানকে পদচ্যুত করলেন। এটি ১৫ জিলকদ ১০৩২ হিজরি (১১ সেপ্টেম্বর ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

তঁার স্থলে দ্বিতীয় উসমানের ভাই চতুর্থ মুরাদ খানকে সিংহাসনে বসানো হলো। যদিও তঁার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর, তাই দেশের সামনে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট তাৎক্ষণিকভাবে কাটিয়ে ওঠার মতো সক্ষমতা তঁার ছিল না, তবে তঁার যোগ্যতা ও মেধার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যাচ্ছিল যে তিনি ধীরে ধীরে শাসনব্যবস্থা সামলে নেবেন। এবং নিঃসন্দেহে তিনি তঁার প্রতি রাখা প্রত্যাশাগুলো পূরণ করে দেখিয়েছেন।

তিনি খুব দ্রুত প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, যোদ্ধা এবং সাহসী। স্নায়ুর ওপর তঁার এতটাই নিয়ন্ত্রণ ছিল যে, কখনো কখনো যুদ্ধের সময় তিনি ঘোড়ার পিঠে বসেই ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি গোয়েন্দা বিভাগকে অত্যন্ত সক্রিয় করে তোলেন এবং প্রতিটি প্রদেশের বিশৃঙ্খলাকারী ও বিদ্রোহীদের তথ্য সংগ্রহ করেন। যখন তিনি ভ্রমণের সময় কোনো এলাকা দিয়ে যেতেন, তখন সেখানকার বিশৃঙ্খলাকারীদের তালিকা দেখে তাদের তলব করতেন এবং কঠোর শাস্তি দিতেন। [১]

একইভাবে মুরাদ ও জিন্দিকদের তিনি কখনোই ক্ষমা করতেন না। প্রায়শই তাদের পরিণতি হতো ফাঁসি। তিনি উসমানীয় খিলাফতের শাসনাধীন এলাকায় মদ্যপান ও তামাক সেবন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। [২]

সাফাভিদের সাথে সংঘাত:

চতুর্থ মুরাদের শাসনের শুরুতেই বাগদাদের আমীর বকর আগা বিদ্রোহ করেন, কিন্তু তিনি নিজেও নিজের দেশ সামলাতে পারেননি, যার ফলে ইরানের শাহ আব্বাস সাফাভি সুযোগ পেয়ে যান এবং তিনি বাগদাদ দখল করে নেন এবং সেখানকার আমীরকে হত্যা করান। এরপর বাগদাদের আহলে সুন্নাহের ওপর চরম অত্যাচার করা হয় এবং তাদের অধিকার হরণ করা হয়।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি - পৃষ্ঠা ৩০৫

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি - পৃষ্ঠা ৩০৫

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা | সুলতান মুরাদ চতুর্থ

১০৩৮ হিজরি (১৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে শাহ আব্বাস সাফাভির ইন্তেকাল হয় এবং তার স্থলে তার অল্পবয়সী নাতি মির্জা শাহ শাসক হন। তুরস্কের উজির-এ-আজম খসরু পাশা এই সুযোগে ইরানি অধিকৃত এলাকাগুলোতে আক্রমণ করেন। যদিও এই অভিযানের সময় তিনি ১০৩৯ হিজরি (১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ) সালে হামাদান জয় করেন, কিন্তু নিজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর বাগদাদকে দ্বিতীয়বার অবরোধ করা সত্ত্বেও পুনরুদ্ধার করতে পারেননি।

[১]

ইয়েনিচেরি বাহিনীর দমন:

ইয়েনিচেরি বাহিনীর অবাধ্যতা চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। বাগদাদ দখলে ব্যর্থতার পর খলিফা উজির-এ-আজম খসরু পাশাকে বরখাস্ত করে হাফিজ পাশাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। খসরু পাশা নিজের বরখাস্তে ক্ষুব্ধ হয়ে ইয়েনিচেরি বাহিনীর সামনে হাফিজ পাশার ওপর এই অভিযোগ আনেন যে, তিনিই সুলতানকে ভুল বুঝিয়ে তাকে বরখাস্ত করিয়েছেন। এতে ইয়েনিচেরি বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৮ রজব ১০৪১ হিজরি (৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) তারা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে এবং হাফিজ পাশাকে হত্যা করে। সুলতান খসরু পাশার এই বোকামিতে এতটাই রাগান্বিত হন যে তাকে হত্যা না করে পারলেন না।

সেই সময় তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে ইয়েনিচেরি বাহিনীকে দমন করতে হবে। তাই তিনি ইয়েনিচেরি বাহিনীর বিদ্রোহী অফিসার ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের অভিযান শুরু করেন, যার ফলে অনেক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং বাকিরা ভয়ে অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে। [২]

দ্রুজী সম্প্রদায়ের ইমামের গ্রেফতারি:

এই সময়ে লেবাননের দ্রুজী সম্প্রদায়ের ইমাম ফখরুদ্দিন মানি সানি নতুন করে জোরেশোরে নিজের আন্দোলন শুরু করেন। সুলতান সিরিয়ার ওয়ালিকে তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন। এই অভিযানের ফলে ফখরুদ্দিন এবং তার ছেলেরা গ্রেফতার হন। তাদের ইস্তাম্বুলে পাঠানো হয় যেখানে সুলতান তাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে নজরবন্দি করে রাখেন।

কিন্তু কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া যায় যে, সিরিয়ায় ফখরুদ্দিনের নাতি পুনরায় বিদ্রোহ করেছে। এই সংবাদে সুলতান ফখরুদ্দিন এবং তার বড় ছেলেকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এটি ১০৪৪ হিজরি জিলকদ (এপ্রিল ১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) মাসের ঘটনা।

এরপর দ্রুজী সম্প্রদায়ের বাকি লোকেরা খিলাফতের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে, ফলে তাদের এলাকা তাদেরই তত্ত্বাবধানে থাকতে দেওয়া হয়। ফখরুদ্দিনের বংশধরদের মধ্যে সেখানকার আমিরাত এক শতাব্দী পর্যন্ত চলতে থাকে। [৩]

বাগদাদ বিজয়:

মুরাদ খান চতুর্থ ১০৪৫ হিজরি (১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে ইরানের কাছ থেকে নিজের সেই এলাকাগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সংকল্প করেন যা সুলাইমান আলিশান

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়ায়্যাহ লি ফারিদ বেক: ২৮২, ২৮০; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়ায়্যাহ: আওয়ামিলুন নুহয ওয়া আসবাবুস সুকুত লিস সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৫।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়ায়্যাহ লি ফারিদ বেক মুহাম্মী: ২৮৩, ২৮২।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়ায়্যাহ লি ফারিদ বেক মুহাম্মী: ২৮৩।

...এর দ্বিতীয় খিলাফতের অংশ ছিল। এই অভিযানের সূচনা হয়েছিল তাবরিজ আক্রমণের মাধ্যমে, যা ২৮ রবিউল আউয়াল (১০ সেপ্টেম্বর) জয় করা হয়েছিল।

কিন্তু কিছুকাল পর ইরানিরা পুনরায় বিদ্রোহ করে। মুরাদ খান এবার চূড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেন এবং ব্যাপক প্রস্তুতির সাথে বের হয়ে ১৮ রজব ১০৪৮ হিজরি (১৫ নভেম্বর ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদ অবরোধ করেন। এই অভিযান অত্যন্ত কঠিন ছিল, কিন্তু এই যুদ্ধে মুরাদ খান সশরীরে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ হাতে পরিখা খনন করে সেনাবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন।

উসমানীয় বাহিনীর শেষ আক্রমণটি ছিল অত্যন্ত তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী যা টানা ৪৮ ঘণ্টা ধরে চলেছিল, যার ফলে ২০ শাবান ১০৪৮ হিজরি (২৫ ডিসেম্বর ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদ পুনরায় উসমানীয় খিলাফতের অধীনে চলে আসে।

এই পরাজয় সফবীয়দের দাপট চূর্ণ করে দেয় এবং তারা এই ভয়ে সন্ধির প্রস্তাব দেয় যে উসমানীয় বাহিনী যেন ইরানে ঢুকে না পড়ে। দশ মাস পর্যন্ত বাবে আলী এবং সফবীয় রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং সীমান্তে ঘনিয়ে আসা যুদ্ধের মেঘ কেটে যায়। [১]

সুলতান মুরাদের মৃত্যু:

সুলতান মুরাদ খান রাবে (চতুর্থ) যদি সময় পেতেন, তবে হয়তো তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের বিজয়ের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু বাগদাদ বিজয়ের মাত্র এক বছর পর শাওয়াল ১০৪৯ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ)-তে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স ছিল ৩১ বছর। তিনি ১৬ বছর ১১ মাস শাসন করেন। তাঁর কোনো সন্তান ছিল না। [২]

সুলতান মুরাদের ১২ বছরের শাসনামলে তাঁর মা “কোসেম সুলতান”, যিনি গ্রিক বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সুলতানের মৃত্যুর সময় যাঁর বয়স প্রায় ৬০ বছর হয়েছিল, রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। এমনকি সুলতান মুরাদের পর রাষ্ট্রীয় কোনো সিদ্ধান্ত তাঁর সম্মতি ছাড়া নেওয়া সম্ভব ছিল না। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মদী: ২৮৪-২৮৫।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মদী: ২৮৫।

[৩] তারিখে উসমানি, উজুন চারশিলি: ২/২৯৩।

১৩০ তারিখ উম্মতে মুসলিমা

সুলতান ইব্রাহিম খান প্রথম বিন আহমদ প্রথম

১০৩৯ হিজরি থেকে ১০৫৮ হিজরি

(১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ)

মুরাদ খান চতুর্থ-এর পুরো শাসনকাল জুড়ে তাঁর ভাই ইব্রাহিম খান প্রথম কারাগারে বন্দি ছিলেন। মুরাদ খান নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়ার পর রাষ্ট্রের আমীরগণ ইব্রাহিম খানকে কারাগার থেকে বের করেন এবং নিয়ম অনুযায়ী জামে আইয়ুব আনসারিতে নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে খেলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। [১]

ইব্রাহিম খান খেলাফতের মসনদে আসীন হয়ে এই দোয়া করেন: “আলহামদুলিল্লাহ! ইলাহি! তুমি আমার মতো একজন দুর্বল বান্দাকে এই মাকামে পৌঁছে দিয়েছ, হে আল্লাহ তুমি আমার শাসনকালে কওমের অবস্থাকে ভালো ও উন্নত রেখো। আমাদের একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট রেখো।” [২]

শান্তি ও উন্নতি:

ইব্রাহিম খানের ৮ বছরের শাসনামলে সরকারি ব্যবস্থাপনা ভালো ছিল। সাবেক খলিফা মুরাদ খান ইয়েনিচেরি বাহিনীকে এমনভাবে শাসন করেছিলেন যে এখন আর কারো মাথা তোলার সাহস ছিল না। এই শান্ত পরিবেশে স্থল ও নৌবাহিনীর উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাও উন্নত করা হয়। [৩]

ক্রিট অভিযান:

সেই সময়ে ভেনিস প্রজাতন্ত্রের নৌবাহিনী ক্রিট দ্বীপ দখল করে ইজিয়ান সাগরের সমস্ত বাণিজ্য নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। বাব-ই-আলি একে উদ্বেগের সাথে দেখে ক্রিট দ্বীপের জন্য জিহাদি অভিযান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১০৫৫ হিজরি (১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে ভেনিস প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদ ঘোষণা করে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। এই যুদ্ধের সময় ক্রিটের কিছু এলাকা দখলও করা হয় কিন্তু আরও বিজয়ের আগেই ইস্তাম্বুলে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে দেয়, ফলে এই অভিযান সেই সময়ে পূর্ণ হতে পারেনি। [৪]

[১] তারিখ সালাতিন বনী উসমান, ইউসুফ আসিফ: ১০৫

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৩০৬

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখ আল-ইসলামি আল-হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১০৮

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, ইয়াগি: পৃ. ১০৯

ইউরোপে সাহসী তুর্কি কমান্ডার হোসেন পাশার ছবি:

তবে উসমানীয় নৌবহর বছরের পর বছর ধরে ক্রিট রণাঙ্গনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। উসমানীয় নৌবাহিনীর একজন আমির হোসেন পাশা উপকূলীয় দুর্গ “সুদা” আক্রমণ করেন যেখানে দ্বীপের শাসক কাউন্ট কলোরাডো অবস্থান করছিলেন। আক্রমণের সময় হোসেন পাশা কাউন্টকে দুর্গ থেকে পালিয়ে যেতে দেখে তার ওপর গুলি চালান, যার ফলে কাউন্ট সেখানেই নিহত হন। এই যুদ্ধে হোসেন পাশার নিজের মুখেও দুটি গুলি লাগে। একটি ভেতরে থেকে যায় এবং অন্যটি দ্বিতীয় ক্ষত তৈরি করে বেরিয়ে যায়। হোসেন পাশা অকল্পনীয় সহনশীলতার প্রমাণ দিয়ে নিজের মুখে রুমাল বেঁধে ঘোড়ায় চড়ে আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এই ঘটনাটি ইউরোপে এতটাই খ্যাতি লাভ করে যে সেখানকার চিত্রশিল্পীরা হোসেন পাশার ছবি তৈরি করে বিক্রি করতে শুরু করেন, যাতে তাকে ঘোড়ার ওপর আহত অবস্থায় যুদ্ধ করতে দেখানো হয়েছিল। [১]

আড়াই হাজার খ্রিস্টান বন্দী:

ক্রিটের যুদ্ধ থেমে থেমে জুন ১৬৪৬ থেকে (শাবান ১০৬৬ হিজরি) পর্যন্ত চলতে থাকে। যদিও উসমানীয়রা দ্বীপটি দখল করতে পারেনি, তবে শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। উসমানীয় নৌবহর যখন ইস্তাম্বুলে ফিরে আসে, তখন তাতে আড়াই হাজার খ্রিস্টান বন্দী ছিল। [২]

আগওয়াত গোষ্ঠীর আধিপত্য এবং সুলতানের হত্যাকাণ্ড:

সুলতান ইব্রাহিমের সাথে তার মা “কোসেম”-এর বনিবনা হচ্ছিল না। “কোসেম” রাজনীতি ও শাসনে অস্বাভাবিক আগ্রহ রাখতেন এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রায়ই তিনি সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। ইব্রাহিম খান এই বিষয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তার মাকে এসব কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করতেন। একবার তিনি এমনকি এই হুমকিও দিয়েছিলেন যে, যদি আপনি বিরত না হন তবে আমি আপনাকে রোডস দ্বীপে নজরবন্দি করে রাখব। ইব্রাহিম খানের এই আচরণে কোসেম ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি তার অনুগত জানিসারি অফিসারদের বিদ্রোহে উস্কানি দেন। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী ইতিহাসে “আগওয়াত” নামে পরিচিত।

সুলতান ইব্রাহিম এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তখন জানতে পারেন যখন তিনি তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিদ্রোহী অফিসাররা খবর পেয়ে যায় এবং তারা আগেই আক্রমণ করে সুলতান ইব্রাহিমকে গ্রেফতার করে। [৩] এই ঘটনাটি ১৮ রজব ১০৫৮ হিজরি (১৮ আগস্ট ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর।

ইব্রাহিম খান আট বছর নয় মাস শাসন করেন। তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ: ৪৯৮/১

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ ওজ তুনা: ৪৯৯/১

[৩] পরবর্তীতে ইব্রাহিমকে হত্যা করা হয় যার বিবরণ সামনে আসছে।

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া আজ ফরিদ বেগ: পৃ. ২৮৮, তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আজ ইয়ালমাজ: ৪৯৯ থেকে ৫০১

১৩২

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

সুলতান মুহাম্মদ রাবে বিন ইব্রাহিম আউয়াল

১০৫৮ হিজরি থেকে ১০৯৯ হিজরি

(১৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

আগওয়াত গোষ্ঠী ইব্রাহিম খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার অল্পবয়সী পুত্র মুহাম্মদ রাবেকে সিংহাসনে বসায়, যার বয়স ছিল ছয় বছর সাত মাস। তিনি উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিলেন। তার শাসনকাল চার দশক ব্যাপী ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিজয় বা উন্নতির দিক থেকে এই দীর্ঘ সময়টি কোনো উল্লেখযোগ্য গণনায় আসে না। পশ্চিমা বিশ্বের বিপরীতে উসমানীয় সাম্রাজ্যে এই নিয়ম চলে আসছিল যে, মালিকার পদমর্যাদা শাসকের স্ত্রীকে নয় বরং তার মাতাকে দেওয়া হতো। তাই বিভিন্ন যুগে সুলতানদের মায়েরা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন, তবে মুহাম্মদ রাবের আমলে এই হস্তক্ষেপ কিছুটা বেশিই দেখা গিয়েছিল।

মালিকা কোসেমের শাসন:

মুহাম্মদ রাবের শাসনকালকে আমরা তিনটি অংশে ভাগ করতে পারি: প্রথম অংশটি ছিল তার দাদী “কোসেম”-এর শাসনকাল। এই তিন বছরের সময়কালকে “সুলতানাত-এ-আগওয়াত” বলা হয়, কারণ এতে বিদ্রোহী ইয়েনিচেরি কর্মকর্তাদের যা খুশি করার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। কোসেম নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে নাতির অভিভাবক হয়ে ওঠেন এবং সব ধরনের আদেশ জারি করতে শুরু করেন। তিনি প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো, ক্ষমতা গ্রহণের দশম দিনে সাবেক শাসক অর্থাৎ নিজের পুত্র ইব্রাহিম খানকে হত্যা করান, যাতে তার ইচ্ছায় কেউ বাধা দিতে না পারে। দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং “কোসেম”-এর অনুগত গোষ্ঠী প্রতিটি বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এমনকি তারা ৮০ বছর বয়সী সদরে আজম সুফি মুহাম্মদ পাশাকেও পদচ্যুত করে হত্যা করে ফেলে।

এতে দরবারের আমিরগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হন। মালিকা কোসেম দরবারের আমিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য এই পদটি আহমদ পাশাকে প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিজের অসহায়ত্ব দেখে এক বছর পর নিজেই পদত্যাগ করেন। এরপর সিয়াউশ পাশাকে এই পদ দেওয়া হয়, কিন্তু দরবারীদের ক্ষোভ প্রশমিত হলো না। মালিকা কোসেমের পুত্রবধূ খাদিজাও নিজের পুত্র অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ রাবের সিংহাসন দাদীর দখলে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন; তিনি তার স্বামীর হত্যার কারণেও গভীরভাবে শোকাহত ছিলেন, তাই তিনিও শাশুড়ির বিরুদ্ধে চলে যান।

মালিকা কোসেম এটি দেখে প্রয়োজনীয় মনে করলেন যে, সাম্রাজ্যকে তার অন্য পুত্রবধুর ছেলে সুলাইমানের দিকে স্থানান্তরিত করে দেবেন এবং এর আগে বর্তমান সুলতান দশ বছর বয়সী মুহাম্মদ রাবেকে হত্যা করিয়ে দেবেন।

মালিকা খাদিজা এই ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে যান এবং তিনি তার অনুগতদের মালিকা কোসেমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন, যারা ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী রাতে (১৫ই রমজান ১০৬১ হিজরি) ৬২ বছর বয়সী মালিকাকে তার প্রাসাদে ঢুকে হত্যা করে।

মালিকা কোসেম তার সন্তানদের মধ্য থেকে তিন জন খলিফার যুগ দেখেছিলেন এবং এই তিনজনের ওপরই হুকুম চালিয়েছিলেন। সুলতান মুরাদ রাবে এবং সুলতান ইব্রাহিম খান —উভয়ই তার পুত্র ছিলেন, আর সুলতান মুহাম্মদ রাবে ছিলেন তার নাতি। এই তিনজনের মোট শাসনকাল প্রায় ২৮ বছর হয়। এই সময়ের এগারো বছরে অর্থাৎ ১০৫২ হিজরি (১৬৪৩ খ্রি.) থেকে ১০৬১ হিজরি (১৬৫১ খ্রি.) পর্যন্ত মালিকা পুরোপুরি রাজনীতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মালিকা অত্যন্ত চতুরতার সাথে এই দীর্ঘ সময়ে নারী রাজনীতিকে বিশ্ব রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলেন, কিন্তু এর ফলাফল উসমানীয় সাম্রাজ্যের তীব্র রাজনৈতিক সংকটের আকারে প্রকাশ পায়। [১]

মালিকা খাদিজার যুগ:

কোসেমের মৃত্যুর পর তার পুত্রবধূ অর্থাৎ সুলতান মুহাম্মদ রাবে-র মা খাদিজা শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। সুলতান মুহাম্মদ রাবে-র শাসনের এই দ্বিতীয় পর্যায়টি, যাকে “সুলতানাত-এ-ওয়ালিদা” বলা হয়, পাঁচ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ইউক্রেনের বংশোদ্ভূত খাদিজা আচার-আচরণ এবং বর্ণ ও বংশের দিক থেকে সুলাইমান আলিশানের মালিকা “হররাম”-এর সদৃশ ছিলেন।

তার শাসন শুরু হতেই “আগওয়াত” গোষ্ঠীর বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় এবং এর কর্মকর্তা ও সদস্যদের খুঁজে খুঁজে নির্মূল করা হয়। যখন তাদের ঘরবাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়, তখন লুণ্ঠন করা বিপুল পরিমাণ সম্পদ উদ্ধার করা হয়। শুধুমাত্র একজন পি-চেরি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বাড়ি থেকে পঞ্চাশ কোটি আশরাফি পাওয়া যায়। (এই অর্থ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ৪৫ বিলিয়ন ডলারের সমান।) এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, পুরো গোষ্ঠীটি তিন বছরে দেশ ও জাতির কতটুকু সম্পদ লুণ্ঠন করেছিল। [২]

পবিত্র শপথ এবং ইউরোপীয় শাসকদের যুদ্ধ ঘোষণা:

মুহাম্মদ রাবে-র অল্প বয়সের কারণে ইউরোপ উসমানীয় খিলাফতের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। পোপ অব রোম অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, ভেনিস, রাশিয়া এবং মাল্টার বাহিনীকে একত্রিত করে একটি চুক্তি করেন যাকে “পবিত্র শপথ” নাম দেওয়া হয়। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ইসলামের এই শ্রোতকে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করা হবে যা উসমানীয় খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপ অতিক্রম করে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্তও পৌঁছে যেতে পারে। [৩]

মালিকা খাদিজার বুদ্ধিমত্তা:

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর এই জোট উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য—যা তীব্র রাজনৈতিক সংকটের শিকার ছিল—বিপদের সংকেত ছিল। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন ছিল যে, উসমানীয়রা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা যত দ্রুত সম্ভব সংশোধন করবে। এমন জটিল অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাগুলো মোকাবিলা করা মালিকা খাদিজা...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১ / ৪৯৫-৪৯৭

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১ / ৪৯৫-৪৯৮

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আস-সাল্লাবি - পৃ. ৩০৮

সদর-ই-আজমের পদটি একটি খেলায় পরিণত হয়েছিল। সিয়াউশ পাশা মাত্র নয় মাস, দরবেশ পাশা এক বছর সাত মাস, ইবশির পাশা সাড়ে ছয় মাস, কারামুরাদ পাশা তিন মাস, সুলাইমান পাশা ছয় মাস, হুসাইন পাশা মাত্র চৌদ্দ দিন এবং মোস্তফা পাশা মাত্র চার ঘণ্টার জন্য সদর-ই-আজম ছিলেন। সিয়াউশ পাশাকে পুনরায় আনা হয়েছিল কিন্তু তিনি এক মাস পর ইন্তেকাল করেন। এরপর ৮০ বছর বয়সী মুহাম্মদ পাশা সাড়ে চার মাস দায়িত্ব পালন করেন।

এমন সময় কিছু দরবারী রানী খাদিজাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন নিয়াবত-ই-সুলতানির পদটি ছেড়ে দেন এবং পুতুল সদৃশ লোকদের পরিবর্তে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সদর-ই-আজমের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এই সিলসিলায় তারা “মুহাম্মদ কোপুরলু পাশা”-র নাম প্রস্তাব করেন, যিনি একজন অখ্যাত কিন্তু অভিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন।

খাদিজা এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কোপুরলুর কাছে এই পদের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু এই ঝানু রাজনীতিজ্ঞ এই প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য কয়েকটি শর্তারোপ করেন, যার সারমর্ম ছিল এই যে, সদর-ই-আজমকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে এবং রানীকে রাজনীতি থেকে সম্পর্কহীন হতে হবে।

প্রথমে তো রানী অবাক হলেন যে, উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসে এই প্রথম কেউ এই পদ গ্রহণের জন্য নিজের শর্তাবলী পেশ করছে। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে এতেই দেশ ও জাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই তিনি সম্মত হলেন এবং দীর্ঘ সময় পর সদর-ই-আজমের পদটি একজন ক্ষমতাধর ও যোগ্য ব্যক্তি পেল।

রানী খাদিজার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে তিনি বুদ্ধিমতী ও যোগ্য হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে এবং দেশ ও জাতির প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৯ বছর। এরপর তিনি প্রায় ৩৫ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এই সময়ে তিনি কেবল নিজে রাজনীতি থেকে দূরে থাকেননি বরং রাজপরিবারের সকল নারীকেও কোনো পর্যায়ে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখেন। এর ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, সালতানাতে নারীদের হস্তক্ষেপের যে ধারা তিন দশক ধরে চলে আসছিল, তার অবসান ঘটল এবং এমন ধারা আর কখনো দেখা যায়নি।

রানী খাদিজা তার বাকি জীবন জনকল্যাণমূলক কাজ ও ওয়াকফ তদারকি এবং দান-খয়রাত করে অতিবাহিত করেন। তিনি নিজের মৃত্যু পর্যন্ত তার পুত্র মুহাম্মদ রাবে-কে ইসলামের সেবা এবং দেশ রক্ষার নসিহত করতে থাকেন। [১]

কোপুরলু শাসনের যুগ:

১৫ সেপ্টেম্বর ১৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ (২২ রমজান ১০৬৬ হিজরি) মুহাম্মদ রাবে-র শাসনের সেই যুগ শুরু হয় যখন তিনি কোপুরলু পরিবারের নির্দেশনায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। এই সময়ে মুহাম্মদ রাবে চৌদ্দ বছরে পদার্পণ করেছিলেন, তাই তাকে স্বাধীন ও ক্ষমতাধর হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছিল। সদর-ই-আজম মুহাম্মদ কোপুরলু ছিলেন তার ডান হাত, যিনি তার উত্তম ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে...

(১) তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৪৯৯, ৫০১।

খিলাফতের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখেছিলেন এবং শত্রুদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে থাকেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে (১০৭২ হিজরি) মুহাম্মদ কোপরুলু ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্ত্রীলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আহমদ কোপরুলু এবং তিনিও উসমানীয় খিলাফতের শান-শওকত বজায় রাখার আশ্রয় চেষ্টা করেন। তিনি অস্ট্রিয়া ও ভেনিসের পক্ষ থেকে পাঠানো সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্বয়ং সেনাবাহিনী নিয়ে অস্ট্রিয়ার সীমান্তে চলে যান। এই যুদ্ধের সময় ভিয়েনার পূর্বে অবস্থিত অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্গ “নোহজল” জয় করা হয়। এটি ২৮ সেপ্টেম্বর ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দের (২৫ সফর ১০৭৪ হিজরি) ঘটনা।

সদর-ই-আজম আহমদ কোপরুলুর আমলে ফ্রান্সকেও শাসন করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী খলিফাগণ ফ্রান্সকে অসাধারণ সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ অধিকার প্রদান করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় এই সুযোগ-সুবিধাগুলো ফিরিয়ে নেওয়া হয়। মুহাম্মদ রাবে-এর আমলে ফ্রান্স পূর্বের সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ অধিকারগুলো পুনর্বহালের আবেদন করে, কিন্তু সদর-ই-আজম সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই নৌবহরের সাথে একটি হুমকিমূলক পত্র পাঠান। কিন্তু সদর-ই-আজম একে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেননি এবং পরিষ্কার বলে দেন: “ফ্রান্সকে দেওয়া বিশেষ অধিকারগুলো ছিল নিছক একটি অনুগ্রহ। এটি এমন কোনো চুক্তি ছিল না যা পূরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।”

এরপর ফ্রান্স বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তাদের আবেদনের পুনরাবৃত্তি করে। অবশেষে বাব-ই-আলী (উসমানীয় সরকার) থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ ১০৮৪ হিজরিতে (১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্সকে বায়তুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টান উপাসনালয়গুলোর সেবার বিশেষ অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। [১]

ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আক্রমণ এবং সুলতান মুহাম্মদ রাবে-এর পদচ্যুতি:

সদর-ই-আজম আহমদ কোপরুলুর মৃত্যুর পর মুহাম্মদ রাবে-এর শাসনের দাপট কমে যায়। অস্ট্রিয়া বাব-ই-আলীর সেই অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শুরু করে যা হাঙ্গেরির সীমানায় ছিল। নোহজল দুর্গ এবং বুদাপেস্টও হাতছাড়া হয়ে যায়। পোল্যান্ডের শাসক বোগদান রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করেন যা খিলাফতের অধীনে ছিল। ১০৯৭ হিজরিতে (১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ) ভেনিস প্রজাতন্ত্রের নৌবাহিনী হসুরা এবং গ্রিক অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করে এথেন্স ও করিন্থের মতো শহরগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

এই পরিস্থিতি দেখে দরবারের আমির ও উলামায়ে কেরাম মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে মুহাম্মদ রাবে-কে পদচ্যুত করা হবে। ফলে ১০৯৯ হিজরিতে (১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দ) তাঁকে পদচ্যুত করে তাঁর ভাই সুলাইমান খান সানিকে সিংহাসনে বসানো হয়। পদচ্যুতির সময় মুহাম্মদ রাবে-এর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩০৮

সুলতান সুলাইমান খান সানি বিন ইব্রাহিম আউয়াল

১০৯৯ হিজরি থেকে ১১০২ হিজরি

(১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলাইমান খান সানি ৪৭ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও দরবারের আমিরদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তাঁর আমলে উসমানীয় খিলাফত আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের প্রথম বছরেই অস্ট্রিয়া আরও অগ্রসর হয়ে বেলগ্রেড দখল করে নেয়, যা হাঙ্গেরির রাজধানী ছিল। অন্যদিকে, ভেনিস প্রজাতন্ত্রের নৌবাহিনী অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ডালমাটিয়াসহ বেশ কিছু গ্রিক অধিকৃত অঞ্চল উসমানীয়দের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

এমন পরিস্থিতিতে উজির-এ-আজম মুস্তফা বিন মুহাম্মদ কোপ্রুলু পরিস্থিতি সামাল দেন। তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের জিম্মি ও খ্রিষ্টান নাগরিকদের সাথে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন, যাতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের খিলাফতের বিরুদ্ধে উসকে দিতে না পারে। তিনি ইস্তাম্বুলের সমস্ত খ্রিষ্টান গির্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। তিনি সেইসব লোকদের কঠোর শাস্তি দেন যারা অমুসলিম নাগরিকদের ন্যায্য অধিকারে বিঘ্ন ঘটচ্ছিল।

এই ন্যায়বিচার ভিত্তিক কৌশলের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, “মোরিয়া” এর খ্রিষ্টান নাগরিকরা নিজেরাই ভেনিস প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পুনরায় খিলাফতের অধীনে আসার ঘোষণা দেয়। কারণ ভেনিসের শাসকরা স্থানীয় নাগরিকদের ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছিল, যেখানে উসমানীয় খিলাফতে এমন কোনো জবরদস্তি ছিল না বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মে অটল থাকার স্বাধীনতা ছিল। [১]

২৬ রমজান ১১০২ হিজরি (২৫ জুন ১৬৯১ খ্রিষ্টাব্দ) সুলাইমান সানি তিন বছর আট মাস শাসন করার পর ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল ৫০ বছর। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত - আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ৩০৮

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ারাহ আল-উসমানীয়াহ - ফরিদ বেক মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ৩০৬

সুলতান আহমদ সানি বিন ইবরাহিম আউয়াল

১১০২ হি. থেকে ১১০৬ হি.

(১৬৯০ খ্রি. থেকে ১৬৯৫ খ্রি.)

সুলাইমান সানির কোনো সন্তান ছিল না, তাই তাঁর পরিবর্তে তাঁর ভাই আহমদ সানি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনের প্রথম বছর সদরে আজম মোস্তফা কোপরুলু অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শহীদ হন। [১]

তাঁর মৃত্যু উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য এক বিরাট ধাক্কা হিসেবে প্রমাণিত হয়, যার পর ভেনিস প্রজাতন্ত্র সুযোগ বুঝে এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিছু উসমানীয় অধিকৃত এলাকা দখল করে নেয়। তবে উসমানীয় বাহিনী ইউরোপীয় শত্রুদের আর সামনে এগোতে দেয়নি এবং এরপর হালকা কিছু সংঘর্ষ ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

সুলতান আহমদ সানির শাসনকাল সংক্ষিপ্ত ছিল। তিনি প্রায় চার বছর শাসন করার পর ১১০৬ হিজরি (১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ) সালে ইন্তেকাল করেন। [২]

১. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সান্নাবি: পৃ. ৩১০

২. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১১৫

সুলতান মোস্তফা সানি বিন মুহাম্মদ রাবে

১১০৬ হিজরি থেকে ১১১৫ হিজরি

(১৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ)

আহমদ সানির মৃত্যুর পর তার ভাতিজা, মোস্তফা সানি বিন মুহাম্মদ রাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার বয়স ছিল ৩২ বছর। এই যুগে উসমানীয়দের ঈমানি চেতনা, তাবলিগের আগ্রহ, জিহাদের জজবা, উন্নতির উদ্দীপনা এবং জাতীয় আত্মমর্যাদা ও সম্মানে যে মরিচা ধরেছিল তা পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনকে ভালোভাবে আঁচ করতে পেরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। [১]

কার্লোউইটস চুক্তি, উসমানীয়দের বড় পশ্চাদপসরণ:

উসমানীয়রা তাদের দুর্বলতার কারণে বাধ্য হয়ে জাগ্রেবের দক্ষিণ-পশ্চিমে দানিউব নদীর তীরে অবস্থিত “কার্লোউইটস” (সার্লোউইটস) শহরে রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে, যার অধীনে উসমানীয় সাম্রাজ্য হাঙ্গেরি এবং ট্রান্সিলভেনিয়ার সমস্ত শহর থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। এই চুক্তিটি ২৪ রজব ১১১০ হিজরি (২৬ জানুয়ারি ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে হয়েছিল। এর ফলে এই শহরগুলোতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এক নির্দয় শত্রুর কবলে পড়ে যায়।

এটি ছিল এক বিশাল পশ্চাদপসরণ যা উসমানীয়দের চারশ বছরের প্রতাপ খতম করে দেয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এখন পুরো বিশ্ব শাসন করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। এই চুক্তি দেশের অভ্যন্তরেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ইয়েনি চেরি বাহিনী সদর-এ-আজম ও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সরকারের এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পদচ্যুত করা হলো। পদচ্যুতির চার মাস পর সুলতান মোস্তফা সানির ইন্তেকাল হয়। তার বয়স ছিল ৩৯ বছর। [২]

+++

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানীয়াহ, মুহাম্মদ ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩০৮, ৩০৯; আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩১০।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানীয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩০৮ থেকে ৩১১; আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩১০।

দ্রষ্টব্য: কার্লোউইটস চুক্তি (সার্লোউইটস, কার্লোট) জমাদিউল আউয়াল ১১৫২ হিজরি (সেপ্টেম্বর ১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে বেলগ্রেড চুক্তির কারণে শেষ হয়ে যায়, যা যুদ্ধে উসমানীয়দের গৌরবময় বিজয়ের পর সম্পন্ন হয়েছিল। এভাবে কার্লোউইটস চুক্তির কালো অধ্যায় “৪২” বছর দীর্ঘ ছিল যার বিস্তারিত সুলতান মাহমুদ খান আউয়ালের যুগে আসবে। যাই হোক, এর দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া চুক্তির চেয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার পথই উত্তম।

সুলতান আহমদ সালিছ বিন মুহাম্মদ রাবে

১১১৫ হিজরি থেকে ১১৪৩ হিজরি

(১৭০৩ খ্রি. থেকে ১৭৩০ খ্রি.)

সুলতান মোস্তফা সানির পর তাঁর ভাই আহমদ সালিছকে সিংহাসনে বসানো হয়। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩১ বছর। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক এবং যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। [১]

রাশিয়ার উত্থান:

সুলতান আহমদ সালিছের শাসনামলে উসমানীয়রা আবারও জিহাদের রীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে। এই যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল রুশ শাসক জার পিটার দ্য গ্রেটের মোকাবিলায় নিজেদের সীমানার সফল প্রতিরক্ষা। রাশিয়া “স্লাভ” জাতির প্রাচীন আবাসস্থল, যার প্রধান কেন্দ্র শত শত বছর ধরে মাসকোভি (মস্কো) হিসেবে চলে আসছে। এখানকার রাজারা ধর্মীয়ভাবে খ্রিস্টান ছিলেন এবং অর্থোডক্স চার্চের সাথে যুক্ত ছিলেন। সর্বপ্রথম রুশ শাসক “ল্লাদিমির” ৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে (৩৭৯ হিজরি) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনিই প্রথম রাশিয়ার সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। রাশিয়া একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপ তখন ধারণ করে যখন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৬ হিজরি) চতুর্থ ইভান মস্কোর রাজা হন এবং “জার” উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপাধি তিন শতাব্দী ধরে রুশ শাসকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রুশ শাসকরা ইসলামি বিশ্বের ওপর আক্রমণ শুরু করে। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৬৩ হিজরি) রাশিয়া তাতারদের রাজধানী “আস্খাখান” দখল করে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং ইরান পর্যন্ত পথ তৈরি করে নেয়। ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে (১০৮১ হিজরি) রাশিয়া আরাল হ্রদও দখল করে নেয়। [২]

পিটার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য:

রুশ জারদের মধ্যে সুলতান আহমদ সালিছের সমসাময়িক “জার” ছিলেন রোমানভ পিটার দ্য গ্রেট (পিটার আকবর), যিনি ১৬৮৯ থেকে ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দ (১১০০ হিজরি থেকে ১১৩৭ হিজরি) পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। রাশিয়াকে বিশ্বের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত করা ছিল তাঁর স্বপ্ন। রাশিয়ার সমস্ত সমুদ্র বছরের ছয় মাস বরফে জমে থাকায় নৌ চলাচলের অনুপযোগী থাকত। তাই পিটার যেকোনো উপায়ে তাঁর শাসনকে উষ্ণ পানি পর্যন্ত...

[১] তারিখ সালাতিন বনি উসমান: পৃষ্ঠা ১০৩

[২] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ: বিষয়: রাশিয়া; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: বিষয়: Russia

সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছিল। ইসলামী খিলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুল ছিল এর আসল লক্ষ্য। সে ইউরোপের সাথে সম্পর্ক মজবুত করেছিল এবং নিজের বাহিনীকে ইউরোপীয় অফিসারদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম বিশ্বকে জয় করার জন্য প্রস্তুত করেছিল। ১৬৯৪ সালে (১১০৩ হিজরি) সে তুরস্কের সীমান্ত লঙ্ঘন করে সেই আগ্রাসনের সূচনা করে, যার ফলে রুশ ও উসমানীয়দের মধ্যে দুইশ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ধারা শুরু হয়। ১৬৯৬ সালে (১১০৭ হিজরি) রাশিয়া তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ শহর আজাক (আজভ) (যা দন নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর) দখল করে নেয়। এরপর তারা তুর্কিদের কাছ থেকে কৃষ্ণসাগরের আরও কিছু এলাকাও ছিনিয়ে নেয়।

রুশ আগ্রাসনের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য সুলতান আহমদ তৃতীয় উজির-এ-আজম বালতাজি পাশাকে মনোনীত করেন। তিনি ১৭১১ সালের (১১২৩ হিজরি) বসন্তকালে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে সীমান্তে পৌঁছান। প্রত্যন্ত নদীর তীরে পিটার দ্য গ্রেট এবং রানী ক্যাথরিন ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত ছিলেন, যারা তুর্কিদের নদী পার হতে বাধা দেওয়ার আশ্রয় চেপ্টা করছিল। কিন্তু নায়েব সিপাহসালার বালতাজি পাশা শত্রুর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে বাহিনীকে উত্তর তীরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন।

জার পিটার খোলা ময়দানে লড়াই করতে না পেরে ঘাবড়ে গিয়ে পরিখায় অবস্থান নিতে বাধ্য হন। বালতাজি পাশা এই পরিখাগুলোর চারপাশে কঠোর অবরোধ গড়ে তোলেন এবং একের পর এক আক্রমণ শুরু করেন। যুদ্ধ যদি চলতে থাকত, তবে জার রুশ এবং রানী ক্যাথরিনসহ পুরো বাহিনী বন্দী হতো এবং এরপর রাশিয়া বিশ্বের মানচিত্রে কেবল একটি ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রের রূপ নিয়ে টিকে থাকত।

এমন পরিস্থিতিতে রানী ক্যাথরিন তার দূতকে মূল্যবান রত্নালঙ্কারসহ তুর্কিদের কাছে পাঠান, যিনি বালতাজি পাশার কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সেই রত্নালঙ্কার উপহার দেন। বিনিময়ে তারা অনুরোধ করেন যে, কোনোভাবে জারকে তার বাহিনীসহ পিছু হটার পথ করে দেওয়া হোক। কর্মকর্তারা এই ঘুষ গ্রহণ করে বালতাজি পাশাকে এই বিশ্বাস করান যে, এই মুহূর্তে নিজের শর্তে সন্ধি করে নেওয়াই উত্তম। বালতাজি পাশা যখন দেখলেন যে কর্মকর্তারা আরও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক, তখন তিনি সন্ধি গ্রহণ করে নেন। [১]

চুক্তিতে স্থির হলো যে, “আজাক” (আজভ) তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হবে। এই সন্ধি ‘প্রত্যন্ত চুক্তি’ বা ‘ফাল্কসন চুক্তি’ নামে পরিচিত। এই চুক্তির অধীনে একটি বিজয়ী যুদ্ধ হেরে যাওয়া হলো। আহমদ তৃতীয় এই পদক্ষেপের কারণে উজির-এ-আজমকে বরখাস্ত করেন; তবে উজির-এ-আজমের দ্বারা যে ভুল হয়ে গিয়েছিল, তা আর সংশোধন করা সম্ভব ছিল না। যদি এই সন্ধি না হতো, তবে রাশিয়া এমন এক মারাত্মক আঘাত পেত যে তারা হয়তো এক শতাব্দী পর্যন্ত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না। কিন্তু এই চুক্তি রাশিয়াকে নতুন জীবন দান করল। [২]

[১] কিছু ঐতিহাসিক একটি ভিত্তিহীন কাহিনী বর্ণনা করেছেন যে, উজির-এ-আজম রানী ক্যাথরিনের রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং রানী তাকে নিজের অলঙ্কার উপহার দিয়ে সম্ভুষ্ট করেছিলেন। এই বর্ণনার কোনো বাস্তবতা নেই। উজির-এ-আজম এবং রুশ নেতৃত্বের মধ্যে সমস্ত কথাবার্তা দূতদের মাধ্যমে হয়েছিল। উজির-এ-আজম কখনো জার বা ক্যাথরিনের সাথে সাক্ষাৎ করেননি। বড়জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধের একটি সহজাত অনুভূতি কাজ করেছিল, যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, উজুনচারশিলি: ৬/৫৯৫, ৫৯৬।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং সন্ধি:

জারের কাছে এই চুক্তিটি ছিল নিছক এক টুকরো কাগজ। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজের রানীর সাথে তুর্কিদের বন্দিদশা থেকে রক্ষা পাওয়া। ফলে ফিরে গিয়ে তিনি পূর্বের চেয়েও বড় ইসলামি বিশ্বের শত্রু হিসেবে প্রমাণিত হলেন। তিনি নিজের রাজধানীতে পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার পর মুক্ত শহরগুলো তুর্কিদের কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন।

এটি দেখে সুলতান তৃতীয় আহমদ ইস্তাম্বুলে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে নিজেই তার কমান্ড গ্রহণ করলেন এবং সীমান্তের দিকে যাত্রা করলেন। জার যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি ঘাবড়ে গিয়ে পুনরায় সন্ধির হাত বাড়ালেন। কিন্তু তৃতীয় আহমদ রাজি হলেন না।

এই যুগে হল্যান্ড ছাড়াও ব্রিটেনও ভারত মহাসাগরে অবতরণ করে বিশ্বের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। এই দুই দেশ রাশিয়াকে পরাজয় থেকে বাঁচাতে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু করে দিল। অবশেষে “এড্রিয়ানোপল চুক্তি” কার্যকর হলো, যার অনুযায়ী রাশিয়া আজাক শহরসহ কৃষ্ণ সাগরের উপকূলীয় এলাকাগুলো থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিল এবং যুদ্ধ শেষ হলো। এটি ১১২৫ হিজরি (১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

ইউরোপীয় ফ্রন্টে সাফল্য:

তৃতীয় আহমদের শাসনামলে ইউরোপীয় ফ্রন্টেও সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। ভেনিস প্রজাতন্ত্রের নৌবাহিনীকে পরাজিত করে ক্রিটসহ অনেক দ্বীপ ও উপকূলীয় এলাকা পুনরায় দখলে নেওয়া হয়। ভেনিস এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অস্ট্রিয়ার সাথে জোটবদ্ধ হয়ে ওই এলাকাগুলো ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়, যা বাবে আলী প্রত্যাখ্যান করে। এরপর উভয় দেশের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে অস্ট্রিয়ার পাল্লা ভারী হয়ে যায়। ১১২৯ হিজরি (১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে উসমানীয়দের বেলগ্রেড থেকে পিছু হটতে হয়। অবশেষে ১১৩০ হিজরি (১৭১৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে হল্যান্ড ও ব্রিটেন মধ্যস্থতা করে সন্ধি করিয়ে দেয়, যাকে “পাসারোভিটস চুক্তি” বলা হয়, যার অনুযায়ী:

- বেলগ্রেড, সার্বিয়া এবং মোরোয়ার এলাকাগুলো বাবে আলীকে ফেরত দেওয়া হলো।
- পূর্ব অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের ডালমেশিয়া বন্দর ভেনিসকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো।
- উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের অনুমতি দেওয়া হলো যে তারা তাদের প্রাচীন গির্জাগুলো পুনরায় নির্মাণ ও আবাদ করতে পারবে।
- চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সকল দেশ পারস্পরিক বাণিজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিল। এভাবে অস্ট্রিয়াসহ অনেক ইউরোপীয় দেশ উসমানীয় সাম্রাজ্যে যাতায়াতের উন্মুক্ত সুযোগ পেয়ে গেল। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ ফিত-তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল বাফী: পৃষ্ঠা ১১৭।

[২] ফি উসুলিত তারিখিল উসমানী, আহমদ আব্দুল করিম মুস্তফা: পৃষ্ঠা ১৫৭, ১৫৮, তবা দারুশ শুরুক।

আফগানিস্তানের সাথে যুদ্ধ

এই সময়ে আফগানিস্তান ও পূর্ব ইরানে “হতাকি সালতানাত” প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করে সফবিদের পশ্চিম ও উত্তরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

কিন্তু এই রাজবংশের শাসক শাহ মাহমুদের মৃত্যুর সাথে সাথেই সালতানাত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শাহ মাহমুদের ভাই মীর হোসেন হতাকি কান্দাহারকে রাজধানী ঘোষণা করে আফগানিস্তানের এলাকা আলাদা করে নেন। অন্যদিকে ইসফাহানে শাহ মাহমুদের চাচাতো ভাই শাহ আশরাফ সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ১৭২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭২৯ খ্রিষ্টাব্দ (১১৩৭ হিজরি থেকে ১১৪১ হিজরি) পর্যন্ত শাসন করেন।

এই যুগে ইরানি সফবি রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী শাহজাদা তাহমাস্প, রাশিয়ার সাহায্যে তার পিতার হারানো সিংহাসন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তিনি রাশিয়ার জারের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেন যে, যদি তিনি তাকে ইরানের সিংহাসন ফিরিয়ে দেন, তবে তিনি আজারবাইজান, মাজানদারান, গিলান এবং কাস্পিয়ান সাগর সংলগ্ন সমস্ত ইরানি জেলা রাশিয়ার হাতে তুলে দেবেন। তাহমাস্প উসমানীয় খিলাফতের কাছেও পূর্বের শত্রুতা ভুলে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, যা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

এখন শাহ আশরাফও তুরস্কের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, কিন্তু তার কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়নি এবং শুরুতেই বাবে আলীর কাছে দাবি জানায় যে, তারা যেন উত্তর ইরানের এলাকাগুলো শাহ আশরাফের জন্য খালি করে দেয়। এই দাবির ফলে সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং উসমানীয় খিলাফত পাল্টা দাবি করে যে, শাহ আশরাফ যেন ইরান ত্যাগ করে শাহ হোসেন সফবিকে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন।

শাহ আশরাফ কেবল এই দাবি প্রত্যাখ্যানই করেননি, বরং শাহ হোসেন সফবিকেও হত্যা করান। এতে উভয় সরকারের সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে, এমনকি ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে (১১৩৮ হিজরি) তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সেনাবাহিনী ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হয়। ইসফাহান ও হামাদানের মধ্যে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। প্রত্যাশার বিপরীতে শাহ আশরাফ বিজয় লাভ করেন। তবে তিনি এই সময়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে খিলাফতের পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সমস্ত গনিমতের মাল তুরস্ককে ফেরত দেন। এর ফলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং উভয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। শাহ আশরাফ তুরস্কের কাছ থেকে উত্তর ইরানের এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের দাবিও ত্যাগ করেন। [১]

রাশিয়া ও ইরানের সাথে দ্বন্দ্ব

এদিকে উসমানীয় সালতানাতের দুর্বলতা আঁচ করতে পেরে রাশিয়াও দাবি জানায় যে, তার নাগরিকদের যেন বাইতুল মুকাদ্দাস জিয়ারতের অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়। বাবে আলী এটিও মেনে নেয়।

কিন্তু এরপর জার পিটার দ্য গ্রেট হঠাৎ পূর্বদিকের এলাকাগুলোর দিকে অগ্রসর হন এবং দাগেস্তানসহ কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলীয় এলাকাগুলো জয় করে উত্তর ইরান পর্যন্ত পৌঁছে যান। উসমানীয়রা এটি দেখে যে পূর্ব সীমান্তকে সুরক্ষিত করার জন্য

[১] আফগানিস্তান দর মাসিরে তারিখ, মীর গোলাম মুহাম্মদ গুব্বার: ১/৪৩৩

আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়াতে সৈন্য প্রবেশ করিয়ে দেয়। প্রায় এমন উপক্রম হয়েছিল যে রাশিয়া এবং তুরস্কের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বেঁধে যেত, কিন্তু রাশিয়ার অনুরোধে ফ্রান্স মধ্যস্থতা করে সন্ধি করিয়ে দেয়, যার পর উভয় পক্ষ নতুন বিজিত এলাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় এবং নিজ নিজ সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তবে ওদিকে সফবীদের কাছে উসমানীয়দের পূর্ব দিকে আসা অত্যন্ত অসহ্য মনে হচ্ছিল এবং তারা মোকাবিলায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায়, যার পর উসমানীয় বাহিনী তাবরিজ এবং হামাদানের ওপরও দখলদারিত্ব কায়েম করে। অবশেষে ১১২০ হিজরী (১৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ) সালে সন্ধি হয়। এখনও এই টানাপোড়েন চলছিল যে, ইয়েনিচেরি বাহিনী আহমদ তৃতীয়-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভতিজা মাহমুদকে সিংহাসনে বসায়। [১]

ইব্রাহিম পাশার সংস্কার এবং তার প্রভাব:

এটি সেই সময় ছিল যখন ইউরোপ অর্থনৈতিক উন্নতি, সামরিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের পথে এক দীর্ঘ দৌড়ে মুসলিম বিশ্বের সমান হয়ে গিয়েছিল এবং তার দ্রুত গতি বলে দিচ্ছিল যে, সে কয়েক দশকের মধ্যে সারা বিশ্ব থেকে অনেক এগিয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু তুর্কি আমীর ইউরোপের বিজয়ের রহস্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। তারা চাচ্ছিলেন যে, তুরস্ক সামরিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক অস্ত্রের উদ্ভাবনে ইউরোপ থেকে কোনোভাবেই পিছিয়ে না থাকুক। তাদের মধ্যে আহমদ তৃতীয়-এর আমলের উষিরে আযম ইব্রাহিম পাশার নাম সর্বাগ্রে; তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইউরোপীয় রীতিনীতির সাথে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন এবং ইস্তাম্বুলে অবস্থানরত ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন ও সুশৃঙ্খল যোগাযোগের সূচনা করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার যোগ্য রাষ্ট্রদূতদেরও পাঠান এবং তাদের তাকিদ দেন যে, তারা বাণিজ্যিক চুক্তি এবং রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ‘বাবে আলী’র প্রতিনিধিত্বের চেয়ে বেশি মনোযোগ যেন এই বিষয়ের ওপর নিবদ্ধ রাখে যে, ইউরোপের রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি কোন মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। [২]

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো জাতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং উন্নতির পেছনের সত্যগুলো জানা জরুরি, কিন্তু এর চেয়েও বেশি জরুরি হলো এতে সারবস্তু এবং খোসার মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা। মূল কারণ অনুসন্ধান করা উচিত এবং বাহ্যিক চাকচিক্যের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। যেহেতু মুসলিম বিশ্ব প্রথমবারের মতো এমন এক বৈশ্বিক পতনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, তাই মুসলিম নেতাদের মধ্যে এক তীব্র হীনম্মন্যতাবোধ দানা বাঁধছিল। ইব্রাহিম পাশা সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের দৃষ্টি সত্যের ওপর ছিল, কিন্তু অনেক রাজনীতিবিদ যখন ইউরোপে আসা সোনালী বিপ্লবকে দেখতেন, তখন তার চাকচিক্যে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত এবং বাস্তবতা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। তারা ইউরোপীয়দের দেশপ্রেম, জাতীয় মর্যাদা, শৃঙ্খলাবোধ, জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, জাতীয় বিষয়ে ব্যাপক পরামর্শ, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনার দক্ষতা, সময়ের পাবন্দি, সময় বাঁচানোর জন্য উন্নততর যন্ত্রপাতি ও উদ্ভাবনের অনুসন্ধান এবং বিশ্ব জাতিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার দৃঢ় সংকল্প দেখতে পেতেন না।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সান্নাবি, পৃ. ৩১৯

[২] ফী উসুলিত তারিখিল উসমানি, ড. আহমদ আবদুর রহিম মোস্তফা, পৃ. ১৫৯

ছিলেন, বরং তাদের দৃষ্টি পোশাকের গঠন, উর্দির কাটছাঁট, প্রাসাদের সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ, সাজগোজের নতুনত্ব এবং পানাহারের স্বাদে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। তুর্কি আমিরগণ ইউরোপীয় পোশাক এবং স্থাপত্যশৈলীকে যুগের ফ্যাশন মনে করে গ্রহণ করতে শুরু করেন। [১]

ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ইউরোপীয়দের কাছ থেকে তাদের যা শেখার ছিল, তা তারা শিখতে পারল না এবং যা থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজন ছিল, তারা তারই পেছনে পড়ে গেল। এই গাফিলতি ছিল সেই পতনের অন্যতম প্রধান কারণ, যা দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের নিয়তি হয়ে দাঁড়াল।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস : ইসমাইল ইয়াগি : পৃষ্ঠা ১১৯

১৪৫ | পঞ্চম খণ্ড | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

উসমানীয় খিলাফত

তৃতীয় পর্যায়

দুর্বলতা, আধুনিকায়ন এবং সংগ্রামের যুগ

সুলতান মাহমুদ খান প্রথম থেকে সুলতান আব্দুল হামিদ দ্বিতীয় পর্যন্ত

১১৩৩ হিজরি থেকে ১৩২৮ হিজরি

(১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

১৮৮ বছর

১৪৬

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

সুলতান মাহমুদ খান আউয়াল বিন মুস্তফা সানি

(১১৩৩ হিজরি থেকে ১১৬৮ হিজরি, ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ)

সুলতান মাহমুদ আউয়াল, সুলতান মুস্তফা সানির পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম ৪ মহররম ১১০৮ হিজরি (১৩ আগস্ট ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দ) এ হয়েছিল। সিংহাসনে আরোহণের শুরুতে তিনি কর্মকর্তাদের হাতের পুতুল ছিলেন, কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের কঠোর শাস্তি দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনরুদ্ধার করেন।

ইরানের সাথে যুদ্ধসমূহ:

তাঁর শাসনামলে ইরানের শাহ তাহমাস্পের সাথে বেশ কিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছিল। অবশেষে ইরানের শাহ সন্ধি করেন এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, ইরান তাবরিজ, হামাদান এবং লুরিস্তান ব্যতীত বাকি উত্তর তুর্কি এলাকাগুলো হস্তান্তর করবে। ১২ রজব ১১৪৪ হিজরি (১০ জানুয়ারি ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) এ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়। কিন্তু ইরানের দরবারে প্রভাবশালী আমির নাদির খান আফশার এই চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং শাহ তাহমাস্পকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। [১]

এভাবে ইরান ও তুরস্কের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। নাদির শাহ তুরস্কের সীমানায় প্রবেশ করে একের পর এক শহর জয় করতে করতে বাগদাদ পর্যন্ত দখল করে নেন। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনার পর ১৮ জমাদিউল আউয়াল ১১৫৯ হিজরি (২৩ সেপ্টেম্বর ১৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ) এ এই বিষয়ে ঐকমত্য হয় যে, উভয় দেশের সীমানা সুলতান মুরাদ রাবে'র (চতুর্থ) আমলের ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ (১০৪৯ হিজরি) এর চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। [২]

আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রচেষ্টা:

সুলতান মাহমুদ আউয়াল জানিসারি বাহিনীর প্রভাব ও আধিপত্য কমানোর জন্য ফরাসি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেন এবং তাঁদের উচ্চ পদে আসীন করেন। জানিসারি বাহিনী, যা একসময় উসমানীয় বিজয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল, প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে দেশ ও...

[১] নাদির শাহ আফশার ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি সশস্ত্র দল গঠন করে কালাত-ই-নাদেরি এবং খোরাসানের কিছু এলাকা দখলের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক সফর শুরু করেন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে শাহ সুলতান হোসেন সাফাভির মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তরসূরি তাহমাস্পের দরবারে পৌঁছান এবং আবদালি ও আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। ১১৪৪ হিজরি (১৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) এ তিনি তাহমাস্পকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর দুগ্ধপোষ্য পুত্র আব্বাসকে নামমাত্র রাজা বানান এবং সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। চার বছর পর আব্বাস মারা গেলে নাদির শাহ নিজেই রাজা হন। তিনি ইরান ও আফগানিস্তানে একের পর এক বিজয় অর্জন করেন। এমনকি তিনি দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে মুঘল সম্রাটদের পরাজিত করেন এবং সেখানে গণহত্যা চালান। ১১৬০ হিজরিতে তিনি তাঁর নিজের সেনাবাহিনীর বিদ্রোহে নিহত হন।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ারাহ আল উসমানিয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মদি: পৃষ্ঠা ৩২৬, ৩২০।

জাতির জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সুলতান মাহমুদ একে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইয়েনি চেরি অফিসাররা এত কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল যে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

সুলতান মাহমুদ ইউরোপে আসা বিপ্লব সম্পর্কে বাস্তবসম্মত ধারণা রাখতেন এবং জানতেন যে বর্তমান সময়ে বিশ্ব জাতিসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য সামরিক সংগঠন এবং বৈজ্ঞানিক উন্নতি অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য একটি উপায় ছিল এই যে, দৃঢ় ধর্মীয় মেজাজ সম্পন্ন কিছু বুদ্ধিমান ও যোগ্য ব্যক্তিকে ইউরোপে পাঠিয়ে সেখানকার জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করা এবং এই লোকেরা নিজ দেশে ফিরে এসে সেই বিদ্যাগুলোর শিক্ষা ও প্রচার করবে। কিন্তু এতে এই আশঙ্কা ছিল যে ইউরোপে গমনকারীরা নিজেরাই যেন বিগড়ে না যায়, তাই এটি উত্তম মনে করা হলো যে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে নিজেদের যোগ্য ব্যক্তিদের নিজ দেশেই শিক্ষা দেওয়া হোক। এই সমস্ত দিক সামনে রেখে সুলতান মাহমুদ ফরাসি জেনারেল আলেকজান্ডার কাউন্ট ডি বোনিভাল-কে নিজের বিশ্বস্ত বানিয়ে নেন এবং তাকে নিম্নলিখিত লক্ষ্যসমূহ প্রদান করেন:

- তুর্কি সৈন্যদের ইউরোপীয় বাহিনীর আদলে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনকে ফরাসি ও অস্ট্রীয় বিন্যাসে ঢেলে সাজাতে হবে।
- আধুনিক অস্ত্র তৈরির কারখানা স্থাপন করতে হবে। আধুনিক পদ্ধতির গোলাবারুদ, রাইফেল এবং যানবাহন তৈরি করতে হবে।
- গোলন্দাজ বাহিনীকে ইউরোপীয় গোলন্দাজ বাহিনীর সমকক্ষ করতে হবে।
- একটি সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে যেখানে গণিত ও বিজ্ঞান, বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সর্বোত্তম শিক্ষা দেওয়া হবে।
- কাগজ তৈরির কারখানা স্থাপন করতে হবে।

জেনারেল এই লক্ষ্যগুলোর ওপর কাজ শুরু করে দিলেন। এরই মধ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার নাম রাখা হয় আহমদ পাশা। তার পরিশ্রম ও একাগ্রতায় খুব শীঘ্রই অস্ত্র তৈরির কারখানা, সামরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কাগজ তৈরির কারখানার উদ্বোধন হয়ে গেল। কিন্তু ইয়েনি চেরি অফিসাররা ফরাসিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারল না।

তারা এমন হাঙ্গামা সৃষ্টি করল যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হলো, এবং ফরাসিরা যারা সেই সময় উসমানীয় সালতানাতের সাথে সম্পর্ককে সৌভাগ্য মনে করত এবং কৃতজ্ঞতার সাথে এই সম্পর্কের হক আদায় করতে প্রস্তুত ছিল, তারা নিজেদের দক্ষতাসহ পিছিয়ে গেল। বিপুল ব্যয়ে শুরু করা এই কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অতীত ইতিহাসে পরিণত হলো। এটি প্রায় ১১৩৩ হিজরি (১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [১]

রক্ষণশীলতার ফলাফল:

এটি এমন এক সময় ছিল যখন ইউরোপ, যারা গত শতাব্দীগুলোতে মুসলমানদের থেকে বেশ পিছিয়ে ছিল, দ্রুত দৌড়ে দুই কদম এগিয়ে গিয়েছিল, কারণ মুসলমানরা দুই শতাব্দী ধরে এক জায়গাতেই থমকে ছিল। মুসলিম বিশ্বের কাছে দৌড়ে शामिल থাকা বা না থাকার জন্য এটিই ছিল চূড়ান্ত মুহূর্ত। যদি তারা সময়ের গতি বুঝে পদক্ষেপ...

[১] আলী উসুলুত তারিখিল উসমানি, লেখক: আহমদ আব্দুর রহিম মুস্তফা: পৃষ্ঠা ১৬২, ১৬৩, তাবা: দারুশ শুরুক।

যদি তারা তা শুরু করত, তবে পরবর্তী শতাব্দীতে তাদের মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার নসিব হতো। কিন্তু তারা যদি একইভাবে সেই স্থানেই অবস্থান করাকে নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা মনে করত, তবে কয়েক দশক পরেই তাদের গণনা অনগ্রসর জাতিগুলোর মধ্যে হতো। আফসোস যে, মুসলমানদের কোনো বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার তৌফিক হয়নি। ফ্রান্সের স্থাপন করা কারখানাগুলো তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছিল।

ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মাত্র পঞ্চাশ বছর পর এই ফ্রান্স কেবল বিশ্বের এক বিশ্বজনীন শক্তিই নয়, বরং উসমানীয় সাম্রাজ্যের এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীতেও পরিণত হয়েছিল এবং এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর উসমানীয় খিলাফত ইউরোপীয় শক্তিগুলোর করুণার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং এর ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তগুলো ইউরোপীয় দেশগুলো একত্রে বসে গ্রহণ করত।

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুদ্ধ এবং বেলগ্রেড চুক্তি:

এই সময়ে উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যে পোল্যান্ডের (বলোনিয়া) অধিকারের প্রশ্নে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় যা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পোল্যান্ড উসমানীয় খিলাফতের অধীনস্থ একটি রাষ্ট্র ছিল যেখানে স্থানীয় খ্রিস্টান নেতারা শাসন করতেন। পোল্যান্ড রাষ্ট্রটি তুরস্ক এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি সীমানা ছিল। রাশিয়ার বিখ্যাত একনায়ক পিটার দ্য গ্রেট তার উত্তরসূরিদের এই ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তারা পোল্যান্ডের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত পৌঁছানোর স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। তাই রুশ সরকার পোল্যান্ডকে দুর্বল করে গ্রাস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে (১১৪৪ হিজরি) অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়া একটি গোপন চুক্তি করে যে, পোল্যান্ডে এমন একজন শাসককে চাপিয়ে দেওয়া হবে যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে তাদের অনুগত হয়ে ওই অঞ্চলে তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। এটি নির্ধারিত ছিল যে, কোনো শাসকের মৃত্যুতে নতুন শাসক নির্বাচনের কাজ পোল্যান্ডের আমিররা নিজেরাই করবেন। এই বিষয়ে তুরস্ক এবং ফ্রান্স উভয়ই স্থানীয় আমিরদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত। ফলে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে (১১৪৫ হিজরি) পোল্যান্ডের শাসক দ্বিতীয় অগাস্টের মৃত্যুতে তুরস্ক এবং ফ্রান্স স্থানীয় আমিরদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে একজন চতুর নবাব স্ট্যানিসলাসকে সিংহাসনে বসার সুযোগ করে দেয়।

এর ওপর রাশিয়া এবং অস্ট্রিয়া সামরিক হস্তক্ষেপ করে বিদ্রোহ ঘটায় এবং নিজেদের ইচ্ছামতো তৃতীয় অগাস্টকে শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়। জবাবে ফ্রান্সকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হয় এবং সে ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত আহমদ পাশার (সাবেক আলেকজান্ডার) মাধ্যমে বাবে আলীর কাছেও আবেদন জানায় যেন তারাও পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে।

কিন্তু বাবে আলীর উজিররা অনাসক্তি প্রকাশ করে এই বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দেননি। যদিও পোল্যান্ডের প্রতিরক্ষা স্বয়ং তুরস্কের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং এই যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে তাদের বিরুদ্ধেই ছিল।

এর তাৎক্ষণিক ফলাফল এই দাঁড়াল যে, তুরস্কের ওপর ফ্রান্সের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়ল। অস্ট্রিয়া, যে এই ভয়ে ভীত ছিল যে যদি ফ্রান্স এবং তুরস্ক মিত্র হয়ে মোকাবিলায় নেমে আসে তবে তাকে চরম মূল্য দিতে হবে, সুযোগ বুঝে তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সে নিজের রাষ্ট্রদূত পাঠায়। যার ফলে ১৭৩৫ খ্রিস্টাব্দে (১১৪৭ হিজরি) ‘ভিয়েনা’য় অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সাথে চুক্তি করে তাকে তুরস্কের পক্ষ না নেওয়ার জন্য রাজি করিয়ে নেয়। এভাবে তুরস্ক একা হয়ে পড়ে।

এই সময়ের মধ্যে পোল্যান্ড রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার দখলে চলে গিয়েছিল। রাশিয়া বাগদান রাজ্য এবং এর কেন্দ্র ইয়াসিও দখল করে নেয়। ২৮ মে ১৭৩৬ (১৬ মহরম ১১৪৯ হিজরি) তারিখে রুশ বাহিনী প্রথমবারের মতো সীমান্ত অতিক্রম করে তাতার রাজ্য “ক্রিমিয়া”-তে প্রবেশ করে এবং তা পদদলিত করতে শুরু করে। তবে তাতার খান দ্বিতীয় গিরাই পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে রুশদের ইউক্রেনের শেষ সীমানা পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং ফেরার পথে এক লক্ষ লোককে বন্দী করেন।

এদিকে ইস্তাম্বুলের সদর-ই-আজম হাজি মুহাম্মদ পাশা খোদাপ্রদত্ত প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও তৎপরতার সাথে শত্রুদের মোকাবিলা করার জন্য যুদ্ধের নকশা তৈরি করেন, যার ফলে উসমানীয় বাহিনী একটি পাহাড়ের মতো মিত্রশক্তির সামনে অটল হয়ে দাঁড়ায়।

অস্ট্রীয় বাহিনীর মোট সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ, যা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে ওয়ালাচিয়া (রোমানিয়া), বসনিয়া ও সার্বিয়ার দিক থেকে অগ্রসর হচ্ছিল। ২৭ জুলাই ১৭৩৭ (২৮ রবিউল আউয়াল ১১৫০ হিজরি) তারিখে তারা নিশ শহর দখল করে নেয়, কিন্তু ৪ আগস্ট ১৭৩৭ (১৬ রবিউস সানি ১১৫০ হিজরি) তারিখে বসনিয়ার ময়দানে অস্ট্রিয়ার ৮০ হাজার সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাদের মধ্যে ৬০ হাজার সেখানেই নিহত হয়।

একইভাবে ২০ অক্টোবর ১৭৩৭ (২৪ জমাদিউল আখির ১১৫০ হিজরি) তারিখে সার্বিয়ার যুদ্ধে খ্রিস্টান যোদ্ধারা ছয় হাজার লাশ ফেলে দানিউব নদীর ওপারে পালিয়ে যায় এবং নিশ শহরে আবারও উসমানীয় পতাকা উড্ডীন করা হয়। একইভাবে ওয়ালাচিয়া (রোমানিয়া) ও বাগদানেও মিত্রবাহিনী পরাজিত হয়।

আজাক-এর ময়দানে রুশ বাহিনীকেও পিছু হটতে হয়। মার্শাল ভন মুনিখ এক লক্ষ ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ “ওজ”-এর ওপর আক্রমণ করেন। ত্রিশ হাজার সৈন্য হারানোর পর যখন তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন, তখন তিনি এটা জেনে অবাক হন যে, দুর্গাধিপতি ইয়াহইয়া পাশা মাত্র ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে লড়াই করছিলেন, যাদের মধ্যে এখন মাত্র ৭০০ জন মুজাহিদ জীবিত ছিলেন। তবে রাশিয়ার যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার তুলনায় এই দুর্গ বিজয় কিছুই ছিল না।

এদিকে উসমানীয় বাহিনী বেলগ্রেড পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা অবরোধ করেছিল। অস্ট্রিয়া বাধ্য হয়ে ফরাসি রাষ্ট্রদূতের মধ্যস্থতায় শান্তির প্রস্তাব দেয়। রাশিয়াও এতে যোগ দেয়। কিন্তু সদর-ই-আজম মুহাম্মদ পাশা, যিনি নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, এমন কঠোর শর্তাবলী পেশ করেন যে মিত্রবাহিনী তাতে রাজি হয়নি। কিন্তু এর পরপরই যখন ২৩ জুলাই ১৭৩৯ (১৫ রবিউস সানি ১১৫২ হিজরি) তারিখে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত কমান্ডার জেনারেল ওয়েলসও পরাজিত হন, তখন মিত্রবাহিনী সমস্ত শর্ত মেনে নিতে রাজি হয়।

এভাবে ১৩ জমাদিউল আউয়াল ১১৫২ হিজরি (১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৩৯) তারিখে বেলগ্রেড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যাতে স্থির করা হয় যে:

- অস্ট্রিয়া বেলগ্রেড এবং সার্বিয়ার সেই সমস্ত এলাকা উসমানীয় খিলাফতের কাছে হস্তান্তর করবে যা পাসারোভিটস চুক্তির মাধ্যমে তাকে দেওয়া হয়েছিল।
- রাশিয়া আজাক বন্দরে নির্মিত তার সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করে দেবে এবং ভবিষ্যতে সেখানে কোনো দুর্গ নির্মাণ করবে না।
- রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে কোনো বাণিজ্যিক বা যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে না। বাণিজ্যের জন্য তাকে বিদেশি জাহাজের সেবা গ্রহণ করতে হবে।

...নিতে হবে।

- এই যুদ্ধে সালতানাতে উসমানিয়া থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সমস্ত দুর্গ, শহর এবং এলাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এই ঐতিহাসিক চুক্তি সালতানাতে উসমানিয়াকে কেবল সেই সমস্ত এলাকাই ফিরিয়ে দেয়নি যা কার্লোউইটজ (সারোউইটজ) চুক্তির কারণে তাদের হাতছাড়া হয়েছিল, বরং এর হারানো মহিমা ও প্রতাপও অনেকটা পুনরুদ্ধার হয়েছিল। এই যুদ্ধের পর ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে (১১৫৩ হিজরি) ফরাসি রাষ্ট্রদূত মসিউ ভিলনেভ-এর প্রচেষ্টায় তুরস্ক সুইডেনের সাথে (যাদের রাশিয়ার সাথে পুরনো শত্রুতা ছিল) একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে যে, ভবিষ্যতে উভয় দেশের যে কোনো একটির ওপর রাশিয়া আক্রমণ করলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করা হবে। [১]

ফ্রান্সের প্রস্তাব যা থেকে ফায়দা নেওয়া হয়নি:

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে (১১৫৩ হিজরি) অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয় যা একটি নতুন যুদ্ধের রূপ নেয়। কয়েক বছরের লড়াইয়ের পর শেষ পর্যায়ে ফ্রান্স পরাজিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালীন ফ্রান্স তার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে বাবে আলীর কাছে প্রস্তাব পেশ করেছিল যে, তারা যদি যুদ্ধে তাদের মিত্র হয়ে অস্ট্রিয়ার ওপর আক্রমণ করে, তবে উভয় মিলে এই শত্রুকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে পারবে এবং সুলতান সুলাইমান আলিশানের সময় পর্যন্ত বিজিত সমস্ত এলাকা তুরস্কের বলে মেনে নেওয়া হবে। এরপর তুরস্ক অস্ট্রিয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে তাদের অন্য শত্রু রাশিয়ার খবর নিতে পারবে, যারা তুরস্ককে গ্রাস করার পরিকল্পনা করছে। রাষ্ট্রদূত সতর্ক করেছিলেন যে, যদি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা হয়, তবে এই শত্রুরা ভবিষ্যতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রমাণিত হতে পারে।

কিন্তু খিলাফত দরবারে এই প্রস্তাবকে গুরুত্বযোগ্য মনে করা হয়নি। সম্ভবত খলিফা দীর্ঘ যুদ্ধের পর এখন অভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন এবং অপ্রয়োজনে আল্লাহর বান্দাদের রক্ত ঝরাতে চাননি। সম্ভবত দরবারের আমিরদের তখন সেই সব বিপদের আন্দাজ ছিল না যা ভবিষ্যতে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আসতে পারত। যা-ই হোক, একজন ঐতিহাসিক এটি না বলে পারেন না যে, শত্রুদের দমন করার একটি চমৎকার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল, যা পরবর্তীতে অনেক যুদ্ধ, বহু পরাজয় এবং সীমাহীন জানমালের ক্ষতি থেকে বাঁচার মাধ্যম হতে পারত। [২]

ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলের প্রশাসনে ত্রুটি:

প্রথম মাহমুদের শাসনামলে আরও একটি বড় ভুল হয়েছিল। খিলাফত দরবারের আমিররা কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় রাজ্য: বুগদান এবং ফালাহ-এর খ্রিস্টান নেতাদের বিদ্রোহের প্রতিকার হিসেবে এই প্রস্তাব করেন যে, সেখানকার শাসনভার সেই সব রোমান বণিকদের হাতে তুলে দেওয়া হোক যারা ইস্তাম্বুলের সাথে যুক্ত। ফলে এই রাজ্যগুলোর শাসনভার রোমান প্রধানদের হাতে চলে আসে, যারা বাবে আলীকে বার্ষিক কর প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছাড়া অন্য সব বিষয়ে স্বাধীন ছিল। এই রোমানরা পূর্বতন নবাবদের অপমান করতে এবং প্রজাদের...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, লেখক: ফরিদ বেক মুহাম্মী: ৩২৫ থেকে ৩২৬; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, লেখক: ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ৬০৮ থেকে ৬১১

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, লেখক: ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩২৬

লুণ্ঠন করতে কোনো ভ্রুটি রাখেনি। দীর্ঘকাল ধরে এই ধারা অব্যাহত থাকায় সেখানকার সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাশিয়ার আধিপত্য মেনে নেওয়ার মধ্যেই নিরাপত্তা খুঁজে পান, যার ফলে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পরবর্তী দশকগুলোতে রাশিয়া সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করে। যদি বাব-ই-আলীর পক্ষ থেকে সেখানে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ ভিত্তিক ব্যবস্থা কায়েম রাখা হতো, তবে বিদ্রোহের ধারাও বন্ধ হয়ে যেত এবং এই অঞ্চলগুলো রাশিয়ার অংশ হওয়াকে প্রাধান্য দিত না। [১]

মাহমুদ আউয়ালের ইন্তেকাল:

জুমুআ ২৭ সফর ১১৬৮ হিজরি (১৩ ডিসেম্বর ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে মাহমুদ আউয়াল ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল, দয়ালু, দূরদর্শী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। তিনি ২৫ বছর শাসন করেন এবং খিলাফতের পতনোন্মুখ মর্যাদাকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনামলে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের অনেক হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করে। বেলগ্রেড বিজয় তাঁর সবচেয়ে গৌরবময় কৃতিত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার এবং গ্রন্থাগার স্থাপনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। ইস্তাম্বুলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারটি গ্রন্থাগার তাঁর জ্ঞানানুরাগের সাক্ষী হয়ে আছে। [২]

সুলতান উসমান সালেস বিন মুস্তফা সানি

(১১৬৮ হিজরি থেকে ১১৭১ হিজরি / ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

মাহমুদ খান আউয়ালের পর তাঁর ভাই উসমান সালেস ৫৮ বছর বয়সে খিলাফতের মসনদে আসীন হন। এর আগে তাঁর ভাইয়ের শাসনামলে তাঁকে সতর্কতামূলকভাবে কারাগারে রাখা হয়েছিল, ফলে দীর্ঘ কারাবাসের প্রভাবে নির্জনতা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। [৩] যা-ই হোক, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য তিনি মাঝে মাঝে রাতে ছদ্মবেশে টহল দিতেন। তিনি তিন বছর শাসন করেন। [৪]

এই সময়ে কোনো বহিঃশত্রুর সাথে যুদ্ধ হয়নি এবং খলিফা নিশ্চিত্তে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং ইসলাম বিরোধী বিষয়গুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন। উসমান সালেসের শাসনামলে কিছু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল যা দমন করা হয়। কুর্দিদের বিদ্রোহ ছিল অস্বাভাবিক, তবে তা প্রশমিত করা হয়েছিল। [৫]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানীয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩২৫

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানীয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩২৫

[৩] তারিখু সালাতিন বানি উসমান: পৃষ্ঠা ১০৯

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪

[৫] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১২১

সুলতান মোস্তফা সালেস বিন আহমদ সালেস

১১৭১ হিজরি থেকে ১১৮৭ হিজরি

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ

মোস্তফা সালেস ৪৩ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন যাতে প্রতিটি শহরের অবস্থা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে জানা যায়। এই সময়ে সিরীয় আরবরা বিদ্রোহ করে হাজীদের কাফেলা লুট করা শুরু করেছিল, কিন্তু সদরে আজম রাঘিব পাশা একটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনেন। [১]

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও চুক্তি:

মোস্তফা সালেস বুঝতে পেরেছিলেন যে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে খেলাফতের জন্য এক বিরাট হুমকি। তিনি জানতেন যে জার পিটার দ্য গ্রেটের অসিয়ত অনুযায়ী ইস্তাম্বুল জয় করে উসমানীয় সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করা রুশ সরকারের প্রধান লক্ষ্য। তাই মোস্তফা সালেস রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিতে থাকেন। সদরে আজম রাঘিব পাশা রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রুশিয়ার সাথে একটি প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতা চুক্তিও করেন। [২]

উন্নয়নমূলক কাজ:

এই যুগে জলপথ ও স্থলপথের বাণিজ্যিক রুটগুলো সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। সদরে আজম রাঘিব পাশা দজলা নদীকে খালের মাধ্যমে কৃষ্ণ সাগরের সাথে যুক্ত করার একটি পরিকল্পনাও অনুমোদন করেন যাতে ব্যবসায়ীদের জাহাজগুলো ভারত মহাসাগর থেকে সরাসরি ইস্তাম্বুল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিন্তু এই পরিকল্পনা শুরু হওয়ার আগেই ১১৭৬ হিজরি (১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে রাঘিব পাশার মৃত্যু হয় এবং এই কাজটি স্থগিত হয়ে যায়।

[৩]

পিটার দ্য গ্রেটের অসিয়তনামা:

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের বিবরণ দেওয়ার আগে এখানে পিটার দ্য গ্রেটের সেই চৌদ্দ দফা অসিয়তনামা উল্লেখ করা সমীচীন মনে হচ্ছে...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইয়াগি, পৃষ্ঠা ১২২।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ৩৩০ থেকে ৩৩১।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ৩১৪।

- এর সারসংক্ষেপ পেশ করা হচ্ছে যা আজ পর্যন্ত রুশ শাসকদের জন্য একটি ইশতেহারের মর্যাদা রাখে, যাতে আমরা এই জাতির কৌশল ও লক্ষ্যসমূহ ভালোভাবে বুঝতে পারি।
- বাহিনীকে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত রাখা হোক। যদি বিশ্রাম দেওয়া জরুরি হয়, তবে আক্রমণের জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে এবং সুযোগ পাওয়ামাত্রই তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করতে হবে। রাশিয়ার উচিত সন্ধি ও শান্তির সময়কে যুদ্ধের শক্তির উৎস হিসেবে গড়ে তোলা এবং যুদ্ধকে সন্ধি ও শান্তির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা।
 - যুদ্ধ চলাকালীন সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনার জন্য সেই সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা হোক, যেগুলোর সাথে ইউরোপীয় জাতিগুলো ভালোভাবে পরিচিত। শান্তির সময়েও বিজ্ঞান ও কলার বিশেষজ্ঞদের সেবা গ্রহণ করা হোক। সমস্ত দেশের ভালো বিষয়গুলো থেকে উপকৃত হতে হবে।
 - সুযোগ পাওয়ামাত্রই ইউরোপীয় দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয় ও স্বার্থে হস্তক্ষেপ করতে হবে, বিশেষ করে মতভেদ ও বিরোধের সময়।
 - অন্য দেশগুলোতে ফিতনা-ফ্যাসাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা ছড়ানোর জন্য ঘুষ প্রদান এবং অর্থ ব্যয় করতে হবে।
 - রুশ রাজপরিবারের জন্য আবশ্যিক হলো তারা যেন ইউরোপীয় রাজপরিবারগুলোতেই বিবাহ সম্পন্ন করে, যাতে ওই দেশগুলোতে আমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।
 - “আসোজ” রাষ্ট্রের কিছু জনপদের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে হবে, এরপর বাকি এলাকাগুলোর ওপরও আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। [১]
 - নিজেদের নৌ-শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেনের সাথে ঐক্য, সংহতি ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।
 - রাশিয়ার উচিত দিন দিন উত্তরে বাল্টিক সাগর এবং দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকা।
 - ইস্তাম্বুল ও হিন্দুস্তানের দিকে যতটা সম্ভব অগ্রসর হতে হবে। কারণ এটি ধ্রুব সত্য যে, যে ইস্তাম্বুল শাসন করবে, সে সারা বিশ্ব শাসন করতে পারবে। এজন্য নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে; কখনো তুরস্কের সাথে, কখনো ইরানের সাথে। এভাবে পর্যায়ক্রমে কৃষ্ণ সাগরের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করতে হবে।
 - অস্ট্রিয়ার সাথে ঐক্য ও সংহতির বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে।
 - তুর্কিদেরকে রুমি (যুগোস্লাভিয়া ও গ্রিস) থেকে বিতাড়িত করতে অস্ট্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে, তবে ইস্তাম্বুল দখলের পর আমাদের উচিত অস্ট্রিয়ার ওপর ইউরোপের প্রাচীন রাজ্যগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া।
 - হাঙ্গেরি ও সুলতানাত-এ-উসমানিয়ায় বসবাসরত সেইসব নাসারাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে যারা (রোমের) পোপের বিরোধী, যাতে রুশ সরকারই তাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হতে পারে।

[১] পোল্যান্ডের মতো এটিও ইউরোপ ও রুশ সীমান্তের মাঝে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল।

- ৩. ইউরোপীয়, ইরানি এবং উসমানীয় শত্রুদের পরাভূত করার পর আমরা কৃষ্ণ সাগর এবং বাল্টিক সাগরের মাঝখানে আমাদের সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করব। এরপর আমরা প্রথমে ফ্রান্স এবং তারপর অস্ট্রিয়ার সাথে আলোচনা করব যে কীভাবে বিশ্বের সরকারগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে গ্রাস করা যায়। যখন রাশিয়া সমগ্র পূর্ব বিশ্ব এবং পশ্চিম ইউরোপ জয় করে নেবে, তখন ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়াকেও দমন করা সহজ হবে।
- ৪. ধরা যাক যদি এই উভয় দেশ আমাদের নিয়ন্ত্রণে না আসে, তবে আমরা তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও মতভেদ উসকে দিয়ে তাদের একে অপরের সাথে লড়িয়ে দেব। [১]

এই ওসিয়তনামা থেকে কেবল প্রতিবেশী দেশগুলোই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য রাশিয়ার বিপজ্জনক পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এবং পরাজয়:

১১৮২ হিজরি (১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সালে রাশিয়ার উস্কানিতে তার পাঁচজন কসাক শাসক তুরস্কের সীমান্তে আক্রমণ শুরু করে। যদিও খিলাফতের সমর্থক ত্রিমিয়ার তাতার খানরা কসাকদের বিতাড়িত করেছিল, কিন্তু এই সময়ে রুশ জেনারেল গ্যালিৎসিন অগ্রসর হয়ে সীমান্ত শহর ‘খোতিন’ দখল করে নেন। ইস্তাম্বুল থেকে আমিন পাশা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে অবরোধ ভাঙার আশ্রয় চেষ্টা করেন কিন্তু তাতে সফল হননি।

এরপর আলী পাশাকে পাঠানো হয়, কিন্তু এই বাহিনী দিনিস্টার নদী পার হওয়ার সময় ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যায়। যে সৈন্যরা অন্য পাড়ে পৌঁছেছিল তারা রুশ কামানের গোলার আঘাতে শহীদ হয়ে যায়। এটি ৭ই জমাদিউল আউয়াল ১১৮৩ হিজরি (১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ) সালের ঘটনা। [২] এরপর রুশ বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে বোগদান এবং ওয়ালাচিয়া (রোমানিয়া) দখল করে নেয়।

রুশ নৌজাহাজ, দার্দানেলস-এর কাছে:

অন্যদিকে রুশ এজেন্টরা ষড়যন্ত্র করে ‘মোরিয়া’-তে বিদ্রোহ উসকে দেয় যা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে রাশিয়ার একটি নৌবহর এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে ইজমিরের কাছে উসমানীয় নৌবাহিনীর মুখোমুখি হয়। যদিও তারা পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু পিছু হটার পর তাদের দুটি জাহাজ চেশমে (ইজমির) বন্দরে পৌঁছে যায় যেখানে বিজয়ী উসমানীয় নৌবহর নোঙর করা ছিল। রুশ জাহাজগুলোর আকস্মিক গোলাবর্ষণে এক সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত জাহাজে বারুদের আধিক্যের কারণে আগুন ধরে যায়। এই সাফল্য রুশ জেনারেল এলফিনস্টোনকে বিশ্বাস করিয়ে দেয় যে দার্দানেলসে তুর্কিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল, তাই তিনি সরাসরি ইস্তাম্বুল বন্দরে এই ধরনের আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এর আগে তিনি তুরস্কের কাছে একটি সামরিক শিবিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং দার্দানেলস থেকে কিছুটা দূরে লেমনোস দ্বীপ জয়ের চেষ্টা শুরু করেন।

সুলতান তৃতীয় মোস্তফা এই সময়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন এবং হাঙ্গেরির একজন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ব্যারন ডি টটকে দার্দানেলসের উভয় তীরে দুর্গ নির্মাণ এবং সেখানে কামান স্থাপনের নির্দেশ দেন। সেই সাথে একটি নতুন কারখানা খুলে নতুন কামানের গোলার প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৪০।

[২] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফারিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৩৫; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১২৬।

কাজও শুরু করে দেওয়া হলো। সেই সাথে তিনি অস্ত্র নির্মাণ এবং আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার একটি মাদ্রাসা খোলেন, যার মাধ্যমে তরুণ তুর্কি অফিসাররা অল্প সময়ের মধ্যেই অস্ত্র নির্মাণ এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশলে দক্ষতা অর্জন করে।

এই প্রশিক্ষণের ফলে কুবতান (ক্যাপ্টেন) হাসান বেগ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ১১৭৭ হিজরি (১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) সালে লেমনোস দ্বীপে পৌঁছান এবং রুশ বাহিনীকে মুহূর্তের মধ্যে পলায়ন করতে বাধ্য করেন। [১]

রুশদের পিছু হটা, জুলুম এবং কাপুরুষতা:

এভাবে রাশিয়ার সাথে চলমান এই যুদ্ধের বেশ কয়েকটি পর্যায়ে তুর্কিদের পাল্লা ভারী ছিল। আরও কিছু লড়াই এবং আলোচনার কয়েক দফা পর ২৩ জিলকদ ১১৮৬ হিজরি (১৫ নভেম্বর ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিনের দূত যুদ্ধবিরতির জন্য কিছু শর্ত পেশ করেন:

- ১. سلطنة عثمانیه (উসমানীয় সাম্রাজ্য) ত্রিমিয়া, কেচ দুর্গ এবং বেশ কিছু দুর্গের এলাকা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।
- ২. রুশ জাহাজগুলোকে কৃষ্ণসাগর এবং গ্রিক দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশে চলাচলের অবাধ অনুমতি দিতে হবে।

খলিফা তৃতীয় মোস্তফা এই শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেন, যার ফলে দানিউব নদীর তীরে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। এখানে “বুখারেস্ট”-এর দক্ষিণ-পূর্ব শহর “সিলিস্টিয়া” এবং দক্ষিণ-পশ্চিম শহর “রুসচুক”-এর ওপর দখল বজায় রাখার জন্য রুশরা আগ্রাণ চেষ্টা চালায়, কিন্তু উভয় স্থানেই তারা পরাজিত হয় এবং আট হাজারের বেশি লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। যাওয়ার সময় তারা নিজেদের ক্ষোভ মেটানোর জন্য “বাজারজিক” নামক একটি ছোট শহরে ঢুকে পড়ে এবং নির্বিচারে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ ও নারীকে হত্যা করে। এরপর রুশ অফিসাররা দস্তুরখান সাজিয়ে খেতে বসেছিল, এমন সময় তুর্কি বাহিনীর ধাওয়া করে আসার খবর পায়। এতে তারা আতঙ্কিত হয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় নিজেদের সীমান্তের দিকে পালিয়ে যায়। তুর্কিরা যখন শহরে প্রবেশ করল, তখন হাঁড়ি ও কড়াইগুলোতে মাংস রান্নারত অবস্থায় পড়ে ছিল। [২]

এই ঘটনা থেকে রুশদের নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি তাদের কাপুরুষতারও ভালো ধারণা পাওয়া যায়।

রাশিয়ার উস্কানিতে মিশরে বিদ্রোহ:

রাশিয়া উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে গোপন যুদ্ধও চালিয়ে যাচ্ছিল এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটিয়ে তুরস্ককে টুকরো টুকরো করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে মিশরের আমির ছিলেন আলী বেগ, যাকে রুশ দূতরা রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে এবং এই নিশ্চয়তা দেয় যে, তাকে একজন স্বাধীন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বদা পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। সিরিয়ার উপকূলীয় শহর এক্কার শাসক জহির ওমরও এই ষড়যন্ত্রে শরিক হন। এরপর ১১৮৬ হিজরি (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ) সালে আলী বেগ মিশরের স্বাধীন শাসক হওয়ার দাবি করেন। কিছুদিন পর তিনি মিশর থেকে সৈন্য নিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছান, যেখানে জহির ওমরের সহায়তায় তিনি জাফা, সাইদা এবং বৈরুত আক্রমণ করেন। এই সময়ে রুশ নৌবাহিনী তাকে সাহায্য করছিল, তাই সাময়িকভাবে তিনি কিছু সাফল্য লাভ করেন।

[১] কুবতান বা কাপ্তান তুর্কি নৌবাহিনীর একটি উচ্চপদ ছিল। এই শব্দটি ফারসি এবং উর্দুতে কাপ্তান এবং ইংরেজিতে ক্যাপ্টেন হয়েছে।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৯।

কিন্তু সে মিশরে ফিরে আসতেই সেখানে উসমানীয় জেনারেল মুহাম্মদ বেগ তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। বিদ্রোহীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং আলী বেগের শিরশ্ছেদ করা হলো। মুহাম্মদ বেগ এর পরপরই তাহের উমরকে দমনের জন্য আক্কায়ে পৌঁছালেন। যদিও মুহাম্মদ বেগ শহরটি পুনরুদ্ধার করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু উসমানীয় বাহিনী যুদ্ধ অব্যাহত রাখে এবং আক্কায়ে মুক্ত করে তাহের উমরকে বন্দি করে। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। [১]

সুলতান মোস্তফা তৃতীয়-এর মৃত্যু:

রাশিয়ার সাথে ছয় বছরের যুদ্ধে ক্রমাগত দুশ্চিন্তা এবং নিজের এলাকা হাতছাড়া হওয়ার শোকে সুলতান মোস্তফা তৃতীয়-এর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে এবং তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৮ জিলকদ ১১৮৭ হিজরি (২১ জানুয়ারি ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে তার মৃত্যু হয়। তার বয়স ছিল ৫৭ বছর। তিনি ষোলো বছর ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করেন এবং জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন। যদিও তার শাসনামলে রাশিয়া অনেক এলাকা দখল করে নিয়েছিল যা আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তবুও তিনি প্রতিপক্ষকে সমানভাবে আঘাত করেছিলেন এবং তাদের শর্তের কাছে মাথা নত করেননি। [২]

তিনি দানশীল ও দয়ালু ছিলেন, তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। ইস্তাম্বুলের পূর্ব দিকের এলাকা উস্কুদারে তিনি তার পিতার কবরের পাশে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন। সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ মসজিদটি মেরামত করে তিনি তা মজবুত করেন। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৩৯, ৩৪০, ৩৫৯

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগী: ১২৩

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৪০

সুলতান আব্দুল হামিদ আউয়াল বিন আহমদ সালিছ

১১৮৭ হিজরি থেকে ১২০৩ হিজরি

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ

মুস্তফা সালিছের পর তার ভাই ৪৯ বছর বয়সী আব্দুল হামিদ আউয়াল, যিনি তার ভাইয়ের শাসনামলে নজরবন্দি ছিলেন, খিলাফতের মসনদে বসেন। তিনি সুলতান আহমদ সালিছের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি ১৫ বছর ৩ মাস শাসন করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ এবং কুচুক কায়নারজা চুক্তি:

তার সিংহাসন আরোহণের সময় রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলছিল। মুস্তফা সালিছের মৃত্যুতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের (বাব-ই আলী) যে ক্ষতি হয়েছিল, রাশিয়া তার পূর্ণ সুযোগ নেয় এবং জুন ১৭৭৪ (রবিউস সানি ১১৮৮ হিজরি) সালে রাশিয়ার ফিল্ড মার্শাল রুমানজভ বিক্ষিপ্ত সমস্ত বাহিনীকে একত্রিত করে দানিউব নদী পার হয়ে “ভার্না” শহরের দিকে অগ্রসর হন। তুর্কি জেনারেল আব্দুর রাজ্জাক আফেন্দি রুশ বাহিনীকে থামানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু ২০ জুলাই ১৭৭৪ (১১ জমাদিউল আউয়াল ১১৮৮ হিজরি) সালে শুমলার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রুশদের বিজয় হয় এবং তারা সদর-ই আজম মুহসিনজাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে।

সদর-ই আজম নিজের দুর্বলতা দেখে সন্ধির প্রস্তাব দেন, এভাবে বুলগেরিয়ার কুচুক কায়নারজা শহরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো ছিল:

- রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।
- উভয় পক্ষ একে অপরের বিদ্রোহী ও অপরাধীদের আশ্রয় দেবে না।
- “ক্রিমিয়া”কে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে; উসমানীয় বাহিনী সেখান থেকে চলে যাবে। সেখানকার জনগণ নিজেদের শাসক নিজেরাই নির্বাচন করবে। তাদের ওপর কোনো কর (খরাজ) ধার্য হবে না। তবে ধর্মীয় বিষয়ে তারা খলিফার দিকনির্দেশনা গ্রহণ করবে।
- রুশ রাষ্ট্রদূতকে খিলাফতের দরবারে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হবে এবং পূর্বের তিক্ততার জন্য ক্ষমা চাওয়া হবে।
- খিলাফত তার সীমানায় খ্রিস্টানদের অধিকার রক্ষা করবে এবং তাদের গির্জাগুলোতে হস্তক্ষেপ করবে না।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেক মুহাম্মদী: পৃষ্ঠা ৩৪১।

- ৬. রুশ পাদ্রী, বাইতুল মুকাদ্দাসসহ অন্যান্য ধর্মীয় স্থানে ভ্রমণের জন্য স্বাধীন হবে।
- ৭. রুশ জাহাজ ও বণিকদের কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সমস্ত বন্দরে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে।
- ৮. রুশ সরকারকে আফ্রিকান দেশগুলোতে বাণিজ্যিক বিষয় ও চুক্তিতে অনুমতি দেওয়া হবে।
- ৯. রুশ সরকার ইস্তাম্বুলের মহাসড়কে একটি গির্জা নির্মাণ করবে।
- ১০. রাশিয়া কৃষ্ণসাগরের যে দ্বীপগুলো উসমানীয় খিলাফতের অধীনে ফিরিয়ে দেবে, সেখানকার বাসিন্দাদের সাধারণ ক্ষমা ও পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে এবং তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করা হবে না। [১]

সন্ধির সমাপ্তি এবং পুনরায় যুদ্ধ:

এই চুক্তির অনুমোদনে রাশিয়া নিজেকে বিজয়ী মনে করল, বরং সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন খুশিতে আত্মহারা হয়ে মস্কোতে উৎসব পালন করলেন, কারণ ইতিহাসের প্রথমবারের মতো তুরস্ক তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী শর্তে সমঝোতা করেছিল।

এই সময়ে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়া পোল্যান্ডের বড় অংশ দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। এভাবে রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ভৌগোলিক বাধাগুলো প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর রাশিয়া তার পূর্ণ মনোযোগ তুরস্কের সাথে যুদ্ধের দিকে নিবদ্ধ করতে পারত।

ফলে রাশিয়া চুক্তিতে নিজের ওপর আরোপিত কোনো বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করেনি এবং “ক্রিমিয়া” থেকে তুর্কি বাহিনী চলে যাওয়ার পর সেখানে সত্তর হাজার সৈন্য মোতায়েন করে তা কার্যত দখল করে নেয়।

খলিফা আব্দুল হামিদ আউয়াল এই সংবাদ পেয়ে সন্ধি বাতিল করে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত তাকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন যে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সাথে গোপন প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে এবং এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্যই হলো একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করে তুরস্ককে ধ্বংস করা।

খলিফা জানতেন যে সেই সময় তুরস্কের অবস্থা এত শক্তিশালী ছিল না যে একটি নতুন যুদ্ধে বিজয়ের আশা করা যায়, তাই ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার সাথে একীভূত করা সহ্য করে নেওয়া হলো। কিন্তু রাশিয়ার বাড়াবাড়ি বেড়েই চলছিল, তারা সেভাস্টোপল উপকূলে দুর্গ নির্মাণ শুরু করল এবং কৃষ্ণসাগরে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করল। রুশ গোয়েন্দারা উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশগুলোতে খ্রিস্টানদের বিদ্রোহে উস্কানি দিতে লাগল, যার পরিষ্কার অর্থ ছিল রাশিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

ফলাফল এই দাঁড়াল যে ১৭৮৭ সালের আগস্টে (শাওয়াল ১২০১ হিজরি) বাবে আলীও সন্ধি বাতিল করে রুশ রাষ্ট্রদূতকে থ্রেপ্তার করে যুদ্ধের ঘোষণা দিল। এই সময়ে ক্যাথরিনের অনুরোধে অস্ট্রিয়ার শাসক দ্বিতীয় জোসেফও যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। তিনি “শাবাশ” কে কেন্দ্র বানিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বেলগ্রেড দখল করে নিলেন। কিন্তু এই সময়ে উসমানীয় প্রধান উজির ইউসুফ পাশা ইস্তাম্বুল থেকে দ্রুত কুচকাওয়াজ করে বিশাল বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন, তিনি ১৭ সেপ্টেম্বর ১৭৮৮ সালে (১৯ জিলহজ ১২০২ হিজরি) কুশতিস উপত্যকায় জোসেফকে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়ায়্যাহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৪০-৩৫১।

দাইমের বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিল। অস্ট্রিয়ার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য বন্দী হলো। অস্ট্রিয়ার রাজা জোসেফ দ্বিতীয় অল্পের জন্য গ্রেপ্তার হওয়া থেকে বেঁচে পালিয়ে গেলেন এবং বেলগ্রেড পুনরায় তুর্কিদের দখলে চলে এল।

অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ জেনারেল পটেমকিন ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম বন্দর “বেভার” এবং “ওজি” দখল করে নিয়েছিলেন। ওজিতে তুর্কি সৈন্যদের পাশাপাশি ২৫ হাজার নিরপরাধ নাগরিককেও হত্যা করে রক্তের নদী বইয়ে দেওয়া হয়েছিল। [১]

এই যুদ্ধ চলাকালীন ১২ই রজব ১২০৩ হিজরি (১৮ই এপ্রিল ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) সুলতান আব্দুল হামিদ আউয়ালের মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স ছিল ৬৬ বছর, তিনি পনেরো বছর আট মাস শাসন করেছিলেন। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৩৯, ৬৪০

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৯৬

সুলতান সেলিম খান তৃতীয় বিন মোস্তফা তৃতীয়

১২০৩ হি. থেকে ১২২২ হি.

১৭৮৮ খ্রি. থেকে ১৮০৭ খ্রি.

সুলতান মোস্তফা তৃতীয়-এর পুত্র সেলিম খান তৃতীয়, তাঁর চাচা আব্দুল হামিদের পর সিংহাসনে আরোহণ করলে যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ড পূর্ণ তীব্রতায় জ্বলছিল। যদিও তুর্কিদের সাহস ভেঙে পড়ছিল, কিন্তু সেলিম তৃতীয় অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন এবং জিহাদের পতাকাকে অবনমিত হতে দেননি।

জাতির উদ্দেশ্যে উদ্দীপনামূলক ভাষণ:

তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর জাতির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্বোধন করে একটি উদ্দীপনামূলক ভাষণ দেন, যাতে অতীতে পিছু হটার কারণগুলো উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানদের দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ ত্যাগ করাই এই পরাজয়গুলোর আসল কারণ। তিনি জিহাদ, কোরবানি এবং আত্মত্যাগের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেই শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব যারা মুসলমানদের এলাকা দখল করে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে হত্যা ও বন্দি করেছে; এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ না ত্রিমিয়া প্রদেশ পুনরুদ্ধার করা হয়। [১]

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও রণকৌশল:

সেলিম তৃতীয় স্পেন, ফ্রান্স এবং প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন এবং সদরে আজমকে নির্দেশ দেন যেন সকল ফ্রন্টে, বিশেষ করে দানিউব নদীর তীরে সেনাবাহিনী সক্রিয় রাখা হয়। তিনি সেনাবাহিনীর বাজেট এবং প্রতিরক্ষা ব্যয়ে এত বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি করেন যা বিগত সময়গুলোতে কখনো করা হয়নি। [২]

তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু হোসেন পাশাকে আমীরুল বাহর নিযুক্ত করেন এবং স্থলবাহিনীর কমান্ড হাসান পাশার হাতে ন্যস্ত করেন। রুশ সীমান্তবর্তী দুর্গ “ইসমাইল”-এ একজন আমীর নিযুক্ত করে তাকে নির্দেশ দেন যে, সে যেন যেকোনো মূল্যে ওজি দুর্গটি রুশদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে, এবং স্থলপথে...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৪২০

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৪২০

...থেকে ত্রিমিয়ার দিকে আক্রমণ করে। [১]

তৃতীয় সেলিম রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে মিত্রদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে সুইডেনের সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন এবং তাদের কাছে দাবি করেন যে তারা যেন উত্তর দিক থেকে রাশিয়া আক্রমণ করে। এই সেবার বিনিময়ে তাকে দশ বছর পর্যন্ত বার্ষিক একটি বিশাল অংকের অর্থ প্রদান করা হবে। [২]

রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ। শান্তি চুক্তি:

ফোকশানি রণাঙ্গনে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বাহিনী একসাথে পৌঁছে। এখানে ১ আগস্ট ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে (৮ জিলকদ ১২০৩ হিজরি) যুদ্ধে তুর্কি সেনাপতি মোস্তফা পাশা ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মিত্রবাহিনীর প্লাবনের মোকাবিলা করেন এবং তাদের পিছু হটতে বাধ্য করেন। তুর্কি বাহিনী অগ্রসর হয়ে অস্ট্রিয়ার সীমান্তে রিমনিচ নদী পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, এমন সময় একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে রুশ ও অস্ট্রিয়ান বাহিনী “বুজাউ” এর ময়দানে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তুর্কিরা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ২২ সেপ্টেম্বর ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে (১ মহরম ১২০৪ হিজরি) সংঘটিত এই যুদ্ধে তুর্কিরা পরাজিত হয় এবং তাদের ২৩ হাজার মুজাহিদ শহীদ হন। এরপর অস্ট্রিয়া ওয়ালাচিয়ার কেন্দ্র বুখারেস্ট এবং রাশিয়া মলদাভিয়ার রাজধানী ইয়াশ দখল করে নেয়। [৩]

এই পরাজয় উসমানীয় সালতানাতের প্রতিরক্ষার ওপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং এরপর নতুন কোনো প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি করা সম্ভব ছিল না। ফলে তুর্কি বাহিনী দানিউব নদীর দক্ষিণ দিকে পিছু হটে যায় এবং রোমানিয়ার সাথে তাদের স্থল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৮ অক্টোবর (২৭ মহরম) অস্ট্রিয়ার জেনারেল লাউডন তিন সপ্তাহের অবরোধের পর বেলগ্রেডও দখল করে নেন।

এরপর অস্ট্রিয়ান বাহিনী দানিউব নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তুর্কিদের পাল্টা আক্রমণে তারা পাঁচ হাজার লাশ এবং এক হাজার বন্দি রেখে পিছু হটে যায়। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে অস্ট্রিয়ার পক্ষে দানিউব নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে গাজী হাসান পাশা ২৩ সেপ্টেম্বর (৪ মহরম) ইসমাইল উপত্যকায় রুশ জেনারেল পটেমকিনকে পনের হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

এই যুদ্ধ পরবর্তী বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ: কিলি, ইসমাইল, তুলচা এবং “ইসাকচি” রাশিয়ার দখলে চলে আসে। ইসমাইল শহর দখলের পর জেনারেল পটেমকিন ত্রিশ হাজার মুসলমানকে তলোয়ারের নিচে ফেলে নিজের পাশবিকতার প্রমাণ দেন। তিন বছর দশ মাস স্থায়ী এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি। ব্যাপক জানমালের ক্ষতির পর ৪ আগস্ট ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে (৩ জিলহজ ১২০৫ হিজরি) অস্ট্রিয়া শান্তি চুক্তি করে বেলগ্রেড ও ওয়ালাচিয়া থেকে সরে দাঁড়ানো গ্রহণ করে।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহজ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি - পৃ. ৩৪১

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহজ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি - পৃ. ৩৪১

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ: ১/৯২; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহজ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি - পৃ. ৩৪১-৩৪২

৯ জানুয়ারি ১৭৯২ (১৩ জমাদিউল আউয়াল ১২০৬ হিজরি), রাশিয়াও ব্রিটেনের সহযোগিতায় আলোচনার পর সন্ধি চুক্তি গ্রহণ করে নেয়, যার শর্তানুযায়ী:

- বেন্দার, আকেরমান, বেসারাবিয়া, পোডোলিয়া এবং ওচাকভ তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হয়।
- আজভ বন্দর, ক্রিমিয়া উপদ্বীপ, তামান উপদ্বীপ, বালাক্লাভা এবং কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে বাগ ও ডিনিস্টার নদীর মধ্যবর্তী এলাকাগুলো তাদের দুর্গসহ রাশিয়ার হাতে তুলে দেওয়া হয়।
- ডিনিস্টার নদীকে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ করা হয়।
- বন্দি বিনিময় করা হয় এবং প্রজাদের সাধারণ ক্ষমা, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং যেকোনো স্থানে বসবাস বা স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হয়। [১]

চুক্তিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আগ্রহের কারণ:

এই চুক্তি সম্পাদনে ব্রিটেন এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়েছিল, যার কয়েকটি কারণ ছিল:

- যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত লাগছিল, যা তারা শান্তির সময়ে কৃষ্ণসাগর, আজভ সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের পথগুলো থেকে অর্জন করত। তাছাড়া রাশিয়ার মোকাবিলায় তারা উসমানীয় সালতানাতকে একটি শক্তিশালী বাধা মনে করত। এটা স্পষ্ট যে মুসলমানদের কল্যাণের সাথে তাদের কোনো স্বার্থ ছিল না, বরং তারা রাশিয়ার পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করছিল। তাই তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য উসমানীয় সালতানাত টিকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে একই সাথে তারা উসমানীয় সালতানাতের স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষেও ছিল না। এই কারণে বন্ধুত্বের দাবি করা সত্ত্বেও সুইডেনসহ কোনো ইউরোপীয় দেশ তুরস্ককে কার্যত সাহায্য করেনি, কারণ তারা উসমানীয় সালতানাতের স্থিতিশীলতাকেও নিজেদের জন্য হুমকি মনে করত।
- ইউরোপে পোপতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করার আন্দোলনের সাফল্যের পর এখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এসে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রভাব অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতেও দেখা যাচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ইউরোপীয় শাসক পূর্ব ইউরোপে শুরু হওয়া যুদ্ধকে তাদের ক্ষমতার জন্য হুমকি মনে করে শান্তি ও নিরাপত্তা চাচ্ছিলেন, যাতে তারা অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার দিকে মনোনিবেশ করে গণতন্ত্রের পথ রোধ করতে পারেন।
- ফ্রান্স নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ইউরোপের সবচেয়ে বড় শক্তিতে পরিণত হচ্ছিল এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর কাছ থেকে শত বছরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছিল। নেপোলিয়নকে থামানোর জন্য এটি জরুরি ছিল যে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে উসমানীয় সালতানাতের সাথে সংঘর্ষ থেকে বাঁচিয়ে ফ্রান্সের মোকাবিলায় দাঁড় করানো হয়।

রাশিয়া ও ইউরোপের প্রাপ্ত সুবিধা:

যদিও এই চুক্তিটি উসমানীয় সালতানাতের প্রতিরক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং পরবর্তী যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু রাশিয়া ও ইউরোপ এর মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জন করে, যেমন:

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ: ইলমাজ, ১/৬৩১-৬৩২; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ: আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত: ড. সাল্লাবি, পৃষ্ঠা ৩২৩।

- দানিউব নদীর ওপারে উসমানীয় সালতানাতের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যায় এবং পূর্ব ইউরোপে তাদের সেনাবাহিনী অত্যন্ত রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে আসে।
- আজভ, ওডেসা এবং সেভাস্টোপোলের মতো বন্দরগুলো রুশ নৌবাহিনীর ঘাঁটিতে পরিণত হয়।
- দানিউব নদী, দানিউব উপত্যকা, দিনিস্টার নদী এবং প্রুথ নদীর বদ্বীপ অঞ্চল রুশদের দখলে চলে আসে।
- রাশিয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলো উসমানীয় সালতানাতকে প্রথমে দুর্বল, তারপর পঙ্গু এবং পরিশেষে ধ্বংস করার এই যৌথ লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়, যার জন্য তাদের রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, কবি এবং সাহিত্যিকরা দীর্ঘকাল ধরে আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন। পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিরোধ থাকা সত্ত্বেও উসমানীয় খিলাফতের পতন ছিল তাদের সবার অভিন্ন লক্ষ্য।

ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব:

উসমানীয় সালতানাত এবং ফ্রান্সের মধ্যে চার শতাব্দী ধরে কোনো যুদ্ধ হয়নি। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দ (৭৯৮ হিজরি) সালে “নিকোপোলিস”-এর যুদ্ধ ছিল এই দুই দেশের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধ। এরপর রাজনৈতিক মতপার্থক্য বা উত্তেজনার সৃষ্টি হলেও নিয়মিত কোনো যুদ্ধ হয়নি। বরং সুলতান সুলাইমান আল-শানের আমলে ফ্রান্সের সাথে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। তৃতীয় সেলিমের সিংহাসন আরোহণের কয়েক মাস পর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ (১২০৩ হিজরি) সালে ফ্রান্সে যে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এবং শেষভাগে ফ্রান্সে রাজা চতুর্দশ লুইয়ের শাসন ছিল। জনগণ শাসকদের অত্যাচার এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। পদমর্যাদা থেকে শুরু করে সম্মান ও আভিজাত্য পর্যন্ত সবকিছুই কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হয়েছিল। দুর্নীতিবাজ ও অসৎ ব্যক্তিদের আধিপত্যের পথ উন্মুক্ত ছিল। করের বোঝা সাধারণ মানুষের কোমর ভেঙে দিয়েছিল, অথচ ধনী ব্যক্তির ঘুষ দিয়ে কর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। এই পরিস্থিতিতে দেশে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপীয় দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদিও ছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে ধর্মকে সেকেলে এবং রাজতন্ত্রকে অনুপযুক্ত আখ্যা দিয়ে যুক্তিবাদ ও গণশাসনের পক্ষে আওয়াজ তুলছিল। স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য ছিল তাদের প্রধান স্লোগান। এই চিন্তাধারাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে রুশো, মন্টেস্কু এবং ভলতেয়ারের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যদিও তাদের মতামতে পার্থক্য ছিল, তবুও ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তারা সবাই একমত ছিলেন। ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রি.) সামাজিক মূল্যবোধের সমালোচক ছিলেন এবং গির্জাকে একটি কলঙ্কিত প্রতিষ্ঠান বলতেন। তবে তিনি গণতন্ত্রের তুলনায় একজন নিরঙ্কুশ শাসকের সমর্থক ছিলেন এবং বলতেন যে, একশটি ইঁদুরের পরিবর্তে একটি সিংহের আনুগত্য করা ভালো। মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রি.) বলতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতার বিভাজন না হবে, ততক্ষণ কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জিত হবে না। তার মতে, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ এবং আইনসভা—এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে জনগণের স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। মন্টেস্কুর বিখ্যাত গ্রন্থ “Spirit of Laws”, যা ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দ (১১৬১ হিজরি) সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ইউরোপে প্রজাতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.) বলতেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে মানুষকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া উচিত, সে নিজেই নিজের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা বেছে নেবে। এই ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ হবে মানুষের এমন এক সরকার দ্বারা যার প্রধান লক্ষ্য হবে মানুষের স্বাধীনতায় যথাসম্ভব বৃদ্ধি ঘটানো।

ইহুদিদের এই আন্দোলনের প্রতি আগ্রহ ছিল কারণ স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে তারা সহজেই উন্নতি লাভ করতে পারত। তাই তাদের গোপন সংগঠন ফ্রিম্যাসন গণতন্ত্রের পথ সুগম করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। [১]

ফ্রান্সে গণতন্ত্র:

আঠারো শতকের শেষের দিকে যখন ষোড়শ লুই রাজা হলেন, তখন সেনাবাহিনী এবং রাজতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভগুলো এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ১৭৮৯ সালে (শাবান ১২০৩ হিজরি) রাজা যখন তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধি: অভিজাত, ধর্মীয় নেতা এবং জনগণের প্রতিনিধিদের তলব করে এই প্রস্তাব দিলেন যে, দেশকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে আরও কর আরোপ করা প্রয়োজন, তখন জনগণের প্রতিনিধিরা তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে একটি দল গঠন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, জনগণের অধিকার ছাড়া দেশের নতুন সংবিধান প্রণয়ন সম্ভব নয়। ষোড়শ লুই সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করেন এবং অসংখ্য মানুষকে বাস্তিল কারাগারে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু জনগণের সশস্ত্র দলগুলো লড়াই শুরু করে এবং ১৪ই জুলাই কারাগার ভেঙে বন্দিদের মুক্ত করে নেয়।

অবশেষে রাজা বাধ্য হয়ে গণআন্দোলনকে দেশের নতুন সংবিধান প্রণয়নের অধিকার প্রদান করেন। গণতন্ত্রপন্থীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, দেশের সংবিধানে রাজার ভূমিকা সীমিত হবে এবং পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী হবে।

সে সময় রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া উসমানীয় সালতানাতের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অস্ট্রিয়া ফ্রান্সে বিপ্লব দেখে যুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন মনে করল এবং যুদ্ধবিরতির পরপরই প্রুশিয়াকে সাথে নিয়ে ফ্রান্সের রাজার সমর্থনের ঘোষণা দিল এবং তাকে আগের মতো ক্ষমতাধর করার দাবি জানিয়ে ১৭৯২ সালের এপ্রিলে ফ্রান্সে আক্রমণ করল। এটি দেখে ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক দল রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান:

এই সময়ে ফরাসি সেনাবাহিনীর এক তরুণ অফিসার নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সামনে আসেন এবং তিনি ফ্রান্সকে সংকটময় অবস্থা থেকে বের করে আনেন।

[১] ফ্রিম্যাসন ইহুদিদের একটি প্রাচীন গোপন সংগঠন যা কয়েক শতাব্দী ধরে একটি বিশ্বব্যাপী ইহুদি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় রয়েছে। এর সদস্যরা প্রতিটি দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিজেদের অনুসারী করার চেষ্টা করে। স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের স্লোগান দিয়ে তারা বাহ্যিকভাবে জনহিতকর কাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য প্রতিটি জাতির জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের তারা নিজেদের জালে আবদ্ধ করেছিল, যার ফলে তাদের ষড়যন্ত্র সফল হতে শুরু করে। ইহুদিদের আজকের বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যের পেছনে ফ্রিম্যাসন আন্দোলনের বড় হাত রয়েছে।

১৬৫ | তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

বের করে এক নতুন যুগে প্রবেশ করিয়ে দেন। নেপোলিয়ন ১৭৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ফ্রান্সের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের পর তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। নিজের অসাধারণ মেধা ও সামরিক দক্ষতার কারণে তিনি দ্রুত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পদে পৌঁছান এবং এরই মধ্যে প্রজাতন্ত্র আন্দোলনের একজন কর্মী হয়ে ওঠেন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর তার পদমর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ১৭৯৩ সালে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর।

যখন অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্রপন্থীদের দমনের জন্য ফ্রান্স আক্রমণ করে, তখন নেপোলিয়ন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দেশের সফল প্রতিরক্ষা করে দেখান। এই ধারাবাহিকতায় ১৭৯৬ থেকে ১৭৯৭ সাল পর্যন্ত একটি যুদ্ধ চলতে থাকে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেখানে নেপোলিয়ন তুলনামূলক কম সৈন্য নিয়ে অস্ট্রিয়ার বাহিনীকে চারবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেন। যখন তিনি প্যারিসে ফিরে আসেন, তখন তাকে একজন জাতীয় বীরের মতো অভ্যর্থনা জানানো হয়। যদিও তিনি তখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের সরকার ঘোষণা করেননি, তবে কার্যত তিনি ফ্রান্সের নেতা ছিলেন এবং জাতি তার পেছনে ছিল। [১]

নেপোলিয়নের মিশর দখল

অস্ট্রিয়া বিজয়ের পরপরই আটশ বছর বয়সী নেপোলিয়ন ১৭৯৮ সালে (১২১১ হিজরি) সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রওনা হন। এই আকস্মিক অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- ১. সুয়েজ খাল দখল করে তার শত্রু ব্রিটেনের সামরিক ও বাণিজ্যিক পথ বন্ধ করে দেওয়া, কারণ সেই সময় ব্রিটেন ভারতের উপকূলে পা রেখেছিল এবং তার ক্রমবর্ধমান শক্তি ফ্রান্সের জন্য চরম হুমকিস্বরূপ ছিল। [২]
- ২. ফ্রান্সের ইহুদিরা দীর্ঘকাল ধরে বায়তুল মুকাদ্দাসকে নিজেদের স্বদেশ বানানোর প্রচেষ্টায় ছিল। তারা ফ্রান্সের বিপ্লবে বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং নেপোলিয়নের সাথে এই শর্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিল যে, তাদের ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পাইয়ে দেওয়া হবে।
- ৩. নেপোলিয়ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পতাকাবাহী ছিলেন এবং ফ্রান্সের এই বিপ্লবকে প্রাচ্যের দেশগুলোতে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল যে, ব্যক্তিগত শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট মুসলিম জনগণও এই ধরনের বিপ্লবের অপেক্ষায় রয়েছে, তাই সেখানে এই পরিবর্তনকে সানন্দে গ্রহণ করা হবে। এই দিক থেকে নেপোলিয়নের এই অভিযান কেবল সামরিক ছিল না, বরং আদর্শিকও ছিল।

[১] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়াহ, নিবন্ধ: নেপোলিয়ন, নিবন্ধ: ফ্রান্স।

[২] সেই দিনগুলোতে মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। টিপু সুলতান ফ্রান্সের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। যখন ব্রিটিশরা তাকে তার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে ঘেরাও করে ফেলে, তখন তিনি নেপোলিয়নের কাছে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য সাহায্যের আবেদন করেন। নেপোলিয়ন এর জবাবে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যখন খেলাফতে উসমানিয়া এবং টিপুর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা জানা গেল, তখন ব্রিটিশরা টিপু সুলতানকে তাদের সাথে সন্ধি করতে এবং ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। টিপু সুলতান ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে খেলাফতে উসমানিয়ার বার্তায় কর্ণপাত করেননি। অবশেষে ফরাসিদেরসহ কারো সাহায্য ছাড়াই টিপু সুলতান ৪ মে ১৭৯৯ সালে তার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: সীরাতে সুলতান টিপু শহীদ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ/ইলিয়াস নদভী)।

যুদ্ধের এই দিকটিও ছিল এবং এই কারণেই তিনি ইউরোপের ১২৩ জন নামকরা পণ্ডিতকেও নিজের সাথে নিয়ে যাচ্ছিলেন। [১]

নেপোলিয়ন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি নৌবহর নিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভেনিস দখল করলেন। এরপর ১২ জুন ১৭৯৮ (২৬ জিলহজ ১২১২ হিজরি) তারিখে মাল্টা দ্বীপও জয় করে নিলেন। ১ জুলাই ১৭৯৮ (১৬ মহররম ১২১৩ হিজরি) তারিখে তিনি সমুদ্রের বুক চিরে ৩৫০টি জাহাজ এবং ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে পৌঁছে যান। খেলাফতে ওসমানিয়ার জন্য এই আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যার প্রতিরক্ষার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। তাই নেপোলিয়ন বিনা বাধায় আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, মিশরে একজন মিশরীয় শাসকই নিযুক্ত করা হবে।

ফরাসি বিজেতা কয়েক দিন পর কায়রোর দিকে যাত্রা করলেন। ১৩ জুলাই (২৮ মহররম) তুর্কি জেনারেল মুরাদ বেগ ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে কায়রোর মহাসড়কে তাকে থামানোর চেষ্টা করেন। এখানে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাকে “মারাকা রহমানি” (রহমানির যুদ্ধ) বলা হয়। মুসলমানরা প্রাণপণ লড়াই করলেও নেপোলিয়নের বিশাল বাহিনীর সামনে তাদের টিকেতে পারা সম্ভব হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পিছু হটতে হয়। ফরাসি বাহিনী অগ্রসর হতে হতে কায়রোর বাইরে সেই মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছে যায় যেখান থেকে পিরামিডের চূড়াগুলো দেখা যায়। এখানে আবু বকর পাশার ২০ হাজার সৈন্যের সাথে তাদের মোকাবিলা হয়। ২১ জুলাই ১৭৯৮ (৬ সফর ১২১৩ হিজরি) তারিখে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাকে “মারাকা আহরাম” (পিরামিডের যুদ্ধ) বলা হয়। এর আগে নেপোলিয়ন তার বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

“চল্লিশ শতাব্দীর ইতিহাস আজ এই পিরামিড থেকে তোমাদের দেখছে।”

আবু বকর পাশাও পরাজিত হলেন এবং নেপোলিয়ন কায়রোতে প্রবেশ করলেন। [২]

মুসলিম বিশ্বে নেপোলিয়নের কৌশল:

নেপোলিয়ন জানতেন যে মুসলমানরা ইসলামকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তাই তিনি মুসলিম বিশ্বে তার রাজনৈতিক কৌশল তিনটি পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে সাজিয়েছিলেন:

- ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং নাগরিকদের ইবাদত ও রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ না করা।
- মিশর ও সিরিয়াকে খেলাফতে ওসমানিয়ার অধীনতা থেকে বের করে আনা।
- ওই অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও গুণীজনদের জাতীয় সরকার গঠন করা।

তিনি ধর্মীয় বিষয়ে সহনশীলতা ও উদারতা প্রদর্শনের জন্য মিশরের নেতাদের সম্বোধন করে বলেছিলেন:

“আপনাদের বলা হয়েছে যে আমি আপনাদের দ্বীন মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছি। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। একে কখনো বিশ্বাস করবেন না। যারা এই বিভ্রান্তিতে আছে তাদের বলে দিন যে, আমি কেবল জালেমদের হাত থেকে আপনাদের অধিকার উদ্ধার করে আপনাদের মুক্ত করতে এসেছি। আমি মামলুকদের তুলনায় আল্লাহর বিধানকে বেশি মান্যকারী।”

[১] আদ-দাওলাতুল ওসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩২৬।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল ওসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৩৯, ৬৫০।

...এর রাসূল এবং কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। আল্লাহর নিকট সকল মানুষ সমান। কেবল বুদ্ধি, গুণাবলী এবং জ্ঞানই তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। [১]

বাব-এ-আলীর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা এবং এর প্রভাব:

এই সময়ে ব্রিটিশ জেনারেল নেলসন, যিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে ফরাসি নৌবহরের পিছু নিচ্ছিলেন, নিজের যুদ্ধজাহাজ নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে যান এবং ১লা আগস্ট আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে বন্দরে নোঙর করা ফরাসি জাহাজগুলোকে তছনছ করে দেন। এভাবে নেপোলিয়নের জন্য সমুদ্রপথ ব্যবহার করে সামনে অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এদিকে ২ সেপ্টেম্বর ১৭৯৮ (২০ রবিউল আউয়াল ১২১৩ হিজরি) বাব-এ-আলী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে জিহাদ ঘোষণা করে। যেহেতু নেপোলিয়নের উদ্দেশ্য ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ছিল, তাই ৩ জানুয়ারি ১৭৯৯ (২৩ রজব ১২১৩ হিজরি) ব্রিটেন এই যুদ্ধে তুরস্কের মিত্র হওয়ার ঘোষণা দেয়। এরপর নেপোলিয়নের ভয়ে ভীত রাশিয়ার জার-ও ১লা মে (২৩ জিলকদ) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। [২]

মিশরে নেপোলিয়নের দখলদারিত্বের ফলে, যা ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের চারশ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরাজয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শোক ও ক্ষোভের ঢেউ বয়ে যায়। সুলতান সেলিম তৃতীয় যখন জিহাদ ঘোষণা করেন, তখন চারদিক থেকে মুজাহিদগণ জিহাদের পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করেন। সেই সময়ের সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল-জাবারতির বর্ণনা হলো:

“যখন হিজাজে ফরাসিদের মিশরের ওপর দখলদারিত্বের খবর পৌঁছাল, তখন হিজাজবাসী অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন। তারা হারামে কান্নাকাটি করে দোয়া করলেন। শেখ কাইলানি মানুষকে ওয়াজ করে জিহাদের দাওয়াত দিতে এবং দ্বীন-এ-হকের সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। সকল মানুষ তার উপদেশ মেনে নিলেন এবং নিজেদের জান ও মালের কুরবানি দিতে সমবেত হলেন। চব্বিশশ মুজাহিদ, যাদের মধ্যে ইয়াবুর লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সমুদ্রপথে সুলতানের কাছে পৌঁছালেন।”

হিজাজের এই মুসলমানগণ মুরাদ বেগের নেতৃত্বে রওনা হলেন এবং বোনাপার্টের পক্ষ থেকে সাঈদ মিসরে নিযুক্ত জেনারেল ডিজির কঠিন প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হলেন। তাদের দুটির মধ্যে একটি সাফল্যের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল: শাহাদাত অথবা বিজয়। তারা এই কুরআনি আয়াতকে নিজেদের স্লোগান বানিয়ে নিয়েছিলেন: **انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا**... “তোমরা বের হও আল্লাহর পথে, হালকা অবস্থায় হোক বা ভারী অবস্থায়। এবং জিহাদ করো তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।” (আত-তাওবাহ: ৪১)। এই মুজাহিদগণ মিশর, হাওয়ারা এবং নুবিয়ার আরব স্বেচ্ছাসেবক এবং মুরাদ বেগের বাহিনীর সাথে মিলে সেই খ্রিস্টান বাহিনীর মোকাবিলা করেন, যাদের মধ্যে ফরাসি স্থল ও নৌবাহিনী ছাড়াও পাদ্রী ইয়াকুব ইউহান্নার নেতৃত্বে কিবতি...

[১] আজায়িবুল আসার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার, লেখক: আবদুর রহমান বিন হাসান আল-জাবারতি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮৩/৩।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, লেখক: ইলমাজ ওজতুনা: ৬৫০/১।

(মিশরীয় খ্রিস্টানরাও) অন্তর্ভুক্ত ছিল। [১]

কায়রোতে ফরাসিদের অত্যাচার:

নেপোলিয়ন এর জবাবে কায়রোর মুকাত্তাম পাহাড়ে কামান স্থাপন করেন এবং শহরের জিহাদের কেন্দ্র জামেয়া আল-আজহারের মহল্লাকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু বানান। এরপর ফরাসি সৈন্যরা শহরে ঢুকে পড়ে। তারা কায়রোর জনগণের ওপর নিকৃষ্টতম প্রতিশোধ নেয়। জামেয়া আল-আজহারের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো লুট করা হয়। শত শত নাগরিককে গ্রেপ্তার করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। শহরের অনেক ভবন ভেঙে সেখানে সামরিক ক্যাম্প তৈরি করা হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটপাটের সময় ফরাসিরা ঘোড়াসহ জামেয়া আল-আজহারে প্রবেশ করে এবং কুরআন মাজিদসহ ধর্মীয় কিতাবসমূহ মাটিতে ফেলে ঘোড়ার খুর দিয়ে মাড়িয়ে দেয়।

বেশ কয়েক দিন ধরে ফরাসি সৈন্যরা জামেয়া আল-আজহারকে তাদের আস্তানা বানিয়ে রাখে। অবশেষে ওলামাদের একটি প্রতিনিধি দল নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর জামেয়া আল-আজহার তাদের থেকে মুক্ত করায়। [১]

নেপোলিয়নের সিরিয়ার উপকূল দখল। আক্কার রণাঙ্গন:

নেপোলিয়ন ১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতে মিশর থেকে সিরিয়ার দিকে রওনা হন এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ (১৮ রমজান ১২১৩ হিজরি) গাজা অতিক্রম করে দ্রুত ফিলিস্তিনে পৌঁছে যান। ১৩ মার্চ (৫ শাওয়াল) তিনি জাফায় আক্রমণ করে দশ হাজার সৈন্য ও নাগরিককে হত্যা করেন। ১৯ মার্চ (১১ শাওয়াল) তিনি আক্কা অবরোধ করেন। এটি সেই শহর ছিল যেখানে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডার বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। এই সময় এখানকার উসমানীয় গভর্নর জাজ্জার আহমদ পাশা পূর্বসূরিদের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করে পরিখা খনন করে বীরত্বের সাথে নেপোলিয়নের মোকাবিলা করেন। এই সময়ে ইস্তাম্বুল ও ব্রিটেনের নৌবহর আক্কার সাহায্যে পৌঁছে যায়। নেপোলিয়ন আড়াই মাস পর্যন্ত আক্কা অবরোধ করে রাখেন কিন্তু শহরটি জয় করতে পারেননি। ব্রিটিশ জেনারেল নেলসন এই রণাঙ্গনে ফরাসি নৌবহরকে পরাজিত করে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। [২]

নেপোলিয়ন আক্কার রণাঙ্গনে বিশ্ব ইহুদিদের নামে তার বিখ্যাত ইশতেহার জারি করেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল “ফিলিস্তিনের আইনি উত্তরাধিকার”। এতে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, ফরাসি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের আবাসভূমি বানানোর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

[৩]

জামেয়া আল-আজহারের জিহাদ ঘোষণা:

মিশরের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ জামেয়া আল-আজহারের মাশায়েখগণ ফরাসি আক্রমণকে ক্রুসেড যুদ্ধ মনে করতেন এবং জানতেন যে এর লক্ষ্য হলো ইসলাম ও ইসলামি খেলাফত। সুলতান সেলিম তৃতীয়-এর জিহাদ ঘোষণার পর তারাও

[১] আজায়েবুল আসার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার: ৩/১২০

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৩৩

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৫০, ৬৫১

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩২৯

ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া দিয়ে জনগণকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। নেপোলিয়ন আক্কা রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন পেছনে মিশরের জনগণ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তারা ফরাসি সৈন্যদের কায়রো থেকে বের করে দেয়। [১]

মিশরে আফ্রিকান মুজাহিদদের কীর্তি:

এই সময়ে জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ত্রিপোলি (লিবিয়া)-র মুজাহিদ মাহদী দারতাভী উপজাতীয় মুসলিমদের একটি বাহিনী গঠন করে মিশরে পৌঁছেছিলেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় মোতায়েন ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ১৭৯৯ সালের এপ্রিল মাসে (জিলকদ ১২১৩ হিজরি) আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ষোলো মাইল দূরে ‘দামানহুর’-এর ময়দানে ফরাসি বাহিনীর সমর্থকদের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে মুজাহিদগণ বিজয়ী হন। এরপর ফরাসি জেনারেল মারমন্ট মাহদীর মোকাবিলায় একটি প্রশিক্ষিত বাহিনী পাঠান, যার ফলে ‘সুহুদ’-এর ময়দানে সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাকে এই পুরো যুদ্ধ সিরিজের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ বলা হয়। সাত ঘণ্টা ধরে লাশের স্তুপ জমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসিদের পালিয়ে যেতে হয়। [২]

আক্কা রণাঙ্গনে নেপোলিয়নের পরাজয়:

এদিকে আরও সাতটি যুদ্ধজাহাজ তিন হাজার আধুনিক প্রশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে আক্কায়ে পৌঁছে যায় এবং শহরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এরপর যখন নেপোলিয়ন খবর পেলেন যে মিশরে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, তখন সিরিয়ায় তার অবস্থান ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বলেছিলেন: ‘যদি আক্কা পথে না আসত, তবে আমি পুরো প্রাচ্য জয় করে নিতাম’। ২১ মে (১৫ জিলহজ) তিনি আক্কার অবরোধ তুলে নিয়ে দ্রুত মিশরের দিকে পিছু হটেন। [৩]

যাত্রার আগে তিনি চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে তার বাহিনীর সমস্ত আহত, অসুস্থ এবং অসহায় সৈন্যদের হত্যা করেন যাতে তার দ্রুত গতিতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। [৪]

নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন:

মিশরে মুজাহিদদের পা তখনও শক্ত হয়নি, এমন সময় ১৪ জুন ১৭৯৯ সালে (৯ মহরম ১২১৪ হিজরি) নেপোলিয়ন পুনরায় কায়রো পৌঁছে যান। কিন্তু শীঘ্রই তিনি খবর পান যে তুর্কি জেনারেল মোস্তফা পাশা ৮০টি নৌকায় আট হাজার সৈন্যের সাহায্য নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলে অবতরণ করেছেন। ২৫ জুলাই ১৭৯৯ সালের (২১ সফর ১২১৪ হিজরি) যুদ্ধে ফরাসি বাহিনী মোস্তফা পাশাকে পরাজিত করে বন্দি করে, কিন্তু এরপর ইস্তাম্বুল থেকে আরও একটি নৌবহর রওনা হওয়ার খবর আসে। কয়েকদিন পর নেপোলিয়ন কায়রোতে এই খবরও পান যে অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সীমান্তে আক্রমণ করেছে। তখন নেপোলিয়ন এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দুটি জাহাজে কিছু সৈন্য নিয়ে হঠাৎ গভীর সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে পড়লেন। উসমানীয় বা ব্রিটিশ নৌবাহিনী টেরও পেল না এবং তিনি ফ্রান্সে পৌঁছে গেলেন।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, সাল্লাবি, পৃ. ৩৩১

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, সাল্লাবি, পৃ. ৩৩০-৩৩১

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৫১

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া, ফরিদ বেগ: পৃ. ৩৭৫

নেপোলিয়নের পশ্চাদপসরণে একদিকে খিলাফত দরবার এবং অন্যদিকে ব্রিটেন ও অন্যান্য বেশ কিছু ইউরোপীয় দেশে আনন্দ উদযাপন করা হয়। সুলতান সেলিম তৃতীয় আক্কার বিজয়ী জাযযার আহমদ পাশাকে একটি স্বর্ণমুকুট পাঠান এবং ব্রিটিশ অফিসার নেলসনকে, যিনি ফরাসি নৌবহর ধ্বংস করেছিলেন, মূল্যবান হীরা উপহার দেন। [১]

কায়রোর জিহাদি আন্দোলন, ফরাসি গভর্নর জেনারেলের হত্যাকাণ্ড:

মিসর ও সিরিয়া অভিযানে ফরাসি বাহিনীর ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র পনেরো হাজার সৈন্য অবশিষ্ট ছিল। তাদের একটি বড় অংশ মুজাহিদদের প্রতিরোধে প্রাণ হারিয়েছিল, আবার অনেক সৈন্য প্লেগ মহামারীর শিকার হয়েছিল। নেপোলিয়নের পর ফরাসি জেনারেল ক্লেবার অবশিষ্ট বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এদিকে ব্রিটিশ বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিল।

২০ মার্চ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (২৩ শাওয়াল ১২১৪ হিজরি) কায়রো থেকে কিছু দূরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বাহিনীর মধ্যে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে প্রত্যাশার বিপরীতে ফরাসি কমান্ডার ক্লেবার বিজয়ী হন। কিন্তু যখন তিনি বিজয়ীর বেশে কায়রোর নিকটবর্তী হলেন, তখন জানতে পারলেন যে উসমানীয় আমির ইব্রাহিম বেগ তাঁর অনুপস্থিতিতে শহর দখল করে নিয়েছেন।

জেনারেল ক্লেবার কায়রো অবরোধ করে গোলাবর্ষণ শুরু করেন। প্রাচীর ও ভবনগুলোর ব্যাপক ক্ষতি করার পর তিনি কায়রোতে প্রবেশ করেন। দশ দিন ধরে শহরের রাস্তায় ফরাসি সৈন্য ও মুজাহিদদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। পরিশেষে জামেয়া আল-আযহারের মাশায়েখগণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে সাধারণ ক্ষমার আবেদন করেন, যা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শহরের ওপর দখল সুসংহত করার পর ক্ষমার ঘোষণাকে উপেক্ষা করে মুজাহিদদের বেছে বেছে হত্যা করা হয়। জেনারেল ক্লেবার পাদ্রি ইয়াকুব ইউহান্নাকে মুসলমানদের সাথে যা খুশি করার অবাধ অনুমতি দেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ধনাঢ্য ও উলামায়ে কেরাম থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি পর্যন্ত সবার ওপর নির্বিচারে ভারী কর আরোপ করা হয়।

মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হয়েছিল যে, জামেয়া আল-আযহারের একজন সাহসী সিরীয় ছাত্র সুলাইমান সুযোগ বুঝে জেনারেল ক্লেবারকে হত্যা করেন। এটি ২৪ জুলাই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ (২ রবিউল আউয়াল ১২১৫ হিজরি) এর ঘটনা। সুলাইমান নিজেও ফরাসিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর শহীদ হন। [২]

ফরাসি বাহিনীর পরাজয়, প্রস্থান এবং সন্ধি:

ফরাসি বাহিনীর নেতৃত্ব এখন জেনারেল মেনু গ্রহণ করেন, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং জেনারেল আবদুল্লাহ মেনু [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৪৮ থেকে ৬৫১।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৭৯; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহয ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৩৫।

[৩] জেনারেল আবদুল্লাহর আসল নাম ছিল জ্যাক-ফ্রাঁসোয়া দ্য মেনু (Jacques-François de Menou)। তিনি ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুবক বয়সে ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদও ছিলেন। ১৭৯৫ সালের ফরাসি বিপ্লবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

তাকে বলা হতো। তিনি দীর্ঘ সময় বাকি সৈন্যদলের সাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবরুদ্ধ ছিলেন। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ রবিউস সানি ১২১৬ হিজরি) তারিখে তিনি তুর্কি ও ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন তাকে তার অবশিষ্ট সৈন্যদেরসহ জাহাজে করে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়। এভাবে মিশরের সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘটে, যা থেকে অনেক বড় আশা ও প্রত্যাশা ছিল এবং যার মাধ্যমে নেপোলিয়ন ইসলামি খিলাফতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পূর্ব ও পশ্চিমের অবিসংবাদিত সম্রাট হতে চেয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে প্রজাতন্ত্র সরকারের প্রধান হন। তিনি উসমানীয় খিলাফতের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন এবং তার রাষ্ট্রদূত খলিফাকে এই বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করেন যে, তুর্কিদের জন্য রাশিয়া ও ব্রিটেনের তুলনায় ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব বেশি উপকারী। খলিফা সতর্কতা অবলম্বন করে পূর্বের ন্যায় কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সম্মতি প্রকাশ করেন। এভাবে ৯ অক্টোবর ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ (১ জমাদিউল আখের ১২১৬ হিজরি) তারিখে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। [১]

মিশরে নেপোলিয়নের আক্রমণের প্রভাব:

মিশরে নেপোলিয়নের আক্রমণের ফলে এখানে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব দ্রুত পড়তে শুরু করে। প্রাচ্যতত্ত্ব (Orientalism) চর্চাও জোরদার হয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাসবিদরা আগের চেয়ে বেশি মনোযোগের সাথে ইসলামি বিশ্বের ইতিহাসের ওপর কাজ শুরু করেন। নেপোলিয়নের সাথে আসা পণ্ডিতদের একটি দল ১৯ খণ্ডে মিশরের বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস (Description de l'Égypte) সংকলন করেন। [২]

নেপোলিয়নের আক্রমণের অনেক আগে, আঠারো শতক থেকেই মিশরে ফরাসি মিশনারি কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় ছিলেন। স্থানীয় কিবতি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক ছিল। এমনকি কিছু মুসলিম আমীরও তাদের বলয়ে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রভাবিত করা হয়েছিল। কায়রোর নাসেরিয়া মহল্লায় ফরাসি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও ইতিহাস পড়ানো হতো এবং সেখানে মুসলমানদের স্বাগত জানানো হতো। [৩]

মোটকথা, মিশরে আধুনিকতার লক্ষণ নেপোলিয়নের আক্রমণের আগেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। নেপোলিয়নের আক্রমণের পর এই ধারা আরও দ্রুততর হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে মিশরে ফ্রিম্যাসনরি লজও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরাই সেই লোক ছিল যারা ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিশরের আমীর মুহাম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহের পথ সুগম করেছিল এবং মিশরকে উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। [৪]

রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার দিকে মনোযোগ, পতনের কারণসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান:

সেলিম তৃতীয় দেশের স্থিতিশীলতার দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি সাম্রাজ্যের আমীর, উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের নির্দেশ দেন যে

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৮০।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ১/৬৩৯।

[৩] আজায়িবুল আসার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার: ৩/১২০।

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবী: পৃষ্ঠা ৩২৭।

তারা সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এমন কিছু প্রস্তাবনা পেশ করেন যাতে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে সেই সময় তুরস্কে আমির, উলামা এবং বুদ্ধিজীবীদের তিনটি চিন্তাধারা বা গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল:

১. রক্ষণশীল

২. মধ্যপন্থী

৩. আধুনিকতাবাদী

রক্ষণশীল গোষ্ঠী (যাদের হাতে সেই সময় ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল) তাদের মতামতের সারসংক্ষেপ ছিল এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য অতীতের একটি বিশ্বজনীন সরকার ছিল যার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কারণ এর প্রশাসনিক কাঠামো এবং অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী ছিল। এখনও এই কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন জীবন দান করা সম্ভব। এভাবে সাম্রাজ্যকে নতুন করে সুসংহত করা যেতে পারে।

মধ্যপন্থীদের বক্তব্য ছিল যে, ইউরোপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমাদের ইউরোপের সেই প্রযুক্তিগুলো অর্জন করা উচিত যা আমাদের এখানে প্রচলিত নেই। এরপর আমরা ইউরোপের মোকাবিলা করতে পারব।

আধুনিকতাবাদীদের অভিমত ছিল যে, পতনের কারণ হলো সেই পুরনো ব্যবস্থার ওপর জেদ ধরে থাকা যা বর্তমান যুগের গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। এখন ইউরোপ মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে, কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে থাকি তবে ইউরোপ সমস্ত ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। আমাদের প্রথমে নিজেদের ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে, তবেই আমরা উন্নতি ও স্থিতিশীলতায় ইউরোপের সমকক্ষ হতে পারব।

সুলতান সেলিম তৃতীয় এই সমস্ত মতামতের ওপর বিচার-বিশ্লেষণ করার পর ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে (২১ জমাদিউল আখিরা ১২০৭ হিজরি) উসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা পরিবর্তনের ঘোষণা দেন। নতুন শাসনব্যবস্থাকে ‘নিজাম-ই-জাদিদ’ নাম দেওয়া হয়। [১]

নিজাম-ই-জাদিদ কার্যকর করা:

এই ব্যবস্থার অধীনে জাহাজ নির্মাণ এবং অস্ত্র তৈরির জন্য ফরাসি ধাঁচের কারখানা স্থাপন করা হয়। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার জন্য পশ্চিমা ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও খোলা হয়। যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সংকল্প করা হয়।

নিঃসন্দেহে এই সংস্কারগুলো অত্যন্ত জরুরি ছিল কারণ তিন মহাদেশে বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্র ও প্রদেশ এবং জনগণ ও কর্মকর্তাদের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। যার ফলে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছিল এবং স্থানে স্থানে প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। [২] এ প্রসঙ্গে সার্বিয়ার ‘ভিদিন’ শহরের আমির পাজভাস্তগলু-র বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য, যা দমন করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং অবশেষে ১২১২ হিজরিতে (১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে) তাকে স্বায়ত্তশাসিত শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, কারণ ভয় ছিল যে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে যেন পুরো বলকান অঞ্চলকে গ্রাস না করে ফেলে। [৩]

নিজাম-ই-জাদিদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা:

এখানে এই বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নেওয়া জরুরি যে, ইসলামে আধুনিকতাবাদ বা অন্যান্য জাতি থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ কতটুকু...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইয়ালামাজ ওরতুনা: ১/৬৩৬, ৬৩৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানীয়াহ, ফরিদ বেক: পৃষ্ঠা ৩৭০; আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১২৭।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানীয়াহ, ফরিদ বেক মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৭১।

পর্যন্ত। অমুসলিম জাতিগুলোর থেকে উপকৃত হওয়ার তিনটি রূপ রয়েছে:

১. নতুন উদ্ভাবন, শিল্প ও কারুশিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হওয়া; গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে তাদের দক্ষতা শেখা এবং তাদের পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। বরং যেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনসমূহ (যেমন সেচ, কৃষি, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রচার, প্রতিরক্ষা এবং জিহাদ) এই দক্ষতাগুলো ছাড়া পূরণ হওয়া সম্ভব নয়, সেখানে এই জ্ঞান ও শিল্পসমূহ থেকে উপকৃত হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।

২. চরিত্র ও শিষ্টাচার, সভ্যতা, জীবনযাপন এবং বেশভূষার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের যা কিছু ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক এবং যা নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারানো ও কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখার অন্তর্ভুক্ত হয়, তা গ্রহণ করা নাজায়েজ।

৩. ইবাদত, আকিদা, সৃষ্টি ও পরকাল, মহাবিশ্ব, জীবন এবং মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে অমুসলিমদের চিন্তাধারাকে সঠিক মনে করে গ্রহণ করা কুফর।

এই সীমাবদ্ধতা ও শর্তাবলি সামনে রেখে যদি আধুনিক ও প্রাচীনের মধ্যে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোর বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এই বিষয়টি বোঝা সহজ হয়ে যায় যে, পশ্চিমের সেই জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা, সেই উদ্ভাবন এবং সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো থেকে উপকৃত হওয়া, যার বদৌলতে পশ্চিম উন্নতির মহাসড়কে এগিয়ে গিয়েছে, তা আমাদের জন্য কেবল জায়েজই নয় বরং জরুরি। হিকমতকে মুমিনের হারানো সম্পদ বলা হয়েছে, যা যেকোনো জাতি বা ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যেতে চায় অথবা কোনো জাতি যদি বিশ্বের জাতিগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়, উভয় ক্ষেত্রেই জরুরি হলো সফল ব্যক্তি ও বিজয়ী জাতিগুলোর অবস্থা পূর্ণ গবেষণা ও তদন্ত, গভীর দৃষ্টি এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে পাঠ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে সৌভাগ্য ও উন্নতির প্রকৃত কারণ ও কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করা। ব্যক্তিগত সাফল্য কাম্য হোক বা সমষ্টিগত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনো প্রচেষ্টাকে তখনই গুরুত্ববহ মনে করা যেতে পারে যখন তা অন্ধভাবে নয় বরং সুপরিকল্পিত হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এমন গুরুত্ব ছাড়া কোনো সংগ্রামই কার্যকর হয় না। আমাদের এই বাস্তবতা মেনে নেওয়া উচিত যে, বিশ্বের যে জাতিই কোনো এক সময়ে ইতিহাসের দিগন্তে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তাদের অবস্থা থেকে আমরা কোনো না কোনো শিক্ষা পেতে পারি এবং এমন কোনো কারণ নেই যে আমরা সেই শিক্ষা কেবল এই জন্য বর্জন করব যে সেই জাতিটি মুসলিম ছিল না।

তবে এই চেষ্টা ও সংগ্রামের দ্বিতীয় দিকটি, যা সতর্কতামূলকও বটে এবং সাফল্যের জন্য জরুরিও, তা হলো আমরা জাতিগুলোর বিজয়ের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করার সময় প্রকৃত কারণ পর্যন্ত পৌঁছাব এবং বাহ্যিক চাকচিক্যে জড়িয়ে পড়ব না। যদি কোনো ব্যক্তি মনে করে যে, পশ্চিমারা প্যান্ট, শার্ট, টাই ও কোট পরা, মদ পান করা, সিগারেট ও সিগারের ধোঁয়া ওড়ানো এবং নারীদের অর্ধনগ্ন করে বাইরে নিয়ে আসার কারণে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তবে এটি হবে অত্যন্ত অগভীর কথা। একইভাবে কেউ যদি মনে করে যে, পশ্চিমের উন্নতির রহস্য আল্লাহর অস্বীকার, উপাসনালয় থেকে পলায়ন এবং কেবল বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভরতার মধ্যে নিহিত, তবে এটিও হবে একটি অন্তঃসারশূন্য চিন্তা। সুতরাং অন্যদের থেকে উপকৃত হওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো আমরা এতে অনুকরণের নয় বরং গবেষণার পথ অবলম্বন করি। তাদের প্রতিটি...

কোনো বিষয়কে আমরা শরয়ী ও যৌক্তিক মানদণ্ডে পরিমাপ করি। যে বিষয়টি এই উভয় কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হবে, তাকে আমরা নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে গ্রহণ করব, কোনো হীনম্মন্যতা বা বাহ্যিক চাপের কারণে নয়।

আঠারো শতকের শুরুতে উম্মাহর সামনে যে চ্যালেঞ্জ ছিল, তা আজও একইভাবে বিদ্যমান। সেই সময় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য এমন এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি খোসা ও শাঁসকে আলাদা করে দেখাতেন এবং উম্মাহকে পাশ্চাত্যবাদের তুফান থেকে এমনভাবে নিরাপদে বের করে আনতেন যে, আঁচলও ভিজত না আবার কাঙ্ক্ষিত মুক্তাও হাতছাড়া হতো না। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব এমন ব্যক্তিত্বদের দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত ছিল। সুলতান সেলিম তৃতীয় নিশ্চিতভাবেই আধুনিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ার পাশাপাশি শরয়ী সীমানা বজায় রাখাও জরুরি মনে করতেন, যেমনটি তাঁর প্রথম ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়, যেখানে তিনি উম্মাহর পতনের মূল কারণ হিসেবে শরীয়ত থেকে বিচ্যুতিকে উল্লেখ করেছিলেন। তাই যদি তাঁর যুগে আধুনিক ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বকে পূর্ণ নিপুণতার সাথে সমাধান করে নেওয়া হতো, তবে উম্মাহ পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের সেই অন্ধ অনুকরণ থেকে বেঁচে যেত, যার পেছনে দীন ও ধর্ম থেকে বিচ্যুতির উপাদান পুরোপুরি সক্রিয় ছিল।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সুলতান সেলিম তৃতীয় এবং তাঁর মতো কিছু সদৃশ্যসম্পন্ন, গম্ভীর ও উদারমনা নেতাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ সময়ের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জটি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারেনি। যদিও সুলতান সেলিম তৃতীয় কর্তৃক নিজাম-ই-জাদিদ (নতুন ব্যবস্থা) প্রবর্তনের সিদ্ধান্তটি মৌলিকভাবে সঠিক ছিল এবং সঠিক আবেগের ওপর ভিত্তি করে ছিল, আর যদি এর ওপর ভারসাম্যের সাথে আমল করা হতো তবে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথমত, সেই সময় জাতি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জ্ঞানে সমান পারদর্শী কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত ছিল। এ ছাড়াও এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল। তা হলো, যারা নিজেরা ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে ছিল, তাদের মধ্যে তিনটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিল:

- প্রথম শ্রেণিটি ছিল সেই সব মুখলিস ও বুদ্ধিমান লোকদের, যারা রাজনৈতিক, সামরিক, বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে উপকৃত হয়ে তুরস্ককে উন্নত করতে চেয়েছিল। সেলিম তৃতীয় এবং তাঁর অনেক যোগ্য আর্মীর এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
- দ্বিতীয় শ্রেণিটি ইউরোপের প্রতিটি জিনিসকে তুর্কিদের প্রতিটি জিনিসের ওপর প্রাধান্য দিত। তাদের মতে, উন্নতির জন্য তুর্কিদের পুরোপুরি ইউরোপীয় হওয়া জরুরি ছিল। এটি ছিল ইউরোপের মানসিক দাসত্ব।
- তৃতীয় শ্রেণিটি ছিল স্বার্থান্বেষীদের, যারা আধুনিকতাবাদীদের সাথে কেবল এই জন্য যুক্ত হয়েছিল যাতে নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উচ্ছ্রাসে উচ্চপদে আসীন হওয়ার সুযোগ পায়। দেশ ও জাতির মঙ্গলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সেলিম তৃতীয় যখন নিজাম-ই-জাদিদ কার্যকর করলেন, তখন তাঁকে অনিবার্যভাবে আধুনিকতাবাদীদের দিয়েই কাজ করাতে হয়েছিল, কারণ পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং চালচলন সম্পর্কে তারাই অবগত ছিল। তাদের মধ্যে ইউরোপের মানসিক দাসরা নিজাম-ই-জাদিদকে সেই সব রক্ষণশীল উলামা ও সালতানাতের অবমাননা ও লাঞ্ছনার হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে দেশ ও জাতির রক্ষক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। স্বার্থান্বেষীরা ‘নিজাম-ই-জাদিদ’-এর স্লোগান দিয়ে এই অভিযানকে আরও বেগবান করার সময় নিজেদের পদমর্যাদা থেকে অন্ধভাবে ব্যক্তিগত...

সুবিধা অর্জন করল এবং দেশ ও জাতিকে লুট করতে শুরু করল।

এটি দেখে রক্ষণশীলদের বলতে হলো যে, এটাই কি সেই নেজামে জাদিদ (নতুন ব্যবস্থা) যার রঙিন স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল? সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তির কি এরই অপেক্ষায় ছিল? পদচ্যুত প্রাক্তন আমীরগণও এ কথা না বলে পারলেন না যে, শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো অনুগত ও অভিজ্ঞ প্রাচীন খাদেমদের ওপর কেন এমন বিশ্বাসঘাতক, পাশ্চাত্যপন্থী এবং জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধহীন লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হলো? [১]

সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা:

সেলিম ৩য় নেজামে জাদিদের অধীনে সেনাবাহিনীতেও ব্যাপক পরিবর্তন শুরু করেন। তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে (১২১০ হিজরি) পদাতিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য ইংরেজ অফিসারদের সেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে একজন অফিসার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং জেনারেল মোস্তফা নামে পরিচিত হন। এই অফিসারদের মাধ্যমে ৬০০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবককে ইংরেজ যুদ্ধরীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে এই যুবকরাই বাকি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে। [২]

ইয়ানিচারি সংস্কারের প্রচেষ্টা ও বিদ্রোহ:

সেলিম ৩য় দেখছিলেন যে, ইয়ানিচারিদের প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার যোগ্য নয়, বরং দেশের ওপর একটি বোঝা এবং ক্রমাগত ফিতনার কারণ। তাই তিনি ইয়ানিচারি বিলুপ্ত করে বাহিনীকে নতুন শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনায় সজ্জিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইয়ানিচারি অফিসার এবং রক্ষণশীল আমীরগণ সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তাদের প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে সরকারি পদে আসীন মুফতিরও বড় হাত ছিল, যিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, যে শাসকই পাশ্চাত্য ব্যবস্থা এবং তাদের রীতিনীতি গ্রহণ করে এবং প্রজাদের তা মানতে বাধ্য করে, সে শাসনের যোগ্য নয়। এই ফতোয়ার সাহায্যে রক্ষণশীল আমীর এবং ইয়ানিচারিরা বিদ্রোহ করে এবং দেশ ও জাতির এই হিতাকাঙ্ক্ষী খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। এটি ২৮ জুন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের (২১ রবিউস সানি ১২২২ হিজরি) ঘটনা।

সেলিম ৩য় এক বছর বন্দি ছিলেন। এরপর নতুন সুলতান ৩ জমাদি-উল-আউয়াল ১২২৩ হিজরি (২৮ জুন ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) তাকে হত্যা করান। সুলতান সেলিম ৩য়-এর বয়স ছিল ৪৮ বছর। তিনি ১৯ বছর শাসন করেন। [৩]

সংস্কারের ব্যর্থতার কারণসমূহ:

সেলিম ৩য়-এর সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংস্কার অভিযান ব্যর্থ হয়। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এর নিম্নোক্ত কারণগুলো সামনে আসে:

- ১. নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা বজায় রাখা হয়নি।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ১/৬৩৫, ৬৩৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৭১

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/১৫৮; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৯৩; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১২৭

(২) এই গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক কাজের জন্য সঠিক কর্মীবাহিনী পাওয়া যায়নি; অযোগ্য, অগভীর মানসিকতাসম্পন্ন এবং স্বার্থান্বেষী লোকেরা এই কাজটিকে নষ্ট করে দিয়েছে।

(৩) জাতির কাছে কোনো মুজাদ্দিদ বা সর্বসম্মত ব্যক্তিত্বের দিকনির্দেশনা ছিল না, যিনি পশ্চিমের উন্নতির প্রকৃত কারণগুলো এমনভাবে স্পষ্ট করতেন যাতে বাস্তবতা ও কৃত্রিমতার পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যেত।

সারকথা হলো, সময়ের একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দায়িত্বটি দুর্বল ভিত্তির ওপর শুরু করা হয়েছিল, তাই ফলাফল প্রত্যাশার বিপরীত হয়েছে।

মুসলমানদের টিকে থাকার রহস্য এবং এর বিরুদ্ধে ইউরোপের কৌশল:

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেসব ঘটনা ও বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো বুঝতে পেরেছিল যে মুসলমানদের টিকে থাকা ও শক্তির রহস্য দুটি জিনিসের মধ্যে নিহিত:

- ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং এই ধর্মের সাথে মুসলমানদের দৃঢ় সংশ্লিষ্টতা।

- দ্বিতীয়ত, উসমানীয় খিলাফতের প্রতাপ, প্রভাব, বিশালতা ও জনপ্রিয়তা।

প্রথম বিষয়টি তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছিল যখন উসমানীয় সালতানাতের সাথে সম্পর্কের সময় কিছু প্রখ্যাত ইউরোপীয় কর্মকর্তা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। [১]

তাই তারা জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে মুসলমানদের পরাজিত করতে, তাদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিতে এবং খোদ ইসলামের বিকৃতি ঘটানোর জন্য একদল বুদ্ধিজীবী বাহিনী মাঠে নামিয়ে দেয়, যাদেরকে “মুস্তাশরিকিন” বলা হয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি খতম করার জন্য তারা উসমানীয় খিলাফতের বিশালতাকে ছোট ছোট এককে বিভক্ত করতে, এর সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে, এর জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানহাজকে কলুষিত করতে, এর শক্তি নিঃশেষ করতে এবং পরিশেষে খিলাফত প্রতিষ্ঠানটিকেই ইতিহাসের পাতায় বিলীন করে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সংস্কার ও আধুনিকতাবাদের অভিযান পুনরায় শুরু হয়, তখন ইউরোপ তাদের আদর্শিক আগ্রাসনের জন্য উন্মুক্ত পথ পেয়ে যায়। এর একটি কারণ ছিল এই যে, ততদিনে তুরস্কে ইউরোপের মানসিক গোলাম ও স্বার্থান্বেষীদের একচেটিয়া আধিপত্য আরও বেড়ে গিয়েছিল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্রিম্যানদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। তাই পরবর্তী শতাব্দীতে ব্যবস্থা সংস্কারের প্রভাব আগের চেয়েও বেশি নেতিবাচক প্রমাণিত হয় এবং তখন সালতানাত আগের চেয়ে অনেক দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়। [২]

[১] কিরাআত জাদিদাহ ফি তারিখিদ দাওলাতিল উসমানিয়ায়হ, যাকারিয়া সুলাইমান বায়ুমি: পৃষ্ঠা ১৩৩।

[২] এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সুলতান আব্দুল হামিদ আউয়াল-এর জীবনীতে পড়ব।

সুলতান চতুর্থ মোস্তফা বিন প্রথম আব্দুল হামিদ

রবিউস সানি ১২২২ হিজরি হতে জমাদিউল উলা ১২২৩ হিজরি

জুন ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দ হতে জুন ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দ

তৃতীয় সেলিমের পদচ্যুতির পর বিদ্রোহী ইয়েনিসারি বাহিনী সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদের পুত্র চতুর্থ মোস্তফাকে খেলাফতের মসনদে বসায়। তার বয়স ছিল ২৮ বছর। তিনি অত্যন্ত দুর্বল শাসক ছিলেন এবং তার মর্যাদা একটি পুতুলের চেয়ে বেশি ছিল না। [১]

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ, ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ এবং ব্যর্থ চুক্তি:

সেই সময় সীমান্তে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চলছিল। তৃতীয় সেলিমের পদচ্যুতি এবং তার স্থলে চতুর্থ মোস্তফার মতো একজন দুর্বল শাসকের সিংহাসন আরোহণের খবর শুনে তুর্কি সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে রাশিয়ার পক্ষে আরও আগ্রাসন চালানো সম্ভব ছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশত ১৪ জুন ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে (২৬ রবিউল আউয়াল ১২২২ হিজরি) নেপোলিয়ন রাশিয়া ও তার মিত্রদের “ফ্রিডল্যান্ড”-এর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যার ফলে রুশ বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াই বাগদান ছেড়ে পিছু হটে। ৭ জুলাই রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার একটি শর্ত ছিল যে, রাশিয়া ও তুরস্কের দ্বন্দ্ব ফ্রান্স মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবে এবং শান্তি আলোচনা সম্পন্ন হওয়ার আগে রুশ বাহিনী বাগদান ও আফলাক খালি করে দেবে।

এর পাশাপাশি একটি গোপন চুক্তিতে এটিও স্থির হয় যে, যদি বাব-এ-আলী ফ্রান্সের মধ্যস্থতা গ্রহণ না করে, তবে রাশিয়া ও ফ্রান্স ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউরোপে তুরস্কের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। বসনিয়া ও আলবেনিয়া ফ্রান্সকে, আফলাক, বাগদান ও বুলগেরিয়া রাশিয়াকে এবং সার্বিয়া অস্ট্রিয়াকে দিয়ে দেওয়া হবে। এই গোপন চুক্তিটি নেপোলিয়ন এবং রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার রাশিয়া ও প্রুশিয়ার সীমান্তে অবস্থিত নেমান নদীর পূর্ব তীরের শহর “তিলসিট”-এ সাক্ষাতের মাধ্যমে করেছিলেন।

প্রকাশ্য চুক্তিটি সম্পর্কে বাব-এ-আলীকে অবহিত করা হয় এবং সেখান থেকে ২৪ আগস্ট ১৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে (২০ জমাদিউস সানি ১২২২ হিজরি) এর অনুমোদন দেওয়া হয় এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশরা নির্ধারিত কোনো শর্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি, তাই এই সমস্ত আলোচনা বাতিল হয়ে যায়। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, লেখক: মুহাম্মী, পৃষ্ঠা: ৩৯৩।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, লেখক: মুহাম্মী, পৃষ্ঠা: ৩৯৫, ৩৯৬।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের গোপন চুক্তিও ভেঙে যায় কারণ রাশিয়ার জার এই বিষয়ে জোর দিতে শুরু করেন যে, উসমানীয় খিলাফতের অবসানের পর রাশিয়া ইস্তাম্বুল দখল করবে। নেপোলিয়ন এতে রাজি হননি, কারণ ইস্তাম্বুল বেশ কয়েকটি সমুদ্র ও মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কারণে একে পুরো বিশ্বের চাবিকাঠি মনে করা হতো এবং নেপোলিয়ন একে নিজের সামরিক কেন্দ্র বানাতে চেয়েছিলেন। [১]

বিদ্রোহ ও পদচ্যুতি:

সুলতান মুস্তফা চতুর্থ মাত্র তেরো মাস শাসন করতে পেরেছিলেন। কিছু আমির ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সেই সমস্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান যারা সুলতান সেলিম তৃতীয়কে পদচ্যুত করেছিল। ২৮ জুন ১৮০৮ (৪ মে ১২২৩ হিজরি) মুস্তফা চতুর্থের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা দাবি করেন যে সেলিম তৃতীয়কে পুনরায় সিংহাসনে বসানো হোক। এর জবাবে মুস্তফা চতুর্থ সেলিম তৃতীয়কে হত্যা করিয়ে তাঁর লাশ বিক্ষোভকারীদের সামনে ফেলে দেন। এই পদক্ষেপ আগুনে ঘি ঢালার মতো কাজ করে এবং বিক্ষোভকারীরা আক্রমণ করে মুস্তফা চতুর্থকে আটক করে। শেষ পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা মুস্তফা চতুর্থের পদচ্যুতির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। [২]

[১] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩০১-৩০২

[২] তারিখ আদ-দাওলা আল-আলিয়া আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৯৭

সুলতান মাহমুদ সানি বিন আব্দুল হামিদ আউয়াল

১২২৩ হিজরি থেকে ১২৫৫ হিজরি

১৮০৮ খ্রি. থেকে ১৮৩৯ খ্রি.

মোস্তফা রাবে-এর পদচ্যুতির পর সুলতান আব্দুল হামিদ আউয়ালের ২৪ বছর বয়সী পুত্র মাহমুদ সানি সিংহাসনে আরোহণ করেন। অফিসার এবং আমীরগণ এই প্রত্যাশায় তাকে ক্ষমতায় এনেছিলেন যে, তিনি সুলতান সেলিম সালেসের সংস্কার এবং আধুনিকায়নের অবসান ঘটাবেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ সানি মনেপ্রাণে এই সংস্কারগুলোর পক্ষে ছিলেন।

[১]

সদরে আজমের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং ইয়েনি চেরি বিদ্রোহ:

তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর মোস্তফা পাশা বায়রাকদারকে সদরে আজম নিযুক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন যে তিনি যেন ইয়েনি চেরি বাহিনীকে আধুনিক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেন। সদরে আজম দায়িত্ব গ্রহণ করে ইয়েনি চেরি বাহিনীকে সম্বোধন করে তাদের অতীতের বীরত্বগাথা এবং বর্তমান সময়ের কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং বলেন যে, বিজয়ের জন্য আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। অতএব, সমস্ত সৈন্য যেন সেই আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করে যা রুশ সেনাবাহিনী ব্যবহার করছে। সদরে আজম নির্দেশ দেন যে, সমস্ত সৈন্য, বিশেষ করে অবিবাহিত সৈন্যরা যেন সেনানিবাসে অবস্থান নিশ্চিত করে এবং সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে। সেইসাথে প্রতিদিনের মহড়ায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এবং ইউরোপীয় বাহিনীর যুদ্ধকৌশল আয়ত্ত করে।

যদি ইয়েনি চেরি সদরে আজমের নির্দেশ পালন করত, তবে প্রশিক্ষণ ও সুশৃঙ্খলার মাধ্যমে তারা কিছুকাল পর আবারও ইউরোপের মোকাবিলা করতে পারত। কিন্তু ইয়েনি চেরি আবারও ফিতনা সৃষ্টির প্রমাণ দিল এবং কয়েক দিনের ষড়যন্ত্রের পর ১৬ নভেম্বর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে (২৭ রমজান ১২২৩ হিজরি) বিদ্রোহ করে পদচ্যুত সুলতান মোস্তফা রাবে-কে পুনরায় সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করল। কিন্তু এর জবাবে খলিফার অনুগতরা পদচ্যুত সুলতানকে হত্যা করে তার লাশ ইয়েনি চেরিদের সামনে ফেলে দিল। মোস্তফা রাবে খলিফা সেলিম সালেসের সাথে একই আচরণ করেছিলেন। একেই বলে কর্মফল (মাকাফাতে আমল)। [২]

(১) তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৯৮, ৩৯৯

(২) তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৩৯৮, ৩৯৯

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ:

খলিফা মাহমুদ সানি-র কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এখন ইয়েনিসারি বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তিনি সময়ের উপযোগিতা বিবেচনা করে সেলিম সানি-র ‘নিজাম-ই-জাদিদ’ (নতুন ব্যবস্থা) স্থগিত করে দিলেন। তবে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যাতে ইয়েনিসারিদের মূলোৎপাটন করে পুনরায় সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই সুযোগ পেতে তাঁর বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যায়, কারণ তাঁর শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। [১]

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে সাফল্য:

মাহমুদ সানি সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বছর ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে (১২২৪ হিজরি) ব্রিটেন ও রাশিয়ার সাথে শান্তি চুক্তি করেন, কিন্তু রাশিয়া খুব শীঘ্রই চুক্তি লঙ্ঘন করে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। এই তিন বছরব্যাপী যুদ্ধের শুরুতে তুর্কিরা কিছু স্থানে পরাজিত হয়, যার ফলে সদর-ই-আজম জিয়া ইউসুফ পাশাকে পদচ্যুত হতে হয়। তবে নতুন সদর-ই-আজম আহমদ পাশা যুদ্ধে জয়লাভ করে দেখান এবং রাশিয়ানদের তাদের সীমানার ভেতরে হটিয়ে দেন। [২]

নেপোলিয়নের বিজয়সমূহ এবং রাশিয়ার ওপর আক্রমণ:

এদিকে ফ্রান্সের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। নেপোলিয়ন মিসর থেকে ফ্রান্সে পৌঁছে অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ১৪ জুন ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে (২১ মহরম ১২১৫ হিজরি) ‘মারেঙ্গো’-র ময়দানে অস্ট্রিয়াকে নতজানু করতে সক্ষম হন। মে ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে (সফর ১২১৯ হিজরি) তিনি নিজ দেশের গণতান্ত্রিক শাসক হিসেবে নির্বাচিত হন। একই বছরের ডিসেম্বরে তিনি রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্র ঘোষণা করেন। মাহমুদ সানি-র শাসনের তৃতীয় বছর ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে (১২২৫ হিজরি) তিনি হল্যান্ড এবং উত্তর জার্মানির বড় একটি অংশ জয় করে নিয়েছিলেন। এরপর যখন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে (১২২৭ হিজরি) তিনি ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে রাশিয়ার দিকে অগ্রসর হন, তখন পথের প্রতিটি শহর তাঁর সামনে নতি স্বীকার করতে থাকে। ফরাসি বাহিনীকে মাথার ওপর দেখে রাশিয়া নতুন মিত্রদের সন্ধানে লিপ্ত হয়। [৩]

রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে শান্তি। বুখারেস্ট চুক্তি:

এই ছিল সেই পরিস্থিতি যার ভিত্তিতে রাশিয়া ২৮ মে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে (১৬ জমাদিউল আউয়াল ১২২৭ হিজরি) তুরস্কের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে, যা ‘বুখারেস্ট চুক্তি’ নামে পরিচিত হয়। এর মাধ্যমে আফলাক (ওয়ালাচিয়া), বাগদান (মলদাভিয়া) এবং সার্বিয়াকে তুরস্কের অধীনস্থ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। সার্বিয়ার এক সর্দার চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যা দমন করা হয় এবং বাকি সর্দাররা পালিয়ে অস্ট্রিয়ায় আশ্রয় নেয়। [৪]

এদিকে নেপোলিয়ন অগ্রসর হতে হতে মস্কোর নিকটবর্তী হয়ে যান। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে (৩০ শাবান ১২২৭ হিজরি) ‘বোরোডিনো’-র ময়দানে পনেরো ঘণ্টার যুদ্ধের পর রাশিয়ানরা পরাজিত হয়ে পিছু হটে যায়। এর পরপরই রাশিয়ানরা মস্কো খালি করে দিয়ে...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১২৭, ১২৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১২৮

[৩] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ: বিষয়, নেপোলিয়ন

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১২৮

অগ্নিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল, যখন নেপোলিয়ন মস্কো পৌঁছাল তখন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে তার বাহিনীর জন্য খাদ্য ও রসদ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে প্রচণ্ড তুষারপাত সেখানে অবস্থান করা দুঃসাধ্য করে তুলল। ১৯ অক্টোবর ১৮১২ (১৩ শাওয়াল ১২২৭ হিজরি) নেপোলিয়ন অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মস্কো থেকে ফিরে এল। নভেম্বরের শেষ দিকে বেরেজিনা নদী পার হওয়ার সময় তার বাহিনীর এক বিশাল অংশ প্রাণ হারায়। নেপোলিয়ন যখন অত্যন্ত বিধ্বস্ত অবস্থায় প্যারিসে ফিরে পৌঁছাল, তখন তার ষাট হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র দশ হাজার অবশিষ্ট ছিল। [১]

নেপোলিয়নের তুরস্কের ওপর অভিযোগ:

নেপোলিয়ন রাশিয়ার কাছে পরাজয়ের দায়ভার উসমানীয় খিলাফতের ওপর চাপিয়ে দিল এবং বলল যে, খলিফা মোক্ষম সময়ে রাশিয়ার সাথে সন্ধি করে ফ্রান্সের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং রাশিয়াকে তাদের সমস্ত সৈন্য তুরস্কের সীমান্ত থেকে সরিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মোতায়েন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। [২] ফ্রান্সের এই অবস্থান ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, কারণ তুরস্কের কাছে নিজের সীমান্ত রক্ষার এটাই ছিল একমাত্র সুযোগ যা সে ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলো রাজনীতিতে সব ধরনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও ধূর্ততায় অভ্যস্ত ছিল। তাদের কাছে ‘রাজনীতি’ শব্দটি ‘মিথ্যা’ ও ‘প্রতারণা’র সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। তারা কোনো চুক্তির তোয়াক্কা না করে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর আগ্রাসন চালানোর কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না। এবার উসমানীয় সাম্রাজ্য সমানে সমান আচরণ করে নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য (আগ্রাসনের জন্য নয়), তাদের রাজনীতির জবাব তাদেরই কায়দায় দিয়ে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করলে নেপোলিয়ন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের নৈতিক মানদণ্ড পরিমাপ করা যায়, যাদের দেওয়ার মাপকাঠি এক আর নেওয়ার মাপকাঠি অন্য।

নেপোলিয়নের পরিণতি:

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরে আসার পর অক্টোবর ১৮১৩ (শাওয়াল ১২২৮ হিজরি) লিপজিগের ময়দানে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ব্রিটেনের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, যাতে সে পরাজিত হয়।

সে যখন প্যারিসে ফিরে এল, তখন তার রাজনৈতিক বিরোধীরা বিদ্রোহ করে বসল এবং মার্চ ১৮১৩ (রবিউল আউয়াল ১২২৯ হিজরি) প্যারিস দখল করে নিল। নেপোলিয়নকে ক্ষমতাচ্যুত করে এলবা নামক একটি ছোট দ্বীপের শাসক বানিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু সাধারণ জনগণ নেপোলিয়নের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু দিন পর একটি মিছিল তাকে কাঁধে তুলে প্যারিসে ফিরিয়ে আনল এবং পুনরায় ক্ষমতার চাবিকাঠি তার হাতে সঁপে দেওয়া হলো।

১৮ জুন ১৮১৫ (১০ রজব ১২৩০ হিজরি) নেপোলিয়ন তার পূর্বের পরাজয়গুলোর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ‘ওয়াটারলু’র ময়দানে

[১] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যা, বিষয়: নেপোলিয়ন; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা: নেপোলিয়ন ১, মস্কো, ওয়াটারলু যুদ্ধ।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যা, ফরীদ বেগ মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ৩০১।

ব্রিটেন, প্রুশিয়া এবং বেলজিয়ামের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে তাকে আবারও পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়। এই যুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে। নেপোলিয়নকে একটি দ্বীপে বন্দি করে রাখা হয় যেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৫ মে ১৮২১ (২ শাবান ১২৩৬ হিজরি) ৫২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। [১]

মুহাম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহ এবং মিশরের বিচ্ছিন্নতা

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে মিশরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মুহাম্মদ আলী পাশার বিদ্রোহ এবং মিশরের স্বাধীনতার ঘোষণা। মুহাম্মদ আলী পাশা ছিলেন একজন চতুর, উচ্চাভিলাষী এবং স্বার্থপর তুর্কি কর্মকর্তা। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি ছিলেন প্রতারক, মিথ্যাবাদী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং জালিম মানুষ। [২]

মুহাম্মদ আলী পাশার ব্যক্তিত্ব:

তিনি ১৭৬৯ (১১৮৩ হিজরি) সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় দার্শনিক মেকিয়াভেলির চিন্তাধারার প্রতি তার অসাধারণ আগ্রহ ছিল। তিনি মেকিয়াভেলির বিখ্যাত বই “The Prince”-এর অনুবাদ করিয়েছিলেন যাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রতারণা ও ধূর্ততার কৌশল উপস্থাপন করা হয়েছে। [৩]

নেপোলিয়নের মিশর দখলের সময় কায়রোতে ফ্রিম্যাসনরির যে কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, যদিও মুহাম্মদ আলী পাশার সাথে তার সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রমাণিত নয়, তবে সেই সময়ের একজন প্রখ্যাত আধুনিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী শেখ হাসান আত্তার (যাকে ফ্রিম্যাসনরির হাতিয়ার বলা হয়) এর সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। [৪]

তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন যে, আমি উসমানীয় পোশাকে একজন ইউরোপীয় মস্তিষ্কধারী মানুষ। [৫]

মুহাম্মদ আলী পাশার উত্থান:

ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য তাকে মিশরে পাঠানো হয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩০ বছর। মিশরে তখন ‘বাব-ই-আলী’ (Sublime Porte)-এর প্রতিনিধিত্বে মামলুক তুর্কি আমিররা শাসন করছিলেন। মুহাম্মদ আলী পাশা অত্যন্ত চতুরতার সাথে স্থানীয় আমির ও ওলামাদের আস্থা অর্জন করেন এবং ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে বাকি তুর্কি, উসমানীয় এবং মামলুক আমিরদের নির্মূল করে দেন। যদিও অতীতে তিনি এমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি যা তার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হতে পারত, তবে সেই দিনগুলোতে...

[১] সূত্র: আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়াহ, বিষয়: নেপোলিয়ন; Encyclopaedia Britannica: Napoleon 1, moscow, waterloo battle

[২] কিরাআতুন জাদিদাতুন ফিত তারিখিল উসমানি, পৃষ্ঠা: ১৫৯

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৩৩

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৩৩

[৫] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৩৭

জাজিরাতুল আরবে ওহাবী আন্দোলনের উত্থানের ফলে এক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। মুহাম্মদ আলী পাশা খলিফা সেলিম তৃতীয়ের সাথে যোগাযোগ করে তাকে এই বিশ্বাস করান যে, যদি তাকে মিশরের শাসক (বেলার বেগ) বানানো হয়, তবে তিনি জাজিরাতুল আরবের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবেন। মিশরের সেই সব আর্মীর ও ওলামা, যারা মুহাম্মদ আলী পাশার বাহ্যিক ভদ্রতায় মুগ্ধ ছিলেন, তারাও বাব-ই-আলীকে অবহিত করেন যে তারা তার শাসনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। ফলে ১৮০৫ সালের জুলাই মাসে (রবিউস সানি ১২২০ হিজরি) তাকে মিশরের শাসনভার অর্পণ করা হয়। [১]

মিশরের স্বায়ত্তশাসন:

সেই দিনগুলোতে ব্রিটেন, যারা মুহাম্মদ আলী পাশার পৃষ্ঠপোষক ছিল, বাব-ই-আলীকে সুপারিশ করেছিল যে হয় মুহাম্মদ আলী পাশাকে মিশরের স্থায়ী শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হোক অথবা তাকে অন্য কোনো অঞ্চলের শাসনভার দেওয়া হোক। খলিফা দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেন এবং মুহাম্মদ আলী পাশাকে ‘সালানিক’-এর গভর্নর করার ঘোষণা দেন। কিন্তু মিশরের জেনারেল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির, যারা মুহাম্মদ আলী পাশার অনুগত হয়ে পড়েছিলেন, তারা এতে সম্মত হননি। এভাবে মুহাম্মদ আলী পাশা মিশরের স্বায়ত্তশাসিত শাসকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ‘খেদিভ’ উপাধি গ্রহণ করে সেখানে ‘খেদিভিয়া রাজবংশ’-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। [২]

বাব-ই-আলীর পক্ষ থেকে মিশরের স্বায়ত্তশাসন কেনই বা মেনে নেওয়া হবে না, কারণ সেক্ষেত্রে তিউনিস, ত্রিপোলি (লিবিয়া) এবং আলজেরিয়াও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু সেই সময় ইউরোপ ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধগুলোর কারণে মুহাম্মদ আলী পাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তাই বাব-ই-আলী মিশরের ইস্যুতে আপস করে নেন।

মুহাম্মদ আলী পাশাও উসমানীয় সালতানাতের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে দেননি, বরং খলিফাদের এই বিশ্বাস করাতে সক্ষম হন যে তিনি উসমানীয় রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। মুহাম্মদ আলী পাশার মিশরের স্বায়ত্তশাসন ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে সেলজুক বা ঘুরিদের স্বায়ত্তশাসন ছিল। মিশরের সাথে বাব-ই-আলীর অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মিশর এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল যে যখনই প্রয়োজন হবে, তার সেনাবাহিনী বাব-ই-আলীর সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

মুহাম্মদ আলী পাশার মিশর:

মুহাম্মদ আলী পাশার বিভিন্ন পদক্ষেপ এটি প্রমাণ করছিল যে তিনি ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সাথে ছিলেন। তিনি শরয়ী সীমানা স্থগিত করে দেন এবং পশ্চিমা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের পথ সুগম করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম শাসক যিনি জাতিকে ‘আধুনিক’ করার চেষ্টা করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াত ও জিহাদের কেন্দ্র মিশর তার যুগে কুফরি ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি কিবতি, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সাথে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাদের মর্যাদা ও অবস্থান উন্নত করেন। তার যুগে জনগণের ওপর কঠোর কর আরোপ করা হয় এবং ওলামাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইউরোপীয় বণিকদের জন্য বাণিজ্যের দরজা খুলে দেওয়া হয়, যার ফলে দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য মন্দার শিকার হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি চরমে পৌঁছায়।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া লি ইলমাজ ওজতুনা: ৬৫৩/১; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া আজ ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ৩৯১

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াতিল উসমানিয়া আজ ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃ. ৩৯০, ৩৯১

গেল। কৃষি এতটাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে মানুষ জমি ছেড়ে দেশ থেকে পালাতে শুরু করেছিল। [১]

সে মিশরে তার বিরোধিতার প্রতিটি সম্ভাবনা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য নিকৃষ্টতম জুলুম চালিয়েছিল। তার তুর্কি মামলুক আমিরদের অসহযোগিতার আশঙ্কা ছিল। তাই ১ মার্চ ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে (৫ সফর ১২২৬ হিজরি) সে দুর্গে একটি মাহফিলের আয়োজন করে সমস্ত মামলুক আমিরদের আমন্ত্রণ জানায়। এক জায়গায় সমবেত করে তাদের ওপর দেয়াল ও ছাদ থেকে গুলির এমন বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় যে সবাই ছটফট করে মারা যায়। যে আমিররা দাওয়াতে আসেনি, তাদের ঘরে ঢুকে হত্যা করা হয়। যারা পালিয়েছিল তাদেরও খুঁজে খুঁজে খতম করে দেওয়া হয়। এভাবে এই স্বৈরশাসক তার প্রতিটি প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। [২]

জাজিরাতুল আরব এবং শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব

উসমানীয় সালতানাতের ক্রমবর্ধমান পতন এবং ইউরোপের ক্রমবর্ধমান উন্নতি দেখে মুসলিম বিশ্বে দুটি মত অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল: একটি মত ছিল এই যে, মুসলমানদের পতনের কারণ তাদের রক্ষণশীলতা। এরপর এই মতের চরমপন্থীরা দীন ও ধর্মকেই পতনের কারণ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে পশ্চিমের অনুসরণের ওপর নির্ভরশীল মনে করতে থাকে। এই মতের ধারক গোষ্ঠী মুহাম্মদ আলী পাশার নেতৃত্বে মিশরের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে তাকে পশ্চিমা রঙে রাঙাচ্ছিল।

অন্যদিকে একটি গোষ্ঠীর মত ছিল এই যে, আমাদের পতনের আসল কারণ হলো সেই দীনে মুবিন থেকে দূরত্ব যা আমাদের ঈমানি শক্তি, তাসলিম ও তাওয়াঙ্কুল, উচ্চতর আখলাক, নফস বা আত্মার প্রশিক্ষণ এবং ত্যাগ ও কুরবানির মতো গুণাবলি দান করে। আমাদের দ্বারে দ্বারে মাথা নত করা থেকে বাঁচিয়ে এক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত রাখা শেখায়। আমাদের সত্য জানতে, মহাবিশ্ব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে, অলীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচতে, ইনসাফ কায়েম রাখতে, জালেমের হাত রুখে দিতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ, একমত ও সতর্ক ও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়। এই গোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল যে, মুসলমানরা বর্তমানে যেসব অসার কুসংস্কার, যেসব পৈতৃক প্রথা এবং যেসব আঞ্চলিক আচার-আচরণকে ইসলাম মনে করে, সেগুলো ইসলাম নয় বরং সেগুলোর অধিকাংশ জিনিসই ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

এই গোষ্ঠীর নেতাদের মধ্যে শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজদি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যার সম্পর্ক ছিল আরবের বনু তামিম গোত্রের সাথে। তিনি ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে (১১১৫ হিজরি) রিয়াদের (নজদ) উত্তরের শহর আল-উয়াইনাহ-তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে বিদআত ও কুসংস্কারের খুব প্রভাব ছিল। তিনি হাফেজে কুরআন, মুহাদিস এবং হাম্বলি ফকিহ ছিলেন। তিনি মৌখিক দাওয়াত ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়ে প্রচুর লেখালেখিও করেছেন। আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকারের আন্দোলন শুরু করে মানুষকে দীনের সঠিক ও সত্য শিক্ষা দিয়ে সজ্জিত করার চেষ্টা করেন। [৩] তিনি তাওহীদের আকিদার আহ্বায়ক এবং শিরকি আকিদা ও প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কবরের...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সাল্লাবি থেকে, পৃষ্ঠা: ৩২৮, ৩৩৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেক মুহাম্মী থেকে: পৃষ্ঠা ৩০৭।

[৩] তবে এটিও বাস্তবতা যে, কিছু বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন এবং এমন সব বিষয়েও যেগুলোর কিছু শর্তসাপেক্ষে শরয়ী অবকাশ রয়েছে, তিনি অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাচীন আলেমদের বিশেষ করে আশায়েরা ও মাতুরিদিয়াদের ওপর তীব্র আঘাত হেনেছিলেন। অনিবার্যভাবে উম্মতের জমহুর আলেমদেরও এসব চিন্তাধারার ওপর আপত্তি করতে হয়েছে।

কবর পাকা করতে এবং সেগুলোর ওপর গম্বুজ ও ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করতেন। যারা নিজেদের ধারণা, পৈতৃক প্রথা ও আচার-আচরণকে ইবাদত মনে করত, তারা নিজেদের মুখতার কারণে মনে করতে লাগল যে, আমাদের নতুন কোনো দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। সেই সব মাশায়েখ ও ওয়ায়েজিনও, যারা বিদআত ও কুসংস্কারের মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে চাইত, তারা শেখের বিরোধী হয়ে গেল। শাসকরাও মনে করল যে, শেখ তাদের গদি ও ক্ষমতার পেছনে লেগেছেন, তাই তারা এই আন্দোলনকে অত্যন্ত সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। এই সব কারণে শেখের এই আন্দোলনকে “ওয়াহাবিবাদ” বলে অপপ্রচার করা হলো।

এই পরিস্থিতিতে যখন নজদের আমির মুহাম্মদ বিন সাউদ শেখের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে তাকে সমর্থন দিলেন, তখন তার সমর্থকদের সামরিক শক্তিও অর্জিত হলো। জাজিরাতুল আরবের সেই সব লোক যারা দীর্ঘকাল ধরে বিদআত ও কুসংস্কারে অভ্যস্ত ছিল, তারা এর বিরোধিতায় একজোট হয়ে গেল। এভাবে শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব এবং তার আন্দোলনের বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলো।

১৭৭৩ সালে (১১৮৭ হিজরি) যখন শেখ আবদুল ওয়াহাবের বয়স ৭০ বছর হয়েছিল, আমির মুহাম্মদ বিন সাউদের পুত্র আবদুল আজিজ রিয়াদ দখল করেন এবং সেখানকার বিদআতি ও জালেম শাসক দাহাম বিন দাওয়াসকে পরাজিত করেন, এরপর রিয়াদ এই আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

শেখ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাব ১৭৯২ সালে (১২০৬ হিজরি) ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। আল সাউদ তার আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। হেজাজের শাসক শরীফ গালিব বিন মুসায়িদের সাথে তাদের বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়। আল সাউদ ১৮০৩ সালে (১২১৮ হিজরি) মক্কা মোয়াজ্জমা এবং ১৮০৫ সালে (১২২০ হিজরি) মদিনা মুনাওয়ারার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। সাউদ বিন আবদুল আজিজের শাসনামলে ইয়েমেন ব্যতীত সমগ্র জাজিরাতুল আরব, সিরিয়ার হাওরান এবং ইরাকের কারবালা পর্যন্ত এলাকা আল সাউদের দখলে চলে আসে। এটি ছিল আল সাউদের ক্ষমতার প্রথম যুগ। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে মুসলমানরা সঠিক, সত্য ও বিশুদ্ধ দ্বীনের ওপর চলে। সেই যুগে অনেক হাজি সশস্ত্র অবস্থায় ঢোল ও তবল বাজিয়ে হারামে আসতেন। আল সাউদ পবিত্র স্থানগুলোর পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য এসবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

জাজিরাতুল আরবকে ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখাও আল সাউদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ১৮০৬ সালে (১২২১ হিজরি) আল সাউদের পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধরত মুজাহিদিনরা ব্রিটিশ নৌবহর পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং পারস্য উপসাগরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তাই ব্রিটেন এই নতুন সরকারের উন্নতি ও স্থিতিশীলতাকে উদ্বেগের চোখে দেখছিল।

যারা পশ্চিমের অনুকরণকে উন্নতির শিখর মনে করত, তাদের কাছেও ওয়াহাবি আন্দোলন একটি বিপদ হিসেবে অনুভূত হচ্ছিল। তাই আধুনিকতাবাদীদের নেতা মুহাম্মদ আলী পাশা এই আন্দোলনকে দমন করার দায়িত্ব নেন। তিনি এবং ব্রিটেনের যোগসাজশে শুরু করা প্রচেষ্টায় খলিফা মাহমুদ সানিকেও এই বিশ্বাস করানো হয় যে, “ওয়াহাবি আন্দোলন”-এর উদ্দেশ্য খেলাফত খতম করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভুল বোঝাবুঝির ফল এই দাঁড়াল যে, খলিফা আল সাউদকে হেজাজ থেকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি প্রথমে ইরাকের...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা ১৮৬

শাসককে এই অভিযান সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কিছু অনিবার্য কারণে তিনি তা করতে অক্ষম ছিলেন। অবশেষে খলিফা মুহাম্মদ আলী পাশা এবং ব্রিটিশ বাহিনীর কাছেই আল সৌদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন।

আল সৌদ সেই সময় একটি সংস্কারবাদী আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল এবং তাদের সামরিক শক্তি খুব বেশি ছিল না। তাই যখন ১৮১৩ সালে (১২২৮ হিজরি) মুহাম্মদ আলী পাশার বাহিনী হিজাজে পৌঁছাল, তখন আল সৌদের আমির আবদুল্লাহ বিন সৌদ কিছু শর্ত সাপেক্ষে হিজাজের দখল ছেড়ে দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু মুহাম্মদ আলী পাশা সেই শর্তগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। দুই বছর ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে। অবশেষে ১৮১৫ সালের জানুয়ারিতে (১২৩০ হিজরি) ‘বিসল’ নামক স্থানে মুহাম্মদ আলী পাশা সৌদিদের শক্তি চূর্ণ করে দেন এবং এভাবে তিনি হিজাজ দখল করে নেন। তার বাহিনীর একটি বড় অংশ অফিসার এবং ফরাসিদের নিয়ে গঠিত ছিল এবং তিনি নিজেও শরয়ী সীমানার তোয়াক্কা করতেন না। তাই এই হামলায় হিজাজের বিপুল সংখ্যক নিরপরাধ নাগরিক, শিশু ও নারী প্রাণ হারান।

মুহাম্মদ আলী পাশার প্রত্যাবর্তনের পর সৌদিরা আবারও জেগে ওঠে, যার ফলে ১৮১৬ সালে (১২৩১ হিজরি) পাশার ছেলে ইব্রাহিম পাশা পুনরায় জাজিরাতুল আরবে আক্রমণ করেন। এবার মিশরীয় বাহিনী আল সৌদের কেন্দ্র দিরিয়া (নজদ) আক্রমণ করে। আমির আবদুল্লাহ বিন সৌদ পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তির অধীনে নিজেকে তুর্কি বাহিনীর হাতে সঁপে দেন। তাকে ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে চুক্তির মর্যাদা রক্ষা না করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

এই যুদ্ধের ফলে মুহাম্মদ আলী পাশাকে মিশরের পাশাপাশি জাজিরাতুল আরবেও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয় এবং এই পুরো অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভাবও অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়, কারণ মুহাম্মদ আলী পাশার সাথে ব্রিটেনের গভীর সম্পর্ক ছিল। ব্রিটেন হিজাজের এই ঘটনা থেকে একটি সুবিধাও লাভ করে যে, তারা এই অঞ্চলে তুর্কি ও আরবদের মধ্যে বিদ্বেষ উসকে দিয়ে মুসলমানদের একে অপরের সাথে লড়াই করার একটি স্থায়ী কারণ তৈরি করে দেয়।

যদি খলিফা মাহমুদ সানি, মুহাম্মদ আলী পাশা এবং ব্রিটেনকে হস্তক্ষেপের সুযোগ না দিয়ে আল সৌদের এই আন্দোলনকে—যা একটি দ্বিনি সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং হারামাঈন শারিফাইনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য শুরু হয়েছিল—নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় নিতেন, তবে হিজাজে তুর্কিদের প্রভাবও বজায় থাকত এবং সেখানে আরব ও তুর্কিদের সেই দ্বন্দ্বও শুরু হতো না যা পরবর্তী শতাব্দীতে মুসলমানদের চরম ক্ষতি সাধন করেছিল। [১]

সার্বিয়ার বিদ্রোহ এবং আধা-স্বায়ত্তশাসন:

দীর্ঘকাল ধরে উসমানীয় সাম্রাজ্য তাদের ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে খ্রিস্টানদের ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের ভাষা, শিক্ষা এবং তাহজিব ও তামাদুনে (সংস্কৃতি) পরিবর্তন আনার কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে কেবল তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট ছিল। এই কারণেই ইউরোপীয় প্রদেশগুলোর বাসিন্দাদের সহানুভূতি ও যোগাযোগ খ্রিস্টান বিশ্বের সাথেই বজায় ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের এই পতনের যুগে যখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৫০ থেকে ৩৬০।

থাকছিলেন, তখন অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতেও এই চিন্তা জাগ্রত হতে দেরি লাগেনি। বিশেষ করে যখন সমগ্র ইউরোপীয় বিশ্ব এই ষড়যন্ত্রে শরিক ছিল এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ফলস্বরূপ ১৮১৫ সালে (১২৩০ হিজরি) সার্বখ্রিস্টানদের নেতা “মিলোশ” (খিওডোরভিচ) পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দুই বছর ধরে তুর্কি বাহিনী এটি দমনের চেষ্টা চালিয়ে যায় কিন্তু কোনো সফলতা আসেনি। অবশেষে এই চুক্তিতে মীমাংসা হয় যে, সার্বরা তাদের নিজস্ব সরকার ও নেতা নিজেরাই নির্বাচন করবে, কর ও ব্যয়সহ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তারা স্বাধীন হবে। তাদের কর স্থানীয় সরকার আদায় করবে এবং তাদের ওপরই ব্যয় করবে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী কেবল সীমান্ত দুর্গগুলো পাহারা দেবে। এই চুক্তি সার্বিয়াকে আধা-স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। [১]

পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা - গ্রিসে বিদ্রোহ:

১৮২১ সালে (১২৩৬ হিজরি) গ্রিক অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, প্রায় দশ বছর সেখানে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রিস খিলাফতের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। এই বিদ্রোহের পেছনে একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা কার্যকর ছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার একাধিক ব্যর্থ চেষ্টার পর ইউরোপীয় দেশগুলো রাশিয়াকে সাথে নিয়ে একত্রিত হয় এবং তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের সমস্ত বিরোধকে গৌণ বিবেচনা করে তুরস্ককে তাদের প্রথম লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে, যে কিনা কয়েক শতাব্দী ধরে একাকী পুরো ইউরোপের মোকাবিলা করছে এবং এই পতনের যুগেও তাকে কাবু করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ফলস্বরূপ সবাই তুরস্ককে নির্মূল করার যৌথ প্রচেষ্টাকে “পূর্বাঞ্চলীয় সমস্যা” শিরোনাম দেয়, যার পর রাশিয়া, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স মিলে কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে গ্রিসের স্বাধীনতার সমর্থন করতে শুরু করে। তারা তুরস্ককে “ইউরোপের রুগ্ন মানুষ” উপাধি দেয় যাতে উসমানীয়দের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়।

গ্রিকরা ১৩ জানুয়ারি ১৮২২ সালে একজন গ্রিক রাজনীতিবিদ মাভোরকর্ডাটো (Mavrokordato)-কে তাদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করে এবং এজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপ দখল করে মোরা উপদ্বীপের পূর্বে অবস্থিত নেপোলিয়ন (আনাপোলি) দ্বীপকে তাদের রাজধানী ঘোষণা করে। এই দ্বীপগুলোতে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক মুসলমানকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়, আর অনেক মুসলমান দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

খলিফা মাহমুদ তৃতীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য কাপ্তান আলী পাশাকে পাঠান, যিনি ১১ এপ্রিল রণাঙ্গনে পৌঁছে এক সপ্তাহের যুদ্ধের পর বিদ্রোহীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয় এবং বাকিরা গ্রেপ্তার হয়।

ইউরোপ, যারা দ্বীপগুলোতে মুসলমানদের গণহত্যার সময় নীরব দর্শক হয়ে বসে ছিল, বিদ্রোহীদের পরাজয়ে চিৎকার করে ওঠে। ইউরোপে “গ্রিস প্রেমী” শিরোনামে সংগঠন গড়ে তোলা হয়, যারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য চাঁদা এবং অস্ত্র বিদ্রোহীদের কাছে পাঠাতে শুরু করে। বীরত্বগাথা কবিতা লেখা ও প্রচার করা হয় যা আবেগ জাগিয়ে তোলে এবং পুরো ইউরোপ থেকে যুবকরা যুদ্ধের জন্য গ্রিসে পৌঁছাতে শুরু করে।

(১) তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ৩০৩, ৩০৪।

এতে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের ছেলে এবং বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

এভাবে বিদ্রোহের আগুন পুনরায় অত্যন্ত তীব্রভাবে জ্বলে উঠল। অন্যদিকে রাশিয়া প্রকাশ্যে গ্রীকদের সাথে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে লাগল। খলিফা মাহমুদ সানি গ্রীসকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু উসমানীয় বাহিনী এই ফ্রন্টে অপরিপাক ছিল। অবশেষে খলিফা এখানেও মুহাম্মদ আলী পাশার কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হলেন। তিনি গ্রীক অধিকৃত এলাকাগুলো মুহাম্মদ আলী পাশার অধীনে দিয়ে দিলেন যাতে তিনি সেগুলো উদ্ধারের আশ্রয় চেষ্টা করেন।

মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২৪ সালে (১২৩৯ হিজরি) তার ছেলে ইব্রাহিমকে একটি নৌবহর দিয়ে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ পাঠান, তিনি রোডস হয়ে ক্রিট দ্বীপ দখল করেন এবং তারপর মোরিয়া দ্বীপে পৌঁছান যেখানে বিদ্রোহের শিখা আকাশ ছুঁয়েছিল।

যদিও পুরো ইউরোপের মোকাবিলায় এই যুদ্ধ যতটা সহজ মনে হয়েছিল ততটা ছিল না। তবুও ইব্রাহিম পাশা অগ্রসর হতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধের পর ১৮২৪ সালে (১২৪০ হিজরি) নাভারিনোর গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখল করেন। ১৮২৫ সালে মোরিয়া দ্বীপও পুনরুদ্ধার করা হয়। এই সময়ে উত্তর দিক থেকে তুর্কি জেনারেল রশিদ পাশাও তার নৌবহর নিয়ে আসেন এবং এজিনা দ্বীপটি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সফল হন। ইব্রাহিম পাশা এবং রশিদ পাশার যৌথ বাহিনী এরপর “মিসোলঙ্গি” অবরোধ করে এবং ১৩ এপ্রিল ১৮২৬ সালে এক বছরের অবরোধের পর এটি বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এভাবে বিদ্রোহীদের রাজধানী নেপোলিয়ন বাদে প্রায় সমস্ত এলাকা পুনরায় উসমানীয়দের দখলে চলে আসে। [১]

ইয়েনিচেরি নির্মূল:

গ্রীস যুদ্ধে উসমানীয়দের ধারাবাহিক বিজয় দেখে সুলতান মাহমুদ সানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং সুযোগ পেয়ে ইয়েনিচেরি প্রথা বিলুপ্ত করার দৃঢ় সংকল্প করেন যা জাতির জন্য একটি ক্ষত এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর অফিসার ও সৈন্যরা মদ্যপান, লুটতরাজ এবং বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত ছিল এবং তাদের বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না। অবস্থা এমন ছিল যে তারা প্রতিটি সংস্কারমূলক কাজের বিরোধিতা করত এবং যে খলিফাকে চাইত হত্যা করত আর যাকে চাইত সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিত।

জাতিকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়ার সৌভাগ্য সুলতান মাহমুদ সানির ভাগ্যে লেখা ছিল। তিনি উলামা, রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং অনুগত জেনারেলদের ধীরে ধীরে আশ্রয় নিলেন এবং তারপর একদিন দেশের মুফতি আজমের বাড়িতে একটি সভা ডেকে এই বিষয়ে পরামর্শ চাইলেন। সদর-ই-আজম সেলিম আহমদ তার উদ্বোধনী বক্তব্যে ইয়েনিচেরি প্রথার দুর্বলতা, ভুল কাজ এবং ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে এই সত্যটি স্পষ্ট করেন যে এই বিভাগটি কেবল নিজেই সংস্কারের অযোগ্য নয় বরং প্রতিটি সংস্কারের পথে বাধা, তাই এটি নির্মূল করা জরুরি। উপস্থিত সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এটি অনুমোদন করেন। মজলিসে ইয়েনিচেরি বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও এই জাতীয় ঐকমত্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ৬৫৩/১; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৯৫, ১৯৩/৮।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

কিন্তু মজলিস শেষ হওয়ার পর ইয়েনিচেরির সেই অফিসাররাই ইয়েনিচেরি সৈন্যদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করে এবং ইস্তাম্বুলের সেনানিবাসে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। সুলতান মাহমুদ সানি এর পূর্ণ প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি উলামা ও মুফতিদের কাছ থেকে তাদের শক্তি প্রয়োগ করে ধ্বংস করার অনুমতি নেন এবং তারপর ষাট হাজার সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনীসহ তাদের সেনানিবাস ঘেরাও করেন।

এখানে তুমুল যুদ্ধ হয়। ইয়েনিচেরিদের কাছে তখন গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না, তাই শীঘ্রই তারা তাদের ব্যারাকে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় কিন্তু সেখানেও গোলাবর্ষণ করা হয়। এভাবে তাদের শক্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তাদের পদক, নাম, ইউনিফর্ম, উপহার এবং সমস্ত বিশেষাধিকার বাতিল ঘোষণা করে তাদের পলাতকদের বিদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি ২৫ জুন ১৮২৬ (৯ জিলকদ ১২৪০ হিজরি) এর ঘটনা। এই যুদ্ধে মূল ভূমিকা পালনকারী অফিসার হোসেন পাশাকে প্রধান সেনাপতি করা হয়।

এরপর সুলতান মাহমুদ সানি পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে “নিজামে জাদিদ” পুনর্বহাল করেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম এবং দরবারী ও সরকারি পোশাকও পরিবর্তন করেন। কুর্তা-পায়জামার পরিবর্তে ইউরোপীয় ইউনিফর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পাগড়ির পরিবর্তে তুর্কি টুপি চালু করা হয়। [১] নতুন যুবকদের নিয়োগ করে আধুনিক প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হয় এবং সেই বছর শেষ হওয়ার আগেই বিশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত করা হয়। [২]

রাশিয়া এবং ব্রিটেন গ্রিসের সাথে:

এদিকে গ্রিস ফ্রন্টে উসমানীয়দের বিজয় সমাপ্তির পথে ছিল। শুধু বিদ্রোহীদের রাজধানী নেপোলিয়ন বাকি ছিল। বিশ্বশক্তিগুলো তুর্কিদের বিজয়ী হিসেবে দেখতে চায়নি। রাশিয়া এই বিষয়ে আগেই প্রকাশ্যে গ্রিক বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়িয়ে তুরস্কের মুখোমুখি হয়েছিল এবং উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটেন রাশিয়াকে সমর্থন করে একদিকে গ্রিসের স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করে এবং অন্যদিকে রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়ে দেয় যা “আক্কেরমান চুক্তি” নামে পরিচিত হয়, এতে স্থির করা হয় যে:

- রাশিয়া কৃষ্ণসাগরে নৌচলাচলের অধিকার পাবে।
- এর জাহাজগুলো তুর্কি বন্দর দিয়ে তল্লাশি ছাড়াই যাতায়াত করতে পারবে।
- আফলাক ও বাগদানের শাসকদের নিয়োগ নির্বাচনের মাধ্যমে হবে। রাশিয়ার সম্মতি ছাড়া তাদের বরখাস্ত করা যাবে না।
- সার্বিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে এবং তুরস্ক সার্বিয়া ও বেলগ্রেডের মাঝে মাত্র তিনটি দুর্গের মালিক থাকবে।

এই চুক্তিতে রাশিয়া ও তুরস্ক ছাড়াও অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া এবং ফ্রান্সের প্রতিনিধিরাও স্বাক্ষর করেন। এতে গ্রিস সমস্যার কোনো উল্লেখ করা হয়নি এবং এটি প্রকাশ করা হয়েছিল যে আসল সমস্যা রাশিয়া ও তুরস্কের, যাদের বিবাদ মিটে যাওয়ার পর গ্রিস

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৩০, ৩৩১।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৪৩১।

এর সমস্যাটি দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাধান করা সহজ হবে। [১]

তুরস্কের ওপর ইউরোপীয় জোটের ঐক্যবদ্ধ চাপ

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমস্যাটি সমাধান করতে চায়নি। তারা তুরস্ককে এই বিশ্বাস জুগিয়ে যে আমাদের প্রচেষ্টায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে এই দাবি উত্থাপন করল যে, উসমানীয় সালতানাত যদি তার ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে শান্তিপূর্ণ রাখতে চায়, তবে সেগুলোতে সরাসরি শাসন করার পরিবর্তে ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যস্থতায় সেগুলোর প্রশাসন পরিচালনা করতে হবে।

সুলতান মাহমুদ সানি এই দাবির পেছনে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর অসৎ উদ্দেশ্য ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি এই প্রস্তাবটি এই বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এটি তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল।

এর ফলে ইউরোপীয় দেশগুলো, যারা এ পর্যন্ত গ্রিসকে পর্দার আড়াল থেকে সমর্থন দিচ্ছিল, তারা প্রকাশ্যে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে চলে যায় এবং সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে একটি ঘোষণা জারি করে যে, যদি তুরস্ক গ্রিসকে স্বাধীনতা দেয় তবে গ্রিস তাকে বার্ষিক জিজিয়া প্রদান করতে থাকবে, যার পরিমাণ উভয় পক্ষ মিলে নির্ধারণ করতে পারে; কিন্তু এক মাসের মধ্যে তুরস্ক যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করে তবে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নিজেদের মতো করে এই সমস্যার সমাধান করে নেবে। খলিফা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। [২]

অ্যাড্রিয়ানোপল চুক্তি:

অবশেষে ইউরোপীয় দেশগুলোর সম্মিলিত নৌবহর ১৯ অক্টোবর ১৮২৭ (২৮ রবিউল আউয়াল ১২৪৩ হিজরি) তারিখে নাভারিনো বন্দরে উসমানীয় নৌবহরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে, যাতে তুরস্ক ও মিশরের সম্মিলিত নৌ-শক্তি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ত্রিশ হাজার মুসলমান শহীদ হন।

এরপর তুরস্কের পক্ষে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার প্রতিনিধিরা তুরস্ককে আস্থায় নেওয়ার প্রয়োজন মনে না করেই লন্ডনে একতরফাভাবে গ্রিসের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়।

খলিফা এই সিদ্ধান্তকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করে ১৮ ডিসেম্বর ১৮২৭ (২৮ জমাদিউল উলা ১২৪৩ হিজরি) তারিখে তার ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট করেন যে, ইউরোপীয় দেশগুলো বিশেষ করে রাশিয়া, ইউরোপের একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র উসমানীয় খিলাফতের ব্যাপারে অসৎ উদ্দেশ্য পোষণ করে এবং এই শত্রুতার কারণ রাজনৈতিক নয় বরং ধর্মীয়, তাই মুসলমানদের উচিত তাদের দীন, তাদের জাতি এবং তাদের মাতৃভূমি রক্ষার জন্য জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। [৩]

খলিফার এই বিবৃতিতে রাশিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সে ২৬ এপ্রিল ১৮২৮ (১১ শাওয়াল ১২৪৩ হিজরি) তারিখে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। খলিফাও রুশ সীমান্তে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন। এই সময়ে গ্রিস ফ্রন্টে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় এবং মুহাম্মদ আলী পাশা সেখানে প্রতিরোধকে নিরর্থক মনে করে সেপ্টেম্বর ১৮২৮ (রবিউল আউয়াল ১২৪৪ হিজরি) মাসে মিশরীয় বাহিনীকে গ্রিস থেকে ফিরিয়ে নেন। [৪]

[১] আত-তারিখুল ইসলামী, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১২৫, ১৬২

[২] আত-তারিখুল ইসলামী, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৬৫, ১৬৬

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানীয়াহ, মুহাম্মি: পৃ. ৪২৭, ৪২৮

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানীয়াহ, মুহাম্মি: পৃ. ৪২৮

তুরস্ক ও রাশিয়ার যুদ্ধ:

১৮২৮ সালের এপ্রিলে (শাওয়াল ১২৪৩ হিজরি) রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর তুর্কি বাহিনী দেড় বছর ধরে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। প্রুথ নদী, বোগদান, ওয়ালাচিয়া এবং দানিউব নদীর তীরে তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইয়েনিচেরি বিলুপ্তির পর তুর্কিদের বিকল্প বাহিনী খুব কম ছিল এবং যেখানেই তারা মোতায়েন ছিল, সেখানে রাশিয়া অতীতের সমস্ত যুদ্ধের চেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ইয়েনিচেরি বিলুপ্তি এবং আধুনিক প্রশিক্ষিত বাহিনী তৈরির সিদ্ধান্তটি একেবারেই সঠিক ছিল। হায়! যদি এই সিদ্ধান্তটি কয়েক বছর আগে নেওয়া হতো, তবে ময়দানে অপমানজনক পরাজয় ইসলামের শত্রুদের ভাগ্যে জুটত। যেহেতু এই সিদ্ধান্তে বিলম্ব হয়েছিল, তাই গ্রিসে তুর্কিরা পরাজিত হয় এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধেও কিছু সাফল্য সত্ত্বেও অনেক স্থানে পিছু হটতে হয়। কারণ ইয়েনিচেরি বিলুপ্ত হয়ে মাত্র দুই বছর অতিবাহিত হয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে এত বেশি সংখ্যক যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়নি যারা প্রতিটি ফ্রন্টে মোতায়েন হতে পারত।

অনেক কৌশলগত পয়েন্টে তুর্কিদের পিছু হটার পর রাশিয়া ‘ভার্না’ দখল করে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করে এবং তাদের বাহিনী ইস্তাম্বুলের উত্তরে ‘কারস’ এবং পশ্চিমে ‘আদ্রিয়ানোপল’ (এদিরনে) দখল করে নেয়, যা তুর্কিদের প্রাক্তন রাজধানী ছিল। সমুদ্রপথে রাশিয়ার অবাধ অগ্রগতির একটি বড় কারণ ছিল নাভারিনোর যুদ্ধে তুর্কি নৌবাহিনীর ধ্বংস হয়ে যাওয়া। [১]

এদিরনে চুক্তি (আদ্রিয়ানোপল চুক্তি):

এদিরনে রাশিয়ার আধিপত্যের পর আশঙ্কা দেখা দেয় যে তারা ইস্তাম্বুলও দখল করে নেবে। যেহেতু প্রতিটি ইউরোপীয় দেশ এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও রাজনৈতিক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল এবং সেখানে রাশিয়ার দখল ইউরোপের জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারত, তাই ফ্রান্স ও ব্রিটেন মধ্যস্থতা করে একটি সমঝোতা করিয়ে দেয়। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ (১৫ রবিউল আউয়াল ১২৪৫ হিজরি) তারিখে আদ্রিয়ানোপল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার শর্তানুসারে:

- ওয়ালাচিয়া, বোগদান, বলকান, কারস, আরজুরুম এবং বুলগেরিয়া তুর্কিদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
- প্রুথ নদীকে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ করা হয়।
- কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার জাহাজ চলাচলের অবাধ অনুমতি দেওয়া হয়।
- উসমানীয় সালতানাতকে রাশিয়ার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
- সার্বিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। তবে এর কিছু অংশ উসমানীয় রাষ্ট্রের অধীনেই থাকে।

“আদ্রিয়ানোপল চুক্তি” উসমানীয়দের জন্য একটি বড় পরাজয় ছিল যা তাদের হাত থেকে অনেক অধিকৃত অঞ্চল ছিনিয়ে নেয়। [২]

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের দখল:

নেপোলিয়নের পূর্ব অভিযানের পর ফ্রান্স ভারত মহাসাগরে ব্রিটেনের আধিপত্য খর্ব করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তবে ভূমধ্যসাগরে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল উসমানিয়্যাহ লি মুহাম্মাদ: পৃষ্ঠা ৩৩২, ৩৩৩।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি লি ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৬৩, ১৬৪।

যাইহোক সে ব্রিটেনকে পরাজিত করতে চেয়েছিল। তাই সে আলজেরিয়া দখল করে ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু আদ্রিয়ানোপল চুক্তির পর ফ্রান্সের কাছে আক্রমণের কোনো অজুহাত ছিল না।

সেই দিনগুলোতে ফ্রান্সের শস্যের প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানকার ইহুদি ব্যবসায়ীরা আলজেরিয়ার উসমানীয় শাসক হোসেন বাই-এর কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ শস্য ক্রয় করে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেয়। এই চুক্তিটি এই শর্তে হয়েছিল যে মূল্য অবিলম্বে পরিশোধ করা হবে, কিন্তু ফ্রান্স পরিশোধের ক্ষেত্রে টালবাহানা শুরু করে। আলজেরিয়ার শাসক ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে ফরাসি রাষ্ট্রদূত এক জনাকীর্ণ সভায়, যেখানে দেশের আমির ও মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন, শাসকের অবমাননা শুরু করেন। শাসক তাকে হাতের পাখা দিয়ে একটি আঘাত করেন। ফ্রান্স, যারা তুরস্ককে দুর্বল দেখে আলজেরিয়া দখলের অজুহাত খুঁজছিল, এই খবর পাওয়ামাত্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং একে নিজের অপমান হিসেবে গণ্য করে ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে (১৩ শাবান ১২৪৫ হিজরি) মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রস্তাব পাস করে যে এখন আলজেরিয়া দখল করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। ফলে কোনো বিলম্ব ছাড়াই ৩৮ হাজার সৈন্য আলজেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফ্রান্স একই সাথে এই অবস্থানও গ্রহণ করে যে তারা তাদের বাণিজ্যিক জাহাজে মুসলিম জলদস্যুদের আক্রমণ সহ্য করতে পারবে না।

খলিফা যখন এই সংবাদ পেলেন, তিনি অবিলম্বে আলজেরিয়ায় একজন রাষ্ট্রদূত পাঠান যাতে তিনি আলজেরিয়ার শাসককে ফ্রান্সের কাছে তার অসদাচরণের জন্য ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু ফরাসি বাহিনী খলিফার রাষ্ট্রদূতকে পথেই গ্রেপ্তার করে এবং আলজেরিয়া দখলের পরই তাকে মুক্তি দেয়। ফরাসি বাহিনী ১৪ জুন (২০ জিলহজ ১২৪৫ হিজরি) আলজেরিয়ার উপকূলে অবতরণ করে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর জুলাই ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে (মুহররম ১২৪৬ হিজরি) রাজধানী দখল করে নেয়। এরপর ফরাসি বাহিনী একের পর এক এসে দেশটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুহাম্মদ আলী পাশা আলজেরিয়ার একেবারে পাশেই এক অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তিনি আলজেরিয়ার প্রতিরক্ষায় কিছুই করেননি। অন্যদিকে খলিফার জন্য রাশিয়ার কাছে পরাজয়, ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ হারানো এবং মিসর হাতছাড়া হওয়ার পর নিজের প্রতিরক্ষা করাই কঠিন ছিল, আলজেরিয়াকে সাহায্য করা তো দূরের কথা। [১]

আমির আব্দুল কাদির আল-জাজাইরির সংগ্রাম:

এমন পরিস্থিতিতে আলজেরিয়ার বীর পুরুষ আমির আব্দুল কাদির আল-জাজাইরি দেশের উলামা, গোত্রপ্রধান এবং যুবকদের কাছ থেকে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন এবং নিজের বাহিনীকে সংগঠিত করে ফ্রান্সের মোকাবিলা শুরু করেন। অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে তারা ফরাসি বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এ প্রসঙ্গে ওরান এবং মোস্তাগানেমের যুদ্ধগুলো স্মরণীয়। বাধ্য হয়ে ফ্রান্সকে আমির আব্দুল কাদিরের সাথে সন্ধি করতে হয়, যার ফলে আলজেরিয়ার অধিকাংশ এলাকায় মুজাহিদদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এক বছর পর ফ্রান্স হঠাৎ সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করে। ফরাসিরা যেখানেই দখল করত, সেখানে রক্তের নদী বইয়ে দিত। ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে “জামালা” দখল করে তারা নারী, শিশু এমনকি বৃদ্ধদেরও জীবিত ছাড়েনি এবং এমন সব জুলুম-অত্যাচার করে যা শুনলে শরীরে কাঁপুনি দিয়ে ওঠে। আমির আব্দুল কাদির সতেরো বছর ধরে ফ্রান্সের মোকাবিলা করে যান, কিন্তু তিনি কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাননি এবং শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফারিদ বেগ মুহাম্মি: পৃষ্ঠা ৪৩৭, ৪৩৮।

৮ জুলাই ১৮৪৭ (২৩ রজব ১২৬৩ হিজরি) তারিখে তারা তাকে গ্রেপ্তার করে। এভাবে এই দেশের ওপর ফ্রান্সের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুল কাদির আল-জাজাইরি চার বছর পর মুক্তি পান। তিনি বাকি জীবন তুরস্ক ও হিজাজে অতিবাহিত করেন এবং ১৮৮৩ সালের শেষে (১৩০১ হিজরি) মক্কায় ইন্তেকাল করেন ও সেখানেই সমাহিত হন। [১] তার এই আত্মত্যাগী জীবনের ওপর মরহুম মুহাম্মদ আলীর এই কবিতাটি যথার্থভাবে প্রযোজ্য:

দূর হায়াত আয়ে গা কাতিল কাজা কে বাদ... হ্যায় ইবতিদা হামারি তেরি ইনতিহা কে বাদ
(মৃত্যুর পর ঘাতকের জন্য নতুন জীবন আসবে... তোমার শেষের পরেই আমাদের শুরু।)

মুহাম্মদ আলী পাশার সিরিয়া আক্রমণ:

খিলাফতে উসমানিয়াকে দুর্বল দেখে এর বন্ধু নামধারী শত্রু মুহাম্মদ আলী পাশাও তার আসল রূপে আবির্ভূত হলেন। আলজেরিয়ার ওপর ফ্রান্সের দখলদারিত্বের কারণে বাব-ই-আলি যে ধাক্কা খেয়েছিল, মুহাম্মদ আলী পাশা তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং আশা করলেন যে তিনি খিলাফতে উসমানিয়াকে খতম করতে পারবেন।

তাই ১৮৩১ সালে (১২৪৬ হিজরি) তিনি তার পুত্র ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে একটি বিশাল নৌ ও স্থল বাহিনী সিরিয়ায় পাঠান। ইব্রাহিম তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করে হোমস দখল করেন। ২৭ মে ১৮৩২ (২৭ জিলহজ ১২৪৭ হিজরি) তারিখে তিনি এক্কাও দখল করে নেন। এরপর তিনি উত্তর সিরিয়া ও তুরস্কের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হয়ে আলেপ্পোর কাছাকাছি পৌঁছে যান।

অন্যদিকে সুলতান মাহমুদ সানি এক্কার পতনের খবর পেয়ে তার পুরো বাহিনী, যার সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, হোসেন পাশার (যিনি জেনিসারিদের দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন) নেতৃত্বে সিরিয়ায় পাঠান। কিন্তু ২৯ জুন ১৮৩২ (২৯ মহররম ১২৪৮ হিজরি) তারিখে হোমস যুদ্ধে তার অগ্রবর্তী বাহিনী পরাজিত হলে মিশরীয় বাহিনী আলেপ্পো দখল করে নেয়। হোসেন পাশা সম্ভবত পরাজয় দেখে পিছু হটার পথ বেছে নেন, যাতে সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যবর্তী তোরোস পর্বতমালায় অবস্থান নিয়ে মিশরীয় বাহিনীকে সেখানে থামানো যায়। কিন্তু ২৯ জুলাই (১ রবিউল আউয়াল) ইব্রাহিম সামনে এগিয়ে গিয়ে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তছনছ করে দেন এবং তুর্কি বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ইব্রাহিম পাশা বিজয়ী বেশে আনাতোলিয়ার মধ্যবর্তী শহর কোনিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং ২০ ডিসেম্বর ১৮৩২ (২৭ রজব ১২৪৮ হিজরি) তারিখে সেখানে দ্বিতীয় তুর্কি প্রধান সেনাপতি রশিদ পাশাকেও পরাজিত করেন।

তুরস্কের অবস্থা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে এখন ইস্তাম্বুলের পতনের আশঙ্কা দেখা দেয়। কিন্তু রাশিয়া, যারা পিটার দ্য গ্রেটের ওসিয়ত অনুযায়ী ইস্তাম্বুলকে তাদের বৈশ্বিক কেন্দ্র বানানোর স্বপ্ন দেখছিল, তারা দ্রুত এগিয়ে আসে এবং খলিফার কাছে প্রস্তাব দেয় যে তারা ইস্তাম্বুল রক্ষার জন্য ১৫ হাজার রুশ সৈন্য পাঠাতে প্রস্তুত। খলিফা অন্য কোনো উপায় না দেখে অনুমতি দেন, ফলে রুশ বাহিনী প্রথমবারের মতো ইস্তাম্বুল পৌঁছে এবং বন্দরে মোতায়েন করা হয়।

রাশিয়ার সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় যাতে স্থির হয় যে রাশিয়া ইস্তাম্বুল বা মুহাম্মদ আলী পাশার যেকোনো আক্রমণ ঠেকাতে সহযোগিতা করবে এবং রুশ নৌবাহিনী ইস্তাম্বুলের প্রণালী দিয়ে বিনা বাধায় যাতায়াত করতে পারবে। এই চুক্তিকে “উস্কিয়ার ইসকেলেসি চুক্তি” বলা হয়।

[১] লক্ষ্য করুন: আল-আমির আব্দুল কাদির আল-জিহাদ আল-জাজাইরি, ডক্টর ইয়াহইয়া বু আজিজ, দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব, তিউনিস।

দ্রষ্টব্য: আলজেরিয়ার ওপর ফ্রান্সের দখল ১৩২ বছর স্থায়ী ছিল। এই সময়ে এখানকার মুসলমানরা বিভিন্নভাবে তাদের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট ছিল। অবশেষে ১৯৬২ সালে আলজেরিয়া একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বলা হয়ে থাকে, এর মাধ্যমে রাশিয়া ইস্তাম্বুলে হস্তক্ষেপের একটি স্থায়ী পথ পেয়ে যায়।

মিশরীয় বাহিনী ইস্তাম্বুলের কাছাকাছি চলে আসায় এবং তুরস্কে রাশিয়ার পূর্ণ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমা দেশগুলো, যাদের প্রত্যেকেই ইস্তাম্বুলকে নিজেদের রাজধানী বানাতে চেয়েছিল, তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা খলিফাকে পরামর্শ দেয় যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই যেন মুহাম্মদ আলী পাশার সাথে সন্ধি করে নেওয়া হয়। খলিফা নিজের প্রতিরক্ষায় অক্ষম ছিলেন, তাই তিনি বাধ্য হয়ে সন্ধি চুক্তি করেন যা মিথাক-ই-কুতাহিয়াহ (কুতাহিয়াহ চুক্তি) নামে পরিচিত। এতে স্থির হয় যে:

- মিশরীয় বাহিনী এশিয়া মাইনর থেকে চলে যাবে।
- মুহাম্মদ আলী পাশা আজীবন মিশরের শাসক থাকবেন।
- সিরিয়ার চারটি প্রদেশ: আক্কা, হিমস, ত্রিপোলি এবং আলেপ্পোতে তিনি নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। [১]

মুহাম্মদ আলী পাশা এবং সিরিয়ার শাসন:

মুহাম্মদ আলী পাশা সিরিয়া দখল করার পর সেখানে ইহুদি ও নাসারাদের, বিশেষ করে ব্রিটেনের লক্ষ্য অর্জনের পথ সুগম করতে শুরু করেন। ফ্রান্স ও আমেরিকার মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। অমুসলিমদের ওপর প্রযোজ্য শরীয়তের বিশেষ আইনগুলো স্থগিত করা হয়। আমেরিকা তাদের ছাপাখানা মাল্টা দ্বীপ থেকে বৈরুতে স্থানান্তর করে। এলি স্মিথ এবং তার স্ত্রী বৈরুতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ও খোলেন। আইন তৌরা কলেজ প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারায় পুষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ তৈরি করতে শুরু করে। ইউরোপ এই প্রচেষ্টায় সফল হয় যে, ইসলামি দেশগুলোতে স্থাপিত আধুনিক ছাপাখানাগুলো যেন খ্রিস্টান পুঁজিপতিরা ছাড়া আর কারও মালিকানায় না থাকে। এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত সাহিত্য এবং এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো হয়। সিরিয়া ও মিশরে জাতীয়তাবাদের চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে তুর্কি ও আরবদের মধ্যে আরও লড়াই বাধানো যায়। জায়গায় জায়গায় ফ্রিম্যাসন লজ খোলা হয় এবং ইসলামের শিকড় কাটা হতে থাকে। [২]

সিরিয়ার ওপর মিশরের দ্বিতীয় আক্রমণ এবং তুর্কিদের পুনরায় পরাজয়:

মুহাম্মদ আলী পাশা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর চাপে পড়ে তুরস্কের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন, অন্যথায় তিনি পুরো তুরস্ক গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে খলিফাও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য সময় নিতে সন্ধি করেছিলেন। এই সময়ে মুহাম্মদ আলী পাশার সাথে আলোচনাও হয়, যেখানে পাশা আপ্রাণ চেষ্টা করেন যেন সিরিয়া ও তুরস্কের মাঝে অবস্থিত “তৌরাস পর্বতমালা”র ওপরও তার অধিকার স্বীকৃত হয়। কিন্তু খলিফা এতে রাজি হননি কারণ এই পাহাড়গুলো ছিল তুরস্কের প্রাকৃতিক প্রাচীর। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। ২৪ জুন ১৮৩৯ (১২ রবিউস সানি ১২৫৫ হিজরি) আল-জাজিরার নুসায়বিন এলাকায় তুর্কি ও মিশরীয়দের মধ্যে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়, যাতে আবারও তুর্কি বাহিনী পরাজিত হয়। মিশরীয় বাহিনী ১৬৬টি কামান এবং বিশ হাজার বন্দি গনিমত হিসেবে লাভ করে। [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, মুহাম্মদ হুসনি: পৃষ্ঠা ৪৫০, ৪৫১।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৬৯।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরিদ বেগ মুহাম্মদ হুসনি: পৃষ্ঠা ৪৫২, ৪৫৩।

মাহমুদ সানির মৃত্যু:

এই পরাজয়ের খবর পৌঁছানোর আগেই ২ জুলাই (১৯ রবিউস সানি ১২৫৫ হিজরি) মাহমুদ সানি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর এবং খেলাফতের মেয়াদ ছিল ৩১ বছর ১০ মাস। [১]

সুলতান মাহমুদ সানির চরিত্র, কীর্তি ও ভুলত্রুটি:

মাহমুদ সানি উসমানীয় সালতানাতের মহান খলিফাদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি দীর্ঘ শাসনকাল পেয়েছিলেন এবং সরকার ও সালতানাতে আধুনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। যদি এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা না হতো, তবে তুর্কি সাম্রাজ্য যা পাঁচশ বছরের পুরনো ব্যবস্থার ওপর টিকে ছিল, সম্ভবত আরও দশ বছরও টিকত না এবং রাশিয়া বা ব্রিটেনের দাসে পরিণত হতো।

ক্রমাগত যুদ্ধ সত্ত্বেও সুলতান মাহমুদ সানি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তাঁর সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। সালতানাতে দুটি শ্রেণী ছিল যারা “আয়ান” এবং “আশরাফ” নামে পরিচিত ছিল, তারা দীর্ঘকাল ধরে প্রদেশ ও জেলাগুলোতে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো কাজ করত। সুলতান তাদের নিপীড়ন ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অবসান ঘটান এবং একটি ফরমান জারির মাধ্যমে এই উভয় শ্রেণীকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। তাদের পরিবর্তে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করা হয় যা কেন্দ্রের অধীনস্থ ছিল।

সুলতান ইয়েনিসারিদের সংস্কার অযোগ্য প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করে তার স্থলে নতুন সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং এভাবে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয় এমন সৈন্যদের পরিবর্তে উন্নত প্রশিক্ষিত বাহিনীকে প্রাধান্য দেন। এই সিলসিলায় তিনি “মাকতাবে ফুনুনে হারবিয়া শাহিয়া” (আল-মাদরাসাতুল হারবিয়াতুল ইমবেরাতোরিয়া) উদ্বোধন করেন। সেদিন প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সুলতান কাদা ও বরফ মাড়িয়ে সেখানে পৌঁছান এবং এই প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। এই ক্যাডেট কলেজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অবিলম্বে “মুলাজিম” (অফিসার) পদমর্যাদা দেওয়া হতো।

সুলতান মাহমুদ সানি “মুহান্দিস খানা-এ-বাররি হুমায়ুনি” (আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)-কে উন্নত ও সম্প্রসারিত করেন এবং সাথে সাথে “মুহান্দিস খানা-এ-বাহরি হুমায়ুনি” (নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ)-ও প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে নৌ কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ পেতে শুরু করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ইউরোপ থেকে সেরা শিক্ষক আনা হয়েছিল এবং এখানকার ব্যবস্থাপনা ছিল আন্তর্জাতিক মানের।

এছাড়াও তিনি “শাহি মাদ্রাসা-এ-তিব্বিয়া আসকারিয়া” নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যেখান থেকে উত্তীর্ণ ডাক্তার ও সার্জনরা যুদ্ধক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত শিক্ষা ফরাসি ভাষায় হতো।

সুলতান “দারুত তরজমা” নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি উজির-এ-আজম এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের জন্য (যারা বিদেশি ভাষা জানতেন না) লেখা ও নথিপত্র অনুবাদ করত। এছাড়াও এখানে তরুণদের বিদেশি ভাষা, বিশেষ করে ফরাসি ভাষা শেখানো হতো।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেক মুহাম্মদি: পৃষ্ঠা ৪৫২।

শেখানো হতো।

সুলতান ইউরোপের আধুনিক শাসনব্যবস্থা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সদর-ই-চাশির পদ পরিবর্তন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং “কেতখুদা-ই-সদারত” (অভ্যন্তরীণ বিষয়ের দায়িত্বশীল)-কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাম দেন। বাশ দপ্তর (অফিসার বায়তুল মাল)-কে অর্থমন্ত্রীতে রূপান্তরিত করেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার এমন এক আধুনিক ব্যবস্থা কায়েম করেন যা পশ্চিমা বিশ্বের ব্যবস্থার চেয়েও উন্নত ছিল।

গ্রিসের সাথে যুদ্ধে তুর্কিদের নৌবহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুলতান তার পরিবর্তে আগের চেয়েও বিশাল ও মহিমান্বিত এক নৌবহর তৈরি করান। তিনি নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য একাধিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন, যার অধীনে হাজার হাজার জরাজীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করা হয়। অসংখ্য রাস্তা তৈরি করা হয় এবং সেতু নির্মাণ করা হয়।

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ যোগাযোগ এবং প্রকাশনা বিভাগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। দেশে লিথোগ্রাফিক মুদ্রণ (লিথো প্রিন্টিং) শুরু করেন এবং প্রেস স্থাপন করেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ (১৮ শাবান ১২৪৬ হিজরি) তারিখে “তাকভিম-ই-ওয়াকায়ি” নামে একটি সংবাদপত্র বের করেন যা আরবি, তুর্কি এবং ফরাসি—এই তিন ভাষায় প্রকাশিত হতো।

তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল নাগরিকদের সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা। তিনি বেসামরিক বিভাগগুলোকে সামরিক বিভাগ থেকে আলাদা করে দেন এবং সেখানে ওইসব বিষয়ে দক্ষ নাগরিকদের হাতে ব্যবস্থাপনা অর্পণ করেন।

দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিভাগ দ্বীনি আলেমদের অধীনে ছিল। এখন সেখানে আধুনিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আলেমগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ফলে ওইসব বিভাগ খুব একটা সক্রিয় ছিল না। সুলতান আলেমদের কেবল তিনটি বিভাগে সীমাবদ্ধ করেন: ধর্মীয় বিষয়াদি বিভাগ, মাদ্রাসা এবং ধর্মীয় বিষয়াদি ও আদালত (শরিয়ি অধিকার) বিভাগ। বাকি অন্যান্য বিভাগ যেমন: বাণিজ্য, শিল্প ও কারুশিল্প এবং পৌরসভাগুলোতে তিনি সেসব বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দেন। উসমানি দরবারের আলেমগণ বড় বড় ভারী পোশাক এবং অনেক উঁচু টুপি পরিধান করতেন। সুলতান তাদের জন্য সাধারণ আলেমদের মতো পোশাক চালু করেন।

এই সংস্কারগুলোর ধারায় সুলতান একটি গুরুতর ভুলও করেছিলেন যা তুর্কিদের জন্য পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ঘটনাটি হলো, সুলতান তার জামাতা ও উপদেষ্টা খলিল রিফাত পাশার পীড়াপীড়িতে প্রাচ্যের পোশাকের পরিবর্তে ইউরোপীয় পোশাক বাধ্যতামূলক করেন। খলিল রিফাত পাশা পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণের প্রবক্তা ছিলেন। তার বক্তব্য ছিল: “যদি আমরা ইউরোপের অধিবাসীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ না করি, তবে আমাদেরও অন্যান্য এশীয় জাতিগুলোর মতো গোলাম হতে হবে।”

অবশেষে ৩ মার্চ ১৮৩৯ (২৭ শাবান ১২৪৪ হিজরি) তারিখে সুলতান এক আদেশ জারি করেন যে, সমস্ত দরবারি, সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য পাগড়ি, কুর্তা, সালোয়ার এবং স্থানীয় ধাঁচের জুতো নিষিদ্ধ। লাল রুমি টুপি (ফেজ), প্যান্ট এবং কোট পরা বাধ্যতামূলক। সামরিক কর্মকর্তারা এই আদেশ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং তারা সামরিক ইউনিফর্ম পরতে বাধ্য ছিলেন। পাগড়ি, কুর্তা এবং সালোয়ার কেবল নির্দিষ্ট আলেমদের জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সুলতানের এই আদেশের সাথে অধিকাংশ দরবারি ও আমীর একমত ছিলেন না, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা এই আদেশ মেনে নেন।

করে নিলেন। সুলতান এই সংস্কারগুলোর বিরোধিতাকারীদের ওপর অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং তাদের কণ্ঠ রোধ করে দেন। [১]

যদিও সুলতান একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন এবং তাঁর চিন্তাধারা তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন ছিল না, তবে এটি একটি অনিবার্য বিষয় যে বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপরও পড়ে। ফলে পশ্চিমা পোশাক গ্রহণের পর তুর্কি কর্মকর্তাদের হৃদয়ে পশ্চিমা জীবনধারা এবং চিন্তা ও মতাদর্শের প্রতিও একটি কোমল জায়গা তৈরি হয়ে যায়। পরবর্তী কয়েক দশকে এই পরিস্থিতি দেশটিকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পশ্চিমা চিন্তা ও মতাদর্শের দিকে ঠেলে দেয়। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায়:

বিদ্যুতের মতো স্বভাবের ওপর প্রভাব পড়ে

আশা ও ভয়ের তার তাদের হাতে এসে গেছে

হৃদয়গুলো কেন এখন পশ্চিমা রঙ ও ঢঙে আসবে না

জাতি তাদের হাতে, শিক্ষা তাদের হাতে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২২৫

১৯৮

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

সুলতান আব্দুল মজিদ আউয়াল বিন মাহমুদ সানি

১২৫৫ হি. থেকে ১২৭৭ হি.

১৮৩৯ খ্রি. থেকে ১৮৬১ খ্রি.

সুলতান মাহমুদ সানির মৃত্যুর পর তাঁর সতেরো বছর বয়সী পুত্র আব্দুল মজিদ আউয়াল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও বুদ্ধিমান, দয়ালু এবং যোগ্য যুবক ছিলেন। তিনি উন্নতি ও স্থিতিশীলতার জন্য ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর ব্যবস্থায় প্রচুর সংস্কার সাধন করেন, বাণিজ্যের প্রসার ঘটান, প্রাচ্য বিদ্যার পাশাপাশি আধুনিক শিল্পকলার প্রচার করেন এবং অনেক নতুন স্থাপনা নির্মাণ করেন। [১] এই যুগেই তুরস্কে প্রথম ব্যাংক খোলা হয় এবং কাগজের নোট চালু করা হয়। [২]

সিরিয়ায় তুরস্ক ও মিশরের বিরোধ:

আব্দুল মজিদ আউয়ালের সিংহাসন আরোহণের সময় সিরিয়া ও আল-জাজিরা ছাড়াও আনাতোলিয়ার অঞ্চলসমূহ: আইনতাব, কায়সারিয়া এবং মালাতিয়াতেও মিশরীয় বাহিনী দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত ছিল। এরপর ‘ঘরের শত্রু বিভীষণ’ প্রবাদের মতো, তুরস্কের আমিরুল্লাহ বাহর আহমদ পাশা তাঁর নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে গিয়ে মুহাম্মদ আলী পাশার হাতে তুলে দেন। এই কাজের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তাঁকে সদরে আজম করা হয়নি, অথচ এই পদের প্রতি তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল।

তুরস্কের নৌবহর হাতে আসার পর মুহাম্মদ আলী পাশা যেকোনো সময় নৌ ও স্থল শক্তিহীন ইস্তাম্বুলের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু এই বিষয়টি ইউরোপীয় শক্তিগুলোর স্বার্থের পরিপন্থী ছিল, কারণ তুরস্ক জয় করা এখন তাদের জন্য কোনো কঠিন সমস্যা ছিল না। তারা তুরস্ককে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে চেয়েছিল। এর আগে অন্য কারো সেখানে শক্তি প্রয়োগ করে দখলদার হওয়া তাদের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারত।

ফলে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া এবং প্রুশিয়া মধ্যস্থতা করে ঘোষণা দিল যে, মিশর ও তুরস্কের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত বিশ্বশান্তিকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে, তাই এই বিরোধের নিষ্পত্তি তাদের সম্মতি ছাড়া হবে না। খলিফা...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ১৮৯, আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭৬।

আব্দুল মাজিদ আউয়াল এটি গ্রহণ করে নিলেন। মুহাম্মদ আলী পাশার কাছেও ইউরোপীয় দেশগুলোর সামনে মাথা নত করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। [১]

সিরিয়া থেকে মিশরীয় সৈন্য প্রত্যাহার:

এ পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলো মুহাম্মদ আলী পাশাকে একজন চমৎকার ইসলামী বীর হিসেবে উপস্থাপন করেছিল যাতে বাকি মুসলমানরাও তাকে অনুসরণ করে। এর আড়ালে ইউরোপীয় শক্তিগুলো ইসলাম বিরোধী ইহুদি ও খ্রিস্টান আন্দোলন ও সংগঠনগুলোকে মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল; তারা প্রকাশ্য বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভের মাধ্যমে প্রাচ্যের সম্পদ লুণ্ঠন করাকে বৈধ করে নিয়েছিল। উলামা ও ফকিহদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তাদেরকে উম্মাহর নেতৃত্ব থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলো মুহাম্মদ আলী পাশাকে সমর্থন দিয়ে তাকে শক্তিশালী করতে থাকে। এরপর এই শক্তির মাধ্যমেই তারা ইসলামী খিলাফতকে টুকরো টুকরো করে এতটাই দুর্বল করে দিয়েছিল যে, খলিফা রাজধানী রক্ষার জন্য তার চরম শত্রু রাশিয়াকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। [২]

কিন্তু যখন ইউরোপের এই লক্ষ্যগুলো পূরণ হয়ে গেল, তখন তারা মুহাম্মদ আলী পাশাকেও দুর্বল করতে শুরু করল যাতে ভবিষ্যতে তিনি কখনোই ইউরোপের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়াতে পারেন। তাই যখন ইউরোপীয় দেশগুলো তুরস্ক ও মিশরের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছামতো সমঝোতা করার অধিকার দাবি করল এবং বিবদমান পক্ষগুলো তা মেনে নিল, তখন তার ফলে ১৫ জুন ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ (১৩ রবিউস সানি ১২৫৬ হিজরি) তুরস্ক ও মিশরের দ্বন্দ্বের অবসান নিম্নলিখিত চুক্তির মাধ্যমে ঘটে:

- মুহাম্মদ আলী পাশা তুরস্কের অনুকূলে সিরিয়া থেকে সরে দাঁড়াবেন।
- মিশরের শাসন ক্ষমতা মুহাম্মদ আলী পাশার বংশধরদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলতে থাকবে।
- মিশরের সেনাবাহিনী আঠারো হাজার সৈন্যের বেশি রাখা হবে না।
- মিশর তার নৌবাহিনীর জন্য জাহাজ নির্মাণ করবে না।
- মিশরের শাসকের সেনাবাহিনীতে অফিসার নির্বাচনের অধিকার থাকবে না, কেবল সৈন্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে।

মুহাম্মদ আলী পাশা শুরুতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন যাতে এমন কোনো চুক্তি হয় যার ফলে অঞ্চলে মিশরের আধিপত্য বজায় থাকে, কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলো কোনোভাবেই রাজি হয়নি। আর যখন তাকে হুমকি দেওয়ার জন্য ব্রিটেনের নৌবহর সিরিয়ার উপকূলে এসে পৌঁছাল, তখন মুহাম্মদ আলী পাশাকে ইউরোপের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতেই হলো।

ইব্রাহিম পাশার নেতৃত্বে মিশরীয় সৈন্য প্রত্যাহার ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে (১২৫৬ হিজরি) শুরু হয়। পথে বেদুইনরা, যারা সিরিয়ার ওপর মিশরের আধিপত্যের ঘোর বিরোধী ছিল, মিশরীয় বাহিনীর ওপর জায়গায় জায়গায় অতর্কিত হামলা চালায়। এর পাশাপাশি আবহাওয়ার তীব্রতাও ছিল অসহনীয়। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মিশরে ফিরে আসা পর্যন্ত ইব্রাহিম পাশা তার তিন-চতুর্থাংশ সৈন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এভাবে মিশরের শক্তি অনেক কমে গেল। মুহাম্মদ আলী পাশা ছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি বিদেশিদের অভিভাবক ও কিবলা বানিয়ে নিজের রাজনৈতিক উচ্চতা বৃদ্ধি করেছিলেন কিন্তু...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়হ আল-উসমানিয়ায়হ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৪৫৬, ৪৫৭।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়ায়হ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবী: পৃষ্ঠা ৩৭০।

যখন সে নিজেকে উচ্চতর মনে করে উন্নতির দিকে উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত হলো, তখন সেই পৃষ্ঠপোষকরাই তার ডানা কেটে দিল। মুহাম্মদ আলী পাশার পর এ ধরনের নেতাদের আসা-যাওয়া এক ধারাবাহিকতায় আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। [১]

“মিথাক খুনকার ইসকেলা সি” এর বাতিলকরণ:

মিথাক খুনকারের শর্তানুসারে, তুরস্ককে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রদানের বিনিময়ে রাশিয়া ইস্তাম্বুলের সমস্ত উপসাগরে অবাধে জাহাজ চলাচলের অনুমতি নিয়েছিল, যা পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য চরম উদ্বেগের কারণ ছিল। তাই সবাই মিলে তুরস্ক ও রাশিয়ার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে এবং অবশেষে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে (১২৫৭ হিজরি) এই চুক্তি বাতিল করিয়ে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদন করে। যার ফলে ইস্তাম্বুলের উপসাগরগুলো দিয়ে যাতায়াতের জন্য ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি দেশের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। একে “মিথাক মুদাইক” বলা হয়। [২]

মিথাক বালতা লিমান:

এই সময়ে আফলাক ও বাগদানের জনগণ ট্রান্সিলভেনিয়ার সাথে একীভূত হওয়ার আন্দোলন শুরু করে এবং এই দুই রাজ্যের শাসকদের ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। জনগণ সেখানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। এটি দেখে খলিফা সেখানে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে উভয় রাজ্যকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এতে রাশিয়া ক্ষুব্ধ হয় এবং যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে (১২৬৫ হিজরি) উভয় দেশ ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী “বালতা লিমান”-এ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সাত বছর পর্যন্ত তুরস্ক ও রাশিয়ার সেনাবাহিনী যৌথভাবে এই দুই রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করবে। [৩]

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ:

ফ্রান্স তখন পর্যন্ত রাশিয়ার হাতে নেপোলিয়নের পরাজয়ের অপমান ভুলে যায়নি এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় ছিল। বিশ্ব রাজনীতিতে নিজের পাল্লা ভারী দেখে সে রাশিয়াকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে বসে। রাশিয়া নিজের আত্মরক্ষার জন্য তুরস্কের সাথে “মুয়াহাদা খুনকার ইসকেলা সি” নবায়ন করার চেষ্টা করে, কিন্তু খলিফা তা মঞ্জুর করেননি।

এতে রাশিয়া ও তুরস্কের সম্পর্ক পুনরায় তিক্ত হয়ে ওঠে এবং রাশিয়া বাগদান ও আফলাক দখলের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। তুরস্কের পাল্টা আক্রমণের আগে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের (১২৬৯ হিজরি) শেষের দিকে বিবদমান পক্ষগুলোর প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই বিবাদে রাশিয়াকে দমন করতে চেয়েছিল। এর কারণ মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ছিল না, বরং তাদের নিজস্ব স্বার্থ ছিল। তাই উভয় দেশ তুরস্ককে পরামর্শ দিয়েছিল যেন তারা রাশিয়ার দাবির সামনে মাথা নত না করে। ফলে তুরস্ক রাশিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং আলোচনা ব্যর্থ হয়।

এর পরপরই তুরস্ক রাশিয়াকে পনেরো দিনের মধ্যে আফলাক ও বাগদান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করার এবং অন্যথায় যুদ্ধের...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭১; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়ায়্যাহ আল-উসমানিয়া, ফরিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৪৬৮ থেকে ৪৬৯।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/ ১৭৪।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/ ১৭৫।

প্রস্তুত থাকার বার্তা দিল। রাশিয়ার একগুঁয়েমির ফলে শেষ পর্যন্ত ওমর পাশার নেতৃত্বে তুর্কি বাহিনী অগ্রসর হলো এবং রুশদের পরাজিত করে অধিকৃত এলাকা থেকে বের করে দিল। এরপর শীত ও তুষারপাতের কারণে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথেই রুশ নৌবাহিনী কৃষ্ণসাগরে অভিযান চালায় এবং উসমানীয় নৌবাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। জবাবে ব্রিটিশ ও ফরাসি নৌবাহিনী, যারা তুরস্কের সাহায্যের জন্য কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল, কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করল।

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ (১২ জমাদিউল আউয়াল ১২৭০ হিজরি) তারিখে ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি যৌথ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাতে স্থির হয় যে:

- ১. ফ্রান্সের পঞ্চাশ হাজার এবং ব্রিটেনের পঁচিশ হাজার সৈন্য তুরস্ককে সহযোগিতা করবে।
- ২. রাশিয়াকে তুরস্কের কোনো অংশ দখল করতে দেওয়া হবে না।
- ৩. ইউরোপীয় বাহিনী ইস্তাম্বুল ও গ্যালিপলিতে সমবেত হবে এবং রুশদের পরাজিত করার পাঁচ সপ্তাহ পর তারা তুরস্ক থেকে ফিরে যাবে।

এই ঘোষণার পর এপ্রিল (রজব) মাসে রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে সাথে নিয়ে এই তিন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং তার বাহিনী দানিউব নদী পার হয়ে সিলিস্ট্রিয়া অবরোধ করে। কিন্তু উসমানীয়রা সময়মতো সাহায্য পেয়ে যায় এবং রুশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। রুশরা পিছু হটার সাথে সাথেই তুর্কিরা ওয়াল্যাচিয়া ও মলদাভিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু অস্ট্রিয়ার বাহিনী এসে তাদের পথ রোধ করে।

তুরস্ক ও তার মিত্ররা রাশিয়ায় প্রবেশ করে “সেভাস্তোপল” বন্দর অবরোধ করে। রুশ বাহিনী শহরটি জ্বালিয়ে দিয়ে পিছু হটে। শীতকাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলতে থাকে এবং রুশরা ক্রমাগত পরাজিত হতে থাকে। [১]

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রথম বৈদেশিক ঋণ:

এই যুদ্ধের সময় উসমানীয় সাম্রাজ্য চরম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং আরও যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করার সক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ২৮ জুন ১৮৫৫ (১৩ অক্টোবর ১২৭১ হিজরি) তারিখে উসমানীয় সাম্রাজ্য ব্রিটেনের কাছ থেকে পাঁচ শতাংশ সুদে পঞ্চাশ লক্ষ আশরাফি ঋণ গ্রহণ করে। এটিই ছিল প্রথম ঋণ যা উসমানীয় সাম্রাজ্য তার ইতিহাসে কোনো দেশ থেকে নিয়েছিল। এরপর এই ধারা চলতে থাকে এবং বিশ বছর পর উসমানীয় সাম্রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে একটি দুর্বল ও ঋণগ্রস্ত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। [২]

তুরস্ক ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সদস্য হলো:

আড়াই বছরের ভয়াবহ যুদ্ধের পর অবশেষে সন্ধির শর্তাবলির জন্য ভিয়েনায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ইউরোপীয় দেশগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানীয় রাষ্ট্রকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সভার সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং এর সীমানা রক্ষার যৌথ নিশ্চয়তা প্রদান করে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষ থেকে বর্ণ ও বংশ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অবস্থার সংস্কার এবং তাদের...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮ / ১৭৫ থেকে ১৭৮

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ৫৩/২

কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যখন ইউরোপীয় সরকারগুলো সম্মিলিতভাবে এটি স্বীকার করে নিয়েছিল যে তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার থাকবে না। [১]

প্যারিস চুক্তি:

ইউরোপীয় জাতিগুলোকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পাশে দেখে অবশেষে রাশিয়াকেও নতি স্বীকার করতে হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ (১৮ জমাদিউল আখিরা ১২৭২ হিজরি) প্যারিসে উসমানীয় সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং সার্ডিনিয়ার প্রতিনিধিরা একত্রিত হন এবং এক মাস আলোচনার পর প্যারিস চুক্তি কার্যকর হয়, যার প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- যুদ্ধরত পক্ষগুলো যুদ্ধের সময় দখলকৃত সমস্ত স্থান খালি করে দেবে।
- কৃষ্ণসাগরে নৌ চলাচলের অধিকার সবার থাকবে, তবে তুরস্কসহ কোনো দেশ সেখানে যুদ্ধজাহাজ আনতে পারবে না।
- দানিউব নদীতেও নৌ চলাচলের অধিকার সবার থাকবে।
- ওয়ালাচিয়া, মোলদাভিয়া এবং সার্বিয়া তুরস্কের অধীনে থাকবে। তবে সার্বিয়রা অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। [২]

এই চুক্তি ৩০ মার্চ ১৮৫৬ (২৩ রজব ১২৭২ হিজরি) প্যারিসে সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির কিছুকাল পর ইউরোপীয় দেশগুলো তুরস্কের সম্মতিতে তুরস্ক এবং সমস্ত ইউরোপীয় দেশের তত্ত্বাবধানে ওয়ালাচিয়া ও মোলদাভিয়াকে একটি ঐক্যবদ্ধ সরকারের রূপ দেয়।

[৩]

রাশিয়ার ওপর প্যারিস চুক্তির প্রভাব:

প্যারিস চুক্তিতে দৃশ্যত সবচেয়ে বেশি ক্ষতি রাশিয়ার হয়েছিল, কারণ এর ফলে রাশিয়ার সেই সমস্ত পরিকল্পনার ওপর পানি ঢেলে দেওয়া হয়েছিল যার জন্য সে দেড় শতাব্দী ধরে সচেষ্ট ছিল। রাশিয়ার চারটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:

- কৃষ্ণসাগরে নিজের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রবেশাধিকার লাভ করা।
- উসমানীয় সাম্রাজ্যের খ্রিস্টান প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করা।
- উসমানীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করা।

কিন্তু প্যারিস চুক্তিতে ইউরোপীয় জাতিগুলো রাশিয়ার পথে অনেক আইনি বাধা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এভাবে প্যারিস চুক্তি রাশিয়ার জন্য অনেক বড় পরাজয় ছিল, কিন্তু রাশিয়া চুক্তি ভঙ্গের অভ্যস্ত ছিল, সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৮৭০-১৮৭১ এবং ১৮৭৭-১৮৭৮ (১২৮৭ এবং ১২৯৫ হিজরি) সালে সে এই চুক্তির ধুলো উড়িয়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর দুটি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, যার বিস্তারিত সামনে আসবে। [৪]

[১] দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ২/৮৮

[২] THE CONGRESS AND TREATY OF PARIS, 1856 BY SEBASTIAN SOLON SIMPSON A. B. University of Illinois, 1917

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/৭৮-১৮০; দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ২/৮৯-৮৮

[৪] দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ২/৮৯-৯০

প্যারিস চুক্তির প্রভাব উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপর, বিদ্রোহের ধারাবাহিকতা:

প্যারিস চুক্তিতে উসমানীয়দের বিন্দুমাত্র লাভ হয়নি। যদিও ইউরোপীয় রাজনীতিবিদদের এই পদক্ষেপ উসমানীয় সাম্রাজ্যের টিকে থাকার জন্য ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উসমানীয়দের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, যার ক্রমবর্ধমান শক্তিতে তারা ভীত ছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে তারা যখন রাশিয়ার অগ্রযাত্রা বন্ধ করে দিল, তখন তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থের কথা বললে, সেদিকে কোনো ভ্রক্ষেপ করা হয়নি। প্যারিস চুক্তিতে উসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বার্থের সারসংক্ষেপ ছিল এই যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহ এর সার্বভৌমত্ব ও এর সীমানা রক্ষা করবে এবং এর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ইউরোপীয় জাতিসমূহ পরবর্তীতে এই দুটি বিষয়েরই সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘন করেছে।

প্যারিস চুক্তির পরপরই মোলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া রাজ্যগুলোকে একত্রিত করার এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে তাদের স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনকে উসকে দেওয়া হয় এবং প্যারিস চুক্তির মাত্র দুই বছর পর ১৮৫৮ সালে (১২৭৪ হিজরি) ইউরোপীয় জোট এই রাজ্যগুলোকে একত্রিত করে সেখানে নিজেদের পক্ষ থেকে একজন প্রধান আলেকজান্ডার কুজাকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করে। উসমানীয় সাম্রাজ্য কিছুটা নিজের দুর্বলতার কারণে এবং কিছুটা শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে এই কারচুপি সহ্য করে এই জোট ও নির্বাচনকে স্বীকৃতি দেয়।

এর পরপরই দেখতে দেখতে ক্রিট, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, বসনিয়া, হার্জেগোভিনা এবং বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং প্রতিটি রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা কোনো না কোনো ইউরোপীয় দেশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। মোটকথা, উসমানীয় সাম্রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চলগুলো রক্ষার প্রতিশ্রুতি ইউরোপীয় জোট স্থানে স্থানে বিদ্রোহ ঘটিয়ে পালন করেছিল। একইভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার এভাবে পূরণ করা হয়েছিল যে, যখন বাবে আলী এই বিদ্রোহগুলো দমনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠাল, তখন ইউরোপীয় দেশগুলো মাঝখানে চলে এল। ফলস্বরূপ ১৮৫৮ সালে (১২৭৪ হিজরি) ফ্রান্স ও রাশিয়া তাদের যুদ্ধজাহাজ ঠিক সেই সময়ে মন্টিনিগ্রোর উপকূলে পাঠিয়ে দিল যখন উসমানীয় বাহিনী একটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সেখানে প্রবেশ করছিল। [১]

সার্বিয়ার বিদ্রোহ এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দ্বিমুখী নীতি:

এই সময়ে সার্বিয়াও বিদ্রোহ করে এবং সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতার নামে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয় যা ইউরোপীয় দেশগুলোর সমর্থনপুষ্ট ছিল। এই কারণেই যখন তুরস্ক সার্বীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করল, তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলো চাপ সৃষ্টি করে তুরস্ককে এ ধরনের যেকোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখল। [২]

এভাবে ইউরোপ উসমানীয় সাম্রাজ্য রক্ষার গান গেয়ে এর বহু ইউরোপীয় জেলাকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহ উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের পরিষদের সদস্য তো বানিয়েছিল, কিন্তু এই সদস্যপদ তার কোনো কাজে আসেনি। উল্টো এই উছিলায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর হস্তক্ষেপ দিন দিন বাড়তে থাকে এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য...

[১] দৌলতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ২/ ৯০-৯১

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/ ১৭৮-১৭৯

...এর চারপাশে ইউরোপীয় বিশ্বের বেষ্টনী ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকে। [১] খাজা আলতাফ

হোসেন হালীর ভাষায়:

হে খেলাফত কেন্দ্র! তোমার ওপর বিপ্লব আসতে শুরু করেছে।

অদৃশ্য থেকে তোমার জন্য ধ্বংসের বার্তা আসতে শুরু করেছে।

হিতৈষী ভাগ্যের পক্ষ থেকে তিরস্কারের বার্তা আসতে শুরু করেছে।

দুর্ভাগ্যের দৃশ্য বন্ধুদের স্বপ্নে আসতে শুরু করেছে।

লেবাননে দ্রুজ ও মারোনিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর হস্তক্ষেপ:

ব্রিটেন ও ফ্রান্স মুসলিম বিশ্বের অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য লেবাননে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। সেখানে দ্রুজ ও মারোনি সম্প্রদায় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটেন দ্রুজদের সাহায্য করছিল এবং ফ্রান্স মারোনিদের পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। ১৮৪১

সালে (১২৫৭ হিজরি) দ্রুজরা মারোনিদের হটিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের বিশাল এলাকা

নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। চার বছর পর্যন্ত তাদের এই লুটতরাজ চলতে থাকে। অবশেষে

খলিফা সেখানকার দ্রুজ শাসক বশির শিহাবিকে অপসারিত করে একজন উসমানীয়

শাসক নিযুক্ত করেন। ইউরোপীয় জাতিগুলো, যারা এখন তুরস্কের প্রতিটি সিদ্ধান্তে

নিজেদের মোহর লাগাত, তারা এতে সম্মত হলো না। বাধ্য হয়ে সেখানে একজন দ্রুজ

এবং একজন মারোনিকে প্রতিনিধি হিসেবে রাখা হলো। তা সত্ত্বেও এই দলগুলোর মধ্যে

বিবাদ বজায় রইল এবং পারস্পরিক গেরিলা হামলার ধারা ১৮৬০ সাল (১২৭৭ হিজরি)

পর্যন্ত চলতে থাকে।

১৮৫৯ সালে (১২৭৬ হিজরি) যখন মারোনিরা দ্রুজদের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ

করল, তখন দ্রুজরাও একইভাবে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করল। ফলে লেবানন থেকে

শুরু করে দামেস্ক পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। অবশেষে ফুয়াদ পাশার নেতৃত্বে সেখানে

সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এই রক্তপাত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এরই মধ্যে ফ্রান্স গৃহযুদ্ধ

খামানোর অজুহাতে ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে (মহররম ১২৭৭ হিজরি) বৈরুতে তাদের

সেনাবাহিনী নামায়। যার উদ্দেশ্য ছিল লেবানন ও সিরিয়ার খ্রিস্টানদের শক্তিশালী করা।

গৃহযুদ্ধ অবসানের বিনিময়ে ফ্রান্স এই সুযোগ লাভ করে যে, লেবাননে তিন বছরের জন্য

একজন স্থানীয় খ্রিস্টান সরকারের অনুমোদন দেওয়া হয়। দশ মাস লেবাননে অবস্থানের

পর ১৮৬১ সালের জুন মাসে (জিলকদ ১২৭৭ হিজরি) ফরাসি বাহিনী ফিরে যায়। [২]

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের ইন্তেকাল:

ফরাসি বাহিনী ফিরে যাওয়ার কয়েক দিন পর ২৬ জুন ১৮৬১ সালে (১৭ জিলহজ ১২৭৭

হিজরি) সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের ইন্তেকাল হয়। [৩] তার বয়স ছিল মাত্র ৩৮

বছর।

টেলিগ্রাফ ও রেললাইন:

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের শাসনামলে টেলিফোন লাইন ও রেললাইনও স্থাপন

করা হয়েছিল। যদিও পশ্চিমা বিশ্বেও এই আবিষ্কারগুলোর খুব বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি।

সে সময় টেলিগ্রাম (তার) ব্যবস্থা বিশ্বের মাত্র চারটি দেশে ছিল: আমেরিকা,

[১] দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ৯০, ৯১।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/ ৭০, ৭১, ৭৩, ১৮০।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/ ১৮০।

২০৫

ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় ব্যবহৃত হতো। সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়াল ১৮৫৫ সালে (১২৭১ হিজরি) টেলিগ্রাফের তার এবং রেললাইন স্থাপনের কাজ শুরু করান যা তার উত্তরসূরি সুলতান আব্দুল আজিজ এবং তারপর সুলতান আব্দুল হামিদ সানি সম্পন্ন করেন। উসমানীয় সালতানাত বিশ্বের নবম রাষ্ট্র ছিল যেখানে এই উদ্ভাবনটি পরিচিত হয়েছিল। সেই সময় পর্যন্ত চীন ও জাপানে রেললাইনের কোনো নাম-নিশানাও ছিল না। [১]

তানজিমাত যুগ, মোস্তফা রশিদ পাশা এবং আধুনিক সংস্কারসমূহ

সুলতান আব্দুল মাজিদের সিংহাসন আরোহণ থেকে সুলতান আব্দুল হামিদ সানির ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত (১৮৩৯ থেকে ১৮৭৬ সাল) সময়কালকে “তানজিমাত যুগ” (দাওরুত তানজিমাত আল-খাইরিয়্যাহ আল-উসমানীয়াহ) বলা হয়, যাতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থায় ক্রমাগত সংস্কার ও পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যবস্থাকে আধুনিক থেকে আধুনিকতর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে এবং এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রচেষ্টাসমূহের প্রকাশ্য লক্ষ্য ছিল তিন মহাদেশে বিস্তৃত উসমানীয় সালতানাতে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে একটি অভিন্ন জাতীয়তাবাদের চেতনা জাগ্রত করা। একে “উসমানীয়বাদ” নাম দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি এবং অমুসলিম প্রজাদের পূর্বের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে উসমানীয়বাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এভাবে সালতানাতে বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করে ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা জাতিগত ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি ভেঙে দেওয়া। এই সংস্কারসমূহে ইউরোপীয় ধাঁচে জনগণের কণ্ঠস্বর উচ্চকক্ষ পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থাও বিবেচনাধীন ছিল, যা শেষ পর্যন্ত ১৮৭৬ সালে সংসদীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূর্ণতা পায়।

এই অভিযানে সালতানাতে বিভিন্ন আধুনিকমনা আমীর ও রাষ্ট্রনায়ক শরিক ছিলেন, যাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম হলো মোস্তফা রশিদ পাশা, যিনি লন্ডন ও প্যারিসে রাষ্ট্রদূত এবং সুলতান মাহমুদ সানির আমলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি আধুনিকায়নের একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের সিংহাসন আরোহণের পর তিনি তার সত্যায়নসহ একটি নতুন সংবিধান (যাকে খাত্তে হুমায়ুন নাম দেওয়া হয়েছিল) পেশ করেন, যার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

- প্রজাদের জীবন ও সম্মানের সর্বতোভাবে সুরক্ষা করা।
- ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাদের ঘৃণা থেকে রক্ষা করা।
- রাষ্ট্রীয় আয় সঠিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে সঠিক খাতে ব্যয় করা।
- সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে ন্যায্যবিচার ও ইনসাফ বজায় রাখা।
- মুসলিম ও অমুসলিম সকল প্রজার অধিকারের ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য না রাখা। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ২/৫৫

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ১৮৫, ১৮৬

নতুন ব্যবস্থার অধীনে বাহিনীকে ছয়টি “কোর”-এ বিভক্ত করা হয়েছিল: দুটি কোর বলকানে, দুটি আনাতোলিয়ায়, একটি সিরিয়ায় এবং একটি ইয়েমেনে। সামরিক, চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতা শেখানোর জন্য ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের আগমন শুরু হয়। এছাড়া প্রথমবারের মতো উসমানীয় সালতানাতের ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইউরোপে যাওয়ার ধারা শুরু হয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিনামূল্যে কেন্দ্রও খুলে দেওয়া হয়। [১]

এক পিতার সন্তান:

প্রথম আবদুল মাজিদের শাসনামলে সালতানাতের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দারুন্ন রেজা পাশা মিটিলিন দ্বীপে মুসলিম, গ্রিক, আর্মেনীয় এবং ইহুদিদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন: “আপনারা সবাই একজন শাসকের প্রজা এবং এক পিতার সন্তান। সুলতান আপনাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখেন না।” [২]

তবে মনে রাখতে হবে যে, সংবিধানে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ না করার অর্থ এই ছিল না যে, অমুসলিমদের সেই সব বিশেষ বিষয়েরও অধিকার থাকবে যেগুলোতে ইসলাম শর্ত হিসেবে রয়েছে, যেমন: ইমামত, বিচার বিভাগীয় পদ এবং হজ্জের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। বরং এর অর্থ ছিল মালিকানা, বসবাস, শিল্প ও কারুশিল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্জন, জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু সুরক্ষা, নিজ নিজ আকিদায় অটল থাকা, নিজ ধর্ম অনুযায়ী ইবাদত পালন করা এবং নিজ নিজ প্রথা অনুযায়ী বিবাহ করার অধিকার সবার থাকবে। আইনের চোখে সবাই সমান হবে, প্রত্যেকেই ইনসাফ পাবে, অপরাধের ক্ষেত্রে মুসলিম বা কাফিরের পাকড়াও সমান হবে।

মানবাধিকার এবং শরিয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই:

এখানে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, মানবাধিকার এবং ইসলামী শরিয়তের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই এবং এই কারণেই উসমানীয় সালতানাত যখন তার উন্নতির শিখরে ছিল এবং ইসলামী শরিয়ত কার্যকর ছিল, তখন সেখানে মানবাধিকার অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল এবং মুসলিম ও অমুসলিম সবাই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিল। পতনের যুগে যখন শরিয়ত পালনে শিথিলতা দেখা দিল, তখন মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগল। এর প্রতিকারও ছিল শরিয়তকে পুনরায় দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরা এবং শরিয়তের আলোকে পূর্বের চেয়ে বেশি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত সংবিধান তৈরি করে তা কার্যকর করা। ১৮৩৯ সালে সুলতান প্রথম আবদুল মাজিদের সিংহাসন আরোহণের সময় পেশকৃত সংবিধানের শুরুতেও এই কথাই বলা হয়েছিল:

“প্রজাদের কাছে এটি গোপন নয় যে, আমাদের মহান সালতানাত তার সূচনালগ্ন থেকেই কুরআন মাজিদ এবং শরয়ী আইনের অনুসারী। এই কারণেই আমাদের সালতানাতের শক্তি ও উন্নতি এবং প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধির কোনো তুলনা ছিল না। কিন্তু গত দেড় শতাব্দী ধরে বিষয়টি এর বিপরীত হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ না শরিয়তে মুতাহহারার অনুসরণ করা হচ্ছে আর না উপকারী আইন মেনে চলা হচ্ছে। এটাই একের পর এক দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদের কারণ। ফলে আমাদের শক্তি দুর্বলতায় পরিণত হয়েছে এবং আমাদের সচ্ছলতার জায়গা দারিদ্র্য দখল করে নিয়েছে।” [৩]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, আলী হাসুন: পৃষ্ঠা ১৮৬। কোর একটি সামরিক ইউনিট যাকে ‘কোরদু’ বলা হয়।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭৫।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭৩।

মোস্তফা রশীদ পাশার বিরোধিতা, পদচ্যুতি এবং পুনর্বহাল:

যাই হোক, এই নতুন ব্যবস্থা দৃঢ় বিশ্বাসী মুসলিম এবং বিশেষ করে ওলামাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তক মোস্তফা রশীদ পাশার প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সংবিধানকে শরীয়ত অস্বীকার এবং দ্বীনের মধ্যে হস্তক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি প্রচার হয়ে যায় যে, মোস্তফা রশীদ পাশা ফ্রিম্যাসনের সদস্য এবং এই সংবিধান ফ্রিম্যাসনের “স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্য” ভিত্তিক প্রচারণার প্রতিফলন। রশীদ পাশার বিরুদ্ধে চাপ এতটাই তীব্র ছিল যে, বিদ্রোহের আশঙ্কায় তাকে পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তবে চার বছর পর পরিস্থিতি শান্ত হলে তাকে পুনরায় আইভানের সদস্য করা হয় এবং ১৮৪৬ সালে তাকে সদর-ই-আজম পদ প্রদান করা হয়। তিনি ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। [২]

১৮৫৬ সাল, বিচার ব্যবস্থা স্থগিত:

এই সময়ে নীতিনির্ধারকদের আধুনিকতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যে প্রতিটি প্রাচীন বিষয়ই তাদের পতনের কারণ। ফলে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা এবং সালতানাতে ওলামাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও তাদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। বিদেশি শক্তির চাপ গ্রহণের ধারাও অব্যাহত থাকে এবং অবশেষে ১৮৫৬ সালে (১২৭২ হিজরি) এই সংবিধানে আরও কিছু ধারা যুক্ত করা হয়, যার মধ্যে এমন কিছু ধারাও ছিল যা উসমানীয় সালতানাতে ইসলামি পরিচয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না এবং বিজাতীয়দের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক আক্রমণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। এই অতিরিক্ত ধারাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- সামরিক নিয়োগে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।
- ধর্ম ও মতাদর্শের ভেদাভেদ ছাড়াই সকল নাগরিকের সাথে সমান আচরণ করা হবে।
- অমুসলিম দেশগুলোর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রাপ্ত বিশেষাধিকার ও সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করা হবে।
- আধুনিক ব্যবস্থার পথে অন্তরায় প্রতিটি বাধা দূর করা হবে যাতে সকল নাগরিক তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে।
- খ্রিস্টান নাগরিকদের অধিকার থাকবে যে তারা তাদের আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদের লোকদের নিয়ে মজলিসে শূরা গঠন করতে পারবে, যার সদস্যদের তারা নিজেরাই নির্বাচিত করতে পারবে।
- খ্রিস্টান নাগরিকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হবে যাতে তারাও সরকারি চাকরি লাভ করতে পারে।
- ঘুষ ও দুর্নীতির আধিক্যের কারণে বিচার ব্যবস্থা স্থগিত করা হচ্ছে। [১]

এভাবে এখন নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমা দাবির ছাপ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থা স্থগিত করা নিশ্চিতভাবেই পশ্চিমা বিশ্বের অন্ধ অনুকরণ বা তাদের চাপ গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাছাড়া মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সেনাবাহিনীতে যোগদান ও পদোন্নতির সমান সুযোগ প্রদান করাও পরবর্তীতে সালতানাতে জন্ম সমস্যা ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭৭, ৩৭৮।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৭৬, ৩৭৭।

তুরস্কে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব:

এই সময়ে তুরস্কে পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব রক্ষণশীল ও আধুনিকতাবাদীরা দুই চরমপন্থার দিকে ধাবিত হতে থাকে। অবিশ্বাস, একে অপরের প্রতি দোষারোপ, আবেগপ্রবণতা এবং চরমপন্থার প্রবণতা বাড়তে থাকে এবং উভয় পক্ষ একে অপরের বিরোধিতায় মধ্যপন্থা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। রশীদ পাশার মতো আধুনিকমনা ব্যক্তির দিন দিন উলামায়ে কেরাম থেকে দূরে এবং পাশ্চাত্যকরণের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন এবং তারা ধারণা করে নেন যে, ইসলামে বর্তমান যুগের সমস্যাবলির কোনো সমাধান নেই এবং এই দ্বীন একটি আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য অপরিপূর্ণ। এর প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেই সব বিষয় থেকেও বিরত থাকা জরুরি মনে করে যেগুলোতে পাশ্চাত্যকরণের গন্ধ পাওয়া যেত, যদিও শরীয়তে তার অবকাশ ছিল; যেমন পাশ্চাত্য ভাষা এবং সেখানে প্রচলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শেখা।

প্রকৃতপক্ষে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কের এমন একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল যিনি ইমাম গাজালী, ইমাম রায়ী এবং ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.)-এর মতো হতেন, যিনি ইসলামী রূহ, মাকাসিদে শরীয়াহ এবং ফিকহী আইনের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি সময়ের চাহিদা, সমকালীন রাজনীতির উত্থান-পতন এবং সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সম্যক অবগত হতেন। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলনীতি ও ফলাফল যাচাই করতে, ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক যুদ্ধের জবাব দিতে, বিশ্বের সামনে বিদ্যমান ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান বের করতে এবং ইসলামী সীমানার মধ্যে কার্যকর পথ দেখানোর মতো সংস্কারমূলক কাজ সম্পাদন করতে পারতেন। উসমানী তুর্কিদের এই পতনের যুগে হয় তো এমন ইলমী ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল অথবা সরকার এমন ব্যক্তিত্বদের থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করেনি, অথবা পরিস্থিতির আবর্তে এবং অবমূল্যায়নের কারণে এমন ব্যক্তিদের ইলমী ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ সামনে আসতে পারেনি। যাই হোক, ফলাফল এই দাঁড়াল যে, সুলতান আব্দুল মাজীদে শেষ দিনগুলোতে পুরাতন ও নতুন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান এতটাই প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল যে তা ঘুচানো কঠিন ছিল। সালতানাতের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তির ইসলামী রাজনীতির সঠিক ব্যাখ্যা সামনে না থাকার কারণে দ্রুত পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং সেকুলারিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। এই যুগের বিখ্যাত আলেম আল্লামা মাহমুদ আলুসী ইরাকী বলতেন:

“আজ কোনো শহরের ওপর আল্লাহর এতটুকু রহমতও অনেক বড় বিষয় যে, তার শাসক এই মন্দ (পাশ্চাত্যকরণ) থেকে বেঁচে আছেন। কারণ এই খারাপ সময়ে খুব কম লোকই তা থেকে নিরাপদ।” [১]

নতুন আইন থেকে ইসলামের শত্রুরা কীভাবে ফায়দা হাসিল করল?

যেহেতু নতুন ব্যবস্থার বদৌলতে সেনাবাহিনীতে মুসলিম ও অমুসলিমের পার্থক্য খতম করে দেওয়া হয়েছিল, খ্রিস্টান নাগরিকদের আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কয়েম করার অনুমতিসহ অস্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। [২] ফলে তাগুতী শক্তিগুলো তুরস্কে নিজেদের প্রভাব

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবী: পৃষ্ঠা ৩৭৮।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবী: পৃষ্ঠা ৩৭৭।

সুযোগ বেড়ে গেল। মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো অবিলম্বে এই সুযোগ-সুবিধার ফায়দা নিল এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তুরস্কে নিজেদের স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা শুরু করল, যা পরবর্তীতে খ্রিস্টধর্মের প্রচার এবং পশ্চিমা সভ্যতার প্রসারের মাধ্যমে হয়ে দাঁড়াল। [১]

এই যুগে উসমানীয় সালতানাতে রাজধানী ইস্তাম্বুলে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, ফরাসি ঐতিহাসিক লিবান, যিনি প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন, আক্ষেপের সাথে লিখেছেন:

“আজকাল তুর্কিদের বড় শহরগুলোতে, বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে ইসলামি হেরেমের অবস্থা ভালো নয়। ইস্তাম্বুলের হেরেমগুলোর সামাজিক জীবন বর্তমানে প্রায় ততটাই স্বাধীন যেমনটা ইউরোপের বড় বড় রাজধানীগুলোর। ইউরোপীয়দের প্রভাব, বিলাসিতার আধিক্য এবং বিগত যুদ্ধের পরবর্তী দারিদ্র্য তুর্কিদের চরিত্রকে অনেক কলুষিত করে দিয়েছে।” [২]

জনাব আকবর এলাহাবাদী কতই না চমৎকার বলেছেন:

- তাদের তো ফাঁদে ফেলা ছাড়া আর কিছুই আসে না
- আমার এখন শ্বাস নেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে
- রাত ছিল অন্ধকার, চোর এল, যা ছিল সব নিয়ে গেল
- এই বান্দার কাশি দেওয়া ছাড়া আর কী-ই বা বলার ছিল

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের কিছু জনহিতকর কাজ:

যদিও সুলতান প্রগতিশীল ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ উজির ও আমিরগণ পশ্চিমা ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যাদের মাধ্যমে আধুনিকতাবাদের বীজ এই সালতানাতে মূলে প্রবেশ করেছিল, তবে আমাদের সুধারণা এই যে, সুলতান এই সবকিছুই নেক নিয়তে করেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন সঠিক আকিদার মুসলিম এবং কোমল ও দয়ালু মানুষ ছিলেন, যিনি দান-খয়রাত ও নেক কাজের জন্য সচেষ্টিত থাকতেন। [৩]

তাঁর নেক কাজগুলোর মধ্যে স্মরণীয় একটি কীর্তি হলো মসজিদে নববীর আধুনিক নির্মাণ। এই কাজ ১২৭০ হিজরি (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) সালে শুরু হয় এবং চার বছরে সম্পন্ন হয়। আজও মসজিদে নববীর প্রাচীন কেন্দ্রীয় অংশ সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের নির্মাণশৈলীর রুচি এবং হজুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার সাক্ষ্য দেয়।

এ ছাড়াও সুলতান হারামাঈন শরিফাইনে আরও অনেক নির্মাণ কাজ করান। তদুপরি তিনি ১২৮৫ হিজরি (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) সালে বাইতুল্লাহর মিজাব (পানির নালী) সংস্কার করান। এ ছাড়াও ইস্তাম্বুলে জামে মাজিদিয়া নামে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করান। [৪]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৩৭৯

[২] তামাদুনে আরব, পৃ. ৩৮০, ৩৮১, মুদ্রিত হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আল-মাজহলাহ: পৃ. ২৯

[৪] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, আলী হাসুন: পৃ. ৯৮, 'তিব' আল-মাকতাবুল ইসলামি বৈরুত

দ্রষ্টব্য: মনে রাখা প্রয়োজন যে, “সোশ্যাল মিডিয়ার বুদ্ধিজীবীরা” সুলতান সম্পর্কে লজ্জাজনক বিলাসিতার যে সব গল্প উদ্ভাবন করেছে, সেগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই।

সুলতান আব্দুল আজিজ বিন মাহমুদ সানি

১২৭৭ হিজরি থেকে ১২৯৩ হিজরি

(১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)

আব্দুল আজিজ মাহমুদ সানির পুত্র এবং আব্দুল মাজিদ আউয়ালের ভাই ছিলেন। তিনি ৩১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর একটি প্রাথমিক ফরমান থেকে তাঁর ইসলামপ্রিয়তার আন্দাজ করা যায়, যাতে বলা হয়েছিল:

“শরিয়তে মুতাহারা, যা খাঁটি ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সালতানাতে আলিয়ার মজবুতি এবং এর শান-শওকতের ভিত্তি। এর বিধানসমূহ আমাদের সকলের জন্য উপকারী এবং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রমাণ। তাই শরয়ি বিধানসমূহকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা আমাদের সকলের জন্য অবশ্যই কাম্য। যেহেতু প্রতিটি সরকারের টিকে থাকা এবং এর শান-শওকত প্রজাদের আইন মেনে চলার ওপর নির্ভরশীল, তাই ছোট-বড় কেউ যেন আইনের গণ্ডির বাইরে না থাকে।” [১]

সংস্কার এবং আধুনিক শিক্ষার প্রচেষ্টা:

এর পাশাপাশি সুলতান শাসনব্যবস্থাকে আধুনিক ও শক্তিশালী করারও সমর্থক ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন এক পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের শাসক। যার বাধ্যবাধকতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো দ্রুত তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আঠারো শতক ঈসাবীর শুরুতে সুলতান মাহমুদ আউয়াল যখন শাসনব্যবস্থা আধুনিকায়নের ইচ্ছা করেছিলেন, তখন তাঁর আসল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা এবং হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা। সে সময় উসমানীয় সালতানাত দুর্বল হতে থাকলেও তা অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন বা রাশিয়ার মতো যেকোনো ইউরোপীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারত।

আবার আঠারো শতক ঈসাবীর শেষের দিকে যখন সেলিম সালিহ আধুনিকায়নের চেষ্টা করেছিলেন, তখন সালতানাত বেশ কিছু পরাজয় বরণ করেছিল এবং অনেক ইউরোপীয় এলাকা হারিয়েছিল। এটি নিশ্চিতভাবেই বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল এবং পরিস্থিতির চাপ নিঃসন্দেহে বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও লক্ষ্য ছিল কোনোভাবে নিজের ভঙ্গুরতাকে স্থায়িত্ব ও উন্নতিতে বদলে দেওয়া।

কিন্তু উনিশ শতক ঈসাবীতে সুলতান মাহমুদ সানি এবং সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের হাতে যে আধুনিকায়ন হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য সালতানাতের স্থায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, কোনোভাবে ইউরোপীয় দেশগুলোকে সন্তুষ্ট রাখা এবং যেকোনো উসিলায় নিজের সালতানাতকে রক্ষা করা।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৫৩১।

উদ্দেশ্য ছিল কারণ সেই সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলো, যারা প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের সমাপ্তির বিষয়ে একমত হয়েছিল, কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী আবার কখনও মিত্র হয়ে যুদ্ধ বা চুক্তির মাধ্যমে তুরস্কের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল। তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে কখনও উপদেশমূলক আবার কখনও আদেশমূলক ভঙ্গিতে দাবি করছিল যে তুরস্ক যেন তার প্রাচীন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ফেলে।

বাহ্যত তাদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা, কিন্তু তারা যে ধরনের সংস্কারের পেছনে লেগেছিল, তার অনিবার্য ফলাফল এটাই হতে পারত যে মুসলিম উম্মাহ তাদের দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়ে জাতিগত ও আঞ্চলিক এককে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তুরস্ক একটি বিশ্বজনীন খিলাফতের পরিবর্তে কেবল তুর্কি জাতির পৈতৃক নিবাস হয়ে থেকে যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে একা কোনো একটি দেশের সাথেও লড়াই করার শক্তি তার ছিল না। একটি দেশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অন্য দেশের সাহায্য তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিটি ইউরোপীয় দেশের চেষ্টা ছিল তুরস্কের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি করে তাকে প্রশাসনিক, আইনি, শিক্ষাগত এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংস্কারে এমনভাবে সাহায্য করা যাতে তুরস্ক তাদেরই রঙে রঞ্জিত হয় এবং তাদের কৌশলগত উদ্দেশ্যের অনুগত হয়ে পড়ে। প্রতিটি ইউরোপীয় দেশের চেষ্টা ছিল যতক্ষণ সম্ভব, তারা যেন তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থানকে এককভাবে নিজেদের বাণিজ্যিক ও প্রতিরক্ষা স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে।

সুলতান আব্দুল আজিজ নিজের রাষ্ট্রকে বাঁচাতে এবং ইউরোপকে আশ্বস্ত করতে সংস্কারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সংস্কার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বাধ্য করেন। তিনি ১৮৬৪ সালে (১২৮১ হিজরি) “কানুন-ই-বিলায়াত” (প্রদেশ আইন) অনুমোদন করেন। বিচার বিভাগকে আধুনিক রূপ দেন এবং কাজীদের প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তে “দেওয়ানুল আহকামুল আদলিয়া” প্রতিষ্ঠা করেন যা সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা রাখত। ১৮৬৮ সালে (১২৮৫ হিজরি) তিনি ফরাসি ধাঁচের পার্লামেন্টের ভিত্তি স্থাপন করেন যাকে “শুরা-ই-দৌলত” অর্থাৎ মজলিসে শুরা বলা হতো। [১]

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে তিনি ১৮৬৮ সালে (১২৮৫ হিজরি) ইস্তাম্বুলের “গালাতাসারায়” মহল্লায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল এমন যুবক তৈরি করা যারা ভবিষ্যতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে পারবে। এতে অধিকাংশ বিষয় ফরাসি ভাষায় পড়ানো হতো। অধিকাংশ ছাত্র মুসলিম ছিল তবে গ্রিক ও আর্মেনীয় খ্রিস্টান ছেলেদের জন্যও সুযোগ রাখা হয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংখ্যা ছয়শতে পৌঁছে যায়। [২]

ক্রিটের ব্যর্থ বিদ্রোহ:

আব্দুল আজিজের শাসনামলে ক্রিট দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দেয় যা ১৮৬৬ সালে (১২৮৩ হিজরি) দমন করা হয়। [৩]

ইউরোপ সফর:

আব্দুল আজিজ ছিলেন প্রথম উসমানীয় শাসক যিনি ইউরোপ সফর করেন, যার আমন্ত্রণ ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন দিয়েছিলেন।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস - ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১৫৯

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া - ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১৫৯

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি - ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮০

১৮৬৭ সালের জানুয়ারিতে (সফর ১২৮৪ হিজরি) তিনি মিশর হয়ে প্যারিসে পৌঁছান এবং তৃতীয় নেপোলিয়নের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর লন্ডনে রানী ভিক্টোরিয়ার সাথেও সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় ইউরোপীয় দেশগুলো তুরস্কের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক স্বার্থের কারণে দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল; তাই ফ্রান্স ও ব্রিটেন তুরস্কের সাথে বাহ্যিকভাবে সহনশীল আচরণ করছিল। [১]

এই সফরে প্রতিটি বিষয়ে তুরস্কের অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। ইউরোপীয় কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রী ফুয়াদ পাশাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: “আপনি ক্রিট দ্বীপটি কত দামে বিক্রি করতে চান?”

প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন: “সেই দামে, যে দামে আমরা এটি কিনেছি।” (অর্থাৎ আমরা বংশপরম্পরায় জিহাদ করে এটি জয় করেছি। আপনাদেরও দীর্ঘকাল যুদ্ধ করতে হবে।)

প্রধানমন্ত্রীকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: “বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সরকার কোনটি?”

তিনি উত্তর দিলেন: “উসমানীয় সাম্রাজ্য! কারণ আপনারা বাইরে থেকে একে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন এবং আমরা ভেতর থেকে একে দুর্বল করছি। তা সত্ত্বেও আপনারা সবাই মিলে একে শেষ করতে পারছেন না।” [২]

বাস্তবতা হলো, স্বার্থের সংঘাত থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় বিশ্ব এই বিষয়ে একমত ছিল যে, সুযোগ পেলেই উসমানীয় খিলাফত নির্মূল করতে হবে। কারণ তারা দেখছিল যে, ইউরোপীয় আইন এবং পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তুরস্কে কার্যকর করা অসম্ভব, কারণ তুরস্কের সংবিধানের ভিত্তি হলো আল্লাহর কিতাব এবং সুন্নাহ নববী।

এজন্যই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ক্ল্যারেডন ১৮৬৫ সালে (১২৮২ হিজরি) স্পষ্টভাবে বলেছিলেন:

“উসমানীয়দের সংশোধনের একটিই উপায় আছে, আর তা হলো তাদের পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা।” [৩]

ইহুদি দুনমাহ, মুসলিম নামধারী ইহুদি

উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে বসবাসকারী ইহুদিদের একটি গোষ্ঠী “ইহুদি দুনমাহ” উসমানীয় খিলাফতকে আঘাত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। “দুনমাহ” শব্দের অর্থ “ধর্মত্যাগ”। ইহুদি দুনমাহ বলতে সেই সব ইহুদিদের বোঝায় যারা এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে বসবাস করত এবং নিজেদের মুসলিম হিসেবে জাহির করত।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের শাসক ও যাজকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে লাখ লাখ মুসলমানের সাথে হাজার হাজার ইহুদিও তুরস্ক হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই যুগে রাশিয়ার জারদের জুলুম ও নির্যাতনের কারণেও অনেক ইহুদি...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৩৯১।

নোট: সেই যুগে বাষ্পীয় জাহাজের কারণে সমুদ্রযাত্রার গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাই এই সফরে মাত্র ৩৯ দিন ব্যয় হয়েছিল, যা গত শতাব্দীতে এই ধরনের সফরের জন্য সর্বনিম্ন সময় ছিল।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪০১।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ড. ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১৫৯।

স্থানান্তরের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। ইহুদিদের অনিষ্টকামিতার কালো ইতিহাস দেখে বিশ্বের কোনো দেশই তাদের আশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিল না। সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, দেশ এবং রাষ্ট্রসমূহও তাদের ঘৃণা করত।

এমন পরিস্থিতিতে তারা উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রখ্যাত শাসক সুলাইমান আলিশানের প্রিয়তমা স্ত্রী হুররাম (রোকেলানা)-এর মাঝে নিজেদের ত্রাণকর্তা খুঁজে পেল, যিনি নিজেও ইহুদি বংশোদ্ভূত ছিলেন। যখন ইহুদিরা তাকে মাধ্যমে বানিয়ে সুলাইমান আলিশানের কাছে তুরস্কের নাগরিকত্বের আবেদন করল, তখন তা মঞ্জুর করা হলো। এই ইহুদিরা ইজমির, এদিরনে, বুরসা এবং উত্তর ও পশ্চিম ইস্তাম্বুলে এসেছিল। তারা এখানে কেবল একটি আশ্রয়স্থলই নয়, বরং সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতাও লাভ করেছিল।

সাবাতাই জেভির আন্দোলন:

তুরস্কে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের কয়েক দশক পর “দোনমেহ” (Donmeh) সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল “সাবাতাই জেভি”। এই ব্যক্তি ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে (১০৩৫ হিজরি) আনাতোলিয়ার ইজমির শহরে জন্মগ্রহণ করে এবং ইহুদিদের একজন বড় আলেম হিসেবে গণ্য হয়। সেই সময়ের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, এই শতাব্দীতেই মসীহের আবির্ভাব ঘটবে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাবাতাই নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করে এবং হাজার হাজার মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়।

সাবাতাইয়ের খ্যাতি পোল্যান্ড, জার্মানি এবং হল্যান্ডে বসবাসরত ইহুদিদের কাছেও পৌঁছে যায় এবং সেখানেও তার ভক্ত তৈরি হয়। অবশেষে তার মুরিদরা ইজমিরে সমবেত হয় এবং “ইহুদিদের সম্রাট” হিসেবে তার রাজ্যাভিষেক করে। সাবাতাই ঘোষণা করল যে, আমি সুলাইমান ইবনে দাউদের বংশধর এবং অচিরেই ফিলিস্তিন পুরো বিশ্বের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হবে। সে পুরো বিশ্বকে ৩৮টি ভাগে বিভক্ত করে তার মুরিদদের মধ্য থেকে প্রতিটি দেশের জন্য একজন করে ইহুদি বাদশাহ নিযুক্ত করে দিল।

এই তথ্যগুলো তৎকালীন উসমানীয় খলিফা সুলতান চতুর্থ মুহাম্মদের কাছে পৌঁছালে তিনি সাবাতাইকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। অবশেষে তাকে এদিরনে (এড্রিয়ানোপল) তলব করা হয়, যেখানে সুলতান পর্দার আড়ালে বসেন এবং আলেমদের নির্দেশ দেন যেন এই হতভাগার ওপর অকাট্য প্রমাণ পেশ করা হয়। আলেমরা তাকে বললেন: “যদি তুমি মসীহ হও, তবে তোমার নবুওয়াতের দাবির সপক্ষে অলৌকিক নিদর্শন (মুজিজা) দেখাও। আমরা দক্ষ তীরন্দাজদের নির্দেশ দিচ্ছি যেন তারা তোমার ওপর তীরের বৃষ্টি বর্ষণ করে। যদি তীর তোমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে, তবে তোমার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে।”

সাবাতাই মৃত্যুকে সামনে দেখে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয় এবং তার নাম রাখা হয় আজিজ আফিন্দি। নিজের প্রাণ বাঁচানোর পর সে আলেমদের কাছে আবেদন করল যে, সে ইহুদিদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে চায়। অনুমতি পাওয়ার পর সে তার মুরিদদের সাথে যোগাযোগ করল এবং তাদের আশ্বস্ত করল যে, তার ইসলাম গ্রহণ মূলত আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য, কারণ প্রাচীন ইহুদি কিতাবসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে মসীহের অনুসারীরা মুসলমান হবে।

তার মুরিদদের পূর্ণ আস্থায় নেওয়ার পর সে একটি নতুন গোপন সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করল, যার অনুসারীদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে তারা প্রকাশ্যে মুসলমান থাকবে এবং গোপনে ইহুদি। তাদের জন্য পাগড়ি ও জুব্বা পরা আবশ্যিক ছিল। কারো ওপর কখনো

(১) আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া (আস-সাল্লাবি: ৩৩৯ থেকে ৩৪১), আত-তারিখুল ইসলামি - ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/৪০১, ৪০২।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

প্রকাশ হতে দিতেন না যে তারা রোজা রাখেন না বা কোরবানি করেন না। তাদের জন্য এটা আবশ্যিক ছিল যে অন্তত ঈদের নামাজে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। তাদের জন্য নিজেদের আসল আকিদা প্রকাশ করা এবং নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কারো সাথে বিবাহ করা হারাম ছিল। ইহুদি মহলে তাদের নাম আলাদা ছিল এবং মুসলিম সমাজে দেখানোর জন্য আলাদা নাম গ্রহণ করা হতো। বহু বছর পর সরকার যখন সাবাতাই-এর এই অপবিত্র কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তাকে দেশান্তর করা হলো এবং ১৬৭৬ সালে সে মারা গেল।

কিন্তু তার রোপণ করা এই খবিস বৃক্ষ ফলপ্রসূ হতে থাকল। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি অসাধারণ ইলমি ও কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে উসমানীয় সালতানাতের বিভিন্ন উচ্চপদে আসীন হয়। এই লোকদের আসল সংখ্যা কত ছিল? কেউ জানত না। কিন্তু যখনই কারো আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত, তখন জানা যেত যে এই লোকেরা কোথায় কোথায় পৌঁছে গেছে। আবদুল্লাহ ইয়াকুব চেলবি (জোসেফ কারিডো) এবং আব্দুল গফুর এফেন্দি (জোসেফ বিলোসোফ) এর উদাহরণ। তারা এমনকি গোসলে জানাবাতও করত না কিন্তু বাহ্যিকভাবে মুসলিম হিসেবে গণ্য হতো। তারা একে অপরকে বিশেষ চিহ্নের মাধ্যমে চিনে নিত। তাদের মহিলারা হলুদ রঙের জুতো পরত। তাদের পুরুষরা সাদা টুপি এবং সবুজ পাগড়ি পরত। [১]

ইহুদি দোনমেরা দেখানোর জন্য নামাজও পড়ত এবং হজ করতেও যেত। মানুষ তাদের আসল পরিচয় ভুলে গিয়েছিল এবং তাদের মুসলিম মনে করতে শুরু করেছিল। তুরস্কে তাদের এমন সব সংগঠন গড়ে উঠেছিল যা গোপনে মিল্লাতের শিকড় কাটছিল। [২]

মিদহাত পাশার আবির্ভাব:

সুলতান আব্দুল আজিজের আমলে এই ছদ্মবেশী ইহুদিদের মধ্য থেকে মিদহাত পাশা নামক এক ব্যক্তি সিরিয়া, শাম এবং ইরাকে উসমানীয় সালতানাতের উচ্চপদে আসীন ছিল এবং সে ছিল একজন ফ্রিম্যাসন। সে তাকে পুরো বিশ্বের সামনে তুরস্কের শ্রেষ্ঠ দূরদর্শী ও সাহসী সংস্কারক হিসেবে উপস্থাপন করেছিল। সে ফ্রিম্যাসনদের সহযোগিতায় আধুনিকমনা তুর্কি যুবকদের সংগঠন “জমিয়তে ইতিহাদ ওয়াত তারাক্কি” (কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীতে তুরস্কে খিলাফতের অবসান এবং ধর্মহীন বিপ্লব আনয়নে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিল। [৩]

তাগুতি সংগঠনসমূহের গঠন:

সুলতান আব্দুল আজিজ ইউরোপীয় শক্তিগুলোর চাপে জনগণকে যে অধিকার ও অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন, তার সুযোগ নিয়ে উসমানীয় সালতানাতের কিছু ইহুদি ও খ্রিস্টান তুরস্কে এমন সব সংগঠন ও গোষ্ঠীর ভিত্তি স্থাপন করে যা বাহ্যিকভাবে ইলমি ও আদবি (জ্ঞান ও সাহিত্যিক) উন্নতির জন্য কাজ করছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয়। এর পাশাপাশি ছিল মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলো।

[১] ইহুদি আদ-দোনমাহ, মুহাম্মদ আলী কুতুব, পৃষ্ঠা ১১ থেকে ৩৫; আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আস-সান্নাবি, পৃষ্ঠা ২৩১, ২৩২।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির, ৮/১৮৩।

[৩] আল-ইয়াহুদ ওয়াল মাসুনিয়াহ, আব্দুর রহমান আদ-দাওসারি, পৃষ্ঠা ৭০, ৭১।

নোট: মিদহাত পাশার আসল পরিচয় সুলতান আব্দুল হামিদ সানির আমলে প্রকাশ পেয়েছিল এবং জানা গিয়েছিল যে সে ইহুদি দোনমাহ এবং ফ্রিম্যাসনদের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে সুলতান তাকে পদচ্যুত করেছিলেন। বিস্তারিত সুলতান আব্দুল হামিদের আলোচনায় আসবে।

কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করে। যেমন আমেরিকান মিশনারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় তুরস্কের দুই খ্রিস্টান: বুতরাস আল-বুস্তানি এবং নাসিফ ইয়াজিজি “জমঈয়াতুল উলুম ওয়াল ফুনুন” গঠন করেন, যার বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং তুরস্কের সাথে ইউরোপের সম্পর্ক উন্নত করা।

শুরুতে এ ধরনের দলগুলোর প্রতি স্থানীয় খ্রিস্টানরাই আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে জমঈয়াতুল উলুম ওয়াল ফুনুন প্রতিষ্ঠার প্রথম দুই বছরে এর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ এবং তারা সবাই ছিল সিরিয়ার খ্রিস্টান। একইভাবে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে (১২৬৬ হিজরি) তুরস্কের কিছু খ্রিস্টান “আল-জমঈয়াতুশ শারকিয়াহ” এর ভিত্তি স্থাপন করে, এর সদস্যরাও খ্রিস্টানই ছিল। এই খ্রিস্টান দলগুলোর প্রচেষ্টা এটাই ছিল যে, জ্ঞান ও কারিগরি কর্মকাণ্ডের আড়ালে পুরো উসমানীয় সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা। তুরস্কের মুসলমানরা শুরুতেই বুঝতে পেরেছিল যে, এই দলগুলোর উদ্দেশ্য দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো, তাই তারা তাদের কোনো প্রতারণায় পা দেয়নি। এই প্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হতে দেখে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১২৭২ হিজরি) এই উপাদানগুলোই “আল-জমঈয়াতুল ইলমিয়াহ আল-আরাবিয়াহ” প্রতিষ্ঠা করে যাতে মুসলমানদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তবে চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে দ্রুজ এবং শিয়াদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ইস্তাম্বুলেও কিছু সংগঠন কাজ করতে শুরু করে যাদের লাগাম ছিল ইহুদিদের হাতে। পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত অনেক তুর্কি যুবক দ্রুত সেগুলোতে যোগ দেয়। যে দলগুলো বেশি উদারপন্থী চিন্তাধারা প্রচার করছিল, ইউরোপ তাদের বেশি উৎসাহিত করে এবং তাদের শহরগুলোতে কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ দেয়। ফলে সেকুলারিজমের সমর্থক আহমদ রেজা বেগের প্রতিষ্ঠিত তুর্কি যুবকদের সংগঠন “জমঈয়াতুত তুর্কিয়া আল-ফাতাত” (তরুণ তুর্কি)-এর সদর দপ্তর ছিল প্যারিসে, আর এর শাখাগুলো ছিল সেলানিক, বার্লিন এবং ইস্তাম্বুলে। ইহুদিদের গোপন সংস্থা ফ্রিম্যাসন এই সমস্ত দলগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করছিল। এই দলগুলোর আহ্বান ছিল পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা এবং উসমানীয় খিলাফতকে বিলুপ্ত করা যা এই লক্ষ্যের পথে বাধা।

এই তুর্কি যুবকরা “তুর্কি” জাতীয়তাবাদের গোঁড়ামিকেও উসকে দিচ্ছিল, যার মাধ্যমে তারা উসমানীয় খিলাফতের অধীনস্থ আরব প্রদেশগুলোকে তুরস্কের ওপর একটি বোঝা হিসেবে বিশ্বাস করাচ্ছিল। এভাবে তুর্কি-আরব বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। [১]

তুর্কিদের নতুন প্রজন্মের ওপর পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের প্রভাব:

জাতীয়তাবাদী তুর্কি যুবকরা সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল এবং তারা প্রায় সবাই ছিল সাংবাদিক, সাহিত্যিক বা কবি। এই যুবকদের ওপর ফরাসি বিপ্লবের অসাধারণ প্রভাব ছিল। ফরাসি গণতান্ত্রিক বিপ্লব আঠারো শতকের শেষের দিকে উদ্ভূত হয়েছিল, অন্যদিকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইতালিতে মাজিনি (১৮০৫-১৮৭২ খ্রি.) জাতীয়তাবাদের (ফ্যাসিবাদ) আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই আন্দোলন ছিল ফ্রান্সের ওপর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের দখলদারিত্ব এবং ইতালিকে খণ্ডবিখণ্ড করার প্রতিক্রিয়ায়...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮২, ১৮৩।

১৮১৫ সালে “ওয়াটারলু” যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইউরোপীয় দেশগুলো “ভিয়েনা” সম্মেলনে ইতালিকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও সার্ডিনিয়া প্রদেশকে আলাদা রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সিসিলি এবং নেপলস বোরবন রাজপুত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং ভেনিসসহ ইতালির অধিকাংশ এলাকা অস্ট্রিয়ার অংশ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এভাবে ইতালির রাজপরিবার একটি সীমিত এলাকা এবং ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার দয়ার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

মাজিনি ইতালির পতনে অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন এবং এর অতীত শৌর্য-বীর্যের পতাকাবাহী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে গেছে, তাই ইতালিকে শক্তিশালী করার জন্য এখানেও প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করা জরুরি। তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য “জাতীয়তাবাদ”-এর স্লোগান তুলেছিলেন। বিপ্লবী চিন্তাধারার কারণে ১৮৩০ সালে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। তিনি প্রথমে ফ্রান্স এবং পরে সুইজারল্যান্ডে পৌঁছান এবং সেখানে ১৮৩২ সালে তাঁর সমমনা সঙ্গীদের নিয়ে “ইয়ং ইতালি” নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। আঠারো বছরের নির্বাসনকালে তিনি ইতালিতে তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন এবং অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮৪৮ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন যেখানে প্রজাতন্ত্রের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এখানে তিনি শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ফ্রান্স নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে ইতালিতে আক্রমণ করে, যার ফলে মাজিনিকে আবারও দেশ থেকে পালিয়ে প্রথমে লন্ডন এবং পরে সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নিতে হয়।

কিন্তু মাজিনির চিন্তাধারা ইতালীয় রাজপরিবারে জাতীয়তাবাদের চেতনা সঞ্চার করেছিল, তাই অবশেষে সার্ডিনিয়ার শাসক “ভিক্টর ইমানুয়েল দ্বিতীয়” ১৮৬১ সালে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। যদিও মাজিনির আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল কারণ তিনি তাঁর স্বদেশে রাজতন্ত্র নয় বরং প্রজাতন্ত্র চেয়েছিলেন, তবে ইতালির পুনরায় শক্তি অর্জনের কৃতিত্ব তাঁর ওপরই বর্তায়। [১]

নতুন উসমানীয় এবং মিদহাত পাশা:

ইতালির পুনরুত্থান দেখে কিছু আধুনিকমনা তরুণ তুর্কি, যারা আগে ফরাসি বিপ্লবকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখত, তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। তারা পতনোন্মুখ তুরস্কের উত্থানের জন্য একটি ইশতেহার পেশ করে এবং ১৮৬৫ সালে ইস্তাম্বুলে “ইত্তিফাক-ই হামিয়্যত” নামে একটি গোপন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে, যার কার্যপদ্ধতি “ইয়ং ইতালি”-র অনুরূপ ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তুর্কি লেখক ও কবি নামিক কামাল, মুহাম্মদ জিয়া এবং আলী ওয়াসকি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুব শীঘ্রই এই তিনজন প্যারিসে গিয়ে “জমিয়তে তুর্কিয়া আল-ফাতাহ” (তরুণ তুর্কি)-র নেতাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সহযোগিতায় একটি নতুন সংগঠন “আল-উসমানিয়্যুন আল-জুদুদ” (নতুন উসমানীয়) আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনটি খুব শীঘ্রই ইস্তাম্বুল প্রাসাদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মিদহাত পাশাকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নেয়, যিনি আগেই পশ্চিমা শক্তিগুলোর হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলেন। [২]

[১] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ, বিষয়: মাজিনি।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সান্নাবি: পৃষ্ঠা: ৩৫০-৩৫৩।

প্যান-তুর্কিজম (উসমানীয় ঐক্য):

প্যান-তুর্কিজম বা উসমানীয় ঐক্য বলতে নব্য উসমানীয়দের দ্বারা শুরু করা সেই আন্দোলনকে বোঝায় যা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল। এই শতাব্দীতে ইউরোপ জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের যে ঝড়ের সাথে পরিচিত হয়েছিল, তার প্রভাব উসমানীয় সাম্রাজ্যের ওপরও পড়ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন খ্রিস্টান জাতিগুলো স্বায়ত্তশাসিত সরকারের দাবি জানাতে শুরু করেছিল যাদের পেছনে পশ্চিমা শক্তিগুলোর সমর্থন ছিল। গ্রিসসহ অনেকগুলো প্রদেশ পশ্চিমা শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিল এবং তাদেরই সাহায্যে তা অর্জনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছিল।

এই পরিস্থিতির কারণে উসমানীয় সাম্রাজ্যের পুরো শাসনব্যবস্থা প্রভাবিত হতে থাকে এবং উসমানীয় সুলতানরা স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় নিরঙ্কুশ শাসনের পথ অবলম্বন করতে শুরু করেন। এমন সময়ে মিদহাত পাশার মতো লোকেরা প্যান-তুর্কিজম আন্দোলন শুরু করেন, যাদের ইশতেহার ছিল যে সুলতানদের নিরঙ্কুশ শাসনই সকল অনিশ্চয়ের মূল। এর পরিবর্তে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সকল জাতি ও ধর্মের পার্থক্য ছাড়াই সমান অধিকার প্রদান করা উচিত যাতে ইউরোপীয় জাতিগুলো সম্ভুষ্ট হয় এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ভাগ ও বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে।

সাংবাদিকতা ছিল নব্য উসমানীয়দের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তারা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর আদলে সাংবাদিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। তরুণ তুর্কিদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে এই প্রচার মাধ্যমগুলোর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি ছিল।

জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি - সদস্যপদ গ্রহণের পদ্ধতি:

মিদহাত পাশা এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত তুর্কি সামরিক কর্মকর্তা ও সৈন্যদের নিয়ে একটি আলাদা সংগঠন “জমিয়তুল ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি” গঠন করেন যা লক্ষ্য অর্জনের জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। খলিফার ক্ষমতা সীমিত করা ছিল এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে এর ভিত্তি ছিল দেশপ্রেমের আবেগ যা ইউরোপীয় আন্দোলনগুলোর প্রাণ ছিল।

জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির নেতারা তাদের আসল উদ্দেশ্য গোপন রেখে সদস্যপদ গ্রহণের শপথনামায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরআন মাজীদে অনুসরণের মতো শব্দগুলো এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যাতে আবেগপ্রবণ তরুণদের মন আসল উদ্দেশ্যের দিকে না যায়। সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল ফ্রিম্যাসনদের আদলে। প্রলুব্ধ করার পদ্ধতি ছিল এমন যে, যে তরুণ সংগঠনে যোগ দিতে রাজি হতো তাকে চোখ বেঁধে রাতের অন্ধকারে কোনো গোপন স্থানে নিয়ে যাওয়া হতো। সেখানে তলোয়ার ও বন্দুকধারী কয়েকজন মুখোশধারী লোক তার হাতে কুরআন মাজীদ দিয়ে এই শপথ করাতে:

“আমি মহান আল্লাহর উপাসনা এবং তাঁর ন্যায্যবিচার ও দয়ার ওপর ঈমান রাখি। মানব ভ্রাতৃত্বের ওপর বিশ্বাস রাখি। আইন ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষকে কোনো জাতিগত বৈষম্য ছাড়াই সমান মনে করি। আমি স্বীকার করছি যে আজ থেকে আমার জান ও মাল পুরোপুরি এই সংগঠনের। জুলুম ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্য সংগঠন যে আন্দোলনই চালাবে তাতে আমি কেবল...”

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ১০৩/৩।

আমি সত্য অন্তরে এতে অংশগ্রহণ করব বরং সব ধরনের কুরবানিও দেব। যদি আমি এই জামাত বা এর ইশতেহার থেকে বিচ্যুত হই তবে আমার ওপর আল্লাহর লানত হোক। এই অবস্থায় সংগঠনের আমাকে হত্যার পূর্ণ অধিকার থাকবে।

সদস্যদের শপথ গ্রহণকারীর কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হতো যে, যদি সে সংগঠনের কোনো গোপন বিষয় কাউকে অবহিত করে তবে তাকে জীবিত ছাড়া হবে না। কোনো সদস্য বিচ্যুত হওয়ার ক্ষেত্রে সেই পুরনো সদস্যকে তার হত্যার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো যে তাকে প্রলুব্ধ করে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এই হত্যায় অবহেলাকারীর ওপর সে নিজেই মৃত্যুদণ্ডের হকদার হয়ে যেত। [১]

এই উপাদানগুলো সালতানাতে প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করার পর উসমানীয় খলিফাদের জালিম, জবরদস্তিকারী, স্বৈরাচারী এবং স্বার্থপর হিসেবে কুখ্যাত করল। এর পাশাপাশি তাদের এই দাবি জোরদার হতে থাকল যে, তুরস্ককে শরীয়ী আইন ও বিধানের পরিবর্তে ইউরোপীয় ধাঁচের সংবিধান দেওয়া হোক। জাতীয়তাবাদীরা সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাময়িকী ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাধারার প্রচার অব্যাহত রাখল এবং তাদের সমর্থকদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। [২]

সুলতান আব্দুল আজিজের পদক্ষেপসমূহ:

সুলতান আব্দুল আজিজ ব্যক্তিগতভাবে একজন খাঁটি ও আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান ছিলেন। তার পূর্ণ চেষ্টা ছিল যে ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে ফায়দা হাসিল করে তুরস্ককে স্থিতিশীল করা হোক। এই সিলসিলায় সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেন:

- পশ্চিমা সংবিধান ও বিধান এবং পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইসলাম বিরোধী রূপগুলো তুরস্কে কার্যকর করতে অস্বীকার করেন।
- বাহিনীকে পুরনো অস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেন, এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ইউরোপের সেরা অস্ত্র নির্মাণকারী কারখানাগুলোর সহযোগিতা লাভ করা হয়।
- বাহিনীকে একটি নতুন বিন্যাসে সাজান যাতে প্রাচীন সামরিক ব্যবস্থার ছাপ ছিল। সমস্ত প্রদেশের সেনানিবাসগুলোতে দলগুলোকে গোত্র ও বংশের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়।
- দুর্গ ও সেনানিবাসগুলোকে আধুনিকতম কামানে সজ্জিত করা হয়। কামান তৈরির কারখানাকে আধুনিক রূপ দেন।
- ইউরোপীয় দেশগুলোর আপত্তি সত্ত্বেও সমস্ত দেশে তাদের সংবাদদাতাদের পরিবর্তে নিজের সংবাদ লেখক নিযুক্ত করেন।
- নৌবাহিনীতে বৃদ্ধি করা হয়।
- জবাবদিহিতা বিভাগকে সক্রিয় করেন, আইন থেকে কাউকে অব্যাহতি দেননি, এই কারণেই খুসরু পাশা, আকিফ পাশা এবং তাহের পাশার মতো বড় বড় আমিরদের কাঠগড়ায় আনা হয়। [৩]
- একটি রিসালা “মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ” এবং একটি রিসালা “মাজাল্লাতুল আহকামিত তিজারিয়্যাহ” জারি করেন যাতে...

[১] খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ও এহিয়া, আজ হক নেওয়াজ: পৃ. ৮৩, ৮৫, ত. জুহাইর পাবলিকেশন্স মুলতান।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি লি-ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৩।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া আজ আস-সাল্লাবি: পৃ. ৩৯৩।

অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে জাতির সামনে শরয়ী ও আইনি অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রিসালাগুলো আধুনিক যুগের সেই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে একটি আইনি ও ফিকহী দলিল ছিল, যেগুলোর ব্যাপারে মানুষ অস্পষ্টতার শিকার ছিল। এগুলো তৈরিতে প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম শরিক ছিলেন, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীর পুত্র আল্লামা আলাউদ্দীন। [১]

সুলতান আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং আপনজনদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইউরোপীয় শক্তিগুলো তুরস্ককে আরও বেশি দুর্বল করতে চেয়েছিল। সুলতান আব্দুল আজিজের এই পদক্ষেপগুলোর কারণে তুরস্কের পুনরায় জেগে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অন্যদিকে সুলতান আব্দুল আজিজও ইউরোপীয় দেশগুলো সফর করে এবং তাদের সাথে ধূর্ত রাজনীতির ধারাবাহিকতা দেখে বুঝে গিয়েছিলেন যে, তাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা কোনোটিই কম ক্ষতিকর নয়। এর আগে সুলতান আব্দুল আজিজের নীতি ছিল যে, কোনোভাবে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতপার্থক্যের সুযোগ নেওয়া যায় কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এই ধারণা হয়েছিল যে, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং অস্ট্রিয়াসহ সমস্ত পশ্চিমা শক্তি তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।

এই সময়ে পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপে টানা পোড়েন চলছিল। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুলতান সিদ্ধান্ত নিলেন যে, পশ্চিম থেকে দূরত্ব বজায় রেখে তাদের মোকাবিলায় রাশিয়ার সাথে অংশীদারিত্ব করা উত্তম। এই সিদ্ধান্তের পর রুশ রাষ্ট্রদূতের সাথে তার ঘনঘন সাক্ষাৎ হতে থাকে। এই সাক্ষাৎগুলোতে মৌখিকভাবে এই বিষয়ে ঐক্যমত হয় যে, রাশিয়া ও তুরস্ক মিলে পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ায় পশ্চিমা দেশগুলোর একচেটিয়া আধিপত্য খতম করে দেবে, যার ফলে বিজিত মুসলিম এলাকাগুলো তুরস্কের এবং খ্রিস্টান এলাকাগুলো রাশিয়ার অধীনে চলে যাবে। কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তির আগেই পশ্চিমা বিশ্ব এই খবর পেয়ে যায় এবং তাদের ইশারায় সারা বিশ্বে সুলতান আব্দুল আজিজকে একজন অপ্রকৃতিস্থ, বিলাসপ্রিয় এবং দুর্নীতিবাজ শাসক হিসেবে প্রচার করা হতে থাকে। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সুলতানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার পর ১৮৭৬ সালের মে মাসে (জমাদিউল আউয়াল ১২৯৩ হিজরি) পশ্চিমা শক্তির দালাল মিদহাত পাশা শায়খুল ইসলাম হাসান খাইরুল্লাহর কাছে একটি ইস্তফতা পেশ করেন যে, একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ এবং বিলাসপ্রিয় শাসক যে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, তাকে কি পদচ্যুত করা যায়? শায়খুল ইসলাম ইতিবাচক ফতোয়া দিলে তার ভিত্তিতে মিদহাত পাশা বিদ্রোহ করেন এবং সুলতান আব্দুল আজিজকে পদচ্যুত করেন। [২]

সুলতান আব্দুল আজিজকে পদচ্যুত করার পরপরই একটি অন্ধকার কুঠুরিতে নিষ্ক্ষেপ করা হয় এবং প্রচার করা হয় যে, ক্ষমতা চলে যাওয়ার শোকে তিনি পাগল হয়ে গেছেন। কিছুদিন পর এই খবর ছড়িয়ে দেওয়া হয় যে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু সুলতান আব্দুল আজিজ তার মৃত্যুর একদিন আগে তৎকালীন শাসক মুরাদ পঞ্চমকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যা পরে প্রকাশ্যে আসে, তাতে লেখা ছিল:

“আল্লাহর ওপর ভরসা করার পর আমি তোমার ওপর ভরসা করছি। তোমাকে সিংহাসন আরোহণের মুবারকবাদ জানাই। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি যে, আমি এই উন্মত্তের সেভাবে খিদমত করতে পারিনি যেভাবে করতে চেয়েছিলাম। আমি আশা করি যে তুমি...”

[১] তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৫৫২

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আস-সাল্লাবী: পৃষ্ঠা ৩৯২; তারিখুদ দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফরীদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৫৭৫

এই লক্ষ্য অর্জন করবে। তোমরা এটা ভুলে যেও না যে, আমি রাষ্ট্রের সুরক্ষা ও মর্যাদার জন্য সমস্ত কার্যকর উপায় অবলম্বন করেছিলাম। আমি তোমাদের অবহিত করছি যে, আমাকে এই অবস্থায় পৌঁছানোর পেছনে সেই বাহিনীই রয়েছে যাকে আমি নিজ হাতে সশস্ত্র করেছিলাম। আমার কর্মপদ্ধতি ছিল মজলুমদের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন এবং মানবতার দাবি অনুযায়ী সবার সাথে সদ্যবহার করা। আমি তোমাদের কাছে আশা করি যে, তোমরা আমাকে এই সংকীর্ণ ও কষ্টদায়ক স্থান থেকে বের করে কোনো উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করবে। আমি সালতানাত আল-আবদুল মাজিদের বংশধরদের কাছে হস্তান্তরের জন্য তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। - আবদুল আজিজ। [১]

এই পত্রের প্রতিটি অক্ষর প্রকাশ করে যে, সুলতান আবদুল আজিজ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ সজ্ঞানে ছিলেন এবং বিদ্রোহীরা তাকে হত্যা করে নিজেদের অপরাধ লুকানোর জন্য একে আত্মহত্যার নাম দিয়েছিল।

সুয়েজ খালের উদ্বোধন:

সুলতান আবদুল আজিজের শাসনামলে ১৮৬৯ সালে (১২৮৫ হিজরি) সুয়েজ খাল খননের মহান পরিকল্পনা সম্পন্ন হয় যা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছিলেন মিদহাত পাশা, যিনি মিশর সরকারকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে ঋণ নিয়ে এই করিডোর তৈরি করতে রাজি করিয়েছিলেন। [২]

এর আগে ইউরোপীয় জাহাজগুলোকে এশিয়ায় যাওয়ার জন্য পুরো আফ্রিকা মহাদেশ ঘুরে আসতে হতো। এখন তাদের সফর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আজও এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সংক্ষিপ্ততম সমুদ্রপথ এটিই এবং অধিকাংশ বাণিজ্য এর মাধ্যমেই হয়। তবে এই খাল খননের ফলে ইসলামি দেশগুলোর ওপর ইউরোপীয় যুদ্ধজাহাজের আক্রমণও অনেক সহজ হয়ে যায়। বিশেষ করে ব্রিটেন এই সক্ষমতা অর্জন করে যে, খুব কম খরচে ও অল্প সময়ে হিন্দুস্তানে অবস্থিত তাদের সামরিক কেন্দ্রগুলোতে দ্রুত সাহায্য পাঠাতে পারত।

টেলিগ্রাফ এবং রেললাইন:

সুলতান আবদুল আজিজ তার ১৫ বছরের শাসনামলে নিরন্তর দেশ গড়ার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তার আমলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হলো: টেলিগ্রাম লাইন এবং রেললাইন দূর-দূরান্তের এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করা। এই কাজ সাবেক সুলতান আবদুল মাজিদ আউয়াল শুরু করেছিলেন, যা এগিয়ে নিয়ে সুলতান আবদুল আজিজের আমলে ১৮৭০ সাল নাগাদ ৯৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ তার সালতানাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ জুড়ে বিছানো হয়েছিল।

একইভাবে ১৮৭৫ সাল নাগাদ ৪ হাজার ৬৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। যোগাযোগ ও যাতায়াতের এই আধুনিক মাধ্যমগুলোকে পরবর্তীতে সুলতান আবদুল হামিদ সানি আরও উন্নত করেন। [৩]

[১] তারিখ আদ-দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা ৫৮১

[২] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ সুলতান আবদুল হামিদ আস-সানি ওয়াল খিলাফাতুল ইসলামিয়াহ, মুওয়াফফাক বানি আল-মারজাহ: পৃষ্ঠা ৭২

[৩] তারিখ আদ-দাওলাতুল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ৫৫/২

সুলতান মুরাদ খামিস বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল

১২৯৩ হিজরি

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ

মুরাদ খামিস সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের পুত্র ছিলেন। তিনি ছেচল্লিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলার সাথে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু “জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কি”-র সদস্যপদ এবং মিদহাত পাশার মতো ষড়যন্ত্রকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ তাকে কেবল লিবারেলিজম ও সেকুলারিজমের সমর্থকই বানায়নি, বরং ফ্রিম্যাসনরির পূর্ণ সমর্থনও পাইয়ে দিয়েছিল। এই প্রভাবগুলোর কারণেই মুরাদ খামিস মদ্যপান এবং অন্যান্য অপকর্ম থেকে মোটেও বিরত থাকতেন না। সুলতান আব্দুল আজিজকে ক্ষমতাচ্যুত করার সময় এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, এই পাশ্চাত্যপন্থী শাহজাদাকেই খেলাফত অর্পণ করা হবে।

কিন্তু মুরাদ খামিস সিংহাসনে আরোহণের পরপরই কোনো এক মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেন যে, যদি তিন মাসের মধ্যে তিনি সুস্থ না হন, তবে নতুন খলিফা নির্বাচন করা হবে। [১]

সুলতান মুরাদের মানসিক ভারসাম্যহীনতা তিন মাসের মধ্যেও দূর না হওয়ায় শায়খুল ইসলামের নিকট থেকে ফতোয়া নিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার স্থলে সুলতান আব্দুল হামিদ সানিকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৩৯৫, ৩৯৬

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়া, ফারিদ বেগ মুহাম্মী: পৃষ্ঠা: ৫৮৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল

১২৯৩ হিজরি থেকে ১৩২৬ হিজরি

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ

সুলতান আব্দুল মাজিদ আউয়ালের পুত্র আব্দুল হামিদ সানি দ্বীনি ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী একজন আলেম ফাজিল, বুদ্ধিমান, আত্মমর্যাদাশীল এবং দূরদর্শী যুবক ছিলেন। তাঁর আপন মা তখন ইন্তেকাল করেছিলেন যখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। তাঁর সৎ মা, যিনি নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁকে আপন পুত্রের মতো লালন-পালন করেন এবং তাঁর সর্বোত্তম তরবিয়ত করেন। সুলতানের চরিত্র গঠনে এই নারীর মেহনতের বড় অংশ ছিল। [১]

ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলি:

আব্দুল হামিদ একজন জ্ঞানানুরাগী যুবক ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। তুর্কি ভাষায় কবিতাও লিখতেন। ইতিহাসের বই এবং বিশ্ব সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। তাসাউফের প্রতিও তাঁর অনেক আগ্রহ ছিল। তিনি সুঠাম ও শক্তিশালী ছিলেন। সমরকলা ও যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত এবং একজন শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী ছিলেন। তলোয়ার চালনায় পারদর্শী ছিলেন এবং পিস্তল দিয়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করতেন।

তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং যখন মুখ খুলতেন তখন মেপে মেপে কথা বলতেন। তিনি তাঁর পিতা আব্দুল মাজিদ আউয়াল এবং তাঁর বড় ভাই মুরাদ খামিসকে পশ্চিমা রীতিনীতির অনুকরণ করতে দেখে ব্যথিত হতেন। তিনি তাঁর চাচা সুলতান আব্দুল আজিজের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন এবং তাঁর মতোই প্রাচ্যের মূল্যবোধের অনুসারী, ইসলামী মানসিকতার অধিকারী এবং তুর্কিদের আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি বিশ্বের খবরাখবর রাখা অত্যন্ত জরুরি মনে করতেন এবং নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ করতেন। [২]

ইউরোপ সফর:

বিশ্বের পরিস্থিতির ওপর তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। তিনি তাঁর চাচা সুলতান আব্দুল আজিজের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ২৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর চাচা এবং সদর-এ-আজম ফুয়াদ পাশার সাথে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটেনে রানী ভিক্টোরিয়া, ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং জার্মানিতে প্রথম রাজা উইলিয়ামের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই সফরে তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেখানকার জীবনযাত্রা, অর্থনীতি, আধুনিক উদ্ভাবন এবং সামরিক

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৩৯৫, ৩৯৯

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ৩ / ৯৯, ১০০

ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ তথ্য লাভ করেন। তিনি বিশ্ব রাজনীতির সেই দাবার চালগুলো বোঝারও চেষ্টা করেন যার ছক উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে বিছানো হয়েছিল। তিনি এটিও আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, তার চাচা সুলতান আব্দুল আজিজ—যিনি কখনো এটি প্রকাশ হতে দেননি যে তিনি কোনো বিদেশী শক্তির চাপে আছেন—আসলে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের চাপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তরুণ আব্দুল হামিদ এই সফরে এই ধারণা লাভ করেন যে, ফ্রান্সের মানুষ আমোদ-প্রমোদে মত্ত, ব্রিটিশরা শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে দক্ষ, আর জার্মানি সামরিক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতায় নিমজ্জিত একটি রাষ্ট্র। [১]

সিংহাসন আরোহণ:

আব্দুল হামিদ সানি একজন শাহজাদা হিসেবে জীবনের ৩৩ বছর এমনভাবে কাটিয়েছিলেন যে তার শাসক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ তার চাচা আব্দুল আজিজ অধিক বয়স হওয়া সত্ত্বেও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তিনি যেভাবে তাজ ও তখত থেকে বঞ্চিত হলেন তা কারো কল্পনাতেও ছিল না। এরপরও আব্দুল হামিদের জন্য শাসনের পথ রুদ্ধ ছিল কারণ তার বড় ভাই মুরাদ খামেস সিংহাসনে বসেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন প্রমাণিত হন। এভাবে আল্লাহ যার নসিবে সিংহাসন লিখেছিলেন, তিনি তা লাভ করেন। [২]

৩১ আগস্ট ১৮৭৬ (১১ শাবান ১২৯৩ হিজরি) সুলতান আব্দুল হামিদ সানি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৩৪ বছর। উসমানীয় খিলাফতের শেষ দিনগুলোতে তিনি কায়মনোবাক্যে উম্মতে মুসলিমার এই উত্তরাধিকার রক্ষার চেষ্টা করেন এবং ইহুদি ও নাসারাদের ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা মোকাবিলা করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি তার সৎ মায়ের জন্য “মালিকা” (রানি) পদমর্যাদা বহাল রাখেন, তবে তার হাতে চুম্বনের পর বলেন: “আপনার স্নেহ আমাকে কখনো মায়ের অভাব অনুভব করতে দেয়নি। আমার দৃষ্টিতে আপনি আমার আপন মায়ের থেকে আলাদা নন। আপনিই সালতানাতের রানি এবং ওয়ালিদা সুলতান। কাসরে খিলাফতে আপনার হুকুমই চলবে। কিন্তু আমি আপনার কাছে আশা করি এবং এই অনুরোধও করছি যে, আপনি সালতানাতের কোনো ছোট বা বড় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।” [৩]

সুলতান আব্দুল হামিদের সামনে আসা পরীক্ষাসমূহ:

এই সময় ইউরোপীয় শক্তিগুলো উসমানীয় খিলাফত খতম করার ব্যাপারে একমত হয়েছিল। তুরস্কে ইসলাম বিদ্বেষী সংগঠনগুলোর প্রভাব এবং সরকারি মহলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে খিলাফতকে স্বৈরতন্ত্র ও জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছিল এবং উসমানীয় খলিফাদের কাছ থেকে ইউরোপীয় ধাঁচের সংবিধান প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দাবি জানাচ্ছিল।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৩০০-৩৯৯।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ২/৯৯-১০০।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ. ৪২৮।

আব্দুল হামিদ সানি তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের শক্তি ও প্রভাব সম্পর্কেও অবগত ছিলেন যে ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের পেছনে রয়েছে। তাই এই দেশীয় শত্রুদের একবারে থামানোর চেষ্টা করা হলে ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতিক্রিয়া খুব কঠোর হতো, যার ফলে সালতানাত ধ্বংস হয়ে যেতে পারত।

এই পরিস্থিতিতে আব্দুল হামিদ সানির হিকমত ও দূরদর্শিতা ছিল এই যে, যেখানে কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই পশ্চিমা এজেন্টদের শায়েস্তা করা সম্ভব হতো, সেখানে সামান্যতম বিলম্ব না করা। আর যেখানে কোনো পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় অবশিষ্ট ক্ষমতাও হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকত, সেখানে ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করা। এই নীতির অধীনে এই যুগে অনেক বড় বড় ইহুদি, খ্রিস্টান এবং পশ্চিমা এজেন্টদের তাদের পরিণতির দিকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। এই কারণেই পশ্চিমা মিডিয়া এবং ইহুদি প্রচার মাধ্যমগুলো সুলতানকে “সুলতান আহমার” (রক্তাক্ত সুলতান) উপাধি দিয়েছিল এবং তাকে বিলাসপ্রিয়, দুর্নীতিবাজ, অমিতব্যয়ী এবং অত্যাচারী হিসেবে প্রচার করেছিল। [১]

সুলতান আব্দুল হামিদের কর্মপন্থা:

খলিফা আব্দুল হামিদ সানি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং এর অধীনে ছড়িয়ে পড়া আঞ্চলিক ও ভাষাগত গোঁড়ামির মোকাবিলায় উন্মতকে এক বিন্দুতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য “জুযউল জামিআতুল ইসলামিয়া” (প্যান ইসলামিজম) নামে একটি আন্দোলন শুরু করেন। তিনি উলামায়ে কেরামকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে পরামর্শে শরিক করেন, শরিয়ত অনুযায়ী আইন বাস্তবায়ন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পূর্ণ চেষ্টা করেন। তিনি সরকারি দপ্তর ও বিভাগগুলো থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি নির্মূল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এই যুগে সদারতে উজমার পদে বারবার রদবদল হয়েছে। তাদের মধ্যে কামিল পাশা ছাড়া এমন কেউ ছিল না যে প্রকৃত অর্থে সরকার পরিচালনা করতে পারত। তাই সালতানাতের অধিকাংশ বিষয় সুলতান নিজেই দেখাশোনা করতেন।

তার কর্মপন্থার একটি দিক ছিল এই যে, যখনই তিনি কোনো ইউরোপীয় দেশে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত বা যুদ্ধের প্রস্তুতির খবর পেতেন, তিনি সেই দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাড়িয়ে দিতেন এবং এমন কাউকে সদর-ই-আজম নিযুক্ত করতেন যাকে সেই দেশের সরকার নিজের লোক মনে করত। তিনি ব্রিটেনের সমর্থন পাওয়ার জন্য কামিল পাশাকে, ফ্রান্সের সমর্থনের জন্য সাঈদ পাশাকে, মস্কোর আস্থা অর্জনের জন্য খলিল পাশাকে এবং জার্মানির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তৌফিক পাশাকে একের পর এক সদর-ই-আজমের চেয়ারে বসিয়েছেন। মোটকথা, খলিফা আন্তর্জাতিক রাজনীতির হাওয়া বুঝে নিজের ঘুঁটি চালতেন। তিনি সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত একটি বিশেষ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন যাতে শত্রুরা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দিতে সফল না হয়। কিছু ক্ষেত্রে তিনি কৌশলগত কারণে সংখ্যালঘুদের অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়িকে উপেক্ষা করেছেন। দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার সাথে হিকমত ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে এই নীতির মাধ্যমে তিনি অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও খিলাফতের মর্যাদা আরও ত্রিশ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। [২]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৮৩/৮

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৮৫/৮

পাশ্চাত্যঘেঁষা শ্রেণির সাথে রাজনৈতিক সংঘাত

দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের খেলাফতের শুরুতে শাসনকার্যে মিদহাত পাশা এবং তার সমমনা কর্মকর্তাদের প্রভাব ছিল। মিদহাত পাশা ১৮২২ সালে (১২৩৭ হিজরি) ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইউরোপীয় দেশগুলোতেও সময় কাটিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ১৮৭১ সালে (১২৮৮ হিজরি) তিনি উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৮ সালে (১২৮৫ হিজরি) তাকে বাগদাদের (ইরাক) আমির নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি মজলিসে শুরার সভাপতিত্ব করার সুযোগ পান। সুলতান আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে তিনিই বিদ্রোহ উসকে দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ইহুদি এজেন্ট এবং মদ্যপ ব্যক্তি, কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তিনি নিজের আসল চেহারার ওপর দেশপ্রেমের মুখোশ পরে ছিলেন। [১]

সুলতান আব্দুল হামিদ সিংহাসনে আরোহণের আগে দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন। তার এই বাহ্যিক অবস্থার কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল যে তিনি পাশ্চাত্যঘেঁষা। এই কারণেই তারা পঞ্চম মুরাদের পর সুলতান আব্দুল হামিদকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। সেই সময় সালতানাতের ভালো-মন্দের ওপর মিদহাত পাশার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্যঘেঁষা শ্রেণির পক্ষ থেকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হচ্ছিল। সুলতান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ১৮৭৬ সালের ৬ অক্টোবর (৪ শাওয়াল ১২৯৩ হিজরি) পার্লামেন্ট এবং সিনেট গঠনের অনুমোদন দেন এবং ঘোষণা করেন যে পার্লামেন্টের প্রতিনিধিরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন, আর সিনেটের সদস্যদের সরকার মনোনীত করবে। [২]

মিদহাত পাশার উত্থান:

সেই দিনগুলোতে প্রধান উজির রশিদ পাশা বার্ষিক্যের অজুহাতে পদত্যাগ করেন। মিদহাত পাশা দীর্ঘকাল ধরে এই পদের অপেক্ষায় ছিলেন। সুলতান আব্দুল হামিদ এখানেও রাজনৈতিক কৌশলের কথা বিবেচনা করে তাকে প্রধান উজির নিযুক্ত করেন। [৩] মিদহাত পাশা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি দেশে নতুন সংবিধান ও শাসনতন্ত্রের অনুমোদন দেবেন এবং প্রগতিশীল নেতা যেমন নামিক কামাল এবং জিয়া বে-কে তার বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করবেন। [৪]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৫-১৮৬, পাদটীকা।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৫।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৫।

[৪] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৭।

টীকা: নামিক কামাল একজন বিখ্যাত তুর্কি কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। ১৮৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতান সেলিম, বারবারোসা এবং আকিফ বে তার বিখ্যাত রচনা। জালালুদ্দিন খাওয়ারেজম শাহ নামে তিনি একটি স্টেজ ড্রামাও লিখেছিলেন যার উর্দু অনুবাদ সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারাম করেছিলেন। নামিক রাজনীতিতে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রতিনিধি হওয়ার পাশাপাশি তুর্কি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এবং প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্য শক্তির আধিপত্যের প্রবক্তা ছিলেন। বিপ্লবী চিন্তাধারার কারণে নামিক কামালকে তুরস্ক ছেড়ে লন্ডনে চলে যেতে হয়েছিল, যেখানে ১৮৬৮ সালে তিনি ‘হররিয়ত’ নামে একটি পত্রিকা চালু করেন। ১৮৭০ সালে তাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তুরস্কে ‘আল-ওয়াতান’ এবং ‘ইবরত’ নামে পত্রিকা বের করেন। বিপ্লবী চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সুলতান আব্দুল হামিদের সমর্থক ছিলেন। সুলতানও তাকে কাছে টেনে নেন এবং ১৮৮৮ সালে তাকে নিজের এবং প্রধান উজিরের মধ্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এই বছরই নামিকের মৃত্যু হয়। (সাখরাতুর রাজুলিল মারিদ: পৃষ্ঠা ৯৩, পাদটীকা সহ)

তুরস্কের নতুন সংবিধান

সুলতান আব্দুল হামিদ ব্যক্তিগতভাবে এখনই গণতন্ত্রের প্রসারের পক্ষে ছিলেন না, কারণ তুরস্ক তখন এক অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং বন্ধুদের ছদ্মবেশে শত্রুরা সক্রিয় ছিল। সুলতানের মতে, সেই সময়ে গণতন্ত্রের চেয়ে একজন শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং অনুগত সহযোগীদের প্রয়োজন বেশি ছিল। তবে সেই যুগে উসমানীয় সালতানাতে ইউরোপীয় প্রদেশগুলোতে এবং এমনকি এশীয় প্রদেশগুলোতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ মুসলিম নাগরিকও পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারের আকাঙ্ক্ষী ছিল। সুলতানের উজির ও উপদেষ্টাদের মধ্যে বিশেষ করে মিদহাত পাশার ঝাঁকও এই দিকেই ছিল। বিদেশি শক্তিগুলোর সাথে চুক্তির কারণে বাহ্যিক চাপও একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানাচ্ছিল।

এমন পরিস্থিতিতে সুলতান একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং মিদহাত পাশার সাথে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর একটি নতুন সংবিধান প্রস্তুত করেন। যেহেতু এই সংবিধানটি প্রধান উজির মিদহাত পাশা পেশ করেছিলেন, তাই পশ্চিমাপন্থী শ্রেণি এই পদক্ষেপের জন্য মিদহাত পাশাকে “সংবিধানের জনক” উপাধি দেয় [১]। সংবিধানটি ২৩ ডিসেম্বর ১৮৭৬ (৬ জিলহজ ১২৯৩ হিজরি) তারিখে পেশ করা হয়, যা নাগরিক স্বাধীনতা এবং সংসদীয় সরকারের রূপরেখার ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছিল। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল:

- সরকারি ধর্ম হবে ইসলাম।
- উসমানীয় নাগরিকত্ব প্রতিটি ব্যক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে।
- রাষ্ট্রকে একটি দেহের মতো বিবেচনা করা হবে, যার মধ্যে বিভক্তি এবং খণ্ড কল্পনা করা যাবে না।
- বার্ষিক বাজেট জাতীয় পরিষদ এবং তারপর সিনেট থেকে অনুমোদন করাতে হবে। উভয়ের সম্মতির পর এটি কার্যকর হবে।
- সংবিধানে বিলায়াত (প্রদেশ) সমূহের ব্যবস্থাপনা এবং গভর্নরদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের বিবরণ পেশ করা হয়েছিল।
- সংবিধানে জাতীয় পরিষদ ও সিনেটের সদস্যদের যোগ্যতার শর্তাবলি এবং নির্বাচনের পদ্ধতিও স্পষ্ট করা হয়েছিল [২]।
- আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক স্বাধীনতা ও সমতার অধিকার লাভ করবে।
- সবার শিক্ষার অধিকার থাকবে। উসমানীয়দের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হবে।

[১] আল-ইয়াহুদ ওয়াল-মাসুনিয়াহ, আব্দুর রহমান আদ-দাওসারী: পৃষ্ঠা ৭০, দারুস সুন্নাহ।

যদি একটি মত এমন হয় যে এই সংবিধান প্রণয়নে সুলতানের কোনো অংশ ছিল না, এটি ছিল নিছক মিদহাত পাশার কৃতিত্ব এবং সুলতান বাধ্য হয়ে এটি মেনে নিয়েছিলেন, তবে সুলতানের কন্যা শাহজাদী আয়েশা সুলতান তার কারাজীবনের স্মৃতিকথায় সুলতানের কথোপকথন উদ্ধৃত করেছেন, যাতে সুলতান বলেছিলেন যে যারা তাকে এই সংবিধানের বিরোধী বলে প্রচার করে তারা মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। সুলতানের কথাগুলো ছিল: “আমার মেয়ে! একইভাবে আমিও সংবিধানের পক্ষে ছিলাম। আমি মন থেকেই এটি তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমি বিশ্বের সকল উন্নত দেশের সংবিধান অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে সেই সব উপকরণের মধ্যে যে বিষয়গুলো আমাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সেগুলো যেন গ্রহণ করা হয়, যাতে আমরা এমন একটি সংবিধান লাভ করি যা দেশকে পতন থেকে রক্ষা করবে। তারপর এর পর সংবিধান ঘোষণা করা হয়েছিল।” (ওয়ালিদী সুলতান আব্দুল হামিদ: পৃষ্ঠা ৩৭)

[২] তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ: পৃষ্ঠা ৫৯০, ৫৯১।

- ৯. প্রেস স্বাধীন হবে।
- ১০. তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন করা, আর্থিক জরিমানা করা এবং বেগার খাটানো নিষিদ্ধ হবে।
- ১১. কোনো শরয়ি বাধ্যবাধকতা ছাড়া কাজিদের বরখাস্ত করা যাবে না। [১]
- ১২. সুলতানের নেতৃত্বের অধিকার বহাল থাকবে। তিনি জবাবদিহিতার উৎসে থাকবেন। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, চুক্তি অনুমোদন, যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার ক্ষমতা তাঁর থাকবে। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কমান্ড তাঁর কাছে থাকবে।
- ১৩. পার্লামেন্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই সুলতানের যেকোনো আইন নির্ধারণ করার অধিকার থাকবে।
- ১৪. পার্লামেন্টের সদস্যরা তাদের মতামত প্রকাশে স্বাধীন থাকবেন। তারা কেবল আইন ভঙ্গ করলেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে।
- ১৫. রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা হবে তুর্কি এবং পার্লামেন্টের অধিবেশনের কার্যক্রম এই ভাষাতেই হবে।
- ১৬. শুরার দুটি কক্ষ থাকবে: একটি মজলিসে মাবউসিন অর্থাৎ জনগণের প্রতিনিধিদের কক্ষ (জাতীয় সংসদ), দ্বিতীয়টি মজলিসে আইয়ান (সিনেট) অর্থাৎ শীর্ষস্থানীয় উলামা, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের কক্ষ। জাতীয় সংসদে মুসলমানদের জন্য ৭১, খ্রিস্টানদের জন্য ৪৪ এবং ইহুদিদের জন্য ৪টি আসন থাকবে। সিনেটে ৩১টি আসন মুসলমানদের এবং বাকিগুলো সংখ্যালঘুদের জন্য হবে। [২]

মিদহাত পাশার উচ্চাভিলাষ:

এই সংবিধানে এমন কোনো ধারা ছিল না যা ইসলামের পরিপন্থী ছিল, তাই ইসলামপন্থীদেরও আপাতদৃষ্টিতে এতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেহেতু এতে খলিফার ক্ষমতা আগের তুলনায় কিছুটা সীমিত করে দেওয়া হয়েছিল, তাই সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী (সদরে আজম) মিদহাত পাশা পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন: “নতুন সংবিধান ঘোষণার উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন খিলাফত ব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাচার থেকে রক্ষা করতে পারি।” [৩]

এ কারণে খিলাফত পদের বিরোধী পশ্চিমঘেঁষা গোষ্ঠীটি খুব খুশি ছিল। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী মিদহাত পাশা, যিনি সুলতান আব্দুল হামিদকে সহজ-সরল মনে করতেন, এই সাফল্যের পর দেশের প্রধান হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি একটি ব্যক্তিগত মজলিসে বলেছিলেন: “অচিরেই এটি তুরস্ক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে এবং আমি প্রথমে এর প্রজাতান্ত্রিক প্রধান এবং পরে সুলতান হয়ে যাব।” [৪]

মিদহাত পাশার অপরাধসমূহ:

মিদহাত পাশার সাথে ব্রিটেনের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক ছিল, তাই তার নীতি ছিল এই অঞ্চলে ব্রিটিশ স্বার্থের ওপর...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/ ১৮৫, ১৮৬।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়া মিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪০১ থেকে ৪০৫।

[৩] আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৯৫, দারুল কলম দামেস্ক।

[৪] মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৭৭।

কখনো হতে দেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নিজের ১১ জন “নায়েব” নিযুক্ত করেছিলেন যাদের মধ্যে ৮ জন খ্রিস্টান ছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরাইলির সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। [১] তিনি প্রধানমন্ত্রীর একটি আলাদা পরামর্শক সভা গঠন করেছিলেন যাতে ৬০ জন খ্রিস্টান এবং ১৮০ জন মুসলিম সদস্য ছিল। [২]

সুলতান আব্দুল হামিদ বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মিদহাত পাশাসহ বড় বড় মন্ত্রীরা ইউরোপের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন। সেই সময় খিলাফতের প্রাসাদের কোনো কোণ ইউরোপীয় এজেন্টদের নাগালের বাইরে ছিল না। মিদহাত পাশা সুলতানের কাছ থেকে শোনা অত্যন্ত গোপনীয় কথাগুলোও সংবাদপত্রে পৌঁছে দিতেন। সুলতান আব্দুল হামিদ বলতেন:

“এমন কোনো সরকার শান্তিতে থাকতে পারে না যেখানে প্রধানমন্ত্রীর মতো পদে আসীন ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিশ্বশক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থে কাজ করিয়ে নেয়।” [৩]

বলকান যুদ্ধ

সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলে বলকান যুদ্ধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই যুদ্ধের সূচনা সুলতানের শাসনের প্রথম বছরগুলোতে হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে এর শিখা জ্বলতে থাকে।

বলকান বলতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সেই অঞ্চলকে বোঝায় যা মন্টিনিগ্রো, রোমানিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং মেসিডোনিয়ার সমষ্টি নিয়ে গঠিত। এটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এই অঞ্চলের পূর্বে বসফরাস উপসাগর, পশ্চিমে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, উত্তরে দানিউব নদী এবং দক্ষিণে মারমারা সাগর ও দার্দানেলেস পর্যন্ত বিস্তৃত।

উসমানীয় সালতানাত ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ক্রমাগত আক্রমণ ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও পতনের এই যুগেও এই ভূখণ্ডের বেশিরভাগ অংশকে আগলে রেখেছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পূর্ণ চেষ্টা ছিল এখানকার খ্রিস্টানদের বিদ্রোহে উস্কানি দিয়ে তাদের উসমানীয় সালতানাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

১৮৭৬ সালে সার্বিয়ান খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করে। সুলতান আব্দুল হামিদ ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধা দেন এবং তার জেনারেল উসমান পাশার মাধ্যমে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। “আলেক্সিনাক” উপত্যকায় উসমান পাশা সার্বিয়ান বাহিনীর মুখোমুখি হন। বলা হয় যে সার্বিয়ান বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন রুশ জেনারেল, যিনি কয়েক বছর আগে মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র তাসখন্দ দখল করেছিলেন। উসমান পাশা অসাধারণ সামরিক দক্ষতা ও সাহসিকতা প্রদর্শন করে শত্রুকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং তারপর বেলগ্রেডের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। কিন্তু এই...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৯৭, ঢাকা সহ।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১০২।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৩০৬।

এই সময়ে রাশিয়ার পক্ষ থেকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয় যার ফলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। [১]

মিদহাত পাশার ষড়যন্ত্র:

যুদ্ধ বন্ধ করার আসল কারণ ছিল সুলতান আব্দুল হামিদের এই কৌশল যে, তুরস্ককে যতটা সম্ভব যুদ্ধ থেকে বাঁচানো যায় এবং এই সময়ে দেশকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে ইউরোপীয় জাতিগুলোর সমকক্ষ করে তোলা যায়। সুলতান আব্দুল হামিদ পুনরায় গৃহযুদ্ধের বিপদ দূর করার জন্য বলকানবাসীদের সব উপায়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। তাদের পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য বিচার বিভাগকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (আমলাতন্ত্র) থেকে পৃথক করে দেন। কাজীদের নির্বাচনে স্থানীয় জনগণের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যিক করা হয়। মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ওপর করের হার সমান করে দেওয়া হয়। [২]

কিন্তু সুলতানের বিপরীতে মিদহাত পাশার নীতি ছিল তুরস্ককে অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া। তিনি বলকানে সুলতানের পক্ষ থেকে জারি করা এই সংস্কারগুলোরও বিরোধিতা করেন। ১৮৭৭ সালের জানুয়ারি মাসে (জিলহজ ১২৯৩ হিজরি) তিনি নিজের মজলিসে শুরার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সময় যুদ্ধবিরোধীদের দেশের গাদ্দার হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি রাশিয়া এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর ওপরও কঠোরতম ভাষায় সমালোচনা করে এটি প্রকাশ করেন যে, এই সময়ে তুরস্কের আত্মমর্যাদাশীল নেতা তিনিই।

মিদহাত পাশার কথায় সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও সুলতানকে বোঝাতে শুরু করেন যে, সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং রাশিয়ার পরাজয় সহজ। তাছাড়া ব্রিটেনও আমাদের সমর্থক।

এই সময়ে মিদহাত পাশা দ্বীনি মাদরাসার ছাত্র এবং জনগণের মধ্যে অর্থ বিতরণ করে তাদের এই মর্মে রাজি করিয়েছিলেন যে, তারা যেন বলকানে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পক্ষে বিক্ষোভ করে। সংবাদমাধ্যমও মিদহাত পাশার সুরে সুর মেলায় এবং পরিস্থিতি সেই দিকেই যেতে শুরু করে যেখান থেকে সুলতান আব্দুল হামিদ দেশকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। সুলতান তার বিশেষ সূত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি যদি যুদ্ধের ঘোষণা না দেন তবে পরিস্থিতি তার চরম বিপক্ষে চলে যাবে, যার সুযোগ নিয়ে মিদহাত পাশা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে এবং তার মানসিক ভারসাম্যহীন ভাই পঞ্চম মুরাদকে নামমাত্র খিলাফতের আসনে বসিয়ে নিজে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করবে। এরপর মিদহাত পাশা সেই সবকিছু করার জন্য স্বাধীন হয়ে যাবে যা ব্রিটেন এবং ইহুদিরা তাকে দিয়ে করাতে চায়।

সুলতানের মতে এই পরিস্থিতিতে ঐকমত্য অর্জনের কৌশল কাজ করতে পারত না বরং নিজের স্বৈচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি কিছু অসাধারণ পদক্ষেপ নেওয়ার সংকল্প করেন। [৩]

মিদহাত পাশার পতন:

মিদহাত পাশার জনপ্রিয়তা দেখে পশ্চিমাপন্থী গোষ্ঠী অত্যন্ত আনন্দিত ছিল কিন্তু এই লোকেরা সুলতানের বিরুদ্ধে...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ১/১০২, ১০৩।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ১৮৯।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ৩/১০৩।

পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলে সুলতান আব্দুল হামিদ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭ (২১ মহররম ১২৯৪ হিজরি) তারিখে হঠাৎ মিদহাত পাশাকে বরখাস্ত করার আদেশ জারি করেন। এর কারণ হিসেবে জানানো হয় যে, তিনি “জমিয়াতুত তুর্কিয়া আল-ফাতাহ” (তরুণ তুর্কি)-এর সমর্থক ছিলেন, যারা তার চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত ছিল এবং ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখার প্রবক্তা ছিল। মিদহাত পাশা পূর্ণ দুই মাসও গ্র্যান্ড উজিরের পদে থাকতে পারেননি এবং তাকে বরখাস্ত করে “ইজমির”-এর গভর্নর করে পাঠানো হয়। [১]

মিদহাত পাশা সুলতান আব্দুল আজিজ বা সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলে যদি উচ্চতর পদমর্যাদা লাভ করে থাকেন, তবে তার কারণ এই ছিল না যে তিনি তাদের ঘনিষ্ঠ বা বিশ্বস্ত ছিলেন। বরং আসল কারণ ছিল এই যে, দেশি-বিদেশি রাজনীতিবিদ, উজির এবং সাংবাদিকদের সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে তিনি একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন অহংকারী ও কঠোর মেজাজের মানুষ। তিনি তার বৈশ্বিক সম্পর্কের জোরে কেবল তার অধীনস্থদেরই নয়, বরং খলিফাদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল অগভীর। তিনি এই সত্যটি বোঝার চেষ্টা করেননি (বা জেনেবুঝে উপেক্ষা করেছেন) যে উসমানীয় সালতানাত কেবল একটি দেশ নয়, বরং বিভিন্ন বংশ ও জাতির সমষ্টি। তাই তার অনেক সিদ্ধান্ত দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। [২]

পার্লামেন্ট গঠন:

মিদহাত পাশার পর গ্র্যান্ড উজিরের পদ এধেম পাশাকে দেওয়া হয়, যার নেতৃত্বে ১৯ মার্চ ১৮৭৭ (৪ রবিউল আউয়াল ১২৯৪ হিজরি) তারিখে উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়েমেন, ত্রিপোলি (লিবিয়া) এবং বসনিয়ার মতো দূরবর্তী প্রদেশগুলোতেও ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় আসেন। পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগদানকারী কিছু সদস্য প্রথমবারের মতো ইস্তাম্বুল দেখছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তুর্কি ভাষার সাথেও পরিচিত ছিলেন না। [৩] সুলতান আব্দুল হামিদ এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তার ভাই মুহাম্মদ রাশাদও তার সাথে ছিলেন।

যেহেতু তুরস্কে গণতন্ত্র আনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপন্থী তরুণ তুর্কিরা অগ্রণী ছিল, যাদের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল, তাই এই পরিবর্তনের পরপরই তারা নতুন তুরস্কে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করার চেষ্টা শুরু করে। সুলতানের কাছে দাবি জানানো হয় যে, তিনি যেন এমন কিছু প্রদেশের শাসনভার খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন যেখানে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দাবিও করা হয় যে, খ্রিস্টান ছেলেদের উচ্চপদে আসীন করার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (ক্যাডেট কলেজ) ভর্তি করা হোক। সেই দিনগুলোতে কিছু ইস্যুতে জাতীয় পরিষদ এবং সিনেটের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলেও কোনো ফলাফল আসেনি। [৪]

[১] আত-তারিখ আল-ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির, ৮/১৮৬-১৮৭।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা, ২/১০৩।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা, ২/১০৫।

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসাবাবুস সুকুত, ড. সাল্লাবি, পৃ. ৩০১-৩০৫।

বলকানে পুনরায় রক্তপাত এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর চক্রান্ত:

কিছু দিন পর বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সমগ্র ইউরোপীয় বিশ্ব বিদ্রোহীদের সমর্থন করে সুলতানের কাছে সংস্কারের দাবি জানায়। সুলতান এই অঞ্চলগুলোর জন্য আরও সুযোগ-সুবিধার ঘোষণা দেন, তা সত্ত্বেও স্থানীয় নাসরানিরা সন্তুষ্ট হয়নি এবং তাদের বিদ্রোহে উস্কানিদাতা ইউরোপীয় শাসকরাও নয়। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল যে, সংস্কারের দাবি ছিল নিছক একটি ভণ্ডামি, আসল উদ্দেশ্য ছিল কোনো না কোনোভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্য যেন গৃহযুদ্ধের শিকার হয়ে থাকে। [১]

কিছু দিন পর বলকানে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বার্লিনে একটি লিখিত চুক্তি করে। ঘটনাটি ছিল এই যে, সেলোনিকের এক নাসরানি মেয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের ঘোষণা দেওয়ার জন্য স্থানীয় আমিরের কাছে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে নাসরানিরা তাকে হত্যা করে ফেলে। এর ওপর মুসলমানরা আমিরের কাছে খুনিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানায়। আমির নাসরানিদের বিদ্রোহের আশঙ্কায় তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করতে পারেননি, যার ফলে প্রতিবাদকারী মুসলমানরা জার্মানির দূতাবাসে হামলা চালায়।

এই খবর ইউরোপে পৌঁছালে বার্লিনে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানির মন্ত্রীরা একত্রিত হয়ে একটি লিখিত প্রস্তাব পাস করেন, যাতে ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিনিধিরাও স্বাক্ষর করেন। প্রস্তাবে বলকানের বিদ্রোহীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে দাবি করা হয়েছিল যে, খলিফা যেন নাসরানি নাগরিকদের অধিকারের খেয়াল রাখেন, অন্যথায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো এই সমস্যার সমাধানের জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। [২]

বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ:

এই দিনগুলোতে বুলগেরিয়ায় নাসরানিদের সংগঠনগুলো ওই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধির অভিযান শুরু করে দেয়, রাশিয়া তাদের অস্ত্র ও সরবরাহ করছিল যা বসনিয়া, সার্বিয়া এবং হার্জেগোভিনার বিদ্রোহীদের মাঝেও বিতরণ করা হচ্ছিল। উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরির জন্য বাবে আলীর বাড়াবাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের গুজবও ছড়ানো হচ্ছিল। এর কিছু দিন পর রাশিয়ার উস্কানিতে বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়। অস্ট্রিয়াও বিদ্রোহীদের সহায়ক ছিল। তবে সুলতান আব্দুল হামিদ পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করেন। এই খবরে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। বুলগেরীয় নাসরানিরা বিদ্রোহের সময় স্থানীয় মুসলমানদের যে গণহত্যা চালিয়েছিল, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তারা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানকে নিরীহ নাগরিকদের ওপর তুর্কি বাহিনীর জুলুম হিসেবে প্রচার করে দেয়। এই খবরে পুরো ইউরোপে ক্ষোভের ঢেউ বয়ে যায় এবং সবদিক থেকে দাবি উঠতে থাকে যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের জুলুম বন্ধের জন্য কোনো কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হোক। এই কর্মপন্থার প্রথম ধাপে ইউরোপ সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে দাবি শুরু করে যে, বুলগেরিয়ায় কোনো নাসরানি শাসক নিযুক্ত করা হোক। [৩]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ১৮৯

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৮৭

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৮৮

২৩২

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

দ্বিতীয় পর্যায়ে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জার্মানি সার্বিয়া ও জাবাল আল-আসওয়াদের খ্রিস্টান নবাবদের সাথে মিলে আবারও বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করল। এতে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল প্রধান। রাশিয়া বিদ্রোহীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, তারা যদি বলকানে সফল হয়, তবে রুশ সেনাবাহিনী সরাসরি ইস্তাম্বুল আক্রমণ করে উসমানীয় খিলাফতকে সমূলে উৎপাটন করবে। আর যদি তুর্কিরা বিদ্রোহ দমনে সফল হয়, তবে রুশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের রক্ষার জন্য মাঝখানে চলে আসবে। অবশেষে সার্বিয়া ও জাবাল আল-আসওয়াদের খ্রিস্টান বাহিনী একত্রিত হয়ে উসমানীয় বাহিনীর মুখোমুখি হলো। বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর আবারও বিদ্রোহীরা পিছু হটতে বাধ্য হলো। উসমানীয় বাহিনী তাদের নির্মূল করার জন্য বেলগ্রেডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমন সময় ইউরোপীয় দেশগুলো মাঝখানে হস্তক্ষেপ করল এবং হুমকি দিল যে, যদি উসমানীয়রা যুদ্ধ বন্ধ না করে, তবে ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রদূতকে ইস্তাম্বুল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ করা হলো।

এরপর ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে (রবিউস সানি ১২৯৪ হিজরি) ইউরোপীয় দেশগুলো সন্ধির জন্য নিম্নোক্ত চুক্তি পেশ করল:

- বুলগেরিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে।
- উভয় অংশের প্রশাসক হবেন খ্রিস্টান। তুর্কি আমিরদের কাছে কিছু বড় শহরের দুর্গের দায়িত্ব থাকবে।
- পুলিশের সদস্যরা খ্রিস্টান হবে। তাদের কর্মকর্তাদের অর্ধেক মুসলিম এবং অর্ধেক খ্রিস্টান হবে।
- একই ব্যবস্থা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাতেও করা হবে।
- উসমানীয় সাম্রাজ্য সার্বিয়া ও জাবাল আল-আসওয়াদের কিছু এলাকা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।

সুলতান আব্দুল হামিদ এই সন্ধিপত্র প্রত্যাখ্যান করলেন এবং সার্বদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করলেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে বিষয়ের বাইরে রেখে তিনি সার্বদের সাথে সরাসরি আলোচনা করলেন, যার ভিত্তিতে স্থির হলো যে:

- তুর্কি বাহিনী সার্বিয়া থেকে ফিরে আসবে।
- সার্বরা কোনো নতুন দুর্গ তৈরি করবে না।
- দুর্গগুলোতে উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং সার্বিয়া উভয়ের পতাকা ওড়ানো হবে।

এই সময়ে রাশিয়া ও ব্রিটেন বাকি ইউরোপীয় বিশ্বকে সাথে নিয়ে লন্ডনে একটি সম্মেলন ডাকল, যেখানে তুরস্কের কাছে দাবি করা হলো যে, তারা যেন খ্রিস্টান নাগরিকদের অবস্থার উন্নতি করে, বলকানে সংস্কার অব্যাহত রাখে, জাবাল আল-আসওয়াদ ও সার্বিয়ার শাসকের সাথে সন্ধি করে এবং রাষ্ট্রদূতদের স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। সুলতান এই দাবি এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই। সাম্রাজ্যে সবাইকে বৈষম্যহীন অধিকার দেওয়া হচ্ছে, বলকানে অশান্তির কারণ হলো এই বিদেশি হস্তক্ষেপ, যার কোনো যৌক্তিকতা নেই। [১]

রাশিয়ার আক্রমণ, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং তুরস্কের পরাজয়:

সুলতান আব্দুল হামিদের ওপর হতাশ হয়ে রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রোমানিয়ার (আফলাক ও বাগদান) নবাবদের সাথে...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, লিড কট্টো ও মাহমুদ শাকির: ১৯০/৮।

এই অঞ্চলগুলোকে নিজেদের সীমানায় অন্তর্ভুক্ত করার একটি গোপন চুক্তি করা হয়েছিল। এরপর ঘোষণা করা হয় যে, লন্ডন কনফারেন্সের দাবি প্রত্যাখ্যান করার কারণে তুরস্কের সাথে সমস্ত রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে যুদ্ধ শুরু করা হচ্ছে।

এভাবে ২৪ এপ্রিল ১৮৭৭ (১০ রবিউস সানি ১২৯৪ হিজরি) রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে সেই মহাযুদ্ধের সূচনা হয়, যা ইতিহাসের অন্যতম বড় যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই যুদ্ধে রুশ বাহিনী কেবল সংখ্যাগত দিক থেকেই শ্রেষ্ঠ ছিল না, বরং তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাও তুরস্কের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। তবে অস্ত্রের গঠনের দিক থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

যুদ্ধ ঘোষণার পর ২১ জুন (৯ জমাদিউস সানি) রুশ বাহিনী দানিউব নদী পার হয়ে রোমানিয়ায় প্রবেশ করে। রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার নিজেই বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তার বাহিনীর সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ, যাদের কাছে ৮০০টি কামান ছিল।

রোমানিয়ার কর্তৃপক্ষ রুশদের স্বাগত জানায় এবং এক লক্ষ সৈন্যসহ রাশিয়ার বাহিনীর সাথে যোগ দেয়। এভাবে যুদ্ধের শুরুতেই রাশিয়ার পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং তাদের বাহিনী রোমানিয়া থেকে বুলগেরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ১৭ জুলাই (২৫ জমাদিউস সানি) রাশিয়া “তিরনোভা” এবং ১৬ জুলাই (৫ রজব) “নিকোপোল” দখল করে নেয়।

রুশ আক্রমণের সময়মতো তথ্য পৌঁছানো ভিয়েনায় নিযুক্ত প্রবীণ তুর্কি অফিসার আবদি পাশার দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তিনি সময়মতো সঠিক তথ্য পাঠাতে পারেননি। যার ফলে দূরবর্তী সীমান্তে ছড়িয়ে থাকা উসমানীয় বাহিনী উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে শত্রুকে অবরোধ করার সুযোগ পায়নি, বরং উল্টো রুশ বাহিনী বিভিন্ন স্থানে মহাসড়ক ও গিরিপথগুলো দখল করে তুর্কি বাহিনীর চলাচলের পথ অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। এই পরিস্থিতির দায়ভার আবদি পাশার ওপর ছিল, যার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

এই সময়ে তুর্কি আমির জেনারেল উসমান পাশা ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে “প্লেভনা” পৌঁছান, যেখানে কোনো দুর্গ ছিল না। উসমান পাশা দিনরাত এক করে সেখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন যাতে রুশ বাহিনীকে বলকান পাহাড় থেকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে ঠেকানো যায়। রুশ জেনারেল শিল্ডার-শুল্ডনার উসমান পাশার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দ্রুত দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু ২০ জুলাই (৯ রজব) উসমান পাশা তাকে প্রায় তিন হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন।

৩০ জুলাই (১৯ রজব) জেনারেল ব্রুডেনার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য এবং “১৮৪”টি কামান নিয়ে উসমান পাশার বিরুদ্ধে একটি বড় আক্রমণ চালান, কিন্তু উসমান পাশা সাত হাজার রুশকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়ে এই আক্রমণকেও ব্যর্থ করে দেন।

উসমান পাশা প্লেভনার রণাঙ্গনে মরণপণ লড়াই করছিলেন, সারা বিশ্বের নজর সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। টেলিগ্রাফের মাধ্যমে মুহূর্তের খবর সবদিকে পৌঁছে যাচ্ছিল। রাশিয়া ও রোমানিয়ার বিশাল যৌথ বাহিনী দুই দিক থেকে উসমান পাশাকে ঘিরে রেখেছিল। যুদ্ধ জয়ের জন্য উসমান পাশার জরুরি ভিত্তিতে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল।

তুর্কি জেনারেল সুলাইমান পাশা, যিনি ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ইতালির কাছে ছিলেন, নিজের নৌবহরের নোঙর তুলে দ্রুত রণাঙ্গনের দিকে আসছিলেন। সেই দিনগুলোতে তিনি দক্ষিণ উপকূলের “শিপকা” গিরিপথ পর্যন্ত পৌঁছে যান, যার উভয় পাশে খাড়া পাহাড় ছিল। ২০ আগস্ট ১৮৭৭ (১০ শাবান ১২৯৪ হিজরি) যখন তিনি গিরিপথে প্রবেশ করেন, তখন প্রতিপক্ষ বাহিনী তাকে বাধা দিতে...

...জন্য চারপাশের পাহাড়ে চলে এল। সুলেমান পাশা তাদের গুলির বর্ষণ এবং নিজের সাথীদের লুটিয়ে পড়া লাশের পরোয়া না করে মৃত্যুর এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাগলের মতো পার হতে থাকলেন। এই সময়ে একদিকে সুলতান আব্দুল হামিদ এবং অন্যদিকে জার আলেকজান্ডার টেলিগ্রাফের মাধ্যমে ক্রমাগত তার গতিবিধি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সুলেমান পাশা শিপকা প্রণালী অতিক্রম করার আগেই রুশরা প্রণালীর নৌ-অবরোধ করে ফেলে।

এদিকে উত্তরে রুশ জারের ভাই গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাস একটি বাহিনী নিয়ে আসছিলেন। তুর্কি জেনারেল আলী পাশা ৩০ আগস্ট (১০ শাবান) “কাহরামান” উপত্যকায় এবং ৫ সেপ্টেম্বর (২৬ শাবান) কাচিলুকা ময়দানে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। কিন্তু রুশরা ক্রমাগত সাহায্য পাচ্ছিল, অন্যদিকে তুর্কিদের প্রতিটি বাহিনী নিজ নিজ স্থানে অবরুদ্ধ ছিল। তাই ২১ সেপ্টেম্বর (১৩ রমজান) এর যুদ্ধে আলী পাশা পরাজিত হন এবং তাকে পিছু হটতে হয়।

এর পরপরই রুশ জার এবং তার ভাইয়ের বাহিনী একত্রিত হয়ে ওসমান পাশার বিরুদ্ধে “প্লোভনা” রণাঙ্গনে সমবেত হয়। এই সময়ে রোমানিয়ার ৫০ হাজার সৈন্যও তাদের সাথে যোগ দেয়। এই বাহিনীগুলো ৩৮০টি কামান নিয়ে দিনরাত প্লোভনা দুর্গে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ওসমান পাশার কাছে তখন ৩০ হাজার সৈন্য এবং ৫৮টি কামান অবশিষ্ট ছিল।

১১ সেপ্টেম্বর (৩ রমজান) রুশ ও রোমানীয় বাহিনী এই বিশ্বাসে যে এখন ওসমান পাশার দম শেষ পর্যায়ে, প্লোভনার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করে। ১২ ঘণ্টার এই যুদ্ধে এক মুহূর্তের বিরতি ছাড়াই কামানের মুখ এবং বন্দুকের নল থেকে আগুন ও লোহার বৃষ্টি হতে থাকে। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধে ওসমান পাশা এবং তার অবরুদ্ধ সাথীরা অতুলনীয় সাহসিকতা প্রদর্শন করে ১৫ হাজারের বেশি প্রতিপক্ষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে এই আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। “প্লোভনা”র যুদ্ধে এটি ছিল ওসমান পাশার তৃতীয় বিজয়, যার জন্য সুলতান আব্দুল হামিদ তাকে “গাজী” উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৭ সেপ্টেম্বর (৯ রমজান) সুলেমান পাশা একটি ঝোড়ো আক্রমণ করে শিপকা প্রণালীর পথ খুলে শত্রুদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সফল হননি।

যদি ওসমান পাশা সুলেমান পাশার সাহায্য পেতেন, তবে এই রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা সম্ভব হতো। কিন্তু সুলেমান পাশা শিপকা প্রণালীতে আটকে ছিলেন, অন্যদিকে রণাঙ্গনে ২৮ অক্টোবর (২০ শাওয়াল) রুশরা আরও ৩৫ হাজার সৈন্যের সাহায্য পেয়ে যায়। তাছাড়া প্লোভনার নিকটবর্তী শহর “লোভচা”ও শত্রুদের দখলে চলে যায়, যার ফলে প্লোভনা তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ে। কেবল দক্ষিণ-পূর্বে সোফিয়ার পথ খোলা ছিল। ওসমান পাশা তা সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যান। শহরের কেবল পুরুষরাই নয়, নারীরাও এই জিহাদে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শরিক ছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে তারা শত্রুর তিনটি প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্যে দুটি ভেঙে ফেলেন এবং তাদের কামানগুলোও দখল করে নেন। ওসমান পাশা নিজেও আক্রমণগুলোতে শরিক হতেন। তবে শেষ পর্যন্ত ওসমান পাশাকে প্লোভনা থেকে পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কিন্তু যে রাতে তিনি সোফিয়ার দিকে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, শহরের এক ইহুদি গিয়ে রুশদের খবর দিয়ে দেয়। রুশরা তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হয়ে ওসমান পাশার পথ রোধ করে। এখানে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে এই মুজাহিদ তীব্র...

আহত হয়ে বন্দী হলেন। হাজার হাজার তুর্কি সৈন্যও বন্দী হয়েছিল যাদেরকে পরে রুশরা হত্যা করে। এভাবে চার মাস ২৩ দিনের যুদ্ধের পর এই রণাঙ্গনে তুর্কিদের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। রুশ জেনারেল উসমান পাশার বীরত্বে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, জারের ভাই তাকে তার তলোয়ার ফিরিয়ে দেন এবং তার বীরত্বের স্বীকৃতি দেন। ডিসেম্বর ১৮৭৭ (জিলহজ ১২৯৪ হিজরি) এ এই গাজীকে মস্কো পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

উসমান পাশার পর বলকান রণাঙ্গনে কোনো তুর্কি জেনারেল রুশদের সামনে টিকতে পারেননি। এর একটি প্রধান কারণ ছিল রণাঙ্গনে উপস্থিত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে, বিশেষ করে সুলাইমান পাশা ও রিফাত পাশার মধ্যে দীর্ঘদিনের তীব্র মতবিরোধ, যার ফলে তারা কোনো কর্মপরিকল্পনায় একমত হতে পারেননি।

এর ফল এই দাঁড়াল যে, ৩ জানুয়ারি ১৮৭৮ (২৮ জিলহজ ১২৯৪ হিজরি) রুশ বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে বুলগেরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর সোফিয়া দখল করে নেয়। এভাবে বলকানে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার আশাও শেষ হয়ে গেল। বুলগেরিয়ার খ্রিস্টানরা রুশদের সহায়তায় মুসলিম নাগরিকদের ওপর ব্যাপক গণহত্যা শুরু করে, যার ফলে অসংখ্য বলকান মুসলিম ইস্তাম্বুল ও আনাতোলিয়ার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হয়।

এই সময়ে আনাতোলিয়ার সেই সীমান্ত দুর্গগুলোতেও যুদ্ধ চলছিল যেখানে আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও ককেশাস থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। এই রণাঙ্গনে তরুণ কমান্ডার আহমদ মুখতার পাশা ৯০ হাজার সৈন্য ও ৯টি কামানের সাথে উপস্থিত ছিলেন, যিনি কয়েক বছর আগে ইয়েমেন জয় করেছিলেন। তিনি ২১ জুন ১৮৭৭ (৯ রজব ১২৯৪ হিজরি) রুশ জেনারেল ‘তের-গুকাশভ’কে ‘হালিয়াজ’-এর ময়দানে পরাজিত করেন। মাত্র চার দিন পর তিনি জেনারেল ‘মেলিনকভ’কেও একইভাবে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

জার হতাশ হয়ে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মার্শাল মিসাইলকে এই রণাঙ্গনে পাঠান, কিন্তু ২৫ আগস্ট (১৫ শাবান) এর যুদ্ধে আহমদ মুখতার তাকেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, যার ফলে সুলতান আব্দুল হামিদ তাকে ‘গাজি’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৩ অক্টোবর (২৬ রমজান) ‘আলাদজা’র ময়দানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যেখানে ৩৭ হাজার রুশ সৈন্যের মোকাবিলায় ৩৪ হাজার তুর্কি ছিল। এবারও ঐশী সাহায্য সাথে ছিল এবং রুশরা দশ হাজার লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। পক্ষান্তরে আড়াই হাজার মুসলিম শহীদ হন।

তবে কয়েক দিন পরই মস্কো থেকে বিশাল সাহায্য এসে পৌঁছায় এবং ১৫ অক্টোবর (২৭ শাওয়াল) রুশরা ১৫০টি কামানের সাথে অগ্রসর হয়ে ‘আলাদজা দাগ’-এর উপত্যকায় আহমদ মুখতারকে পরাজিত করে এবং এরপর কারস, বাতুম ও বায়েজিদের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলো দখল করে নেয়। আহমদ মুখতার পাশা অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে ‘এরজুরুম’-এর দুর্ভেদ্য দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। রুশরা একে ঘিরে ফেলে আক্রমণ শুরু করে কিন্তু দুর্গটি জয় করতে পারেনি।

অন্যদিকে সোফিয়া জয়ী রুশ বাহিনী দ্রুত আদ্রিয়ানোপলের দিকে অগ্রসর হয়। আহমদ আইয়ুব পাশা শহরটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সেখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নেন এবং ২০ জানুয়ারি ১৮৭৮ (১৬ মহরম ১২৯৫ হিজরি) রুশরা এটিও দখল করে নেয়।

হয়ে গেলেন। এরপর রুশ বাহিনী অগ্রসর হয়ে ইস্তাম্বুল থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে চলে আসে। সুলতান আব্দুল হামিদ এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে রাশিয়াকে আলোচনার ইঙ্গিত দেন এবং এর জন্য কৃষ্ণসাগর উন্মুক্ত করে দেওয়ার ঘোষণা করেন। ব্রিটেন এই যুদ্ধকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। রাশিয়াকে ইস্তাম্বুলের সন্নিকটে দেখে তারা তাদের নৌবহর বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশ করিয়ে রুশ বাহিনীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যাতে রাশিয়া ইস্তাম্বুলের একক বিজয়ী হতে না পারে। ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল যে, উষ্ণ সমুদ্রের এই সংযোগস্থলে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর রাশিয়া বিশ্বের যেকোনো দেশে আক্রমণ চালাতে এবং তাদের বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে সক্ষম হবে। রুশ বাহিনীর এই বিজয়াভিযানের সময় সার্বিয়ার খ্রিস্টান শাসক হাজার হাজার মানুষের সাথে মিলে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চুক্তি করে ফেলেছিলেন। ফলে মানচাস সার্বিয়ায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং জাবাল আসওয়াদের খ্রিস্টানরাও তার সাথে যোগ দেয়। গ্রিসও একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে এবং যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে (২৯ মহরম ১২৯৫ হিজরি) তাদের বাহিনী “থিসালি”-তে প্রবেশ করায়। [১]

পার্লামেন্ট স্থগিতকরণ:

রাশিয়ার কাছে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও সুলতান কোনো দুর্বল চুক্তির পক্ষে ছিলেন না। তিনি অনুভব করলেন যে, এর আগে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেওয়া এবং দেশটিকে ব্যক্তিগত শাসনের আদলে পরিচালনা করা জরুরি। তিনি দেখেছিলেন যে, পার্লামেন্টের অনেক সদস্য শরয়ী আইনের বিরোধী, আঞ্চলিকতা ও ভাষাগত সংকীর্ণতায় আক্রান্ত, অগভীর চিন্তার অধিকারী এবং ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবিত। তারা রাজনীতির গুঢ় রহস্য এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ। তদুপরি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও মতভেদ এতটাই প্রকট যে, তারা কোনো কার্যকর কৌশলের ওপর একমত হতে পারে না। তাই সুলতান ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে (১০ সফর ১২৯৫ হিজরি) পার্লামেন্টকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেন, যা গঠিত হওয়ার পর প্রায় চৌদ্দ মাস অতিবাহিত হয়েছিল। এরপর পার্লামেন্ট প্রায় সাড়ে ৩০ বছর স্থগিত থাকে। এ কারণে অধিকাংশ সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক এই সময়কালকে “স্বৈরাচারী যুগ” হিসেবে অভিহিত করেন। [২]

কিন্তু বাস্তবতা হলো, সুলতান মৃতপ্রায় উসমানীয় সাম্রাজ্যকে আরও ৩০ বছরের জীবন দান করেছিলেন। সুলতান না থাকলে উনবিংশ শতাব্দীতেই তুরস্কের সেই দশা হতো যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হয়েছিল। সুলতানই প্রথম শাসক নন যিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিলেন। বরং এর আগে ও পরে এমন ডজন ডজন ঘটনা ঘটেছে। জার্মানির শাসক ফন বিসমার্ক, যিনি জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত করার জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত, তিনি সুলতান আব্দুল হামিদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন: “যদি জাতীয় প্রতিনিধিদের চিন্তাধারা এক না হয়, তবে এমন পার্লামেন্টের ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে অনেক বেশি।” [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির: ৮/১৯৩; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়া মিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩১০-৩১১; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১১৫।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির: ৮/১৯৮; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১১৬।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১১৮।

২৩৭

সুলতান আব্দুল হামিদ মৌলিকভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না, তবে তিনি এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলোর মদদপুষ্ট ও তাদের সমর্থনপুষ্ট লোকদের পার্লামেন্টে পৌঁছে জাতীয় সিদ্ধান্তের ওপর আধিপত্য বিস্তার করাকে সহ্য করতে পারতেন না। যদি নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির শুভাকাঙ্ক্ষীরা উসমানীয় সালতানাতের ক্ষমতায় আসত, তবে সুলতান আব্দুল হামিদের কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলো, বিশেষ করে ফ্রান্স ও ব্রিটেন, উসমানীয় সালতানাতের ওপর যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আক্রমণ চালাচ্ছিল এবং যে গণতন্ত্রের লালন-পালন করছিল, তা ছিল তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিক স্বার্থ হাসিলের জন্য, মুসলমানদের কল্যাণের জন্য নয়।

সান স্টিফানো চুক্তি এবং বার্লিন চুক্তি:

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং ব্রিটেনের চাপে রাশিয়া আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। মারমারা সাগরের নিকটবর্তী সান স্টিফানো নামক একটি শহরে তুরস্ক ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা সমবেত হন। রাশিয়া তার শর্তাবলী পেশ করে এবং হুমকি দেয় যে, যদি এগুলো হুবহু মেনে নেওয়া না হয়, তবে তারা ইস্তাম্বুলের ওপর আক্রমণ করবে। সন্ধির প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- জাবাল আসওয়াদ (মন্টিনিগ্রো)-এর সীমানা নির্ধারণ করে একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে। ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্রের যেকোনো সমস্যা রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া মিলে সমাধান করবে।
- সার্বিয়াকে আরও কিছু এলাকা প্রদান করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হবে। এর সীমানা নির্ধারণ রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে হবে।
- বুলগেরিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এটি তুরস্ককে একটি নির্ধারিত কর প্রদান করবে। এর সরকারি কর্মকর্তা ও সৈন্যরা হবে খ্রিস্টান। তুরস্ক ও রাশিয়া মিলে এর সীমানা নির্ধারণ করবে। সেখানকার শাসক হবে স্থানীয়। তুরস্ক তার সেনাবাহিনী চিরতরে বুলগেরিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেবে।
- রোমানিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হবে।
- তুরস্ক আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান ও সার্কাসিয়ার খ্রিস্টানদের সুরক্ষা দিতে বাধ্য থাকবে।
- তুরস্ক ক্রিট দ্বীপের খ্রিস্টানদের অবস্থার উন্নতি করবে।
- তুরস্ক যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ২৪ কোটি ৩১ লক্ষ ৭২ হাজার স্বর্ণ লিরা প্রদান করবে।
- যদি এই অর্থ পুরোপুরি পরিশোধ করা সম্ভব না হয়, তবে রাশিয়া এর সমমূল্যের তুর্কি ভূখণ্ড দখল করে নেবে।
- দার্দানেলেসসহ সমস্ত প্রণালী যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থাতেই রাশিয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
- উসমানীয় সালতানাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এলাকার মুসলমানরা তাদের জমি বিক্রি করে তুরস্কের যেকোনো অংশে চলে যেতে পারবে।

৩ মার্চ ১৮৭৮ (২৮ সফর ১২৯৫ হিজরি) তারিখে রাশিয়া সান স্টিফানোতে চুক্তির খসড়া তুর্কি প্রতিনিধি সাফওয়াত পাশা ও সাদুল্লাহ বে-র কাছে পেশ করে, যারা অশ্রুসজল চোখে এই লেখাটি পড়েন এবং এতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু সুলতান আব্দুল হামিদ এই চুক্তিকে উসমানীয় সালতানাতের জন্য মৃত্যুর সমতুল্য মনে করেছিলেন। যেহেতু এর অনুসমর্থন...

চুক্তির আগে কোনো আইনি মর্যাদা পাওয়া সম্ভব ছিল না, তাই চুক্তির অনুমোদনের আগে সে গোপনে ব্রিটেনের সাথে যোগাযোগ করে, যারা রাশিয়ার এই পর্যায়ে আধিপত্যকে তাদের বিশ্বব্যাপী লক্ষ্যের জন্য ক্ষতিকর মনে করত।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা তুরস্ককে সাহায্যের বিনিময়ে সাইপ্রাস দ্বীপে তাদের নৌঘাঁটি তৈরির অনুমতি চায়। সুলতান আব্দুল হামিদ বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করেন, তবে সাথে এই শর্ত জুড়ে দেন যে, যখন রাশিয়া ইস্তাম্বুলের প্রতিরক্ষা দুর্গ বাতুম এবং কার্স থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে, তখন ব্রিটিশ নৌবাহিনীও সাইপ্রাস খালি করে দেবে। এরপর তুরস্ক ও ব্রিটেনের মধ্যে এই গোপন চুক্তি সম্পন্ন হয় যে, যদি রাশিয়া ইস্তাম্বুল দখল করার চেষ্টা করে, তবে ব্রিটিশ বাহিনী তাকে প্রতিহত করবে।

ব্রিটেন তুরস্কের সাথে এই গোপন চুক্তি করে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে সাথে নেয় এবং সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুমূর্ষু তুরস্কের অবস্থা থেকে সবাই মিলে ফায়দা হাসিল করবে। রাশিয়ার ব্যবসায়ীদের এই ভোজ একাই হজম করতে দেওয়া হবে না।

এরপর ব্রিটেন ইউরোপীয় বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে রাশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে যেন সে সন্ধির শর্তাবলি ইউরোপীয় শক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন করে। এই সময়ে বুলগেরিয়ার মুসলমানরা রুশ বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা শুরু করেছিল, যার ফলে রুশদের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করে। ফলে রাশিয়া পুনরায় আলোচনায় বসতে রাজি হয়, যার ফলশ্রুতিতে বার্লিনে নিম্নোক্ত চুক্তিটি সম্পাদিত হয়:

- ১. বুলগেরিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। এর পূর্ব ও পশ্চিম সীমানা নির্ধারণে সার্বদের এবং উত্তর ও দক্ষিণ সীমানা নির্ধারণে তুরস্কের স্বার্থের কথা বিবেচনা করা হবে। ফলে এজিয়ান সাগরের উত্তর অংশ তুরস্কের কাছে থাকবে। দক্ষিণ বলকানকে “রুমেলি শারকি” নাম দিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে তুরস্কের অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা হবে, যার প্রধান হবে একজন খ্রিস্টান এবং তাকে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী সকল দেশের সম্মতিক্রমে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করা হবে। বুলগেরিয়ায় রাশিয়ার পঞ্চাশ হাজার সৈন্য অবস্থান করবে।
- ২. বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়ার অধীনস্থ রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হবে।
- ৩. যদিও এই বিবাদের সাথে গ্রিসের কোনো সম্পর্ক নেই, তবুও উত্তর দিকে তাকে “থিসালি” অঞ্চল দেওয়া হবে।
- ৪. “বেসারাবিয়া”-কে রোমানিয়া থেকে আলাদা করে রাশিয়ার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ৫. রোমানিয়াকে কিছু দ্বীপ দেওয়া হবে।
- ৬. আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ও সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো তা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

বার্লিন চুক্তি ১৩ জুলাই ১৮৭৮ (১৩ রজব ১২৯৫ হিজরি) তারিখে সম্পন্ন হয়। এই চুক্তির ফলে তুরস্ক তার ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে রোমানিয়া, দোব্রুজা, সার্বিয়া, নিশ, কারাদাগ, থিসালি এবং বুজাক হারায়। এটি ছিল মোট দুই লক্ষ সতেরো হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকা, যেখানে ৭৮ লক্ষের বেশি মানুষ বসবাস করত। [১]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৯৩ থেকে ১৯৫; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১১৯ থেকে ২৫৮।

বার্লিন চুক্তির প্রভাব:

বার্লিন চুক্তিকে আমরা ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দ (১১১০ হিজরি)-এর কার্লোভিটস চুক্তি এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের লন্ডন চুক্তির মধ্যবর্তী যোগসূত্র বলতে পারি। কার্লোভিটস চুক্তিতে তুরস্ককে প্রথমবারের মতো ইউরোপের কিছু অংশ হারাতে হয়েছিল। বার্লিন চুক্তিতে তাকে আরও পিছু হটতে হয় এবং লন্ডন চুক্তি তাকে বলকান থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করে দেয়। তা সত্ত্বেও যদি দেখা যায়, তবে সুলতান আব্দুল হামিদ যা করেছেন, সেই পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো আর কিছু করা সম্ভব ছিল না। তিনি সান স্টিফানো চুক্তির পরিবর্তে বার্লিন চুক্তি গ্রহণ করে অসাধারণ রাজনৈতিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তারকারী রাশিয়াকে আলোচনার টেবিলে অনেকটা পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী প্রচুর জানমালের শক্তি ব্যয় করেও রাশিয়ার হাতে ‘বেসারাবিয়া’ অঞ্চল ছাড়া আর কিছুই আসেনি। তুরস্ক, যে কেবল পুরো বলকানই হারায়নি বরং যার রাজধানীও বিপদের মুখে ছিল, তা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। বলকানে রোমানিয়া, সার্বিয়া এবং মন্টিনিগ্রো সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায় এবং বাকি রাষ্ট্রগুলোও অভ্যন্তরীণভাবে আরও স্বাধীনতা লাভ করে, তবে আইনি দিক থেকে বলকান আরও ৩৫ বছর পর্যন্ত তুরস্কের অংশ হিসেবেই ছিল।

ব্রিটিশ প্ররোচনায় ইস্তাম্বুলে বিদ্রোহের ব্যর্থ চেষ্টা:

রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে মধ্যস্থতা করার সময় ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কর্মকর্তারা বিভিন্ন বেশে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ভেতরে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং হস্তক্ষেপের সুযোগ অনবরত খুঁজছিল। আধুনিকতাবাদী তুর্কি সাংবাদিক আলী সাআভি ছিল তাদের অন্যতম প্রধান এজেন্ট, যে লন্ডনের মারিয়া নামক এক সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করেছিল।

সেই দিনগুলোতে বলকান থেকে অসংখ্য মানুষ হিজরত করে ইস্তাম্বুলে আশ্রয় নিয়েছিল। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স আলী সাআভিকে প্ররোচিত করল যেন সে এই শরণার্থীদের মাধ্যমে বিদ্রোহ ঘটায়, যার পর সুলতান আব্দুল হামিদের পরিবর্তে তার ভাই পঞ্চম মুরাদকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করা হবে। আলী সাআভি শরণার্থীদের সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে মারাত্মকভাবে খেপিয়ে তুলল এবং তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করে তাদের ‘চিরাগান প্রাসাদে’ হামলার জন্য প্রস্তুত করল, যেখানে পঞ্চম মুরাদ গৃহবন্দী ছিলেন।

২০ মে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ (১৭ জমাদিউল আউয়াল ১২৯৫ হিজরি) তারিখে আলী সাআভি শরণার্থীদের নেতৃত্ব দিয়ে চিরাগান প্রাসাদে পৌঁছাল। প্রাসাদের অধিকাংশ রক্ষী আগে থেকেই কেনা ছিল, তাই কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই জনতা প্রাসাদে প্রবেশ করল যাতে পঞ্চম মুরাদকে বের করে তার রাজত্ব ঘোষণা করা যায়। তবে সুলতানের কিছু অনুগত কর্মকর্তা প্রতিরোধও গড়ে তোলেন। এরই মধ্যে একটি লাঠি আলী সাআভির মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে সে প্রাণ হারাল। সরকারি বাহিনী দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। এই সংঘর্ষে আরও ২৩ জন বিদ্রোহী নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়।

সুলতান আব্দুল হামিদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, পঞ্চম মুরাদকে ভবিষ্যতেও বিদ্রোহের উচ্ছিন্না হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকবে। তাই বিদ্রোহ দমনের পর তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। বিশ্ব এই পদক্ষেপকে চরম জুলুম হিসেবে আখ্যায়িত করল, তবে এর চেয়েও বেশি...

আলী সাআভির মৃত্যুতে অনেক শোরগোল করা হয়েছিল কারণ তিনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন। সুলতানের শাসনের ত্রিশ বছরে তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও লেখায় এই ঘটনাটিকে “আলী সাআভি ট্র্যাজেডি” নামে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

এই ঘটনার শেষ দৃশ্যটি ছিল এমন যে, সাআভির ইংরেজ স্ত্রী মারিয়া বিদ্রোহের ব্যর্থতার খবর পাওয়া মাত্রই তার স্বামীর সমস্ত গোপন কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন এবং দ্রুত নিকটস্থ বন্দরে পৌঁছে যান যেখানে একটি নৌকা আগে থেকেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সুলতান আব্দুল হামিদ তাকে অনেক খুঁজেছিলেন কিন্তু সে লন্ডনে পৌঁছে গিয়েছিল। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে সে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার একজন গুপ্তচর ছিল এবং এই বিদ্রোহে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায় যে, এই বিদ্রোহে সদর-ই-আযম সাদিক পাশারও হাত ছিল, যাকে কিছুদিন আগেই ব্রিটেনের সুপারিশে এই পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সুলতানকে ব্রিটেনের সুপারিশ এই কারণে গ্রহণ করতে হয়েছিল যে, সেই সময়ে ব্রিটেনকে ছাড়া রাশিয়ার সাথে যুদ্ধবিরতির কোনো পথ খোলা ছিল না। [১]

গোয়েন্দা বিভাগ (মুখাবরাত) প্রতিষ্ঠা:

সুলতান আব্দুল হামিদ যখন পদে পদে শত্রুদের জাল বিছানো দেখলেন, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য একটি গোপন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল “মুখাবরাত”। এর সমস্ত ব্যবস্থাপনা সুলতানের হাতে ছিল। সুলতান এর মাধ্যমে প্রাসাদের ভেতর ও বাহির থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করেন, যার ফলে বিস্ময়কর সব তথ্য সামনে আসতে থাকে। জানা গেল যে, পুরো ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। এই পরিস্থিতির ওপর সুলতানের মন্তব্য ছিল এমন:

“আমার দাদা সুলতান তৃতীয় সেলিম বলতেন যে, বিদেশিদের হাত আমার কলিজার ওপর। কিন্তু আমি অনুভব করছি যে তাদের হাত আমার কলিজার ভেতরে, তারা আমাদের সদর-ই-আযম এবং উজিরদের পর্যন্ত কিনে নিয়েছে।” [২]

সুলতান আব্দুল হামিদের উদ্দেশ্য ছিল এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশকে শত্রুর এজেন্টদের থেকে মুক্ত করা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: “গোয়েন্দাদের মধ্যেও নিষ্ঠাবান ও মিথ্যাবাদী কর্মকর্তাদের চেনা জরুরি। এই কারণে আমি কোনো সংবাদের ওপর তদন্ত ও যাচাই-বাছাই ছাড়া বিশ্বাস করি না।”

“মুখাবরাত”-এর মাধ্যমে সুলতান শত্রুদের যেকোনো ষড়যন্ত্র সময়মতো মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। তিনি তাঁর শাসনের বাকি সময়ে অধিকাংশ বিদ্রোহ দমন করেন এবং কোনো গৃহযুদ্ধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেননি। তবে তিনি বিশ্বশক্তিগুলোর গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়ানো সেই প্রোপাগান্ডার মোকাবিলা করতে পারেননি যাতে তাঁর ক্রমাগত চরিত্রহনন করা হচ্ছিল। [৩]

মিদহাত পাশার পরিণতি:

সুলতান ষড়যন্ত্র নির্মূল করার লক্ষ্যে মিদহাত পাশার বিরুদ্ধেও প্রমাণ সংগ্রহ করেন। ১৮৮১ সালে তাকে

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওরতানা: ২/১১/১২১

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ: ৩০৬

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃ: ৩০৭, ৩০৮

সমস্ত সরকারি দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। তদন্তের ফলে তার বিরুদ্ধে কেবল বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে আঁতাতই নয়, বরং সাবেক সুলতান আব্দুল আজিজ হত্যার অভিযোগও প্রমাণিত হয়। আদালত ২৮ জুলাই ১৮৮১ (২৯ শাবান ১২৯৮ হিজরি) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

কিন্তু মিদহাত পাশার সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলি-র গভীর সম্পর্ক ছিল, যিনি মধ্যস্থতা করে মৃত্যুদণ্ডকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তন করিয়ে দেন। এরপর বিশ্ব সংবাদমাধ্যম মিদহাত পাশার মুক্তির জন্য একসুরে কথা বলতে শুরু করে। তাকে “স্বাধীনতার বীর” এবং “গণতন্ত্রের জনক” উপাধিতে ভূষিত করে বিখ্যাত করা হয় এবং সুলতান আব্দুল হামিদের ক্রমাগত চরিত্রহনন করা হয়।

আন্তর্জাতিক চাপের ফলে মিদহাত পাশার সাজা আরও কমিয়ে দেওয়া হয়। তাকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তায়েফের একটি দুর্গে নজরবন্দি করে রাখা হয়, যেখানে সে তার “আত্মজীবনী” লিখতে থাকে। পাশাপাশি সে বিপ্লবের জন্য চিন্তাভাবনা করছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা তাকে মুক্ত করার জন্য তৎপর ছিল। তাদের একটি দল আরবদের ছদ্মবেশে তায়েফে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ঠিক সময়ে তাদের মধ্য থেকে একজন ইংরেজকে ধরে ফেলে, যে পুরো পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়।

যেহেতু মিদহাত পাশার জীবিত থাকা এখন রাষ্ট্রের জন্য কোনো বড় ধরনের বিদ্রোহের কারণ হতে পারত, তাই ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের গ্রেপ্তারের পরপরই ৬ মে ১৮৮৪ (১০ জুলাই ১৩০১ হিজরি) উসমানীয় সৈন্যরা মিদহাত পাশার কক্ষে ঢুকে তাকে হত্যা করে। [১]

এটা স্পষ্ট নয় যে মিদহাত পাশাকে হত্যার নির্দেশ কে দিয়েছিল? যাই হোক, এই নির্দেশ সুলতানের ছিল না। সুলতান এই অভিযোগ জোরালোভাবে অস্বীকার করেছিলেন। সুলতান বলেছিলেন: “আমার মত এটাই ছিল যে, এমন একজন সুপরিচিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিকে যেন মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হয়। মিদহাত পাশাকে শহীদদের কাতারে शामिल করে আমার কী লাভ হতে পারত?” [২]

স্থানীয় কর্মকর্তারা নিজ উদ্যোগে এই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন নাকি কেউ তাদের এই নির্দেশনা দিয়েছিলেন—সেটা ভিন্ন কথা; যাই হোক, ফ্রিম্যাসনরির এই প্রতিনিধি এক শিক্ষণীয় পরিণতির সম্মুখীন হয়।

তিউনিসিয়া, মিশর এবং সুদানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দখলদারিত্ব

এই সময়ে ফ্রান্স এবং জার্মানি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার কারণে এই বিবাদ থেকে দূরে ছিল। তাই তাদের এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফ্রান্স এই ভাগাভাগিতে অংশীদারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। ফলে সে মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত ও বিলীন করার খেলায় নিজের অংশ আদায় করার জন্য এক অদ্ভুত অজুহাত তৈরি করে। সে ঘোষণা করে যে, তিউনিসিয়ার জনগণ আলজেরিয়ায় ফরাসি সৈন্যদের ওপর হামলায় জড়িত, তাই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিউনিসিয়া দখল করা ফ্রান্সের অধিকার।

[১] আদ-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৮৬, ঢাকা সহ; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১২৭।

[২] মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮।

এর পরে ১৮৮১ সালে (জমাদিউল আখিরা ১২৯৮ হিজরি) ত্রিশ হাজার ফরাসি সৈন্য তিউনিসিয়ার উপকূলে অবতরণ করে। তিউনিসিয়ার বাই (Bey) পরিবারের শাসকদের, যারা উসমানীয় সালতানাতের সাথে সংযুক্ত ছিল, বাধ্য করা হয়েছিল যাতে তারা একটি চুক্তির মাধ্যমে ফরাসি সৈন্য মোতায়নকে আইনি রূপ দেয়। ইউরোপীয় দেশগুলোও এই চুক্তিকে অনুমোদন দেয়। এভাবে আলজেরিয়ার পতনের মাত্র অর্ধ শতাব্দী পর তিউনিসিয়াও খিলাফতের হাত থেকে বেরিয়ে যায়।

খলিফা আব্দুল হামিদ কেন্দ্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও তিউনিসিয়া রক্ষার জন্য নৌ ও স্থল বাহিনী প্রেরণ করেন, যার ফলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে জার্মানি, যার সাথে ফ্রান্সের চরম শত্রুতা চলছিল, প্রথমবারের মতো তুরস্কের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং খলিফাকে পরামর্শ দেয় যে তিনি যেন একটি দূরবর্তী ফ্রন্টে সৈন্য পাঠিয়ে কেন্দ্রকে দুর্বল না করেন, বরং আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করেন। ফলে সেই নৌবহরকে পথ থেকেই ফিরিয়ে আনা হয়। তা সত্ত্বেও বাব-ই-আলী তিউনিসিয়ার ওপর ফ্রান্সের দখলদারিত্বকে কখনোই মেনে নেয়নি বরং একে জবরদখলকারী হিসেবে গণ্য করত। [১]

মিসরের পতন

মুহাম্মদ আলী পাশা তার বংশধরদের জন্য যে বিশাল ও মহিমাম্বিত মিসর রেখে গিয়েছিলেন, তা সুদান, ইরিত্রিয়া এবং উগান্ডা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দেশ চুক্তির দিক থেকে বাব-ই-আলীর সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু বাব-ই-আলী থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছিল না। ব্রিটেনের তুরস্কের কাছ থেকে সাইপ্রাস দখল করার পর মিসরের ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল, যেখানে মুহাম্মদ আলী পাশার নাতি খেদিভ ইসমাইল শাসক ছিলেন। আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার ওপর ফ্রান্সের দখলের পর ব্রিটেনের কাছে ভূমধ্যসাগরে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মিসর দখল করা জরুরি ছিল।

খেদিভ ইসমাইলের অপব্যয় মিসরকে ইউরোপের কাছে ঋণী করে তুলেছিল। বিশেষ করে সুয়েজ খাল খননের জন্য ব্রিটেন থেকে প্রচুর ঋণ নেওয়া হয়েছিল। দশ বছরে ঋণের পরিমাণ মোট ১০০ মিলিয়ন পাউন্ডে পৌঁছেছিল। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধের দাবি কঠোর হলে খেদিভ ইসমাইল সুয়েজ খালের মালিকানা পাওনাদারদের হাতে তুলে দেন। তা সত্ত্বেও তার ঋণ মাফ করা হয়নি।

২৫ জুন ১৮৭৯ সালে (৫ শাবান ১২৯৬ হিজরি) ব্রিটেনের ইশারায় খেদিভ ইসমাইলকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় এবং তার পুত্র খেদিভ তৌফিককে সিংহাসনে বসানো হয়, যার ওপর ব্রিটেন ও বাব-ই-আলী উভয়ই একমত ছিল। এই সময়ে ব্রিটেনের চাপে মিসরের দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য এবং কয়েক হাজার সামরিক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আরব। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে আহমদ উরাবি এই আদেশ মানতে অস্বীকার করেন। চারদিকে এই স্লোগান উঠতে থাকে যে মিসর মিসরীয়দের জন্য। এভাবে মিসরে তুর্কি ও আরবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়ে যায়। খলিফা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে আহমদ উরাবির সাথে যোগাযোগ করে তার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন এবং তাকে “পাশা” উপাধি দেন, কিন্তু মিসরে বর্ণবাদী ঘৃণার যে আগুন জ্বলে উঠেছিল তা নেভানো সম্ভব হয়নি।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ১৯৩/৮; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১৩২, ১৩৩/২। ১৯২৩ সালের লুসান চুক্তিতে তুরস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে তিউনিসিয়ার ওপর থেকে তার দাবি ত্যাগ করে।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ের জন্যই মিশর দখলের এটি ছিল সর্বোত্তম সুযোগ, কিন্তু তারা সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে এই জন্য বিরত ছিল যে, এভাবে মিশর দখলের চেষ্টায় উভয় দেশ একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে তারা খলিফাকে এই প্রস্তাব দিল যে, তিনি যেন সৈন্য পাঠিয়ে মিশরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে একটি নতুন রণাঙ্গনে ব্যস্ত রাখা, কারণ মিশরে মিশরীয় জাতীয়তাবাদের যে স্লোগান তৈরি হয়েছিল, এরপর তুর্কি বাহিনীকে সেখানে কখনোই স্বাগত জানানো হতো না। খলিফা এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। তিনি এটাও দেখছিলেন যে মিশর প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের দখলেই রয়েছে। সেখানে যে সরকারই আসুক না কেন, তা কেবল নামমাত্র হবে এবং ১০০ মিলিয়ন লিরার ঋণ তাকে কখনোই শক্তিশালী হতে দেবে না। তাই খলিফা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সেখানে সৈন্য পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। মিশরে তখন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ আহমদ উরাবির হাতে ছিল। ব্রিটেন তাকে আর বেশি সুযোগ দেয়নি, বরং জুলাই ১৮৮২ সালে (শাবান ১২৯৯ হিজরি) তাদের নৌবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করে। এরপর ১৩ সেপ্টেম্বর (২৮ শাওয়াল)-এর যুদ্ধে ইংরেজরা আহমদ উরাবিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মিশরকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। [১]

সুদান:

সুদানসহ পূর্ব আফ্রিকার অনেক দেশ উসমানীয় সালতানাতের যুগে মিশরের অধীনস্থ প্রদেশ হিসেবে গণ্য হতো। মিশরের ওপর দখলদারিত্বের কারণে ব্রিটেন সুদান ও পূর্ব আফ্রিকার এই সমস্ত এলাকাকে নিজেদের জায়গির মনে করে সেখানে দখলদারিত্বের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। তবে সুদানি মাহদী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে প্রায় পুরো সুদানকে মুক্ত করে নেন। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সুদানি মাহদী বিজয় লাভ করতে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন মিশরের খেদিভ বাহিনীর সাথে মিলে সুদানি মাহদীর শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এরপর পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোকে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং বেলজিয়াম নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। এভাবে সমস্ত ইউরোপীয় শক্তি উসমানীয় সালতানাতকে টুকরো টুকরো করে গ্রাস করার গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে সম্পন্ন করে। এরপর ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকার ইসলামি দেশগুলোতে গৃহযুদ্ধের উস্কানি দিতে থাকে যাতে তারা কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে না পারে। [২]

আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান এবং ইয়েমেনের বিদ্রোহ:

আর্মেনিয়া ছিল উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র যেখানে অধিকাংশ জনসংখ্যা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান। এই খ্রিস্টানদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার অর্জিত ছিল। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত স্বাধীনতা তাদের ছিল। কিন্তু রাশিয়া ও ব্রিটেন উভয়ই সেখানে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

১৮৮৬ সালে (১৩০৩ হিজরি) কিছু চরমপন্থী আর্মেনীয় সুইজারল্যান্ডে “হিনচাক” নামে একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে। যার উদ্দেশ্য ছিল আর্মেনীয় এলাকাগুলো থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা। এই সংগঠনের কর্মীরা সুযোগ পেলেই...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ৩/১৩৪-১৩৬।

[২] আল-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/১৯৩-১৯৭।

মুসলমানদের জনবসতিতে ঢুকে তারা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহগুলোতে অগ্নিসংযোগ করত। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করা, গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে ফেলা এবং জীবিত মানুষকে শলাকায় গেঁথে ঝলসানো ছিল তাদের প্রিয় শখ।

এই সন্ত্রাসবাদের পেছনে ছিল পশ্চিমা দেশগুলো। রাশিয়া আমেনিয়া থেকে উসমানীয়দের উচ্ছেদ করে সেখানে একটি পুতুল সরকার গঠন করে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত পৌঁছাতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ব্রিটেন পারস্য উপসাগরে পৌঁছানোর আগেই রাশিয়াকে থামানোর জন্য সেখানে নিজের পছন্দমতো সরকার গঠন করা জরুরি মনে করত। এজন্য বার্লিন চুক্তিতে একটি ধারা রাখা হয়েছিল যে, আমেনিয়াকে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক।

কিন্তু সুলতান আব্দুল হামিদ এর বাস্তবায়ন প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে, এটি মেনে নেওয়ার চেয়ে তিনি মৃত্যুকে প্রাধান্য দেবেন। এর একটি কারণ ছিল এই যে, আমেনিয়া হাতছাড়া হয়ে গেলে আনাতোলিয়া পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে অনিরাপদ হয়ে পড়ত। দ্বিতীয় কারণ ছিল এই যে, আমেনিয়ায় স্বাধীনতার পর খ্রিস্টানদের হাতে মুসলমানদের জান-মাল ও ইজ্জত পদদলিত হওয়া নিশ্চিত ছিল। তাই রাশিয়া ও ব্রিটেনের জেদ সত্ত্বেও সুলতান নিজেকে এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারিকে এই ধারা থেকে অব্যাহতি করিয়ে নেন।

এরপর বিশ্বশক্তিগুলো আমেনিয়ায় বিদ্রোহের আগুন আরও উসকে দিয়ে একে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান কেবল জেনারেল জাকি পাশার নেতৃত্বে “ফোর্থ আর্মি কোর”কে সক্রিয় করেননি, যার কেন্দ্র ছিল আনাতোলিয়া, বরং কুর্দি মুসলিম যুবকদের একটি আলাদা বাহিনীও তৈরি করেছিলেন যার নাম দেওয়া হয়েছিল “আল-খায়ালা আল-হামিদিয়া” (হামিদি অশ্বারোহী)। এই বাহিনী জায়গায় জায়গায় পৌঁছে আমেনীয় বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করেছিল।

ব্রিটিশ ও ফরাসি সংবাদপত্রগুলো এই পদক্ষেপগুলোকে খ্রিস্টানদের গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করে। ইউরোপে তোলপাড় সৃষ্টি হয় এবং সুলতান আব্দুল হামিদকে “আস-সুলতান আল-আহমার” (রক্তপিপাসু সুলতান) বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এই সময়ে ১১ মে ১৮৯৫ (১৬ জিলকদ ১৩১২ হিজরি) ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া যৌথভাবে একটি ঘোষণা জারি করে যে, সুলতান যেন বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী আমেনিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দেন এবং কুর্দি বাহিনীকে বাতিল ঘোষণা করেন।

সুলতান এখানে আবারও রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে নিজের সমর্থনে রাজি করান। যার ফলে ব্রিটেন ও রাশিয়ার দাবির গুরুত্ব কমে যায়।

যুদ্ধে ব্যর্থ হওয়ার পর আমেনীয়রা সরকারের নিন্দায় বিক্ষোভ শুরু করে। ২৬ আগস্ট ১৮৯৬ (১৬ রবিউল আউয়াল ১৩১৪ হিজরি) তারা ইস্তাম্বুলে একটি মিছিল বের করে যার অনেক সদস্য রাইফেল ও বোমা নিয়ে সজ্জিত ছিল। এমন সহিংস বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেও অভিযানে নামতে হয়, যাতে বিক্ষোভকারীদের লাশও পড়ে। যাই হোক, আমেনিয়ার বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দেওয়া হয় এবং খ্রিস্টান বিক্ষোভকারীরাও বিদেশি সাহায্যের অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়।

আজ যদি পূর্ব তুরস্কের এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তবে তা এই অবস্থানের ওপর সুলতানের অটল থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

অঞ্চলগুলো তুরস্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। [১]

গ্রিসের সাথে যুদ্ধ:

গ্রিস রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে থেসালি দখল করে নিয়েছিল এবং এখন তার নজর ছিল উসমানীয় সালতানাতের আরও অঞ্চলের দিকে, বিশেষ করে “ইয়ানিয়া” এবং ত্রিট দ্বীপের ওপর। সে এই অঞ্চলগুলোতে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল যারা তুর্কিদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য উস্কানি দিচ্ছিল। গ্রিস ইউরোপীয় জাতিগুলোর কাছে তুরস্ককে নিপীড়ক হিসেবে অভিযুক্ত করে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে মদদ দিতে শুরু করে।

সুলতান আব্দুল হামিদ জানতেন যে অবশিষ্ট কোনো খ্রিস্টান অঞ্চলের সাথে যুদ্ধের সময় ইউরোপীয় শক্তিগুলো বিদ্রোহীদেরই সমর্থন দেবে এবং যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা খুব কম থাকবে। তাই তিনি সাধারণত ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে বিদ্রোহ দমনে শক্তি প্রয়োগ এড়িয়ে চলতেন এবং সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে তাদের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে আসছিলেন।

তবে গ্রিসের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাই সুলতান যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রথমে সমস্ত গ্রিকদের দুই সপ্তাহের মধ্যে উসমানীয় সালতানাতের সীমানা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। গ্রিকরা এই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে এবং ১৪ এপ্রিল ১৮৯৭ (৮ রবিউল আউয়াল ১৩১৪ হিজরি) যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধের আগে সুলতান কূটনৈতিক ফ্রন্টে চেষ্টা করেছিলেন যাতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো গ্রিসের সাথে যোগ না দেয় এবং তিনি এতে সফল হন।

এরপর তুর্কি বাহিনী অগ্রসর হয়ে থেসালিতে পৌঁছায় এবং ১৮ এপ্রিল ১৮৯৭ (১৫ জিলকদ ১৩১৪ হিজরি) তারা “ফারসালা”র ময়দানে গ্রিকদের শেকড় উপড়ে ফেলে। পরের দিন তুর্কি বাহিনী “লোস কানি”তে পৌঁছায়। এখানে গ্রিকদের সাথে দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। এই ভয়াবহ যুদ্ধে তরুণ গ্রিক শাসক কনস্টানটাইন তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

তুর্কি বাহিনীর পতাকাবাহী জালাল পাশাসহ বহু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন, তবে শেষ পর্যন্ত ইসলামী লস্করই বিজয়ী হয়।

২৩ এপ্রিল (২১ জিলকদ) মুসলমানরা “তারখালা” দখল করে এবং পরের দিন “ইয়েনি শেহর”-এও উসমানীয় পতাকা উড়িয়ে দেয়। উভয় শহরেই বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করত যারা বিজয়ী বাহিনীকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানায়।

এই সময়ে গ্রিক শাসক কনস্টানটাইন বন্দরে গোলাবর্ষণ করে তুর্কিদের থামানোর চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন এবং ৫ মে (৩ জিলহজ) “দোমোকোস”-এর ময়দানে তাকে পিছু হটতে হয়।

এই সময়ে আমির আধাম পাশা ৪৮,০০০ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে “লামিয়া” জয় করে “দোমোকোস” পর্যন্ত পৌঁছে যান। ১৭ মে (১৫ জিলহজ) আধাম পাশা ৩৫,০০০ গ্রিককে তাদের পরিখা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। কনস্টানটাইন ঘোড়ায় চড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান এবং তুর্কিরা “দোমোকোস”-এ প্রবেশ করে। এভাবেই তুর্কিরা যুদ্ধে জয়লাভ করে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ২/১৩০, ১৩৩।

তারিখ-এ-উন্মতে মুসলিমা

তুর্কিদের পূর্বের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রদর্শনে ইউরোপীয় জাতিগুলো বিচলিত হয়ে পড়ে এবং তারা গ্রিসের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার জন্য প্রস্তুত হয়। ফলে ৩২ দিন পর যুদ্ধ থেমে যায়। তুর্কিরা দক্ষিণে দেড়শ কিলোমিটার পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়। উসমানীয় খিলাফত এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে দূতদের যাতায়াতের পর ‘কিয়াম-এ-আমান’ (শান্তি প্রতিষ্ঠা) শিরোনামে ইস্তাম্বুলে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৪ ডিসেম্বর ১৮৯৭ (৯ রজব ১৩১৫ হিজরি) তারিখে ইস্তাম্বুল চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থির করা হয়:

- “থিসালি” গ্রিসের অংশ হবে।
- “ক্রিট”-কে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। সেখানকার গভর্নর স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হবে। তুর্কি বাহিনী সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে।
- তুর্কিরা ষোলো বছর পর্যন্ত দ্বীপটি থেকে কর আদায় অব্যাহত রাখবে।
- গ্রিস যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তুর্কিকে “৪০ লক্ষ স্বর্ণ লিরা” প্রদান করবে।

এই চুক্তি ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইতালির চাপে হয়েছিল এবং তারা তা না মানার ক্ষেত্রে তুরস্কের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের হুমকি দিয়েছিল। তাই সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে এটি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এই সময়ে উসমানীয় সালতানাত দুর্বল ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, যেখানে উল্লিখিত চারটি শক্তি বিশ্বের অধিকাংশ অংশের ওপর দখলদার ছিল। যেকোনো সালতানাতের জন্য এমন পরিস্থিতিতে এটিই বড় বিষয় ছিল যে তারা তাদের সীমানা রক্ষা করতে পেরেছে। এটিই ছিল সুলতান আব্দুল হামিদের রাজনৈতিক কৌশল। সম্ভবত এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভবও ছিল না। [১]

কুর্দিস্তান ও ইয়েমেন:

ব্রিটেন গত পৌনে এক শতাব্দী ধরে তুরস্ক ও ইরানের সীমান্তে অবস্থিত কুর্দিস্তানের বিশাল এলাকায় গোত্রীয় নেতাদের ভাষা, ধর্ম ও বংশের নামে উস্কানি দিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করছিল। ইংরেজরা ইরাকের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কুর্দিস্তানকে উসমানীয় খিলাফত থেকে আলাদা করা জরুরি মনে করত। একইভাবে তারা ইয়েমেনকেও বিদ্রোহের মাধ্যমে আলাদা করার চেষ্টা করছিল যাতে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের পথ তাদের জন্য পুরোপুরি খুলে যায়।

সুলতান আব্দুল হামিদ তার গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্রগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এর মোকাবিলায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কুর্দিস্তানের বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধি দল পাঠান যারা গোত্রীয় নেতাদের ইসলামী ঐক্যের দাওয়াত দেন। এর ফল ইতিবাচক হয় এবং অধিকাংশ গোত্রীয় নেতা সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তুরস্কের সমর্থক হয়ে যান। সুলতান আব্দুল হামিদ খিলাফতের দরবার থেকে এই নেতাদের সাথে স্থায়ী যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন এবং কুর্দিদের সেনাবাহিনীতেও নিয়োগ দেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়েলমাজ ওজতুনা: ২/১৩৭, ১৪০।

...করে ইস্তাম্বুলের পূর্বে তাদের জন্য একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও সেনানিবাস নির্মাণ করান। আর্মেনিয়ার খ্রিস্টানরা দীর্ঘকাল ধরে কুর্দিস্তানে হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে আসছিল। সুলতান আব্দুল হামিদ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে কুর্দিস্তানের সীমান্তসমূহ নিরাপদ করেন। [১]

তিনি ইয়েমেনে ইংরেজদের আধিপত্য খতম করার জন্য তার সেরা জেনারেলদের: আহমদ মুখতার পাশা, তৌফিক পাশা এবং ফাওজি পাশাকে পাঠান এবং ব্রিটেনের সর্বাধিক চেষ্টা সত্ত্বেও ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধের আগুন আর জ্বলতে দেননি। তিনি ভবিষ্যতের জন্য ইয়েমেনে আট হাজার সৈন্যের একটি স্থায়ী বাহিনী মোতায়েন করেন। [২]

ম্যাসেডোনিয়ার বিদ্রোহ:

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশ ম্যাসেডোনিয়া তিনটি বড় জেলা: স্যালোনিকা (সেলানিক), কসোভো এবং মোনাস্টির নিয়ে গঠিত ছিল, যার আয়তন ছিল ৯৩ হাজার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষাধিক। এখানে পঞ্চাশ শতাংশ তুর্কি ও আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম ছিল, আর বাকিরা ছিল খ্রিস্টান, ইহুদি, গ্রিক এবং বুলগেরীয়দের মিশ্রণ।

বুলগেরিয়ার খ্রিস্টানরা দীর্ঘকাল ধরে তুরস্কের কাছ থেকে ম্যাসেডোনিয়া ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল। তারা ১৮৯৩ সালে (১৩১০ হিজরি) ম্যাসেডোনিয়ায় একটি বিদ্রোহী দল গঠন করে, যা গোপনে কাজ করতে থাকে। অবশেষে ১৯০৩ সালে (১৩২০ হিজরি) তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং জনপদে হত্যা ও লুণ্ঠনের রাজত্ব কায়েম করে। তবে সেপ্টেম্বর ১৯০৩ সালে (জমাদিউল আখিরা ১৩২০ হিজরি) তুর্কি বাহিনী সেখানে পৌঁছে যায় এবং এক মাসের অভিযানের পর বিদ্রোহীদের দমন করা হয়।

পরের বছর আগস্ট মাসে (জমাদিউল আউয়াল ১৩২১ হিজরি) বিদ্রোহীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু এবারও তাদের দমন করা হয়। এই যুদ্ধে তুরস্কের থার্ড আর্মিও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার তরুণ অফিসাররা পরবর্তীতে তুরস্কে পশ্চিমা ধাঁচের বিপ্লব নিয়ে আসে। ইউরোপীয় বিশ্ব তুর্কি বাহিনীর অভিযানকে খ্রিস্টানদের গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করে অনেক শোরগোল করে, যদিও বিদ্রোহীদের নৃশংস কর্মকাণ্ডে অসংখ্য মুসলিম নিহত হয়েছিল; কিন্তু বিশ্বে তখন কোন মুসলিম দেশ স্বাধীন ছিল যে এ বিষয়ে মুখ খুলবে? [৩]

মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের তুলনা

চতুর্দশ হিজরি শতাব্দীর শুরুতে এবং ঊনবিংশ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর শেষে মুসলিম বিশ্ব পতনের এমন এক পর্যায়ে ছিল যা এক শতাব্দী আগে কল্পনাও করা যেত না। অন্যদিকে খ্রিস্টান বিশ্ব তখন এমন এক শিখরে ছিল যার কোনো উদাহরণ অতীতে ছিল না। পুরো বিশ্বে স্বাধীন ইসলামি দেশ মাত্র তিনটি অবশিষ্ট ছিল: (১) তুরস্ক (২) ইরান (৩) আফগানিস্তান।

[১] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১৩১, ১৩২

[২] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ২৩৩

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১৯১

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা ২৪৮

অমুসলিম স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী: চীন, জাপান, থাইল্যান্ড। এই তিনটি মুসলিম এবং তিনটি বৌদ্ধ দেশ বাদ দিলে বিশ্বের মানচিত্রে যে দেশের ওপরই আঙুল রাখা হোক না কেন, তা ছিল খ্রিস্টান অথবা খ্রিস্টানদের গোলাম। খ্রিস্টান দেশগুলোর মধ্যে ছয়টি ছিল অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের: রাশিয়া, রোমানিয়া, সার্বিয়া, গ্রিস, মন্টিনিগ্রো, ইথিওপিয়া। বাকি সব ছিল ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট।

তিনটি স্বাধীন মুসলিম দেশের মধ্যে কেবল তুরস্ক ও আফগানিস্তান নিজেদের প্রতিরক্ষার সাহস রাখত, যেখানে ইরান বহিঃশক্তির চাপে ছিল। বাকি সমস্ত ইসলামী দুনিয়া ইউরোপীয় শক্তির দখলে ছিল।

রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তির বিচারে সে সময় বিশ্বের দশটি বড় শক্তির ক্রমবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:

- ১. ব্রিটেন
- ২. জার্মানি
- ৩. ফ্রান্স
- ৪. রাশিয়া
- ৫. আমেরিকা
- ৬. অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি জোট
- ৭. তুরস্ক
- ৮. জাপান
- ৯. ইতালি
- ১০. চীন

বিশ্বশক্তিগুলোর মধ্যে আয়তন, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে ব্রিটেন সবার চেয়ে এগিয়ে ছিল। শিল্প ও প্রযুক্তিতেও সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করত। তবে এই ময়দানে জার্মানি ও আমেরিকা তার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল তারা পুরো বিশ্বকে ছাড়িয়ে যাবে। জার্মানির স্থলবাহিনী বিশ্বের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে বিবেচিত হতো, যেখানে নৌ-শক্তিতে ব্রিটেনের পর দ্বিতীয় স্থানে ছিল। জার্মানির পর ফ্রান্স এবং তারপর রাশিয়ার সেনাবাহিনী সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। রাশিয়ায় কলকারখানা ও শিল্পের প্রাথমিক যুগ ছিল। এই ময়দানে প্রতিযোগিতার জন্য যে অর্থনৈতিক শক্তি এবং বৈজ্ঞানিক দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, রাশিয়া তখনও সেখানে পৌঁছাতে পারেনি।

জাপান, যা আগে একটি অপরিচিত দেশ ছিল, নৌবাহিনী এবং ভারী যন্ত্রপাতি তৈরিতে বিস্ময়কর উন্নতি করেছিল এবং বর্তমান চীনের বড় একটি অংশ দখল করে একটি বড় শক্তির মর্যাদা লাভ করেছিল। এখন সে এই চেষ্টায় ছিল যেন দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপ রুখে দেওয়া যায়।

আমেরিকা, যা আঠারো শতকে স্বাধীনতা লাভ করেছিল, দ্রুত উন্নতির শিখরে আরোহণ করছিল। যেখানে স্পেন বিশ্বশক্তিগুলোর কাতার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কারণ তার শক্তির ভিত্তি ছিল মূলত উপনিবেশগুলোর ওপর। যখন আমেরিকা কিউবা ও ফিলিপাইনসহ তার অধিকাংশ উপনিবেশ কেড়ে নিল, তখন স্পেন তার পুরনো সীমানায় সংকুচিত হয়ে বিশ্ব রাজনীতি থেকে ছিটকে পড়ল। ইতালি ইথিওপিয়ায় পরাজয় বরণ করা সত্ত্বেও তুরস্কের কাছ থেকে সোমালিয়া কেড়ে নিয়েছিল এবং এখন সে ত্রিপোলি (লিবিয়া) ও রোডস দ্বীপপুঞ্জ দখল করতে চাচ্ছিল।

তুরস্ক এই জরাজীর্ণ অবস্থায়ও বিশ্বের বড় শক্তিগুলোর মধ্যে সপ্তম ছিল। যেখানে চীনের অবস্থা তুরস্কের তুলনায় দুর্বল ছিল কারণ এই দেশ আধুনিক প্রযুক্তিতে অনেক পিছিয়ে ছিল। বড় শক্তিগুলো চীনকেও পদানত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা এর চেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল তুরস্ককে জয় করতে এবং সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে, কারণ তুরস্ক সে সময় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র ছিল।

এটি ছিল শেষ দুর্গ এবং সুলতান আব্দুল হামিদ ছিলেন এর শেষ সশস্ত্র সৈনিক। বিশ্বশক্তিগুলোর বিশ্বাস ছিল যে সুলতান পতনের সাথে সাথেই তুরস্কও নতি স্বীকার করবে এবং তখন পুরো বিশ্ব তাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

এই পরিস্থিতিতে যদি তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ শুরু হতো, যার অজুহাত তৈরি করা ইউরোপের জন্য কোনো কঠিন কাজ ছিল না, তবে তুরস্কের পরাজয়ের প্রবল আশঙ্কা ছিল। তাই সুলতান আব্দুল হামিদ মনে করলেন যে, যথাসম্ভব আরও যুদ্ধ এড়িয়ে চলা প্রয়োজন এবং এর জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে মিত্র বানানো উচিত।

তুরস্কের সবচেয়ে পুরনো মিত্র ছিল ফ্রান্স, যার সাথে সুলাইমান আল-শানের আমলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং আড়াই শতাব্দী পর্যন্ত তা বজায় ছিল। আঠারো শতকের শেষের দিকে মিশরে নেপোলিয়নের আক্রমণের পর এই বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায় এবং ফ্রান্সের জায়গায় ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তবে সুলতান আব্দুল আজিজের আমলে ব্রিটেনের কুৎসিত চেহারাও স্পষ্টভাবে সামনে চলে এসেছিল। তাই সুলতান আব্দুল আজিজ ব্রিটেনের পরিবর্তে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে শুরু করেন, কিন্তু মিদহাত পাশা তার তখত উল্টে দেন।

সুলতান আব্দুল হামিদ কোনো ইউরোপীয় শক্তির ওপরই আস্থা রাখতেন না, তবে তিনি জানতেন যে জার্মানি বহু শতাব্দী ধরে কোনো মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়নি, যেখানে ইসলাম বিদ্বেষের ক্ষেত্রে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া এবং ইতালিকে একই কাতারে দেখা যেত। এদিকে জার্মানিও তুরস্ককে মিত্র বানানো জরুরি মনে করত, কারণ ব্রিটেনের নেতৃত্বাধীন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দলের সাথে তাদের তীব্র বিরোধ চলছিল। ফলে এই পরিবেশে জার্মানি ও তুরস্ক ধীরে ধীরে কাছাকাছি আসতে থাকে। প্রথমবারের মতো ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে (রবিউল আউয়াল ১৩০৭ হিজরি) জার্মান রাজপুত্ররা ইস্তাম্বুল সফর করেন এবং সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এরপর আরও অনেক সাক্ষাৎ হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে জার্মানি ও তুরস্ক শক্তিশালী মিত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়। [১]

সাম্রাজ্যবাদের উত্থান:

এখানে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর জবরদখলমূলক অগ্রযাত্রা এবং ইসলামি সরকারগুলোর পতনের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাত করা সমীচীন হবে:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়া মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং একের পর এক বেশ কয়েকটি ইসলামি রাষ্ট্র দখল করে নেয়। গাজী মুহাম্মদ, “হামজা বে” এবং ইমাম শামিলের মতো মুজাহিদগণ বছরের পর বছর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান, কিন্তু এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত বাইরের মুসলিম দেশগুলোর উদাসীনতার কারণে সমাপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে রাশিয়া অত্যন্ত দ্রুততার সাথে মাওরাউন নাহরের ইসলামি রাষ্ট্রগুলো দখল করতে থাকে। ১৮৬৪ সালে ককেশাস, ১৮৬৭ সালে তাসখন্দ, ১৮৬৮ সালে বুখারা, ১৮৭৩ সালে খিভা এবং ১৮৮৪ সালে “মার্ত” রাশিয়ার সামনে নতি স্বীকার করে।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ৩/ ১৩৫, ১৫০।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা

ব্রিটেন উপমহাদেশের উপকূল থেকে মধ্যবর্তী প্রদেশগুলোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করা হয় এবং হিন্দুস্তান সরাসরি ব্রিটিশ রাজের অধীনে চলে যায়। ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিশরও দখল করে নেয়।

ফ্রান্স ১৮৩০ সালে উসমানীয় প্রদেশ আলজেরিয়া, ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া, ১৮৮৪ সালে সেনেগাল ও মাদাগাস্কার এবং ১৯১২ সালে মরক্কোকে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

ইতালি আফ্রিকার ইসলামি দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে ১৮৮০-এর দশকে সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯১১ সালে ত্রিপোলি (লিবিয়া) দখল করে নেয়।

সুলতান আব্দুল হামিদ, প্রাচীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং নতুন লক্ষ্যসমূহ:

রাশিয়ার কাছে পরাজয় এবং বার্লিন চুক্তির পর সুলতানের পূর্ণ মনোযোগ জাতিকে তুফানি পরিস্থিতি থেকে নিরাপদে বের করে আনার দিকে নিবদ্ধ হয়। সময় ছিল কম এবং কাজ ছিল অনেক বেশি। তিনি পশ্চিমা ভাবধারায় পুষ্ট লোকদের উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করেন, খিলাফত পদকে সুসংহত করেন এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে সাধারণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তিনি পার্লামেন্ট স্থগিত করেছিলেন কিন্তু মূল সংবিধান বাতিল করেননি, বরং প্রতি বছর সরকারি কর্মকাণ্ডের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে সংবিধানের কার্যকারিতা বজায় রাখেন। উচ্চকক্ষ বা সিনেটকেও নামমাত্র বহাল রাখা হয়েছিল, যদিও এর কোনো অধিবেশন আহ্বান করা হতো না। প্রকৃতপক্ষে সুলতান তার পূর্বসূরি মাহমুদ ও তুঘানির আমলের ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থার দিকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তবে এটা স্পষ্ট যে, সেই সময়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মেজাজ যে দিকে মোড় নিয়েছিল, তাতে এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে পুনরায় জনপ্রিয় করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। দেশি ও বিদেশি সংবাদমাধ্যম একে “স্বৈরতন্ত্র” (আমরিত) নাম দিয়ে জনগণকে সহজেই সুলতানের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছিল। এর পরিবর্তে সুলতান যদি জনগণের প্রতিনিধিত্ব এবং জাতীয় শুরার কোনো বিকল্প ব্যবস্থা পেশ করতেন, অথবা এই সংসদীয় ব্যবস্থাকে এমনভাবে ইসলামি ছাঁচে ঢালতেন যাতে ইসলামপন্থীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে সম্ভবত বিদেশি এজেন্ট এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণি তার বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে সফল হতো না। [১]

সুলতান আব্দুল হামিদের আন্দোলন, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া:

দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ মুসলিম বিশ্বের মজলুম মুসলমানরা সুলতান আব্দুল হামিদের প্রতি অনেক আশা পোষণ করতেন এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সুলতান তার দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি করেননি। তিনি আঞ্চলিক ও ভাষাগত সীমানার উর্ধ্ব উঠে মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে সাধারণ করার সংকল্প করেন এবং এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য “আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া” (প্যান-ইসলামিজম) এর মতো কার্যকর আন্দোলন শুরু করেন। নিঃসন্দেহে এটি সুলতানের দায়িত্ববোধ ও দূরদর্শিতারই বহিঃপ্রকাশ ছিল। এ বিষয়ে সুলতানের চিন্তাধারার প্রতিফলন তার নিচের বক্তব্যগুলো থেকে ফুটে ওঠে:

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৬৭, ১৯৮; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/১১৬।

১. “উসমানীয় খিলাফতে তুর্কি, আরব, আলবেনীয়, বুলগেরীয়, গ্রীক, হাবশি এবং অন্যান্য জাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম আমাদের একটি পরিবারে পরিণত করে রেখেছে।”

২. “আমাদের জন্য আবশ্যিক হলো বাকি মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ মজবুত করা, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আমাদের ওপর আবশ্যিক হলো আমরা একে অপরের যতটা সম্ভব নিকটবর্তী হই। এই ঐক্য ছাড়া আমাদের ভবিষ্যতের কোনো আশা নেই।”

৩. “ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম দুটি ভিন্ন আদর্শ, যাদের একটি সভ্যতায় একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।”

৪. “ইংরেজরা মিশরীয়দের মন-মানসিকতা নষ্ট করে দিয়েছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধর্মের ওপর জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয় এবং মনে করে যে মিশরীয় সভ্যতার সাথে ইউরোপীয় সভ্যতার ঐক্য সম্ভব।”

৫. “মিশরের আধুনিকতাবাদীরা ইংরেজদের হাতের পুতুল, আর এই কারণেই তারা ইসলামি খিলাফতকে ধ্বংস করতে এবং খিলাফতের পদের মর্যাদা নষ্ট করার চেষ্টা করছে।” [১]

এই চিন্তাধারার ফলে ‘তাহরিকে আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া’ (প্যান-ইসলামিক মুভমেন্ট)-এর ভিত্তি রাখা হয়েছিল যার ইশতেহার ছিল নিম্নরূপ:

- (১) সমস্ত মুসলিম জামাত ও দলগুলোকে খিলাফতের অধীনে একত্রিত করা।
- (২) খিলাফতের কেন্দ্র এবং সমস্ত প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ মজবুত করা।
- (৩) পশ্চিমা সংবিধান ও আইনের বিকল্প হিসেবে ইসলামি সংবিধান পেশ করা।
- (৪) সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমানদের সমস্ত সক্ষমতাকে কাজে লাগানো এবং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। [২]

ইসলামি জাগরণের জন্য সুলতানের অবদান:

সুলতান আব্দুল হামিদ মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ মজবুত করার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে দ্রুততর যোগাযোগ ব্যবস্থা কয়েম করার পাশাপাশি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ এই নিয়েছিলেন যে, আরবিকে উসমানীয় সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা ঘোষণা করে এর সর্বোচ্চ প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেন। উসমানীয়দের ইতিহাসে এই পদক্ষেপ প্রথমবারের মতো নেওয়া হয়েছিল। সরকারি কর্মকর্তা ও অভিজাতদের সন্তানদের পশ্চিমা প্রভাব থেকে বাঁচাতে এবং উন্নত শিক্ষা প্রদানের জন্য ইস্তাম্বুলে একটি বিশাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য সুলুক ও ইহসানের সিলসিলাসমূহকে উৎসাহিত করতে, খানকাহসমূহ উন্মুক্ত করতে এবং মাশায়েখদের থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করেন। নতুন মসজিদ নির্মাণ এবং পুরাতন মসজিদসমূহের মেরামত ও সংস্কারের দিকেও মনোযোগ দেন।

সুলতান ইসলামি বিশ্বে ইলমি ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী ওলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদেরকে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোত্রকে ইসলামি সংহতির দাওয়াত দিতে, ইসলামি উলুমের প্রচার করতে, দ্বীনি দরসগাহ...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩১৭-৩১৮; মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ, পৃষ্ঠা: ২২-২৩ এর বরাতে।

[২] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ, পৃষ্ঠা: ১২৬।

২৫২ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা | পঞ্চম খণ্ড

পুরানো ইসলামী কিতাবসমূহ বিশেষ করে মূল উৎসসমূহ উন্মুক্ত করে সেগুলোকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করা। পশ্চিমের আদর্শিক যুদ্ধের মোকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতি এবং পশ্চিমের বস্তুবাদী মতাদর্শের বিপরীতে ‘মুসলিম জাতীয়তাবাদ’ (মুসলিমিয়াত)-এর ফ্রন্ট গঠন করা।

এই যুগের অনেক আলেম, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিক সুলতান আব্দুল হামিদের এই আন্দোলনে शामिल হন এবং উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মোকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক মুজাহিদদের ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে আমির শাকিব আরসালান, মুহাম্মদ আকিফ, মোস্তফা কামিল এবং শেখ আলী ইউসুফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [১]

উপমহাদেশে এই চিন্তা ও দর্শনের প্রতিফলন আল্লামা শিবলী নোমানী, খাজা আলতাফ হোসেন হালী, লিসানুল আসর আকবর এলাহাবাদী এবং আল্লামা ইকবালের কাজে দেখা যায়।

জামাল উদ্দিন আফগানী এবং সুলতানের নৈকট্য ও মতপার্থক্য:

এই যুগের বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানী (১৮৩৮ খ্রি. থেকে ১৮৯৭ খ্রি.) সুলতান আব্দুল হামিদের এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন। আল্লামা আফগানীকে এই যুগে ইসলামী জাগরণের অগ্রদূত মনে করা হয়। তিনি পশতু, ফারসি, আরবি, তুর্কি, রুশ, ইংরেজি এবং ফরাসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়াও পশ্চিমা চিন্তাধারা ও দর্শনের ওপর গভীর পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি এগারো বছর আফগান দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। এরপর বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে স্বদেশ ত্যাগ করেন। এরপর হিন্দুস্তান, ব্রিটেন এবং মিশরসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থান করেন। তাকে অনেকবার বিভিন্ন দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে লন্ডনে অবস্থানকালে তিনি “আল-উরওয়াতুল উসকা” নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। জীবনের শেষ পাঁচ বছর তিনি খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে অতিবাহিত করেন এবং সুলতান আব্দুল হামিদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৮৯৭ সালে তিনি সেখানেই ইন্তেকাল করেন। সুলতান আব্দুল হামিদ সম্পর্কে জামাল উদ্দিন আফগানীর বক্তব্য ছিল:

“যদি সুলতান আব্দুল হামিদকে বর্তমান যুগের চারজন ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়, তবে সুলতান তার মেধা, চতুরতা, রাজনীতি জ্ঞান এবং বিশেষ করে তার সঙ্গীদের আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবেন।”

আল্লামা আফগানী আরও বলতেন:

“সুলতানের সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা, পশ্চিমা ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য সতর্কতা, সদিচ্ছা এবং খেলাফতের এই উন্নতির প্রচেষ্টা যার ওপর মুসলমানদের সাধারণ উত্থান নির্ভরশীল, আমাকে তার হাতে বায়াত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমি তার খেলাফত ও সালতানাতের বায়াত গ্রহণ করেছি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যে প্রাচ্যের ইসলামী দেশগুলো ইউরোপের কবল থেকে, ইসলামী বিশ্বের আরও বিভক্তি এবং তাদের একের পর এক লাঞ্ছনা থেকে কেবল তখনই রক্ষা পেতে পারে যখন তারা সাধারণভাবে সচেতন হবে এবং খলিফা-এ-আজমের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে।” [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, লেখক: আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ২১৯, ২২০

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, লেখক: আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৩২২

তবে ইসলামী ঐক্যের আহ্বানে সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে থাকা সত্ত্বেও জামাল উদ্দিন আফগানী পুরোপুরি সুলতানের সমমনা ছিলেন না। যদিও তিনি ইসলামী ঐক্যের ডাক দিচ্ছিলেন, কিন্তু উত্তর আফ্রিকার ওপর ফ্রান্সের জবরদখলের বিরুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। একইভাবে তিনি মধ্য এশিয়ার ওপর রাশিয়ার দখলের বিরুদ্ধে ছিলেন না, বরং তার পক্ষ থেকে রাশিয়াকে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছিল যে, তারা যদি উন্মুক্ত সমুদ্রে পৌঁছানোর জন্য হিন্দুস্তান দখল করতে চায়, তবে তাদের উচিত এই উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান ও ইরানের সাহায্য নেওয়া এবং তাদের বিজয়ের লভ্যাংশে অংশীদার করা। পরবর্তীতে এটিও প্রকাশ পায় যে, তিনি চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নামে তুর্কি জাতিসমূহ এবং উসমানীয় কর্মকর্তাদের সুলতানের রণকৌশলের বিরুদ্ধে বিমুখ করে তুলছিলেন। তার অবস্থান ছিল এই যে, ক্ষমতা যেন একক ব্যক্তির হাতে না থাকে।

এরই মধ্যে ইস্তাম্বুলের রক্ষণশীল উলামায়ে কেরাম আল্লামার আকিদা ও মতাদর্শের ওপর আপত্তি তোলা শুরু করেন। শেখ খলিল আল-ফাওজি “আস-সুযুফুল কাওয়াতি” নামক গ্রন্থে আল্লামার অনেক মতাদর্শের কঠোর প্রতিবাদ করেন।

সুলতান আব্দুল হামিদ সময়ের উপযোগিতা বিবেচনা করে এক সময় পর্যন্ত আল্লামা আফগানীকে উম্মাহর ঐক্যের জন্য ব্যবহার করেন, কিন্তু জামাল উদ্দিন আফগানীর চিন্তাধারা ধীরে ধীরে সুলতানের থেকে ভিন্ন হতে থাকে। এমনকি তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মিস্টার ব্লাণ্টের সাথে মিলে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। পরিকল্পনা ছিল এই যে, খিলাফতকে তুর্কিদের থেকে সরিয়ে আরবদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে ষড়যন্ত্রটি সময়মতো ফাঁস হয়ে যায় এবং জামাল উদ্দিন আফগানীকে নজরবন্দি করা হয়। অবশেষে ইস্তাম্বুলে নজরবন্দি অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

আল্লামা আফগানীকে যেখানে একজন মহান চিন্তাবিদ হিসেবে জানা যায়, সেখানে তাকে ফ্রিম্যাসনরির গুপ্তচর এবং সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ারও বলা হয়। এতটুকু নিশ্চিত যে, পশ্চিমা চিন্তা ও দর্শন অধ্যয়ন করতে করতে তিনি পুরোপুরি আধুনিকতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তাই তার কিছু মতামত প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। ফলে তার বিতর্কিত চিন্তাধারা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। [১]

আল্লামা আফগানী ও সুলতানের মতপার্থক্যের একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, আল্লামা আফগানী প্যান-ইসলামিজম আন্দোলনে শিয়াদেরও এমনভাবে একীভূত করতে চেয়েছিলেন যাতে আহলে সুন্নাহ ও আহলে তাশাইয়ুর পার্থক্য শেষ হয়ে যায়। সুলতানের কাছে শিয়া ও আহলে সুন্নাহের আদর্শিক দূরত্ব ও ধর্মীয় পার্থক্য ছিল একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা এবং প্যান-ইসলামিজম আন্দোলনেও এর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যিক ছিল। সুলতানের মতে শিয়াদের সাথে ঐক্য কেবল রাজনৈতিক ভিত্তিতে হওয়া উচিত ছিল, ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়। [২]

আল্লামা আফগানী সম্পর্কে সুলতান আব্দুল হামিদের এই মন্তব্যগুলো প্রাণিধানযোগ্য:

“আমি জামাল উদ্দিন আফগানীকে কাছ থেকে চিনি। তিনি মিশরে ছিলেন। তিনি একজন বিপজ্জনক লোক ছিলেন। তিনি...”

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ২১৯-২২৩।

[২] আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, মুহাম্মদ হারব, পৃষ্ঠা: ১৮১।

মেহেদী হওয়ার দাবিদারও ছিলেন। একবার তিনি আমার সামনে প্রস্তাব রাখলেন যে, তিনি মধ্য এশিয়ার সমস্ত মুসলমানদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন। আমি জানতাম যে তিনি তা করতে পারবেন না। তিনি ইংরেজদের চর ছিলেন। এই বিষয়ে প্রবল সম্ভাবনা ছিল যে ইংরেজরা তাকে আমার গোয়েন্দাগিরির জন্য নিযুক্ত করেছে। আমি আফগানির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তিনি ব্রিটেনের সাথে আঁতাত করেন। আমি আবুল হুদা আল-সাইয়াদির মাধ্যমে তাকে ইস্তাম্বুলে আসার দাওয়াত দিই এবং তারপর তাকে আর যেতে দিইনি এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। [১]

খানকাহসমূহের বৈশ্বিক বলয়:

সুলতান আব্দুল হামিদ বিশ্ব মুসলিমকে এক সুতোয় গাঁথার জন্য মক্কা ও হারামের মাশায়েখদের তত্ত্বাবধানে ‘তাহরিকে ইত্তিহাদে ইসলামি’ (প্যান-ইসলামিক মুভমেন্ট)-এর একটি স্থায়ী বিভাগ কয়েম করেন এবং এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা খানকাহগুলোকে খেলাফতের কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত করেন। এই সিলসিলায় মক্কা ও হারামের মাশায়েখ ছাড়াও নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, শায়লিয়া এবং রিফাইয়া সিলসিলার বুজুর্গদের সহযোগিতা লাভ করা হয়। প্রতি বছর হজ ও ওমরাহ এবং রওজায়ে রাসুলের জিয়ারতের জন্য লাখ লাখ মুসলমান মক্কা ও মদিনায় আসতেন। একইভাবে উত্তর আফ্রিকা থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার জিয়ারতকারী হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানির মাজারে হাজিরা দেওয়ার জন্য বাগদাদে আসতেন। মক্কা, মদিনা ও বাগদাদে তাদের মনস্তাত্ত্বিক গঠন তৈরি করা হতো এবং তারা নিজ নিজ খানকাহে ফিরে গিয়ে বাকি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও খেলাফতের সমর্থনের প্রেরণা জাগ্রত করতেন। এই আন্দোলনের ধারা দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং চীন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার খানকাহ এই আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানরা এতটাই সুসংগঠিত হয়ে যায় যে, খেলাফত কেন্দ্রের ইশারা পেলে তারা ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে পারত। যদিও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো অনেক কেন্দ্রের সন্ধান পেয়ে বিপুল সংখ্যক উলামা ও মাশায়েখকে শহীদ ও গ্রেফতার করেছিল, কিন্তু কিছু কেন্দ্র তবুও নিরাপদ ছিল এবং কোনো না কোনোভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। [২]

সুলতান মাশায়েখ ও সুফিদের একটি প্রতিনিধি দল ভারতেও পাঠিয়েছিলেন যাতে উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের ভিত উপড়ে ফেলা যায় এবং ইসলামি খেলাফত খতম করার স্বপ্ন পূরণ হতে না দেওয়া হয়। [৩] এটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। এটি সেই সময় ছিল যখন দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবি, হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান এবং হাজি সাহেব তুরাঙ্গজাই হজের উদ্দেশ্যে হিজাজে গিয়েছিলেন। এই কাফেলা হজের ফরজ আদায়ের পাশাপাশি মক্কা মোয়াজ্জামায় হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার হাতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করেন। [৪]

[১] মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ আল-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১৩৮।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬।

[৩] সুলতান আব্দুল হামিদ আল-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১৯৮।

[৪] হাজি সাহেব তুরাঙ্গজাই, আজিজ জাভেদ: পৃষ্ঠা ১৩১।

দ্রষ্টব্য: এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সুলতান আব্দুল হামিদের পক্ষ থেকে ভারত সফরকারী প্রতিনিধি দলের আমন্ত্রণে এই ব্যক্তিবর্গ হিজাজে গিয়েছিলেন... (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)।

ইউরোপীয় এজেন্টদের পক্ষ থেকে হজ্জের আবশ্যকতা বাতিলের ফতোয়া কেন দেওয়া হয়েছিল?

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সুলতান আব্দুল হামিদের এই গোপন নেটওয়ার্ক নস্যাৎ করার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তারা কোনো সাফল্য পায়নি কারণ এই আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল মক্কা যেখানে মুসলমানরা যেকোনো মূল্যে হজ্জের জন্য যেতেন। তাদের এই দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখার কোনো অজুহাতও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো কিছু দুনিয়ালোভী গদিনশীন এবং আলেমকে অর্থ-সম্পদ ও পদের মাধ্যমে নিজেদের সাথে যুক্ত করে এবং তাদের মাধ্যমে এই ফতোয়া প্রচার করায় যে, বর্তমানে অশান্তি ও মহামারীর কারণে হজ্জ যাবতীয় আত্মহত্যার শামিল, তাই হজ্জের আবশ্যকতা বাতিল হয়ে গেছে। [১]

এই যুগে অনেক সুফি সিলসিলা এবং অসংখ্য মাশায়েখ বিদআত ও কুসংস্কারে লিপ্ত ছিলেন কিন্তু সুলতান আব্দুল হামিদ রাজনৈতিক কৌশলের কারণে এসব বিষয় উপেক্ষা করেন এবং কোনো ভেদাভেদ ছাড়াই সমস্ত খানকাহ ও সিলসিলাকে আন্দোলনের অংশ করার চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু প্রথা পূজারী মাশায়েখরা দীর্ঘ সময় ধরে ত্যাগ ও কুরবানির ওপর ভিত্তি করে এই আন্দোলনের সাথে থাকতে পারেননি। তাই এই আন্দোলন প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলপ্রসূ হতে পারেনি। [২]

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার মোকাবিলা:

সুলতান আব্দুল হামিদ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে হুবহু গ্রহণ করা প্রতিরোধ করেন এবং সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রমে অপরিহার্য পরিবর্তন আনেন। ফিকহ, তাফসীর এবং ইসলামী আখলাক বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কুপ্রভাব রোধ করার আশ্রয় চেষ্টা করেন। সেই সময়ে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বড় শহরগুলোতে বিশেষ করে ইস্তাম্বুলে বেপদা হওয়া সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান অক্টোবর ১৮৮৩ সালে (জিলহজ্জ ১৩০০ হিজরি) একটি আদেশ জারি করে নারীদের শরীয়ত বিরোধী পোশাক পরিধান এবং বেপদা হয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করেন এবং তাদের বাধ্য করেন যেন তারা রাস্তায় বের হওয়ার সময় পূর্ণ শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা করেন। [৩]

সুলতান নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, বরং তিনি ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে কর্মরত নারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি দারুত তারবিয়াত খোলেন।

সুলতান রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণকে মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর মনে করতেন। সুলতান তার...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার টীকা অংশ) ...হন। কারণ হিজাজ থেকে ভারতে ফিরে এসে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গোপনে কাজ চালিয়ে যান। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান প্রতি বছর হিজাজের দ্বিতীয় সফর করে তুর্কি সরকারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে রেশমি রুমাল আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন যার উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি ও আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর বহিঃআক্রমণ এবং ভারতের জনগণের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা। এই আন্দোলনের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গেলে ব্রিটেন শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করে মাল্টা দ্বীপে বন্দি করে। মুক্তির পর শায়খুল হিন্দ ভারতে এসে খিলাফত আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে খিলাফত পদ টিকিয়ে রাখা কিন্তু আফসোস যে এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

বর্তমান পৃষ্ঠার টীকা:

[১] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, লেখক: মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১৯৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, লেখক: আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪২৫

[৩] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, লেখক: মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১০০

সং মাকেও প্রাসাদের বাইরে দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের অনুমতি দেননি। [১]

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা:

সুলতান সাম্রাজ্যে তুর্কি ও আরবদের মধ্যকার বিদ্বেষ দূর করার জন্য আরবদের সমান স্তরে উচ্চ পদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ইস্তাম্বুলে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “মাদরাসাতুল আশায়ের আল-আরাবিয়্যাহ” প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে আরব প্রদেশগুলোর ছাত্রদের যাতায়াত ও আবাসনসহ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। ইরাক, ত্রিপোলি (লিবিয়া), ইয়েমেন, হিজাজ এবং জর্ডান থেকে ছাত্ররা দলে দলে সেখানে ভর্তি হতে শুরু করে।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ছিল পাঁচ বছরের, যাতে কুরআন মাজিদ নাজেরা, তাজবিদ, ক্যালিগ্রাফি, ইসলামি ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত এবং সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি দ্বীনি জ্ঞান (প্রয়োজনীয় তাফসির, হাদিস ও ফিকহ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরবি সরফ ও নাহর সাথে তুর্কি, ফারসি এবং ফরাসি ভাষা লেখা, পড়া ও বলার অনুশীলনও করানো হতো। এই পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম শেষ করার পর ছাত্রদের ইখতিয়ার ছিল যে তারা উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ নেবে নাকি প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ। সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া ছাত্রদের শিক্ষা সমাপ্তির পর উচ্চ সামরিক পদে নিয়োগ দেওয়া হতো। প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠান “আল-মাদরাসাতুল মুলকিয়্যাহ” (রাজকীয় মাদ্রাসা) নামে পরিচিত ছিল, যেখানে এক বছরের পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার পর স্নাতকদের বিভিন্ন প্রদেশে প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করা হতো।

যেসব যুবক ইসলামের দাওয়াত ও প্রচারের ময়দানে জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখত, তাদের জন্য “মা’হাদুত তাদরিবুল ওয়াজ ওয়াল মুরশিদিন” প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানকার স্নাতকরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামি ঐক্য ও সংহতির দাওয়াত দিত। সুলতানের এই আন্দোলনের প্রভাব চীন পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং সেখানকার কোটি কোটি মুসলমান উসমানীয় খেলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। বেইজিংয়ের তিন ডজনেরও বেশি মসজিদে সুলতানের নামে খুতবা পড়া হতে শুরু করে। সুলতানের প্রচেষ্টায় বেইজিংয়ে একটি ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “আল-জামিআতুল হামিদিয়্যাহ” প্রতিষ্ঠিত হয়, যার দরজায় তুরস্কের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। [২]

তেল সম্পদ এবং সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের পরিকল্পনা:

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য সুলতান প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেন যে, চরম প্রয়োজন দেখা দিলেও আর কোনো বৈদেশিক ঋণ নেওয়া হবে না। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি ছিল শিল্পের উন্নয়ন ও বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা।

তবে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ছিল তেলের আবিষ্কার। এটি এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বশক্তিগুলো পরবর্তী শতাব্দীর পরিকল্পনা করে তেলের ভাণ্ডার দখলের জন্য ওত পেতে ছিল। ইংরেজরা আন্দাজ করেছিল যে আনাতোলিয়া, ইরাক, জাজিরাতুল আরব এবং মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রোলের বিশাল ভাণ্ডার লুকিয়ে আছে, কিন্তু তারা এই অঞ্চলগুলোতে এর সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, আস-সাল্লাবি: পৃ. ২২৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, আস-সাল্লাবি: পৃ. ২৩০-২২৮

তারা খনন কাজ করতে চেয়েছিল। সুলতানের উপস্থিতিতে এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন ছিল। তাই তারা এই অভিযানের নাম দিয়েছিল “প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান”। সুলতান এটি জানার জন্য যে ইংরেজদের আসল উদ্দেশ্য কী, এর অনুমতি দিয়ে দিলেন। আনাতোলিয়ার কায়সারী অঞ্চলে এবং ইরাকের মোসুল ও বাগদাদ জেলাগুলোতে খনন কাজ শুরু হলো। খননকালে প্রাপ্ত প্রাচীন পাত্র ও মুদ্রা ইত্যাদি তুর্কি কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করা হতে থাকল। এই সময়ে সুলতান তাদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা আসলে কী চায় তা জানা যায়।

একদিন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত সুলতান আব্দুল হামিদের দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে একটি প্রাচীন ধাঁচের তলোয়ার উপহার দিলেন যার হাতলে মূল্যবান মুক্তা খচিত ছিল। রাষ্ট্রদূত জানালেন যে এই অত্যন্ত প্রাচীন তলোয়ারটি উত্তর ইরাক থেকে পাওয়া গেছে। সুলতান নীরবতা অবলম্বন করলেন। পরে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানা গেল যে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি।

তারপর সুলতান একজন বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ীকে সেই তলোয়ারটি দেখালেন। তিনি জানালেন যে এটি খুব বেশি পুরনো নয়। সুলতান আন্দাজ করে নিলেন যে খনন কাজের মাধ্যমে ইংরেজদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু। কিছুদিন পর জানা গেল যে ব্রিটিশরা ওই এলাকাগুলোতে নিয়মিতভাবে কূপ খনন করতে শুরু করেছে। সুলতান তখনও নীরবতা বজায় রাখলেন যাতে দেখা যায় ব্রিটিশরা প্রতারণা কতদূর নিয়ে যায়।

এটি দেখে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সাহস আরও বেড়ে গেল। কিছু সময় পর তিনি আবেদন করলেন যে ব্রিটিশ সরকার জাজিরাতুল আরব এবং সিরিয়ার মরুভূমিতে (জর্ডান) মিষ্টি পানির সন্ধানে কূপ খনন করতে চায় যাতে মরুভূমির বাসিন্দাদের পানির কষ্ট দূর হয়। রাষ্ট্রদূত মানবতার দোহাই দিয়ে সুলতানের কাছে এই অভিযানের অনুমতি চাইলেন।

এখন সুলতানের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে পানির কূপের আড়ালে পেট্রোল বা তেলের সন্ধান করা হচ্ছে। ফলে সুলতান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে ইরাক ও আনাতোলিয়ায় যে কূপগুলো খনন করা হয়েছে সেগুলোও যেন ভরাট করে দেওয়া হয়। এই চাল ব্যর্থ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ক্ষোভে ফেটে পড়ল। [১] এটি ১৮৮৫ সালের ঘটনা। অন্যদিকে সুলতান কিছু খনিজ বিশেষজ্ঞকে ওই ভূমিগুলোতে গবেষণার কাজ অর্পণ করলেন। তারা জরিপ করে জানালেন যে সেখানে তেলের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে। [২]

সুলতান এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন এবং এই বাস্তবতা বুঝতে পারলেন যে তেলের ভাণ্ডারকে যদি রেললাইনের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহ এবং ইউরোপের সাথে যুক্ত করা যায়, তবে এটি একটি বড় বিপ্লব হবে। ফলে পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮৬ সালে সুলতান রাশিয়ার সাথে বাগদাদ রেললাইন শুরুর চুক্তি করলেন। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলো এটি জানতে পেরেই ষড়যন্ত্র শুরু করল এবং উত্তর ইরাকে তেলের জমি কেনা শুরু করল। এভাবে রাশিয়ার সাথে চুক্তিটি ভেঙে গেল। [৩]

[১] মুজাক্কিরাত সুলতান আব্দুল হামিদ, মুহাম্মদ হারব, পৃষ্ঠা: ১৫৬-১৫৭।

[২] তুর্কিয়া ওয়া নাফতুল ইরাক, কাতিব খালিদ আবু হুরাইরা, ওয়েবসাইট: তুর্কিয়া আল-আন, ১ মার্চ ২০২০।

[৩] আদ-দিমাউল মাসফুরা লি-আজলিন নাফত, আজিজ উতাল, ওয়েবসাইট: TurkPress.co, প্রকাশের তারিখ: ৭ নভেম্বর ২০১৩।

যা-ই হোক, সুলতান আব্দুল হামিদ অবশেষে এই ষড়যন্ত্রগুলোর মোকাবিলা এভাবে করেন যে, ১৯০৩ সালে তিনি খনিজ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে সেই এলাকাগুলোকে সরাসরি নিজের বিশেষ প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করে নেন, যেখানে জমি কেনাবেচা নিষিদ্ধ ছিল।

এরপর সুলতান জার্মানির সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সাথে একটি চুক্তি করেন, যাতে সিদ্ধান্ত হয় যে তুরস্ক ও জার্মানি মিলে বার্লিন থেকে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেললাইন স্থাপন করবে, যা তেল সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে বাগদাদে পৌঁছাবে। মোসুল থেকে বাগদাদের মধ্যবর্তী রেললাইনের উভয় পাশে বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় জার্মান বিশেষজ্ঞরা তেলের কূপ খনন করবেন। তেল না পাওয়া গেলে সমস্ত লোকসান তুরস্ক বহন করবে। [১]

এই পরিকল্পনাটি বর্তমান সময়ের “সি-পেক” (CPEC)-এর চেয়ে কম ছিল না। যদি এটি পূর্ণতা পেত, তবে তুরস্ক ইউরোপে তেল রপ্তানি করে খুব দ্রুতই তার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিত এবং অতীতের শান-শওকতের পথে চলতে শুরু করত। এই কারণে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো সুলতানের চারপাশ ঘিরে ধরতে শুরু করে, যাতে এই পরিকল্পনার সফলতার আগেই সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়।

হিজাজ রেলওয়ে পরিকল্পনা:

এই সময়ে সুলতান হিজাজ রেলওয়ে পরিকল্পনা শুরু করেন যাতে ইস্তাম্বুলকে মদিনা মুনাওয়ারা এবং মক্কা মুয়াজ্জমার সাথে সংযুক্ত করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই রেললাইনকে ইয়েমেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। এটি ছিল একটি বহুমুখী পরিকল্পনা, যার সাথে উসমানীয় সাম্রাজ্যের ঐক্য বজায় রাখা, ইসলামি সংহতি আন্দোলনকে জনপ্রিয় করা, হাজীদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান, প্রদেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত যাতায়াত দ্রুততর করার মতো মহান উদ্দেশ্যগুলো জড়িত ছিল। পরবর্তী ধাপে এই রেললাইন তেল পরিবহনের কাজেও ব্যবহৃত হতো। বিদেশি শক্তিগুলো এই ক্ষেত্রেও নিজেদের শর্তে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু সাম্রাজ্য ঋণী ছিল, তাই বাহ্যিকভাবে বিদেশি সাহায্য অপরিহার্য মনে হচ্ছিল, কিন্তু সুলতান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। এর পরিবর্তে সুলতান সাধারণ আহ্বান জানান যে, সমস্ত মুসলমান যেন এই মহৎ কাজে অংশ নেয়।

সুলতান নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশ হাজার উসমানীয় স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। দেশের রাজস্ব আয় থেকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এর জন্য বরাদ্দ করা হয়। সারা বিশ্বের মুসলমানরাও তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেন, উপমহাদেশের মুসলমানরাও এতে ব্যাপক আগ্রহ দেখান। হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের (ডেকান) নবাব একটি বিশাল অংকের অর্থ পাঠান।

১৯০০ সালে (১৩১৮ হিজরি) এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। সুলতানের সচিব ইজ্জত পাশা এবং বিশেষ উপদেষ্টা শেখ আব্দুল হুদা আল-তিবি এই অভিযানে অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। দিনরাত পরিশ্রম করে ১৯০৮ সালে (১৩২৬ হিজরি) দামেস্ক থেকে মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত রেললাইন সম্পন্ন করা হয়। ৮১৩ মাইলের এই পথ যা স্থলপথে চল্লিশ দিন এবং সমুদ্রপথে বারো দিনের ছিল, এখন তা তিন দিনে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হলো। এটিই ছিল প্রথম রেললাইন যা কোনো মুসলিম দেশ নিজের শক্তিতে তৈরি করেছিল এবং মানের দিক থেকে কোনো ইউরোপীয় রেললাইনের চেয়ে কম ছিল না।

[১] তুর্কিয়া ওয়া নাফতুল ইরাক, লেখক: খালিদ আবু হুরায়রা, ওয়েবসাইট: তুর্কিয়া আল-আন, ১ মার্চ ২০২০।

এই পরিকল্পনাটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দেয় এবং সারা বিশ্বের মুসলমানরা সুলতান আব্দুল হামিদ সানিকে নিজেদের নেতা হিসেবে মানতে শুরু করে। ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ১৯০৭ সালে (১৩২৫ হিজরি), যখন রেলওয়ে লাইনের উদ্বোধন হতে যাচ্ছিল, তখন এই পরিকল্পনাকে একটি বিপদ হিসেবে অভিহিত করে এক সভায় বলেছিলেন:

“গত দশ বছরে উদ্ভূত বিপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপদ হলো সুলতানের সেই দক্ষতা, যার ভিত্তিতে তিনি ৩০ কোটি মুসলমানের সামনে খলিফা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সুলতান রেলওয়ে লাইন বিছিয়ে নিজের ধর্মীয় চেতনা ও ইসলামী আত্মমর্যাদাবোধের প্রমাণ দিয়েছেন, কারণ এর মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের জন্য মদিনা ও মক্কার পথ সুগম হতে চলেছে।” [১]

এটি ছিল প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রেলওয়ে লাইন মক্কা মোয়াজ্জমা পর্যন্ত বিছানোর কথা ছিল, আর তৃতীয় পর্যায়ে তা ইয়েমেন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু মক্কার শরীফ হুসাইন বিন আলী আশঙ্কা করলেন যে, মক্কা পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন পৌঁছে গেলে পুরো জাজিরাতুল আরবের ওপর তুর্কিদের নিয়ন্ত্রণ বেড়ে যাবে। তাই তিনি এই পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন সম্পন্ন হওয়ার এক বছরও পার হয়নি যে, সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঘেঁষা তুর্কি অফিসাররা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। এরপর শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ফলে এই কাজ মদিনা মুনাওয়ারার আগে আর এগোতে পারেনি। কয়েক বছর পর ব্রিটিশদের প্ররোচনায় মক্কার শরীফ যখন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন এই রেলওয়ে লাইনকে বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় যাতে তুর্কিদের সাথে স্থলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই পুরো ব্যবস্থাটি ধ্বংস করে দেওয়া হয় যাতে খলিফার এই মহৎ কীর্তি তাঁর নেক স্মৃতি ও সদকায়ে জারিয়া হিসেবে অবশিষ্ট না থাকে। [২]

দেশের অভ্যন্তরে গোপন বা বিদ্রোহী সংগঠনসমূহের তৎপরতা:

বাইরে যুদ্ধ চলছিল এবং দেশের অভ্যন্তরে পশ্চিমাঘেঁষা সরকারি মহল রাজপ্রাসাদ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এই লোকেরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক লড়াই জোরদার করার জন্য কিছু গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ছিল “আশ-শাবিবাতুল উসমানিয়া” জামাত, যা ১৮৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল উসমানীয় সালতানাতকে পশ্চিমা ছাঁচে ঢেলে সাজানো। শুরুতে দুই বছর এতে মাত্র চারজন সদস্য ছিল, কিন্তু পরে এর সংখ্যা বেড়ে আড়াইশ পর্যন্ত পৌঁছায়। উজির আলী পাশা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সংগঠনের অনেক নেতা প্যারিসে পালিয়ে যান। আলী পাশার মৃত্যুর পর ১৮৮৪ সালে এই পলাতকদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তারা ফিরে এসে “জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত-তারাক্কি”-তে যোগ দেয়।

“জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত-তারাক্কি” সুলতান আব্দুল হামিদের শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠন ছিল, যার ভিত্তি ১৮৮৯ সালে প্যারিসে স্থাপিত হয়েছিল। এটি ছিল “জমিয়াতুল তুর্কুল ফাতাত” (ইয়ং টার্কস), যা একটি সামরিক সংগঠন ছিল। এই সংগঠনটি তুর্কিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় এমন এক অলঙ্কিত উপায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল যে অন্য জাতিগুলো এ সম্পর্কে টেরও পায়নি।

[১] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ: ১১২, ১১৩।

[২] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ: ১১২, ১১৩।

১৯০৫ সালে স্যালোনিকায় ‘জমিয়াতুল হররিয়া’ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এটি প্যারিসে ‘জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কি’-র সাথে একীভূত হয় এবং উভয়ের যৌথ নাম ‘আল-জমিয়াতুল উমুমিইয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কি’ নির্ধারিত হয়। এর অধীনে সামরিক বাহিনীর গোপন সংগঠনগুলো বিভিন্ন জেনারেলদের নামে পরিচিত ছিল, যার মধ্যে জেনারেল নিয়াজি বেগ, রাইফ বেগ, হাসান বেগ, সালাহউদ্দিন বেগ এবং জেনারেল আনোয়ার বেগ উল্লেখযোগ্য। এই গোপন দলগুলো খিলাফতের পরিবর্তে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিল। [১]

বিশ্বব্যাপী জায়নবাদ এবং সুলতান আব্দুল হামিদ

সুলতান আব্দুল হামিদ সেই সময় নিজের বাহিনীকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি ইহুদিদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মোকাবিলাও করছিলেন। ইহুদিরা সেই সময় ফ্রিম্যাসনরি, ‘ইয়াহুদুদ দাওলা’ এবং বিদেশি ইহুদি পুঁজিপতিদের মাধ্যমে উসমানীয় সালতানাতের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল।

এই সময়ে ইহুদিরা তাদের বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আন্দোলনের সূচনা করেছিল, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অস্ট্রিয়ার একজন সাংবাদিক ‘থিওডোর হার্জল’ (১৮৬০-১৯০৪)। তিনি তার রচিত গ্রন্থ ‘আদ-দাওলাতুল ইয়াহুদিয়া’ (ইহুদি রাষ্ট্র)-তে নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত একটি বিশাল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পেশ করেন এবং ফিলিস্তিনকে এর কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে বিশ্বব্যাপী ইহুদি বাদশাহ (দাজ্জাল)-এর শাসনের পথ সুগম করার প্রস্তাব দেন।

১৮৯৭ সালে (১৩১৩ হিজরি) হার্জল সুইজারল্যান্ডের ‘বাসেল’ শহরে প্রথম বার্ষিক জায়নবাদী সম্মেলন আয়োজন করেন, যেখানে সারা বিশ্বের প্রায় তিনশ ইহুদি নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। হার্জল ঘোষণা করেন যে, আমরা ইহুদি আধিপত্যের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি এবং অচিরেই সারা বিশ্ব আমাদের অনুগত হবে। এই সম্মেলনেই প্রথমবার ‘প্রটোকলস অব দ্য এল্ডার্স অব জায়ন’ পেশ করা হয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয় যার সারসংক্ষেপ ছিল তিনটি পয়েন্ট:

- আমরা ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব।
- আমরা বিশ্বের অর্থনীতিতে ইহুদিদের আধিপত্য বিস্তার করব অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ আমাদের হাতে থাকবে।
- প্রাচীন হিব্রু ভাষা ও সংস্কৃতি যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জীবিত করা হবে।

এই সম্মেলনেই জাতিসংঘ (ইউনাইটেড নেশনস)-এর মতো একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণাও আলোচনায় আসে।

হার্জল জার্মানি, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালি এবং ব্রিটেনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদেরও নিজের এই পরিকল্পনার সমর্থক বানিয়ে নেন এবং এরপর তার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিউলিনস্কিকে সুলতান আব্দুল হামিদের দরবারে পাঠান। তিনি সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে আবেদন করেন যেন ইহুদিদের পুনর্বাসনের জন্য ফিলিস্তিনে জমি দেওয়া হয়, যার বিনিময়ে উপযুক্ত মূল্য পরিশোধ করা হবে। [২]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৯৮ থেকে ১৯৯।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/১৯৯।

২৬১

হার্জলের প্রস্তাব ছিল: “আমরা উসমানীয় সালতানাতের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য ২ কোটি লিরা দেব, যার মধ্যে ২০ লক্ষ ফিলিস্তিনের বিনিময়ে হবে, আর বাকি অর্থ দিয়ে তুরস্ক তার ঋণ পরিশোধ করে ইউরোপীয় আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ সুগম করতে পারবে। এরপরও আমরা সুলতানকে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দিতে থাকব।”

নিউলিংকি ইলদিজ প্রাসাদে সুলতানের সাথে দেখা করে হার্জলের বার্তা পৌঁছে দিলে সুলতান বললেন: “এটা কি সম্ভব যে আমরা ইহুদিদের ফিলিস্তিন ছাড়া অন্য এলাকায় জমি দিই?”

নিউলিংকি বললেন: “ফিলিস্তিন ইহুদিদের প্রধান কেন্দ্র। ইহুদিরা সেখানেই ফিরে যেতে ইচ্ছুক।”

সুলতান এই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “ফিলিস্তিন শুধু ইহুদিদের জন্য নয়, বাকি সব ধর্মের জন্যও পবিত্র স্থান।” [১]

ইহুদি বিশ্বকে সুলতান আব্দুল হামিদের দাঁতভাঙা জবাব:

নিউলিংকি আরও কিছু আরজি পেশ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতান ইহুদি বিশ্বের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিউলিংকিকে পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলেন। সুলতানের এই কথাগুলো ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে:

“আপনার বন্ধু হার্জলকে বুঝিয়ে দিন যে এই বিষয়ে যেন বৃথা চেষ্টা না করে। আমি ফিলিস্তিনের এক বিঘত জমিও দিতে রাজি নই। এই জমি আমার ব্যক্তিগত মালিকানা নয়, এটি মুসলিম উম্মাহর আমানত। আমার জাতি জিহাদ করে এই ভূখণ্ড অর্জন করেছে এবং নিজেদের রক্ত দিয়ে একে সিক্ত করেছে। ইহুদিরা তাদের কোটি কোটি টাকা নিজেদের কাছেই আগলে রাখুক। হ্যাঁ, যদি খিলাফত ধ্বংস হয়ে যায় তবে ইহুদিরা বিনা মূল্যে এই জমি নিয়ে নেবে। কিন্তু যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, আমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার কাছে মঞ্জুর হবে কিন্তু এটা দেখা যাবে না যে ফিলিস্তিন খিলাফত থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এটা কখনোই হতে পারে না। আমি জীবিত থাকতে নিজের দেহের কোনো অংশকে টুকরো টুকরো করা সমর্থন করতে পারি না।” [২]

এই ব্যর্থতার পর হার্জল জার্মানিতে গিয়ে রাজা উইলিয়াম দ্বিতীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। হার্জল চেষ্টা করেছিলেন যে জার্মান রাজা সুলতান আব্দুল হামিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইহুদিদের দাবি মানিয়ে নেবেন, কিন্তু এতেও তিনি ব্যর্থ হন। [৩]

সুলতানের সাথে হার্জলের সাক্ষাৎ:

১৮৯৯ সালে (১৩১৭ হিজরি) হার্জল নিজ প্রচেষ্টায় ইস্তাম্বুলে পৌঁছান এবং ইলদিজ প্রাসাদে প্রবেশের চেষ্টা করেন কিন্তু তাকে বাধা দেওয়া হয়। তবে দুই বছরের চেষ্টার পর ১৯০১ সালের শেষ দিকে (১৩১৯ হিজরি) “আধুনিক জায়েনবাদ”-এর প্রতিষ্ঠাতা সুলতানের সাথে সাক্ষাতের সময় পেতে সফল হন। ইলদিজ প্রাসাদে অনুষ্ঠিত দুই ঘণ্টার এই সাক্ষাতে হার্জল সুলতানকে...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৩৫, উদ্ধৃতি: ‘আনিল ইয়াহুদ ওয়া দাওলাতিল উসমানিয়া’, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭।

[২] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ, পৃষ্ঠা: ৯।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৩৬।

তাকে এই বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে, তার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্যের গত বিশ বছরে নেওয়া ঋণের বোঝা হালকা করে দেওয়া হবে। সুলতান আব্দুল হামিদ নিরবে হার্জলের দীর্ঘ বক্তব্য শুনতে থাকেন। মনে হচ্ছিল সুলতান তার সাথে একমত হয়েছেন, কিন্তু শেষে যখন সুলতান মুখ খুললেন, তখন তার সিদ্ধান্ত সেটিই ছিল যা আগে ছিল। [১]

সুলতান জায়নবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখছিলেন। তিনি হার্জলের সাথে সাক্ষাতের বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:

“জায়নবাদী নেতা হার্জল আমাকে তার চিন্তাধারার সাথে একমত করতে সফল হয়নি। হার্জলের বক্তব্য ছিল যে, যেদিন ইহুদিরা নিজেদের জমি নিজেরা চাষাবাদ করতে শুরু করবে, সেদিন ইহুদিদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তার এই অভিমত সঠিক, আর এ কারণেই সে তার ইহুদি ভাইদের জমির মালিক বানানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। জায়নবাদীরা ফিলিস্তিনে শুধু কৃষি কাজ করতে চায় না, বরং তারা একটি নিয়মিত রাষ্ট্র গঠনের সংকল্প করে আছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যগুলো ভালোভাবে বুঝি। এটা ইহুদিদের ভুল ধারণা যে আমি তাদের কথা মেনে নেব। যদিও আমি আমার ইহুদি নাগরিকদের সেবার কদর করি, কিন্তু ফিলিস্তিন সম্পর্কে তাদের আকাঙ্ক্ষার আমি ঘোর বিরোধী।” [২]

সুলতান স্পষ্টভাবে বলতেন:

“আমরা কেন বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে হাত গুটিয়ে নেব? এটি সব সময় এবং প্রতিটি যুগে আমাদের ভূখণ্ড ছিল এবং থাকবে। এটি আমাদের পবিত্র স্থানগুলোর অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামি বিশ্বে অবস্থিত। এটা জরুরি যে কুদস ভূমি আমাদেরই থাকুক।” [৩]

সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র:

এরপর সুলতান আব্দুল হামিদ যেমনটা প্রত্যাশা করেছিলেন, হার্জল উসমানীয় খিলাফত ধ্বংসের পরিকল্পনা শুরু করে দেয়। তার বক্তব্য ছিল: “সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তুরস্ক থেকে ফায়দা হাসিল করা ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব যতক্ষণ না এর রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তন করা হয় অথবা একে এমন কোনো যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয় যাতে তার পরাজয় ঘটে, অথবা এই উভয় বিষয় একসাথে ঘটে।” [৪]

সুলতান খিলাফত এবং পবিত্র ভূমির ব্যাপারে জায়নবাদী ষড়যন্ত্র প্রতিরোধের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। ইহুদিদের কাছে ফিলিস্তিনের কোনো জমি বিক্রি করা আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। গোয়েন্দাদের মাধ্যমে দেশের ভেতরে ও বাইরে ইহুদিদের কর্মকাণ্ডের তাৎক্ষণিক খবর পাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৮৯০ সালে তিনি উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমানায় নতুন ইহুদিদের প্রবেশ বন্ধ করতে এবং তাদের ষড়যন্ত্র নির্মূল করার জন্য দুটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান কয়েম করেন। [৫]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪২৭, ৪২৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪৩৯

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪৩৯

[৪] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪৩৯

[৫] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, মুহাম্মদ হারব, পৃষ্ঠা: ৮৮

এভাবে হার্টজলের এই কথাটি সঠিক প্রমাণিত হলো যে, “যতক্ষণ সুলতান আব্দুল হামিদের শাসন অবশিষ্ট আছে, ইহুদিরা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।” [১]

ঘাতক আক্রমণ:

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি কুফরি বিশ্বের চোখে কাঁটার মতো বিঁধছিলেন। অবশেষে শত্রুরা সুলতানকে হত্যা করার জন্য একটি জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বুনল। বেলজিয়ামের একজন গোয়েন্দা “জোরিস”-কে, যে বোমা তৈরিতে পারদর্শী ছিল, এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হলো। ১৯০৫ সালে সে ইস্তাম্বুলে পৌঁছাল এবং সুলতানের চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করতে থাকল।

সুলতানের প্রাসাদে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এতই কঠোর ছিল যে সে ভেতরে ঢোকার কোনো পথ পেল না। অবশেষে সে দেখল যে সুলতান জুমার নামাজের জন্য জামে মসজিদ ইলদিজে যান এবং ফেরার সময় মসজিদের দরজার বাইরে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থামেন যাতে মানুষ তাকে দেখতে পায় এবং এরপর নিজের ঘোড়ার গাড়িতে সওয়ার হন। সুলতানের সময়ের পাবন্দি এতটাই নিখুঁত ছিল যে মসজিদ থেকে বের হওয়া এবং গাড়িতে বসার সময় কখনো আগে-পিছে হতো না। এটি সর্বদা ৪২ সেকেন্ডের সময় হতো। জোরিস এই মুহূর্তগুলোর সুযোগ নিল। ইউরোপ থেকে একটি বিশেষ ধরনের ঘোড়ার গাড়ি পাঠানো হলো, যার গোপন অংশে জোরিস একশ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্যের একটি টাইম বোমা স্থাপন করল। ২১ জুলাই ১৯০৫ (১৯ জমাদিউল আউয়াল ১৩২৩ হিজরি) তারিখে এই ঘোড়ার গাড়িটি জামে মসজিদের দরজার কাছে সেই জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হলো যেখানে জুমার নামাজের সময় গাড়িগুলো দাঁড় করানো হতো।

সুলতান নামাজ শেষ করে মসজিদের দরজায় পৌঁছালে হঠাৎ শায়খুল ইসলাম জামালুদ্দিন সামনে এগিয়ে এলেন এবং কোনো একটি বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। এরই মধ্যে হঠাৎ কান ফাটানো এক বিস্ফোরণ ঘটল, কিছুক্ষণের জন্য সবকিছু ধোঁয়া ও ধুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। যখন ধোঁয়া পরিষ্কার হলো, তখন মানুষ দেখল সুলতান মানুষের লাশ এবং মৃত ঘোড়াগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চেহারা ছিল অভ্যাসমতো সম্পূর্ণ শান্ত। আল্লাহ তাকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে দিলেন।

সুলতান নিজের ঘোড়ার গাড়ি নিজেই চালিয়ে অভ্যাসমতো পূর্ণ গান্ধীর্যের সাথে প্রাসাদে পৌঁছালেন। মানুষ আতঙ্কিত ছিল। সুলতান তাদের সান্ত্বনা দিলেন। সুলতানের গোয়েন্দা বিভাগ দ্রুতই অপরাধীকে খুঁজে বের করল। আসল ঘটনা তদন্তের পর সুলতান তাকে এই শর্তে ক্ষমা করে দিলেন যে সে তার জন্য গোয়েন্দাগিরি করবে। জোরিস ছিল একজন ভাড়াটে খুনি, তাই সে এতে রাজি হয়ে গেল। পরবর্তী বছরগুলোতে সে সুলতানকে ইউরোপীয় বিশ্ব সম্পর্কে দরকারী তথ্য সরবরাহ করতে থাকল। এই ঘাতক আক্রমণ সম্পর্কে সে যা বলেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ কারো কাছে প্রকাশ করা হয়নি, তাই ঐতিহাসিকরা জানেন না যে এটি কার ষড়যন্ত্র ছিল? শুধু এতটুকু নিশ্চিত যে অপরাধীর মেসিডোনিয়া বা আমেনিয়া ইত্যাদি বিদ্রোহী সংগঠনগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই কারণেই কিছু তুর্কি ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করেন যে, এটি ছিল জায়েনবাদীদের ষড়যন্ত্র, যারা ফিলিস্তিন সম্পর্কে সুলতানের অনড় অবস্থানের কারণে চরম ক্ষুব্ধ ছিল। [২]

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৪৫০।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা, ২/১৬২, ১৬৩।

জায়নবাদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রগতিশীলদের অবদান:

এর আগে সুলতান আব্দুল হামিদ আধুনিকতাবাদী তুর্কিদের লাগাম টেনে ধরার জন্য আশ্রাণ চেপ্টা করে আসছিলেন। সদর-এ-আযম মিদহাত পাশাকে বরখাস্ত ও নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যও ছিল এটিই। এরপর ব্রিটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় আলী সুয়াভি এবং পরবর্তীতে ফ্রিম্যাসনরির কিছু এজেন্ট সুলতানের সিংহাসন উল্টে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু এই উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সরকার পতনের জন্য জনমত গঠনের কাজ চলতে থাকে। আহমদ রেজা বেগ নামক একজন প্রখ্যাত তুর্কি কর্মকর্তা রাজনৈতিক ময়দানে ইহুদিদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি প্যারিসে চলে যান এবং “আল-মাশওয়ারাত” নামক সাময়িকী প্রকাশ করে তুর্কিদের আধুনিকতাবাদের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন।

সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহী মানসিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইস্তাম্বুলের সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই সরকার বিরোধী সৈন্যদের প্রথম সংগঠন “আল-ইত্তিহাদ আল-উসমানি” ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফ্রিম্যাসন এজেন্ট ইব্রাহিম তিমো আল-রুমানি। এই সংগঠনের সদস্য প্রশিক্ষণাধীন তরুণ সৈন্যরা পরবর্তী দশ বছরে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হন।

তরুণ তুর্কি অফিসারদের মধ্যে মিশ্র মানসিকতার লোক ছিল, যাদের বিভিন্ন শিরোনামে প্রলুব্ধ করে সহযোগী বানানো হয়েছিল। যেহেতু অধিকাংশ তুর্কি সৈন্য মূলত ইসলামপন্থী ছিল, তাই তাদের সামনে এটাই প্রকাশ করা হয়েছিল যে, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো সেই ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সাম্যের সুরক্ষা যা ইসলাম শিক্ষা দেয়। এই ধরনের অফিসাররা খিলাফত বা ইসলামের বিরোধী ছিলেন না, বরং তারা সুলতান আব্দুল হামিদকে একজন স্বৈরাচারী ও রক্ষণশীল শাসক মনে করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। আনোয়ার পাশা, জামাল পাশা এবং আইয়ুব সাবরি ছিলেন এই ধরনের ব্যক্তি।

দ্বিতীয় ধরনের অফিসাররা ছিলেন তারা যারা পশ্চিমা চিন্তাধারায় মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ছিলেন এবং ইসলামী রাজনীতি ও শরয়ী বিধিনিষেধকে নিরর্থক মনে করতেন। তারা আধুনিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভক্ত এবং ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এই লোকেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিকে যেমন পশ্চিমকে আদর্শ মানতেন, অন্যদিকে চেস্টিস খান ও তৈমুর লঙকেও শুধুমাত্র তুর্কি হওয়ার কারণে আদর্শ নেতা হিসেবে গণ্য করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন যে আমাদের কিবলা হলো “তোরান” (তুর্কিস্তান)। তাদের কাছে প্রাচীন অমুসলিম তুর্কিদের শিরকপূর্ণ ইবাদত ও রীতিনীতি পালন করাও প্রশংসনীয় ছিল।

যাই হোক, উসমানীয় সাম্রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি ছিল এই যে, সরকারি সেনাবাহিনী পশ্চিমা চিন্তাধারায় প্রভাবিত এবং সাম্রাজ্যের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনী যদি দ্বীনদার ও অনুগত থাকত, তবে ইহুদি এবং তাদের প্রশিক্ষিত রাজনীতিবিদ ও আধুনিকতাবাদী সাংবাদিকরা আশ্রাণ চেপ্টা করেও উসমানীয় খিলাফতকে টলাতে পারত না।

যখন ফিলিস্তিন সংক্রান্ত বিষয়ে সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে জায়নবাদীদের আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ইহুদিরা খিলাফত বিলুপ্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়, তখন এই সামরিক অফিসাররাই জায়নবাদীদের অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে প্রমাণিত হন।

যদিও আধুনিক জায়েনবাদের প্রতিষ্ঠাতা হার্জল ১৯০৪ সালে মারা যান, কিন্তু ইহুদি নেতৃবৃন্দ তার পরিকল্পনার ওপর অটল ছিলেন। তারা তাদের অগাধ সম্পদ, বিশ্ব বাণিজ্যে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে বিশ্বের যে কাউকে সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি দেওয়ার পূর্ণ সক্ষমতা রাখতেন। তারা অত্যন্ত সুসংগঠিত পরিকল্পনার সাথে তাদের সকল শক্তি ব্যবহার করেছিলেন। নিজেদের সমমনা তুর্কি সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং কবিদের একটি দল তারা আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। এখন তারা উসমানীয় খিলাফতের বিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করল। গাদ্দার ফৌজি অফিসারদের দল “আল-ইত্তিহাদ আল-উসমানি” এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করা আহমেদ রেজা বেগের মতো লোকদেরকে “জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কি” শিরোনামে একত্রিত করা হলো। এরপর আমেনিয়া ও বলকানের বিদ্রোহী নাসারাদের সংগঠিত করা হলো এবং জমিয়াতুল ইত্তিহাদ ওয়াত তারাক্কির গাদ্দার ফৌজি অফিসারদের তাদের সমর্থক বানানো হলো। সেনাবাহিনীতে গাদ্দারদের আধিপত্যের কারণে সুলতান আব্দুল হামিদ দ্রুত অসহায় হয়ে পড়ছিলেন।

[১]

বিদ্রোহী অফিসার এবং খিলাফতের কেন্দ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

সেই সময় উসমানীয় সালতানাতের চারটি বড় সামরিক ছাউনি ছিল: ইস্তাম্বুল, এদিরনে, আরজুরুম (আনাতোলিয়া), সালোনিকা এবং বলকান। ইস্তাম্বুলের ফার্স্ট আর্মি কোরে সালতানাতের অনুগত ও গাদ্দাররা মিলেমিশে ছিল, আনাতোলিয়ার ফোর্থ আর্মি কোরে অনুগতরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। অন্যদিকে মেসিডোনিয়া ও সালোনিকার সেকেন্ড এবং থার্ড আর্মি কোরে বিদ্রোহী অফিসার ও সৈন্যদের স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

সুলতান আব্দুল হামিদ গোয়েন্দাদের মাধ্যমে গাদ্দার অফিসারদের খবর পেয়েছিলেন। তিনি থার্ড আর্মি কোরের কমান্ডার শামসি পাশাকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি বিদ্রোহীদের সর্দার জেনারেল নিয়াজি বেগকে গ্রেফতার করেন, কিন্তু এর আগেই শামসি পাশাকে হত্যা করা হয়। সুলতান ইস্তাম্বুল থেকে একটি বাহিনী পাঠালেন কিন্তু তারাও গিয়ে গাদ্দারদের সাথে মিশে গেল। এভাবে বিদ্রোহীদের পাল্লা স্পষ্টভাবে ভারী হয়ে গেল। [২]

খিলাফত প্রাসাদ অবরোধ। খলিফার ক্ষমতা হরণ:

২৩ জুলাই ১৯০৮ সাল ইসলামী ইতিহাসের সেই মোবারক দিন ছিল যখন এই ফৌজি অফিসাররা সালোনিকায় (সলা নিক) তাদের সমমনা রাজনীতিবিদদের সাথে একটি যৌথ কনফারেন্স করে, যেখানে সুলতান আব্দুল হামিদের কাছে দাবি জানানো হয় যে তিনি যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গণতান্ত্রিক সংবিধান কার্যকর করার ঘোষণা দেন। অন্যথায় সেনাবাহিনী রাজধানীতে আক্রমণ করবে।

টেলিগ্রাফের মাধ্যমে এই বার্তা ইস্তাম্বুলে পৌঁছে দেওয়া হলো। সুলতান আব্দুল হামিদ সময় পাওয়ার চেষ্টা করলেন যাতে এই সময়ের মধ্যে তিনি তার অনুগত অফিসারদের প্রস্তুত করতে পারেন। তিনি তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অফিসার আলী হুসাইন হিলমি পাশাকে জিজ্ঞেস করলেন: “বিদ্রোহীদের দমনে সফলতার কি কোনো সম্ভাবনা আছে কি না?”

হিলমি পাশা ইতিবাচক উত্তর দিলেন। এরপর সুলতান সালোনিকায় তার অনুগত জেনারেল খায়রি পাশাকে নির্দেশ পাঠালেন যেন তিনি বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেন, কিন্তু খায়রি পাশা ভীরুতা প্রদর্শন করে এই কাজ অন্য এক অফিসার ইব্রাহিম পাশার ওপর ন্যস্ত করলেন যার...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৪৫৬ থেকে ৪৫০।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২০২, ২০৩।

তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেও কার্যত কিছুই করেননি। এর থেকে প্রকাশ পায় যে, বিদ্রোহীদের শক্তি পরিমাপ করতে সুলতান এবং তাঁর গোয়েন্দা বিভাগ ভুল করেছিল এবং তারা কোনো বিপ্লব মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

এরপর যখন বিদ্রোহী বাহিনী স্যালোনিকা থেকে ইস্তাম্বুল পৌঁছে ইলদিজ প্রাসাদ অবরোধ করল, তখন সুলতান বাধ্য হলেন। বিদ্রোহী অফিসাররা শায়খুল ইসলামকে সাথে নিয়ে সুলতানের কাছ থেকে গণতান্ত্রিক সংবিধানের ওপর স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন।

বিদ্রোহী সামরিক অফিসাররা সুলতানকে পদচ্যুত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা এর জন্য ধীরগতির পথ অবলম্বন করলেন। কারণ তখনো সেনাবাহিনীর একটি অংশ সুলতানের অনুগত ছিল। যদি বিদ্রোহীরা সুলতানের পদচ্যুতির ওপর জোর দিত, তবে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। তা ছাড়া সুলতান তাদের দাবি মেনে নিয়ে নিজের বরখাস্তের কোনো অজুহাত বাকি রাখেননি। তাই বিদ্রোহীরাও আপাতত গণতান্ত্রিক সংবিধান বাস্তবায়নের ওপরই সন্তুষ্ট থাকল।

এরপর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো এবং ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্ট অস্তিত্বে এল যেখানে প্রগতিশীলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ইস্তাম্বুলে বিজয়ের উৎসব পালন করা হলো এবং সফল নেতাদের জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হলো। সদর-ই-আযম ফরিদ পাশাকে পদচ্যুত করে তাঁর জায়গায় সাঈদ পাশাকে বসানো হলো। ‘জমিয়ত-ই-নওজওয়ান-ই-তুর্কি প্যারিস’-এর প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজা বেগকে পার্লামেন্টের স্পিকার নিযুক্ত করা হলো।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে কারাগারের দরজা খুলে দেওয়া হলো, ফলে উসমানীয় সালতানাতের গাদ্দার সকল অপরাধী মুক্তি পেয়ে গেল, কিন্তু অন্যদিকে জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র ওপর যারা হাত দিয়েছিল, সেইসব অফিসার ও সৈন্যদের বেছে বেছে হত্যা করা হতে লাগল। [১]

প্রগতিশীলদের শাসন এবং ইস্তাম্বুলে হাস্লামা:

প্রগতিশীল এবং জাতীয়তাবাদীরা এটা অনুভব করেছিল যে, যতক্ষণ সুলতান আব্দুল হামিদ খিলাফতের মসনদে আছেন, ততক্ষণ তাদের লক্ষ্য পূরণ হতে পারে না। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, ইস্তাম্বুলে শান্তি কায়েম হতে দেওয়া হবে না এবং বিশৃঙ্খলার দায় সুলতানের ওপর চাপানো হবে। এভাবে তারা সুলতান আব্দুল হামিদকে বিশৃঙ্খলাকারীদের সমর্থক এবং সংবিধান ও আইনের বিদ্রোহী প্রমাণ করে তাঁর হাত থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

এদিকে তুরস্কে এই বিপ্লবে ধর্মীয় গোষ্ঠী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। খোদ ইস্তাম্বুলে এমন লোকের অভাব ছিল না যারা আধুনিকতাবাদীদের একাধিপত্য সহ্য করতে পারছিল না। তারা ‘আল-জমিয়তুল মুহাম্মাদিয়া’ নামে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য সংগঠিত হতে শুরু করেছিল। তাদের প্রধান ছিলেন দৈনিক ‘ভলকান’-এর সম্পাদক হাফেজ দরবেশ ওয়াহদতি, যিনি একজন নকশবন্দী সূফী বুজুর্গ ছিলেন। তিনি সুলতানের সমর্থনে আওয়াজ তুললেন এবং নিজের সংবাদপত্রে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ও নিবন্ধের ধারাবাহিকতা শুরু করলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৯ (২২ মহরম ১৩২৭ হিজরি) থেকে যখন এই নিবন্ধগুলো ছাপা হতে শুরু করল, তখন অনেক মানুষ সুলতানের সমর্থনে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ:

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২০২, ২০৩।

• শরয়ী আইন পুনরায় কার্যকর করা হোক।

• সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হোক এবং সুলতানের অনুগত সৈন্যদের শাস্তি দেওয়া না হোক।

• গ্র্যাভ উজির, নৌ ও স্থল বাহিনীর প্রধান এবং নিম্নোক্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বহিষ্কার বা নির্বাসিত করা হোক: “আহমদ রেজা বেক, হুসাইন জাহিদ বেক, জাভেদ বেক, রাহমি বেক, তালাত বেক, ইসমাইল হাক্কি, মাহমুদ মুখতার পাশা।”

প্রগতিশীলরা এই সংঘাতকে বাড়িয়ে গৃহযুদ্ধ এবং সুলতানকে অপসারণ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তাই তারা উস্কানি দিতে শুরু করল। ফলে ইস্তাম্বুলে উভয় পক্ষের প্রতিবাদী বিক্ষোভ ও হাঙ্গামার একটি ধারা শুরু হয়ে গেল। [১]

দেয়ালের লিখন পড়ে নিলেন:

সুলতান দেয়ালের লিখন পড়ে নিয়েছিলেন এবং আন্দাজ করেছিলেন যে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম থেকে প্রভাবিত হয়ে সামরিক জেনারেল এবং পশ্চিমা স্বাধীনতার মদে মাতাল লোকেরা এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তারা খুব শীঘ্রই এই হাঙ্গামাকে ভিত্তি করে খিলাফতের পদমর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে দেবে। অন্যদিকে যারা সুলতানের সমর্থনে রাস্তায় নেমে এসেছিল, তাদের উস্কানি দেওয়ার জন্য প্রায়ই বহিরাগতরা আসত। এই সহজ-সরল মানুষগুলো রাস্তায় এসে সুলতানের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছিল, কিন্তু তারা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের হাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। দুনিয়া মুসলমানদের একে অপরের সাথে লড়তে দেখে তামাশা দেখতে চেয়েছিল।

সুলতান সেই দিনগুলোতে সংবাদপত্রগুলো অধ্যয়ন করার সময় নিজের সমর্থক ও বিরোধীদের উত্তেজনা ও জোশ দেখে বারবার বলতেন: “ফলাফল ভালো হবে না। একটি ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে জড়ানো হচ্ছে যেখানে সংঘর্ষে লিপ্তদেরই ক্ষতি হবে এবং তৃতীয় (অসংশ্লিষ্ট) পক্ষ লাভবান হবে।”

১৩ এপ্রিল ১৯০৯ (২২ রবিউল আউয়াল ১৩২৭ হিজরি) ইস্তাম্বুলে একটি বিশাল মিছিল বের হয় যাতে ত্রিশ হাজার লোক ‘আঞ্জুমানে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’-র স্লোগানবাজি এবং অসাংবিধানিক সরকারের অবসানের দাবি জানায়। [২]

বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিচ্ছিল: “আমরা সুলতানকে চাই... আমরা শরীয়ত চাই।” অন্যদিকে বিরোধীরাও বেরিয়ে আসে এবং আরেকটি হাঙ্গামা শুরু হয়। এরপর গুলিও চলতে শুরু করে। [৩]

সুলতানের কন্যা শাহজাদী আয়েশা উসমান বর্ণনা করেন:

“আমরা গুলির শব্দ শুনলাম। আমাদের ওপর আতঙ্ক ভর করল। আমার বাবা হারামসারা এবং শাহী প্রাসাদের মাঝখানে চলাচলের সময় নিজের কাতেব জাওয়াদ বেক এবং রেজা বেকের সাথে কথা বলছিলেন এবং বোঝার চেষ্টা করছিলেন...”

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২০৪-২০৫; খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ওয়া এহইয়া, হক নেওয়াজ: পৃ. ৮৪-৮৫, জুহাইর পাবলিকেশন্স পাকিস্তান; ওয়ালিদিস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩০

[২] উপরোক্ত রেফারেন্স অনুযায়ী

[৩] ওয়ালিদিস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩০

তারা বলছিলেন যে কী হচ্ছে। যখন তিনি হেরেমখানায় আসলেন তখন বললেন: “এটাই হলো যার ভয় আমি পাচ্ছিলাম। আমি কি তোমাদের বলিনি যে এটি ষড়যন্ত্রে ঘেরা একটি যুদ্ধ হবে? দেখ, এখন তা শুরু হয়ে গেছে।” এ কথা বলার সময় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। [১]

এই সময়ে একটি জনতা ‘আমরা সুলতানকে চাই’ স্লোগান দিতে দিতে রাজপ্রাসাদের সামনে চলে আসে। তাদের মধ্যে সুলতানের সমর্থক সৈন্যরাও ছিল। তারা ‘আলী কবুলি বেগ’ নামক এক ব্যক্তিকে সুলতানের বিরোধী বলে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এসেছিল, যার ওপর মূর্ছা ভাব বিরাজ করছিল এবং নির্যাতনের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল। সুলতান এই দৃশ্য দেখে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রাসাদের জানালা থেকে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন: “আমার বাচ্চারা! ওকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিচ্ছি যে, আমার খাতিরে এই লোকটিকে ক্ষমা করে দাও।”

সুলতানের সহচর শহরুদ্দিন আগা পানির পেয়ালা নিয়ে দৌড়ে গেলেন যাতে বেচারী আলী কবুলিকে পান করাতে পারেন, কিন্তু উত্তেজিত জনতা তাকে সামনে এগোতে দেয়নি এবং সেখানেই আলী কবুলিকে হত্যা করে ফেলে। এই ঘটনা সুলতানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। [২]

সুলতানের কন্যা শাহজাদী আয়েশা ওসমান লিখেছেন:

“আববাজান যখন হেরেমখানায় ফিরে আসলেন তখন তিনি ঘামে ভিজে গিয়েছিলেন। দুঃখ ও শোকে তার কাঁধ ঝুঁকে পড়েছিল। তিনি মাথা চেপে ধরে বললেন: আজকের পর মুক্তির আর কোনো পথ নেই। সেনাবাহিনী অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। হায় ধ্বংস! সুলতানের চেহারা থেকে দুঃখ ও বেদনা ঝরছিল। তিনি সেদিনও এত ব্যথিত ও শোকাবুত ছিলেন না যেদিন তাকে সিংহাসন থেকে নামানো হয়েছিল। সেই দিনের পর আমার আববাজানের চেহারায় তার পুরনো প্রফুল্লতার এক বিন্দুও আর ফিরে আসেনি। তিনি বলতেন: ‘আমার শত্রুদের কামনা পূর্ণ হয়েছে’।” [৩]

সুলতান আব্দুল হামিদ পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত:

এই সময়ে সুলতান জাওয়াদ বেগকে পাঠালেন যাতে তিনি অবাধ্যদের বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করার উপদেশ দেন। জাওয়াদ বেগ ফিরে এসে আশ্বস্ত করলেন যে বিক্ষোভকারীরা শান্ত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছুই ছিল না। ফলে পরের দিন আবার দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সুলতান গ্রিস যুদ্ধের বিজয়ী আদহাম পাশাকে পাঠালেন কিন্তু সবকিছুই বৃথা গেল। সুলতান নিশ্চিত হলেন যে এই বিষয়টি সিংহাসন থেকে অপসারণের মাধ্যমেই শেষ হবে। সুলতান সদর-ই-আজম তৌফিক পাশাকে নিজের পদত্যাগ এবং তার ভাই মুহাম্মদ রাশাদকে উত্তরসূরি করার ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিলেন। সুলতান বললেন:

“আমি নিশ্চিত যে এই লোকেরা আমাকে শাসক হিসেবে দেখতে চায় না। নিঃসন্দেহে আমি সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত। তবে এটি স্পষ্ট থাকা উচিত যে ১৩ এপ্রিলের দাঙ্গার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।” [৪]

প্রগতিশীলদের চক্রান্ত ও প্রতারণা:

এদিকে ১৩ এপ্রিলের দাঙ্গার পরপরই প্রগতিশীলরা পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকল এবং বিক্ষোভকারীদের কিছু দাবি...

[১] ওয়ালদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩২, ২৩৩

[২] ওয়ালদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩১, ২৩২

[৩] ওয়ালদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩২, ২৩৩

[৪] ওয়ালদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃ. ২৩৩

মেনে নিলেন। ফলে পার্লামেন্টের প্রধান আহমদ রেজা বেগসহ কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হলো এবং ইসমাইল হাক্কি ব্যতীত বাকি সামরিক জেনারেলদের ইস্তাম্বুলের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ধর্মনিরপেক্ষ সাংবাদিকরা এই ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করল, বরং একটি ষড়যন্ত্রের অধীনে এটি প্রকাশ করতে শুরু করল যে সুলতানের সমর্থকরা জয়ী হয়েছে এবং সুলতান তার পূর্বের অবস্থান ফিরে পেয়েছেন আর পার্লামেন্ট এখন নিছক একটি দাবার ঘুঁটি। এই পরিবেশ তৈরি করার পর প্রগতিশীলরা সুলতান আব্দুল হামিদকে দাঙ্গার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করল এবং বলল যে, তারই ইশারায় সংবিধান স্থগিত এবং সেকেলে ব্যবস্থা পুনরায় চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুলতান আব্দুল হামিদ এই বিদ্রোহের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করে এই অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। [১]

ইস্তাম্বুলের ওপর সেনাবাহিনীর দখল:

যদিও এই হাঙ্গামায় সুলতানের কোনো হাত ছিল না বরং এটি ছিল সুলতানের সুনাম নষ্ট করার একটি ষড়যন্ত্র, তবুও তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্রোহী জেনারেলরা এই ঘটনাগুলোকে সুলতান আব্দুল হামিদের অপসারণের অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে ইস্তাম্বুলে সংবিধান ও পার্লামেন্টের অস্তিত্ব বিপন্ন, যা রক্ষার জন্য সামরিক অভিযান প্রয়োজন। ফলে ৩১ এপ্রিল কোর কমান্ডার জেনারেল মাহমুদ শওকত পাশা (১৮৬০ খ্রি. থেকে ১৯১৩ খ্রি.) থার্ড আর্মি নিয়ে সেলানিক থেকে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [২] তবে এই অগ্রযাত্রাকে সুলতানের সমর্থনের নাম দেওয়া হলো এবং মাহমুদ শওকত ঘোষণা করলেন যে, তিনি সুলতানকে বিদ্রোহীদের কবল থেকে উদ্ধার করতে আসছেন। এই বাহিনীতে মাহমুদ শওকতের তরুণ অফিসারদের মধ্যে মোস্তফা কামাল পাশাও ছিলেন। [৩] সুলতান জানতেন যে বাহিনী কেন আসছে, তবুও তিনি তার অনুগত বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা আক্রমণকারীদের পথ রোধ না করে। সুলতানের ফরমান ছিল:

“থার্ড আর্মিও আপনাদের মতো মুসলিম সৈন্য ও কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। আপনারা তাদের বাধা দেবেন না। তাদের পরদেশি নজরে দেখবেন না। তবে থার্ড আর্মির অফিসারদের উচিত হবে তারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে গুজবের সত্যতা যাচাই না করে এবং নিজেদের ছাউনিতে অবস্থান করে যাতে আমাদের দেশের শত্রুরা সীমান্ত খালি না পায়।” [৪]

মোদাকথা, সুলতান বিদ্রোহীদের কাছে এমন কোনো আইনি পথ বাকি রাখেননি যা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অজুহাত তৈরি হয়। [৫]

সুলতানের পক্ষ থেকে অস্ত্র ধারণে নিষেধাজ্ঞা:

ইস্তাম্বুলে সুলতানের কাছে অনুগত সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী ছিল যারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু সুলতান লড়াইয়ের অনুমতি দেননি। এই ঘটনাগুলোর প্রত্যক্ষদর্শী সুলতানের কন্যা শাহজাদী আয়েশা ওসমানের বর্ণনা হলো:

“লশকরে হুররিয়াত (স্বাধীনতার বাহিনী) ইস্তাম্বুলের কাছাকাছি চলে এল। আমার পিতা তার অপসারণ পর্যন্ত এই দিনগুলো অপেক্ষায় কাটিয়ে দিলেন। আমরা শোকাতুর অবস্থায় ছিলাম। সকাল-সন্ধ্যা তার কাছে যেতাম যখন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর রাজি ছিলাম। সুলতানের একনিষ্ঠ পাশা...”

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকের: ৮/২০৩, ২০৫; খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ও এহিয়া, হক নেওয়াজ: পৃষ্ঠা ৮৩, ৮৫ ত।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকের: ৮/২০৫।

[৩] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৩৭, ৩৮।

[৪] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকের: ৮/২০৫।

ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাছে বারবার আসতেন এবং অস্ত্র তুলে নিয়ে মোকাবিলার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু পিতা উত্তর দিতেন: “এটা জায়েজ নয় যে একজন ব্যক্তির খাতিরে এক হাজার মানুষ নিহত হোক এবং ভাই ভাইয়ের ওপর হামলা করুক। আবশ্যিক হলো যে ফৌজ থেকে অস্ত্র জমা করে নেওয়া হোক এবং গুলি না চালানো হোক। একজন ব্যক্তির নাক দিয়েও যেন রক্ত না ঝরে। বাকি যা চান করুন।” [১]

শাহজাদী বলেন:

“সেদিন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আমার পিতা এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি রক্তপাত থেকে চরমভাবে বিরত থাকতেন, চাই এর বিনিময়ে তাঁকে নিজের সিংহাসনই ছেড়ে দিতে হোক না কেন।” [২]

২৩ এপ্রিল ১৯০৯ সালে বিদ্রোহী বাহিনী যাকে “লশকরে হুররিয়াত” নাম দেওয়া হয়েছিল, কোনো বিশেষ প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই ইস্তাম্বুল দখল করে নিল। এর পরপরই সুলতানের বিরুদ্ধে জনআবেগ উসকে দেওয়ার জন্য ধর্মীয় ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া হলো এবং শহরে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তু প্রচার করা হলো:

“হে মুসলমানগণ! আমরা তোমাদেরকে জালিম, বেঈমান, কুরআন অবমাননাকারী, ঈমান ও বিবেককে পদদলিতকারী সুলতানের শাসন থেকে মুক্তি দিয়েছি। হে উম্মতে মুহাম্মদীয়া! জাগ্রত হও, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দাও। আল্লাহ সাহায্য করবেন। হে তওহীদপন্থী মুসলমান! উঠে দাঁড়াও এবং নিজের দ্বীনকে জালিমদের হাত থেকে বাঁচাও। এখানে একজন জালিম শয়তান মাথায় মুকুট পরে বসে আছে। সুলতান আব্দুল হামিদ শরীয়তের দৃষ্টিতে সুলতানও নন, খলিফাও নন। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা আবশ্যিক। যে এতে অবহেলা করবে, সুলতানের গুনাহের দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে।” [৩]

মিথ্যা অভিযোগ ও জাল ইস্তিফতা:

এই চক্রটি তাদের অপবিত্র উদ্দেশ্যে আলেমদেরও ব্যবহার করেছিল। সুলতানের বিরুদ্ধে ইস্তিফতা তৈরি করা হয়েছিল যাতে নিম্নোক্ত মিথ্যা অভিযোগগুলো আনা হয়েছিল:

- ১৩ এপ্রিলের বিদ্রোহী বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা।
- কুরআন মাজীদের পৃষ্ঠাগুলো অগ্নিদগ্ধ করা।
- অপব্যয় ও অপচয়।
- জুলুম-অত্যাচার ও রক্তপাত।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুলতানের বিরোধীদের কাছে এগুলোর কোনো একটিরও কোনো প্রমাণ ছিল না। সুলতানের মতো সওম ও সালাত পালনকারী এবং দ্বীনদার ব্যক্তির ওপর কুরআন মাজীদের অবমাননা ও দহনের অভিযোগ ছিল অত্যন্ত অপবিত্র প্রোপাগান্ডা যার উদ্দেশ্য ছিল কেবল জনআবেগ উসকে দেওয়া। সুলতান অপব্যয়ী ছিলেন না বরং মিতব্যয়ী মানুষ ছিলেন যিনি এই নাজুক অবস্থায়ও একদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে শক্তিশালী রেখেছিলেন, অন্যদিকে সালতানাতে মহান নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করিয়েছিলেন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য নিজের পকেট থেকেও সর্বদা মূল্যবান অনুদান দিতেন।

[১] ওয়ালিদ আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, পৃষ্ঠা: ২৩৩

[২] ওয়ালিদ আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, পৃষ্ঠা: ২৩৩

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত আয-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩৫৯

সুলতানের ওপর জুলুম ও অত্যাচারের অভিযোগের বাস্তবতা এতটাই ছিল যে, তিনি কিছু বিদ্রোহীকেও ক্ষমা করেননি বরং যখন তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হতো, তখন তাদের মৃত্যুদণ্ড, দেশান্তর বা পদচ্যুতির শাস্তি দিতেন। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক প্রয়োজন যা থেকে কোনো শাসকই মুক্ত নন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী নিজেরা গুজব ছড়াত এবং তারপর সেই সাক্ষ্যগুলোকে নিশ্চিত রূপ দিয়ে একটি ইশতেহার তৈরি করত যাতে এই অপরাধগুলো গণনা করা হতো। শেষে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, এই অপরাধে লিপ্ত শাসককে পদচ্যুত করা ওয়াজিব কি না। শেখুল ইসলাম জিয়াউদ্দিন এফেন্দির উত্তর লেখা হয়েছিল: “হ্যাঁ, ওয়াজিব।”

কিন্তু শেখুল ইসলাম কি সত্যিই এই উত্তর দিয়েছিলেন? দারুল ইফতা-র আমিন, নুরী এফেন্দি এই ফতোয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যদিও তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, পার্লামেন্টে যেখানে প্রগতিশীলদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, যখন এই ফতোয়া পড়ে শোনানো হলো এবং সুলতানের পদচ্যুতির বিষয়ে জনমত যাচাই করা হলো, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা একে সমর্থন করল। এভাবেই সুলতান আব্দুল হামিদ সানির আনুষ্ঠানিক পদচ্যুতির ঘোষণা দেওয়া হলো। [১]

ফ্রি-মেসন গ্র্যান্ড মাস্টারের হাতে সুলতান আব্দুল হামিদের পদচ্যুতি:

২৪শে এপ্রিল বিদ্রোহী বাহিনী ইলদিজ প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি “তাশ কিশলা”-কে কামানের গোলা থেকে মুক্ত করল। ঠিক সেই সময় রুশ রাষ্ট্রদূত সুলতানের কাছে একটি বার্তা পাঠালেন যাতে জারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব ছিল যে, যদি সুলতানের পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া যায় তবে তারা সুরক্ষা দিতে প্রস্তুত। (অর্থাৎ রুশরা তাকে নিরাপদে মস্কো নিয়ে যাবে।)

সুলতান এই বার্তা শুনে বললেন: “আমি আমার ওপর আপতিত বিপদে সন্তুষ্ট। আমার কবর আমার পূর্বপুরুষদের কবরের সাথেই হবে। আমি এই অপমানের চেয়ে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিই।” এই বলে সুলতান জারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করে ফিরতি বার্তা পাঠালেন। [২]

কয়েক ঘণ্টা পর বিদ্রোহী বাহিনী ইলদিজ প্রাসাদ ঘেরাও করে বাইরের দুনিয়ার সাথে এর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। সুলতান তার অনুগতদের নির্দেশ দিলেন যেন তারা অস্ত্র ত্যাগ করে প্রাসাদের ছাদে শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা উড়িয়ে দেয়। সুলতানের বারবার বলা সত্ত্বেও কারো এই সাহস হলো না। অবশেষে মুহাম্মদ আলী বেগ এই স্নায়ুচাপের কাজটি সম্পন্ন করলেন। [৩]

বিদ্রোহী বাহিনী থেকে চারজন ব্যক্তি প্রাসাদে প্রবেশ করল এবং সুলতানের সামনে এসে দাঁড়াল। এই চারজন ছিল জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র নেতা। দুইজন তুর্কি মুসলিম ছিল অর্থাৎ আসাদ তোপাতানি এবং আরিফ হিকমত পাশা। আরাম এফেন্দি ছিল আমেনীয় বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান। চতুর্থ ব্যক্তি যে এই চারজনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সে ছিল জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র কোষাধ্যক্ষ ইমানুয়েল কারাসো। [৪]

[১] সুলতান আব্দুল হামিদ সানি, মুহাম্মদ হারব: ২৮২-২৮৩; আল-উসমানিয়্যুন ফিল তারিখ ওয়াল হাদারাহ, মুহাম্মদ হারব: ২২১-২২২; সাহওয়াতুর রাজ্জলিল মারিদ: ৩১০; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: ৩৬০-৩৬১।

[২] ওয়ালিদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: ২৩৫, ২৩৩।

[৩] ওয়ালিদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: ২৩৫।

[৪] ওয়ালিদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: ২৩০।

ইমানুয়েল কারাসো ছিল সেলানিকের ইহুদি ফ্রি-মেসন লজের গ্র্যান্ড মাস্টার। এই লজটি ১৮৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি ছিল এ ধরনের প্রথম লজ।

সুলতান যখন প্রতিনিধিদলে সেই হতভাগা কারাসোকে সবার সামনে দেখলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে আসাদ তোবতানিকে বললেন:

“আমি আপনাকে বলেছি যে আমি আইন এবং পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের অনুসারী। আল্লাহ আজিজ ও কদীরের তকদির এটাই। আমি এটাও জানিয়েছি যে ১৩ই এপ্রিলের বিক্ষোভের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এখন আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন তা অনেক বড় দায়িত্বের বিষয়। কিন্তু খেলাফতের বিষয়ের সাথে এই ইহুদির কী সম্পর্ক? আপনারা কেন তাকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন?” [১]

আসল কথা ছিল এই যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করার পেছনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইহুদিদের পরিকল্পনা কার্যকর ছিল। তারা ফিলিস্তিন ইস্যুতে মাথা নত না করা সুলতানকে এটা দেখাতে চেয়েছিল যে, আজ ইহুদিরাই তার ভবিষ্যতের মালিক। এই কারণেই সুলতানকে পদচ্যুত করার কমিটিতে এই ইহুদিকে বিশিষ্ট রাখা হয়েছিল যাতে সুলতানের মানসিক যন্ত্রণার কোনো সীমা না থাকে।

আসাদ তোবতানি সুলতানকে বললেন: “উম্মাহ আপনাকে পদচ্যুত করেছে।”

সুলতান গান্ধীর্ষ ও মর্যাদার সাথে উচ্চস্বরে বললেন: “ভালো কথা, কিন্তু এর কারণ কী?”

এ কথা শুনে আরিফ হিকমত পাশা ফতোয়া নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং এর পাঠ শোনাতে লাগলেন যাতে সুলতানের বিরুদ্ধে শরীয়তের কিছু বিধান স্থগিত করা এবং ধর্মীয় কিতাব পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ ছিল। যখন আরিফ হিকমত পবিত্র পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলার শব্দগুলো পড়তে লাগলেন, তখন সুলতান চিৎকার করে বললেন: “আমি কোন শরয়ী কিতাব পুড়িয়েছি? হাসবুনা ল্লাহ।”

আরিফ হিকমত ফতোয়া শোনানো শেষ করলে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন: “এই আদেশনামা কোন পদমর্যাদা থেকে জারি করা হয়েছে?”

আরিফ হিকমত বললেন: “পার্লামেন্ট থেকে।” সুলতান বললেন: “সত্যিই! আর এর প্রধান কে?”

উত্তর এলো: “সাইদ পাশা।” এ কথা শুনে সুলতান একটি ধাক্কা খেলেন। “সাইদ পাশা কি সত্যিই এই আদেশ জারি করেছেন?” [২]

কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর সুলতান বললেন:

“আমি ৩৩ বছর উম্মাহ এবং সাম্রাজ্যের খাতিরে সংগ্রাম করেছি, নিজের দেশের নিরাপত্তার চেষ্টা করেছি, নিজের সাধ্যমতো কাজ করেছি। আমি এমন একজন শাসক ছিলাম যার ওপর আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের শাসন ছিল। এখন আমি এই দেশ ঠিক সেভাবেই আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি যেভাবে আমি এটি গ্রহণ করেছিলাম। আমি এর এক ইঞ্চি জমিও কারো সাথে খেয়ানত করে দিইনি। আমার সেবার প্রতিদান আমি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছি। তবে আমার চেষ্টা ছিল যে আল্লাহর হুকুমে আমি আমার শত্রুদের এই সুযোগ দেব না যাতে তারা আমার সেবার ওপর কালো পর্দা টেনে দিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তারা এতেও সফল হয়ে গেল।” [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২০৬, ২০৭; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৩৬১, ৩৯০।

[২] সাইদ পাশা সুলতানের সেই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাদের ওপর সুলতানের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আস্থা ছিল। সুলতানের কাছে তার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার ধারণা করা কঠিন ছিল। পরবর্তীতে সুলতান বন্দিদশায় থাকাকালীন তার মেয়ে আয়েশা উসমানকে বলেছিলেন যে, সাইদ পাশা বিশ্বাসঘাতক নন বরং আমার মনে হয় তিনি ভয় ও আতঙ্কের কারণে শত্রুদের পক্ষ নিয়েছেন। (ওয়ালিদ সুলতান আব্দুল হামিদ: পৃষ্ঠা ৪৭৩)

[৩] ওয়ালিদ আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃষ্ঠা ৪৪০, ৪৪১।

পরের পক্ষ থেকে কোনো গালিগালাজের তীর বাকি থাকেনি

আপনজনদের পক্ষ থেকেও কোনো তিরস্কারের ধরণ বাদ পড়েনি

এই ইশক বা সেই ইশকের জন্য এই দিল লজ্জিত নয়

এই দিলে অনুশোচনার দাগ ছাড়া প্রতিটি দাগই বিদ্যমান [১]

সুলতানের গ্রেফতারি, বন্দিত্ব ও মৃত্যু:

সুলতানকে পরিবার-পরিজনসহ গ্রেফতার করে ট্রেনে বসিয়ে রোমানিয়ার শহর সালোনিকা (সেলানিক)-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। [২] এই সফর সন্ধ্যা সাতটা থেকে পরবর্তী রাত দশটা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পথে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে উত্তেজিত জনতা ট্রেনের ওপর পাথর নিক্ষেপও করে। সালোনিকা পৌঁছে সুলতানকে পরিবারসহ একটি হাভেলি “কাসরে আলাতিনি”-তে নজরবন্দি করে রাখা হয় যেখানে কড়া পাহারা বসানো ছিল। [৩] যখন বলকান যুদ্ধ শুরু হলো, তখন সুলতানকে ইস্তাম্বুলের কাসরে বেলারবেকি-তে স্থানান্তরিত করা হয়। সুলতানের পরিবারও তাঁর সাথে ছিল। নয় বছর বন্দি জীবন অতিবাহিত করার পর ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ (৩০ রবিউস সানি ১৩৩৬ হিজরি) সুলতান আব্দুল হামিদের মৃত্যু হয়। [৪] বন্দি থাকাকালীন সুলতান যে মূল্যবান স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাতে দিকনির্দেশনার বড় উপকরণ রয়েছে।

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি পতনের যুগের সেই সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন যিনি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও উন্মত্তের তরী পার করার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আফসোস যে খোদ স্বদেশীরাই তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়।

খাইর তো সাকি সহি লেকিন পিলায়েগা কিসে

আব না ওহ মে-কাশ রাহে বাকি, না পয়মানে রাহে

রো রহি হ্যায় আজ এক টুটি হুই মিনা উসে

কাল তালাক গারদিশ মে জিস সাকি কে পয়মানে রাহে

আজ হ্যায় খামোশ ওহ দাস্তে জুনুন পরওয়ার জাহা

রাকস মে লায়লা রহি, লায়লা কে দিওয়ানে রাহে

ওয়ায়ে নাকামি মাতা-এ-কারওয়া যাতা রহা

কারওয়া কে দিল সে এহসাসে যিয়া যাতা রহা [৫]

[১] ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

[২] সালোনিকা (সেলানিক): ইউরোপীয় দেশ রোমানিয়ার একটি শহর। এটি ইস্তাম্বুল থেকে উত্তর দিকে ৭৯২ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। রেললাইন বলকান ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে রোমানিয়ায় প্রবেশ করে। সে সময় এই সমস্ত দেশ চুক্তির অধীনে উসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং সেখানে উসমানীয় বাহিনী মোতায়ন ছিল।

[৩] ওয়ালদি আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃষ্ঠা ২৬০, ২৩৬

[৪] আত-তারিখুল ইসলামি লি-ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/ ২০৭

[৫] আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

সুলতানের শাসনামলের ওপর পর্যালোচনা

এই মহান শাসক তাঁর ৩৩ বছরের শাসনকালে খিলাফতকে রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং পশ্চিমা ও ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্রের দৃঢ় মোকাবিলা করেছেন। রাশিয়ার কাছে পরাজয়ের পর যখন উসমানীয় সালতানাত মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল, তখন সুলতান রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে একে রক্ষা করেন এবং সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের আধুনিক পদ্ধতির সাথে পরিচিত করে শক্তিশালী করেন। এই পতনের যুগেও তিনি ক্রিট ও গ্রিসের রণাঙ্গনে খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন।

এই অত্যন্ত ফিতনাপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুলতান যে নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন তা বিস্ময়কর। তিনি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নারীদের বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাদুঘর, এতিমখানা, স্থায়ী হাসপাতাল এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করেন। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগ ছাড়াও হিজাজ রেলওয়েও তাঁর মহান কীর্তিগুলোর মধ্যে গণ্য করা হয়। ইসলামি সংহতি আন্দোলনের চারাগাছও তিনিই রোপণ করেছিলেন, যা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইসলামি আন্দোলনকে রসদ জুগিয়েছিল এবং জনবলও তৈরি করে দিয়েছিল। [১]

বৈদেশিক ঋণ থেকে মুক্তি

সিংহাসনে আরোহণের সময় উসমানীয় সালতানাত ৩০০ মিলিয়ন লিরার ঋণে জর্জরিত ছিল। সুলতান নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে তুরস্কের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি ঘটান এবং ঋণ পরিশোধ অব্যাহত রাখেন। এর ফলে সুলতানের শেষ দিনগুলোতে উসমানীয় সালতানাতে ওপর বৈদেশিক ঋণ মাত্র ৩০ মিলিয়ন লিরা অবশিষ্ট ছিল। [২]

সুলতানের লেখনী সেবা

সুলতান একজন ভালো লেখক ও কবি হওয়ার পাশাপাশি একজন মহান চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। তিনি বিশ্ব পরিস্থিতির ওপর গভীর দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বন্দিদশায় যে স্মৃতিকথা লিখেছেন, তা উসমানীয় খিলাফতের পতনের নেপথ্যে থাকা ইহুদিবাদী ষড়যন্ত্রের পর্দা উন্মোচন করে, যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। তবে সুলতান তাঁর গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে এই গোপন সত্যগুলো সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এই স্মৃতিকথাগুলো “মুজাক্কিরাত সুলতান আব্দুল হামিদ” নামে প্রকাশিত হয়েছে, যা এই যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। সুলতানের সেই পত্রটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা শায়লি সিলসিলার বুজুর্গ শেখ মাহমুদ আবু আল-শামাত-এর নামে লেখা হয়েছিল। সুলতান এতে তাঁর ক্ষমতাচ্যুতির ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন:

“ঐক্যবাদীরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল যেন আমি পবিত্র ফিলিস্তিন ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিই। কিন্তু তাদের বারবার পিড়াপিড়ি সত্ত্বেও আমি তা গ্রহণ করিনি। তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে ১৫ কোটি...”

[১] আদ-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২০৭

[২] মুজাক্কিরাত আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৬৮

ব্রিটিশ পাউন্ডের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরিষ্কার জবাব দেন: “যদি তোমরা আমাকে সারা দুনিয়ার ওজনের সমান সোনাও দাও, তবুও আমি এতে সমর্থন দেব না। ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে উম্মতে মুহাম্মদীর খেদমত করার পর আমি মুসলমানদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করব না।” আমার এই জবাবের পর তারা আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমাকে জানিয়ে দেয় যে তারা আমাকে সেলানিকে পাঠিয়ে দেবে। আমি এই কষ্ট মেনে নিয়েছি। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি যে, আমি ইসলামী দুনিয়াকে সেই কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছি যা পবিত্র ফিলিস্তিন ভূমিতে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতে পারত।“ [১]

সংস্কার কেন সফল হয়নি:

সুলতান আব্দুল হামিদের এই চমৎকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উসমানীয় খিলাফত রক্ষা করা যায়নি এবং সুলতানের জীবদ্দশাতেই এর ডানা ছেঁটে ফেলা হয়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে, সংস্কারের এই কাজ অনেক দেরিতে শুরু হয়েছিল এবং ততদিনে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসলামী বিশ্বের বড় অংশের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। তাদের আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও মিশনারি শক্তি মুসলিম বিশ্বে পুরোপুরি অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে পরিস্থিতির মোড় ঘোরানো এমনভাবে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল যে তা পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। সুলতান আব্দুল হামিদের প্রচেষ্টাগুলো ছিল একদম সঠিক দিকে, কিন্তু মিলাতের এই নাবিক তখন তরী বাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যখন প্লাবন ঘরে ঢুকে পড়েছিল। যদি সুলতান আব্দুল হামিদের মতো কোনো শাসক এক শতাব্দী আগে ক্ষমতায় আসতেন এবং তিনি এই সংস্কারগুলো সেই সময়েই গ্রহণ করতেন, তবে কেবল পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির তুফান থেকেই জাতিকে রক্ষা করা যেত না, বরং মিশর ও উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চল পর্যন্ত উসমানীয় সালতানাতের অবস্থান সুদৃঢ় থাকত।

যা-ই হোক, সুলতান আব্দুল হামিদ এই শেষ যুগে যা কিছু করেছেন, তা অন্তত পরবর্তীদের জন্য একটি পথ নির্ধারণ করে দিয়েছে। আজও মুসলিম শাসকরা সুলতানের প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক পথরেখা থেকে উপকৃত হয়ে পশ্চিমা শাসকদের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

এখন আফসোস করে কী লাভ:

সুলতান আব্দুল হামিদের পর তুরস্কের ধ্বংস এবং মুসলমানদের পরাজয় অবধারিত হয়ে পড়েছিল। ‘জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’-এর নেতারা যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তরুণ, তারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাহীন ছিল। তাদের মধ্যে অনেকে দেশের সেবার নিয়তে আন্তরিক ছিল কিন্তু অজান্তেই তারা জায়েনবাদী এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নির্ধারিত পথে চলে এখানে পৌঁছেছিল। তাদের একটি বড় অংশ ক্ষমতার মোহে মত্ত ছিল। তারা সুলতান আব্দুল হামিদের চিন্তা ও দর্শন বুঝতে পারেনি এবং পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম ও ফ্রিম্যাসনরির জালে আটকা পড়েছিল।

[১] সাহওয়াতুর রাজ্জুলিল মারীয: পৃষ্ঠা ৩১২

সেটিই ছিল অবিনশ্বর ঝর্ণা যাকে সবাই মরীচিকা ভেবেছিল

সেসব স্বপ্নই ছিল নির্ভরযোগ্য যা কল্পনা পর্যন্ত পৌঁছেনি

সেই দৃষ্টি অর্জিত হয়নি যা সৌন্দর্যকে পরিবেষ্টন করতে পারে

তোমার দর্শনের মাধ্যমগুলো অবয়ব পর্যন্ত পৌঁছেনি

কোনো বন্ধু প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কেউ হুঁশ হারিয়েছে

এই এক-দুই পেয়ালার সাথীরা আমার অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছেনি [১]

কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি দেখার পর জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির অনেক জেনারেল প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ভুল স্বীকার করতেন। প্রগতিশীল জেনারেল আইয়ুব সাবরি আক্ষেপ করে বলতেন:

“আমরা ইহুদিদের জালে আটকে গিয়েছিলাম। আমরা ইহুদিদের সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো পূরণ করে দিয়েছি, যার জন্য ফ্রি-মেসনরা সুলতান আব্দুল হামিদকে ত্রিশ মিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা (লিরা) দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল যাতে তিনি তাদের দাবি পূরণ করেন, কিন্তু সুলতান তা গ্রহণ করেননি।” [২]

সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আনোয়ার পাশা জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির আরেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জামাল পাশাকে বলতেন:

“জামাল, তুমি কি জানো আমরা কী ভুল করেছি? আমরা সুলতান আব্দুল হামিদকে চিনতে পারিনি। ফলে আমরা জায়নবাদীদের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছি। বিশ্বব্যাপী ফ্রি-মেসনরা আমাদের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ হাসিল করে নিয়েছে। আমরা আমাদের সংগ্রামকে জায়নবাদের পেছনে ব্যয় করেছি। এটিই আমাদের আসল গুনাহ।” [৩]

আমার হত্যার পর সে নিষ্ঠুরতা থেকে তওবা করেছে

হায়! এই দ্রুত অনুতপ্ত ব্যক্তির অনুশোচনা [৪]

বর্তমান যুগের আমেরিকান প্রাচ্যবিদ বার্নার্ড লুইসও এই সত্য স্বীকার করে লিখেছেন:

“ফ্রি-মেসন কর্মী এবং ইহুদিরা সুলতান আব্দুল হামিদকে সরানোর জন্য গোপনে একে অপরকে সহযোগিতা করতে থাকে, কারণ তিনি ইহুদিদের একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে ফিলিস্তিনের এক বিঘত জমিও ইহুদিদের দিতে অস্বীকার করেছিলেন।” [৫]

[১] ফয়েজ আহমদ ফয়েজ

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৪৬৩, ৪৬৪

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৪৬৩

স্মরণীয় যে, জেনারেল আনোয়ার পাশা অনেক যুদ্ধে তার বীরত্বের কারণে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বলকানের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি বুলগেরিয়ার দখল থেকে আদ্রিয়ানোপলকে মুক্ত করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন তুরস্ক খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করে, তখন তিনি নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে মধ্য এশিয়ায় চলে যান এবং সমরকন্দ ও বুখারাকে কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ শুরু করেন। কয়েক বছরের যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে তিনি রুশদের এক হামলায় শাহাদাত বরণ করেন। তার বয়স ছিল ৪৩ বছর।

[৪] গালিব

[৫] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ৪৬৩

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

উসমানীয় খিলাফত

চতুর্থ পর্যায়

প্রগতিশীলদের আধিপত্যের যুগ

সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ থেকে সুলতান আব্দুল মাজিদ সানি পর্যন্ত

১৩২৭ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি

(১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১৪ বছর

সুলতান রাশাদ, মুহাম্মদ খামিস বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল

১৩২৭ হিজরি থেকে ১৩৩৬ হিজরি

(১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান আব্দুল হামিদের গ্রেপ্তারের একদিন আগে ২৭ এপ্রিল ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (৭ রবিউস সানি ১৩২৭ হিজরি) বিদ্রোহীরা তার ৬৮ বছর বয়সী ভাই মুহাম্মদ রাশাদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। তিনি মুহাম্মদ খামিস উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দূরদর্শিতা, দৃঢ় সংকল্প এবং রাজনৈতিক দক্ষতায় তার ভাইয়ের সাথে কোনো তুলনাই রাখতেন না। উসমানীয় সুলতানদের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি সবার চেয়ে বেশি বয়স্ক ছিলেন। তিনি একাকীত্ব পছন্দকারী মানুষ ছিলেন এবং সুলতান আব্দুল হামিদের আচরণ তাকে আরও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। [১]

জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির প্রতিশোধ:

তার শাসনামলে দেশের শাসনভার মূলত জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির নেতাদের হাতে ছিল। এই লোকেরা ফ্রিম্যাসনরি-র কর্মী ছিল, তাই তারা যে নতুন মুদ্রা জারি করেছিল তাতে ফ্রিম্যাসনরি-র বিশেষ চিহ্ন এবং তাদের বিশেষ স্লোগান অর্থাৎ “স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়বিচার” অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। [২] হিলমি পাশা যদিও প্রধানমন্ত্রী (সদরে আজম) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তার মর্যাদা একটি পুতুলের চেয়ে বেশি ছিল না। ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির নেতৃত্ব তাদের বিরোধীদের বেছে বেছে প্রতিশোধ নিয়েছিল। জমিয়তে ইত্তিহাদ-ই-মুহাম্মাদীর প্রধান হাফেজ দরবেশ ওয়াহদাতিকে তার বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। [৩]

প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল এক চরম স্বৈরাচারী যুগ, যাতে ইসলামপন্থীদের জন্য জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল। তবে এই যুগে লিবারেল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অবশ্যই ছিল যা ইসলামী নিদর্শন এবং শরয়ী বিধান নিয়ে উপহাস করত। অন্যদিকে ওলামাদের ধরপাকড় অব্যাহত ছিল এবং অনেক দীনদার আলেমকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল। [৪]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ২/২০৮; খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ওয়া এহিয়া, হক নেওয়াজ: পৃষ্ঠা ৮৫, ৮৬, ত. জুহাইর পাবলিকেশনস মুলতান।

[২] মাওকিফুদ দাওলাতিল উসমানিয়া মিনাল হারাকাতুস সাহিউনিয়া, হাসান আলী হান্নাক: পৃষ্ঠা ৩৬৩।

স্মরণীয় যে, মোস্তফা কামালের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর রেজা নূরের স্মৃতিকথা অনুযায়ী খলিফা সুলতান রাশাদ নিজেও ফ্রিম্যাসনরি-র সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

[৩] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ২/২০৮; খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ওয়া এহিয়া, হক নেওয়াজ: পৃষ্ঠা ৮৬, ৮৭, ত.

[৪] মাওকিফুদ দাওলাতিল উসমানিয়া মিনাল হারাকাতুস সাহিউনিয়া, ইহসান আলী হান্নাক: পৃষ্ঠা ৩৩১, ৩৩২, ত. বৈরুত।

পাগড়িকে কেবল উপহাসের পাত্রই বানানো হয়নি, বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন মনে করা হতো। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তখন, যখন সুলতান আব্দুল হামিদের তখত উল্টে দিয়ে সালোনিকা থেকে আসা ‘জাইশে হুররিয়াত’ (মুক্তিবাহিনী) জেনারেল মাহমুদ শওকতের নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করেছিল। এই বাহিনী রাস্তায় দেখা পাওয়া প্রত্যেক পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তি, তালিবে ইলম এবং আলেমকে বিনা তদন্তে গ্রেফতার করে নিয়েছিল। এমন সম্মানিত ব্যক্তিদের অপমান করার জন্য ‘পাগড়ি পরিহিত গোষ্ঠী’ (আত-তাইফাতুল মুআম্মাহ) নাম দেওয়া হয়েছিল [১]।

কিন্তু খুশি ছিল যখন তারা বন্ধ ঘরে ছিল

দোর খুলতেই মুখে তালা পড়ে গেল [২]

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় চলা লিবারেল সাংবাদিকতা নারীর বেহায়াপনা ও স্বাধীনতাকেও উৎসাহিত করেছিল। ইহুদি দনমে গোষ্ঠী এতে অগ্রণী ছিল। এই সাংবাদিকরা দাবি করেছিল যে, নারীর পর্দা ইসলামের বিধান নয় বরং এটি রোমানদের একটি প্রথা। তারা কনফারেন্স ও সংগঠনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সাধারণ করার পূর্ণ চেষ্টা করেছিল। এই প্রচারও করা হয়েছিল যে, ইসলাম একটি সেকেলে ধর্ম যা আধুনিক যুগের সাথে তাল মেলাতে পারে না [৩]।

ফ্রিমেসন লজের আধিক্য:

‘ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’ (কমিটি অফ ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস) ক্ষমতায় আসতেই উসমানীয় সালতানাতে ইহুদিরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে যায়। জায়গায় জায়গায় ফ্রিমেসন লজ খুলে যায়।

মাত্র এক বছরে খোলা কেন্দ্রগুলোর একটি বলক লক্ষ্য করুন:

- মাহফিল আল-হিলাল আল-উসমানি (বৈরুত) ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১০ খ্রি.।
- মাহফিল আল-ওয়াহদাত আল-উসমানিয়্যাহ (হিমস) ১৬ আগস্ট ১৯১০ খ্রি.।
- মাহফিল আল-ইত্তিহাদ ওয়াল খুলদ (বাইতুল মাকদিস) ১৯ আগস্ট ১৯১০ খ্রি.।
- মাহফিল আল-মারজ আল-উয়ুন আল-উসমানি (মারজ উয়ুন, শাম) ১০ আগস্ট ১৯১০ খ্রি.।
- মাহফিল মাবাদ সুলাইমান (বাইতুল মাকদিস) ১৩ ডিসেম্বর ১৯১০ খ্রি.।
- মাহফিল আল-জাবাল (বৈরুত) ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯১১ খ্রি. [৪]।

আলবেনিয়া সফর:

১৯১১ সালের জুন মাসে সুলতান রাশাদ আলবেনিয়া সফর করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল বলকান রাষ্ট্রগুলোর আস্থা অর্জন করা যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। তিনি কসোভোতে জুমার নামাজ আদায় করেন। সুলতানকে দেখার জন্য জনগণের বিশাল ভিড় জমেছিল কারণ সুলাইমান আল-কানুনির পর গত ৫৩২ বছরে কোনো উসমানীয় সুলতান এই ভূখণ্ডে আসেননি।

[১] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, সুলাইমান বিন সালিহ আল-খারশি, পৃষ্ঠা ৭১।

[২] আল-হাজ্জাজ।

[৩] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, সুলাইমান বিন সালিহ আল-খারশি, পৃষ্ঠা ৭১-৭২।

[৪] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিদ, পৃষ্ঠা ৩৩২।

...পা রাখেনি। [১]

নির্বাচন এবং নতুন সংসদ:

১৯১২ সালে সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। কামাল পাশাকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। বিজয়ী দল সরকার গঠনের পর তাদের ইশতেহারের মৌলিক নীতি “সাম্য”-কে নিজেরাই পদদলিত করে এবং তুর্কিদেরকে উসমানীয় সালতানাতের অবশিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর (আরব, কুর্দি, আফ্রিকান ইত্যাদি) ওপর স্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। এই আধুনিকতাবাদী নেতারা আরবি ভাষার পরিবর্তে তুর্কি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং “তুর্কি জাতীয়তাবাদ”-এর স্লোগান তুলে খেলাফতে উসমানীয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে দূরে সরিয়ে দেন। [২] জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির এই নেতারা “কেন্দ্রীয়করণ”-এর প্রবক্তা ছিলেন, অর্থাৎ তারা তুরস্ককে ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং জাজিরাতুল আরবের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এরই মধ্যে জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির বিপরীতে “জমিয়তে হুররিয়াত ওয়া ইনতিলাফ” (Freedom and Accord Party) নামে আরও একটি উদারপন্থী রাজনৈতিক দল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যা এর বিপরীতে “বিকেন্দ্রীকরণ”-এর পতাকাবাহী ছিল। তাদের মতে, প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উচিত এবং তুর্কিদের শাসন কেবল তুরস্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। [৩]

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনসমূহ:

তুরস্কে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও চিন্তাধারার একটি জোয়ার এসেছিল। আব্দুল করিম খলিল এবং জেনারেল আজিজ মিসরি “জমিয়তে কাহতানিয়া” গঠন করেন, যার ইশতেহার ছিল ইরাক, সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তিন এবং জাজিরাতুল আরবকে একত্রিত করে একটি স্বায়ত্তশাসিত আরব রাষ্ট্র গঠন করা, যা তুরস্কের সাথে মৈত্রীবদ্ধ থাকবে এবং খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় থাকবে।

কিন্তু বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র ছিল উসমানীয় সালতানাতকে কেবল এশিয়া মাইনর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেওয়া এবং সমস্ত আরব প্রদেশকে খেলাফতের ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে প্যারিসে “জমিয়তে জাওয়ানানে আরব” (আল-জামিয়াতুল আরাবিয়াতুল ফাতাত) গঠিত হয়েছিল, যার ইশতেহার ছিল আরব প্রদেশগুলো তুরস্ক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে এবং খেলাফতের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

এই দলগুলোতে খ্রিস্টান আরবরাও পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আঞ্চলিক পর্যায়ে সশস্ত্র দলগুলোও গঠিত হয়েছিল। ইরাকের রাজনৈতিক নেতারা ব্রিটেনের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাতে তারা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে ইরাককে একটি নতুন আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। সিরিয়া ও লেবাননে ফ্রান্সের দখল ছিল, সেখানে “আল-জামিয়াতুল ইসলাহিয়াহ” এবং “আল-নাহদাতুল লুবনানিয়াহ” ফ্রান্সের...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ২০৮/২; খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ওয়া ইহয়া, হক নেওয়াজ: পৃ. ৮৬-৮৭, ত: জুহাইর পাবলিকেশনস মূলতান।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, আলী হাসুন: পৃ. ৪৭৫-৪৭৬; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ২১০-২১১/৮।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ২১২/৮।

দাবি করা হলো যে, তিনি যেন সিরিয়া ও লেবাননকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। ফ্রান্স এই নেতাদের প্যারিসে একত্রিত করে এবং আব্দুল হামিদ জাহরাভির নেতৃত্বে একটি দল গঠন করে, যার ইশতেহারে স্থির করা হয়েছিল যে আন্দোলনটি হবে ধর্মনিরপেক্ষ, এটি আরব জাতীয়তাবাদের জন্য কাজ করবে এবং আরব অঞ্চলগুলোতে আরবিকেই সরকারি ভাষা করা হবে। এর নেতাদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের অনুপাত সমান হবে। [১]

পরিশেষে, কয়েক মাসের মধ্যে গণতন্ত্রের নামে উসমানীয় সাম্রাজ্যে এমন ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে সংহতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তুরস্ক পশ্চিমা শক্তিগুলোর জন্য একটি সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। এটিই ছিল সেই বিপদ যার কারণে সুলতান আব্দুল হামিদ কিছুকাল পর গণতন্ত্রের পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছিলেন।

সেই একই পুরনো বাদ্যযন্ত্র পশ্চিমের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

যার পর্দার আড়ালে কায়সারি সুর ছাড়া আর কিছুই নেই

স্বৈরাচারের দানব গণতান্ত্রিক পোশাকে নৃত্যরত

তুমি মনে করছ এটি স্বাধীনতার নীল পরী

সংবিধান সভা, সংস্কার, সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার

পাশ্চাত্য চিকিৎসায় স্বাদে মিষ্টি, কিন্তু প্রভাবে তন্দ্রাচ্ছন্নকারী

পরিষদ সদস্যদের বাগ্মিতার উত্তাপ, আল্লাহ রক্ষা করুন!

এটিও পুঁজিপতিদের একটি ছদ্মযুদ্ধ

এই রঙ ও ঘ্রাণের মরীচিকাকে তুমি বাগান মনে করেছ

হায় ওহে নির্বোধ! খাঁচাকে তুমি নীড় মনে করেছ। [২]

এই আরব নেতাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যারা আরবি ভাষা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে, নিজ নিজ দেশের শাসনব্যবস্থা উন্নত করতে, তাদের উন্নতি করতে এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তারা উসমানীয় খিলাফতের সাথে সম্পর্কহীনতা বা শত্রুতার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু জাতীয়তাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ ও ভাষাগত উগ্রতা অবলম্বনকারী উপাদানগুলো তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেল এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও চিন্তাধারার ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাদের পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য করল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলামপন্থী এবং কেউ কেউ দৃঢ় ধর্মীয় মেজাজের লোকও ছিলেন যারা মুসলমানদের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু নিজেদের উদ্দেশ্যের জন্য তারা পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেন এবং সহজেই বিদেশি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যান; ফ্রিম্যাসনের মতো ইহুদি সংগঠনগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে নিল। সুতরাং এটি যদি তাদের অজ্ঞতা, নিবুদ্ধিতা ও মূর্খতা হয়ে থাকে, তবে একে কোনোভাবেই ক্ষমাযোগ্য বলা যায় না।

[১] ইকবাল

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি, পৃষ্ঠা: ৩১৫-৩১৬; আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির: ৮/২২১-২২২।

তারিখে উন্মত্তে মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম বলকান যুদ্ধ:

সুলতান মুহাম্মদ রশাদের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে উসমানীয় সালতানাত দ্রুত দুর্বল হতে থাকে। পশ্চিমা বিশ্ব, যারা দীর্ঘকাল ধরে এই সময়ের অপেক্ষায় ছিল, তারা অবিলম্বে তুরস্কের ওপর মারাত্মক আঘাত হানার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯০৯ সালে সুলতান আব্দুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতির কয়েক মাস পরেই বলকান সংকট তীব্রভাবে দেখা দেয়। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা রাজ্যগুলো নামমাত্র তুরস্কের সাথে যুক্ত থাকলেও অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল। অস্ট্রিয়া সেগুলোকে পুরোপুরি নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করল। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া রাশিয়াকে এই মর্মে রাজি করিয়েছিল যে, তারা বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না, এর বিনিময়ে অস্ট্রিয়া দার্দানেলস এবং বসফরাস প্রণালীর ওপর রাশিয়ার দখলের পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখবে। রাশিয়ার সাথে আলোচনার পর অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে নিজেদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

এই ঘটনার ফলে বিশ্বশক্তিগুলোর মধ্যে এক নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। সার্বিয়া ও ইতালি, যারা দীর্ঘকাল ধরে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে নিজেদের সম্পত্তি বানাতে চেয়েছিল, তারা অস্ট্রিয়ার এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়। ইতালি অবিলম্বে রাশিয়ার সাথে একটি চুক্তি করে যে, অস্ট্রিয়া যদি বলকানে আরও সৈন্য সমাবেশ করে তবে তারা উভয় মিলে তা প্রতিহত করবে।

এদিকে জাবালে আসওয়াদ অঞ্চলেও বিদ্রোহ শুরু হয়। সেই সাথে বলকান রাষ্ট্র সার্বিয়া, বুলগেরিয়া এবং গ্রিস সম্মিলিতভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং গ্রিক বাহিনী ক্রিট দ্বীপে প্রবেশ করে।

এই যুদ্ধকে “প্রথম বলকান যুদ্ধ” বলা হয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয় এবং এদিরনে (আদ্রিয়ানোপল) এর ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়। আধুনিকতাবাদীদের সরকার এই বিদ্রোহগুলো দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

সালোনিকাও বলকান বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। তাই সেখানে গৃহবন্দী থাকা প্রাক্তন সুলতান আব্দুল হামিদকে একটি নৌকায় করে ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসা হয়। নৌকায় ওঠার সময় প্রাক্তন সুলতান ইত্তিহাদ ও তারাক্কি সরকারকে এভাবে অভিশাপ দেন:

“আল্লাহ তাঁর কাহহার নামের মাধ্যমে এই লোকদের ওপর গজব নাজিল করুন যারা এই পরিস্থিতির কারণ হয়েছে। তারা সালতানাতকে ধ্বংস করে দিয়েছে।”

প্রাক্তন সুলতানকে ইস্তাম্বুলে এনে বেইলারবেয়ি প্রাসাদে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। এই নাজুক পরিস্থিতিতেও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা নেওয়ার এবং রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করা হয়নি। প্রাক্তন সুলতানের স্থানান্তরের এক সপ্তাহ পরেই সালোনিকার পতন ঘটে।

বলকানের রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে আরও ক্ষতি এড়ানো জরুরি ছিল। সুলতান রশাদ চেয়েছিলেন ইত্তিহাদ ও তারাক্কি জামায়াতকে পুরোপুরি ক্ষমতাচ্যুত করে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, কিন্তু তিনি মন্ত্রিসভা বরখাস্ত করে নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি। কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁকে সুলতান আব্দুল হামিদের মতো পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

ইত্তিহাদ ও তারাক্কি জামায়াত যুদ্ধবিরতির জন্য ইউরোপীয় ও বলকান রাষ্ট্রগুলোর শর্তাবলী মেনে নেয়। ৩০ মে ১৯১৩ সালে লন্ডন...

চুক্তির ফলে তুরস্ক এড্রিয়ানোপল (এদিরনে) সহ ইউরোপে তার প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চল হারায়। আলবেনিয়াকেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

[১]

যুগে যুগে লাঞ্ছিত হয়েছে লাল রঙের টুপি

যারা ছিল আগাগোড়া গর্বিত, আজ তারা বিনয়ে বাধ্য

পাশ্চাত্যের কূটকৌশলে মিল্লাতের এই অবস্থা হয়েছে

যেভাবে কাঁচি সোনাকে টুকরো টুকরো করে দেয়। [২]

হিন্দুস্তানের মুসলমানদের কোরবানি:

বলকান যুদ্ধের সময় হিন্দুস্তানের মুসলমানরা তাদের পরাধীনতা সত্ত্বেও অসাধারণ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন করেছিল। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর উৎসাহে মুসলমানরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জোহরের আবেদনে তুর্কিদের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ১৯১২ সালের শেষের দিকে ডক্টর মুখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে ১৩৫ জন সদস্যের একটি চিকিৎসা প্রতিনিধি দল তুরস্কে পৌঁছায় যাতে আহত তুর্কিদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা যায়। এই প্রতিনিধি দল সেখানে আট মাস ধরে সেবা প্রদান করে। [৩]

তুরস্কের ক্ষয়ক্ষতি:

সাড়ে সাত মাস ধরে চলা এই যুদ্ধে তুরস্ক যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, তা গত ছয় শতাব্দীর মোট ক্ষতির চেয়েও বেশি ছিল। চোখের পলকে তুরস্ক ১ লক্ষ ৬৩ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা এবং ৬৫ লক্ষ ৮২ হাজার জনসংখ্যা হারায়। সাতটি প্রদেশ (সেলানিক, মোনাস্টির, কসোভো, স্কোপিয়ে, শকোড্রা, ইয়ানিনা, এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ক্রিট) তার হাত থেকে চলে যায়। এই সাতটি প্রদেশে ৩৩টি জেলা এবং ১৫৮টি শহর ছিল যা থেকে উসমানীয় সাম্রাজ্য বঞ্চিত হয়।

খ্রিস্টানদের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো, বিশেষ করে বুলগেরিয়ার উগ্র খ্রিস্টানরা মুসলিম জনবসতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রতিটি শহরে নারী, শিশু ও বৃদ্ধের পার্থক্য না করে হাজার হাজার মুসলমানকে গণহারে হত্যা করা হয়। লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই রাজ্যগুলো থেকে হিজরত করে ইস্তাম্বুল এবং এশিয়া মাইনরের শহরগুলোর দিকে চলে যেতে শুরু করে। ১৯১২ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। গ্রিস সেলানিকসহ দক্ষিণ মেসিডোনিয়া দখল করে নেয়। সার্বিয়া কসোভোসহ উত্তর মেসিডোনিয়া দখল করে নেয়।

আলবেনিয়া, যেখানে ৭০ শতাংশ জনসংখ্যা ছিল মুসলিম, তাকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সেখানকার শাসক হবেন কোনো উসমানীয় শাহজাদা। কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিগুলো এই চুক্তিকে ধূলিসাৎ করে আলবেনিয়ার অর্ধেক অংশ সার্বিয়াকে দিয়ে দেয় এবং অবশিষ্ট অংশে জার্মানির এক অল্পবয়সী শাহজাদাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। এভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পুরোপুরি খ্রিস্টানদের কবলে ঠেলে দেওয়া হয়।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/৩১৩; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়িলমাজ ওজতুনা: ২/২১৮

[২] ইকবাল

[৩] খিলাফতে ইসলামিয়া সুকুত ও এহইয়া: পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭

[১]

দিয়ে দেওয়া হলো।

ত্রিপোলি (লিবিয়া) এর পতন

উত্তর আফ্রিকায় ত্রিপোলি (লিবিয়া) ছিল একমাত্র দেশ, যা সেই চরম দুর্দিনেও উসমানীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত ছিল। আয়তনে এটি বর্তমান তুরস্কের চেয়ে দ্বিগুণ এলাকা ছিল, যার মধ্যে নাইজেরিয়া এবং চাদও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকাংশ ভূমি ছিল মরুদ্যান এবং মরুভূমি। সুলতান আব্দুল হামিদ এই অঞ্চলের গুরুত্ব জানতেন, তাই তাঁর আমলে এখানে সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন মোতায়েন ছিল। কিন্তু এরপর এখানে তুর্কি বাহিনীও ছিল না, কোনো জেনারেলও ছিল না।

এদিকে ইতালি, যা রোমান পোপের প্রাচীন কেন্দ্র ছিল, ফ্রান্সকে আলজেরিয়া এবং ব্রিটেনকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে উপমহাদেশ পর্যন্ত দখলদার হিসেবে দেখার পর উত্তর আফ্রিকায় অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আধুনিক ইতালির প্রতিষ্ঠাতা মার্টিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, লিবিয়া ইতালির উত্তরাধিকার। ত্রিপোলি ছাড়াও ইতালি ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ উসমানীয় বন্দরসমূহ: ইজমির, ইস্কান্দারুন এবং আন্তাকিয়া, সেইসাথে পূর্ব ইউরোপের মুসলিম রাষ্ট্র আলবেনিয়াও দখল করার পরিকল্পনা করেছিল। ইতালি শুরুতে ত্রিপোলিতে স্কুল ও ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা কূটনীতি এবং লেনদেনের রাজনীতির মাধ্যমে ইউরোপীয় দেশগুলোকে এই বিষয়ে সম্মত করে যে, তারা যেন ত্রিপোলির আধিপত্যে কোনো হস্তক্ষেপ না করে এবং একে ইতালির উপনিবেশ হতে দেয়।

ত্রিপোলির পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল, কিন্তু ইস্তাম্বুল সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাক্কি পাশা তা গোপন করে রেখেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাক্কি পাশা ইতালীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন এবং ইস্তাম্বুলে অবস্থিত ইতালীয় দূতাবাসে তাঁর যাতায়াত ছিল প্রচুর। তিনি ত্রিপোলিতে ইতালির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছিলেন। ইতালিতে নিযুক্ত তুর্কি রাষ্ট্রদূত ত্রিপোলির পতনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য ইস্তাম্বুলে যে পত্রগুলো পাঠিয়েছিলেন, হাক্কি পাশা সেগুলোকেও কারো সামনে আসতে দেননি।

আক্রমণের আগে ইতালি তুরস্কের বিরুদ্ধে ত্রিপোলির জনগণের অধিকার হরণ করার অভিযোগ আনে এবং খলিফাকে আল্টিমেটাম পাঠায় যে, ত্রিপোলিতে বসবাসরত ইতালীয় নাগরিকদের অভিযোগ দূর করো অথবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। খলিফার পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়ার আগেই ইতালি সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই হঠাৎ তাদের বাহিনী ত্রিপোলির উপকূলে নামিয়ে দেয়। খলিফা মুহাম্মদ রাশাদ ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে প্রতিবাদ জানান, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। ইতালীয় বাহিনী ত্রিপোলির বড় উপকূলীয় শহরগুলো: ত্রিপোলি এবং বেনগাজিকে ঘিরে ফেলে। ৩ অক্টোবর আক্রমণকারীরা ত্রিপোলিতে ঢুকে পড়ে। ১৯ অক্টোবর তারা বেনগাজিও দখল করে নেয়। এই আক্রমণে ইতালীয় সৈন্যরা আরবদের ওপর চরম পাশবিক নির্যাতন চালায়। ঘরে ঢুকে নারীদের শ্লীলতাহানি...

[১] তারিখদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২১৮-২২০।

এবং শিশুদের পর্যন্ত অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করল।

এই সংবাদ পাওয়ার পর তুর্কি সরকার ব্রিটেনের কাছে আবেদন করল যেন তাদের মিশরের মধ্য দিয়ে ত্রিপোলিতে সৈন্য পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজরা দীর্ঘ সময় ধরে উসমানীয় সালতানাতের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে আসছিল এবং এই সুযোগে তারা মিশরের ওপর, যা নীতিগতভাবে উসমানীয় সালতানাতের একটি প্রদেশ ছিল, অবৈধ দখল বজায় রেখেছিল। কিন্তু এখন চরম প্রয়োজনের সময় তারা চোখ ফিরিয়ে নিল এবং পথ দিতে পরিষ্কার অস্বীকার করল।

অবশেষে তুরস্ক থেকে জেনারেল আজিজ মিসরি, জেনারেল আনোয়ার পাশা এবং জেনারেল নুরি সমুদ্রপথে ত্রিপোলি আল-গারব রক্ষার জন্য পৌঁছালেন। সহকারী জেনারেলদের মধ্যে মোস্তফা কামালও ছিলেন। ত্রিপোলি আল-গারবের স্থানীয় উলামা ও মাশায়েখদের আধ্যাত্মিক ও জিহাদি সংগঠন ‘আল-হারাকাতুস সেনুসিয়া’-র কর্মীরাও তাদের সাথে যোগ দিলেন। তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ইতালীয় বাহিনী উপকূল থেকে আর এগোতে পারল না। মুজাহিদিনরা ত্রিপোলি পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং তারা বেনগাজি রণাঙ্গনেও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করলেন।

এই যুদ্ধগুলোতে মুসলমানরা ঈমানি গায়রাত এবং আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের এমন না-বলা ও না-শোনা কাহিনী রচনা করলেন। ইসলামী সীমান্ত রক্ষার জন্য নারী, শিশু এমনকি বৃদ্ধরা পর্যন্ত নিজেদের জীবন বাজি ধরলেন। এই নিষ্পাপদের মধ্যে বারো বছর বয়সী এক বালিকা ফাতেমা বিনতে আবদুল্লাহ ছিল, যাকে কামানের গর্জন, ধেয়ে আসা অগ্নিশিখা, ধোঁয়ার মেঘ এবং বারুদের ঘূর্ণিবাতাসের মধ্যে হাতে পানির বোতল নিয়ে আহত মুজাহিদিনদের পানি পান করানোর জন্য দৌড়াতে দেখা যেত। যখন একটি যুদ্ধে এই নিষ্পাপ বালিকা শহীদ হলো, তখন প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবালও তাকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে বাধ্য হলেন:

ফাতেমা তুমি তো মরহুম মিল্লাতের সম্মান

তোমার এক মুঠো ধূলিকণার প্রতিটি অণু নিষ্পাপ

মুজাহিদিনদের ক্রমাগত আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে ইতালি তুরস্ককে হুমকি দিল যে তারা ইস্তাম্বুল দখল করে নেবে। কিন্তু খলিফা মুহাম্মদ রাশাদ এতে কোনো ভ্রক্ষেপ করলেন না। এর ফলে ইতালীয় নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে রোডসসহ তুরস্কের বারোটি দ্বীপ দখল করে নিল এবং বৈরুত বন্দরকেও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করল।

১৯১২ সালে ইতালীয় বাহিনী ত্রিপোলি আল-গারব (লিবিয়া)-এর প্রধান শহরগুলো: ত্রিপোলি, বারকা এবং ফাজ্জান দখল করে নিল এবং তুর্কি বাহিনী কোণঠাসা হয়ে পড়ল। খলিফা বাধ্য হয়ে ইতালির সাথে একটি চুক্তি করলেন যার অধীনে তুর্কি বাহিনীকে নিরাপদে ফিরে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হলো। জেনারেল আনোয়ার পাশা ফিরে যেতে চাননি কিন্তু তাকে বাধ্য করা হলো। তবে জেনারেল আজিজ সেখানেই থেকে গেলেন এবং সেনুসি মুজাহিদিনদের সাথে মিলে ইতালীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেলেন। ইতালীয় কর্তৃপক্ষ ত্রিপোলি আল-গারবের নাম পরিবর্তন করে ‘লিবিয়া’ রাখল যা আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

১৫ অক্টোবর ১৯১২ সালে খলিফার অনুমোদনে লুসান চুক্তি কার্যকর হলো যাতে লিবিয়ার ওপর ইতালির আধিপত্য মেনে নেওয়া হলো। সেই সাথে এটিও স্থির হলো যে তুরস্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবে লিবিয়ায় নিযুক্ত থাকবেন। শরয়ী কর্মকর্তাদের

ইস্তাম্বুল থেকে নিয়োগ করা হবে। রোডস এবং বারোটী দ্বীপ তুরস্ককে ফেরত দেওয়া হবে।

[১]

সানুসি মুজাহিদদের জিহাদ আন্দোলন এবং ওমর মুখতার শহীদ:

লিবিয়ায় ইতালির জবরদখল অভিযান চলছিল, এমন সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, যাতে ইতালি ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার পক্ষ নেয়, অন্যদিকে তুরস্ক ছিল জার্মানির পাশে। এভাবে ইতালি ও তুরস্ক পুনরায় মুখোমুখি হয়। তুরস্ক এই সময়ে সানুসি মুজাহিদদের যথাসম্ভব আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, ফলে এই জানবাজদের আরও কয়েক বছর লড়াই করার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু যখন মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হলো, তখন তারা আর কাউকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় রইল না। তা সত্ত্বেও সানুসি মুজাহিদরা দীর্ঘ সময় ধরে এই অঞ্চলকে নিজেদের রক্তে রঞ্জিত করতে থাকেন। তাদের আধ্যাত্মিক নেতা মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে অবস্থান করেন, অন্যদিকে ময়দানি নেতা ওমর মুখতার দুই দশক ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং ইতালীয় বাহিনীকে স্থানে স্থানে পরাজিত করেন। ১৯৩১ সালে ওমর মুখতারের গ্রেপ্তার ও শাহাদাতের পর ইতালি এই দেশটির ওপর পুরোপুরি দখলদারিত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়। [২]

যখন প্রাণের পতাকা নিয়ে বের হলাম, আমরা ধূলিশায়ী মাকতাল মাকতাল

সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, জল্লাদের ওপর আতঙ্ক বিরাজ করছে

জখমে শরীর গুলজার হোক না কেন, কিন্তু তাদের ভাঙা তীরগুলো গণনা করো

তুণধারীরা নিজেরাই বলে দেবে, এই বাজি কে হেরেছে [৩]

জমিয়ত হুররিয়াত ওয়া ইত্তিলাফ-এর সাফল্য, কামিল পাশার সরকার:

ত্রিপোলির পতন এবং বলকানের পরাজয় পুরো তুরস্ককে শোকাবুত করে দিয়েছিল।

তুরস্কের ডান হাত কাটা পড়েছিল। আফ্রিকায় তাদের কাছে এক ইঞ্চিও জমিও অবশিষ্ট ছিল

না। ব্রিটিশ নৌবহর পারস্য উপসাগরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তুরস্কের কাছে দাবি করছিল

যেন তারা কুয়েত, কাতার এবং হাজরামাউতের বন্দরগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়।

তুরস্কের জনগণ এবং সামরিক কর্মকর্তারা চরম শোকের মধ্যে ছিলেন। জমিয়ত ইত্তিহাদ

ওয়া তারাক্কি-র জনপ্রিয়তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল এবং বিরোধী দল “জমিয়ত হুররিয়াত

ওয়া ইত্তিলাফ” (Freedom and Accord Party)-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। [৪]

যেহেতু জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি নির্বাচনে পরাজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, তাই সবার

আগে তারা সংবিধানের ৩৫ নম্বর ধারাকে

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/৪০৯ থেকে ৪১১; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহজ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৩৬; আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলমিয়া: লিবিয়া অধ্যায়, ওমর মুখতার।

এই যুদ্ধের সবচেয়ে বিস্তারিত বিবরণ শেখ তাহের আহমদ তারাবলুসির রচিত “জিহাদুল আবতাল ফি তারাবলুসিল গারব” এর ৮৩৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।

দ্রষ্টব্য: কিন্তু ইতালি রোডস এবং বারোটী দ্বীপ তুরস্কের কাছে হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৫ সালে জার্মানি যখন এই দ্বীপগুলো দখল করে, তখন তারা সেগুলো তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কিন্তু তুরস্ক তা গ্রহণ করেনি। এরপর এই দ্বীপগুলো গ্রিসের দখলে চলে যায়।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, আওয়ামিলুন নুহজ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৩৭; আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলমিয়া: লিবিয়া অধ্যায়, ওমর মুখতার।

[৩] আহমদ ফারাজ।

[৪] এই দলটি ২১ নভেম্বর ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৯১৯ সালে এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল যাতে নতুন সরকার দ্রুত ভেঙে দেওয়া যায়। সংবিধানের মূল খসড়া যা ১৮৭৬ সালে মিদহাত পাশা সুলতান আব্দুল হামিদের মাধ্যমে মঞ্জুর করিয়েছিলেন, তার ৩৫ নম্বর ধারা সুলতানকে যেকোনো সময় পার্লামেন্ট এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার অধিকার প্রদান করত। সুলতান আব্দুল হামিদ নিজের শাসনামলে এই অধিকার ব্যবহার করে পার্লামেন্ট স্থগিত করেছিলেন। জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি ক্ষমতা গ্রহণ করে এই অধিকারকে শর্তযুক্ত করে দিয়েছিল, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল যে সুলতান সিনেটের সাথে পরামর্শ করে তবেই পার্লামেন্ট স্থগিত করতে পারবেন। কিন্তু যখন জমিয়ত দেখল যে বিরোধী দল (হিযব-ই-ইখতিলাফ) প্রবল হয়ে উঠছে, তখন তারা সংবিধানের এই ধারায় পুনরায় সংশোধন করে সুলতানকে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদান করল। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি বিরোধী দল সরকার গঠনও করে, তবে সুলতানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তা যেকোনো সময় শেষ করে দেওয়া যাবে।

যাই হোক, বিরোধী দল যথেষ্ট জনসমর্থন লাভ করেছিল। তাই যখন ১৯১২ সালের এপ্রিলে (১৩৩০ হিজরি) উসমানীয় সালতানাতের ইতিহাসে দ্বিতীয়বার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তখন “জমিয়তে হররিয়াত ও ইখতিলাফ” (Freedom and Accord Party) জাতীয় পরিষদের ২৭৫টি আসনের মধ্যে ২৬৯টি আসনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করল। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল যে জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি জনগণের সমর্থন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। ফলে জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কিকে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে হলো এবং মুহাম্মদ কামিল পাশার সভাপতিত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। [১]

ফৌজি ইনকিলাব - কামিল পাশা অপসারিত - মাহমুদ শওকত পাশার হত্যাকাণ্ড:

কিন্তু জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির জেনারেলরা এই নির্বাচিত সরকারকে এক বছরও চলতে দেননি। ২৩ জানুয়ারি ১৯১৩ সালে ‘হিযবুল হররিয়াহ ওয়াল ইখতিলাফ’-এর তখত উল্টে দেওয়া হলো। জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির সাথে সংশ্লিষ্ট জেনারেল আনোয়ার পাশা সিপাহিদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ কামিল পাশার প্রাসাদে ঢুকে পড়লেন এবং জোরপূর্বক তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন।

জেনারেল মাহমুদ শওকতের নেতৃত্বে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। ইনি সেই মাহমুদ শওকত ছিলেন যিনি সুলতান আব্দুল হামিদের তখত উল্টে দিয়েছিলেন এবং ১৯০৮ ও ১৯০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত গুরুতর রাজনৈতিক ও জাতীয় অপরাধের সাথে জড়িত ছিলেন।

তবে মাহমুদ শওকত সরকারের লাগাম হাতে নিয়ে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন যা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে তিনি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছেন। তিনি আরবদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১১ জুন ১৯১৩ সালে তাকে হত্যা করা হলো। তিনি সরকারি মোটরগাড়িতে করে নিজের বাসভবনের দিকে যাচ্ছিলেন, পথে তাকে থামিয়ে পাঁচটি গুলি করা হয়। [২]

সামরিক ত্রয়ীর (মিলিতারি ট্রায়াল) একাধিপত্য:

এই হত্যাকাণ্ডের পর তালাত পাশা, আনোয়ার পাশা এবং জামাল পাশা সুলতান রাশাদকে বাধ্য করে নিজেদের পছন্দমতো পদে নিয়োগের অনুমোদন করিয়ে নিলেন। তালাত পাশা প্রধানমন্ত্রীর পদ (উযরাতে উজমা), আনোয়ার পাশা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জামাল পাশা নৌ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ২১২/৮

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইয়ালামায ওযতুনা: ৩২২, ৩২১/২; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ২১২, ২১৩/৮

গেল। সাঈদ হালিম পাশাকে সদরে আজম বানানো হলো কিন্তু তার অবস্থান ছিল নিছক আনুষ্ঠানিক। যৌথভাবে দেশের লাগাম ত্রয়ীর হাতে ছিল। তবে তারা নিজেরা ভিন্ন মতাদর্শের ছিলেন, তাদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ:

- তালাত পাশা জাতীয় চেতনার পতাকাবাহী, বুদ্ধিমান ও ধূর্ত ছিলেন কিন্তু ধর্মীয় চেতনা বর্জিত এবং জ্ঞান ও গুণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি ‘কেন্দ্রীয়করণ’-এর প্রবক্তা ছিলেন এবং সমস্ত প্রদেশকে তুরস্কের সাথে সংযুক্ত রাখতে এবং ‘উসমানীয়বাদ’কে উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন।
- জামাল পাশা তুর্কি জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রবক্তা ছিলেন।
- আনোয়ার পাশার বয়স তখন ছিল মাত্র ৩২ বছর। তিনি মধ্যম সারির অফিসার থেকে হঠাৎ চিফ অফ আর্মি স্টাফ পদে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ৩ জানুয়ারি ১৯১৪ সালে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও হন এবং পুরো দেশের সেনাবাহিনী এই একক ব্যক্তির হাতে চলে আসে। এই উত্থানে জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি ছাড়াও রাজপরিবারের সাথে সম্পর্কেরও ভূমিকা ছিল কারণ তার স্ত্রী খলিফা রশাদের ভাতিজি ছিলেন। আনোয়ার পাশা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিপরীতে ইসলামপন্থী, ধর্মপ্রাণ এবং পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার আত্মমর্যাদা ও সাহসিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না কিন্তু একগুঁয়েমি ও সংকীর্ণমনা দৃষ্টিভঙ্গি তার অনেক গুণকে ল্হান করে দিয়েছিল। তিনি নিছক পক্ষপাতের কারণে সেইসব অধিকাংশ অফিসারকে বরখাস্ত করেছিলেন যাদের প্রশিক্ষণে প্রাক্তন সুলতান আব্দুল হামিদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন এবং যারা ইসলামি চেতনা ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতার কারণে ভবিষ্যতে তুরস্কের প্রতিরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারতেন।

তবে আনোয়ার পাশা নতুন অফিসার ও সৈন্য নিয়োগ করে তাদের অল্প সময়ের মধ্যে কঠোর প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রথম বলকান যুদ্ধে পরাজিত তুর্কি বাহিনীকে স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় সংগঠিত, শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী করে তোলেন যা দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছিল। [১]

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ:

বলকান জোট তুরস্কের কাছ থেকে ইউরোপীয় অধিকৃত অঞ্চলগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার কয়েক মাস পরেই নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। বুলগেরিয়া যখন মেন্ডেলিনার শাসনভার গ্রহণ করল তখন রোমানিয়া, সার্বিয়া ও গ্রিস একে অসহনীয় মনে করে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

২৯ জুন এই যুদ্ধ শুরু হয়। এই সুযোগে তুরস্কও বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং রণক্ষেত্রে একাধিক সাফল্য অর্জন করে। অবশেষে ১৯১৪ সালে লন্ডনে যুদ্ধরত পক্ষগুলো আলোচনার জন্য বসে যার ফলে তুরস্ক প্রথম বলকান যুদ্ধে হাতছাড়া হওয়া কিছু এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় যার মধ্যে ‘এদিরনে’ (আদ্রিয়ানোপল) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওজতুনা: ২/২২৫, ২২৬, ২২৮; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৩

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৩

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে শুরু হয়েছিল?

১৮৭০ সাল থেকে ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যে সামরিক শক্তির ভিত্তিতে সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। জার্মানির সাথে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির যৌথ সালতানাতের চুক্তি হয়েছিল এবং তাদের “কেন্দ্রীয় শক্তি” বলা হতো। অন্যদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল এবং তাদের “মিত্র শক্তি” বলা হতো। তৃতীয় পক্ষ তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু সুলতান আব্দুল হামিদের আমলে রেলওয়ে লাইন প্রকল্পে অংশীদারিত্বের কারণে তুরস্ক ও জার্মানি খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল।

এটি ছিল সেই পরিবেশ যাতে হঠাৎ করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধকে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা বলা হলে ভুল হবে না। এটি বিশ্বের মানচিত্র যেভাবে বদলে দিয়েছে, তা কল্পনাও করা যায় না। বিশ্বের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং মহামারি পরাজিত দেশগুলোকে গ্রাস করে নেয়। শক্তির কেন্দ্রগুলো বদলে যায়। বিশ্ব সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মালিকরা বদলে যায়। বড় বড় রাজকীয় পরিবার, যাদের অধীনে কোটি কোটি টাকার ধনভাণ্ডার ও সম্পদ ছিল, তারা কপর্দকহীন হয়ে পড়ে। অবর্ণনীয় পরিমাণ সম্পদ ও ঐশ্বর্য কয়েকজন বিজয়ীর হাতে চলে যায়।

বিজয়ী শক্তিগুলো পরাজিত দেশগুলোর কাছ থেকে ভয়াবহ প্রতিশোধ নেয় এবং তাদের কেবল রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়নি, বরং তাদের প্রাচীন রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে তাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তুরস্ক থেকে উসমানীয়দের সাড়ে সাতশ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। জার্মানি থেকে হোহেনজোলার্ন (Hohenzollern) এবং অস্ট্রিয়া থেকে হ্যাবসবার্গ (Habsburg) রাজবংশের পতন ঘটে। এমনকি এই যুদ্ধের প্রভাব বিজয়ী জাতিগুলোকেও ছাড়েনি। রাশিয়া, যে অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে এই যুদ্ধ শুরু করেছিল, রাজনৈতিকভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে লেনিন জারতন্ত্রের পতন ঘটান।

যুদ্ধের আগে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য:

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য ইউরোপে কেন্দ্রীভূত ছিল। ব্রিটেন ঔপনিবেশিক আয়তন, জনসংখ্যা এবং সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে বিশ্বে সবার আগে ছিল। এর পরে ছিল জার্মানি, যা সামরিক শক্তির দিক থেকে ব্রিটেনের খুব কাছাকাছি ছিল এবং শিল্প ও উদ্ভাবনে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তার স্থলবাহিনী ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও সুশৃঙ্খল বাহিনী।

২৯০

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

ঔপনিবেশিক আয়তন এবং সামরিক শক্তির দিক থেকে ফ্রান্স ছিল তৃতীয় স্থানে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ই জার্মানিকে ভয় পেত এবং তার শক্তি খর্ব করতে চাইত।

চতুর্থ স্থানে ছিল রাশিয়া, যা উদ্ভাবন, শিল্প ও অর্থনীতির দিক থেকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পেছনে ছিল। এর স্থলবাহিনী ছিল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। শক্তির বিচারে আমেরিকা ছিল পঞ্চম স্থানে, তবে এর স্থলবাহিনী বৈদেশিক অভিযানের জন্য যথেষ্ট বড় ছিল না। অবশ্য শিল্প ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তারা পুরো বিশ্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

জাপান সামরিক ও শিল্পগত দিক থেকে বিশ্বে এক অসাধারণ অবস্থান অর্জন করেছিল। বিশেষ করে তাদের নৌবহর ছিল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, যার ফলে তারা কেবল সুদূর প্রাচ্যের বেশ কিছু ঔপনিবেশিক এলাকা দখলই করেনি, বরং চীনেও প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করছিল। ১৯১২ সালে চীনের নেতারা তাদের কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সেখানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটি তখন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপানি রাজতন্ত্রের খাঁতাকলে পিষ্ট ছিল।

অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির জোটও ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোর মধ্যে গণ্য হতো, যারা সীমান্ত সংযোগের কারণে রাশিয়াকে ভয় পেত। এটিই ছিল ইউরোপের একমাত্র শক্তি যারা জার্মানির মিত্র ছিল।

যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ:

ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে প্রত্যেকেই বলকান অঞ্চলের সেই রাষ্ট্রগুলোতে নিজেদের প্রভাব বাড়াতে চাইত যেগুলো উসমানীয় সালতানাত থেকে স্বাধীন হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির যৌথ সালতানাতের উত্তরাধিকারী আর্চডিউক ফ্রান্স ফার্ডিনান্ড তার স্ত্রী সোফিয়াকে নিয়ে বসনিয়া সফরে বের হন। ২৮ জুন ১৯১৪ সালে সারায়েভোতে তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা হয় এবং তিনি তার স্ত্রীসহ নিহত হন। হত্যাকারী একটি সার্বীয় সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য ছিল যারা এই অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রভাবের বিরোধী ছিল।

অস্ট্রিয়া এই ঘটনাকে অসহনীয় বলে ঘোষণা করে। জার্মানির সম্রাট উইলিয়াম দ্বিতীয় ঘোষণা করেন যে, অস্ট্রিয়া যদি এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চায় তবে জার্মানি তাকে সাহায্য করবে। অস্ট্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে সার্বিয়াকে দমন করার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছিল। এই হত্যাকাণ্ডকে অজুহাত বানিয়ে তারা ২৮ জুলাই সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

রাশিয়া সার্বদের সমর্থক ছিল এবং এই অঞ্চলে নিজের স্বার্থে তাদের ব্যবহার করছিল। সার্বদের বাঁচাতে তারা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যেহেতু জার্মানি যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার সশস্ত্র মিত্র ছিল, তাই অস্ট্রিয়ার পরাজয় বা তার ওপর রাশিয়ার আধিপত্য জার্মানির জন্যও ছিল মারাত্মক। ফলে তারা অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়।

জার্মানির তুফানি বাহিনীর সামনে রাশিয়ার পরাজয় খুব বেশি দূরে ছিল না, তাই ফ্রান্স, যারা জার্মানির কটুর শত্রু ছিল, রাশিয়ার সমর্থনে দাঁড়িয়ে যায়। ব্রিটেনের আশঙ্কা ছিল যে, ফ্রান্স ও রাশিয়া মিলে যদি জার্মানির কাছে পরাজিত হয়, তবে জার্মানির পরবর্তী লক্ষ্য হবে ব্রিটেন। তাই তারাও ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে যোগ দেয়।

এই সময়ে যুদ্ধ থামানোর জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু অস্ট্রিয়া ও জার্মানি এই বলে কনফারেন্সটি...

সুপারিশগুলো প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হলো যে এটি অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং সার্বিয়ার অভ্যন্তরীণ বিরোধ, যাতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। এর ফলে কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাথে যোগ দিল।

এভাবে ১৯১৪ সালের আগস্টে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, যাতে শুরুতে একদিকে ছিল জার্মানি এবং “সংযুক্ত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি”, অন্যদিকে ছিল সার্ব সন্ত্রাসী এবং তাদের সমর্থক রাশিয়া। কিন্তু প্রতিটি পক্ষ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং পূর্ববর্তী চুক্তির দোহাই দিয়ে নিজ নিজ মিত্রদেরও এই যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করতে থাকল। ফ্রান্স ও ব্রিটেন বেলজিয়াম, রাশিয়া, পর্তুগাল, গ্রিস এবং আমেরিকাকে নিজেদের সাথে যুক্ত করে নিল। ইউরোপে কেবল স্পেন, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, সুইডেন এবং ডেনমার্ক নিরপেক্ষ রইল।

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানি বেলজিয়ামকে তহনহ করে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যৌথ বাহিনীকে পরাজিত করল এবং ফ্রান্সের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নিল। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যৌথ বাহিনী রাশিয়ার বেশ কিছু সীমান্ত শহরে ঢুকে পড়ল।

২৩ আগস্ট ১৯১৪ সালে জাপানও মিত্রশক্তির সাথে যোগ দিল এবং তারা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ থেকে জার্মানদের বিতাড়িত করে চীনের জার্মান বসতি “সিংতাও” দখল করে নিল।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্রিটেন ১৯১৪ সালের শেষ নাগাদ সমুদ্রপথে কঠোর অবরোধ আরোপ করেছিল যাতে জার্মানির কোনো যুদ্ধজাহাজ তাদের বন্দর থেকে বের হতে না পারে বা কোনো বহিরাগত সাহায্য সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবরোধ জার্মানদের অনাহারে মরতে বাধ্য করল। এমন পরিস্থিতিতে জার্মানির অস্ত্র নির্মাতারা দিনরাত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাবমেরিন আবিষ্কার করল এবং মে ১৯১৫ সালে বিশ্বের প্রথম সাবমেরিন হামলার পরীক্ষা চালিয়ে আয়ারল্যান্ড উপকূলে ব্রিটেনের একটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল যাতে ১১৯৮ জন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে ১২৮ জন ছিল আমেরিকান, যাদের প্রতিশোধ নিতে আমেরিকাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। মে ১৯১৭ সালে আমেরিকা তাদের সেনাবাহিনী ফ্রান্সে নামিয়ে দিল যাতে তারা জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে।

যুদ্ধের পরিধি যত বাড়তে থাকল, বিভিন্ন দেশ এতে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল। ২৩ মে ১৯১৫ সালে ইতালিও মিত্রশক্তির কাতারে शामिल হয়ে অস্ট্রিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করল। যুদ্ধের তিন বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও জয়-পরাজয়ের ফয়সালা হতে পারল না। এই সময়ে রাশিয়ায় লেনিন কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটালেন এবং রাশিয়ার জারের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে জার্মানির সাথে যুদ্ধবিরতি করলেন।

৮ জানুয়ারি ১৯১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন চৌদ্দ দফার শান্তি ফর্মুলা পেশ করলেন। তা সত্ত্বেও জার্মানরা নতি স্বীকার করল না এবং যুদ্ধ আরও কয়েক মাস ধরে চলতে থাকল। অবশেষে মিত্রশক্তি পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হলো, যার ফলে জার্মানি বাধ্য হয়ে আলোচনার টেবিলে চলে এল। [১]

বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ভূমিকা:

জার্মানির সাথে তুরস্কের চুক্তি ছিল, তাই যুদ্ধ শুরু হতেই তুরস্কের সামনে এই প্রশ্ন এসে দাঁড়াল যে জার্মানির সাথে চুক্তি...

(১) আল-মাওসুআতুল আরাবিয়্যাতুল আলামিয়্যাহ: বিষয়, আল-হারবুল আলামিয়্যাতুল উলা; তারিখদাওলাতিল উসমানিয়্যাহ, ইলমাজ ওজতুনা: ২/৩৩৩/২৩০।

বাকি রাখা এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মধ্যে ফায়দা আছে নাকি নিরপেক্ষ থাকা উত্তম হবে। সুলতান মুহাম্মদ রাশাদ, তাঁর উত্তরাধিকারী ইউসুফ ইযযুদ্দীন এবং তালাত পাশাসহ অধিকাংশ উজির এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং এটাই সঠিক রায় ছিল। তুরস্কের ইউরোপীয় বিবাদের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। না এমন কোনো বিপদ মাথার ওপর এসে পড়েছিল যা তুরস্ককে এই মুসিবতে টেনে নিয়ে যেত। তুরস্ককে ধ্বংসের এই জলাভূমিতে ঠেলে দেওয়া ৩২ বছর বয়সী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনোয়ার পাশার ব্যক্তিগত রায়ের কারিশমা ছিল।

গন্তব্য খোঁজার ধাপগুলোতে এই এক অদ্ভুত দুর্ঘটনা দেখলাম

পথের প্রতারণা বিশ্বাসের রূপ ধরে বসে থাকে

অহংকারের মত্ততা মেরে ফেলেছে নতুবা আমরা বেঁচে যেতাম

কারো চোখের আলো হয়ে কারো হৃদয়ের প্রশান্তি হয়ে

আনোয়ার পাশা তাঁর স্বভাবজাত জোশ, জাতীয় গায়রাত এবং ইসলামি আদর্শের কারণে এই উদ্দীপনা রাখতেন যে তুরস্ককে পুনরায় সুপার পাওয়ার বানিয়ে দেখাবেন। এটি ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় স্বপ্ন যার জন্য তিনি যেকোনো কুরবানি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ সময় আগে প্রশিক্ষণার্থী অফিসার হিসেবে জার্মানি সফর করেছিলেন এবং সেই সময় এই জাতির সামরিক প্রস্তুতি দেখার পর তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে দুনিয়ার কোনো শক্তি জার্মানিকে পরাজিত করতে পারবে না। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাঁর এই বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। তুর্কি বাহিনীকে শক্তিশালী করে বলকানের দ্বিতীয় যুদ্ধ জেতার পর আনোয়ার পাশার এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে যদি তিনি এবং জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হন তবে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে দুই শতাব্দীর প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব। পরিস্থিতি সাক্ষ্য দেয় যে জার্মানিকে রাশিয়া এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তুরস্ক এই যুদ্ধ লড়বে। তাঁর এই রায় তৈরিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল সেই জার্মান জেনারেলরা, যারা তুর্কি বাহিনীতে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [১]

আনোয়ার পাশা যখন যুদ্ধের সংকল্প করলেন তখন দ্বিতীয় সারির অনেক তুর্কি জেনারেল যাদের মধ্যে ইসমত ইনোন্স, মোস্তফা কামাল পাশা এবং কাজিম কারাবেকির উল্লেখযোগ্য, আনোয়ার পাশাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আনোয়ার পাশা মানেননি। [২]

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামায ওযতুনা থেকে: ২/৪৩৯-৪৪২।

এখানে এই হাকিকতও সামনে রাখা উচিত যে বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা ছিল জায়েনবাদী নেতাদের যার বিস্তারিত আমরা সামনে বলব। তবে এখানে আনোয়ার পাশাকে যুদ্ধের জন্য মরিয়া দেখে এই সম্ভাবনা উপেক্ষা করা যায় না যে জায়েনবাদীরা তাকে প্ররোচিত করার পূর্ণ ব্যবস্থা করে রেখেছিল কারণ আনোয়ার পাশা ফ্রিম্যাসনদের তৈরি করা জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির সদস্য ছিলেন অর্থাৎ তিনি আগে থেকেই ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। বিষাক্ত উপদেষ্টাদের মাধ্যমে তাকে পুনরায় একটি ধ্বংসাত্মক সিদ্ধান্তের ওপর রাজি করানো ইহুদিদের জন্য কোনো অসম্ভব বিষয় ছিল না। বরং এটাও অসম্ভব নয় যে যেসব জার্মান জেনারেল আনোয়ার পাশাকে এই পথ দেখিয়েছিলেন, তারাও ইহুদি লবির প্রভাবে ছিলেন।

বলা হয়ে থাকে যে হিটলার ইহুদিদের এই কারণেই চরম শত্রু ছিল যে সে জার্মানির ইহুদি জেনারেলদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করে জার্মানির ধ্বংসের কারণ মনে করত। হিটলার তাঁর আত্মজীবনী “মাইন কাম্পফ” (আমার সংগ্রাম)-এ শুধু জার্মানদের পতন নয় বরং বিশ্বশান্তি বিনষ্টের জন্য ইহুদিদের দায়ী করেছেন।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামায ওযতুনা থেকে: ২/৪৩৯-৪৪২।

মোস্তফা কামালের আনোয়ার পাশাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা প্রকাশ করে যে সেই সময় পর্যন্ত ইহুদিরা তাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে সিরিয়াস ছিল না এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ কিছু ছিল না। অবশ্য বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাকে ঘুঁটি বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যার বিস্তারিত সামনে আসবে।

যুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের কারণ কী ছিল?

সাধারণত বলা হয় যে, যুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের তিনটি বড় কারণ ছিল:

- ১. ব্রিটেন অকারণে তুরস্কের সেই দুটি জাহাজ দখল করে নিয়েছিল যা ব্রিটিশ জাহাজ নির্মাণ কারখানায় তৈরি করা হয়েছিল এবং সেগুলোর অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল।
- ২. জামাল পাশা খলিফার দূত হয়ে ফ্রান্সে গেলে ফরাসি কর্তৃপক্ষ জেদ ধরেছিল যে তুরস্ক যেন সিরিয়াকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দেয়।
- ৩. জার্মানির দুটি জাহাজ ব্রিটিশ নৌবহর থেকে বাঁচতে দার্দানেলস প্রণালীতে প্রবেশ করেছিল এবং ব্রিটেন তুরস্কের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যেন সে জার্মান জাহাজগুলো ব্রিটেনের হাতে তুলে দেয়, অথচ জার্মানি ছিল তুরস্কের মিত্র।

কিন্তু বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে দেখলে এর একটি কারণও এমন ছিল না যা একটি বড় যুদ্ধ শুরু করার জন্য যথেষ্ট হতো। এই কারণগুলোর মর্যাদা অজুহাতের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, যা কোনো শক্তি তখন গ্রহণ করে যখন সে প্রতিপক্ষের ওপর সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব রাখে এবং কোনো বড় ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই পূর্ণ বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। কিন্তু তুরস্কের অবস্থা কি তখন এমন ছিল যে সে বিশ্বের বড় শক্তিগুলোকে সহজে পরাভূত করার লোভ করবে এবং কোনো ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়াই একটি ভয়াবহতম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে?

বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণের রহস্যময় কাহিনী:

সত্য এই যে, এত বড় লড়াই যার উদাহরণ বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে নেই, কোনো পরামর্শ ও পরিকল্পনা ছাড়াই এক ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছিল। কীভাবে? এই রহস্যময় কাহিনীর আসল বিবরণ নিচে পেশ করা হলো।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পর জার্মানির দুটি নৌজাহাজ দার্দানেলস প্রণালীর মুখে আসে। তারা বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করে এবং রুশ নৌজাহাজগুলোর ওপর হামলা চালিয়ে দেয়। ওই সময় পর্যন্ত তুরস্ক নিরপেক্ষ ছিল।

কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস (ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি) সরকার এই সুযোগে সংবাদ প্রচার করে যে, জার্মান জাহাজগুলো তুর্কি সরকারকে না জানিয়েই প্রণালীতে প্রবেশ করেছিল। যদিও চিন্তা করলে এই দাবির ওপর বিশ্বাস করা কঠিন। দার্দানেলস প্রণালীতে সর্বদা কঠোর পাহারা থাকত এবং কোনো বিদেশি জাহাজ অনুমতি ছাড়া সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে পারত না। এছাড়া প্রতিটি জাহাজ তল্লাশি দিয়ে এবং অস্ত্র জমা রেখেই প্রবেশ করত।

এমন অবস্থায় এটা বোঝা কঠিন নয় যে, আনোয়ার পাশা নিজেই জার্মান জাহাজগুলোর ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন এবং তাদের প্রণালী পার হয়ে রুশ নৌবাহিনীর ওপর হামলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন যাতে একদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করার একটি অজুহাত দেওয়া যায় এবং অন্যদিকে খলিফা ও মন্ত্রীদের এই বিশ্বাস করানো যায় যে ইউরোপ আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বদ্ধপরিকর। এভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে যুদ্ধে নামার পরিবেশ তৈরি করা যায়।

আনোয়ার পাশার প্রত্যাশা অনুযায়ী ঠিক তাই হলো। যখন ব্রিটেন তুরস্কের কাছে দাবি করল যে সে যেন জার্মান জাহাজগুলো তাদের হাতে তুলে দেয়, তখন এই দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলো। কারণ আনোয়ার পাশার মতে যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। এই সিদ্ধান্তের জন্য...

তারিখ উম্মতে মুসলিমা ২৯৪

তিনি নিজের অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করতেন এবং তাঁর মন্ত্রিসভা শুধু খলিফা রশাদকেই নয় বরং উজির-এ-আযমকেও নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে দেননি।

এই সময়ে ব্রিটেন তুরস্ককে ইউরোপীয় জোটে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানায় যাতে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্রুত জেতা যায়। কিন্তু ব্রিটেনের মিত্র ফ্রান্স এবং রাশিয়া তুরস্ককে নিজেদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারণ রাশিয়া ইস্তাম্বুল এবং দার্দানেলিস দখল করতে ইচ্ছুক ছিল, অন্যদিকে ফ্রান্স সিরিয়াকে পদানত করতে চেয়েছিল। এই দুই দেশের ধারণা ছিল যে, যদি তুরস্ক তাদের সাথে যোগ দেয়, তবে বিজয়ের পর তুরস্কের কোনো অংশ দখলের কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের এই চিন্তাধারাকে সামনে রেখে ইউরোপীয় জোট তুরস্ককে নিজেদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে নিরপেক্ষ থাকার প্রস্তাব দেয় এবং এর বিনিময়ে তাকে ঋণ ও কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তরুণ তুর্কি সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে এবং এর পরিবর্তে নিজের নিরপেক্ষতার জন্য ইউরোপীয় জোটের কাছে নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করে:

- ব্রিটেনকে মিশর থেকে চলে যেতে হবে।
- এজিয়ান দ্বীপপুঞ্জ তুরস্ককে ফেরত দিতে হবে।
- রাশিয়াকে তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ইউরোপীয় জোটের উদ্দেশ্য ছিল বিজয়ের পর তুরস্কের অংশগুলো ভাগ করে নেওয়া, তাই তারা এই দাবিগুলোর কোনো উত্তর দেয়নি, যার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে জার্মান সেনাবাহিনী ফ্রান্সে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু সিন নদীর একটি শাখা “মার্ন”-এর তীরে মিত্রবাহিনী বিশাল শক্তি সংগ্রহ করেছিল, যার ফলে জার্মানির অগ্রযাত্রা থেমে যায়। এমন পরিস্থিতিতে জার্মানি তুরস্কের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যেন সে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে শরিক হয়, যাতে জার্মানির ওপর যুদ্ধের চাপ কম হয় এবং সে মার্ন নদী পার হয়ে ফ্রান্সের আরও এলাকা দখল করতে পারে। এর বিনিময়ে জার্মানি তুরস্ককে শুধু ৫০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (লিরা) ঋণ দেওয়ার প্রস্তাবই দেয়নি, বরং একটি গোপন চুক্তিও করেছিল যে বিজয়ের পর মিশর, ত্রিপোলি (লিবিয়া), তিউনিস, আলজেরিয়া এবং রুশ তুর্কিস্তানের এলাকাগুলো তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আনোয়ার পাশা আগেই যুদ্ধক্ষেত্রে নামার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নৌবাহিনী প্রধান জামাল পাশাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি কৃষ্ণসাগরে রুশ নৌবহরের ওপর হামলা করেন। সেই সময় পর্যন্ত জামাল পাশা যুদ্ধে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন না, কিন্তু আনোয়ার পাশা তাকে কোনোভাবে রাজি করিয়ে ফেলেন। সম্ভবত মধ্য এশিয়া দখল এবং মিশর ও তিউনিস পুনরুদ্ধারের আশায় জামাল পাশা এই নির্দেশ মেনে নেন। তিনি কৃষ্ণসাগরের বন্দর ওডেসায় একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে জার্মানির একটি যুদ্ধজাহাজ রুশ বন্দর “সেভাস্টোপোল”-এ হামলা করে একটি রক্ষণাত্মক জাহাজ ডুবিয়ে দেয়।

এটি ছিল বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের প্রথম পদক্ষেপ, যার জন্য খলিফার অনুমতি নেওয়া হয়নি। এমনকি উজির-এ-আযমও জানতেন না যে তুরস্ক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। তবে রুশ জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেওয়ার পর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে খলিফাও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন। এভাবে ২৯ অক্টোবর ১৯১৪ (১০ জিলহজ...

১৩৩২ হিজরিতে তুরস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়।

যেহেতু ইসলামী জিহাদের আবেগ ছাড়া এত বড় লড়াই জেতা অসম্ভব ছিল, তাই ‘জমিয়ত ইত্তিহাদ ও তারাক্কি’র নেতারা প্রথমবারের মতো ‘প্যান ইসলামিজম’ (আল-জামিআতুল ইসলামিয়া) আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজন অনুভব করেন, যার ভিত্তি সুলতান আব্দুল হামিদ সানি রেখেছিলেন এবং জাতিপূজারী সরকার এখন পর্যন্ত তার চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল।

এখন সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধের ঘোষণার পর সাম্রাজ্যে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হলো এবং প্যান ইসলামিজম আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো। খলিফা রশাদ, শায়খুল ইসলাম এবং ওলামাদের পক্ষ থেকে তিনটি বার্তা পাঠানো হলো যা ফতোয়ার মর্যাদা রাখত।

সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল:

“এই যুদ্ধ যাতে উসমানীয় রাষ্ট্র শরিক হচ্ছে, নিঃসন্দেহে একটি দ্বীনি লড়াই, যার উদ্দেশ্য মুসলমানদের গোলাম দেশগুলোকে স্বাধীন করা এবং উসমানীয় সাম্রাজ্য ও পবিত্র স্থানসমূহ মক্কা, মদিনা ও কুদস রক্ষা করা। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা জিহাদ যা দ্বীনি দিক থেকে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক এবং সামর্থ্যবান মুসলমানের ওপর ফরজ।”

এর পাশাপাশি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে জিহাদের উৎসাহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল, মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানো হলো। [১]

বেলার বেগের দুর্গে নজরবন্দি সুলতান আব্দুল হামিদ যখন জিহাদের খবর পেলেন, তখন তার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হলো:

“এটি একটি বড় যুদ্ধান্ত্র। এমন অস্ত্রের ব্যবহার সেই সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা বেশি কার্যকর হয়, যতক্ষণ না তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।” [২]

মুসলিম বিশ্ব কেন তুরস্কের সাথে দিল না?

তুর্কি সরকারের আশা ছিল যে রুশ তুর্কিস্তান থেকে মিশর ও লিবিয়া পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান তুরস্কের সাথে দেবে এবং দখলদার পশ্চিমা শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু জিহাদের আহ্বানে মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া হতাশাজনক ছিল। যার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছিল এই:

- ১. তুরস্কে প্রকৃত শাসক খলিফা ছিলেন না বরং জমিয়ত ইত্তিহাদ ও তারাক্কি-র নেতারা ছিলেন এবং তাদের মধ্যে দ্বীনি গায়রাত ও হামিয়াতের পরিবর্তে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের উপাদান প্রবল ছিল। এজন্য মুসলিম বিশ্ব তাদের ওপর আস্থা রাখত না।
- ২. মুসলমানরা দুর্বলতা ও অধঃপতনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তাই তারা কোনো বিপ্লবের সাহস রাখত না।
- ৩. অধিকাংশ মুসলিম দেশ আগেই বিশ্ব শক্তিগুলোর দখলে ছিল। তারা আর কার সাহায্য করবে।
- ৪. মুসলমানদের বড় একটি অংশ বৈশ্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনবহিত এবং সঠিক-ভুল সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ছিল। তাদের সচেতন শ্রেণির কাছেও বেশিরভাগ বিভ্রান্তিকর তথ্য ও সংবাদ পৌঁছাত যা বৈশ্বিক প্রচার মাধ্যমগুলো পৌঁছাতে চাইত। কোনো স্পষ্ট দিক...

[১] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, সুলাইমান বিন সালেহ আল-খারানি, পৃষ্ঠা ৭৩, দারুল কাসিম রিয়াদ।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৩৮।

...সামনে না আসার কারণে তারা নীরবতা ও স্থবিরতাকে শ্রেয় মনে করেছেন।

[১] সাধারণ জনমত এই ছিল যে, এটি জিহাদ নয় বরং বিশ্বশক্তিগুলোর পারস্পরিক লড়াই, যাতে তুরস্ককে ব্যবহার করা হচ্ছে।

হিন্দুস্তানের মুসলমান ও দেওবন্দের আকাবিরদের কোরবানি:

অবশ্য মুসলিম বিশ্বে হিন্দুস্তানই একমাত্র ভূখণ্ড ছিল যেখানে মুসলমানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে থাকা সত্ত্বেও তুরস্কের পক্ষে আওয়াজ তুলেছিলেন। হিন্দুস্তানি উলামাদের মধ্যে শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সময়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে হিজরত করেন এবং নিজের সাথীদের সাথে মিলে রেশমি রুমাল আন্দোলন পরিচালনা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল উসমানীয় খিলাফতকে টিকিয়ে রাখা এবং মুসলমানদেরকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, তুর্কি বাহিনী ইরান ও আফগানিস্তানের পথে হিন্দুস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আক্রমণ করবে এবং একই সময়ে হিন্দুস্তানের সাধারণ জনগণ অভ্যন্তরীণভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু কিছু গাদ্দারের কারণে এই গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যায়, যার ফলে শাইখুল হিন্দ ও তাঁর সাথী হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মাওলানা আজিজ গুল রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ গ্রেফতার হন এবং তাঁদেরকে মাল্টা দ্বীপে বন্দি করা হয়। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই মহান ব্যক্তির মুক্তি পেলেও তাঁরা শান্ত হয়ে বসে থাকেননি, বরং খিলাফত রক্ষার জন্য হিন্দুস্তানে খিলাফত আন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে যান।

আমার হৃদয়ের আর্তনাদ জান্নাতের বাগান পর্যন্ত পৌঁছেছে

আর্তনাদকারী বুলবুলের বিলাপ চিরস্থায়ী বসন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

হে ঘাতক! আমাদের মতো কঠোর প্রাণদের সাথে তোমার পাল্লা পড়েনি

আমরাও একটু দেখি তোমার জল্লাদগিরি কতদূর পর্যন্ত চলে। [২]

জিহাদের ডাক বিশ্বব্যাপী কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে না পারলেও, খোদ তুর্কি মুসলমানদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও শাহাদাতের তামান্না জাগ্রত হয়েছিল, তার প্রভাব সারা বিশ্ব দেখেছিল। যুদ্ধের প্রথম বছরগুলোতে তুরস্ক ও জার্মানির পাল্লা ভারী ছিল। অধিকাংশ রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির জোর ভাঙতে তারা পুরোপুরি সফল ছিল। [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২১৩

[২] জওহর

[৩] কাইফ সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, সুলাইমান বিন সালেহ আল-খারশি: পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪

বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা

বিশ্বযুদ্ধের প্রতিটি পক্ষই শুরুতে নিশ্চিত ছিল যে তারা খুব শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে এবং বিশাল উপনিবেশের মালিক হয়ে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে থাকে। এই যুদ্ধে প্রথমবারের মতো বিমান, ট্যাংক এবং মেশিনগান ব্যবহৃত হয়েছিল।

তুরস্ক একটি নতুন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে এই যুদ্ধে তার সমস্ত শক্তি ঢেলে দিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ সৈন্য সরবরাহ করা হয়েছিল, যাদের মধ্যে দুই লক্ষ ইস্তাম্বুল ও দার্দানেলিস প্রণালীতে এবং এক লক্ষ এশিয়া মাইনরের এরজুরুম (আরজ রুম) সেনানিবাসে রুশ সীমান্তের কাছে মোতায়ন করা হয়েছিল। এক লক্ষ সৈন্য বিভিন্ন ব্যাটালিয়নের আকারে সিরিয়া ও ককেশাস সীমান্তে মোতায়ন করা হয়েছিল। চল্লিশ হাজার সৈন্য ফিলিস্তিনে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়া আড়াই লক্ষ যুবকের সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছিল। [১]

পূর্ব রণাঙ্গন:

তুরস্ক তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কারণে অনেক রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত। পূর্ব রণাঙ্গনে আনোয়ার “এরজুরুম”-এর থার্ড আর্মি কোরের এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে স্বয়ং প্রচণ্ড তুষারপাতের মধ্যে রুশ সীমান্তে আক্রমণের জন্য বের হন এবং ককেশাসের বরফাবৃত পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যান। কিন্তু রুশদের কঠোর প্রতিরোধ এবং আবহাওয়ার ভয়াবহতা এই আক্রমণকে সফল হতে দেয়নি। এই অভিযানে ৯০ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায় এবং বাকি দশ হাজার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পিছু হটে এরজুরুমে ফিরে আসে। [২]

এডেন রণাঙ্গন:

তুরস্কের জন্য ব্রিটেনের সাথে ভারতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা জরুরি ছিল, যার উপায় ছিল এডেনের ওপর ইংরেজদের আধিপত্য খতম করা। ব্রিটেন ১৮৩৯ সাল থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি দখল করে রেখেছিল। পরবর্তী দশকগুলোতে তারা ইয়েমেনের জাইদি ইমাম এবং উসমানীয়দের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ ইয়েমেনের আরও এলাকা দখল করে নিয়েছিল, যেগুলোকে ভারতের ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ হিসেবে গণ্য করা হতো।

ইয়েমেনের জাইদি ইমাম এবং উসমানীয়দের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল।

উসমানীয় খলিফাগণ ইয়েমেনের ওপর আধিপত্যের

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/৪৩৩

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৭; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৩৮

...চেপ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ইয়েমেনি ইমামগণ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে থাকেন। উসমানীয় এবং ইয়েমেনি ইমামদের মধ্যে শেষ সংঘাত ১৯১১ সালে হয়েছিল যা তুর্কি আমির ইজ্জত পাশা এবং জাইদি ইমাম ইয়াহইয়া হামিদুদ্দিনের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছিল। তুর্কি বাহিনী বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত ও ব্রিটেনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য ইয়েমেনে অভিযান চালায় এবং এবার জাইদি ইমামগণ পূর্বের মতভেদ ভুলে তাদের সাথে দেন। কিন্তু এই সময়ে লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল “তিহামা আসির”-এর গোত্রীয় আমির আল-ইদ্রিসি ইংরেজদের সাথে হাত মেলায়। যার ফলে ইয়েমেনকে স্বাধীন করার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তুর্কি বাহিনীকে পিছু হটতে হয়। [১]

আর্মেনিয়ায় মুসলমানদের গণহত্যা:

বিশ্বযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল আর্মেনিয়া। তুরস্ক ও রাশিয়ার মাঝে অবস্থিত উসমানীয় সাম্রাজ্যের এই প্রদেশে তেরো লক্ষ আর্মেনীয় খ্রিস্টান বসবাস করত। বিশ্বশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের অধীনে আর্মেনীয়রা বেশ কিছু সংগঠন তৈরি করে উসমানীয় সাম্রাজ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেছিল কিন্তু তারা কখনো সফল হয়নি।

বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে আনোয়ার পাশা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আর্মেনিয়া হয়ে ককেশাস পৌঁছেছিলেন কিন্তু তার বিধ্বস্ত পশ্চাদপসরণের পর আর্মেনিয়া অঞ্চল তুর্কি সৈন্যদের থেকে শূন্য হয়ে যায়। এরপর রাশিয়ার উস্কানিতে এখানকার গোঁড়া খ্রিস্টানরা অনেকগুলো আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করে এবং মুসলমানদের জনপদগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করতে শুরু করে। শিশু, নারী এবং বৃদ্ধদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করা হতো। আর্মেনীয়দের নৃশংসতা এমন পর্যায়ে ছিল যে তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য গুলি ব্যবহার করাকে অপচয় মনে করত। এর পরিবর্তে তারা মানুষকে আগুনে নিক্ষেপ করত অথবা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলে রেখে যেত। নারীদের সম্ভ্রমহানি করে মেরে ফেলত। তাদের পূর্ণ চেপ্টা ছিল যেন আর্মেনিয়া মুসলমান শূন্য হয়ে যায় যাতে একে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর স্বপ্ন পূরণ করা যায়।

১৯ মে ১৯১৫ সালে যখন রুশ বাহিনী আর্মেনিয়ার শহর “ভান”-এ প্রবেশ করে, তখন তারা এটা দেখে অবাক হয়ে যায় যে সেখানে একজন মুসলমানও জীবিত অবশিষ্ট নেই। লাশের স্তুপ পাহাড়ের মতো দেখা যাচ্ছিল। মসজিদগুলো ভস্মীভূত ছিল এবং ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই গণহত্যার কারণে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যারা শতাব্দী ধরে এই অঞ্চলে বসবাস করছিল, হিজরত করে পূর্ব আনাতোলিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তুরস্ক যদি যুদ্ধে জয়লাভ করত তবে এই মুহাজিরদের আর্মেনিয়ায় পুনরায় পুনর্বাসন সম্ভব ছিল কিন্তু আফসোস যে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে আর্মেনিয়াও মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত হয়। [২]

দার্দানেলস প্রণালী:

তুরস্কের দার্দানেলস প্রণালী এই যুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করত যা রাশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে একমাত্র নৌপথ ছিল। ইউরোপীয়...

[১] আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ, বিষয়: ইয়েমেন; আত-তারিখুল ইসলামি লিদ-দুকতুর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৯

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, আজ ইলমাজ ওজতুনা: ২/ ৪৩০ থেকে ৪৩৩

রাশিয়াকে নৌপথে সাহায্য পৌঁছাতে চেয়েছিল কিন্তু তুরস্ক দারদানেলস প্রণালী (দারা-ই-দানিয়াল) বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে এর এশীয় ও ইউরোপীয় উপকূলে বিপুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করে দেয়। এর জবাবে ব্রিটেন ১৯১৪ সালের শেষের দিকে উসমানীয় সালতানাতের অধীনে থাকা সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে নেয়।

দারদানেলস প্রণালী খোলার জন্য ১৯১৫ সালের শুরুতে রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেন মিলে আক্রমণ করে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকে। প্রণালীর এশীয় উপকূলে “চানাক কালে” এবং ইউরোপীয় উপকূলে “গ্যালিপলি” গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল। এপ্রিল মাসে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বাহিনীও এই রণাঙ্গনে মিত্রশক্তির সাথে যোগ দেয়।

তুর্কিরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে দারদানেলস রক্ষা করে এবং মিত্রশক্তির বসফরাস প্রণালীতে প্রবেশের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তুর্কি কামানের গোলার আঘাতে ইংল্যান্ডের সেরা জাহাজগুলো ডুবে যায়। মিত্রশক্তির প্রধান সেনাপতি ব্রিটেনের জেনারেল হ্যামিল্টন, যিনি দারদানেলসে প্রবেশ অসম্ভব মনে করেছিলেন, স্থলপথে ইস্তাম্বুল পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেন। তিনি ফরাসি বাহিনীকে এশীয় উপকূলে অবতরণের নির্দেশ দেন, আর ইউরোপীয় উপকূল দখলের দায়িত্ব ব্রিটিশ বাহিনীকে দেওয়া হয়। এক কঠিন যুদ্ধের পর মিত্রশক্তি গ্যালিপলি উপদ্বীপে ৩০ হাজার সৈন্য অবতরণ করিয়ে সেখান থেকে ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু তুর্কিরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাদের ইস্তাম্বুল পৌঁছাতে দেয়নি। দারদানেলসের তুর্কি বাহিনী চানাক কালে থেকে পিছু হটেনি এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যায়।

দুই বছর এখানে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যে স্বয়ং ইউরোপও বিস্মিত হয়ে যায়। এই রণাঙ্গনে আড়াই লক্ষ তুর্কি সৈন্য শহীদ হয়, অন্যদিকে মিত্রশক্তিরও প্রায় সমসংখ্যক লোক নিহত হয়। আহত, অসুস্থ এবং নিখোঁজদের সংখ্যা এর বাইরে ছিল। [১] প্রকৃতপক্ষে দারদানেলস ও ইস্তাম্বুল দখল করে তুরস্ককে পুরোপুরি পরাস্ত করা ছিল ব্রিটেন ও ইহুদি নেতাদের জেদ, যার কারণে বিশ্বযুদ্ধ আরও দুই বছর দীর্ঘায়িত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, যিনি ইসলাম ও উসমানীয় সালতানাতের ঘোর শত্রু এবং ইহুদি পুঁজিপতিদের অংশীদার ছিলেন, তিনি এই বিষয়ে অনড় ছিলেন যে যতক্ষণ না তুরস্ক হাঁটু গেড়ে বসে পড়বে ততক্ষণ যুদ্ধ চলতেই থাকবে। তার বক্তব্য ছিল যে আমরা তুরস্ককে আলোচনার টেবিলে এনে তার বিচার করব।

সুয়েজ খালের রণাঙ্গন:

এই সময়ে তুরস্ক সুয়েজ খাল দখলের চেষ্টা করে যেখান দিয়ে ব্রিটিশ নৌ-জাহাজগুলো ভারতে যাতায়াত করত। তুরস্কের পরিকল্পনা ছিল সুয়েজ খাল দখলের পর তুর্কি বাহিনী মিশরে প্রবেশ করবে এবং ইংরেজদের সেখান থেকে বিতাড়িত করবে। তুর্কি শাসকদের পূর্ণ আশা ছিল যে এই যুদ্ধে সিরিয়া ও মিশরের মুসলমানরা তাদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করবে। এজন্য এই রণাঙ্গনে আরও বড় এবং শক্তিশালী বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

[১] আত-তারিখ আল-ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১১; আল-মাওসুআহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-আলামিয়্যাহ: আল-হারব আল-আলামিয়্যাহ আল-উলা; তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়্যাহ, ইয়ালমাজ ওজতুনা: ২/২৩৭।

তুর্কি ফৌজ যখন সিনাই মরুভূমিতে প্রবেশ করল, তখন বৃষ্টির কারণে মরুভূমির বালু জমে গিয়েছিল এবং পদাতিক বাহিনীর অগ্রযাত্রা সহজ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারী কামানগুলো মরুভূমি দিয়ে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। অধিকন্তু, দামেস্কের সেনানিবাস থেকে অনেক সৈন্য প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গিয়েছিল। এ কারণে আক্রমণের প্রস্তুতিতে বিলম্ব ঘটে। অবশেষে ইস্তাম্বুল থেকে জামাল পাশা চতুর্থ সেনাবাহিনী নিয়ে এলেন। তিনি সেনাবাহিনীর একটি অংশ সিরিয়ায় রেখে দিলেন যাতে সিরিয়ায় মিত্রশক্তির সম্ভাব্য আক্রমণ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ মোকাবিলা করা যায়।

বাকি বাহিনীকে নিয়ে তিনি সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করে ১৯১৫ সালের নভেম্বরে সুয়েজ খালের তীরে পৌঁছান, যেখানে ব্রিটেন ভারতীয় সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী মোতায়ন করে রেখেছিল। তুর্কি অফিসাররা মিশরীয় প্রতিনিধিদের সাথে গোপনে এই মর্মে চুক্তি করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট দিনে তুর্কি বাহিনী সুয়েজ আক্রমণ করবে এবং একই সাথে মিশরীয় জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। কিন্তু এর পরে তুর্কিদের খাদ্য সরবরাহ কমে যায়, যার ফলে তারা নির্ধারিত দিনের আগেই সুয়েজ আক্রমণ করে বসে। দুই দিন পর্যন্ত এখানে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্য এবং তুর্কিদের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে। অবশেষে খাদ্য শেষ হওয়ার আশঙ্কা দেখে তুর্কিদের গাজার দিকে পিছু হটতে হয়। এই আক্রমণের ব্যর্থতার কারণে জামাল পাশার সেনাবাহিনীর কমান্ড ফিরিয়ে নেওয়া হয় এবং দুই-তিন মাস পর্যন্ত লড়াই বন্ধ থাকে। তবে লিবিয়ার মুজাহিদগণ পশ্চিম দিক থেকে এবং সিরিয়ার আরবগণ পূর্ব দিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে এই আক্রমণগুলোর প্রভাব এর চেয়ে বেশি হতে পারত না যে ব্রিটিশ বাহিনীর চলাচল ও গতিবিধি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জামাল পাশার পরিবর্তে সুয়েজ রণাঙ্গনের কমান্ড জার্মান কমান্ডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যারা ১৯১৬ সালের মার্চ ও জুলাই মাসে সুয়েজে আরও দুটি বড় আক্রমণ চালায় কিন্তু উভয়ই ব্যর্থ হয়। [১]

ইরাক রণাঙ্গন:

ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ শহর বসরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ১৯১৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশদের দখলে চলে গিয়েছিল। ইরাকের বাকি শহরগুলোতেও বেশ কয়েকটি রণাঙ্গনে যুদ্ধ হয়। তুর্কিরা সালমান বেক নামক স্থানে ইংরেজদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং তাদের পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ তেরো হাজার সৈন্যকে বন্দি করে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ইরাকের প্রতিরক্ষা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। অবশেষে ৯ ডিসেম্বর ১৯১৭ সালে বাগদাদেও ইংরেজদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে পুরো ইরাক তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়। [২]

জাজিরাতুল আরব:

তুরস্কের যুদ্ধ ঘোষণার পরপরই ব্রিটেন ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং জাজিরাতুল আরবে তাদের গোয়েন্দা সংস্থা “BIS”-এর এজেন্টদের সক্রিয় করে তোলে। এই গোয়েন্দারা আরবি ভাষা ও উপভাষায় পারদর্শী ছিল এবং তারা রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করত...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকের: ৮/২১৮, ২২১, ২২২।

[২] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৩৮, ২৩৯।

তারা তাদের সাদা গায়ের রঙকে তামাটে করে নিত। তারা আরব সেজে আরবদের জনপদ, এমনকি মাদ্রাসা ও খানকাহগুলোতেও বসবাস করত এবং তাদেরকে তুর্কি খিলাফতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলত। তাদের মধ্যে কর্নেল লরেন্স (লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া, ১৮৮৮-১৯৩৫ খ্রি.)-এর নাম সবচেয়ে বেশি পরিচিত। সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচ্যবিদ্যা ও শিল্পকলায় শিক্ষা লাভ করেছিল। সে ছিল আরবি ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী, এক অগ্নিবরা কলমের অধিকারী সাহিত্যিক এবং এক অগ্নিবরা বক্তা। মহাযুদ্ধে “তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ” পরিকল্পনার নেতৃত্ব তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। কর্নেল লরেন্স আরবদের তুর্কিদের বিরুদ্ধে এতটাই উত্তেজিত করে তুলেছিল যে, যুদ্ধের সময় আরবরা তার নির্দেশে তুর্কি কর্মীদের হত্যা করত এবং সে প্রতিটি তুর্কি হত্যার বিনিময়ে আরবদের পুরস্কার দিত।

‘জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’র শাসনামলে হিজাজের আমির ছিলেন হোসেন পাশা, যাকে “শরীফ মক্কা” বলা হতো। তিনি বংশগতভাবে হাশেমী ছিলেন। সাবেক খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তার মধ্যে ক্ষমতার লোভের বীজ অনুভব করেছিলেন, তাই তাকে পরিবারসহ এক চতুর্থাংশ শতাব্দী পর্যন্ত জোরপূর্বক ইস্তাম্বুলে বসবাস করতে বাধ্য করেছিলেন। ‘জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’ সরকার সুলতান আব্দুল হামিদের বিরাগভাজন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সম্মানিত হিসেবে দেখতে চাইত, তাই তারা হোসেন পাশাকে মক্কার ওয়ালি বানিয়ে দেয়।

মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই হোসেন পাশা ব্রিটেনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং ব্রিটেন তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যদি তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তবে তাকে ইরাক ও সিরিয়াসহ সমগ্র জাজিরাতুল আরবের বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই যোগাযোগের সফলতায় কর্নেল লরেন্সের বড় ভূমিকা ছিল। সে হোসেন পাশা এবং তার পুত্রদের: আমির ফয়সাল ও আমির আব্দুল্লাহকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্ররোচিত করে এবং তাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, হোসেনকে জাজিরাতুল আরবের, ফয়সালকে সিরিয়ার এবং আব্দুল্লাহকে ফিলিস্তিনের শাসক বানিয়ে দেওয়া হবে। ৩০ জানুয়ারি ১৯১৬ খ্রি. (২৫ সফর ১৩৩৪ হি.) এই চুক্তি সম্পন্ন হয় এবং ৭ জুন ১৯১৬ খ্রি. (৭ শাবান ১৩৩৪ হি.) যখন মহাযুদ্ধ চরম শিখরে ছিল এবং তুরস্ক তার সমস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যুদ্ধে নিয়োজিত করেছিল, তখন শরীফ মক্কা ও তার পুত্ররা হঠাৎ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। তিন দিনের সংঘর্ষের পর ১০ জুন মক্কায়ে মোতায়েন করা ক্ষুদ্র তুর্কি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর তায়েফ ও জেদ্দাও সামান্য সংঘর্ষের পর দখলে চলে আসে। [১]

এর ওপর জাফর আলী খান বলেছিলেন:

কি বিপ্লব যে আরবের শরীফরাও
পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারী হয়ে গেল
খ্রিস্টানদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে
উসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো
খিলাফতে কুবরার ধমনী কাটার জন্য
ব্রিটেনের হাতের তলোয়ার হয়ে গেল

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৩৪, ২৩৫

কাবা’র সম্মান বিক্রি করে যদিও ফয়সাল ও হুসাইন

পরকালের লাঞ্ছনার যোগ্য হয়ে গেল।

এবং আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন:

এশিয়ার জীর্ণ আলখাল্লা ছিঁড়ে যাচ্ছে

নতুন সম্পদশালী জাতিগুলোর যুবকরা এর তালি পরিধান করছে

হাশেমী বিক্রি করছে মুস্তফার দ্বীনের সম্মান

কঠোর পরিশ্রমী তুর্কিরা ধুলো ও রক্তে মিশে যাচ্ছে।

নজদ-এর শাসন এবং সুলতান আব্দুল আজিজ বিন সউদ:

নজদ অঞ্চলে আমির আব্দুল আজিজ বিন সউদের শাসন ছিল। তিনি ১৯১৬ সাল পর্যন্ত উসমানীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত ছিলেন। তুর্কিদের পরাজয় আসন্ন দেখে তিনি ব্রিটেনের সাথে এই চুক্তি করেন যে, আল-সউদ নজদ-এর স্বাধীন শাসক হিসেবে থাকবে। সেই সাথে তিনি ব্রিটেনের কাছে এটি স্পষ্ট করে দেন যে, আল-সউদ এই যুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন করবে না এবং তুর্কিদের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরবে না। [১]

সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন:

এই সময়ে সুয়েজ খালের রণাঙ্গনে তুর্কি সৈন্যরা ব্রিটেনের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে ছিল। মক্কার শরীফের পুত্র ফয়সাল আরব গেরিলা যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিয়ে জাবালে দ্রাজ এবং বালবেকে ঘাঁটি তৈরি করেন এবং তুর্কিদের সরবরাহ লাইনের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ শুরু করেন। রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তারা মদিনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সুলতান আব্দুল হামিদের নির্মিত রেললাইনটি বিভিন্ন স্থানে অকেজো করে দেন। এভাবে সুয়েজ এবং সিরিয়ায় মোতায়েন তুর্কি বাহিনীর জন্য সাহায্য ও রসদ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

সেই সময় দক্ষিণ সিরিয়ায় তুর্কি বাহিনীর চতুর্থ আর্মি কোর, সপ্তম আর্মি কোর এবং অষ্টম আর্মি কোর মোতায়েন ছিল। চতুর্থ আর্মি কোর ছিল “বালকা” (জর্ডান)-এ। সপ্তম আর্মি কোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জেনারেল মোস্তফা কামাল পাশার অধীনে ছিল। অষ্টম আর্মি কোর পশ্চিম উপকূলে নিযুক্ত ছিল। এই তিনটি বাহিনীর সাধারণ কমান্ড ছিল জার্মানির জেনারেল স্যাভার্স-এর হাতে। আরবদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং খাদ্য ও রসদ সরবরাহের বিচ্ছিন্নের কারণে এই তিনটি বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায় এবং সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে শুরু করে। এর ফলে ব্রিটেনের মোকাবিলায় এখানেও তুরস্কের পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১২ ডিসেম্বর ১৯১৬ সালে ইংরেজরা গাজায় প্রবেশ করে। তুর্কিরা তাদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। ২৭ মার্চ এবং ১৯ জুনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তারা ইংরেজদের পিছু হটতে বাধ্য করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ জুন ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ বাহিনীর নেতৃত্ব জেনারেল অ্যালেনবি (Allenby)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়, যিনি বাহিনীকে নতুন করে সংগঠিত করেন এবং অগ্রসর হয়ে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করেন।

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইয়ালামাজ ওরতুনা: ৩/২৪৬

হয়ে গেল। তুর্কিরা এখানেও প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল এবং কদমে কদমে প্রাণের নজরানা পেশ করেছিল, কিন্তু সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের ইহুদিরা মিত্রবাহিনীর হয়ে গোয়েন্দাগিরি করছিল। তারা তুর্কিদের গতিবিধির প্রতিটি খবর তৎক্ষণাৎ মিত্রবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিত, যার সুযোগ নিয়ে মিত্রবাহিনী আরও উন্নত পরিকল্পনার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে ৯ ডিসেম্বর ১৯১৭ (২৫ সফর ১৩৩৬ হিজরি) ইংরেজরা বায়তুল মুকাদ্দাসও দখল করে নেয়। জেনারেল অ্যালেনবি কুদসে পা রেখে বলেছিলেন:

“ক্রুসেড আজ আমাদের বিজয়ের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো।”

১৯১৮ সালে ব্রিটিশ বাহিনী নাবলুসে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে নাসারার (নাজারেথ) দিকে অগ্রসর হয় যেখানে জার্মান নেতৃত্বের সদর দপ্তর ছিল। এই হামলায় জার্মান কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল স্যাভার্স গ্রেফতার হতে হতে অল্পের জন্য বেঁচে যান। তুর্কি বাহিনীর পরাজয় এখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফরাসি বাহিনীও ব্রিটেনের সাহায্যে সিরিয়া আক্রমণ করেছিল। বেশ কিছু যুদ্ধের পর ২ অক্টোবর ১৯১৮ (২৭ জিলহজ ১৩৩৬ হিজরি) সিরিয়ায় তুর্কিরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং তারা মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে উত্তরের দিকে পিছু হটে যায়।

এরপর মিত্রবাহিনী লেবাননের দিকে অগ্রসর হয়। ৭ অক্টোবর বৈরুত এবং ২৬ অক্টোবর আলেপ্পো দখলের পর পুরো সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও জর্ডান মিত্রবাহিনীর হাতে চলে যায়। ১২ নভেম্বর মসুল দখলের মাধ্যমে আল-জাজিরাও তুর্কিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এরই মধ্যে ফয়সাল বিন হুসাইন, কর্নেল লরেন্সের সাহায্যে আরবদের সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়ে ‘মাআন’ পৌঁছে যান। এখান থেকে তিনি দামেস্কের দিকে যাত্রা করেন যেখানে ব্রিটিশ কর্মকর্তারা ১ অক্টোবর দখলদার হয়ে পুতুল সরকারের মসনদ তার হাতে তুলে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। [১]

দার্দানেলস প্রণালী ও ককেশাস:

দার্দানেলস প্রণালীতে তখনও যুদ্ধ চলছিল। এখানে জার্মান ও তুর্কি বাহিনীর নেতৃত্ব মোস্তফা কামালের হাতে ন্যস্ত করা হয়। মিত্রবাহিনীর মধ্য থেকে অস্ট্রেলীয়রা প্রণালীটি দখলের জন্য কঠোরতম হামলা চালায় কিন্তু তুর্কিরা প্রতিটি হামলা ব্যর্থ করে দেয়। এরপর জার্মান ও তুর্কিরা মিলে মিত্রবাহিনীর ওপর আক্রমণাত্মক হামলা শুরু করে কিন্তু মিত্রবাহিনীকেও পেছনে হঠানো সম্ভব হয়নি। [২]

রাশিয়ার রণাঙ্গনে উসমানীয় বাহিনী আবারও ককেশাসের দিকে অগ্রসর হয় এবং বেশ কিছু স্থানে রুশদের পিছু হঠতে বাধ্য করে। এরই মধ্যে সেখানে লেনিন জার শাহীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন এবং আপাতত কোনো বৈদেশিক যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করার পক্ষে ছিলেন না, তাই রাশিয়ার এই নতুন সরকার ২২ জানুয়ারি ১৯১৮ সালে তুরস্কের সাথে সন্ধি করে নেয়।

মদিনা মুনাওয়ারার অবস্থা:

জাজিরাতুল আরবে কেবল মদিনা মুনাওয়ারা তুরস্কের অধীনে রয়ে গিয়েছিল যেখানে আত্মমর্যাদাশীল তুর্কি কমান্ডার ফখরুদ্দিন পাশা অসাধারণ...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২২০, ৯/২০০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ: ২/২৩৮, ২৩৯, ২৪৫

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২১৯; আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ: মাদাতুল হারবিল আলামিয়াতিল উলা

তিনি অবিচলতা ও সাহসের সাথে মোকাবিলায় অটল ছিলেন যাতে কাফেরদের অপবিত্র কদম নবী মুতাহার (সা.)-এর শহরের ওপর না পড়ে। বিশ্বের চারপাশ থেকে বিশ্বযুদ্ধ থেমে যাওয়ারও কয়েক মাস পর পর্যন্ত ফখরুদ্দিন পাশা মিত্রবাহিনী এবং তাদের এজেন্টদের মদিনার হারামে প্রবেশ করতে দেননি। তবে ১৩ জানুয়ারি ১৯১৯ (১২ রবিউস সানি ১৩৩৭ হিজরি) তারিখে তাঁর প্রতিরোধও স্তিমিত হয়ে যায়। [১]

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি:

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী এবং নিহতদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় শক্তিসমূহ অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী শুধুমাত্র যুদ্ধে নিহত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও রোগে মোট নিহত

১. জার্মানি ১ কোটি ১০ লক্ষ ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৭ লক্ষ

২. অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি ৭৮ লক্ষ ১২ লক্ষ ৭০ লক্ষ

৩. তুরস্ক ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৩ লক্ষ ৮ লক্ষ ৫০ হাজার

৪. বুলগেরিয়া ১২ লক্ষ ৯০ হাজার ৪ লক্ষ ৭ হাজার

মোট ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার ৩৫ লক্ষ ৪০ হাজার ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার

ইউরোপীয় জোট অংশগ্রহণকারী সেনাবাহিনী শুধুমাত্র যুদ্ধে নিহত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও রোগে মোট নিহত

১. রাশিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ ১৭ লক্ষ ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার

২. ব্রিটেন ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ লক্ষ ৮ হাজার ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার

৩. ফ্রান্স ৮৪ লক্ষ ১০ হাজার ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৩ লক্ষ

৪. ইতালি ৫৬ লক্ষ ১০ হাজার ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১২ লক্ষ ৫০ হাজার

৫. আমেরিকা ৪২ লক্ষ ৭ হাজার ১ লক্ষ ২০ হাজার ৩ লক্ষ ২০ হাজার

মোট ৩ কোটি ৯২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪২ লক্ষ ৮ হাজার ২ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার

এগুলো ছাড়াও পর্তুগাল, জাপান, বেলজিয়াম, রোমানিয়া, সার্বিয়া, গ্রিস এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ও বলকানের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৮/২২০; তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৪৫, ২৪৬।

যদি পরিসংখ্যানগুলোও যোগ করা হয়, তবে ইউরোপীয় জোটের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের মোট সংখ্যা ৪ কোটি ২ লক্ষ অতিক্রম করেছিল, যাদের মধ্যে ৫৬ লক্ষ ৮৩ হাজার নিহত হয়েছিল। অন্যদিকে যদি দুর্ভিক্ষ, অনাহার এবং রোগব্যাধিতে মৃত্যুবরণকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এই সংখ্যা ২ কোটি ২৮ লক্ষ ৬১ হাজারে দাঁড়ায়।

উভয় পক্ষের পরিসংখ্যান একত্রিত করলে দেখা যায় যে, সাড়ে ছয় কোটি মানুষ লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। চার বছরের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্য ও বেসামরিক নাগরিক মিলিয়ে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৮১ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ৯৩ লক্ষ ২৩ হাজার ছিল সৈন্য। দুই কোটিরও বেশি মানুষ আহত ও পঙ্গু হয়েছিল। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩৩ বিলিয়ন ডলার অনুমান করা হয়েছিল। [১]

সাইকস-পিকো চুক্তি। বেলফোর ঘোষণা:

যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালে মিত্রশক্তি নিজেদের মধ্যে তুরস্ককে বিভক্ত করার একটি গোপন চুক্তি করেছিল, যা “সাইকস-পিকো চুক্তি” নামে পরিচিত। এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- দক্ষিণ ইরাক ব্রিটেনকে দেওয়া হবে।
- লেবাননসহ উত্তর সিরিয়ার উপকূল ফ্রান্সের হবে।
- দুটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- একটি আরব রাষ্ট্র উত্তর ইরাক এবং পূর্ব জর্ডান নিয়ে গঠিত হবে। এটি ব্রিটেনের অধীনে থাকবে।
- দ্বিতীয় রাষ্ট্রটি সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং আল-জাজিরা নিয়ে গঠিত হবে, যার ওপর ফ্রান্সের আধিপত্য থাকবে।
- ইস্তাম্বুল এবং দার্দানেলিস প্রণালীর ওপর রাশিয়ার আধিপত্য থাকবে।

যুদ্ধ চলাকালীন ২ নভেম্বর ১৯১৭ সালে ব্রিটেন এটিও ঘোষণা করেছিল যে, ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। একে “বেলফোর ঘোষণা” বলা হয়। [২]

উসমানীয় সাম্রাজ্য, বিশ্বযুদ্ধের পর

খলিফা মুহাম্মদ রাশাদ তার মৃত্যু পর্যন্ত মিত্রশক্তির সাথে কোনো চুক্তির অনুমোদন দেননি। জুলাই ১৯১৮ সালে (অক্টোবর ১৩৩৭ হিজরি) তার মৃত্যু হয়। সেই সময় পর্যন্ত সামরিক দিক থেকে তুরস্কের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছিল এবং তুরস্কের পরাজয় একেবারে সামনে ছিল।

পরিস্থিতির সবচেয়ে কষ্টদায়ক দিকটি ছিল এই যে, জার্মানি যারা যুদ্ধের মূল পক্ষ ছিল, তারা পরাজিত হয়েও তাদের উপনিবেশগুলো ছাড়া

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানীয়াহ, ইলমাজ ওজতুনা: ২/২৩২, ২৩৩; আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ: বিষয়: আল-হারবুল আলামিয়াতুল উলা; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৮/২১৩।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ, আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা: ২৬৬, ২৬৭।

কোনো এলাকা থেকে বঞ্চিত হয়নি। জার্মানির শহরগুলোর মধ্যে কোনো শহরই মিত্রশক্তির দখলে যায়নি। কিন্তু তুরস্ক, যারা গোঁণভাবে যুদ্ধের অংশ হয়েছিল, আনাতোলিয়া এবং ইউরোপের কয়েকটি শহর বাদ দিয়ে তাদের সমস্ত উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছিল। সংক্ষেপে, মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত তুরস্ককে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিল। বাস্তবতা হলো, ইউরোপীয় দেশগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তুরস্কের জড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না, বিশেষ করে এই কারণে যে পরাজয়ের ক্ষেত্রে তুরস্কের কোনো ভবিষ্যৎ ছিল না। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের বিরোধ তো কোনোভাবে মিটিয়ে নিত, কিন্তু তুরস্কের জন্য চরম প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু হওয়া অনিবার্য ছিল। এই আশঙ্কার কোনো বিশেষ গুরুত্ব ছিল না যে, তুরস্ক যদি যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকত তবে ইউরোপীয় জোট জার্মানিকে পরাস্ত করার পর তুরস্ককে ঘিরে ফেলত। কারণ:

- ইউরোপের কোনো দেশের কাছে এমন কোনো কারণ ছিল না যার ভিত্তিতে তারা তুরস্কের ওপর সরাসরি আক্রমণের যৌক্তিকতা তৈরি করতে পারত।
- যদি তর্কের খাতিরে কোনো ইউরোপীয় শক্তি বা তাদের কোনো মিত্র এমন দুঃসাহস দেখাতও, তবে তুরস্ক নিজের প্রতিরক্ষা ভালোভাবে করতে পারত কারণ যুদ্ধ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে অত্যন্ত দুর্বল করে দিয়েছিল।
- বাস্তবতা হলো, বিজয়ী পক্ষও বিজয়ের পর তুরস্কের সাথে নতুন কোনো যুদ্ধ শুরু করার সাহস করতে পারত না, কারণ তুরস্ক প্রথম বলকান যুদ্ধের পর প্রচুর পরিমাণে সতেজ বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিল। যদি এই বাহিনীগুলো মহাযুদ্ধের গ্রাসে পরিণত না হতো, তবে তুরস্ক আরও কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকতে পারত। আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মতো উদীয়মান শক্তিগুলোর মোকাবিলায় বিশ্বে একটি ইসলামি পরাশক্তি অন্তত বিদ্যমান থাকত।

এর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক সত্য হলো এই যে, তুরস্ক যদি যুদ্ধে শরিক না হতো তবে যুদ্ধের শেষে ক্লান্ত ইউরোপের মোকাবিলায় নিজের সংরক্ষিত বাহিনী নিয়ে সে বিশ্বের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত।

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি গৃহবন্দী থাকাকালীন তার মৃত্যুর কিছুকাল আগে নিজের স্মৃতিচারণায় লিখেছেন:

“আমি আমার জন্মভূমির পরিণতি সম্পর্কে ভাবছি। ভাবছি যে এটি কোথায় থেকে কোথায় এসে পৌঁছাল? একটি বিশাল দেশ যা বিশ্ব জয় করেছিল এবং তিন মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মাত্র দশ বছরের মধ্যে তা এক মুঠো ধুলোয় পরিণত হলো। এই ধ্বংসের কারণ কী? আর তা জেনে এখন আর লাভই বা কী? নিজের দেশ হারানোর পর আমরা আর কী পেতে পারি? চল্লিশ বছর ধরে আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে বিশ্বশক্তিগুলো কখন নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়? এটিই ছিল আমার চূড়ান্ত আশা। আমার অভিমত ছিল যে, উসমানীয় সালতানাতের সৌভাগ্য এর সাথেই জড়িত। তারপর সেই দিনটি এল যার জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম কিন্তু... আফসোস যে এই লোকেরা আমাকে ততক্ষণে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছিল। আর যারা আমার পর দেশের শাসক হলো, তারা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা থেকে দূরে সরে গেল।”

সেই মহান সুযোগ যার জন্য আমি চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিলাম, তা এসে চলে গেল এবং উসমানীয় সালতানাতের হাত থেকে চিরতরে বেরিয়ে গেল। আমি ত্রিশ বছর ধরে যে চেষ্টা করেছিলাম যাতে আমাকে সিংহাসন থেকে সরানো না হয়, সেই চেষ্টা ছিল এই সুযোগটির জন্যই। আমি আমার নৌবহরকে (সর্বদা) উপসাগরের ভেতরে রেখেছিলাম এবং একে যুদ্ধ মহড়ার জন্যও বাইরে বের হতে দিইনি।

তারিখে মিল্লাতে মুসলিমা

আমি নৌবহরকে এই দিনের জন্যই সংরক্ষিত রেখেছিলাম। আমি জেনেশুনে গ্রিসের যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন সেজেছিলাম যাতে ইংরেজরা একে ক্রিট দখলের অজুহাত বানাতে না পারে। এই অবহেলা ছিল এই সুযোগের অপেক্ষায়। সংক্ষেপে, প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমার সিদ্ধান্তগুলো, সেগুলো ভুল হোক বা সঠিক, এই সুযোগের অপেক্ষায় নেওয়া হয়েছিল। আমি এই রহস্য চল্লিশ বছর ধরে নিজের হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তা নিজের সন্তানদের কাছে প্রকাশ করছি যাতে তারা আমাকে চিনতে পারে। আমি এই কথা কখনো কাউকে বলিনি, কারণ আমি অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে কথা দুইজন ব্যক্তি জেনে যায় তা আর রহস্য থাকে না। এই কারণেই আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব এই বিষয়ে দিতাম যাতে আমার এই উদ্দেশ্য কেউ জানতে না পারে এবং ভিনদেশি রাষ্ট্রগুলো এর কোনো আভাস না পায়। আমার ধারণা ছিল যে উসমানীয়দের এই ধরনের সুযোগ থেকে সময়মতো এবং দূরদর্শিতার সাথে ফায়দা হাসিল করা তাদের বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হবে। তারপর তারা তাদের সাম্রাজ্যকে পুনরায় বিশ্বশক্তির সারিতে নিয়ে যেতে পারবে। [১]

হায়! যদি তুর্কিদের নতুন সরকার এই সুযোগের সদ্যবহার করত। হায়! যদি এই লোকেরা অন্তত সেই সময় সুলতান আব্দুল হামিদের সাথে পরামর্শ করত এবং এই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের অভিজ্ঞতা থেকে ফায়দা হাসিল করত। যদি এমন হতো তবে তালাত পাশা, আনোয়ার পাশা এবং জামাল পাশার ট্রায়াল্‌সেল, খলিফা রশাদের ছায়াতলে দীর্ঘ সময় রাজত্ব করতে পারত। এমন পরিস্থিতিতে মোস্তফা কামাল পাশার মতো উদারপন্থী লোকের উপরে আসার কোনো সম্ভাবনা থাকত না। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার কোনো সুযোগ কখনো পেত না এবং উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্তির কোনো প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সম্ভবত জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তরাক্কির সরকারে তাই হতে পারত, কারণ এই যুগ যাকে এই লোকেরা ‘আহদে হুররিয়াত’ নাম দিয়েছিল, তা ছিল প্রকৃত স্বৈরতন্ত্রের যুগ।

এই ঋতুগুলোতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে

বাতাস নিঃশ্বদের চাদর পর্যন্ত

ওফার নামে কিছু জাদুকর

চুরি করে নেয় হাতের হিনা পর্যন্ত [২]

জমিয়তের স্লোগান—হুররিয়াত, আদল এবং মাসাওয়াত—ছিল সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য যার মাধ্যমে জাতিকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছিল। তারা হুররিয়াতের নামে স্বাধীনতা হরণ করেছে, আদলের নামে জুলুম করেছে এবং মাসাওয়াতের নামে ইসলামী ভ্রাতৃত্বকে ছিন্নভিন্ন করেছে। তাদের ট্রায়াল্‌সেল কারো কাছ থেকে মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, পরামর্শ গ্রহণ করত না। তারা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং মাহমুদ শওকতকে হত্যা করে ক্ষমতা পুরোপুরি নিজের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল। তারা সাময়িকী ও সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতাকে নিজেদের প্রশংসা ও স্তুতি এবং নিজেদের বিরোধীদের চরিত্র হননের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল। নির্বাচনকে তারা খেলায় পরিণত করেছিল এবং নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করতে কোনো দ্বিধাবোধ করেনি। নির্বাচনে নিজেদের বিজয়ের পথ সুগম করার জন্য তারা কেবল সংবিধানে পরিবর্তনই আনেনি, বরং তাদের নির্বাচনী বিজয়ের পেছনে আসল শক্তি ছিল সেনাবাহিনী, জনগণ নয়।

[১] মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি: পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭

[২] আহমদ ফারাজ

তাদের স্বঘোষিত স্বাধীনতার যুগ সম্পর্কে তাদের সমসাময়িক জেনারেল জাওয়াদ রিফাত [১]-এর বক্তব্য ছিল:

“জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর একটি দমনমূলক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এর যুগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা এমন ছিল যা সুলতান আব্দুল হামিদের ৩৩ বছরেও ঘটেনি।”

একইভাবে মুস্তফা তুরানের বক্তব্য ছিল:

“আমাদের প্রজন্ম দেখেছে এই স্বাধীনতা কী জিনিস? এই প্রজন্ম এমন সব বিপদ-আপদ দেখেছে এবং দেখেছে যে মানুষকে কুকুরের মতো ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এবং জাতীয় নেতাদের বুকো বর্শা বিদ্ধ করা হয়েছে। সেই ভুখণ্ড, যার স্বাধীনতার জন্য তার সেনাবাহিনী নিজের রক্ত বিসর্জন দিয়েছিল, ধ্বংসস্তূপের আকারে গণ-বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। এই সবই স্বাধীনতার যুগে ঘটেছে।” [২]

সুলতান আব্দুল হামিদ সানি উসমানীয় সালতানাতের ঋণ ৩০ মিলিয়ন লিরায়ে নামিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির সরকার কয়েক বছরের মধ্যে ঋণের বোঝা ৪০০ মিলিয়ন লিরা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এভাবে দেশটি অর্থনৈতিকভাবেও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। [৩]

তুর্কি জাতীয়তাবাদের ব্যর্থ স্লোগান:

যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল প্যান-ইসলামিজম আন্দোলন ত্যাগ করে পুনরায় তুরানিজম এবং প্যান-তুর্কিজমকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা। আমরা আগেই পড়েছি যে যুদ্ধের শুরুতে এই আধুনিকতাবাদী নেতারা প্যান-ইসলামিজম আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার এবং জিহাদি চেতনা থেকে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দুই বছর যুদ্ধের পর যখন তারা অনুভব করলেন যে তাদের বিজয় নিশ্চিত, তখন তারা ইসলামপন্থার সেই পোশাকটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যা তারা বাধ্য হয়ে পরিধান করেছিলেন। প্যান-ইসলামিজম আন্দোলন শেষ করে দেওয়া হলো এবং আবারও তুর্কি জাতীয়তাবাদের স্লোগান দেওয়া হতে লাগল। এই দ্বিমুখী নীতির কারণে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলাফল হিসেবে তুর্কি সরকারের প্রতি অনীহা, আস্থার অভাব এবং চূড়ান্ত পরাজয় দেখা দেয়। [৪]

যে করবে বর্ণ ও রক্তের ভেদাভেদ সে মিটে যাবে

তাঁরুতে বসবাসকারী তুর্কি হোক বা উচ্চবংশীয় আরবি

বংশ যদি মুসলিমের কাছে ধর্মের ওপর প্রাধান্য পায়

তবে দুনিয়া থেকে তুমি পথের ধুলোর মতো উড়ে যাবে

[১] জাওয়াদ রিফাতের জন্ম ১৮৯৩ সালে ইস্তাম্বুলে, তার পিতা দামেস্কের গভর্নর ছিলেন। জাওয়াদ সামরিক শিক্ষালয় থেকে প্রশিক্ষণ নেন এবং জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির শাসনামলে উচ্চ সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে সাংবাদিকতা ও লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং শত শত প্রবন্ধ লেখেন। জাওয়াদ সত্য কথা বলার কারণে বারবার কারাবরণ করেন। তার প্রবন্ধ ও রচনাবলী সেক্যুলার তুরস্কে নতুন করে ইসলামি চেতনা জাগ্রত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাওয়াদ রিফাত ১৯৭২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া, সুলাইমান বিন সালিহ আল-খিরাশি: পৃষ্ঠা ৬০।

[৩] মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ৬৮।

[৪] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া: পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪।

জাতীয়তাবাদী নেতারা প্যান-তুর্কিজম আন্দোলনকে তিনবার ব্যবহার করেছেন এবং প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। তারা মনে করতেন যে প্যান-তুর্কিজম বা ওসমানীয়বাদের পতাকা তুলে তারা একটি শক্তিশালী দুর্গ তৈরি করছেন যা সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ও ঐক্যের গ্যারান্টি হবে। প্রথমবার সুলতান আব্দুল আজিজের আমলে তাদের নেতা মিদহাত পাশা এটি পরীক্ষা করেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণেই সুলতান আব্দুল হামিদ এর পরিবর্তে প্যান-ইসলামিজম আন্দোলনের চারা রোপণ করেছিলেন।

সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর প্রগতিশীল নেতারা দ্বিতীয়বার প্যান-তুর্কিজম আন্দোলনকে শক্তিশালী করেন। তাদের দাবি ছিল যে এভাবে সাম্রাজ্যের সমস্ত জাতিগত ও ধর্মীয় উপাদানকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে, কিন্তু বলকান যুদ্ধের হাঙ্গামা তাদের সেই সুন্দর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়। মের্সিডোনিয়ার বিদ্রোহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে বিভিন্ন শ্রেণির এই জাতীয়তাবাদকে, যা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সমর্থনপুষ্ট ছিল, তুর্কিজমের দুর্বল প্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।

এই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছরগুলোতে প্যান-ইসলামিজমকে পরীক্ষা করেন এবং ইতিবাচক ফলাফলও অর্জন করেন, কিন্তু যেহেতু এই ইসলামপ্রীতি অন্তর থেকে ছিল না, তাই প্রয়োজন পূরণ হওয়ার নিশ্চয়তা পেতেই তারা তৃতীয়বার প্যান-তুর্কিজম বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন যার ফলস্বরূপ বিশ্বযুদ্ধে এমন এক শোচনীয় পরাজয় ঘটে যে তুরস্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। এটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির নেতারা একটি মরীচিকার পেছনে ছুটছিলেন।

মহাযুদ্ধের নেপথ্যে ইহুদিবাদী চক্রান্ত

এত বড় ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ কি কেবল একটি দুর্ঘটনা ও কাকতালীয় বিষয় ছিল নাকি এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল? দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ব এটাই ভেবেছে, বুঝেছে এবং প্রচার করেছে যে এই যুদ্ধের কারণ ছিল অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড, এরপর যা কিছু ঘটেছে তা আকস্মিকভাবে ঘটে গেছে। কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই ধারণাটিকে দুর্বল মনে করে এতটুকু বলেছেন যে বিশ্বের একটি বড় অংশকে পদানত করার পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিচরণক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে প্রতিটি দেশ পুরো বিশ্বের একমাত্র মালিক হতে চেয়েছিল যা বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখে সম্ভব ছিল না। তাই স্বার্থের আশা এবং চুক্তিগুলো তাদের দুটি দলে বিভক্ত করে দিয়েছিল যারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ নিজ স্থানে সঠিক হতে পারে, কিন্তু সমস্ত তথ্যের উর্ধ্ব বাস্তবতা হলো এই যুদ্ধের আসল খেলোয়াড় ছিল সেই ইহুদি পুঁজিপতি ও রাজনীতিবিদরা, যারা বিশ্বব্যাপী ইহুদিবাদের জন্য সক্রিয় ছিল। যুদ্ধের আগুন তারাই জ্বালিয়েছিল এবং পরে তা নেভানোর জন্য লিগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠা করাও ছিল তাদেরই কীর্তি। ইহুদিরা এর পরিকল্পনা অনেক আগেই করে রেখেছিল।

যুদ্ধের বহু বছর পর ইহুদিদের এই রহস্যগুলো ফাঁস হতে শুরু করে। ইহুদিবাদী গোপন প্রোটোকল এবং তালমুদের ব্যাখ্যামূলক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে এই তথ্যগুলো প্রথমবারের মতো প্রকাশ্যে আসে, কিন্তু যেহেতু গণমাধ্যমের ওপর ইহুদিদের একচেটিয়া আধিপত্য চলে আসছে, তাই এই তথ্যগুলো গোপন রাখা হয়েছে। আজও এগুলো সামনে আনার সাহস খুব কম মানুষই করে।

এই যুদ্ধের পেছনে জায়নবাদী লবির সেই বিশেষ মানসিকতা কাজ করছিল যা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ “তালমুদ” তাদের দিয়েছে। এর মতে বনী ইসরাঈল ছাড়া সমস্ত মানুষ (তারা মুসলিম হোক বা নাসরানি, হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ) ভেড়া-বকরি বরং পোকামাকড়ের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তাই ইহুদিরা নিজেদের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ উসকে দিতে, সরকার পতনে এবং লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করতে কোনো দ্বিধা বোধ করে না। এই সমস্ত বিষয়কে তারা “বিজনেস” (ব্যবসা) মনে করে। নিজেদের সামান্য স্বার্থের জন্য তারা হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাছে অন্য জাতিগুলোর জানমালের ক্ষতির কোনো মূল্য নেই। হ্যাঁ, নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা তা সহ্য করে না।

ঊনবিংশ শতাব্দী ঈসায়ীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দী ঈসায়ীর শুরুতে বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আন্দোলন পুরো বিশ্বে সক্রিয় ছিল। ব্রিটেন, আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে তাদের বড় হাত ছিল। তাদের ব্যক্তির কেবল সরকারি সর্বোচ্চ পদমর্যাদাতেই আসীন ছিল না বরং গির্জাতেও তাদের প্রতিনিধিরা ঢুকে পড়েছিল। আমেরিকান কংগ্রেস সদস্য, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে ইহুদি বা ইহুদিদের জন্য কাজ করা ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশ ভালোই ছিল।

ইহুদিদের হাজার বছরের পুরনো আকাঙ্ক্ষা কেবল একটি স্বাধীন মাতৃভূমি লাভ করা ছিল না। বরং তাদের ফিলিস্তিন প্রয়োজন ছিল যাকে কেন্দ্র বানিয়ে তারা পুরো বিশ্ব শাসন করার স্বপ্ন দেখে আসছিল। তাদের বিশ্বাস হলো যে, একজন বিশ্বব্যাপী ইহুদি বাদশাহর আবির্ভাবের পর পুরো পৃথিবী তাদের গোলাম হবে, তবে সেই বাদশাহর আবির্ভাব তখনই হবে যখন তারা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে সেখানে হাইকালে সুলাইমানি নির্মাণ করে নেবে।

ইহুদিদের সাথে একটি বড় সমস্যা ছিল বারবার দেশান্তর হওয়া। এর কারণও তারা নিজেরাই ছিল। তারা বিশ্বের যে দেশেই আবাদ হতো, সেখানকার কেবল অর্থনীতি ও বাণিজ্যই নয় বরং রাজনৈতিক কাঠামোর ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করত এবং সরকার গঠন ও পতনে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তাই বিশ্বের বিভিন্ন সরকার তাদের নির্বাসিত করতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ার বাদশাহ স্থানীয় ইহুদিদের এমনই এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন এবং রাশিয়ায় ইহুদিদের ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। তাই অনেক ইহুদি রাশিয়া থেকে পালিয়ে যাযাবর হয়ে যায়।

এমন সময়ে ইহুদিদের একজন ঘুঁটি তাদের খুব কাজে আসে যাকে বিশ্ব “ডিজরায়েলি” (বেঞ্জামিন ডিজরায়েলি) নামে চেনে। এই ইহুদি দুইবার নির্বাচিত হয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি একজন চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৮০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার উপন্যাস “কনিংসবি” (Coningsby) বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর একটি। তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার প্রিয়পাত্র ছিলেন, রানীই তাকে “লর্ড বিকনসফিল্ড” খেতাব দিয়েছিলেন। তিনি ১৮৩৭ সালে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৬৭ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়বার তার প্রধানমন্ত্রিত্ব ১৮৭৪ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ছিল। তিনি বাহ্যিকভাবে নাসরানি ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে তিনি বাস্তবে শেষ পর্যন্ত কটুর ইহুদিই ছিলেন।

ডিজরায়েলি আমেরিকার দুই বিখ্যাত ইহুদি পুঁজিপতি: মন্টেফিওরি এবং রথচাইন্ডের সাথে মিলে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। ডিজরায়েলি তার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পুরোপুরি ব্যবহার করেন এবং ইহুদি পুঁজি...

দাতারা পানির মতো অর্থ ব্যয় করেছিল, কিন্তু সেই সময় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি।

১৮৯৬ সালে বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অস্ট্রিয়ার সাংবাদিক “থিওডোর হার্জল” (১৮৬০-১৯০৪) সামনে আসেন। তিনি তার রচিত গ্রন্থ “আদ-দাওলাতুল ইয়াহুদিয়াহ”-তে নীল নদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত একটি বিশাল ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র বানানো এবং বিশ্বব্যাপী ইহুদি বাদশাহর ক্ষমতার পথ সুগম করার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা পেশ করেন। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সময় থেকে বনী ইসরাঈল যেসব দেশে বসবাস করত, সেগুলোকে ইহুদিদের জায়গির হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই গ্রন্থটি সারা বিশ্বের ইহুদিদের বিশ্বব্যাপী জায়নবাদী আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। হার্জলই জায়নবাদীদের বার্ষিক সম্মেলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথম বিখ্যাত সম্মেলনটি ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩০০ জন এমন নির্বাচিত ইহুদি নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল যারা সারা বিশ্বে ইহুদিদের আধিপত্য বিস্তারে সক্রিয় ছিল।

এই সম্মেলনে হার্জল ঘোষণা করেন যে, আমরা ইহুদিবাদের আধিপত্যের প্রথম পাথর স্থাপন করেছি এবং অচিরেই পৃথিবী আমাদের অনুগত হবে। এই সম্মেলনেই প্রথমবারের মতো “প্রোটোকলস অফ দ্য এন্ডার্স অফ জায়ন” পেশ করা হয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয় যার সারসংক্ষেপ ছিল তিনটি পয়েন্ট:

- আমরা ফিলিস্তিনে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করব।
- আমরা বিশ্বের অর্থনীতিতে ইহুদিদের আধিপত্য বিস্তার করব অর্থাৎ সম্পদের সকল উৎস আমাদের হাতে থাকবে।
- প্রাচীন হিব্রু ভাষা ও সংস্কৃতি যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় জীবিত করা হবে।

এই সম্মেলনেই জাতিসংঘ সদৃশ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণাও আলোচনার অধীনে আসে।

সম্মেলনের তিন বছর পর ১৯০১ সালে হার্জল মুসলিম খলিফা সুলতান আব্দুল হামিদ সানির সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ফিলিস্তিনের ভূমি দাবি করেন, কিন্তু সুলতান সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে জায়নবাদীরা সরাসরি উসমানীয় খিলাফতকে ধ্বংস করে ফিলিস্তিন দখলের পরিকল্পনা করে এবং এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তি ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ব্রিটেনের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯০৩ সালের ষষ্ঠ বিশ্ব ইহুদি সম্মেলনে ইহুদি নেতা ম্যাক্স নরডাউ ঘোষণা করেছিলেন:

“অচিরেই আমরা একটি বিশ্ব সমাবেশের ডাক দেব। আমি আপনাদের একটি মইয়ের ধাপ দেখাচ্ছি যা আমাদের এক নিমেষে উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ব্রিটেনের সাহায্যে ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তৈরি হবে।”

এই সময়ে ইহুদিরা বিশ্ব জয়ের বৈশ্বিক পরিকল্পনায় অন্য একটি দিক থেকেও কাজ শুরু করেছিল। তারা এমন একটি ধর্মহীন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল যা বাহ্যিকভাবে নাস্তিক্যবাদী কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে ইহুদি-ঘনিষ্ঠ হবে। এই উদ্দেশ্যে ইহুদি চিন্তাবিদরা ধর্মহীনতাকে কমিউনিজম ও সোশ্যালিজমের রূপ দিয়ে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ ছিলেন মার্ক্স, যিনি The Capital নামক বই লিখে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা পেশ করেন।

মার্কস তার পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দেখার আগেই মারা যান। তবে কিছু ইহুদি তাদের জনবসতিগুলোতে পরীক্ষামূলকভাবে মার্কসীয় চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত একটি ব্যবস্থার অধীনে পরিচালনা করতে শুরু করে, যাকে “কিবুতজ” (kibbutz) বলা হতো। এতে জমি ও সম্পত্তিতে কোনো ব্যক্তির মালিকানা ছিল না। প্রশাসনই ছিল প্রকৃত মালিক। সকল মানুষ মিলেমিশে কাজ করত এবং প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত আয় দিয়ে তাদের প্রয়োজন মেটানো হতো। যেন এটি ছিল একটি সীমিত স্থানে সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক পরীক্ষা। জনবসতি রক্ষার জন্য একটি প্রহরী বাহিনীও গঠন করা হয়েছিল।

এই সীমিত পরীক্ষার পর লেনিন নামক আরেক ইহুদি রাজনীতিবিদ এটি রাশিয়ায় বাস্তবায়নের অভিযান শুরু করেন। জার তার বিপ্লবী চিন্তাধারাকে বিপদজনক মনে করে ১৯০০ সালে তাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করেন, কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে ইউরোপে চলে যান এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে তার বিপ্লবী মতাদর্শ প্রচার করতে থাকেন। যেহেতু রাশিয়ার জনগণ “জার”-এর জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, তাই তারা “লেনিন”-কে তাদের ত্রাণকর্তা মনে করে তার চিন্তাধারার প্রতি প্রভাবিত হতে শুরু করে।

ইহুদিরা তাদের প্রাচীন পরিকল্পনা অনুযায়ী রাশিয়ার জারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেখানে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিল। তাই ১৯০৪ সালে তারা আবারও জারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, যা ব্যর্থ হয়। এবার রুশ সরকার ইহুদিদের ওপর অধিক কঠোরতা অবলম্বন করে, যার ফলে বিপুল সংখ্যক ইহুদি রাশিয়া থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে রুশ রাজপরিবারের সাথে ইহুদিদের শত্রুতা আরও দৃঢ় হয়। এদিকে লেনিন ১৯১০ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন এবং প্যারিসে স্থানান্তরিত হন। ১৯১৩ সালে লেনিন “প্রাগ”-এ “বলশেভিক কনফারেন্স”-এর প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনটি ছিল আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার একটি ভূমিকা।

এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় দশকে ইহুদিদের তিনটি বড় শত্রু ছিল: প্রথম শত্রু ছিল রাশিয়ার জার। ইহুদিরা লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে জার শাসনের অবসান ঘটাতে চেয়েছিল এবং সেখানে একটি নাস্তিক্যবাদী ও পর্দার আড়ালে জায়নবাদ-পন্থী সরকার গঠন করতে চেয়েছিল।

দ্বিতীয় শত্রু ছিল জার্মানির রাজপরিবার, যারা ইহুদিদের ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের শাস্তি দিয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যায় নির্বাসিত করেছিল। এই পরিবারটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হতে যাচ্ছিল, যা ইহুদিদের জন্য ছিল অসহনীয়।

তৃতীয় শত্রু ছিল তুরস্ক, যেখানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও খিলাফত টিকে ছিল, যা ফিলিস্তিন সংক্রান্ত জায়নবাদী লক্ষ্য অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এই তিনটিই ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী শক্তি যাদের সহজে টলানো সম্ভব ছিল না। অথচ ইহুদিরা কেবল তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, বরং তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মতাদর্শকেও মিটিয়ে দেওয়ার সংকল্প করেছিল। এই উদ্দেশ্যগুলো এমন কোনো বিশাল যুদ্ধ ছাড়া পূরণ হওয়া সম্ভব ছিল না, যেখানে এই তিনটি শক্তি পূর্ণ শক্তিতে অংশগ্রহণ করে ক্লান্ত ও পরাজিত হবে।

একটি বড় যুদ্ধের আগুন জ্বালানোর জন্য বলকান ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান, যেখানে কয়েক বছরের মধ্যে দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এবং সেখানে রাজ্যগুলোর ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে অস্ট্রিয়ার দ্বন্দ্ব চলছিল।

সুলতান আব্দুল হামিদের পদচ্যুতি, জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র ক্ষমতা লাভ এবং বলকান ও লিবিয়ার পতনের পর বহির্বিপ্লবে তুরস্ক তার পূর্বের শান-শওকত হারিয়ে ফেলেছিল এবং অভ্যন্তরীণভাবে এর বিভিন্ন প্রদেশে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছিল।

যুদ্ধের আগে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ইহুদি পুঁজিপতি, জায়নবাদী নেতা এবং তাদের মিত্র ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা বিশ্বের অবস্থাকে এমন একটি দালানের মতো করে তুলেছিলেন যেখানে জায়গায় জায়গায় বারুদের স্তূপ বিছিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু তারের মাধ্যমে সেগুলোকে একে অপরের সাথে যুক্ত করা এবং আগুনের ফুলকি দেখানো বাকি ছিল।

তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে নামানো অথবা জার্মানি ও রাশিয়াকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য কোনো অজুহাত তৈরি করা কঠিন ছিল না। তবে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া বলকান ইস্যুতে যেকোনো সময় লড়তে পারত। অস্ট্রিয়ার সমর্থনে জার্মানির যুদ্ধে শরিক হওয়া নিশ্চিত ছিল। জার্মানির খাতিরে তুরস্কের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া অবশ্যই কঠিন ছিল কিন্তু তা অসম্ভব ছিল না, কারণ সেখানে খলিফার নয় বরং জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র সেই জেনারেলদের হুকুম চলত, যাদের প্রশিক্ষণে ফ্রিম্যাসনরি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা বর্জিত এবং আবেগ ও উত্তেজনায় ভরপুর ছিল। তাদের ভুল তথ্য দিয়ে এবং রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা ফ্রিম্যাসন এজেন্ট এবং জায়নবাদী সংবাদমাধ্যমের জন্য কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। এটাও অসম্ভব নয় যে, তুরস্কের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনোয়ার পাশা—যিনি তুরস্ককে যুদ্ধের আগুনে ঠেলে দিয়েছিলেন—ফ্রিম্যাসনরি বা এই জাতীয় কোনো গোপন ইহুদি সংগঠনের প্রভাবে এসে প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন; এটাও সম্ভব যে তিনি তাদেরই এজেন্ট ছিলেন, যদিও এর কোনো প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না এবং তার বাহ্যিক চরিত্রও এই সাক্ষ্য দেয় যে তিনি নিষ্ঠাবান, ইসলামপন্থী এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন কিন্তু চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছিলেন।

জায়নবাদী লবির জন্য যুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা খুব সহজ ছিল কারণ সেখানে ইহুদি পুঁজিপতি ও রাজনীতিবিদদের সাথে প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের গভীর সম্পর্ক ছিল। এমনকি জার্মানিতেও, যেখান থেকে ইহুদিদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, জায়নবাদী লবি গোপনে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যবহার করতে সক্ষম ছিল।

ইহুদিরা এই যুদ্ধের সাথে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলো যুক্ত করে রেখেছিল:

- ১. তাদের শত্রু রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের অবসান।
- ২. তাদের শত্রু জার্মানির পরাজয় ও ধ্বংস।
- ৩. খিলাফতের পতন এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভাজন ও বিলুপ্তি।
- ৪. ফিলিস্তিনে নিজেদের জন্য আবাসভূমির পথ সুগম করা।
- ৫. শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা যা পুরো বিশ্বের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

এই শেষ উদ্দেশ্যটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার একটি অঙ্গরাজ্যের বিচারক মিস্টার স্ট্রং ‘খিয়ানতের পতাকাবাহী’ (The Traitors)...

নামে একটি বই লিখেছিলেন যাতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলনে লিগ অফ নেশনস-এর ধারণাটি একটি নিয়মিত কালানুক্রমিক বিন্যাসে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি নির্ধারিত পদক্ষেপের পর একটি বিশ্ব সংস্থা অস্তিত্বে আনা হবে। এই সম্মেলনে এটিও ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এই ধরনের একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর ইহুদি রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেরি হবে না।

যেহেতু এই সমস্ত বিষয় জার্মানি ও তুরস্কের পরাজয় এবং জার শাসনের শক্তি ক্ষয় হওয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই এটিও স্থির করা হয়েছিল যে, প্রথমে জার্মানিকে প্রাণপণে লড়াইতে দেওয়া হবে যাতে রাশিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং লেনিন সেখানে সফল বিদ্রোহ করতে পারে। এটিও স্থির করা হয়েছিল যে, জার্মানিকে শেষ পর্যন্ত পরাজিত করতে হবে। এর জন্য জার্মানির কিছু কমান্ডারকে কিনে নেওয়া হয়েছিল যাদেরকে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ব্যবহার করা হয়েছিল, যখন জার্মানি আপাতদৃষ্টিতে বিজয়ী হতে যাচ্ছিল।

তুরস্কের সাথে যুদ্ধকে এই পর্যায় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যাতে তার শক্তি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে মিত্রশক্তির প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামনে মাথা নত করে দেয়, যদিও এতে মানুষের প্রাণের ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ বেড়ে যায়।

যুদ্ধের তৃতীয় বছরে এর ফলাফল সামনে আসে। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে লেনিন নির্বাসন ত্যাগ করে মস্কো পৌঁছান এবং বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে নভেম্বরে জার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে “ক্রেমলিন”-কে কেন্দ্র করে সোভিয়েত সরকার গঠন করা হয়। এটি আসলে ইহুদিদের বিজয় ছিল। যারা এই আন্দোলনের নেতাও ছিল এবং এর জন্য আর্থিক সম্পদও সরবরাহ করে আসছিল। লেনিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিখ্যাত মার্কিন লেখক লুই ফিশার তার গ্রন্থ “লাইফ অফ লেনিন”-এ প্রকাশ করেছেন যে লেনিন ইহুদি ছিলেন। ইহুদিরা তাকে এই হিসেবে ভালোভাবেই চেনে। তার স্ত্রীও ইহুদি ছিলেন।

মস্কোর লাল বিপ্লবের কয়েক মাস আগে ১৯১৭ সালের জুনে, যখন যুদ্ধের ফলাফলের আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল, ইহুদি বিশ্ব সম্মেলনে বলা হয়েছিল:

“আমরা জালিম সামরিক শক্তিগুলোকে একে অপরের সাথে লড়িয়ে দিয়ে তাদের শক্তি ভেঙে দিয়েছি (জালিম সামরিক শক্তি বলতে মুসলমানদের উসমানীয় খিলাফত, রাশিয়া এবং জার্মানিকে বোঝানো হয়েছে)। আমরা কায়সারি শক্তিগুলোকে ভেঙে দিয়েছি এবং অবশিষ্ট কয়েকটি সরকারকেও উপড়ে ফেলব, অর্থাৎ পুরো বিশ্বে উপনিবেশ স্থাপিত হবে, বিশ্বের মানচিত্র ও ভূগোল পরিবর্তিত হয়ে যাবে, এখন একটি আধিপত্যশীল বিশ্ব ক্ষমতা অস্তিত্বে আনা যেতে পারে।”

এমনটাই হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে বড় বড় বিপ্লব আসে। ইহুদিবাদীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো বিশ্বকে “লিগ অফ নেশনস”-এর ওপর একমত করে, যার কাঠামো মার্কিন প্রেসিডেন্ট “উইলসন”-এর রাজনৈতিক উপদেষ্টা “কর্নেল হাউস” তার সহযোগীদের সহায়তায় তৈরি করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে লিগ অফ নেশনস (League of Nations)-এর মাধ্যমেই সেই চুক্তিগুলো হয়েছিল, যার মাধ্যমে উসমানীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয় এবং খিলাফতের বিশাল এলাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয়। এভাবে সিরিয়া ও আরব দেশগুলোর ওপর যেসব ব্যক্তি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রিটিশ এজেন্ট এবং ইহুদি এজেন্ট, তাদের উপস্থিতিতে ইহুদি...

কে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে গিয়ে বসানো কোনো কঠিন কাজ ছিল না। আধুনিক তুরস্ক অস্তিত্বে এল, উপনিবেশবাদ এবং নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯২৭ সালে ফ্রিম্যাসনরি সদস্য “লেন হফ” “ওয়ান্টারফ্রি মোরার্স রাইটিং” নামক সাময়িকীর সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন:

“যারা ফ্রিম্যাসন এবং লিগ অফ নেশনস-এর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে তারা সঠিক বলে। লিগ অফ নেশনস ফ্রিম্যাসন চিন্তাধারা থেকেই উদ্ভূত।”

লিগ অফ নেশনস তিন দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। পরবর্তীতে যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্যকর থাকা কঠিন হয়ে পড়ল, তখন একে ভেঙে দিয়ে “জাতিসংঘ” (ইউনাইটেড নেশনস)-কে অস্তিত্ব দান করা হলো। [১]

[১] বিশ্বযুদ্ধের নেপথ্যে জায়েনবাদী ষড়যন্ত্রের জন্য উল্লিখিত সমস্ত তথ্য নিম্নোক্ত বইসমূহ থেকে নেওয়া হয়েছে:

- দাওরুল ইয়াহুদ ফি ইসকাতিল খিলাফাতিল উসমানিয়াহ: ড. হিলা বিনতে সাদ বিন মুহাম্মদ আল-সুলাইমি, তাবা জামিআ উম্মুল কুরা, মক্কা মুকাররমা, ১৪২২ হিজরি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
- মুজাযু তারিখিল ইয়াহুদ: মাহমুদ বিন আবদুর রহমান কদাহ।
- আত-তারিখুল ইয়াহুদি আল-আম: ড. সাবের তুআইমাহ।
- বাবওয়াত মিনাল হাইয়িল ইয়াহুদি: লেখক জোয়াকিম বার্নস, অনুবাদ খালিদ আসাদ, তাবা দারু হাসসান লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি, দামেস্ক, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ, ১৪০৩ হিজরি।
- Hidden Menace to World Peace
- “বিশ্ব শান্তির জন্য প্রাচীন হুমকি” মেজর গিব স্টুয়ার্টের কলম থেকে।

মুহাম্মদ স, ادس, ওয়াহিদউদ্দিন

১৩৩৭ হি. থেকে ১৩৪০ হি.

(১৯১৯ খ্রি. থেকে ১৯২২ খ্রি.)

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ (২৯ রবিউস সানি ১৩৩৬ হিজরি) তারিখে প্রাক্তন খলিফা সুলতান আব্দুল হামিদ সানি বন্দি অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। চার মাস পর ৩ জুলাই ১৯১৮ তারিখে খলিফা রশাদ (মুহাম্মদ খামিস)-এরও মৃত্যু হয়। যুবরাজ ইউসুফ ইজ্জুদ্দিন বিন সুলতান আব্দুল আজিজ আগেই মারা গিয়েছিলেন। বলা হয় যে, ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র নেতারা, যারা যুবরাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিলেন। [১]

এমন পরিস্থিতিতে মরহুম খলিফা রশাদের ভাই মুহাম্মদ স, ادس ওয়াহিদউদ্দিনকে খেলাফতের মসনদে বসানো হয়। তিনি ১৮৬০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জ্ঞান, গুণ এবং সামরিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন [২] কিন্তু পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে পারছিলেন না। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ৫৯ বছর হয়েছিল এবং তার চোখের সামনেই তুরস্ক ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। আরব, সিরিয়া এবং ইরাক হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। উত্তর সিরিয়া এবং দক্ষিণ আনাতোলিয়ার উপকূলীয় এলাকায় লিকিয়া ও ফ্রান্সের বাহিনী দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। আনাতোলিয়ার কিছু পশ্চিমা শহর গ্রিস এবং কিছু দক্ষিণ এলাকা ইতালি দখল করে নিয়েছিল। আনাতোলিয়ার মধ্য ও পূর্ব অংশ ছাড়া তুর্কিদের কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যার পর তুরস্কের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। [৩]

খলিফা ওয়াহিদউদ্দিন যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা এবং জামাল পাশার মতো ত্রয়ীসহ ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র সমস্ত মন্ত্রীদের বরখাস্ত করেছিলেন, যাদের অদূরদর্শিতার কারণে তুরস্কের এই পরিণতি হয়েছিল।

তিনি আহমদ ইজ্জত পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে তাকে মিত্রশক্তির সাথে শান্তির আলোচনার দায়িত্ব দেন। ৩০ অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে লিমোস দ্বীপের “মুদ্রোস” শহরে তুরস্ক এবং ব্রিটেনের প্রতিনিধিদের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী নির্ধারিত হয়। ১২ নভেম্বর ১৯১৮ তারিখে এই শর্তাবলী অনুযায়ী ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালির বাহিনী দার্দানেলস প্রণালীতে প্রবেশ করে।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১২/১৪

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াতুল মাজহলাহ: পৃষ্ঠা ৪৭৯

[৩] আনাতোলিয়ার পূর্ব এলাকা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলো এজন্য বেঁচে গিয়েছিল কারণ রাশিয়া কমিউনিস্ট বিপ্লবের ত্রাস্তিকাল অতিক্রম করার কারণে কোনো বৈদেশিক অভিযানে অংশ নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না।

বসফরাস প্রণালী এবং ইস্তাম্বুলসহ তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও সামরিক পয়েন্টগুলোতে মোতায়ন করা হয়েছিল। এভাবে তুরস্কের কেন্দ্রবিন্দু মিত্রশক্তির কবলে চলে আসে। এটি এমন এক সাফল্য ছিল যা মিত্রশক্তি যুদ্ধ করেও অর্জন করতে পারেনি। [১]

ট্রায়াম্পেলের পলায়ন ও পরিণতি

যুদ্ধে পরাজয় ও পদচ্যুতির কারণে তালাত পাশা, আনোয়ার পাশা এবং জামাল পাশার সম্মান কেবল ধুলোয় মিশে যায়নি, বরং তারা নিশ্চিত ছিলেন যে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে তাদের মর্যাদা হবে যুদ্ধাপরাধীদের মতো। আর যুদ্ধ শুরু করার অপরাধে ইউরোপীয় মিত্রশক্তি তাদের কঠোরতম প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানাবে। [২]

ফলে মুদরোস চুক্তির দুই দিন পর আঞ্জুমানে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির বড় বড় নেতারা আত্মগোপন করেন। তিন বড় নেতা একটি জার্মান জাহাজে চড়ে গোপনে জার্মানি চলে যান যাতে পরিস্থিতি অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত সেখানে আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু তুরস্কের ফিরে আসা তাদের ভাগ্যে ছিল না। তালাত পাশাকে বার্লিনে হত্যা করা হয়। জামাল পাশা আফগানিস্তানের শাহ আমানুল্লাহ খানের কাছে আশ্রয় নেন এবং কিছুকাল আফগান বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেন। এরপর রাশিয়া থেকে ফেরার পথে তিবিলিসিতে তাকেও হত্যা করা হয়। আনোয়ার পাশা একটি নতুন তুর্কি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে তুর্কিস্তানে চলে যান এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ দেন। [৩]

একটি মন্তব্য

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি জামাতের এই নেতারা অপরাধী ছিলেন এবং কর্মফল তাদের সেই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল যার তারা যোগ্য ছিলেন। তবে এটিও সত্য যে ত্রুসেডার শক্তি এবং ইহুদি নেতারাও তাদের রাজনীতিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না। ইহুদিদের প্রতি নরম মনোভাব থাকা সত্ত্বেও এই লোকেরা স্বাধীনতাপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং কখনো কখনো তাদের মধ্যে ইসলামী চেতনাও জেগে উঠত। এই লোকদের বোকামি ও অজ্ঞতার কারণে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা পাশ্চাত্যপন্থী ছিলেন এবং পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের দাবার গুটির মতো ব্যবহার করেছিল, কিন্তু এই জেনারেলরা অন্তত তুরস্কের প্রতিরক্ষা থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষ করে আনোয়ার পাশা এবং জামাল পাশা তুর্কি অঞ্চলগুলোতে বিদেশি দখলদারিত্ব সহ্য করতে পারতেন না, যেমনটি লিবিয়া, বলকান, আর্মেনিয়া এবং রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে তাদের সাহস ও রণলিপ্সার ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়। এই লোকেরা ক্ষমতাবান খলিফার প্রবক্তা ছিলেন না কিন্তু খেলাফতকে নামমাত্র হলেও অবশ্যই টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তারপর বিশ্বযুদ্ধে তাদের...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২২৫; আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলমিয়া: প্রবন্ধ আল-হারবুল আলমিয়াতুল উলা; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২১৩, ২৩৬।

[২] এই কথার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে যে তুর্কি নেতৃত্বের এই ট্রায়াম্পেলের তুরস্কে থাকা এজন্য কঠিন করে তোলা হয়েছিল যাতে মোস্তফা কামাল পাশাকে সামনে আনা যায়, যার হাতে তুরস্ক থেকে কেবল খেলাফতের অবসানই ঘটানো হয়নি বরং এর ইসলামী পরিচয়ও মুছে ফেলা হয়েছে। যদি তালাত পাশা এবং আনোয়ার পাশা ক্ষমতায় থাকতেন তবে তারা কখনোই খেলাফত বিলুপ্তিতে রাজি হতেন না। বরং তাদের মতো প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের উপস্থিতিতে মোস্তফা কামালের উত্থানও সম্ভব ছিল না।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২২৬, ২২৮।

তারিখ উন্মতে মুসলিমা — পঞ্চম খণ্ড — ৩১৮

ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিল এবং পশ্চিম সম্পর্কে তাদের সুধারণার তাজমহল ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে পশ্চিম সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারাও কিছুটা হলেও অবশ্যই বদলে গিয়েছিল। এই কারণেই পশ্চিমা শক্তিগুলো এখন আর তাদেরকে আগের মতো নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার মনে করত না। তারা জানত যে, এই জেনারেলদের উপস্থিতিতে তারা তুরস্কের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইচ্ছামতো প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে তাদের এই চেষ্টা অবশ্যই ছিল যে, রাজনৈতিক কূটচাল, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তুরস্ককে এতটাই দুর্বল করে দেওয়া হোক যাতে তার কাছ থেকে প্রতিটি দাবি আদায় করে নেওয়া যায়। এই দাবিগুলোর মাধ্যমে তারা কেবল তুরস্কের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং সামরিক শক্তির অবসানই চায়নি, বরং সেখান থেকে ইসলামের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে ফেলা ছিল তাদের লক্ষ্য। তাই তাদের পূর্ণ চেষ্টা ছিল যে:

- তুরস্ককে এতটাই দুর্বল করে দেওয়া হোক যাতে তার ওপর নিজেদের প্রতিটি জেদ চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

- তুরস্কে এমন একজন হাতিয়ার পাওয়া যাক যে তাদের এজেন্ডা অনুযায়ী চলবে।

যতক্ষণ তুরস্কের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির আধুনিকতাবাদীরা ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও বিশ্বশক্তিগুলো তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারছিল না। বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে তারা উসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি খতম করে তাকে অসহায় ও নিরুপায় করে দিয়েছিল। এভাবে তাদের প্রথম লক্ষ্য পূরণ হয়েছিল। এরপর তাদের আসল লক্ষ্যের দিকে এগোতে হতো, অর্থাৎ তুরস্কের ইসলামী পরিচয় বিলুপ্ত করা। জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে এমন কিছু লোক ছিল যারা কেবল আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীই ছিল না, বরং দ্বীনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং কট্টর নাস্তিক ছিল। তারা ইসলামকে একটি সেকেলে ব্যবস্থা এবং খিলাফতকে উন্নতির পথে বাধা মনে করত। বিশ্বশক্তিগুলো তাদের মধ্য থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিল যে তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। এমন একজন ব্যক্তির মধ্যে তারা নিম্নোক্ত গুণাবলি খুঁজছিল:

- যার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে।
- যে মুসলমানদের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির কঠোর সমালোচক ও বিরোধী হবে।
- যে ইসলামী বিধানের বিদ্রোহী হবে, হালাল-হারাম সম্পর্কে উদাসীন এবং মুক্তমনা হবে।
- যে স্বভাবগতভাবে নির্ভীক, রুক্ষ মেজাজের ও সাহসী হবে এবং পরিণতির পরোয়া না করে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

পশ্চিমা শক্তিগুলো এই সমস্ত গুণাবলি যে ব্যক্তির মধ্যে একত্রে পেয়েছিল, তাকে বিশ্ব মোস্তফা কামাল পাশা নামে চেনে। এই সেই ব্যক্তি ছিল যে পুরো মুসলিম বিশ্বের বিরোধিতার পরোয়া না করে পশ্চিমা এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিল।

+++

মোস্তফা কামাল পাশা

তুরানি এঙ্গেলের পদচ্যুতি ও পলায়নের পর জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির দ্বিতীয় সারির নেতাদের সামনে আসার সুযোগ হয়, যাদের মধ্যে মোস্তফা কামাল কিছু রণাঙ্গনে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিন মোস্তফা কামালের বুদ্ধিমত্তার তখন থেকেই প্রশংসাকারী ছিলেন যখন তিনি যুবরাজ ছিলেন এবং মোস্তফা কামালকে সাথে নিয়ে বার্লিন সফরে গিয়েছিলেন। [১]

মোস্তফা কামাল যাকে আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা এবং “আতাতুর্ক” (তুর্কিদের পিতা) বলা হয়, ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের একজন। এক গোষ্ঠী তাকে তুর্কিদের ত্রাণকর্তা মনে করে, আবার অন্যদের মতে তিনি ইসলামের চরম শত্রু এবং ইহুদি এজেন্ট ছিলেন। আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে আমরা লভ্য অকাট্য তথ্যের আলোকে নিরপেক্ষতার সাথে মোস্তফা কামালের ব্যক্তিত্ব এবং তার যুগকে সামনে নিয়ে আসি।

মোস্তফা কামাল ১৮৮১ সালে স্যালোনিকা (সেলানিক)-এ জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর রেজা নুরের মতে, মোস্তফা কামাল স্যালোনিকার এক দুশ্চরিত্রা ও স্বাধীনচেতা নারী জুবাইদার অবৈধ সন্তান ছিলেন। পরবর্তীতে সেই নারী আলী রেজা আফেন্দি নামক এক সৈনিকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সন্তানকে তার সাথে সম্পর্কিত করে দেন। ডক্টর রেজা নুরের মতে, কামালের গায়ের রঙ, তার মাথার খুলির গঠন এবং নীল চোখ দেখার পর তার বাবা-মাকে তুর্কি বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। মোস্তফা কামাল সর্বদা তার পিতামাতা সম্পর্কে কিছু বলতে ইতস্তত করতেন। এ বিষয়ে তিনি বড়জোর এতটুকু বলতেন: “আমিও অন্যদের মতো জন্মগ্রহণ করেছি এবং বড় হয়েছি। যদি আমার জন্মের মধ্যে কোনো ভিন্ন কিছু থেকেও থাকে, তবুও আমি একজন তুর্কিই।”

আলী রেজা আফেন্দির মৃত্যুর পর জুবাইদা, যার বয়স তখন ৩৫ বছর ছিল, রোডসের এক সচ্ছল ব্যক্তির সাথে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। মোস্তফা কামালের বয়স তখন আট বছর ছিল। তিনি মায়ের এই কাজে ক্ষুব্ধ হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যান এবং নিজের ফুফুর কাছে থাকতে শুরু করেন। তিনি সেলানিক এবং মোনাস্টির-এর সামরিক স্কুলগুলোতে শিক্ষা লাভ করেন। [২]

মোস্তফা কামাল সম্পর্কে আর্মস্ট্রং-এর বক্তব্য:

আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, তিনি মেসিডোনিয়ার কিছু খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের কাছে থাকতে শুরু করেছিলেন। তাদের কাছ থেকেই তিনি ফরাসি ভাষা শেখেন, যার পর তিনি ভলতেয়ার, রুশো, জঁ-জ্যাক এবং ভিক্টর হুগোর মতো ফরাসি চিন্তাবিদদের সেই বইগুলোর ভক্ত হয়ে যান যা উসমানীয় সাম্রাজ্যে নিষিদ্ধ ছিল। এরপর তিনি জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের সমর্থনে অগ্নিবরা কবিতা বলতে শুরু করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি সামরিক...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ৮/২২৮

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১২/৭১৬

কলেজের সহপাঠীদের সামনে সুলতান আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এরপর সে ইস্তাম্বুলে চলে যায় যেখানে সে মদ্যপান, জুয়া এবং প্রেম-ভালোবাসায় মগ্ন থাকে। এরই মধ্যে সে জমিয়াতুল ওয়াতান-এর সাথে যুক্ত হয়, যার সদস্য হওয়ার অপরাধে তাকে জেলেও যেতে হয়েছিল।

আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, জমিয়াত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-এর সাথে ফ্রিম্যাসন এবং দোনমে ইহুদিদের গভীর সম্পর্ক ছিল। বারবার এর সভাগুলো ইহুদিদের কুঠিতে অনুষ্ঠিত হতো। কামালের পুরনো বন্ধু ফাতহি মাকদুনি ফ্রিম্যাসনের সদস্য হয়ে গিয়েছিল। তারা জমিয়াত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কিকেও ফ্রিম্যাসনদের আদলে পরিচালনা করত। তারা বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা লাভ করত। তারা এমন লোকদের খুঁজত যাদের রাজনৈতিক অপরাধের কারণে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। [১]

শিক্ষা ও উন্নতি, কর্মদক্ষতা এবং খ্যাতি:

১৯০০ সালে কামাল ইস্তাম্বুলের ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হয় এবং চার বছরের প্রশিক্ষণ শেষে অফিসার হয়। তাকে ইয়াফা (সিরিয়া)-তে নিযুক্ত করা হয় যেখানে সে ফিফথ আর্মি কোরে ত্রিশজন অশ্বারোহীর একটি প্লাটুনের ক্যাপ্টেন হয়। কিন্তু সে ইয়াফা থেকে পালিয়ে মিশরে চলে যায় এবং সেখান থেকে তার পৈতৃক এলাকা সালোনিকায় ফিরে আসে। ১৯০৭ সালে সে উচ্চতর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে এবং তাকে সালোনিকায় থার্ড আর্মি কোরের অফিসার নিযুক্ত করা হয়। সে ক্রিট দ্বীপে গ্রিসের একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে অংশ নেয়।

নামিক কামালের সাময়িকী ‘আল-ওয়াতান’ তার আবেগকে প্রভাবিত করেছিল। নিজের চিন্তাধারা প্রচারের জন্য সে ‘হুররিয়াত’ নামে একটি ম্যাগাজিন চালু করে। এরপর জমিয়াত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-এর দেখাদেখি সে একটি দল ‘জমিয়াতুল ওয়াতান’ কায়েম করে। কিছুকাল পর সে তার দলকে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কির সাথে একীভূত করে উপরে আসার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয়নি। কারণ তার উগ্র মেজাজ ও একগুঁয়েমির কারণে নেতারা তাকে পছন্দ করতেন না। তার মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও বিলাসিতাও তার দুর্নামের কারণ ছিল। সে ক্ষমতা ও খ্যাতির লোভী ছিল এবং মাঝে মাঝে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রাজকীয় আদেশ জারি করত। একবার সে তার বন্ধু নুরিকে বলেছিল: “আমি তোমাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেব?”

নুরি হেসে বলল: “ভাই! আমাকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে তুমি নিজে কোন পদে থাকবে?”

[১] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারীয: ২৬৮ বা ২৭১

মুস্তফা কামালের বংশপরিচয় এবং ফ্রিম্যাসনের সাথে তার সম্পর্কের বিষয়ে এই তথ্যগুলো আমরা ডক্টর মুওয়াফফাক বানি আল-মারজাহ-এর গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘সাহওয়াতুর রাজুলিল মারীয, সুলতান আব্দুল হামিদ সানি’ থেকে উদ্ধৃত করেছি, যা একটি পিএইচডি থিসিস। উক্ত ডক্টর এই তথ্যগুলো ডক্টর রেজা নুর এবং প্রাচ্যবিদ আর্মস্ট্রং-এর বরাতে পেশ করেছেন। ডক্টর রেজা নুর (মৃত্যু ১৯৪২ খ্রি.) মুস্তফা কামালের আমলে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি কয়েক খণ্ডে তুরস্কের ইতিহাস ‘আত-তারিখুত তুর্কি আল-মুফাসসাল ওয়াল মুসাওয়ার’ পেশ করে বিদগ্ধ মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা সংকলন করে এই শর্তে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন যে, সেগুলো যেন ১৯৬০ সালের আগে প্রকাশিত না হয়। এই স্মৃতিকথাগুলো ১৯৬৮ সালে প্রথমবার তুরস্কে প্রকাশিত হয় যা সেখানে তোলপাড় সৃষ্টি করে এবং প্রথমবারের মতো মুস্তফা কামালের চেহারা থেকে মুখোশ উন্মোচিত হয়। প্রাচ্যবিদ ‘আর্মস্ট্রং’-ও মুস্তফা কামালের জীবনী লিখেছিলেন এবং ১৯৭৭ সালে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান ‘আর-রাজুলুস সানাম আতাতুর্ক’ নামে এর আরবি অনুবাদ করেন যা ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

কামাল বলেছিল: “এই পদে যে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে।”

সুলতান আব্দুল হামিদের শেষ যুগে নির্বাচনের মাধ্যমে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি-র সরকার গঠিত হলে আনোয়ার পাশা, যিনি কামালের অভ্যাসের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাকে ত্রিপোলিতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সে দুই মাস পর অনুমতি ছাড়াই নিজের পৈতৃক শহর সেলানিকে ফিরে আসে। যখন খলিফা আব্দুল হামিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলো এবং জেনারেল মাহমুদ শওকত সেলানিক থেকে সৈন্য নিয়ে বের হলেন, তখন কামাল সেই বাহিনীর একজন অফিসার ছিল।

খলিফা মুহাম্মদ রাশাদের যুগে ১৯১০ সালে সে আবারও সেলানিকে অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে সে ফ্রান্স সফর করে। ১৯১১ সালে লিবিয়ায় ইতালির আক্রমণের সময় সে ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিন্তু কিছুকাল পর সেখান থেকে পালিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসে। সে প্রথম বলকান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। তাকে বুলগেরিয়ায় এটাচি হিসেবে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সে অধিকাংশ সময় মদের দোকানে কাটাত।

কিছুকাল পর তাকে গ্যালিপলি দ্বীপের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে সে উচ্চতর কমান্ডের নির্দেশ পাওয়ার আগেই শত্রুর ওপর আক্রমণ করে বসে কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছু হটে। এরপর তাকে সোফিয়ায় একটি সাধারণ পদে নিযুক্ত করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সে আনোয়ার পাশার কাছে দাবি জানায় যেন তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে নিযুক্ত করা হয়। আনোয়ার পাশা তার ওপর আস্থা রাখতেন না, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে দার্দানেলিসের চানা দুর্গ, গ্যালিপলি, দিয়ার বকর, হিজাজ এবং সিরিয়ার রণাঙ্গনে কাজে লাগান। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তার সামনে গ্যালিপলি দ্বীপ থেকে পিছু হটলে সে পদোন্নতি পায় এবং তাকে ১৬তম আর্মি কোরের কমান্ডার বানিয়ে দেওয়া হয়, যা দিয়ার বকরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মোতায়েন ছিল। কিন্তু এই সময়ে সে আবারও আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

১৯১৬ সালে তাকে সেকেন্ড আর্মি কোরের ডেপুটি কমান্ডার বানিয়ে দেওয়া হয়। এই সময়েই সে “পাশা” উপাধি লাভ করে যা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দেওয়া হতো। দুই বছর পার হতে না হতেই তাকে পূর্বদিকের শহরগুলোর ডেপুটি সেনাপতি বানিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর তাকে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মদিনা মুনাওয়ারার প্রতিরক্ষার জন্য সেই বাহিনীর সাথে পাঠানো হয় যার সাধারণ অধিনায়ক ছিলেন ফুয়াদ পাশা। সেই সময় তুরস্কের পরাজয়ের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল এবং হাই কমান্ডের সামনে সমস্যা ছিল যে কোনোভাবে তুরস্ককে রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যে অবশিষ্ট সেনাবাহিনীগুলোকে পিছিয়ে নিয়ে তুরস্কের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মোতায়েন করা জরুরি ছিল। প্রশ্ন ছিল কোথা থেকে সৈন্য সরানো হবে এবং কোন রণকৌশলের মাধ্যমে যাতে ক্ষয়ক্ষতি সর্বনিম্ন হয়।

মক্কায় হোসেন পাশার বিদ্রোহের পর হিজাজ প্রতিরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক রূপ ধারণ করেছিল। খলিফা রাশাদ হিজাজ প্রতিরক্ষায় অবহেলাকে অসহনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং মন্ত্রীদের ওপর স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, যদি হিজাজ থেকে সৈন্য সরানো হয় তবে তিনি খেলাফতের মসনদ ছেড়ে দেবেন। বিষয়ের নাজুকতার কারণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আনোয়ার পাশা নিজেই দামেস্কে পৌঁছেছিলেন যাতে হিজাজ প্রতিরক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা নিজেই করতে পারেন। ফুয়াদ পাশাও হারামাইন শরিফাইনের নিরাপত্তাকে মৌলিক উদ্দেশ্য মনে করতেন কিন্তু মোস্তফা কামালের মত ছিল হিজাজ থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া, এই কারণে সে হিজাজ অভিযানে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এরপর তাকে সেভেস্ত আর্মি কোরের...

কমান্ডার নিযুক্ত করে সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। ততক্ষণে সিরিয়া থেকেও পিছু হটার কৌশলগত প্রশ্ন সামনে চলে এসেছিল। এ বিষয়ে মোস্তফা কামালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি সেই বাহিনীকে বাঁচিয়ে বের করে আনেন যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইসমত ইনোন্সু, ফুয়াদ পাশা এবং জার্মান কমান্ডার জেনারেল স্যাভার্স।

মোস্তফা কামাল সিরিয়ায় পৌঁছে সমস্ত বাহিনীর বিষয়াদি নিজের হাতে তুলে নেন এবং ব্রিটিশ জেনারেল লিমেনির সাথে গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে আঁতাত শুরু করেন। জার্মান কমান্ডার স্যাভার্স মোস্তফা কামালের বিশ্বাসঘাতকতা আঁচ করতে পেরে পালিয়ে জার্মানিতে চলে যান।

মোস্তফা কামাল এবং জেনারেল লিমেনির মধ্যে যোগাযোগের সময় পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা তাকে নিজেদের স্বার্থের জন্য উপযোগী মনে করেন এবং তাকে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। কামাল এতে সম্মতি দেন কিন্তু সেনাবাহিনীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমমনা অফিসার না পাওয়ায় তিনি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেননি।

যা-ই হোক, কামাল এবং জেনারেল লিমেনির গোপন চুক্তির ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, এক লক্ষ তুর্কি সৈন্য অস্ত্র সমর্পণ করে ব্রিটেনের বন্দি হয়, অন্যদিকে হাজার হাজার সৈন্যকে দ্রুজ মিলিশিয়া এবং আমেনীয় খ্রিস্টানরা বিভিন্ন স্থানে অতর্কিত হামলার মাধ্যমে হত্যা করে। এই পশ্চাদ্গতির ২০ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালে শুরু হয়েছিল। অবশিষ্ট সৈন্যরা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মোস্তফা কামালের সাথে তুরস্কে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

এই ছিল কামাল পাশার সেই কর্মকাণ্ড যা বিশ্ব গণমাধ্যম সোনালী রঙে এমনভাবে উপস্থাপন করেছিল যে সারা বিশ্বের মুসলিম কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং ওলামা ও খতিবগণ তার প্রশংসা করতে ক্লান্ত হতেন না।

ইতিমধ্যে খলিফা রশাদের ইন্তেকাল হয়েছিল এবং নতুন খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিন ‘জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি’র সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন। কামাল ওয়াহিদ উদ্দিনের সাথে পুরনো সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হওয়ার আশ্রয় চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। তিনি খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিনের মেয়ে সাবিহা খাতুনকে বিয়ে করে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। তিনি বিরোধী দল “জমিয়তুল হুররিয়া”কে সাথে নিয়েও নিজের রাজনৈতিক উচ্চতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন যা ব্যর্থ হয়।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাথে তার ক্রমাগত গোপন যোগাযোগ ছিল। সাধারণ জীবনে তিনি ছিলেন একজন ভোগবিলাসী, মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তি যার ইসলামী শিক্ষার প্রতি চরম বিদ্বেষ ছিল। এই কারণেই ব্রিটিশ সংস্থাগুলো বুঝতে পেরেছিল যে এই ব্যক্তিই তুরস্কের ইসলামী পরিচয় মুছে ফেলার কাজ করতে পারে। ফলে ব্রিটিশ ও ইহুদি সংস্থাগুলো তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে এবং গণমাধ্যমের সাহায্যে তার এমন প্রশংসা ও গুণগান করা হয় যে মুসলমানরা তাকেই তাদের সবচেয়ে সাহসী নেতা মনে করতে শুরু করে। [১]

মুদ্রোস চুক্তি এবং খলিফার কৌশল:

ইতিমধ্যে ৩০ অক্টোবর ১৯১৮ সালে “মুদ্রোস”-এ সাময়িক যুদ্ধবিরতি নির্ধারিত হয় এবং মিত্রবাহিনী দার্দানেলস প্রণালী ও ইস্তাম্বুল বন্দরে প্রবেশ করে। এমন পরিস্থিতিতে জেনারেল লিমেনি ইস্তাম্বুল পৌঁছান এবং তুর্কি সরকারের সাথে আলোচনার সময় মোস্তফা কামালের ওপর আস্থা প্রকাশ করে দাবি করেন যে, মোসলে—যাকে ব্রিটেন সংবেদনশীল এলাকা মনে করে—সেখানে ষষ্ঠ আর্মি কোরের কমান্ড...

(১) আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের, ৮/২২৭ থেকে ২৩০, ৬/২৩৫।

মোস্তফা কামালকে দেওয়া হোক।

খলিফার সামনে তখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা ছিল যেকোনোভাবে তুরস্ককে রক্ষা করা, যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় পয়েন্ট এবং খিলাফতের রাজধানীও মিত্রবাহিনীর দখলে ছিল। শুধুমাত্র পূর্ব ও মধ্য আনাতোলিয়া মুক্ত ছিল। খলিফা যখন দেখলেন যে মিত্রবাহিনীও মোস্তফা কামালের ওপর আস্থা রাখে, তখন এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য তিনি এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ভাবলেন যে, তিনি নিজে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর দাবি মেনে নিয়ে সময়ক্ষেপণ করবেন যাতে খিলাফতের পদ হাতছাড়া না হয়। অন্যদিকে মোস্তফা কামালের সাথে গোপনে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তুরস্কের মুক্ত অঞ্চলে গিয়ে বাবে আলীর বিরুদ্ধে একটি লোকদেখানো বিদ্রোহ করবেন। যেহেতু এভাবে গঠিত সরকার অবশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ থাকবে না, তাই তারা একটি স্বাধীন তুরস্কের জন্য সংগ্রাম করতে পারবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারবে না এবং তারা সন্ধির শর্ত শিথিল করতে বাধ্য হবে। এভাবে মিত্রবাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সুতরাং খলিফা মোস্তফা কামালের ওপর আস্থা রেখে তাকে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং তাকে আনাতোলিয়ায় পাঠিয়ে রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে মিলে একটি বিদ্রোহী আন্দোলন গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন, যারা পশ্চিমা শক্তিগুলোর সাথে সন্ধি প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ভূখণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাবে। বাহ্যিকভাবে সে এই সমস্ত বিষয় নিজের হাতে রাখবে কিন্তু গোপনে খিলাফতের অনুগত থাকবে। মোস্তফা কামাল অত্যন্ত আনন্দের সাথে এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি যে সাফল্যের স্বপ্ন দেখতেন, তার দরজার চাবি খলিফা নিজেই তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

যেহেতু খলিফা মোস্তফা কামালকে আনাতোলিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর কাছ থেকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, যাদের গোয়েন্দারা প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়িয়ে ছিল, তাই এটি প্রকাশ করা হয়েছিল যে তাকে নবম সেনাবাহিনীর কমান্ডার করে পূর্ব আনাতোলিয়ায় পাঠানো হচ্ছে। খলিফা মোস্তফা কামালকে বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা (লিরা) দিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের সরকারি দুরবস্থায় একটি বিশাল অংকের অর্থ ছিল।

পরিস্থিতির এই মোড় থেকে বোঝা যায় যে, খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিনের মোস্তফা কামালের ওপর অসাধারণ আস্থা ছিল, অথবা অন্তত সেই পরিস্থিতিতে তার চেয়ে ভালো কোনো ব্যক্তি তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আফসোস যে খলিফার দূরদর্শিতা মারাত্মক হোঁচট খেয়েছিল। একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক বিষয়ের জন্য যাতে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, তিনি এমন একজনকে নির্বাচন করেছিলেন যিনি মোটেও আস্থার যোগ্য ছিলেন না এবং যেকোনো উপায়ে ক্ষমতায় আসতে চেয়েছিলেন।

১৩ মে ১৯১৯ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং গ্রিস একটি প্রস্তাব পাস করে যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এশিয়ার মাইনর এলাকা “ইজমির” এর ওপর গ্রিসের অধিকার রয়েছে। এই কনফারেন্স বাবে আলীকে সতর্ক করে দেয় যে গ্রিসের সেনাবাহিনী ইজমিরে প্রবেশ করবে যাদের কোনো বাধা দেওয়া যাবে না। যদি বাবে আলী ইজমিরের ওপর গ্রিসের অধিকার স্বীকার না করে, তবে তার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করা হবে। এই ঘোষণার পরদিন গ্রিক বাহিনী ইজমিরে প্রবেশ করে। এভাবে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

খলিফার দৃষ্টিতে এখন মোস্তফা কামালের অভিযানের গুরুত্ব আরও বেড়ে গিয়েছিল যাতে এর মাধ্যমে গ্রিকদেরও থামানো যায়।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

পারত। ফলে ইজমিরের ওপর গ্রিকদের দখলের মাত্র দুই দিন পর ১৬ মে মোস্তফা কামাল ইস্তাম্বুল থেকে রওনা হয়ে গেলেন।

তিনি খলিফার গোপন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আনাতোলিয়ায় পৌঁছালেন। বাহ্যত তিনি এরজুরুম সেনানিবাসের পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাঁর কাজ ছিল সামরিক প্রশাসনে সংস্কার সাধন করা। আনাতোলিয়ায় সামরিক ইউনিটগুলোতে আদেশ পাঠানোর পাশাপাশি বেসামরিক প্রশাসনকেও আদেশ জারি করার ক্ষমতা তাঁরই হাতে ছিল। এভাবে মোস্তফা কামাল তুরস্কের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি দেশের অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নতির নামে তুর্কি যুবকদের একত্রিত করে নিম্নোক্ত প্রস্তাব পাস করেন:

- তুর্কি জনগণ বিদেশি আধিপত্য সহ্য করবে না।
- ইজমির তুরস্কের অংশ। আমরা এর ওপর গ্রিকদের দখল মেনে নেব না।
- জাতি তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সংকল্প করছে। [১]

খলিফার চাল উল্টে গেল:

পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে এই সত্য গোপন থাকেনি যে খলিফা কোন উদ্দেশ্যে তাঁকে আনাতোলিয়ায় পাঠিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা এমন এক অদ্ভুত খেলা খেললেন যে খলিফার চাল উল্টে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসের সাথে পরিচিত ব্যক্তির ভালো করেই জানেন যে ইংরেজদের রাজনীতি হলো “তারা এক রকম, কিন্তু দেখায় অন্য রকম”-এর মতো। খলিফার চালকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত চতুরতার সাথে তাঁরই বিরুদ্ধে উল্টে দিল। এ ব্যাপারে ব্রিটেনের কৌশল দুটি পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে ছিল:

- মোস্তফা কামালকে কেবল লোকদেখানো নয়, বরং বাস্তবে বিদ্রোহী বানিয়ে দেওয়া হোক এবং এই বিদ্রোহকে সফল করা হোক।
- এমন সব পদক্ষেপ নেওয়া হোক যাতে খলিফার মিত্রদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের সামনে তাঁর বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পক্ষ থেকে মোস্তফা কামালের বিরোধিতা এবং এর জবাবে কামালের “সাহস ও বীরত্বের” ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে ইউরোপীয় জোট আনাতোলিয়ায় মোস্তফা কামালের নিয়োগের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করল এবং ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভার প্রধান ফরিদ পাশার ওপর চাপ সৃষ্টি করল যাতে তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁকে ইস্তাম্বুলে ফিরিয়ে আনা হয়।

এদিকে মোস্তফা কামাল প্রকৃতপক্ষে এই সক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যে তিনি সত্যিই খলিফার তখত উল্টে দিতে পারেন। যদিও খলিফার দেওয়া পরিকল্পনায় এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু একজন ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়ার পর তিনি খলিফার ইচ্ছাকে নিজের কৌশল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। খলিফা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাঁকে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন। এটি দেখে মন্ত্রিসভা মোস্তফা কামালকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নিল কিন্তু সুলতান ওয়াহিদউদ্দিনের তখনও মোস্তফা কামালের ওপর কিছুটা আস্থা ছিল। তাই তিনি শুরুতে বরখাস্তের আদেশে স্বাক্ষর করেননি।

কিন্তু কয়েক দিন পর যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে মোস্তফা...

[১] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: পৃ. ৭৭ থেকে ৮০; আত-তারিখুল ইসলামি লিদ-ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৯/১৭/২২৫; উসমানি তুর্ক আজ ডক্টর এস এন আলী: ১২৩ থেকে ১২৪।

কামাল প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিলেন, তাই ৮ জুলাই ১৯১৯ সালে তিনি (খলিফা) অনিচ্ছাসত্ত্বেও কামালের বরখাস্তের আদেশে সিলমোহর লাগিয়ে দেন। [১]

মোস্তফা কামাল জাতীয় নেতার রূপে:

কিন্তু মোস্তফা কামাল বরখাস্তের আদেশের কোনো পরোয়া করেননি। তিনি আনাতোলিয়া ছাড়াও ইস্তাম্বুলের সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী তুরস্কের স্বপ্ন দেখিয়ে নিজের সমর্থক বানিয়ে নেন। তিনি জাতিকে এই বার্তা দেন: “জনগণ ও সেনাবাহিনীর ওপর এটি কর্তব্য যে, তারা উসমানীয় সাম্রাজ্য, উসমানীয় সুলতান এবং খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে।”

কিন্তু একই সাথে তিনি খেলাফত পদের প্রতি সম্মান বজায় রেখে এটি প্রকাশ করতে থাকেন যে, তার লড়াই বর্তমান খলিফার বিরুদ্ধে। তিনি তার এক বক্তৃতায় বলেন: “জনগণ ও সেনাবাহিনী খেলাফতে আলিয়ার মর্যাদা বজায় রাখাকে নিজেদের অস্তিত্বের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে চিন্তা করবে, তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য। এমন ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, কাফির এবং মুরতাদ।” [২]

এই সময়ে মোস্তফা কামাল ব্রিটিশ প্রতিনিধি ‘রলিনসন’-এর সাথে গোপন বৈঠক করেন, যিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জনের ভাতিজা ছিলেন। এরপর তিনি তার সমমনা দুই নেতা: আলী ফুয়াদ পাশা এবং রউফ বেগের সাথে মিলে সিদ্ধান্ত নেন যে, জনগণের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন ডেকে দেশের প্রতিরক্ষা ও স্থিতিশীলতা এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে।

ফলে ২৩ জুলাই ১৯১৯ সালে এরজুরুমে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৫৪ জন সদস্য নির্বাচিত করে একটি কংগ্রেস গঠন করা হয় যার সভাপতি ছিলেন মোস্তফা কামাল। খলিফা কামালের গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করেন, কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করা এখন অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে সিভাসে সাত দিনব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাকে ‘সিভাস কনফারেন্স’ নাম দেওয়া হয়।

এতে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা গৃহীত হয়:

- যেসব এলাকায় তুর্কিরা বসবাস করে, তার কোনো অংশই বিদেশি দখলে থাকতে দেওয়া হবে না।
- দেশ রক্ষায় খেলাফতের ব্যর্থতা বা অবহেলার ক্ষেত্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হবে যা জাতীয় পরিষদ নির্বাচন করবে।
- উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে জাতি যেকোনো উপায়ে নিজের প্রতিরক্ষা নিজেই করবে।
- একটি জাতীয় পরিষদ গঠন করে জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন করা হবে।
- বিদেশি পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করা হবে না।

এই সম্মেলনে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধি কাউন্সিলও গঠন করা হয় এবং মোস্তফা কামালকে এর সভাপতি হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। মোস্তফা কামালকে চিফ অফ আর্মি স্টাফ নিযুক্ত করে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। সিভাস কনফারেন্সের এই সিদ্ধান্তগুলো প্রকাশ করা হয় যাকে ‘মিসাকে মিল্লি’ (জাতীয় চুক্তি) নাম দেওয়া হয়। এতে খলিফার মর্যাদা বজায় রাখার অঙ্গীকারও করা হয়েছিল।

[১] কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ: পৃষ্ঠা ৭৯ থেকে ৮১; আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির: ৭/২৩ থেকে ২৪।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ড. মাহমুদ শাকির: ১৭/২২।

৩২৬ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা | খিলাফত

সৈন্যবাহিনীর সকল ইউনিট মুস্তাফা কামালকে এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিল যে, ইস্তাম্বুলের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং তারা ‘সিড্রেস’ চুক্তির বিরোধী। এভাবে মুস্তাফা কামালের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। [১]

নির্বাচনে কামালের বিজয়: খলিফার সাথে দ্বন্দ্ব:

কনফারেন্স খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিনের কাছে এই দাবিও করেছিল যে, তিনি যেন ফরিদ পাশার মন্ত্রিসভা ভেঙে না দেন, কিন্তু খলিফা মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন এবং নতুন করে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯১৯ সালের নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যাতে জাতীয়তাবাদীরা বিজয়ী হয়। মুস্তাফা কামাল এরজুরুম এবং আঙ্কারা উভয় নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। এরপর ইস্তাম্বুলে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। রউফ বেগ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং আলী রেজা পাশা মন্ত্রণালয়গুলো গঠন করেন। মুস্তাফা কামাল অধিবেশনে যোগ দেননি; তিনি আঙ্কারায় অবস্থান করে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন, কিন্তু পার্লামেন্ট সদস্যরা তাকে সমর্থন করেননি এবং প্রধানমন্ত্রীর ওপর আস্থা প্রকাশ করেন।

ইস্তাম্বুলে সুলতান ওয়াহিদ উদ্দিন খানের সমর্থক এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিল, তাই জাতীয়তাবাদীদের প্রতিনিধি পরিষদ পার্লামেন্টের অধিবেশন আঙ্কারায় ডেকে পাঠায়। যারা অংশগ্রহণ করেননি, তাদের স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত করা হয়। নতুন অ্যাসেম্বলি গঠনের পাশাপাশি নতুন সংবিধানও প্রণয়ন করা হয়। এরপর আঙ্কারাতেই নতুন জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে উসমানীয় সালতানাতের নাম পরিবর্তন করে ‘তুরস্ক’ রাখা হয়। ১৯২০ সালের এপ্রিলে জাতীয় পরিষদ একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনিক কমিটি গঠন করে মুস্তাফা কামালকে এর সভাপতি নির্বাচিত করে। এভাবে মুস্তাফা কামাল তুরস্কের সরকার প্রধান হয়ে ওঠেন।

এভাবে একই সময়ে এক রাষ্ট্রে দুটি সরকার অস্তিত্ব লাভ করে। একদিকে ইস্তাম্বুলে খলিফার শাসন ছিল এবং অন্যদিকে আঙ্কারায় মুস্তাফা কামালের গণতান্ত্রিক সরকার। [২]

খলিফা, সদরে আজম ফরিদ পাশা এবং শায়খুল ইসলাম মুস্তাফা কামালের সরকারকে প্রত্যাখ্যান করেন। সদরে আজম নির্বাচনের ফলাফল বাতিল ঘোষণা করেন, অন্যদিকে শায়খুল ইসলাম মজলিসে ওয়াতানি (পার্লামেন্ট)-এর সদস্য এবং তাদের সমর্থক সামরিক কর্মকর্তাদের বিদ্রোহী ও মুনাফিক হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের হত্যার বৈধতার ফতোয়া জারি করেন।

মুস্তাফা কামাল ৩ মে ১৯২০ সালে দেশের নতুন মন্ত্রণালয়গুলো গঠন করেন এবং একজন নতুন মুফতিও নিয়োগ করেন। মজলিসে ওয়াতানি খলিফা, সদরে আজম এবং শায়খুল ইসলামকে দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত করে। এই অভিযোগ এতটাই কঠোর ছিল যে জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়, কিন্তু কিছুদিন পর যখন ‘সিড্রেস চুক্তির’ প্রতিধ্বনি শোনা গেল, তখন জনসমর্থন আবারও মুস্তাফা কামালের পক্ষে চলে আসে। [৩]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ২৫/৩৩; উসমানি তুর্ক, ড. এস. এন. আলী: ১/২৫, ১১৩; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭।

[২] উসমানি তুর্ক, ড. এস. এন. আলী: ১/১২৬; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ড. ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২২৮।

[৩] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস: পৃষ্ঠা ২২৮, ২২৯।

মোস্তফা কামাল সম্পর্কে সারসংক্ষেপ:

আমাদের মোস্তফা কামাল সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে কিছু সত্য মেনে নিতে হয়:

- তিনি নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন।
 - একটি স্বাধীন মাতৃভূমি অর্জনের জন্য তাঁর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা ছিল।
 - ইসলাম ও ধর্মের জন্য তাঁর হৃদয়ে কোনো স্থান ছিল না।
 - বাকি মুসলিম বিশ্বের স্বার্থের সাথেও তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না।
 - ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য ছিল যে, তারা তুর্কিদের যেভাবেই হোক স্বাধীন করে দিক, চাই তাতে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাক।
- সেই দিনগুলোতে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল যা ইউরোপে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে রাশিয়ার যে জোট ছিল তা ভেঙে গিয়েছিল এবং এখন ইউরোপীয় শক্তিগুলো রাশিয়ার পক্ষ থেকে বিপদ অনুভব করছিল। তুরস্কের সাথে রাশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর পরিস্থিতি এমন ছিল যে, ককেশাস অঞ্চলের মুসলমানরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে প্রত্যাখ্যান করে এর বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেছিল এবং সোভিয়েত বাহিনী সেখানে দখলদারিত্ব কায়েম করতে তখন পর্যন্ত ব্যর্থ ছিল। মোস্তফা কামাল এমতাবস্থায় অনুভব করলেন যে, যদি রাশিয়াকে ককেশাস অঞ্চলে পা রাখার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে ইউরোপীয় শক্তিগুলো আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। যেহেতু তারা কোনোভাবেই চায় না যে রাশিয়া বসফরাস প্রণালী ও উষ্ণ সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে পারুক, তাই তারা তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ড করার পরিবর্তে রাশিয়ার পথে একটি শক্তিশালী তুরস্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করবে। ফলে মোস্তফা কামাল ককেশাস অঞ্চলের জিহাদ আন্দোলনকে দুর্বল করে দিয়ে রাশিয়াকে অগ্রসর হওয়ার এবং ককেশাস দখল করার সুযোগ করে দিলেন।

মুসলিম উন্মাহর দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি ছিল একটি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, কিন্তু মোস্তফা কামাল এতে গর্বিত ছিলেন যে তিনি ইউরোপকে একটি শক্তিশালী তুরস্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করাতে পেরেছেন। [১]

ইস্তান্বুলে ব্রিটিশ বাহিনী:

১৬ মার্চ ১৯২০ সালে ব্রিটিশ বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তান্বুলে প্রবেশ করে। তাদের চাপে সালেহ পাশার নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার গঠন করা হয়, যা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে এবং কারাগারগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে মোস্তফা কামাল পাশার সমর্থকদের গ্রেপ্তার করে। খলিফা আধুনিকতাবাদীদের নির্মূল করতে এবং উসমানীয়দের প্রাচীন রাজনৈতিক ধারা অনুসরণের শেষ চেষ্টা করেন। জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র বেশ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে মাল্টায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। ডাক, তার এবং টেলিফোনের ওপর নজরদারি শুরু হয়। জাতীয়তাবাদী দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সালতানাতে উলামাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটেন এই নতুন সরকারের ওপর নিজেদের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে ঘোষণা দেয় যে, জনগণ যেন খলিফার আনুগত্য করে। কিন্তু এসব প্রচেষ্টার ফলে এই ছাড়া আর কোনো ফল আসেনি যে, মানুষ খলিফাকে ব্রিটেনের হাতের পুতুল মনে করতে শুরু করে। তাদের মধ্যে তুর্কি জাতীয়তাবাদের চেতনা আরও বৃদ্ধি পায়।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ২৬/১৭।

আবেগ আরও দৃঢ় হতে লাগল। ১৫ এপ্রিল ব্রিটেনের চাপে এই সরকার বিলুপ্ত করে ফরিদ পাশার নেতৃত্বে পুনরায় নতুন সরকার গঠন করা হয়। এভাবে এই ধারণা সাধারণ হয়ে গেল যে, খলিফা সাম্রাজ্যবাদের একজন এজেন্ট, যার হাতে কিছুই নেই; পক্ষান্তরে মোস্তফা কামাল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক উন্মুক্ত তলোয়ার। দেশের প্রতিরক্ষার জন্য মানুষ মোস্তফা কামালের চারপাশে সমবেত হতে লাগল। ইস্তাম্বুল ও এর আশপাশের এলাকায় তরুণ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ শুরু হলো যাতে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে আরও একটি যুদ্ধ করা যায়। এভাবে কামাল মুহূর্তের মধ্যে একজন জাতীয় নেতার রূপ ধারণ করলেন। [১]

নির্বাচনে মোস্তফা কামালের জয়:

পরিস্থিতি মোস্তফা কামালকে আরও জনপ্রিয়তা দিচ্ছিল। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তিনি আবারও জয়লাভ করেন। কিন্তু তিনি ইস্তাম্বুলে গিয়ে অ্যাসেম্বলির অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে আনাতোলিয়ার সফল সদস্যদের একত্রিত করে আঙ্কারায় একটি পৃথক “মজলিসে তানফিজিয়া” কায়েম করেন, যা ৩ মে ১৯২০ সালে আনাতোলিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। এতে মোস্তফা কামাল প্রধান, সামি বকর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জামি বিকুত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আরিফ জালালুদ্দিন আইনমন্ত্রী ছিলেন। এভাবে একই দেশে দুটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো: একটি আঙ্কারার প্রজাতন্ত্রী সরকার, অন্যটি ইস্তাম্বুলের উসমানীয় সালতানাত।

কামাল এই সুযোগে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হওয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। মজলিসে তানফিজিয়ার প্রথম অধিবেশন জুমার নামাজের পর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কুরআন মাজিদ খতম এবং বুখারি শরিফ পাঠ করা হয়। কামাল তার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, তিনি সরকার ও খেলাফতের বিচ্ছেদে বিশ্বাসী নন। এই পর্যায়ে তিনি জনসমর্থন আদায়ের জন্য নিজের ও খলিফার মধ্যকার গোপন চুক্তির কথা ফাঁস করে দেন এবং বলেন যে, তিনি খলিফার অনুমতি নিয়েই আনাতোলিয়ায় এসেছেন এবং তার উদ্দেশ্য খলিফার আদেশ পালন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। [২]

ইউরোপীয় জোট একই দেশে প্রতিষ্ঠিত এই দুই সরকারের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল যে, তাদের মধ্যে কার আধিপত্য তাদের উদ্দেশ্যের জন্য বেশি সহায়ক হতে পারে। তারা খলিফাকে কিছু ক্ষমতা প্রদান করে, যার সুযোগ নিয়ে খলিফা সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কুর্দিস্তানের পুরো এলাকা ইস্তাম্বুলের সাথে সংযুক্ত করে নেন। খলিফাকে শক্তিশালী হতে দেখে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের কর্মকর্তারাও একে একে বাবে আলীর প্রতি আনুগত্য নবায়ন করতে শুরু করেন এবং মোস্তফা কামালের কাছে কেবল আঙ্কারা অবশিষ্ট থাকে।

এরপর খলিফার বাহিনী আঙ্কারার দিকে রওনা হয় যাতে মোস্তফা কামালের বিদ্রোহ দমন করা যায়। যদি লড়াই হতো, তবে খলিফার জয় এবং কামালের পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল প্রবল, কারণ সামরিক কমান্ডারদের ঝাঁক খলিফার দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কামালের সমর্থকরা খলিফা ও ইউরোপীয় জোটের মধ্যে সম্পাদিত সেন্দ্রে চুক্তির বিস্তারিত জানতে পারে এবং...

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃ. ৪২; আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৭/২৭৯, ২৭

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ৭/২৮০, ২৮

তারা অবিলম্বে এগুলো প্রচার করে এই ঢোল পিটিয়ে দিল যে, খলিফা তুর্কিদের স্বাধীনতার সওদা করে ফেলেছেন। এতে পাশা একদম উল্টে গেল। জনগণ ও সেনাবাহিনীর সমর্থন পুনরায় কামালের সাথে হয়ে গেল।

সেভ্রে চুক্তি কী ছিল?

এখানে এটা জেনে নেওয়া জরুরি যে, আসলে সেভ্রে চুক্তি কী ছিল? এর প্রচার হতেই খলিফাকে কেন গাদ্দার হিসেবে গণ্য করা হলো? মিত্রশক্তি খলিফার ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যেন তিনি তাদের পছন্দসই শর্তে সন্ধি করে নেন, অন্যথায় মিত্রবাহিনী খেলাফত খতম করে দেবে। খলিফার ওপর আরও চাপ সৃষ্টির জন্য মিত্রশক্তির উস্কানিতে ১৯২০ সালের মে মাসে গ্রিস প্রথমে ইজমির এবং পরে স্মার্নাও দখল করে নেয়, যার ফলে বাধ্য হয়ে খলিফা তার প্রতিনিধিদের আলোচনার জন্য পাঠান যারা মিত্রশক্তির শর্তাবলি মেনে নেয়।

এভাবে ১০ আগস্ট ১৯২০ সালে সেভ্রে চুক্তি লিখিত হয়, যার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ:

- ইস্তাম্বুল ও মারমারা সাগর ব্যতীত তুরস্কের বাকি সমস্ত এলাকা মিত্রশক্তির দখলে দিয়ে দেওয়া হবে।
- পশ্চিম আনাতোলিয়ার ইজমির ও এর আশপাশের পাঁচটি জেলা পাঁচ বছর পর্যন্ত গ্রিসের দখলে থাকবে। এরপর সেখানকার নাগরিকদের রায় হলে গ্রিসের স্থায়ী সরকার গঠনের অধিকার থাকবে।
- এজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জ গ্রিসের, আর রোডস ও এর আশপাশের দ্বীপপুঞ্জ ইতালির দখলে যাবে।
- তুরস্ক আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল থেকে হাত ধুয়ে ফেলার ঘোষণা দেবে যা বিশ্বযুদ্ধে তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কুর্দিস্তান, আর্মেনিয়া ও হেজাজকে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হবে। তুরস্ক আফ্রিকা ও এজিয়ান সাগরের সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল থেকে সরে আসবে। সাইপ্রাস ও মিশরের ওপর ব্রিটেনের এবং বাকি দ্বীপপুঞ্জ ইতালির নামে করে দেবে।
- তুরস্কের সেনাবাহিনী হবে মাত্র পঞ্চাশ হাজার যার অফিসাররা হবে বিদেশি।

মজলিসে ওয়াতানি এবং মোস্তফা কামাল এটি মানতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে খলিফার প্রতিনিধিরা এটি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু খলিফার অনুমোদন ছাড়া চুক্তির কোনো আইনি মর্যাদা থাকতে পারত না। খলিফা চিন্তা-ভাবনার অজুহাতে এতে স্বাক্ষর করা স্থগিত রাখতে থাকেন, এভাবে তিনি শেষ পর্যন্ত এই চুক্তির অনুমোদনের সুযোগ আসতে দেননি এবং এর মর্যাদা কেবল একটি লিখিত কাগজের মতোই রয়ে গেল যার ওপর কখনোই আমল হয়নি। [১]

কিন্তু যেহেতু সেভ্রে চুক্তি ইউরোপীয় জোট এবং ইস্তাম্বুলের উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে আবর্তিত ছিল, তাই এর বিষয়বস্তু প্রকাশ করে মোস্তফা কামাল পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেন। এটা অসম্ভব নয় যে চুক্তির অনুলিপি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থাই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। দেশের পরিবেশ যা খলিফার পক্ষে হয়ে গিয়েছিল, এখন তা হঠাৎ খলিফার বিপক্ষে এবং আঙ্কারা সরকারের সমর্থনে চলে গেল। [২]

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৭/২৮

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২২৬

যার ফলে আক্ষারার ওপর খলিফার অনুগত বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যায়। সেনাবাহিনী এবং জনগণ পুনরায় মোস্তফা কামালের সাথে একাত্ম হয়ে যায়, যাদের সাহায্যে কামাল ইস্তাম্বুলের ওপর আক্রমণ করার যোগ্য হয়ে ওঠেন। [১]

এখানে আমাদের অবশ্যই এটি চিন্তা করা উচিত যে, যদি সত্যিই খলিফা ইংরেজদের সাথে মিলে থাকতেন এবং মোস্তফা কামালই সাম্রাজ্যবাদের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী হতেন, তবে ব্রিটিশ বাহিনী আক্ষারার পরিবর্তে ইস্তাম্বুল দখল করা কেন জরুরি মনে করল? মোস্তফা কামালকে তারা কেন স্বাধীনভাবে ছেড়ে রাখল? মোস্তফা কামাল যদি ব্রিটেনের দাবার ঘুঁটি না হতেন, তবে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ কেন নিলেন না?

আক্ষারার বাহিনী ফরাসি, ইতালীয় এবং গ্রীকদের মোকাবিলায় অবশ্যই দাঁড়িয়েছিল, যার ফলে মোস্তফা কামালের দেশপ্রেম এবং সাহস ও বীরত্বের চর্চা হয়েছিল এবং তিনি জনগণের আস্থা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রিটেনের সাথে লড়াই করার কোনো চেষ্টা করেননি, অথচ তুর্কিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ইস্তাম্বুলে কেবল ব্রিটিশ বাহিনীই আক্রমণকারী ছিল। কামাল সেখানে আক্রমণ করে ইংরেজদের বিতাড়িত কেন করলেন না? তিনি যদি উসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি একনিষ্ঠ হতেন, তবে খলিফাকে ব্রিটেনের দখল থেকে মুক্ত করাও তারই দায়িত্ব ছিল, কারণ জাতি এবং সেনাবাহিনী তার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি এমন কিছুই করেননি। শেষ পর্যন্ত কেন?

এই প্রশ্নটিও সামনে আসে যে, যদি মিত্রশক্তিগুলো চাইত তবে কামালের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তাদের জন্য কোনো কঠিন কাজ ছিল না। তারা শুরুতেই তাকে দমন করার জন্য কেন সক্রিয় হলো না?

এই পরিস্থিতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিশ্বশক্তিগুলো মোস্তফা কামালের হাতে খেলাফত খতম করানোর জন্য তাকে একজন শক্তিশালী নেতার মর্যাদা পাইয়ে দিতে আগ্রহী ছিল। মিত্রশক্তি, বিশেষ করে ব্রিটেন পরিস্থিতিকে নিজেদের অনুকূলে নিয়ে যেতে সফল হয়েছিল। কামালের জনপ্রিয়তা এবং উত্থান থেকে তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, বরং তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথ সহজ হয়ে গিয়েছিল।

এক দেশ, দুই সরকার:

তুরস্কের পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। একদিকে ইস্তাম্বুলে সুলতান ওয়াহিদ উদ্দিন ছিলেন, যিনি আইনত ও শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমানদের খলিফা ছিলেন। অন্যদিকে আক্ষারায় মোস্তফা কামাল ছিলেন, যার হাতে দেশের কাঁচা-পাকা সমস্ত ক্ষমতা ছিল।

এই পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ১৯২১ সালে আক্ষারা সরকার একটি নতুন সংবিধান ও আইন প্রণয়ন করে, যা ইস্তাম্বুলে প্রণীত সমস্ত সংবিধান ও চুক্তি বাতিল করে দেয়। এই সংবিধানে এটিও স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, সরকারের দুটি ধরন রয়েছে:

- ১. আইন প্রণয়নকারী (تشريعی)
- ২. নির্বাহী (تنفيذی)

নির্বাহী সরকার ইস্তাম্বুলের খলিফার, আর আইন প্রণয়নকারী সরকার জাতীয় পরিষদের (মজলিসে ওয়াতানি)।

এদিকে ব্রিটেন ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেভ্রে চুক্তি (Treaty of Sèvres) পর্যালোচনার জন্য লন্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান করে এবং ইস্তাম্বুল ও আক্ষারা উভয় সরকারের প্রতিনিধিদের সেখানে তলব করে। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল যে, ব্রিটেন নিজেই আক্ষারাকে ইস্তাম্বুলের সমান মর্যাদা দিতে চায়। যদিও সারা বিশ্ব জানত যে মহাযুদ্ধের পক্ষ ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্য এবং মিত্রশক্তির সাথে সন্ধির...

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৭/৩০, ৩১।

বিষয়গুলো মীমাংসা করাও ছিল তার অধিকার। আক্ষারাকে সমান মর্যাদা দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বশক্তিগুলো উসমানীয় সালতানাতের মর্যাদা আরও কমিয়ে দিয়েছিল। এই সম্মেলনে খলিফার প্রতিনিধি দল আরও ত্যাগের প্রমাণ দিয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করার পরিবর্তে আক্ষারার প্রতিনিধি দলকেই আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছিল, যাতে বিশ্বের সামনে তুরস্ক থেকে একটিই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। সম্মেলনে ইজমিরের ওপর গ্রিসের দখলের বিষয়টি আলোচনায় এলে আক্ষারার প্রতিনিধি দল সেখানে একজন খ্রিস্টান শাসক নিয়োগে সম্মতি প্রকাশ করেছিল, কিন্তু মিত্রশক্তি সেখানে গ্রিসের দখলকে আইনগতভাবে মেনে নিতে চেয়েছিল, যার ওপর ঐক্যমত হতে পারেনি। তবে মোস্তফা কামাল ফ্রান্সের অনুকূলে উত্তর সিরিয়া ছেড়ে দিতে সম্মত হন, যার বিনিময়ে ফ্রান্স আনাতোলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল কিলিকিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং আক্ষারা সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। একইভাবে ইতালির সাথেও সমঝোতা করে তাকে আন্তাকিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি করানো হয়। ৩ মার্চ কামাল “বাতুম”-এর সীমান্ত এলাকায় রাশিয়ার অধিকার মেনে নেন। জবাবে রাশিয়াও আধুনিক তুর্কি সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এভাবে কামাল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন বৈধ শাসকের মর্যাদা লাভ করেন, অন্যদিকে ইস্তাম্বুলের ভাবমূর্তি আরও ক্ষুণ্ণ হয়। [১]

তুরস্ক-গ্রিস যুদ্ধ এবং গোপন সত্যসমূহ:

বিশ্বশক্তিগুলোর সাথে বিষয়গুলো মীমাংসা করার পর কেবল গ্রিসের সাথে ইজমির ইস্যু নিয়ে বিরোধ বাকি ছিল। এটিই ছিল একমাত্র ইউরোপীয় দেশ যার সাথে মোস্তফা কামাল আলোচনার পরিবর্তে শক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত নেন। দেখা গেলে এটি খুব একটা কঠিনও ছিল না, কারণ গ্রিস ছিল একটি ছোট শক্তি যারা বিশ্বযুদ্ধেও মিত্রশক্তির সাহায্যেই কিছু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছিল। আক্ষারা ও গ্রিসের যুদ্ধে যদি এই শক্তিগুলো নিরপেক্ষ থাকত, তবে গ্রিসের জয়লাভ করা কঠিন ছিল। ইউরোপীয় জোট গ্রিস ও আক্ষারার বিবাদে নিরপেক্ষ থাকার কৌশল অবলম্বন করে। অন্যদিকে রাশিয়া আক্ষারাকে সেই পথগুলো দিয়ে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে যা ইংরেজদের দখলে ছিল। ব্রিটেন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিল। এখন আমরা গ্রিসের সাথে মোস্তফা কামালের সেই যুদ্ধের বিবরণ পেশ করছি, যার ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহর এই গাদ্দারকে একজন মহান সামরিক জেনারেল, একজন বিজয়ী এবং জাতীয় ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এবং ইহুদি গণমাধ্যমগুলো এই লোকদেখানো যুদ্ধের সময় মোস্তফা কামাল পাশার বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা এমনভাবে প্রচার করেছিল যে, সারা বিশ্বের পরাধীন মুসলমানরা এই নতুন মুখটিকে তাদের ত্রাণকর্তা মনে করতে শুরু করে। লন্ডন ও আমেরিকার সংবাদপত্র থেকে শুরু করে উপমহাদেশের মুসলিম সংবাদপত্র ও সাময়িকী পর্যন্ত সব জায়গায় “গাজী মোস্তফা”-র জয়জয়কার শুরু হয়। আরব কবি আহমদ শওকি তার বিশ্ববিখ্যাত কাসিদায় মোস্তফা কামালকে খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমকক্ষ বলে অভিহিত করেন। সারা বিশ্বের মুসলমানরা দেড়-দুই শতাব্দী ধরে পরাজয় ও ধ্বংসের দৃশ্য দেখছিল এবং সেই সময় আফগানিস্তান ও তুরস্ক ছাড়া বিশ্বে কোনো স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্র অবশিষ্ট ছিল না। দাসত্বের অপমানে নিমজ্জিত এই...

(১) আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকির: ১৭ / ৩৩-৩৪।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মুসলমানরা মোস্তফা কামাল পাশাকে এমন একজন সাহসী নেতা হিসেবে দেখেছিল যে খেলাফতের শান-শওকত পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, পক্ষান্তরে খলিফা ওয়াহিদ উদ্দিনকে তারা একজন কাপুরুষ ও অযোগ্য ব্যক্তি মনে করতে শুরু করেছিল। [১]

আমরা এমনই সরল ছিলাম, এভাবেই বরণ করে নিয়েছি

যতবারই শরৎ এসেছে, ভেবেছি বসন্ত এসেছে

দৃষ্টির বিভ্রমে আমরা বাগান সাজিয়েছি

যা কিছু চোখে পড়েছে, ফুল হিসেবেই চোখে পড়েছে [২]

পাঠকরা মোস্তফা কামালের জীবনবৃত্তান্ত এবং তার সামরিক কর্মজীবনে এটি লক্ষ্য করেছেন যে, নিজেকে ‘আতাতুর্ক’ নামে অভিহিত করা এই ‘স্বাধীনতার বীর’-এর আমলনামায় এমন একটিও কৃতিত্ব নেই যার জন্য ইসলামী ইতিহাস গর্ব করতে পারে। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়েছে, সেখানেই সে কোনো না কোনো অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে ফিরেছে। এটি ভিন্ন কথা যে, জায়েনবাদী লবি এই সত্যগুলোকে গোপন করেছে এবং কামালের পিছু হটা ও পলায়নপরতার ওপর ‘অতুলনীয় নেতৃত্ব’ এবং ‘সাহস ও বীরত্ব’-এর উজ্জ্বল তকমা লাগিয়ে দিয়েছে। যারা মোস্তফা কামালের অন্য কোনো গুণের প্রবক্তা নন, তারাও মনে করেন যে অন্তত গ্রিসের মোকাবিলায় সে অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়েছে এবং তুরস্ককে তাদের হাতে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে। এর কারণ হলো গ্রিসের সাথে যুদ্ধের ঘটনাবলী অধিকাংশ ইতিহাসে অত্যন্ত সংক্ষেপে পাওয়া যায়। শুরুতে এগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে সত্য গোপন থাকে। শুধু এতটুকু প্রকাশ করা হয় যে যুদ্ধ হয়েছে এবং গ্রিস পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে যার কৃতিত্ব মোস্তফা কামালের। পরবর্তী ইতিহাসবিদরা সেই সংক্ষিপ্ত বিবরণই নকল করে গেছেন। এজন্য আমরা গ্রিস যুদ্ধকে কিছুটা প্রয়োজনীয় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছি যাতে জানা যায় যে এতে কামালের কতটুকু বীরত্ব ছিল এবং গ্রিকদের কোথায় কোথায় পরাজিত করে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

১৯২১ সালের বসন্তকালে মোস্তফা কামাল তুর্কি বাহিনীকে রুশ অস্ত্রে সজ্জিত করে রণাঙ্গনের দিকে পাঠিয়ে দেন। গ্রিকরা তুর্কিদের রণাঙ্গনে পৌঁছানোর আগেই পর্যুদস্ত করার জন্য অতর্কিত হামলা শুরু করে দেয়। গ্রিসের বিশ্বাস ছিল যে শীঘ্রই ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালি তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে, কারণ দীর্ঘ সময় ধরে এই শক্তিগুলোর প্ররোচনাতেই গ্রিকরা উসমানীয় তুর্কিদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করে আসছিল। কিন্তু ব্রিটেন, তার মিত্রশক্তি এবং ইহুদী নেতাদের পরিকল্পনা ছিল অন্য কিছু। ব্রিটেন পরিষ্কার ঘোষণা করে দিল যে তারা এবং তাদের মিত্ররা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

৬ মার্চ ১৯২১ (২৭ জমাদিউল আখিরা ১৩৩৯ হিজরি) গ্রিকদের আক্রমণ শুরু হয় এবং তারা যুদ্ধের প্রথম লড়াইয়ে তুর্কি জেনারেল ইসমত ইনোনুকে পিছু হটতে বাধ্য করে। গ্রিকরা অগ্রসর হতে হতে উসমানীয়দের প্রথম রাজধানী ব্রুসা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

[১] নীল আফ্রিকা

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াহ, আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৬৮

সেখান থেকে তারা ইস্তাম্বুলের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল। কিন্তু ব্রিটিশ বাহিনী তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। গ্রীকরা এখান থেকে ফিরে “কুতাহিয়াহ” পৌঁছাল যেখানে ইসমত ইনোন্স পুনরায় বাহিনী বিন্যস্ত করছিলেন। গ্রীকরা দক্ষিণে কারাহিসার দখল করে উত্তরের দিকে আক্রমণ চালাল। এদিকে মোস্তফা কামাল আঙ্কারা থেকে নিজের কমান্ডে বাহিনী নিয়ে এই রণাঙ্গনে এসে পৌঁছালেন, কিন্তু গ্রীকদের ওপর আক্রমণের পরিবর্তে তিনি বাহিনীকে যুদ্ধ থামিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এই পিছু হটার ফলে তুর্কিদের চরম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো, কিন্তু কামাল ঞ্ক্ষেপ করলেন না এবং বাহিনীকে সাকারিয়া নদী পার করে সেখানে প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরির নির্দেশ দিলেন। তুরস্কের সমস্ত লভ্য বাহিনী এখানে সমবেত হলো যার সংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। কামাল এরপর ট্রেনের মাধ্যমে আঙ্কারা পৌঁছালেন যেখানে পার্লামেন্ট সদস্যরা রণাঙ্গন থেকে ক্রমাগত পিছু হটার কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। কামাল পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকে সদস্যদের আশ্বস্ত করলেন যে, তুর্কি বাহিনী এখনও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত। তুর্কি বাহিনী সাকারিয়া নদীর তীরে পরিখা খনন করে অবস্থান করছিল। ১৯২১ সালের মে মাসে গ্রীকরা অগ্রসর হয়ে নদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছাল। যখন তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণ শুরু হলো, তখন তুর্কিরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সেখানেও টিকে থাকতে পারল না এবং বিশৃঙ্খলভাবে পালিয়ে যেতে লাগল। কেবল ফিদায়ী সৈন্যরা অবিচলতা প্রদর্শন করল এবং খঞ্জর দিয়ে লড়াই করতে করতে নিহত হলো। বাকিরা এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পালিয়ে গেল যে, ৭০ হাজারের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার আঙ্কারা পৌঁছাতে সক্ষম হলো। অধিকাংশ গ্রীকদের আক্রমণের শিকার হলো অথবা এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ল। এই পরাজয়ের পর আঙ্কারার পতনের আশঙ্কা দেখা দিল এবং মন্ত্রীরা রাজধানী কায়সারিতে স্থানান্তরের পরামর্শ করতে লাগলেন। আতঙ্কিত নাগরিকরা স্থানান্তর শুরু করে দিল। কিন্তু এই সময়ে একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। তা হলো এই যে, বিজয়ী গ্রীস ময়দানে কোনো পরাজয়, কোনো প্রতিরোধ বা কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই হঠাৎ পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিল এবং ইস্তাম্বুলের নাগরিকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এটিই ছিল গ্রীসের সেই পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ যাকে কামাল পাশার ভক্তরা আজ পর্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের এক অবিস্মরণীয় কাহিনী হিসেবে গণ্য করে। কিন্তু বাস্তবে এই বিষয়টি দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না যে, বিজয়ী গ্রীসের এই প্রত্যাবর্তনের কারণ ব্রিটেন ও তার মিত্রদের চাপ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এই শক্তিগুলো কখনোই চায়নি যে, তাদের উদ্দেশ্য হাসিলকারী ভবিষ্যতের “মহান তুর্কি নেতা” শুরুতেই রাজনৈতিক মৃত্যুর শিকার হোক। আঙ্কারার নিকট থেকে গ্রীকদের ফিরে যাওয়া প্রকৃতপক্ষে পিছু হটা ছিল না, বরং প্রত্যাবর্তন ছিল। এই কারণেই তারা পূর্ণ নিশ্চিন্তে সফর করতে থাকল। তাদের কোনো তাড়া খাওয়ার বা পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তারা পথের প্রতিটি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলিম নারী-পুরুষদের গণহত্যা করতে থাকল। কুয়া ও পানির আধারগুলো ধ্বংস করে এবং গবাদি পশু ও সম্পদ লুট করে সাথে নিয়ে যেতে থাকল। এভাবে কোনো পিছু ধাওয়ার আশঙ্কা ছাড়াই তারা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ (২ রজব ১৩৪০ হিজরি) তারিখে পুনরায় “ইজমির”-এ পৌঁছাল। তাদের এই বিজিত শহরটি তারা নিজেরাই খালি করে দিল এবং পশ্চিম উপকূলের দিকে রওনা হয়ে গেল। তাদের চলে যাওয়ার ছয় মাস পর সেপ্টেম্বরের শুরুতে তুর্কি বাহিনী ইজমিরে পৌঁছাল এবং একটি গুলি না চালিয়েই শহরটি দখল করে নিল, যেখানে তখন কোনো গ্রীক অবশিষ্ট ছিল না।

গ্রিক বাহিনী ‘তরাকিয়া’ থেকেও বেরিয়ে গেল এবং তারা খুব দ্রুত আক্ষার সরকারের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করল, যার মাত্র পাঁচ দিন পর ইস্তাম্বুল দখলকারী ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা খলিফা ওয়াহিদউদ্দীনকে পদচ্যুত করল। [১]

এই কার্যক্রমে কামালের সমর্থকরা অগ্রণী ভূমিকায় ছিল। খলিফা ওয়াহিদউদ্দীনকে গ্রেপ্তার করে একজন আনুষ্ঠানিক খলিফা বানানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি ক্ষমতাহীন খিলাফত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। যার ফলে তাকে পদচ্যুত করা হয়। [২]

পদচ্যুত খলিফা এবং তার ছেলেকে একটি জাহাজে করে মাল্টা দ্বীপে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হলো। খলিফাকে সমস্ত ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হলো। মুসলিম বিশ্বের কিছুটা হলেও ক্ষমতা রাখা এই শেষ খলিফা এমন অবস্থায় ইস্তাম্বুল ত্যাগ করলেন যে, তার কাছে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মাত্র একটি বাক্স ছিল যা একজন ভৃত্য বহন করছিল। [৩]

বন্ধুর দৃষ্টির ঋণ আমরা শোধ করেছি

আনুগত্যের পথে আমরা সবকিছু উৎসর্গ করেছি

অত্যাচারী হাতের কিছু পরীক্ষা আমরা করেছি

ঘাতকের নাগালের খবর আমরা জেনে নিয়েছি [৪]

১. আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৭ / ৫৩৩ থেকে ৩৭।

২. উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে, সেই দিনগুলোতে (ফেব্রুয়ারি ১৯২২) ভারতে গান্ধিজি একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ করে দেন। সেই সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই এই আন্দোলনে যৌথভাবে शामिल ছিল, যেখানে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল খিলাফত টিকিয়ে রাখা, এজন্য তারা পাশাপাশি খিলাফত আন্দোলনও চালাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরে দাঁড়ানোর কারণে মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং এভাবে খিলাফত টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে ব্রিটেনের ওপর থাকা বিশাল চাপ শেষ হয়ে যায়।

৩. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২৩০।

৪. আত-তারিখুল ইসলামি, ডক্টর মাহমুদ শাকের: ১৭ / ৫৩৭।

৫. ফয়েজ আহমদ ফয়েজ।

শেষ খলিফা: দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ এবং খিলাফতের পতন

১৩৪০ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি

(১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১৭ নভেম্বর ১৯২২ (২৮ সফর ১৩৪১ হিজরি) তারিখে ওয়াহিদ উদ্দিনের পরিবর্তে তার চাচাতো ভাই দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদ বিন আব্দুল আজিজকে এই অঙ্গীকারের সাথে খিলাফতের আসনে বসানো হয় যে, তিনি কেবল একজন আলঙ্কারিক খলিফা হবেন।

দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদের সিংহাসন আরোহণের তিন দিন পর লুজান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে কেবল আঙ্কারার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন কারণ ইস্তাম্বুলের রাজনৈতিক মর্যাদা শেষ হয়ে গিয়েছিল। [১]

লুজান চুক্তি: তুর্কিদের ইসলামি পরিচয়ের অবসান:

এর আগে ১ নভেম্বর ১৯২২ (১২ সফর ১৩৪১ হিজরি) তারিখে মোস্তফা কামাল আঙ্কারা সরকারকে খিলাফত থেকে পৃথক করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যদিও পার্লামেন্ট তা গ্রহণ করেনি, কিন্তু কামাল নিজের পক্ষ থেকে এই সংবাদ প্রচার করে দিয়েছিলেন যে, পার্লামেন্ট সদস্যরা সরকার ও খিলাফতের পৃথকীকরণের অনুমোদন দিয়েছেন। এর অর্থ ছিল খলিফার মর্যাদা ভবিষ্যতে কেবল আনুষ্ঠানিক হবে এবং তার কোনো ক্ষমতা থাকবে না। কামাল একজন স্বৈরশাসকের ভূমিকা পালন করে পার্লামেন্ট সদস্যদের হুমকি দিয়েছিলেন যে, যদি কেউ এই ঘোষণার বিরোধিতা করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। [২]

এই কারণেই নতুন খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। এই পরিস্থিতি বিশ্বশক্তিগুলোর জন্য অত্যন্ত আনন্দের কারণ ছিল, তাই খিলাফত ক্ষমতাহীন হওয়ার মাত্র তিন দিন পর ২০ নভেম্বর ১৯২২ (১ রবিউস সানি ১৩৪১ হিজরি) তারিখে তারা লুজান সম্মেলন আহ্বান করে। আপাতদৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য ছিল সেভ্রে চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল তুরস্কের “ইসলামিয়াত” বা ইসলামি ভাবধারার অবসান ঘটানো। এই চুক্তিতে খলিফার কোনো ভূমিকাই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে খলিফাকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছিল এই জন্য যে, তুরস্ককে যখন আত্মহত্যার আমন্ত্রণ জানানো হবে, তখন ইসলামপ্রিয়তার কোনো ছিটেফোঁটাও যেন এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ৪৩০।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ৪৩০; আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকির: ১৭/৩৭।

লোজান কনফারেন্স এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এতে ব্রিটেন ছাড়াও ফ্রান্স, ইতালি, আমেরিকা, গ্রিস এবং জাপানের প্রতিনিধিরাও শরিক ছিলেন। উসমানীয় সালতানাতের সাথে সংশ্লিষ্ট দুই গাদ্দার ইহুদি, মাথের সালেম এবং ইমানুয়েল কারাসো (ফ্রিম্যাসনারি গ্র্যান্ড মাস্টার) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতা ব্রিটেনের হাতে ছিল। বাকি সবাই ছিল দর্শক ও সমর্থক।

এই কনফারেন্সে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন তুরস্ককে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে এবং ইস্তাম্বুল থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য নিম্নলিখিত চারটি শর্ত পেশ করেন:

- ১. তুরস্কের সাথে ইসলামের সম্পর্ক ছিন্ন করে একে একটি সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।
- ২. খিলাফতে ইসলামিয়াকে পুরোপুরি বিলুপ্ত করতে হবে।
- ৩. খলিফা এবং খিলাফতের সাহায্যকারীদের তুরস্ক থেকে বের করে দিতে হবে। খলিফার আর্থিক হিসাব গ্রহণ করে তার ওপর জরিমানা আরোপ করতে হবে।
- ৪. তুরস্ক উসমানীয় আমলের শরিয়তে ইসলামিয়া ভিত্তিক সংবিধান বাতিল করে একটি আধুনিক নাগরিক সংবিধান প্রণয়ন করবে। [১]

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পেশ করা এই শর্তগুলো ছিল পশ্চিমা শক্তিগুলোর সেই যৌথ এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যার উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কের ইসলামি পরিচয় মুছে ফেলা। এটি কেবল কোনো সাময়িক জেদ ছিল না, বরং ক্রুসেডার বিশ্ব এই লক্ষ্য সামনে রেখে শত শত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছিল। খ্রিস্টানরা রাশিয়ার এবং গ্রিসের অর্থোডক্স হোক বা ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং আমেরিকার ক্যাথলিক, তাদের আসল শত্রুতা ছিল ইসলামের সাথে। নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একমত ছিল। যতক্ষণ খিলাফতে ইসলামিয়া শক্তিশালী ছিল, তারা এই হীন ইচ্ছা পূরণ করতে পারেনি, কিন্তু এখন সময়ের লাগাম তাদের হাতে ছিল, তাই তারা তুর্কি নেতৃত্বকে বাধ্য করার চেষ্টা করল যেন তারা খিলাফতসহ ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতীক থেকে সরে আসে।

লোজানে যাওয়া তুর্কি প্রতিনিধি দলটি ইসমত ইনোনির নেতৃত্বে ছিল, যার মধ্যে কিছুটা হলেও ইসলামি ভাবধারা অবশিষ্ট ছিল, তাই এই প্রতিনিধি দলটি দাবিগুলো মেনে না নিয়েই ফিরে আসে। পার্লামেন্টও এই শর্তে সন্ধি করতে অস্বীকার করে। এটি এই কথার প্রমাণ ছিল যে আধুনিকমনা তুর্কি মুসলমানরাও এতটা অধঃপতিত হয়নি যে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত হবে। এই কারণেই তারা খিলাফতের বিলুপ্তি এবং ধর্মহীন সরকার প্রতিষ্ঠায় রাজি হয়নি।

কিন্তু মোস্তফা কামাল ছিল চরম পর্যায়ের সেকুলার এবং ইসলামি নিদর্শন ও বিধানের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। তার পার্লামেন্টের বিরোধিতারও কোনো ভয় ছিল না কারণ সে সামরিক শক্তির মাধ্যমে যে কাউকে দমন করার ক্ষমতা রাখত। তাকে উস্কানি দেওয়ার ক্ষেত্রে ইহুদি নেতাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যাদের মধ্যে একজন ছিল ইস্তাম্বুলের হাকাম (ফ্রিম্যাসনারি প্রধান) হাইম নাহম। দ্বিতীয়জন ছিল মাথের সালেম যার কাছে ইতালি ও তুরস্কের দ্বৈত নাগরিকত্ব ছিল এবং সে সালোনিকার উসমানীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধায়ক ছিল।

[১] সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিয়: পৃষ্ঠা ২৬৮; আদ-দাওলাতুল উসমানীয়াহ: আওয়ামিলুন নুহুয ওয়া আসবাবুস সুকূত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৭২।

ইসমত ইনোন্সুর প্রতিনিধি দলের ব্যর্থ প্রত্যাৱর্তনের পর এই ইহুদি নেতারা আঙ্কারায় পৌঁছান। তাদের কার্যক্রম গোপন ছিল, শুধু এতটুকু জানা যায় যে তারা প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। এরপর তুরস্ক এবং মিত্রশক্তির প্রতিনিধি দলগুলোকে পুনরায় লোজানে সমবেত হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। যেন পর্দার আড়ালে সমস্ত বিষয় মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। এখন লোজানে ডেকে শুধু স্বাক্ষর করানো বাকি ছিল।

৩০ অক্টোবর ১৯২৩ (২০ সফর ১৩৪২ হিজরি) আঙ্কারায় মোস্তফা কামাল পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকেন, যেখানে ১৮৫ জন সদস্যের সমর্থনে তিনি দেশের প্রধান হন। এই অধিবেশনেই খিলাফত বিলুপ্তি এবং দেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার বিলও পাস করা হয়। (যদিও এর আইনি অনুমোদন পরে হয়েছিল)। এর মাত্র দুই দিন পর ১ নভেম্বর ১৯২৩ (২২ সফর ১৩৪২ হিজরি) লোজান চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী তুরস্ক সেই ভূখণ্ড ফিরে পায় যার ওপর আজকের তুরস্ক গঠিত, কিন্তু তুরস্কের আত্মা শেষ হয়ে যায় এবং এর ইসলামী পরিচয় মুছে যায়। [১]

তোমার জুলুম অত্যন্ত সাধারণ, তবুও হে অত্যাচারী!

নিপীড়নের এই বিশেষ ভঙ্গি কেবল আমার জন্যই। [২]

লোজান চুক্তির পর:

লোজান চুক্তির পর তুরস্কে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো আসে:

- পশ্চিমা দেশগুলোর সেনাবাহিনী ইস্তাম্বুল থেকে চলে যায় এবং তাদের স্থলে তুর্কি সেনাবাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়।
- ইস্তাম্বুলের পরিবর্তে আঙ্কারাকে রাজধানী করা হয়।
- মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়।
- ইসমত ইনোন্সুকে তুরস্কের প্রথম প্রধানমন্ত্রী করা হয়।
- ৩ মার্চ ১৯২৪ (২৭ রজব ১৩৪২ হিজরি) খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়।
- এর পরপরই শেষ খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল মাজিদকে দেশান্তর করা হয়।
- ওয়াকফ মন্ত্রণালয় বিলুপ্ত করা হয়। উসমানীয় খলিফাদের জারিকৃত সমস্ত ওয়াকফ সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়।
- মোস্তফা কামাল স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মহীনতার চরম সীমায় পৌঁছে ইসলামী আইন স্থগিত করে দেন।
- আরবি লিপির পরিবর্তে ল্যাটিন অক্ষর চালু করা হয়।
- হিজরি ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার চালু করা হয়।
- নারীদের জন্য হিজাব অবৈধ ঘোষণা করা হয় এবং বেপর্দা হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।
- প্রাচ্যের পোশাক নিষিদ্ধ এবং পশ্চিমা পোশাক বাধ্যতামূলক করা হয়। ওলামায়ে কেরাম এবং মসজিদের ইমামগণও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, মাহমুদ শাকের: ৭/৩০৭-৩০৮; আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ২৩১।

[২] জওহর।

- ১৪. শেখুল ইসলাম পদটি বিলুপ্ত করা হয়।
- ১৫. দ্বীনি মাদরাসাগুলোকে আধুনিক স্কুল ও কলেজের রূপ দেওয়া হয়।
- ১৬. খানকাহগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সুফি সিলসিলাগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
- ১৭. মসজিদের সংখ্যা সীমিত করা হয় এবং সেগুলোতে সরকারি কর্মচারীদের ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।
- ১৮. জামে মসজিদ আয়া সোফিয়াকে জাদুঘরে পরিণত করা হয়।
- ১৯. জামে মসজিদ সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহকে গুদামে রূপান্তরিত করা হয়।
- ২০. আজানের শব্দগুলো তুর্কি ভাষায় বলা বাধ্যতামূলক করা হয়।
- ২১. ১৯২৮ সালে সংবিধান থেকে সেই শব্দগুলোও বাদ দেওয়া হয় যা ইসলামকে রাষ্ট্রের সরকারি ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করত।
- ২২. একের অধিক স্ত্রী রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তালাকের জন্য সরকারের অনুমতি আবশ্যিক করা হয়।

মোস্তফা কামালের এসব পদক্ষেপে অতিষ্ঠ হয়ে কুর্দিস্তানের মানুষ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তারা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের পুত্র সেলিম খানকে খলিফা করার ঘোষণা দেয়। কিন্তু মোস্তফা কামাল পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই আন্দোলন দমন করেন এবং এর নেতাদের হত্যা করান। মোস্তফা কামাল ১৯৩৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন, তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইসমত ইনোন্‌উদ্‌দৌলা দেশের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [১] সংক্ষেপে বলতে গেলে, পশ্চিমা শক্তিগুলোর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী খিলাফতের অবসান ঘটে এবং তুরস্ক তার ইসলামী পরিচয় হারিয়ে একটি সেকুলার ও পশ্চিমা ধাঁচের দেশে পরিণত হয়। আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, মোস্তফা কামালের হাতে খিলাফতের অবসান এবং ইসলামী নিদর্শনগুলোর বিলুপ্তি সত্ত্বেও মুসলিম বিশ্বের চোখ খোলেনি। সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তারা প্রচারমাধ্যমের মোহে পড়ে বছরের পর বছর মোস্তফা কামালের গুণগানে মগ্ন ছিলেন। [২] তবে যারা দূরদর্শী ছিলেন এবং তিব্বত সত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তারা মোস্তফা কামালের সমালোচনা অব্যাহত রাখেন।

মরহুম আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন:

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া ফিল তারিখিল ইসলামিল হাদিস, ইসমাইল ইয়াগি: পৃষ্ঠা ৪৩১ থেকে ৪৩৩।

[২] جنانہ ১৯৩৮ সালে মাওলানা জাফর আলী খান “মোস্তফা কামালের মৃত্যুতে” শিরোনামে লিখেছিলেন: “আতাতুর্ক মোস্তফা কামাল নুরুল্লাহ মারকাদাহ” এবং শোকগাথায় বলেছিলেন:

দুনিয়া থেকে সেই মহান মুজাহিদ বিদায় নিলেন... যার উদাহরণ খুঁজেও তোমরা পাবে না

মিল্লাতের সমস্যাগুলোকে সহজ করে দিলেন... তার সংকল্পগুলো মহিমা প্রকাশ করল

যেই ক্ষতের জন্য তিনশ বছর কেঁদে অতিবাহিত হয়েছিল... সেই ক্ষতের জন্য তিনি উপশমের কারণ হলেন

যেই ব্যবস্থা তিনি পূর্ণতার সাথে কায়ম করে গেলেন... হে কাবার রব, এখন যেন তা পতনের লজ্জায় না পড়ে

(চমনস্তান, পৃষ্ঠা ২০৯)

একইভাবে মোস্তফা কামাল পাশার মৃত্যুর “সানহে” (ট্র্যাজেডি)-তে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের অধিবেশনে এভাবে শোক প্রকাশ করা হয়:

“জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই অধিবেশন মহান মুজাহিদ, গাজী মোস্তফা কামাল পাশা—যিনি তুরস্কের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রাণপুরুষ ছিলেন—তার শোকাবহ মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। তার মৃত্যুতে মিল্লাতে ইসলামিয়ার একজন মহান চিন্তাবিদ ও বড় মুজাহিদ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা মরহুম গাজীকে জামাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করুন এবং তুর্কি জাতিকে মিল্লাতের পুনর্জাগরণে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দান করুন।” (খুতবাতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পৃষ্ঠা ৬৩৩)

৩৩৯

নির্বোধ তুর্কিরা খিলাফতের পোশাক ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে... আপনজনদের সরলতা দেখ, আর পরজনদের ধূর্ততাও দেখ।

কবি আহমদ শওকী, যিনি আগে মোস্তফা কামালকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সমকক্ষ মনে করতেন, খিলাফতের জন্য এই শোকগাথা গাইতে বাধ্য হলেন:

ضجت عليك مآذن ومنابر ... وبكت عليك ممالك ونواح

“তোমার জন্য মসজিদের মিনার ও মিসরগুলো বিলাপ করছে... তোমার জন্য এই দেশসমূহ এবং তাদের চারপাশ ক্রন্দনরত।”

الهند والهة ومصر حزينة ... تبكى عليك بدمع سحاح

“হিন্দুস্তান অস্থির এবং মিসর শোকাতুর... এরা সবাই তোমার জন্য অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে যা থামার নয়।”

والشام تسأل، والعراق وفارس ... احما من الارض الخلافة ماح

“শাম জিজ্ঞাসা করছে এবং ইরাক ও পারস্যও... কোনো বিনাশকারী কি সত্যিই জমিন থেকে খিলাফতকে মিটিয়ে দিয়েছে?”

يا للرجال نخرة مؤودة ... قتلت بغير جريرة وجناح

“হে লোকসকল! এই শরিফ এবং জীবন্ত সমাহিত সত্তার জন্য বিস্ময়... যাকে কোনো অপরাধ ও গুনাহ ছাড়াই হত্যা করা হয়েছে।” [১]

+++

তুর্কিদের সাথে যা কিছু ঘটেছে, তা ছিল তাদেরই কর্মের ফল। তারা সুলতান আব্দুল হামিদ সানি এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের খিলাফতকে একটি কারাগার মনে করতে শুরু করেছিল এবং সেই “দাসত্বের যুগ” থেকে মুক্তি পেয়ে ইউরোপের মতো “স্বাধীনতা” চেয়েছিল। হ্যাঁ! তারা সেই স্বাধীনতা ‘জমিয়ত ইত্তিহাদ ও তারাক্কি’ এবং কামাল আতাতুর্কের হাতে পেয়েও গিয়েছিল। কিন্তু এই “স্বাধীনতা” কী ছিল এবং সেই “দাসত্ব” কেমন ছিল?

সুলতান আব্দুল হামিদ সানির “দাসত্বের যুগে” তিন মহাদেশে মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি সহ প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে স্বাধীন ছিল। এখন “স্বাধীনতার যুগে” তারা নিজেদের আজান ও নামাজেও স্বাধীন ছিল না।

“দাসত্বের যুগে” প্রেস সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং শুধু সুলতান আব্দুল হামিদের রাজনীতি নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপরও ক্রমাগত আক্রমণ করা হতো, এমনকি প্রতিদিন তাঁর কার্টুন প্রকাশিত হতো যা দেখে তরুণ তুর্কিরা আনন্দ পেত। কিন্তু “স্বাধীনতার যুগে” মোস্তফা কামাল এবং কামালবাদের বিরুদ্ধে একটি লাইনও প্রকাশিত হতে পারত না। প্রেস কঠোরতম সেন্সরশিপের কবলে ছিল। জিহ্বায় তাল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং ছবির অন্য পিঠ দেখানো ব্যক্তিদের হাত ছিল শিকলবন্দি।

“দাসত্বের যুগে” সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। চাই তা দ্বীনি শিক্ষা হোক বা আধুনিক শিক্ষা। মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমদের জন্যও সব ধরনের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু “স্বাধীনতার যুগে” তুর্কি মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা একটি ভিনদেশি বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে মোস্তফা কামালের শাসন ছিল একটি চাবুক ও চপেটাঘাত, যার ফলে হয়তো তুর্কি মুসলমানরা ইসলাম ও খিলাফতের কদর বুঝতে পারত না। শোকর আলহামদুলিল্লাহ যে, এই চপেটাঘাত তুর্কিদের মোড় পুনরায় ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

[১] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহদ ওয়া আসবাবুস সুকুত, আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ৪৭৩।

ইসলামের ইতিহাস | উসমানীয় খিলাফত

উসমানীয় তুর্কিদের তালিকা

নম্বর শাসক শাসনকাল চরিত্র বিশেষ বৈশিষ্ট্য

‘আমীর’ উপাধি নিয়ে যারা শাসন করেছেন

১ উসমান খান বিন আরতুগ্রুল ৬৮৭ হি. হতে ৭২৬ হি. (১২৯৯ খ্রি. হতে ১৩২৬ খ্রি.)

নেক সীরাত সালতানাতে প্রতিষ্ঠাতা

২ ওরখান বিন উসমান খান ৭২৬ হি. হতে ৭৬১ হি. (১৩২৬ খ্রি. হতে ১৩৬০ খ্রি.) নেক

সীরাত সালতানাতকে স্থায়িত্ব দান করেন

৩ মুরাদ খান আউয়াল বিন ওরখান ৭৬১ হি. হতে ৭৯১ হি. (১৩৬০ খ্রি. হতে ১৩৮৯ খ্রি.)

নেক ও সাহসী সালতানাত সম্প্রসারণ করেন

৪ বায়েজিদ ইয়ালদারাম বিন মুরাদ আউয়াল ৭৯১ হি. হতে ৮০৫ হি. (১৩৮৯ খ্রি. হতে

১৪০৩ খ্রি.) বিলাসপ্রিয়, সাহসী, উগ্র মেজাজ সালতানাত বিস্তৃত করেন কিন্তু তৈমুরের

কাছে পরাজিত হয়ে সালতানাত হারান

‘সুলতান’ উপাধি নিয়ে যারা শাসন করেছেন

৫ মুহাম্মদ চেলপি বিন বায়েজিদ ইয়ালদারাম ৮১২ হি. হতে ৮২৪ হি. (১৪০৩ খ্রি.

হতে ১৪২১ খ্রি.) মধ্যমপন্থী। জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহী ভাইদের সাথে গৃহযুদ্ধ।

সালতানাতকে নতুন করে সুসংগঠিত করা

৬ মুরাদ খান সানি বিন মুহাম্মদ চেলপি ৮২৪ হি. হতে ৮৫৫ হি. (১৪২১ খ্রি. হতে ১৪৫১

খ্রি.) অত্যন্ত নেক সীরাত সালতানাতে নতুন করে স্থিতিশীলতা আনয়ন

৭ মুহাম্মদ খান ফাতেহ বিন মুরাদ সানি ৮৫৫ হি. হতে ৮৮৬ হি. (১৪৫১ খ্রি. হতে ১৪৮১

খ্রি.) নেক সীরাত কনস্টান্টিনোপল বিজয়

৮ বায়েজিদ সানি বিন মুহাম্মদ ফাতেহ ৮৮৬ হি. হতে ৯১৮ হি. (১৪৮১ খ্রি. হতে ১৫১২

খ্রি.) নেক সীরাত পতনের লক্ষণসমূহ, বাদশাহ নিজ পুত্র সেলিমের পক্ষে পদত্যাগ করেন

খিলাফতে উসমানিয়া — উত্থানের যুগ

৯ সলিম আউয়াল বিন বায়েজিদ সানি ৯১৮ হিজরি থেকে ৯২৬ হিজরি (১৫১২ থেকে ১৫২০ খ্রি.) কঠোর মেজাজ, শরীয়ত পালনে শিথিল আল-উসমানের প্রথম খলিফা, মিশর বিজয়, সফভী সালতানাতের সাথে যুদ্ধ।

১০ সুলাইমান কানুনী বিন সলিম আউয়াল ৯২৬ হিজরি থেকে ৯৭৪ হিজরি (১৫২০ থেকে ১৫৬৬ খ্রি.) নেক সীরাত, কঠোর মেজাজ চরম উন্নতি, স্পেনের সাথে সংঘর্ষ, নৌ বিজয়সমূহ।

১১ সলিম সানি বিন সুলাইমান কানুনী ৯৭৪ হিজরি থেকে ৯৮২ হিজরি (১৫৬৬ থেকে ১৫৭৪ খ্রি.) দ্বীনি ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল উসমানীয় আমিরদের মধ্যে মদ্যপান সাধারণ হয়ে যায়, অস্টিয়ার সাথে সন্ধি।

খিলাফতে উসমানিয়া — পতনের যুগ

১২ মুরাদ সালেস বিন সলিম সানি ৯৮২ হিজরি থেকে ১০০৩ হিজরি (১৫৭৪ থেকে ১৫৯৫ খ্রি.) নেক সীরাত, দুর্বল রাশিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর বিজয়।

১৩ মুহাম্মদ সালেস বিন মুরাদ সালেস ১০০৩ হিজরি থেকে ১০১২ হিজরি (১৫৯৫ থেকে ১৬০৩ খ্রি.) দুর্বল ইস্তাম্বুলে বিদ্রোহ।

১৪ আহমদ খান আউয়াল বিন মুহাম্মদ সালেস ১০১২ হিজরি থেকে ১০২৬ হিজরি (১৬০৩ থেকে ১৬১৭ খ্রি.) ব্যক্তিগতভাবে নেক সীরাত কিন্তু দুর্বল তামাক সেবন সাধারণ হয়ে যায়, ইরান থেকে পরাজয়।

১৫ মোস্তফা খান আউয়াল বিন মুহাম্মদ সালেস ১০২৬ হিজরি, কয়েক মাস (১৬১৭ খ্রি.) বিলাসপ্রিয়, অযোগ্য ইয়েনী চেরীর ক্ষমতা।

১৬ উসমান খান সানি বিন মুহাম্মদ সালেস ১০২৬ হিজরি থেকে ১০৩১ হিজরি (১৬১৮ থেকে ১৬২২ খ্রি.) যোগ্য কিন্তু শরীয়ত পালনে শিথিল হাঙ্গামার যুগ, খলিফাকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হয়।

মোস্তফা আউয়াল, পুনরায় ১০৩১ হিজরি থেকে ১০৩২ হিজরি (১৬২২ থেকে ১৬২৩ খ্রি.) পুনরায় পদচ্যুত করা হয়।

১৭ মুরাদ রাবে বিন আহমদ আউয়াল ১০৩২ হিজরি থেকে ১০৪৯ হিজরি (১৬২৩ থেকে ১৬৪০ খ্রি.)

১৮ ইব্রাহিম খান আউয়াল বিন আহমদ আউয়াল ১০৪৯ হিজরি থেকে ১০৫৮ হিজরি (১৬৪০ থেকে ১৬৪৮ খ্রি.) ক্ষমতাহীন ক্রিট বিজয়, সুলতানকে পদচ্যুত করে হত্যা করা হয়।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

নং শাসকের নাম রাজত্বকাল বৈশিষ্ট্য প্রধান ঘটনাবলী

১৯ মুহাম্মদ রাবে বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১০৫৮ হিজরি থেকে ১০৯৯ হিজরি (১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ) চল্লিশ বছরের শাসন, কিন্তু ক্ষমতাহীন অর্ধেক হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়ার হাতে সোপর্দ, সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়

২০ সুলাইমান খান সানি বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১০৯৯ হিজরি থেকে ১১০২ হিজরি (১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতাহীন

২১ আহমদ সানি বিন ইব্রাহিম আউয়াল ১১০২ হিজরি থেকে ১১০৬ হিজরি (১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতাহীন

২২ মোস্তফা সানি বিন মুহাম্মদ রাবে ১১০৬ হিজরি থেকে ১১১৫ হিজরি (১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতাহীন তুরস্ক হাঙ্গেরি থেকে বঞ্চিত

২৩ আহমদ সালেস বিন মুহাম্মদ রাবে ১১১৫ হিজরি থেকে ১১৪৩ হিজরি (১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ) দুর্বল সার্বিয়া হাতছাড়া হয়ে যায়

উসমানীয় খিলাফত - আধুনিকায়ন এবং সংগ্রামের যুগ

নং শাসকের নাম রাজত্বকাল বৈশিষ্ট্য প্রধান ঘটনাবলী

২৪ মাহমুদ খান আউয়াল বিন মোস্তফা সানি ১১৪৩ হিজরি থেকে ১১৬৮ হিজরি (১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ) সতর্ক, আধুনিকমনা নাদির শাহ দুররানির কাছে পরাজয়

২৫ উসমান সালেস ১১৬৮ হিজরি থেকে ১১৭১ হিজরি (১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সচ্চরিত্র

২৬ মোস্তফা সালেস বিন আহমদ সালেস ১১৭১ হিজরি থেকে ১১৮৭ হিজরি (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ) সচ্চরিত্র, সাহসী মিশরে মুহাম্মদ আলী পাশার স্বায়ত্তশাসন

২৭ আব্দুল হামিদ আউয়াল বিন আহমদ সালেস ১১৮৭ হিজরি থেকে ১২০৩ হিজরি (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) মধ্যম রাশিয়ার ত্রিমিয়া দখল

২৮ সেলিম সালেস বিন মোস্তফা সালেস ১২০৩ হিজরি থেকে ১২২২ হিজরি (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ) দূরদর্শী, ন্যায়পরায়ণ মিশরে নেপোলিয়নের দখল, সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়

২৯ মোস্তফা রাবে বিন আব্দুল হামিদ আউয়াল ১২২২ হিজরি থেকে ১২২৩ হিজরি (১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) ক্ষমতাহীন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করা

তারিখে উন্মতে মুসলিমা (৩৪৩)

ক্রম নাম শাসনকাল বৈশিষ্ট্য প্রধান ঘটনাবলী

৩০ মাহমুদ সানি বিন আব্দুল হামিদ আউয়াল ১২২৩ হিজরি থেকে ১২৫৫ হিজরি (১৮০৮ থেকে ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) সংস্কারের জন্য সচেষ্টি সৌদি সরকারের পতন। জেনেশারির অবসান। ফ্রান্স কর্তৃক আলজেরিয়া দখল। মুহাম্মদ আলী পাশার সিরিয়া আক্রমণ।

৩১ আব্দুল মাজিদ আউয়াল বিন মাহমুদ সানি ১২৫৫ হিজরি থেকে ১২৭৭ হিজরি (১৮৩৯ থেকে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যম সিরিয়ায় মুহাম্মদ আলী পাশার পরাজয়।

৩২ আব্দুল আজিজ বিন মাহমুদ সানি ১২৭৭ হিজরি থেকে ১২৯৩ হিজরি (১৮৬১ থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) মধ্যম সুয়েজ খাল খনন।

৩৩ মুরাদ খামেস বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল ১২৯৩ হিজরি (১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) মদ্যপায়ী, ক্ষমতাহীন উন্মাদনার কারণে পদচ্যুত।

৩৪ আব্দুল হামিদ সানি বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল ১২৯৩ হিজরি থেকে ১৩২৭ হিজরি (১৮৭৬ থেকে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) সচ্চরিত্র ও সাহসী সুলতান হেজাজ রেলওয়ে নির্মাণ। ফিলিস্তিন ইহুদিদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার। বিদ্রোহ ও পদচ্যুতি।

প্রগতিশীলদের আধিপত্যের যুগ

| ৩৫ | মুহাম্মদ খামেস, রাশাদ বিন আব্দুল মাজিদ আউয়াল | ১৩২৭ হিজরি থেকে ১৩৩৬ হিজরি (১৯০৯ থেকে ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ) | দুর্বল | সাধারণ নির্বাচন, বলকান যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। |

| ৩৬ | মুহাম্মদ সাদেস, ওয়াহিদ উদ্দিন বিন মুরাদ খামেস | ১৩৩৬ হিজরি থেকে ১৩৪১ হিজরি (১৯১৮ থেকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ) | দুর্বল | তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ, মোস্তফা কামাল পাশার উত্থান। |

| ৩৭ | আব্দুল মাজিদ সানি বিন আব্দুল আজিজ | ১৩৪১ হিজরি থেকে ১৩৪২ হিজরি (১৯২২ থেকে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দ) | নামমাত্র খলিফা | খিলাফতের অবসান। |

সিলতানাত-ই-উসমানিয়ার দুর্বলতা ও পতনের কারণসমূহ

উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন বিশ্ব ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম বেদনাদায়ক ঘটনা। তাতারীদের হাতে বাগদাদ এবং খ্রিষ্টানদের হাতে স্পেনের ধ্বংসের তুলনায় এর ক্ষত অনেক বেশি গভীর। বাগদাদে আবাসীয় খিলাফত শেষ হলে মিশর ইসলামের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্পেন থেকে মুসলমানদের পতাকা যখন নেমে গেল, তখনও বিশ্বমঞ্চে মুসলমানরা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ছিল। কিন্তু আল-ই-উসমান-এর হাত থেকে শাসন ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর মুসলমানদের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এই শূন্যতা আজ প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পূরণ হয়নি। উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন ও দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে যা বিগত পৃষ্ঠাগুলো গভীরভাবে অধ্যয়নকারী পাঠকদের কাছে নিশ্চয়ই অজানা নয়। তবুও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে একত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে।

১) ঈমানি অবক্ষয় এবং ইসলামি শিক্ষা থেকে বিমুখতা:

আমাদের বিশ্বাস এই যে, যেকোনো ব্যক্তি বা জাতির দুনিয়াবী ও আখিরাতে সাফল্যের চাবিকাঠি ঈমানের দৃঢ়তা এবং ইসলামি শিক্ষার ওপর অটল থাকার মধ্যে নিহিত। এটিই মূল ভিত্তি। উসমানীয় সাম্রাজ্য হোক বা অন্য কোনো সরকার, সবকিছুর উন্নতি এই মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সবকিছুর পতনের পেছনে এই মূলনীতি থেকে বিমুখতা কাজ করেছে।

২) জিহাদের চেতনার দুর্বলতা:

জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ উসমানীয়দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং এই আবেগেই উদ্বুদ্ধ হয়ে উসমানীয় সুলতানরা স্বয়ং জিহাদের জন্য বের হতেন এবং অতুলনীয় বিজয় অর্জন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সুলতানরা আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন। তারা স্বয়ং জিহাদি অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া ছেড়ে দেন এবং এর দায়িত্ব উজির-ই-আজমদের ওপর ন্যস্ত করেন। এর ফলে সেনাবাহিনীতে আগের মতো উদ্দীপনা আর অবশিষ্ট থাকেনি এবং উসমানীয়দের বিজয়ের পরিধি অসিফ্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছে থমকে যায়। এরপর থেকে তাদের পশ্চাদপসরণ শুরু হয়, যা তাদের দুর্বল করতে করতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

৩) ক্ষমতার রাজনীতি:

ইসলাম রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে শুরার অধীন করেছে। উসমানীয় সাম্রাজ্যে শুরার রাজনৈতিক পরিবেশ হারিয়ে যায় এবং সামরিক রাজনীতির পরিবেশ প্রবল হয়ে ওঠে। খলিফা, শাহজাদা, দরবারের আমীর এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সবাই সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। পেশাগত উন্নতির মাধ্যমেই তারা সর্বোচ্চ উপযুক্ত পদ পর্যন্ত পৌঁছাতেন।

যদিও তাদের প্রশিক্ষণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী মুজাহিদসুলভ পদ্ধতিতে হতো, তবে এতে মানুষের মস্তিষ্ক কেবল যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়েই দক্ষ হতে পারে। আর যদি এটি বলা হয় তবে ভুল হবে না যে, গুটিকয়েক ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশের চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রতিটি সমস্যার একটিই সমাধান তাদের বুঝে আসে, আর তা হলো শক্তির ব্যবহার করা, বীরত্ব প্রদর্শন করা এবং বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া। দূরদর্শিতার সেই গুণটি দমে যায় যা রাজনীতির জন্য অপরিহার্য।

একজন সাধারণ সৈনিক বা সাধারণ মুজাহিদকে এই মানসিকতার ক্ষেত্রে অক্ষম মনে করা যেতে পারে এবং এতে কোনো সামষ্টিক ক্ষতিও হয় না, কারণ তাকে কেবল উপরের নির্দেশ পালন করতে হয়। কিন্তু একজন নেতা ও শাসকের চিন্তাধারাও যদি এমন সীমাবদ্ধ হয়, তবে জাতির ধ্বংসের পথ খুলে যায়। কারণ এই মানসিকতার সাথে যদি ইসলামী ন্যায়বিচারের দাবি এবং হুকুকুল ইবাদ লক্ষ্য রাখা না হয়, তবে মানুষ নিছক খুনি ও রক্তপিপাসু হয়ে পড়ে।

উসমানীয় সালতানাতের শুরুর যুগ থেকে উত্থানের যুগ পর্যন্ত ঈমান মজবুত ছিল এবং শরয়ী সীমার খেয়াল রাখা হতো, তাই সামরিক মানসিকতার প্রভাবও একটি সীমার মধ্যে ছিল। কিন্তু যখনই ঈমানী অবক্ষয় শুরু হলো, সামরিকবাদী মানসিকতার ক্ষতিগুলো দ্রুত সামনে আসতে শুরু করল। শক্তির মাধ্যমে সিংহাসনে পৌঁছানোই শাহজাদাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। এই কারণেই সুলতানদের উত্তরসূরিদের মধ্যে যুদ্ধ হলো, বিদ্রোহের সন্দেহ এমনকি নিছক সংশয়ের ভিত্তিতেও আপন ভাইদের হত্যার জঘন্য প্রথা চালু হলো। যার ফলে সালতানাত যেমন কলঙ্কিত হলো, তেমনি দুর্বলও হলো।

৪. ইয়েনি চেরি বাহিনীর অবক্ষয়:

ইয়েনি চেরি বাহিনীতে বালকদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাদশাহর বিশেষ জান-নিসার বানানো হতো। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ইসলামী প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই বাহিনী মুজাহিদসুলভ ঢঙে বড় বড় বিজয়ের কারণ হয়েছে। কিন্তু যখন ঈমানী রুহ বিদায় নিল, তখন জিহাদের স্থলে কেবল সামরিকবাদিতা অবশিষ্ট রইল। নিজের শক্তির অহেতুক প্রদর্শন ইয়েনি চেরি সৈন্যদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল, যা রাজধানী শহরে দীর্ঘ সময় ধরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিল। উসমানীয় সুলতানরা তাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়লেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই এই ইয়েনি চেরি অফিসারদের হাতে নিহত হলেন।

ইয়েনি চেরি বাহিনী সর্বদা সুলতানের সাথে অভিযানে যেত। যখন তারা আধিপত্য পেয়ে গেল, তখন তারা অভিযানে না যাওয়ার এই অজুহাত তৈরি করল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সুলতান যুদ্ধের জন্য যাবেন না, আমরাও যাব না। এরপর ইয়েনি চেরি বাহিনী ইস্তাম্বুলের সেনানিবাসে বসে বসে মাগনা বেতন পেতে থাকল। এই কমহীনতা মুসলিম বিশ্বের এই সেরা বাহিনীকে কেবল আরামপ্রিয়ই নয়, বরং বিলাসপ্রিয় করে তুলল। সৈন্যরা মদ্যপান এবং পাপাচারের অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহর সাহায্য আর সাথে থাকল না এবং উসমানীয়রা ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হতে লাগল।

৫. শাহজাদাদের হত্যা:

উসমানীয় সুলতানদের ইতিহাসে ভাই ও সন্তানদের হত্যার অনেক দুঃখজনক ঘটনা পাওয়া যায়। এই বিষয়ে...

কিছু তো প্রোপাগান্ডা (যার ওপর আমরা সামনে আলাদা শিরোনামের অধীনে আলোকপাত করব), আর কিছু বাস্তবতাও বটে। **سُلطان مُراد** সুলতান মুরাদ তৃতীয়-এর পাঁচ ভাই এবং সুলতান মুহাম্মদ খান তৃতীয়-এর নিজের “১৯” ভাইকে কেবল এই আশঙ্কায় যে তারা বিদ্রোহ করতে পারে, হত্যা করা প্রমাণিত। এই পরিস্থিতির ফলে সালতানাত শাহজাদাদের বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকে তো রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু এর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিকটি ছিল এই যে, যোগ্য শাহজাদাদের অভাব দেখা দিল এবং সালতানাত অযোগ্যদের হাতে চলে গেল।

৬. উজির-এ-আজম এবং মন্ত্রীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের শাস্তি:

উসমানীয় সুলতানদের আমলে উজির এবং উজির-এ-আজমদের মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার ঘটনাও প্রচুর পাওয়া যায়। যেমন সুলতান সুলাইমান আলিশান-এর আমলে ইব্রাহিম পাশা ও আহমদ পাশা; সুলতান মুহাম্মদ তৃতীয়-এর আমলে ফরহাদ পাশা, হাসান পাশা খাদেম এবং হাসান পাশা ইয়েমিশজি; সুলতান আহমদ প্রথম-এর আমলে দরবেশ পাশা ও নাসুহ পাশা; সুলতান উসমান দ্বিতীয়-এর আমলে হুসাইন পাশা ও দিলাওয়ার পাশা; সুলতান মুস্তফা প্রথম-এর আমলে হুসাইন পাশা আরনউদি ও মুহাম্মদ পাশা গুরজি; মুরাদ চতুর্থ-এর আমলে রজব পাশা ও মুহাম্মদ পাশা তাবানি; সুলতান ইব্রাহিম খান প্রথম-এর আমলে কারাহ মুস্তফা পাশা ও সালিহ পাশা হত্যা করা হয়েছিল। [১]

পরবর্তী সুলতানদের আমলে হত্যার পরিবর্তে কারাদণ্ডের ঘটনা বেশি পাওয়া যায়। যদিও এই উজিরদের মধ্যে সবাই নির্দোষ ছিলেন না, বরং অনেকে বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড, কুরুচিপূর্ণ চরিত্র, জনগণের ওপর জুলুম, দুর্নীতি এবং অন্যান্য অপরাধের কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেয়েছিলেন, তবে এমন উদাহরণও বিদ্যমান যেখানে কেবল অভিযোগের ভিত্তিতে ভালো উজিরদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই অসতর্কতার ফল এই দাঁড়াল যে, সালতানাতের কাজে যোগ্য ব্যক্তিদের অভাব দেখা দিতে লাগল। তাছাড়া উজির-এ-আজমের পদ গ্রহণ করতেও আমীররা ভয় পেতে শুরু করলেন, কারণ অনেক উজির-এ-আজমের শেষ পরিণতি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রূপেই তাদের সামনে ছিল। ফলে এখন যোগ্য ব্যক্তিদের স্থলে অযোগ্য ব্যক্তিদের আধিক্য হতে লাগল।

৭. অন্যদের সাথে চুক্তি ও সম্পর্ক:

বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক একটি অনিবার্য প্রয়োজন যার জন্য চুক্তিও করতে হয়। এই চুক্তিগুলোর উদ্দেশ্য কখনো উপকার লাভ করা এবং কখনো ক্ষতি দূর করা হয়। এখানে আমরা চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি না, বরং এটি বলতে চাই যে, অন্যদের সাথে সম্পর্কের প্রতিটি পদক্ষেপে এবং চুক্তিতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা অত্যন্ত জরুরি। এগুলোকে ভাসাভাসা দৃষ্টিতে দেখা এবং তাৎক্ষণিক উপকার বা তাৎক্ষণিক ক্ষতি দূর করার চিন্তার উর্ধ্ব না ভাবা অনেক সময় ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়। উসমানীয় সালতানাত থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সম্পর্কগুলোর সীমা ও শর্ত বজায় রাখতে অবহেলা হয়েছিল যার খেসারত পরে দিতে হয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে উসমানীয় সালতানাতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা সুলতান সুলাইমান কানুনির আমলে হয়েছিল যখন স্পেনের শক্তি চূর্ণ করার জন্য ফ্রান্সকে মিত্র বানানো হয়েছিল এবং ভেনিসের সাথেও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলোকে খোলা...

[১] জামিউদ দুওয়াল আজ মুনাজ্জিম বাশি: খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩১০, ৩১২; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬১, ৩৬৩; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭৭; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮২, ৩৮৩; খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৫০৯, ৫১০, ৫২১; খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫২৮, ৫৩৪।

সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করা হয়েছিল, যার ফলে তারা তুরস্কের শক্তিশালী সমুদ্রগুলোতে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ অনুমতি পেয়েছিল। সুলাইমানের এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে তুর্কিরা প্রবল শক্তিশালী, তাই এই চুক্তিগুলো যখন ইচ্ছা বাতিল করা যেতে পারে। কিন্তু তার পরে তুর্কিদের শক্তি কমে যায় এবং এই চুক্তিগুলো তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এগুলো থেকে ফায়দা হাসিল করে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলো ক্রমাগত বাণিজ্যিক ও সামরিক সুবিধা ভোগ করতে থাকে।

পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর উসমানীয় সুলতানরা এ ধরনের আরও চুক্তিতে বাধ্য হন। এভাবে উসমানীয় সাম্রাজ্যে ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে, বরং এর আড়ালে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও তুর্কিদের ওপর পড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে ইউরোপীয় শক্তিগুলো এই সুযোগ-সুবিধা থেকে ফায়দা নিয়ে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও শিক্ষার নামে এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে যা পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের জন্ম দেয়।

৮. বিলাসিতা:

বিজয় এবং উৎপাদনের প্রাচুর্য উসমানীয় সাম্রাজ্যকে যে ঈর্ষণীয় সমৃদ্ধি দান করেছিল, তার একটি প্রভাব এই হয়েছিল যে সুলতান, শাহজাদা, উমরাহ এবং অফিসাররা দুনিয়ার স্বাদ ও নেয়ামত ভোগ করাকেই নিজেদের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাতেই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাদের সামনে জীবনের আর কোনো উচ্চতর লক্ষ্য ছিল না।

সুলাইমান কানুনি নিজের সময় পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম, সাধারণ সফর, জিহাদী উদ্যম এবং কষ্টসহিষ্ণুতার ঐতিহ্যকে জীবিত রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ইনিচেরি বাহিনীর সেই নিয়ম পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন যার অধীনে কেবল সুলতানই তাদের অভিযানে সাথে নিয়ে যেতে পারতেন। সুলাইমান কানুনি অফিসারদের এই ক্ষমতা দিয়ে দেন যে তারা ইনিচেরি বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে পারবেন। এর ফলে পরবর্তী সুলতানদের জিহাদের জন্য বের হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, বরং তারা প্রাসাদের আরাম-আয়েশ এবং আমোদ-প্রমোদের পূর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। এই পরিবর্তন আরামপ্রিয় খলিফাদের জন্ম দেয় যার ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

৯. বিদেশি নারীদের সাথে সম্পর্ক:

শরিয়তে অবশ্যই এমন খ্রিস্টান বা ইহুদি নারীদের সাথে বিবাহের অনুমতি রয়েছে যারা নিজেদের ধর্মে অটল থাকে, কিন্তু এতে সব অবস্থাতেই কয়েক ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। যেমন সাধারণ মানুষের জন্য এটি দেখা জরুরি যে এই নারীরা যেন সন্তানদের ধর্মহীনতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে শাসকদের জন্য এটি খেয়াল রাখা জরুরি যে এই নারীরা যেন রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রভাব বিস্তার না করে, তাদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের গোপন তথ্য বাইরে পাচার না হয় এবং তারা যেন কোনো বিদেশি এজেন্টের অধীনে শাহী হারেমে না পৌঁছায়।

উসমানীয় সুলতানরা ইউরোপ ও রাশিয়ার অনেক খ্রিস্টান ও ইহুদি নারীকে বিবাহ করেছিলেন। কখনো এর পেছনে কোনো রাজনৈতিক কৌশল কার্যকর থাকত (যেমন সংখ্যালঘুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন বা কোনো রাষ্ট্রের সাথে মিত্রতার সম্পর্ক জোরদার করা) এবং কখনো এই নারীদের রূপ-লাবণ্য বিবাহের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এমন কিছু নারী বিবাহের পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং কেউ কেউ নিজেদের পৈতৃক ধর্মেই অটল ছিলেন। সুলতান মুরাদ সানির স্ত্রী, যিনি সার্বিয়ার রাজার কন্যা ছিলেন, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টানই ছিলেন যাকে সুলতান মুরাদ...

তার মৃত্যুর পর তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর মা-ও খ্রিস্টান ছিলেন। এই নারীদের সম্পর্ক তাদের নিজেদের জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে বজায় থাকত। তাদের মধ্যে যারা কোনো রাজকীয় পরিবারের হতো, তারা নিজেদের পরিবারের রাজা ও আমিরদের সাথে যোগাযোগ রাখত। উসমানীয় সালতানাতেও খ্রিস্টানরা বড় সংখ্যায় বসবাস করত। এই নারীরা স্বাভাবিকভাবেই পুরনো খ্রিস্টান ঘরানার নারীদের সাথে বেশি পরিচিত হতো। এই সম্পর্কগুলো অনেক সময় বড় ধরনের গভীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণ হয়ে দাঁড়াত।

এই নারীদের প্রভাব তাদের সন্তানদের ওপরও পড়ত। তারা যদি তাদের খ্রিস্টান বানাতে না-ও পারত, তবুও তাদের মুসলিম ও খ্রিস্টানের ভেদাভেদ থেকে উদাসীন করার চেষ্টা অবশ্যই করত এবং তাদের সহনশীলতা বা মানবতার পাঠ দিত। যেহেতু তারা বংশগতভাবে অর্ধেক তুর্কি এবং অর্ধেক ইউরোপীয় হতো, তাই তাদের মধ্যে সেই জাতীয় আত্মমর্যাদা ও বীরত্বের অভাব থাকত যা সেই জাতির কওমের বৈশিষ্ট্য ছিল।

এই নারীরা এই চেষ্টাও পুরোপুরি করত যেন খাঁটি তুর্কি ও মুসলিম বংশের পরিবর্তে তাদের মিশ্র বংশের সন্তানরাই বাদশাহ হয়, চাই তাদের মধ্যে যোগ্যতা কমই কেন না থাকুক। এভাবে প্রাসাদে যে দ্বন্দ্ব শুরু হতো, তা অনেক সময় সালতানাতে রাজনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এই সিলসিলায় সুলাইমান কানুনির বেগম হুররামের উদাহরণ দেখে নেওয়া যথেষ্ট, যে নিজের ছেলে সেলিম সানিকে সিংহাসন পাইয়ে দেওয়ার জন্য যুবরাজ মোস্তফাকে হত্যা করিয়েছিল।

অনেক সময় খ্রিস্টান বেগমদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো না এবং মিশ্র বংশের বাদশাহও নিজের বাবার মনোযোগ এবং শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কারণে ইসলামের শ্রেষ্ঠ রক্ষক প্রমাণিত হতো। যেমনটা খ্রিস্টান মায়ের সন্তান সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতেহ-এর হাতে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল বিজিত হয়েছিল।

১০. উচ্চ লক্ষ্য সামনে না থাকা:

সুলাইমান কানুনির যুগে বনু উসমান এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল যে তাদের সামনে এখন আর কোনো চূড়া বাকি ছিল না যা তাদের হিম্মতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। কনস্টান্টিনোপল জয় করা হয়েছিল। সফবিদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। স্পেনের দস্ত চূর্ণ করা হয়েছিল। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এখন আর কেউ ছিল না। এমন অবস্থায় উসমানীয় সুলতানরা নিজেদের অবসরপ্রাপ্ত মনে করে নিলেন এবং এমন সব কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লেন যা অবসর সময়ের জন্য হয়ে থাকে। তাদের কোনো চিন্তা ছিল না যা তাদের ভবিষ্যতের কোনো পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত করত।

১১. আয়তনের বিশালতা, ব্যবস্থার স্থবিরতা:

উসমানীয় সালতানাতের আয়তন বিস্তৃত হতে হতে তিন মহাদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অতীতের ডজন ডজন দেশ এর প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। এত বড় সালতানাতকে সুসংহত রাখার জন্য শাসন ব্যবস্থাকে ক্রমাগত উন্নত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। উসমানীয় সালতানাত ছিল বিশ্ব ইসলামের জন্য একটি প্রাচীর স্বরূপ, বন্যার বাঁধের মতো। দেয়ালে ফাটল ধরলে তার মেরামত করা তেমন কঠিন নয় কিন্তু বাঁধ ভেঙে গেলে তাকে ধরে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। উসমানীয়রা শাসন ব্যবস্থার উন্নতির সেই ধারা সেখানেই থামিয়ে দিয়েছিল যেখানে সুলতান সুলাইমান কানুনি একে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

যদিও সময়ের সাথে সাথে এগুলোতে আধুনিক সংস্কারের কঠোর প্রয়োজন ছিল। ব্যবস্থার স্থবিরতার কারণে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হতে শুরু করে, নতুন প্রয়োজন মেটানোর পথ তৈরি হয়নি এবং সমস্যাগুলো বাড়তে বাড়তে সংকটের রূপ ধারণ করে।

১২. কিছু খলিফার অযোগ্যতা:

উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রথম সেলিমের শাসনামলে খিলাফতের লাগামও হাতে তুলে নিয়েছিল। এভাবে উসমানীয় বংশ কেবল তিনটি মহাদেশেরই নয়, বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অনেক সুলতান এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন, কিন্তু এত বড় খিলাফতের হক আদায় করার জন্য শাসকের অসাধারণ মাত্রায় যোগ্য, গতিশীল এবং তৎপর হওয়া জরুরি ছিল। এটা স্পষ্ট যে, এমন উচ্চতর যোগ্যতা কেবল উত্তরাধিকারের মাধ্যমে বজায় রাখা সম্ভব নয়, কারণ বংশগত উত্তরসূরিদের মধ্যে যোগ্য ও অযোগ্য সব ধরনের মানুষই থাকে। উসমানীয় খিলাফত যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ শাসক পেয়েছে, ততক্ষণ এর সূর্য মধ্যগগনে ছিল, কিন্তু মাঝখানে যখনই কয়েকজন অযোগ্য শাসক এলেন, এর ভারসাম্য নষ্ট হতে শুরু করল। এরপর অনেক ভালো শাসকের আশ্রয় চেষ্টাও একে পুনরায় আগের মতো শক্তিশালী করতে পারেনি।

১৩. ক্রুসেডারদের বিদ্বেষ ও হিংসা:

উসমানীয় সাম্রাজ্যের বন্ধু ছিল কম এবং শত্রু ছিল অসংখ্য। খ্রিস্টান ও ইহুদি বিশ্বের সেটিই ছিল প্রধান লক্ষ্য। ক্রুসেডার সাম্রাজ্যবাদ একে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। রোমের পোপ এবং ফ্রিম্যাসন রাবিরা এর বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। ইহুদি নেতারা গোপনে এর বিরুদ্ধে তৎপর ছিল, অন্যদিকে পোপের ইশারায় খ্রিস্টান দেশগুলো উসমানীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে যুদ্ধরত ছিল। শান্তির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিরতি ছাড়া, আমরা ইতিহাসের এই পাতাগুলোতে অধিকাংশ সময় যুদ্ধ আর যুদ্ধই দেখতে পাই। এই ধারাবাহিকতা সাম্রাজ্যকে দুর্বল করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন একে ধ্বংস করেই শান্ত হয়।

১৪. জ্ঞানগত ও কারিগরি দুর্বলতা:

উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইউরোপের সাথে সমানে সমান পাল্লা দেওয়ার জন্য যে জ্ঞানগত ও কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন ছিল, তার প্রতি সময়মতো মনোযোগ দেওয়া হয়নি। সুলতান তৃতীয় সেলিম কিছুটা দেরিতে এটি উপলব্ধি করেন এবং ফ্রান্সের সহায়তায় এই অভাব দূর করার চেষ্টা করেন, কিন্তু রক্ষণশীলতা তুর্কিদের মজ্জায় এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে তারা সেই সময় নিজেদের পথ পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। এর ফল এই দাঁড়াল যে, পরবর্তী শতাব্দীতে যখন সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ এবং সুলতান প্রথম আবদুল মজিদ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিলেন, ততক্ষণে ইউরোপ অনেক এগিয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষতিপূরণের কোনো উপায় ছিল না। এখন মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুকরণের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো, যা তাদের আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও পঙ্গু করে দিল।

১৫. যোগ্য ব্যক্তির অভাব:

বনু আব্বাসের পতন এবং বাগদাদের পতনসহ অবনতির প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি বড় দুর্ঘটনার পর আমরা মুসলমানদের পুনর্জাগরণের...

উসমানীয় সাম্রাজ্য এমন সব কর্মবীরদের কাছে ঋণী ছিল যাদের মধ্যে কেউ ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং কেউ রাজনৈতিক দিক থেকে। আমরা ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে আসছি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, উসমানীয় বংশের শেষ যুগটি ছিল এমন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের অভাবের সময়। দীন ও দুনিয়াকে সাথে নিয়ে চলার মতো এবং পশ্চিমা চিন্তাধারার সামনে বাঁধ দেওয়ার মতো কোনো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এই যুগে আবির্ভূত হননি। অথচ পশ্চিমে এই সময়টিই ছিল মহান ব্যক্তিত্বদের সামনে আসার সময়, যারা জাতিগুলোকে (চাই তা ভুল পথেই হোক) নিজেদের সাথে নিয়ে নিয়েছিলেন এবং বিশ্বে বিপ্লব আনতে সফল হয়েছিলেন।

(১৬) একটি ঈমানি ও নৈতিক দাওয়াত এবং ইসলামী আন্দোলনের অভাব:

উসমানীয় সাম্রাজ্যকে জীবিত ও টিকিয়ে রাখার জন্য শেষ দুই শতাব্দীতে একটি সার্বক্ষণিক ঈমানি, নৈতিক, ইলমি ও বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দাওয়াতি আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সেই মুসলিম প্রদেশগুলোকে নিজেদের মধ্যে সংযুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব ছিল যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করা হচ্ছিল। তাছাড়া অমুসলিম প্রদেশগুলোতেও ইসলামের দাওয়াতের ধারা শুরু করা যেত। কিন্তু এমন কোনো আন্দোলন আমাদের এই যুগে দেখা যায় না। সুলতান আব্দুল হামিদ সানি প্যান-ইসলামিজম আন্দোলন শুরু করে এই অভাব দূর করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

(১৭) বিদ্রোহী আন্দোলনসমূহ:

ইউরোপ উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রোহী আন্দোলনকে উসকে দিয়েছিল, সেগুলো সাম্রাজ্যকে পতনের চরম সীমায় পৌঁছে দেওয়ার একটি বড় কারণ ছিল। এগুলোর মধ্যে বলকান ও আর্মেনিয়ার বিদ্রোহগুলো ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক। সুলতানদের সমস্ত মনোযোগ ও শক্তি এগুলোর মোকাবিলা করতেই ব্যয় হতে থাকে এবং অন্যান্য অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো অবহেলিত হতে থাকে।

(১৮) গোপন দল ও সংগঠনসমূহ:

সাম্রাজ্যের শেষ কয়েক দশকে ইউরোপের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত গোপন দলগুলো সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিয়েছিল। এই দলগুলো আধুনিকতাবাদী তুর্কিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের আবেগকে উসকে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকেও নিজেদের অনুসারী বানিয়ে সুলতান আব্দুল হামিদ সানির শাসনের অবসান ঘটায়, যিনি ইউরোপীয় তাগুতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো শেষ অনন্য ব্যক্তি ছিলেন।

(১৯) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ইসলামী সাংবাদিকতার দুর্বলতা:

উসমানীয় সাম্রাজ্য পতনের যুগে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ধীরে ধীরে সংবাদমাধ্যমকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে ডজন ডজন সংবাদপত্র, সাময়িকী, ম্যাগাজিন এবং প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মানুষের অন্তর থেকে খেলাফতের ধারণা মুছে ফেলতে, উসমানীয়দের ইতিহাস বিকৃত করতে এবং তৎকালীন সুলতানদের চরিত্র হননে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা আধুনিকতাবাদী প্রবণতা এবং পশ্চিমা অনুকরণকে জাতির কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাছাড়া মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে দেশপ্রেমের জাদু ফুঁকে দেয় এবং তুর্কি ও আরবদের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

৩৫১ | তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা | খুলাফায়ে আজম

এই নাস্তিক্যবাদী ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত সংবাদমাধ্যমের মোকাবিলায় ইসলামী চিন্তাধারার ময়দানে যদিও বেশ কিছু যোগ্য ব্যক্তি কাজ করছিলেন, কিন্তু এই প্লাবনের তুলনায় তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য। ফলে উসমানীয় সাম্রাজ্য বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারার প্রভাবে একাত্মতা হারিয়ে বিশৃঙ্খলা ও পতনের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

২০. আরবিকে সরকারি ও জ্ঞানচর্চার ভাষা না করা:

উসমানীয় সাম্রাজ্যে সাধারণত তুর্কি ভাষাই প্রচলিত ছিল। জ্ঞানচর্চার কাজও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুর্কি ভাষাতেই হতো। আরবিকে গৌণ পর্যায়ে রাখা হয়েছিল। এই কারণে উসমানীয় তুর্কিদের সাথে মুসলিম বিশ্বের আলেম ও গুণীজনদের জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম ছিল। শুধুমাত্র মিশরে দুই শতাব্দীতে যে পরিমাণ জ্ঞানতাত্ত্বিক কাজ হয়েছে, তা উসমানীয় সাম্রাজ্যের কয়েক শতাব্দীর কাজের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত। কারণ তা আরবি ভাষায় এবং শতাব্দীকাল ধরে উম্মাহ তা থেকে উপকৃত হচ্ছে। উসমানীয় সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল এর উল্টো। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ খান এই পরিস্থিতি সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। আজও তুর্কিদের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাণ্ডারের একটি বড় অংশ পাণ্ডুলিপি আকারে আলেমদের মনোযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। এই ভাণ্ডারে হাদিস, তাফসির, ফিকহ (বিশেষ করে হানাফি ফিকহ) এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ওপর এত বেশি মূল্যবান উপাদান রয়েছে যে, সেগুলো যদি আরবিতে অনুবাদ করা হয় তবে একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি তৈরি হয়ে যাবে।

২১. বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ:

বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ উসমানীয় সাম্রাজ্যের সমাপ্তিতে চূড়ান্ত সিলমোহর লাগিয়ে দেয়। যুদ্ধে পরাজয় সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে তছনছ করে দেয় এবং বিশ্বশক্তিগুলো তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তুর্কিদের মাধ্যমেই খিলাফত বিলুপ্ত করে দেয়। [১]

এগুলো কিছু বাহ্যিক কারণ যা শিক্ষা হিসেবে লেখা হয়েছে। পরিশেষে সকল কারণের ধারা মুসাব্বিবুল আসবাব-এর ইচ্ছার ওপর গিয়ে শেষ হয়। তিনি যতক্ষণ চেয়েছেন, মুসলমানদের সম্মান ও শাসন ক্ষমতা দান করেছেন। যখন তাঁর ইচ্ছা রইল না, তখন কারণসমূহের ধারা আমাদের প্রতিকূলে চলে গেল এবং আমরা সুরাইয়া থেকে অতল গহ্বরে গিয়ে পৌঁছালাম।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“বলুন: হে আল্লাহ! আপনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক; আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন; আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” [২]

[১] এই কারণগুলো মূলত “তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া: আন-নাশা ওয়াল ইজদিহার” (সৈয়দ মুহাম্মদ) এবং “কিরাতাতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিল উসমানিয়িন” (যাকারিয়া সুলাইমান) থেকে নেওয়া হয়েছে।

[২] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ২৬।

ওসমানীয় সুলতানগণ এবং ভ্রাতৃহত্যা

বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য প্রভাবিত সাংবাদিকতা মূলত ওসমানীয় সুলতানদের বিরোধী এবং তাদের সমস্ত গুণাবলী উপেক্ষা করে শুধুমাত্র এই বিষয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে যে, কীভাবে মুসলমানদেরকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উসকে দেওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে এই সুলতানদের ওপর সবচেয়ে তীব্রভাবে যে অভিযোগ আনা হয় তা হলো, তাদের কাছে ভাইদের হত্যা করা একটি সাধারণ বিষয় ছিল এবং সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ একে একটি নিয়মিত আইনের রূপ দিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে যেকোনো বাদশাহ নিজের সিংহাসন সুরক্ষিত করার জন্য শাহজাদাদের হত্যা করাতে পারতেন। ফলে (দুই-চারজনকে ব্যতিক্রম রেখে) সকল ওসমানীয় সুলতান তাদের ভাইদের এমনকি ভ্রাতৃজাদের এবং কোনো কোনো সময় নিজেদের পুত্রদের পর্যন্ত নির্দিষ্ট হত্যা করতে থাকেন এবং স্বয়ং সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহও তার ভাইদের এমনকি এক দুগ্ধপোষ্য ভাইকেও এই আইনের অধীনে হত্যা করিয়েছিলেন।

এই সমস্যার প্রকৃত সত্য হলো:

সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ তার কোনো ভাইকে হত্যা করাননি। তার সমস্ত ভাই তার সিংহাসন আরোহণের পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন এবং দুগ্ধপোষ্য ভাইকে হত্যার কাহিনীটি নিছক বানোয়াট। [১]

আর সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর তৈরি করা আইনের ব্যাপারে বলা হয়েছিল:

“যখন আমার সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ সালতানাত লাভ করবে, তখন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তার ভাইদের হত্যা করা সমীচীন হবে। অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম এর অনুমতি দিয়েছেন, সুতরাং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব।” [২]

ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ তার ইতিহাসে এই ধারাটি পাশ্চাত্য উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন এবং এর অনুবাদ এভাবে করেছেন:

“আমার ফকিহদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ফতোয়া জারি করেছেন যে, আমার উত্তরসূরিদের মধ্যে যারা সিংহাসনে বসবেন, তারা বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বার্থে নিজ ভাইদের হত্যা করতে পারেন। তাদের কর্তব্য হবে এর ওপর অটল থাকা।” [৩]

আমাদের সামনে আইনের মূল পাঠ্য যা তুর্কি ভাষায় ছিল, তা উপস্থিত নেই যে আমরা এখানে শাব্দিক বিতর্ক করব। তবে আসল বোঝার বিষয় হলো সুলতানের আইনগুলো অনেকগুলো ধারার সমন্বয়ে গঠিত ছিল যা উলামা ও ফকিহদের তত্ত্বাবধানে তৈরি করা হয়েছিল। আইনের...

[১] এর বিস্তারিত বিবরণ আমরা সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর জীবনীর আলোচনায় বর্ণনা করেছি। সেখানে দেখে নেওয়া যেতে পারে।

[২] আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াতুল মাজহলাহ: পৃষ্ঠা ১৩১।

[৩] দাওলাতে উসমানিয়া, ডক্টর আজিজ: ১/১৩০, ফন হ্যামার থেকে উদ্ধৃত, কারিমি-এর বরাতে: ১/১৮২।

ব্যাখ্যা একটি সংবেদনশীল ও নাজুক বিষয়। কারো অধিকার নেই যে কোনো আইনের ইবারত বা তার অনুবাদ পড়ে নিজের ইচ্ছামতো তার ব্যাখ্যা করে দেবে, বরং এই কাজ আইন বিশেষজ্ঞের এবং অনেক বিষয় সামনে রেখে তা সম্পন্ন করা হয়।

প্রখ্যাত তুর্কি গবেষক জনাব ডক্টর আহমদ আক গুন্দুজ এবং জনাব ডক্টর সাঈদ ওজতুর্ক অনেক তথ্য ও প্রমাণের আলোকে উক্ত আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যা অধ্যয়নযোগ্য।

তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহে ভাইদের হত্যা সংক্রান্ত উল্লিখিত ধারার অর্থ মোটেও এটি ছিল না যে, কোনো সুলতান শরয়ী সীমা লঙ্ঘন করে কেবল অশান্তির সম্ভাবনা বা সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে হত্যা করতে পারবেন। বরং উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয় তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহীকে হত্যা করা যেতে পারে। একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি বাস্তবে সালতানাতের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে (গোপনে বা প্রকাশ্যে) লিপ্ত হয় তবে তাকে তা'যীর হিসেবে হত্যা করা যেতে পারে। তা'যীর বলতে এমন সাজা বোঝায় যা শরীয়ত নির্ধারণ করে দেয়নি বরং এর দায়িত্ব আরবাব-এ-হল ও আকদ-এর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কোথাও তা'যীরের ক্ষেত্রে ধমক বা তিরস্কারই যথেষ্ট হয় আবার কোথাও তা'যীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তও পৌঁছে যায় যেমন সমকামিতার তা'যীর এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ। শুধু আমাদের ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে নয় বরং বিশ্বের অধিকাংশ দেশের আইনে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যমান হুমকি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যুদণ্ডের সুযোগ রাখা হয়েছে।

সুতরাং উসমানীয় আইনসমূহে ভাইদের হত্যার অর্থ হলো একটি সাধারণ সমস্যার বিশেষ অবস্থার ব্যাখ্যা অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা হুমকির মুখে পড়ে তবে তাকে রাজনীতি ও তা'যীর হিসেবে হত্যা করা যেতে পারে এবং এই বিষয়ে নিকটাত্মীয় এমনকি পুত্র ও ভাইদের ওপরও এই চরম দণ্ড কার্যকর করা যেতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, যে দেশ তিনটি মহাদেশে বিস্তৃত এবং সব সময় বিদেশি রাষ্ট্রসমূহ তার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে, শাহজাদাদের প্ররোচিত করতে এবং আর্মীর ও কর্মকর্তাদের ক্রয় করতে সচেষ্ট থাকে এবং সেখানকার সুলতানগণ বারবার আপনজনদের বিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন এবং কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই বারবার হাজার হাজার প্রাণহানির দৃশ্য দেখা গেছে, তবে তারা এই ফিতনা বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন কঠোর করার ক্ষেত্রে অপারগ বিবেচিত হতে পারেন। এই ভিত্তিতেই বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাকে গুটিকয়েক ব্যক্তির জীবনের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ জাতীয় সাজাসমূহকে আইনি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। খোদ খিলাফতকে বিলুপ্ত করে আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠাকারীরা নতুন সংবিধানে মাতৃভূমির নিরাপত্তার সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ডের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেছে। [২]

যারা বলেন যে তা'যীর হিসেবে হত্যা করার কোনো সুযোগ নেই এবং উসমানীয় আইনের এই ধারাটি অনৈসলামিক বা বুদ্ধি ও প্রথার দিক থেকে এর কোনো যৌক্তিকতা নেই, তাদের দায়িত্ব হলো প্রমাণের সাথে নিজেদের দাবি সাব্যস্ত করা।

[১] দ্রষ্টব্য: আদ-দাওলাতুল উসমানিয়াতুল মাজহলাহ, ৩০৩ সওয়াল ও জওয়াব তুযিহ হাকায়িক গায়িবাহ আন আদ-দাওলাতিল উসমানিয়াহ: পৃ. ১২২ থেকে ১২৯, পৃ. ২৬৮, তাবা মাকতাবাতু আমর ও নূর।

[২] দেখুন: কাওয়ানিনে জাদিদ তুর্কি ধারা: ১২৫ থেকে ১৬৩।

এটি ছিল সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ-এর আইনের ব্যাখ্যা, যাকে বিরোধীরা সম্পূর্ণ ভুল অর্থে প্রচার করেছে। এই আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটি সবারই জানা যে, বাস্তব প্রয়োগ সর্বদা আইনের মূল চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ হয় না। কখনো এমন হয় যে, কোনো শাসক বা বিচারক কারো সাথে শত্রুতা মেটানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে আইনের অপব্যবহার করেন। কখনো আবার তিনি ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন।

উসমানীয়দের ইতিহাসে বায়েজিদ ইলদিরিম প্রথম উদাহরণ, যিনি অন্যদের প্ররোচনায় সন্দেহ ও সংশয়ে লিপ্ত হয়ে নিজের ভাই ইয়াকুবকে হত্যা করিয়েছিলেন। [১] দ্বিতীয় উদাহরণ হলো সুলতান সুলাইমান আল-শানের, যিনি যদিও ফকিহদের ফতোয়ার পর নিজের ছেলে মুস্তফাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে, সুলতানকে তার স্ত্রী হুররাম সুলতান প্ররোচিত করেছিলেন, অথচ মুস্তফা নির্দোষ ছিলেন। এখানে সুলতান এবং ফকিহগণও ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। [২]

এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যেখানে ভুল বোঝাবুঝি বা ভুল তথ্যের কোনো বিষয় ছিল না, বরং তা ছিল ব্যক্তিগত ক্রটি এবং নফসের অহংকার। যেমন তৃতীয় মুরাদ কর্তৃক তার পাঁচ ভাইকে এবং তৃতীয় মুহাম্মদ খান কর্তৃক উনিশ ভাইকে হত্যা করানো ছিল চরম জুলুম। এর কোনো বৈধতা ইসলামি শরিয়তে ছিল না এবং উসমানীয় আইনেও ছিল না। কিন্তু যেহেতু বাদশাহদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই তাদের জুলুম থামানো কারো সাধ্যে ছিল না।

তবে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে জুলুম ও বাড়াবাড়ির তকমা লাগানো সঠিক হবে না। যেমন সুলতান মুহাম্মদ চেলবির ভাই ঈসা ও মুসা রাজনৈতিক সংঘাত ও বিদ্রোহের কারণে নিহত হন। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ কর্তৃক তার ভাই মুস্তফাকে হত্যা করানোও একই ধরনের ছিল। দ্বিতীয় বায়েজিদ তার ভাই শাহজাদা জমশিদকে যে পরিস্থিতিতে বিষ প্রয়োগ করিয়েছিলেন, তা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় সেলিম তার দুই ভাই আহমদ ও কোরকুদকে বিদ্রোহী তৎপরতার কারণেই হত্যা করিয়েছিলেন।

মোদ্রাকথা, যেসব সুলতান জুলুম করেছেন, আমরা কখনোই তাদের পক্ষাবলম্বন করি না; কিন্তু যেসব সুলতান ফিতনা দমন এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অনিবার্য প্রয়োজনে এই কাজ করেছেন, তাদের দোষারোপ করাও মোটেও সঠিক নয়। বিশ্বের এমন কোনো সাম্রাজ্য কি আছে যার দরবারে ন্যায় ও অন্যায় সিদ্ধান্তের উদাহরণ পাওয়া যায় না? কিন্তু উসমানীয় সুলতানদের বেশি লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় এই কারণে যে, তারা শেষ যুগে মুসলিম বিশ্বের সীমান্তসমূহের একমাত্র পাহারাদার ছিলেন।

[১] আখবারুদ দাওলা: ১৫/৩

[২] এর বিস্তারিত বিবরণ সুলতান সুলাইমান আল-শানের আলোচনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

ওসমানী যুগের প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকগণ

শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনসারী রহ.: ৮২৩ হিজরি থেকে ৯২৬ হিজরি (১৪২০ খ্রি. থেকে ১৫২০ খ্রি.)

শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আনসারী রহ. মিশরের পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা সুনাইকাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত শাফেয়ী ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি জামিয়া আল-আজহারে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। শাইখুল ইসলাম জাকারিয়া আনসারী রহ. ফিকহ, তাফসির, হাদিস, তাজবিদ, ফারাজেজ, ইতিহাস ও সীরাতসহ অধিকাংশ ইলমে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১০২ বছর দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের শেষ বছরগুলো এভাবেই অতিবাহিত হয়।

শুরুতে তাঁর দারিদ্র্যের অবস্থা এমন ছিল যে, রাতের অন্ধকারে তিনি রাস্তা থেকে তরমুজের খোসা কুড়িয়ে নিতেন এবং তাতে লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতেন। অবশেষে এক আটা কল মালিকের নজরে তা আসে এবং তিনি তাঁর জন্য খাদ্যশস্য, পোশাক ও কিতাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর এমন এক সময় আসে যখন তিনি আলেমদের মুকুট হয়ে ওঠেন। সুলতান কাইতবে (৮৭২ হিজরি - ৯০১ হিজরি) এর ক্রমাগত অনুরোধে তিনি কায়রোর কাযিউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) নিযুক্ত হন। এখন ধন-সম্পদ ও খ্যাতি তাঁর পদচুম্বন করছিল। তাঁর দৈনিক আয় ছিল তিন হাজার দিরহাম, যা দিয়ে তিনি অসংখ্য কিতাব সংগ্রহ করেন। তিনি বিচারক হিসেবে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করতেন। সুলতানের কোনো পদক্ষেপ ইনসাফ পরিপন্থী মনে হলে তিনি তাঁকে চিঠি লিখে তা থেকে বারণ করতেন। সুলতান রাগান্বিত হয়ে তাঁকে পদচ্যুত করেন। এটি ৯০৬ হিজরির ঘটনা। কিছুকাল পর চোখের রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অন্ধ হয়ে যান। এই অক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁর ইলমি খিদমতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি কারণ তাঁর ইলম তাঁর সিনায় সংরক্ষিত ছিল। তিনি এই অবস্থায় বিশ বছর পর্যন্ত রচনা ও সংকলনের কাজ চালিয়ে যান এবং অত্যন্ত মূল্যবান রচনাবলির মাধ্যমে ইসলামের অসামান্য খিদমত করেন। বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘তুহফাতুল বারী’ তাঁর এক অনন্য কাজ। আলফিয়াতুল ইরাকীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘ফাতহুল বাকী’, ‘শারহুল গুররুল বাহিয়াহ’ (৫ খণ্ড) এবং রওজাতুত তালিবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘আসনাল মাতালিব’ (৩ খণ্ড) তাঁর ইলমি গভীরতা, সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক অধ্যয়নের প্রমাণ। শেষোক্ত কিতাব দুটি শাফেয়ী ফিকহের ওপর রচিত। উসূলে ফিকহে ‘গায়াতুল উসূল’ও তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। [১]

তিনি নিজের স্বাস্থ্যের খুব যত্ন নিতেন এবং নিজের শক্তি অনর্থক কাজে ব্যয় করতেন না, তাই শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল। একশ বছরের বেশি বয়স হওয়ার পরও তিনি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতেন।

যদিও আপনি উসমানীয় সালতানাতের সাথে যুক্ত ছিলেন না বরং আপনার জীবনের অধিকাংশ সময় মামলুক সুলতানদের শাসনামলে অতিবাহিত হয়েছে এবং আপনি সরকারি পদসমূহও তাদের পক্ষ থেকেই পেয়েছিলেন, তবে আপনার জীবনের শেষ বছরগুলোতে মিসর উসমানীয় সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে আপনার আলোচনা আলে উসমানের যুগের আলেমদের মধ্যে করা হয়েছে।

কাজী ইবনে কামাল পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি: মৃত্যু ৯৪০ হিজরি (১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ)
আহমদ বিন সুলাইমান ইবনে কামাল পাশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি উসমানীয় সালতানাতের প্রখ্যাত আলেমদের একজন ছিলেন। তিনি তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন। এদিরনে শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানকার কাজী নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে ইস্তাম্বুলের প্রধান মুফতি (সদর মুফতি) নিযুক্ত হন। তিনি প্রতিটি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফিকহ শাস্ত্রে ‘ঈযাহুল ইসলাহ’, উসূলে ফিকহে ‘তাগয়ীরুত তানকীহ’, ইতিহাসে ‘তারীখে আলে উসমান’ এবং আকায়েদ শাস্ত্রে ‘রিসালা ফীল জাবরি ওয়াল কদর’ তাঁর ইলমি নিদর্শন। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চল্লিশটির মতো ছোট ছোট পুস্তিকা রয়েছে যার সংকলন প্রসিদ্ধ। [১]

শায়খ আলাউদ্দিন মুত্তাকী হিন্দি রহমাতুল্লাহি আলাইহি: ৮৮৫ হিজরি থেকে ৯৭৫ হিজরি (১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দ)

আল্লামা আলী বিন হুসামুদ্দিন মুত্তাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বপুরুষদের সম্পর্ক ছিল জৌনপুরের সাথে। তিনি দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি দ্বীনি ইলমের পাশাপাশি তাসাউফেরও ইমাম ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইলম অর্জন এবং মাশায়েখদের থেকে উপকৃত হওয়ার পর আপনি বিভিন্ন শহরে সফর করে কামেল শায়খের সন্ধান খানেন। অবশেষে শায়খ হুসামুদ্দিন মুলতানি রহমাতুল্লাহি আলাইহির হালকায় शामिल হন (আপনার শায়খ আপনার পিতার সমনামীয় ছিলেন), দুই বছর তাঁর থেকে খুব উপকৃত হন।

আপনি মসজিদ বা খানকাহে অবস্থান করতেন না। যেখানে যেতেন ভাড়া বাসায় থাকতেন। আপনার কাছে সফরে দুটি থলে থাকত: একটিতে কিতাবাদি, অন্যটিতে আটা, ডাল, লবণ, মরিচ ও তেল। জঙ্গল থেকে কাঠ নিজেই সংগ্রহ করতেন, নিজের খাবার নিজেই রান্না করতেন, কারো থেকে অনিবার্য খেদমত নিতে হলে তাকে পারিশ্রমিক দিতেন।

কিছুকাল পর আপনার হারামাইন শরীফাইন সফরের শখ হলো। হিজাজ পৌঁছে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও মাশায়েখে সুলুকের থেকে উপকৃত হন। শায়খ ইবনে হাজার মাক্কী হাইতামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছেও হাদিস পড়েছেন যিনি বয়সে আপনার চেয়ে ছোট ছিলেন। কিন্তু আপনার এই উস্তাদ বাতেনি দৌলত অর্জনের জন্য আপনার কাছে বায়াত হন এবং ইজাজত ও খিলাফত লাভ করেন।

আপনি মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘ সময় পর আপনি হিন্দুস্তান সফরও করেন। সেখানে মানুষ আপনার ঘিয়ারতের জন্য এমনভাবে ভিড় করতে শুরু করল যে আপনাকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হতো। গুজরাটের শাহ মাহমুদ আপনার কামালিয়াতের বড় কদরদান ছিলেন। যখন তিনি আপনার হিন্দুস্তান উপকূলে আগমনের সংবাদ পেলেন তখন সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আপনি

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ১/১৩৩, ১৩৪।

নিষেধ করে দিলেন। একজন খাদেম কাজী আবদুল্লাহ সিন্ধী সুপারিশ করলে তিনি বললেন: “সুলতানের চালচলনে শরীয়ত বিরোধী কিছু বিষয় রয়েছে, যা দেখে আমি চুপ থাকতে পারব না।”

তারা বলল যে, আপনি এই শর্তে অনুমতি দিন যে তিনি শরীয়ত বিরোধী অবস্থায় দেখা করবেন না।

শেখ এর অনুমতি দিলেন। গুজরাটের শাহ এসে ঘিয়ারত করলেন এবং ফিরে গিয়ে এক কোটি মুদ্রা হাদিয়া পাঠালেন। শেখ সমস্ত অর্থ কাজী আবদুল্লাহ সিন্ধীকে দিয়ে দিলেন যে, তোমার কারণেই এটি পাওয়া গেছে, তোমাকেই মোবারকবাদ।

শাহ মাহমুদ গুজরাট এরপর প্রায়ই খিদমতে হাজির হতে লাগলেন। আপনি শরীয়ত বিরোধী যা কিছু দেখতেন, তাতে বাধা দিতেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তা মেনে নিতেন। শাহ মাহমুদ আপনাকে এত হাদিয়া দিলেন যে, যখন আপনি ফিরে এলেন তখন আপনি সম্পদশালী হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি সেই অর্থ দিয়ে হারামের কাছে একটি হাবেলী কিনলেন যেখানে হাদীসের হালকা বসত। আপনার বেশিরভাগ সময় এখানে দরস ও তাদরিস, কিতাব রচনা এবং দুর্লভ কিতাবসমূহ নকল করার কাজে ব্যয় হতো। ছাত্রদের জন্য কালি আপনি নিজেই তৈরি করতেন, এই কাজ প্রায়ই দরস চলাকালীন হতো। জিহ্বা ও মন দরসের দিকে নিবিষ্ট থাকত আর হাত দিয়ে কালি ঘষতেন। বলতেন যে, হাতকেও কাজ থেকে খালি রাখা উচিত নয়। আপনার হাবেলীতে সালেকীনদের জন্য অনেক কুঁড়েঘর ছিল। এই খানকাহে সালেকীনরা জিকির ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অধিকাংশ মুরিদ হিন্দুস্তান বিশেষ করে গুজরাট ও সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন।

নিজের কলমে কিতাব লিখে বিক্রি করা ছিল আপনার জীবিকার মাধ্যম। ধনীদের হাদিয়া ও সহযোগিতা থেকে বিমুখ ছিলেন। হাদিয়া কেবল গরীবদের থেকে গ্রহণ করতেন, তাও আবার যখন সেটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতেন।

সুলতান সুলাইমান আলিশানও আপনার সুখ্যাতি শুনে দোয়ার দরখাস্ত করেছিলেন।

একবার উসমানীয় সালতানাতের কোনো এক উজির অনেক পীড়াপীড়ি করে আপনাকে দাওয়াতে ডাকলেন। আপনি প্রথমে অস্বীকার করতে থাকলেন কিন্তু যখন কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুপারিশ করলেন তখন আপনি দাওয়াতে অংশগ্রহণের তিনটি শর্ত রাখলেন: যেখানে চাইব সেখানে বসব। যা চাইব তা খাব। যখন মন চাইবে উঠে চলে আসব। উজির একেই গণীমত মনে করলেন এবং রাজি হলেন। আপনি উজিরের হাবেলীতে তাশরীফ নিলেন এবং শাহী গালিচা ছেড়ে দরজার কাছে মাটিতে বসে পড়লেন। খাবার পরিবেশন করা হলে নিজের পকেট থেকে ঘরের রুগটি বের করে খেতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর আসসালামু আলাইকুম বলে ফিরে আসলেন।

উমারা ও কর্মকর্তাদের থেকে এত মানসিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও আপনি দ্বিতীয়বার গুজরাট গেলেন এবং শাহ মাহমুদকে জানালেন যে, আমি কেবল এজন্য এসেছি যাতে সালতানাতের ব্যবস্থাকে শরীয়তের কষ্টিপাথরে যাচাই করি, যা কিছু শরীয়ত বিরোধী হবে তা বন্ধ করে দেব।

শাহ আপনাকে পূর্ণ ইখতিয়ার দিয়ে দিলেন। আপনি নিজে সরকারি দপ্তরে যাওয়া পছন্দ করতেন না, তাই আপনার ঘনিষ্ঠ ছাত্র শেখ জিউ-কে নিজের উকিল হিসেবে এই মিশন অর্পণ করলেন। রাজ্যে ইসলামী আইন প্রয়োগের ফলে ঘুষ ও অন্যায়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে উমারা ও কর্মকর্তাদের অনেকের কাছে এটি অসহনীয় হয়ে উঠল। তারা এই সংস্কারমূলক অভিযানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করল। শেখ জিউ-এর সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তাকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে এল। নিজেদের পাকড়াও থেকে বাঁচাতে তাকে বড়...

বড় বড় ঘুষ পেশ করতে লাগল। এভাবে শেখ আলী মুত্তাকী রহ.-এর এই উকিল অল্প সময়ের মধ্যেই নিজে দুর্নীতিবাজ হয়ে গেল। উজির শেষ চাল চালল এবং এক মহিলাকে শেখের কাছে কোনো কাজের জন্য ঘুষ দিয়ে পাঠাল। শেখ চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সেই অর্থ গ্রহণ করে নিলেন। এখন উজির সুলতানকে খবর দিল যে, শেখ আলী মুত্তাকী রহ.-এর উকিল মানুষের কাছ থেকে ঘুষ নেয়। সুলতানের বিশ্বাস হলো না, তখন উজির সেই মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করল। মহিলার কাছ থেকে ঘটনা শুনে সুলতান শেখকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নির্বাক হয়ে গেলেন। সুলতান ব্যথিত হৃদয়ে সালতানাতের বিষয়াদি পুনরায় উজিরের হাতে সোপর্দ করে দিলেন।

শেখ আলী মুত্তাকী রহ. এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মান্বিত হলেন। আপনি হিজাজে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শাহে গুজরাট উমরাদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে মিনতি করলেন যেন আপনি এখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু আপনি মানলেন না। অবশেষে শাহে গুজরাট নিজে উপস্থিত হয়ে পুনরায় অনুরোধ জানালেন।

আপনি বললেন: “দ্বীন এবং দুনিয়া দুই সতীনের মতো। একজনকে সন্তুষ্ট করলে অন্যজন অসন্তুষ্ট হয়।”

পুনরায় বললেন: “মক্কায় দোয়া বেশি কবুল হয়। আমি সেখান থেকে আপনার জন্য দোয়া করলে তা বেশি কার্যকর হবে।”

আপনি নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে শেখ আব্দুস সামাদ রহ.-কে সুলতানের শরয়ী উপদেষ্টা বানিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন।

আপনি নিজে মোটা চালের খাবার খেতেন, অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। শরীর অত্যন্ত কৃশ ছিল। গ্রন্থ রচনা ও সংকলন এবং হাদিসের দরস প্রদানই ছিল আপনার কাজ। নামাজের জন্য মসজিদে হারামে যেতেন এবং শেষ কাতারে নামাজ আদায় করে দ্রুত খানকায় ফিরে আসতেন। এক বিশাল জগত আপনার কাছ থেকে হাদিসের ইলম অর্জন করেছে। এই দরসের ধারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারি ছিল এবং আপনার ছাত্রদের পরিধি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আপনার রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশ। আপনার হাদিস বিষয়ক মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো “কানযুল উম্মাল”, যাতে সাড়ে ৪৬ হাজারেরও বেশি হাদিস সংকলিত হয়েছে। এটি ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত।

আপনি সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। অধিকাংশ সময় অজু অবস্থায় থাকতেন। প্রত্যেকবার অজুর পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু নামাজ আদায় করতেন। শেষ বয়সে দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে চলাফেরা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আপনার দৈনন্দিন আমলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। মূত্রাশয় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, রাতে দশবার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যেতে হতো। প্রতিবারই অবসর হয়ে অজু করতেন এবং দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন।

আপনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। আপনার ছাত্রদের মধ্যে শেখ আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী রহ. অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, যিনি শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ.-এরও উস্তাদ ছিলেন।

আল্লামা তাশ কুবরী জাদাহ রহ. (৯০১ হি. থেকে ৯৬৮ হি. / ১৪৯৫ খ্রি. থেকে ১৫৬১ খ্রি.)

আহমদ বিন মুস্তফা রহ. একজন প্রখ্যাত তুর্কি ঐতিহাসিক, যিনি তাশ কুবরী জাদাহ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি বুরসায় জন্মগ্রহণ করেন, আঙ্কারায় লালিত-পালিত হন এবং শিক্ষা অর্জন করেন। তুরস্কের বিভিন্ন শহরে শিক্ষকতা করেন। ৯৫৮ হিজরিতে দারুল খিলাফত ইস্তাম্বুলে কাজী নিযুক্ত হন। এর দুই বছর পর অন্ধ হয়ে যান। এই অবস্থাতেই তিনি তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আশ-শাকায়িকুন নুমানিয়্যাহ ফী উলামা...” রচনা করেন।

“আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া”, “ইমলা কারায়ি”, “নাওয়াদিরুল আখবার”, “মিফতাহ্‌স সাআদাহ” এবং “মুতান্নিমু তারাজিম”ও তাঁর চমৎকার রচনাবলি। [১]

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ.: ৯৭০ হিজরি (১৫৬৩ খ্রি.)

আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. উসমানীয় সালতানাতের যুগে মিশরের সবচেয়ে বড় হানাফি আলেম ছিলেন। তিনি হানাফিদের প্রাচীন ফিকহি মূলপাঠ “কানযুদ দাকায়িক”-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আল-বাহরুর রায়িক” নামে লিখেছেন এবং এই বিষয়ের হক আদায় করেছেন।
উসুলে ফিকহ-এ “আল-আশবাহ ওয়ান নাযাইর” তাঁর দ্বিতীয় অতুলনীয় রচনা। [২]

শেখ আব্দুল ওয়াহাব শারানি রহ.: ৮৯৮ হিজরি থেকে ৯৭৩ হিজরি (১৪৯৩ খ্রি. থেকে ১৫৬৬ খ্রি.)

আব্দুল ওয়াহাব আশ-শারানি রহ. হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া রহ.-এর বংশধরদের মধ্যে একজন প্রখ্যাত সুফি বুজুর্গ ও আলেম ছিলেন। মিশরের কালশান্দ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচনাবলি প্রচুর, যার মধ্যে “লাওয়াকিহুল আনওয়ার” (আত-তাবাকাতুল কুবরা) অধিক প্রসিদ্ধ। এতে এক হাজার বছরের প্রখ্যাত আউলিয়াদের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি সংকলন করা হয়েছে। তাসাউফের প্রতিরক্ষায় তাঁর কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে “আল-আজউবাতুল মারদিয়্যাহ আন আইন্মাতিল ফুকাহা ওয়াস সুফিয়্যাহ”, “ইরশাদুত তালিবিন” এবং “বাহজাতুন নুফুস” তাঁর বিশ্বখ্যাত রচনাবলি। [৩]

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কি হাইতামি রহ.: ৯০৯ হিজরি থেকে ৯৭৪ হিজরি (১৫০৩ খ্রি. থেকে ১৫৬৭ খ্রি.)

আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজার হাইতামি রহ. মিশরের প্রখ্যাত গবেষক আলেম ছিলেন। জামিয়াতুল আজহার থেকে শিক্ষা লাভ করেন। মক্কায় অবস্থান করার কারণে মক্কি নামেও পরিচিত ছিলেন। আপনি হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ.-এর সমতুল্য বিবেচিত হতেন। বিদআতি ও রাফেজিদের খণ্ডনে “তাতহিরুল জানান” এবং “আস-সাওয়ায়িকুল মুহরিকা”-এর মতো কিতাবসমূহ আপনার কলম থেকে লিখিত হয়েছে। আপনি ইমাম নববীর ফিকহি মূলপাঠ “আল-মিনহাজ”-এর এক সুমহান ব্যাখ্যাগ্রন্থ “তুহফাতুল মুহতাজ” দশ খণ্ডে রচনা করেছেন, যা শাফেয়ি ফিকহের এক মূল্যবান উৎস হিসেবে গণ্য হয়। আপনার ফতোয়ার সংকলন “আল-ফাতাওয়াল হাদিসিয়্যাহ” চার খণ্ডে রয়েছে। শাফেয়ি হওয়া সত্ত্বেও আপনি হানাফি ফকিহদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। ইমামে আজম আবু হানিফা রহ.-এর জীবনী নিয়ে আপনার রচিত গ্রন্থ “আল-খাইরাতুল হিসান ফি মানাকিবি আবি হানিফাতান নুমান” আপনার গভীর পাণ্ডিত্যের সাক্ষী। [৪]

[১] মুজামুল মুফাসসিরিন মিন সদরিল ইসলাম হাভাল আহদিল হাযির, আদিল নুওয়াইহিজ: ১/৮৯, তাবা মুয়াসসাসাতু নুওয়াইহিজ, বৈরুত।

[২] আল-আলাম যিরিকলি: ৩/৬৪।

[৩] আল-আলাম যিরিকলি: ৪/১৮০, ১৮১।

[৪] আল-আলাম যিরিকলি: ১/২৩৩।

মোল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহ: মৃত্যু ১০১৪ হিজরি (১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দ)

হেরাতে জন্মগ্রহণ করেন, মক্কায় বসবাস করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। রচনার প্রাচুর্যের কারণে তিনি তাঁর সময়ের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। আপনি ইলমে হাদিসের অনেক বড় খিদমত করেছেন এবং এমন সব কিতাব রেখে গেছেন যা থেকে উম্মত আজ পর্যন্ত পুরোপুরি উপকৃত হচ্ছে। মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতুল মাফাতিহ আপনার ইলমি কামালের প্রমাণ। শরহ মুসনাদে আবি হানিফা এবং শরহুল শিফা-ও আপনার ইলমি শাহকার। বানোয়াট বর্ণনাগুলো যাচাই করার জন্য আপনি আল-আসরারুল মারফুআ ফিল আখবারিল মাওদুআ এবং আল-মাসনু ফি মারিফাতিল হাদিসিল মাওদু-এর মতো চমৎকার কিতাব লিখেছেন। [১]

শেখ মোস্তফা সবরি রহমাতুল্লাহ: ১২৮৬ হিজরি থেকে ১৩৭৩ হিজরি (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১২৮৬ হিজরিতে (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) আনাতোলিয়ার তোকাত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাসা জামে সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ-এ উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং শেখ মুহাম্মদ আতিফ ইস্তাখুলি রহমাতুল্লাহ ও শেখ আহমদ আসিম এফেন্দি রহমাতুল্লাহ-এর বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে গণ্য হন। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনশ আলেমের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় জয়ী হয়ে এই মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। সুলতান আব্দুল হামিদ সানি তাঁর খ্যাতি শুনে তাঁকে ইলদিজ প্রাসাদের কুতুবখানার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, যেখানে দুনিয়ার মূল্যবান ও বিরল কিতাবসমূহ সংরক্ষিত ছিল।

শেখ মোস্তফা সবরি রহমাতুল্লাহ সেই আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা প্রোপাগান্ডার শিকার হয়ে একটি উন্নত সরকারের আশায় সুলতান আব্দুল হামিদের পদচ্যুতির ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেছিলেন। পরবর্তীতে শেখের কাছে বাস্তবতা উন্মোচিত হয় এবং তিনি অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। তাঁর বক্তব্য ছিল: “সুলতানের পদচ্যুতির ছয় মাস পর আমি বুঝতে পারি যে, সুলতানের রাজনৈতিক ওজন পার্লামেন্টের সমস্ত সদস্যের রাজনৈতিক ওজনের সমান বরং তার চেয়েও বেশি ছিল।”

শেখ মোস্তফা সবরি রহমাতুল্লাহ সুলতান ওয়াহিদ উদ্দিন খানের শাসনামলে কিছু সময়ের জন্য শায়খুল ইসলাম এবং ছয় মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই মোস্তফা কামাল পাশার শাসনামল চলে আসে এবং সত্যবাদী আলেমদের জন্য তুরস্কে জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়। এমন পরিস্থিতিতে শেখ মোস্তফা সবরি রহমাতুল্লাহ দেশ ত্যাগ করে গ্রিসে চলে যান এবং সেখান থেকে তুর্কি ভাষায় একটি সাময়িকী প্রকাশ করে মোস্তফা কামালের ইসলাম বিদ্বেষ ও জাতির সাথে গাদ্দারির প্রমাণ দিতে শুরু করেন। মোস্তফা কামালের সরকার এটি সহ্য করতে পারেনি এবং তাদের চাপে গ্রিস শেখকে দেশান্তর করে দেয়।

শেখ কায়রোতে চলে আসেন। এখানেও পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে ছিল না কারণ এখানে আধুনিকতাবাদীদের প্রভাব ছিল যারা মোস্তফা কামালকে মিডিয়ার জোরে একজন বীর হিসেবে উপস্থাপন করছিল। শেখ এখানে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব “আন-নাকিরু আলা মুনকিরিন নিমাহ মিনাদ দ্বীন ওয়াল খিলাফাহ ওয়াল উম্মাহ” লেখেন। এই কিতাবটি প্রথমবারের মতো জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির নেতৃবৃন্দ, খেলাফতের শত্রু নেতা এবং বিশেষ করে মোস্তফা কামালের স্বৈরাচারী ও জালিম হওয়ার বাস্তবতা প্রকাশ করে দেয়। শেখ এই কিতাবে...

[১] আল-আলাম ঘিরিকলি: ১৩, ১২/৫

স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে যদিও কামালিপন্থীরা (মুস্তফা কামাল পাশার সমর্থক) জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির তুলনায় বেশি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো একই জিনিসের দুটি নাম। জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কি তুরস্কে মন্ত্রণালয় দখল করেছিল এবং কামালিপন্থীরা সালতানাতকে। জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির লোকেরা সেক্যুলার, যেখানে কামালিপন্থীরা প্রকাশ্য নাস্তিক।

শায়খ এই বইয়ে সেই সব বিপদ-আপদ, পরাজয় এবং ধ্বংসের কথা উল্লেখ করেছেন যা জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির হাতে তুরস্কের ওপর আপতিত হয়েছিল। শায়খ বলেছেন যে, ইত্তিহাদ ও তারাক্কির নেতারা সুলতান আব্দুল হামিদ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তুর্কি, আরব, কুর্দি এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বৈদেশিক রাজনীতিতে মারাত্মক পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং অপ্রয়োজনে বিশ্বযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজধানী ইস্তাম্বুল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

শায়খ মুস্তফা কামালের সাথে ইহুদিদের সম্পর্কের প্রমাণও পেশ করেছেন এবং বলেছেন যে, উসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মুস্তফা কামালের শুরু থেকেই গভীর সম্পর্ক ছিল কেবল ইহুদিদের সাথে। শায়খ আরও বলেছেন যে, জমিয়তে ইত্তিহাদ ও তারাক্কির গোপন বৈঠকগুলো ইহুদিদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। তাদের সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন অর্থমন্ত্রী জাভেদ পাশা ছিলেন একজন ইহুদি। একইভাবে কামালের শাসনামলের শিক্ষামন্ত্রী খালিদ জিয়ার সম্পর্কও ছিল ইহুদিদের সাথে। শায়খের এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার এক বছরও পার হয়নি যে, মুস্তফা কামাল খিলাফত বিলুপ্ত করে এবং ইসলামি নিদর্শনসমূহকে পদদলিত করে শায়খের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে দেন।

শায়খের বাকি জীবন মিশরে আধুনিকতাবাদীদের সাথে বিতর্ক, পশ্চিমের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মোকাবিলা এবং বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রতিরক্ষায় কলমী জিহাদ করে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর রচনাবলির মধ্যে “মাওকিফুল আকলি ওয়াল ইলমি ওয়াদ দ্বীনি মির রাব্বিল আলামিন” বাতিল মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি চমৎকার, অতুলনীয় এবং বিশাল কাজ যা চার খণ্ডে সমাপ্ত।

শায়খ ১৯৫৭ সালে (১৩৭৭ হিজরি) কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। [১]

আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি: ১২৯৩ হি. থেকে ১৩৮০ হি. (১৮৭৭ খ্রি. থেকে ১৯৬০ খ্রি.)

আল্লামা বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি ১৮৭৭ সালে (১২৯৩ হিজরি) পূর্ব আনাতোলিয়ার নুরস গ্রামের একটি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বংশগতভাবে কুর্দি ছিলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। কুরআন মাজিদের পাশাপাশি তাঁর অনেক আরবি কিতাব মুখস্থ ছিল। তিনি ধর্মীয় ও আধুনিক উভয় জ্ঞানে সমান পারদর্শী ছিলেন। তাফসির, হাদিস এবং ফিকহের পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোলেও তিনি অনন্য ছিলেন। তিনি পনেরো বছর পর্যন্ত “ওয়ান” শহরে শিক্ষকতা করেন।

আল্লামা নুরসির সুলতান আব্দুল হামিদ সানির ব্যক্তিগত রাজনৈতিক পদ্ধতির সাথে মতপার্থক্য ছিল। তিনি ১৯০৭ সালে ইস্তাম্বুল যান এবং নিজের অবস্থান তুলে ধরেন। সুলতানের কিছু খাদেম এই সমালোচনা সহ্য করতে পারেননি এবং আল্লামাকে আটক করেন, তবে শীঘ্রই

[১] আল-মুসলিহনা ফি তুর্কিয়া: পৃষ্ঠা ১১৪; মুস্তফা সাবরি আল-মুফাক্কির আল-ইসলামি, ডক্টর মুফরিহ বিন সুলাইমান আল-কাউসি, তাবা দারুল কলাম।

তারা আল্লামার ইখলাস সম্পর্কে বুঝতে পারলেন, তাই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এরপর আল্লামা সালানিক গিয়ে জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র নেতৃবৃন্দ এবং ফ্রিম্যাসনের গ্র্যান্ড মাস্টার ইমানুয়েল কারাসো-র সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং আলোচনা ও বিতর্ক করেন। কারাসো-র ধারণা ছিল যে সে আল্লামাকে নিজের সমমনা বানিয়ে নেবে, কিন্তু সে ব্যর্থ হলো। শীঘ্রই সে আল্লামার সাথে বিতর্ক ত্যাগ করে উঠে গেল। পরে সে বলেছিল:

“অল্পের জন্য এই অদ্ভুত ব্যক্তিত্বটি আমাকে মুসলমান বানিয়ে দিচ্ছিল।”

জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র নেতারা সুলতান আব্দুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে ১৯০৯ সালে নিজেদের সেকুলার সরকার কায়েম করলে তারা শরীয়ত প্রবর্তনের দাবি তোলা আলেমদের বেছে বেছে ফাঁসি দেয়। আল্লামাকেও ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে নিজেদের ইচ্ছামতো জবানবন্দি নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু আল্লামা সেখানে এমন দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য প্রদান করেন যে সবাই হতবাক হয়ে যায়। অবশেষে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সেই বছরই তিনি “আল-ইত্তিহাদ আল-মুহাম্মদী” নামে একটি রাজনৈতিক ও আধা-সামরিক জামাত গঠন করেন, যা জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র বর্ণবাদী রাজনীতির বিপরীতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দাওয়াত দিত। এই জামাতটি গোপনে খলিফা সুলতান মুহাম্মদ রশাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। এই জামাতের সদস্য সংগ্রহের জন্য আল্লামা ১৯১১ এবং ১৯১২ সালে উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ সফর করেন এবং সেখানে মুজাহিদদের দলও তৈরি করেন।

যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো, তখন আল্লামা সেই মুজাহিদদের সাথে আরজ-এ-রুমের কঠিনতম যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে শরিক ছিলেন। ১৯১৬ সালে যখন রাশিয়া আরজ-এ-রুম দখল করে, তখন আল্লামা গুরুতর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। দুই বছর চার মাস তিনি সাইবেরিয়ায় বন্দি ছিলেন। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হলে আল্লামা জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

তিনি পুনরায় তুরস্কে পৌঁছালে ১৯১৮ সালে তাঁকে দারুল হিকমাহ আল-ইসলামিয়াহ নামক প্রতিষ্ঠানের সদস্য করা হয়, যাতে তুরস্কের প্রখ্যাত আলেমগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লামা প্রতিষ্ঠানের বেতন থেকে কিছু অংশ নিজের জন্য এবং বাকি অংশ তাঁর বইগুলো ছাপানোর কাজে ব্যয় করতেন, যা তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। যখন বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর একটি চুক্তির অধীনে ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী ইস্তাম্বুলে মোতায়েন হলো, তখন আল্লামা এই পরিস্থিতির ওপর একটি রিসালাহ “আল-খুতুওয়াত আস-সিত্তাহ” লিখলেন। ব্রিটিশ সরকার এর বিষয়বস্তু সহ্য করতে পারেনি এবং এই রিসালাহটি বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করার নির্দেশ জারি করে।

১৯২২ সালে তাঁকে পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য ডাকা হয়। তিনি এটি দেখে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন যে, পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যই সালাত সম্পর্কে একেবারেই গাফেল ছিলেন। আল্লামা পার্লামেন্ট সদস্যদের সামনে সালাতের গুরুত্ব এমন কার্যকরভাবে বর্ণনা করলেন যে, ষাটজন সদস্য সালাত নিয়মিত আদায়ের অঙ্গীকার করলেন। এটি দেখে মোস্তফা কামাল অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং আল্লামাকে বললেন: “আপনি সালাতের উৎসাহ দিয়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।” আল্লামা উত্তর দিলেন: “বেনামাজি খায়েন হয় এবং খায়েনের শাসন নাজায়েজ।” মোস্তফা কামাল এটি দেখে আল্লামার কাছ থেকে রেহাই পাওয়া উত্তম মনে করলেন এবং তাঁকে পূর্বদিকের জেলাগুলোতে ওয়াজ ও ইরশাদের দায়িত্ব দিতে চাইলেন, কিন্তু আল্লামা তা গ্রহণ করেননি এবং ১৯২৩ সালে “ভান”-এ গিয়ে জিকির ও ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন।

হয়ে গেলেন। কিন্তু মোস্তফা কামালের সরকার তাকে সন্দেহের চোখে দেখছিল, তাই কিছুকাল পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। ১৯২৬ সালে তাকে “বারলা”-র শীতলতম অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তিনি চরম কষ্টের মধ্যে আট বছর অতিবাহিত করেন। এরপরও তিনি বিভিন্ন কারাগারে ছিলেন। এই সময়ে তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ বর্ণনা করতেন, তার ভক্তরা সেগুলো নকল করে বাইরে পাঠিয়ে দিতেন। এই প্রবন্ধগুলোর সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। সেগুলোকে “রাসায়েলুন নূর” বলা হতো। এগুলো নকল করা এবং ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে সতর্কতাবশত সেগুলো আল্লামা নূরসীর দিকে সম্বন্ধ করা হতো না।

আল্লামা নূরসী রহ. প্রায় বিশ বছর কারাবন্দী থাকার পর ১৯৫৩ সালে মুক্তি পান। সে সময় তার বয়স ৭৭ বছর হয়েছিল। ১৯৬০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার সাহস ও সংকল্প এবং রাসায়েলুন নূর-এর মাধ্যমে দিকনির্দেশনা তুর্কি জাতিকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। [১]

শাইখ মুহাম্মদ জাহিদ আল-কাওসারী রহ.: ১৮৭৯ খ্রি. থেকে ১৯৫২ খ্রি. (১২৯৬ হি. থেকে ১৩৯০ হি.)

শাইখ মুহাম্মদ জাহিদ আল-কাওসারী রহ. ১৮৭৯ সালে (১২৯৬ হিজরি) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সার্কাসীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি ইস্তাম্বুলের মাদ্রাসা জামে মুহাম্মদ ফাতিহ-এ শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখানেই শিক্ষক ও পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক হন।

যখন জমিয়ত ইত্তিহাদ ওয়া তারাক্কি-র সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তারা জামেয়ার পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় বিষয়গুলো কমিয়ে দিয়ে বেশিরভাগ আধুনিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করে। শাইখ জাহিদ আল-কাওসারী রহ. এটি গ্রহণ না করায় তাকে বরখাস্ত করা হয়।

মোস্তফা কামাল পাশার সরকার ১৯২২ সালে শাইখকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে, তবে তিনি একটি জাহাজে চড়ে আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছাতে সক্ষম হন। কিছু সময় এমনভাবে কাটান যে কখনো মিশরে থাকতেন আবার কখনো সিরিয়ায়। পরিশেষে কায়রোতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে সরকারি লাইব্রেরিতে তুর্কি পাণ্ডুলিপিগুলোকে আরবিতে অনুবাদ করার কাজ করতে থাকেন।

তিনি হানাফি ফিকহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবে গণ্য হতেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তার ছাত্রদের ওপর চমৎকার কাজ করেছেন এবং তাদের প্রতিরক্ষায় একাধিক বই লিখেছেন। এছাড়া তিনি কমবেশি একশটি ইলমি প্রবন্ধ লিখেছেন যা “মাকালাতুল কাওসারী” নামে প্রকাশিত হয়েছে। শাইখ রহ. ১৯৫২ সালে (১৩৯০ হিজরি) কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। [২]

শাইখ আবুল হুদা আস-সাইয়াদী রহ.: ১২৬৬ হি. থেকে ১৩২৮ হি. (১৮৪৯ খ্রি. থেকে ১৯০৯ খ্রি.)

শাইখ আবুল হুদা সাইয়াদী ১২৬৬ হিজরিতে (১৮৪৯ খ্রি.) সিরিয়ার মা’রা জেলার নিকটবর্তী “খান শাইখুন”-এ জন্মগ্রহণ করেন। তার...

[১] বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী, হযাতি ওয়া ওয়াকিয়াত, জুবায়ের গুন্দুজ আল্ল, মোস্তফা সুফুর, রেওয়ায়াতে ইসলাম, ২০১৯ খ্রি., আল-মুসলিহন ফি তুর্কিয়া, পৃ. ২৩ থেকে ৩৪।

[২] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৭/২৩৬, আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৬/১২৯ থেকে ১৩১।

আসল নাম ছিল মুহাম্মদ বিন হাসান। তিনি বংশগতভাবে হুসাইনী ছিলেন। তিনি হালাবে (আলেপ্পো) দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন এবং কয়েক বছর পর বিশিষ্ট আলেমদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তাকে ‘শাইখুল মাশায়েখ’ পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজের উপদেষ্টা বানিয়ে নেন। তার আন্তরিক পরামর্শ ও উপদেশ থেকে সুলতান অনেক উপকৃত হন এবং তাকে ‘মুস্তাশারুল মুলক’ উপাধি দেন।

শাইখ সাইয়াদী (রহ.) ‘আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া’ (প্যান-ইসলামিজম)-এর একজন শক্তিশালী প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তার লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে উম্মাহকে খিলাফতের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি ত্রিশ বছর উসমানীয় সালতানাতের সেবা করেন। তিনি একজন কবি, সাহিত্যিক ও লেখকও ছিলেন। সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের ক্ষমতাচ্যুতির পরপরই উসমানীয় সালতানাতের প্রতি আনুগত্যের কারণে শাইখকে দেশান্তর করা হয় এবং কয়েক মাস পর তিনি এই অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। [১]

আমীর শাকীব আরসালান: ১২৮৬ হিজরি থেকে ১৩৬৬ হিজরি (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ)

বিখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও রাজনীতিবিদ আমীর শাকীব আরসালান হীরা রাজবংশের বংশধর ছিলেন। তিনি ১২৮৬ হিজরিতে (১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন। শুরুতে কুরআন মাজীদ হিফজ করেন। এরপর বৈরুতের বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন। তিনি আরবি, ইংরেজি, তুর্কি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা রাখতেন। ইসলামী চিন্তাধারায় তার প্রশিক্ষণ শাইখ মুহাম্মদ আবদুহর দরসে অংশগ্রহণ এবং তার সাহচর্যের মাধ্যমে হয়েছিল। এছাড়াও তিনি আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানীর দ্বারাও বেশ প্রভাবিত ছিলেন।

তিনি ইসলামী ঐক্যের আহবায়ক, পশ্চিমা জীবনদর্শনের সমালোচক, সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী এবং উসমানীয় খিলাফত রক্ষায় অগ্রণী ছিলেন। তিনি তার প্রবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের তাদের গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়ে দিতে, তাদের বর্তমান পতনের কারণ সম্পর্কে সচেতন করতে এবং ইসলাম থেকে দিকনির্দেশনা নেওয়ার শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি আরব বিশ্বকে বিভেদ ও লক্ষ্যহীনতা থেকে বের করে আনতে এবং আরব যুবকদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির উচ্চতা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তার রচনাবলির মধ্যে তার চমৎকার কাব্যগ্রন্থ (দেওয়ান) ছাড়াও ‘আল-হুলালুস সুন্দুসিয়া’, ‘উরওয়াতুল ইত্তিহাদ’, ‘লিমাযা তাআখখারাল মুসলিমুন ওয়া তাক্বাদামা গাইরুহুম’, ‘তারিখু গাযাওয়াতিল আরব’ এবং ‘হাযিরুল আলামিল ইসলামী’ অনেক খ্যাতি লাভ করে।

তিনি টানা চল্লিশ বছর কাজ করেছেন এবং হাজার হাজার প্রবন্ধের পাশাপাশি অনেক চমৎকার বই লিখেছেন। এর পাশাপাশি তিনি একজন উচ্চমানের কবিও ছিলেন। কবিতা ও গদ্যে উচ্চমানের প্রচুর কাজের কারণে তিনি ‘আমীরুল বায়ান’ উপাধি পান এবং এ কারণেই সাধারণত তাকে ‘আমীর শাকীব আরসালান’ বলে স্মরণ করা হয়। তিনি হিজাজ, ইয়েমেন, মিশর, লিবিয়া, মরক্কো, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও আমেরিকাসহ বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রায় ৭৭ বছর বয়সে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে ইন্তেকাল করেন। [২]

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৬/৯৩; সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, লেখক: মুহাম্মদ হারব: পৃষ্ঠা ১৮৮, ১৯১।

[২] আল-আলাম লিয-যিরিকলী: ৩/৪৩, ১১৭; আমীরুল বায়ান শাকীব আরসালান, লেখক: আহমদ শারবাসী, তাবা দারুল কিতাব আল-আরাবি, মিশর।

মোস্তফা কামিল: ১২৯১ হিজরি থেকে ১৩২৬ হিজরি (১৮৭৪ খ্রি. থেকে ১৯০৮ খ্রি.)

প্রখ্যাত আইনবিদ ও সাংবাদিক মোস্তফা কামিল ১৮৭৪ সালে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলন্দাজ বাহিনীর প্রকৌশলী ছিলেন। মোস্তফা কামিল মাত্র তেরো বছর বয়সে মাস্টারি ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯ বছর বয়সে ফ্রান্সের তুলুজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের উচ্চতর শিক্ষা সম্পন্ন করেন এবং তাঁর মেধা ও যোগ্যতার কারণে তখনই খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৬ সালে সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ তাঁকে ইস্তাম্বুলে ডেকে পাঠান এবং উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জাগ্রত করার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সেই সময়ে মিশর ব্রিটিশ উপনিবেশের কবলে ছিল। মোস্তফা কামিলের হৃদয়ে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ছিল। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য আজীবন কলম যুদ্ধ চালিয়েছেন। তিনি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি “আল-লিওয়া” নামে আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা উপনিবেশবাদী চিন্তাধারা ও পশ্চিমা মতাদর্শের ওপর কঠোর আঘাত হানে। মোস্তফা কামিল তাঁর কলমের মাধ্যমে উপনিবেশবাদী অশুভ উদ্দেশ্যগুলো উন্মোচন করতে থাকেন। তাঁর অসামান্য সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান আব্দুল হামিদের পক্ষ থেকে তাঁকে খিলাফতে উসমানিয়ার উচ্চ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯০০ সালে তাঁকে “নিশানে মজিদি তৃতীয়” এবং ১৯০৩ সালে তাঁকে “নিশানে আমিরে মিরান” প্রদান করা হয়। মোস্তফা কামিলের সংক্ষিপ্ত জীবনের অধিকাংশ সময় ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। তাঁর অবস্থান কখনো মিশরে, কখনো ফ্রান্সে আবার কখনো ব্রিটেনে হতো। ১৯০৭ সালে মোস্তফা কামিল একটি রাজনৈতিক সংগঠন “আল-হিযবুল ওয়াতানি” এর ভিত্তি স্থাপন করেন, কিন্তু এর পরের বছরই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর। [১]

আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানি: ১২৫৪ হিজরি থেকে ১৩১৫ হিজরি (১৮৩৮ খ্রি. থেকে ১৮৯৭ খ্রি.)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত লেখক, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক ছিল আফগানিস্তানের সাথে। তিনি বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মিশর, ভারত, ইরান, লন্ডন ও প্যারিসে অবস্থান করার পর সবশেষে ইস্তাম্বুলে আসেন। তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখেছেন যার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা। [২]

[১] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৭/২৩৮; সুলতান আব্দুল হামিদ আল-সানি আজ মুহাম্মদ হারব: পৃ. ১৮৩ থেকে ১৮৮; মোস্তফা কামিল ফি মাহকামাতিত তারিখ লিত ডক্টর আব্দুল আজিম রমজান: পৃ. ১১ থেকে ৩৩, মাকতাবাতুল ইস্কান্দারিয়া।

দ্রষ্টব্য: মোস্তফা কামিল এবং মিশরীয় সাংবাদিক হাইকাল (১৮৬০-১৯০৮) সমসাময়িক ছিলেন। দুজনের কাজ এবং মৃত্যুর বছরও একই ছিল, শুধু বয়সের ব্যবধান ছিল চার বছর। দুনিয়া হাইকালের মেধা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় বিস্মিত হয়, অথচ মোস্তফা কামিলের মতো লেখক ও সাংবাদিকের এই বাস্তবতা ছিল যে, মুসলিম দুনিয়া তাঁর অবক্ষয় ও পতনের সময়েও তাঁর মতো মহান ব্যক্তিত্বের কোলে লালিত হয়েছিল।

[২] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ২/১২৬।

সুলতান আব্দুল হামিদের বর্ণনায় আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানির বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে অতিব্রান্ত হয়েছে, তাই এখানে কেবল ইশারা করা হয়েছে।

শেখ মুহাম্মদ আবদুহ: ১২৬৬ হিজরি থেকে ১৩২৩ হিজরি (১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)

শেখ মুহাম্মদ আবদুহ ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদদের একজন ছিলেন। তিনি তুর্কমেন বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জামিয়া আল-আজহার থেকে উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মিশরে প্রধান মুফতি ও বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফরাসি ভাষাতেও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার প্রবন্ধগুলো আরব বিশ্বসহ বিশ্বের সেরা সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত হতো। তিনি উন্মতে মুসলিমার ঐক্য ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন এবং খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতেন। তিনি ইসলামি শিক্ষা এবং উন্মতে মুসলিমার বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক সমস্যার ওপর অনেক কিছু লিখেছেন। তিনি জামাল উদ্দিন আফগানির চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাই তার লেখায় আধুনিকতাবাদের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। [১]

+++

মুহাম্মদ রশিদ রেজা: ১২৮৩ হিজরি থেকে ১৩৫৪ হিজরি (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ)

মুহাম্মদ রশিদ রেজা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে (১২৮২ হিজরি) উত্তর সিরিয়ার উপকূলীয় শহর ত্রিপোলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ সাংবাদিক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং দক্ষ ঐতিহাসিক ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিশরে আসেন এবং শেখ মুহাম্মদ আবদুহর বলয়ের সাথে যুক্ত হন। তার অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, তবে তিনি আধুনিকতাবাদের দিকে ঝুঁকেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি মিশরে “মাদরাসাতুদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ” প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সিরিয়ায় শাহ ফয়সাল বিন হসাইনের আমলে “আল-মুতামার আস-সুরি”-এর সভাপতিও ছিলেন। তবে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি পুনরায় মিশরে ফিরে আসেন, তখন মুসলিম বিশ্বে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। তিনি হিজাজ, ভারত ও ইউরোপেও গিয়েছিলেন এবং প্রতিটি স্থানের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি ইতিহাস, সাহিত্য, সমসাময়িক পরিস্থিতি এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যার ওপর প্রচুর লিখেছেন। তার সবচেয়ে বড় কাজ হলো “মাজাল্লাতুল মানার”, যা ৩৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি পবিত্র কুরআনের তাফসির লিখছিলেন, যার বারোটি খণ্ড সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫৪ হিজরি) মিশরে একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

[১] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ২৫২/৬

[২] আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ১২৬/৬, ১২৭

দ্রষ্টব্য: আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানি, শেখ মুহাম্মদ আবদুহ এবং শেখ রশিদ রেজা আধুনিকতাবাদী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে জমহুর ওলামাদের থেকে আলাদা মত পোষণ করতেন। জামাল উদ্দিন আফগানি এবং রশিদ রেজা তাদের ব্যাপক অধ্যয়ন এবং আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সত্ত্বেও মুকাল্লিদ ছিলেন না। শেখ মুহাম্মদ আবদুহ, যিনি হাদিসের শিক্ষক, মুফতি এবং বিশ্বের একজন মহান আলেম ছিলেন, তার আধুনিক চিন্তাধারার কারণে অনেক বিষয়ে জমহুর ওলামা, ফকিহ এবং বিচারকদের মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন এবং তার চিন্তাধারায় বৈপরীত্যও দেখা যায়। কখনো তাকে আশআরি এবং কখনো মূতাজিলি মনে হয়। কখনো কখনো এই ধরনের বৈপরীত্য আল্লামা জামাল উদ্দিন আফগানির চিন্তাধারাতেও দেখা যায় এবং সম্ভবত সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের সাথে জামাল উদ্দিন আফগানির মতপার্থক্যের এটিই ছিল বড় ও মৌলিক কারণ। এখানে জ্ঞান ও সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তালিকায় এই তিনজনের উল্লেখ করার অর্থ তাদের চিন্তা ও মতাদর্শের সাথে একমত হওয়া নয়। শুধুমাত্র এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল যারা সেই যুগে ইসলামি ফ্রন্টে কাজ করেছেন এবং মুসলিম বিশ্বে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। যেখানে এই আধুনিকতাবাদী ব্যক্তির মৌলিক বা শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে জমহুর ওলামাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন, সেখানে তাদের স্ব-উদ্ভাবিত মতামত ও চিন্তাধারা নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আন্দালুসের ইতিহাস

মুসলমানদের আগমন

থেকে

আন্দালুসের পতন পর্যন্ত

৯২ হিজরি থেকে ৮৯৭ হিজরি

৭১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ

৩৬৮ তারিখ-ই-ইসলাম

আন্দালুসের ভূগোল

আন্দালুসের ভূগোল সম্পর্কে অবগত হওয়া ছাড়া এর ইতিহাস পড়া বা বোঝা অত্যন্ত কঠিন। ইসলামী আন্দালুসের পতনের পর স্পেনের এলাকাগুলোর নামও এতটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে সেগুলোকে চেনা সহজ নয়। এজন্য জরুরি যে আমরা এখানে ভূগোলের ওপর এক নজর বুলিয়ে নিই। যেসব পাঠক স্পেনের ভূগোলের সাথে পরিচিত, তারা এই পাতাগুলো বাদ দিয়ে সরাসরি এই দেশের ইতিহাসের অধ্যয়ন শুরু করতে পারেন।

স্পেন বা আন্দালুস ইউরোপ মহাদেশের একটি ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপ যা পশ্চিমে পর্তুগাল এবং উত্তরে ফ্রান্সের সাথে যুক্ত। ইউরোপের অধিবাসীরা এই দেশকে স্পেন বা হিস্পানিয়া এবং আরবরা “আন্দালুস” নামে স্মরণ করে। দৈর্ঘ্য প্রায় এগারোশ এবং প্রস্থ প্রায় ছয়শ মাইল।

ভূমধ্যসাগর (বাহরে রুম) একে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। অন্যদিকে আটলান্টিক মহাসাগর (বাহরে ওকিয়ানুস) এর পশ্চিমে এবং উত্তরে আছড়ে পড়ছে। দেশের দক্ষিণ উপকূলে ভূমধ্যসাগর সংকীর্ণ হয়ে একটি ছোট উপসাগরে পরিণত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিশেছে। একে জিব্রাল্টার প্রণালী (Strait of Gibraltar) বলা হয়।

দেশের উত্তরে অর্ধেক অংশ বিস্ফে উপসাগরের সাথে যুক্ত। অর্ধেক অংশ শুষ্ক ভূমি যা পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালার দুর্গম পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এবং ফ্রান্সের সাথে গিয়ে মিলেছে। এই পর্বতমালাকে “কোহে বারানস”ও বলা হয়।

দক্ষিণ উপকূল:

আন্দালুসের দক্ষিণ উপকূলের মনোরম তীর এবং আল-খায়রা-এর মতো দ্বীপগুলোর সজীবতা ও সতেজতা মানুষকে মুগ্ধ করে। সেবতা, কাদেশ, হালব এবং ওলবার মতো সুন্দর উপকূলীয় জনপদগুলো এখানেই অবস্থিত। দক্ষিণ উপকূলে সবচেয়ে বড় শহর হলো মালাকা, যার জেলায় রিয়া, আরশদুনাহ এবং মুরবিলা অন্তর্ভুক্ত।

ভূমধ্যসাগর থেকে ৬৬ কিলোমিটার দূরে, মালাকার উত্তর-পশ্চিমে ওয়াডিউল কাবীর নদীর তীরে “ইশবিলিয়াহ” (Seville) দেখা যায়। ইশবিলিয়াহ প্রদেশের অধীনে কারমোনা (Carmona), আশুনা এবং হিসনুল ফারাজ-এর জনপদগুলোও রয়েছে।

দক্ষিণ উপকূল থেকে ৫২ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি শহর “গ্রানাডা” (Granada) অবস্থিত, যা জেনিল (Genil) নদীর তীরে...

অবস্থিত। এই এলাকাটি আগে “এলবিরা” নামে পরিচিত ছিল, চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে যখন “গ্রানাডা” আবাদ হলো তখন “এলবিরা” এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

গ্রানাডা থেকে ২৫ মাইল পশ্চিমে “লোশা” (Loja) অবস্থিত, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্বে সিয়েরা নেভাদা (Sierra nevada)-এর বরফাবৃত চূড়াগুলো রয়েছে। একে জাবাল আল-হালজও বলা হয়। এই পর্বতশৃঙ্গের একটি অংশ হলো “জাবাল শালির”, যা আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল বরাবর প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সিয়েরা নেভাদা পর্বতের ঢালে গ্রানাডার বিখ্যাত শহর ওয়াদি আশ (Guadix) অবস্থিত, যার পাদদেশে আশ নদী প্রবাহিত হয়। সিয়েরা নেভাদার চূড়াগুলোর পূর্বে “জাবাল আল-বাসারাত” অবস্থিত, যার কাছে ভূমধ্যসাগরের বন্দর “আলমেরিয়া” রয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা:

পূর্ব উপকূলে বিখ্যাত বাণিজ্যিক শহর “বালানসিয়া” (Valencia) অবস্থিত। শাতিবা (Jativa), শাকর (Alcira), দানিয়া (Dania) বন্দর, শাকুরা (Segura) এবং “লাকান্ত” (Al-icante) হলো বালানসিয়ার অন্তর্ভুক্ত জেলা। পূর্ব উপকূলেই “কার্টাজেনা” (Qartajanna) বন্দর অবস্থিত। এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হলো “মুরসিয়া”, যা উপকূল থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শাকুরা নদীর তীরে অবস্থিত এই অত্যন্ত উর্বর এলাকাটি তার বাগানগুলোর জন্য বিখ্যাত। মুরসিয়া থেকে ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে “আল-হামা” (Alhama) অবস্থিত। তাদমির এবং লোরকা (Lorca)-ও এই জেলার অন্তর্ভুক্ত।

মধ্যাঞ্চলীয় এলাকা:

আন্দালুসের মধ্যাঞ্চলে সবচেয়ে বড় শহর হলো “কর্ডোভা” (Cordoba), যা কয়েক শতাব্দী ধরে এখানকার রাজনৈতিক কেন্দ্র এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান উৎস ছিল। এটি ওয়াদি আল-কাবির নদীর তীরে অবস্থিত। কর্ডোভার উত্তরে ২৯৪ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন গথ শাসকদের রাজধানী “তোলেদো” (Madrid) অবস্থিত, যা উপদ্বীপের একেবারে কেন্দ্রে। এটি বর্তমান স্পেনেরও রাজধানী। এর চারপাশে বাগান এবং খালের জাল বিছানো রয়েছে। তোলেদোর উত্তরে “আল-শারাত” (Mont des Sierra)-এর বিশাল পর্বতমালা রয়েছে, যা তার সজীবতা ও শ্যামলিমার কারণে ভেড়া ও ছাগলের এক বিশাল চারণভূমি। এটি মাদিনাত সালিম (Medinaceli) থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে পর্তুগাল সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। তোলেদো ছাড়াও এই জেলায় তালাবেরা (Talavera), “আল-ফাহমিন” (Alafmin) এবং “ওয়াদি আল-হিজারা” (Guadalajarra) এলাকাগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

জাবাল আল-শারাতের উত্তরে অন্তহীন পর্বতমালা রয়েছে যেখানে কটর নাসরানি বাসিন্দাদের রাজ্য কাস্তিল, লিওন এবং আস্তুরিয়াস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নাসরানিরা “আন্দালুস” নামটি সেই মুসলিম শহরগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করত যা “জাবাল আল-শারাত”-এর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। আজও স্পেনে গ্রানাডা, মালাগা, সেভিল এবং কর্ডোভা নিয়ে গঠিত দক্ষিণাঞ্চল “আন্দালুসিয়া” নামে পরিচিত। তোলেদো থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আনা নদীর তীরে “মারিদা” নামক সুদৃঢ় শহরটি অবস্থিত এবং এর থেকে ৩০ মাইল পশ্চিমে পর্তুগাল সীমান্তে “বাদাজোজ” (Badtoz) অবস্থিত। এর থেকে আরও পশ্চিমে গেলে...

তাজো নদীর তীরে “আল-কান্তারা” নামক শহরটি অবস্থিত, যেখান থেকে পর্তুগালের সীমান্ত মাত্র সাত মাইল দূরে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল:

দেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলে “বার্সেলোনা” সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর, অন্যদিকে জাবাল আল-বারতাত (Pyrenees)-এর দক্ষিণ ঢালে জনবহুল শহর “সারগোসা” অবস্থিত, যা ইব্রো নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর তীরেই ভূমধ্যসাগরের কাছে মারবেল পাথরের খনির জন্য বিখ্যাত শহর “তোরতোসা” (Tortosa) অবস্থিত। সারগোসার উত্তরে ৩৫ মাইল দূরে “উশকা” (Osea) নামক একটি শহর রয়েছে, অন্যদিকে উত্তর-পূর্বে দুর্গম চূড়ার ওপর “বারবাস্তুর” (বারবাস্ত্রো) নামক একটি দুর্গ রয়েছে।

উত্তরাঞ্চল:

উত্তর স্পেনের পাঁচটি বিখ্যাত প্রদেশ হলো:

- (১) লিওন (Leon): এর রাজধানী হলো সামোরা (Zamora), যা ডুয়েরো নদীর তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর হলো “সালামানকা” (Salamanca), যা টামস নদীর তীরে অবস্থিত।
- (২) কাস্তিল (Castilla): এতে কাস্তিল ছাড়াও শাতুবিয়া, বারগুশ, আশতাত আসতিন এবং গারমাজ-এর দুর্গগুলো বিখ্যাত ছিল।
- (৩) বাশকানস (Bosques): বাশকানস শহরটি বিস্কে উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এই উপসাগরকে ইংলিশ চ্যানেলও বলা হয়। বাশকানস-এর পুরো এলাকাটি পাহাড়ি ও উপকূলীয়। সাখরা বালাই (Compostela), আস্তুরিয়াস, কান্তাব্রিয়া এবং “আলাভা” (Alava) এখানকার বিখ্যাত শহর।
- (৪) গ্যালিসিয়া (Galacia): এটি উত্তর-পশ্চিম স্পেনের একটি পাহাড়ি প্রদেশ যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত, এর পশ্চিমের পাহাড়গুলো সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। করুনা, শিন্ত মানকাশ, শিন্ত ইয়লা ইয়া ওয়া দিকিস্তান, লগরুনিয়া এবং সেন্ট ইয়াকুব (সান্তিয়াগো) এর গুরুত্বপূর্ণ জনপদ।
- (৫) নাবরা বা নাভার রাজ্য (Navarra): স্পেনের একদম উত্তরে অবস্থিত এই রাজ্যটি পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালার পূর্ব ও পশ্চিম সারির মাঝখানে অবস্থিত। এখান থেকে ফ্রান্সের দিকে তিনটি মহাসড়ক চলে গেছে, তাই এর গুরুত্ব অনেক বেশি। নাভার রাজ্যের রাজধানী হলো “পামপ্লোনা” (Pamplona), যা বিখ্যাত রোমান শাসক পম্পেই নতুন করে নির্মাণ করেছিলেন। ভিগভেরা (Vigvera), নাতেরা (Natera) এবং বায়োন (Bayonne)-ও এর শহর। বায়োন ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলের সাথে মিশেছে এবং ফ্রান্সের দিকে একটি মহাসড়ক এখান থেকে চলে গেছে।

স্পেন থেকে ফ্রান্সের পথসমূহ:

প্রাচীন যুগে স্পেন থেকে ফ্রান্সে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। মাঝখানে পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালা অবস্থিত যাতে সেই সময়ে মাত্র চার বা পাঁচটি গিরিপথ ছিল যার মধ্য দিয়ে এক সময়ে কেবল একজন অশ্বরোহী প্রবেশ করতে পারত। প্রতিটি গিরিপথ মাইলের পর মাইল দীর্ঘ ছিল এবং এর ডানে ও বামে পাহাড়ের ওপর নাসারাদের বসতি ছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ এই গিরিপথগুলোকে “আবওয়াব” বলতেন। বুরতাত, বুরত-এর বহুবচন, আসলে এটি লাতিন শব্দ “পোর্ট” (port) থেকে এসেছে যার অর্থ হলো পথ বা বন্দর।

এই আবওয়াবগুলোর মধ্যে প্রথম গিরিপথটি বার্সেলোনার উত্তরে “জাকা” (Jaca) শহরের কাছে ছিল যাকে “বুরত জাকা” বলা হতো। বর্তমানে একে (Perpignan) বলা হয়। এখান থেকে ফ্রান্সের শহর: জিরোনা (Gerona) এবং “আরবোনা” পর্যন্ত রাস্তা গিয়েছে।

এর থেকে কিছু দূরত্বে দ্বিতীয় গিরিপথটি ছিল “বুরত আশবারাহ” যা (Port Asperi) বা (Somport) নামে পরিচিত।

তৃতীয় গিরিপথ “বুরত শিজরো” (Port Cisereus) জাবলোনার কাছে ছিল। এটি ৩৫ মাইল দীর্ঘ ছিল। একে “রোনসেভালেস”ও বলা হতো। এটি ফ্রান্সের শহর “সেন্ট জিন” (saint jean) পর্যন্ত গিয়েছে। আবদুর রহমান আল-গাফেকি ১১৪ হিজরিতে এই পথেই ফ্রান্স আক্রমণ করেছিলেন। এছাড়া ফ্রান্সের রাজা শার্লম্যান ১৬১ হিজরিতে এখান থেকেই স্পেনে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

চতুর্থ গিরিপথটি ছিল “বুরত বায়োন” (Bayonne)। এটি ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের একটি শহর। স্পেনের উত্তরের শহর তুলুসা (Tolosa) থেকে রাস্তা এখানে পর্যন্ত গিয়েছে। পঞ্চম গিরিপথটি হলো “পুইগসার্দা” (Puigcerda) যা “সারদানিয়া” (Cerdana)-র কাছে অবস্থিত।

পশ্চিম অঞ্চলসমূহ:

স্পেনের পশ্চিমে পর্তুগাল অবস্থিত, আগে এটিও স্পেনের একটি প্রদেশ ছিল। লিসবন (Lisbon) এর রাজধানী যা থেকে ১২ মাইল উত্তরে “শিন্ত্রা” অবস্থিত, এই অঞ্চলেই তাজা নদীর তীরে “কাসরিন” রয়েছে। পর্তুগালে সমুদ্র উপকূলে সান্তা মারিয়া (Santa Maria)-র প্রাচীন বন্দর রয়েছে। ফালতোরিয়াও এই প্রদেশেই অবস্থিত।

ইসলামী আন্দালুসের বিভিন্ন যুগ

ইসলামী আন্দালুসের ইতিহাস আটটি শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত। এই সময়ে এই দেশের ওপর দিয়ে অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। অনেকবার এমন মনে হয়েছে যে এখন এখান থেকে ইসলামী শাসনের অবসান ঘটতে চলেছে। কিন্তু প্রতিবারই কুদরত-ই-ইলাহিয়া কোনো বিকল্প শক্তি পাঠিয়ে এখানকার মুসলমানদের নতুন জীবন দান করেছেন। মুসলমানরা আট শতাব্দী পর্যন্ত এখানে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন করেছেন কিন্তু এত দীর্ঘ সময়েও তারা একে কখনো পূর্ণাঙ্গ ইসলামী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হননি। উত্তর আন্দালুসের এলাকা অধিকাংশ যুগে স্বাধীন ছিল এবং সেখানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নাসারা শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে।

আন্দালুসের ইতিহাস শিক্ষণীয়ও বটে এবং ইবরতপূর্ণও। এর পাশাপাশি এটি বেশ জটিল এবং প্যাঁচানোও। আমরা এখানে এর আলাদা আলাদা যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করছি যাতে পরবর্তীতে প্রতিটি যুগের অধ্যয়ন সহজ মনে হয়।

প্রথম যুগ: বিলাত যুগ: ৯৫ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি (৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগ আন্দালুস বিজয়ের সমাপ্তির পর শুরু হয় এবং ১৩২ হিজরি পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এই যুগে এখানকার শাসনব্যবস্থা সিরিয়ার উমাইয়া খলিফাদের অধীনস্থ আমিরদের হাতে ছিল যাদেরকে ওয়ালি বলা হতো। তাদের মধ্যে প্রথম ওয়ালি ছিলেন আব্দুল আজিজ বিন মুসা এবং শেষ ওয়ালি ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান ফিহরি। ১৩২ হিজরিতে সিরিয়ার উমাইয়া খিলাফত শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এখানে বিলাতের আইনি মর্যাদাও শেষ হয়ে যায় এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় যা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় যুগ: বনু উমাইয়া আমিরাত: ১৩৮ হিজরি থেকে ৪২২ হিজরি (৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

এই যুগের সূচনা বনু উমাইয়া রাজপুত্র আমির আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের আন্দালুস বিজয়ের মাধ্যমে হয়েছিল এবং সমাপ্তি ঘটে হিশাম আল-মু'তাদ-এর মাধ্যমে। আব্দুর রহমান আদ-দাখিল আন্দালুসে এসে এই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং স্বাধীন উমাইয়া সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা ২৮৫ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। এই বংশের অষ্টম শাসক আমির আব্দুর রহমান আস-সালিস (তৃতীয়) খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন যার পর এখানকার প্রত্যেক শাসককে খলিফা বলা হতো থাকে।

৩৬৬ হিজরিতে দশম শাসক হিশাম মুয়ায়্যিদ বিল্লাহর সিংহাসন আরোহণের সাথে সাথেই একজন শক্তিশালী আমির ইবনে আবি আমির কার্যত শাসনভার নিজে গ্রহণ করেন যার পর উমাইয়া খলিফার মর্যাদা কেবল নামমাত্র থেকে যায়। কিছুকাল ইবনে আবি আমিরের বংশধররা খলিফাদের অভিভাবক এবং কার্যত শাসক হিসেবে থাকে। এরপর বনু হামুদ তাদের ওপর চেপে বসে। এভাবে আন্দালুসের খলিফারা প্রায় ৫৭ বছর ক্ষমতাহীন হয়ে অতিবাহিত করেন।

তৃতীয় যুগ: মুলুকুত তাওয়াইফ: ৪০০ হিজরি থেকে ৪৮৩ হিজরি (১০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

আন্দালুসের উমাইয়াদের পতনের সাথে সাথেই আন্দালুসে মুসলিম আমিররা জায়গায় জায়গায় স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করতে শুরু করেন। এই শাসকরা মুলুকুত তাওয়াইফ নামে পরিচিত হন। তাদের মধ্যে বনু জাহওয়ার, বনু জুহরি, বনু হুদ, বনু আফতাস, বনু যিন-নুন এবং বনু আব্বাদ বিখ্যাত ছিল। পৌনে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। তাদের বিশৃঙ্খলা এবং অদূরদর্শিতা আন্দালুসে খ্রিস্টানদের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ণ সুযোগ করে দেয় যার ফলে এখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশঙ্কা তৈরি হয়।

চতুর্থ যুগ: মুরাবিতুন: ৪৮৩ হিজরি থেকে ৫৪১ হিজরি (১০ movie৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

আন্দালুসের মুসলমানদের প্রাণ ওষ্ঠাগত দেখে মরক্কোর শাসক ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসে হস্তক্ষেপ করেন এবং এখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে মুসলমানদের এক নতুন জীবন দান করেন। এই শাসন ৫৬ বছর স্থায়ী হয়। এর শেষ শাসক তাশফিন বিন আলী মুওয়াহহিদুনদের হাতে নিহত হন।

পঞ্চম যুগ: মুওয়াহহিদুন: ৫৪১ হিজরি থেকে ৬২৯ হিজরি (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

মুওয়াহহিদুনরা ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শুরুতে আফ্রিকায় শক্তি সঞ্চয় করে এবং ধীরে ধীরে মুরাবিতুনদের ওপরও বিজয়ী হয়।

মুওয়াহহিদুনদের প্রথম শাসক ছিলেন আবদুল মুমিন এবং সর্বশেষ ছিলেন মুহাম্মদ আন-নাসির। আন্দালুসে তাদের শাসন ৮৪ বছর স্থায়ী ছিল। মুওয়াহহিদুনদের পর আন্দালুসে মুসলমানদের কাছে কেবল কয়েকটি দক্ষিণীয় শহর অবশিষ্ট ছিল, যাদের সমষ্টিকে আন্দালুস সুগরা বলা হতো।

ষষ্ঠ যুগ: আন্দালুস সুগরা; গ্রানাডার বনু নাসর: ৬৩৯ হিজরি থেকে ৮৯৮ হিজরি (১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ)

আন্দালুস সুগরায় মুসলমানদের সর্বশেষ ঘাঁটি ছিল গ্রানাডা, যেখানে বনু নাসর বংশের শাসন ছিল। এই শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ওরফে ইবনুল আহমার, আর সর্বশেষ শাসক ছিলেন আবু আবদুল্লাহ। এই শাসন ২৬৯ বছর পর্যন্ত কায়েম ছিল। পরিশেষে খ্রিস্টানরা এটিও দখল করে নিয়ে আন্দালুসের আটশ বছরের ইসলামী ইতিহাসের অধ্যায় সমাপ্ত করে দেয়।

আন্দালুসের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমরা এই অঞ্চলের ইতিহাসের নিয়মিত অধ্যয়ন শুরু করছি।

৩৭৪

তারিখে মিল্লাতে ইসলামিয়া

দ্বিতীয় খণ্ড

আন্দালুসের প্রাচীন ইতিহাস

আন্দালুসের প্রাচীন অধিবাসীদের সম্পর্ক ছিল ‘সেল্ট’ নামক একটি জাতির সাথে যারা ফ্রান্স থেকে এসেছিল। তারা ছাড়াও আরও দুটি জাতি অর্থাৎ আইবেরীয় এবং লিগুরীয়রাও এখানে বসবাস করত। এখানে ফিনিশীয়, গ্রীক এবং কার্থেজীয় জাতিরা বিদেশী আক্রমণকারী হিসেবে একের পর এক দখলদারিত্ব বজায় রাখে। প্রায় আড়াইশ বছর খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানরা এখানে দখলের চেষ্টা শুরু করে। কার্থেজীয়দের সাথে তাদের যুদ্ধের একটি ধারা শুরু হয় যাকে ‘পিউনিক যুদ্ধ’ বলা হয়। এগুলোর মধ্যে তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধে যা দুইশ বছর খ্রিস্টপূর্বাব্দে হয়েছিল, কার্থেজীয়রা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং রোমানরা এই দেশ দখল করে নেয়। তারা পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে শাসন করে। এই যুগে আন্দালুস একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গণ্য হতো। রোমান সাম্রাজ্যের চারজন বিখ্যাত সম্রাট: ট্রাজান, হ্যাড্রিয়ান, মার্কাস অরেলিয়াস এবং থিওডোসিয়াস আন্দালুসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়াও এখানে অনেক নামী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন, যেমন: বিখ্যাত চিন্তাবিদ সেনেকা যিনি রোমান সম্রাট নিরোর শিক্ষক ছিলেন এবং ৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক লুচান যার কাল্পনিক সংলাপগুলো অনেক খ্যাতি পেয়েছিল। একইভাবে রোমান কবি মার্শালও আন্দালুসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যখন বাইজেন্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলো, তখন আন্দালুসের ওপরও এর নিয়ন্ত্রণ মজবুত থাকল না এবং উত্তর ইউরোপের বন্য জাতিগুলো আন্দালুসে আক্রমণ শুরু করে দিল। তাদেরই একটি জাতি ‘গথ’ (যাকে আরবিতে কুত বলা হয়) ষষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে এই দেশটিকে পুরোপুরি জয় করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই জাতিই আন্দালুসের ওপর দখলদার ছিল।

আন্দালুস দখলের পর গথ জাতি সেই লাতিন জাতিগুলোর সাথে মিশে গিয়ে যারা আগে থেকেই এখানে বসবাস করত, লাতিন ভাষা গ্রহণ করে নেয়। তারপর তাদেরই প্রভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এই মেলামেশা কেবল নবাব, সরকারি কর্মকর্তা এবং পুঁজিপতিদের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের কথা বলতে গেলে, তারা ক্রমাগত দাসত্বের অবস্থায় ছিল এবং রাজবংশ বা শাসক জাতির পরিবর্তনে তাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হতো না। এই অসহায়ত্বের মধ্যে তারা প্রতিটি বিজয়ী শক্তির আনুগত্য করতে প্রস্তুত থাকত।

সপ্তম খ্রিস্টীয় শতাব্দীতে যখন ইসলামি বিশ্বে উমাইয়াদের শাসন ছিল, তখন আন্দালুসে খোদ গথ জাতির অবস্থা এমন ছিল যে, এর নবাব ও অভিজাতরা সবসময় একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত থাকত এবং একই সময়ে ডজন ডজন আমির রাজত্বের প্রত্যাশী হতো।

ছিলেন। তারা ছিল এক জীবন্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং সাধারণ মানুষ যারা শ্রম দিতে এবং জমি চাষ করতে নিযুক্ত ছিল, তাদের খোঁজখবর নেওয়ার কেউ ছিল না। [১]

এই শাসন আমলে পাদ্রিদের হাতে অটেল ক্ষমতা চলে এসেছিল। তলোয়ারধারী (যোদ্ধা) এবং গির্জার লোকদের পারস্পরিক যোগসাজশে দেশের সমস্ত সম্পদ গুটিকয়েক পরিবারের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। আন্দালুসের সাধারণ মানুষ পাদ্রিদের স্বৈরাচারী ব্যবস্থার অধীনে অত্যন্ত জুলুম ও কঠোর পরিশ্রমের জীবন অতিবাহিত করছিল। কৃষকদের অবস্থা দাসদের চেয়েও অধম ছিল এবং জমিদাররা ছিল তাদের জীবন ও মৃত্যুর মালিক। পাদ্রিদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবস্থা এমন ছিল যে, বাদশাহ প্রশাসনিক আইনও তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ধারণ করতেন। কৃষি, বাণিজ্য, ভূমির মালিকানা এবং দাসত্ব সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পাদ্রিদের হস্তক্ষেপ ছিল।

এখানে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল ইহুদিদের। তারা একদিকে সাধারণ মানুষ এবং অন্যদিকে শাসকদের বিদ্বেষ ও ঘৃণার লক্ষ্যবস্তু ছিল। তাদের সব ধরনের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার লক্ষ্যবস্তু বানানো হতো। দেশে পাদ্রিদের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা ইহুদিদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করত। অনেক ইহুদি অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং অনেকে প্রাণ বাঁচাতে বাহ্যিকভাবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের সন্দেহের চোখেই দেখা হতো।

রাজা ইজিকার আমলে ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে (৭৫ হিজরি) গির্জার কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, আন্দালুসের ইহুদিদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাদের স্থানীয় খ্রিস্টানদের দাসে পরিণত করা হবে এবং তাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদের ছিনিয়ে নিয়ে পাদ্রিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে যাতে তাদের লালন-পালন ও শিক্ষা খ্রিস্টান ধর্মে হয়। [২]

ইজিকার পুত্র উইটিজা (যিনি গথ জাতির শেষ রাজা ছিলেন) গির্জার অসীম ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন। তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে গির্জার সিদ্ধান্তগুলো বাতিল ঘোষণা করেন। এই পদক্ষেপে পাদ্রিরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। তারা ষড়যন্ত্র করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তার স্থলে রডারিক নামক এক কঠোর কর্মকর্তাকে সিংহাসনে বসায়, যে জুলুম ও নির্যাতনের মাধ্যমে দেশে এমন অন্ধকার সৃষ্টি করে যে চারদিকে কান্নার রোল পড়ে যায়। [৩]

এই সময়ে আরবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সৈমানদারদের বাহিনী আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। ২৭ হিজরিতে হযরত উসমান (রা.)-এর নির্দেশে একটি বাহিনী প্রথমবারের মতো আন্দালুসে পরীক্ষামূলক আক্রমণ চালায়। এরপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে আন্দালুসে দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক অভিযান চালানো হয়। পরিশেষে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে আফ্রিকার আমির মুসা বিন নুসাইর এবং মুসলিম বিজেতা তারিক বিন জিয়াদ এখানে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। মজার ব্যাপার হলো, মুসলমানদের আফ্রিকা জয় করতে এবং বিশেষ করে সেখানকার যোদ্ধা বারবারদের নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল, কিন্তু পুরো স্পেন দখলে তাদের এক বছরও লাগেনি। ৫ রজব ৯২ হিজরিতে (৭১১ খ্রিস্টাব্দ) তারিকের বাহিনী আন্দালুসের উপকূলে জাবালুত তারিকের সামনে নোঙর ফেলে। প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে...

[১] এই সমস্ত বর্ণনা ফরাসি ঐতিহাসিক গুস্তাভ লে বনের। দ্রষ্টব্য: “তামাদুন-এ-আরব” অনুবাদক সৈয়দ আলী বিলগ্রামী, পৃ. ৪২৫ থেকে ৪২৭, মুদ্রিত হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৩০ থেকে ৩৩; নাফহত তীব: ১/ ৯৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯২ হিজরি।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৩৩, ৩৪; নাফহত তীব: ১/ ৯৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯২ হিজরি।

এর পর ২৭ রমজানুল মুবারক ৯২ হিজরি (১৯ জুলাই ৭১১ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে বারো হাজার ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী বাহিনী এবং রডারিকের পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বেশ কয়েক দিন যুদ্ধের পর অবশেষে ৫ শাওয়াল খ্রিস্টানরা পিছু হটে এবং রডারিক গুয়াডালিট (Guadalete) নদীতে ডুবে মারা যায়। এরপর মুসলমানরা পথের শহরগুলো ছেড়ে এসিজা (Ecija)-তে পৌঁছায়।

এখান থেকে তারিক বিন জিয়াদ বিভিন্ন দিকে বেশ কিছু বাহিনী প্রেরণ করেন। সাতশ সৈন্য ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের গোলাম মুগীসের নেতৃত্বে ৯২ হিজরির শাওয়াল মাসে কর্ডোভা (Qurtuba) জয় করে। অন্যান্য বাহিনীগুলো মালাগা (Malaga), এলভিরা (Elvira) অর্থাৎ গ্রানাডা (Granada), তুদমির (Tudmir) এবং জিয়ান (Jaen) দখল করে। অনেক শহর যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হয়। ৯৩ হিজরির রবিউস সানি মাসে তারিক গথ রাজাদের রাজধানী টলেডো (Toledo)-ও জয় করে নেন।

৯৩ হিজরির রমজান মাসে মুসা বিন নুসাইরও একটি বাহিনী নিয়ে প্রণালী পার হন এবং আলজাজিরাতুল খাদরা (Algeciras)-তে নিজের নৌবহর নোঙর করে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন যা “মসজিদ আল-রায়াত” নামে পরিচিত হয়। এই বাহিনী প্রথমে সিদোনিয়া (Sidonia) এবং তারপর স্পেনের অত্যন্ত সুদৃঢ় শহর কারমোনা (Carmona) জয় করে। এরপর সেভিল (Seville)-এর ওপর আক্রমণ করা হয় যা গথ শাসকদের পূর্বে স্পেনের রাজধানী ছিল। কয়েক মাসের অবরোধের পর এই শহরটিও নতি স্বীকার করে।

পরবর্তী আক্রমণ “মেরিডা” (Merida)-র ওপর হয় যার প্রাচীর ছিল ৬৪ ফুট উঁচু এবং ১৮ ফুট পুরু। অবশেষে ৯৩ হিজরির শাওয়াল মাসে এটিও পদানত করা হয়। একই বছর মুসার পুত্র আব্দুল আজিজের নেতৃত্বে একটি বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়ে “তুদমির” এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোও জয় করে নেয়, যার মধ্যে কার্টাজেনা (Cartagena) এবং মার্সিয়া (Murcia) অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯৩ হিজরির জিলকদ মাসে মুসা টলেডোর (Toledo) দিকে যাত্রা করেন। শহর থেকে ১৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে তালাভেরা (Talavera)-তে উভয় বিজয়ীর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা দুজনে একসাথে টলেডো পৌঁছান এবং উত্তর স্পেন বিজয়ের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন।

এখন অভিযান এভাবে শুরু হলো যে, প্রথমে তারিকের বাহিনী কোনো শহর অবরোধ করত, আর পেছনে মুসা বিন নুসাইরের বাহিনী সাহায্য এবং শহরের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পৌঁছে যেত। প্রথমে উত্তর-পূর্বে সারাগোসা (Zaragoza) শহরটি কোনো বড় যুদ্ধ ছাড়াই দখল করা হয়। এর সাথে বার্সেলোনা (Barcelona) এবং “হুয়েস্কা” (Huesca)-র মতো পার্শ্ববর্তী শহরগুলোও জয় করা হয়। পূর্ব উপকূলীয় শহর ভ্যালেন্সিয়া (Valencia), শাতিবা (Xativa) এবং দানিয়া (Denia)-ও এই অভিযানে বিজিত হয়। এরপর তারিক এবং মুসা দুটি ভিন্ন পথে আক্রমণ পরিচালনা করেন।

তারিক সারাগোসা থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং “ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বতমালা” অতিক্রম করে “গ্যালিসিয়া” (Galicia)-র শহর আমায়া (Amaya), অ্যাস্টোরগা (Astorga) এবং “লিওন” (Leon) জয় করেন। অন্যদিকে মুসা বিন নুসাইর উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বেলানফস (Balanfos), নাভারে (Navarre), ইব্রো উপত্যকা (Ebro Valley) এবং কাস্টিল (Castile)-কে পদানত করেন। এরপর “অ্যাস্টোরগা”-তে উভয় সেনাপতি আবারও একে অপরের সাথে মিলিত হন। এই দুই বিজয়ীর প্রচেষ্টায় ৯৫ হিজরির জিলহজ মাস নাগাদ পুরো আন্দালুস বিজিত হয়।

এরপর মুসা বিন নুসাইর ফ্রান্সের সামরিক শক্তি পরিমাপ করতে এবং সেখানকার পথঘাট দেখার জন্য কিছু সৈন্যদল পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালায় প্রেরণ করেন, যারা ফ্রান্সের সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ফিরে আসে।

৩৭৭

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

এই অভিযানগুলো অব্যাহত ছিল যখন নতুন উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মুসা বিন নুসাইর এবং তারিক বিন যিয়াদকে ফিরিয়ে ডাকলেন। [১]

এই দেশে মুসলমানদের শাসনের প্রভাব:

আন্দালুসে মুসলমানদের শাসন এখানে একটি নতুন যুগের সূচনা ছিল যা এখানকার মানুষকে শত শত বছর পর প্রকৃত স্বাধীনতা দান করেছিল এবং তাদের আদল ও ইনসাফ এবং মানবিক আচরণের মতো নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছিল। কুফর ও জাহালতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল এবং এখানে ঈমানের আলো ছড়াতে লাগল। আখলাক ও আদব সাধারণ হলো। উলুম ও ফুনুন-এর দরজা খুলে গেল এবং কৃষি, কারুশিল্প, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলো যার ফলে সাধারণ নাগরিকরাও সচ্ছল ও সম্পদশালী হতে লাগল।

প্রাচ্যবিদ ডোজি লিখেছেন:

“ইসলামী শাসনে নাসারাদের অবস্থা এমন ছিল না যে তাদের কোনো অভিযোগ থাকবে, কারণ তারা পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় ভালো অবস্থায় ছিল। আরবরা তাদের সাথে সদয় আচরণ করত। তাদের ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করত না। সরকার, যারা খুব বেশি ধর্মপরায়ণ ছিল না, তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করত না, কারণ এতে সরকারের আয় অনেক কমে যেতে পারত। নাসারারা আরবদের এই সদাচরণের অবমূল্যায়ন করত না। বরং বিজয়ীদের পক্ষ থেকে দয়া ও ইনসাফের প্রশংসা করত।” [২]

গুস্তাভ লে বন লিখেছেন:

“আরবরা আন্দালুসের অধিবাসীদের সাথেও সেই একই আচরণ করেছিল, যা তারা শাম ও মিশরে করেছিল। তাদের সম্পদ, তাদের গির্জা, তাদের আইন তাদের কাছেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের স্বজাতীয় শাসকদের অধীনে ইনসাফের সাথে বসবাসের অধিকার তাদের প্রদান করা হয়েছিল। কিছু শর্তসহ তাদের ওপর একটি বার্ষিক জিজিয়া ধার্য করা হয়েছিল যা তাদের অভিজাতদের জন্য একটি লাল দিনার এবং সাধারণ জনগণের জন্য অর্ধেক দিনার ছিল। এই শর্তগুলো এতটাই সহজ ছিল যে প্রজারা শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করে নিয়েছিল।” [৩]

[১] নাফহত তীব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/ ৩৩০, ২২৮; আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৯৪, ৯৫ হিজরি; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৬০, ১৯।

দ্রষ্টব্য: এই বিজয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ তারিখে উম্মতে মুসলিমা তৃতীয় খণ্ডে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের অবস্থার অধীনে বর্ণিত হয়েছে, তাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬৩

[৩] “তামাদুনে আরব” অনুবাদক সৈয়দ আলী বিলগেরামি, পৃষ্ঠা ৩৩৯, ৩৪০, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে মুদ্রিত।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

আন্দালুসের বেলায়েতকাল

আবদুল আজিজ বিন মুসা থেকে ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরি পর্যন্ত

৯৫ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি

(৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ)

৩৭ বছর

আন্দালুসে আমিরদের ধারাবাহিকতা

মুসা বিন নুসাইর রাজধানী দামেস্কে যাওয়ার সময় তাঁর পুত্র আবদুল আজিজকে আন্দালুসের শাসক এবং উকবা বিন নাফিকের নাতি হাবিবকে তাঁর উজির নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর মুসা বিন নুসাইর সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের রোযানলে পড়ার কারণে আন্দালুসে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাননি।

আবদুল আজিজ বিন মুসা: (৯৫ হিজরি থেকে ৯৭ হিজরি)

আবদুল আজিজ বিন মুসা আন্দালুসে শাসনের লাগাম ধরে রাখেন। এভাবে তিনি আন্দালুসের প্রথম ওয়ালি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এখনও দুই বছর অতিবাহিত হয়নি যে, সেনাবাহিনীতে আবদুল আজিজ সম্পর্কে ঘৃণ্য সব কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। আবদুল আজিজ স্পেনের প্রাক্তন রাজা রডারিকের রানি “এজিলোনা”-কে বিয়ে করেছিলেন। রটে গেল যে, আবদুল আজিজ তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নির্জনে হীরা-জহরত খচিত মুকুট পরিধান করতে শুরু করেছেন। আরব ও বারবার আমিররা এই বিলাসিতাকে চরম ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই অভিযোগের প্রচার আবদুল আজিজের সুনামের ব্যাপক ক্ষতি করে।

এরপর এই গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে, তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রতি ঝুঁকে পড়েছেন। এতে সেনাবাহিনীর কয়েকজন আমির উত্তেজিত হয়ে তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। এও বলা হয় যে, এই নির্দেশ স্বয়ং খলিফা সুলাইমানের ছিল, কারণ তাঁর আশঙ্কা ছিল যে মুসা বিন নুসাইরের বংশধররা আন্দালুসে নিজেদের রাজত্ব কায়েম না করে ফেলে। রজব ৯৭ হিজরি (মার্চ ৭১৬ খ্রিস্টাব্দ) মাসে একদিন আবদুল আজিজ মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ছিলেন, সূরা ফাতিহা শেষ করে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত শুরু করেছিলেন, এমন সময় বিদ্রোহী আমিররা হঠাৎ তলোয়ার উঁচিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাঁর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুসা বিন নুসাইর যখন পুত্রের হত্যার সংবাদ পেলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “তাকে শাহাদাতের মুবারকবাদ। সে রোজাদার এবং তাহাজ্জুদ গুজার ছিল।” [১]

আইয়ুব বিন হাবিব: (৯৭ হিজরি)

আবদুল আজিজের হত্যার পর লশকর বা সেনাবাহিনীর আমিররা আইয়ুব বিন হাবিবকে সাময়িকভাবে তাঁদের নতুন ওয়ালি হিসেবে নির্বাচন করেন। আইয়ুব ছিলেন মুসা বিন নুসাইরের ভাগ্নে এবং একজন নেক ও সৎ মানুষ। তিনি কর্তোভাকে ইসলামি আন্দালুসের রাজধানী বানান। মুসা বিন নুসাইরের সাথে আত্মীয়তার কারণে তাঁকে দ্রুত পদচ্যুত করা হয়।

হুর বিন আবদুর রহমান: (৯৮ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি)

এখন খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে নিযুক্ত আফ্রিকার শাসক হুর বিন আবদুর রহমান সাকারফিকে আন্দালুসের নতুন...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৯৭ হিজরি; আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি-ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ২/২৫৩।

গভর্নর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ৯৮ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন।

তিনি ইশবিলিয়াকে নিজের রাজধানী বানান। [১]

সামহ বিন মালিক খাওলানি: (১০০ হিজরি থেকে ১০৩ হিজরি)

এখন পর্যন্ত আন্দালুস প্রদেশটি আফ্রিকার অধীনে ছিল এবং এখানকার গভর্নর নিয়োগ আফ্রিকার শাসক করতেন। কিন্তু হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আন্দালুসকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে আফ্রিকা থেকে আলাদা করে দেন এবং এখানকার শাসকের নিয়োগ খলিফার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেন। তিনি সামহ বিন মালিক খাওলানিকে আন্দালুসের আমির নিযুক্ত করে পাঠান এবং তাকে তাকিদ দেন যেন তিনি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে শাসন করেন এবং সেখানে শরিয়ত কায়েম করেন। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশনায় সামহ বিন মালিক কুরতুবাহর কাছে ওয়াদিউল কাবির নদীর ওপর একটি বিশাল সেতু নির্মাণ করেছিলেন। সামহ বিন মালিক অত্যন্ত সুচারুভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। [২]

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পর নতুন খলিফা ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে সামহ বিন মালিক ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন এবং জাবালে বারানস (পীরেনিজ) অতিক্রম করে নরম্যান রাজ্য জয় করেন। এরপর ইসলামি বাহিনী একিটান রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে এবং এর রাজধানী টুলুস ঘেরাও করে। এখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে আমির সামহ বিন মালিক অনেক মুজাহিদসহ শাহাদাত বরণ করেন। অবশিষ্ট বাহিনী উপ-সেনাপতি আব্দুর রহমান গাফেকির নেতৃত্বে পিছু হটে জাবালে বারানসের পাদদেশে চলে আসে। [৩]

আন্দালুসের আমিরগণ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-গাফেকিকে নিজেদের শাসক নির্বাচিত করেন। কিন্তু এই সময়ে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক আন্দালুসকে পুনরায় আফ্রিকার অধীনে করে দিয়েছিলেন, ফলে আফ্রিকার শাসক ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিমের পক্ষ থেকে আব্দুর রহমান আল-গাফেকিকে দ্রুত বরখাস্ত করা হয় এবং বনু কালবের আনবাসা বিন সুহাইমকে নিযুক্ত করা হয়। [৪]

আনবাসা বিন সুহাইম কালবি: (১০৩ হিজরি থেকে ১০৭ হিজরি)

আনবাসা বিন সুহাইম চার বছর আট মাস আন্দালুস শাসন করেন। ১০৫ হিজরিতে আনবাসা বিন সুহাইম ফ্রান্সে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং ‘কারকাসোন’ জেলার কিছু অংশ ছাড়াও ‘সেপ্টিমেনিয়া’ প্রদেশও জয় করেন। এরপর মধ্য ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হন এবং রোন নদী পার হয়ে ‘লায়ন্স’, ‘বারগান্ডি’ এবং ‘অটুন’ জয় করেন। ফরাসিরা মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থামানোর জন্য গেরিলা হামলা শুরু করে যার ফলে মুসলমানদের বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমন একটি হামলা প্রতিহত করার চেষ্টার সময় আমির আনবাসা গুরুতর আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলমানরা পিছু হটে ‘নারবোন’ চলে আসে। [৫]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৫

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৬

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি আল-আম, ডক্টর আলী ইব্রাহিম হাসান: পৃষ্ঠা ৩১৬

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৬

[৫] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৭

১০৭ হিজরি থেকে ১১৩ হিজরির শাসকগণ:

আন্দালুসের আমিরগণ সাময়িকভাবে বনু ফাহরের একজন আরব সরদার উজরা বিন আব্দুল্লাহকে তাদের অস্থায়ী শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরপর আফ্রিকার শাসক নতুন ওয়ালি পাঠান। যাই হোক, বেশ কিছুদিন এখানে এমন কোনো শাসক আসেননি যার কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য ছিল। শাসকদের অপসারণ ও নিয়োগ বারবার হতে থাকে।

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ গাফিকি: (১১৩ হিজরি থেকে ১১৪ হিজরি)

১১৩ হিজরিতে এখানে প্রখ্যাত মুসলিম সেনাপতি আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ আল-গাফিকি নিযুক্ত হন। গাফিকি আন্দালুসের প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করেন এবং সমস্ত বিষয় সংশোধন করেন। ১১৪ হিজরিতে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে আট হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামের বাহিনী আবারও ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তিনি ফ্রান্সের বন্দর বর্দো দখল করেন এবং তারপর ডর্ডোন নদীর তীরে দক্ষিণ ফ্রান্সের শাসক ডিউক অফ অ্যাকুইটেইনকে পরাজিত করে “পয়টিয়ার্স” জয় করেন এবং “টুরস” (তলোশা)-এর দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। এই পরিস্থিতিতে ডিউক অফ অ্যাকুইটেইন মধ্য ফ্রান্সের শাসক চার্লস মার্টেলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফ্রান্সকে বাঁচাতে জার্মানি ও পর্তুগালের বাহিনীও চলে আসে। অবশেষে টুরস উপত্যকায় আট হাজার মুসলমানের সাথে তিন দেশের পঞ্চপাল সদৃশ বাহিনীর মোকাবিলা হয়। ১৫ শাবান ১১৪ হিজরি (১৯ অক্টোবর ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা বীরত্বের নতুন ইতিহাস রচনা করেন কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, ফলে আব্দুর রহমান আল-গাফিকি এই যুদ্ধেই হাজার হাজার মুসলমানসহ শহীদ হন। এই শাহাদাতস্থল “বালাতুশ শুহাদা” নামে পরিচিত। [১]

এই পরাজয়ের পরেও দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি বিশাল এলাকা মুসলমানদের অধীনে ছিল। উকবা বিন হাজ্জাজের স্থলে আব্দুল মালিক বিন কাতান শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দুই বছর এই পদে বহাল থাকেন।

উকবা বিন হাজ্জাজ সালুলি: (১১৬ হিজরি থেকে ১২১ হিজরি)

১১৬ হিজরিতে উকবা বিন হাজ্জাজকে আন্দালুসের শাসক বানানো হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক। তিনি আন্দালুসের সমস্ত প্রশাসনিক দুর্বলতা দূর করেন। অসাধু ও বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তাদের কোনো প্রকার ছাড় না দিয়ে বরখাস্ত করেন এবং সমস্ত বিভাগকে অনেক উন্নত করেন। তিনি মহাসড়কগুলোর নিরাপত্তার জন্য অশ্বারোহী সৈন্যদের একটি আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি জনপদে আদালত স্থাপন করেন এবং নতুন মসজিদ ও মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন করেন। এভাবে আন্দালুস শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতির দিক থেকে মুসলিম বিশ্বের আদর্শ প্রদেশগুলোর মধ্যে গণ্য হতে শুরু করে।

উকবা বিন হাজ্জাজের শাসনামলে উত্তর আন্দালুসের দুর্গগুলোতে বেশ কিছু আক্রমণ চালানো হয়। পামপ্লোনা, গ্যালিসিয়া এবং আরিউনা জয় করা হয় এবং সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করা হয়। উকবা বিন হাজ্জাজের অভ্যাস ছিল যে, যখন তার কাছে ফিরিজি বন্দিদের আনা হতো, তখন তিনি তাদের হত্যা করতেন না বরং ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং কুফর ও শিরকের মন্দ দিকগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট করতেন। এভাবে কমবেশি এক হাজার ফিরিজি তার...

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি, পৃষ্ঠা ১৯৩ থেকে ২০৩; নাফছত তিব: ১/ ২৮৬ থেকে ২৯০; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস লিশ শায়খ আব্দুল্লাহ ইনান: ১/ ১১১ থেকে ১১২।

...হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। [১]

আব্দুল মালিক বিন কাতান ফিহরি: (প্রথমবার: ১১৪ হিজরি থেকে ১১৬ হিজরি...
দ্বিতীয়বার: ১২১ হিজরি থেকে ১২৩ হিজরি)

সেই সময়ে আন্দালুসের বয়োজ্যেষ্ঠ আমিরদের মধ্যে আব্দুল মালিক বিন কাতান অত্যন্ত বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর বয়স ছিল কমবেশি ৯০ বছর। তিনি হাররার যুদ্ধে মদিনাবাসীদের ওপর জুলুমকারী ইয়াজিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আফ্রিকা এবং তারপর আন্দালুসে চলে আসেন। ১১৪ হিজরি থেকে ১১৬ হিজরি পর্যন্ত তিনি এখানকার শাসকও ছিলেন। [২] তিনি একজন জালেম ও দুশ্চরিত্রের মানুষ ছিলেন। [৩] তিনি ১২১ হিজরিতে উকবা বিন হাজ্জাজকে হত্যা করেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে ক্ষমতা দখল করেন। [৪]

আব্দুল মালিক বিন কাতানের দ্বিতীয় শাসনকাল তিন বছর স্থায়ী ছিল, কিন্তু এটিও কোনো কৃতিত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় খারেজি মতাদর্শ গ্রহণকারী বারবারদের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যার প্রভাব আন্দালুসেও পড়ে। এই বারবাররা ১২২ হিজরিতে তানজাহ দখল করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আরবদের গণহত্যা করে। আন্দালুসেও বারবার গোত্রগুলোর বিশাল সংখ্যা ছিল। মরক্কোতে বারবারদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে তারাও আন্দালুসে সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। এই সময়ে হিশাম বিন আব্দুল মালিক ১২৩ হিজরিতে কুলসুম বিন আইয়াজকে ত্রিশ হাজার আরব সৈন্য দিয়ে মরক্কো ও আন্দালুসের বারবারদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। এই বাহিনীতে দশ হাজার সৈন্য ছিল খাঁটি উমাইয়া বংশের। কিন্তু বারবারদের হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং কুলসুম বিন আইয়াজসহ অধিকাংশ সৈন্য নিহত হয়। [৫]

বালজ বিন বিশর: (১২৩ হিজরি)

এই বাহিনীর উপ-সেনাপতি বালজ বিন বিশর কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় জঙ্গলে আশ্রয় নেন এবং আব্দুল মালিক বিন কাতানের কাছে আবেদন পাঠান যেন তিনি তাঁর বাহিনীকে আন্দালুসে আশ্রয় দেন। আব্দুল মালিকের আশঙ্কা ছিল যে, এই লোকেরা হয়তো আন্দালুস দখল করে নেবে, তাই তিনি শর্ত দিলেন যে এক বছর পূর্ণ হলে তারা ফিরে যাবে। বালজ এই চুক্তিতে সম্মত হন এবং নিজের সৈন্যদের নিয়ে আন্দালুসে চলে আসেন। এখানে তারা আব্দুল মালিকের সাথে মিলে আন্দালুসে বিদ্রোহকারী বারবারদের একের পর এক পরাজিত করেন। এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর আব্দুল মালিক বালজকে তাঁর বাহিনীসহ ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। বালজ ও তাঁর সঙ্গীরা ফিরে যেতে অস্বীকার করেন এবং আব্দুল মালিককে হত্যা করেন। [৬]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২২৩/৩, আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২৯/২

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ৩২/২

[৩] ওকানা জালুমান জাইরান ফি সিরাতিহি (নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ২৩৯/১)

[৪] সুন্না ওয়াসাবা আলাইহি আব্দুল মালিক বিন কাতান আল-ফিহরি সানাতা ইহদা ওয়া ইশরিনা ফাখালাআছ ওয়া কাতালাছ ওয়া ইউকালু: আখরাজা মিনাল আন্দালুস। (নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ২৩৯/১)

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৩৫৩ থেকে ৩৫৬, আল-কামিল ফিত তারিখ, ১২১ হিজরি, আল-ইসতিকসা লি আখবারিল দুওয়ালিল মাগরিবিল আকসা: ১৭০ থেকে ১৯৩/১

[৬] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ৩১, ৩২/২

তবে বলজ বিন বিশরের জন্য শাসনকাল অনুকূল হয়নি। কয়েক মাস পর তিনি আব্দুল মালিকের অনুগতদের সাথে এক যুদ্ধে আহত হন এবং এই ক্ষতটিই প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয়। [১]

সালাবা বিন সালামা: ১২৪ হিজরি

১২৪ হিজরিতে উমাইয়া সরকারের পক্ষ থেকে সালাবা বিন সালামা জুজামি এসে আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি একজন ভালো ও দয়ালু শাসক ছিলেন, কিন্তু আব্দুল মালিক বিন কাতানের সমর্থকরা অর্থাৎ বনু ফিহর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেনি। অন্যদিকে বারবারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তবে তিনি বারবারদের বিদ্রোহ পূর্ণ শক্তিতে দমন করেন। কিন্তু এই সময়ে আন্দালুসে খোদ আরবদের মধ্যে মুদারি ও ইয়ামানি গোত্রীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে এবং ইয়ামানি গোত্রগুলো সালাবার বিরোধী হয়ে যায়। অবশেষে এক বছরও অতিবাহিত হয়নি যে, সালাবাকে পদচ্যুত হতে হয়। [২]

হুসাম বিন দিরার আবুল খাত্তার: ১২৫ হিজরি থেকে ১২৮ হিজরি

এবার হুসাম বিন দিরার কালবি ওরফে আবুল খাত্তার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় তিন বছর (১২৫ হিজরি থেকে ১২৮ হিজরি) সময় পান। তিনি একজন সাহসী, দানশীল ও সচ্চরিত্রবান শাসক ছিলেন। আন্দালুসের সমস্ত আরব গোত্র তাঁর বায়আত গ্রহণ করে। আরব গোত্রগুলো কর্ডোভায় থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের আধিক্যের কারণে এই শহরটি তাদের জন্য অপরিপাক ছিল। হুসাম বিন দিরার চিন্তা করে দেখলেন যে, ‘এলভিরা’ তার অবস্থান ও আবহাওয়ায় দামেস্কের সদৃশ। ফলে তিনি একটি অদ্ভুত কাজ করলেন যে, ‘এলভিরা’র সরকারি নাম ‘দামেস্ক’ রেখে দিলেন এবং দামেস্কের আরবদের সেখানে আবাদ করলেন। এরপর তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখেন এবং আন্দালুসের প্রতিটি শহর যা সিরিয়ার কোনো শহরের সাথে কিছুটা হলেও সদৃশ ছিল, সেটিকে সেই নাম দিতে থাকেন এবং সিরীয় আরবদের সেখানে বসতি স্থাপন করান। ফলে হিমসবাসীদের ইশবিলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং এর নাম হিমস রাখা হয়। কিন্নাসরিনবাসীদের জিয়ানে পাঠিয়ে এর নাম কিন্নাসরিন রাখা হয়। জর্ডানবাসীদের মালাগাতে পাঠিয়ে একে জর্ডান বলা হতে থাকে। ফিলিস্তিনিদের শাদুনায় বসতি স্থাপন করিয়ে বলা হয় যে, একেই যেন তারা ফিলিস্তিন বলে। মিশরবাসীদের তাদমিরে আবাদ করে একে মিশরের নাম দেওয়া হয়। এটি একটি আকর্ষণীয় পরীক্ষা ছিল যার কারণে মানুষ নতুন শহরগুলোতে স্থানান্তরিত হওয়া মেনে নেয়, তবে এটি ভিন্ন কথা যে শহরগুলোর এই নতুন নামগুলো প্রচলিত হতে পারেনি। [৩]

গৃহযুদ্ধের যুগ এবং ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান ফিহরি:

আবুল খাত্তার শুরুতে সমস্ত আরব গোত্রের সাথে সমান আচরণ করেছিলেন, তবে পরবর্তীতে তাঁর ঝোঁক ইয়ামানি গোত্রগুলোর দিকে হয়ে যায় এবং বনু কাইস তাঁর আস্তা হারিয়ে ফেলে। এমন পরিস্থিতিতে সুমাইল বিন হাতিম নামক এক সরদার (যিনি শিমর বিন জিল জাওশানের নাতি ছিলেন) গোত্রীয় বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে এক তুফান সৃষ্টি করেন। এখান থেকেই আন্দালুসে গৃহযুদ্ধের যুগ শুরু হয় এবং চারদিকে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

[১] আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/৩২

[২] আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/৩২

দ্রষ্টব্য: ইয়ামানি বলতে সেই আরব গোত্রগুলোকে বোঝানো হয়েছে যাদের মূল উৎপত্তি ও বিকাশ ইয়ামেনে হয়েছে, যেমন: আজদ, গাসসান, লাখম, জুজাম, হিমইয়ার, তানুখ, জুজাম, তাই ইত্যাদি।

[৩] নাফহত তিব: ১/২৩; আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ২/৩২, ৩৩

নতুন শাসক সাওয়াবা বিন সালামা হাদানি (১২৮ হিজরি - ১২৯ হিজরি) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ব্যর্থ হন। অন্যদিকে রাজধানী দামেস্কে পরিস্থিতি ছিল শোচনীয় এবং খোদ বনু উমাইয়ার ক্ষমতা টালমাটাল ছিল। এমন অবস্থায় আন্দালুসের দিকে কে-ই বা মনোযোগ দিত।

অবশেষে ১২৯ হিজরিতে বিবদমান মুদারি এবং ইয়ামানি গোত্রগুলো নিজেদের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি করল যে, শহরগুলো তাদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে এবং প্রতি বছর উভয় গোত্র থেকে পর্যায়ক্রমে একজন আমিরকে কর্তোভার সিংহাসনে বসানো হবে।

এই চুক্তির অধীনে মুদার গোত্র ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরিকে শাসক হিসেবে পেশ করল এবং ইয়ামানিরা তার অনুগত হলো। তবে এরপর ইউসুফ বিন আবদুর রহমান স্থায়ীভাবে কর্তোভাকে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে নেন এবং এক বছর পর যখন শাসক পরিবর্তনের পালা এল, তখন তিনি ইয়ামানিদের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দেননি। এভাবে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে।

এরই মধ্যে আন্দালুসে এমন এক ভয়াবহ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে যে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়। মহামারি শেষ হলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ইউসুফ ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান এবং যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ। এই ফিতনার যুগে তিনি প্রায় নয় বছর শাসন করেন। যদিও এই সময়ে স্থানে স্থানে বারবার বিদ্রোহ হতে থাকে, তবুও তিনি কর্তোভায় নিজের শাসনকে যেকোনো মূল্যে সুরক্ষিত রাখেন। [১]

শাসনকালের শেষ দিকে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদের কারণে দক্ষিণ ফ্রান্সের এলাকাগুলো মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এটি এমন এক ক্ষতি ছিল যা আর কখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

শাসনকাল এক নজরে:

শাসনকাল ছিল ইসলামি আন্দালুসের ইতিহাসের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর। এই সময়ে ভালো শাসকও এসেছেন আবার কেউ কেউ মন্দও ছিলেন। অধিকাংশ শাসকই বেশি সময় পাননি এবং তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগই মেলেনি। বারবার রদবদল এখানে প্রকৃত স্থিতিশীলতা তৈরি হতে দেয়নি। এই রদবদলের পেছনে যেমন অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও অন্যান্য কারণ ছিল, তেমনি এটাও অনুভূত হয় যে মারওয়ানি খলিফারা আন্দালুসে কোনো শাসককে দীর্ঘকাল রাখতে চাইতেন না। সম্ভবত তাদের এই আশঙ্কা ছিল যে সমুদ্রপারের এই প্রদেশে কোনো শাসক বেশি প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় হয়ে স্বায়ত্তশাসিত না হয়ে যান। এই কারণেই তারা আন্দালুসের মতো বিশাল দেশকে একটি প্রদেশের মর্যাদা না দিয়ে বরং একটি জেলার মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং আফ্রিকার শাসককে সর্বদা আন্দালুসের শাসকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কেবল হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের শাসনকাল এর ব্যতিক্রম এবং তার সংক্ষিপ্ত শাসনামলে আন্দালুসে যে কল্যাণ ও গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছিল, তা ইতিহাসের পাতায় সুস্পষ্ট।

যা-ই হোক, সেই শাসনকাল এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সময়ে সামহ বিন মালিক, আবদুর রহমান আল-গাফেকি, আনবাসা বিন সুহাইম এবং উকবা বিন হাজ্জাজের মতো যোগ্য শাসকদের প্রচেষ্টায় অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। দুর্গ, সেতু এবং শহর নির্মিত হয়েছিল এবং ইসলামি আন্দালুস গঠনের প্রাথমিক রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছিল। মুসলমানরা স্থানীয় জনগণের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছিলেন। গথ রাজাদের আমলে পাদ্রিদের কঠোরতায় খোদ খ্রিস্টানরা চরম সংকটে ছিল। মুসলিম শাসকদের দিকে...

[১] নাফহত তিব: ১/ ২৩৭, ২৩৮; আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব: ১/ ৩৯, ৪০।

...সেসব কঠোরতা সরিয়ে নেওয়া হলো। নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হলো। ভারী কর মওকুফ করে দেওয়া হলো। খোদ পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা মুসলিম শাসকদের পক্ষ থেকে এই সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা স্বীকার করেছেন। এই পরিবেশে অসংখ্য স্থানীয় মানুষ ইসলামে দাখিল হতে থাকে এবং তাদের অনেকের সন্তান-সন্ততি পরবর্তীতে আন্দালুসের প্রখ্যাত আলেম এবং জ্ঞান ও গুণের অধিকারী হিসেবে গণ্য হয়। আমরা যদি এসব বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই, তবে আমাদের সফর বেশ দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আমরা সংক্ষেপেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

আন্দালুসের নতুন খ্রিস্টান রাষ্ট্র - আস্তুরিয়াস

স্পেনে ইসলামের আগমনের পর এখনও অর্ধশতাব্দীও পার হয়নি, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল খ্রিস্টান। তারা কিছু এলাকা স্বাধীন করে সেখানে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করছিল। বাকি মুসলিম বিশ্বের সাথে আন্দালুসের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিল। এই পরিস্থিতি খ্রিস্টানদের অন্তর থেকে মুসলমানদের ভয় ও দাপট কমিয়ে দিল। এদিকে এশিয়ায় বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে আন্দালুসে আরব ও বারবারদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। খোদ আরবদের মধ্যেও ইয়ামানি ও মুদারিরা একে অপরের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জয়জয়কার ছিল। প্রতি দেড়-দুই বছর পর একজন নতুন শাসক সিংহাসনে বসতেন।

মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন দেখে খ্রিস্টানদের সাহস বেড়ে গেল এবং তারা ১০৩ হিজরিতে (৭২২ খ্রি.) উত্তর স্পেনের পাহাড়ি অঞ্চলে ‘আস্তুরিয়াস’ (Asturias) নামে একটি ছোট স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিল একজন গথ নেতা ‘পেলাইও’ (৭২২ খ্রি. থেকে ৭৩৭ খ্রি.)। তার উত্তরসূরি ‘প্রথম আলফনসো’ (৭৩৯ খ্রি. থেকে ৭৫৭ খ্রি.) ‘গ্যালিসিয়া’ (Galicia)-কেও নিজের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালার দক্ষিণ পাদদেশ থেকে উত্তর চূড়া পর্যন্ত সমস্ত এলাকা নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এই খ্রিস্টান রাষ্ট্রটিই পরবর্তীতে আন্দালুসের মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হয়।

আন্দালুসের মুসলিম আমিররা যদি এই খ্রিস্টান রাষ্ট্র দমনের দিকে গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিতেন, তবে তাদের মধ্যে একজন আমিরই এই অভিযান সম্পন্ন করতে পারতেন। কিন্তু তাদের অবহেলার কারণে ‘প্রথম আলফনসো’-র শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে, এমনকি পরবর্তীতে এই ফিতনা দমন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি, ডক্টর আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ২১১, ২১২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬২ থেকে ৭৩।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/ ৩৮০।

দ্রষ্টব্য: ইয়ামানি বলতে সেই আরব গোত্রগুলোকে বোঝানো হয়েছে যাদের মূল বিকাশ ইয়ামেনে হয়েছিল, যেমন: আজদ, গাসসান, লাখম, কিনদাহ, হিমইয়ার, তানুখ, জুজাম, তাই ইত্যাদি। উমাইয়া যুগে এদের অধিকাংশ গোত্র দক্ষিণ সিরিয়ার প্রদেশ হিমস, কিননাসরিন ইত্যাদির উন্মুক্ত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কিছু ইয়ামানি গোত্র জাহেলিয়াত যুগে সিরিয়ায় এসেছিল যেমন: কালব, তানুখ, জুজাম এবং তাই। মুদারি-র সম্পর্ক মুদার গোত্রের সাথে, যার দুটি বড় শাখা ছিল—একটি কাইস বিন আইলান এবং অন্যটি বনু ইলিয়াস বিন মুদরিকাহ। বনু কাইসের শাখাগুলোর মধ্যে গাতফান, হাওয়াযিন, কিলাব ইত্যাদি বিখ্যাত, অন্যদিকে বনু ইলিয়াস-এর শাখাগুলোর মধ্যে হুয়াইল, আসাদ, তামিমি, কিনানাহ ইত্যাদি বিখ্যাত। নবী করীম (সা.)-এর সম্পর্ক বনু ইলিয়াস-এর শাখা নজর বিন কিনানাহ-র সাথে। জাহেলিয়াত যুগে এই গোত্রগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল।

[৩] আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/ ৪০; এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা Spain।

আন্দালুসের গভর্নরদের তালিকা

ক্রমিক নং নাম শাসনকাল বিশেষ মন্তব্য

১ আবদুল আজিজ বিন মুসা ৯৫ থেকে ৯৭ হিজরি (৭১৩ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ)
সৈন্যবাহিনীর হাতে নিহত

২ আইয়ুব বিন হাবিব লাখমি ৯৭ হিজরি (৭১৬ খ্রিস্টাব্দ) মুসা বিন নুসাইরের ভাগ্নে হওয়ার
কারণে দ্রুত পদচ্যুত করা হয়।

৩ হুর বিন আবদুর রহমান সাকাফি ৯৮ থেকে ১০০ হিজরি (৭১৬ থেকে ৭১৮ খ্রিস্টাব্দ)

৪ সামাহ বিন মালিক খাওলানি ১০০ থেকে ১০৩ হিজরি (৭১৮ থেকে ৭২১ খ্রিস্টাব্দ)
ন্যায়বিচার ও ইনসাফ, নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ, ফ্রান্সে আক্রমণ, আরবোনের বিজয়।

৫ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ গাফেকি ১০৩ হিজরি (৭২১ খ্রিস্টাব্দ) সৈন্যবাহিনী
সাময়িকভাবে নির্বাচিত করেছিল।

৬ আনবাসা বিন সাহিম কালবি ১০৩ থেকে ১০৭ হিজরি (৭২১ থেকে ৭২৫ খ্রিস্টাব্দ) ফ্রান্সে
আক্রমণ, কারকাসোনের বিজয়। উত্তর আন্দালুসে ‘অস্টুরিয়াস’-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৭ উজরা বিন আবদুল্লাহ ফিহরি ১০৭ হিজরি (৭২৫ খ্রিস্টাব্দ) সৈন্যবাহিনী সাময়িকভাবে
নির্বাচিত করেছিল।

৮ ইয়াহইয়া বিন সালামা কালবি ১০৭ হিজরি (৭২৫ খ্রিস্টাব্দ) অযোগ্যতার কারণে দ্রুত
পদচ্যুত।

৯ উসমান বিন আলী উবাইদা ১০৯ হিজরি (৭২৭ খ্রিস্টাব্দ) সৈন্যবাহিনী সাময়িকভাবে
নির্বাচিত করেছিল।

১০ উসমান বিন আবি নিসা খাসআমি ১১০ হিজরি (৭২৮ খ্রিস্টাব্দ) দ্রুত পদচ্যুত।

১১ হুজাইফা বিন আহওয়াস কায়সি ১১১ হিজরি (৭২৮ খ্রিস্টাব্দ) মাকতুশার বিজয়। দ্রুত
পদচ্যুত।

১২ হাইসাম বিন উবাইদ কিলাবি জিলকদ ১১১ হিজরি (৭২৯ খ্রিস্টাব্দ) বনু কালবের সাথে
শত্রুতা সৃষ্টি করে নিহত হন।

১৩ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আশজায়ী ১১১ হিজরি (৭২৯ খ্রিস্টাব্দ) সৈন্যবাহিনী
সাময়িকভাবে নির্বাচিত করেছিল।

১৩ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ গাফেকি (দ্বিতীয়বার) ১১২ থেকে ১১৪ হিজরি (৭৩০
থেকে ৭৩২ খ্রিস্টাব্দ) শ্রেষ্ঠ শাসনকাল। অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতি মনোযোগ, ফ্রান্সে
আক্রমণে বোর্দো এবং পোয়াতিয়ে বিজয়। ফরাসি জেনারেল চার্লস মার্টেলের মোকাবিলা
করতে গিয়ে শহীদ।

৩৮৭ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ | পঞ্চম খণ্ড

ক্রমিক নং নাম সময়কাল সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫ আব্দুল মালিক বিন ক্বাতান ফিহরি ১১৪ হিজরি থেকে ১১৬ হিজরি (৭৩২ থেকে ৭৩৪ খ্রি.) জালিম ও দূরদর্শিতাহীন

১৬ উকবা বিন হাজ্জাজ সালুলি ১১৬ হিজরি থেকে ১২১ হিজরি (৭৩৪ থেকে ৭৩৯ খ্রি.) উত্তম শাসন। অনেকগুলো দুর্গ জয় করেন। শৃঙ্খলা উন্নত করেন। ইসলামের প্রচার করেন।

১৭ আব্দুল মালিক বিন ক্বাতান - পুনরায় ১২১ হিজরি থেকে ১২৩ হিজরি (৭৩৯ থেকে ৭৪১ খ্রি.) বারবার ও শামি আরবদের মধ্যে সংঘাত

১৮ বালজ বিন বিশর কুশাইরি ১২৩ হিজরি (৭৪১ খ্রি.) শামিদের সমর্থনে ক্ষমতা দখল করেন

১৯ সালাবা বিন সালামা আমেলি ১২৪ হিজরি (৭৪২ খ্রি.) আরব ও বারবারদের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

২০ হুসাম বিন জিরার কালবি ১২৫ হিজরি থেকে ১২৮ হিজরি (৭৪৩ থেকে ৭৪৫ খ্রি.) সাময়িকভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনরুদ্ধারে সফল হন। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন।

২১ সাওয়াব বিন সালামা জুজামি ১২৮ হিজরি থেকে ১২৯ হিজরি (৭৪৬ থেকে ৭৪৭ খ্রি.) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করেন।

২২ ইউসুফ বিন আব্দুর রহমান ফিহরি ১২৯ হিজরি থেকে ১৩৮ হিজরি (৭৪৭ থেকে ৭৫৬ খ্রি.) শেষ শাসক। ইয়ামানি ও মুদারি আরবদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা, দুর্ভিক্ষ। ফ্রান্সের অধিকাংশ অধিকৃত এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায়।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

আন্দালুসের উমাইয়া শাসকগণ

১৩৮ হিজরি থেকে ৪২২ হিজরি

(৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

২৮৪ বছর

৩৮৯ | তারিখ উম্মতে মুসলিমা | দ্বিতীয় খণ্ড

আবদুর রহমান আউয়াল

(১৩৮ হিজরি থেকে ১৭২ হিজরি / ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

এই নাজুক মুহূর্তে আল্লাহর ইচ্ছায় যে মহান ব্যক্তিকে আন্দালুসের ইসলামী হুকুমত রক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল, ইতিহাস তাকে “আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া”, “আবদুর রহমান আদ-দাখিল” এবং “আবদুর রহমান আউয়াল” নামে স্মরণ করে।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার শৈশবের এই ঘটনাটি প্রসিদ্ধ যে, তিনি তাঁর দাদা খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিকের দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মাসলামা বিন আবদুল মালিক তাঁর দিকে গভীরভাবে তাকালেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কপালে চুম্বন করলেন। এরপর খলিফাকে সম্বোধন করে বললেন: “আমি এই প্রতিভাবান শিশুর কপাল ও ঘাড়ের শাসনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।” [১]

বনু উমাইয়ার পতন এবং আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা:

বনু উমাইয়া খিলাফতের শেষ বছরগুলোতে উমাইয়া ও আব্বাসীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘাত চলছিল, অবশেষে বনু উমাইয়া সব জায়গায় পরাজিত হয়। ১৩২ হিজরিতে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ নিহত হন এবং প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতার মসনদে আসীন হন। দামেস্কে, যা বনু উমাইয়ার রাজধানী ছিল, শত শত উমাইয়া নিহত হয়। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে এবং আত্মগোপন করে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। সৌভাগ্যবশত আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া সেই দিনগুলোতে দামেস্কে ছিলেন না, তাই তিনি এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। তিনি তাঁর পরিবারসহ সিরিয়ার ঘন বনের মাঝে অবস্থিত একটি গ্রামে ডেরা ফেলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুযোগ পেলেই আফ্রিকার দিকে চলে যাবেন, যেখানে আমির আবদুর রহমান বিন হাবিব বনু উমাইয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি চোখের রোগে আক্রান্ত হন। একদিন তিনি তাঁর অসুস্থ চোখ থেকে ঝরতে থাকা পানি একটি কাপড় দিয়ে মুছছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর চার বছর বয়সী ছেলে সুলাইমান আতঙ্কিত অবস্থায় দৌড়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং তাঁর বুকের সাথে লেপ্টে গেল। আবদুর রহমান চিন্তিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলেন অশ্বারোহীদের একটি দল দ্রুত গ্রামের দিকে আসছে। সবার আগে আবদুর রহমানের তেরো বছর বয়সী ভাই দৌড়ে এল এবং চিৎকার করে বলল: “সরকারি সৈন্যরা আসছে, দ্রুত পালানোর চেষ্টা করো।”

[১] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৫৩।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া দ্রুত কিছু দিনার সাথে নিলেন, নিজের সন্তানদের এবং বোনদের তাঁর অনুগত গোলাম বদরের সাথে কোনো গোপন আস্তানায় পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে গ্রামের কাছে এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেলেন। সরকারি সওয়াররা তাঁকে খুঁজে পেল না। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া তাঁর মেজবানের কাছে অবস্থান করতে থাকলেন।

তারপর তাঁর গোলাম বদর তাঁর পরিবার-পরিজনকে নিয়ে তাঁর কাছে চলে এল। যেহেতু ওই এলাকায় অবস্থান করা আরও বেশি বিপজ্জনক ছিল, তাই তিনি তাঁর মেজবানকে কিছু দিনার দিয়ে সফরের সরঞ্জাম ও ঘোড়া সংগ্রহ করে দিতে বললেন।

মেজবান এই ভুলটি করলেন যে, এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি নিজে করার পরিবর্তে তাঁর এক গোলামকে এই রহস্য সম্পর্কে অবগত করে এই কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। গোলামের ওপর সরকারি পুরস্কারের লোভ চেপে বসল এবং সে সরকারি পেয়াদাদের কাছে তাঁর মনিবের মনিব আবদুর রহমানের আত্মগোপনের খবর পৌঁছে দিল। কিন্তু তাদের আস্তানায় হানা দেওয়ার আগেই আবদুর রহমান বিপদের আভাস পেয়ে গেলেন এবং ছোট ভাইকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সরকারি বাহিনী ধাওয়া করল এবং দ্রুতই তাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেল।

সামনে নদী ছিল। কোনো পথ না দেখে আবদুর রহমান তাঁর ভাইসহ নদীতে ঝাঁপ দিলেন। সৈন্যরা এটি দেখে চিৎকার করে বলতে লাগল, “ফিরে এসো... তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।”

আবদুর রহমান তাদের কথা শুনলেন না এবং অন্য তীরের দিকে সাঁতরে যেতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর ছোট ভাই সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আবদুর রহমানের বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে জীবন বাঁচানোর আশায় ফিরে গেল। সৈন্যরা তাকে ধরে হত্যা করল। [১]

আফ্রিকায় আত্মগোপন

আবদুর রহমান কিছু দিন ফিলিস্তিনের একটি গ্রামে আত্মগোপন করে থাকলেন। তারপর মিসর হয়ে আফ্রিকার মরুভূমিতে পৌঁছে গেলেন যেখানে আবদুর রহমান বিন হাবিবের স্বায়ত্তশাসিত শাসন ছিল। তিনি আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁকে আস্তানা করে দিলেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার দুই অনুগত গোলাম বদর এবং আবু শুজা আস-সালিম যখন আফ্রিকায় তাঁর নিরাপদ আস্তানার খবর পেলেন, তখন তাঁরা প্রয়োজনীয় দিনার ও অলঙ্কার নিয়ে তাঁর কাছে চলে এলেন। কিছু দিন শান্তিতে কাটল, কিন্তু তারপর আফ্রিকার শাসকের কাছে আবদুর রহমানের অসাধারণ যোগ্যতা বিপদের কারণ মনে হতে লাগল। তার নিয়ত বদলে গেল এবং সে তাঁকে আবাসীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া সময়মতো খবর পেয়ে গেলেন এবং তিনি তাঁর ছেলে ও গোলামকে সাথে নিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে চলে গেলেন। এই লোকেরা গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিতেন এবং কখনো মরুভূমিতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করতেন। অবশেষে তাঁরা উত্তর আফ্রিকার বারবার গোত্রগুলোর কাছে পৌঁছে গেলেন। আবদুর রহমানের মা বারবার ছিলেন, তাই নাফজা গোত্র তাঁকে নিজেদের আশ্রয়ে গ্রহণ করল।

কিন্তু এখানেও খবর ফাঁস হয়ে গেল এবং সরকারি সওয়াররা জনপদে হানা দিল। এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁকে এক স্তূপ কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেললেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার ভাগ্যে আন্দালুসের মুসলমানদের অভিভাবকত্ব লেখা ছিল, তাই সিপাহি তাঁকে...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩৯ হিজরি; আন-নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ৩৩৫/২৩, মুদ্রণ: দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িকুল কাওমিয়া।

তারা এবারও তাকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হলো। [১]

আন্দালুসের আমিরদের সাথে যোগাযোগ:

পরিশেষে আবদুর রহমান মরক্কোর উপকূলীয় এলাকা ‘সেউটা’-তে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি জানতেন যে আন্দালুস আবাসীয় খিলাফতের প্রভাব থেকে অনেক দূরে এবং সেখানে বনু উমাইয়ার সমর্থকদের সংখ্যাও কম নয়। তাছাড়া সেখানে খ্রিস্টানদের ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং মুসলমানদের বিশৃঙ্খলাও তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি জানতেন যে যদি আন্দালুসের মুসলিম আমিরদের ঐক্যবদ্ধ করা না যায়, তবে সেখানে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ চিরতরে অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই তিনি তার বিশ্বস্ত গোলাম বদরকে পাঠিয়ে আন্দালুসের কিছু আমিরের সাথে গোপন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন যাতে সেখানে একটি নতুন স্থিতিশীল সরকার গঠন করা যায়।

এই প্রচেষ্টা সফল হলো এবং তাদের গোলাম বদর আন্দালুসের আমিরদের বার্তা নিয়ে তাদের কয়েকজন নেতার সাথে একটি জাহাজে করে সেউটার উপকূলে অবতরণ করল। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া তখন সালাতে মগ্ন ছিলেন। সালাম ফেরানোর পর বদর এগিয়ে এসে আন্দালুসের আমিরদের সমর্থনের সুসংবাদ শোনালেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া সাথে আসা আন্দালুসি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের নাম জিঙেস করলেন। তিনি বললেন: ‘কুনিয়াত হলো আবু গালিব, আর নাম হলো তাম্মাম’।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া শুভ লক্ষণ গ্রহণ করে বললেন: ‘ইনশাআল্লাহ আমরা হবো গালিব (বিজয়ী) এবং আমাদের উদ্দেশ্য হবে তাম্মাম (পূর্ণ)’। [২]

আন্দালুসে প্রবেশ, আমিরাত ঘোষণা:

রবিউল আউয়াল ১৩৮ হিজরি (আগস্ট ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ)-তে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার জাহাজ আন্দালুসের উপকূলে নোঙর করে। আন্দালুসি আমিররা উপকূলে প্রতীক্ষায় ছিলেন। গোত্রীয় প্রধানরা একে একে তার কাছে বায়াত গ্রহণের জন্য আসতে লাগলেন। ১লা শাওয়াল ১৩৮ হিজরি (৮ মার্চ ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ)-তে আন্দালুসি আমিরদের সমর্থনে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার আমিরাত ঘোষণা করে খুতবায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। [৩]

ইউসুফ বিন আবদুর রহমানের সাথে সংঘর্ষ:

সেই সময় ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহরি আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ শহর কর্ডোভা, টলেডো এবং সেভিলের শাসক ছিলেন। তিনি আবদুর রহমানের মোকাবিলায় বেরিয়ে এলেন। কর্ডোভার বাইরে ওয়াদিউল কাবির নদীর তীরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া ইউসুফ বিন আবদুর রহমানকে সন্ধির প্রলোভন দেখালেন এবং আলোচনা শুরু করলেন। ইউসুফ ধোঁকায় পড়ে গেলেন এবং ভাবলেন যে এখন সন্ধি হয়ে যাবে। ৯ জিলহজ ১৩৮ হিজরি (১৫ মে ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ)-এর সন্ধ্যায় ইউসুফ এবং তার অনুচরবর্গ এক বিশাল ভোজ...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/২৩৪, ২৩৫, ত. আর-রিসালাহ

[২] নাফহত তিব: ৩/৫০, আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৩০, ৩০

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৩৩

...প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে আবদুর রহমান আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাতের কোনো এক প্রহরে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করলে ইউসুফের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা পুরোদমে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, যা পরের দিন ঈদুল আযহার সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। যা-ই হোক, আবদুর রহমানের কৌশল সফল হয় এবং ইউসুফের বাহিনী পরাজিত হয়।

কুরতুবা (কর্ডোবা) যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কিছু ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়, কিন্তু অবশেষে সফর ১৩৯ হিজরি (জুলাই ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ) মাসে ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহরি কিছু শর্তসাপেক্ষে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার পক্ষে শাসনের দাবি ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। আন্দালুস দখলের পর আবদুর রহমান কুরতুবা-কে রাজধানী বানান এবং এরপর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই শহরটিই দেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে থাকে। [১]

আবদুর রহমান আউয়াল (প্রথম) কেবল স্থানীয় মুসলমানদের সাথেই নয়, বরং খ্রিস্টানদের সাথেও অত্যন্ত ভালো আচরণ করেন। তাঁর পক্ষ থেকে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য যে নিরাপত্তা সনদ (আমাননামা) লেখা হয়েছিল, তাতে লিপিবদ্ধ ছিল:

“এটি সারা দেশের পাদ্রি, সন্ন্যাসী এবং তাদের ধর্মাবলম্বীদের জন্য শান্তি ও রহমতের একটি দলিল; এটি জান ও ইজ্জত রক্ষার অঙ্গীকার, যা সম্মানিত আমিঁর, মহান শাসক আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া নির্ধারণ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সেই বিষয়গুলো পালনে অটল থাকবে যা তাদের ওপর আবশ্যিক করা হয়েছে।” [২]

এই চুক্তিনামায় ১লা সফর ১৩৩ হিজরি তারিখটি লেখা ছিল।

আব্বাসীয়দের থেকে দেশ রক্ষা:

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া মাত্র ৬ মাসের প্রচেষ্টায় আন্দালুস দখল করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এরপরও ছোটখাটো অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল এবং তিনি কখনোই এই বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে শঙ্কামুক্ত হওয়ার সুযোগ পাননি। ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরিও বিদ্রোহ করেন এবং ব্যর্থ হয়ে নিহত হন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বিদ্রোহের আগুন উসকে দেওয়ার পেছনে আব্বাসীয় খলিফাদের হাত ছিল, যারা আন্দালুসে একজন উমাইয়াকে ক্ষমতায় দেখতে পারতেন না।

এসব প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর ১৩৯ হিজরি (৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে আব্বাসীয় খলিফা মনসুর আফ্রিকার গভর্নর আলা বিন মুগিসকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে আন্দালুসে পাঠান যাতে আবদুর রহমানের শাসনের অবসান ঘটানো যায়। এই সময়ে আব্বাসীয়দের সমর্থক একজন আন্দালুসি সর্দার হাশিম বিন আবদ রাবিহ-ও এক বিশাল দল নিয়ে আন্দালুসে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন এবং তুলাইতুলা (টোলেডো)-তে স্বায়ত্তশাসিত শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াকে মাত্র সাতশ সৈন্য নিয়ে “কারমোনা” দুর্গে অবরুদ্ধ হতে হয়। প্রতিপক্ষ বাহিনী দুই মাস পর্যন্ত দুর্গটি অবরোধ করে রাখে।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া যখন মৃত্যুকে সামনে দেখলেন, তখন এক রাতে তিনি তাঁর সৈন্যদের তলোয়ারের খাপগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ...

[১] নিহায়াতুল আরাব: ২৩/২৩৮, ত. দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়াহ; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/১৫৫, ত. দারুল ফিকর

[২] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ৮/২০৫, ত. আর-রিসালাহ

দিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁর এই মুষ্টিমেয় সঙ্গীদের নিয়ে কয়েক গুণ বড় প্রতিপক্ষ বাহিনীর ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালিয়েছিলেন। হামলাটি এতটাই আকস্মিক ও তীব্র ছিল যে, আব্বাসীয় বাহিনী সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সাত হাজার আব্বাসীয় সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় এবং বাকিরা পিছু হটে আন্দালুস থেকে বেরিয়ে যায়। আবদুর রহমান এই অপ্রত্যাশিত ও গৌরবময় বিজয়ের পর আলা বিন মুগিস এবং অন্যান্য আব্বাসীয় কর্মকর্তাদের বিচ্ছিন্ন মস্তক আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দৃশ্য দেখে মনসুরের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এল: “আল্লাহর শুকরিয়া যে আমার এবং আবদুর রহমানের মাঝে সমুদ্র অন্তরায় হয়ে আছে।” [১]

এরপর আব্বাসীয় বাহিনীগুলোর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে আক্রমণ করার সাহস আর কখনো হয়নি।

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার চেষ্টা ছিল যাতে আব্বাসীয়দের সাথে বিরোধ না বাড়ে। তিনি এর জন্যও প্রস্তুত ছিলেন যে আন্দালুস আব্বাসীয়দের একটি করদ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাক যেখানে আব্বাসীয় খলিফাদের নামে খুতবা পাঠ করা হবে, কিন্তু যখন আব্বাসীয়দের আচরণ শত্রুতামূলক রয়ে গেল, তখন আবদুর রহমানও একটি স্বাধীন সরকারের রূপ গ্রহণ করলেন। তবে এটি তাঁর পরিমিত মেজাজের পরিচয় ছিল যে তিনি নিজের খেলাফত ঘোষণা করেননি, বরং আন্দালুসের সরকারকে ‘ইমারত’ এবং নিজেকে ‘আমির’ বলানোর ওপরই সন্তুষ্ট থাকলেন। তাঁর অধিকাংশ উত্তরসূরিও এই রাজনৈতিক ধারা অনুসরণ করেছিলেন এবং নিজেকে খলিফা বলা থেকে বিরত ছিলেন। [২]

ফ্রান্সের রাজার আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ:

মুসলমানদের মধ্যে এই গৃহযুদ্ধের সময় উত্তর আন্দালুস এবং দক্ষিণ ফ্রান্সে খ্রিস্টানদের শক্তি সুসংহত হতে থাকে। দক্ষিণ ফ্রান্স যা হিশাম বিন আবদুল মালিকের আমলে ইসলামি খেলাফতের অংশ হয়ে গিয়েছিল, আন্দালুসে গৃহযুদ্ধের সময় তা পুনরায় খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং এখন ফ্রান্সের শাসক শার্লিমেন আন্দালুসে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফারাও তাকে উৎসাহিত করেছিলেন যাতে সে আন্দালুস থেকে আবদুর রহমানের শাসনের অবসান ঘটায়।

শার্লিমেন আক্রমণের পূর্বে আন্দালুসের সেই সব আমিরদের সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে নিজের দলে ভিড়িয়ে নেন যারা আবদুর রহমানের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। আবুল আসওয়াদ নামক এক সর্দার আন্দালুসের কারাগার থেকে পালিয়ে তার সাথে যোগ দেন, সারগোসার শাসক তার ইশারায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গৃহযুদ্ধ শুরু করিয়ে শার্লিমেন লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান সৈন্য নিয়ে আন্দালুসের দিকে অগ্রসর হন।

আবদুর রহমান অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিপদের মোকাবিলা করেন। সারগোসার বিদ্রোহীদের দমনের জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি সালাবা বিন উবাইদকে প্রেরণ করেন, কিন্তু বেশ কিছু যুদ্ধের পর সারগোসার বিদ্রোহীরা বিজয়ী হয়, বিদ্রোহীরা সালাবাকে গ্রেপ্তার করে ফ্রান্সের রাজার হাতে তুলে দেয়। এরপর শার্লিমেন পিরেনিজ (Pyrenees) পর্বতমালা অতিক্রম করে আন্দালুসে প্রবেশ করতে শুরু করেন, সৈন্যবাহিনীর আধিক্য এমন ছিল যে রাস্তাগুলো অপ্রতুল হয়ে পড়েছিল। বাহিনীকে বিভক্ত করে বিভিন্ন পথে আনা হচ্ছিল। খ্রিস্টানদের এই প্লাবন দেখে আন্দালুসীয়দের হুঁশ ফিরে আসে, বিদ্রোহীরাও বুঝতে পারে যে তারা আন্দালুসকে খ্রিস্টানদের হাতে...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/৫১, ৫২; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৫৭, ত. দারুল ফিকর।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/৫৫; সিয়াকু আলামিন নুবালা: ৭/৪৭৫।

তারা দিচ্ছিল। তারা তাদের ভুল সংশোধন করল এবং খ্রিস্টান বাহিনী যখন সারকুস্তায় পৌঁছাল, তখন সেখানকার মুসলমানরা অভ্যর্থনার পরিবর্তে শহরের দরজা বন্ধ করে দিল। এদিকে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াও দ্রুত সারকুস্তার দিকে অগ্রসর হলেন। শার্লিম্যান যখন সারকুস্তাবাসীদের বিরোধিতা এবং আবদুর রহমানের অগ্রযাত্রা দেখলেন, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া সারকুস্তায় পৌঁছে স্থানীয় শাসক হুসাইন বিন আসির সাথে মৈত্রী স্থাপন করলেন এবং শার্লিম্যানকে তাড়া করে ফ্রান্সে প্রবেশ করলেন। এই বাহিনী দক্ষিণ ফ্রান্সের অনেক শহরের প্রাচীর, দুর্গ এবং পরিখাগুলো ধ্বংস করে দিল যাতে ভবিষ্যতে খ্রিস্টানরা সহজে সেগুলোকে নিজেদের ঘাঁটি বানাতে না পারে। শার্লিম্যান এই পরিস্থিতি দেখে আবদুর রহমানের সাথে সন্ধি করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ভবিষ্যতে ফরাসি বাহিনী আন্দালুসে হস্তক্ষেপ করবে না। [১]

মৃত্যু

আবদুর রহমানের জন্ম ১১৩ হিজরিতে হয়েছিল। আন্দালুসের ইসলামি সরকারকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পর ১লা রবিউস সানি ১৭২ হিজরি (৬ নভেম্বর ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ৩৩ বছর শাসন করেন এবং ৫৯ বছর বয়স পেয়েছিলেন। [২] তাঁকে কর্ডোভার কাসরুল খিলাফতের এক কোণে দাফন করা হয়। [৩]

ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র

আন্দালুসের ইতিহাসে আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়াকে আবদুর রহমান আদ-দাখিল এবং আবদুর রহমান আল-আউয়াল উপাধিতে স্মরণ করা হয়। নিঃসন্দেহে তিনি এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি সারাজীবন বিপদের মোকাবিলা করেছেন। আন্দালুসে ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর একটি দিনও অভিযান থেকে খালি ছিল না। এই সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি আন্দালুসের মাটিতে একটি চমৎকার শাসনব্যবস্থা কায়েম করে দেখিয়েছেন। আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়ার কটুর প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আবু জাফর মনসুর একবার তাঁর মজলিসের সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করেছিলেন: “সাকর-ই-কুরাইশ অর্থাৎ কুরাইশদের বাজপাখি কে?”

দরবারীরা বললেন: “আপনিই সেই ব্যক্তি যিনি সালতানাতকে অনুগত করেছেন, ফিতনা খতম করেছেন, বিশৃঙ্খলা দূর করেছেন এবং মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন।” মনসুর বললেন: “ভুল বলেছ। কুরাইশদের বাজপাখি হলেন আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া, যিনি বর্ষার ফলক এবং তলোয়ারের ধারের মধ্য থেকে নিজের বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বেঁচে বেরিয়ে গেছেন, জনমানবহীন প্রান্তর অতিক্রম করেছেন, সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন, এমনকি একা একটি অপরিচিত দেশে প্রবেশ করেছেন এবং একের পর এক শহর জয় করেছেন। বাহিনী বিন্যস্ত করেছেন এবং উত্তম কৌশল ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে নিজের হারানো রাজত্ব পুনরায় কায়েম করেছেন।” [৪]

একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ থেকে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের জন্য এর চেয়ে বড় শ্রদ্ধাঞ্জলি আর কী হতে পারে!

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/৫৭৫

[২] সিয়রুু আলামিন নুবালা: ৮/২৫২, ২৫৩, তাবাআত আর-রিসালাহ

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/৬৫

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/৫৯

উন্নয়নমূলক কাজ:

আবদুর রহমান বিন মুয়াবিয়া আন্দালুসের সমস্ত রাস্তাঘাট যা জরাজীর্ণ ও অকেজো হয়ে পড়েছিল, তা মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। বেশ কিছু নতুন রাস্তাও তৈরি করান, জায়গায় জায়গায় সামরিক চৌকি স্থাপন করে লুটতরাজ ও রাহাজানি বন্ধ করেন। ডাক ব্যবস্থার জন্য প্রতিটি চৌকিতে দ্রুতগামী ঘোড়া রাখেন। আদালতগুলোতে শরীয়ত অনুযায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। ইমারত বা ভবন নির্মাণের প্রতি তাঁর চমৎকার রুচি ছিল। কর্ডোবার পশ্চিমে তিনি ফলদ গাছ ও ফুলে সুশোভিত একটি অত্যন্ত মনোরম বাগান তৈরি করান যাকে “রুসাফা” বলা হয়। কর্ডোবার সুউচ্চ ও বিশাল প্রাচীর যাতে আটটি দরজা রয়েছে, তা তাঁরই কীর্তি। [১]

১৭০ হিজরিতে তাঁর আদেশ, পরিকল্পনা ও নকশা অনুযায়ী কর্ডোবার বিশ্ববিখ্যাত জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আমির আবদুর রহমান নিজেই মসজিদের নির্মাণ কাজ তদারকি করতেন এবং কখনো কখনো শ্রমিকদের সাথে কাজে অংশ নিতেন। মসজিদের শোভাবর্ধনের জন্য তিনি মার্বেল পাথরের ফলক আনিয়েছিলেন, দেয়ালে কারুকার্য করিয়েছিলেন এবং প্রশস্ত ও উঁচু দরজা তৈরি করিয়েছিলেন। মসজিদের মেঝে সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের তৈরি ছিল। নির্মাণ কাজ ১৭০ হিজরি (৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ) এ শুরু হয় এবং দুই বছরের মধ্যে এটি এমন এক বিশাল পরিসরে অত্যন্ত মনোরম নকশা অনুযায়ী প্রস্তুত হয়ে যায় যে এতে নামাজ আদায় করা সম্ভব হয়। এই সময় পর্যন্ত এতে ৮০ হাজার দিনার ব্যয় করা হয়েছিল। [২]

জ্ঞান-সাহিত্য ও কবিতা:

আমির আবদুর রহমানের জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। রণক্ষেত্র ও রাজনীতির বাইরে তাঁর একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কোমল হৃদয় ছিল। তিনি নিজেও চমৎকার কবিতা লিখতেন। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সিরিয়া থেকে খেজুরের একটি চারা এনে রুসাফা বাগানে রোপণ করেছিলেন। এটি ছিল আন্দালুসের প্রথম খেজুর গাছ। পরবর্তীতে এরই চারা থেকে আন্দালুসে খেজুরের বাগান গড়ে ওঠে। আমির আবদুর রহমান এই গাছটিকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে দেখতেন। এমন অবস্থায় যখন নিজের দেশ ও আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়ত, তখন তাঁর আত্মার তারে টান লাগত এবং মুখ থেকে আবেগপূর্ণ কবিতা ঝরতে থাকত। একদিন এই দৃশ্য দেখে তিনি বলেন:

تَبَدَّتْ لَنَا وَسَطَ الرُّصَافَةِ نَخْلَةٌ
تَنَاءَتْ بِأَرْضِ الْغَرْبِ عَنْ بَلَدِ النَّخْلِ

“রুসাফার বাগানের মাঝখানে একটি খেজুর গাছ দেখা গেল, যা খেজুরের দেশ (আরব) থেকে দূরে সরে এসে পশ্চিমাঞ্চলে (ইউরোপে) চলে এসেছে।”

[১] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/৭৮, ৭৯

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/২৭৬, ২৭৭

আমি বললাম, “তুমি প্রবাসে থাকা, বিচ্ছেদ এবং সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন থেকে দীর্ঘ দূরত্বের ক্ষেত্রে আমারই মতো।”

“তুমিও এক বেগানা ভূমিতে বেড়ে উঠেছ। সুতরাং প্রবাস জীবন ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তুমিও আমারই মতো।”

“ভোরের মেঘমালা তোমাকে এমন মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে সিঁত্র করতে থাকুক, যা সামাকাইন নামক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পানি নিয়ে অবিরাম বর্ষিত হয়।”

একবার এই গাছটিকে সম্বোধন করে তিনি নিজের আবেগ এভাবে প্রকাশ করেন:

“হে খেজুর গাছ! তুমিও আমার মতো একাকী, যে নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমে চলে এসেছে।”

“অতঃপর আমি কাঁদছি, কিন্তু ছড়া দিয়ে ঢাকা এই নির্বাক খেজুর গাছ কি কাঁদতে পারে? অথচ কল্পনাপ্রসূত চিন্তা করা তো তার স্বভাব নয়।” [১]

“যদি সে কাঁদতে পারত, তবে (তাকে সেচনকারী) ফোরাত নদীর পানি এবং (তার স্বদেশ) খেজুর বাগানের জন্য কাঁদত।”

“কিন্তু সেও বঞ্চিত হয়েছে, আর আমাকেও বনু আব্বাসের বিদ্বেষ আপনজনদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।” [২]

[১] তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবীতে مَكْمُومٌ (মুকামমামাতুন)-এর স্থলে مَكْمُومٌ (মুকাম্মাদাতুন) উল্লেখ আছে, কিন্তু নাফহত তীব (পৃষ্ঠা ৬০৩)-এ مَكْمُومٌ-ই রয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ “চাদর পরিহিত” বা “ছড়া দিয়ে ঢাকা”। مَكْمُومٌ-এর অর্থ হলো “বুদ্ধিমান সন্তান জন্মদানকারী”, যা গ্রহণ করা অর্থের দিক থেকেও সঠিক নয় এবং কবিতার ছন্দের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

[২] তারীখুল ইসলাম লিয-যাহাবী: ১১/২৪১, ত. তাদমুরী।

মরহুম আল্লামা ইকবাল আমির আবদুর রহমান আউয়ালের এই কবিতাগুলোর মর্মার্থ তাঁর কবিতায় এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

তুমি আমার চোখের জ্যোতি

তুমি আমার হৃদয়ের প্রশান্তি

আমি আমার উপত্যকা থেকে দূরে

তুমি আমার জন্য তুর পর্বতের বৃক্ষ

পশ্চিমের হাওয়া তোমাকে লালন করেছে

তুমি আরব মরুভূমির হ্র

পরবাসে আমি অধৈর্য

পরবাসে তুমিও অধৈর্য

বিদেশের হাওয়ায় ফলবান হও

সাকি, তোমার ভোর যেন শিশিরসিক্ত হয় [১]

[১] বাল-ই-জিবরীল, কবিতা অংশ।

হিশাম আউয়াল আর-রাযী

১৭২ হিজরি থেকে ১৮০ হিজরি (৭৮৮ খ্রি. থেকে ৭৯৬ খ্রি.)

আবদুর রহমান আদ-দাখিল তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র হিশামের উত্তরাধিকার ঘোষণা করেছিলেন। তাই ১লা জমাদিউল আখিরা ১৭২ হিজরিতে তাঁর মৃত্যুর পর হিশাম বিন আবদুর রহমান আন্দালুসের দ্বিতীয় উমাইয়া শাসক হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিহাসে তাঁকে হিশাম আউয়াল, হিশাম আর-রাযী এবং আল-আদিল উপাধিতে স্মরণ করা হয়।

হিশাম আউয়াল শৈশব থেকেই আন্দালুসের প্রখ্যাত আলেম, ফকিহ এবং মাশায়েখদের মজলিসে উপস্থিত হতেন এবং তাঁদের থেকে উপকৃত হতেন। তিনি ইলম ও আমলের পিপাসু ছিলেন, শরিয়ত কঠোরভাবে মেনে চলতেন এবং সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য ইবাদত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সতর্কতা এবং পিতার মতো বীরত্ব ছিল তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সচ্চরিত্র, দয়াদ্রুত, দানশীলতা এবং খোদাভীতি ছিল তাঁর অনন্য গুণাবলি। পিতার মতো তিনিও বিভিন্ন বিজ্ঞানে ঈর্ষণীয় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ও কাব্যিক রুচিও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাঁর বড় ভাই সুলাইমান এই গুণাবলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন।

এই কারণেই আবদুর রহমান আদ-দাখিল সাধারণ প্রথা থেকে সরে এসে বড় ছেলের পরিবর্তে তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। [১] এই নির্বাচনের আগে আবদুর রহমান উভয় ভাইকে কয়েকবার পরীক্ষা করেছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় হিশাম সুলাইমানের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এই বিষয়ে একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো, একবার আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিল এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিলেন:

وَتَعْرِفُ مِنْ أَبِيهِ شَمَائِلًا ... مِنْ خَالِهِ أَوْ مِنْ يَزِيدَ وَمِنْ حَجْرٍ
سَمَاحَةً ذَا وَبَرٍّ ذَا وَوَفَاءَ ذَا ... وَنَائِلَ ذَا إِذَا صَحَّ وَإِذَا سَكِرَ

“তার পিতা এবং তার মামার অথবা ইয়াজিদ ও হুজরের আকৃতি দেখে তুমি সেই (প্রশংসিত ব্যক্তির) দানশীলতা, তার পুণ্য, তার বিশ্বস্ততা এবং তার দান চিনতে পারবে, সে সচেতন থাকুক বা মত্ত থাকুক।”

হিশাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমির আবদুর রহমান হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি জানো এগুলো কার কবিতা?” হিশাম অত্যন্ত আদবের সাথে উত্তর দিলেন: “হুজুর! এগুলো কিন্দার রাজা ইমরুল কায়েসের কবিতা এবং মনে হচ্ছে যেন...”

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ১/৬৫; সিয়রু আলামিন নুবালা: ৮/২৫৩, তাবাতুতুর রিসালাহ।

“যে আমিরুল মুসলিমীনের শানেই এগুলো বলা হয়েছে।”

হিশামের এই যথাযথ উত্তর শুনে আমির আবদুর রহমান তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং পুরস্কারে ভূষিত করলেন।

অন্য এক সময়ে আমির এই একই কবিতা বড় ছেলে সুলাইমানের সামনে পাঠ করলেন এবং কবির নাম জানতে চাইলেন।

সুলাইমান অবহেলার সাথে বললেন: “জানি না এগুলো কার কবিতা, মনে হয় আরবদের কোনো সংকীর্ণমনা লোক বলেছে। যাই হোক, যারই হোক না কেন, এই বেদুইনদের কবিতা মুখস্থ করার আমার কী প্রয়োজন।”

আমির আবদুর রহমান এই উত্তর শুনে নীরবে মাথা নিচু করে নিলেন। এই ধরনের কয়েকটি পরীক্ষার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আন্দালুসের শাসনের উত্তরাধিকারী হিশামকেই বানানো উচিত।

ভাইদের সাথে সংঘর্ষ ও সদ্যবহার:

সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রথম হিশামের বয়স ছিল প্রায় ৩৪ বছর। তার বড় ভাই সুলাইমান তার সিংহাসন আরোহণে খুশি ছিলেন না, তাই তিনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হলেন। সুলাইমান ফুসতাতের রাজপ্রাসাদ দখল করে নিজের শাসন ঘোষণা করলেন, কিন্তু জনগণ হিশামকে ভালোবাসত, তারা রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে সুলাইমানকে সেখান থেকে বের হতে বাধ্য করল। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে সুলাইমান তার অন্য ভাই আবদুল্লাহর সাথে মিলে হিশামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়ে যান, কিন্তু তাদের উভয়কেই সর্বদা ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়। অবশেষে উভয়েই হিশামের কাছে ক্ষমার আবেদন করেন, হিশাম তা কবুল করে তাদের উভয়কে অসাধারণ সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

আবদুল্লাহকে তলেতোতে একটি বিশাল জায়গির দান করা হয়, আর সুলাইমানকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ সুযোগ-সুবিধাসহ আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শরয়ী বিধান জারি:

প্রথম হিশাম সিংহাসনে আরোহণ করেই তার পিতার চেয়েও বেশি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে শরয়ী বিধান কার্যকর করেন। শরয়ী কর ব্যতীত সকল ট্যাক্স মওকুফ করে দেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সদকা, জাকাত ও উশর আদায়ের নির্দেশ দেন এবং এর জন্য আমিল নিয়োগ করেন। আল্লামা ইবনুল আসির এবং ‘নাফহত তীব’ এর লেখক জাকাত ও উশর ব্যবস্থা কয়েম করাকে হিশামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ:

প্রথম হিশাম কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অসাধারণ উদ্দীপনা রাখতেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্রোহী আত্মীয়-স্বজন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সরদারদের...

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৩৩৩

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/১৫৯, দারুল ফিকর; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/৬৩, ৬৪

[৩] নিহায়াতুল আরাব লিন-নুওয়াইরি: ২৩/৫৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৮০ হিজরি, হিশামের মৃত্যু প্রসঙ্গ।

প্রতিরোধের কারণে তিনি নিজের জিহাদের স্পৃহা মেটানো থেকে বঞ্চিত ছিলেন। যখন স্থানীয় বিদ্রোহ এবং অভ্যন্তরীণ বিবাদের আগুন প্রশমিত হলো, তখন হিশাম আন্দালুসের ইসলামী সরকারের চরম শত্রু খ্রিস্টান শাসকদের সাথে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি জিহাদের ঘোষণা দিয়ে আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার এক প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুললেন।

১৭৫ হিজরি (৭৯১ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি আবু উসমানের নেতৃত্বে চল্লিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর দিকে প্রেরণ করেন। উত্তর আন্দালুসের বেশ কিছু এলাকা যা দীর্ঘকাল ধরে আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর পুনরায় খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল, হিশামের বাহিনী সেই এলাকাগুলোকে পুনরায় ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

গ্যালিসিয়ার খ্রিস্টান রাজ্য এবং আস্তুরিয়াস (Asturias) এর পাহাড়ি খ্রিস্টানরা দীর্ঘকাল ধরে আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিশাম তার সেনাপতি ইউসুফ বিন বুখতকে এই অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। ইউসুফ বিন বুখত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করে এই বিদ্রোহী রাজ্যের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন এবং তাদের বিদ্রোহী শাসক বারমুডোকে বন্দি করেন। খ্রিস্টান রাজ্য এবং দক্ষিণ ফ্রান্সের এই অভিযানগুলোর সময় মুসলমানরা প্রচুর পরিমাণে গনিমত লাভ করে। নারবোন থেকে যে গনিমত অর্জিত হয়েছিল তার এক-পঞ্চমাংশ ছিল ৪৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। আমির হিশাম এই পুরো অর্থ জামে মসজিদ কর্তোভার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেন।

১৭৭ হিজরিতে হিশাম তার অত্যন্ত যোগ্য সেনাপতি আব্দুল মালিককে একটি বিশাল বাহিনী দিয়ে “সেপ্টিম্যানিয়া” এবং “এলনে” এর দিকে প্রেরণ করেন। এই এলাকাগুলো স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল নারবোন (NARBONNE)। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটি দক্ষিণ ফ্রান্সে ইসলামী বিজয়ের কেন্দ্র ছিল, কিন্তু গত প্রায় ৪০ বছর ধরে এখানে ফরাসীরা দখলদার ছিল। ইসলামী বাহিনী “এলনে” দুর্গের ওপর আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়।

জিরোনা দুর্গটি কিছুকাল আগে ফরাসীরা মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র ছিল এবং এখান থেকে অনেকগুলো রাস্তা একে অপরের সাথে মিলিত হতো। এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ১৭৭ হিজরিতে হিশামের নির্দেশে ইসলামী বাহিনী গভীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এরপর এই দুর্গের ওপর হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে দেয়। একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র মোকাবিলার ফলে দুর্গটি জয় হয়ে যায় এবং ইসলামী বাহিনীর জন্য অনেকগুলো দিকে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যায়।

ইসলামী বাহিনী আরও সামনে এগিয়ে “ওয়াদি রাহোল” দখল করে নেয়। ফরাসী সম্রাট শার্লিমেন তখন জার্মানিতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তার এই ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে আন্দালুসি সৈন্যরা খুব সহজেই বিশাল এলাকা জয় করে নেয়। [১]

সেপ্টিম্যানিয়া এবং এর আশপাশের এলাকা থেকে মুসলমানদের হাতে সোনা, রূপা, জহরত এবং অলঙ্কারের অগণিত ভাণ্ডার অর্জিত হয়। নারবোনের প্রাচীরগুলো মজবুত পাথর ও সিসা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। আব্দুল মালিক যুদ্ধবন্দিদের নির্দেশ দেন...

[১] নেহায়াতুল আরব: ২৩/৩৫১, আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/৬৩-৬৫।

৪০১ - তারিখ উন্মতে মুসলিমা

নির্দেশ দেওয়া হলো যে, প্রাচীরের পাথরগুলো আলাদা করে নেওয়া হোক। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হলো। আব্দুল মালিক প্রত্যেক বন্দীকে একটি করে পাথর তুলে ফুসতাতের জামে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে হাজার হাজার বন্দী প্রাচীরের পাথর কাঁধে নিয়ে ফুসতাতের দিকে রওনা হলো। বড় পাথরগুলোকে কয়েকজন বন্দী মিলে বহন করেছিল। ফুসতাত পৌঁছানোর পর আব্দুল মালিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন। ফুসতাতের জামে মসজিদের পশ্চিম দিকে এই পাথরগুলো দিয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হলো। একটি প্রাচীরকে শত শত মাইল দূরে স্থানান্তর করা আব্দুল মালিকের এক চমৎকার ও বিস্ময়কর কীর্তি ছিল। [১]

জিহাদের দ্বিতীয় অভিযান:

১৭৮ হিজরিতে (৭৯৫ খ্রিষ্টাব্দে) হিশাম তার বিশ্বস্ত আমীর আব্দুল মালিক এবং তার ভাই আব্দুল করিমকে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। আব্দুল করিম বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেপ্টিম্যানিয়া অঞ্চলে প্রবেশ করেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের শহর জিরোনা এবং নারবোন (আরবোন) আগেই জয় করা হয়েছিল, তাই আব্দুল করিম কোনো বাধা ছাড়াই সামনে এগিয়ে যান। এখানে ফরাসি জেনারেল উইলিয়াম ডিউক অফ টুলুস এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তার মোকাবিলায় আসেন, কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান। [২]

তৃতীয় অভিযান:

আব্দুল মালিকের নেতৃত্বে গমনকারী বাহিনী গ্যালিসিয়ার খ্রিষ্টান রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। দ্বিতীয় আলফনসো এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে সামনে এগিয়ে আসেন, কিন্তু যখন মুখোমুখি মোকাবিলা হলো, তখন খ্রিষ্টানদের ওপর এমন আতঙ্ক ছেয়ে গেল যে তারা পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে গেল। ইসলামী বাহিনী পুরো রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করল। তবে যেহেতু এই অঞ্চলটি অত্যন্ত শীতল এবং বসবাসের জন্য অনুপযোগী ছিল, তাই মুসলমানরা এখানে বসতি স্থাপন না করার সিদ্ধান্ত নিল।

হিশাম আউয়ালের এই জিহাদি অভিযানগুলোর কারণে দূর-দূরান্তের খ্রিষ্টান শাসকদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হলো এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা আন্দালুসের ইসলামী সালতানাতের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পায়নি। হিশাম আউয়ালের মুজাহিদসুলভ কর্মকাণ্ডের কারণে আন্দালুসের ইতিহাসে তাকে “কাসীরুল গাজওয়া ওয়াল জিহাদ” (অধিক পরিমাণে যুদ্ধ ও জিহাদকারী) নামে স্মরণ করা হয়। [৩]

হিশাম আউয়ালের প্রতাপ খ্রিষ্টানদের মনে এতটাই কম্পন সৃষ্টি করেছিল যে, সেই যুগে কোনো খ্রিষ্টান রাজা বা বাদশাহ কোনো মুসলমানকে গ্রেপ্তার বা বন্দী করার সাহস পেত না। আল্লামা ইবনুল আসীর বর্ণনা করেন:

“হিশামের যুগে ইসলাম এতটাই সম্মান এবং কুফর এতটাই লাঞ্ছনা লাভ করেছিল যে, সেই দিনগুলোতে কোনো একজন ব্যক্তিও মৃত্যুবরণ করতে...”

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব, মাক্কারি তিলমিসানি: ১/৩৩৭

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২২/৩৫৫ থেকে ৩৫৭, তাবা দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়াহ; নাফহত তীব: ১/৩৩৭

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১২০, তাবা দারুল ফিকর; নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতিব, মাক্কারি তিলমিসানি: ১/১৩৩

ওসিয়ত করেছিলেন যে, তার সম্পদের একটি অংশ কোনো মুসলিম বন্দীকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে ব্যয় করা হোক। যখন সেই ব্যক্তির ওসিয়ত পূরণ করার জন্য কাফেরদের দেশগুলোতে কোনো মুসলিম বন্দীর খোঁজ শুরু করা হলো, তখন জানা গেল যে কোথাও কোনো মুসলিম বন্দী নেই যাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করা যেতে পারে। আর এটি ছিল কাফেরদের দুর্বলতা এবং মুসলমানদের শক্তির কারণে। [১]

হিশামের প্রতি ইমাম মালিক (রহ.)-এর অদেখা ভালোবাসা:

হিশামের যুগে মুসলিম বিশ্বের মহান মুজতাহিদ হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-এর ইলমি কামালত (জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব) এবং ফিকহি দক্ষতার খ্যাতি বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়ছিল। হিশাম ইমাম মালিক (রহ.)-এর ইলমি মাকাম (জ্ঞানগত মর্যাদা) দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। এদিকে হযরত ইমাম মালিক (রহ.)-ও হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও আন্দালুসের এই মুজাহিদ ব্যক্তির অবস্থা শুনে আনন্দিত হতেন। একবার তিনি আন্দালুসের বিখ্যাত আলেম যিয়াদ বিন আবদুর রহমান লাখমি (রহ.)-এর মুখে হিশামের কীর্তিগাঁথা শুনে বললেন: “হায়! আল্লাহ তাআলা যদি আমাদের হজকে এমন লোকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৌন্দর্য দান করতেন।” [২]

আন্দালুসে মালেকি ফিকহের প্রসার:

হিশামের যুগে আন্দালুসের ছাত্ররা প্রচুর সংখ্যায় মদিনা মুনাওয়ারা সফর করে ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট থেকে ফয়েজ (জ্ঞান) অর্জন করেন এবং পরে আন্দালুসে ফিরে এসে মালেকি মাযহাবের প্রচার-প্রসার করেন। স্বয়ং আমির হিশাম ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া এবং অন্যান্য প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বিনি ইলম এবং উসূলে ফিকহ অর্জনের জন্য ইমাম মালিক (রহ.)-এর খিদমতে প্রেরণ করেছিলেন।

এই ব্যক্তিবর্গ ইমাম মালিক (রহ.)-এর সান্নিধ্যে থেকে দিন-রাত এক করে মালেকি ফিকহ শেখেন এবং মুয়াত্তা ইমাম মালিক অধ্যয়ন করেন। যখন তারা ফিরে আসলেন, তখন হিশাম তাদের সরকার ও শরয়ি আদালতসমূহের উচ্চপদে নিযুক্ত করলেন। একারণেই আন্দালুসে মালেকি মাযহাব ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রতি ভক্তির কারণে হিশাম এবং তার সরকারের সদস্যরা মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাসমূহে ইমাম মালিক (রহ.)-এর ইজতিহাদের ওপর আমল করতেন। আমির হিশামের নিকট মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহ.) ছিল হাদিস এবং ইসলামি ফিকহের সবচেয়ে চমৎকার কিতাব। পরবর্তীতেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আন্দালুসের আদালত এবং ইফতা কেন্দ্রগুলোতে কুরআন মাজিদের পর মুয়াত্তা ইমাম মালিককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। [৩]

শিক্ষা ও ইসলামের প্রচার:

আমির হিশাম আউয়ালের একটি বড় কীর্তি এটিও যে, তিনি পুরো আন্দালুসে ইসলামি শিক্ষার কেন্দ্রসমূহের জাল বিছিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিটি শহরে বড় বড় জামিয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) এবং প্রতিটি জনপদ ও গ্রামে মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। সমসাময়িক জ্ঞানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১৮০ হিজরি, হিশামের মৃত্যুর আলোচনা।

[২] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ১/ ৩৩৭।

[৩] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/ ৮৩; নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/ ২৩০; তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস: ১/ ১১২, ১১৩।

বিভিন্ন স্থানে [শিক্ষা প্রতিষ্ঠান] খোলা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ছিল সরকারি খরচে।

এই যুগে আরবি ভাষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং একে আন্দালুসের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার ফলে আন্দালুসে আরবির ব্যাপক প্রচার ঘটে। স্থানীয় অমুসলিম জাতিসমূহ এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম যখন আরবির সাথে পরিচিত হলো, তখন তারা ইসলামি শিক্ষা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পেল। এভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ইসলামে প্রবেশের পথ সুগম হলো। [১]

ন্যায়বিচার ও ইনসাফ:

হিশাম দেশে ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যেকের জন্য নিজের দরজা উন্মুক্ত রাখেন। তাঁর যুগে আন্দালুসের শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনি তাঁর আমিল ও কর্মকর্তাদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন এবং এমন কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে ভবিষ্যতে যেকোনো পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করতেন।

একবার এক সরকারি কর্মকর্তা এক ব্যক্তিকে মারধর করে। সেই ব্যক্তি আমির হিশামের সওয়ারির পথে দাঁড়িয়ে গেল যাতে সে সরাসরি আমিরের কাছে নিজের ফরিয়াদ জানাতে পারে। সেখানে উপস্থিত এক কর্মকর্তার সাথে সেই অত্যাচারী কর্মকর্তার গভীর সম্পর্ক ছিল। সে চাইল যেন বাদশাহর কাছে অত্যাচারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ না পৌঁছায় এবং মজলুমের প্রতিকারও হয়ে যায়।

সে ফরিয়াদিকে নিজের সাথে নিয়ে একটি তাঁবুতে বসাল, তারপর অত্যাচারী কর্মকর্তাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সেখানে ডেকে আনল এবং উভয়কে আপস করিয়ে দিল। পরবর্তীতে হিশাম এই কর্মকর্তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। সহচরগণ আরজ করলেন: “হজুর, ফরিয়াদিকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে।”

কিন্তু হিশাম আশ্বস্ত হলেন না। তিনি বললেন: “যতক্ষণ না অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া হয়, ততক্ষণ মজলুমের প্রতি ইনসাফ করা যায় না।” তিনি ফরিয়াদিকে ডাকলেন এবং বললেন, “যদি এই কর্মকর্তা শরয়ি দণ্ড ব্যতীত তোমাকে মারধর করে থাকে, তবে তার বিবরণ হলফনামা আকারে বর্ণনা করো।” অতঃপর বাদশাহর সামনে ফরিয়াদি হলফনামা প্রদান করল এবং অত্যাচারী কর্মকর্তার কাছ থেকে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করল। [২]

কুধারণা নির্মূল করার জন্য নিজের নফসের ওপর কঠোরতা:

হিশাম কর্ডোভার নিকটবর্তী ওয়াডিউল কাবিরের সেতুটি নতুন করে নির্মাণ করান। এই নির্মাণ ছিল অত্যন্ত মজবুত ও আকর্ষণীয়। সেতুটি তৈরি হলো, হাজার হাজার মানুষ তা দেখতে এল। কারো মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, “বাদশাহ সরকারি অর্থ দিয়ে এই সেতুটি এজন্য নির্মাণ করেছেন যাতে তাঁর নিজের যাতায়াতে সুবিধা হয়।” এই কথা হিশামের কানে পৌঁছালে তিনি সারাজীবনে আর সেই সেতুতে পা রাখেননি, যাতে জনগণের মনে কোনো কুধারণা সৃষ্টি না হয়। [৩]

[১] তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস: ১/১২১, ১২৩, ১২৯, ১৮৫, ২২৫।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৬৬।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৬৬।

এই নেক সীরাত সম্পন্ন শাসক প্রায় সাত বছর শাসন করার পর ১লা রজব ১৮০ হিজরী (৯ সেপ্টেম্বর ৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনচল্লিশ (৩৯) বছর চার মাস। তিনি তাঁর বড় ছেলে আব্দুল মালিকের পরিবর্তে ছোট ছেলে আল-হাকামকে উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, যোদ্ধা এবং যোগ্য যুবক। আন্দালুসের জনগণের হিশাম আর-রাজীর প্রতি এতটাই ভক্তি ছিল যে, তারা তাঁকে আমীর আদিল বলে স্মরণ করত। আল্লামা ইবনুল আসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

“তাঁর গুণাবলি বর্ণনায় আন্দালুসবাসীরা এমনকি এও বলত যে, তিনি তাঁর সীরাত ও চরিত্রে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সদৃশ ছিলেন।”

বাস্তবতা হলো, যদিও আন্দালুসের উমাইয়া শাসনের ভিত্তি আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু একে সঠিক অর্থে স্থায়িত্ব দান করেছিলেন হিশাম আউয়াল। তাঁর শাসনামল ছিল মাত্র সাত বছর, কিন্তু বিজয় ও স্থায়িত্বের দিক থেকে এই সময়কাল এতটাই সফল ছিল যে, এই শাসন তিন শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। এই সময়ে একে বারবার অভ্যন্তরীণ ফিতনা-ফ্যাসাদ এবং বাহ্যিক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু সালতানাতের প্রাথমিক দুই স্থপতি এর কাঠামোকে এতটাই মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন যে, প্রতিকূল বাতাসের ক্রমাগত ঝাপটা সত্ত্বেও এই বংশের সম্রাটগণ ৩০০ বছর পর্যন্ত আন্দালুসে শাসন করে গেছেন।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: হিজরী ১৮০ সাল, হিশামের মৃত্যুর আলোচনা।

আল-হাকাম আল-আউয়াল, আর-রাবাদি

(১৮০ হিজরি থেকে ২০৬ হিজরি / ৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮২২ খ্রিস্টাব্দ)

হিশাম আউয়ালের পর সফর ১৮০ হিজরিতে তাঁর ২৬ বছর বয়সী পুত্র আল-হাকাম বিন হিশাম ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি একজন সৈনিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁকে আল-হাকাম আউয়াল নামে স্মরণ করা হয়।

তবে এই গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে তাঁকে ক্রমাগত বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার ফলে তিনি কঠোর প্রকৃতির হয়ে ওঠেন এবং কিছু ক্ষেত্রে তাঁর অস্বাভাবিক কঠোরতা জুলুমের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই কারণে ইতিহাসে তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের মতো প্রশংসনীয় স্থান লাভ করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও এটি সত্য যে, আন্দালুসকে বিদেশি ভাগ্যান্বেষীদের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করতে তাঁর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

চাচাদের বিদ্রোহ:

আল-হাকাম ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ১৮৩ হিজরিতে একটি বিশাল বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। ঘটনাটি ছিল এমন যে, তাঁর চাচা আবদুল্লাহ এবং সুলাইমান, যাঁদের পূর্ববর্তী শাসনামলে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তাঁরা ফিরে এসে তাঁর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তাঁরা ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের সাথে এই মর্মে ষড়যন্ত্র করেন যে, তাঁদের বিদ্রোহের ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই তিনি উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করবেন। এ ছাড়া উত্তর সীমান্ত রাজ্য ‘অ্যাকুইটেইন’-এর খ্রিস্টান নবাবও এই ষড়যন্ত্রে শরিক হন।

আবদুল্লাহ তলেয়তলায় পৌঁছে স্থানীয় খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নিজের পক্ষে নিয়ে আসেন। সুলাইমান বালানসিয়ায় বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। একই সময়ে শার্লিমেন অগ্রসর হয়ে বার্সেলোনায় পৌঁছে যান এবং অ্যাকুইটেইনের শাসক উত্তর আন্দালুসের আরও বেশ কিছু শহর দখল করে নেন।

আল-হাকাম আউয়াল আবদুল্লাহর বিদ্রোহের খবর শুনেই তলেয়তলায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন শার্লিমেনও উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি তলেয়তলার অবরোধ ত্যাগ করে উত্তর সীমান্তের দিকে রওনা হন। তাঁর ঝোড়ো আক্রমণ দেখে অ্যাকুইটেইনের শাসক প্রাণভয়ে পালিয়ে যান এবং নিজের রাজ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শার্লিমেনও বার্সেলোনার অবরোধ ছেড়ে পিছু হটেন, কিন্তু আল-হাকাম তাঁর পিছু ধাওয়া করে ফ্রান্সে প্রবেশ করেন এবং পিরেনিজ পর্বতমালা (Pyrenees) ও “নারবোন” চোখের পলকে জয় করে নেন।

এই সময়ের মধ্যে তাঁর বিদ্রোহী চাচা আবদুল্লাহ ও সুলাইমান সুযোগ বুঝে আন্দালুসের অধিকাংশ শহর দখল করে নেন। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল...

যে আল-হাকাম আউয়াল ফ্রান্সে পরাজিত হয়েছেন এবং তাদের জন্য ক্ষমতার পথ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের প্রত্যাশার বিপরীতে আল-হাকাম ফরাসিদের নাভিশ্বাস তুলে দিলেন। যদি পেছনে বিদ্রোহীদের আধিপত্যের খবর না আসত, তবে তিনি সহজেই মধ্য ফ্রান্স পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন, কিন্তু তাকে কয়েকটি বিজয়ের পর অবিলম্বে ফিরে আসতে হয়েছিল যাতে বিদ্রোহ দমন করা যায়।

তার বিজয়ী আগমন বিদ্রোহীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিল এবং শহরগুলো থেকে তাদের আধিপত্য শেষ হয়ে গেল। অবশ্য পাহাড়ে দুই-তিন বছর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন অব্যাহত ছিল। অবশেষে ১৮৫ হিজরির এক সংঘর্ষে সুলাইমান নিহত হন।

১৮৭ হিজরিতে আবদুল্লাহও হার মেনে ক্ষমার আবেদন পাঠান, যা আল-হাকাম কবুল করে নেন। তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মরক্কোর তানজাহ শহরে পাঠিয়ে তার খরচের জন্য মাসিক এক হাজার দিনার বরাদ্দ করে দেন। আল-হাকাম আরও উদারতার পরিচয় দিয়ে আবদুল্লাহর ছেলে কাসিমকে নিজের জামাতা বানিয়ে নেন। [১]

ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক:

আল-হাকামের শাসনামলে মরক্কোতে আলবিদের স্বাধীন রাষ্ট্র ‘ইদ্রিসি রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্দালুসের জন্য এটি ছিল এক বিরাট নিয়ামত, কারণ এই সরকার ছিল বনু আব্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফলে এর প্রতিষ্ঠার পর আন্দালুসের ওপর আব্বাসীয়দের সরাসরি আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়ে যায়। আল-হাকাম বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ইদ্রিসি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, স্বয়ং বনু আব্বাসের অন্তর থেকে আন্দালুস আক্রমণের চিন্তা দূর হয়ে গেল; এর পরিবর্তে তাদের নিজেদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিল যে, বনু উমাইয়রা কখনো ইদ্রিসি রাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে বনু আব্বাস রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা শুরু না করে দেয়। এই কারণেই যখন তিউনিসিয়ায় বনু আব্বাস থেকে আলাদা হয়ে আরেকটি স্বাধীন সরকার “আঘলাবি রাষ্ট্র” প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন হারুনুর রশিদ তা নির্মূল করার কোনো চেষ্টা করেননি। কারণ এভাবে স্বয়ং বনু আব্বাস একটি মধ্যবর্তী সীমানা পেয়ে যাচ্ছিল যা ইদ্রিসি রাষ্ট্র এবং আন্দালুসের উমাইয়াদের পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারত।

আন্দালুসের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান শক্তিগুলোর জোট:

শার্লিমেন ছিলেন ফ্রান্সের সেই অভিজ্ঞ, চতুর, বিচক্ষণ ও ধূর্ত শাসক যিনি উমাইয়া ইসলামি সালতানাত প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই আন্দালুসে হস্তক্ষেপ শুরু করেছিলেন। তবে আবদুর রহমান আউয়াল, হিশাম আউয়াল এবং আল-হাকাম আউয়ালের হাতে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করার পর তিনি আন্দালুসে সরাসরি হস্তক্ষেপের নীতি ত্যাগ করেন।

এর পরিবর্তে তিনি উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টান শাসকদের সহযোগিতায় আন্দালুস সংলগ্ন এমন একটি স্বায়ত্তশাসিত খ্রিস্টান সালতানাত প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন যা স্থায়ীভাবে আন্দালুসের শাসকদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তর আন্দালুসে ফ্রান্সের সীমান্তের কাছে তখন খ্রিস্টানদের কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। এগুলোর মধ্যে একটি ছিল “অ্যাস্টুরিয়াস”, যার শাসক ছিলেন প্রথম আলফোনসো। দ্বিতীয়টি ছিল “অ্যাকুইটেইন”, যার রাজা ছিলেন লুই।

[১] নাফহত তিব: ১/৩৩৮, ৩৪০, তবা দার সাদির; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৬০, ১৬১, তবা দারুল ফিকর; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/৭০।

শার্লিমেন “টুলুজ”-এ আলফনসো, লুইস এবং অন্যান্য স্থানীয় নবাবদের একত্রিত করে এই বিষয়ে একমত করেন যে, পিরেনিজ (Pyrenees) এবং আন্দালুসের মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যবর্তী দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় একটি নতুন খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যা আন্দালুসের ইসলামী জনবসতিগুলোতে সময়ে সময়ে ক্ষতি সাধন করবে এবং অতর্কিত হামলার মাধ্যমে ইসলামী বাহিনীর জন্য পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ইউরোপে পৌঁছানো অসম্ভব করে তুলবে।

এই শাসকদের সাথে একমত হয়ে (৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে), উত্তর আন্দালুসে ইব্রো নদীর উপকূল থেকে বার্সেলোনা পর্যন্ত একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যার নাম রাখা হয় “থাকা মার্জ”। এই রাষ্ট্রটি “স্প্যানিশ মার্জ” নামেও পরিচিত ছিল।

“বুরেল” নামক এক খ্রিস্টান সর্দারকে এই নতুন সীমান্তের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং এই এলাকাটিকে সম্পূর্ণভাবে একটি সামরিক ছাউনিতে পরিণত করা হয়। জায়গায় জায়গায় দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং সৈন্য মোতায়েন করা হয়। বাস্তবতা হলো, এই রাষ্ট্রটি ইউরোপীয় রাজাদের জন্য একটি বাফার স্টেট হিসেবে কাজ করত। এর আড়ালে তারা কেবল নিজেদেরকে মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারত না, বরং যখনই চাইত কোনো অভিযোগ ছাড়াই আন্দালুসে লুটতরাজ চালাতে পারত।

এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে হাকামের জন্য স্থায়ী এক বিপদ সৃষ্টি হয়। তদুপরি, সেই দিনগুলোতে হাকাম সম্পর্কে এই খবরগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল যে তিনি পাপাচার ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত। এগুলো গুজব ছিল নাকি বাস্তবতা—আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এটা নিশ্চিত যে হাকাম একজন যোদ্ধা প্রকৃতির মানুষ হওয়ার কারণে খেলাধুলা, শিকার এবং আনন্দ-উৎসবে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি তার পিতার মতো আবেদ ও জাহিদ ছিলেন না। ওলামাদের সম্মান ও কদর অবশ্যই করতেন, কিন্তু তার স্বভাবগত ঝোঁক তাদের সাহচর্যের চেয়ে যুদ্ধ ও রাজনীতির দিকে বেশি ছিল। হিশাম আর-রাযীর যুগ দেখা লোকদের কাছে হাকামের এই আচরণ অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। বিশেষ করে কর্ডোভায়, যেখানে পদে পদে জ্ঞান ও গুণের মজলিস বসত, সেখানে শাসকের এই ধরনের ব্যস্ততা ও বিনোদন অপছন্দ করা হতে লাগল।

অধিকন্তু, আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদ এবং ফ্রান্সের রাজা শার্লিমেনের মধ্যে বন্ধুত্বের চুক্তি হয় এবং তারা আন্দালুসের উমাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে মিত্র হয়ে ওঠে। আব্বাসীয়দের সমর্থকরা আন্দালুসের শহরগুলোতে এই ধারণা ছড়িয়ে দেয় যে হাকামের খেলাফত ইসলাম বিরোধী। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা ওয়াজিব এবং তার পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফার মিত্র ফ্রান্সের রাজার শাসন মেনে নেওয়া উত্তম।

এই সব বিষয় মিলে হাকামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চিন্তাধারাকে উসকে দেয় এবং উত্তর আন্দালুসের শহর সারগোসা এবং গ্যালিসিয়ার মুসলিম শাসকরা ফ্রান্সের রাজার আনুগত্য ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহীদের অনুরোধে সাহায্যের জন্য ১৮৮ হিজরির শেষের দিকে ফ্রান্স এবং উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর বাহিনী এসে পৌঁছায়। তাদের মধ্যে অ্যাকুইটেইনের নবাব বার্সেলোনার বন্দরে দখল করে নেন। সারগোসা এবং গ্যালিসিয়ার ওপরও খ্রিস্টানদের আধিপত্য সুদৃঢ় হয়।

হাকাম তার সেনাপতি ইব্রাহিমকে পাঠিয়ে সারগোসা ও গ্যালিসিয়াকে কঠোর যুদ্ধের পর খ্রিস্টানদের হাত থেকে উদ্ধার করেন। তবে খ্রিস্টানরা ফ্রন্টকে এতটাই বিস্তৃত করেছিল যে কর্ডোভার বাহিনী অন্যান্য অঞ্চলে অগ্রসর হতে পারেনি। এই সময়ে ১৮৯ হিজরিতে বার্সেলোনায় খ্রিস্টান বাহিনী অগ্রসর হয়ে টলেডো (মাদ্রিদ) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সাবেক গথিক খ্রিস্টান রাজাদের রাজধানী ছিল।

ছিল। স্থানীয় গাদ্দার মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের সাহায্যে আক্রমণকারীরা এই শহরটি খুব দ্রুত ছিনিয়ে নিয়েছিল।

তবে আল-হাকাম আমরুস বিন ইউসুফকে পাঠিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং একটি কঠিন যুদ্ধের পর এই শহরটি পুনরায় দখল করা হয়। বিজয়ের পর স্থানীয় গাদ্দার খ্রিস্টানদের সাথে নম্র আচরণ করা হয় এবং তাদের ক্ষতিপূরণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই সফলতার পর আল-হাকাম নিশ্চিন্তে শাসন করার সুযোগ পান। তবে বড় বড় শত্রুদের ওপর বিজয় তাকে অহংকারী করে তোলে। সেই সাথে তিনি প্রকাশ্যে পাপাচার ও অনৈতিক কাজ শুরু করে দেন। [১]

মালিকি উলামাদের বিদ্রোহ এবং মৃত্যুদণ্ড:

এটি দেখে মালিকি ফকিহগণ, যাদের কর্তোভায় ব্যাপক প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তার বিরুদ্ধে চলে যান। তাদের মধ্যে মুয়াত্তা মালিক-এর বর্ণনাকারী কাজি ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া মালিকি রহ.ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা বনু উমাইয়ার একজন সম্মানিত নেতা মুহাম্মদ বিন কাসিম মারওয়ানিকে শাসক বানানোর সিদ্ধান্ত নেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন কিন্তু পরে আল-হাকামের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বলে দেন। ফলে বিদ্রোহের অপরাধে ৭২ জন আলেম ও ফকিহকে গ্রেপ্তার করা হয়। আল-হাকাম কাজি ইয়াহইয়া রহ.-কে অব্যাহতি দিয়ে বাকি সবাইকে জনসমক্ষে ফাঁসি দেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে বড় বড় প্রখ্যাত আলেম ও আমিরগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাই কর্তোভা অধিবাসীরা আল-হাকামকে ঘৃণা করতে শুরু করে। [২]

তলেতোর অধিবাসীদের সাথে আচরণ:

আল-হাকাম তলেতোর অধিবাসীদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের স্থায়ী আশঙ্কায় থাকতেন। এটি খ্রিস্টানদের সাবেক রাজধানী ছিল এবং সেখানে তখন পর্যন্ত অধিকাংশ জনসংখ্যা অমুসলিম ছিল। এই লোকেরা আমিরদের উত্থাপন করে তাদের পরিবর্তন করাত। আল-হাকাম তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার একজন বিশ্বস্ত আমির আমরুস বিন ইউসুফকে কাজে লাগান। এই ব্যক্তি আরব ও স্প্যানিশদের মিশ্র বংশোদ্ভূত ছিলেন, এমন লোকদের ‘মুওয়াল্লাদুন’ বলা হতো এবং স্পেনের মানুষ খাঁটি আরবদের তুলনায় তাদের ওপর বেশি ভরসা করত।

আল-হাকাম আমরুস বিন ইউসুফকে তলেতোর নতুন শাসক বানিয়ে পাঠান এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি শহরের মুসলিম ও খ্রিস্টান গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাদের সামনে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেন, তারপর যারা তার সাথে একমত হবে তাদের নিজের ঘনিষ্ঠ করে নেন। এভাবে সমস্ত বিদ্রোহী সামনে চলে আসবে যাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

আমরুস বিন ইউসুফ আমির হয়ে তলেতো পৌঁছান। তিনি সরকার-বিদ্বেষী গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিদ্রোহী আলোচনার মাধ্যমে আশ্রয় নেন এবং তাদের বিশ্বাস করান যে তিনি শীঘ্রই আল-হাকামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছেন। শহরবাসীর সাথে পরামর্শ করে তিনি শহরে একটি নতুন দুর্গও নির্মাণ করেন।

কিছু সময় পর আল-হাকাম তার পুত্র শাহজাদা আবদুর রহমানকে একটি বাহিনী দিয়ে পাঠান। দুনিয়ার সামনে এটি প্রকাশ করা হয় যে এই বাহিনী

[১] জামহারাতি আনসাবিল আরব, আল্লামা ইবনে হাজম: ৯৫-৯৬; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ১৩/২২; তারজামাতুল হাকাম বিন হিশাম, ত লুমারি ১

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ১৮৭ হিজরি

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ১৮৭ হিজরি

৪০৯

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

উত্তরের কোনো অভিযানে যাচ্ছে বলে মনে হলেও এর আসল লক্ষ্য ছিল তলেদো। শাহজাদা আবদুর রহমান তলেদোর বাইরে এমনভাবে তাবু ফেললেন যেন তার গন্তব্য আরও সামনে কোথাও।

আমরুস বিন ইউসুফ শাহজাদাকে নতুন দুর্গে আমন্ত্রণ জানালেন এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সকল নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে তাদের শাহজাদার খেদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে বোঝালেন যে, শাহজাদার সম্মান ও আপ্যায়ন এবং আতিথেয়তা অত্যন্ত জরুরি যাতে সরকার তলেদোর অধিবাসীদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, অন্যথায় সময়ের আগেই বিদ্রোহের আভাস পাওয়া যাবে।

শহরের নেতৃবৃন্দ এই কথার গুরুত্ব অনুভব করলেন এবং নতুন দুর্গে চলে গেলেন। শাহজাদা একটি কক্ষে বসে ছিলেন যার একটি দরজা সামনে এবং একটি পেছনে ছিল। লোকদের বলা হলো যে তারা যেন সারি বেঁধে একে একে শাহজাদাকে সালাম দেওয়ার জন্য কক্ষে প্রবেশ করে এবং পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করতে শুরু করল।

যখনই কেউ সালাম দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হতো, সেখানে মোতায়েন করা সৈন্যরা তাকে জাপটে ধরত এবং শিরশ্ছেদ করে একটি পরিখায় ফেলে দিত। এভাবে সাতশ ব্যক্তিকে দাফন করা হলো এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কেউ টেরও পেল না। পরবর্তীতে যখন নিখোঁজ নেতৃবৃন্দের সন্ধান শুরু হলো তখন এই সত্য উন্মোচিত হলো। সবাই কেঁপে উঠল এবং এরপর দীর্ঘকাল তারা বিদ্রোহে প্ররোচিতকারী কোনো রাজনীতিবিদের কথায় বিশ্বাস করেনি। [১]

এই ঘটনা থেকে আন্দাজ করা যায় যে, আল-হাকাম অত্যন্ত ধূর্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি সমকালীন রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি কৌশল ও পদক্ষেপকে সঠিক মনে করতেন, যদিও তা শরিয় ও নৈতিকভাবে সঠিক বলে বিবেচিত না হয়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শান্তি তো প্রতিষ্ঠিত হলো কিন্তু অন্যদিকে আল-হাকাম চরম দুর্নামও কুড়ালেন। এই কারণেই ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনার উল্লেখ অপছন্দনীয়ভাবে করেছেন।

মারদাহর বিদ্রোহ:

১৯০ হিজরিতে পশ্চিম আন্দালুসের শহর ‘মারদাহ’-তে একজন মুসলিম আমির আসবাগ বিন আবদুল্লাহ বিদ্রোহ করেন। আল-হাকাম অবিলম্বে তার শক্তি চূর্ণ করার নির্দেশ দেন এবং প্রথম বাহিনীর নেতৃত্ব নিজেই দেন কিন্তু সীমান্তে পৌঁছানো মাত্রই তিনি কর্ডোভায় বিদ্রোহী তৎপরতার খবর পান, ফলে তাকে ফিরে আসতে হয়। এরপর তিনি মারদাহতে বারবার সৈন্য পাঠাতে থাকেন। সাত বছর পর্যন্ত এই অভিযান বিরতি দিয়ে দিয়ে চলতে থাকে। অবশেষে আসবাগ আত্মসমর্পণ করেন, আল-হাকাম তাকে ক্ষমা করে দিয়ে কর্ডোভার তদারকি বাহিনীতে উচ্চ পদে নিয়োগ দেন। [২]

জিহাদি অভিযানসমূহ:

এই বছরগুলোতে মুসলমানদের খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকেও ক্রমাগত আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সম্মুখীন হতে হয়। ১৯২ হিজরিতে ইউরোপ থেকে একটি নৌবাহিনী এসে উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় শহর তরতুশায় আক্রমণ করে। শাহজাদা আবদুর রহমান একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে এর মোকাবিলার জন্য...

[১] আল-বায়ান আল-মাগরিব: ২ / ৭০, আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ১৯১ হিজরি, ইবনুল আসির নিহতের সংখ্যা পাঁচ হাজার বলেছেন তবে সম্ভবত এটি অতিরঞ্জন মুক্ত নয়।

[২] আল-বায়ান আল-মাগরিব: ২ / ৭২

তারীখে উম্মতে মুসলিমা | ৪১০

পৌঁছাল এবং অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর তাকে হত্যা করা হলো।

১৯৩ হিজরিতে খ্রিস্টান দস্যুরা সীমান্ত শহর “আল-ফারাজ” এর কসবা “ওয়াদিউল হিজারা” তে লুটতরাজ চালাল। এক মুসলিম নারী এভাবে আর্তনাদ করল: “হে হাকাম! তুমি আমাদের নিশ্চিন্ত করে ধ্বংস করে দিলে। আমাদের শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দিলে।” স্থানীয় এক আমীর আব্বাস বিন নাসিহ যখন এই নারীর আর্তনাদ শুনলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের কমান্ডে লস্কর প্রস্তুত করে সীমান্তের দিকে রওনা হলেন। খ্রিস্টানদের অনেক দুর্গ জয় করলেন, অনেককে হত্যা ও গ্রেফতার করলেন। এরপর সেই নারীকে খুঁজে বের করলেন এবং তার পরিবারের সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন: “হাকাম তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করেছেন।”

সবাই বলল: “আল্লাহর কসম! হাকাম আমাদের অন্তর ঠান্ডা করে দিয়েছেন। শত্রুকে শাস্তি দিয়েছেন। তিনি খবর পাওয়ার পর অবহেলা করেননি।” [১]

দুই বছর পর হাকাম পুনরায় সৈন্য নিয়ে সীমান্তে এলেন এবং খ্রিস্টানদের এলাকায় দীর্ঘ সময় ধরে অভিযান চালিয়ে ফিরে এলেন। [২]

আব্দুল করিমের উত্তর স্পেনে আক্রমণ:

২০০ হিজরিতে হাকাম তার সেনাপতি আব্দুল করিমকে উত্তরের এলাকাগুলোর দিকে পাঠালেন। এই অভিযান তিন বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। আব্দুল করিম উপজাতীয় গেরিলা যোদ্ধাদের দুর্গগুলো একের পর এক জয় করতে করতে একটি নদী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। মুসলমানরা নদী পার হতে চাচ্ছিল কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদের বাধা দিচ্ছিল। তারা নদীর ওপারে চলে এল। এখানে খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে এক বিশাল যুদ্ধ হলো যা তেরো দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অবশেষে খ্রিস্টানরা পরাজয় বরণ করে পালিয়ে গেল।

খ্রিস্টানদের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং কর আদায় করার পর ২০৩ হিজরিতে তিনি গনিমতের মালের স্তুপ নিয়ে কর্ডোভায় ফিরে এলেন। তবে আস্তুরিয়াস, গথিক মার্চ এবং অ্যাকুইটেইন এর রাজ্যগুলো পুরোপুরি পদানত করা সম্ভব হয়নি। মুসলমানরা বাসেসেলোনার বন্দরকেও “গথিক মার্চ” এর দখল থেকে মুক্ত করতে পারেনি। [৩]

বাস্তবতা হলো এই ধরনের ধারাবাহিক অভিযানের পরেও খ্রিস্টানদের শক্তি কমার পরিবর্তে বাড়তে থাকে, কারণ তারা ক্রমাগত যুদ্ধের অবস্থায় থাকায় এই গেরিলা যুদ্ধে লড়াকু, সাহসী এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠছিল। হাকাম এবং পরবর্তী মুসলিম শাসকরা এই রাজ্যগুলো থেকে কর আদায় করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। তারা উত্তরের চরম শীতের কথা বিবেচনা করে জাবালে আল-বারতাত (Pyrenees) এ আস্তানা গাড়তে বা ফ্রান্সে নিজেদের শক্ত দুর্গ তৈরি করার চেষ্টাও করেননি। মুসলিম আমীররা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিবর্তে সর্বদা দক্ষিণের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার শহরগুলোতে থাকাকেই অগ্রাধিকার দিতেন।

দুর্ভিক্ষ:

২০৩ হিজরিতে আন্দালুসে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই সাথে শস্যের জন্য লুটতরাজও শুরু হয়ে যায়। হাকাম এই সুযোগে বাইরে...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/৭৩, ৭৪

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/৭৩

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০০ হিজরি

...থেকে শস্য আনিয়ে মানুষের মাঝে বিতরণ করলেন এবং লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য রাস্তাগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করলেন। এভাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল।

[১]

আফ্রিকান গোলামদের নিয়োগ:

এই সমস্ত অভিযান সত্ত্বেও আল-হাকাম এখন পর্যন্ত এই যোগ্য ছিলেন না যে কোনো বড় বাহিনী গঠন করবেন এবং তাকে উত্তরে স্থায়ীভাবে মোতায়েন করে নাসারাদের রাজ্যগুলোর ওপর পুরোপুরিভাবে দখলদারিত্ব কায়েম করতে পারেন, কারণ তার আন্দালুসের বাসিন্দাদের ওপর আস্থা ছিল না এবং তিনি সবসময় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আশঙ্কা অনুভব করতেন। অবশেষে অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি একটি নতুন বাহিনী তৈরি করা শুরু করলেন যাতে দক্ষিণ আন্দালুসের শুধুমাত্র সেই নিরাপদ ও সমৃদ্ধ এলাকার লোক নেওয়া হয়েছিল যেখানে অতীতে কখনো কোনো বিদ্রোহ হয়নি। এছাড়া আফ্রিকা থেকে হাজার হাজার গোলাম আনিয়ে নিয়োগ করা হয়েছিল যারা আন্দালুসের স্থানীয় ভাষা থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এভাবে তারা স্থানীয় রাজনীতি, দলাদলি বা কোনো ষড়যন্ত্রের অংশ হওয়ার যোগ্য ছিল না। আল-হাকাম তাদের সামরিক প্রশিক্ষণে নিজে আগ্রহ নিতেন এবং তাদের কঠোর সামরিক অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ সৈনিকে পরিণত করেছিলেন।

কর্ডোবাসীদের বিদ্রোহ:

রাজধানী কর্ডোবায় এই আফ্রিকান গোলামদের উপস্থিতি শহরবাসীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই লোকেরা আরবদের মার্জিত আখলাক ও সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল, তাই তারা তুচ্ছ বিষয়ে শহরবাসীর সাথে ঝগড়া করত। রমজান ১৯৮ হিজরিতে একদিন একজন আফ্রিকান সৈন্য কোনো কামারের কাছে গেল এবং তাকে তলোয়ার ধার দিতে বলল। কামার দেরি করলে আফ্রিকানটি রাগান্বিত হয়ে গেল। সে সেই তলোয়ার দিয়েই কামারকে হত্যা করল। এটি দেখে বাজারের লোকজন খেপে গেল। অনেক লোক যারা আগে থেকেই আল-হাকামের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল, তারা সশস্ত্র হয়ে রাস্তায় নেমে এল এবং আল-হাকামকে ক্ষমতাচ্যুত করার স্লোগান দিতে দিতে তার প্রাসাদের দিকে দৌড়ে গেল। শহরের মালিকি উলামা ও ফকিহগণও তাদের সাথে যোগ দিলেন। কাজী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া রহ. ও তাদের সমর্থক ছিলেন। আল-হাকাম এটি দেখে তার অফিসারদের নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন কর্ডোবার দক্ষিণ মহল্লাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয় কারণ অধিকাংশ আক্রমণকারী ওখানকারই ছিল। এই নির্দেশের ওপর আমল করা হলো এবং আক্রমণকারীরা নিজেদের ঘরবাড়ি বাঁচানোর জন্য ফিরে দৌড়ালো। আল-হাকাম সরকারি বাহিনীকে তাদের পিছু ধাওয়া করতে পাঠালেন। তিন দিন পর্যন্ত বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে হাতাহাতি লড়াই চলতে থাকল। অবশেষে বিদ্রোহের জোর দমে গেল। এই অভিযানে হাজার হাজার বিদ্রোহী গ্রেফতার হলো। আল-হাকাম তিনশ সর্দারকে ওয়াডিউল কাবীর নদীর তীরে ফাঁসি দিলেন। বাকি সবার প্রাণ ভিক্ষা দিলেন কিন্তু নির্দেশ দিলেন যে তারা যেন তিন দিনের মধ্যে নিজেদের এলাকা খালি করে দেয় এবং কর্ডোবা থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর আল-হাকাম সেই সমস্ত মহল্লা যা দক্ষিণ কর্ডোবায় সবচেয়ে বেশি ছিল এবং কিছু শাহী প্রাসাদের কাছে অবস্থিত ছিল, সেগুলো ধ্বংস করে দিলেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাবুশি ২/৭৩।

এই কঠোর পদক্ষেপের কারণে আল-হাকাম সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছেই কুখ্যাত হয়ে যান। তিনি তার পিতার উপাধি “আর-রাজি” দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে “আল-মুরতাজা” হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মানুষ তাকে “আর-রাবাজি” বলে স্মরণ করতে থাকে। [১]

দেশান্তরিত ব্যক্তিদের মধ্যে আট হাজার লোক মরক্কোর তানজাহ শহরে এবং পনের হাজার লোক মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাদের মধ্যে প্রখ্যাত মালিকি উলামা এবং তাদের অনুসারীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে তারা আলেকজান্দ্রিয়া থেকেও হিজরত করে ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপ দখল করেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল শাসন করেন। [২]

ঐতিহাসিকগণ রাবাজের এই ঘটনাকে আল-হাকামের কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন, কিন্তু অন্যদিকে এমন ঐতিহাসিকও রয়েছেন যারা এই বিষয়ে সাধারণ জনগণ এবং তাদের সমর্থনকারী উলামাদের ভুল বলে মনে করেন। ইবনে আযারি আল-মাররাকুশি (মৃত্যু ৬৯৫ হিজরি), যিনি আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর গভীর জ্ঞান রাখতেন, তিনি লিখেছেন:

“বিদ্রোহের কারণ সম্পর্কে বর্ণনাগুলো ভিন্ন ভিন্ন। কেউ কেউ বলেন যে, এর কারণ ছিল রাগ ও মূর্খতা, কারণ না তো মানুষের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, না তাদের সম্মান লুণ্ঠন করা হচ্ছিল, আর না তাদের সম্পদের ওপর দখলদারিত্ব চালানো হচ্ছিল। পরিস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই কথাটিই সঠিক। নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর কোনো কর আরোপ করা হয়নি, আর না তাদের দিয়ে বেগার খাটানো হচ্ছিল। এমন কোনো বিষয় ছিল না যা বিদ্রোহের কারণ হতে পারে। বরং এটি ছিল উস্কানি, অদূরদর্শিতা, উগ্র মেজাজ এবং আত্মহত্যার শামিল।” [৩]

ওফাত:

আল-হাকাম ২০৬ হিজরিতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অবশেষে ২৪ বছর শাসন করার পর ২৫ জিলকদ ২০৬ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। যদিও তিনি ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত এবং একজন ভালো কবিও ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানতাত্ত্বিক বা গঠনমূলক কাজে তার বিশেষ কোনো খ্যাতি নেই, কারণ তার পুরো সময়কাল হাঙ্গামা, বিদ্রোহ, সীমান্ত রক্ষা এবং বৈদেশিক অভিযানে অতিবাহিত হয়েছে।

আল-হাকামের চরিত্রের ওপর এক নজর:

আল্লামা ইবনুল আসির রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি বিষয়গুলো নিজেই সম্পাদন করতেন, তা কাছের হোক বা দূরের। তার কাছে বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল যারা তাকে মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানাত, ফলে তিনি তাদের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিকার করতেন এবং মজলুমকে ইনসাফ পাইয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন সাহসী, যোদ্ধা এবং প্রভাবশালী। আন্দালুসকে তিনিই তার উত্তরসূরিদের জন্য সুগম করেছিলেন। তিনি উলামা ও ফকিহদের কাছে রাখতেন।” [৪]

আল-হাকামের অধিক মনোযোগ ছিল সেনাবাহিনীর ওপর। তিনি আন্দালুসের প্রথম শাসক ছিলেন যিনি সেনাবাহিনীকে পেশাদার ভিত্তিতে সুসংগঠিত করেছিলেন এবং বেতনভুক্ত...

[১] শহরের সাথে লাগোয়া মহল্লা বা জনবসতির বেষ্টনীকে “রাবাজ” বলা হয়, যার বহুবচন হলো “আরবাশ”। আল-হাকামের ধ্বংস করা মহল্লাগুলোকেও “রাবাজ” বলা হতো, তাই মানুষ তাদের স্মরণে তাকে “আর-রাবাজি” বলতে শুরু করে।

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ১৯৮ হিজরি। ইবনুল আসির এবং অনেক ঐতিহাসিক এই ঘটনাটি ১৯৮ হিজরির অধীনে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সঠিক হলো এটি ২০৩ হিজরির ঘটনা, যেমনটি আল-বায়ানুল মুগরিব-এ ইবনে আযারি আল-মাররাকুশি বর্ণনা করেছেন।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/৭৫-৭৬

[৪] আল-কামিল ফিত তারিখ, ২০৬ হিজরি

সৈন্য নিয়োগ করলেন। তার ক্রয়কৃত যোদ্ধা দাসের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। [১]

তার দুর্গের দরজায় একশজন সহিস এক হাজার ঘোড়া নিয়ে সব সময় প্রস্তুত থাকত যাতে কোনো বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের খবর পাওয়া মাত্রই তা দমনের ব্যবস্থা করা যায়।

কাজী মুসআব বিন ইমরান এবং আল্লামা মুহাম্মদ বিন বশীর তার শাসনামলে কর্তোভার কাজী ছিলেন, যারা জ্ঞান, মর্যাদা এবং ন্যায়বিচারের জন্য সুপরিচিত। এই ব্যক্তিবর্গ ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে আল-হাকামকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। এক ব্যক্তি আদালতে দাবি করল যে, তার এক দাসী আল-হাকামের দখলে রয়েছে। কাজী মুহাম্মদ বিন বশীর আল-হাকামকে আদালতে তলব করলেন এবং বললেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর ন্যায়বিচারের আইন কার্যকর না হবে, ততক্ষণ সাধারণ মানুষের ওপর তা কার্যকর হতে পারে না।” এই বলে তিনি আল-হাকামকে বাদীর দাবির বিষয়ে অবহিত করলেন।

আল-হাকাম বললেন: “আরেকটি পথ আছে। তা হলো আমি বাদীর চাওয়া দাম অনুযায়ী দাসীটির মূল্য পরিশোধ করে দিই।”

কিন্তু কাজী সাহেব বললেন যে, এটি হবে জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয়। এরপর দাসীটিকে আদালতে আনা হলো এবং মামলার শুনানি হলো। কাজী সাহেব সাক্ষী ও প্রমাণের ভিত্তিতে বাদীর পক্ষে রায় প্রদান করে দাসীটিকে তার হাতে তুলে দিলেন। [২]

সাধারণত আল-হাকামকে জালিম ও দয়াহীন বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো বিদ্রোহ দমন করা ছাড়া অন্য কোথাও তাকে রক্তপাতের সমর্থক হিসেবে দেখা যায়নি। নিজের চাচা, চাচাতো ভাই এবং অনেক বিদ্রোহীকে আয়ত্তে আনার পর তিনি কেবল তাদের ক্ষমা করে দেননি বরং তাদের সাথে নানা ধরনের অনুগ্রহও করেছেন। তিনি ন্যায়বিচার পছন্দ করতেন এবং বলতেন:

“শাসকদের সর্বোত্তম অলঙ্কার হলো ন্যায়বিচার।” [৩]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ২০৬ হিজরি

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৭৮, ৭৯

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৭৯

৪১৪ | উম্মতে মুসলিমাহর ইতিহাস | পঞ্চম খণ্ড

আবদুর রহমান আস-সানি

২০৬ হিজরি থেকে ২৩৮ হিজরি

(৮২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৫২ খ্রিস্টাব্দ)

আবদুর রহমান আস-সানি ২০৬ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই তাকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম বিদ্রোহটি করেন তার দাদা প্রথম আবদুর রহমানের ভাই আবদুল্লাহ। এই অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ আগে থেকেই আন্দালুসের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত তার তিন ছেলের ওপর ভরসা করেছিলেন। তাই তিনি ভেবেছিলেন যে সহজেই সিংহাসন দখল করতে পারবেন। তবে এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তার ছেলেরা তাকে সমর্থন দেয়নি বরং তাকে বুঝিয়ে বিদ্রোহ থেকে বিরত রাখে। আবদুল্লাহ বিষয়টি মেনে নেন। তিনি নতুন শাসকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আবদুর রহমান আস-সানি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে মুরসিয়ার আমির নিযুক্ত করেন। আবদুল্লাহ আরও তিন বছর জীবিত ছিলেন এবং এই পদে থাকাকালীনই মৃত্যুবরণ করেন।

[১]

আবদুর রহমান আস-সানির শাসনামলের দ্বিতীয় বছরে আন্দালুসের দক্ষিণ-পূর্ব শহর “তাদমির”-এ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যেখানে বেশিরভাগ আরব গোত্র বসবাস করত। মুদারি এবং ইয়ামানি গোত্রগুলো একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সাত বছর ধরে পারস্পরিক যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ধারা অব্যাহত থাকে। কর্ডোভা থেকে এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বেশ কয়েকবার সরকারি বাহিনী পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু বাহিনী ফিরে আসার পর গোত্রগুলো পুনরায় লড়াই শুরু করত। এই গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষটি ২০৯ হিজরিতে ঘটেছিল, যাতে বিপুল সংখ্যক ইয়ামানি গোত্রীয় লোক নিহত হয়। [২]

কাস্তিলিয়া রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন:

আবদুর রহমান আস-সানির সিংহাসনে আরোহণের আগেই উত্তর আন্দালুসে খ্রিস্টানদের একটি দুর্গবেষ্টিত শহর গড়ে উঠেছিল। আস্তুরিয়াসের একজন পাদ্রি দাবি করেছিলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন একজন ফেরেশতা আস্তুরিয়াসের সেই সীমান্তবর্তী জঙ্গলে— যা “গ্যালিসিয়া”র সাথে মিশেছে—একটি কবরের সন্ধান দিয়েছেন, যা যিশুর শিষ্য সেন্ট জেমসের বিশ্রামস্থল। আস্তুরিয়াসের শাসক এই দাবিতে বিশ্বাস করে সেখানে একটি মাজার ও গির্জা নির্মাণ করেন। মানুষ দলে দলে সেখানে

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৮৫

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৮১

আসতে এবং বসতি স্থাপন করতে শুরু করল। এই বসতিটি প্রথমে একটি দুর্গে এবং পরে একটি শহরে পরিণত হয়। দুর্গের সাথে মিল রেখে একে ‘ক্যাসটাইল’ বা ‘কুস্তালিয়া’ বলা হতে লাগল।

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আমলে যখন আন্দালুসের মুসলমানরা গৃহযুদ্ধ এবং ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল, তখন আস্তুরিয়াস রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। আরও দুটি খ্রিস্টান রাজ্য লিওন এবং গ্যালিসিয়াও এর সাথে একীভূত হয়ে যায়। যেহেতু ‘কুস্তালিয়া’ তাদের মাঝখানে অবস্থিত ছিল, তাই আস্তুরিয়াসের বিস্তৃতির পর এই শহরটিই রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে রাজ্যের নামও ‘কুস্তালিয়া’ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যায়। এটিই ছিল সেই রাজ্য যা শেষ পর্যন্ত আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য মৃত্যুর বার্তা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল।

উত্তর আন্দালুসের অভিযানসমূহ:

প্রথম আল-হাকামের আমলে উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে একাধিক অভিযানের মাধ্যমে পুনরায় করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আমলে তাদের পক্ষ থেকে কর প্রদান বন্ধ করা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসের দিকে রক্ষণাত্মক ও শাস্তিমূলক অভিযান পাঠানো হতে থাকে। ২০৮ হিজরিতে আবদুল করিম ‘আলবা’ উপত্যকা অতিক্রম করে খ্রিস্টান রাজ্য গ্যালিসিয়া ও আস্তুরিয়াসে প্রবেশ করেন এবং বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর তাদের পুনরায় করদ রাজ্যে পরিণত করে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন। পরের বছর বনু উমাইয়ার এই মহান সেনাপতি আবারও জিহাদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অসুস্থ হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন। তার স্থলে উমাইয়া বিন হিশাম কমান্ড গ্রহণ করেন এবং অভিযান সম্পন্ন করে ফিরে আসেন।

২১৩ হিজরিতে দ্বিতীয় আবদুর রহমানের চাচা উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বার্সেলোনা পর্যন্ত আক্রমণ চালান। তবে এই অভিযানগুলো ছিল কেবল শত্রুকে ভীত করার জন্য। এগুলোর উদ্দেশ্য এলাকা দখল করা ছিল না। তাই প্রতিবার মুসলমানরা গ্রীষ্মকালের চার-পাঁচ মাস জিহাদে কাটিয়ে তুষারপাতের আগেই ফিরে আসতেন। [১]

মারিদা ও তোলেদোর বিদ্রোহসমূহ:

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের আমলে খ্রিস্টান পাদ্রী ও রাজনীতিবিদরা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে খোদ মুসলমানদের বারবার বিদ্রোহে প্ররোচিত করা যায়। এই কাজটি তাদের জন্য কঠিন ছিল না। আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে খ্রিস্টান স্ত্রী প্রচুর ছিল। তাছাড়া উত্তর আন্দালুসের মুসলিম শহরগুলোতে খ্রিস্টান জনসংখ্যার অনুপাত মুসলমানদের চেয়ে কিছুটা বেশিই ছিল। এখানকার খ্রিস্টানরা মিষ্টি কথা এবং ভালোবাসা ও হৃদয়তা প্রদর্শনের মাধ্যমে স্থানীয় মুসলিম সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেজাজ ও প্রবণতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখত। তারা সামান্য বিষয় নিয়ে তাদের দক্ষিণ আন্দালুসের মুসলমান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে উসকে দিত। আস্তুরিয়াস রাজ্য ‘মারিদা’য় এবং ‘গথিক মার্চ’ রাজ্য ‘তোলেদো’তে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল।

মারিদা (পর্তুগাল)-এ বিদ্রোহের সূচনা হয় ২১০ হিজরি থেকে। যখন এখানকার শাসক মাহমুদ বিন আবদুল জব্বার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সরকারি বাহিনী ২১০ হিজরি, ২১৩ হিজরি, ২১৭ হিজরি, ২১৮ হিজরি এবং ২২০ হিজরিতে এখানে একের পর এক অভিযান চালায়। অবশেষে ২২০ হিজরিতে বিদ্রোহী

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/৮১, ৮২।

মাথা নত করল এবং এই এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে বিজিত হলো। বিদ্রোহী সর্দার মাহমুদ বিন আব্দুল জব্বার পালিয়ে আস্তুরিয়াস পৌঁছে গেল যেখানে তাকে একটি দুর্গের শাসক নিযুক্ত করা হলো।

এরই মধ্যে “গথিক মার্চ” রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের কারণে ২১২ হিজরিতে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ শহর তুলাইতুলায় হাশিম জাররাব নামক এক সর্দার বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। ২১৬ হিজরি থেকে ২২৩ হিজরি পর্যন্ত এখানে সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। ২২০ হিজরিতে কর্ডোভা থেকে আব্দুর রহমান সানির পুত্র উমাইয়া এখানে আসে কিন্তু সেও কোনো সাফল্য পায়নি। ২২৪ হিজরিতে আব্দুর রহমানের ভাই ওয়ালিদ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পৌঁছায় এবং বছরব্যাপী যুদ্ধের পর এক হামলায় হাশিম জাররাবকে হত্যা করতে সক্ষম হয়, কিন্তু তার ডান হাত মুহাম্মদ বিন ওয়াসিম বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। অবশেষে ২২৪ হিজরিতে আব্দুর রহমান সানি নিজে চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এখানে পৌঁছান এবং ব্যাপক রক্তক্ষয়ের পর তুলাইতুলা জয় করেন। [১]

উত্তর আন্দালুসে বার্ষিক অভিযানসমূহ:

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করার পর আব্দুর রহমান প্রতি বছর খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদি অভিযানের ধারা শুরু করেন। ২২৩ হিজরিতে তিনি তার ভাই ওয়ালিদকে আস্তুরিয়াস ও জলিকিয়ায় পাঠান এবং বিদ্রোহী খ্রিস্টান শাসকদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। পরের বছর তিনি তার পুত্র আল-হাকামকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন, যে অনেকগুলো দুর্গ জয় করে বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসে। ২২৫ হিজরিতে আব্দুর রহমান নিজে আক্রমণ করেন এবং বেশ কিছু দুর্গ পদানত করেন। পরের বছর মুতাররিফ বিন আব্দুর রহমানকে পাঠান।

২২৭ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ “আরিওনা” ও “সারতানিয়া” পর্যন্ত পৌঁছে যান যেখানে খ্রিস্টানরা এক রাতে হঠাৎ ইসলামি বাহিনীকে ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং খ্রিস্টানদের ঘেরাও ভেঙে বেরিয়ে আসে। পরের বছর ২১ শাবান আব্দুর রহমান একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে তার পুত্রদেরসহ নিজে বের হন এবং প্রতিপক্ষকে বারবার পরাজিত করার পর ১৫ শাওয়াল কর্ডোভায় ফিরে আসেন। ২২৯ হিজরিতে পুনরায় নিজে বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে লিওন সীমান্তে পৌঁছান। এখানে খ্রিস্টানরা মুসলিম সেনাপতি মুসা বিন মুসা, যে সম্প্রতি বিদ্রোহ করেছিল, তাকে সাথে নিয়ে মোকাবিলায় নেমেছিল। আব্দুর রহমান সেই খ্রিস্টানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ২৩১ হিজরিতে শাহজাদা মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান জলিকিয়া ও লিওনে অভিযান চালান। এই হামলায় লিওনের প্রাচীর ধসিয়ে দেওয়া হয়। [২]

নরম্যানদের আক্রমণ:

২৩০ হিজরির শুরুতে উত্তর ইউরোপের নরম্যান জাতির একটি নৌবহর যা ৮০টি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, হঠাৎ আন্দালুসের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে নোঙর ফেলে। এই লোকেরা জার্মানি ও স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে এসেছিল। তাদের ধর্ম ছিল অগ্নিপূজা, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকরা তাদের “মজুসি” বলে অভিহিত করেছেন। এই লোকেরা কাদিস ও আশবুনিয়া লুণ্ঠন করে ১৪ মহরম ইশবিলিয়ায়...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/৮৩ থেকে ৮৫।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/৮৫, ৮৬।

পৌঁছে গেল। শত শত মুসলিম নর-নারী ও শিশু নিহত বা বন্দী হলো। ইশবিলিয়াকে কেন্দ্র বানিয়ে এই দুর্ভাগারা বিভিন্ন শহর ও জনপদে লুটতরাজ চালাতে থাকে। ৪২ দিন পর্যন্ত কিয়ামত সদৃশ অবস্থা বিরাজ করছিল।

আব্দুর রহমান তখন উত্তর সীমান্তে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি খবর পাওয়া মাত্রই নৌ ও স্থল বাহিনী প্রেরণ করেন। নরম্যানরা সরকারি বাহিনীকে আসতে দেখে উপকূলের দিকে পালাতে শুরু করল। ধাওয়া করার সময় মুসলমানরা তাদের পাঁচশ লোককে হত্যা করল। ৫ সফর ইশবিলিয়া থেকে দুই মাইল দূরে তালিয়াতাহ-তে তাদের সাথে এক জোরালো যুদ্ধ হয়, যাতে নরম্যানদের সর্দারসহ আরও শত শত আক্রমণকারী নিহত হয়। অবশিষ্টরা উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

যখন তারা নিজেদের নৌকায় চড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন মিনজানিক দিয়ে তাদের ওপর অগ্নিবর্ষণ করা হলো। তাদের ত্রিশটি নৌকা পুড়ে ডুবে গেল এবং চারটি মুসলমানরা দখল করে নিল। মুসলমানরা তাদের লাশগুলো ইশবিলিয়ার বাজারে খেজুর গাছে ঝুলিয়ে দিল। এরপর বহু বছর পর্যন্ত নরম্যানদের আন্দালুসের দিকে আসার সাহস হয়নি। [১]

নৌবাহিনীর প্রতি মনোযোগ:

নরম্যানদের আক্রমণ পর্যন্ত আন্দালুসের মুসলমানদের কাছে বিশেষ কোনো নৌ শক্তি ছিল না। এই আক্রমণ তাদের নৌবাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য করল যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের আক্রমণ থেকে উপকূলীয় শহরগুলোকে রক্ষা করা যায়। নৌ বিশেষজ্ঞদের ইশবিলিয়াতে তলব করে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হলো এবং খুব শীঘ্রই আন্দালুসের নৌবাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠল। [২]

২৩৩ হিজরিতে আন্দালুসের এই নতুন নৌবাহিনী প্রথমবারের মতো সমুদ্রে কোনো অভিযানে বের হলো। এর লক্ষ্য ছিল ‘মিউজরকা’ দ্বীপ, যেখানকার খ্রিস্টানরা মুসলমানদের নৌ কাফেলা লুট করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এক বছর পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত ছিল। অবশেষে এখানকার শাসক আমির আব্দুর রহমানের কাছে পত্র পাঠিয়ে দয়া প্রার্থনা করল। আমির শান্তিপূর্ণভাবে থাকা এবং জিজিয়া প্রদানের শর্তে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করলেন। [৩]

কায়সারের দূতাবাস:

দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় পর্যন্ত আন্দালুসের ইসলামি সরকারের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের কায়সার সেই সময় খলিফা মামুনুর রশিদের প্রতাপ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। রোমান ও আব্বাসীয়দের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষও চলছিল। সম্রাট মাইকেল যখন দেখলেন যে বাগদাদবাসীরা আন্দালুসের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে, তখন তিনি সুযোগ বুঝে আন্দালুসে নিজের একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠালেন এবং দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে নিজের মিত্র বানানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তবে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান দ্বীনি চেতনার পরিচয় দিয়ে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে কোনো জোটের অংশ না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ৮৮/২

[২] আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৯৪/৩; তারিখুল ফাতাহ আল-আন্দালুস, ইবনে কুতিয়াহ: পৃ. ৮০-৮১, দারুল কিতাব আল-মিসরি, কায়রো

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ৯০/২

সিদ্ধান্ত নিলেন এবং কায়সারের দূতাবাসকে এই উত্তর দিয়ে ফেরত পাঠালেন যে, আমাদের নিজেদের দেশে অনেক কঠিন অভিযানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেগুলো থেকে অবসর হয়ে আমরা কায়সারের সাহায্যের ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি।

২২৫ হিজরিতে নতুন কায়সার থিওফিলাস আরেকটি দূতাবাস পাঠালেন। এবারও একই আবেদন ছিল যে, বাগদাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাথে জোট করা হোক। কিন্তু আব্দুর রহমান সানি এবারও ব্যবহারিকভাবে কোনো সাহায্য করেননি। তবে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন। [১]

মালকী মাযহাবের প্রসার:

আমির আব্দুর রহমান সানির যুগে কাজী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর মাধ্যমে আন্দালুসে মালকী ফিকহ অনেক প্রসার লাভ করে। কাজী ইয়াহইয়া (রহ.) বারবার বংশোদ্ভূত ছিলেন। ১৫২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। হিজাজে গিয়ে ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহ.) এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর নিকট হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। মুয়াত্তা ইমামের বর্ণনা তাকে বিশ্ববিখ্যাত করে তোলে।

তার ইলম অর্জনের প্রতি এতই আগ্রহ ছিল যে, একবার ইমাম মালিকের পাঠচক্রের বাইরে দিয়ে একটি হাতি যাচ্ছিল। সব ছাত্ররা উঠে এই অদ্ভুত প্রাণীটি দেখতে চলে গেল। কিন্তু ইয়াহইয়া এই ভেবে সেখানেই বসে রইলেন যে, আমি ইলম অর্জন করতে এসেছি, হাতি দেখতে নয়। ইমাম মালিক (রহ.) এই আদব ও আগ্রহ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন এবং তাকে নিজের নিকটবর্তী করে নিলেন। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। এরপর কর্ডোভায় ফিরে আসেন এবং নিজের ইলম দ্বারা পুরো আন্দালুসকে আলোকিত করে দেন। [২]

হাকাম আউয়ালের যুগে তিনি যুবক ছিলেন। তাই তার রাজনৈতিক সচেতনতা ও অভিজ্ঞতায় ঘাটতি ছিল। এই কারণেই তিনি হাকাম আউয়ালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে তিনি পালিয়ে তলেতলে (Toledo) চলে গিয়েছিলেন। হাকাম প্রাণের নিরাপত্তা দিলে তিনি ফিরে আসেন। এরপর তিনি রাজনৈতিক ফিতনা থেকে দূরে থাকার নীতি অবলম্বন করেন। [৩]

এই আচরণ তাকে আরও মর্যাদা দান করল। এমনকি আমির আব্দুর রহমান সানির যুগে তাকে কাজীউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি)-এর পদ যাচাচ করা হয় কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে আমির আব্দুর রহমান সানি আরও প্রভাবিত হন এবং তাকে বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দেন। আন্দালুসের সমস্ত কাজী তারই আদেশে নিযুক্ত হতে শুরু করেন। এভাবে আদালতগুলোতে মালকী ফকিহদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে গেল এবং পুরো দেশে মালকী মাযহাবের ব্যাপক প্রসার ঘটল। [৪]

কাজী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) সত্য কথা বলতে কখনো পিছপা হননি। শাসকদের খাতিরে কখনো শরয়ী মাসআলা গোপন করেননি, বরং তাদের এমন কোনো সুযোগ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন না যা শরিয়তে বিদ্যমান থাকলেও তার মাধ্যমে শাসকদের বিগড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। একবার আমির আব্দুর রহমান সানি অকারণে ইচ্ছাকৃতভাবে রমজানের রোজা ভেঙে ফেলেন। পরে ফকিহদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) বললেন: “টানা দুই মাস রোজা রাখুন।”

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/ ১৩০, ত. দারুল ফিকর; আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/ ৯১

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১০/ ৫২১, ত. আর-রিসালাহ

[৩] তারিখু উলামাইল আন্দালুস, ইবনুল ফারদি: ২/ ১৭৭ [৪] ওফয়াতুল আইয়ান: ৬/ ১৩৯, ত. দারু সাদির; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/ ৮১

পরবর্তীতে উলামায়ে কেরাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “আপনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী মাসআলাটি কেন বলেননি যে, গোলাম আযাদ করা, ষাটটি রোজা রাখা অথবা ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে সমান এখতিয়ার রয়েছে?”

তিনি বললেন: “শাসকদের জন্য প্রতিদিন রোজা ভেঙে গোলাম আযাদ করা বা খাবার খাওয়ানো খুবই সহজ। আমি তাকে কঠিন মাসআলাটি বলেছি যাতে সে ভবিষ্যতে এমনটি আর না করে।”

কাজী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর মৃত্যু ২৩৪ হিজরীর রজব মাসে হয়েছিল। [১]

যিরইয়াব - আলী বিন নাফি:

আমির আবদুর রহমান সানির সিংহাসন আরোহণের প্রথম বছর ২০৬ হিজরীতে পূর্ব দিক থেকে এমন এক ব্যক্তি আন্দালুসে পৌঁছান, যিনি এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বদলে দেন এবং আরবদের সাধারণ জীবনযাত্রাকে অনারব জাঁকজমকপূর্ণ আভিজাত্যে রাঙিয়ে দেন।

তার নাম ছিল আলী বিন নাফি, তবে ইতিহাসে তিনি “যিরইয়াব” উপাধিতে পরিচিত। তিনি হিকমত, দর্শন এবং ললিতকলায় এক অনন্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইরাকের বিখ্যাত গায়ক ও সংগীতজ্ঞ আবু ইসহাক মওসিলির ছাত্র ছিলেন, তবে তার ইলমি ও শৈল্পিক যোগ্যতা মওসিলির চেয়ে অনেক বেশি ছিল। একই সাথে ডজনখানেক বৈচিত্র্যময় শিল্পে তার দক্ষতা ছিল। তদুপরি, প্রতিটি শিল্পে নতুনত্ব এবং উদ্ভাবন আনা ছিল তার জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। তিনি যখন আন্দালুসে পৌঁছান, তখন শিরশ শহরে তাকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং কর্ডোভায় পৌঁছে তিনি বিশেষ সহচরের (নাদিমে খাস) মর্যাদা লাভ করেন। তিনি আন্দালুসের সমাজ ও জীবনযাত্রার ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা, অলঙ্করণ এবং জীবনযাপনের ধরন থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি নতুনত্ব নিয়ে আসেন। আন্দালুসের মানুষ ছিল সচ্ছল ও নিশ্চিত, তাই তারা এই নতুন, আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক পরিবর্তনগুলোর দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হতে শুরু করে।

যিরইয়াব নর্দমার পরিবর্তে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার সূচনা হয়েছিল কর্ডোভা থেকে। পরবর্তীতে পুরো আন্দালুসে এর প্রচলন ঘটে। তিনি খাওয়া-দাওয়ার ধরন বদলে দেন। চামচ এবং ছুরি-কাঁটার ব্যবহার তারই উদ্ভাবন। তিনি শামি কাবাবের মতো সুস্বাদু ও জাঁকজমকপূর্ণ খাবারের প্রচলন করেন। কাঁচের পাত্র, চামড়ার বিছানা এবং চামড়ার দস্তুরখান প্রবর্তন করেন। প্রতিটি ঋতুর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের পোশাকের প্রচলন করেন। আন্দালুসের মানুষের কাছে সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। যিরইয়াব যখন বিলাসিতা ও উপভোগের মাধ্যমে দুনিয়াকে জাল্লাতের মতো বানানোর রুচি তৈরি করলেন, তখন এই জিনিসগুলোই সম্পদের ব্যয়ের খাতে পরিণত হলো। তিনি সংগীত ও গায়কীতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এক হাজারেরও বেশি গান তার মুখস্থ ছিল এবং প্রতিটি গান তিনি বিভিন্ন সুর ও রাগে গাইতে পারতেন। তিনি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলোতে অনেক নতুনত্ব আনেন। তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মানুষ সেই সব শিল্পে আগ্রহী হয়ে ওঠে যেগুলোকে বর্তমানে ললিতকলা বলা হয়। [২]

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৬/১৩৫, ১৩৬, ত তদার সাদির; সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১০/৫২৫, ত তদার রিসালাহ।

[২] নাফহত তীব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/১২৩ থেকে ১৩৩; আত-তারিখুল ইসলামি, আহমদ শালবি: ৩/৮৯; মুরস ইন স্পেন, স্ট্যানলি লেন-পুল, পৃষ্ঠা ৮১, ৮২।

আন্দালুসে জিরিয়াবের প্রবর্তিত কিছু জিনিস মানুষের সুযোগ-সুবিধা এবং জীবনকে সহজ করার কারণ হলেও কিছু জিনিস এমন ছিল যা শরীয়ত অনুমতি দেয় না, সেগুলো এখনকার বাসিন্দাদের জন্য ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। আন্দালুসের মুসলমানরা যারা প্রথম শতাব্দীতে সৈনিক ছিল, পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তারা কঠোর পরিশ্রম, সজাগ দৃষ্টি এবং উচ্চ মনোবল থেকে বঞ্চিত হয়ে বিলাসপ্রিয় এবং আরামপ্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে খ্রিস্টানরা তাদের ওপর বিজয়ী হওয়ার সুযোগ পেয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল এ সম্পর্কেই বলেছেন:

এসো তোমাকে বলি জাতিসমূহের ভাগ্য কী

প্রথমে তলোয়ার ও বর্শা, শেষে ময়ূর ও সেতার

রাসুলের অবমাননার অপবিত্র অভিযান:

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে আন্দালুসের রাজধানী কর্ডোভায় বসবাসরত খ্রিস্টানদের মধ্যে একটি অপবিত্র আন্দোলনের সূচনা হয়, যা আন্দালুসের মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার এমন এক আগুন জ্বালিয়ে দেয় যা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নেভানো সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমা ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেন-পুলের বর্ণনা অনুযায়ী, এই আন্দোলনের সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, কর্ডোভার এক বিকৃত স্বভাবের পাদ্রী ইউলোজিয়াস খ্রিস্টান যুবকদের সামনে একটি নতুন দর্শন পেশ করেন, যার অনুযায়ী:

“ধর্মের প্রকৃত প্রাণ কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে জন্ম নেয়, তাই খ্রিস্টানদের উচিত শাসকদের উস্কানি দিয়ে তাদের কাছ থেকে শাস্তি ভোগ করা। এর সর্বোত্তম উপায় হলো মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া (নাউযুবিল্লাহ), যাতে বাদশাহ ও কাজী উত্তেজিত হন এবং তোমাদের হত্যা করেন। এভাবে তোমাদের আত্মার সর্বোত্তম পরিশুদ্ধি হবে এবং তোমরা আল্লাহর ওলিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”

ইউলোজিয়াসের এই অপবিত্র আন্দোলন সরলমনা, অল্পবুদ্ধি এবং আবেগপ্রবণ খ্রিস্টান যুবকদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং তারা প্রকাশ্যে নবী করীম (সা.)-এর শানে অবমাননাকর স্লোগান দিতে শুরু করে। মুসলমানরা এই পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতে পারত? জায়গায় জায়গায় মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। অনেক মামলা আদালতে যায় এবং ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

শুধুমাত্র ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে এগারোজন খ্রিস্টানকে এই অপরাধ করার কারণে হত্যা করা হয়। এই আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। কাজীগণ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি দিতে বিরত থাকতেন। [১]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু:

২৩৮ হিজরীর রবিউস সানি মাসে দ্বিতীয় আবদুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। তিনি ৩১ বছর ৩ মাস শাসন করেন। তিনি ছিলেন শ্যামলা বর্ণের, দীর্ঘদেহী এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি কেবল শরীয়তের জ্ঞানেই পারদর্শী ছিলেন না, বরং হিকমত ও দর্শনেও পারদর্শী ছিলেন। [২]

[১] Moors in Spain, by Stanley Lane-Poole, p. 118, 119, 121.

[২] Hitti: History of Arabs, p. 515 - Dozy: The Muslims in Spain, 279, 280.

শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন চমৎকার সাহিত্যিক ও কবি। তাঁর যুগে বিজয় অভিযান ও অভিযানসমূহ অব্যাহত ছিল এবং এত পরিমাণ গনীমতের মাল হস্তগত হয়েছিল যে, প্রচুর ব্যয় করা সত্ত্বেও রাজকোষ পূর্ণ থাকত। তিনি স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। অনেক মসজিদ ও অনেক ভ্রমণস্থল নির্মাণ করিয়েছিলেন। নতুন নতুন প্রাসাদ ও দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাস্তাঘাট তৈরি করিয়েছিলেন। জামে কুরতুবার নির্মাণেও সম্প্রসারণ করেছিলেন এবং এর ওপর নতুন ছাদ নির্মাণ করেছিলেন। [১]

আন্দালুসের বিখ্যাত শহর ‘মারবিয়া’র নির্মাণ তাঁরই কীর্তি, যার ভিত্তি ২০৮ হিজরিতে স্থাপন করা হয়েছিল। [২]

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ২৩৮ হিজরি

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/ ৮২, আর-রওদুল মিতার ফি খবরিল আকতার, লেখক: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল মুনইম আল-হিময়ারি (মৃ. ৯০০ হি.), পৃষ্ঠা ১৮১, মুয়াসসাসাতুন নাসির লিস সাকাফাহ, বৈরুত।

৪২২

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

মুহাম্মদ আউয়াল

২৩৮ হিজরি থেকে ২৭৩ হিজরি

(৮৫২ খ্রি. থেকে ৮৮৬ খ্রি.)

আব্দুর রহমান সানির পুত্র মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান ৩০ রবিউল আখের ২৩৮ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ৩০ বছর। তার শাসনামল প্রায় ৩৫ বছর দীর্ঘ ছিল। এই সময়ে নাসারাদের ষড়যন্ত্র, মুসলিম আমিরদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। আমরা এখানে মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমানের সময়ের কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর্যালোচনা করব।

সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের নিয়োগ:

মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমানের আগে সরকারি দপ্তরের লেখালেখি ও হিসাব-নিকাশের কাজে নাসারারা ছেয়ে ছিল এবং শিক্ষিত মুসলিম যুবকদের প্রতিভা অলস বসে থেকে নষ্ট হচ্ছিল। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান নাসারাদের পরিবর্তে সরকারি দপ্তরে তাদের (মুসলিমদের) স্থান দিতে শুরু করেন। এই পদক্ষেপের ফলে আন্দালুসের মুসলমানরা সন্তুষ্ট হলেও নাসারাদের মধ্যে ঘৃণার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

তৌহিনে রিসালাত অভিযানের পরিণতি:

মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমানের প্রাথমিক দিনগুলোতে তৌহিনে রিসালাতের আন্দোলন চলছিল। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান কঠোরতা অবলম্বন করে একের পর এক অনেক অবমাননাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে পাদ্রিরা চিন্তা করতে বাধ্য হন। অবশেষে তারা নিজেরা হস্তক্ষেপ করে অবমাননাকর আন্দোলন বন্ধ করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে যে তৌহিনে রিসালাত করবে সে গুনাহগার হবে, তবে যেসব নাসারা এভাবে কুরবানি দিয়ে নিহত হয়েছে, তারা যাই হোক না কেন আউলিয়া। [১]

এই নতুন মানসিকতা তৈরির ফলাফল এই হলো যে, এই অশুভ আন্দোলন সাময়িকভাবে তো বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু নাসারা প্রজন্মের মধ্যে রাসুলের অবমাননাকারীদের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণা রয়ে গেল। ফলে মুসলমান ও নাসারাদের মধ্যে ঘৃণার ব্যবধান আরও প্রশস্ত হলো। এর সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হলো যে, আন্দালুসের নাসারাদের ইসলাম গ্রহণের গতি না হওয়ার সমান হয়ে গেল এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুসলমানদের...

[১] Moors in Spain, by stanly lane poole, p: 118, 119, 121

Hitti: History of Arabs: 515 - Dozy: The Muslims in spain: 279, 280

...এর তুলনায় তাদের জনসংখ্যার অনুপাত বেশি হয়ে গিয়েছিল।

নারমানদের আক্রমণ:

২৩৫ হিজরিতে ইউরোপের অগ্নিপূজক নারমানরা ৫৪টি জাহাজের সাথে আক্রমণ করে এবং ইশবিলিয়া নদীর বদ্বীপ হয়ে জাজিরাতুল খিজর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এখানে তারা মার-ও-হাজ এবং জামে মসজিদ পুড়িয়ে দেয়। বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত তারা জনপদগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। অবশেষে সরকারি বাহিনী সেখানে পৌঁছায় এবং এই লুটেরারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের চল্লিশটি জাহাজ মুসলমানদের হস্তগত হয়। [১]

আন্দালুসে বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী:

তারিক বিন জিয়াদের হাতে আন্দালুস বিজয়ের এক শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং এই সময়ের মধ্যে আন্দালুসের বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকগুলো গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমানের সময় পর্যন্ত এই গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মতভেদ অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাই এই গোষ্ঠীগুলোর পরিচয় জানা জরুরি।

- খাঁটি আরব: এরা ছিল দেশের বিজয়ী ও শাসক। এরা ছিল উচ্চবিত্ত শ্রেণি। এদের মধ্যে অনেক বংশ ও গোষ্ঠী ছিল, যেমন হিজাজি, শামি, ইয়ামানি, মুদারি।
- মুওয়াল্লাদুন: আরব এবং স্থানীয় খ্রিস্টান নারীদের সম্পর্কের ফলে জন্ম নেওয়া মুসলমানদের মুওয়াল্লাদুন বলা হতো। তারা মর্যাদার দিক থেকে আরবদের সমান হতে চাইত, কিন্তু আরবরা তাদের এই মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। এই বঞ্চনাবোধের কারণে তারা আরবদের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি ঘৃণা পোষণ করত এবং নিজেরা ক্ষমতা লাভ করতে চাইত।
- মুসাল্লামাহ (নওমুসলিম): এই লোকেরা খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল এবং নিজেদের আলাদা পরিচয় বজায় রাখত।
- বারবার (আফ্রিকান): এটি ছিল অত্যন্ত বড় এবং অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় একটি আফ্রিকান গোত্র, যার অনেকগুলো শাখা ছিল। আন্দালুসের সেনাবাহিনীতে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।
- সাকালেবা: জিহাদের সময় যেসব অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে যুদ্ধবন্দি হয়ে আসত, তাদের ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হতো। হাকাম আউয়াল তাদের প্রশিক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিছুকাল পর তারা সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। তাদের সাকালেবা বা সাকলামি বলা হতো।
- জিন্মি: এরা ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টান যারা মুসলিম সমাজে সমস্ত অধিকার নিয়ে বসবাস করত। তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম সমাজে মিশে গিয়ে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। তাদের “মুস্তা’রিব” বলা হতো। দক্ষিণ আন্দালুসে তাদের সংখ্যা মুসলমানদের প্রায় সমান ছিল; তারা ছিল সুসভ্য, শান্তিকামী ও নম্র স্বভাবের। উত্তর আন্দালুসে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল; তারা ছিল যুদ্ধপ্রিয় ও বিদ্রোহী।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ২৩৫ হিজরি।

মুওয়াল্লাদদের বিদ্রোহ এবং এর কারণসমূহ:

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের শাসনামলে বেশ কিছু গোষ্ঠী ক্রমাগত বিদ্রোহ করতে থাকে, যাদের মধ্যে মুওয়াল্লাদগণ অগ্রগণ্য ছিল। এই অনাস্থা ও উত্তেজনার গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- উত্তর দিকের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর প্রধানরা মুসলিম আন্দালুসের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলোকে সমর্থন দিচ্ছিলেন। কেন্দ্রবিমুখ প্রবণতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা তাদের চরদের সক্রিয় করে রেখেছিলেন।
- এই পরিস্থিতিতে শক্তিশালী করতে খোদ আরবদেরও ভূমিকা ছিল, যারা রাজনৈতিক বিষয়াবলীতে পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিলেন। যদিও আইনত কেবল মুওয়াল্লাদ নয় বরং জিম্মিরাও পূর্ণ অধিকার ভোগ করত এবং আদালতগুলোতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের প্রচলন বজায় ছিল, তবে ক্ষমতার অলিন্দে ইসলামের স্বাভাবিক উদারতা ও প্রশস্ততার পরিবেশ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল।
- আন্দালুস বিজয়ে বারবার গোত্রগুলোর বড় ভূমিকা ছিল। আবদুর রহমান আল-আউয়াল তাদের উচ্চপদে আসীন করেছিলেন। কিন্তু এখন বারবারদের মনে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরি হয়েছিল যে, তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। মুওয়াল্লাদদের এই অভিযোগ আরও বেশি ছিল যে, তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদের ওপর আরবদের মতো আস্থা রাখা হচ্ছে না।
- শাসনব্যবস্থা বংশানুক্রমিক হওয়া এবং রাজসিংহাসনে আরবদের মধ্য থেকে কেবল একটি পরিবারের আসীন থাকা খোদ অনেক আরব পরিবারকেও দুঃখ ও হিংসায় লিপ্ত করে রেখেছিল। এ কারণে আরব কর্মকর্তারাও জায়গায় জায়গায় বিদ্রোহ করে আসছিলেন। যখন মুওয়াল্লাদ ও বারবাররা দেখত যে আরবরা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ নয়, তখন তারা ভাবতে বাধ্য হতো যে আমরাই ক্ষমতা আরও ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি।

মুওয়াল্লাদদের বিদ্রোহের মধ্যে তলেতলোবাসী, ইবনে মারওয়ান এবং উমর বিন হাফসুনের সংগ্রাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা পর্যায়ক্রমে তাদের কথা উল্লেখ করব।

তলেতলোর অভিযানসমূহ:

তলেতলোতে যেখানে খ্রিস্টান জনসংখ্যার অনুপাত বেশি ছিল, সেখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ হতে থাকে। এখানকার প্রধানরা খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

এ কারণে কর্ডোভা থেকে বারবার সৈন্য পাঠিয়েও তাদের শক্তি দমন করা সম্ভব হয়নি।

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান ২৩৯ হিজরি এবং ২৪০ হিজরিতে তলেতলোবাসীদের দমন করার জন্য দুইবার নিজে অভিযান পরিচালনা করেন। ২৪২ হিজরিতে নিজের ছেলে শাহজাদা মুনজিরকে পাঠান কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। তলেতলোর বিদ্রোহীরা ২৪৩ হিজরিতে আশেপাশের মুসলিম জনপদগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। যদিও তাদের দ্রুত পিছু হটতে হয়েছিল, তবে এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে তাদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে।

এটি দেখে ২৪৪ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আবারও এখানে সৈন্য পাঠান।

২৪৫ হিজরিতে তলেতলোবাসী সরকারের সাথে কিছু শর্তে সন্ধি করে নেয়। [১]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইয়ারি আল-মাররাকুশি: ২/৯৩ থেকে ৯৬।

উত্তর নসরানি রাষ্ট্রগুলোর সাথে যুদ্ধ:

তলেয়তলার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর নসরানি রাষ্ট্রগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য একাগ্রতা লাভ করা, কারণ প্রতিটি বিদ্রোহের পেছনে মূল হাত ছিল এই রাষ্ট্রগুলোরই।

তাই তলেয়তলার অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধবিরতির পর আমির নসরানি রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করেন যা বেশ কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে। আমির কখনো সেনাবাহিনীকে নিজের কমান্ডে নিয়ে আবার কখনো শাহজাদাদের হাতে নেতৃত্ব অর্পণ করে সীমান্তে অভিযান চালাতে থাকেন। ২৩৬ হিজরিতে তিনি নিজে গিয়ে জাবালুনা, ফায়রুস দুর্গ এবং থাসাল দুর্গ জয় করেন। ২৩৯ হিজরি, ২৫১ হিজরি এবং ২৫২ হিজরিতে শাহজাদা আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আলবা-তে জিহাদি অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং নসরানিদের দুটি বড় যুদ্ধে পরাজিত করেন। ২৫৩ হিজরি, ২৫৪ হিজরি এবং ২৫৫ হিজরিতে শাহজাদা মুহাম্মদকে জিহাদি অভিযানে পাঠানো হয়। [১]

তলেয়তলার আধা-স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর:

এদিকে তলেয়তলার অধিবাসীদের ষড়যন্ত্র আবারও তুঙ্গে ছিল এবং রাজ্যের ঠিক মাঝখানে এই প্রদেশের বিদ্রোহগুলো কেন্দ্রকে কোনো অভিযানের জন্য স্থির হতে দিচ্ছিল না। অবশেষে ২৫৯ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান এই সমস্যা থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সসৈন্যে তলেয়তলায় গিয়ে সেখানকার প্রধানদের সাথে আলোচনা করেন, যার ফলে তলেয়তলাকে আধা-স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা নিজেদের পছন্দমতো শাসক নিজেরাই নিযুক্ত করবে এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। তারা কেবল সরকারকে বার্ষিক কর প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

যদিও সেই সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই পদক্ষেপ হয়তো অনিবার্য ছিল, কিন্তু বাস্তবে এভাবে নসরানিদের প্রাচীন রাজধানী শহরকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে আবারও আন্দালুসের ঠিক মাঝখানে নসরানি রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছিল।

এরপর তলেয়তলার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো চলতে শুরু করে। উত্তরের নসরানি রাষ্ট্রগুলোর পাদ্রি এবং হাজার হাজার মানুষ এই বিশাল শহরের আশপাশে দ্রুত বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। মুসলমানরা তাদের আধিপত্য দেখে ধীরে ধীরে দক্ষিণ আন্দালুসের দিকে হিজরত করতে শুরু করে। এভাবে কয়েক দশকের মধ্যে তলেয়তলা এবং এর আশপাশের এলাকাগুলো উত্তরের নসরানি রাষ্ট্র গথ মার্চ এবং আস্তুরিয়াসের মতো মনে হতে থাকে। [২]

ইবনে মারওয়ানের বিদ্রোহ:

তলেয়তলার স্বাধীনতা অন্যান্য বিদ্রোহীদেরও উৎসাহিত করে। সারাকুস্তায় মুসা বিন মুসা এবং মারিদায় আবদুর রহমান ইবনে মারওয়ান কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইবনে মারওয়ানও সেই বিদ্রোহী মুওয়াল্লাদদের একজন ছিলেন যার ফিতনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ইসলাম ও নসরানিয়াতের মূলনীতি ও আকিদাহকে মিশিয়ে একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছিলেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ৩ / ৯৫-১০০।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ৪ / ১০১।

বিদ্রোহী ও জাহেল মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে সে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। হাজার হাজার মানুষ তার চারপাশে সমবেত হয়। ইবনে মারওয়ান অস্টিয়াস রাজ্যের শাসক আলফনসোর সাথে জোট করে নিজের শক্তি আরও সুসংহত করে নেন।

২৬২ হিজরিতে আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান সালতানাতের উজির হাশিম বিন আবদুল আজিজকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে তাকে দমনের জন্য পাঠান। কিন্তু ইবনে মারওয়ান এমন এক সুপরিকল্পিত কৌশলে মোকাবিলা করেন যে সরকারি বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং স্বয়ং হাশিম বিন আবদুল আজিজ বন্দি হন। ইবনে মারওয়ান তাকে আলফনসোর হাতে তুলে দেন। তিনি আড়াই বছর অস্টিয়াস রাজ্যের কারাগারে বন্দি থাকেন। অবশেষে আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান মোটা অংকের মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেন।

আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান যখন দেখলেন ইবনে মারওয়ানকে পরাজিত করা অসম্ভব, তখন তিনি তার সাথে আলোচনা শুরু করেন এবং সন্ধির শর্তাবলি জানতে চান। তিনি উত্তর দিলেন যে, যদি বাতলিয়ুস ও মারিদা দুর্গ তার অধীনে রাখা হয়, কর মওকুফ করা হয় এবং কোনো প্রকার আনুগত্যে বাধ্য না করা হয়, তবে তিনি লুটতরাজ বন্ধ করবেন এবং আমিরের নামে খুতবা জারি করবেন। যদিও শর্তগুলো কঠিন ছিল, তবুও আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সেগুলো হুবহু মেনে নেন। এভাবে বাতলিয়ুস থেকে মারিদা পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা ইবনে মারওয়ানের আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। আবদুর রহমান আন-নাসিরের সময় পর্যন্ত এই রাজ্য এভাবেই স্বাধীন ছিল। [১]

ওমর বিন হাফসুনের উত্থান:

বিখ্যাত বিদ্রোহী ওমর বিন হাফসুন, যিনি ২৬৭ হিজরিতে উত্তর আন্দালুসের পাহাড়ি এলাকা “রাইয়া”-তে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি একটি গোথ পরিবারের সদস্য ছিলেন, তার পূর্বপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ২৩৬ হিজরিতে “রান্দা”-র একটি গ্রাম “হিসন আউলি”-তে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হাফসুন একজন শরীফ ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এই যুবক অত্যন্ত দাঙ্গাবাজ এবং তুচ্ছ বিষয়ে মারামারি করতে প্রস্তুত থাকত। এই স্বভাবই তাকে খুনি বানিয়ে দেয়। তার পিতা তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে নিজের গ্রাম ছাড়িয়ে দেন এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্বের “জাবালে বারবাস্ত্রো” (কোবো বাস্ত্রো)-র নির্জন জঙ্গলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। ওমর বিন হাফসুন এখানেও তার স্বভাব পরিবর্তন করেননি, বরং জঙ্গলে বসবাসকারী জলদস্যু ও ডাকাতদের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং নিজেই তাদের সর্দার হয়ে যান। অবশেষে পিতা অতিষ্ঠ হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তিনি আন্দালুস ছেড়ে উত্তর আফ্রিকার তাহেরতে পৌঁছান। সেখানে এক পাদ্রি অনুমান করেন যে, এই ব্যক্তি আন্দালুসের ইসলামী সরকারকে নাস্তানাবুদ করতে পারে। পাদ্রি তাকে একটি মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে বিশ্বাস করান যে, তিনি আন্দালুসের শাসক হবেন। তিনি তাকে প্ররোচিত করেন যে, তিনি যেন আন্দালুসে ফিরে গিয়ে আল্লাহর গজব হয়ে দাঁড়ান এবং সেখানে নিজের শাসন কায়েম করেন।

ওমর বিন হাফসুন আন্দালুসে ফিরে আসেন এবং কিছু সমমনা লোককে সাথে নিয়ে “জাবালে বারবাস্ত্রো”-র চূড়ার একটি দুর্গ দখল করে নেন। পুরো আন্দালুসে এর মতো নিরাপদ দুর্গ আর ছিল না। এখানে অবস্থান গেড়ে তিনি আশেপাশের এলাকাগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/১০২, ১০৩।

লুণ্ঠন, হত্যা ও নৈরাজ্যের বাজার গরম করে রেখেছিল। ধীরে ধীরে তার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে সে নিয়মিতভাবে অনেক জনপদ ও দুর্গের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেয়। যখন তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানগুলো ব্যর্থ হতে থাকে, তখন আমির মুহাম্মদ ২৭০ হিজরিতে তাকে সর্বোচ্চ পদের প্রস্তাব দিয়ে রাজি করিয়ে নেন। সে সরকারের অংশ হয়ে কুরতুবাতে চলে আসে। তার বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার দক্ষতার কদর করে তাকে সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়।

পরের বছর সে কুরতুবাহর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে কিছু অভিযানে বের হয় এবং বীরত্ব প্রদর্শন করে প্রশংসা কুড়ায়। কিন্তু শীঘ্রই উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে তার মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং সে এই পদে বিরক্ত হয়ে পড়ে, কারণ এই পদে থেকে সে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে পারছিল না। তাই কিছুদিন পর সে পুনরায় নিজের পাহাড়ি আশ্রয়ে চলে যায়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা আবারও তার চারপাশে সমবেত হতে থাকে। যেহেতু সে এখন রাজকীয় দরবারের চালচলন ও শাসকদের রাজনীতির ধরন কাছ থেকে দেখে নিয়েছিল, তাই সে একজন ডাকাত বা বিদ্রোহীর পরিবর্তে একজন প্রজাবৎসল শাসকের রূপ ধারণ করল। সে তার অধিকৃত এলাকাগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করল এবং মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের নিজের অনুগত করে নিল।

কোনো জোরালো পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে তার শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী শাসকদের যুগে সে এক অপরাজেয় প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রমাণিত হয়। [১]

ওফাত:

২৭৩ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের মৃত্যু হয়। তিনি ৩৩ বছর ১০ মাস শাসন করেন এবং তার বয়স ছিল ৬৫ বছর। তিনি একজন নেককার মানুষ ছিলেন। খেলাধুলা ও অনর্থক কাজকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। [২]

তার মধ্যে সাহস ও যুদ্ধবিদ্যার দক্ষতার অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা ও অশান্তিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি চড়া মূল্য দিয়ে হলেও শান্তি চেয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক নীতি ছিল সমঝোতা ও সহনশীলতার ওপর ভিত্তি করে। তিনি মুওয়াল্লাদদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে দেখে অনেক ক্ষেত্রে তাদের স্বায়ত্তশাসন দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

সামগ্রিকভাবে দেখা যায় যে, মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের পুরো সময়কাল উত্তরের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর এবং দেশের অভ্যন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা বিদ্রোহীদের দমনেই কেটে গেছে। এই যুগে আন্দালুসের ইসলামি সরকার আরও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং একে মিটিয়ে দেওয়ার সংকল্পকারী খ্রিস্টানরা শক্তিশালী হতে থাকে। আল্লামা ইবনুল আজারি রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন বাগ্মী ও প্রাজ্ঞলভাষী, অত্যন্ত গাভীর্ষপূর্ণ এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকতেন। সত্য ও ন্যায়ের পথকে অগ্রাধিকার দিতেন। বুদ্ধিমান, শিষ্টাচারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি হিসাব-নিকাশ ও প্রশাসনিক কাজে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।” [৩]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ৩/১০৩ থেকে ১০৫।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ৩/৯৩।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ৩/১০৭।

সাধারণত তাকে কৃপণ বলা হতো। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, তিনি সালতানাতের সমস্ত হিসাব নিজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন এবং লাখ লাখ টাকার লেনদেনে এক পয়সার কমবেশিও উপেক্ষা করতেন না। যখন তার সামনে হিসাবের ফাইলগুলো রাখা হতো, তখন তিনি এত সূক্ষ্মভাবে সেগুলো পর্যালোচনা করতেন যে, মুন্সি বা কোষাধ্যক্ষদের সামান্য ভুলও তার দৃষ্টি এড়াত না। লেনদেনের ক্ষেত্রে এই কঠোরতা কিছু আমিরের কাছে অসহনীয় ছিল এবং তারা এর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল। তবে এই যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ হযরত বাকি বিন মাখলাদ (রহ.) বলেন:

“আমি বিশ্বের অনেক শাসকের সাথে কথা বলেছি, তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের চেয়ে বেশি জ্ঞানবান ও গুণী কাউকে পাইনি। একদিন আমি তার মজলিসে ছিলাম। তিনি হামদ ও সানা এবং দরুদ শরীফের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করলেন, তারপর একে একে প্রত্যেক শাসকের কথা উল্লেখ করলেন এবং অত্যন্ত সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যেকের প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করলেন, কিন্তু যখন নিজের বর্ণনায় পৌঁছালেন তখন চুপ হয়ে গেলেন।” [১]

ইমাম বাকি বিন মাখলাদ (রহ.):

এই যুগের সবচেয়ে নামকরা আলেম ছিলেন ইমাম বাকি বিন মাখলাদ (রহ.), যিনি ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রথম সারির ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; অর্থাৎ হযরত কাজী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া কুরতুবি (রহ.), হযরত ইয়াহইয়া বিন বুকাইর (রহ.) এবং আফ্রিকায় মালিকি ফিকহ প্রচারকারী হযরত কাজী সাহনুন বিন সাঈদ (রহ.)-এর ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। তাকে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম বলা হতো। তার জন্ম রমজান ২০১ হিজরিতে এবং মৃত্যু জমাদিউল আখিরা ২৭৬ হিজরিতে হয়েছিল।

তিনি দেশ-দেশান্তরে সফর করে হাদিস সংগ্রহ করেছিলেন। তার মাশায়েখ বা শিক্ষক অনেক ছিলেন, যাদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলা হতো যে, বাকি বিন মাখলাদ (রহ.) যে শহরে থাকতেন, সেখানে অন্য কোনো আলেমের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। আন্দালুসে ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শায়বা (রহ.)-এর মুসান্নাফ, ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কিতাবুল ফিকহ এবং খলিফা বিন খাইয়াত (রহ.)-এর আত-তারিখ তিনিই বর্ণনা করেছিলেন। [২]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ১০৯/২

[২] তারিখু উলামাইল আন্দালুস লি ইবনিল ফারযি: ১০৯/১

মুনজির বিন মুহাম্মদ

২৭৩ হি. থেকে ২৭৫ হি.

(৮৮৬ খ্রি. থেকে ৮৮৮ খ্রি.)

আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের পর ১৮ রবিউল আউয়াল ২৭৩ হিজরিতে তাঁর পুত্র মুনজির বিন মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪৪ বছর বয়সী একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার জীবদ্দশায় অনেক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং প্রতিটি স্থানেই বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু এই যোগ্য শাসক শাসনের জন্য মাত্র দুই বছর সময় পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি উমর বিন হাফসুনসহ সেইসব বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন যারা তাঁর পিতার শাসনামলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

২৭৪ হিজরির শেষের দিকে তিনি উমর বিন হাফসুনের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দিতে দিতে তাঁর পাহাড়ি আশ্রয়ে পৌঁছে যান। সেই বছর সাধারণ দুর্ভিক্ষও ছিল এবং শীতকালে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছিল, তাই কোনো অভিযানে অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও আমির মুনজির সেখানে দেড় মাস অবস্থান করেন। তিনি উমর বিন হাফসুনের ওপর সামরিক চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি আলোচনার পথও খোলা রেখেছিলেন এবং তাকে পাহাড়ি অঞ্চলে আধা-স্বায়ত্তশাসন দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

এই সময়ে আবহাওয়ার কঠোরতা এবং অভিযানের ক্লান্তিতে আমির মুনজির গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অভিযানের নেতৃত্বের জন্য তাঁর ভাই আবদুল্লাহকে কুরতুবা থেকে ডেকে পাঠান। আবদুল্লাহ পৌঁছানোর আগেই আমির মুনজির শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাহিনীকে ফিরে যেতে হয়। এই ঘটনাটি ১৫ সফর ২৭৫ হিজরির।

আমির মুনজির সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উদার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং তাঁদের খেয়াল রাখতেন। আন্দালুসের মানুষ তাঁকে পছন্দ করত। তাঁর মৃত্যুর পর কুরতুবার মুরগবিদের বলতে শোনা গেছে যে, আমির মুনজির যদি আরও সময় পেতেন তবে দেশে কোনো বিশৃঙ্খলাকারী অবশিষ্ট থাকত না। [১]

আব্বাস বিন ফিরনাসের উদ্ভাবনসমূহ:

উত্তাল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আন্দালুস আলেম ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে শূন্য ছিল না। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ এবং কবি আব্বাস বিন ফিরনাস এই যুগেরই লোক ছিলেন, যিনি দ্বিতীয় আবদুর রহমান এবং মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমানের জন্য আধুনিক ধরনের ঘড়ি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/১১৯, ১২০; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৬৯, ১৬০, তবা দারুল ফিকর।

তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি পাথর থেকে কাঁচ তৈরিতে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রথম মানুষ ছিলেন যিনি পাখিদের মতো ওড়ার পরীক্ষা করেছিলেন। ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের বাহুতে লম্বা লম্বা ডানা বাঁধেন এবং একটি উঁচু পাহাড় থেকে লাফ দেন। উড়তে উড়তে তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন কিন্তু এই পরীক্ষায় এই ত্রুটি থেকে গিয়েছিল যে, লেজের ব্যবস্থা করা হয়নি যার মাধ্যমে পাখিরা নামার সময় নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে নিচে নামার সময় তিনি নিজেকে সামলাতে পারেননি এবং গুরুতর আহত হয়ে প্রাণ হারান। [১]

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৩৭৩; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/২৫৩।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ

২৭৫ হি. থেকে ৩০০ হি.

(৮৮৮ খ্রি. থেকে ৯১৩ খ্রি.)

আমির মুনজিরের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না, তাই শাসনভার তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদের হাতে আসে, যিনি নেককার ছিলেন কিন্তু নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার অভাব ছিল। তাঁর শাসনামল ছিল আন্দালুসে ফিতনা-ফাসাদ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির এক আক্ষেপজনক সময়। আব্দুল্লাহ হাফেজে কুরআন ছিলেন এবং প্রচুর তিলাওয়াত করতেন। তিনি নফল নামাজ এবং সদকা ও খয়রাতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

[১]

সাধারণ পরিস্থিতিতে তিনি একজন ভালো শাসক প্রমাণিত হতেন, কিন্তু যে ধরনের নাজুক পরিস্থিতিতে তিনি ক্ষমতা পেয়েছিলেন, তা মোকাবিলা করা তাঁর সাধ্যের বাইরে ছিল। আব্দুল্লাহর প্রশাসনিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমিরগণ অবাধ্য হয়ে ওঠেন। খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো বিশৃঙ্খলার তুফান সৃষ্টি করে এবং ইসলামি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে তলেতিলাসহ আন্দালুসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করে নেয়। বারবার গোত্রগুলো পশ্চিম আন্দালুস এবং দক্ষিণ পর্তুগালে একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র কায়েম করে। লুজকা এবং সারাকুস্তার আমিরগণও স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আলবিরাতে নও-মুসলিম এবং সিরীয় আরবদের মধ্যে চরম সংঘাত শুরু হয়েছিল। ইশবিলিয়াতে অত্যন্ত কঠোর বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এই এলাকাটি সরকারের হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রায় পনের বছর পর্যন্ত সরকার এটি পুনরুদ্ধারে অক্ষম ছিল। এরপর আমির আব্দুল্লাহর উজির বদরের কৌশলী পদক্ষেপে এখানকার বিদ্রোহীরা সমঝোতায় রাজি হয় এবং ইশবিলিয়া পুনরায় কুরতুবার অধীনে আসে। [২]

এদিকে ইবনে মারওয়ান নও-মুসলিমদের সাথে নিয়ে মারদাহ এবং বাতলিয়ুসের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেন। আস্তুরিয়াসের রাজা আলফনসো তৃতীয়-এর সাথে সন্ধি করে তিনি নিজের শক্তি অনেক বাড়িয়ে নেন। এই পরিস্থিতিতে আমির আব্দুল্লাহ কুরতুবা বাঁচানোর জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু আলফনসো তৃতীয়-এর শাসনকে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, উভয় শাসক একে অপরের সীমানার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। [৩]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/১২২

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৭৩, ৭৫ সংস্করণ দারুল ফিকর

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৭১ থেকে ১৭৩ সংস্করণ দারুল ফিকর

ওমর বিন হাফসুনের সাথে কর্ডোবার বাইরে ঐতিহাসিক যুদ্ধ:

এই সময়ে ওমর বিন হাফসুন, যে বহু বছর ধরে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করে রেখেছিল, আন্দালুসের উমাইয়া সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিতে পরিণত হয়েছিল। রাজকীয় বাহিনীর সাথে তার বারবার সংঘর্ষ হয়েছিল এবং প্রতিবারই সে রাজকীয় বাহিনীকে শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন করেছিল। সে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কর্ডোবার খ্রিস্টান আমিরদেরও নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়েছিল। এভাবে তার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সে কর্ডোবার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং ওয়াডিউল কাবিরের দক্ষিণের পুরো এলাকা দখল করে নিয়েছিল। রন্দা এবং মালাকার মধ্যবর্তী এলাকাগুলোর ওপরও তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এরপর সে সরাসরি কর্ডোবা দখল করে পুরো আন্দালুসের শাসক হওয়ার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিল। কর্ডোবা আক্রমণের জন্য সে ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করল এবং কালআতে বালাই-কে নিজের সেনানিবাস বানাল। সেই সাথে আব্বাসীয় কর্মকর্তাদের সাথে পত্রিনিময় করে দাবি জানাল যে তাকে আন্দালুসের বৈধ শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক।

কর্ডোবার পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক ছিল। আশঙ্কা ছিল যে কোনো দিন ওমর বিন হাফসুন আক্রমণ করে শহর দখল করে নেবে। যদি আব্বাসীয় খলিফারা ওমর বিন হাফসুনকে বৈধ শাসক হিসেবে মেনে নিতেন, তবে কর্ডোবার অবশিষ্ট সম্মানটুকুও ধূলিসাৎ হয়ে যেত। আবদুল্লাহর কোষাগার শূন্য ছিল, প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে হবে, সৈন্যদের দেওয়ার মতো বেতন পর্যন্ত ছিল না।

এমন পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহর কুরাইশি রক্ত টগবগ করে উঠল। সে সিদ্ধান্ত নিল যে অপমানের জীবনের চেয়ে ময়দানে সম্মানের মৃত্যু অনেক ভালো। সে বাহিনীকে শহর থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দিল এবং ১৪ হাজার সৈন্যের লস্কর নিয়ে নিজেই কালআতে বালাইয়ের দিকে রওনা হলো। ওমর বিন হাফসুনও ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ময়দানে নেমে এল, তার বিশ্বাস ছিল যে এখন আন্দালুসের শাসক সেই হবে।

১২ মহরম ২৭৮ হিজরি (৫ এপ্রিল ৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) আবদুল্লাহ এবং ওমর বিন হাফসুনের বাহিনীর মধ্যে “এগুইলার” বা “পোলি” নামক স্থানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। কর্ডোবাবাসী জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করল এবং শেষ পর্যন্ত ওমর বিন হাফসুন তার সমস্ত সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। আমির আবদুল্লাহ তাকে তাড়া করে তার কালআতে বালাই দুর্গটিও দখল করে নিলেন যেখান থেকে প্রচুর গনিমতের মাল ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হলো।

ওমর বিন হাফসুন পিছু হটতে হটতে তার পুরনো পাহাড়ি আস্তানায় চলে গেল। এই পরাজয় তার দাপট ও প্রভাব খতম করে দিল এবং আব্বাসীয় কর্মকর্তারাও তার পিছু হটার খবর শুনে তাকে আন্দালুসের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়ার দাবি এড়িয়ে গেল। এভাবে বনু উমাইয়ার মুমূর্ষু সরকার নতুন জীবন ফিরে পেল এবং দক্ষিণ আন্দালুসে তাদের শাসন টিকে রইল। [১]

ওমর বিন হাফসুন বনু আব্বাসের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর মুসলমানদের পরিবর্তে খ্রিস্টানদের ওপর ভরসা করার এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং এই উদ্দেশ্যে ২৮৬ হিজরিতে ইসলাম ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ খ্রিস্টান হয়ে গেল। এই অপবিত্র পদক্ষেপের খবর শুনে খ্রিস্টানরা দলে দলে তার কাছে পৌঁছাতে লাগল, অন্যদিকে মুসলমানরা তার সঙ্গ ত্যাগ করল।

(১) আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/১২০ থেকে ১২২।

গেল। তার শক্তি কমে গিয়েছিল কিন্তু তার অবসান হয়নি এবং আবদুল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত তা দেশের জন্য যথারীতি হুমকি হয়ে রইল।

আমির আবদুল্লাহ ৩০০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ২৩ বছর শাসন করেন। এই সময়ে আন্দালুস দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সালতানাতের বার্ষিক আয় যা কখনো বার্ষিক এক কোটি দিনার ছিল, এখন তা মাত্র এক লক্ষ দিনারে নেমে এসেছিল। কোষাগার শূন্য ছিল, সেনাবাহিনী দুর্বল ছিল, ইসলামী সীমান্ত সংকুচিত হয়ে আসছিল। [১]

আলফনসো তৃতীয় এবং খ্রিস্টান রাজ্য “লিওন”-এর উত্থান:

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে বড় বিপ্লব ছিল উত্তর আন্দালুসে আলফনসো তৃতীয়ের ক্ষমতা লাভ, যিনি তার শক্তি ও রাজনীতির মাধ্যমে খ্রিস্টান রাজপরিবারের সমস্ত পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। তিনি খ্রিস্টান রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে উত্তরে একটি বিশাল সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর রাজধানী “লিওন” নামক শহরে স্থানান্তরিত করেন, যা রূপার খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। লিওন শহরটি আগে “আস্তুরিয়াস” বা “গ্যালিসিয়া” (Galicia)-র অধীনে ছিল, এখন তা স্বাধীন হয়ে নিজের বিশাল সীমানার সাথে “লিওন রাজ্য” নামে পরিচিত হতে থাকে। “সালামানকা” (Salamanca) এবং “জামোরা” (Zamora) এর গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল।

“লিওন”-এর সীমানা সংলগ্ন আরও তিনটি খ্রিস্টান রাজ্য ছিল যা এতে একীভূত হয়নি: [২]

- নাভারে রাজ্য, যাকে আরবরা “নাবারা” এবং “নাফার” বলত।
- ক্যাস্টিল, যাকে আরবরা “আল-কিলা” বলত। [৩]
- “আরাগন” (Aragon), যা স্পেনের উত্তর-পূর্বে জাবালে প্রানিস থেকে নির্গত ইব্রো নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

এই রাজ্যগুলো কখনো “লিওন রাজ্য”-এর সাথে জোট করত আবার কখনো এর সাথে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হতো।

মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান থেকে আমির আবদুল্লাহ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ে ইসলামী সরকারের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে এই খ্রিস্টান রাজ্যগুলো বিকশিত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ পায়। যদি দেখা যায়, তবে আন্দালুসের উমাইয়া সরকারের জন্য তৃতীয় হিজরি শতাব্দী ছিল বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার শতাব্দী, বিশেষ করে এর শেষার্ধ্বে আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। আন্দালুসের এখন একজন প্রতিভাবান এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। এটি অনুভূত হচ্ছিল যে, যদি আল্লাহর বিশেষ রহমত শামিল না হয় এবং পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো লৌহমানবের আবির্ভাব না ঘটে, তবে এই মহান ইসলামী সালতানাত কয়েক দশকের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

[১] আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল-মাগরিব, ইবনে ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/৫১ থেকে ১৫৩।

[২] এক শতাব্দী পরে ক্যাস্টিল রাজ্য আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং “লিওন”-কে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কয়েক দশক পর লিওন আবার স্বাধীন হয় কিন্তু তেরো শতকে এটি পুনরায় ক্যাস্টিলের অংশে পরিণত হয়।

[৩] আত-তারিখ আল-আন্দালুসি মিনাল ফাতহি ইলা সুকুতি গারনাতা, আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ২৭১ থেকে ২৭৪। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যখন মুসলমানরা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন এই রাজ্য জাবালে প্রানিস থেকে পূর্বে ভ্যালেন্সিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ক্যাস্টিলের অংশে পরিণত হয়।

আবদুর রহমান আন-নাসির

৩০০ হিজরি থেকে ৩৫০ হিজরি

(৯১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

এখন আমরা আন্দালুসের ইতিহাসের সেই নাজুক মোড়ে আল্লাহর রহমত হিসেবে আবির্ভূত হওয়া সেই মহান ব্যক্তির আলোচনা শুরু করছি, যিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আমির আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদের সন্তান আবদুর রহমান আন-নাসির। আমির আবদুর রহমান আন-নাসিরের জন্ম ২২ রমজান ২৭৭ হিজরিতে (ডিসেম্বর ৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) হয়েছিল। আবদুর রহমানের বয়স তখন এক মাসও পূর্ণ হয়নি, যখন তার পিতা মুহাম্মদ নিজের ভাইয়ের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হন। ফলে আমির আবদুল্লাহ তার এতিম নাটিকে কোলে তুলে নেন এবং নিজেই তার লালন-পালন করেন।

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদকে খোদায়ী কুদরত অসাধারণ গুণাবলীতে ভূষিত করেছিল। দশ বছর বয়সেই তিনি কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ও ইতিহাসেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তার বয়স যখন মাত্র সতেরো বছর, তখন তার দাদা তাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। অনেকবার জুমার নামাজ ও দুই ঈদের নামাজে নিজের পরিবর্তে তাকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

খোদায়ী কুদরত যখন কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে চায়, তখন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের নেতাদের কল্যাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার তাওফিক দান করে। ফলে আমির আবদুল্লাহ নিজের জীবদ্দশাতেই রাজকীয় আংটি তার এই প্রতিভাবান নাতির হাতে তুলে দিয়ে তার উত্তরাধিকার ঘোষণা করেছিলেন এবং তার ভাইয়েরা ও পুত্ররাও অপ্রত্যাশিতভাবে ইসলামি সালতানাতের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে পিতার মৃত্যুর পর এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই যুবকের সিংহাসন আরোহণ মেনে নিয়েছিলেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. লিখেন:

“তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছিল বিস্ময়কর। কারণ তিনি যুবক ছিলেন, শুধু তার চাচারা নয় বরং তার পিতার চাচারাও জীবিত ছিলেন।” [১]

দাদার মৃত্যুর পর আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ ১লা রবিউল আউয়াল ৩০০ হিজরিতে কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তার বয়স ছিল ২৩ বছর। জনগণের আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদের প্রতি অনেক প্রত্যাশা ছিল। এই যুবকের শাসনকাল আন্দালুসের আটশ বছরের ইসলামি ইতিহাসের...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৭৬, তাবা দারুল ফিকর।

...সবচেয়ে সফল ও স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। আন্দালুসের মানুষ এই ত্রাণকর্তাকে আবদুর রহমান আন-নাসির এবং আবদুর রহমান আস-সালিহ (তৃতীয়) বলে স্মরণ করত।

[১]

বিপর্যস্ত শাসনব্যবস্থার সংস্কার:

আবদুর রহমান আন-নাসির এমন এক পরিস্থিতিতে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন যখন ইসলামের শত্রুরা তলোয়ার শান দিচ্ছিল এবং ইসলামী সরকারের কর্মকর্তারা বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র এবং জনগণের ওপর অত্যাচারে লিপ্ত ছিল।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই যুবককে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, ইস্পাতকঠিন হৃদয় এবং বিস্ময়কর প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই গভীর চিন্তা-ভাবনা, প্রজ্ঞা ও উচ্চ সাহসিকতার সাথে সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করতে শুরু করেন। তিনি অযোগ্য বা দুশ্চরিত্র কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করেন এবং বেছে বেছে আল্লাহভীরু, সাহসী ও যোগ্য ব্যক্তিদের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত করেন।

তিনি “বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতা এবং জনগণের প্রতি দয়া” নীতি গ্রহণ করেন। দেশের সর্বত্র কর্মকর্তাদের কাছে এই বার্তা পাঠান যে, যারা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছে বা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তারা যদি ভবিষ্যতে সরকারের অনুগত থাকে এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তাদের পূর্ববর্তী ভুলগুলো ক্ষমা করা হবে। যেসব কর্মকর্তা বিদ্রোহ করেছে তারা যেন অবিলম্বে রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাদের অধিকৃত এলাকার বিবরণ প্রদান করে, অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এটি ছিল আবদুর রহমান আন-নাসিরের আল্লাহ প্রদত্ত প্রভাব যে, একটি মাত্র বার্তায় অনেক বিদ্রোহী সর্দারের হাত-পা অবশ হয়ে গেল এবং তারা বিদ্রোহী পথ ত্যাগ করে আনুগত্য স্বীকার করে নিল। অন্যদিকে যেসব আমীর বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিল তারা তাদের ভুল চিন্তার জন্য লজ্জিত হলো এবং সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে গেল। আবদুর রহমান আন-নাসির প্রজাদের ওপর ধার্যকৃত সমস্ত কর মওকুফ করে দিলেন, যার ফলে জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং সবাই তাকে মন থেকে দোয়া করতে লাগল। [২]

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান:

আবদুর রহমান আন-নাসির ইসলামী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী উমর বিন হাফসুনকে আর কোনো সুযোগ দিতে চাননি, তবে তার আগে পথের কাঁটা পরিষ্কার করা জরুরি ছিল। আবদুর রহমান আন-নাসির এই কাজে দেরি করেননি; তার সিংহাসনে আরোহণের তিন মাসও পার হয়নি যখন তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেনাপতি হাজিব বদরকে একটি বাহিনী দিয়ে এতিজা (Stanga) অভিমুখে পাঠান, যিনি ১৮ই জমাদিউল আউয়াল ৩০০ হিজরি (৩১শে ডিসেম্বর ৯১২ খ্রিস্টাব্দ) সেখানে পৌঁছে শহরটি অবরোধ করেন। বিদ্রোহীদের সাহস ভেঙে পড়ে এবং শহরটি জয় হয়।

শাবান ৩০০ হিজরি (মার্চ ৯১৩ খ্রিস্টাব্দ) মাসে আবদুর রহমান আন-নাসির নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বসন্তকালেই জাইন (Jaen) অবরোধ করে তা দখল করে নেন। তার পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মারতিশ (আর্চিডোনা), যার শাসক উমর বিন হাফসুন...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/৫৮, ৫৭; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৭৬, ১৭৭, ত ত দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৩৭৩

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ৩/১৫৯, ১৬০

...এর মিত্র ছিল। ধারণা করা হয়েছিল যে, মারতাককে অবরুদ্ধ দেখে উমর বিন হাফসুন তার মিত্রদের সাহায্যের জন্য আসবে, কিন্তু আবদুর রহমানের উপস্থিতিতে উমর বিন হাফসুন এদিকে আসার সাহস করেনি। মারতাক বিজয়ের পর আবদুর রহমান আন-নাসির ‘মিনতা’ (Minta), এলভিরা এবং উমর বিন হাফসুনের পাহাড়ি মিত্রদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ‘ফতিয়ানা’ পদানত করে তাবলীশ দুর্গে পৌঁছান, যেখানে খ্রিস্টান লুটেরাদের ডজন ডজন দল একত্রিত ছিল এবং মুসলিম জনপদগুলো লুণ্ঠন করছিল।

তাবলীশ দুর্গের লুটেরাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ইসলামি বাহিনী সেই সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়াগুলোর কাছে গিয়ে পৌঁছাল যেখানে বিদ্রোহী ও ডাকাতদের অনেকগুলো দুর্গ অবস্থিত ছিল। এই দুর্গম স্থানটি ‘আশিয়ানা-ই-উকাব’ (ঈগলের বাসা) নামে পরিচিত ছিল।

সাধারণত মুসলিম আমিরগণ এই এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর না হয়েই ফিরে যেতেন, কিন্তু আবদুর রহমান আন-নাসির জানতেন যে, অনিষ্ট ও ফিতনার এই আস্তানাগুলো এলভিরা ও থানাডার মুসলমানদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে আঘাত হয়ে আছে। তাই তিনি অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখেন এবং শালুবিয়া, শান্ত ইস্তিবান ও বকরুল্লাহর মতো কঠিন স্থানগুলো একে একে জয় করে সমস্ত ডাকাত ও দস্যুদের তাদের পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছে দেন। [১]

ইশবিলিয়া বিজয়:

ইশবিলিয়া ইসলামি আন্দালুসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। সেখানকার শাসক ইবনে মুসলিমার ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হয়ে ৩০১ হিজরিতে আবদুর রহমান আন-নাসির ইশবিলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। ইবনে মুসলিমা সরকারি বাহিনীর আগমনের খবর শুনে উমর বিন হাফসুনের কাছে সাহায্য চাইল। যখন সরকারি বাহিনী ইশবিলিয়ার কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন উমর বিন হাফসুনের যোদ্ধারা পেছন দিক থেকে এসে আক্রমণ করল। কিন্তু সরকারি সৈন্যরা ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতভাঙা জবাব দিল এবং এই লুটেরাদের লেজ গুটিয়ে পালাতে হলো। ইবনে মুসলিমাকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং ইশবিলিয়ায় উমাইয়া সরকারের নতুন আমির নিযুক্ত করা হলো। [২]

উমর বিন হাফসুনের নতিস্বীকার:

ইশবিলিয়া বিজয়ের পর আবদুর রহমান আন-নাসির উমর বিন হাফসুনকে দমনের সংকল্প করেন। উমর বিন হাফসুন সেই দিনগুলোতে ‘তুলুশ’কে কেন্দ্র বানিয়ে আশপাশের এলাকায় তাগুব চালিয়ে আসছিল। সে বিপুল সংখ্যক ভাড়াটে যোদ্ধা সংগ্রহ করেছিল। অর্ধ শতাব্দীর লুটতরাজের ধনভাণ্ডার তার কাছে জমা ছিল, যার ফলে তার অর্থনৈতিক শক্তিও ছিল অত্যন্ত মজবুত।

আমির আবদুর রহমান আন-নাসির তার ফিতনা পুরোপুরি নির্মূল করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে একটি বাহিনী ‘তুলুশ’-এ পাঠালেন। বাহিনী দীর্ঘ সময় ধরে তুলুশ দুর্গ অবরোধ করে রাখে এবং অবশেষে তা দখল করে নেয়। তবে এই সময়ের মধ্যে উমর বিন হাফসুনও গোপন পথে পালিয়ে গিয়েছিল। ‘তুলুশ’-এ পরাজিত হওয়ার পর উমর বিন হাফসুনের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে পাহাড়ে আত্মগোপন করে। যেহেতু তার রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তাই সে হতাশ হয়ে আমির আবদুর রহমানের সাথে সন্ধি করে নেয়। সন্ধির শর্তাবলি...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/১৬০, দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৩৭৬, তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৭৯, ত. দারুল ফিকর।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/১৬৩।

চুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু পাহাড়ি দুর্গ তার কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ‘বোবাস্ট্রো’র চূড়ায় অবস্থিত প্রাচীন পাথুরে দুর্গটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটিই ছিল সেই দুর্গ যা উমর বিন হাফসুনের প্রথম এবং শেষ আশ্রয়স্থল ছিল। ৭২ বছর বয়স পূর্ণ করে ৩০৫ হিজরিতে তিনি মারা যান এবং নিজের প্রাচীন দুর্গ “কাস্টিলা”য় সমাহিত হন। এভাবে আন্দালুসের মুসলমানরা এক ঘোরতর শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায়। [১]

উমর বিন হাফসুনের উত্তরসূরিদের সমাপ্তি:

উমর বিন হাফসুনের পাঁচজন পুত্র ছিল: সুলাইমান, আব্দুর রহমান, জাফর, হাফস এবং আইয়ুব। এরা সবাই পিতার মতো মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। পাহাড়ি দুর্গগুলোর আশ্রয়ে তারা আরও কয়েক বছর রাজকীয় বাহিনীর পাকড়াও থেকে বেঁচে ছিল, তবে এখন তাদের শক্তি ভেঙে পড়েছিল এবং তাদের পারস্পরিক কোন্দল চরমে পৌঁছেছিল। আব্দুর রহমান আন-নাসির এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, বরং তাদেরকে নিজেদের কোন্দলে লিপ্ত থাকতে দেন। এরপর আব্দুর রহমান আন-নাসির পৃথক পৃথক অভিযানের মাধ্যমে একে একে তাদের সবাইকে পরাস্ত করেন। তবে উমর বিন হাফসুনের প্রাচীন দুর্গ ‘বোবাস্ট্রো’র মালিক জাফর বহু বছর পর্যন্ত হাতে আসেনি।

৩১২ হিজরিতে যখন উমর বিন হাফসুনের উত্তরসূরিরা পারস্পরিক কোন্দলে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, তখন আমির আব্দুর রহমান আন-নাসির বোবাস্ট্রো অবরোধ করেন। দুর্গের কাছে রোমানদের একটি প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গ তিনি পুনরায় নির্মাণ করান এবং সেখানে নিজের সেনাবাহিনীর জন্য একটি ছোট শহর গড়ে তোলেন। রসদ সরবরাহের সমস্যার কারণে এই অঞ্চলে কোনো সামরিক অভিযান দীর্ঘ সময় ধরে চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমিরের নির্দেশে আশেপাশের এলাকা চাষাবাদের উপযোগী করা হয় এবং সেখান থেকে সেনাবাহিনীর জন্য শস্য ও খাদ্যের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থার পর পাহাড় ও উপত্যকাগুলো কঠোরভাবে অবরোধ করা হয়, যার ফলে বোবাস্ট্রো’র আকাশচুম্বী প্রাচীর পর্যন্ত ছয় মাস যাবত শস্যের একটি দানাও পৌঁছাতে পারেনি।

অবশেষে অবরুদ্ধরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হয় এবং ৩১৫ হিজরির ১৬ই জিলকদ এই অপরাজেয় দুর্গ আব্দুর রহমান আন-নাসিরের সামনে নতি স্বীকার করে। আব্দুর রহমান আন-নাসির এই মহান বিজয়ে সিজদায়ে শোকর আদায় করেন এবং কয়েক দিন পর্যন্ত নফল রোজা রাখেন ও শুকরানা নামাজ আদায় করতে থাকেন।

উমর বিন হাফসুন শেষ বছরগুলোতে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু লোক তাকে তখনও মুসলমান মনে করত। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য আব্দুর রহমান আন-নাসির উলামা ও ফকিহদের অনুমতি নিয়ে তার কবর খনন করান। দেখা গেল তার লাশ খ্রিস্টান রীতি অনুযায়ী দাফন করা হয়েছে। মুখ কিবলার পরিবর্তে পূর্ব দিকে এবং হাত বুকের ওপর বাঁধা ছিল। লাশ বের করে কর্ডোভার চকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে সত্য সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়।

বোবাস্ট্রো বিজয়ের ফলে আন্দালুসের সমস্ত বিদ্রোহী খ্রিস্টানরা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তাদের একটি বড় অংশ অবাধ্যতা ত্যাগ করে।

[১] আল-বায়ান আল-মাগরিব: ১৬২/২ থেকে ১৭১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৮০/১; আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস লি-ইবনে হাইয়ান: ৬৫/৫।

ইসলামী সালতানাতের আনুগত্যের অঙ্গীকার করল। [১]

খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে জিহাদ:

উমর বিন হাফসুনের ফিতনা শেষ হতেই আব্দুর রহমান আন-নাসিরের মোকাবিলা সেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে হলো যারা উত্তর আন্দালুস থেকে বেড়ে মধ্য আন্দালুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আস্তুরিয়াস রাষ্ট্র, যা একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের রূপ ধারণ করে ইসলামী আন্দালুসের জীবননাড়ির ওপর খঞ্জর হয়ে বসেছিল। গ্যালিসিয়া, লিওন এবং কাস্টিলের তিনটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র আস্তুরিয়াসের সাথে একীভূত হওয়ার পর আস্তুরিয়াসের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আব্দুর রহমান আন-নাসিরের দাদা আমির আব্দুল্লাহ এবং আস্তুরিয়াসের রাজা আলফনসো ৩য়-এর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল। আলফনসো ৩য় এই চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। ২৯৭ হিজরিতে (৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) যখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন, তখন তার ছেলে গার্সিয়া সিংহাসনে বসেন এবং তিনিও শান্তিতে অটল থাকেন। কিন্তু আব্দুর রহমান আন-নাসিরের শাসনের দ্বিতীয় বছর ৩০১ হিজরিতে আস্তুরিয়াসে আলফনসো ৩য়-এর নাতি অর্ডোনো (অর্ডোনো) ২য়-এর শাসন শুরু হয়, যিনি ছিলেন স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত দুষ্ট ও ধূর্ত মানুষ। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে “ইয়াবুরা” আক্রমণ করেন এবং শহরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। ফেরার পথে তিনি চার হাজার নারী ও শিশুকে বন্দী করে নিয়ে যান। [২]

এভাবে সেই শান্তি চুক্তি ভেঙে গেল যা আমির আব্দুল্লাহর সময় থেকে আস্তুরিয়াসের সাথে চলে আসছিল। আব্দুর রহমান আন-নাসিরের কাছে এই বিদ্রোহী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের যৌক্তিক কারণ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তখন তিনি উমর বিন হাফসুনের সাথে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে এমনভাবে লিপ্ত ছিলেন যে বাইরের ফ্রন্টে সৈন্য পাঠাতে পারছিলেন না।

৩০৩ হিজরিতে আন্দালুসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার ফলে সাধারণ মানুষ ও শাসকরা চরম সংকটের সম্মুখীন হন। আব্দুর রহমান আন-নাসির শস্য ক্রয়ের জন্য এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য রাজকোষের মুখ খুলে দেন এবং দান-সদকার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যাই হোক, দেশ অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয়, যার কারণে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতিও কঠিন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই অবস্থা দেখে অর্ডোনো ২য় সুযোগটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করে বেশ কিছু দুর্গ দখল করে নেন।

ততক্ষণে উমর বিন হাফসুনের ফিতনা স্তিমিত হয়ে এসেছিল, তাই আব্দুর রহমান আন-নাসির মহররম ৩০৪ হিজরিতে ইবনে আবি আবদাহকে একটি শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে অর্ডোনোর মোকাবিলায় পাঠান। অর্ডোনো চার গুণ বড় বাহিনী নিয়ে মোকাবিলায় আসেন কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। [৩]

ইবনে আবি আবদাহর হাতে খ্রিস্টানদের পরাজয়:

পরের বছর অর্ডোনোর অবাধ্যতার শক্তি পুরোপুরি ভেঙে দেওয়ার জন্য ইবনে আবি আবদাহ পুনরায় তার মোকাবিলায় বের হন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৮৬/১; আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস লি ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি: ৫/৬২-৬৩, তাবা আল-মাজলিসুল আলা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়া কায়রো; আল-বায়ানুল মাগরিব: ১৯১/২-১৯৯।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৯২/১।

[৩] আল-বায়ানুল মাগরিব: ১৬৭/২-১৬৯।

তাকদীরে ইলাহীর কারণে এই লড়াইয়ে মুসলমানদের পরাজয় হলো, ইবনে আবি আবদাহ লড়াই করতে করতে শহীদ হলেন। খ্রিস্টানরা চরম দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়ে তার মাথা একটি শুকরের মাথার সাথে বেঁধে একটি দুর্গে ঝুলিয়ে দিল। আবদুর রহমান আন-নাসির অত্যন্ত সাহসের সাথে এই পরাজয়ের সংবাদ শুনলেন এবং পাল্টা আক্রমণের সংকল্প করলেন। [১]

খ্রিস্টানদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ ও সফলতা:

মুসলমানদের পরাজিত করে ওরদুনোর সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল, সে জিলহজ ৩০৮ হিজরিতে আন্দালুসের পশ্চিম প্রান্তের দুর্গসমূহ: নাজরাহ, তালিলাহ এবং ওয়াদিয়ে তারসুনাহ দখল করে নিল। এই অভিযানে জালিকিয়া এবং বাবলুনার শাসক শানজাহ-ও শরিক ছিল।

আবদুর রহমান আন-নাসির এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তার বিশেষ সেনাপতি হাজিব বদর বিন আহমদকে পাল্টা আক্রমণের জন্য সৈন্যবাহিনী দিয়ে পাঠালেন। তিনি যুদ্ধবাজ সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতিতে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোতে ঢুকে পড়লেন এবং মোকাবিলায় আসা বাহিনীগুলোকে একে একে পদদলিত করে উত্তর আন্দালুসের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এই পাহাড়গুলোতে খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে অত্যন্ত রোমাঞ্চকর দুটি লড়াই হলো যাতে অসংখ্য খ্রিস্টান নিহত হলো।

কিছুকাল পর খ্রিস্টানদের শক্তি পুরোপুরি দমনের জন্য আবদুর রহমান আন-নাসির নিজে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে কর্ডোভা থেকে অভিযান শুরু করেন এবং মিনা কেলি (Menna Celli), ওয়াদিয়ে ইবরু, আশত আসতিপান, ফারমাজ, কালআতুল কাবিলাহ, কালআতুল কুল্লাহ এবং কালআতুল কারকার-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো জয় করে নেন।

এই বিজয়ের পর ইসলামী লস্কর আরও সামনে অগ্রসর হলে ইবরু নদীর ওপারে খ্রিস্টান শাসক শানজাহর সাথে প্রচণ্ড লড়াই হলো যাতে শেষ পর্যন্ত শানজাহ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে অন্যান্য খ্রিস্টান আমির ও বাদশাহরাও শানজাহর সাহায্যে এগিয়ে এল এবং কিছুদূর সামনে গিয়ে একটি উপত্যকায় খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের মোকাবিলায় চলে এল। কিন্তু এখানেও আল্লাহর সাহায্য ইসলামী লস্করের সাথে ছিল। হাজার হাজার খ্রিস্টান গাজর-মুলার মতো কাটা পড়ল এবং বাকিরা পিছু হটে গেল।

এই অভিযানগুলো ৩০৬ হিজরিতে শুরু হয়েছিল এবং ৩০৮ হিজরি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ৩১০ হিজরিতে আবদুর রহমান আন-নাসির নিজের কমান্ডে দুটি অভিযান পরিচালনা করেন: প্রথম অভিযানে রতিয়াহ এবং কালআতু তুরাশ জয় করেন। দ্বিতীয় অভিযানে আল-বিরাহ এবং কালআতু মানতারুবি দখলে নেন। [২]

বিজয় সম্পন্ন হওয়া:

এই ধারাবাহিক পরাজয়ের পরও ওরদুনো শান্ত হয়ে বসেনি। ৩১১ হিজরিতে (৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে) সে কতিয়াহ আক্রমণ করে শত শত মুসলমানকে নির্মমভাবে শহীদ করে দিল। এই সংবাদ আবদুর রহমান আন-নাসিরকে জ্বালিয়ে দিল এবং তিনি ওরদুনোকে শেষ না করা পর্যন্ত তলোয়ার হাত থেকে না রাখার সংকল্প করলেন। [৩]

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ৭০/২, ১৭১; আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস লি-ইবনে হাইয়ান: ৬৬/৫

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৮৩/৪, ৮৪; ত: দারুল ফিকর; আল-বায়ানুল মুগরিব: ১৪২/২, ১৪৩, ১৫২, ১৮৩

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মুগরিব লি-ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ১৮৩/২

মহররম ৩১২ হিজরি (এপ্রিল ৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) তে তিনি পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে কর্ডোভা থেকে বের হলেন এবং খ্রিস্টানদের পামপ্লোনা রাজ্যের ওপর আক্রমণ করলেন। খ্রিস্টান সেনাবাহিনী বিনা প্রতিরোধে পলায়ন করল এবং মুসলিম বাহিনী পামপ্লোনা পর্যন্ত বিনা বাধায় বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে গেল। আমির আবদুর রহমান খ্রিস্টানদের অত্যাচারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন, তাই তিনি পামপ্লোনার প্রাচীর ভেঙে ফেললেন এবং সমস্ত গির্জা ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। সেই বিশাল গির্জাটিও যা সানচো বিপুল অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করেছিলেন, স্থানীয় খ্রিস্টানদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

খ্রিস্টানরা যখন এই অপমানের কথা শুনল, তখন কাস্টিল রাজ্য তাদের সেনাবাহিনীকে মোকাবিলার জন্য পাঠাল, কিন্তু তাদেরও শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হলো। আবদুর রহমান আন-নাসির কর্ডোভা থেকে আরদুন পর্যন্ত অভিযান সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে খবর এল যে আরদুন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং খ্রিস্টান শাসকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

আবদুর রহমান আন-নাসির এই সংবাদ শুনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং কর্ডোভায় ফিরে গেলেন, যেখানে বিজয়ী শাসকের এক জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা হলো। ৩১৩ হিজরিতে আমির আবদুর রহমান আন-নাসির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করলেন এবং “কেল্লা আশতিন” জয় করলেন। [১]

শত্রুদের মধ্যে বিভেদ:

আল্লাহর অশেষ রহমতে শত্রুদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার রূপ প্রকাশ পেয়েছিল এবং আলফনসো ৩য়-এর সন্তানদের মধ্যে আস্তুরিয়াস সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশগুলোর অধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ওদিকে খ্রিস্টান গ্যালিসিয়া রাজ্যের শাসকও মারা যান এবং তার জায়গায় আলফনসো ৪র্থ সিংহাসনে বসেন। (তিনি সাত বছর শাসনের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তার জায়গায় রামিরো ২য় শাসক হন)। পরের বছর পামপ্লোনার খ্রিস্টান শাসক সানচোও মারা যান। এভাবে খ্রিস্টানদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। [২]

আবদুর রহমান আন-নাসির একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের স্বভাব সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। তিনি জানতেন যে, যদি এই মুহূর্তে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর ওপর আক্রমণ করা হয়, তবে তাদের গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে এবং তারা সবাই ইসলামি বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তিনি খ্রিস্টানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ চলতে দিলেন। পরিণামে কয়েক বছরের মধ্যে আস্তুরিয়াসের খ্রিস্টান সাম্রাজ্য ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেল এবং অন্যান্য ছোট ছোট খ্রিস্টান রাজ্যের দুর্বল ও স্বার্থপর শাসকরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বয়ং আমির আবদুর রহমান আন-নাসিরের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হলো।

খিলাফত ঘোষণা:

সেই সময়ে আব্বাসীয় খিলাফত এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, মুসলিম বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। খলিফাদের আদেশ বাগদাদের ভেতরেও কার্যকর হতো না। খিলাফতের প্রাসাদের ভেতরে নারীদের রাজত্ব ছিল এবং বাইরে তুর্কি আমিররা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বাগদাদের মসজিদ ও মোড়ে মোড়ে বিতর্ক হতো যা শেষ হতে হতে অনেক সময় ডজন ডজন লাশ পড়ে যেত।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৪৩, ১৪৪; আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/১৮৫, ১৮৬; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৩৯৯, ৪০০।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/১৮৯।

ছিল। এদিকে রোমানরা প্রতিদিন এশিয়া মাইনরে (এশিয়ায় কুচক) সামরিক অভিযান চালাচ্ছিল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রতিরোধ শক্তি দেখা যাচ্ছিল না। কারামাতিরা ইরাক ও আরবে এমন তুফান সৃষ্টি করে রেখেছিল যে খুব কম লোকই হজের জন্য মক্কায় পৌঁছাতে পারত।

এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ৩১৬ হিজরিতে আবদুর রহমান আন-নাসির উলামা ও ফুকাহাদের সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেন যে, এখন আন্দালুসের মহান উমাইয়া সরকারই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য, তাই এর প্রধানকে ভবিষ্যতে আমিরের পরিবর্তে খলিফা বলা হবে। এভাবে আমির আবদুর রহমান “আমিরুল মুমিনীন আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ” উপাধি গ্রহণ করে আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফতের সূচনা করেন। ঘোষণা করা হলো যে, এখন থেকে জুমার খুতবায় আবদুর রহমান আন-নাসিরের নাম খলিফাতুল মুসলিমীন হিসেবে উল্লেখ করা হবে। [১]

প্রাচ্যের ইসলামি পণ্ডিতগণ আন্দালুসের উমাইয়া রাষ্ট্রকে কখনোই খিলাফত হিসেবে গ্রহণ করেননি, তাই এই পদক্ষেপের শরয়ী অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। তবে আন্দালুসবাসীরা তাদের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপকে সঠিক মনে করতেন।

বাতলিউস ও মারদাহ বিজয়:

কর্ডোভার (কুরতুবা) পশ্চিমে চল্লিশ বছর ধরে বাতলিউস ও মারদাহর ওপর মুওয়াল্লাদুনদের আধিপত্য ছিল, যাদের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল। এই সরকার উমাইয়া রাষ্ট্রের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ৩১১ হিজরিতে এর শাসক আবদুল্লাহ বিন মারওয়ান জিলিকি তার এক সমর্থকের হাতে নিহত হন এবং এখন এখানে তার ছেলে আবদুর রহমান জিলিকি ক্ষমতাসীন ছিলেন।

৩১৭ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে আবদুর রহমান আন-নাসির এই রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হন এবং দীর্ঘ অবরোধের পর ৩১৮ হিজরিতে এর কেন্দ্র বাতলিউস জয় করেন। [২]

তলাইতলা (মাদ্রিদ) বিজয়:

মধ্য আন্দালুসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর তলাইতলা (স্পেনের বর্তমান রাজধানী মাদ্রিদ) গত ৮০ বছর ধরে স্বায়ত্তশাসিত ছিল। এখানে সেই নওমুসলিম বাসিন্দাদের শাসন ছিল যারা ইসলামি আন্দালুসকে আরবদের অধীনে দেখতে পছন্দ করত না। আরবদের পরিবর্তে তাদের পৈতৃক ধর্ম খ্রিস্টধর্মের পতাকাবাহীদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল সুদৃঢ়।

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির প্রথমে তাদের অবাধ্যতা দমন করা জরুরি মনে করেন এবং উলামা ও ফুকাহাদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তাদের আনুগত্যের পথে আনার চেষ্টা করেন, যাতে এই নওমুসলিমদের সাথে রক্তপাত ছাড়াই বিষয়টি মীমাংসা হয়ে যায়। কিন্তু তলাইতলাবাসীদের অবাধ্যতা বেড়েই চলল।

অবশেষে খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির ৩১৮ হিজরির রবিউস সানি (মে ৯৩০ খ্রি.) মাসে তার সেনাপতি সাঈদ বিন মুনজিরকে একটি বাহিনী দিয়ে তলাইতলার দিকে পাঠান। এই বাহিনী দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে তলাইতলা অবরোধ করে, কিন্তু এত বড় শহরের জন্য...

[১] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব লিত-তিলমিসানি: ১/১৬৬

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি-ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ২/১৯৭ থেকে ২০২

এই বাহিনী অপরিপাক ছিল, পরের মাসে আবদুর রহমান আন-নাসির নিজে অন্য একটি লস্কর নিয়ে তলীত্বলা পৌঁছালেন এবং চারপাশের সমস্ত উপত্যকা, পাহাড় ও মহাসড়কগুলোতে প্রহরী মোতায়েন করে কঠোর অবরোধ করলেন। তলীত্বলায় খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল, তাই বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও শহরবাসীর মনোবল অটুট ছিল। এছাড়া তারা তাদের মিত্র খ্রিস্টান শাসকদের সাহায্যের জন্য ডেকেছিল এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে তলীত্বলার সাহায্যের জন্য কোনো না কোনো খ্রিস্টান রাষ্ট্রের লস্কর অবশ্যই পৌঁছাবে। কিন্তু খ্রিস্টান শাসকরা যখন আবদুর রহমান আন-নাসিরের স্বয়ং লস্করের নেতৃত্ব দেওয়ার খবর পেল, তখন তারা ভীত হয়ে পড়ল, ফলে তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পৌঁছাল না। তা সত্ত্বেও তলীত্বলাবাসী অটল রইল এবং অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে লাগল।

আবদুর রহমান আন-নাসির কোনো অধৈর্য বা তাড়াহুড়ো করার পরিবর্তে এখানেও দূরদর্শিতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি তলীত্বলার বাইরে একটি নিয়মিত সামরিক ছাউনি নির্মাণ করালেন এবং স্থায়ী ভিত্তিতে বাহিনীর খাদ্য ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যতক্ষণ না শহর জয় হবে, তিনি ফিরে যাবেন না।

দুই বছর পর্যন্ত এই অবরোধ অব্যাহত রইল। শহরবাসীরা খাদ্যাভাবের শিকার হতে লাগল, অন্যদিকে উমাইয়া বাহিনী অত্যন্ত নিশ্চিন্তে বাইরে অবস্থান করছিল। এটি দেখে তলীত্বলার বাসিন্দাদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, যদি আরও দুই বছরও অতিবাহিত হয়, তবুও এরা এখান থেকে সরবে না। অবশেষে ৩২০ হিজরিতে তারা বাধ্য হয়ে আনুগত্যের অঙ্গীকার করল এবং শহরের দরজা খুলে দিল। আবদুর রহমান আন-নাসির এই মহান বিজয়ে সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন। [১]

তলীত্বলা আন্দালুসের কেন্দ্রীয় শহর ছিল এবং পুরো দেশের মহাসড়কগুলো এখানে এসে মিলিত হতো, তাই এর বিজয় আবদুর রহমান আন-নাসিরের জন্য অনেক বড় সাফল্য ছিল, যার ফলে আন্দালুসে ইসলামি সালতানাত তার পূর্ববর্তী সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হলো এবং চারপাশের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর ওপর আবারও ইসলামি সরকারের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো।

সরকস্তাহ বিজয়:

উত্তর আন্দালুসে সরকস্তাহ-ও একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। এখানে মুহাম্মদ বিন হাশিমের শাসন ছিল। ৩২৬ হিজরিতে আবদুর রহমান আন-নাসির এখানে লস্কর নিয়ে অভিযান চালান এবং কয়েক মাসের অবরোধের পর মুহাম্মদ বিন হাশিম সন্ধি ও আনুগত্য করতে সম্মত হন। চুক্তি অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন হাশিমকে খিলাফতে উমাইয়ার অধীনে সরকস্তাহ প্রদেশের গভর্নর হিসেবে বহাল রাখা হলো। [২]

আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ মাহদী ও তার উত্তরসূরিদের ফিতনা-ফ্যাসাদ:

এই যুগ পুরো ইসলামি বিশ্বে বিভ্রান্ত ফেরকাগুলোর একচেটিয়া আধিপত্যের ছিল। আহলে সুন্নাতে হকুমত কোথাও কোথাও অবশিষ্ট ছিল এবং তাও ছিল কেবল নামমাত্র। ইরান, ইরাক থেকে শুরু করে রাজধানী বাগদাদ পর্যন্ত ইসনা আশারি শিয়াদের আধিপত্য ছিল। বাহরাইন থেকে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত এবং হিন্দুস্তানে সিন্ধু ও মুলতান পর্যন্ত ইসমাইলি কারামতিদের দখল ছিল। আল-জাজিরা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত শিয়াদের একটি দল বনু হামদান...

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/২০২, ২০৩, ২০৯, ২১০; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮০, ১৮১, দারুল ফিকর।

[২] আল-মুকতাবিস মিন আনবায়ি আহলিল আন্দালুস লি-ইবনে হাইয়ান: ৫/১৫৬।

৪৪৩ — তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — পঞ্চম খণ্ড

দখলদার ছিল। আফ্রিকার প্রায় সমস্ত মুসলিম এলাকা ইসমাইলি দাঈ উবায়দুল্লাহ তার অধীনে নিয়ে নিয়েছিল। সে নিজেকে মাহদী ও ফাতিমী বলে দাবি করত এবং ইসলামের আড়ালে কুফরি আকিদা প্রচার করছিল।

সেই সময় ইসলামি বিশ্বে পূর্বে তুর্কিস্তান এবং পশ্চিমে কেবল আন্দালুস এমন দুটি অঞ্চল ছিল যা রাফেজিদের আধিপত্য থেকে মুক্ত ছিল। তবে উবায়দুল্লাহ তার চিন্তাধারা প্রচারের জন্য আন্দালুসেও তার গোপন দাঈ পাঠিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে একজন দাঈ “ইবনে মাসাররা”-এর বিষাক্ত বই আন্দালুসের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। আব্দুর রহমান আন-নাসির যখন এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে দেশ থেকে বহিস্কার করলেন এবং তার বইগুলো পুড়িয়ে দিলেন।

খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির অনুভব করেছিলেন যে আফ্রিকা থেকে উত্থিত এই বিভ্রান্তিকর তুফানকে যদি পূর্ণ তৎপরতার সাথে এখনই থামানো না যায়, তবে আগামী বছরগুলোতে এটি আন্দালুসকেও গ্রাস করতে পারে। তাই তিনি আন্দালুসের ব্যাপারে উবায়দুল্লাহর সংকল্প চিরতরে নস্যাৎ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে তিনি তাড়াছড়ো না করে বরং উত্তর আফ্রিকার রাজনীতির উত্থান-পতনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

আব্দুর রহমান আন-নাসিরের আফ্রিকা বিজয়:

৩০৫ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ মাহদী আলজেরিয়া থেকে ইদ্রিসি শাসনের অবসান ঘটান, যার ফলে মরক্কোর মুসলমানরাও বিপদের মুখে পড়ে। অবশেষে ৩১৯ হিজরিতে মিকনাসা গোত্রের নেতা মুসা ইবনে আবি আল-আফিয়া আব্দুর রহমান আন-নাসিরের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে অনুরোধ করেন যে, মরক্কোর অধিবাসীদের যেন উবায়দুল্লাহ মাহদীর বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য তার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়।

খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তার আমিরুল বাহর আহমদ ইবনে মুহাম্মদের নেতৃত্বে একশটি জাহাজ এবং সাত হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী মুসা ইবনে আবি আল-আফিয়ার ইমারতকে সহায়তা করার জন্য পাঠান। এটি দেখে অনেক বারবার গোত্রও মুসা ইবনে আবি আল-আফিয়ার সমর্থক হয়ে যায়। আহমদ ইবনে মুহাম্মদ এই সম্মিলিত শক্তির সাথে সাবতা আক্রমণ করে একে উবায়দুল্লাহ মাহদীর প্রতিনিধিদের হাত থেকে মুক্ত করেন এবং সেখানে আমিরুল মুমিনীন আন-নাসিরের নামে খুতবা জারি করেন। [১]

আফ্রিকায় পা রাখার জন্য আব্দুর রহমান আন-নাসিরের বাহিনীর উপকূলীয় শহর তানজাহ প্রয়োজন ছিল, যা নির্বাসিত ইদ্রিসি শাসক আবু আল-আইশ আল-হাসানির শেষ দুর্গ ছিল। শুরুতে আবু আল-আইশ আন্দালুসের বাহিনীকে জায়গা দিতে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু পরে আব্দুর রহমান আন-নাসিরের চাপে তা মেনে নেন এবং ৩৩৩ হিজরিতে নিজেই কর্তোভায় উপস্থিত হন। আবু আল-আইশ উচ্চবংশীয় সাদাতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আব্দুর রহমান আন-নাসির তাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেন এবং তার সম্মানে পুরো কর্তোভাকে সাজানো হয়। [২]

[১] আল-বায়ান আল-মুগরিব ফি আখবার আল-আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/২০৩।

[২] আল-বায়ান আল-মুগরিব: ৩/১২১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮০, তাবা দারুল ফিকর। আবু আল-আইশের দাদা ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান। তিনি সেই আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান যার পুত্র মুহাম্মদ নফস-ই-জাকিয়া ১৪৫ হিজরিতে মনসুর আব্বাসির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

এই সময় নাগাদ আফ্রিকায় ইসমাইলি যিনদিক নেতা উবায়দুল্লাহ মাহদীর মৃত্যু হয়েছিল এবং তার স্বঘোষিত ইমামত তার পুত্র আল-কায়েম গ্রহণ করেছিল। তার জুলুম ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আফ্রিকায় আবু ইয়াজিদ বিন মাখলাদ নামক একজন বয়োবৃদ্ধ আমির বিপ্লবী অভিযান শুরু করেছিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি বনু উবাইদের মোকাবিলা করছিলেন। এরই মধ্যে উত্তর আফ্রিকার এক বারবার গোত্র যানাতার সরদার মুহাম্মদ বিন খাযারও বনু উবাইদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির এই উভয় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন দিতে শুরু করেন। আবু ইয়াজিদ এবং মুহাম্মদ বিন খাযারের দূতগণ একে একে ৩৩৩ হিজরিতে কুরতুবায় আসেন এবং আন-নাসিরের খেলাফতের অধীনে আসার ঘোষণা দেন। [১]

আবু ইয়াজিদ তার অভিযানে সফল হতে পারেননি এবং উবাইদিদের সাথে যুদ্ধে বন্দি হয়ে নিহত হন, কিন্তু মুহাম্মদ বিন খাযারের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। ৩৩৮ হিজরিতে তিনি বনু উবাইদের অধিকৃত শহর ‘তাহেরত’ আক্রমণ করে শিয়াদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। বনু উবাইদের আমিরকে তার বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীসহ হত্যা করা হয় এবং তাদের মস্তক ছিন্ন করে কুরতুবায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই শক্তিশালী বারবার গোত্রগুলোর সহযোগিতায় খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির কোনো অসুবিধা ছাড়াই আলজেরিয়াসহ উত্তর আফ্রিকার এক বিশাল অংশের ক্ষমতা লাভ করে সেখান থেকে বনু উবাইদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খতম করে দেন। বনু উবাইদের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন রাখার জন্য আব্দুর রহমান আন-নাসির ৩৩৩ হিজরিতে আদেশ জারি করেন যে, জুমার খুতবায় যেখানে খলিফার জন্য দোয়া করা হবে, সেখানে খেলাফতের শত্রু বনু উবাইদের জন্য বদদোয়া ও লানতও করা হবে। [২]

উত্তর আফ্রিকার ওপর বনু উবাইদের আধিপত্য এরপরও বজায় ছিল এবং তারা আন্দালুসপন্থী বারবার গোত্রগুলোকে দমনে এই পর্যায় পর্যন্ত সফল ছিল যে, তাদের কোনো বড় ভূখণ্ডে কখনো দখলদার হতে দেয়নি। খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির বনু উবাইদের বিরুদ্ধে কোনো অসাধারণ সাফল্য পাননি, তবে তার রণকৌশল এই পর্যায় পর্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল যে, বনু উবাইদ কখনো আন্দালুস আক্রমণ করতে পারেনি। এর বিপরীতে আন্দালুসের বাহিনী বারবার আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ করে বনু উবাইদকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে।

এই ধারার শেষ অভিযানগুলো আব্দুর রহমান আন-নাসিরের জীবনের শেষ বছরগুলোতে আহমদ বিন ইয়া’লার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। আহমদ বিন ইয়া’লা সত্তরটি (৭০) যুদ্ধজাহাজের বহর নিয়ে ৩৪৫ হিজরিতে (৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে) আফ্রিকায় পৌঁছান এবং ফিতনাবাজ উবাইদিদের দমন করে অগণিত গনিমতের মালসহ আন্দালুসে ফিরে আসেন। দুই বছর পর ৩৪৭ হিজরিতে আবারও একই জেনারেলের নেতৃত্বে একটি অভিযান পাঠানো হয় যা সফল ও বিজয়ী হয়ে ফিরে আসে। [৩]

খন্দকের ভয়াবহ যুদ্ধ:

উবাইদিদের সাথে সংঘাতের সময় উত্তর দিকের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে প্রতি বছর জিহাদি অভিযান পাঠানোর ধারা অব্যাহত ছিল। অনেক...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইয়ারি আল-মাররাকুশি: ৩/২১২

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইয়ারি আল-মাররাকুশি: ৩/২১২, ২১৮, ২২০

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইয়ারি আল-মাররাকুশি: ২/২৪১, ২৪৩

অভিযানের নেতৃত্ব খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির নিজেই দিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই সাফল্য তাঁর পদচুম্বন করেছিল। তবে বিজয়ের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে ৩২৭ হিজরিতে (৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) আবদুর রহমান আন-নাসির এমন এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন যাকে আমরা তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা বলতে পারি।

৩২৭ হিজরিতে আবদুর রহমান আন-নাসির সারগোসার মুসলিম আমির উমাইয়া বিন ইসহাকের ভাই আহমদকে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের চেষ্টার অপরাধে হত্যা করান। এতে উমাইয়া বিন ইসহাক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, খ্রিস্টান শাসকরা সুযোগ বুঝে তাকে আরও উসকে দেয় এবং সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে।

ফলে উমাইয়া বিন ইসহাক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং সারগোসার সেনাবাহিনী ও ফারগানা সহ গ্যালিসিয়ার রাজধানী সামোরার দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার শাসক রাডমির তাকে স্বাগত জানান। নাভার, লিওন এবং কাস্টিলের খ্রিস্টান বাহিনীও সেখানে পৌঁছে যায় এবং সবাই মিলে ইসলামি অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করে।

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির যখন উমাইয়া বিন ইসহাক এবং খ্রিস্টান বাহিনীর সমাবেশের খবর পেলেন, তখন তিনি শত্রুদের দমনের জন্য পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি সৈন্য নিয়ে গ্যালিসিয়ার রাজধানী সামোরার দিকে রওনা হন। সামোরার দুর্গটি ছিল অত্যন্ত বিশাল এবং মজবুত। সাতটি উঁচু ও শক্তিশালী প্রাচীর লোহার বলয়ের মতো এটিকে ঘিরে রেখেছিল এবং প্রতি দুটি প্রাচীরের মাঝখানে একটি গভীর ও প্রশস্ত পরিখা ছিল।

শুরুতে গ্যালিসিয়ার ময়দানে কয়েকটি ছোট যুদ্ধে আবদুর রহমান আন-নাসির সফল হন এবং প্রতিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনী সামোরার দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ে আবদুর রহমান আন-নাসিরের কিছু অনভিজ্ঞ সেনাপতি তাদের ত্রুটিপূর্ণ বিচারবুদ্ধির ওপর ভরসা করে খলিফাকে না জানিয়েই দুর্গে আক্রমণের এমন এক কৌশল নির্ধারণ করেন যা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

৩ শাওয়াল ৩২৭ হিজরি (৫ আগস্ট ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) আবদুর রহমান আন-নাসিরের বাহিনী সামোরার দুর্গে আক্রমণ করে এবং দুটি প্রাচীর অতিক্রম করে অবশিষ্ট ও খ্রিস্টান বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এর পরপরই কয়েকজন আরব সেনাপতি তাদের পূর্বনির্ধারিত ও দুর্বল কৌশল অনুযায়ী হঠাৎ পিছু হটতে শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে শত্রুর সমস্ত বাহিনী আমাদের পিছু ধাওয়া করে খোলা ময়দানে বেরিয়ে আসবে এবং সেখানে তাদের সাথে মুখোমুখি লড়াই হবে, কিন্তু তাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তৃতীয় প্রাচীরের কাছে পৌঁছানোর পর তারা অগ্রযাত্রা ত্যাগ করে লোকদেখানো পিছু হটার কৌশল অবলম্বন করতেই খ্রিস্টানরা সুযোগ বুঝে তাদের ওপর সর্বাঙ্গিক আক্রমণ চালিয়ে দেয়। ততক্ষণে ইসলামি লশকর বা বাহিনীর সমস্ত সৈন্য দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। শত্রুদের আকস্মিক ও প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, তারা উভয় দিক থেকে কঠিন প্রাচীর এবং পরিখার মাঝে আটকা পড়ে যান। হাজার হাজার সৈন্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিখার মধ্যে পড়ে যায়।

আবদুর রহমান আন-নাসির নিজেও সেই সময় প্রাচীর অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনিও শত্রুর ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যান। তাঁর কয়েকজন প্রাণোৎসর্গকারী সৈন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে শত্রুদের তলোয়ার ও বর্শা থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁকে দুর্গের বাইরে নিয়ে আসতে...

সফল হলেন। এই যুদ্ধে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মুসলমান শহীদ হন। আব্দুর রহমান আন-নাসির যখন কর্ডোভায় ফিরে আসেন, তখন তাঁর সাথে মাত্র পঁয়তাল্লিশ জন লোক ছিল।

এই মুহূর্তে তাঁর জায়গায় অন্য কোনো শাসক থাকলে খ্রিস্টানরা এত বড় বিজয়ের পর কর্ডোভায় পৌঁছাতে দেরি করত না, কিন্তু খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের আল্লাহ-প্রদত্ত প্রভাব ও প্রতাপ এমন ছিল যে খ্রিস্টানরা পিছু ধাওয়ার চেষ্টা করেনি এবং আব্দুর রহমান আন-নাসির নিরাপদে কর্ডোভায় পৌঁছে যান। [১]

পাল্টা ব্যবস্থা এবং ধারাবাহিক বিজয়:

এই পরাজয়ের প্রভাব খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের ওপর এতটাই পড়েছিল যে তাঁর সুখ-শান্তি ও আরাম বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি পরাজয়ের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের কঠোর শাস্তি দেন এবং শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করেন।

দীর্ঘ দুই বছরের প্রস্তুতির পর, যখন কাস্টিলের শাসক ফার্ডিনান্ড এবং গ্যালিসিয়ার প্রধান রামিরোর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন ইসলামী বাহিনী আহমদ বিন ইয়ালার নেতৃত্বে খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর ওপর আক্রমণ করে। রামিরো কাস্টিলের সাথে যুদ্ধের কারণে আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি প্রকাশ্য পরাজয় বরণ করেন।

রজব ৩৩৯ হিজরি (জানুয়ারি ৯৫১ খ্রিস্টাব্দ) রামিরোর মৃত্যুর পর খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। ইসলামী বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে এবং একে একে সমস্ত খ্রিস্টান শাসক ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয় এবং তারা সর্বদা অনুগত থাকার ও কর (خراج) প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। [২]

কর্ডোভার দরবারে ইউরোপীয় শাসকদের প্রতিনিধি দল:

এই বিজয়ের পর আন্দালুসে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিদ্রোহীদের কোমর ভেঙে গিয়েছিল। তাই ৩৩৭ হিজরির পর খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির বাকি জীবন কর্ডোভাতেই অবস্থান করেন। তিনি রক্ত ও ঘাম দিয়ে ক্ষেত সেচন করেছিলেন। এখন তাঁর জন্য ফসল কাটার সময় ছিল, তাই তাঁর বাকি দিনগুলো শান্তি ও স্বস্তিতে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে আফ্রিকা এবং উত্তর আন্দালুসের দিকে জিহাদি ও সামরিক অভিযান অবশ্যই পাঠানো হয়েছিল, তবে সেগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন রাজপুত্র বা সেনাপতিরা।

খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের বিজয় তাঁর খ্যাতি বিশ্বের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্ব শাসন পদ্ধতি এবং বিশ্বজয়ের শক্তিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কেবল ইসলামী বিশ্বেই তাঁর নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে নেওয়া হতো না, বরং অমুসলিম দেশগুলোর শাসকরাও তাঁর মহত্বের সামনে মাথা নত করেছিল এবং কর্ডোভার দরবারে তাদের প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছিল।

কনস্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) রাজা কায়সার কনস্টানটাইন বিন লিওন, যাকে খ্রিস্টান বিশ্বের কেন্দ্রীয় প্রধানের মর্যাদা দেওয়া হতো, তিনি তাঁর শৌর্য-বীর্য ও প্রতাপে কম্পমান ছিলেন এবং চাইতেন যে তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি...

[১] মুরুজুয যাহাব লিল মাসউদী: ১/৪৮, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩২৭ হিজরি, নাফহত তীব: ১/১৬৫, দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪১৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪১৯ থেকে ৪২১

৩৩৬ হিজরিতে (৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) সে মূল্যবান উপহারসামগ্রীসহ তার একটি প্রতিনিধি দল কর্ডোভায় পাঠায় যাতে আবদুর রহমান আন-নাসিরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সূচনা করা যায়।

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কায়সারের দরবারের সেরা দুর্লভ বস্তু ও উপহার সাথে এনেছিল, কিন্তু আবদুর রহমান আন-নাসিরের বিশাল প্রাসাদের ওপর নজর পড়তেই তারা কাঁপতে শুরু করল। রাজপ্রাসাদের আকাশচুম্বী মিনার এবং এর সুউচ্চ প্রাচীরগুলো তাদের বিমোহিত করে দিল। বিশেষ কক্ষের জাদুকরী সৌন্দর্য দেখে তারা হতবাক হয়ে গেল। স্তম্ভ ও মেহরাবগুলোতে খচিত মুক্তার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা দেখে তাদের মনে হতে লাগল যেন তাদের আনা উপহারগুলো নুড়ি পাথর ও মাটির চেয়ে বেশি কোনো মর্যাদা রাখে না। যখন প্রতিনিধি দলের সদস্যদের খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের সামনে তাদের রাজার চিঠি পড়ে শোনানোর জন্য বলা হলো, তখন খলিফার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দরবারের মোহাবিষ্টকারী সৌন্দর্য তাদের বাকরুদ্ধ করে দিল এবং তারা অত্যন্ত কষ্টে তাদের রাজার বার্তা শোনাতে পারল।

কর্ডোভার দরবারে একজন আলেম শেখ আবু আলী কালি বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সামনে ফিরতি বক্তব্য প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিলেন এবং তখন সবার প্রত্যাশা ছিল যে, তিনি কনস্টান্টিনোপলের রাষ্ট্রদূতের সামনে ইসলাম এবং আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব তার বিশেষ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করবেন। কিন্তু দরবারের প্রতাপ ও গাভীর্যে শেখ আবু আলী কালির ওপর এমন ভীতি ভর করল যে তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তখন কাজী মুনজির বিন সাঈদ, যাকে একজন সাধারণ ফকিহ মনে করা হতো, পরিস্থিতির নাজুকতা দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন এবং এমন এক সাবলীল, প্রভাবশালী ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণ দিলেন যে সবার মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুবহানাল্লাহ! এবং মাশাআল্লাহ! প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারিত হতে লাগল। খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির কয়েকদিন পর্যন্ত কায়সারের রাষ্ট্রদূতদের চমৎকার আতিথেয়তা করার পর নিজের ফিরতি চিঠিসহ তাদের বিদায় জানালেন এবং কাজী মুনজির বিন সাঈদকে কর্ডোভার দরবারের সেরা প্রতিনিধিত্বের জন্য নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিলেন। [১]

দুই বছর পর ৩৩৮ হিজরিতে কায়সারের দূতাবাস আবারও এল। এবারও তেমনই চমৎকার সংবর্ধনা হলো এবং কায়সারের রাষ্ট্রদূতরা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে ফিরে গেল। [২]

৩৪২ হিজরিতে জার্মানির রাজা অটো তার বিশপ ইউহান্নাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠালেন যাতে আন্দালুসের সামরিক অভিযান থেকে সুরক্ষা লাভ করা যায়, কিন্তু যেহেতু জার্মানির রাজার নিজের আচরণ ভালো ছিল না, তাই আন-নাসিরও প্রতিনিধি দলটিকে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেননি।

[১] কাজী মুনজির বিন সাঈদ ২৭৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার সময় তার বয়স ছিল আটান্ন বছর। আন-নাসির এই ঘটনার পর তাকে কাজীউল কুজাত নিযুক্ত করেন এবং আন-নাসিরের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর ৩৫৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। এভাবে তিনি একুশ বছর কাজী ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান, ইখলাস, সত্যবাদিতা, বাগ্মিতা এবং প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি তার সময়ের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আন-নাসিরের সফলতার পেছনে এ ধরনের ব্যক্তিদের সাহচর্য, পরামর্শ ও দোয়ার অনেক বড় অবদান ছিল। (আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২৫০, সিয়াকু আলামিন নুবালা: ১৬/৪৩-৪৭, তাবাতাত্তুর রিসালাহ)

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২১৪, ২১৫; নাফহত তিব: ১/৩৭২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪৫৪-৪৫৫; জায়ওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস লিল মায়ুরকি মুহাম্মদ বিন ফুতুহ: ১/১২২, তাবাতাত্তুদ দারিল মিসরিয়্যাহ।

বুলগেরিয়ার শাসক পিটার একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে আন্দালুসের শাসকের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করেন।

৩৩৭ হিজরিতে রোমের পোপ নবম জন তার দূতদের পাঠান যারা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি, শান্তি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাব নিয়ে আসে। আন-নাসির এটিও গ্রহণ করেন।

উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টান শাসকরা এখন ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যে বিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আব্দুর রহমান আন-নাসিরের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই এখন তাদের প্রত্যেকেই নিজের রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য ইসলামি সরকারের সম্ভৃষ্টি কামনা করত। ফ্রান্স, যারা আন্দালুসের মুসলমানদের সবচেয়ে কঠোর বিরোধী ছিল, এখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ লুইসের দূতরা উপস্থিত হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রস্তাব দেন। আন-নাসির ইতিবাচক উত্তর দিয়ে প্রতিনিধি দলকে ফেরত পাঠান।

৩৪৪ হিজরিতে উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টান রাষ্ট্র লিওনের শাসকও সন্ধির জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। ৩৪৫ হিজরিতে কাস্তিলিয়ার নবাব ফার্ডিনান্ড আব্দুর রহমান আন-নাসিরের দরবারে আবেদন পাঠান যেন তাকে কাস্তিলিয়ার স্থায়ী শাসক নিযুক্ত করা হয়। এই আবেদন মঞ্জুর হওয়ার ফলে ফার্ডিনান্ডের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। [১]

খ্রিস্টান শাসকরা ফরিয়াদি হয়ে এল:

ফার্ডিনান্ডের প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাষ্ট্রটি চতুর্থ অর্ডুনো দ্বারা শাসিত ছিল, যে তার দুশ্চরিত্র ও কদর্যতার কারণে ‘অর্ডুনো খবিস’ নামে পরিচিত ছিল। সে ফার্ডিনান্ডকে সাথে নিয়ে লিওন রাষ্ট্রের শাসক সানজোর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে লিওন রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করে। সানজো প্রাণ বাঁচাতে তার নানি রানী তোতার কাছে চলে যান। সে সময় সানজো বিভিন্ন মারাত্মক রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং তার শরীর এত বেশি ফুলে গিয়েছিল যে তার পক্ষে চলাফেরা করা কঠিন ছিল।

রানী তোতার অনুরোধে খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির প্রথমে কর্ডোভার একজন দক্ষ চিকিৎসক পাঠিয়ে সানজোর স্থূলতা ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করান এবং তার সুস্থ হওয়ার পর তাকে কর্ডোভায় তলব করেন। সানজো ফরিয়াদি হিসেবে তার নানি রানী তোতা এবং তার মামা (যিনি নাভার রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন) এর সাথে উত্তর আন্দালুস থেকে যাত্রা করে কর্ডোভায় পৌঁছান।

যখন এই তিন খ্রিস্টান শাসক (দুই রাজা ও এক রানী) কর্ডোভায় প্রবেশ করছিলেন, তখন শহরের রাস্তায় তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য জনগণের বিশাল ভিড় উপস্থিত ছিল। মুসলমানদের জন্য এই দৃশ্যটি ছিল অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, সেই বিদ্রোহী খ্রিস্টানরা যারা দেড় শতাব্দী ধরে আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য গলার কাঁটা হয়ে ছিল, তারা এখন ফরিয়াদি হয়ে তাদের দরবারে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়েছে। খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের দরবারে পৌঁছে তিন ফরিয়াদি সানজোর ওপর অন্যান্য খ্রিস্টান শাসকদের অন্যায়ের প্রতিকার এবং তাকে লিওনের সিংহাসনে পুনর্বহাল করার আবেদন জানান। আব্দুর রহমান আন-নাসির এই আবেদন গ্রহণ করেন এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিদায় দেন। এরপর রাজকীয় বাহিনী এক আঘাতেই অর্ডুনো খবিসের কাছ থেকে লিওন রাষ্ট্র ছিনিয়ে নিয়ে সানজোর হাতে তুলে দেয়।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৮২, ১৮৩; আত-তারিখুল ইসলামি লি-শালবি: ৩/ ১১০; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৪৫৭ থেকে ৪৫৯।

এই পরিস্থিতি দেখে বাকি ছোট ছোট খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর শাসকরাও ভয়ে কাঁপতে শুরু করল এবং সবাই খলিফা আন-নাসিরের সম্ভ্রষ্ট কামনা করল। তারা বার্তা পাঠাল যে, আমরা সবাই ইসলামি দরবারের অনুগত গোলাম এবং আমাদের এক ইঞ্চি পরিমাণ শাসনকেও কর্ডোভা দরবারের দান মনে করি এবং রাজকীয় আদেশ পালন করাকে নিজেদের কর্তব্য ও সৌভাগ্য মনে করি। অতএব, আমাদের রাষ্ট্রগুলোর শাসনের নবায়নের অনুমতিপত্র প্রদান করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করা হোক।

আবদুর রহমান আন-নাসির তাদের সবার কাছে শাসনের অনুমতিপত্র পাঠিয়ে তাদের ওপর নিজের রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখলেন। [১]

সম্মানিত পাঠকগণ! কী এক সময় ছিল যখন অমুসলিম শাসকরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানদের কাছে ফরিয়াদ করত। আজ আমরা অন্যদের দ্বারে নত হয়ে তাদের কাছে শান্তি ও ন্যায়ের আকুতি জানাই, কিন্তু আমাদের সব জায়গা থেকে ধিক্কার দেওয়া হয়। যদি আল্লাহর ওপর আমাদের ঈমান মজবুত হয়, আমল ও আখলাক সংশোধন হয় এবং আমরা প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে পারি, তবে আবারও পাশা উল্টে যেতে পারে।

+++

আন্দালুসের জ্ঞানতাত্ত্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের শাসনকাল মুসলিম আন্দালুসের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ছিল। এই যুগে আন্দালুস শান্তি ও শৃঙ্খলার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল, সমস্ত বিদ্রোহী মাথা নত করেছিল এবং সমস্ত বিরোধী অনুগত হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেছেন: “আবদুর রহমান আন-নাসির প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন এবং বনু উমাইয়ার ক্ষমতা তাঁর শাসনকালে পুনরায় সুসংহত হয়।” [২]

মসজিদ, মাদ্রাসা ও গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ নামাজের পাবন্দ ছিল। চারদিকে জ্ঞানতাত্ত্বিক আগ্রহ ছড়িয়ে পড়েছিল। কর্ডোভায় এই যুগটি ছিল ‘আল-ইকদুল ফারিদ’-এর লেখক আল্লামা ইবনে আবদে রাবিরিহি (মৃত্যু ৩২৮ হিজরি), মুহাদ্দিস আহমদ বিন কাসিম বিন মাখলাদ (৩২৩ হিজরি) এবং কাজী আসলাম বিন আবদুল আজিজের মতো আলেমদের। মানুষ ইসলামি জ্ঞান অর্জন, বই পড়া এবং জিহাদে অংশগ্রহণের মতো মহৎ উদ্দেশ্যগুলোতে আগ্রহী ছিল। তারা মদ্যপান এবং খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ থেকে বিরত থাকত। [৩] ঐতিহাসিকদের মতে, এই যুগে আন্দালুসের ঘনবসতির সামনে ইউরোপীয় দেশগুলোকে মরুভূমি ও প্রান্তর মনে হতো। আন্দালুসের প্রতিটি শহর আকর্ষণীয় ও সুউচ্চ অটালিকা দিয়ে সজ্জিত ছিল এবং প্রতিটি গ্রাম সবুজের চাদরে ঢাকা ছিল। দেশে কোনো এক টুকরো জমিও অনাবাদী দেখা যেত না, প্রতিটি ইঞ্চি জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা হয়েছিল। কৃষিকাজের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করে সেগুলো চালু করা হয়েছিল।

আন্দালুসের মুসলিম কৃষি বিশেষজ্ঞরা এই শিল্পের চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের দক্ষতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাঁরা সারা বছর...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮৩, ১৮৪, ত. দারুল ফিকর; নাফহত তিব: ১/৪৬৫, ৪৬৬; Moors in Spain, by stanly lane poole, p: 160, 161

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৭৬, ত. দারুল ফিকর

[৩] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাকারি আত-তিলমিসানি: ১/৩৬২

তারা জমিকে একদিনের জন্যও খালি থাকতে দিতেন না। একটি ফসল কাটার সাথে সাথেই ঋতু অনুযায়ী পরবর্তী ফসলের বীজ বপন শুরু হয়ে যেত। খেজুর, জাফরান, ডুমুর, জলপাই, পেস্তা, তুঁত, ডালিম, কলা, পিচ, তুলা এবং চাল ছিল এখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য। কৃষকরা আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে বছরে তিনটি করে ফসল কাটত। আব্দুর রহমান আন-নাসিরের কোষাগারে বার্ষিক দুই কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আশি হাজার দিনার আয় হতো। [১]

খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের শাসনামলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই দেখা যায় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন চিন্তাধারা ও শ্রেণির মধ্যে মতভেদ উসকে দেওয়া সমাজবিরোধী চক্রের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। পুরো দেশে মুসলমানদের সকল গোষ্ঠী মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোচনা কেবল জ্ঞানতাত্ত্বিক মজলিস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সরকার প্রতিটি গোষ্ঠী ও প্রতিটি দলকে সমান নজরে দেখত। আদালতের রায়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতো। সকল শ্রেণিকে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাই জনগণ সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট এবং নিজেরা ঐক্যবদ্ধ ছিল। জিম্মিদের (অমুসলিম নাগরিক) সাথেও শরীয়ত অনুযায়ী ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা হতো, তাই তারাও সরকারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল এবং আব্দুর রহমান আন-নাসিরের যুগে তারা বিদ্রোহ ত্যাগ করে আনুগত্য ও বাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছিল।

কাব্য ও সাহিত্যের চরম শিখর:

এই যুগে আন্দালুস জ্ঞান ও সাহিত্যের উচ্চতার চরম শিখর স্পর্শ করছিল। আরবি ভাষা সর্বত্র মাতৃভাষার মতো বলা হতো। আরবির বড় বড় নামকরা বাগ্মী, সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও গদ্যকাররা এই যুগে নিজ নিজ বাগ্মিতার জাদু ছড়াচ্ছিলেন। বিশিষ্টজন তো বটেই, সাধারণ মানুষও কাব্য ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম রস আনন্দনে পারদর্শী ছিল। ধনীদের বাড়িতে পোষা পাখিদেরও আরবির চমৎকার সব কবিতা মুখস্থ করানো হতো এবং তাদের সময় ও সুযোগ অনুযায়ী এই কবিতাগুলো পড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো।

ঐতিহাসিকগণ এই যুগের একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির তার ফাসদ করানোর (শরীর থেকে অতিরিক্ত ও দূষিত রক্ত বের করা) জন্য রাজকীয় শল্যবিদকে তলব করলেন। শল্যবিদ অস্ত্র হাতে নিয়ে ফাসদ করতে উদ্যত হলেন, এমন সময় হঠাৎ জানালার পথ দিয়ে একটি ময়না পাখি উড়ে এল এবং সোনার ফুলদানির ওপর বসে এই কবিতাগুলো পড়তে লাগল:

আইয়্যুহাল ফাসিদু রিফকান... বি-আমিরিল মু'মিনিনা

“হে শল্যবিদ! আমিরুল মুমিনিনকে অস্ত্রোপচার করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা ও কোমলতা অবলম্বন করো।”

ইন্নামা তাফসিদু ইরকান... ফিহি মুখখুল আলামিনা

“কেননা তুমি এমন এক মানুষের রগে অস্ত্র চালাচ্ছ যার ওপর পুরো বিশ্বের জীবনের ভিত্তি নির্ভরশীল।”

আব্দুর রহমান আন-নাসির ময়না পাখির মুখে এই কবিতা শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন: “এই ময়নাটি কার?”

[১] নাফহত তিব: ১/১৭৭, ২০৫; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/২৩৭; নুযহাতুল মুশতাক লিল ইদরিসি: পৃষ্ঠা ২৭২।

কারো কথা বলার আগেই বেটা নিজেই উত্তর দিল:

“আমি আপনার উত্তরাধিকারী শাহজাদা আল-হাকামের মা মারজানার বেটা।”

আবদুর রহমান আন-নাসির এটি শুনে খুব খুশি হলেন এবং মারজানাকে বিশ হাজার দিনার পুরস্কার দিলেন। [১]

আন্দালুসের উন্নতি ও সমৃদ্ধি:

আন্দালুসে এটি ছিল মুসলমানদের চরম উন্নতির যুগ। ঐতিহাসিকদের মতে, আন-নাসিরের যুগে কৃষি রাজস্ব ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার দিনার পর্যন্ত পৌঁছেছিল। [২] যেখানে বাণিজ্যিক রাজস্ব ছিল ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার দিনার। [৩] আন-নাসিরের মৃত্যুর সময় কোষাগারে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল পাঁচ বিলিয়ন দিনার। [৪] সরকারি বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ সেনাবাহিনীর জন্য, এক-তৃতীয়াংশ নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ এবং জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো। এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত রাখা হতো। [৫] এই যুগে ইউরোপের সমস্ত রাজাদের মোট আয়ও আন্দালুসের ইসলামি সরকারের আয়ের সমান ছিল না।

মরহুম আমির শাকিব আরসালানের মতে, আন-নাসিরের যুগে এখানকার মুসলিম জনসংখ্যা দেড় কোটির কম ছিল না। এখানে চল্লিশটি শহর ছিল শুধুমাত্র আরবদের এবং সেই সময়ে কেবল কর্ডোভার জনসংখ্যা ছিল বিশ লক্ষ। [৬] সালতানাতের নৌবহর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এটি দুইশ যুদ্ধজাহাজ নিয়ে গঠিত ছিল, যা উত্তর আফ্রিকা দখলকারী বনু উবাইদকে ক্রমাগত পিছু হটতে বাধ্য করছিল। [৭]

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের রাজধানী কর্ডোভাকে সেই যুগের পৃথিবীর স্বর্গ বলা যেতে পারে। এই শহরটি ছয় মাইল প্রশস্ত ছিল যার দালানকোঠা, প্রাসাদ, বাজার, মসজিদ এবং বাগানগুলো ওয়াদিউল কাবির নদীর তীরে তীরে চব্বিশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [৮] শহরের ভেতরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত রাস্তা ছিল, যার দুই পাশে সুন্দর ও মজবুত দালানকোঠার সারি দেখা যেত। যত বৃষ্টিই হোক না কেন, এখানে কাদার নামনিশানা পর্যন্ত থাকতো না। [৯] শহর থেকে মদিনাতুজ জাহরা পর্যন্ত দশ মাইল দীর্ঘ রাস্তায় নিরবচ্ছিন্ন জনবসতি ছিল। রাতের বেলাতেও প্রদীপের আলোর কারণে এতে যাতায়াতে কোনো অসুবিধা হতো না। [১০]

[১] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৩৬১

[২] প্রায় ১ বিলিয়ন ৯০ কোটি ডলার

[৩] প্রায় ২৬ কোটি ১৮ লক্ষ ডলার

[৪] প্রায় ১৭৩ বিলিয়ন ৫০ কোটি ডলার

[৫] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪৩৭

[৬] আল-হুলালুস সুন্দুসিয়াহ ফিল আখবার ওয়াল আসারিল আন্দালুসিয়াহ, আমির শাকিব আরসালান: ১/৪১

[৭] এটি আমির শাকিব আরসালানের উক্তি, ঐতিহাসিক সেডিও সংখ্যাটি দশ লক্ষ বলেছেন এবং কিছু আরব ঐতিহাসিক পাঁচ লক্ষ বলেছেন। সম্ভবত সময়ের ব্যবধানে জনসংখ্যা কম-বেশি হতে থাকতো। যাই হোক, আন্দালুস থেকে মুসলমানদের পতনের পর এই দেশের মোট জনসংখ্যা মুসলিম স্বর্ণযুগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল। ১৮৭৯ সালে স্পেনের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬০ লক্ষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত তা দুই কোটি দশ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিল। (আল-হুলালুস সুন্দুসিয়াহ, পৃ. ৪২, ৪৩)

[৮] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪৩৬

[৯] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৩৫৮

[১০] নাফহত তিব: ১/৩৬২

[১১] নাফহত তিব: ১/৩৫৬

শহরে সাধারণ নাগরিকদের ঘরের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ তেরো হাজার। [১] আমীর, উজির, অফিসার এবং সরকারি কর্মচারীদের ঘরগুলো ছিল এর বাইরে। রাজপ্রাসাদ ছিল শহরের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ও সুউচ্চ ভবন, যার দরজা ও দেয়ালগুলো সুন্দর কারুকার্য ও মীনাকারি দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই নকশায় পিতল, তামা ও সীসা ছাড়াও সোনা ও রূপার ব্যবহারও করা হয়েছিল। প্রাসাদের বাগানগুলোতে স্থানে স্থানে মার্বেল পাথরের পুকুর, হাউজ এবং স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা ছিল। [২] শহরের জলবায়ু ছিল অত্যন্ত চমৎকার। খাল, ঝর্ণা, দুর্গ এবং দিগন্ত বিস্তৃত বাগান ও ফসলি জমি একে ঘিরে রেখেছিল। [৩]

কুরতুবাহর (কর্ডোবা) মানুষ সঠিক আকিদা, উচ্চ মনোবল এবং উত্তম চরিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা হালাল উপার্জন, ভালো পোশাক এবং উন্নত সওয়ারিতে অভ্যস্ত ছিল। পানাহারের ক্ষেত্রেও তাদের অত্যন্ত মার্জিত রুচি ছিল। [৪] তারা দ্বীনদারি এবং নামাজের পাবন্দিতে মগ্ন থাকত। [৫] উচ্চ বংশমর্যাদার পর ইলমি (জ্ঞানগত) বা সামরিক কৃতিত্বই ছিল সম্মানের কারণ এবং এগুলোর কারণেই মজলিসগুলোতে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া যেত। ইলমি রুচি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। মানুষ বই সংগ্রহ করার শৌখিন ছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সম্মানিত প্রধান হিসেবে গণ্য করা হতো না, যতক্ষণ না তার ব্যক্তিগত পাঠাগার থাকত। কুরতুবাহর মতো পাঠাগার পুরো দেশে আর কোথাও ছিল না। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আমীরগণ তাদের হাবেলি ও কুঠিগুলোতে পাঠাগার স্থাপন করতেন এবং এমন সব দুর্লভ ও দুপ্রাপ্য বই সংগ্রহ করার চেষ্টা করতেন যা অন্য কারো কাছে নেই। কারো কাছে কোনো দুর্লভ বই থাকলে সে তাতে গর্ববোধ করত এবং মানুষ তাকে ঈর্ষার চোখে দেখত। [৬]

কুরতুবাহ পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি অংশ নিজেই একটি শহর ছিল, যাতে মসজিদ, মাদ্রাসা, বাজার, সরাইখানা, হাম্মামখানা এবং শিল্প এলাকা ছিল। প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা প্রাচীরও ছিল। [৭] এরপর পুরো শহরের চারপাশে আরও একটি বড় প্রাচীর ছিল, যার সাতটি দরজা থেকে সাতটি ভিন্ন দিকে মহাসড়ক বের হতো। [৮] শহরের সাথে সংলগ্ন একুশটি (২১) জনপদ ছিল। [৯] প্রতিটি জনপদে মসজিদ, বাজার এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিল। শহরতলিতে তিন হাজার গ্রাম ছিল। প্রতিটি গ্রামে একজন দক্ষ আলেম নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইলমের ক্ষেত্রে দক্ষতার মানদণ্ড ছিল এই যে, মুয়াত্তা ইমাম মালিক মুখস্থ থাকতে হবে। এক বর্ণনা অনুযায়ী, দক্ষ আলেম তাকেই বলা হতো যিনি দশ হাজার হাদিস এবং ফিকহে মালিকির কিতাব “আল-মুদাওয়ানা”র হাফেজ হতেন। [১০]

কুরতুবাহর এই শান-শওকতের বর্ণনা দিতে গিয়ে সেডিলট (ইউরোপীয় ঐতিহাসিক) লেখেন:

“মুসলিম স্পেন ছয়টি প্রদেশ, আশিটি বড় এবং তিনশটি ছোট শহর, অসংখ্য জনপদ এবং হাজার হাজার গ্রাম...” [১১]

[১] আল-বায়ান আল-মাগরিব: ২৩২/২

[২] নাফহত তিব: ৩৬০/১

[৩] নাফহত তিব: ৪৬৩, ৪৬২/১

[৪] নাফহত তিব: ৪৬৫/১

[৫] নাফহত তিব: ৪৬৪/১

[৬] নুযহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাকিল আফাক: ৫৭৫/২

[৭] নুযহাতুল মুশতাক: ৫৭৫/২

[৮] নাফহত তিব: ৪৫৮/১

[৯] এই জনপদগুলো ছিল কুরতুবাহ, ইশবিলিয়া, গার্নাতা, তুলাইতুলা, বালানসিয়া এবং সারকুস্তা প্রদেশ। জনবহুল বড় শহরগুলোর মধ্যে মালকা, আলমেরিয়া, জিয়ান, শাতিবা, দানিয়া, মাইয়ুরকা, তারতুশা, মারদা, বাতালইউস, শানতারিন, বাসেলোনা এবং ওয়াশকা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছোট শহরগুলোর মধ্যে আল-জাজিরাতুল খাদরা, আল-কান্তারা, ওয়াদিউল হিজারা, সালিম, বারলাঙ্গা, বায়ারা, তালিওয়ারা, লোরকা, রান্দা, আত-তারিক, ওয়াদি আশ, কাদিস ইত্যাদিকে গণ্য করা যেতে পারে।

সমন্বিত ছিল। উন্নতির অবস্থা এমন ছিল যে, শুধু কর্ডোভাতেই দুই লক্ষ ঘরবাড়ি [১], ছয়শত মসজিদ, পঞ্চাশটি হাসপাতাল, সমসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং নয়শত হাম্মাম (গোসলখানা) ছিল। শহরের জনসংখ্যা ছিল কয়েক মিলিয়ন। শহরের একটি লাইব্রেরিতে ছয় লক্ষ বই ছিল। [২]

এই কারণে দশম শতাব্দীর বিখ্যাত ল্যাটিন কবি ‘হিরোসভিথা’ তাঁর একটি কবিতায় কর্ডোভাকে ‘দুনিয়ার অলঙ্কার’ বলে অভিহিত করেছিলেন। [৩]

সালিম ও আস-সুওয়াইরা নির্মাণ:

আব্দুর রহমান আন-নাসির আন্দালুসে বহু শহর আবাদ করার গৌরব অর্জন করেছেন। ৩৩৫ হিজরিতে তিনি টলেডো থেকে ১৩৫ কিলোমিটার উত্তরে ‘মদিনা সালিম’ নির্মাণ করেন যাতে সীমান্ত প্রতিরক্ষা শক্তিশালী হয়। [৪] ৩৭৩ হিজরিতে তিনি দেশের দক্ষিণ-পূর্বে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ‘আস-সুওয়াইরা’ নির্মাণ করেন যা নৌবাহিনীর ছাউনি এবং একটি বিশাল বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে প্রমাণিত হয়। [৫]

মদিনাতুজ জাহরা:

খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের স্থাপত্য বিষয়ক আগ্রহের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রবিন্দু ছিল ‘মদিনাতুজ জাহরা’। মদিনাতুজ জাহরা কর্ডোভা থেকে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি ছোট কিন্তু জান্নাত সদৃশ শহর ছিল। এর সূচনা হয়েছিল একটি চমৎকার প্রাসাদের মাধ্যমে, পরবর্তীতে এর চারপাশে সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণের ফলে এটি একটি শহরের রূপ লাভ করে।

‘জাহরা’ নির্মাণের কারণ সম্পর্কে আল্লামা মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি ‘আল-মুসামারাত’ গ্রন্থে কর্ডোভার এক বৃদ্ধের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের এক প্রিয় দাসী ইন্তেকাল করেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পদ রেখে যান। এখন আব্দুর রহমান তাঁর মনিব হওয়ার সুবাদে সেই সম্পদের হকদার ছিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, এই সম্পদের বিনিময়ে মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করা হোক। সরকারি কর্মকর্তারা খবর দিলেন যে, আশেপাশের কোনো দেশে কোনো মুসলিম বন্দী অবশিষ্ট নেই। এতে খলিফা আব্দুর রহমান আন-নাসির আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

এরই মধ্যে খলিফার আরেক প্রিয় দাসী ‘জাহরা’ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, এই অর্থ দিয়ে তাঁর নামে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করা হোক। আব্দুর রহমান আন-নাসির এমনিতেই স্থাপত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। ফলে কর্ডোভার উত্তরে জাবালুল আরুসের পাদদেশে এই প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। [৬]

[১] ইবনে উয়ারি উজির, আমির এবং সরকারি কর্মচারীদের বাদ দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের ঘরবাড়ির সংখ্যা এক লক্ষ তেরো হাজার বলেছিলেন, যেখানে সম্ভবত সেডিও তাদের বাদ দেননি বলে দুই লক্ষ সংখ্যা উল্লেখ করেছেন।

দ্রষ্টব্য: কর্ডোভার ঘরবাড়ি, জনসংখ্যা এবং একইভাবে মসজিদ ও হাম্মাম ইত্যাদির সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক মত রয়েছে। যেমন জনসংখ্যা সম্পর্কে পাঁচ লক্ষের কথাও আছে আবার বিশ লক্ষের কথাও আছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই অনুমান। কেউ কেউ সর্বনিম্ন অনুমান করেছেন আবার কেউ কেউ এর বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন।

[২] দাইরাতুল মাআরিফ লিল করনিল ইশরিন, ফারিদ ওয়াজদি; যা ঐতিহাসিক সেডিও-এর ‘খুলাসাতু তারিখিল আরব’ থেকে নেওয়া হয়েছে।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪২৮

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২১৩

[৫] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৩০৩

[৬] নাফহত তিব: ১/৫২৩

নির্মাণ কাজ ৩২৫ হিজরি (৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে শুরু হয়েছিল। এতে রাজপ্রাসাদের পাশাপাশি রাজপুত্র, রাজকীয় বেগমগণ, খলিফার নিকটাত্মীয়, খাদেম এবং দেহরক্ষী সৈন্যদের জন্যও প্রাসাদ ও ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিল।

“কাসর আল-জাহরা”-র দৈর্ঘ্য চার মাইল এবং প্রস্থ তিন মাইলের কম ছিল না। এতে পনেরো হাজার সুউচ্চ দরজা এবং চার হাজার তিনশ ষোলটি বুরুজ ও স্তম্ভ ছিল। এগুলোর নির্মাণে কমপক্ষে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ দিনার (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৪ আরব ৩৫ কোটি ডলার) ব্যয় হয়েছিল। দশ হাজার শ্রমিক ও স্থপতি নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে ২৫ বছরে এটি তৈরি করেন। গড়ে প্রতিদিন ছয় হাজার পাথর কেটে নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হতো।

আল-জাহরা নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল। এই মার্বেল পাথর আফ্রিকা থেকে আনা হয়েছিল। ফ্রান্স ও কনস্টান্টিনোপলের রাজারা উপহার হিসেবে কিছু স্তম্ভ পাঠিয়েছিলেন, যা খণ্ড খণ্ড আকারে স্থানান্তর করে প্রাসাদে লাগানো হয়েছিল। প্রাসাদের বাগানের শোভাবর্ধনের জন্য কনস্টান্টিনোপল থেকে একটি ফোয়ারা আনা হয়েছিল যা দেখতে হুবহু সোনার মতো মনে হতো। সিরিয়া থেকেও একটি অতুলনীয় ফোয়ারা আনা হয়েছিল যা ছিল সবুজ রঙের এবং অত্যন্ত সুন্দর।

“আল-জাহরা”-র সবচেয়ে বিশেষ অংশ ছিল কাসরুল খুলাফা। এর ছাদ ছিল সোনার। মার্বেল পাথর এতই দৃষ্টিনন্দন ও সুস্বাদু ছিল যে তা আয়নার মতো চকচক করত। বাইরের দেয়ালে সোনা ও রূপার কাজ ছিল।

কাসরুল খুলাফার মাঝখানে একটি অদ্ভুত ও চমৎকার ফোয়ারা ছিল, যার উপরের অংশে গ্রিসের রাজার পাঠানো একটি মূল্যবান মুক্তা বসানো ছিল। এর নিচে একটি বড় ফোয়ারা সদৃশ পাত্র ছিল যা পারদ দ্বারা পূর্ণ থাকত। দেয়ালে হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না ঝুলানো ছিল। যখন সূর্যের আলো কাসরুল খুলাফার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এই আয়নাগুলোর ওপর পড়ত, তখন পুরো দরবার ঝলমল করে উঠত এবং আয়নার চমক থেকে প্রতিফলিত রশ্মির উজ্জ্বলতা দৃষ্টি ধাঁধিয়ে দিত। যদি কখনো বাতাসের ঝাপটায় পাত্রে থাকা পারদে ঢেউ সৃষ্টি হতো, তবে আয়নায় তার প্রতিফলনের কারণে মনে হতো যেন পুরো প্রাসাদ কাঁপছে। বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা যখন কাসরুল খুলাফায় উপস্থিত হতেন, তখন তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যেত এবং যদি সেই মুহূর্তে পারদকে নাড়িয়ে দেওয়া হতো, তবে মেহমানদের হাঁশ উড়ে যেত। তাদের ধারণা হতো যে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির আল-জাহরার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে তেরো হাজার সাতশ পঞ্চাশ জন কর্মচারী এবং তেরো হাজার তিনশ পঁচাশি জন গোলাম কাজ করত। নারীদের সেবার জন্য পৌনে তিন হাজার তিনশ চৌদ্দ জন দাসী নিযুক্ত ছিল। এই বিশাল ও মনোরম বিনোদন কেন্দ্রে শত শত জলাধার ছিল যেখানে রঙ-বেরঙের মাছ সাঁতার কাটত। এই মাছগুলোর খাবার হিসেবে প্রতিদিন বারো হাজার রুটি জলাধারগুলোতে ফেলা হতো। বাগানগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সুকণ্ঠী ও সুন্দর পোষা পাখি আকাশে উড়তে এবং ডালে ডালে কিচিরমিচির করতে দেখা যেত। আল-জাহরার রান্নাঘরগুলোতে প্রতিদিন তেরো হাজার সের ছাগল ও গরুর মাংস সরবরাহ করা হতো। মুরগি, মাছ, বুনো হাঁস এবং তিতির পাখির মাংস ছিল এর অতিরিক্ত।

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির আল-জাহরায় একটি সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করেছিলেন যাকে “মসজিদ আল-জাহরা” বলা হতো, এর...

ভিত্তিগুলো এত গভীর করে খনন করা হয়েছিল যে পানি বেরিয়ে এসেছিল। মসজিদের নির্মাণে ৩০০ প্রকৌশলী, ২০০ কাঠমিস্ত্রি এবং ৫০০ শ্রমিক শরীক হয়েছিলেন। মদিনাতুজ জাহরায় পানি সরবরাহের জন্য কর্ডোভার পাহাড় থেকে স্বচ্ছ ও সুপেয় পানির একটি খাল বের করা হয়েছিল। পানির প্রবাহের জন্য জ্যামিতি ও গণিতের নীতি অনুযায়ী এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল যে পানি নালা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রাসাদের প্রতিটি উঁচু-নিচু অংশে পৌঁছে যেত। [১]

কাজী মুনজির বিন সাঈদ রহ.-এর নসিহত:

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির আল-জাহরাকে যে শান-শওকতের সাথে নির্মাণ করেছিলেন, তাকে আমরা শৌখিনতা বলতে পারি। কর্ডোভার বিজ্ঞ আলেম কাজী মুনজির বিন সাঈদ রহ. আন-নাসিরের এই নির্মাণকাজে অপচয় ও অনর্থক ব্যয় মনে করতেন এবং এর ওপর সমালোচনা করতেন। শেষ বছরগুলোতে খলিফা কর্ডোভা ছেড়ে আল-জাহরায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। আল-জাহরার প্রশংসা শুনে তিনি খুব খুশি হতেন এবং আশা করতেন যে তার এই কীর্তি দুনিয়াতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদিন তার দরবারে আবু উসমান বিন ইদ্রিস কাসরে জাহরায় তাকে এই কবিতা শোনালেন:

سَيَشْهَدُ مَا أَبْقَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ ... مُضِيْعًا وَقَدْ مَكَّنْتَ لِلدِّينِ وَالْدُّنْيَا

“আপনার রেখে যাওয়া ইমারতগুলো সাক্ষ্য দেবে যে আপনি কিছুই নষ্ট করেননি। দ্বীন ও দুনিয়া উভয়কেই আবাদ করেছেন।”

فَبِالْجَامِعِ الْمَعْمُورِ لِلْعِلْمِ وَالتَّقَى ... وَبِالزَّهْرَاءِ الزَّهْرَاءِ لِلْمَلِكِ وَالْعُلْيَا

“আপনি জামে মসজিদের মাধ্যমে জ্ঞান ও পরহেজগারীকে এবং সুন্দর আল-জাহরার মাধ্যমে রাজত্ব ও শান-শওকতকে উন্নতি দান করেছেন।”

মদিনাতুজ জাহরার ইমাম ও খতিব কাজী মুনজির বিন সাঈদ রহ. পাশেই বসা ছিলেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বললেন:

يَا بَايَ الزَّهْرَاءِ مُسْتَغْرَقًا ... أَوْقَاتُهُ فِيهَا أَمَّا تَمْهَلُ

“হে আল-জাহরার নির্মাতা! আপনি আপনার পুরো সময় এর দেখাশোনায় ব্যয় করছেন, আপনি কি একটুও বিরতি নেবেন না?”

لِلَّهِ مَا أَحْسَنَهَا رَوْنَقًا ... لَوْ لَمْ تَكُنْ زَهْرَتُهَا تَذْبُلُ

“বাহ্ বাহ্! এর সৌন্দর্যের কী চমৎকার বর্ণনা, যদি না এর ফুল (যাহরা) শুকিয়ে যেত।” [২]

আল-জাহরায় খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের মজলিস যে বালাখানায় বসত, তা সোনা ও রূপার প্রলেপ দেওয়া ইট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর ছাদ ছিল জাফরানি রঙের, যার ওপর এমন কারুকার্য ছিল যে চোখ ধাঁধিয়ে যেত।

[১] নাফহত তিব: ১/২২৫, ২৩৯, ২৪৪, ১৬৩, ১৬৫, ২১৫, ২৬৯, ৫২৩, ৫২৮, ৫৬৪, ৫৭০; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮৩; সুরাতুল আরদ লি ইবনে হাওকাল: ১/১১২; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/২৩১; সিফাতু জাজিরাতিল আন্দালুস: ১/৯৫; আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লি আবু উবাইদ আল-বাকরি: ২/৯০০-৯০২।

[২] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব লিত তিলমিসানি: ১/৫৬৫-৫৬৬।

৪৫৬ | তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

একবার আবদুর রহমান নাসির এই বালাখানায় বসে তাঁর সালতানাতের কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলেন:

“তোমরা কি অন্য কোনো শাসক সম্পর্কে শুনেছ যে সে এমন জায়গা তৈরি করেছে?”

কিছু চাটুকার তৎক্ষণাৎ বলল: “আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! আপনার শানই আলাদা।”

ইতিমধ্যে কাজী মুনজির বিন সাঈদ (রহ.) সেখানে উপস্থিত হলেন। এই প্রশ্নোত্তর শুনে তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন: “আমিরুল মুমিনীন! আমার এই প্রত্যাশা ছিল না যে অভিশপ্ত শয়তান আপনাকে এখানে পৌঁছে দেবে, আর না এই ধারণা ছিল যে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত এবং তাঁর দেওয়া শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আপনি নিজের লাগাম এই পর্যায় পর্যন্ত শয়তানের হাতে তুলে দেবেন যে সে আপনাকে কাফেরদের জায়গায় পৌঁছে দেবে।”

আবদুর রহমান নাসির চমকে উঠে বললেন: “ভেবেচিন্তে কথা বলুন। শয়তান কি আমাকে কাফেরদের জায়গায় পৌঁছে দিতে পারে?”

কাজী সাহেব বললেন: “হ্যাঁ! আপনি কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী শোনেননি:

وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لَبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

(যদি এই সম্ভাবনা না থাকত যে সমস্ত মানুষ এক জাতি হয়ে যাবে (অর্থাৎ কাফেরদের ভোগবিলাস দেখে সবাই কাফের হয়ে যাবে), তবে আমি দয়াময় রহমানকে অস্বীকারকারীদের জন্য তাদের ঘরের ছাদগুলো রূপার বানিয়ে দিতাম এবং সিঁড়িগুলোও (রূপার), যাতে তারা আরোহণ করে।)” [১]

খলিফা মাথা নিচু করে এই আয়াতগুলো শুনলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলেন, তারপর এত কাঁদলেন যে দাড়ি ভিজে গেল। অবশেষে মাথা তুলে কাজী সাহেবের দিকে তাকালেন এবং বললেন: “আল্লাহ আপনাকে সর্বোত্তম জায়ায়ে খায়ের দান করুন এবং পৃথিবীতে আপনার মতো ব্যক্তিত্ব আরও সৃষ্টি হোক। আল্লাহর কসম! আপনি যা বলেছেন তা একেবারেই সঠিক।”

একথা বলে ইস্তিগফার করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং সেই গম্বুজটি ভেঙে মাটি দিয়ে নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। [২]

দুর্ভিক্ষের সময় আবদুর রহমান নাসিরের দোয়া:

একবার আন্দালুসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। খেতখামার বিরান এবং শস্যের গুদাম খালি হয়ে গেল। আবদুর রহমান নাসিরের তাগিদে কাজী মুনজির বিন সাঈদ (রহ.) সালাতুল ইস্তিসকার ঘোষণা করলেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ময়দানে সমবেত হলেন। কিন্তু আবদুর রহমান নাসিরকে দেখা গেল না, তখন কাজী সাহেব বললেন: “হায়! আমি যদি জানতে পারতাম যে তিনি এই মুহুর্তে কী করছেন?”

একজন অফিসার আরজ করলেন: “হযরত! তিনি তো আজকাল ময়লা কাপড় পরে নিজের কামরায় বসে কাঁদছেন এবং মাথা ও দাড়ির চুলে ধুলোবালি মাখছেন আর বলছেন, হে আল্লাহ! আমার গুনাহের কারণে অসহায় জনগণের ওপর কঠোরতা করবেন না।”

[১] সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৩

[২] সিফাত জাজিরাতুল আন্দালুস লি-আল্লামা হিমযারি: ১৩১/১; নাফহত তীব: ৫৭৫, ৫৭৬/১

কাজী সাহেবের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন: “যখন জমিনের শাসক বিনয় প্রকাশ করে, তখন আসমানের অধিপতি অবশ্যই রহম করেন। তোমরা বৃষ্টির সুসংবাদ সাথে নিয়ে যাও।” জনতা সালাতুল ইস্তিসকার দোয়া শেষ করে কেবল ঘরে ফিরছিল, এমন সময় ঘন কালো মেঘ ঘনিয়ে এল এবং রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। [১]

জামে মসজিদ কর্ডোভা

আবদুর রহমান আন-নাসিরের স্থাপত্যের প্রতি অত্যন্ত উন্নত রুচি ছিল। তিনি জামে মসজিদ কর্ডোভার সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন করেন, যার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ আবদুর রহমান আদ-দাখিল। তিনি এর সম্প্রসারণ ও সাজসজ্জার জন্য তাঁর পূর্ববর্তী সকল শাসকদের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর সময়ে নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পর মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫০০ ফুট পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মসজিদের মোট আয়তন ছিল ৩৩ হাজার বর্গ হাত (প্রায় ৫০ হাজার বর্গফুট)। আয়তনের দিক থেকে এটি তখন বিশ্বের বৃহত্তম মসজিদ ছিল।

মসজিদের বড় দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার পর বাগান ও হাউজগুলোর মাঝখান দিয়ে যাওয়া পথ অতিক্রম করে মানুষ মসজিদের ছাদযুক্ত (আচ্ছাদিত) অংশে প্রবেশ করত। এই ছাদযুক্ত অংশটি মার্বেল পাথরের ১৪০০টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্তম্ভগুলোর ওপর অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন ও সুন্দর খিলান তৈরি করে সেগুলোর ওপর এক বিশাল ছাদ স্থাপন করা হয়েছিল। স্তম্ভগুলোর ওপর পাথরের কারুকাজ এমন অনন্য ছিল যে তা দৃষ্টি কেড়ে নিত। খিলানগুলোর উচ্চতা এবং সেগুলোর জৌলুসও দেখার মতো ছিল। বছরের দিনগুলোর হিসেবে এগুলোর সংখ্যা ছিল ৩৬০টি। এগুলোর মাঝখানে ছোট ছোট কুলুঙ্গি তৈরি করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ আছে যে, সূর্য সারা বছরের আবর্তনে প্রতিদিন ঠিক একটি কুলুঙ্গির ওপর দিয়ে অতিক্রম করত এবং প্রতিদিন সূর্যের রশ্মি একটি কুলুঙ্গির মধ্য দিয়ে সরলরেখায় ভেতরে প্রবেশ করত।

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির মসজিদের পুরনো মিনারটি ভেঙে একটি নতুন মিনার নির্মাণ করান, যা ছিল ১০৮ ফুট উঁচু। মিনারে ওঠা ও নামার জন্য দুটি পৃথক সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছিল, যার প্রতিটিতে ১০৭টি করে ধাপ ছিল। মুয়াজ্জিনের মিনারের উচ্চতা ছিল প্রায় ৮২ ফুট, যাতে তিনটি বড় বড় লণ্ঠন ছিল যা “ডালিম”-এর আকৃতির মতো দেখা যেত।

রাতে মসজিদের আলোর জন্য ২৮০টি ঝাড়বাতি জ্বালানো হতো, যার মধ্যে তিনটি বড় ঝাড়বাতি ছিল রূপার। বড় একটি ঝাড়বাতিতে ১৪৮০টি প্রদীপ জ্বলত। সামগ্রিকভাবে ঝাড়বাতিগুলোতে সাত হাজার চারশ পঁচিশটি প্রদীপ জ্বালানো হতো। আলোর এই অতুলনীয় ব্যবস্থার কারণে রাতেও মসজিদে দিনের মতো মনে হতো। মসজিদে জ্বলা মোমবাতিগুলোর জন্য প্রতি বছর সাড়ে তিন মণ মোম এবং সাড়ে তিন সের সুতার সলতে প্রয়োজন হতো। প্রদীপগুলোতে বার্ষিক ৩১২ মণ তেল ব্যবহৃত হতো। প্রতি জুমাবারে মসজিদে উদ ও আশ্বরের ধোঁয়া দেওয়া হতো।

মিনারগুলোর ওপর রূপার কলস ছিল। যখন সূর্যের আলো সেগুলোর ওপর পড়ত, তখন সেগুলোর ঝিলিক মাইলের পর মাইল দূর থেকে দেখা যেত। মসজিদের কেন্দ্রীয় মেহরাব, যেখানে ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পড়াতেন, তা সৌন্দর্যে ছিল অতুলনীয়।

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৫৭৩।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা ৪৫৮

একে সমসাময়িক কালের বিস্ময়গুলোর মধ্যে গণ্য করা হতো। দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা কেবল এটি দেখার জন্য আসতেন।

মেহরাবে খতিব ও ইমামের প্রবেশের জন্য আলাদা দরজা ছিল। মিস্বরটি ছিল খাঁটি হাতির দাঁতের তৈরি, এর সাজসজ্জার জন্য ৩৬ হাজার রঙ এবং কয়েক ডজন প্রকারের মূল্যবান কাঠ ব্যবহার করা হয়েছিল। বিশ্বের স্বীকৃত কারিগররা অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিপুণতার সাথে সাত বছরে এটি তৈরি করেছিলেন, এর নির্মাণে ৭৩,৫০৭ দিনার ব্যয় হয়েছিল (যা বর্তমানে সতর্ক হিসাব অনুযায়ী ১২ কোটি ১৩ লক্ষ ৬২ হাজার ৫০০ রুপির সমান)। মসজিদের পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০০ জন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। মসজিদের ইমামের জন্য আলাদা চমৎকার হাজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিরাপত্তার খাতিরে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রথম কাতারে আলাদা বেষ্টনীযুক্ত এলাকা তৈরি করা হয়েছিল। [১]

জামে কুরতুবাহর প্রকৃত আকর্ষণ ও সৌন্দর্য আজ দেখা সম্ভব নয়, কারণ খ্রিস্টানরা আন্দালুস দখলের পর মসজিদের সৌন্দর্যকে অত্যন্ত নির্মমভাবে পদদলিত করেছে। জামে মসজিদ কুরতুবাহর বর্তমান অবস্থা এই যে, এতে প্রবেশের পর ডানে ও বামে উভয় পাশে দেয়াল ঘেঁষে অনেকগুলো ছোট ছোট গির্জা তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের ঠিক মাঝখানে একটি বড় গির্জা রয়েছে, তার পাশেই সংগীতশিল্পীদের বসার স্থান। মেহরাব থেকে কিছুটা দূরে সেই গির্জাটি অবস্থিত যা এই মসজিদে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়েছিল, অন্যদিকে মেহরাবের পাশেই একটি গির্জা রয়েছে যাকে কার্ডিনালের গির্জা বলা হয়। আন্দালুসের স্থপতিরা বছরের পর বছর পরিশ্রম করে যে ইবাদতগাহটিকে অভাবনীয় কারুকার্যমণ্ডিত করেছিলেন, খ্রিস্টানরা তাদের শাসন আমলে সেটিকে □□□□ভাবে বিকৃত করে ফেলেছে। সেই সৌন্দর্যমণ্ডিত মেহরাব, যেখানে বড় বড় ইমাম, মাশায়েখ, ফকিহ এবং সুলতানরা সিজদাবনত হতেন, তা প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আজ এর ডানে-বামে সকাল-সন্ধ্যা শিরকপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে কোনো মুসলমান তার হৃদয়ে আঘাত অনুভব না করে থাকতে পারে না। মরহুম ডক্টর ইকবাল ইউরোপ সফরের সময় যখন স্পেনে যান, তখন কুরতুবাহর জামে মসজিদ দেখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাকে টেনে এই মেহরাবের সামনে নিয়ে আসে। নিরাপত্তা কর্মীদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি নজর এড়িয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং মসজিদের বিষণ্ণ দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে এভাবে বলতে থাকেন:

এ-ই আমার নামাজ, এ-ই আমার অজু

আমার সুরের মাঝে আছে আমার কলিজার রক্ত

তার বিখ্যাত কবিতা ‘মসজিদ-এ-কুরতুবাহ’-তে তিনি বলেন:

হে কুরতুবাহর হারাম, প্রেমের মাধ্যমেই তোমার অস্তিত্ব

তোমার পরিবেশ হৃদয় জুড়ানো, আমার সুর বুক জ্বালানো

[১] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ১/ ৫৩৯ থেকে ৫৪৯, ৫৫৮ থেকে ৫৬৬; আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লিল বাকরি: ২/ ৯০১; নুযহাতুল মুশতাক: ২/ ৫৭৫ থেকে ৫৭৯; খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব: ১/ ৬১, ৬২; আর-রওদুল মিতার ফি খবরিল আকতার: ১/ ৬৮; আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/ ২২৯ থেকে ২৩১

ইশক সারা পা দাওয়াম যাতে নেই কোনো আসা-যাওয়া

তোমার থেকে হৃদয়ের উপস্থিতি, আমার থেকে হৃদয়ের উন্মোচন

তোমার ভিত্তি টেকসই, তোমার স্তম্ভ অসংখ্য

শামের মরুভূমিতে যেন খেজুর গাছের ভিড়

তোমার দরজা ও ছাদে ওয়াদিয়ে আয়মানের নুর

তোমার সুউচ্চ মিনার জিবরাঈলের দৃষ্টিস্থল

ইয়েমেনের সুবাস আজও এর বাতাসে আছে

হিজাজের রঙ আজও এর সুরে আছে

আবদুর রহমান আন-নাসিরের অসুস্থতা ও মৃত্যু:

৩৫০ হিজরির মহররম মাসে খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল সত্তর বছর এবং তাঁর শাসনের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অসুস্থতার এই ধারা দীর্ঘায়িত হয় এবং অবশেষে ২ রমজান ৩৫০ হিজরি (১৬ অক্টোবর ৯৬১ খ্রিস্টাব্দ) তিনি মৃত্যুর ডাককে সাড়া দেন। [১]

খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসির নিঃসন্দেহে তাঁর সময়ের একজন মহান ইসলামি শাসক ছিলেন। যেহেতু সেই সময়ে বাগদাদের আব্বাসীয় খিলাফত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই পশ্চিমের মুসলমানদের একটি বড় অংশ আব্বাসীয় খলিফার পরিবর্তে তাঁকে খলিফা হিসেবে স্বীকার করত। আবদুর রহমান আন-নাসিরও এই ভিত্তিতেই খলিফা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই যুগে আব্বাসীয় খলিফার তুলনায় বিশ্ব রাজনীতিতে আন-নাসিরের গুরুত্ব বেশি ছিল। আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ পর্যন্ত অমুসলিম শাসকরা তাঁকে কর প্রদান করত। তাঁর শাসনকাল ছিল ইসলামি আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ সময়। তিনি বিরোধীদের মোকাবিলায় সর্বদা সফল ছিলেন এবং তাঁর সৌভাগ্যের নক্ষত্র তাঁর শাসনকালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তুঙ্গে ছিল। তবে তা সত্ত্বেও তিনি কখনো শান্তিতে বসেননি, ছুটি বা বিনোদনে যাননি বরং নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। কখনো জিহাদ, কখনো রাজনীতি, কখনো স্থানীয় বিদ্রোহ দমন, কখনো ফরিয়াদিদের কথা শোনা এবং কখনো নির্মাণ কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে একটি লেখা পাওয়া যায় যাতে পূর্ণ হিসাব কষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর পঞ্চাশ বছরের শাসনকালে তিনি আরাম, শান্তি ও অবসরের মাত্র চৌদ্দটি দিন পেয়েছিলেন। [২]

নিঃসন্দেহে এই মহান মুসলিম শাসকদের জিহাদ ও রাজনীতি, ন্যায়বিচার, জনকল্যাণ এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিরন্তর সংগ্রাম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হলো যে, আজও ইতিহাসে তাঁদের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২৩৩

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২৩২

আল-হাকাম সানি মুস্তানসির বিল্লাহ

৩৫০ হিজরি - ৩৬৬ হিজরি

(৯৬১ খ্রি. - ৯৭৬ খ্রি.)

আব্দুর রহমান আন-নাসির তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে তীব্র অসুস্থতার কারণে সালতানাতের অধিকাংশ দায়িত্ব তাঁর যুবরাজ হাকামের ওপর অর্পণ করেছিলেন। যখন আন-নাসির ৫ রমজান ৩৫০ হিজরি (১৯ অক্টোবর ৯৬১ খ্রি.) ইন্তেকাল করেন, তখন শাহজাদা হাকাম বিন আব্দুর রহমান আন্দালুসের নতুন খলিফা হিসেবে কাসরুজ জাহরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আটচল্লিশ বছর। ইতিহাসে তাঁকে হাকাম সানি মুস্তানসির বিল্লাহ উপাধিতে স্মরণ করা হয়। তিনি পনেরো বছর সাত মাস শাসন করেন। তিনি আন্দালুসের প্রথম শাসক ছিলেন যিনি আব্বাসীয় খলিফাদের মতো ‘আল্লাহ’ শব্দ যুক্ত করে উপাধি গ্রহণ করেছিলেন [১]।

ইলমি খিদমত:

খলিফা হাকাম সানি মুসলিম শাসকদের মধ্যে এই দিক থেকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী যে, তিনি একজন বড় মাপের দ্বিনি আলেম ছিলেন। তাঁর শৈশব ও যৌবনের পুরো সময় ইলম ও ফন (জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা) অর্জনে অতিবাহিত হয়েছে। তাঁর পিতা আব্দুর রহমান আন-নাসিরও বড় ইলম অনুরাগী এবং আলেম ও গুণীজনদের কদরদান ছিলেন। তিনি জানতেন যে ইলম সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই তিনি তাঁর পুত্রকে ইলমের অলঙ্কারে সজ্জিত করার জন্য আন্দালুসের বড় বড় আলেমদের খিদমত গ্রহণ করেছিলেন।

যৌবনে পদার্পণ করতে করতেই হাকাম সানি তাজবিদ, তাফসির, হাদিস, ফিকহ, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা), সরফ ও নাহ (ব্যাকরণ), লুগাত (অভিধান), বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র), দর্শন, গণিত, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, আদব (সাহিত্য) এবং অন্যান্য প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন বাগ্মী বক্তা, কবি এবং শৈলীসম্পন্ন সাহিত্যিক ছিলেন। কবিতা ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রে সমান দক্ষতা খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই জুটেছে।

তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অতুলনীয়, যা পড়তেন তা-ই মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর অধ্যয়ন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, যৌবনেই তিনি হাজার হাজার বই পড়ে ফেলেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, আব্দুর রহমান আন-নাসিরের কুতুবখানায় (লাইব্রেরি) বিদ্যমান সমস্ত বই তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছিলেন এবং সেগুলোর অনেক বইতে নিজ হাতে দরকারী টীকা লিখেছিলেন।

মানুষের ধারণা ছিল যে ক্ষমতা গ্রহণের পর তাঁর ইলমি ব্যস্ততা আর বজায় থাকবে না, কিন্তু তিনি শাহী ইখতিয়ারাত (রাজকীয় ক্ষমতা)...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/২৩৩।

...কাজে লাগিয়ে ইলমের আরও খিদমত করেছেন। উলামায়ে কেরামের পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর ইলম-প্রীতির কথা শুনে দুনিয়ার কোণায় কোণায় থেকে মর্যাদাবান উলামায়ে কেরামের এক বিশাল সমাবেশ কর্তোভায় একত্রিত হয়েছিল। খলিফা হাকাম সানি তাঁদের সমস্ত প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যাতে তাঁরা জীবিকার চিন্তা ছেড়ে ইলমি খিদমতে মশগুল থাকতে পারেন।

খলিফা হাকাম সানি উলামায়ে কেরামের একটি দলকে শুধুমাত্র এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন যে তাঁরা বিদেশি ভাষার উপকারী বইগুলোর অনুবাদ করবেন। এভাবে ইসলামি বিশ্বের কুতুবখানাগুলোতে শত শত নতুন বই যুক্ত হয়েছিল।

খলিফা হাকাম সানির নতুন নতুন বই পড়ার এবং সেগুলো কর্তোভার কুতুবখানায় সংগ্রহ করার প্রবল শখ ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বিশেষ কর্মীদের দুনিয়ার সমস্ত ইলমি কেন্দ্রে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই কর্মীরা মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, কায়রো, দামেস্ক, কনস্টান্টিনোপল, বাগদাদ, কুফা এবং বসরাসহ প্রতিটি শহরে যেখানে ইলমের চর্চা ছিল সেখানে অবস্থান করতেন এবং দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য বইগুলো খুঁজে খুঁজে কর্তোভায় পাঠাতেন। কোনো বই সংগ্রহের জন্য এই কর্মীরা বড় থেকে বড় কষ্টও হাসিমুখে সহ্য করতেন। এই খিদমতের জন্য তাঁরা অত্যন্ত সম্মানজনক ভাতা এবং অতিরিক্ত পুরস্কারও পেতেন। যদি কোনো বই চড়া দামে বিক্রি হতো, তবুও হাকাম সানির নির্দেশ ছিল যে তা যেন কিনে নেওয়া হয় এবং দামের পরোয়া না করা হয়। অনেক সময় একটি বইয়ের জন্য তাঁকে স্বর্ণমুদ্রার অনেক খলি খরচ করতে হতো, কিন্তু তিনি একে সস্তা সওদা মনে করতেন।

প্রতিটি শহরে তাঁর নিযুক্ত ক্যালিগ্রাফাররাও উপস্থিত ছিলেন। যে বই বেশি জীর্ণ হতো অথবা তার মালিক তা বিক্রি করতে রাজি হতো না, এই ক্যালিগ্রাফাররা তার অনুলিপি তৈরি করে হাকাম সানির খিদমতে পাঠিয়ে দিতেন। কোনো ব্যক্তি যদি দরবারে প্রবেশাধিকার এবং সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষী হতো, তবে সে অনুসন্ধান করে কোনো দুর্লভ বই খুঁজে বের করত এবং তা খিদমতে হাদিয়া হিসেবে পেশ করে রাজকীয় অনুগ্রহের যোগ্য হয়ে যেত।

খলিফা হাকাম সানির যুগে আন্দালুসে ইলমি রুচি এতটাই সাধারণ হয়ে গিয়েছিল যে ঐতিহাসিকদের মতে, “প্রতিটি ঘরে একটি করে কুতুবখানা বিদ্যমান ছিল।” এছাড়া আন্দালুসের প্রতিটি বড় শহরে একটি সরকারি কুতুবখানাও তৈরি করা হয়েছিল যেখানে বইপ্রেমীদের অধ্যয়নে মগ্ন দেখা যেত। হাকাম সানি আন্দালুসের জায়গায় জায়গায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, ছোট ছোট গ্রাম ও জনপদে নতুন মক্তব ও মাদ্রাসা খোলেন। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও মক্তবের যাবতীয় খরচ সরকার বহন করত। বিদেশ থেকে আসা ছাত্রদের এতটাই সম্মান করা হতো যে, যতক্ষণ তাঁরা আন্দালুসে থাকতেন, ততক্ষণ তাঁরা হাকাম সানির ব্যক্তিগত মেহমানের মর্যাদা পেতেন।

এই যুগেই বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ ইসফাহানি কবি, সাহিত্যিক, জ্ঞানী-গুণী, সুলতান এবং আমিরদের জীবনীর ওপর একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন যা “আল-আগানি” নামে প্রসিদ্ধ হয়। হাকাম সানি যখন আবুল ফারাজ ইসফাহানির এই রচনায় ব্যস্ত থাকার কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি অগ্রিম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন যে বই শেষ হলে প্রথম কপিটি যেন কর্তোভায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আবুল ফারাজ একটি প্রশংসামূলক কাসিদাসহ বইটি হাকাম সানির কাছে পাঠিয়ে দেন, যার বিনিময়ে হাকাম সানি আরও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা হাদিয়া দেন। কলম সৈনিকদের এই সম্মাননা দেখে সেই যুগের বিশিষ্ট লেখকদের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তাঁরা তাঁদের রচনার প্রথম কপি আল-হাকাম...

...এর খিদমতে পাঠিয়ে দিতেন। [১]

জ্ঞানী ব্যক্তিদের কদরদানি

খলিফা হাকাম সানি জ্ঞানী ব্যক্তিদের (আহলে ইলম) কতটুকু কদর করতেন এবং তাঁদের সাথে কতটা বিনয়ের সাথে আচরণ করতেন, তা এই ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে, কর্তোভার একটি মসজিদে ফকিহ আবু ইবরাহিম দরস দিচ্ছিলেন। এমন সময় খলিফার এক কর্মচারী এসে তাঁকে বললেন: “খলিফা এখনই আপনার সাথে দেখা করতে চান এবং আপনার অপেক্ষায় আছেন।”

ফকিহ জবাব দিলেন: “তাঁকে গিয়ে বলো যে, আমি আল্লাহর কাজে ব্যস্ত আছি। যতক্ষণ না আমি অবসর হচ্ছি, ততক্ষণ উপস্থিত হতে অক্ষম।”

সরকারি কর্মচারী ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে গেল এবং ফকিহর জবাব পৌঁছে দিল।

হাকাম সানি মোটেও কিছু মনে করলেন না, বরং কর্মচারীকে বললেন: “ফকিহ সাহেবকে গিয়ে বলো যে, আমরা তাঁর জবাবে অত্যন্ত খুশি হয়েছি। তিনি যখন আল্লাহর কাজ শেষ করবেন, তখন যেন তশরিফ আনেন। আমরা অপেক্ষায় আছি।”

সরকারি কর্মচারী ফকিহ আবু ইবরাহিমকে এই বার্তা পৌঁছালে তিনি বললেন: “আমি বার্ষিকের কারণে ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারি না এবং পায়ে হেঁটেও বেশি দূর চলতে পারি না। যদি খলিফা ‘বাব আস-সানাআ’ খুলে দেন যা এখান থেকে কাছে, তবে আমি সহজে উপস্থিত হতে পারব। অন্যথায় আমাকে ‘বাব আল-আসাদ’ দিয়ে যেতে হবে যার পথ অত্যন্ত দীর্ঘ।”

এই জবাব দিয়ে ফকিহ আবু ইবরাহিম পুনরায় দরসে মশগুল হয়ে গেলেন।

‘বাব আস-সানাআ’ খোলার জন্য ফকিহ দাবি করেছিলেন, যা বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া সবসময় বন্ধ রাখা হতো। কিন্তু খলিফা হাকাম সানি তৎক্ষণাৎ তা খোলার নির্দেশ দিলেন এবং কয়েকজন আমির ও উজিরকে ফকিহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। ফকিহ দরস থেকে অবসর হয়ে এলে আমিরগণ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং খলিফার কাছে পৌঁছে দিলেন। খলিফা তাঁর সাথে সাক্ষাতের পর অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে সেই দরজা দিয়েই তাঁকে বিদায় দিলেন। [২]

উলামা ও ফকিহদের কর্তোভার দিকে প্রত্যাবর্তন

হাকাম সানির ইলমি রুচি এই যুগের বড় বড় উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন উলামাদের কর্তোভার অনুরাগী করে তুলেছিল। বাগদাদের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি আবু আলী আল-কালি আল-বাগদাদি (২৮৮ হিজরি - ৩৫৬ হিজরি), যাঁর কিতাব “আল-আমালি” অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, তিনি হাকাম সানির পিতার শাসনামলে আন্দালুসে এসেছিলেন এবং হাকাম সানির যুগেও কর্তোভায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। [৩]

[১] নাফহত তিব: ১ / ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৯৩, ৩৯৫, সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৬ / ২৩০ থেকে ২৩২, ত. আর-রিসালাহ, তারিখ ইবনে খালদুন: ৪ / ১৮৭, ১৮৮, ত. দারুল ফিকর, দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১ / ৫০৩ থেকে ৫০৭।

নোট: আবুল ফারাজ ইসফাহানির এই সংকলনটি নিঃসন্দেহে সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান রাখে, তবে ঐতিহাসিক দিক থেকে এর অধিকাংশ বর্ণনা মানসম্মত নয়। তবুও প্রাচ্যবিদ এবং বাতিলপন্থীরা এই বর্ণনাগুলো থেকে দ্বীনি এমনকি আকিদাগত বিষয়েও দলিল পেশ করে থাকে, যা মূলনীতি সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ।

[২] নাফহত তিব: ১ / ৩৭৮।

[৩] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ১ / ২২১।

আসগর আল-বাগদাদী এই যুগের বিখ্যাত লেখক ও ক্যালিগ্রাফার ছিলেন। ইরাকে হাকাম সানির জ্ঞানানুরাগের কথা শুনে তিনি ফুসতাত চলে আসেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এখানেই খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন।

কায়রোর আল্লামা ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান আল-কুরাশি (রহ.) একজন বিশিষ্ট দ্বীনি আলেম এবং উচ্চমানের সাহিত্যিক ছিলেন। কায়রোতে বনু উবাইদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিলেন। আল-হাকাম সানির জ্ঞানানুরাগের খ্যাতি শুনে তিনি এদিকে যাত্রা করেন এবং ইশবিলিয়াতে অবস্থান করেন। হাকাম সানি যখন জানতে পারলেন যে এমন একজন বিজ্ঞ আলেম আন্দালুসে এসেছেন, তখন তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। [১]

আবু বকর আল-আযরাক (৩১৯ হিজরি - ৩৮৫ হিজরি) মিসরে ছিলেন। সেখানে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে তিনি তিউনিসিয়া চলে যান। কিন্তু কায়রোয়ানের উবাইদিরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা প্রকাশের কারণে তাকে কঠোর নির্যাতনের শিকার করে এবং কারারুদ্ধ করে। যখন মুক্তি পেলেন, তখন ৩৪৯ হিজরিতে আন্দালুসে এসে আশ্রয় নেন। হাকাম সানি তাকে নিজের কাছে ডাকেন এবং তার পাণ্ডিত্য ও হকের ওপর অবিচলতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নেন। [২]

এটি ছিল সেই যুগে বাইরে থেকে আন্দালুসে আসা আলেমদের তালিকার একটি নমুনা মাত্র। খোদ আন্দালুসের প্রখ্যাত আলেমদের যে বলয় আগে থেকেই হাকাম সানির চারপাশে সমবেত ছিল, তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানাকাশের সূর্য ও চন্দ্র। এই বলয়ের শেখ আহমদ বিন দাহিম, শেখ সাবিত বিন কাসিম, মুহাম্মদ বিন আস-সালাম, শেখ জাকারিয়া বিন আল-খাত্তাব এবং আল্লামা কাসিম বিন আসবাগ-এর মতো আলেমদের কাছ থেকে খলিফা হাকাম সানি নিয়মিত হাদিস ও ফিকহের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। [৩]

ব্যক্তিগত পাঠাগার:

খলিফা হাকাম সানির ব্যক্তিগত পাঠাগারটি প্রায় ছয় লক্ষ বইয়ের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই পাঠাগারে নতুন বইয়ের আরও অনুলিপি তৈরি করার জন্য শত শত কর্মচারী সবসময় কাজে নিয়োজিত থাকতেন। পাঠাগারের ভবনটি কোনো প্রাসাদের চেয়ে কম ছিল না। এটি মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এতে চন্দন ও আবলুস কাঠের তৈরি মূল্যবান আলমারিগুলো সারিবদ্ধভাবে দেখা যেত। আলমারিগুলোকে বিষয় অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে সাজানো হয়েছিল এবং প্রতিটি আলমারিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামফলক ঝুলানো ছিল। পাঠাগারে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বইয়ের মজবুত ও সুন্দর বাঁধাই করা হতো। এই উদ্দেশ্যে বাঁধাইকারীদের একটি দল পাঠাগারের একটি অংশে নিজ নিজ কাজে মগ্ন থাকত।

এই পাঠাগারের বইগুলোর শুধুমাত্র ক্যাটালগ বা সূচিপত্রই ৪৪ খণ্ডে বিভক্ত ছিল, যাতে কমবেশি চার লক্ষ বইয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ বই খলিফা হাকাম সানি আদ্যোপান্ত পড়েছিলেন এবং সেগুলোর ওপর টীকাও লিখেছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং প্রতিটি বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় খলিফা হাকাম নিজ হাতে বইয়ের নাম এবং লেখকের পরিচয় লিখেছিলেন। [৪]

[১] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৬৬/৩

[২] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ১২২/৩

[৩] নাফহত তিব: ৩৯৫/১

[৪] নাফহত তিব: ৩৯৪, ৩৯৫/১

আফসোস যে, আন্দালুসের ইসলামী সালতানাত হাতছাড়া হওয়ার পর ইলমের এই অমূল্য মুক্তাসমূহও অন্যদের হাতে চলে যায়। আজ ইউরোপ ও আমেরিকার লাইব্রেরিগুলোতে অতীতের সেই ইলম-অনুরাগী বাদশাহ এবং ইসলামী জ্ঞানতাপসদের এমন লক্ষ লক্ষ কিতাব সংরক্ষিত আছে যা থেকে মুসলিম বিশ্ব আজও বঞ্চিত। মরহুম ইকবাল এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই বলেছিলেন:

কিন্তু ইলমের সেই মুক্তাসমূহ, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই কিতাবগুলো,
যখন ইউরোপে সেগুলোকে দেখি তখন হৃদয় শতধা বিভক্ত হয়ে যায়।

হাকাম সানির জিহাদী তৎপরতা:

হাকাম সানি ইলমি ব্যস্ততায় এতটা নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও কেবল একজন নিভৃতচারী আলেম ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সালতানাতের বিষয়াবলীতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী একজন শাসক, সতর্ক রাজনীতিবিদ এবং রণনিপুণ সেনাপতি।

এটি ভিন্ন কথা যে, তাঁর যুগে বিরোধীরা ভীত থাকার কারণে যুদ্ধবিগ্রহের খুব একটা প্রয়োজন পড়েনি, কিন্তু যখনই এমন সুযোগ এসেছে, হাকাম সানি লৌহহস্তে শত্রুর ঘাড় মটকাতে দেরি করেননি। সিংহাসনে আরোহণের পর অর্ধ বছরও অতিবাহিত হয়নি, এমন সময় তাঁকে প্রথম সামরিক অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়।

আবদুর রহমান আন-নাসির খ্রিস্টান রাজপুত্র শানজাহকে সাহায্য করে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও চাচাতো ভাই “অরদুন চতুর্থ”-এর বিপরীতে এই শর্তে “লিওন”-এর শাসনক্ষমতা পাইয়ে দিয়েছিলেন যে, সে কিছু সীমান্ত দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দেবে। কিন্তু শানজাহ আন-নাসিরের মৃত্যু পর্যন্ত এই অঙ্গীকার পূরণ করেনি। হাকাম সানির সিংহাসন আরোহণের পর শানজাহ আরও প্রশ্রয় পায় এবং সে মনে করে যে, কর্ডোভার নতুন সম্রাট কেবল একজন নিভৃতচারী আলেম, তাই সে সমস্ত চুক্তি অস্বীকার করে বসে। হাকাম সানি এই সংবাদ পেয়ে ৩৫১ হিজরির মহরম মাসে সমস্ত নায়েব ও আমিরদের নির্দেশ পাঠান যেন তারা অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখে। এরপর তিনি নিজেই লিওনের সীমান্তে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং একটি পরীক্ষামূলক সফল আক্রমণ চালিয়ে ফিরে আসেন। [১]

অরদুন চতুর্থের কর্ডোভার দরবারে উপস্থিতি:

অরদুন চতুর্থ, যিনি তখন যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, খলিফা হাকাম সানি এবং শানজাহর মধ্যকার উত্তেজনা দেখে ৩৫১ হিজরির সফর মাসে বিনীতভাবে নিজে কর্ডোভায় উপস্থিত হন, যাতে মুসলমানদের সমর্থনে শানজাহকে লিওন থেকে বিতাড়িত করে নিজে শাসনক্ষমতা লাভ করতে পারেন।

যখন তিনি রাজপ্রাসাদের নিকট পৌঁছালেন, তখন অভ্যর্থনার জন্য সারিবদ্ধ বাহিনীর প্রতাপ, গান্ধীর্ষ এবং শৃঙ্খলা দেখে তাঁর ঘাম ছুটতে শুরু করল। তিনি মরহুম খলিফা আবদুর রহমান আন-নাসিরের কবরের কাছে পৌঁছালেন এবং নিজের টুপি খুলে কিছুক্ষণ আদবের সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন তিনি হাকাম সানির খাস কামরায় পৌঁছালেন, তখন দরবারের শান-শওকত তাঁকে বিমোহিত করে দিল। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে খলিফার কাছে পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যের আবেদন জানালেন। হাকাম সানি পূর্বের ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিয়ে তা কবুল করে নিলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, অরদুনকে লিওনের শাসনক্ষমতা পাইয়ে দেওয়া হবে, যা সর্বদা কর্ডোভার অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাবুশি: ২/ ২৩৪, ২৩৫।

এদিকে শানজাহ যখন অর্ডুন এবং হাকাম সানির মধ্যে সন্ধির কথা জানতে পারল, তখন সে তার প্রধানদের এবং পাদ্রিদের একটি প্রতিনিধি দল কর্ডোভায় পাঠাল, যারা ভবিষ্যতে চুক্তি মেনে চলার নিশ্চয়তা দিল এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু এরই মধ্যে শানজাহ তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী অর্ডুনের মৃত্যুর খবর পেল, যার হাত থেকে নিজের সিংহাসন বাঁচাতে সে কর্ডোভার সাথে হাত মেলাচ্ছিল। অর্ডুনের মৃত্যুতে শানজাহর সামনে থাকা বিপদ দূর হয়ে গেল, ফলে সে অবিলম্বে তার অবস্থান পরিবর্তন করল এবং অন্য তিন খ্রিস্টান শাসক: কাস্টিলের নবাব ফার্ডিনান্ড, নাভারের নবাব গার্সিয়া শানজাহ এবং বাসেলোনার নবাবের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কর্ডোভার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। [১]

আবারও জিহাদি সফর:

খ্রিস্টানদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রতিকারের জন্য আল-হাকাম সানি সমস্ত খ্রিস্টান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একযোগে জিহাদ ঘোষণা করে টলেডোতে সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং ৩৫২ হিজরির গ্রীষ্মকালে কাস্টিল আক্রমণ করে কঠোর যুদ্ধের পর প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তিশালী দুর্গ ‘সেন্ট সিফেন’ (সান্ত এস্বেবান) জয় করেন। দ্বিতীয় আক্রমণে আতিয়েঞ্জা (Atienza) শহরটিও জয় করা হয়। দ্বিতীয় ইসলামি বাহিনী মেস্ত ফাস্তা থেকে নাভার রাজ্য আক্রমণ করে। তৃতীয় বাহিনী উশতা থেকে নাভারের দুর্গ ‘ইয়াহ’-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শানজাহ এবং তার মিত্ররা স্থানে স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই যুদ্ধগুলো বিরতি দিয়ে দিয়ে চার বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে ‘কালান্সরা’, ‘কালাহরা’ এবং ‘গোরমাজ’ (Gormaz)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলোও জয় করা হয়। [২]

খ্রিস্টানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল, তদুপরি তাদের নেতারা একে একে মারা যেতে থাকে। ৩৫৫ হিজরিতে (৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) শানজাহ বিষক্রিয়ায় মারা যায় এবং তার অল্পবয়সী ছেলে রামিরো তৃতীয় ‘লিওন’-এর উত্তরাধিকারী হয়। এদিকে ফার্ডিনান্ড তৃতীয়ও মারা যান এবং তার স্থলে তার পুত্র ‘গার্সিয়া ফার্ডিনান্ড’ কাস্টিলের সিংহাসনে বসেন। নাভারের শাসক ‘গার্সিয়া শানজাহ’ও পরলোকগমন করেন এবং ‘শানজাহ গার্সিয়া দ্বিতীয়’ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তারা সবাই একে একে আল-হাকামের সাথে সন্ধি করে নেয়। ৩৬০ হিজরি থেকে ৩৬৩ হিজরি পর্যন্ত তাদের প্রতিনিধি দলগুলো কর্ডোভায় আসতে থাকে। সবাই আনুগত্যের চুক্তি করে। এরই মধ্যে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট এবং জার্মানির রাজা অটো দ্বিতীয়-এর দূতরাও আসেন এবং আন্দালুসের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নবায়ন করেন। [৩]

আফ্রিকা অভিযান:

আন্দালুসের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের পর হাকাম সানিকে বনু উবাইদের ফিতনা দমনের জন্য আফ্রিকায়ও সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়। সেই দিনগুলোতে বনু উবাইদ উত্তর আফ্রিকার শাসনভার বারবার গোত্র ‘সানহাজা’-র হাতে তুলে দিয়েছিল এবং সানহাজি সর্দার ইউসুফ বিন জিরিকে এখানকার নায়েব নিযুক্ত করেছিল। সেই সময় পর্যন্ত মরক্কোর উপকূলে আলভী পরিবার...

[১] নাফহত তিব: ১/৮১; আল-বায়ানুল মাগরিব: ৩/২৫১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪৮৫

[২] আল-বায়ানুল মাগরিব: ১/২৫১ থেকে ২৫৫; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/১৮৬, ১৮৭, ত. দারুল ফিকর

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৪৯০

বনু ইদ্রিসের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাই মরক্কো এবং মৌরিতানিয়ার অঞ্চলগুলো বনু উবাইদের সানহাজি প্রতিনিধি এবং বনু ইদ্রিসের মধ্যে সংঘর্ষের ময়দানে পরিণত হয়েছিল। বনু ইদ্রিস বনু উবাইদের বিপরীতে আবদুর রহমান আন-নাসিরের খিলাফত গ্রহণ করে নিয়েছিল, কিন্তু নাসিরের মৃত্যুর কয়েক বছর পর তাদের কাছে মরক্কোর ওপর উমাইয়া কর্তৃত্বের ছায়া অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল।

যখন বনু উবাইদের শাসক ইউসুফ বিন জিরি উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হলো, তখন তানজিয়ারের ইদ্রিসি আমির হাসান বিন গানুন প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি তার আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সানহাজিদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে আন্দালুসের উমাইয়াদের বিরুদ্ধে চলে যান। এর ফলে তানজিয়ারে আন্দালুসের স্থানীয় আমির লায়লা ইবনে মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে হাকাম সানি তার সেনাপতি গালিবকে উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের দায়িত্ব দেন। তিনি তানজিয়ার ও সাবতার মধ্যবর্তী “কালআ মাসমুদা”-কে সেনানিবাস বানিয়ে এই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন করেন এবং মরক্কোসহ অন্যান্য বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এলাকাগুলোকে ফিতনা থেকে মুক্ত করে ৩৬৩ হিজরিতে আন্দালুসে ফিরে আসেন। [১]

হাকাম সানির মৃত্যু:

আল-হাকাম সানির শাসনামলে অভ্যন্তরীণভাবে পুরো আন্দালুসে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। কোনো ধরনের বিদ্রোহ বা হাঙ্গামা ছিল না। মানুষ নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করছিল। শুরুর পাঁচ বছর বাদে হাকাম বৈদেশিক অভিযান থেকেও অবসর পেয়েছিলেন, তাই তিনি একনিষ্ঠভাবে দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করতে ব্যস্ত ছিলেন।

৩৬৪ হিজরিতে হাকাম পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং রোগের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হতে লাগল। এই দয়ালু শাসক জীবনের শেষ দিনগুলোতে ১০০ গোলাম আজাদ করেন, জনগণের ওপর থেকে করের ষষ্ঠাংশ মওকুফ করে দেন এবং তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বাজারগুলোর আয় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা এবং শিক্ষকদের বেতনের জন্য ওয়াকফ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

দুই বছর শয্যাশায়ী থাকার পর ৩ রমজান ৩৬৬ হিজরিতে খলিফা হাকাম সানি ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি ১৬ বছর শাসন করেন এবং এই সময়ে ন্যায়বিচার, দ্বীনদারি এবং জ্ঞানানুরাগের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যে আজ পর্যন্ত দুনিয়া তাকে একজন জ্ঞানানুরাগী শাসক হিসেবে স্মরণ করে। [২]

যদিও হাকাম সানি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী আলেম এবং যুক্তিনির্ভর ও বর্ণনাভিত্তিক উভয় শাস্ত্রেরই অনুরাগী ছিলেন, তবে ইতিহাস এবং বংশলতিকা শাস্ত্রের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইতিহাসের কিতাবসমূহ থেকে জানা যায় যে তিনি নিজেই আন্দালুসের ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন, কিন্তু আফসোস যে কালের বিবর্তনে এই মূল্যবান রচনাটি হারিয়ে গেছে। তবে আন্দালুসের প্রাচীন ঐতিহাসিকদের কিতাবসমূহে এমন উদ্ধৃতি প্রচুর পাওয়া যায় যে, অমুক ঘটনা হাকামের নিজ হাতে লেখা ইতিহাস থেকে নকল করা হয়েছে। [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১ / ৩৯৪ থেকে ৩৯৭

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি-ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২ / ২৫৩

[৩] ওয়াজাদা বি-খাভিল খলিফাতিল মুস্তানসির বিল্লাহ — (আল-বায়ানুল মুগরিব: ২ / ২৪১)

হিশাম আল-মুয়ায়্যিদ বিল্লাহ এবং মুহাম্মদ বিন আবি আমির (হাজিব আল-মানসুর)

৩৬৬ হিজরি থেকে ৩৯২ হিজরি

(৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-হাকাম মৃত্যুর পূর্বে তার পুত্র হিশামকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছিলেন, যদিও সে অল্পবয়স্ক ছিল। অথচ তার পরিবর্তে যদি তার চাচা মুগিরা বিন আব্দুর রহমান আন-নাসিরকে মনোনীত করা হতো তবে ভালো হতো, কারণ তিনি সব দিক থেকেই শাসনের যোগ্য ছিলেন। এই ভুল সিদ্ধান্তে মূলত হিশামের মা “মালিকা সুবহ”-এর হাত ছিল। তিনি বাশকুনিশ গোত্রের একজন দাসী ছিলেন। তিনি একজন ভালো গায়িকা এবং খলিফার প্রিয়পাত্রী ছিলেন। [১]

তিনি খলিফা হিসেবে নিজের ছেলেকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন। এভাবে একটি বিশাল সাম্রাজ্য একজন অনভিজ্ঞ ও দুর্বল ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করা হলো। উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত ধুমধাম করে পালন করা হয়েছিল যাতে রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর আল-হাকাম পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব উজির জাফর বিন উসমান মুসহাফি এবং শাহজাদার গৃহশিক্ষক মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের হাতে চলে আসে।

আল-হাকাম এক বছরেরও বেশি সময় শয্যাশায়ী ছিলেন এবং প্রজাদের মধ্যে সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে কানাঘুষা শুরু হয়েছিল। অবশেষে মুহাম্মদ বিন আবি আমির এবং জাফর বিন উসমান পারস্পরিক পরামর্শ করে ১০ সফর ৩৬৬ হিজরিতে উত্তরাধিকারী হিশাম বিন আল-হাকামের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন যাতে জনগণ আশ্বস্ত হতে পারে যে পরবর্তী শাসক নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই উপলক্ষে আল-হাকাম এটিও স্থির করে দিয়েছিলেন যে, যখন সে সিংহাসনে বসবে তখন তার উজির হবেন ইবনে আবি আমির। এই উপলক্ষে ইবনে আবি আমিরের পক্ষ থেকে কর্তোবাবাসীদের জন্য জলপাই তেলের বাণিজ্যিক কর মওকুফ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যা আয়ের একটি প্রধান উৎস ছিল। এই ঘোষণায় মানুষ অত্যন্ত খুশি হলো এবং ইবনে আবি আমিরের জন্য দোয়া করতে লাগল। [২]

সকালাবাদের ষড়যন্ত্র এবং মুগিরা বিন আন-নাসিরের হত্যাকাণ্ড:

এই ঘটনার প্রায় সাত মাস পর ৩ রমজান ৩৬৬ হিজরিতে আল-হাকাম সানি অত্যন্ত নিরবে তার মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২৫৩/২

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২৫৩, ২৫৪/২

লাববাইক বলে দিল। দীর্ঘ অসুস্থতার পর আল-হাকামের মৃত্যু হয়েছিল এবং অনেক দিন ধরে তিনি তাঁর উজির জাফর বিন উসমান এবং উপদেষ্টাদের সাথেও দেখা করতে পারেননি। খলিফার দেখাশোনা এবং প্রাসাদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সেই সাকলাবি আমিরগণ, জওয়ার এবং ফায়েক সামলে রেখেছিলেন যাদের অধীনে এক হাজার সাকলাবি পরিচারক ও সৈন্য ছিল। [১]

তারা খলিফার মৃত্যুকে সবার কাছ থেকে গোপন রাখল এবং প্রথমে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে মুগিরা বিন আন-নাসিরকে খলিফা বানানো হবে। তারপর তারা সালতানাতের উজির জাফর বিন উসমানকে আল-হাকামের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে মুগিরাকে খলিফা বানানোর প্রস্তাব পেশ করল। জাফর বিন উসমান সেই সময় তো এটাই প্রকাশ করল যে সে এই প্রস্তাবের সাথে পুরোপুরি একমত, কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে সে মুহাম্মদ বিন আবি আমির এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তাদের একত্রিত করল এবং তাদের জানাল যে সাকলাবি আমিরগণ উত্তরাধিকারীর বায়াত ভঙ্গ করেছে।

সে বলল: “যদি আমরা হিশামকে আমাদের প্রধান বানাই তবে আমরা কেবল নিরাপদই থাকব না বরং এই দুনিয়া আমাদের হাতেই থাকবে, তাই আমাদের মুগিরাকে হত্যা করে ফেলা উচিত।” মুহাম্মদ বিন আবি আমিরসহ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ কর্মকর্তা এতে একমত হলেন।

উজির জাফর বিন উসমান মুগিরাকে হত্যার দায়িত্ব মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের ওপর অর্পণ করলেন। তিনি কিছু সৈন্য নিয়ে তার প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। মুগিরা তখন পর্যন্ত আল-হাকামের মৃত্যুর খবরও জানতেন না। তিনি সরকারি কর্মকর্তা ও সৈন্যদের দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। ইবনে আবি আমির তাকে খলিফার মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে বললেন যে এখন দরবারের আমিরগণ তার হত্যার ফয়সালা শুনিয়ে দিয়েছেন।

মুগিরা বললেন: “আমি সব দিক থেকে নতুন খলিফার অনুগত ও বাধ্য। বায়াতের ওপর অটল আছি। আপনারা যেভাবে চান, আমার আনুগত্যের সত্যতা যাচাই করে নিন।”

মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের দয়া হলো। তিনি উজিরের কাছে বার্তা পাঠালেন যে মুগিরা থেকে কোনো বিপদ নেই, তাই আপনি অনুমতি দিন যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। উজির মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাকে ফিরতি চিঠিতে লিখে পাঠালেন:

“তুমি প্রতারিত হয়েছ। এই কাজ সম্পন্ন করো, অথবা সরে দাঁড়াও। অন্য কেউ তাকে হত্যা করবে।”

মুহাম্মদ বিন আবি আমির চুপ হয়ে গেলেন এবং এই চিঠি মুগিরাকে দেখিয়ে একপাশে সরে গেলেন। পরের মুহূর্তেই তার ইশারায় সৈন্যরা গলা টিপে সেই দুর্ভাগা শাহজাদাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল। [২]

এভাবেই একজন নির্দোষের লাশের ওপর এই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো যাতে খলিফা ছিলেন অসহায় আর সেনাবাহিনীর আমিরগণ সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বাস্তবতা হলো এই যে, আন্দালুসের উমাইয়াদের পতনের প্রথম লাইন সেদিনই লিখে দেওয়া হয়েছিল।

হিশাম বিন হাকাম যার বয়স তখন এগারো বছর ছিল, আল-মুয়ায়্যিদে বিল্লাহ উপাধি নিয়ে খলিফা হলেন। তিনি নির্জনতা প্রিয় ছিলেন। তিলাওয়াত এবং জিকির ও ইবাদতে বেশি সময় কাটাতে। প্রচুর পরিমাণে সদকা ও খয়রাত করতেন।

[১] সাকালিবা বা সাকলাবি ছিল সেই সব বালক যারা জিহাদের সময় খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো থেকে বন্দি হয়ে আসত এবং তাদের ইসলামি ও সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠান, খিলাফত প্রাসাদের দায়িত্ব এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হতো। এই বিভাগটিকে আল-হাকাম আউয়াল অনেক উন্নত করেছিলেন।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৬০, ২৬১।

যেহেতু সে তার উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরকে উজির বানিয়ে দিয়েছিল, তাই প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের শাসনের যুগ শুরু হয়। হিশাম বিন হাকাম নামেমাত্র প্রধান ছিল। তাকে রসমী খলিফা বলা হতো। মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের পূর্বপুরুষরা ইয়েমেনের মা’আফির গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারিক বিন জিয়াদের সাথে আন্দালুস বিজয়ে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের মধ্যে তারা অগ্রগণ্য ছিলেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এই পরিবার জ্ঞান ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিল। মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের দাদা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইশবিলিয়ার কাজী ছিলেন, আর তার পিতা আবু হাফস আন্দালুসের একজন নামকরা ফকিহ ছিলেন।

ইবনে আবি আমিরের জন্ম ৩২৯ হিজরিতে হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি খলিফা হাকাম সানির যুগে একজন সাধারণ আরজি লেখক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন, কিন্তু শীঘ্রই তার অসাধারণ যোগ্যতার কথা ছড়িয়ে পড়ে। হাকাম সানির স্ত্রী এবং যুবরাজ হিশামের মা ‘মালিকা সুবহ’ তাকে নিজের সচিব বানিয়ে নেন। এরপর খলিফা হাকাম সানি তাকে শাহজাদা হিশামের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। [১]

হিশাম সানির রাজ্যাভিষেক এবং ইবনে আবি আমিরের ক্ষমতা:

হাকাম সানির মৃত্যুর পর ৩৮ বছর বয়সে মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের ক্ষমতা শুরু হয়। এই উন্নতিতে মালিকা সুবহের পূর্ণ সমর্থন তার সাথে ছিল। নতুন খলিফা হিশামও তার অনুগত ছিল। এভাবে তিনি অসীম ক্ষমতা লাভ করেন। [২]

এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তিনি সর্বপ্রথম সেই সব সাকলাবি অফিসার ও খাদেমদের দমন করেন যারা মুগিরাকে খলিফা বানাতে চেয়েছিল। যেহেতু খিলাফতের প্রাসাদে সাকলাবিদের ব্যাপক প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, তাই ইবনে আবি আমির অত্যন্ত কৌশলের সাথে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের দুই বড় অফিসার ফায়িক এবং জাওয়ারকে কর্ডোভা থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং তারা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। তাদের এক অফিসার যখন বিদ্রোহ ছড়ানোর চেষ্টা করে, তখন ইবনে আবি আমির তাকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করান। এরপর তিনি অধিকাংশ সাকলাবিকে কর্ডোভা থেকে সরিয়ে দিয়ে খিলাফতের প্রাসাদে তাদের প্রভাব পুরোপুরি কমিয়ে দেন। [৩]

ইবনে আবি আমির এমন এক সময়ে আন্দালুসের রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন যখন সালতানাতে বিভক্তির সব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ইবনে আবি আমির ছাড়া অল্পবয়সী হিশামের পক্ষে একদিনও শাসন পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। বরং আশঙ্কা ছিল যে স্বার্থান্বেষী আমিররা বিদ্রোহ করে অনেকগুলো ছোট ছোট রাষ্ট্র বানিয়ে নেবে এবং খ্রিস্টান শাসকরা আন্দালুসের ওপর আক্রমণ শুরু করবে। তাই শাসনের পুরো নিয়ন্ত্রণ ইবনে আবি আমিরের হাতেই থেকে যায়।

তিনি সেনাবাহিনীকে নতুন করে সুসংগঠিত করেন এবং খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বারবার অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি এমন সব স্থানেও সেনাবাহিনী পাঠান যেখানে আন্দালুসের পূর্ববর্তী শাসকদের কখনো পৌঁছানোর সুযোগ হয়নি। এজন্য কিছু ঐতিহাসিকের মতে, তার যুগে আন্দালুসের উমাইয়া শাসন সেই শিখরে পৌঁছেছিল যা আব্দুর রহমান আন-নাসিরের যুগে ছিল।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/২৫৩-২৫৫; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৮৯, তাবা’ দারুল ফিকর।

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/২৬৫।

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল ইজারি আল-মাররাকুশি: ২/২৬৩-২৬৪।

যুগেও নসিব হয়নি। [১]

আল-জাহিরার নির্মাণ:

মুহাম্মদ বিন আবি আমির স্থাপত্যশৈলীর প্রতিও অনুরাগী ছিলেন। তিনি আবদুর রহমান আন-নাসিরের “মদিনাতুজ জাহরা” দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ৩৬৮ হিজরিতে কর্ডোভার পূর্বে “আল-জাহিরা” নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ শুরু করেন। এর একটি কারণ এও ছিল যে, মুহাম্মদ বিন আবি আমির কর্ডোভায় নিজেকে নিরাপদ মনে করতেন না, কারণ সেখানে তাঁর বিরোধী উমারা (অভিজাতরা) বিপুল সংখ্যায় বসবাস করত। যেহেতু কর্ডোভার সাধারণ মানুষ উমাইয়াদের প্রতি অনুরাগী ছিল, তাই এই বিরোধী উমারা যেকোনো সময় তাদের ইবনে আবি আমিরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে পারত।

৩৭০ হিজরিতে “আল-জাহিরা”র নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইবনে আবি আমির তাঁর পরিবার-পরিজন এবং অনুগত উমারাদের নিয়ে সেখানে বসবাস শুরু করেন। সরকারি দপ্তরগুলোও সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে একটি সামরিক ছাউনিও তৈরি করা হয়, যা মূলত বারবার এবং “সাকালিবা” জাতির লোকদের নিয়ে গঠিত ছিল। এভাবে এই নতুন শহরটি আন্দালুসের রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। [২]

জাফর বিন উসমানের বেদনাদায়ক পরিণতি:

প্রাক্তন উজির জাফর বিন উসমান সেই সময় সালতানাতের হাজিব ছিলেন এবং অত্যন্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। ইবনে আবি আমিরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পথে তিনিই ছিলেন একমাত্র বড় বাধা। মুহাম্মদ বিন আবি আমিরও তাঁর বিরুদ্ধে সুযোগ খুঁজছিলেন। এই সুযোগ তখন আসে যখন ৩৬৭ হিজরির শাবান মাসে খলিফা হিশাম বিন হাকাম জাফর বিন সুলাইমানকে পদচ্যুত করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। জাফর একজন চমৎকার সাহিত্যিক এবং প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি কারাগার থেকে ইবনে আবি আমিরের নামে গদ্য ও পদ্যে বেশ কিছু পত্র পাঠান যাতে দয়া প্রার্থনা করা হয়েছিল, কিন্তু ইবনে আবি আমির তাঁকে কোনো ছাড় দেননি। বরং তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁর সন্তান-সন্ততিকে নিঃস্ব করে দেন। [৩]

খ্রিস্টানদের ওপর ইবনে আবি আমিরের প্রভাব ও ভীতি:

মুহাম্মদ বিন আবি আমির একজন স্বাধীন রাজার ন্যায় ২৭ বছর শাসন করেন। অভ্যন্তরীণভাবে তিনি আন্দালুসের জনগণের এত সেবা করেন যে ছোট-বড় সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। তাঁর ঘর সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বিশাল দস্তুরখান বিছানো হতো যেখানে মেহমানদের বিভিন্ন ধরনের খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ইবনে আবি আমির দয়া, উদারতা, দানশীলতা ও মহানুভবতায় কারো চেয়ে কম ছিলেন না। তাই অফিসাররা তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর সৈন্যদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি অসংখ্য সৈন্যের নাম ও পরিচয় জানতেন, তাই তারা তাঁর এক ইশারায় যেকোনো অভিযানে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

এই অদম্য শক্তির মাধ্যমে এই শাসক কেবল সফলতার সাথে বহিঃশত্রুর বিপদ থেকেই রক্ষা করেননি বরং খ্রিস্টান...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৯০, ত. দারুল ফিকর

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৫৩৬

[৩] আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/২৬৭-২৬৮; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ২/১২৫

তারিখে উম্মতে মুসলিমা — পঞ্চম খণ্ড

সরকারগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রাখেন এবং ২৭ বছরে ৫২টি অভিযান পরিচালনা করেন। প্রতি বছর বসন্ত ও শরৎকালে বাহিনী রওনা হতো। প্রতিবারই চমৎকার বিজয় অর্জিত হতো। তাঁর প্রেরিত কোনো বাহিনীকে কোথাও পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়নি। তিনি অবাধ্য প্রতিপক্ষদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন যে, বিরোধীরা তাঁর নাম শুনেই প্রকম্পিত হতো।

ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে, আন্দালুসের ইতিহাসে কোনো খ্রিস্টান শাসকের ওপর এমন ভীতি সঞ্চার হয়নি যেমনটি মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তিনি প্রতিপক্ষের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রবক্তা ছিলেন। হাতেগোনা কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া তিনি শত্রুর সাথে কখনো সন্ধি করেননি এবং পূর্ণ বিজয় অর্জন না করে ক্ষান্ত হননি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অনেক খ্রিস্টান আমির তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অন্য খ্রিস্টান আমিরদের বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিতেন, তাদের দুর্গগুলো ধূলিসাৎ করতেন এবং টু শব্দ করার সাহস পেতেন না। [১]

মুহাম্মদ ইবনে আবি আমিরের যুগে আন্দালুসের বাহিনী এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, ৩৬ হাজার নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। জিহাদের জন্য যখন বাহিনী বের হতো, তখন স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদের মিলিয়ে তাদের সংখ্যা অনেক সময় এক লক্ষ ছাড়িয়ে যেত। [২]

লিওন রাজ্যের ওপর হামলা:

৩৭১ হিজরিতে (৯৮১ খ্রিস্টাব্দে) মুহাম্মদ ইবনে আবি আমির হেলমান্টিকার উত্তরে “সামোরা” দুর্গে পৌঁছান। যদিও দুর্গটি জয় করা সম্ভব হয়নি, তবে আশেপাশের শত শত গ্রাম দখলে চলে আসে। তৃতীয় রামিরো পালিয়ে ক্যাস্টিলে চলে যান এবং গার্সিয়া ফার্নান্দেজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। নাভারের শাসক সানচোও তাদের সাথে যোগ দেন এবং সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের মোকাবিলায় কাতারবন্দি হন। “রুয়েদা” (Rueda)-র বাইরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় যাতে খ্রিস্টানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুসলমানরা আরও অগ্রসর হয়ে “সিমানকাস” (Simancas) দুর্গ জয় করে নেয় এবং “লিওন”-এর রাজধানী পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করে। শহরটি প্রায় জয় হয়েই গিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে ইসলামী বাহিনীকে ফিরে আসতে বাধ্য করা হয়। [৩]

বাদশাহীর দিকে অগ্রসর হওয়া: জাফর বিন উসমানের হত্যাকাণ্ড:

এই অভিযান থেকে ফেরার পর ৩৭১ হিজরিতে ইবনে আবি আমির “হাজিব আল-মানসুর” উপাধি গ্রহণ করেন, মুদ্রায় নিজের নাম খোদাই করান এবং জুমার খুতবায় তাঁর জন্য দোয়া করা হতে থাকে। তিনি বাদশাহদের মতো রীতিনীতি গ্রহণ করেন। দরবারে নিজের হাত চুম্বনের প্রথাও চালু করেন। সাবেক উজির জাফর বিন উসমান যদিও এখন সম্পূর্ণ অসহায় ও নিরুপায় ছিলেন, তবুও ইবনে আবি আমির তাঁকে নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। [৪]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫২৩/১; তারিখ ইবনে খালদুন: ১৮৯/৪ থেকে ১৯১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫৭০/১

[৩] Dozy: Hist. Vol. II. p. 234-235; Recherches (3ème ed.) Vol. I. p. 180-181

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫৩০/১, ৫৩১

সুতরাং তাকে হত্যা করিয়ে তার লাশ তার পরিবার-পরিজনের কাছে হস্তান্তর করা হলো।

এটি ৩৭২ হিজরির ঘটনা। [১]

স্বায়ত্তশাসন:

জাফর বিন উসমানকে হত্যা করানোর পর মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের পথে আর কোনো বাধা রইল না। ফলে তিনি রানী সুবহের অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে খলিফা হিশাম বিন হাকামের সাথে সেই আচরণই করলেন যা তুর্কি জেনারেলরা মুতাওয়াঙ্কিল আলাল্লাহর পর দুর্বল আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে করেছিলেন। তিনি হিশামের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে রাজকীয় বাসভবনে অবরুদ্ধ করে দেন এবং নিজে একজন স্বাধীন সুলতানের মর্যাদা লাভ করেন। রানী সুবহ এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। [২]

আরও বিজয়:

বাদশাহ হওয়ার পর হাজিব মনসুর আরও অনেক বিজয় অর্জন করেন। তিনি প্রথমবারের মতো খ্রিস্টান রাষ্ট্র লিওন এবং আশেপাশের অনেক ছোট ছোট রাষ্ট্রকে ইসলামি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেন। বার্সেলোনা, কাস্টিল এবং নাভারেকে সম্পূর্ণ অনুগত ও করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ৩৭৪ হিজরিতে তিনি উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং বার্সেলোনা আক্রমণ করেন যা ৮৫ হিজরি থেকে খ্রিস্টানদের দখলে ছিল। দীর্ঘ যুদ্ধের পর সফর ৩৭৫ হিজরিতে বার্সেলোনা জয় করা হয় এবং এখানকার নওয়াব নিহত হন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতির কারণে এখানে দখল বজায় রাখা কঠিন ছিল, তাই ইসলামি বাহিনী শহরের প্রাচীর ও দুর্গ অকেজো করে দিয়ে ফিরে আসে।

মনসুরের যুদ্ধের ধরন পূর্ববর্তী খলিফাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তারা সাধারণত শত্রুর পক্ষ থেকে উস্কানির পর বাহিনী পাঠাতেন এবং দ্রুত সন্ধি করতে রাজি হয়ে যেতেন। কিন্তু মনসুর প্রায়ই নিজেই যুদ্ধের সূচনা করতেন এবং যথাসম্ভব শত্রুকে কোনো চুক্তি ছাড়াই পুরোপুরি পদানত করে তবেই ফিরতেন। এই সাফল্যের কারণে আন্দালুসের জনগণ তাকে “মনসুর আজম” বলতে শুরু করে। [৩]

লিওন ও জিলিকিয়া অভিযান:

উত্তর দিকের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে শাসক পরিবর্তন হলে সেখানে আবারও ষড়যন্ত্রের ধারা শুরু হয়। এটি দেখে ৩৭৮ হিজরিতে মনসুর উত্তর আন্দালুসের দিকে ঝোড়া গতিতে অগ্রসর হন। তিনি দুয়েরো নদী পার হয়ে “লিওন”-এর রাজধানীতে আক্রমণ করেন এবং তা জয় করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। এখানকার নওয়াব “জোনজ আলিফ” নিহত হন। এরপর বাহিনী জিলিকিয়ার অপরাজেয় শহর “সামুরা” পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেটিরও একই দশা করে। এভাবে খ্রিস্টানদের কাছে জিলিকিয়ার উত্তর-পশ্চিমে সামান্য এক টুকরো জমি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। [৪]

সেন্ট ইয়াকুব অভিযান:

৩৮৭ হিজরিতে মনসুর জানতে পারেন যে আন্দালুসের উত্তর-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে খ্রিস্টানদের একটি গির্জা...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/ ২৬৭, ২৬৮; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/ ১২৫

[২] আল-মুগরিব ফি হলি আল-মুগরিব: ১/ ১৯৫; আল-বায়ানুল মুগরিব: ২/ ২৭২, ২৭৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৫৩০, ৫৩১

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৪৪৮

“সেন্ট ইয়াকুব” হলো সেই স্থান যাকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর হাওয়ারী ইয়াকুব নামক কোনো বুজুর্গের মাজার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এর জিয়ারতের জন্য ইউরোপ পর্যন্ত মানুষ আসে। এর পাশাপাশি সেখানে গির্জাও ছিল।

মনসুর এই দ্বীপগুলোতে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ খ্রিস্টানদের গির্জা ও জেলখানাগুলোতেও মুসলিম বন্দীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো হতো, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীও ছিল। তাদের গির্জা ও পাদ্রীদের সেবার কাজেও লাগানো হতো। এই সত্যটি নিচের ঘটনা থেকে জানা যায়।

একবার মনসুরের একজন দূত খ্রিস্টান রাষ্ট্র ‘গ্যালিসিয়া’ সফরের সময় একটি গির্জায় যান। সেখানে তিনি এক অসহায় নারীকে দেখতে পান। দূত তার কুশল জিজ্ঞেস করলে সে বলল: “আমি এখানে বছরের পর বছর ধরে বন্দী। মনসুর কি তার ভোগবিলাসে আমাদের ভুলে গেছেন?” সে দূতকে কসম দিল যেন সে মনসুরকে তার অসহায় অবস্থার কথা অবশ্যই জানায়।

দূত ফিরে এসে মনসুরকে অবহিত করলে এই আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তি অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে সেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। রাষ্ট্রের শাসক ভীত হয়ে নিবেদন করল যে, আমাদের দ্বারা কী ভুল হয়েছে?

মনসুর বলে পাঠালেন: “তোমরা ওয়াদা করেছিলে যে কোনো মুসলিমকে বন্দী রাখবে না, কিন্তু তোমাদের অমুক গির্জায় একজন নারী বন্দী আছে। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের জমিন পদদলিত করব।”

খ্রিস্টান শাসক সেই নারীসহ আরও দুই নারীকে পাঠিয়ে দিলেন এবং পয়গাম দিলেন: “খোদার কসম! আমার তাদের বন্দী হওয়ার কোনো খবর ছিল না।” [১]

সম্ভবত মনসুর অন্যান্য গির্জা সম্পর্কেও খবর পেয়েছিলেন যে সেখানে মুসলমানরা বন্দী আছে এবং তাদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে।

যা-ই হোক, তিনি ৩৮৭ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে মহাসাগর অভিমুখে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। মানচিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তিনি সেই কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করেন। আন্দালুসের দক্ষিণ উপকূলে একটি নৌবহর প্রস্তুত করা হয় যাতে প্রচুর রসদ ছিল। এই নৌবহর পর্তুগালের উপকূল ঘেঁষে চলতে চলতে ডুরো নদীর মোহনায় প্রবেশ করে। এখানে স্থানে স্থানে সেতু তৈরি করে পদাতিক বাহিনীকে এগিয়ে নেওয়া হয়। সামনে একটি দেয়ালের মতো সোজা পাহাড় ছিল যাতে একটি সংকীর্ণ উপত্যকা ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। মনসুরের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার ও শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রমে এই উপত্যকা কেটে প্রশস্ত করে যাতে সৈন্যরা পার হতে পারে। পাহাড় অতিক্রম করার পর লঙ্কর খ্রিস্টানদের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু দুর্গ প্রথমবারের মতো জয় করে, যার মধ্যে সেন্ট পেলাও এবং রদ্রিগোও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উপকূলের সমস্ত বিরোধীদের দমন করার পর নৌবাহিনী মহাসাগরেও অভিযান চালায় এবং কোয়েমব্রা, ভিসিউ, ব্রাগা, সেন্ট ব্রায়াক এবং মাকলাশ দখলের পর অবশেষে লঙ্কর তাদের গন্তব্য সেন্ট ইয়াকুব-এ পৌঁছায়। খ্রিস্টানরা তা খালি করে দিয়েছিল। সেন্ট ইয়াকুবের কল্পিত কবরের ওপর কেবল একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসে ছিল।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাকুশি, ২/২৯৭, ২৯৮।

মনসুর জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কোথাকার?” সে বলল: “ভেনিসের।” মনসুর তাকে কিছু বললেন না এবং মাজারের ওপর কিছু সৈন্য নিযুক্ত করে দিলেন যাতে ভবিষ্যতে এখানে শিরকপূর্ণ রীতিনীতি না হয়। মনসুর আটলান্টিক মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপ দখল করে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হলেন। ফ্রান্সের উপকূলেও বেশ কিছু সফলতা অর্জন করলেন, অনেকগুলো দুর্গ জয় করলেন এবং বিরোধীদের ষড়যন্ত্রমূলক ক্যাম্পগুলো ধ্বংস করে দিয়ে ফিরে আসলেন। [১]

আফ্রিকায় সফলতা:

মনসুর আজম ৩৮৩ হিজরিতে আফ্রিকার উপকূলেও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন, বনু ইদ্রিসের ইবনে ঘানুন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করেছিল। মনসুর সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। সানহাজি সর্দার জিরি বিন আতিয়াও আল-মনসুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাকেও মাথা নত করতে হলো। এভাবে মনসুর আজম সমস্ত বিরোধীদের দমন করলেন। [২]

খলিফার শোভাযাত্রা:

মনসুর আজম যদিও তার ন্যায়বিচার, রাষ্ট্র পরিচালনা এবং জিহাদি অভিযানের কারণে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে ব্যথিত ছিল যে, তিনি খলিফা হিশামকে জিম্মি করে রাষ্ট্রের কাজকর্ম থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য মনসুর আজম একদিন খলিফা হিশামের উপস্থিতির জন্য এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন। খলিফাকে রাজকীয় পোশাক ও মুকুট পরিধান করিয়ে অলঙ্কৃত ঘোড়ায় সওয়ার করালেন এবং নিজে প্রধান মন্ত্রিত্বের দণ্ড হাতে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে সাথে চললেন।

যেহেতু এই শোভাযাত্রার ঘোষণা আগেই করা হয়েছিল, তাই খলিফাকে দেখার জন্য শুধু কর্ডোবা নয় বরং অন্যান্য শহরের জনগণও এসে পৌঁছাল এবং কর্ডোবার রাস্তায় তিল ধারণের জায়গা রইল না। আন্দালুসের জনগণ তাদের খলিফার দর্শন পেয়ে এবং মনসুর আজমকে তার সাথে খাদেম হিসেবে পায়ে হেঁটে চলতে দেখে সন্তুষ্ট হলো এবং শাসন ব্যবস্থার ওপর তাদের আস্থা ফিরে এল। [৩]

মৃত্যু:

মনসুর তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বার্ধক্য, দুর্বলতা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। সফর ৩৯৩ হিজরিতে (ডিসেম্বর ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি শেষবারের মতো জিহাদের জন্য বের হলেন, নিয়ম অনুযায়ী নিজের কাফন যা তিনি তার মেয়েদের দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন, সাথে ছিল। এবার তিনি কাস্তিলের বিরুদ্ধে জোরালো অভিযান চালান এবং গৌরবময় বিজয়ের পর ফিরে আসেন। কিন্তু পথে রোগের তীব্র আক্রমণ হলো এবং তিনি ঘোড়ায় চড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন। খাদেমরা তাকে একটি খাটিয়ায় শুইয়ে কাঁধে করে নিয়ে চলল, পথেই রমজান মাস শুরু হয়ে গেল। লস্কর “মদিনা সালিম” পৌঁছালে মনসুরের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এল এবং এখানেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

[১] আল-বায়ানুল মাগরিব: ২/ ২৯৫ থেকে ২৯৭

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৫৩৫ থেকে ৫৩৭

[৩] আল-মাগরিব ফি হলিল মাগরিব, লি-আবুল হাসান আল-মাগরিব আল-আন্দালুসি (মৃ. ৬৮৫ হি.): ১/ ৪০১, তাবা দারুল মাআরিফ কায়রো

...করে দিলেন। এটি ২৮ রমজানুল মুবারক ৩৯২ হিজরি (১০ আগস্ট ১০০২ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। তাকে সেই কাফনই পরানো হলো যা তিনি ঘর থেকে সাথে নিয়ে বের হয়েছিলেন।

[১]

ধর্মীয় অনুভূতি:

মনসুর আজম একজন আত্মমর্যাদাশীল এবং দৃঢ় চিন্তার অধিকারী মুসলিম ছিলেন। খলিফা হাকাম সানি কর্তৃভার রাজকীয় গ্রন্থাগারে লক্ষ লক্ষ বই সংগ্রহ করেছিলেন, যার মধ্যে অমুসলিম পণ্ডিত, দার্শনিক এবং নাস্তিকদের রচনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। মনসুর আজম এই ধরনের বইগুলোকে ইসলামি সমাজের জন্য বিপজ্জনক মনে করে নিজের তত্ত্বাবধানে ধ্বংস করে দেন। [২]

তিনি জিহাদি সফরে সর্বদা নিজের হাতে লেখা পবিত্র কুরআনের একটি কপি সাথে রাখতেন এবং তা তিলাওয়াত করতেন। [৩]

তিনি তাঁর ২৭ বছরের জিহাদি অভিযানে কাপড়ে লেগে থাকা ধুলোবালি ঝেড়ে একটি থলিতে জমা করতেন। তাঁর ওসিয়ত ছিল যে, তাঁর লাশের ওপর এই ধুলো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর পর যখন সেই থলিটি তোলা হলো, তখন সেটি এতই ভারী হয়ে গিয়েছিল যে তাতে থাকা মাটি দিয়ে একটি ইট তৈরি করা সম্ভব ছিল। [৪]

জিহাদের পথের এই অমূল্য ধুলো, যার উপস্থিতিতে নবী আল-মালাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের আগুন স্পর্শ না করার সুসংবাদ দিয়েছেন, তা এই মুজাহিদ ব্যক্তির শরীরের ওপর ছিটিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে মদিনা সালেমেই দাফন করা হলো।

মনসুর আজমের গোয়েন্দা ব্যবস্থা:

মনসুর আজম অত্যন্ত সচেতন প্রশাসক এবং অত্যন্ত সতর্ক শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শত্রুদের এমন সব চাল ব্যর্থ করে দিতেন যেগুলোর সাফল্য শত্রুদের কাছে নিশ্চিত মনে হতো। তাঁর সাফল্যের একটি বড় কারণ ছিল সফল গোয়েন্দা ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শত শত সংবাদাতা উপস্থিত ছিল। শত্রুদের সারিতে এবং তাদের গোপন মজলিসগুলোতেও মনসুর আজমের গোয়েন্দারা শরিক থাকত এবং তাঁকে মুহূর্তের খবর পৌঁছে দিত।

৩৮৭ হিজরি (৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা, তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। এক রাতে কোনো এক স্থানে যাত্রাবিরতি করলেন এবং একজন সৈন্যকে নির্দেশ দিলেন যেন সে তিয়াস গিরিপথে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেখান দিয়ে যে ব্যক্তিই অতিক্রম করবে তাকে গ্রেপ্তার করে তাঁর সামনে হাজির করে। শীতের অন্ধকার রাত ছিল, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। সৈন্যটি সারা রাত সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু কোনো লোক অতিক্রম করল না। ভোরের আলোয় সে মনসুর আজমকে তার কাজের রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ফেরার ইচ্ছা করছিল, এমন সময় সে এক বৃদ্ধ লোককে তার গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখল। সৈন্যটি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল: “তুমি কে?”

বৃদ্ধ উত্তর দিল: “আমি একজন দরিদ্র মানুষ, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে সেগুলো বিক্রি করে কোনোমতে জীবন অতিবাহিত...”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫৬৬/১

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনুল আজারি আল-মাররাকুশি: ২৯২/২

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫৭৭/১

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৯/১৭, ত. আর-রিসালাহ

৪৭৬ তারিখ উম্মতে মুসলিমা

“...জীবন অতিবাহিত করি।” সৈনিকটি এই ভেবে যে, এমন নিঃস্ব ও অসহায় বৃদ্ধের কাছ থেকে কী বিপদ হতে পারে, তাকে ছেড়ে দিল। বৃদ্ধ কিছুটা দূরে চলে যাওয়ার পর সৈনিকের হঠাৎ মানসুর আজমের সেই কথাগুলো মনে পড়ল যে, “যে ব্যক্তিই এখান দিয়ে যাবে তাকে গ্রেফতার করে আমার সামনে হাজির করো।” ফলে সৈনিক দৌড়ে তার পেছনে গেল এবং তাকে ধরে মানসুর আজমের কাছে নিয়ে এল।

মানসুর আজম সারা রাত কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির গ্রেফতারের অপেক্ষায় জেগে ছিলেন। সেই বৃদ্ধকে দেখামাত্রই তল্লাশি চালানো হলো কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। এরপর তিনি নির্দেশ দিলেন যে, গাধার জিনের (পাদান) তল্লাশি নাও। জিনটি হাতড়ানোর পর একটি চিরকুট পাওয়া গেল যাতে প্রতিপক্ষকে ইসলামের লশকর বা বাহিনীর এমন সব গোপন তথ্য জানানো হয়েছিল যা ফাঁস হয়ে গেলে পুরো ইসলামী বাহিনী শত্রুর ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে যেতে পারত। মানসুর আজম এই সময়োচিত উদ্ঘাটনের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারীদের গ্রেফতার করে হত্যা করালেন। এভাবে সফল গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে শত্রুর চাল থেকে বাঁচার বহু ঘটনা মানসুর আজমের জীবনের অংশ। [১]

সহ্যশক্তি:

আল্লাহ তাআলা মানসুর আজমকে অসাধারণ সহ্যশক্তি দান করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, একবার তাঁর পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল, চিকিৎসকরা লোহা দিয়ে ছঁয়াকা (দাগ দেওয়া) দিয়ে এর চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। মানসুর আজম তাঁর দরবারে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় চিকিৎসক উপস্থিত হলেন। মানসুর সময়ের স্বল্পতার কারণে তাকে ইশারা করলেন যে, তুমি এই অবস্থাতেই তোমার কাজ শুরু করে দাও। চিকিৎসক লোহা গরম করে পায়ে ছঁয়াকা দিতে শুরু করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানসুর আজমের কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দিল না। চেহরায়ও কোনো পরিবর্তন প্রকাশ পেল না।

অনেক আমীর চিকিৎসকের দিকে মনোযোগী ছিলেন না, ফলে তাদের ধারণাই ছিল না যে কী হচ্ছে। যখন মাংস পোড়ার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল তখন তারা জানতে পারলেন যে মানসুর আজমের পায়ে ছঁয়াকা দেওয়া হচ্ছে। [২]

ন্যায়বিচারের এক অদ্ভুত ঘটনা:

মানসুর আজমের ন্যায়বিচার ছিল দৃষ্টান্তমূলক, জনগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে তাঁর ন্যায়বিচার মানুষ ছাড়াও পশু-পাখি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইবনে হাইয়ান এই প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, প্রাচ্যের এক বণিক কয়েকটি অত্যন্ত মূল্যবান ইয়াকুত (চুনি) নিয়ে আন্দালুসে পৌঁছান, এই ইয়াকুতগুলো একটি লাল থলিতে সংরক্ষিত ছিল। কর্ডোভার (কুরতুবা) কাছে একটি খালের পাড়ে তিনি গোসলের জন্য কাপড় খুললেন এবং সেই থলিটিও পাশে রাখলেন, হঠাৎ একটি চিল এসে ছোঁ মেরে থলিটি নিয়ে গেল।

বণিক কাঁদতে কাঁদতে কর্ডোভায় প্রবেশ করলেন। লোকজন তাঁকে মানসুরের দরবারে ফরিয়াদ করার পরামর্শ দিল। বণিক বারবার বলছিলেন যে, উজির-এ-আজম মানুষের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি দিতে পারেন কিন্তু পশু-পাখির ওপর তাঁর কী নিয়ন্ত্রণ চলবে? কিন্তু মানুষের ক্রমাগত পিড়াপিড়িতে তিনি অবশেষে দরবারে হাজির হলেন এবং নিজের দুঃখের কাহিনী শোনালেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৯০, ২৯১

[২] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/৩০০, ৩০১ ত ত দারুস সাকাফাহ বৈরুত

মনসুর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন: “খলিটি ছিনিয়ে নেওয়ার পর চিলটি কোন দিকে উড়ে গিয়েছিল?”

ব্যবসায়ী দিকটি জানালে মনসুর সেই দিকে অবস্থিত শহরগুলোর পুলিশ কর্মকর্তাদের তলব করলেন এবং তাদের আদেশ দিলেন যে, তারা যেন খুঁজে বের করে সাম্প্রতিক কয়েক দিনে কোনো ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হয়েছে কি না?

পুলিশ কর্মকর্তারা গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তদন্ত করে জানালেন যে, “অমুক শ্রমিক যে কয়েক দিন আগে পর্যন্ত একেবারে নিঃস্ব ছিল, সে নতুন কাপড় পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, স্ত্রী-সন্তানদেরও নতুন কাপড় পরিয়েছে এবং সওয়ারির জন্য সে একটি খচ্চরও কিনেছে।”

মনসুর অবিলম্বে সেই শ্রমিককে ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শ্রমিক স্বীকার করল যে সে ইয়াকুতের খলিটি পেয়েছে, যেখান থেকে সে কিছু খরচ করে ফেলেছে।

মনসুর ব্যবসায়ীর মাধ্যমে খলিতে থাকা জিনিসগুলো শনাক্ত করালেন এবং নিশ্চিত হওয়ার পর খলিটি তার হাতে তুলে দিলেন। নিজের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীকে দশ দিনার দিলেন এবং শ্রমিককে তার সত্য কথা বলার পুরস্কার হিসেবে দশ দিনার প্রদান করলেন এবং সেই সাথে বললেন: “যদি তুমি খলিটি পাওয়ার সাথে সাথেই খবর দিতে, তবে তুমি আরও বেশি পুরস্কারের হকদার হতে।” [১]

হায়, যদি এই কবরের অধিবাসী.....!

যেহেতু খ্রিস্টানরা মনসুর আল-আজমের জিহাদের জজবার কারণে তার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিল, তাই ইসলামী আন্দালুসের পতনের যুগে যখন খ্রিস্টানরা আলফান্সোর নেতৃত্বে মদিনা সালিম দখল করে নিল, তখন আলফান্সো মনসুর আল-আজমের কবরের ওপর তার সিংহাসন স্থাপন করল এবং সিংহাসনে হেলান দেওয়ার বালিশ লাগিয়ে তার রানীর সাথে তার ওপর বসল।

সেই সময় সেখানে শুজা নামক এক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, যাকে সম্বোধন করে আলফান্সো বলল: “তুমি কি দেখেছ আমি মুসলিম জনপদগুলো দখল করে নিয়েছি এবং আমার সিংহাসন তাদের বাদশাহর কবরের ওপর এনে স্থাপন করেছি।”

মুসলমান ব্যক্তিটি উত্তর দিলেন: “মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর বসা কোন বীরত্বের কাজ? হায়! যদি এই কবরের অধিবাসী আজ জীবিত থাকতেন এবং তোমার সামনে একটি শ্বাসও নিতেন, তবে তোমার জন্য এই সিংহাসনে টিকে থাকা কঠিন হয়ে যেত।”

এটি শুনে আলফান্সো রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। সে সেই মুসলমানকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, এমন সময় তার রানী বাধা দিয়ে বলল: “সে তো সত্যই বলছে। তোমার মতো একজন বাদশাহর কি এমন আশ্চর্যজনক করা শোভা পায়?” [২]

সেই খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর পরিচয় যাদের সাথে জিহাদ চলত:

৩৯২ হিজরিতে হাজিব আল-মনসুরের ইন্তেকালের পর উত্তর দিকের খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে ঢুকে আক্রমণাত্মক অভিযানের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে মুসলমানরা কেবল নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে থাকে। ৩৯২ হিজরি পর্যন্ত যে খ্রিস্টান এলাকাগুলো প্রায়শই মুসলমানদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল, এখানে সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হচ্ছে যা আমাদের ভবিষ্যতের পরিস্থিতি বুঝতেও সাহায্য করবে।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ২/২৯১, ২৯২।

[২] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব লিল মাঙ্কারি আত-তিলমিসানি: ১/৩৯৯।

বার্সেলোনা (Barcelona): এটি আন্দালুসের উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় শহর ছিল। ১৮৫ হিজরিতে এটি মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাকাম আউয়াল, আবদুর রহমান সানি এবং মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান এর দিকে অভিযান পাঠিয়েছিলেন কিন্তু শহরটি খ্রিস্টানদের দখলেই থেকে যায়।

বুরতানিয়া (Boltana): এটি দক্ষিণ ফ্রান্সে কোহ আলবার্তের পাদদেশে একটি শহর ছিল। ১৭৬ হিজরিতে হিশাম আউয়াল, ২৩৬ হিজরিতে আবদুর রহমান সানি এবং ২৫৯ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান এখানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন।

আরবুনা, জিরুন্দা (Gironde): এগুলোও দক্ষিণ ফ্রান্সের শহর ছিল, যেখানে বারবার আক্রমণ করা হয়েছিল।

পামপ্লোনা: এটি খ্রিস্টান রাজ্য “নাভার” (নাফার) এর রাজধানী ছিল। এই এলাকাটি “বাসকুনিস” নামেও পরিচিত ছিল। এখানে ২২৯ হিজরিতে আবদুর রহমান সানি এবং ২৩৭ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান জিহাদ করেছিলেন।

আল-কিলা অর্থাৎ কাস্টিল: এখানে হিশাম আউয়ালের যুগে ১৭৫ হিজরি এবং ১৭৮ হিজরিতে জিহাদ হয়েছিল। আবদুর রহমান সানি ২০৮ হিজরিতে এখানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ২২৩ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আল-বালানসি এখানে আক্রমণ করেছিলেন। ২৩৬ হিজরিতে আমির মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান এখানে নিজে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন, ২৩১ হিজরিতে তিনি মুসা বিন মুসাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, ২৩৯ হিজরিতে আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আউয়াল এবং ২৫১ হিজরিতে মুনজির বিন মুহাম্মদ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন।

গ্যালিসিয়া: এখানে ১৭৬ হিজরি, ১৭৮ হিজরি, ১৮৫ হিজরি, ২২৩ হিজরি, ২৩১ হিজরি এবং ২৫১ হিজরিতে সফল আক্রমণ হয়েছিল। ২৬৩ হিজরির একটি অভিযানে এখানে শত শত মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ২৬৪ হিজরিতে পুনরায় সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল।

মায়োর্কা, মেনোর্কা, ইবিজা: এগুলো আন্দালুসের পূর্বে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং আন্দালুসের বন্দর “দানিয়া” (Denia) এর নিকটবর্তী। এখানে হাকাম আউয়ালের যুগে ১৮২ হিজরি এবং ২০০ হিজরিতে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়েছিল, এরপর আমির আবদুর রহমান সানি ২৪৩ হিজরিতে এগুলো জয় করেছিলেন কিন্তু বিজয়ের পূর্ণতা ২৯৫ হিজরিতে হয়েছিল। আল্লামা হুমাইদি (মৃত্যু ৪৮৮ হিজরি) যিনি আন্দালুসের ইতিহাসের ওপর “জাদওয়াতুল মুকতাবিস” লিখেছেন, তিনি মায়োর্কার অধিবাসী ছিলেন। [১]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আবদুর রহমান আলি: পৃ. ২৩৬ থেকে ২৪৭।

আবদুল মালিক হাজিব আল-মুজাফফর

৩৯২ হিজরি থেকে ৩৯৯ হিজরি

(১০০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দ)

মনসুর আজম তাঁর তরুণ পুত্র আবদুল মালিককে উত্তরসূরি নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁর জন্ম ৩৬৪ হিজরিতে হয়েছিল। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর ২৮ বছর বয়সী আবদুল মালিক কার্যত দেশের শাসক হন, অন্যদিকে খলিফার আনুষ্ঠানিক পদটি পূর্বের ন্যায় হিশাম মুয়াইয়িদ বিল্লাহর কাছেই থেকে যায়। [১]

খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়িদের সিংহাসন আরোহণ:

এই সময়ে সাধারণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে দাবি জানান যে খলিফার ক্ষমতা পুনর্বহাল করা হোক। যেহেতু খলিফা হিশাম নিজে নির্জনবাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই জনগণকে প্রতিবাদমুখর দেখে তিনি এক সাধারণ দরবার আহ্বান করেন এবং আবদুল মালিককে সেই সমস্ত ক্ষমতা প্রদানের ঘোষণা দেন যা তাঁর পিতার ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় নির্জন জীবন অতিবাহিত করছেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তবুও সন্তুষ্ট হয়নি এবং জেদ ধরে যে এখন খলিফাকেই নিজে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হবে। পরিশেষে আবদুল মালিক শক্তি প্রয়োগ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। [২]

জিহাদি কীর্তিসমূহ:

আবদুল মালিক তাঁর পিতার মতোই সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর নেতৃত্বে দেশ শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়। আবদুল মালিক সেনাবাহিনীতে বারবারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং এই নতুন শক্তির সাহায্যে উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর ওপর বেশ কিছু আক্রমণ চালান। শাবান ৩৯৩ হিজরিতে তিনি “আল-জাহরা” থেকে বের হন এবং তাঁর প্রথম অভিযানে রওনা হন। এই অভিযানে তিনি “বার্সেলোনা”র আশপাশের ছয়টি দুর্গ জয় করেন এবং ৮টি দুর্গ ধ্বংস করেন এবং ৫ হাজার ৭৫ জন বন্দীকে নিয়ে ফিরে আসেন।

এই জিহাদের সময় একদিন আবদুল মালিক একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন। মানজানিকসমূহ থেকে দুর্গের ওপর পাথর বর্ষণ করা হচ্ছিল এবং কাছেই আবদুল মালিক আমিরদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসেছিলেন। হঠাৎ একটি মানজানিকের পাথর ছিটকে ফিরে আসে...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬০৮/১

[২] নিহায়াতুল আরাব লিন নুওয়াইরি: ২৪ / ৩০৭, প্রকাশনা: দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল কওমিয়াহ

...এবং আব্দুল মালিক থেকে মাত্র দুই বিঘত দূরে এসে পড়ল। অসংখ্য মানুষ এর কবলে পড়ে প্রাণ হারাল। আব্দুল মালিক অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। [১]

শানজাহ গার্সিয়ার সাথে বিরোধ এবং দ্বিতীয় অভিযান:

আব্দুল মালিকের শাসনামলে কাস্টিল ও নাভারের ধূর্ত ও বৃদ্ধ শাসক শানজাহ গার্সিয়া আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর কারণ ছিল এই যে, সেই সময় লিওনের শাসক ছিল এগারো বছর বয়সী পঞ্চম আলফনসো, যার অভিভাবকত্ব ছিল গ্যালিসিয়ার শাসক কাউন্ট মেনেন্দেজের হাতে। কিন্তু শানজাহ, পঞ্চম আলফনসোর মামা হওয়ার সুবাদে এই অভিভাবকত্ব নিজে পেতে চেয়েছিলেন। অবশেষে মামলাটি আব্দুল মালিকের আদালতে পেশ করা হয়, যেখানে খ্রিস্টানদের বিচারক ওসামা বিন আসবাগ কাউন্ট মেনেন্দেজের অভিভাবকত্ব বহাল রাখেন।

শানজাহ গার্সিয়া এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে আব্দুল মালিকের বিরোধী হয়ে ওঠেন। অবশেষে ৩৯৪ হিজরিতে আব্দুল মালিক তার রাজ্যে আক্রমণ করেন, যার ফলে শানজাহ গার্সিয়াকে নিজে কর্ডোভায় উপস্থিত হয়ে শান্তি চুক্তি এবং যুদ্ধে সহযোগিতার অঙ্গীকার নবায়ন করতে হয়। [২]

অন্যান্য অভিযান এবং ক্লুনিয়ার যুদ্ধ:

৩৯৫ হিজরিতে আব্দুল মালিক উত্তরে গ্যালিসিয়ার প্রাক্তন কেন্দ্র “সামোরা” পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ৩৯৬ হিজরিতে “পামপ্লোনা” আক্রমণ করেন। ৩৯৭ হিজরিতে কাস্টিলের শাসক শানজাহ গার্সিয়া এবং লিওনের শাসক পঞ্চম আলফনসোসহ বেশ কয়েকজন খ্রিস্টান আমির আবারও কর্ডোভার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন, কিন্তু আব্দুল মালিক দ্রুত অগ্রসর হয়ে ক্লুনিয়ার ময়দানে তাদের সবাইকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই বিজয়গুলোর কারণে আব্দুল মালিক “আল-মুজাফফর” উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। [৩]

এই যুগে ইসলামী আন্দালুসের অবস্থা:

আব্দুল মালিকের আমলে বিজয়ের প্রাচুর্যের কারণে ইসলামী আন্দালুসে ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির এমন জোয়ার এসেছিল যা আগে কখনো দেখা যায়নি। মানুষ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করছিল। গড় আয় ছিল বেশি এবং ব্যয় ছিল কম। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করছিল, অন্যদিকে বিত্তবানদের মধ্যে অতিরিক্ত সম্পদ ভাঙারে জমা করা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে নাচ-গানে পারদর্শী দাসীদের চড়া দামে কেনার রেওয়াজও বেড়ে যায়। ফলে এমন দাসীদের দাম অনেক বেড়ে যায়। দুনিয়ার চাকচিক্য মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল এবং তারা এই পার্থিব জাহ্নামে ভবিষ্যতের বিপদ সম্পর্কে অসচেতন হয়ে বিলাসিতার দোলনায় দুলতে মগ্ন ছিল। [৪]

উজির ঈসা বিন সাঈদের পরিণতি:

মানসুর আল-আজমের সময় থেকেই সরকারি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ঈসা বিন সাঈদ ওরফে ইবনে কাত্তাহ-এর হাতে ছিল। আব্দুল মালিকের আমলে উজির হিসেবে তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পরবর্তীতে আব্দুল মালিক এবং তার মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। কথা এখানে...

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল আযারি আল-মাররাবুশি, ৩/৫ থেকে ১০।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬১১।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬০৭ থেকে ৬১৩।

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬০৮।

...পর্যন্ত বেড়ে গেল যে ইবনে কাত্তাহ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু উমাইয়া রাজপুত্র হিশাম বিন আব্দুল জব্বার (বিন আব্দুর রহমান আন-নাসির)-কে খলিফা বানানোর ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেন। কিন্তু আব্দুল মালিক সময়মতো খবর পেয়ে যান এবং তিনি ইবনে কাত্তাহকে কোনো এক বাহানায় নিজের কাছে ডেকে এনে হত্যা করেন। এই ঘটনা ২০ রবিউল আউয়াল ৩৯৭ হিজরির। এরপর রাজপুত্র হিশাম বিন আব্দুল জব্বারকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। [১]

শেষ অভিযান ও মৃত্যু:

সফর ৩৯৮ হিজরিতে আব্দুল মালিক কাস্তালিয়ার ওপর শেষ আক্রমণ করেন এবং দুয়েরা নদীর তীরে অবস্থিত সেন্ট মার্টিন দুর্গ ঘেরাও করেন। দুর্গের সেনাবাহিনী বাইরে বেরিয়ে মোকাবিলা করলেও পরাজিত হয়ে দুর্গের ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আব্দুল মালিক পাথর নিক্ষেপ করে দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ফেলেন এবং মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে দুর্গ দখল করে নেয়। এখানকার সমস্ত সৈন্যদের হত্যা করা হয়।

এই অভিযান থেকে তার প্রত্যাবর্তন রবিউস সানি মাসে হয়েছিল। রমজান মাস অতিবাহিত করার পর তিনি আবারও জিহাদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু মদিনা সালামে পৌঁছাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার অপেক্ষায় সেখানে অনেক দিন কেটে গেল। এই সময়ে লস্করের স্বেচ্ছাসেবকরা বিরক্ত হয়ে পড়ল এবং তাদের একটি বড় অংশ বাড়ি ফিরে গেল। এটি দেখে আব্দুল মালিক অভিযান স্থগিত করে দেন এবং ৩৯৯ হিজরির মহররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে কর্ডোভায় ফিরে আসেন। তিন সপ্তাহ পর তিনি আবারও জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু কর্ডোভা থেকে বের হতেই অসুস্থতা বেড়ে যায় এবং তাকে ফিরে আসতে হয়। রোগের তীব্রতায় নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, যার পর ১৬ সফর (৩১ অক্টোবর ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি ইন্তেকাল করেন। তার বয়স ছিল ৩৩ বছর। [২]

মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, তার সৎ ভাই আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ তাকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। [৩]

আব্দুল মালিকের চরিত্র ও শাসনকালের ওপর এক নজর:

আব্দুল মালিকের শাসনের সূচনা ৩৯২ হিজরির রমজান মাসের শেষের দিকে হয়েছিল। এভাবে তার শাসনের মেয়াদ ছয় বছর সাড়ে চার মাস হয়। তিনি নিজের গুনাহের ওপর কান্নাকাটি করতে এবং প্রচুর তওবা ও ইস্তেগফার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। আলেম ও নেককারদের মজলিসে বসতেন এবং তাদের কাছ থেকে দোয়া নিতেন। নাবিয পান করা তার একটি বড় দুর্বলতা ছিল, তবে তার গুণাবলি ত্রুটিগুলোর ওপর প্রবল ছিল। তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শরিয়ত বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন। প্রজাদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। তিনি সরকারি কর্মের ষষ্ঠ অংশ মওকুফ করে জনগণের মন জয় করে নিয়েছিলেন। মানুষ তাকে ভালোবাসত। [৪]

উমাইয়া যুগের মহান শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন শেষ ব্যক্তি। এরপর আন্দালুসের মুসলমানরা এত দ্রুত পতন ও বিশৃঙ্খলার শিকার হয় যে, কয়েক বছরের মধ্যে পুরো আন্দালুস ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব: ৩/ ৩৭ থেকে ৩৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬১৯

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯০, তাবা দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬১৫, ৬১৯

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব: ৩/ ৩৭

[৪] আল-বায়ানুল মুগরিব: ৩/ ৩

আন্দালুসের উমাইয়াগণ পতনের যুগ

১. হাজিব আবদুর রহমান শানজুল: (সফর থেকে জমাদিউল আউয়াল ৩৯৯ হিজরি - অক্টোবর ১০০৮ থেকে জানুয়ারি ১০০৯ খ্রিস্টাব্দ)

আবদুল মালিকের আকস্মিক মৃত্যুর পর তার সৎ ভাই আবদুর রহমান শানজুল আন্দালুসের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন কর্ডোভার কটুর বিরোধী খ্রিস্টান শাসক শানজাহ ফারসিয়া (কাস্টিলের রাজা)-র নাতি। শানজাহ ফারসিয়া অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন। কখনো মুসলমানদের সাথে সন্ধি করতেন আবার কখনো অস্ত্র তুলে নিতেন। এক সন্ধির সময় তিনি তার মেয়ে “আবদাহ”-কে মানসুর আল-আজমের সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। এই মেয়েটি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মানসুর আল-আজমের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলেন। আবদুর রহমান শানজুল ছিলেন তারই সন্তান। যেহেতু চেহারা ও অবয়বে তিনি তার নানা শানজাহ ফারস্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, তাই মানুষ তাকে “শানজুল” অর্থাৎ ছোট শানজাহ বলে ডাকত। ৩৮২ হিজরিতে যখন শানজাহ ফারসিয়া সন্ধি নবায়নের জন্য কর্ডোভায় আসেন, তখন আবদুর রহমান শানজুল ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। ১২ বছর পর ৩৯৪ হিজরিতে শানজাহ হাজিব আবদুল মালিকের সাথে সন্ধি নবায়নের জন্য আবারও কর্ডোভায় আসেন। তখন তার নাতি যৌবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছিলেন। শানজাহ এটা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন যে, আন্দালুসের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে তার বংশও অংশীদার হতে যাচ্ছে। [১]

শানজাহর রাজনীতি সফল হয়েছিল এবং আবদুল মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার নাতি আন্দালুসের সর্বসর্বা হয়ে ওঠেন। জনশ্রুতি ছিল যে, তিনিই আবদুল মালিককে বিষযুক্ত শরবতের মাধ্যমে হত্যা করেছিলেন। [২]

শাসক হয়ে আবদুর রহমান শানজুল মুসলমানদের দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান। আন্দালুসে সরকারের মর্যাদা এবং শাসকের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায়। সাধারণ জনগণ ধৈর্য ও সহনশীলতা হারিয়ে ফেলে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দূরদর্শিতা থেকে বঞ্চিত হন।

আবদুর রহমান শানজুল জোরপূর্বক সিংহাসন দখল করেছিলেন। নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক থেকে তিনি একেবারেই অযোগ্য ছিলেন। তার পুরো সময় খেলাধুলা এবং ভোগ-বিলাসে কাটত। ফলে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে।

হাজিব আল-মানসুর এবং আবদুল মালিক তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের জন্য “খিলাফত” অর্জন করার বা খলিফার উত্তরাধিকারী হওয়ার চেষ্টা করেননি, কিন্তু আবদুর রহমান শানজুল সিংহাসনে আরোহণের কিছু দিন পরেই খলিফা হিশামের কাছে দাবি শুরু করেন যে, তিনি যেন তাকে খিলাফতের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। হিশাম ইতস্তত করেছিলেন কিন্তু আবদুর রহমান শানজুল চাপ প্রয়োগ করে নিজের উত্তরাধিকারের দলিল আদায় করে নেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৫৮৩, ৫৮৪, ৬১১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬১৫

এভাবে মানুষের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেল, কারণ তারা তখনও অনারব পরিবারগুলোর ওপর বনু উমাইয়াদের প্রাধান্য দিত। আব্দুর রহমান শাঞ্জুল যখন তার উত্তরাধিকারী হওয়ার ঘোষণা দিলেন এবং বিজয়ের পর বিজয়ের খবর আসতে লাগল, তখন তিনি ‘লিওন’ অভিমুখে সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন। পেছনে কর্ডোভার আমীররা বিদ্রোহ করে বসল। তারা খলিফা হিশাম বিন আল-হাকামের পুত্র মুহাম্মদ বিন হিশামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করল। এই যুবক তার পিতাকে অযোগ্য ঘোষণা করে ক্ষমতাচ্যুত করল এবং ৩৯৯ হিজরির জমাদিউল আউয়াল (২৯ জানুয়ারি ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে নিজের খেলাফত ঘোষণা করল। শাঞ্জুল এই সংবাদ শুনে তার অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু তার সেনাবাহিনী তাকে ছেড়ে চলে গেল এবং পশ্চিমধ্যেই তিনি নিহত হলেন। তার লাশ কর্ডোভার একটি প্রধান সড়কে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। [১]

আব্দুর রহমান শাঞ্জুলের মৃত্যুর সাথে সাথে কর্ডোভায় এক অন্তহীন রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলো। একদিকে ছিল বারবাররা, যারা শুরু থেকেই আন্দালুসের ইসলামী বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের শাসনামলে তাদের একটি বিশাল ক্যাম্প মারাক্লেস থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এর কারণ ছিল আব্দুর রহমান আন-নাসির মারাক্লেসে ইদ্রিসি রাষ্ট্রের অবশিষ্টাংশ নির্মূল করেছিলেন। ফলে এই সরকারের বারবার সৈন্যরা মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের বিজয়ের মূল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু আরবরা, বিশেষ করে বনু উমাইয়ার অনুগতরা মুহাম্মদ বিন আবি আমিরকে ঘৃণা করত, কারণ তিনি উমাইয়া পরিবারকে ক্ষমতাহীন ও পঙ্গু করে দিয়েছিলেন। তাই তারা বারবারদেরও শত্রু মনে করত, যারা ছিল মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের ডান হাত।

সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দলও ছিল যারা মুহাম্মদ বিন আবি আমিরের আমলে পদোন্নতি পেয়েছিল। তাই উমাইয়াদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার ঠেকাতে বারবারদের সাথে হাত মেলাতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। আরবরা এই গোষ্ঠীকে ‘জওয়ানানে আমিরি’ বলত।

সংক্ষেপে, এই বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের কারণে কর্ডোভায় একের পর এক শাসক আসতে ও যেতে থাকল। আমীররা কাউকে ‘খেলাফতের মসনদে’ বসাত, কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ করে তাকে নামিয়ে দিতে বাধ্য করত। আবার কখনো জনগণের কোনো প্রতিনিধি তাদের সমর্থনে ক্ষমতায় আসত, কিন্তু সেনাবাহিনীর আমীরদের হাতে নিহত হতো। কর্ডোভার কাজী ও ফকিহগণ কোনো নেককার ব্যক্তিকে খেলাফতের পাগড়ি পরাতেন, কিন্তু তিনি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিহত হতেন অথবা কোনো অন্ধকার কারাকক্ষে নিষ্কিপ্ত হতেন। কখনো কোনো বারবার গোত্রপতি শক্তির জোরে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করত, কিন্তু আরব আমীররা বিদ্রোহ করে তার তখত উল্টে দিত। সংক্ষেপে, একের পর এক বিভিন্ন শাসক কর্ডোভার সিংহাসনে বসতে ও নামতে থাকল।

২. মুহাম্মদ সানি বিন হিশাম আল-মাহদি (জমাদিউল আউয়াল ৩৯৯ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৪০০ হিজরি - জানুয়ারি ১০০৯ থেকে নভেম্বর ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)

আব্দুর রহমান শাঞ্জুলের হত্যার পর মুহাম্মদ বিন হিশাম ‘আল-মাহদি’ উপাধি ধারণ করে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাকে মুহাম্মদ সানিও বলা হতো। সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি তার পিতা হিশাম বিন আল-হাকামকে একটি গোপন স্থানে বন্দি করেন এবং রটিয়ে দেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

[১] নেহায়াতুল আরব লিন-নুওয়াইরি: ২৩/৩১০, দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়েক আল-কাওমিয়া; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/১৬০, দারুল ফিকর।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

হয়ে গেছে। আল-মাহদী চরিত্রের দিক থেকে শাহী ভুলের চেয়েও অধম ছিল। সে সিংহাসনে আরোহণ করে সমস্ত দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়ে যায় এবং ভোগ-বিলাস, মদ্যপান ও অন্যান্য পাপাচারে নিমগ্ন হয়ে পড়ে।

তার আসল শক্তি ছিল কর্ডোভার সেই সব মানুষ যারা বনু উমাইয়ার গুণগ্রাহী এবং মানসুর আল-আযমের পরিবারের বিরোধী ছিল। আল-মাহদী তাদের শক্তিতেই ক্ষমতার মসনদে পৌঁছেছিল এবং নিজের সেনাবাহিনীও তাদের মাধ্যমেই গঠন করেছিল, তাই সাধারণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা তার সাধ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। সে নিজেও দূরদর্শিতা বর্জিত ছিল এবং তার সমর্থকরা তার চেয়েও বেশি একগুঁয়ে ও গোঁড়া ছিল। তারা বনু উমাইয়ার অনুরাগী এবং হাজিব আল-মানসুরের পরিবারের শত্রু ছিল। তারা ক্ষুব্ধ ছিল যে কেন হাজিব আল-মানসুর এবং তার ছেলেরা উমাইয়া খলিফাদের নিজেদের অধীনস্থ করে রেখেছিল। যেহেতু এখন খ্রিস্টানদের ওপর ঈগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো আল-মানসুর জীবিত ছিলেন না, না তার ছেলেরা; তাই বনু উমাইয়ার এই ভক্তরা বনু আমিরের শত্রুতায় মানসুর আল-আযমের নির্মিত বিশাল শহর “আল-যাহরা”র ওপর হামলা চালিয়ে দেয় এবং মন ভরে লুটতরাজ করে। চার দিন ধরে দাঙ্গাকারীরা কাসর আল-যাহরার আসবাবপত্র লুট করতে থাকে। এর সুন্দর ভবনগুলোর ইট দিয়ে ইট বাজিয়ে দেওয়া হলো এবং শেষে শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। এই ঘটনাটি প্রমাণ করছিল যে আন্দালুসের মুসলমানরা রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে।

মাহদী রাজনীতিবিদ হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। প্রথমে সে বারবারদের নিরস্ত্র করে কর্ডোভাবাসীদের তাদের ওপর চড়াও হওয়ার খোলা সুযোগ দেয়, ফলে বারবাররা তার বিরোধী হয়ে যায়। এরপর সে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সন্দেহ করে উমাইয়া শাহজাদাদের দমন ও নির্মূল করার চেষ্টা করে এবং এভাবে আরবদেরও নিজের শত্রু বানিয়ে ফেলে। কর্ডোভায় এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো যে, আল-আমান ওয়াল হাফিজ।

এমন পরিস্থিতিতে বারবাররা একজন উমাইয়া শাহজাদা সুলাইমান বিন আল-হাকাম (বিন আবদুর রহমান আন-নাসির)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে তার নেতৃত্বে মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সুলাইমান এই সুযোগে খ্রিস্টান রাষ্ট্র কাসতালিয়ার প্রধান সানজোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। এই ধূর্ত রাজনীতিবিদের কাছে মুসলমানদের ধ্বংস করার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারত। ফলে খ্রিস্টান সেনাবাহিনীও সুলাইমান বিন আল-হাকামের সাথে যোগ দেয়।

এটিই ছিল প্রথমবার যখন আন্দালুসে মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সাহায্য নিয়েছিল। এরপর থেকে খ্রিস্টানদের সহায়তায় নিজ ধর্মাবলম্বীদের হেয় করা এখানকার রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়। যা-ই হোক, ১৩ই রবিউল আউয়াল ৪০০ হিজরিতে কর্ডোভার বাইরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হলো। মাহদীর অদূরদর্শিতার কারণে তার সমর্থকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তাই তার সেনাবাহিনী কম ছিল। তবে বিপুল সংখ্যক নাগরিক তার সাথে ছিল। অবশেষে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো যাতে মাহদী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং সে বিশ হাজারের বেশি লাশ ফেলে পিছু হটে গেল, যাদের মধ্যে অনেক আলেম, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং নেককার লোকও ছিলেন।

মাহদী কর্ডোভার প্রাচীরের পেছনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। যখন সে দেখল যে বাঁচার কোনো পথ নেই, তখন সে তার পিতা হিশামকে, যিনি একটি গোপন কারাগারে বন্দি ছিলেন, বের করে এনে কর্ডোভার সিংহাসনে বসিয়ে দিল এবং কাজী আবু যাকওয়ানকে দূত বানিয়ে এই বার্তা দিয়ে বারবারদের কাছে পাঠাল যে, শরয়ী খলিফা হিশাম বিন আল-হাকাম জীবিত ও সুস্থ আছেন।

আর মুহাম্মদ আল-মাহদী কেবল সালতানাতের নায়েব, তাই শরয়ী খলিফার মোকাবিলা করা সঠিক নয়। বারবাররা দূতের সাথে অত্যন্ত অবমাননাকর আচরণ করে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল এবং সুলাইমানকে খলিফা বানানোর ব্যাপারে অটল থাকল। মাহদী যখন কোনো উপায় দেখল না, তখন ছদ্মবেশ ধারণ করে কর্ডোভা থেকে পালিয়ে গেল এবং টলেডো পৌঁছে গেল।

৩. সুলাইমান বিন আল-হাকাম মুস্তাইন বিল্লাহ: (১৪০০ ھ تا شوال ১৪০০) - নভেম্বর ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ)

১৫ রবিউল আউয়াল ৪০০ হিজরিতে বারবাররা বিজয়ী বেশে কর্ডোভায় প্রবেশ করল এবং সুলাইমান বিন আল-হাকাম খিলাফতের আসনে বসল। যেহেতু এই বিজয়ী বাহিনীতে খ্রিস্টানরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই লুটতরাজে তারাও শরিক ছিল। এভাবে কর্ডোভা বেশ কয়েকদিন ধরে বারবার এবং খ্রিস্টানদের হাতে লুণ্ঠিত হতে থাকল। অবশেষে সুলাইমান অনেক কষ্টে তাদের থামাল। কিছুটা শান্তি স্থাপিত হলে সে ‘আল-মুস্তাইন বিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করে নিজের খিলাফত ঘোষণা করল। সে আবদুর রহমান শানজুলের জীর্ণ মৃতদেহটিও, যা কয়েক মাস ধরে রাজপথে বুলছিল, নামিয়ে আনল এবং তার দাফনের ব্যবস্থা করল।

এদিকে মাহদীর কাছে টলেডোতে কিছু স্বার্থান্বেষী আমীর একত্রিত হয়েছিল যারা কর্ডোভা পুনরুদ্ধারের জন্য খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। অবশেষে কাতালোনিয়ার খ্রিস্টান বাহিনী নিয়ে এই লোকেরা মুস্তাইনের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। মুস্তাইন এই খবর পেয়ে কর্ডোভা থেকে সৈন্য নিয়ে টলেডোর দিকে অগ্রসর হলো এবং সেখানকার লোকদের নিজের আনুগত্যের দাওয়াত দিল, তবে তার এই আহ্বান সম্পূর্ণ নিষ্ফল রইল। অবশেষে মুস্তাইন কর্ডোভায় ফিরে গেল।

এদিকে মাহদীর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সে তিনজন নতুন মিত্র পেয়েছিল। তাদের মধ্যে একজনের সম্পর্ক ছিল জাওয়ানান-ই-আমেরি গোষ্ঠীর সাথে। সে ছিল ‘মদিনা সালিম’-এর স্বায়ত্তশাসিত আমীর ওয়াজিহ। বাকি দুই মিত্রের মধ্যে একজন ছিল ‘ওরকলা’ রাজ্যের নবাব আরিতো এবং অন্যজন ছিল বার্সেলোনার নবাব রামন বোরিল। খ্রিস্টানরা এই অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলি রেখেছিল:

- তাদের জন্য চাহিদা অনুযায়ী খাবার ও মদের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নবাবদের দৈনিক সোয়া একশ আশরাফি প্রদান করা হবে।
- প্রত্যেক খ্রিস্টান সৈন্যকে দৈনিক দুই আশরাফি প্রদান করা হবে।
- বারবারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মালের হকদার কেবল খ্রিস্টানরাই হবে।
- মদিনা সালিম তাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

এই সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়া হলো এবং অবশেষে মিত্রবাহিনী কর্ডোভার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ওদিক থেকে মুস্তাইনও বারবার এবং কর্ডোভা অধিবাসীদের এক বিশাল জনতা নিয়ে বের হলো। শাওয়াল ৪০০ হিজরির মাঝামাঝি (মে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি) কর্ডোভা থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে আকবাতুল বাকার নামক স্থানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ফরাসিরা বারবারদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে দিল। এটি দেখে মুস্তাইন ভাবল যে বাহিনী পরাজিত হয়েছে। যদি...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯০, ১৯১; নাফহত তীব: ১/ ৩২৭, ৩২৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬৩২ থেকে ৬৩৭।

সে অটল হয়ে লড়াই করলে যুদ্ধের ফলাফল ভিন্ন হতে পারত, কিন্তু সে ঘাবড়ে গিয়ে তার বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে শাহ্‌বিবা শহরের দিকে পালিয়ে গেল। এটি দেখে বারবারাও ময়দান ছেড়ে দিল এবং মাদিনাতুজ জাহরার দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকে নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সাথে নিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে চলে গেল। এভাবে ময়দান মাহদী এবং তার মিত্রদের হাতে রয়ে গেল।

(৪) মুহাম্মদ সানি আল-মাহদী, দ্বিতীয়বার: (শাওয়াল থেকে জিলহজ ৪০০ হিজরি — মে থেকে জুলাই ১০১০ খ্রিস্টাব্দ)

১৬ শাওয়াল ৪০০ হিজরিতে মাহদী কর্ডোভায় প্রবেশ করল। কর্ডোভা আরও একবার মুসলমানদের “সাহায্যকারী” খ্রিস্টানদের হাতে □□□□ভাবে লুণ্ঠিত হলো। মাহদী চুক্তি অনুযায়ী খ্রিস্টান মিত্রদের দান ও পুরস্কারে ভূষিত করল।

তার সবচেয়ে বড় ভয় ছিল বারবারদের নিয়ে যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের শক্তি বাঁচিয়ে ওয়াদিয়ে আরু-তে চলে গিয়েছিল, যা জাজিরায় খাজরার পথে একটি স্থান ছিল। মাহদী সৈন্যবাহিনী গঠন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বের হলো। তার সাথে ত্রিশ হাজার মুসলমান এবং নয় হাজার খ্রিস্টান ছিল। জিলকদ ৪০০ হিজরিতে (জুন ১০১০ খ্রিস্টাব্দ) উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো যাতে প্রত্যাশার বিপরীতে বারবারা বিজয়ী হলো এবং তাদের হাতে তিন হাজারের বেশি খ্রিস্টান মিত্র নিহত হলো। মাহদী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পুনরায় কর্ডোভার দিকে পিছু হটল। কর্ডোভা পৌঁছামাত্রই খ্রিস্টানরা তার সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রাজ্যের দিকে ফিরে গেল। এদিকে বারবারা এই বিজয়ের পর দক্ষিণের দিকে চলে গেল এবং “ওয়াদিয়ে রিয়া”-তে মুস্তাইন (সুলাইমান বিন হাকাম)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হলো।

কর্ডোভায় এসে মাহদী নিজের শাসন সুসংহত করার চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু ক্ষমতা বেশিদিন তার ভাগ্যে ছিল না। তার মদ্যপান, দুশ্চরিত্র এবং অন্যান্য বোকামির কারণে তার কর্মকর্তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাদের কাছে এটিও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল যে মাহদী বনু উমাইয়া এবং বনু আমির উভয়ের সাথেই নির্দয় আচরণ করেছে। এই অসন্তুষ্ট সরদারদের মধ্যে মাদিনাতু সালিমের প্রাক্তন শাসক ওয়াজিহ সবার আগে ছিল যে বনু আমিরের পালিত ছিল। অবশেষে এই সরদাররা ৮ জিলহজ ৪০০ হিজরিতে বিদ্রোহ করল যাতে মাহদী নিহত হলো। তার শিরশ্ছেদ করে কর্ডোভার প্রধান সড়কে বুলিয়ে দেওয়া হলো। [২]

প্রাক্তন নিভৃতচারী খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়িদ বিল্লাহ, যিনি দীর্ঘকাল বন্দি ছিলেন, তাকে মুক্ত করে পুনরায় খেলাফতের মসনদে বসানো হলো।

(৫) হিশাম আল-মুয়াইয়িদ, দ্বিতীয়বার: (জিলহজ ৪০০ হিজরি থেকে শাওয়াল ৪০৩ হিজরি — জুলাই ১০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলাই ১০১৩ খ্রিস্টাব্দ)

হিশাম আল-মুয়াইয়িদ তার ক্ষমতার প্রথম মেয়াদ পুতুলের মতো কাটিয়েছিলেন। এখন পুনরায় খেলাফতের মসনদে বসার সময় তার বয়স ৪৭ বছর হয়েছিল। প্রথমবার মসনদে আরোহণের পর এখন ৩৩ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। ইসলামি আন্দালুসের ইতিহাসে এই ৩৩ বছর ছিল অষ্টম শাসকের অসহায়ত্ব এবং অ-অষ্টম শাসকদের (জারিহি) আধিপত্যের। এর মধ্যে ত্রিশ বছর পর্যন্ত দেশের শাসনভার এক...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯২, ১৯৩, ত. দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬৩৪, ৬৩৮।

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯২, ১৯৩, ত. দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬৩৮, ৬৩৯।

শক্তিশালী ও যোগ্য সেনাপতি ইবনে আবি আমির (মানসুর আজম)-এর হাতে ছিল, তাই শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। কিন্তু এরপর ফিতনার যুগ শুরু হয় এবং কর্ডোভার (কুরতুবা) সিংহাসন ক্ষমতার লোভীদের জন্য খেলার বস্তুতে পরিণত হয়।

এখন দীর্ঘ সময় পর হিশাম আল-মুয়াইয়িদ পুনরায় খেলাফতের মসনদ ফিরে পেলে তিনি তার পূর্ববর্তী শাসনকালের বিপরীতে শহরের রাস্তায় বের হন এবং রাজকীয় শান-শওকত প্রদর্শন করেন যাতে মানুষের মনে প্রভাব পড়ে। যদিও সেই সেনাপতি ও আমীরগণ যারা তাকে কারাগার থেকে বের করে এনেছিলেন, তারা তার ওপর প্রভাবশালী ছিলেন। তাদের মধ্যে ওয়াজহ আল-ফিতী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, যিনি খলিফার হাজিব হয়েছিলেন।

যা-ই হোক, হিশাম আল-মুয়াইয়িদ পূর্ণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে কোনোভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বারবারদের (বার্বার) সাথে সন্ধি হয়। তিনি মাহদীর কাটা মাথাও তাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে নিজেদের শত্রুর পরিণতি দেখে তাদের রাগ প্রশমিত হয়, কিন্তু বারবাররা পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিল যে, তারা তাদের নেতা সুলাইমান বিন হাকাম (মুসতাইন বিল্লাহ) ছাড়া আর কারো শাসনে সন্তুষ্ট নয়।

প্রকৃতপক্ষে বারবারদের মধ্যে কর্ডোভাবাসীদের প্রতি ঘৃণা চরমে পৌঁছেছিল। অতীতে কর্ডোভার আরব শাহজাদা ও আমীরদের কাছ থেকে তারা যে কষ্ট পেয়েছিল, তার বদলে তারা কর্ডোভার ধ্বংস সাধনে মত্ত ছিল, তাই তারা কোনো সমঝোতায় রাজি হয়নি। শীঘ্রই তারা কাস্টিলের (কুসতালিয়া) শাসক সানজোর সাথে যোগাযোগ করে পুনরায় তার কাছে সামরিক সাহায্য চাইল যাতে কর্ডোভা জয় করা যায়। বিনিময়ে মানসুর আজমের জয় করা সমস্ত দুর্গ খ্রিস্টানদের ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিল। সানজো একজন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি জানতেন যে, এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়ার অধিকার কেবল কর্ডোভার মসনদে আসীন খলিফারই আছে। তাই তিনি বারবারদের এড়িয়ে গেলেন এবং মুসলমানদের গৃহযুদ্ধের পরিণতির অপেক্ষায় রইলেন।

বারবারদের হাতে আল-জাহরার ধ্বংসযজ্ঞ:

যখন বারবাররা কর্ডোভার মতো সুদৃঢ় শহর জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পেল না, তখন তারা জনপদ ও ছোট শহরগুলো তছনছ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সর্বপ্রথম রবিউল আউয়াল ৪০১ হিজরি (নভেম্বর ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ)-তে তারা কর্ডোভার সংলগ্ন মদিনাতুজ জাহরায় পৌঁছাল এবং এখানকার অধিকাংশ রক্ষীবাহিনীকে হত্যা করল। তারা শাবান মাস পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করল।

কর্ডোভার আরবরা বারবারদের পৃষ্ঠপোষক মানসুর আজমের শহর “জাহরা” তছনছ করেছিল, তাই বারবাররা এর প্রতিক্রিয়ায় “মদিনাতুজ জাহরা”য় অবস্থানের সময় এই শহরের ইমারতগুলোকে চরমভাবে তাদের প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু বানাল এবং এখান থেকে যাওয়ার সময় তারা শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দিল।

এভাবে সেই শহর, যার প্রতিটি ইমারত ছিল স্থাপত্যশৈলীর এক একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং সভ্যতার এক একটি তাজমহল, তা বিপদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লাগামহীনতার পথে পা বাড়ানো লোকেরা আন্দালুসের উমাইয়াদের এই অতুলনীয় স্থাপত্য নিদর্শনকে যেভাবে পদদলিত করল, তা অত্যন্ত দুঃখজনক।

(১) তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯৩, ত. দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬৫৩

৪৮৮ তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

আমরা নিজেদের বাগান নিজেরাই উজাড় করেছি, কী আর বলব যে আমরা বিজয়ী

নিজেদের জনপদ পুড়িয়ে আমরা যুদ্ধের ময়দান জয় করেছিলাম

আয-যাহরার হারানো গৌরব আর ফিরে আসবে না

দুনিয়া মনে রাখবে মুসলিম নিজের কাছে নিজেই হেরেছিল [১]

আয-যাহরার অবশিষ্ট কিছু ঘরবাড়িতে কিছু লোক বসবাস করত, কিন্তু এর অধিকাংশ অংশই জনশূন্য ছিল। পরবর্তী মুসলিম শাসকরা এর পুনর্নির্মাণের দিকে কোনো মনোযোগ দেননি, বরং তারা পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং এই শহরটি ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। খ্রিস্টানদের শাসনামলে এটি আরও বেশি পদদলিত হতে থাকে। এভাবে সেই মাদিনাতুজ যাহরা, যার জাদুকরী সৌন্দর্য বড় বড় রাজাদের হতবাক করে দিত, তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। আজ এই স্থানটি দেখলে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের কথা মনে পড়ে যায় এবং এটা বিশ্বাস করা কঠিন মনে হয় যে, এই ধসে পড়া ভিত্তিগুলোর ওপর একসময় ইসলামি আন্দালুসের সভ্যতার সেই সুমহান প্রাসাদগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, যা দেখে ইউরোপীয় রাষ্ট্রদূতরা মূর্ছা যেতেন। আয-যাহরার ধ্বংসস্তূপের ওপর শেখ মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি-র এই কবিতাগুলো অশ্রু উদ্বেককারী:

“এই প্রমোদ উদ্যানগুলোর চারপাশে কিছু ঘরবাড়ি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সেগুলোতে বসবাস করার মতো কেউ নেই এবং সেগুলো সম্পূর্ণ জনশূন্য।”

“মনে হয় চারপাশ থেকে পাখিরা এগুলোর ওপর বিলাপ ও আহাজারি করছে, কখনো চুপ হয়ে যায়, কখনো ডুকরে কেঁদে ওঠে।”

“আমি একটি একাকী পাখিকে সম্বোধন করলাম, যার হৃদয়ে দুঃখ ছিল এবং সে ভীত ছিল।”

“আমি জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কিসের জন্য বিলাপ ও আহাজারি এবং ফরিয়াদ করছ?”

সে বলল: “সেই সময়ের জন্য যা অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং আর ফিরে আসবে না।” [২]

[১] সাগর

[২] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসিল রতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৫৩৩

হিশাম আল-মুয়াইয়াদ নিখোঁজ:

আল-জাহরা ধ্বংস করার পর বারবাররা একদিকে কর্ডোভা অবরোধ করে এবং অন্যদিকে তাদের অনেক দল দক্ষিণ আন্দালুসের দিকে চলে যায়, যেখানে তারা গ্রানাডা এবং মালাগার মতো শহরগুলোর আশেপাশে লুটতরাজ শুরু করে। বারবারদের ধ্বংসলীলা দেখে হিশাম আল-মুয়াইয়াদ এবং তার আমিররা কর্ডোভায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। একই সাথে তাদের এই ভয়ও ছিল যে, এই পরিস্থিতিতে যদি খ্রিস্টানরাও বারবারদের সাথে যোগ দেয়, তবে শহরের প্রতিরক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সানচো এই সময়ের অপেক্ষায় ছিল। সে কর্ডোভা সরকারের ভয়ের সুযোগ নিয়ে একটি কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠায়, যারা দাবি করে যে খলিফা আল-হাকাম থেকে শুরু করে মানসুর আল-আজমের সময় পর্যন্ত বিজিত সমস্ত শহর ও দুর্গের কর্তৃত্ব খ্রিস্টানদের ফিরিয়ে দিতে হবে। হিশাম আল-মুয়াইয়াদ যেকোনো মূল্যে খ্রিস্টানদের সম্ভ্রুষ্টি চেয়েছিলেন যাতে বারবাররা আরও শক্তি না পায়। ফলে তিনি এই চুক্তিটি করে নেন, যা উলামা, ফকিহ এবং খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আইনি রূপ দেওয়া হয়। এই চুক্তি আন্দালুসের মুসলমানদের ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়ে আসে। এর ফলে দুইশ সীমান্ত দুর্গ এবং বেশ কিছু শহর মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এই শহরগুলোর মধ্যে শানত আশতিন, কুলুনিয়া, উসামা এবং গুরমারজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ইসলামী আন্দালুস তার প্রতিরক্ষার প্রথম সারি থেকে বঞ্চিত হয়। দুই শতাব্দীতে এটিই প্রথম ঘটনা ছিল যে আন্দালুসের কোনো শাসক নিজেই খ্রিস্টানদের নিজের ভূমি দিয়ে দিয়েছিলেন।

তবে এই চরম অপমানজনক পদক্ষেপের ফলে কর্ডোভা সরকার বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়নি। বারবারদের হাত থেকে তারা তবুও মুক্তি পায়নি এবং শহরের ওপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। শহরবাসী প্রাচীরের দরজা বন্ধ করে কয়েক মাস ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। অনেকবার তারা শহরের বাইরে বেরিয়েও আক্রমণ করে, কিন্তু তারা বারবারদের পিছু হটাতে পারেনি। অবশেষে ২৬ শাওয়াল ৪০৩ হিজরি (১ জুন ১০১৩ খ্রিস্টাব্দ) উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে কর্ডোভা বাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই সময়ে কিছু লোক প্রাচীরের দরজা খুলে দেয় এবং বারবার যোদ্ধারা ক্ষিপ্ত ঝড়ের মতো শহরে ঢুকে পড়ে। তারা হাজার হাজার মানুষকে তলোয়ারের নিচে ফেলে রক্তের নদী বইয়ে দেয়। শিশু, বৃদ্ধ এবং নারীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। নারীদের অপহরণ করে তাদের স্ত্রীলতাহানি করা হয়। পরের দিন সুলাইমান মুস্তাইন মানুষের লাশের ওপর দিয়ে হেঁটে বারবারদের কাঁধে চড়ে খেলাফতের মসনদে পৌঁছান। হিশাম আল-মুয়াইয়াদ নিখোঁজ হয়ে যান। কেউ কেউ বলতেন যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আবার কারো ধারণা ছিল যে সুলাইমান তাকে কোনো গোপন স্থানে বন্দি করে রেখেছেন। [১]

+++

(৬) মুস্তাইন বিল্লাহ—দ্বিতীয়বার: (শাওয়াল ৪০৩ হিজরি থেকে মহরম ৪০৭ হিজরি... জুন ১০১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুলাই ১০১৬ খ্রিস্টাব্দ)

সুলাইমান মুস্তাইন বিল্লাহ কর্ডোভায় পুনরায় শাসক হন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান ও গুণে সজ্জিত ছিলেন এবং একজন ভালো কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজনীতিতে দুর্বল ছিলেন, ফলে বারবারদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। সেই দিনগুলোতে বারবারদের গোত্রীয় দলগুলো: বনু জিরি (সানহাজা), বনু মাগরাওয়া, বনু ইয়াজাল, বনু ইফরান, বনু খাজার এবং বনু আজদাজা পুরো সরকারের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ১৯৩-১৯৪, ত. দারুল ফিকর; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ৬৩৯-৬৫৩।

আল-মুসতাইন তাদের কর্ডোভা থেকে বের করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও শহরের শাসনভার তাদের হাতে তুলে দেন। ফলে এলভিরা (গ্রানাডা) জেলা বনু জিরিকে, জিয়ান জেলা ও এর আশপাশের এলাকা বনু বারজাল ও বনু ইফরানকে এবং শাদোনা ও মুরুর জেলা বনু দাম্মার ও বনু আজদাজাহকে দিয়ে দেওয়া হয়। বনু মাগরাওয়াকে কিছু মধ্যবর্তী শহর দেওয়া হয়। এভাবে বারবাররা দক্ষিণ ও মধ্য আন্দালুসে আধিপত্য বিস্তার করে।

যখন বনু আমিরের অনুগত আমীররা এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তারা বারবারদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। ফলে তাদের অধিকাংশ কর্ডোভা ছেড়ে অনেক দূরে পূর্ব আন্দালুসে চলে যান। তাদের একজন কর্মকর্তা মুজাহিদ ‘দানিয়া’তে এবং অন্য একজন কর্মকর্তা খাইরান আলমেরিয়া ও মুরিয়াতে কিছু দুর্গের ওপর ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলেন।

আল-মুসতাইন আরবদেরও কিছু জেলা ও শহর প্রদান করেন। যেমন: বনু তুজিবের মুনজির বিন ইয়াহইয়াকে সারাগোসা এবং উত্তর সীমান্তের শাসনভার অর্পণ করেন। এছাড়া সেই সময়ে মরক্কোর শাসক পরিবার ইদ্রিসি বংশের কিছু রাজপুত্র ও আমীর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নতুন সুযোগের সন্ধানে কর্ডোভায় এসেছিলেন। ৪০৩ হিজরিতে আল-মুসতাইন তাদের পশ্চিম সীমান্তের জেলাগুলো দান করেন। আলী বিন হাম্মুদকে সেউতার শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং তার ভাই কাসিম বিন হাম্মুদকে আলজেসিরাস ও তাঞ্জিয়ারের শাসনভার দেওয়া হয়। আল-মুসতাইন সাম্রাজ্যকে এভাবে ভাগ করে বাহ্যিকভাবে কর্ডোভাকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু এই শাসকরাই খুব দ্রুত তার শত্রুতে পরিণত হয়। ঘটনাটি ছিল এমন যে, সেই দিনগুলোতে এই কথা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, সাবেক খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়াদ-এর পক্ষ থেকে আলী বিন হাম্মুদের কাছে একটি গোপন বার্তা পৌঁছেছে, যাতে তাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়েছে এবং তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে আলী বিন হাম্মুদ যেন তার প্রতিশোধ নেন।

এই চিঠিটি আসল ছিল নাকি কাল্পনিক—তা আল্লাহই ভালো জানেন। যা-ই হোক, আলী বিন হাম্মুদ একে ভিত্তি করে আল-মুসতাইনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। তিনি ৪০৬ হিজরির শেষের দিকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সেউতা থেকে আন্দালুসে পৌঁছান, যেখানে মালাগার শাসক আমির বিন ফুতুহ নিজের শহর তার হাতে তুলে দেন। আলমেরিয়ার খাইরান আমেরি এবং গ্রানাডা থেকে বারবারদের নেতা জাভি বিন জিরিও তার সাথে যোগ দেন। এই বাহিনী কর্ডোভার দিকে রওনা হয়। ওদিকে আল-মুসতাইনও বাহিনী নিয়ে বের হন। ৪০৭ হিজরির মহরম মাসে কর্ডোভা থেকে দশ মাইল দূরে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল-মুসতাইন পরাজিত হয়ে তার ভাই ও বাবাসহ বন্দী হন। আলী বিন হাম্মুদ ২৮ মহরম ৪০৭ হিজরি (৮ জুলাই ১০১৬ খ্রিস্টাব্দ) নতুন শাসক হিসেবে কর্ডোভায় প্রবেশ করেন। তার ধারণা ছিল যে, সাবেক খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়াদ কোনো কারাগারে বন্দী আছেন এবং আল-মুসতাইন তাকে হত্যা করেননি। তাই এসেই তিনি হিশামকে খুঁজতে শুরু করেন কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। যখন তার হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেল, তখন আলী বিন হাম্মুদ নিজ হাতে আল-মুসতাইন ও তার ভাইকে হত্যা করেন এবং সরকারিভাবে হিশাম আল-মুয়াইয়াদ-এর মৃত্যুর ঘোষণা দেন। এভাবে কর্ডোভা থেকে বনু উমাইয়ার শাসনের অবসান ঘটে এবং এরপর বনু হাম্মুদের শাসনের যুগ শুরু হয়। যদিও এরপরও সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কিছু উমাইয়া শাসক এসেছিলেন, কিন্তু তাদের শাসনের কোনো বিশেষ গুরুত্ব নেই। [১]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/ ১৯৩, ১৯৫, ত দারুল ফিকর; নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/ ৩২৯, ৩৮২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৬০।

কুরতুবা - বনু হাম্মুদ এবং বনু উমাইয়া পর্যায়ক্রমে

এখান থেকে কুরতুবায় বনু হাম্মুদ এবং বনু উমাইয়ার মধ্যে একটি নতুন দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে উভয় পরিবারের শাসকরা স্বল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসতে থাকেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

(৭) আলী বিন হাম্মুদ: (মুহাররম ৪০৭ হিজরি থেকে যিলকদ ৪০৮ হিজরি - জুলাই ১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ)

বনু হাম্মুদ যদিও বংশগতভাবে হাশেমী ছিল, কিন্তু বারবারদের দেশে বেড়ে ওঠার কারণে তারা বারবারি ভাষায় কথা বলত। তারা আরবি খুব কষ্টে বলতে পারত এবং তাও বারবারি উচ্চারণে। [১] মুহাররম ৪০৭ হিজরিতে তাদের প্রথম প্রধান আলী বিন হাম্মুদ আন-নাসির লি-দীনিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে খিলাফতের আসনে বসেন। [২] আলী বিন হাম্মুদ শুরুর আট মাসে বারবারদের ওপর কঠোরতা করেন এবং তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুসারী করেন। তিনি অনেক বারবারকে যারা নাগরিকদের ওপর জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত ছিল, মৃত্যুদণ্ড দেন। অন্যদিকে তিনি কুরতুবাবাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। তার এই সদ্যবহারে আরবরা সন্তুষ্ট হয় এবং কুরতুবায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কিছুকাল পর জাওয়াতান আমিরির আরব নেতা এবং আল-কাসরিয়ার শাসক খায়রান অনুভব করলেন যে, তিনি আলী বিন হাম্মুদকে সমর্থন দিয়ে মারাত্মক ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আলী বিন হাম্মুদকে এই আশায় সমর্থন দিয়েছিলেন যে, কুরতুবার কোনো কারাগার থেকে সাবেক খলিফা হিশাম আল-মুয়াইয়াদকে উদ্ধার করা হবে এবং তিনিই তাদের খলিফা হবেন। কিন্তু যখন আলী বিন হাম্মুদ নিজেই খলিফা হয়ে গেলেন, তখন খায়রানের আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সাথে তিনি আলী বিন হাম্মুদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কায় পড়ে গেলেন।

এই কারণে খায়রান কুরতুবা ত্যাগ করে পূর্ব আন্দালুসে অবস্থিত তার দুর্গ আল-কাসরিয়ায় চলে যান এবং সমমনা আরবদের সাথে নিয়ে একজন উমাইয়া রাজপুত্র আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদকে (যিনি আবদুর রহমান আন-নাসিরের নাতি ছিলেন) কুরতুবার সিংহাসনে বসানোর আন্দোলন শুরু করেন এবং তাকে আল-মুরতাজা উপাধি দেন। তাকে আবদুর রহমান চতুর্থও বলা হতো। এই আমিরদের অবস্থান ছিল যে, যতক্ষণ বনু উমাইয়ার রাজপুত্ররা বিদ্যমান আছেন, অন্য কারো কুরতুবার সিংহাসনের ওপর অধিকার নেই। শাতিবা, বালানসিয়া এবং তারতুশার শাসকরা এর সাথে একমত হলেন।

আলী বিন হাম্মুদ যখন এই জোটের খবর পেলেন, তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। আরবদের ওপর তার আর কোনো আস্থা রইল না এবং রাগের বশবর্তী হয়ে তিনি কুরতুবার আরবদেরও শত্রু হয়ে গেলেন। তিনি বারবারদের শহরের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতিটি অলিগলিকে কারাগারে পরিণত করলেন। শহরকে গোয়েন্দা ও তথ্যদাতায় ভরে দিলেন। অনেক শরীফ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং পরে মোটা অংকের অর্থ নিয়ে তাদের মুক্তি দিলেন। জনগণের ওপর এত ভারী কর আরোপ করলেন যে তারা হাহাকার করে উঠল। পরিশেষে তিনি কুরতুবা শহরকে সম্পূর্ণ জনশূন্য ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু প্রাসাদের অলিন্দে থাকা বিরোধীরা তার এই ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়নি এবং ১২ যিলকদ ৪০৮ হিজরি (৩ এপ্রিল ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) রাজপ্রাসাদের তিনজন সাকলাবি গোলাম তাকে হাম্মামখানায় আটকে হত্যা করে এবং নিজেরা পালিয়ে আত্মগোপন করে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬৫৭

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬৫৯

আলী বিন হান্সুদের শাসনকাল ছিল মাত্র এক বছর নয় মাস। [১]

৮. কাসিম বিন হান্সুদ: (জিলকদ ৪০৮ হিজরি থেকে রবিউস সানি ৪১২ হিজরি — এপ্রিল ১০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আগস্ট ১০২১ খ্রিস্টাব্দ)

আলী বিন হান্সুদের হত্যার পর কর্ডোভার কিছু আমির তার পুত্র ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হান্সুদকে (সেউটার শাসক) খলিফা বানাতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে কিছু লোক তার ভাই কাসিম বিন হান্সুদের (সেভিলের শাসক) খিলাফতের ব্যাপারে অনড় ছিলেন, যিনি আলী বিন হান্সুদের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। পরিশেষে কাসিমকেই খিলাফতের প্রস্তাব দেওয়া হয়। শুরুতে তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে এটি তার ভাই আলী বিন হান্সুদের কোনো চাল কি না। কিন্তু যখন তার হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হলো, তখন তিনি কর্ডোভায় আসেন এবং ৮ জিলকদ ৪০৮ হিজরিতে আল-মামুন উপাধি নিয়ে খিলাফতের আসনে বসেন। তিনি সর্বপ্রথম তার ভাইয়ের তিন হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে মৃত্যুদণ্ড দেন।

শুরুতে তিনি কোমলতা ও দয়ার নীতি গ্রহণ করেন। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং অনেক কর মওকুফ করে দেন, যার ফলে কর্ডোভাবাসীরা আশ্বস্ত হয়। তবে এদিকে পূর্ব আন্দালুসে খাইরান এবং তার সঙ্গীরা শাহজাদা আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-মুরতাজার খিলাফতের ব্যাপারে অনড় ছিলেন। অবশেষে তাদের বাহিনী কর্ডোভার বাইরে এসে পৌঁছায়, কিন্তু কর্ডোভার সেনাবাহিনী তাদের পরাজিত করে এবং আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ নিহত হন। এখন কাসিম বিন হান্সুদের অবস্থান সুদৃঢ় হলো, কিন্তু তিনি তার সমর্থক বারবারদের উগ্র মেজাজ নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন। তাই বারবারদের দমন করার জন্য তিনি আফ্রিকা থেকে হাবশি ক্রীতদাস ক্রয় করেন এবং তাদের একটি আলাদা বাহিনী তৈরি করেন। এটি দেখে বারবাররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা ভাবতে থাকে।

এই দিনগুলোতে কাসিম বিন হান্সুদের ভাতিজা ইয়াহইয়া বিন আলী চাচার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং মালাগা দখল করে নেন। বারবাররা সুযোগ বুঝে তার সাথে যোগ দেয়। এই মিত্ররা কাসিম বিন হান্সুদের পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং অবশেষে ২৩ রবিউস সানি ৪১২ হিজরিতে (১৭ আগস্ট ১০২১ খ্রিস্টাব্দ) তাকে কর্ডোভা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তিনি সেভিলে চলে যান এবং সেখানে المستعلى بالله (আল-মুস্তালি বিল্লাহ) নামে খলিফা হন। [২]

৯. ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হান্সুদ: (জমাদিউল আউয়াল ৪১২ হিজরি থেকে জিলকদ ৪১৩ হিজরি — আগস্ট ১০২১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

বারবাররা খিলাফত প্রাসাদ দখল করে নেয় এবং ইয়াহইয়া বিন আলীকে কর্ডোভার সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানায়। তিনি কয়েক দিনের মধ্যে কর্ডোভায় পৌঁছান এবং ১ জমাদিউল আউয়াল ৪১২ হিজরিতে (২৩ আগস্ট ১০২১ খ্রিস্টাব্দ) নতুন খলিফা হন। তার বয়স ছিল ৩২ বছর। তিনি المستعلى بالله (আল-মু'তালি বিল্লাহ) উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি একজন দক্ষ সৈনিক, অশ্বারোহী এবং ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন, কিন্তু বারবারদের আধিপত্যের কারণে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন কিন্তু গৃহযুদ্ধ এড়াতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি তার চাচা কাসিম বিন হান্সুদের সাথে একটি চুক্তি করেন, যাতে স্থির হয় যে তারা উভয়েই একে অপরের খিলাফতকে স্বীকৃতি দিয়ে একই সময়ে খলিফা থাকবেন। ইতিহাসে এটি সম্ভবত একমাত্র উদাহরণ যেখানে দুইজন শাসক খিলাফতের দাবিদার এবং একে অপরকে খলিফা হিসেবেও স্বীকার করেন।

[১] নাফহত তিব: ১/৩৮২, ৩৮৩; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬৫৯ থেকে ৬৬১।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/৬৬২, ৬৬৩।

এখান থেকে আন্দালুসে ঐক্যবদ্ধ খিলাফতের সেই অশুভ অধ্যায় শুরু হলো যে, ধীরে ধীরে প্রতিটি শহরই রাজধানীতে পরিণত হলো। ওদিকে বারবাররা নামধারী খলিফাদের নিয়ে খেলা করতে খুব মজা পাচ্ছিল, তাই তারা ১২ যিলকদ ৪১৩ হিজরি (১৮ ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ) ইয়াহইয়া বিন আলীর বরখাস্তের ঘোষণা করে দিল। ইয়াহইয়া একজন সতর্ক মানুষ ছিলেন। তিনি কর্ডোভার সিংহাসনের রক্তপিপাসু মেজাজ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই কর্ডোভা ছেড়ে মালাগায় চলে গেলেন। তার শাসনকাল ছিল মাত্র দেড় বছর। [১]

(১০) কাসিম বিন হামুদ, দ্বিতীয়বার (যিলকদ ৪১৩ হিজরি থেকে জুমাদিউল আখিরা ৪১৪ হিজরি — ফেব্রুয়ারি ১০২৩ থেকে সেপ্টেম্বর ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

এখন বারবারদের আমন্ত্রণে কাসিম বিন হামুদ আবারও এলেন এবং ১৮ যিলকদ ৪১৩ হিজরি (২৩ ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভার সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু এবার তার মধ্যে আগের মতো সেই তেজ ছিল না, কারণ বনু হামুদের ক্ষুদ্র রাজত্ব যা জাজিরাতুল খাদরা এবং আন্দালুসের দুই-চারটি উপকূলীয় শহর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, পরিবারের আলাদা আলাদা প্রধানদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

ওদিকে কাসিম বিন হামুদের অসহায়ত্বের কারণে বারবাররা কর্ডোভা অধিবাসীদের ওপর চরমভাবে চেপে বসেছিল। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কর্ডোভা অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে দিল। এটা দেখে কাসিম বিন হামুদ বারবারদের নিয়ে তাদের মোকাবিলায় বেরিয়ে এলেন। শহরের বাইরে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। কর্ডোভা অধিবাসীরা এই যুদ্ধকে তাদের স্বাধীনতার শেষ আশা মনে করে লড়েছিল। ফলাফল এই হলো যে, বারবাররা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে দূর-দূরান্তে পালিয়ে গেল। এটি ৪১৪ হিজরির জুমাদিউল আখিরা মাসের ঘটনা। কাসিম প্রাণ বাঁচিয়ে ইশবিলিয়া পৌঁছালেন, কিন্তু শহরবাসী তার জন্য ফটক খুলল না। অবশেষে তাকে দক্ষিণ আন্দালুসের দিকে পালিয়ে যেতে হলো। কিন্তু তার ভাগ্যে অন্ধকারই অন্ধকার ছিল। তার ভতিজা ইয়াহইয়া বিন আলী তাকে ধরে জেরেজ-এ নিষ্ক্ষেপ করেন, যেখানে তেরো বছর বন্দি থাকার পর তাকে হত্যা করা হয়। [২]

(১১) আবদুর রহমান বিন হিশাম, আল-মুস্তাজহির (রমজান ৪১৪ হিজরি থেকে যিলকদ ৪১৪ হিজরি — ডিসেম্বর ১০২৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

কর্ডোভা অধিবাসীরা বনু হামুদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। বারবারদের আধিপত্য থেকে তারা মুক্তি পেয়েছিল। তিন মাস পর্যন্ত কর্ডোভায় কোনো শাসক ছিল না। উমারা নিজেদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন যে কাকে বিশ্বাস করা যায়? অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে খিলাফত আবারও উমাইয়া পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাই তারা আবদুর রহমান আন-নাসিরের এক প্রপৌত্র আবদুর রহমান বিন হিশামকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করলেন। এটি ১৬ রমজান ৪১৪ হিজরি (১৩ ডিসেম্বর ১০২৩ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

নতুন খলিফা আবদুর রহমান পঞ্চম নামে পরিচিত হলেন এবং “মুস্তাজহির” উপাধি গ্রহণ করলেন। তার বয়স ছিল ২৩ বছর। তিনি বেশ যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার সময়ের তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন। কবিতা ও সাহিত্যে তার গভীর দখল ছিল। বিখ্যাত আলেম আল্লামা ইবনে হাজম তার দরবারি ছিলেন। তবে খলিফাকে কর্ডোভার বাইরে কেউ স্বীকার করেনি এবং রাজপ্রাসাদের ভেতরেও আমির ও উমাইয়া শাহজাদারা তাকে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা করছিলেন না। আবদুর রহমান বিন হিশাম এই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরেছিলেন এবং তিনি বেশ কয়েকজন আমির ও উমাইয়া শাহজাদাকে বন্দি করে ফেলেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৬৩/১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৬৩/১, ৬৬৪

অধিকন্তু সে বার্বারদের দিয়ে কাজ করানোর ইচ্ছা করল এবং তাদের কয়েকজন সর্দারকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে খিলাফত প্রাসাদে ডেকে নিল। শহরের আমিররা যখন এটি দেখল, তখন তারা জনগণকে উত্তেজিত করল এবং বলল: “আমরা কত কষ্টে বার্বারদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, আর এই ব্যক্তি তাদের পুনরায় আমাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।” মানুষ রাগে দিশেহারা হয়ে খিলাফত প্রাসাদে ঢুকে পড়ল এবং বার্বার সর্দারদের হত্যা করল। আবদুর রহমান বিন হিশাম কোনো এক গোপন স্থানে লুকিয়ে পড়ল। তার শাসনকাল ছিল মাত্র ৪৭ দিন।

(১২) আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ, আল-মুস্তাকফি: (জিলকদ ৪১৪ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৪১৬ হিজরি... ফেব্রুয়ারি ১০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জুন ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ)

সেই দিনগুলোতে একজন উমাইয়া রাজপুত্র আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ পূর্ববর্তী শাসকের ভয়ে আত্মগোপনে ছিল। তার হত্যার পর সে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং ৩ জিলকদ ৪১৪ হিজরিতে কর্ডোভার আমিররা তাকে সিংহাসনে বসায়। সে ‘আল-মুস্তাকফি’ উপাধি ধারণ করে শাসনভার গ্রহণ করে। সে পূর্ববর্তী শাসককে খুঁজে বের করে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়।

নতুন শাসক কোনো কাজের ছিল না। তার অযোগ্যতার কারণে অনেক যোগ্য লোক শহর ছেড়ে চলে যায়। অবশেষে কর্ডোভার আমিররা একযোগে তার পদত্যাগের দাবি জানায়। সে তাদের নরমভাবে উত্তর দিয়ে কোনোমতে এড়িয়ে যায় এবং তারপর এক মহিলার ছদ্মবেশে শহর থেকে বেরিয়ে যায়। এটি ২৫ রবিউল আউয়াল ৪১৬ হিজরি (৭ জুন ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। পথে কোনো এক ডাকাত ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে হত্যা করে। [২]

(১৩) ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হামুদ। দ্বিতীয়বার: (রমজান ৪১৬ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৪১৭ হিজরি... নভেম্বর ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে মে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ)

কর্ডোভাবাসীদের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। তারা পর্যায়ক্রমে কখনো বনু হামুদ এবং কখনো বনু উমাইয়াকে ক্ষমতার দোলনায় দোলাচ্ছিল। কিন্তু এখন আর কেউ এই শহর সামলানোর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ছয় মাস পর্যন্ত ক্ষমতার মসনদ খালি পড়ে ছিল। অবশেষে কর্ডোভার আমিররা মালকার শাসক ইয়াহইয়া হামুদকে আমন্ত্রণ জানায় যাতে সে এসে এখানকার শাসনভার গ্রহণ করে। সে ১৫ রমজান ৪১৬ হিজরি (২১ নভেম্বর ১০২৫ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভায় পৌঁছায় এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত এখানকার সিংহাসনে আসীন থাকে। এরপর সতর্কতা অবলম্বন করে মহররম ৪১৭ হিজরিতে পুনরায় মালকায় ফিরে যায় এবং তার দুই প্রতিনিধি: আহমদ বিন মুসা এবং দুনাস বিন আবি রুহ-কে দেড় হাজার বার্বার সৈন্যসহ এখানে রেখে যায়।

কিছুকাল পর পূর্ব আন্দালুসের আমিরি সর্দারগণ: খাইরান এবং মুজাহিদ কর্ডোভাবাসীদের সেখানে বার্বারদের উপস্থিতির জন্য তিরস্কার ও লজ্জা প্রদান করে। এর ফলে ২০ রবিউল আউয়াল ৪১৭ হিজরি (২২ মে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোভায় বার্বারদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের হত্যা করা শুরু হয়। ইয়াহইয়া বিন আলীর প্রতিনিধিরা কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৬৫, ৬৬৬/১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৬৯/১ [৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৬৬৭, ৬৬৮/১

(১৩) হিশাম বিন মুহাম্মদ, আল-মু'তাদ বিল্লাহ: (রবিউস সানি ৪১৮ হিজরি থেকে জিলকদ ৪২২ হিজরি — জুন ১০২৭ থেকে নভেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)

কর্ডোভার আমিরগণ এক বছর কোনো শাসক ছাড়াই অতিবাহিত করেন। শাসনকার্য পরিচালনায় যারা অগ্রণী ছিলেন তাদের মধ্যে আবু আল-হাজম জাওহার বিন মুহাম্মদ অন্যতম ছিলেন। তার পরামর্শে আবারও উমাইয়া পরিবারকে সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সেই দিনগুলোতে একজন উমাইয়া রাজপুত্র হিশাম বিন মুহাম্মদ (হিশাম আল-মুরতাজার ভাই) উত্তর-পূর্ব আন্দালুসের “আল-পুয়েন্তে” দুর্গে বসবাস করছিলেন। একটি প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে তার হাতে বায়াত গ্রহণ করে। এটি ২৫ রবিউস সানি ৪১৮ হিজরি (১৫ জুন ১০২৭ খ্রিষ্টাব্দ)-এর ঘটনা।

তবে এই রাজপুত্র দুই বছর সাত মাস পর্যন্ত কর্ডোভায় আসেননি। অবশেষে জিলহজ ৪২০ হিজরিতে তিনি কর্ডোভায় পৌঁছান যেখানে তার বায়াত নবায়ন করা হয় এবং তাকে খিলাফতের সিংহাসনে বসানো হয়। তাকে আল-মু'তাদ বিল্লাহ উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উমাইয়া পরিবার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে শূন্য হয়ে পড়েছিল। এই খলিফাও একজন আরামপ্রিয় এবং অযোগ্য মানুষ প্রমাণিত হন। তিনি শাসনকার্য তার উজির হাকাম বিন সাঈদের হাতে সোপর্দ করেন, যিনি অযোগ্য ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন এবং সরকারি সম্পদে ব্যাপক লুটতরাজ শুরু করেন। উজির অদক্ষ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের খলিফার মজলিসে বসিয়ে দেন এবং তাকে বড় বড় লোকদের সাথে খারাপ আচরণ করতে ও মদ্যপানে অভ্যস্ত করে তোলেন। এর ফলে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অবমাননা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং মানুষ উজিরের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে থাকে।

অবশেষে দুই বছর পর উজিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ উমাইয়া প্রধান উমাইয়া বিন আবদুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত হয় এবং তারা জিলকদ ৪২২ হিজরি (নভেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ)-তে সুযোগ বুঝে উজিরকে হত্যা করে এবং তার মাথা পুরো শহরে প্রদর্শন করে।

অন্যদিকে উত্তেজিত জনতা খিলাফতের প্রাসাদে আক্রমণ করে। যদি বিশিষ্ট আমির ইবনে জাওহার তাদের না থামাতেন তবে প্রাসাদে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। ইতিমধ্যে হিশাম আল-মু'তাদ প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান। লোকেরা তাকে জামে মসজিদের চারদেয়ালের মধ্যে ঘিরে ফেলে এবং তিনি নিজের প্রাণ ভিক্ষার জন্য আল্লাহর দোহাই দিতে থাকেন। ইবনে জাওহার সামনে এসে জনতাকে শান্ত করেন এবং সবার সম্মতিতে হিশাম আল-মু'তাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে শহর থেকে বের করে দেন। ইবনে জাওহার ঘোষণা করেন যে, এই মুহূর্তে খিলাফতের যোগ্য কেউ নেই, তাই কর্ডোভার খিলাফত সমাপ্ত করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো উমাইয়া রাজপুত্রকে কর্ডোভায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। [১]

এই ঘোষণা মূলত এই সত্যের স্বীকৃতি ছিল যে, প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন মুসলিম উলামাদের শরয়ী দলিলের ওপর মুজতাহিদানা দৃষ্টি ফেলে আকল ও অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো কার্যকর, উন্নত ও আধুনিক শাসনব্যবস্থা গঠন করতে হবে।

পতনের কারণসমূহ:

উমাইয়া শাসন যা চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আবদুর রহমান আন-নাসির, আল-হাকাম সানি এবং হাজিব আল-মানসুরের মতো শাসকদের অধীনে বিশ্বের অন্যতম মহান ও শক্তিশালী সালতানাত হিসেবে গণ্য হতো, কয়েক বছরের মধ্যেই তা এমনভাবে ধসে পড়ল যেন উইপোকা তা খেয়ে ফেলেছে। উত্থানের পৌনে তিন শতাব্দীতে এখানে এগারোজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন, যেখানে পতনের এক চতুর্থাংশ শতাব্দীতে এখানে চৌদ্দবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। এই দ্রুত পতন অবশ্যই বিস্ময়কর, তবে এই পতনের কারণ ও আমলগুলো দেখা উচিত।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ১৯৩/৪, ১৯৮/৫, ত ত দারুল ফিকর; ন্যফহত তিব: ৪৩৮/১।

তো এই বিস্ময় অনেকটা কমে যেতে পারে।

নিচে আমরা সংক্ষেপে আন্দালুসের উমাইয়া রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও পতনের কারণসমূহ উল্লেখ করছি:

- সিরিয়ার উমাইয়া খলিফাদের যুগে আন্দালুসে মুসলমানরা যে আধিপত্য লাভ করেছিল, এখানকার স্বাধীন উমাইয়া সরকার তা থেকে বঞ্চিত ছিল। কারণ খলিফাদের অধীনে থাকা আন্দালুসের পেছনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের শক্তি নিহিত ছিল। যখন আবদুর রহমান আল-আউয়াল এখানে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আন্দালুস রাজনৈতিকভাবে বাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং খ্রিস্টানরা মুসলমানদের একা মনে করে নেয়।
- আব্বাসীয় এবং বনু উবাইদের পক্ষ থেকে আন্দালুসের উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র খ্রিস্টানদের সাহস আরও বাড়িয়ে দেয়।
- সিরিয়ার খলিফাদের যুগে মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতও তুলনামূলক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কারণ প্রথম যুগের মুসলমানরা তাদের দ্বীনের ওপর অটল এবং আখলাক ও চরিত্রে অনেক উন্নত ছিলেন এবং ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রেও উৎসাহী ছিলেন। তাই স্থানীয় লোকজন তাদের চরিত্র ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলমান এখানে এসে ইসলামী জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি করতে থাকে।

কিন্তু স্বাধীন আন্দালুসের যুগে এখানে বিদেশ থেকে নতুন মুসলমানদের আগমন কমে যায়। স্থানীয় শাসক ও জনগণের মধ্যে ইসলামের দাওয়াতের স্পৃহাও স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাদের চরিত্র ও আচরণেও তাদের পূর্বপুরুষদের মতো গুণাবলি অবশিষ্ট ছিল না। তাই অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের গতি নামমাত্র হয়ে পড়ে; ফলে মুসলিম ও অমুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় সমান হয়ে যায়।

- আন্দালুসের উমাইয়ারা অসংখ্য জিহাদী অভিযান সত্ত্বেও উত্তরে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোকে পুরোপুরি নির্মূল করতে পারেনি। আবদুর রহমান আন-নাসির এবং মানসুর আল-আজমের মতো মুজাহিদ শাসকরা, যারা প্রায়ই নিজেদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতেন, তারা এই অঞ্চলগুলোকে অনুগত ও করদ রাজ্যে পরিণত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতেন। দুই শতাব্দী ধরে চলা এই শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন অভিযানগুলোর লক্ষ্য মূলত শত্রুকে ভীত করা, তাদের দুর্গগুলোকে অকেজো করা, তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা এবং তাদের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই উত্তরের আস্তুরিয়াস, কাস্তিলিয়া, লিওন এবং নাভারের মতো রাষ্ট্রগুলো পুরোপুরি নির্মূল হতে পারেনি এবং সুযোগ পাওয়ামাত্রই তারা শক্তিশালী হতে শুরু করে।

- খ্রিস্টানরা মুসলমানদের যুদ্ধকৌশল ভালোভাবে বুঝে ফেলেছিল। তাই যখনই কোনো বড় বাহিনী আক্রমণ করত, তারা পিছু হটে যেত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিত। মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের পর তারা পুনরায় সেই পাহাড়গুলো দখল করে যথারীতি শাসন করতে শুরু করত।

- উত্তরের রাষ্ট্রগুলোতে ইসলাম প্রচারের কোনো কার্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়নি। তাছাড়া এই অঞ্চলগুলোতে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করে সেগুলোকে ইসলামী জনপদে রূপান্তর করাও সম্ভব হয়নি, কারণ বাকি মুসলিম বিশ্ব থেকে মানুষ হিজরত করে আন্দালুসে আসছিল না...

ছিল, না মুসলমানদের মধ্যে বংশবৃদ্ধি খ্রিস্টানদের চেয়ে বেশি ছিল আর না অমুসলিম শহরের খ্রিস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করছিল। এমন অবস্থায় যদি অন্য শহরের মুসলমানদের উত্তরের রাজ্যগুলোতে আবাদ করা হতো তবে দক্ষিণ ও মধ্য ইসলামি শহরগুলো খালি হয়ে যেত বা অন্তত সেখানে খ্রিস্টানদের অনুপাত বেড়ে যেত কারণ কর্ডোভা সহ কোনো শহরই অমুসলিমদের থেকে খালি ছিল না।

- ৭. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, অগাধ প্রাচুর্য এবং সম্পদ মুসলমানদের উচ্চ লক্ষ্য থেকে গাফেল করে দিয়েছিল। জিরিয়াবের মতো সংগীতশিল্পীদের জনপ্রিয়তা এটা প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে আন্দালুসবাসী কোন পথে চলছে। যখন বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদ এবং আরাম-আয়েশের সংস্কৃতি সাধারণ হয়ে গেল তখন দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ সত্যগুলো পেছনে পড়ে গেল এবং মানুষ নফস পূজারী হয়ে একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকল যা সমাজকে পঙ্গু, গৃহযুদ্ধ এবং বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়াল।
- ৮. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সরকারগুলোতে কেবল বংশীয় আভিজাত্যের ভিত্তিতে কোনো অযোগ্য ব্যক্তির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এছাড়া এই ব্যবস্থায় যেহেতু সরকার প্রধানের হাতে অসীম ক্ষমতা থাকে, তাই তার ব্যক্তিত্ব ও মেজাজের প্রভাব সরাসরি রাষ্ট্রের ওপর পড়ে এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ বা অকল্যাণ তার চরিত্র ও আচরণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত যদি এমন শাসন ব্যবস্থায় কোনো দুর্বল বা মন্দ চরিত্রের ব্যক্তি ক্ষমতায় আসে তবে সালতানাত খুব দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে পারে কারণ সালতানাতের স্তম্ভগুলোর তাকে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা থাকে না। এই মৌলিক ত্রুটি আন্দালুসের উমাইয়া সহ সেই যুগের সমস্ত মুসলিম সালতানাতগুলোতে বিদ্যমান ছিল এবং দীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই চলে আসছিল।
- ৯. যোগ্যতার পরিবর্তে পারিবারিক নৈকট্যকে প্রাধান্য দেওয়ার বড় ভুল হাকাম সানি থেকেও হয়েছিল এবং তার যোগ্য ভাই মুগিরা ইত্যাদির পরিবর্তে তার ছেলে হিশাম আল-মুয়াইয়িদ বিল্লাহকে খেলাফত দেওয়া হয়েছিল। আন্দালুসের উমাইয়াদের পতনের যুগ সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল কারণ হিশাম আল-মুয়াইয়িদ ব্যক্তিগতভাবে নেক চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।
- ১০. মানসুর আজম হিশাম আল-মুয়াইয়িদের অভিভাবক হয়ে সালতানাতকে এক চতুর্থাংশ শতাব্দী পর্যন্ত সামলে রেখেছিলেন এবং তার এই সময়কাল একদিক থেকে আন্দালুসে মুসলমানদের উন্নতির চরম শিখর ছিল কিন্তু গভীরভাবে দেখলে আন্দালুসের রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতা শেষ হওয়ার পরিবর্তে বেড়ে গিয়েছিল কারণ মানসুর আজমের যুগে খলিফার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং বনু উমাইয়া বংশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ ও জেনারেলদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাউকে বিদ্রোহের অভিযোগে হত্যা করা হয়েছিল এবং কাউকে লোকচক্ষুর অন্তরালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। উলামা ও ফকিহগণ, যারা সাধারণ ও বিশেষ মহলে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিলেন, তারা চেয়েছিলেন খলিফার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তবে মানসুর আজম তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন কিন্তু তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সাথে সাথেই ব্যবস্থার এই ত্রুটি তার সমস্ত প্রভাব নিয়ে তীব্রভাবে প্রকাশ পেল।
- ১১. হিশাম আল-মুয়াইয়িদের নির্জনবাস এবং মানসুর আজমের ব্যক্তিগত রাজনীতি বনু উমাইয়ার মর্যাদা ও মহিমা শেষ করে দিয়েছিল। এরপর আব্দুল মালিক আল-মুজাফফরের আকস্মিক মৃত্যু এবং সানজুল এর মতো অযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে কর্ডোভার আমিররা বেপরোয়া হয়ে উঠল এবং তারা খেলাফতকে খেলনায় পরিণত করল। কর্ডোভায় ঠিক সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যা বনু আব্বাসের পতনের যুগে বাগদাদে ছিল।

- আন্দালুসে বারবার, সাকলাবি, মুওয়াল্লাদিন, ইয়ামানি আরব, মুদারি আরব, গথিক এবং অন্যান্য বংশের খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধরনের জাতি একত্রিত হয়েছিল এবং প্রতিটি জাতির মধ্যে ক্ষমতার অনেক লোভী ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল। এই পরিস্থিতি এখানে বারবার বিদ্রোহ এবং গৃহযুদ্ধের পরিবেশ তৈরি করে দেশকে দুর্বল করে দিয়েছিল।
- আন্দালুসে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক সামাজিক মেলামেশা, আত্মীয়তা এবং সম্পর্কও রাজনৈতিক অবনতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আবদুর রহমান আন-নাসির এবং মানসুর আল-আজমের আমলে পরিচালিত জিহাদি অভিযানগুলোতে অসংখ্য খ্রিস্টান নারী দাসী হিসেবে মুসলিমদের ঘরের অংশ হতে থাকে। এই নারীদের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মের ওপর পড়ে, যাদের মধ্যে কারো কারো হাতে ক্ষমতার লাগামও আসে। সানজা ফারিবার মতো কউর খ্রিস্টানের নাতি সানজুল, মানসুর আল-আজমের ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে কর্ডোভার সিংহাসনে বসে পড়ে এবং দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।
- শেষ যুগে আন্দালুসের মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রবণতা চরম অদূরদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে দেখা যায়। তারা তাদের শত্রুদের ব্যাপারে কেবল নিশ্চিন্তই হয়ে যায়নি, বরং তাদের সাথে নিয়ে একে অপরের গলা কাটছিল। সংক্ষেপে, এগুলোই ছিল সেই গুরুত্বপূর্ণ কারণ যার ভিত্তিতে দেখতে দেখতে আন্দালুসের উমাইয়াদের মহান শাসন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আন্দালুস (কর্ডোভা)-এর শাসকদের তালিকা

নম্বর শাসক শাসনকাল মোট সময়কাল বিশেষ কথা

১ আবদুর রহমান আউয়াল ১৩৮ হি. থেকে ১৭২ হি. (৭৫৫ খ্রি. থেকে ৭৮৮ খ্রি.) ৩৩ বছর ৪ মাস উমাইয়া কর্ডোভা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা

২ হিশাম আর-রাজি ১৭২ হি. থেকে ১৮০ হি. (৭৮৮ খ্রি. থেকে ৭৯৬ খ্রি.) ৭ বছর ৯ মাস সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়

৩ আল-হাকাম আউয়াল ১৮০ হি. থেকে ২০৬ হি. (৭৯৬ খ্রি. থেকে ৮২২ খ্রি.) ২৬ বছর ১১ মাস খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ

৪ আবদুর রহমান সানি ২০৬ হি. থেকে ২৩৮ হি. (৮২২ খ্রি. থেকে ৮৫৩ খ্রি.) ৩১ বছর ৩ মাস তৌহিনে রিসালাতের ফিতনা

৫ মুহাম্মদ আউয়াল ২৩৮ হি. থেকে ২৭৩ হি. (৮৫২ খ্রি. থেকে ৮৮৬ খ্রি.) ৩৩ বছর ১০ মাস অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহসমূহ

৬ মুনজির বিন মুহাম্মদ ২৭৩ হি. থেকে ২৭৫ হি. (৮৮৬ খ্রি. থেকে ৮৮৮ খ্রি.) ২ বছর শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে

৭ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ২৭৫ হি. থেকে ৩০০ হি. (৮৮৮ খ্রি. থেকে ৯১৩ খ্রি.) ২৫ বছর ৬ মাস উমর বিন হাফসুনের ফিতনা

৮ আবদুর রহমান আন-নাসির ৩০০ হি. থেকে ৩৫০ হি. (৯১৩ খ্রি. থেকে ৯৬১ খ্রি.) ৫০ বছর ৬ মাস সুবর্ণ যুগ, বিজয়সমূহ, খিলাফত ঘোষণা

৪৯৯ | তারিখ-ই মিল্লাত-ই ইসলামিয়া

৯. আল-হাকাম সানি | ৩৫০ হিজরি থেকে ৩৬৬ হিজরি (৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) | ১৫ বছর ৭ মাস | জ্ঞানানুরাগী, শান্তিপূর্ণ যুগ।

উমাইয়া খলিফাগণ, বনু আমিরের আমিরদের অধীনে

১০. হাজিব আল-মানসুর সাথে হিশাম সানি আল-মুয়ায়্যিদ বিল্লাহ | ৩৬৬ হিজরি থেকে ৩৯৩ হিজরি (৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০২ খ্রিষ্টাব্দ) | ২৭ বছর কয়েক মাস | নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১১. আবদুল মালিক আল-মুজাফফর সাথে হিশাম আল-মুয়ায়্যিদ | ৩৯৩ হিজরি থেকে ৩৯৯ হিজরি (১০০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দ) | ৭ বছর | নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১২. হাজিব শানজুল সাথে হিশাম আল-মুয়ায়্যিদ | সফর থেকে জমাদিউল আউয়াল ৩৯৯ হিজরি (অক্টোবর ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জানুয়ারি ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) | তিন মাস | পতনের যুগের সূচনা।

পতনের যুগ - দুর্বল উমাইয়া খলিফাগণ

১৩. মুহাম্মদ বিন হিশাম আল-মাহদি | জমাদিউল আউয়াল ৩৯৯ হিজরি থেকে রবিউল আউয়াল ৪০০ হিজরি (জানুয়ারি ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নভেম্বর ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) | দশ মাস।

১৪. সুলাইমান বিন আল-হাকাম মুসতাইন | রবিউল আউয়াল থেকে শাওয়াল ৪০০ হিজরি (নভেম্বর ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মে ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ) | সাত মাস।

১৫. মুহাম্মদ বিন হিশাম আল-মাহদি, দ্বিতীয়বার | শাওয়াল থেকে জিলহজ ৪০০ হিজরি (মে থেকে জুলাই ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ) | দুই মাস।

১৬. হিশাম আল-মুয়ায়্যিদ, দ্বিতীয়বার | জিলহজ ৪০০ হিজরি থেকে শাওয়াল ৪০৩ হিজরি (জুলাই ১০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুলাই ১০১৩ খ্রিষ্টাব্দ) | এক বছর দশ মাস।

১৭. সুলাইমান মুসতাইন, দ্বিতীয়বার | শাওয়াল ৪০৩ হিজরি থেকে মহররম ৪০৭ হিজরি (জুন ১০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে জুলাই ১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ) | চার বছর।

কর্ডোবার ওপর বনু হাম্মুদের আধিপত্য, যার মধ্যে নামমাত্র উমাইয়া খলিফাগণও আসতে থাকেন।

১৯. আলী আন-নাসির বিন হাম্মুদ | মহররম ৪০৭ হিজরি থেকে জিলকদ ৪০৮ হিজরি (জুলাই ১০১৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এপ্রিল ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) | এক বছর।

২০. আল-কাসিম আল-মামুন বিন হাম্মুদ | জিলকদ ৪০৮ হিজরি থেকে রবিউস সানি ৪১২ হিজরি (এপ্রিল ১০১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আগস্ট ১০২১ খ্রিষ্টাব্দ) | পাঁচ বছর।

৫০০ | খিলাফতে বনু উমাইয়া | তারিখ উম্মতে মুসলিমা

২১ | ইয়াহইয়া বিন আলী বিন হান্মুদ | জুমাদাল উলা ৪১২ হিজরি হতে যিলকদ ৪১৩ হিজরি (আগস্ট ১০২১ খ্রি. হতে ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রি.) | কয়েক মাস

২২ | আল-কাসিম বিন হান্মুদ - পুনরায় | যিলকদ ৪১৩ হিজরি হতে জুমাদাল আখিরা ৪১৪ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রি. হতে সেপ্টেম্বর ১০২৩ খ্রি.) | এক বছর

২৩ | আবদুর রহমান বিন হিশাম, আল-মুসতাহযির | রমজান ৪১৪ হিজরি হতে যিলকদ ৪১৪ হিজরি (ডিসেম্বর ১০২৩ খ্রি. হতে ফেব্রুয়ারি ১০২৪ খ্রি.) | কয়েক মাস

২৪ | মুহাম্মদ আস-সালিস আল-মুসতাকফি | যিলকদ ৪১৪ হিজরি হতে রবিউল আউয়াল ৪১৬ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১০২৪ খ্রি. হতে জুন ১০২৫ খ্রি.) | দুই বছর

২৫ | ইয়াহইয়া বিন আলী - পুনরায় | রমজান ৪১৬ হিজরি হতে রবিউল আউয়াল ৪১৭ হিজরি (নভেম্বর ১০২৫ খ্রি. হতে মে ১০২৬ খ্রি.) | দুই বছর

২৬ | হিশাম আস-সালিস আল-মু'তাদ বিল্লাহ | রবিউল আখির ৪১৮ হিজরি হতে যিলকদ ৪২২ হিজরি (জুন ১০২৭ খ্রি. হতে নভেম্বর ১০৩১ খ্রি.) | চার বছর

+++

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

মুলুকুত তাওয়াইফ

৪০০ হিজরি থেকে ৪৮৩ হিজরি

(১০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

৮৩ বছর

চরম বিশৃঙ্খলা ও বিকেন্দ্রীকরণ

কর্ডোভায় উমাইয়া শাসনের পতন শুরু হওয়ার সাথে সাথেই পুরো দেশের প্রদেশগুলো স্বাধীন হতে শুরু করে। প্রায় প্রতি বছরই এক বা দুটি শহর স্বায়ত্তশাসনের দাবি করত এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণ করার সাহস পেত না।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রথম আবদুর রহমান নিজের জীবন বাজি রেখে যে আন্দালুস অর্জন করেছিলেন এবং আবদুর রহমান আন-নাসির ও হাজিব আল-মনসুর বছরের পর বছর জিহাদের মাধ্যমে যেসব শহর জয় করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা হিন্নভিন্ন হয়ে গেল। স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদ এবং ক্ষমতার লোভী জেনারেলরা ইসলামি আন্দালুসকে টুকরো টুকরো করে বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত করে ফেলে। এরপর প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ক্ষমতার একাধিক দাবিদার তৈরি হয় এবং এক অন্তর্হীন সংঘাত শুরু হয়।

এভাবে হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে এখানে অনেকগুলো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের মধ্যে কিছু শাসক খিলাফতের দাবিদারও হয়ে বসেন এবং আব্বাসীয় খলিফাদের মতো নিজেদের নামের সাথে বিল্লাহ, মিনাল্লাহ, লিল্লাহ-এর মতো উপাধি যুক্ত করতে শুরু করেন। অবশিষ্ট ইসলামি বিশ্বে তাদের “মুলুকুত তাওয়াইফ” বলা হতো। তাদের মধ্যে বিখ্যাত সরকারগুলো নিম্নরূপ:

নং সরকার বংশ অঞ্চল বিখ্যাত শাসক

১ দৌলতে বনী হামুদ আলভী ইদ্রিসি (আরব) মালাগা, আল-জাজিরা, পরে কর্ডোভা আলী বিন হামুদ, কাসিম বিন হামুদ, ইয়াহইয়া, ইদ্রিস

২ দৌলতে বনী জাহওয়ার বনু কালব (আরব) কর্ডোভা, ওয়াদিল কাবির আবুল হাযম ইবনে জাহওয়ার, আবুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ার

৩ দৌলতে বনী যুন-নুন হাওয়ারা (বার্বার) টলেডো, পরে কর্ডোভাও ইসমাইল যুন-নুন, ইয়াহইয়া আল-মামুন, ইয়াহইয়া আল-কাদির

৪ দৌলতে বনী আব্বাদ বনু লাখম (আরব) সেভিল, পরে কর্ডোভাও কাজী আবুল কাসিম, মুতাদিদ, মুতামিদ

৫ দৌলতে বনী তুজীব বনু তুজীব (আরব) সারাগোসা, লারিদা, তুতিলা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা মুনঘির বিন ইয়াহইয়া

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — ৫০৩

ক্রমিক রাষ্ট্র বংশ অঞ্চল শাসকগণ

৬ দাওলাত বনী হুদ বনু হুদ (আরব) কালাত আইয়ুব, তারপর সারাগোসাও সুলাইমান বিন হুদ আল-মুসতাসিন, আহমদ আল-মুকতাদির, ইউসুফ আল-মুতামিন, আহমদ আল-মুসতাসিন

৭ দাওলাত বনী আফতাস বনু আফতাস (বারবার) বাদাজোজ, মেরিদা, লিসবন, কোইম্ব্রা, পর্তুগালের মধ্যবর্তী অঞ্চল ইবনে আফতাস, মুহাম্মদ আল-মুজাফফর, আবু হাফস উমর আল-মুতাওয়াক্কিল

৮ দাওলাত বনী জিরি বনু জিরি (বারবার) গ্রানাডা, ওয়াদি আল-কাবির জাউয়ি বিন জিরি, হাবুস, বাদিস বিন হাবুস, তামীম, আবদুল্লাহ

৯ দাওলাত বনী মুজাইন বনু মুজাইন (আরব) বেজা, সিলভেস, মার্তোলা, পর্তুগালের দক্ষিণ উপকূল কাজি ইসা, ইবনে আবি বকর মুজাইন

১০ দাওলাত বনী রাজিন বনু রাজিন (বারবার) সাহলা, সান্তামারিয়া শারকি হুদাইল বিন আব্দুল মালিক

১১ দাওলাত বনী ফিহর বনু ফিহর (আরব) ভ্যালেন্সিয়া, পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল আবদুল্লাহ বিন আল-কাসিম আল-ফিহরি

১২ দাওলাত বনী বকর বনু বকর (আরব) উয়েলভা, নিবলা আব্দুল আজিজ আল-বাকরি

১৩ দাওলাত বনী হারুন বনু হারুন (সম্ভবত আরব) সান্তামারিয়া গারবি

১৫ দাওলাত বনী ইয়াহইয়া বনু মুসহাব (আরব) নিবলা আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-মুসহাবি

১৬ দাওলাত আস-সাকালেবা সাকালেবা আমিরগণ, বনু আমির মুরসিয়া, শাতিবা, পূর্ব উপকূল খায়রান, জুহাইর

১৭ দাওলাত বনী বারজাল বনু বারজাল (বারবার) কারমোনা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বারজালি

১৮ দাওলাত বনী সামাদিহ বনু তুজিব (আরব) আলমেরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল মান বিন মুহাম্মদ আবি ইয়াহইয়া বিন সামাদিহ, মুতাসিম

১৯ দাওলাত বনী মুজাহিদ সাকলাবি দেনিয়া, বালেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (মায়োর্কা, মিনোর্কা, ইবিজা) মুজাহিদ বিন ইউসুফ, ইকবাল আদ-দাওলা

২০ দাওলাত বনী ইফরান বনু ইফরান (বারবার) রোভা আবু নুর বিন আবি কুররা ইফরানি

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের আত্মপ্রদর্শন

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে বনু যুন-নুন, বনু আব্বাদ, বনু যিরি এবং বনু হাফস-এর রাজ্যগুলো বেশ বিস্তৃত ছিল। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল যা মাত্র দুই-চারটি শহর বা কয়েকটি দুর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু রাজ্যের তো একটি বড় শহরও নসিব হয়নি, বরং তারা কেবল একটি দুর্গ বা কয়েকটি গ্রামের জায়গিরদার হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের খেয়ালখুশিমতো ‘বাদশাহ’ ও ‘খলিফা’ এবং ‘আমিরুল মুমিনিন’ ও ‘খলিফাতুল মুসলিমিন’ বলে দাবি করত এবং আব্বাসীয় খলিফাদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ উপাধি গ্রহণ করত। তাদের মধ্যে কেউ ছিল ‘আন-নাসির’, কেউ ‘আল-মনসুর’, কেউ ‘আল-মু’তাদিদ’, কেউ ‘আল-মু’তামাদ’, কেউ ‘আল-কাদির বিল্লাহ’ এবং কেউ ‘আল-মুতাওয়াঙ্কিল’।

এমন এক সময়ও এসেছিল যখন কর্ডোভার খলিফা ছাড়াও দক্ষিণ আন্দালুসের প্রায় ৬০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে একই সময়ে তিনজন খলিফা সিংহাসনে আসীন ছিলেন—আলজাজিরাতুল খাদরায় মুহাম্মদ বিন কাসিম (বনু হামুদ), মালাগাতে মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস (বনু আলী বিন হামুদ) এবং অধিকাংশ অঞ্চলে ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (বনু হামুদ)। [১]

এই যুগের একজন কবি ইবনে রশীদ (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি) তাদের অবস্থা এবং এই উপাধিগুলোর তুলনা করতে গিয়ে বলেন:

مَّا يُزْهِدُنِي فِي أَرْضِ أَدْلُسٍ ... سَمَاعٌ مُّقْتَدِرٌ فِيهَا وَمُعْتَضِدٌ

“আন্দালুসের মাটিতে আমার অনীহা জাগে যখন আমি সেখানে ‘মুক্তাদির’ এবং ‘মু’তাদিদ’-এর নাম শুনতে পাই।”

أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ... كَالْهَرِّ يَحْكِي اتِّفَاحًا صَوْلَةَ الْأَسَدِ

“এই রাজকীয় উপাধিগুলো ভুল জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন কোনো বিড়াল নিজেকে ফুলিয়ে বাঘের গর্জন অনুকরণ করে।” [২]

অন্য একজন কবি বলেন:

وَتَفَرَّقُوا شِيعًا فَكُلُّ مَحَلَّةٍ ... فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْبَرٌ

“এই লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, ফলে প্রতিটি মহল্লায় একজন আমিরুল মুমিনিন এবং একটি মিম্বর রয়েছে।” [৩]

কাব্য ও সাহিত্যের অঙ্গন

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের এই আত্মকেন্দ্রিক শাসনামলে আন্দালুসের দরবারগুলোতে যোগ্য ও গম্ভীর ব্যক্তিদের জন্য কোনো স্থান ছিল না। উলামা ও ফকিহগণ, যারা আগে আন্দালুসের রাজনীতির প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, এখন তারা হয় উপেক্ষিত হচ্ছিলেন অথবা তাদের কেবল সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। সংকীর্ণমনা, ধূর্ত এবং স্বার্থান্বেষী লোকেরা সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল। শাসকরা উলামা ও নীতিবান আমিরদের পরিবর্তে চাটুকার ও দরবারি কবিদের বেশি পছন্দ করতেন। এটাই ছিল কারণ যে প্রতিটি দরবারে কবি ও সাহিত্যিকদের ভিড় বাড়তে থাকে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৩৮

[২] আল-মু’জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ১/৫৯; খারিদাতুল কাসর ওয়া জারিদাতুল আসর লিল ইমাদ কাতিব আল-ইসফাহানি, বিভাগ: শুয়ারাউল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস: ১/৭৩

[৩] আমালুল আলাম ফিমান বুয়িআ কাবলাল ইহতিলাম: ২/৩২২

যদি এই কবি ও সাহিত্যিকগণ একটি জীবন্ত জাতির প্রতিনিধিত্ব করে শাসকদের আগত বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতেন এবং জনগণের মধ্যে চেতনা ও জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা করতেন, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের যোগ্যতার প্রশংসা কিয়ামত পর্যন্ত হতো। কিন্তু তারা কেবল পুরস্কার ও পদের লোভে নিজেদের প্রতিভাকে জনগণের অসচেতনতা এবং শাসকদের আত্মবিস্মৃতির জন্য ব্যবহার করেছেন। শাসকদের অধিক থেকে অধিকতর খুশি করতে এবং বড় বড় পুরস্কার পেতে যেখানে তাদেরকে মহান বিজয়ী হিসেবে প্রমাণ করা জরুরি ছিল, সেখানে তাদের বিরোধীদের প্রতি বিদ্রূপ করা এবং তাদের উপহাস করাও আবশ্যিক ছিল। ফলে আন্দালুসে যেখানে কাসিদা পাঠ ও প্রশংসাগাথার শিল্প শিখরে পৌঁছেছিল, সেখানে নিন্দাগাথা বা ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও উন্নতির শিখরে ছিল।

এই যুগের একজন কবি বিরোধী আমিরদের নিন্দা করতে গিয়ে বলেন:

خُتِمَ فَهْنُهُمْ وَكُمُ أَهْنُهُمْ ... زَمَانَ كُنْتُمْ بِلَا عِيُونِ

“তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তাই লাঞ্ছিত হয়েছ, তোমরা অন্ধ হয়ে দীর্ঘকাল ধরে জামানাকে অপমান করেছ।”

فَأَنْتُمْ تَحْتَ كُلِّ تَحْتٍ ... وَأَنْتُمْ دُونَ كُلِّ دُونَ

“অতঃপর এখন তোমরা প্রত্যেক অধীনের অধীনে পরিণত হয়েছ এবং প্রত্যেক নীচ ব্যক্তির চেয়েও নীচ হয়ে গেছ।”

سَكَنْتُمْ يَا رِيَّاحَ عَادٍ ... وَكُلُّ رِيحٍ إِلَى سُكُونِ

“হে আদ জাতির ঝোড়ো হাওয়া! তোমরা থেমে গেছ, আর প্রতিটি ঝড়ই শেষ পর্যন্ত থেমে যায়।” [১]

অনেক কবি নিন্দাগাথায় অশ্লীল এবং নৈতিকতাহীন নোংরা কথা অন্তর্ভুক্ত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিছু কবি তো সমস্ত সীমা অতিক্রম করে দ্বীন ও আকিদাকেও উপহাসের পাত্র বানিয়ে ফেলতেন। না তাদের নিজেদের ঈমানের চিন্তা ছিল, না তাদের কালাম শ্রবণকারী শাসক ও দরবারীদের। একজন কবি আরবদের সমর্থনে বারবার নেতার নিন্দা করতে গিয়ে বলেছিলেন:

رَأَيْتُ آدَمَ فِي نَوْمِي فَقُلْتُ لَهُ ... أَبَا الْبَرِيَّةِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ حَكَمُوا

“আমি স্বপ্নে আদম (আলাইহিস সালাম)-কে দেখলাম এবং তাকে বললাম: হে মানবজাতির পিতা! মানুষ ফয়সালা চায় যে...”

إِنَّ الْبَرَّابِرَ نَسْلُ مِنْكَ قَالَ إِذَنْ ... حَوَاءُ طَالِقَةٌ إِنْ كَانَ مَا زَعَمُوا

“বারবাররা আপনার বংশধর কি না। তিনি বলতে লাগলেন: যদি বারবাররা সত্যিই আমার বংশধর হয় তবে হাওয়া তালুক।” [২]

মাআযাল্লাহ, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

কাসিদা পাঠের চরম শিখর:

যখন দরবারী কবিরা তাদের সুলতানের প্রশংসা করতে গিয়ে তার বিরোধীদের প্রতি বিদ্রূপের তীর ছুড়তেন, তখন তিনি নিশ্চিত হতেন যে তিনি ইহকাল ও পরকালে উচ্চমর্যাদাশীল, অথচ তার রাজনৈতিক বিরোধী সমস্ত সৃষ্টির সামনে লাঞ্ছিত হয়েছে। এই শাসকরা সেই খ্রিস্টানদের ভয়ে কাঁপতেন যারা গতকাল পর্যন্ত মুসলমানদের খরাজ প্রদান করত। তাদের অন্ধত্বের অবস্থা এমন ছিল যে, যে সময় উত্তর...

[১] তারিখুল আদাবিল আন্দালুসি আসরুত তাওয়ায়েফ: ১/ ১২৪

[২] তারিখুল আদাবিল আন্দালুসি আসরুত তাওয়ায়েফ: ১/ ১২১

খ্রিস্টানরা তাদের বিরুদ্ধে তলোয়ার শানাচ্ছিল, আর তারা একে অপরের প্রাণ নিতে ব্যস্ত ছিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন আমরা সেই যুগের সাহিত্যিক ও কাব্যিক ভাণ্ডার অধ্যয়ন করি, তখন আমরা এই অযোগ্য, দুর্বল এবং অদূরদর্শী শাসকদের সম্পর্কেও প্রশংসার স্তুতিতে ভরা পঙক্তি দেখতে পাই। ইতিহাস যদি আমাদের না জানাত যে সেই যুগে আন্দালুসের অবস্থা কতটা শোচনীয় ও ধ্বংসাত্মক ছিল এবং আমীর ও রাজন্যবর্গ ভবিষ্যতের বিপদ থেকে কীভাবে চোখ বন্ধ করে রেখেছিলেন, তবে নিশ্চিতভাবেই এই সাহিত্য পড়ে আমাদের বিশ্বাস হতো যে মুলুকুত তাওয়ায়েফের প্রত্যেকেই এক একজন সর্বগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার ওপর দৃষ্টিপাত করার পর এই বিশ্বাস জন্মে যে, এই সমস্ত কাব্যিক ভাণ্ডার সীমাহীন তোষামোদ, চরম অতিরঞ্জন এবং কৃত্রিম অলঙ্করণে ভরপুর। এতে সত্যের চেয়ে নাম ও কল্পকাহিনীই বেশি।

হ্যাঁ, এটা মানতেই হবে যে মুলুকুত তাওয়ায়েফের যুগে আন্দালুসে কাব্য ও সাহিত্য, রচনাইশৈলী এবং বাগ্মিতা তার শিখরে পৌঁছেছিল। কল্পনাপ্রসূত অলঙ্কার এবং বাকপটুতার চরম অবস্থা এমন ছিল যে তিলকে তাল করা যেত। মুলুকুত তাওয়ায়েফের সাহিত্যিক ও বাগ্মীরা সত্যিই এই স্তরে পৌঁছেছিলেন। একজন ভীরা ব্যক্তিকে সিংহের মতো বীর, দুই দুর্গের জায়গিরদারকে সেকান্দারের মতো বিজয়ী, কৃপণতম ব্যক্তিকে হাতেম তায়ীর চেয়েও দানশীল এবং একজন লম্পট ও অযোগ্য শাসককে খলিফা বা ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করা তাদের বাম হাতের কাজ ছিল। খ্রিস্টানদের কর প্রদানকারী একজন শাসক সম্পর্কে একজন দরবারী কবি বলতেন:

مَنْ لَا تُوَاَزِنُهُ الْجِبَالُ إِذَا احْتَبَى ... مَنْ لَا تُسَابِقُهُ الرِّيَّاحُ إِذَا جَرَى

“তিনি এমন এক সত্তা যে, যখন তিনি বসেন তখন পাহাড়ও তাঁর ওজনের সাথে পাল্লা দিতে পারে না। আর যখন তিনি দৌড়ান তখন ঝড়ও তাঁর আগে যেতে পারে না।”

وَسَمِعْتُ بِاسْمِ الْقَطْرِ حَتَّى شِمْتُهُ ... فَرَأَيْتُهُ فِي بُرْدَتِيهِ مُصَوَّرًا

“আমি বৃষ্টির কেবল নামই শুনেছিলাম, কিন্তু যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম তখন তাঁর পোশাকেই বৃষ্টির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম।”

[১] وَجَهَلْتُ مَعْنَى الْجُودِ حَتَّى زُرْتُهُ ... فَقَرَأْتُهُ فِي رَاحَتِيهِ مُفَسَّرًا

“আমি দানশীলতার অর্থ জানতাম না, কিন্তু যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তাঁর হাতের তালুতে এর ব্যাখ্যা পড়ে নিলাম।”

অন্য এক কবি মিয়োরকা দ্বীপের ছোট এক রাজ্যের শাসকের প্রশংসা করতে গিয়ে বলতেন:

وَعَمَّرَتْ بِالْإِحْسَانِ أَفُقَ مَيُورَقَةَ ... وَبَنَيْتَ فِيهَا مَا بَنَى الْإِسْكَندَرُ

“আপনি মিয়োরকার আকাশকে অনুগ্রহ দ্বারা আবাদ করেছেন... আপনি সেখানে সেকান্দারের দেয়ালের মতো মজবুত কিছু নির্মাণ করেছেন।”

[২] فَكَأَنَّهَا بَغْدَادُ، أَنْتَ رَشِيدُهَا ... وَوَزِيرُهَا وَلَهُ السَّلَامَةُ جَعْفَرُ

“যেন এটি বাগদাদ আর আপনি হারুনুর রশিদ, আর আল্লাহ তাঁর উজির জাফরকে শান্তিতে রাখুন যিনি এখানে আছেন।”

[১] আল-মুতরিব মিন আশআর আহলিল মাগরিব: ১/৩৮

[২] আল-মুতরিব মিন আশআর আহলিল মাগরিব: ১/৫১

শাসকরা এই কাব্যিক বিজয়গুলোতে আনন্দিত হতেন এবং নিজেদেরকে প্রকৃত বিশ্ববিজয়ী ও জগতজয়ী মনে করতে শুরু করতেন। তারা বাস্তব অবস্থা থেকে গাফেল হয়ে কাসিদার কাল্পনিক জগতে বাস করছিলেন। অস্ত্র নির্মাণ ও জাহাজ তৈরির কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, পক্ষান্তরে বাদ্যযন্ত্রের শিল্প ছিল চরম শিখরে এবং এগুলোর ত্রোতাও ছিল প্রচুর। শাহজাদা ও আমীর-ওমরাওরা রূপ-লাবণ্যের পাশাপাশি গায়কীতে পারদর্শী দাসীদের ক্রয় করতেন। গান গেয়ে মন ভুলানো এক একজন দাসী তেত্রিশ হাজার দিনারে (প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা) বিক্রি হতো।

দরবারগুলোর এই পরিবেশ নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ওপরও প্রভাব ফেলছিল। কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল এবং টলেডোর দাপট কেবল বুদ্ধিজীবী ও সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং রাজমিস্ত্রি, কৃষক, কুলি, তাঁতি এবং জেলেরা পর্যন্ত কথায় কথায় কবিতা বলত। এর পাশাপাশি গায়কী ও সঙ্গীতবিদ্যার জনপ্রিয়তাও ছিল তুঙ্গে। গ্রানাডার ইবনে হামারা এবং কর্ডোভার ইবনে শিমউন নামক এক ইহুদি সঙ্গীতের নামকরা শিক্ষক ছিলেন। সেভিলের আবু বকর এবং মালগার ইবনে হামুদ এর গায়কী বিশ্বজুড়ে সমাদৃত ছিল। [১]

কর্ডোভা এবং বনু জাহওয়ার রাষ্ট্র

আন্দালুসের এই রাজনৈতিক সংকটের সময়ে কর্ডোভায় বনু জাহওয়ারের অস্তিত্ব ছিল একটি রহমত। সেখানে খিলাফত বিলুপ্তির ঘোষণার পর কর্ডোভার আমীরগণ ৪২২ হিজরীর জিলহজ মাসে একটি বিস্তৃত ও শক্তিশালী মজলিসে শূরা গঠন করেন। পারস্পরিক পরামর্শের পর তারা পূর্বতন উজির আবু আল-হাজম ইবনে জাহওয়ারকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত করেন। মুসলিম ইতিহাসে কয়েক শতাব্দী পর দেখা গেল যে, ব্যক্তিগত ও বংশানুক্রমিক শাসন এবং স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের পরামর্শের মূলনীতি এবং জনমতের সাথে সংগতি রেখে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকার কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আত্মরক্ষায় সফল প্রমাণিত হয়েছে।

ইবনে জাহওয়ার ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। তিনি সব দিক থেকেই এই দায়িত্বের যোগ্য ছিলেন। তিনি রাজকীয় চালচলন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে তিনি নিজের ব্যক্তিগত বাসভবনে অবস্থান করতেন, যেখানে সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের জন্য দরজা খোলা থাকত। তিনি প্রতিটি কাজ মজলিসে শূরার পরামর্শ নিয়ে করতেন। তিনি কর্ডোভার স্থানীয় লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি সেনাবাহিনী তৈরি করেন এবং বিদ্রোহী উপাদান ও বার্বারদের সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করেন।

এই সরকার আন্দালুসের একটি ছোট কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যার মধ্যে কর্ডোভা ছাড়াও ওয়াদিউল কাবীর এবং জাবালুশ শারাতের কিছু শহর ও গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মজলিসে শূরায় অত্যন্ত জ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে উজির আবু আল-ওয়ালিদ ইবনে যায়দুন এবং আন্দালুসের মহান ঐতিহাসিক আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসীর নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

আবু আল-হাজম ইবনে জাহওয়ার তেরো বছর অত্যন্ত সফলভাবে শাসন করেন। ৪৩৫ হিজরীতে তাঁর মৃত্যুর পর শূরা...

[১] তারিখুল আদাব আল-আন্দালুসী, আসরুত তাওয়াইফ: ৪২১/১, ৫২০।

তিনি তার পুত্র আবুল ওয়ালিদ ইবনে জাহওয়ারকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করলেন। তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এবং জাতীয় কল্যাণ কামনার আবেগে পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। তিনি ২২ বছর ধরে মানুষের এমনভাবে সেবা করেছেন যে কাউকে অভিযোগ করার সুযোগ দেননি। [১]

ইশবিলিয়া রাষ্ট্র এবং বনু আব্বাদ

কর্ডোভার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল ইশবিলিয়া (সেভিল)। মানসুর আল-আজমের সময় থেকে এখানে আরব গোত্র বনু লাখমের একজন বিদ্বান ব্যক্তি আবুল কাসিম ইসমাইল ইবনে আব্বাদ বিচারকের (কাজী) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন কর্ডোভার কেন্দ্রীয় সরকার সংকটের সম্মুখীন হয়, তখন কাজী সাহেব বেশ বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বিচারকের পদটি তার পুত্র আবুল কাসিমের হাতে সোপর্দ করেন। সেই সময় কর্ডোভায় উমাইয়া রাজপুত্র এবং বনু হাম্মুদের আমিররা পর্যায়ক্রমে শাসন করেও রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং সেই সাথে তারা ইশবিলিয়াকেও এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে কর্ডোভার উজির আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মারিয়াম কাজী ইসমাইল ইবনে আব্বাদ এবং ফকিহ আবু আবদুল্লাহ জুবাইদির সাথে মিলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরামর্শ সভা (শুরা মজলিস) গঠন করেন এবং ইশবিলিয়া সংক্রান্ত সমস্ত আদেশ এই তিনজনের স্বাক্ষরে জারি হতে থাকে। তবে এই মজলিসে কাজী ইসমাইল ইবনে আব্বাদের মর্যাদা কিছুটা উচ্চতর ছিল। জমাদিউল আখিরা ৪১৩ হিজরিতে কাসিম ইবনে হাম্মুদ কর্ডোভা থেকে পালিয়ে ইশবিলিয়ায় আশ্রয় নিতে এলে এই অন্তর্বর্তীকালীন মজলিসের সিদ্ধান্তে তাকে শহরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়। এভাবে ইশবিলিয়া এই অসার রাজনীতি থেকে আলাদা হয়ে নিজের পরিচয় তৈরি করে।

কিছুকাল পর শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মতিতে কাজী ইসমাইলের পুত্র আবুল কাসিমকে ইশবিলিয়ার পরামর্শক প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। সেই দিনগুলোতে ইশবিলিয়ার ওপর বারবারদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। আবুল কাসিম ইশবিলিয়ার বারবার নেতাদেরও শহর থেকে বের করে দেন এবং একই সাথে বারবারদের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেন যে, ইশবিলিয়া সরকার বারবার ও আরবদের বিবাদে নিরপেক্ষ থাকবে এবং বারবার নেতাদের একটি সম্মানজনক বার্ষিক অর্থ প্রদান করতে থাকবে। এভাবে আবুল কাসিম ইশবিলিয়াকে বারবারদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ইশবিলিয়াকে নিরাপদ মনে করে বারবারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ অসংখ্য আরব এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। আবুল কাসিম ইশবিলিয়ায় ২০ বছর শাসন করেন। তিনি কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করতে না পারলেও বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত আরবদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল অবশ্যই নিশ্চিত করেছিলেন। [২]

মুতাদিদ-এর যুগ:

৪৩৩ হিজরিতে আবুল কাসিমের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু আমর নিজের নামের সাথে ‘মুতাদিদ’ উপাধি ধারণ করে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে সিংহাসনে বসেন। তিনি বিপরীতধর্মী গুণের অধিকারী এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন। তার গোয়েন্দারা পুরো আন্দালুসে সক্রিয় থাকত। তিনি সাধারণ মানুষকে গোয়েন্দাগিরির জন্য এমনভাবে ব্যবহার করতেন যে তারাও বুঝতে পারত না যে...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ২০৪, ২০৫, ত. দারুল ফিকর; আল-বায়ানুল মাগরিব: ৩/ ১৫০ থেকে ১৫৫; আল-হুলাতুস সিয়ারা: ১/ ২৪৫; নাফহত তিব: ৪/ ৩০২, ৩৩০; আল-মুকতাবাস মিন আনবাউল আন্দালুস লি-ইবনে হাইয়ান: ৩/ ৩৫ থেকে ৪৫

[২] আল-মু’জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ১/ ৭২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ৩২ থেকে ৩৫

৫০৯ — তারীখে উম্মতে মুসলিমা

কোনো এক মিশন সম্পন্ন করা হচ্ছে। একবার তিনি এক বেদুইনকে ডাকলেন এবং তাকে একটি চমৎকার জুব্বা পরিয়ে দিয়ে হুকুম দিলেন যে, সে যেন জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে এবং তা বারবারদের শাসিত এলাকা কারমুনায় গিয়ে বিক্রি করে, তবে পাঁচ দিরহামের কম দামে নয়।

বেদুইন কাঠ কাটা এবং তা বহন করায় অভ্যস্ত ছিল না। সে সামান্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করল, কারমুনায় পৌঁছাল এবং বাজারে পাঁচ দিরহাম হাঁকতে শুরু করল। মানুষ হাসতে হাসতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল যে, আধা দিরহামের জিনিস পাঁচ দিরহামে বিক্রয়কারী এই ব্যক্তি পাগল।

কিছু সাধারণ মানুষ দূর থেকে সন্দেহ করছিল যে, এই বেদুইন হয়তো আবলুস বা চন্দন কাঠ এনেছে বলেই এত দাম হাঁকছে, কিন্তু কাছে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিত। সারা দিন কেটে গেল। সন্ধ্যায় এক অপরিচিত ব্যক্তি এল এবং বলল: “কাঠের বোঝাটি আমার বাড়িতে পৌঁছে দাও, আমি পাঁচ দিরহাম দেব।”

বেদুইন বোঝাটি তুলে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। অপরিচিত ব্যক্তি তাকে পাঁচ দিরহাম দিয়ে দিল কিন্তু সাথে বলল:

“তুমি কি জানো যে বারবাররা কতটা বিপজ্জনক এবং নিষ্ঠুর? রাতটা এখানেই থেকে যাও।”

বেদুইনের জন্য বিছানা করা হলো, যখন সে শুতে গেল তখন অপরিচিত ব্যক্তি বলল: “জুব্বাটি খুলে রাখো, ভালো ঘুম আসবে।”

বেদুইন জুব্বাটি খুলে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেল। অপরিচিত ব্যক্তিটি ছিল মুতাদিদের গোয়েন্দা। তাকে আগে থেকেই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সে জুব্বার ভেতরের স্তরটি ছিঁড়ে ফেলল। মুতাদিদের গোপন চিঠি ভেতরেই ছিল। গোয়েন্দা সেটি পাঠ করল। তারপর ফিরতি চিঠি লিখে ভেতরে রেখে জুব্বাটি আগের মতোই সেলাই করে দিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে বেদুইন পুনরায় ইশবিলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো। মুতাদিদের কাছে পৌঁছালে তিনি বললেন: “এই জুব্বাটি খুলে রাখো এবং আমার কাছ থেকে নতুন পোশাক নিয়ে নাও।”

তাকে অত্যন্ত চমৎকার পোশাক পরানো হলো এবং সে হাসিমুখে বাড়ি চলে গেল।

মুতাদিদ সেই জুব্বাটি খুলে তার গোয়েন্দার উত্তর পড়ে নিলেন, অথচ বেচারা বেদুইন টেরই পেল না যে সে কোনো বার্তা নিয়ে গিয়েছিল এবং তার উত্তর নিয়ে মুতাদিদের কাছে পৌঁছেছে।

মুতাদিদের কঠোরতা:

একদিকে তিনি যেমন কাব্য ও শিল্প-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, অন্যদিকে ছিলেন অত্যন্ত পাষণ্ড হৃদয়ের ও নির্দয়। তিনি তার পুত্র ইসমাইলকে বিদ্রোহের অপরাধে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। যার সাথে তার শত্রুতা হতো, তিনি যেকোনো মূল্যে তার প্রতিশোধ নিতেন। একজন মুয়াজ্জিন তার কঠোরতায় অতিষ্ঠ হয়ে তুলাইতুলা চলে গিয়েছিলেন এবং তাহাজ্জুদের সময় উঠে তাকে বদদোয়া দিতেন। মুতাদিদ যখন জানতে পারলেন, তখন এক গোপন কর্মকর্তাকে তার পেছনে পাঠালেন। যতক্ষণ না সেই গরিব লোকটির মাথা কেটে মুতাদিদের সামনে রাখা হলো, ততক্ষণ তার অহমিকা শান্ত হয়নি। এমনকি জনশ্রুতি আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি যে তার জুলুমের শিকার হয়েছিল এবং পালিয়ে আন্দালুস থেকে মক্কায় চলে গিয়েছিল, মুতাদিদ সেখানেও তার পিছু নিলেন এবং তাকে বিষ খাইয়ে হত্যা না করা পর্যন্ত মুতাদিদ স্বস্তি পাননি।

তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদ্রোহীদের বেছে বেছে হত্যা করতেন এবং তাদের মাথার খুলিগুলো নিজের বিশেষ বাগানে ফুলের টব হিসেবে স্থাপন করতেন।

[১] আল-মুজিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ১/৭৫

[২] সিয়রু আ'লামিন নুবালা: ১৯/৫৯, ত. আর-রিসালা

করত। টবগুলোতে নাম লিখে সেগুলোতে ফুলের চারা রোপণ করত। [১]

শারীরিক দিক থেকে সে ছিল ইম্পাত সদৃশ। তার দাসীদের সংখ্যা ছিল সত্তর, যাদের সাথে মদ্যপান ও কাবাব ভক্ষণ করে আসর জমানো তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এতটা বিলাসিতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কখনো শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়নি এবং সে কখনো নেশায় মাতাল হয়নি। সে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে খুব কমই নামত, তবে যুদ্ধের নকশা তৈরি এবং নেতৃত্বে তার বিশেষ দক্ষতা ছিল। তার গোয়েন্দা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রখর। মুলুকুত তাওয়ায়েফের প্রতিটি দরবারে তার গুপ্তচর বিদ্যমান ছিল। সে রাজনৈতিক চালে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। এটা ভিন্ন কথা যে, তার এই সমস্ত যোগ্যতা প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বিবাদেই ব্যয় হচ্ছিল। দক্ষিণ আন্দালুসের মুলুকুত তাওয়ায়েফ ছিল তার তলোয়ারের প্রধান লক্ষ্যবস্তু।

সে ৩৪৩ হিজরিতে ‘ওয়ালবা’ এবং ‘লাবলা’ দখল করে বনু বকর ও বনু ইয়াহইয়াকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করে। ৩৫০ হিজরিতে মুতাদিদ দক্ষিণ আন্দালুসে আরও অগ্রসর হয় এবং জাজিরাতুল খাদরা দখল করে বনু হাম্মুদকে সেখান থেকে বের করে দেয়। আবার ৩৫৫ হিজরিতে ‘শলব’ দখল করে ‘বনু মুজাইন’কেও ক্ষমতার বলয় থেকে উচ্ছেদ করে। [২]

মুতাদিদের বিজয় এবং বিরোধীদের ওপর জুলুম

এরপর সে দক্ষিণ-পূর্বের মোরোন এবং রোভার বারবার রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করে। এই আমিরদেরকে পুরোপুরি কবজা করার জন্য একটি ফাঁদ পাতা হয়েছিল। বারবার সরদাররা তাকে স্বাগত জানালেও অভ্যন্তরীণভাবে তারা তার বিরোধী ছিল। তাই একদিন তারা তাকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, তবে জনৈক রইস মুয়াজ বিন আবি কুররা তাদের বাধা দেন। মুতাদিদ এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেও না জানার ভান করে বারবারদের সাথে বন্ধুত্বের অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকে।

ইশবিলিয়ায় ফিরে এসে সে রোভা, মোরোন, আরকোস এবং মোরিকের বারবার সরদারদের এক জাঁকজমকপূর্ণ ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানায়। খাবারের আগে সে তাদের নিজের সুন্দর হাম্মামে (গোসলখানা) গোসলের জন্য পাঠায়। সবাই যখন ভেতরে প্রবেশ করল, তখন হঠাৎ করে বাতাসের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং তাপমাত্রা এতটাই বাড়িয়ে দেওয়া হলো যে সবাই গরমে ছটফট করে মারা গেল। এসবই মুতাদিদের নির্দেশে হয়েছিল। সে সমস্ত ছিদ্র প্লাস্টার করে বন্ধ করে দিয়েছিল। [৩]

ষাটজন বারবার সরদারের একসাথে মৃত্যুর ফলে দক্ষিণ আন্দালুসে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এবং আরব ও বারবারদের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। গ্রানাডার আমির বাদিস বারবারদের এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুতাদিদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু মুতাদিদ তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন। [৪]

এইসব বিজয়ের পর মুতাদিদ নিজেকে ইসলামী আন্দালুসের প্রাচীন রাজনৈতিক কেন্দ্র ‘কুরতুবা’র উত্তরাধিকারী মনে করতে শুরু করেন।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনুল ইজারি আল-মাররাফুশি: ৩/২০৫

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৫৩, ৫৬, ৬০

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৪/৫৯, ৬০, ত: আল-রিসালাহ

[৪] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৩০২, ত: দারুল ফিকর

গ্রানাডা দখলের চেষ্টাও শুরু করেছিলেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। মুতাদিদের এই রাজ্য বিস্তারের লালসার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য মুলুকুত তাওয়ায়েফগণ কাস্টিলের রাজা প্রথম ফার্ডিনান্ডকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়ে নেন এবং তাকে নিয়মিত কর দিতে শুরু করেন।

গ্রানাডা রাষ্ট্র এবং বাদিস বিন হাবুস

গ্রানাডায় বারবার সর্দার বাদিস বিন হাবুসের শাসন ছিল, যিনি ছিলেন মুতাদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও তিনি গ্রানাডায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন এবং ব্যাপক নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ করে নতুন নতুন ইমারতের মাধ্যমে একে একটি সুন্দর শহরে পরিণত করেছিলেন, তবে নৈতিকতা ও চরিত্রের দিক থেকে তিনি অত্যন্ত অধঃপতিত ছিলেন, বিশেষ করে বিরোধীদের জন্য তিনি ছিলেন এক আযাব। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন:

“তিনি তাঁর বিরোধীদের ধ্বংস করে দিতেন। ন্যায়ের পথ থেকে দূরে ছিলেন। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো অত্যন্ত নির্ভীকভাবে করতেন এবং লজ্জিতও হতেন না। পরিণতির পরোয়া না করে তিনি যা খুশি তা-ই করে ফেলতেন। জবানের আগে তলোয়ার ব্যবহার করতেন। তাঁর অনিষ্ট তাঁর কল্যাণের ওপর প্রবল ছিল। তিনি প্রতারকদের চেয়ে বড় প্রতারক এবং অপরাধীদের চেয়ে বড় অপরাধী ছিলেন।” [১]

বাদিসের ইনসাফ ছিল সবার চেয়ে আলাদা। একবার এক মহিলা এসে ফরিয়াদ করল: “হে আমির! আমার ছেলে অবাধ্য।” বাদিস তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তলোয়ার বের করলেন। মহিলা ঘাবড়ে গিয়ে বলতে লাগলেন: “হে আমির! আমি তো শুধু তাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলাম।” বাদিস বললেন: “আমি উস্তাদ নই যে কিতাব পড়াব।” এই বলে তলোয়ার চালালেন এবং ছেলের শিরশ্ছেদ করে দিলেন। [২]

গ্রানাডার ইহুদি উজির

মুমিনদের চেয়ে কাফেরদের ওপর তাঁর ভরসা বেশি ছিল। তিনি ইসমাইল বিন নাগরেলা নামক এক ইহুদিকে উজির বানিয়ে দেশের শাসনভার তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এই ইহুদি প্রশাসনিক কাজে অত্যন্ত দক্ষ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল। যদি সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো সরকারি চাকরি পেত তবে কোনো সমস্যা ছিল না, কিন্তু বাদিস তাকে সালতানাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে রেখেছিলেন, যা ছিল চরম অদূরদর্শিতার কাজ। গ্রানাডাবাসীদের কাছে নিজেদের ওপর একজন ইহুদির উপস্থিতি অত্যন্ত অসহনীয় ছিল। ইবনে নাগরেলার মৃত্যুর পর তারা আশা করেছিল যে এখন কোনো মুসলমান এই পদটি পাবে, কিন্তু বাদিস সেই ইহুদির ছেলে ইউসুফকে উজির বানিয়ে নিলেন। ইউসুফ তার বাবার চেয়েও অনেক বেশি চতুর প্রমাণিত হলো। সে সরকারি পদগুলোতে ইহুদিদের নিয়োগ দিয়ে গ্রানাডায় তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে শুরু করল। রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্থানে তার গুপ্তচর নিযুক্ত ছিল, যারা তাকে শাসক পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি নড়াচড়ার খবর দিত।

এসব কিছু হওয়া সত্ত্বেও বাদিস তার ইহুদি উজিরের ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন। তবে তাঁর বড় ছেলে এবং যুবরাজ শাহজাদা বুলুগগিন সাইফুদ দৌলা বিপদ অনুভব করেছিলেন। তিনি ইহুদি উজিরের সাথে বাহ্যিক সৌজন্য বজায় রাখছিলেন এবং তার...

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ১ / ৩২১, ত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[২] সয়ারু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৫৯১

সাথে সাথে সে উদ্ধতও ছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ইহুদিদের আধিপত্য বাদিসের পক্ষে একেবারেই সহ্য করার মতো ছিল না। অবস্থা এমন ছিল যে সে ইউসুফকে খতম করে দিত কিন্তু ইউসুফের গোয়েন্দারা তাকে সতর্ক করে দিল এবং সে শাহজাদা বুলুন্ধিনকে মদ্যপানের এক মজলিসে দাওয়াত দিল এবং তার পেয়ালায় বিষ মিশিয়ে দিল। শাহজাদা পেয়ালা পান করে মজলিস থেকে উঠতেই তার বমি হতে লাগল। অত্যন্ত কষ্টে সে নিজের প্রাসাদে পৌঁছাল এবং বিছানায় পড়ে গেল। তার অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকল এবং অবশেষে সে প্রাণ ত্যাগ করল।

বাদিস নিজের ছেলের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ইহুদি উজির নিজের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ রাখেনি। সে বাদিসকে বিশ্বাস করিয়ে দিল যে এটি কিছু গোলাম ও দাসীদের ষড়যন্ত্র। বাদিস একে সত্য মনে করে গোলাম ও দাসীদের হত্যা করল এবং নিজে নির্জনে গিয়ে বসল। ক্ষমতা এখন পূর্ণরূপে ইউসুফ ইহুদির হাতে চলে এল। গ্রানাডার উলামা, ফকিহ এবং জ্ঞানী ব্যক্তির এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। [১]

ইহুদি উজিরের জুলুমের বিরুদ্ধে কবিদের প্রতিবাদ:

একজন কবি ইবনুল আলজাদ এই পরিস্থিতির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন:

تَحَكَّمَتِ الْيَهُودُ عَلَى الْفُرُوجِ ... وَتَاهَتْ بِالْبَغَالِ وَالسُّرُوجِ

“ইহুদিরা আমাদের সম্মানের মালিক হয়ে গেছে... তারা খচ্চরের ওপর জিন লাগিয়ে দম্ভভরে ঘুরে বেড়ায়।”

وَقَامَتْ دَوْلَةُ الْأَنْدَالِ فِينَا ... وَصَارَ الْحُكْمُ فِينَا لِلْعُلُوجِ

“আমাদের ওপর নীচ লোকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে... আমাদের ওপর কর্তৃত্ব কাফেরদের হাতে চলে গেছে।”

فَقُلْ لِلْأَعْوَرِ الدَّجَالِ هَذَا ... زَمَانُكَ إِنْ عَزَمْتَ عَلَى الْخُرُوجِ

“কানা দাজ্জালকে বলে দাও... যদি তুমি আত্মপ্রকাশ করতে চাও তবে জেনে রাখো তোমার সময় এসে গেছে।”

ইহুদি কর্মকর্তারা মুসলমানদের ওপর কর আরোপ করেছিলেন যার কারণে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। একজন কবি আবু হাফস আল-কাউয়ি এর ওপর ফরিয়াদ করে বলেন:

كَمَا نَطَالِبُ لِلْيَهُودِ بِجَزِيَّةٍ ... وَارَى الْيَهُودَ بِجَزِيَّةٍ طَلَبُونَا

“আমরা ইহুদিদের কাছ থেকে জিজিয়া আদায় করতাম... কিন্তু আমি দেখছি যে ইহুদিরা আমাদের কাছে জিজিয়া চাচ্ছে।”

مَا إِنْ سَمِعْنَا مَالِكًا أَفْتَى بِذَا ... لَا، لَا، وَلَا مِنْ بَعْدِهِ سَخُونَا

“আমরা না ইমাম মালিকের কাছ থেকে এর বৈধতার ফতোয়া শুনেছি, আর না তার পরে সাহনুন থেকে এমন কিছু শুনেছি।”

সবচেয়ে কষ্টের বিষয় ছিল এই যে, ইহুদি নেতারা কুরআন মাজিদের সত্যতা নিয়ে আপত্তি করত এবং উলামাদের এই বিষয়ে উত্থাপিত করত। ইউসুফ ইহুদি রীতিমতো একটি বই লিখেছিল যাতে সে কুরআন মাজিদকে ভুল প্রমাণ করার অপচেষ্টা করেছিল।

[১] দৌলতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১৩২, ১৩৩।

...করা হয়েছিল। ফকিহ আবু ইসহাক আল-ইলবিরি (রহ.) এই পরিস্থিতির ওপর আফসোস প্রকাশ করে বলেছিলেন:

ফাসারাত হাওয়াইজুনা ইনদাহ... ওয়া নানু আলা সাবিহি কায়িমুন

“আমাদের প্রয়োজনসমূহ এই ইহুদির নিয়ন্ত্রণে... ফলে আমরা তার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি।”

ওয়া ইয়াদহাকু মিনা ওয়া মিন দিনিনা... ফাইনা ইলাল্লাহি ওয়া ইনা ইলাইহি রাজিউন

“সে আমাদের এবং আমাদের দীন নিয়ে উপহাস করে... সুতরাং ‘ইনা লিল্লাহি ওয়া ইনা ইলাইহি রাজিউন’।” [১]

ফকিহ আবু ইসহাকের এই কবিতাগুলো গ্রানাডার সেই মুসলমানদের আবেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল যারা ইউসুফ ইহুদির ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে উত্তেজিত ছিল। ফলে সফর ৪৫৯ হিজরির রাতে শহরবাসীরা মন্ত্রণালয় প্রাসাদে আক্রমণ করে ইউসুফ ইহুদিকে হত্যা করে। [২] এভাবে গ্রানাডায় ইহুদিদের শাসন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

বাদিস বিন হাবুস ২৭ বছর দীর্ঘ শাসন শেষে শাওয়াল ৪৬৫ হিজরি (জুলাই ১০৭৩ খ্রি.)-তে মৃত্যুবরণ করেন। আন্দালুসে বারবারদের মধ্যে তার চেয়ে শক্তিশালী কোনো শাসক অতিবাহিত হয়নি। তার পর রাষ্ট্রের আমীরগণ তার অল্পবয়সী নাতি আবদুল্লাহ বিন বুলকিনকে সিংহাসনে বসান (কেননা সালতানাতের উত্তরাধিকারী বুলকিন সাইফুদ দৌলা ইহুদি উজিরের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন)। [৩]

পূর্ব আন্দালুসের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ

এই সময়ে পূর্ব আন্দালুসের উপকূলীয় শহরসমূহ: বালানসিয়া, আল-মারিয়া এবং মুরসিয়াতে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যেগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফুসতাতের সেই সাকালিবা কর্মকর্তাগণ যারা ইবনে আবি আমির হাজিব আল-মানসুরের মাওয়ালি হওয়ার কারণে আমিরি নামে পরিচিত ছিলেন।

- দানিয়া: মুজাহিদ আমিরি ৪০৮ হিজরিতে দানিয়ার সুন্দর উপকূলে নিজের ছোট একটি শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি পূর্বদিকের দ্বীপপুঞ্জ: মিওরকা, মিনুরকা এবং ইয়াবিসা-কেও নিজের শাসনাধীনে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই ব্যক্তি নৌ-যুদ্ধে ব্যাপক অভিজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি বাণিজ্যিক বিষয়েও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। এ কারণে ‘দানিয়া’ রাষ্ট্রটি ধন-সম্পদে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে যায়। ২৮ বছর শাসন করার পর ৪৩৬ হিজরিতে মুজাহিদের মৃত্যু হয় এবং এখানকার মসনদ তার পুত্র আলী বিন মুজাহিদ ইকবালুদ দৌলা গ্রহণ করেন। [৪]

[১] তারিখুল আদাব আল-আন্দালুসি আসরুত তাওয়ায়েফ: ১/১৩৫, ১৩৭, ১৩৮

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১৩৫, ১৩৬

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১৩৯, ১৪২

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৯৩, ২০৩

[৫] ৪৬৮ হিজরিতে তার শাসন মুরাবিতুনদের হাতে শেষ হয়ে যায়।

তারিখ-ই ইসলাম — খণ্ড ২

বালেঙ্গিয়া

দুই সিসিলীয় অফিসার মুবারক এবং মুজাফফর ৪০০ হিজরিতে মহান উপকূলীয় শহর বালেঙ্গিয়াকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এই দুজন ছিলেন ‘এক প্রাণ দুই দেহ’-এর মূর্ত প্রতীক। তারা সর্বদা একসাথে থাকতেন এবং প্রতিটি কাজ মিলেমিশে করতেন। তারা অত্যন্ত ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে এই নতুন রাষ্ট্রকে বিকশিত করেছিলেন। যদিও তারা দুজন শিক্ষিত ছিলেন না, তবে তারা অবশ্যই জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাদের দরবার শীর্ষস্থানীয় উলামা ও গুণীজনদের দ্বারা পূর্ণ থাকত, যাদের মধ্যে ইবনে নাকরানি, আল্লামা মুহাম্মাব এবং ইবনে তালুতের মতো ব্যক্তির ছিলেন।

মুবারক এবং মুজাফফর একসাথেই জীবন অতিবাহিত করেন এবং সামান্য ব্যবধানে একই বছর অর্থাৎ ৪০৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

তাদের পর হাজিব আল-মানসুরের নাতি আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান (আব্দুল আজিজ বিন আবি আমির) এই রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৪২ বছর পর্যন্ত (৪১১ হি. থেকে ৪৫৩ হি.) এর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং একে একটি সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করেন। [১]

আলমেরিয়া

আরেকজন সিসিলীয় অফিসার খাইরান আমিরি ৪০৫ হিজরিতে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বন্দর আলমেরিয়া এবং মুরসিয়াতে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর এখানকার উজির মা’ন বিন সুমাদিহ, যার সম্পর্ক ছিল আরব গোত্র বনু তুজিবের সাথে, আলমেরিয়াতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন বড় আলেম, গুণী এবং যোগ্য মানুষ। তিনি দশ বছর (৪৩৩ হি. থেকে ৪৪৩ হি.) শাসন করেন এবং এই সুন্দর শহরটিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

এরপর তার পুত্র মুহাম্মদ বিন মা’ন ‘মু’তাসিম’ উপাধি ধারণ করে এখানে ৪১ বছর পর্যন্ত (৪৪৩ হি. থেকে ৪৮৪ হি.) অত্যন্ত সুচারুভাবে শাসন করেন। আয়তনের দিক থেকে একটি ছোট রাষ্ট্রের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার জ্ঞানানুরাগ, কাব্যচর্চা, উদারতা এবং রাজনৈতিক দক্ষতার কারণে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। [২]

প্রথম ফার্ডিনান্ড এবং কুস্তালিয়ার বিপজ্জনক পরিকল্পনা

পরিস্থিতি আন্দালুসীয়দের নাড়া দিচ্ছিল, কিন্তু তারা গান-বাজনায় মত্ত ছিল। সেই সময় উত্তরে কুস্তালিয়া রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং এর শাসক প্রথম ফার্ডিনান্ড মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্রথম ফার্ডিনান্ড ত্রিশ বছর শাসন করেন এবং মুসলমানদের দুর্বলতা ও গৃহযুদ্ধের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। মুলুকুত তাওয়াইফরা নিজেদের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ করত এবং একে অপরের এলাকা দখল করার জন্য সব ধরনের ছলচাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় নিত। পারস্পরিক যুদ্ধে তারা প্রথম ফার্ডিনান্ডের সাহায্যের ওপর ভরসা করত এবং তাকে নিজেদের সমর্থক হিসেবে ধরে রাখার জন্য জনগণের রক্ত...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/২২৩ থেকে ২৩১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১৫৮ থেকে ১৭৫, বিজ্ঞ লেখক এই রাষ্ট্রগুলোর গঠন, উন্নতি এবং রাজনৈতিক বিপ্লবসমূহের অত্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যা লক্ষ্যণীয়। এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

উপার্জিত অর্থ থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ তারা খরাজ হিসেবে আদায় করত। ফার্ডিনান্ড ১ সুযোগ বুঝে বিবাদমান আমিরদের মধ্যে কখনো একজনকে অন্যজনের বিরুদ্ধে সাহায্য করত এবং কখনো তার পৃষ্ঠপোষকতার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে সীমান্ত দুর্গগুলো নিয়ে নিত। এভাবে ত্রিশ বছরে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের অনেক এলাকা দখল করে নেয়।

পূর্ববর্তী যুগে খ্রিস্টানরা যখন ইসলামী শহরগুলোর ওপর আক্রমণ করত, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল লুটতরাজ। কিন্তু এখন তাদের শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা পাহাড় থেকে নেমে উপকূলীয় ও সমতলীয় শহরগুলো দখল করতে শুরু করে এবং নিয়মিতভাবে নিজেদের আমির নিযুক্ত করতে থাকে। পূর্ব উপকূলের একটি শহর বার্সেলোনা তাদের দখলেই ছিল। এখন তারা পশ্চিম উপকূলের (অর্থাৎ বর্তমান পর্তুগাল) ইসলামী শহরগুলোর দিকেও অগ্রসর হতে শুরু করে। আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর যদিও ফার্ডিনান্ড ১-এর নাগালের বাইরে ছিল, কিন্তু তলীত্বলাহ (Toledo) এর সীমান্তের সাথে যুক্ত ছিল, আর কর্ডোভা ও সেভিলও ধীরে ধীরে এর দূরত্ব কমিয়ে আনছিল।

সেই লাঞ্ছনা ও অপমানের দিনগুলোতে অনেক মানুষ আল-মু'তাদিদকে আন্দালুসের ত্রাণকর্তা মনে করত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ফার্ডিনান্ড ১-কে কেবল দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকেই বিরত রাখবেন না, বরং তাকে পুরনো সীমান্ত পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য করবেন। কিন্তু তাদের সেই প্রত্যাশা কখনোই পূরণ হতে পারেনি।

যতক্ষণ ফার্ডিনান্ড ১ খ্রিস্টান রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে খরাজ এবং দু-একটি দুর্গ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ৪৩৩ হিজরিতে যখন লিওন ও ক্যাস্টিলের ঐক্যের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরীণ বিবাদ শেষ হয়ে গেল, তখন ফার্ডিনান্ড ১ বাতলিয়ুস (Badajoz)-এর আমিরের ওপর আক্রমণ করে কয়েকটি শহর ছিনিয়ে নিলেন।

৪৪৯ হিজরিতে তিনি উত্তর আন্দালুসে বনু হুদ-এর শহর ‘ভাজু’ (Viseo) অবরোধ করেন এবং তা গায়ের জোরে পদানত করে লোকজনকে বন্দী করেন। ত্রিশ বছর আগে আলফনসো ৫ এই শহর আক্রমণ করেছিলেন এবং ‘ভাজু’-র একজন তীরন্দাজ সঠিক নিশানায় তীর ছুড়ে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করেছিলেন। ফার্ডিনান্ড ১ আলফনসো ৫-এর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। তিনি বন্দীদের মধ্য থেকে সেই তীরন্দাজকে খুঁজে বের করেন, তার চোখে উত্তপ্ত শলাকা বিদ্ধ করেন, তারপর তার হাত-পা কেটে তাকে ছটফট করতে ছেড়ে দেন, এমনকি তিনি শহীদ হয়ে যান। ‘ভাজু’ বিজয়ের মাধ্যমে সেই পুরো এলাকা খ্রিস্টানদের অধীনে চলে যায় যা দুয়েরো নদীর দক্ষিণে ছিল। [১]

তলীত্বলাহ এবং বনু যুন-নুন

সেই সময় মুসলিম স্পেনের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল তলীত্বলাহ, যেখানে বারবার গোত্র হাওয়ারা-র সাথে সম্পর্কযুক্ত বনু যুন-নুন পরিবারের শাসন ছিল। এই পরিবার তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খ্যাতি লাভ করে যখন তাদের নেতা মুসা ইবনে যুন-নুন তলীত্বলাহর পূর্বে ‘শান্ত বারিয়া’ (Santaver)-র পাহাড়কে নিজের সদর দপ্তর বানিয়ে তলীত্বলাহবাসীদের গবাদি পশু লুট করতে শুরু করেন।

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৩২৮।

...ধারা শুরু করল। তলেতলার অধিবাসীরা এই গোষ্ঠী দ্বারা অতিষ্ঠ ছিল এবং এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করত। [১] হাজিব আল-মানসুর তার শাসনামলে এই বিদ্রোহী লোকদের শক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহারের জন্য তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের সুযোগ দিয়েছিলেন। ইয়াহইয়া আল-মামুন ছিলেন এই গোষ্ঠীরই “নয়নমনি”। তার পিতা ইসমাইল যুন-নুন বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সেই যুগে নিজের গোষ্ঠীর শক্তিকে সফলভাবে ব্যবহার করে ৪২৮ হিজরিতে তলেতলা দখল করে নিয়েছিলেন।

সাত বছর শাসন করার পর ৪৩৫ হিজরিতে ইসমাইল যুন-নুন ইন্তেকাল করেন এবং তার পুত্র ইয়াহইয়া আল-মামুন শাসক হন। বংশীয় আভিজাত্যের অভাবের কারণে তিনি জনসমর্থন পাননি, তাই তিনি খ্রিস্টানদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন এবং প্রথম ফার্ডিনান্ডকে শুরুতেই নিজের বন্ধু বানিয়ে নেন। তিনি কখনো খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধের ঝুঁকি নেননি, বরং মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সাথে লড়াই করে নিজের সীমানা বাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি বাতলিয়ুসের শাসক মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আফতাসের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং তার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিনিয়ে নেন। [২]

ইয়াহইয়া আল-মামুনের কন্যা বালানসিয়ার স্বায়ত্তশাসিত শাসক আব্দুল মালিকের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, যিনি ছিলেন ইবনে আবি আমিরের প্রপৌত্র। তার পিতা আব্দুল আজিজ গ্রানাডার রাজনৈতিক সংকটের সময় বালানসিয়ায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আব্দুল মালিক পিতার পর সিংহাসনে আরোহণ করে মদ্যপান ও বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে যান এবং স্ত্রীকে অপমান ও লাঞ্ছিত করাকে অভ্যাসে পরিণত করেন। ইয়াহইয়া আল-মামুন এটি সহ্য করতে পারেননি।

একদিন তিনি ভ্রমণের অজুহাতে বালানসিয়ায় যান। আব্দুল মালিক তার শ্বশুরের অভ্যর্থনা জানান এবং আপ্যায়ন করেন। একদিন সুযোগ বুঝে আল-মামুন তার ভৃত্যদের মাধ্যমে আব্দুল মালিককে অপহরণ করে তার পৈতৃক আবাসস্থল হান্ত বাররিয়ার পাহাড়ে পাঠিয়ে দেন এবং সহজেই বালানসিয়া দখল করে নেন। এটি ৪৫৭ হিজরির ঘটনা। [৩]

মুলুকুত তাওয়ায়েফরা এ ধরনের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মগ্ন ছিল এবং এদিকে এই পরিস্থিতিতে উত্তর দিক থেকে প্রথম ফার্ডিনান্ডের আক্রমণ পুনরায় শুরু হয়ে যায়। ইয়াহইয়া আল-মামুন প্রথম ফার্ডিনান্ডের সাথে বন্ধুত্বের কারণে আশা করেছিলেন যে, সে তার এলাকায় আক্রমণ করবে না, কিন্তু ৪৫৪ হিজরিতে যখন সে তার বিশাল বাহিনী নিয়ে তলেতলার দরজায় এসে উপস্থিত হলো, তখন তলেতলার অধিবাসীদের চোখ খুলে গেল। যখন মামুন যুন-নুন বিশাল কর প্রদানের শর্তে প্রথম ফার্ডিনান্ডের সামনে মাথা নত করলেন, তখন তলেতলার মুসলমানরা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, ইসলামি আন্দালুসের গৌরবের দিন শেষ হয়ে এসেছে। [৪]

ইশবিলিয়াও করদ রাজ্যে পরিণত:

তলেতলার পর প্রথম ফার্ডিনান্ড আন্দালুসের দ্বিতীয় শক্তিশালী রাষ্ট্র ইশবিলিয়াকে লক্ষ্যবস্তু বানান এবং ৪৫৫ হিজরিতে বাহিনী...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯/৩১৭, সন ৪৬০ হিজরি

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলি: পৃ. ২২৮

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/১০১, ১০২

[৪] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলি: পৃ. ২২৮

৫১৭ তারিখ উম্মতে মুসলিমা পঞ্চম খণ্ড

ক্রুশ সেভিলের সামনে এসে পৌঁছাল। যেহেতু মুতাদিদ দক্ষিণে ক্রমাগত বিজয়ের কারণে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তাই মুসলমানরা তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহসী পদক্ষেপের আশা করছিল। কিন্তু তারা এটা দেখে অত্যন্ত হতাশ হলো যে, মুতাদিদ নিজেই প্রথম ফার্ডিনান্ডের তাঁবুতে উপস্থিত হয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা ছাড়াই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। [১]

বনু আফতাস রাষ্ট্র - বাতলিয়ুস

বিশাল ও বিস্তৃত রাষ্ট্র “বাতলিয়ুস” আন্দালুসের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বাজা, মারদা, ইয়াবুর, আশবুনা, শানতারিন, শানতারা, বাজুয়া এবং কাসরিয়া ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ শহর। এগুলোর মধ্যে অনেক শহর বর্তমান পর্তুগালের অংশ।

কর্ডোভার কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের যুগে এখানে শাপুর ফারসি নামক এক গোলাম প্রতিনিধি হিসেবে শাসন করছিলেন। তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর উজির মুহাম্মদ বিন মাসলামা ওরফে ইবনে আফতাস (যিনি বারবারদের মিকনাসা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) আল-মানসুর উপাধি ধারণ করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আয়তনের দিক থেকে এটি ছিল মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র।

৪৩৭ হিজরিতে মুহাম্মদ ইবনে আফতাসের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র আল-মুজাফফর (৪৩৭ হি. থেকে ৪৬১ হি.) এখানকার শাসক হন, যিনি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ঈর্ষণীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে তিনি কাব্য, সাহিত্য ও ইতিহাসে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বহু বছরের পরিশ্রমে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ঘটনাবলির ওপর পঞ্চাশ খণ্ডের একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যাকে “আল-মুজাফফরি” বলা হতো। [২]

তাঁর যুগে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের গৃহযুদ্ধ চরম পর্যায়ে ছিল। আল-মুজাফফরকে নিজের রাষ্ট্র রক্ষার জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হতো। ৪৩৩ হিজরি পর্যন্ত তাঁর রাষ্ট্র সেভিলের বনু আব্বাদের আক্রমণের শিকার ছিল, এরপর তোলেদোর বনু যুন-নুনের সাথে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এরপর কাস্টিলের প্রথম ফার্ডিনান্ডের আক্রমণ শুরু হয়, যিনি ৪৪৯ হিজরিতে (১০৫১ খ্রি.) রাষ্ট্রের উত্তরের শহরগুলো: লামেগো (মালিকিয়া) এবং বাজু দখল করে নেন। আল-মুজাফফর ফার্ডিনান্ডের পক্ষ থেকে কর প্রদানের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, কিন্তু যখন ফার্ডিনান্ড দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তাজা নদীর তীরে অবস্থিত রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শহর শানতারিনের দিকে অগ্রসর হন, তখন আল-মুজাফফর নতি স্বীকার করেন এবং বার্ষিক পাঁচ হাজার দিনার কর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফার্ডিনান্ডকে ফিরে যেতে রাজি করান। তবে বাতলিয়ুস রাষ্ট্র এই চুক্তির কোনো সুফল পায়নি এবং ৪৫৬ হিজরিতে প্রথম ফার্ডিনান্ড এর উত্তরের শহর ফিকরিয়া দখল করে নেন। এখানে অসংখ্য নর-নারীকে বন্দি করা হয়। যারা বেঁচে ছিল, তাদের মধ্যে যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা এখান থেকে হিজরত করে চলে যায়। ফার্ডিনান্ড তাঁর উপদেষ্টা সিসনান্দোকে এখানকার নওয়াব নিযুক্ত করেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৩৮

[২] একটি মত হলো, এই বইটি দশটি বিশাল খণ্ডের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। যাই হোক, এই বইটি দীর্ঘকাল ধরে আজ পর্যন্ত নিখোঁজ। অনেক গবেষক এর সন্ধান তৎপর ছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত এর কোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি।

বারবাস্ত্রোর (Barbastro) পতন মুসলমানদের অত্যন্ত ভীত করে তুলেছিল। এর পরে সম্ভব ছিল যে ফার্ডিনান্ড আরও অগ্রসর হতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে বতলিউস (Badajoz) কিছুটা অবকাশ পেয়ে গেল। [১] এদিকে ৪৬১ হিজরিতে আল-মুজাফফর ইন্তেকাল করেন। বতলিউসে তাঁর দুই পুত্র ইয়াহইয়া আল-মামুন এবং উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিলের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং অবশেষে ৪৬৩ হিজরিতে উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল নতুন শাসক হন। তিনি তাঁর পিতার মতোই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী ও সমঝদার ছিলেন। তাঁর যুগে বতলিউস জ্ঞান ও সাহিত্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁর दरবারে বড় বড় আলেম, ফকিহ এবং কবি ও সাহিত্যিকরা যুক্ত ছিলেন। রাজ্যে সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ ছিল। খ্রিস্টানদের গৃহযুদ্ধের কারণে বাহ্যিক আক্রমণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। [২] ফলে উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিলকে বেশ কয়েক বছর সেই সব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি যা তাঁর পিতা আল-মুজাফফরকে পোহাতে হয়েছিল।

সারাকুস্তা রাষ্ট্র এবং বনু হুদ

সারাকুস্তা (Zaragoza) উত্তর আন্দালুসের একটি বিশাল প্রদেশ ছিল যাতে উশকা (Huesca), বারবাস্ত্রো (Barbastro), লারিদাহ (Lerida), আফ্রাগাহ (Afraga) এবং তারতুশাহর (Tortosa) মতো শহরগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রদেশটি তিনটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র: আরাগন, নাভারে এবং কাতালোনিয়া দ্বারা ধনুকের মতো ঘেরা ছিল, যার কারণে এখানকার মুসলিম শাসকদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হতো। এভাবে এই লোকেরা খ্রিস্টানদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে ফায়দা হাসিল করতে এবং একে অপরের সাথে লড়াই করানোর বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিল।

এই রাষ্ট্রের স্বাধীনতার কাহিনী হলো এই যে, কুসতানতাহর শাসক সুলাইমান আল-মুস্তাইন ৪০৩ হিজরিতে বনু তুজিবের রইস মুনজির বিন ইয়াহইয়াকে সারাকুস্তার ওয়ালি (গভর্নর) নিযুক্ত করেছিলেন, যার পরিবার দীর্ঘকাল ধরে সীমান্ত অঞ্চলগুলো পাহারা দিয়ে আসছিল।

৪১১ হিজরিতে যখন কর্ডোবার রাজনৈতিক সংকট তীব্রতর হলো, তখন মুনজির স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে উত্তরের খ্রিস্টানদের হাত থেকে নিজের রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। তিনি অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে বসবাস করতেন, তাঁর প্রাসাদ বিরল ও মূল্যবান সামগ্রী এবং সুন্দরী দাসীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল। তিনি সুযোগ বুঝে খ্রিস্টান শাসকদের উপটৌকনও পাঠাতেন। তিনি ৪১৩ হিজরি পর্যন্ত শাসন করেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া আল-মুজাফফর (৪১৩ হিজরি থেকে ৪৩০ হিজরি) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর তাঁর পৌত্র মুনজির মুইয উদ-দৌলা শাসক হন যাকে ১লা জিলহজ ৪৩০ হিজরিতে হঠাৎ হত্যা করা হয়। সারাকুস্তায় এক মাস ধরে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে।

অবশেষে ১লা মহররম ৪৩১ হিজরিতে ফৌজের একজন আরব সেনাপতি সুলাইমান বিন মুহাম্মদ বিন হুদ আল-জুজামি ক্ষমতা দখল করেন এবং অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। ৪৩৮ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে তিনি এই ভুলটি করেছিলেন যে, রাষ্ট্রের পাঁচটি বড় শহরকে তাঁর পাঁচ পুত্রের নামে করে দিয়েছিলেন।

ফলাফল যা হওয়ার তাই হলো যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেল যার ফলে উত্তর দিক থেকে খ্রিস্টানরা...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ৮১-৮৭

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৮৭-৮৯

পুরো ফায়দা উঠাল এবং একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের ভাইদের সাহায্য করে তাদের দুর্বল করতে থাকল। [১]

পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয়ের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা এবং নরম্যানদের আক্রমণ:

আন্দালুসে মুসলমানদের এই অনৈক্য এবং পারস্পরিক রেষা-রেষির ফলে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সাহস বেড়ে গেল। ৪৫৬ হিজরিতে পোপ আলেকজান্ডার দ্বিতীয় ক্রুসেডারদের প্রকাশ্যে প্ররোচিত করলেন যাতে তারা আন্দালুস থেকে মুসলমানদের বের করে দেয়। নিজের জাতিকে উৎসাহিত করার জন্য পোপ ঘোষণা করলেন যে, আন্দালুসের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী প্রত্যেক ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে জান্নাতের অধিকারী হবে। [২]

এই বছরই নরম্যান খ্রিস্টানরা আন্দালুসে সৈন্য পরিচালনা করল এবং বারবাশতরো যা কুস্তনতুনিয়া থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, সেখানে আক্রমণ করল। এটি ছিল উত্তর দিক থেকে প্রতিরক্ষার জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী শহর। চল্লিশ দিনের অবরোধের পর শহরবাসীরা জান ও মালের নিরাপত্তার চুক্তিতে কেল্লার প্রাচীরের দরজা খুলে দিল। কিন্তু খ্রিস্টানরা চুক্তি করার পরপরই তা ভঙ্গ করে শহরবাসীদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করল এবং প্রায় ৫০ হাজার নারী-পুরুষকে শহীদ করল। বনু হুদ সেই সময়ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং সেখানে নরম্যানরা বারবাশতরোতে রক্তের নদী বইয়ে দিচ্ছিল। [৩]

বারবাশতরো পুনরুদ্ধার - একটি সাহসী পদক্ষেপ:

তবে এই ঘটনা জনগণকে নাড়া দিল এবং বনু হুদের প্রধান আহমদ বিন সুলাইমানকে পাল্টা ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করল। ইশবিলিয়ার মুতাদিদও তাকে সাহায্যের জন্য পাঁচশ সৈন্য পাঠালেন। এই বাহিনী জমাদিউল আউয়াল ৪৫৭ হিজরিতে শহরটি অবরোধ করল। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে মুসলমানরা কেল্লার প্রাচীরে সুড়ঙ্গ তৈরি করে শহরে প্রবেশ করল এবং নরম্যানদের কচুকাটা করল। দেড় হাজার নরম্যান নিহত হলো এবং পাঁচ হাজারের বেশি বন্দি করে কুস্তনতুনিয়ায় নিয়ে আসা হলো।

“বারবাশতরো” পুনরুদ্ধার দীর্ঘ সময় পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি সাহসী পদক্ষেপ ছিল। এই কৃতিত্ব আহমদ বিন সুলাইমানকে অনেক সুনাম এনে দিল এবং পরবর্তী বছরগুলোতে তিনি তার ভাইদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে কুস্তনতুনিয়ার রাজ্যকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করলেন। তিনি আল-মুকতাদির বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। সাধারণত তাকে মুকতাদির বিন হুদ বলা হতো। [৪]

খ্রিস্টানদের মধ্যে অনৈক্য এবং মুলুকুত তাওয়াইফের বোকামি:

নরম্যানদের বিরুদ্ধে মুকতাদির বিন হুদের এই সাফল্যের কিছুদিন পর ৪৫৮ হিজরিতে (১০৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ফার্ডিনান্ড প্রথম মারা যান এবং তার বিশাল সাম্রাজ্য তার তিন ছেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল: সানচো, আলফনসো ষষ্ঠ এবং গার্সিয়া। সানচো কাস্টিল, আলফনসো লিওন এবং আস্তুরিয়াস এর শাসক হলেন এবং পর্তুগাল গার্সিয়ার অংশে পড়ল। এর পরপরই এই তিন ভাইয়ের মধ্যে...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৪৬৩-৪৬৫

[২] তারিখু আফ্রিকা আশ-শামালিয়া: আল-দুরি জুলিয়ান, আরব্য অনুবাদ: মুহাম্মদ মজালি: ১১১/২

[৩] আল-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গার্নাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৩২১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৪৬৩-৪৬৭

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৪৮০-৪৮৩

ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গেল এবং ইসলামী শহরগুলোর দিকে খ্রিস্টানদের অগ্রসরমান পদক্ষেপ কিছু সময়ের জন্য থেমে গেল। [১]

যদি মুলুকুত তাওয়ায়েফগণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, তবে পরবর্তী দিনগুলোতে পূর্বের ত্রুটিগুলো সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু আফসোস যে, তারা এই দুর্লভ সুযোগ থেকে কোনো ফায়দা গ্রহণ করেননি। যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হতেন, তবে সেই সময় গত দুই-তিন দশকের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে কেউ কেউ বিপদ কেটে যেতে দেখে আগের চেয়েও বেশি উদাসীনতার সাথে দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়লেন এবং কেউ কেউ একে অপরের সাথে লড়াই করার মোক্ষম সময় মনে করলেন।

তলেতলার কুখ্যাত শাসক ইয়াহইয়া আল-মামুন এই সবকিছুর অগ্রভাগে ছিলেন। যখন উত্তরের খ্রিস্টান রাজপুত্রদের গৃহযুদ্ধে সানচো জয়ী হলেন এবং ষষ্ঠ আলফনসো পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন, তখন ইয়াহইয়া আল-মামুন তাকে এবং তার সঙ্গীদের নিজের কাছে সম্মানিত মেহমান হিসেবে আশ্রয় দিলেন এবং তাদেরকে রাজপ্রাসাদে রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে থাকার সুযোগ করে দিলেন।

খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় রাজপুত্র গার্সিয়াও ক্ষমতার এই লড়াইয়ে পিছু হটেছিলেন। তাকে ইশবিলিয়ার মুতাদিদ নিজের কাছে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে স্থান দিলেন, তবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি খ্রিস্টানদের কর প্রদানের চুক্তিতে এখনো অটল রয়েছেন। [২]

এদিকে মুকতাদির বিন হুদ ৪৬৮ হিজরিতে তার প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র “দানিয়া” আক্রমণ করেন। এই বিজয়ের পর সারগোসা রাষ্ট্র আয়তনে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু আফসোস যে, এই পরিস্থিতি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এবং মুকতাদির বিন হুদ ৪৭৪ হিজরিতে তার মৃত্যুর আগে সেই একই ভুল করেন যা তার পিতা করেছিলেন। তিনি সারগোসাকে তার দুই ছেলের মধ্যে ভাগ করে দেন। রাজধানী এবং এর সংলগ্ন শহরগুলো ইউসুফকে দেন, যিনি আল-মুতামিন উপাধি ধারণ করে শাসক হন; অন্যদিকে দানিয়া, লারিদা এবং তারতুশা ছোট ছেলে মুনজিরের নামে করে দেন। [৩]

মুতাদিদের প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ এবং মৃত্যু:

মুতাদিদ এবং ইয়াহইয়া আল-মামুনসহ মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সকল শাসক খ্রিস্টানদের আধিপত্য থেকে মুক্তির এই সুবর্ণ সুযোগটিও হাতছাড়া করলেন এবং এই অবসরে তারা পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত রইলেন।

মুতাদিদ ৪৫৯ হিজরিতে বনু বারজালের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাদের থেকে “কারমোনা” অঞ্চলটি ছিনিয়ে নেন। এরপর তিনি নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করতে শুরু করেন, কারণ তিনি মরক্কোতে মুরাবিতুনদের নতুন উদীয়মান শক্তির পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। তবে মৃত্যু তাকে আর সময় দেয়নি। জীবনের ৫৩টি বসন্ত দেখে তিনি ৪৬১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৪]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গরনাতা, লি-আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা: ৩৬১, ৩৩০

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গরনাতা, লি-আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা: ৩৩০

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/২৮১, ২৮২

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৫৮

মুহাম্মদ মুতামিদ, ইশবিলিয়ার কবি বাদশাহ

মুতামিদ-এর পর ইশবিলিয়ার সিংহাসনে তার ৩৩ বছর বয়সী যুবক পুত্র মুহাম্মদ ‘মুতামিদ’ উপাধি ধারণ করে আসীন হন। তিনি তার পিতার বিপরীতে একজন দানশীল ও স্বচ্ছ হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। প্রতারণা এবং জুলুম-অত্যাচার তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি শরীফ, সাহসী এবং যোদ্ধা অবশ্যই ছিলেন, তবে রাজনৈতিক কূটকৌশলে তার দক্ষতা ছিল না। অসাধারণ মেধার কারণে তিনি অল্প বয়সেই মুয়াত্তা ইমাম মালিকসহ হাদিস ও তাফসিরের বড় বড় কিতাবসমূহ পড়ে ফেলেছিলেন। [১]

কবিতার প্রাচুর্য:

তবে মুতামিদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল কাব্য ও সাহিত্যে। তিনি অত্যন্ত দক্ষ কবি ছিলেন। কবিতায় তার শব্দচয়ন, কল্পনা ও ভাবনা ছিল সবার থেকে আলাদা। তিনি এমন স্তরের সমালোচক ছিলেন যে, তার কাছে সাধারণ কোনো কবি বা সাহিত্যিকের স্থান হতে পারত না। তার উজির, বেগমগণ এমনকি দাসীরা পর্যন্ত কাব্যচর্চায় পারদর্শী ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুতামিদ ছিলেন একজন কবি, কিন্তু ভাগ্য তাকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিল। [২]

ইবনে আশ্মারের কাহিনী:

সম্ভব ছিল যে, সিংহাসন আরোহণের পর দায়িত্ববোধ তার চিন্তা ও ভাবনার ধারা বদলে দিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ইবনে আশ্মারের মতো এমন একজন সহচর পেয়েছিলেন, যিনি সব জায়গায় এবং সব সময় তার মেজাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখতেন।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আশ্মার দক্ষিণ স্পেনের শিলব শহরের একজন নিঃস্ব কবি ছিলেন। তিনি ৪২২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। একটি দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি অসাধারণ আগ্রহের সাথে নামী সাহিত্যিক ও কবিদের থেকে উপকৃত হন। কিন্তু বাস্তব জীবনে পদার্পণ করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি তার বাগ্মিতা দিয়ে কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষের প্রশংসা গীতি গেয়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। একবার ঘুরতে ঘুরতে তিনি শিলবে আসলেন, তখন তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, নিজের গাধার জন্য খাদ্য কেনার টাকাও তার কাছে ছিল না। তিনি এক কৃষকের শানে কসিদা লিখলেন এবং সে বিনিময়ে এক বস্তা যব প্রদান করল। তখন ইবনে আশ্মার গাধার পেট ভরাতে সক্ষম হলেন। এগুলো ছিল ইবনে আশ্মারের দুর্দিন। তিনি সুদিনের আশায় সেই খালি বস্তাটি যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

আর তারপর ৪৫৫ হিজরিতে তার ভাগ্য হঠাৎ বদলে গেল যখন মুতামিদ শাহজাদা মুতামিদকে সেনাপতি বানিয়ে শিলব অভিযানে পাঠালেন। শহর অবরোধের সময় শাহজাদা মুতামিদের সাথে ইবনে আশ্মারের সাক্ষাৎ হয়। শাহজাদা তখন ২৩ বছর বয়সী ছিলেন এবং ইবনে আশ্মার ছিলেন ৩৩ বছরের। ইবনে আশ্মার তার রসবোধ ও মার্জিত কথাবার্তা দিয়ে শাহজাদাকে মুগ্ধ করে ফেললেন।

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৯ / ৬১, ত. আর-রিসালাহ

[২] তারিখুল আদাবিল আন্দালুসি আসরুত তাওয়াইফ: ১ / ৯৫; নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব লিল মাঙ্কারি আত-তিলিমসানি: ৩ / ২৮৩

হালাব বিজয়ের পর যখন মুতামিদ সেখানকার শাসক নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি কোনো দ্বিধা ছাড়াই ইবনে আন্মারকে তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করলেন। দুজনেই সেখানে দীর্ঘ সময় একসাথে কাটিয়েছেন। এই সময়ে ইবনে আন্মার মুতামিদের ওপর নিজের প্রভাব ভালোভাবেই বিস্তার করেছিলেন। দুজনের মধ্যে এমন বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল যে তারা এক প্রাণ দুই দেহের উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন। এক রাতে ইবনে আন্মার একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখার পর ভীত হয়ে পড়লেন যে, শাহজাদার সাথে এই ঘনিষ্ঠতা কখনো কোনো ধৃষ্টতার কারণ হয়ে মৃত্যুর উসিলা না হয়ে দাঁড়ায়। তিনি পালিয়ে প্রাসাদের এক অন্ধকার কোণে লুকিয়ে রইলেন। কিন্তু মুতামিদ তাঁকে খুঁজে বের করলেন। বারবার জিজ্ঞাসার পর যখন ইবনে আন্মার তাঁর ভয়ের কথা প্রকাশ করলেন, তখন মুতামিদ হেসে বললেন: “তুমি আমার প্রাণের মতো। কেউ কি কখনো নিজের প্রাণ নিজে নিতে পারে?” [১]

মুতামিদ কাব্য ও সাহিত্যের অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও আরবদের সামরিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ ছিলেন। যদি তিনি উচ্চাভিলাষী ও দূরদর্শী মানুষের সাহচর্য পেতেন, তবে তিনি একজন ভালো শাসক হিসেবে প্রমাণিত হতে পারতেন, কিন্তু ইবনে আন্মারের সাহচর্য তাঁকে কবিতা ও রোমান্টিকতার এমন নেশায় আসক্ত করেছিল যা থেকে তিনি সারা জীবনেও মুক্তি পাননি।

ইবনে আন্মার মন্ত্রিত্বের পদে:

তাঁর পিতা মুতাদিদ-এর মৃত্যুর পর মুতামিদ ইশবিলিয়া রাষ্ট্রের শাসক হলেন। ইবনে আন্মার আবেদন করে তাঁর কাছ থেকে নিজের পৈতৃক শহর হালাবের শাসনভার মঞ্জুর করিয়ে নিলেন। এরপর অতীতের এই সাধারণ কবি এমন শান-শওকতের সাথে ইশবিলিয়া থেকে হালাবে পৌঁছালেন যে, মানুষ কখনো কোনো যুবরাজের এমন জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল দেখেনি। তাঁর আগে-পিছে দরবারী, খাদেম ও গোলামদের এক বাহিনী চলছিল। তবে ইবনে আন্মার শহরে প্রবেশ করেই মানুষের কাছে সেই কৃষকের খোঁজ নিলেন, যে তাঁকে কাসিদার বিনিময়ে যব দিয়েছিল, যার বস্তা ইবনে আন্মারের কাছে তখনো সংরক্ষিত ছিল। তিনি সেই বস্তাটি রূপা দিয়ে ভর্তি করে সেই কৃষকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাথে বলে পাঠালেন:

“যদি তুমি যবের পরিবর্তে গম দিতে, তবে আমি রূপার বদলে এই বস্তা সোনা দিয়ে ভর্তি করে দিতাম।” [২]

ইবনে আন্মার হালাবে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন শুরু করলেন এবং দরবারকে কাব্যিক সৌন্দর্যে ভরিয়ে দিলেন। সরকারি কোষাগার তিনি অকাতরে মদ্যপান ও বিলাসিতায় উড়াতে লাগলেন। [৩]

মুতামিদের ইবনে আন্মারের প্রতি ভালোবাসা:

কিন্তু মুতামিদ তাঁর এই বিশেষ সহচরের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারছিলেন না। হালাবে তিনি ইবনে আন্মারের সাহচর্যে যে রঙিন দিন-রাত কাটিয়েছিলেন, তা তিনি কখনো ভুলতে পারতেন না এবং তিনি তাঁর কবিতায় সেগুলোকে স্মরণ করতে থাকতেন। একটি গজল-এ তিনি ইবনে আন্মারকে সম্বোধন করে বলেন:

[১] আল-মু'জিব ফি আখবারিল মাগরিব: ৯০/১

[২] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৮/৫৮৩, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আল-হুন্নাতুস সিয়ারা: ১১৭/১

“শোনো! হে আবু বকর, আমার স্বদেশ শলবকে অভিবাদন জানাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো যে যৌবনকাল কি এখনও তেমনই আছে যেমনটি আমি জানতাম।”

“কাসরে শরাহীবকে সেই যুবকের পক্ষ থেকে সালাম বলো যার হৃদয়ে সেই প্রাসাদে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সর্বদা থাকবে।”

“আমি সেখানে কত রাত কাটিয়েছি যার অন্ধকার ছিল আনন্দদায়ক, প্রশস্ত নিতম্ব ও সরু কোমর বিশিষ্ট সঙ্গিনীর সাথে।”

“এবং কত রাত আমি নদীর তীরে আমোদ-প্রমোদে কাটিয়েছি, এমন এক অলঙ্কার পরিহিতার সাথে যে পূর্ণিমার চাঁদের মতো সুশোভিত ছিল।” [১]

মুতামিদের আগ্রহ এবং পীড়াপীড়িতে ইবনে আন্মার শলবের শাসনভার ছেড়ে তার কাছে ইশবিলিয়ায় চলে আসেন। সেখানে পৌঁছে তার মর্যাদা আরও বেড়ে গেল। মুতামিদ তাকে উজির-এ-সালতানাত বানিয়ে দিলেন এবং নিজে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে নিশ্চিত হয়ে কবিতার রসাস্বাদনে মগ্ন হয়ে গেলেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত শাসনভার একজন পেশাদার কবির হাতে চলে এল। [২]

এই কবি বাদশাহ এবং উজির যখনই একত্রিত হতেন, তখন কবিতা ও কাব্যচর্চা ছাড়া আর কিছুই ভাবতেন না। মুতামিদ একটি চরণের প্রথম অংশ বলতেন এবং ইবনে আন্মারকে দ্বিতীয় অংশ বলার ফরমায়েশ করতেন। একদিন জামে মসজিদে যাওয়ার সময় আজান শুনে মুতামিদ বললেন, এই চরণটি মেলাও:

এই মুয়াজ্জিন আজান দিতে শুরু করেছে

(এই মুয়াজ্জিন আজান দিতে শুরু করেছে)

ইবনে আন্মার তৎক্ষণাৎ বললেন:

সে এই আমলের মাধ্যমে তার রহমানের কাছে ক্ষমার আশা রাখে

(সে এই আমলের মাধ্যমে তার রহমানের কাছে ক্ষমার আশা রাখে)

মুতামিদ আবার চরণ দিলেন:

সৌভাগ্যবান সে, যে এক সত্যের সাক্ষী

(সৌভাগ্যবান সে, যে এক সত্যের সাক্ষী)

ইবনে আন্মার তৎক্ষণাৎ বললেন:

[১] আল-হামাসাতুল মাগরিবিয়া লি-আবীল আব্বাস আত-তাদিলি: ২/ ১০৫৯, ত. দারুল ফিকর আল-মুয়াসির বৈরুত।

[২] আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি: ৯১/১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আব্দুল্লাহ ইনান আল-মা'মারি: ৯৩/২।

ইন কানা আকদু দামিরিহি কালিসানিহি [১]

(শর্ত হলো তার অন্তরের বিশ্বাসও যেন তার জবানের মতোই হয়)

মুতামিদের নতুন ভালোবাসা, রুমাইকিয়া:

ইশবিলিয়া রাষ্ট্রের পতনের জন্য শাসকদের কবিতার প্রতি এই পর্যায়ের আসক্তিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হঠাৎ মুতামিদের জীবনে এক রূপবতী ও সুন্দরী কবি নারীর আগমন ঘটে, যে তাকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয়।

এক সন্ধ্যায় মুতামিদ তার উজির ইবনে আন্মারের সাথে ওয়াদিউল কাবীর নদীর তীরে পায়চারি করছিলেন। বাতাসের মৃদু ঝাপটা নদীর পানির উপরিভাগে ছোট ছোট ঢেউ সৃষ্টি করছিল। মুতামিদ ইবনে আন্মারকে এই সুন্দর দৃশ্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়ে বললেন:

“একটু এই চরণে ছন্দ মেলান তো:

সানাআর রিহ মিনাল মায়ি যুরাদ

‘বাতাস পানির ঢেউগুলোকে বর্ম বানিয়ে দিয়েছে’।”

ইবনে আন্মারের মতো ওস্তাদ কবিও চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় নদীর দিক থেকে এক নারী কণ্ঠ ভেসে এল:

আইয়ু দিরইন লিকিতালিন লাও জামাদ

‘যুদ্ধের জন্য কী চমৎকার বর্ম হতো যদি তা জমে যেত’।“

মুতামিদ ফিরে তাকিয়ে দেখলেন এক তরুণী কাপড় কাচছে, যার কণ্ঠস্বর ছিল এটি। মুতামিদ তার বুদ্ধিমত্তা, বাগ্মিতা, আত্মবিশ্বাস এবং সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি বিবাহিত?”

মেয়েটি নেতিবাচক উত্তর দিলে মুতামিদ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। মেয়েটির নাম ছিল “ইতিমাদ” এবং সে রুমাইক বিন হাজ্জাজের দাসী ছিল, তাই তাকে রুমাইকিয়া বলা হতো।

মুতামিদ রুমাইককে চড়া মূল্য দিয়ে তাকে কিনে নিলেন এবং তারপর মুক্ত করে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। এভাবে রুমাইকিয়া নামক এই সুন্দরী ইশবিলিয়ার রানী হয়ে গেলেন।

ইশবিলিয়ার ভাগ্য কবিদের দয়া ও করুণার ওপর চলে গিয়েছিল যে, এখন সালতানাতের তিনটি নক্ষত্র: বাদশা, রানী এবং উজির—সবাই কবি ছিলেন। [২]

মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার মনোরম দিনরাত:

রুমাইকিয়া প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের মন জয় করার এবং তাদের বুদ্ধি হরণ করার মতো অধিকাংশ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। একজন ঐতিহাসিক বলেন: “মুতামিদ তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তার অদ্ভুত ও চমৎকার কথায় আনন্দ পেতেন। রুমাইকিয়া যদিও গায়িকা ছিলেন না, তবে সুন্দরী এবং সুকণ্ঠী ছিলেন। তিনি রসালো কথায় পারদর্শী ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে তার কাছে কোনো না কোনো চমৎকার কথা জানা ছিল।” [৩]

[১] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/৬১৬

[২] শাজারাতুজ জাহাব: ৫/৩৩৫, নাফহত তিব: ৩/৩১১, ৩৪৩

[৩] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/৩৭২

কবিতা এবং রোমান্টিক আবেগ অবিচ্ছেদ্য ছিল। মুতামিদের মতো প্রেমিক স্বভাবের মানুষ যখন রুমাইকিয়ার মতো স্ত্রী পেলেন, তখন তিনি তাঁরই হয়ে গেলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর জীবনসঙ্গিনীর সাথে সেভিলের “ওয়াদিউত তালহ”-এ যেতেন এবং দুজনেই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতেন। [১] রুমাইকিয়ার একটি ইশারায় তিনি সোনা-রূপার স্তূপ করে দিতেন। তাঁর সামান্যতম ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি কোষাগারের মুখ খুলে দিতেন। একদিন রুমাইকিয়া দেখলেন গ্রামের কিছু দুধ বিক্রেতা মহিলা মাথার ওপর দুধের কলস রেখে, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে নগ্ন পায়ে কাদার মধ্যে আনন্দের সাথে হাঁটছে। রুমাইকিয়ারও কাদার মধ্যে হাঁটার শখ হলো। মুতামিদ যখন তাঁর এই ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন, তখন তাঁর আদেশে মণকে মণ গোলাপ জল দিয়ে মাটি মিশিয়ে কাদা তৈরি করা হলো, তারপর তাতে আশ্বর, কস্তুরী এবং কর্পূরসহ বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান সুগন্ধি তেলে মাখা হলো। এরপর প্রাসাদের আঙিনায় তা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সেখানে সুন্দর কলস এবং রেশমি দড়ি দিয়ে দুধ বিক্রেতাদের ডেরার মতো পরিবেশ তৈরি করা হলো। এখন রুমাইকিয়াকে ডাকা হলো যাতে তিনি তাঁর শখ পূরণ করতে পারেন। তিনি তাঁর সখী ও দাসীদের সাথে আসলেন এবং কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে দীর্ঘক্ষণ আনন্দিত হলেন। [২]

একদিন প্রচণ্ড গরম ছিল। রুমাইকিয়া বললেন: “হায়! আজ যদি মেঘ থাকতো আর আমরা বৃষ্টির মজা নিতে পারতাম।” মুতামিদ প্রাসাদের বাগানে আংটি বসানো পাত্রে আশ্বর ও উদের ধূপ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আশ্বর ও উদের এত বিশাল পরিমাণ পোড়ানো হলো যে ধোঁয়া উঠে আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে গেল এবং পরিবেশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেল। এরপর ফোয়ারার মাধ্যমে গোলাপ জল ছিটানো শুরু হলো, তখন মনে হচ্ছিল যেন সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে। [৩] চারদিকে জল থৈ থৈ হয়ে গেল।

কর্ডোভায় মুলুকুত তাওয়ায়েফদের বিশৃঙ্খলা

কর্ডোভা চার শতাব্দী ধরে স্পেনে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ঐক্যের কেন্দ্র হিসেবে চলে আসছিল, কিন্তু এই সময়ে এর সীমানা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও আন্দালুসে এর মতো সুন্দর ও উন্নত শহর আর কোনোটি ছিল না। এটাই কারণ ছিল যে একদিকে ষষ্ঠ আলফনসো এবং অন্যদিকে মুলুকুত তাওয়ায়েফরা এটি দখল করার জন্য ব্যাকুল ছিল।

এই সময়ে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে সেভিলের শাহ মুতামিদ এবং টলেডোর শাসক ইয়াহইয়া যুন-নুন রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ এবং সামরিক শক্তির দিক থেকে সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। তাই তারা দুজনেই কর্ডোভার সিংহাসনকে নিজেদের অধিকার মনে করতেন।

বনু উমাইয়ার শাসনের অবসানের পর যখন কর্ডোভায় শুরা ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন সেখানে অভ্যন্তরীণভাবে শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ তৈরি হলো। এই সরকারের প্রথম প্রধান ছিলেন ইবনে জাহওয়ার এবং তারপর তাঁর পুত্র আবুল ওয়ালিদ, যাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই ব্যবস্থা...

[১] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসির রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ২/২৮৫

[২] নাফহত তিব: ৩/৩৭৩, ১/৩৩০; আল-আলাম লিয়-যিরিকলি: ১/৩৩৩, তাবা দারুল ইলম

[৩] নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব লিন-নুওয়াইরি: ১/১৩৯, তাবা দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসায়িকুল কাওমিয়া

কিন্তু ৩৫৭ হিজরিতে যখন আবুল ওয়ালিদ তার পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্জনতা অবলম্বন করেন এবং শাসনভার তার পুত্র আব্দুল মালিকের হাতে আসে, তখন আবারও যোগ্যতার নীতি উপেক্ষিত হয় এবং বংশপরম্পরায় মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

আবুল ওয়ালিদের উত্তরসূরি আব্দুল মালিক অত্যন্ত অযোগ্য প্রমাণিত হন। তিনি রাষ্ট্রের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অভিজ্ঞ উজির ইবনে সাক্কাকে হত্যা করে দরবারের আমির ও সেনাবাহিনীকে এতটাই বীতশ্রদ্ধ করে তোলেন যে, বড় বড় কর্মকর্তারা পদত্যাগ করতে শুরু করেন।

তলেতলার (Toledo) শাসক অনেকদিন ধরেই কর্ডোভার দুর্বল সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সুযোগ বুঝে ৩৬১ হিজরিতে কর্ডোভার ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু কর্ডোভার জনগণ, যারা কোনো মূল্যেই ইয়াহইয়া আল-মামুনের মতো খ্রিস্টান-ঘেঁষা শাসকের দাসত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না, তারা শহর রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। অন্যদিকে কর্ডোভার শাসক আব্দুল মালিক বিন জাহওয়ার সেভিলের দিকে তার দূত পাঠান, কারণ তিনি জানতেন যে মুতাদিদ এবং মামুন যুন-নুনের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে এবং মুতাদিদ কখনোই চাইবেন না যে কর্ডোভা মামুনের দখলে যাক।

মুতাদিদ আব্দুল মালিকের প্রস্তাবকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কর্ডোভায় তার সেনাবাহিনী পাঠান, যারা মামুনের বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করে। কর্ডোভা অধিবাসীদের ধারণা ছিল যে সেভিলের সেনাবাহিনী তাদের সাহায্যের জন্য এসেছে এবং যুদ্ধের পর ফিরে যাবে, কিন্তু এটি ছিল তাদের ভুল ধারণা। মুতাদিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেভিলের সেনাবাহিনী কর্ডোভা অধিবাসীদের সাথে প্রতারণা করে এবং শহরের শাসনভার গ্রহণ করে। বনু জাহওয়ারের শাসনের অবসান ঘটে এবং মুতাদিদ আন্দালুসের শ্রেষ্ঠ নগরী দখলের পুরনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। এটি ৩৬২ হিজরির ঘটনা। মুতাদিদ তার পুত্র আব্বাদকে কর্ডোভার শাসক নিযুক্ত করেন। কর্ডোভা অধিবাসীদের কোনো কথা চলল না এবং তারা এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। আব্বাদের আমোদ-প্রমোদ এবং ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকা কর্ডোভা অধিবাসীদের আরও বেশি হতাশ করে তুলল। [১]

ইবনে উকাশার কর্ডোভা দখল এবং ইয়াহইয়া আল-মামুনের পরিণতি:

এদিকে ইয়াহইয়া আল-মামুনও কর্ডোভা দখলের জন্য অস্থির ছিলেন। তিনি একটি নতুন চাল চাললেন এবং আব্বাদের প্রতি কর্ডোভা অধিবাসীদের ঘৃণার সুযোগ নিয়ে ইবনে উকাশা নামক এক পেশাদার খুনিকে নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেন। ইবনে উকাশা কর্ডোভা অধিবাসীদের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে নিজের দলবল নিয়ে মাঠে নামলেন। তিনি কর্ডোভার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিশ্বাস করালেন যে, তারা যদি সহযোগিতা করেন তবে তিনি কর্ডোভা থেকে সেভিলের বাহিনীকে তাড়িয়ে তাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারেন।

কর্ডোভা অধিবাসীরা প্রতারিত হয়ে তার সাথে যোগ দিল। ইবনে উকাশা একদিন হঠাৎ কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে ঢুকে মুতাদিদের পুত্র আব্বাদকে হত্যা করেন। আব্বাদের সামান্য সেনাবাহিনী ইবনে উকাশার লোক এবং কর্ডোভা অধিবাসীদের সামনে টিকতে পারল না এবং এভাবেই কর্ডোভা থেকে মুতাদিদের শাসনের অবসান ঘটল। কিন্তু এরপর ইবনে উকাশা কর্ডোভা অধিবাসীদের দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেননি। যখন তিনি সেখানে ইয়াহইয়া আল-মামুনের রাজত্ব ঘোষণা করলেন, তখন কর্ডোভার উলামা ও ফকিহদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। আল-মামুন কর্ডোভায় তার প্রতিনিধির দখলে এতটাই আনন্দিত হলেন যে, তিনি অবিলম্বে কর্ডোভায় আসেন এবং ইবনে উকাশাকে ধন্যবাদ জানান।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৯১, ১০৩।

আদায় করতে গিয়ে তার ওপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করলেন। এটি জমাদিউল আখিরা ৪৬৭ হিজরির ঘটনা। এভাবে ইবনে উকাশা কুরতুবাহর নায়েবে হাকীম হয়ে গেলেন। কিন্তু ইয়াহইয়া আল-মামুন জানতেন যে, ইবনে উকাশার মতো অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য নয়। তিনি ইবনে উকাশাকে ঘুঁটি বানিয়ে নিজে কুরতুবাহর ওপর রাজত্ব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি অনুভব করছিলেন যে কুরতুবাহর ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। ধীরে ধীরে ইয়াহইয়া যুন-নুন এবং ইবনে উকাশার মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। কিন্তু যখন তলাইতলায় ইবনে উকাশাকে বরখাস্ত করার পরামর্শ চলছিল, তখন ইবনে উকাশা একটি ষড়যন্ত্র তৈরি করে ফেলেছিলেন। তিনি শক্তিতে ইয়াহইয়া আল-মামুনের সমকক্ষ না হলেও নিজের কাজে ওস্তাদ ছিলেন। ঘিলকদ ৪৬৭ হিজরিতে বিষক্রিয়ার কারণে ইয়াহইয়া আল-মামুন হঠাৎ মারা যান। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, এটি ছিল ইবনে উকাশার কারসাজি। এভাবে তলাইতলার এই বিখ্যাত কিন্তু কুখ্যাত শাসক ৩২ বছর শাসন করার পর রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে অদৃশ্য হয়ে যান। [১]

ইয়াহইয়া আল-কাদির:

তলাইতলার সিংহাসনে এখন ইয়াহইয়া আল-মামুনের পুত্র ইয়াহইয়া আল-কাদির আসীন হলেন, যিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল, ভীরা এবং স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন। তার পুরো সময় সুন্দরী দাসী এবং গায়কদের আসরে কাটত। তার সাহসহীনতার অবস্থা এমন ছিল যে, খোজারাও তাকে নিয়ে উপহাস করত, ছোট ছোট সর্দাররাও তার ওপর প্রভাব বিস্তার করত এবং বিভিন্ন অজুহাতে তার কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিত। এভাবে তলাইতলা, যা আগে মুলুকুত তাওয়াইফের সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র ছিল, তার মর্যাদা ও গাভীর্ঘ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়ে পড়ল। তলাইতলাকে দুর্বল দেখে মুতাদিদ পুনরায় কুরতুবাহ দখলের পরিকল্পনা করেন। ততদিনে ইবনে উকাশার কবলে বন্দি কুরতুবাহবাসীর ধৈর্যও শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই মুতাদিদ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং সফর ৪৭১ হিজরিতে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে কুরতুবাহ জয় করে নেন। ইবনে উকাশা এবং তার সঙ্গীরা নিহত হন। কুরতুবাহর ওপর আবারও ইশবিলিয়ার পতাকা উড়তে শুরু করে। [২] মোদাকথা, মুলুকুত তাওয়াইফরা আগত বিপদগুলোকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আসছিল। তারা কখনো নিজেদের মধ্যে লড়াই করত, আবার কখনো নিজেদের বিলাসকুঞ্জে বসন্তের আনন্দ উপভোগ করত, যদিও শরতের মৌসুম চলে এসেছিল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১০৩/২

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১০৩/২; আল-মুজিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি: ৯৭/১

ষষ্ঠ আলফন্সোর আক্রমণ

অবশেষে খ্রিস্টানদের গৃহযুদ্ধের অবসান হলো। ষষ্ঠ আলফন্সোর রূপে খ্রিস্টানরা একজন নতুন নেতা পেল। সে তার ভাইদের তাড়িয়ে উত্তর আন্দালুসের সমস্ত রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। সমস্ত খ্রিস্টান মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। লিওন, গ্যালিসিয়া এবং নাভারের কাস্টিলের সাথে অন্তর্ভুক্তির ফলে তার সামরিক শক্তি অসীম হয়ে গিয়েছিল। সে ‘ডিভাইড অ্যান্ড রুল’ নীতি অনুসরণ করে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে থাকে। সে এক রাজ্যের আমীরকে পৃষ্ঠপোষকতার প্রলোভন দেখিয়ে নিজের সাথে মেলাত এবং অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে তার থেকে একটি শহর ছিনিয়ে নিত এবং তারপর বড় অংকের কর ধার্য করে যুদ্ধবিরতি মেনে নিত। কিছু সময় পর সে অন্য কোনো মুসলিম রাজ্যকে মিত্র বানিয়ে তৃতীয় কারো সাথে লড়াই শুরু করে দিত।

পশ্চিমা ঐতিহাসিক লেন পুল লিখেছেন:

“মুলুকুত তাওয়ায়েফ যখন নিজেদের মুসলিম ভাইদের সাথে লড়াই করার জন্য দুর্বল হয়ে পড়ত, তখন তারা আলফন্সোর পায়ে লুটিয়ে পড়ত এবং তার কাছে সাহায্য চাইত। ফলে ইসলামী রাজ্যগুলো আলফন্সোকে কর পাঠাতে শুরু করল। আলফন্সো প্রতি বছর নিজের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে করের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে থাকে, কারণ এটি ছিল তার সাহায্য ও সহযোগিতার বিনিময়, আর এজন্যও যে সে মুসলমানদের সম্পদ কেড়ে নিতে চেয়েছিল যাতে আন্দালুস থেকে তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য তা যথেষ্ট হয়।

মুলুকুত তাওয়ায়েফ অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এই অর্থ পরিশোধ করত যাতে আলফন্সোর কাছ থেকে সামরিক সাহায্য পাওয়া যায় অথবা তার সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় যা সর্বত্র অব্যাহত ছিল। এমনকি তার বাহিনী কাদিস পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তর আন্দালুস নিঃস্ব ও রিক্ত ছিল, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, আলফন্সো মুসলিম বাদশাহদের কাছ থেকেই সেই সম্পদ লাভ করছিল যা তাদেরই ধ্বংসের প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল।“ [১]

তার যুদ্ধের পদ্ধতি চারটি পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে ছিল: প্রথমত, সে কোনো রাজ্যকে করদ রাজ্যে পরিণত করত এবং খাজনা দ্বিগুণ বা চারগুণ করে দিয়ে সেই রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করে দিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সে সেই রাজ্যের গ্রামগুলো উজাড় করে দিয়ে তার উৎপাদন ও সম্পদ ধ্বংস করে দিত যাতে তারা খাজনা দেওয়ার যোগ্য না থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে, সে খাজনা পরিশোধ না করার অভিযোগ তুলে সৈন্য ময়দানে নামিয়ে দিত এবং গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলো দখল করে নিত। চতুর্থ পর্যায়ে, সে নিয়মিত সৈন্য পাঠিয়ে রাজ্য জয় করে নিত।

তলোয়তলার ভীরা শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদির ষষ্ঠ আলফন্সোর মিত্র ছিল, তার অযোগ্যতার কারণে এই রাজ্যে সেই তীব্রতার সাথে...

[১] Story of the moors in Spain : 177

বিদ্রোহ ৪৭৩ হিজরির শুরুতে তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে এবং তিনি রাজ্যের পূর্ব দিকের দুর্গ ‘উবেদা’-তে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তলেতলে (টোলেডো) এখন কোনো শাসক ছিল না, শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বনু আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসক উমর আল-মুতাওয়াক্কিল এসে শহরের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইয়াহইয়া আল-কাদির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য তার বন্ধু আলফনসো ষষ্ঠের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আলফনসো তার বাহিনী নিয়ে ইয়াহইয়া আল-কাদিরকে তলেতলের সিংহাসনে বসাতে আসেন এবং উমর আল-মুতাওয়াক্কিলকে তলেতলে ছেড়ে চলে যেতে হয়। এভাবে যুল-কাদা ৪৭৩ হিজরিতে তলেতলে পুনরায় ইয়াহইয়া আল-কাদিরের দখলে চলে আসে। [১]

আলফনসো ষষ্ঠের ইশবিলিয়া আক্রমণ—ইবনে আশ্মারের বুদ্ধিমত্তা ও দাবার চাল:

আলফনসো ষষ্ঠ মুসলমানদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। যদি কখনো কর পরিশোধে দেরি হতো, তবে তিনি সসৈন্যে সেখানে লুটতরাজ চালাতেন। বনু আব্বাদের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুতামিদের শাহখর্চি, রমাইকিয়ার বিলাসিতা এবং ইবনে আশ্মারের অপব্যয় রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিল। সৈন্যদের বেতন দেওয়ার মতো টাকাও ছিল না। এটি দেখে আলফনসো ষষ্ঠ সৈন্য নিয়ে কর্ডোভার দিকে অগ্রসর হন।

যখন তার বাহিনী কর্ডোভার বাইরে তাবু ফেলল, তখন মানুষের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। মুতামিদ বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে তার সিংহাসন রক্ষা করবেন। যুদ্ধ করার মতো কোনো শক্তিশালী বাহিনী ছিল না এবং দেওয়ার মতো কোনো অর্থও ছিল না।

তিনি ইবনে আশ্মারকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন আলফনসো ষষ্ঠের কাছে যান এবং কোনোভাবে এই বিপদ দূর করেন। ইবনে আশ্মার তখন এক অদ্ভুত কাব্যিক চিন্তা করলেন। তিনি দাবার একটি চাল চাললেন যার উদাহরণ পৃথিবীতে কোথাও নেই। তার দাবার গুটিগুলো ছিল আবলুস, চন্দন ও হাতির দাঁতের তৈরি, যার ওপর সোনার কাজ করা ছিল।

ইবনে আশ্মার তার দলবল নিয়ে কর্ডোভা থেকে বের হলেন এবং আলফনসো ষষ্ঠের শিবিরের কাছে কিছু দূরে তাবু ফেললেন। আলফনসো ষষ্ঠের সেনাপতিরা যখন ইবনে আশ্মারের কাছে এলেন, তখন তিনি তাদের সেই দাবা দেখালেন। সেই সেনাপতিরা এর কারুকার্য ও মূল্যবান উপকরণ দেখে মুগ্ধ হলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা এই বিরল ও অমূল্য জিনিসের কথা আলফনসো ষষ্ঠের কাছে পৌঁছাবেন। আর যখন আলফনসো ষষ্ঠ এটি পেতে চাইবেন, তখন তার বিনিময়ে আলফনসোকে ইবনে আশ্মারের দাবি মেনে নিতে রাজি করাবেন।

খ্রিস্টান সেনাপতিরা রাজি হলেন। তারা আলফনসো ষষ্ঠের সামনে গিয়ে এই দাবার প্রশংসা করলেন। আলফনসো ষষ্ঠ দাবার খুব শৌখিন ছিলেন। তিনি স্বাভাবিকভাবেই সেটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যখন ইবনে আশ্মার তার কাছে এলেন, তখন আলফনসো তাকে খুব সমাদর করলেন এবং কথার ছলে জিজ্ঞেস করলেন: “তুমি কি দাবা খেলতে জানো?”

ইবনে আশ্মার দাবা খেলায় নিজের দক্ষতার দাবি করলে আলফনসো বললেন: “শুনেছি তোমার কাছে একটি অত্যন্ত বিরল ও মূল্যবান দাবা আছে।” ইবনে আশ্মার বললেন: “জি হ্যাঁ, অবশ্যই আছে।” আলফনসো বললেন: “সেটি কি দেখার সুযোগ হতে পারে?”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১০৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা ৫৩০

ইবনে আন্মার বললেন: “আমি সেই দাবাটি তখন পেশ করব যখন আপনি আমার সাথে খেলার জন্য প্রস্তুত হবেন। তারপর যদি আপনি বাজি জিতে যান তবে সেই দাবাটি আপনার জন্য উপহার। আর যদি আমি জিতে যাই তবে আপনাকে আমার একটি দাবি মানতে হবে।”

আলফনসো বললেন: “তুমি সেই দাবাটি আনিয়ে নাও।”

ইবনে আন্মার একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে দাবাটি আনিয়ে নিলেন। আলফনসো ষষ্ঠ যখন কারুকার্যের এই অনন্য নিদর্শনটি দেখলেন তখন তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন: “আমি আশা করিনি যে দাবার প্রতি কারো শখ এই পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে।”

তারপর তিনি ইবনে আন্মারকে বললেন: “তোমার প্রস্তাবটি কী ছিল?”

ইবনে আন্মার বললেন: “যদি আপনি জিতেন তবে দাবাটি আপনার, আর যদি আমি জিতি তবে আপনি আমার একটি দাবি পূরণ করবেন।”

আলফনসো ষষ্ঠ বললেন: “না, আমি এই অজানা কথাটি মানতে প্রস্তুত নই। হতে পারে তুমি এমন কোনো দাবি করে বসবে যা আমার সাধ্যের বাইরে।”

মজলিস শেষ হলে সেই সব আমীরগণ, যাদের ইবনে আন্মার আগেই বশীভূত করে নিয়েছিলেন, আলফনসোকে বলতে লাগলেন: “এই প্রস্তাব মানতে ক্ষতি কী? যদি আপনি জিতে যান তবে এই অতুলনীয় দাবাটি আপনার হয়ে যাবে। আর যদি সে জিতেও যায় তবে সে আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছুই নিতে পারবে না।”

তারপর তারা আলফনসোকে বোঝালেন যে, এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আপনার সুনাম নষ্ট হবে কারণ মানুষ মনে করবে আপনি প্রতিপক্ষের একটি সাধারণ দাবি পূরণ করতেও অক্ষম। “যদি সত্যিই ইবনে আন্মার কোনো অন্যায় দাবি করে তবে আপনার তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে।” অবশেষে আলফনসো রাজি হলেন। তিনি ইবনে আন্মারকে ডেকে পাঠালেন।

তিনি নিজের দাবা সাথে নিয়ে আলফনসোর তাঁবুতে পৌঁছালেন। আলফনসো বললেন: “আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।”

ইবনে আন্মার বললেন: “এই বিষয়ে সাক্ষী নিযুক্ত করুন।” আলফনসো ষষ্ঠ বড় বড় সরদারদের সাক্ষী বানালেন। এরপর খেলা শুরু হলো। যদিও আলফনসো দাবার ভক্ত ছিলেন কিন্তু ইবনে আন্মার এই বিদ্যায় ওস্তাদদের ওস্তাদ ছিলেন। আলফনসো খুব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন এবং ইবনে আন্মার তাকে বললেন: “এখন কি আমার একটি দাবি করা অধিকার নয়?”

আলফনসো ষষ্ঠ বললেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই। তোমার দাবি কী?”

ইবনে আন্মার বললেন: “আপনি আপনার দেশে ফিরে যান।”

এ কথা শুনেই আলফনসো ষষ্ঠের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবং তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি তার সরদারদের বললেন: “আমি আগেই এই বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম কিন্তু তোমরা আমার মত বদলে দিয়েছিলে।”

আলফনসো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরদাররা তাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে শান্ত করলেন এবং বললেন: “আপনি খ্রিস্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাজা। আপনি যদি নির্ধারিত কথা অস্বীকার করেন তবে তা হবে অনেক বড় কলঙ্ক।”

অবশেষে আলফনসো নিজের রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে বললেন: “ফিরে যাওয়া একটি শর্তে হতে পারে, আর তা হলো আমাকে আগামী থেকে দ্বিগুণ...”

“খরাজ দেওয়া হোক।” ইবনে আন্নার এতে সম্মত হলেন এবং আলফনসো ষষ্ঠ তার সেনাবাহিনীসহ ফিরে গেলেন। কর্ডোভা এবং সেভিলে এই সংবাদ পৌঁছালে চারদিকে ইবনে আন্নারের জয়জয়কার পড়ে গেল এবং কবিদের মহলে তাকে আন্দালুসের “ফাতেহে আজম” (মহা বিজয়ী) হিসেবে গণ্য করা হতে লাগল। [১]

ইবনে আন্নারের উত্থান:

এই সাফল্যের পর ইবনে আন্নার নিজেকে সত্যিই প্রথম আবদুর রহমান এবং হাজিব আল-মানসুরের মতো একজন মহান শাসক মনে করতে লাগলেন। তিনি সেভিল এবং কর্ডোভার শান-শওকতকে তার “রাজনৈতিক দক্ষতা”-র অবদান হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্বের একটি বড় অংশ নিজের বিলাসিতায় ব্যয় করতে লাগলেন। কর্ডোভায় তার শোভাযাত্রা অত্যন্ত ধুমধাম করে বের হতো। সাধারণ মানুষ তার এক পলক দেখার জন্য ভিড় জমাত। সেই সব মানুষ অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে গণ্য হতো যারা ইবনে আন্নারের হাত চুমু খাওয়ার সুযোগ পেত, অথবা যাদের ভাগ্যে তার এক নজর দৃষ্টি এবং সালামের ইশারা জুটত। সেই সব মানুষও নিজেদের ধন্য মনে করত যারা ইবনে আন্নারের রেকাব চুমু খাওয়ার বা তার পোশাক স্পর্শ করার সুযোগ পেত। [২]

ইবনে আন্নার ও মুতামিদের মধ্যে দূরত্ব এবং অতঃপর শত্রুতা:

ইবনে আন্নারের কাছে মুতামিদ এবং রুমাইকিয়া মূল্যহীন দাবার ঘুঁটির মতো হয়ে গেলেন। এই অনুভূতিগুলো ধীরে ধীরে ঘৃণা ও অবজ্ঞায় রূপ নিতে লাগল। রুমাইকিয়ার প্রতি ইবনে আন্নারের ঘৃণার আরেকটি বড় কারণ ছিল। রুমাইকিয়ার সাথে বিয়ের পর মুতামিদের ভালোবাসা ও অনুরাগের দৃষ্টিতে ইবনে আন্নারের অবস্থান গৌণ হয়ে গিয়েছিল। যদিও শাসনকার্য তখনও ইবনে আন্নারের হাতেই ছিল, কিন্তু মুতামিদ আগের মতো তার প্রতি আসক্তি দেখাতেন না বলে বিষয়টি তার কাছে অসহনীয় লাগত। ইবনে আন্নার দীর্ঘকাল ধরে এই কারণে মনে মনে রুমাইকিয়ার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। এখন তিনি ব্যক্তিগত মজলিসগুলোতে রুমাইকিয়া সম্পর্কে কিছু কুরুচিপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তিনি মুতামিদের সন্তানদের সাথেও দুর্ব্যবহার করতে লাগলেন। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তিনি খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন।

মুতামিদ বৈদেশিক বিষয়াবলি সমাধান এবং আলোচনার জন্য তাকেই পাঠাতেন। তিনি এমন সব সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর করে আসতেন যা সেভিলের জন্য পুরোপুরি ক্ষতিকর এবং খ্রিস্টানদের জন্য উপকারী হতো। মুতামিদ এতে অবশ্যই ক্ষুব্ধ হতেন, কিন্তু ইবনে আন্নারের সাথে পুরনো বন্ধুত্বের খাতিরে ধৈর্য ধারণ করতেন। [৩]

অহংকারের পরিণাম শুরুতে মূর্খতা এবং শেষে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইবনে আন্নারের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটল। মুতামিদ ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইবনে আন্নারকে মুরসিয়া এবং এর সংলগ্ন শহরগুলো (যা তদমিরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল) জয় করার জন্য সেনাবাহিনী দিয়ে প্রেরণ করেন। পথে ইবনে রাশিক নামক এক যোদ্ধা সর্দারও তার সেনাবাহিনী নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। তিনি মুরসিয়া অবরোধে এবং সেখানকার অধিবাসীদের স্থানীয় শাসক ইবনে তাহিরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এভাবে ইবনে আন্নার...

[১] আল-মুজিব ফি তালখিস আখবার আল-মাগরিব: ১/৯২

[২] আল-মুজিব ফি তালখিস আখবার আল-মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাফি: ১/৯৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৮/৭০৬

...সহজেই মার্সিয়া দখল করে নিল। কিন্তু এর পরপরই সে নিজের কর্মফলের কারণে স্বায়ত্তশাসনের ঘোষণা দিল। [১]

বাদশাহ বিন আব্বাদ মুতামিদকে তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষার আগে তার ওপর নোংরা কবিতার বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। সে মুতামিদ এবং রুমাইকিয়ার এমন কুৎসা রটনা শুরু করল যা ছিল নৈতিকতা বিবর্জিত। সে এক নতুন মজলিসে মুতামিদকে সম্বোধন করে বলল:

تَخَيَّرْتَهَا مِنْ بَنَاتِ الْهَجَانِ ... رُمَيْكِيَّةٌ مَا تُسَاوِي عِقَالًا

“তুমি জাতির কন্যাদের মধ্য থেকে রুমাইকের সেই দাসীকে পছন্দ করেছ যার মূল্য একটি উটের রশির সমানও ছিল না।”

سَأَكْشِفُ عِرْضَكَ شَيْئًا فَشَيْئًا ... وَأَهْتِكُ سِتْرَكَ حَالًا فَحَالًا

“এখন আমি ধীরে ধীরে তোমার সম্মান ধূলিসাৎ করব... এবং সুযোগ বুঝে তোমার পর্দা উন্মোচন করব।” [২]

ইবনে আন্নারের পরিণতি:

এই কবিতাগুলো কোনোভাবে মুতামিদের কাছে পৌঁছে গেল এবং এভাবে উভয়ের মধ্যে এক চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হলো। ইবনে আন্নারের ধৃষ্টতা সামান্য ছিল না, তবে মুতামিদকে আরও উত্তেজিত করার পেছনে রুমাইকিয়া ছাড়াও একজন বিখ্যাত দরবারী আবু বকর ইবনে যাইদুনেরও হাত ছিল, যিনি ইবনে আন্নারের সমপর্যায়ের কবি এবং পদমর্যাদার দৌড়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সেই সময় তিনি ইবনে আন্নারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং চাইতেন যেন ইবনে আন্নারকে দ্রুত তার কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া হয়।

এদিকে ইবনে আন্নারের ধারণা ছিল না যে তার ভাগ্যে মাত্র চার দিনের রাজত্ব লেখা আছে। একদিন সে যখনই কোনো জরুরি অভিযানে মার্সিয়ার বাইরে গেল, ইবনে রাশিক, যার মার্সিয়া বিজয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, বিদ্রোহ করে বসল।

ইবনে আন্নার দ্রুত ফিরে এল কিন্তু শহরের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ইবনে আন্নার তার রক্ষীবাহিনীর সাথে মার্সিয়ার আকাশচুম্বী প্রাচীরগুলো অতিক্রম করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বুঝতে পারল যে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। সে পালিয়ে কাসতালিয়া চলে গেল যাতে আলফনসো ষষ্ঠ-এর সাহায্য নিতে পারে, কিন্তু সেখানে লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই জুটল না।

এরপর সে সারকুস্তা এসে বনু হদের আশ্রয় নিল, কিন্তু ৪৭৫ হিজরিতে সেখানকার আমির আল-মুকতাদির বিন হদের মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরিরা এমন এক ব্যক্তির তোষামোদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে তার অন্নদাতার সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

ইবনে আন্নার বনু হদের বিরূপ আচরণ দেখে সারকুস্তা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং একে একে বিভিন্ন আমিরের আশ্রয় খুঁজতে লাগল, কিন্তু সবাই তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। রবিউল আউয়াল ৪৭৭ হিজরিতে সে ‘উশকা’ দুর্গে পৌঁছাল যেখানে দুর্গাধিপতি ইবনে মুবারক তাকে প্রতারণা করে বন্দি করে ফেলল। ইবনে আন্নার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কিছুদিন কাটানোর পর ইবনে মুবারককে প্রস্তাব দিল যে সে তাকে বন্দি রাখার...

[১] আল-মুজিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ৯৫/১

[২] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব লিত-তিলমিসানি: ২/ ৪৫১, ৪৫২

এর পরিবর্তে তার নিলাম ডাকো এবং যে তার সর্বোচ্চ মূল্য দেবে, সে তাকে নিয়ে যাক।
ইবনে আন্নার এই পরামর্শ পছন্দ করলেন। তিনি দূত পাঠিয়ে প্রতিটি দরবারে ইবনে
আন্নারের নিলামের খবর জানিয়ে দিলেন। ইবনে আন্নার এই উপলক্ষে বলেছিলেন:

أَصْبَحْتُ فِي السُّوقِ يُنَادَى عَلَى ... رَأْسِي بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْمَالِ

“আমি বাজারে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার মাথার দাম বিভিন্ন ধরনের ধন-সম্পদ দিয়ে
নির্ধারণ করা হচ্ছে।”

وَاللَّهِ مَا جَارَ عَلَى مَالِهِ ... مَنْ ضَمَّنِي بِالثَّنِّ الْغَالِي

“আল্লাহর কসম! যে আমাকে উচ্চ মূল্য দিয়ে লাভ করবে, সে তার সম্পদের ওপর জুলুম
করবে না।”

মুতামিদ ইবনে আন্নারকে গ্রেপ্তার করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। তাই তিনি সর্বোচ্চ মূল্য
দিয়ে ইবনে আন্নারকে লাভ করলেন। তাকে খড় বোঝাই একটি গাধার পিঠে বসিয়ে কড়া
পাহারায় শিকলবদ্ধ অবস্থায় প্রথমে কর্ডোভায় আনা হলো, যেখানে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে
সেই হাজার হাজার মানুষ তার অপদস্থ হওয়ার দৃশ্য দেখল, যারা একসময় তার হাত-পা
চুম্বন করত। মুতামিদও ততক্ষণে কর্ডোভায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তিনি ইবনে আন্নারকে
নিজের সামনে ডাকলেন, নিজের অনুগ্রহ এবং তার অকৃতজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে
তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন। ইবনে আন্নার মাথা নিচু করে শুনতে থাকলেন এবং
তারপর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন:

“আমার ভুল হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করে দিন।”

কিন্তু মুতামিদের রাগ প্রশমিত হয়নি। ইবনে আন্নারকে সেভিলে পাঠিয়ে সেখানকার রাস্তায়
ঘোরানোর পর মুতামিদের বাসভবন ‘কাসরুল মুবারক’-এর একটি কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা
হলো। ইবনে আন্নার এই অবস্থায় মুতামিদের প্রশংসায় বেশ কিছু কাসিদা রচনা করেন,
যাতে নিজের অপরাধ স্বীকারের পাশাপাশি ক্ষমার আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই কালাম
যখন মুতামিদের কাছে পৌঁছাল, তখন তার পুরনো বন্ধুত্বের কথা মনে পড়তে লাগল।

অবশেষে এক রাতে মুতামিদ ইবনে আন্নারকে কাছে ডেকে পাঠালেন। তিনি শিকল টেনে
টেনে হেঁচড়ে চলে এলেন। মুতামিদ আবারও নিজের অনুগ্রহ এবং তার ধৃষ্টতার কথা উল্লেখ
করে তাকে লজ্জিত করলেন। ইবনে আন্নার দৃষ্টি নিচু করে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকলেন।

মুতামিদ আর কিছু না বলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি ভেতর থেকে নরম
হয়ে গিয়েছিলেন। তার এই অবস্থা তার রানী রুমাইকিয়া এবং শাহজাদাদের কাছে গোপন
থাকল না। মুতামিদ হয়তো ইবনে আন্নারকে ক্ষমা করে দিতেন, কিন্তু রুমাইকিয়া এবং
তার ছেলেরা এই কাঁটা চিরতরে উপড়ে ফেলার সংকল্প করেছিলেন। এক রাতে পানাহার
ও গান-বাজনার আসরে রুমাইকিয়া মুতামিদকে বললেন: “শুনেছি তুমি ইবনে আন্নারকে
ক্ষমা করে দেবে। অথচ সে বিদ্রোহও করেছে এবং আমাদের সম্মানের সাথেও ছিনিমিনি
খেলেছে। বাদশাহরা এটা কখনোই সহ্য করেন না।”

এ কথা শুনেই মুতামিদ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং সরাসরি সেই কুঠুরির
দিকে ছুটলেন যেখানে ইবনে আন্নার বন্দি ছিলেন। ইবনে আন্নার শিকলে বাঁধা ছিলেন।
মুতামিদকে দেখে তিনি তার পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, কিন্তু মুতামিদ তখন নিজের হুঁশে
ছিলেন না। তার হাতে তখন সেই বর্শাটি ছিল যা ষষ্ঠ আলফনসো তাকে উপহার
দিয়েছিলেন। তিনি বর্শাটি দিয়ে ইবনে আন্নারের মাথায় আঘাত করলেন এবং তারপর
ক্রমাগত আঘাত করতে থাকলেন যতক্ষণ না ইবনে আন্নারের আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে চলে
গেল। এই ঘটনাটি ৪৭৭ হিজরির শেষের দিকের। এভাবে মুতামিদ এবং

ইবনে আশ্মারের বন্ধুত্বের কাহিনী এক করুণ পরিণতির মাধ্যমে সমাপ্ত হলো। [১]

তলেয়তোলা ও ইশবিলিয়া লক্ষ্যবস্তুতে:

এই সময়ে ষষ্ঠ আলফনসো আন্দালুসের মধ্যবর্তী শহর তলেয়তোলাকে তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিলেন। তলেয়তোলা ছিল বিশ্বের অন্যতম সুরক্ষিত শহর এবং উত্তর আন্দালুসের খ্রিস্টানরা দীর্ঘকাল ধরে তাদের এই প্রাক্তন রাজধানী পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাকুল ছিল। ষষ্ঠ আলফনসো কয়েক বছর আগে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তার ভাইদের কাছে পরাজিত হয়ে তলেয়তোলায় ইয়াহইয়া আল-মামুনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি তার চোখ ও কান খোলা রেখেছিলেন এবং শহরের সেই সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়েছিলেন যার মাধ্যমে এই শহর জয় করা সম্ভব ছিল। তিনি আল-মামুন এবং তলেয়তোলার আমিরদের একটি গোপন পরামর্শ চুরিসূত্রে শুনে ফেলেছিলেন, যেখান থেকে তিনি জানতে পারেন যে এই শহরের কাছে খাদ্যের এত সম্পদ রয়েছে যে সাত বছর পর্যন্ত অবরোধ সহ্য করা সম্ভব।

ষষ্ঠ আলফনসো ইয়াহইয়া আল-মামুনের আতিথেয়তার প্রতিদান এভাবে দিলেন যে, শাসক হওয়ার পর তার বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করতে এবং তাকে করদ রাজ্যে পরিণত করতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেননি। এরপর ৪৬৭ হিজরিতে যখন আল-মামুন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি তার দুর্বল চিত্তের উত্তরসূরি ইয়াহইয়া আল-কাদিরকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। যখন শহরবাসীর ঘৃণার কারণে ৪৭২ হিজরিতে তিনি তলেয়তোলা থেকে বিতাড়িত হন, তখন ষষ্ঠ আলফনসোই তাকে পুতুল শাসক হিসেবে পুনরায় তলেয়তোলার সিংহাসনে বসান।

এরপর ষষ্ঠ আলফনসো তলেয়তোলা আনুষ্ঠানিকভাবে দখলের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ইশবিলিয়ার শাসক মুতামিদের কাছ থেকে—যিনি তার করদ রাজ্যও ছিলেন—এই অঙ্গীকার নেওয়া যে, খ্রিস্টানরা যদি তলেয়তোলা আক্রমণ করে তবে মুতামিদ তলেয়তোলাবাসীদের কোনো সাহায্য করবেন না। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পর ষষ্ঠ আলফনসোর বাহিনী ৪৭৪ হিজরিতে তলেয়তোলার শহরতলিতে অতর্কিত হামলা শুরু করে, যার ফলে আশেপাশের সমস্ত ক্ষেত-খামার, বাগান এবং গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। [২]

ইশবিলিয়া রাষ্ট্রের শহরগুলোতে আক্রমণ:

এদিকে ইশবিলিয়ার ওপর ধার্যকৃত কর দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল এবং মুতামিদের কাছে তা পরিশোধ করার মতো পর্যাপ্ত অর্থ ছিল না। তিনি বাধ্য হয়ে টাঁকশালে ভেজাল মুদ্রা তৈরি করান যার ওপর সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। ৪৭৫ হিজরিতে যখন ষষ্ঠ আলফনসোর পক্ষ থেকে তার ইহুদি সচিব ইবনে শালিব করের অর্থ আদায় করতে আসেন, তখন মুতামিদের উজির ইবনে যায়দুন তাকে এই মুদ্রাই প্রদান করেন। কিন্তু তিনি আসল-নকল চেনার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাই অত্যন্ত ঘৃণার সাথে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “যদি তোমরা নিজে থেকে খাঁটি সোনা না দাও, তবে খুব শীঘ্রই আমরা তোমাদের শহরগুলো দখল করে আমাদের ইচ্ছামতো সোনা আদায় করে নেব।” মুতামিদ এই জবাবে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। তিনি ইহুদিটিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন এবং তার সাথে আসা দুই খ্রিস্টান সৈন্যকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

[১] আল-মুজিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ১/৯৩ থেকে ৯৬; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৬৮৬

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি লি-আব্দুর রহমান আলি: পৃ. ৩৩১, ৩৩২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/১০৮ থেকে ১১০

আলফনসো যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি মুতামিদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিকে দুটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। প্রথম বাহিনীটি ইশবিলিয়ার অধীনস্থ পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরসমূহ: ওলবা এবং বাজা-র সীমান্তে প্রবেশ করে বাগান ও ফসল ধ্বংস করার পর লোকজনকে বন্দিও করল। দ্বিতীয় বাহিনী নিয়ে আলফনসো ষষ্ঠ নিজে রওনা হলেন এবং ওয়াডিউল কাবীর নদীর তীরে ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছালেন যেখান থেকে মুতামিদের প্রাসাদ সামনে দেখা যেত। এদিকে প্রথম বাহিনীটিও তার সাথে এসে মিলিত হলো। খ্রিস্টান যোদ্ধারা কোনো প্রতিরোধ না দেখে চারদিকে ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। আলফনসো তিন দিন পর্যন্ত ইশবিলিয়া অবরোধ করে শহরবাসীকে আতঙ্কিত করার পর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। শায়ুনা-কে ধ্বংসলীলার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তিনি তরীফ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে প্রবেশ করে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরলেন। [১]

এই অভিযানের সময় তিনি মুতামিদের কাছে একটি বিদ্রপাত্মক পত্র পাঠালেন যাতে লেখা ছিল:

“আমাদের এখানে মাছি অনেক বেশি। তুমি তোমার প্রাসাদ থেকে একটি পাখা পাঠিয়ে দাও যাতে আমি স্বস্তি পাই।”

মুতামিদ জবাবে লিখলেন: “আমি তোমার অহংকার ও দম্ভ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। আমি তোমাকে চামড়ার এমন পাখা পাঠাব যা মানুষকে তোমার অনিষ্ট থেকে মুক্তি দেবে।”

আলফনসো ষষ্ঠ এই জবাব পড়ে চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি এতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুতামিদ এখন আর অধিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। [২]

সুকুত-এ-তলীতলা (তলীতলার পতন):

আলফনসো ষষ্ঠ মুলুকুত তাওয়ায়েফদের শাসন বিলুপ্ত করে পুরো আন্দালুস নিজের দখলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে সবার আগে তিনি তলীতলা জয় করতে চেয়েছিলেন, যেখানকার নামমাত্র শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদির প্রতিরোধের সামান্যতম সাহসও রাখতেন না।

আলফনসো ষষ্ঠ ইয়াহইয়া আল-কাদিরকে বলে পাঠালেন যে, সে যেন তলীতলা তার হাতে তুলে দেয় এবং নিজে তার পরিবর্তে বালানসিয়া-র শাসনভার গ্রহণ করে, যা তার পিতা ইয়াহইয়া আল-মামুন নিজের শেষ দিনগুলোতে জয় করেছিলেন। আল-কাদিরের কোনো উচ্চবাচ্য করার সাহস ছিল না, কিন্তু তলীতলার আমীরগণ শহর হস্তান্তরে রাজি ছিলেন না। তাই আলফনসো ষষ্ঠের বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতির পর তলীতলার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এই শহরের গ্রাম ও বাগানগুলো তিন বছর ধরে খ্রিস্টানদের লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার ছিল, ফলে প্রাথমিক রসদ সরবরাহের উপায় শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং শহর দখল করা খুব একটা কঠিন ছিল না। তলীতলাকে বিপদে দেখেও মুলুকুত তাওয়ায়েফরা চোখ বুজে রইলেন এবং কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন না, বরং সবাই আতঙ্কিত অবস্থায় আলফনসো ষষ্ঠকে কর দিতে থাকলেন। [৩]

কেবল বাতলিয়াস-এর শাসক উমর বিন মুহাম্মদ আল-আফতাস, যিনি মুতাওয়াঙ্কিল উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, ঈমানি চেতনার পরিচয় দিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী এবং বাগ্মী ও সাহিত্যমনা মানুষ ছিলেন। পতনের এই যুগে তিনি বাতলিয়াসকে কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রই বানাননি, বরং সামরিক দিক থেকেও একে একটি অপরাজেয় দুর্গে পরিণত করেছিলেন। [৪]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল্ম আন্দালুস: ২ / ৭৩, ৭৪

[২] নাফহত তীব: ২ / ৩৫৮

[৩] আত-তারীখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ: ৩৩৩

[৪] আল-হুলাতুস সিয়ারা: ২ / ৯৬, ৯৮

উমর আল-মুতাওয়াক্কিলের আদেশে তার পুত্র আল-ফজল, যিনি মারদাহর শাসক ছিলেন, খ্রিস্টানদের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য তাদের ওপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আলফনসো ষষ্ঠের শক্তি ছিল অনেক বেশি এবং উমর আল-মুতাওয়াক্কিলের সেনাবাহিনী ছিল সীমিত। তাই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে। জমাদিউল আখিরা ৪৭৭ হিজরিতে আলফনসো ষষ্ঠ তার পঙ্গপাল সদৃশ বিশাল বাহিনী নিয়ে, যার মধ্যে লিওন এবং কাস্টিল ছাড়াও আরাগন রাজ্য এবং ফ্রান্সের স্বেচ্ছাসেবকরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাজা নদীর মোড় অতিক্রম করে তুলয়তুলাহ-র প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে যান।

তুলয়তুলাহবাসীদের রক্ষা পাওয়া কঠিন ছিল, তবুও তারা শহরের আকাশচুম্বী প্রাচীরের সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধ শুরু করে। তাদের আশা ছিল যে, মুলুকুত তাওয়াইফরা ইসলামী আন্দালুসের এই প্রতিরক্ষা দুর্গ রক্ষার জন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু প্রতিটি আশাই বৃথা প্রমাণিত হলো। অবরোধ নয় মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, এমনকি শহরবাসী অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে শুরু করে। মুক্তি অসম্ভব দেখে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সন্ধির আবেদন নিয়ে আলফনসো ষষ্ঠের কাছে যান, কিন্তু তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ না করেই অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার ধূর্ত ও চতুর উজির শাতানাদো-কে তাদের সাথে কথা বলার নির্দেশ দেন। শাতানাদো প্রতিনিধি দলকে বুঝিয়ে বলেন যে, আলফনসো ষষ্ঠ শহর জয় না করে পিছু হটবেন না। ভালো হয় যদি আপনারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন।

শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বললেন: “যদি মুলুকুত তাওয়াইফদের সাহায্য চলে আসে, তবে আমাদের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।”

শাতানাদো গিয়ে আলফনসো ষষ্ঠকে এই কথা জানালে তিনি বিদ্রপাত্মক হাসি হাসলেন এবং মুলুকুত তাওয়াইফদের সেই দূতদের সামনে হাজির করলেন, যারা তার আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে তার কাছে এসেছিল।

তুলয়তুলাহর প্রতিনিধি দল অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে আসে এবং তিন দিন পর আলফনসো ষষ্ঠের বাহিনী শহরে প্রবেশ করে। এটি মহররম ৪৭৮ হিজরির ঘটনা। পুতুল শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদিরকে কান ধরে সিংহাসন থেকে নামানো হয় এবং তিনি আলফনসো ষষ্ঠের অনুমতি নিয়ে তার পরিবার-পরিজনসহ “বালানসিয়া” (ভ্যালেন্সিয়া)-তে চলে যান, যা তার পিতা তার শেষ দিনগুলোতে জয় করেছিলেন।

আলফনসো শহর জয়ের সময় স্থানীয় মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং উপাসনালয়ের স্বাধীনতার সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন, কিন্তু দুই মাস পর তার সংকল্প বদলে যায়। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি আদেশ দেন যে, শহরের সুমহান জামে মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হোক। তার সৈন্যরা এই আদেশ অনুযায়ী জামে মসজিদে প্রবেশ করে। মানুষ আগে থেকেই খবর পেয়ে গিয়েছিল, তাই সমস্ত মুসল্লি, উলামা, ফুকাহা এবং ছাত্ররা মসজিদ খালি করে দিয়েছিলেন। তবে একজন মুহাদ্দিস শেখ আল-গুমারি তার হালকায়ে (পাঠচক্রে) বসে ছিলেন। সরকারি কর্মচারীরা বারবার এসে বলছিল: “তাড়াতাড়ি উঠুন।” তিনি হাদিসের পাঠ পাঠরত ছাত্রকে ইশারা করে বলতেন: “বর্ণনাটি পূর্ণ করো।” পাঠ শেষ করে তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন। সিজদাবনত হয়ে মসজিদের পবিত্র ধূলিকণাকে অশ্রু দিয়ে ভেজাতে থাকলেন। তিনি বাইরে বের হওয়া মাত্রই মসজিদের মেহরাব ভেঙে ফেলা হয় এবং ছাদে দ্রুশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। [১]

আলফনসো ষষ্ঠের আন্দালুসের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছানো:

আন্দালুসের মধ্যবর্তী শহর তুলয়তুলাহর সাথে সাথে দেশের পূর্ব উপকূলও আলফনসো ষষ্ঠের হাতে চলে এসেছিল, কারণ ইয়াহইয়া...

(১) আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গরনাতা, লি-আবদুর রহমান আলি: পৃ: ৪৩২, ৪৩৩।

আল-কাদির আলফনসো ষষ্ঠের বাহিনীর সাথে বালেঙ্গিয়ায় পৌঁছেছিলেন যেখানে আলফনসো ষষ্ঠ তার সরকারের আড়ালে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আল-কাদিরের রক্ষক খ্রিস্টান বাহিনী বালেঙ্গিয়ায় অবস্থান করে সমস্ত শহরতলি এবং গ্রাম ও উপকূলীয় এলাকাগুলোকে তাদের লুটতরাজ ও গুন্ডামির ময়দান বানিয়ে নিয়েছিল। এই “সেবা”র বিনিময়ে কাস্টিলীয়রা আল-কাদিরের কাছে বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করতে শুরু করল এবং অবশেষে বালেঙ্গিয়াবাসীদের ওপর কর আরোপ করা হলো যাতে আলফনসোর দাবি পূরণ করা যায়। [১]

আন্দালুসের অন্যান্য শহর বিপদে:

টলেডো পতনের পর আলফনসো ষষ্ঠের মনোযোগ অন্যান্য মুলুকুত তাওয়ায়েফের দিকে নিবদ্ধ হলো। তিনি দ্রুত পূর্ব ও দক্ষিণে বাহিনী পাঠিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। শত শত গ্রাম, জনপদ এবং ছোট ছোট শহর তার রাজ্যের অংশ হয়ে গেল। তিনি নিজের নামের সাথে “শাহেনশাহে মুলতাইন” এবং “হামিয়ে মাসিহিয়াত ওয়া ইসলাম” উপাধি যুক্ত করে দাবি করলেন যে তিনি খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় জাতির প্রধান। [২]

আন্দালুসের কোনো শাসকেরই এখন আর এই ভুল ধারণা ছিল না যে তিনি নিরাপদ। মনে হচ্ছিল যে বালেঙ্গিয়া এবং টলেডোকে গ্রাসকারী খ্রিস্টানদের এই প্লাবনের ঢেউ দক্ষিণ দিকে জিব্রাল্টারের দিকে অগ্রসর হয়ে একে অপরের সাথে মিলিত হবে এবং আন্দালুসের কোনো কোণই স্বাধীন থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে আল-মুতামিদ শেষ চেষ্টা হিসেবে তার এক ইহুদি মন্ত্রী ইবনে মাসালকে পুনরায় সন্ধির আলোচনার জন্য আলফনসোর কাছে পাঠালেন কিন্তু এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো।

আলফনসো ষষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন:

“আমি এই জাতিকে কীভাবে ছেড়ে দেব, যার প্রতিটি আমার খলিফা ও সুলতানদের উপাধি ধারণ করে বসে আছে। কেউ আল-মুতামিদ, কেউ আল-মুতাসিম, কেউ আল-মুতাওয়াক্কিল, কেউ আল-মুস্তাইন, কেউ আল-মুকতাদির, কেউ আল-মুতামিন, কেউ আল-মামুন। অথচ তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতিরক্ষার জন্য তলোয়ার তুলতে পারে না এবং নিজের ও নিজের প্রজাদের সম্মান রক্ষা করতে পারে না।” [৩]

মুসলমানদের ঐক্যের জন্য ওলামাদের ভূমিকা

মুলুকুত তাওয়ায়েফের পারস্পরিক লড়াই এবং উত্তর দিক থেকে খ্রিস্টানদের আক্রমণের সময় আন্দালুসের ওলামায়ে কেরাম ঐক্যের প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাদের মধ্যে কায়রোয়ানের ইবনে আবি তালিব রহ. (৩৫৫ হিজরি - ৪৩৭ হিজরি) ছিলেন, যিনি আফ্রিকা ও মিশরের প্রখ্যাত ক্বারী ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি কর্ডোভায় আসেন এবং জামে কর্ডোভায় পাঠদান শুরু করেন। তার রচনার সংখ্যা ৮০-এর কাছাকাছি। তিনি মুলুকুত তাওয়ায়েফের সেই বিশৃঙ্খল সময়ের ৩৮ বছর নিজের চোখে দেখেছিলেন। কর্ডোভায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ ভূমিকা ছিল। এখানকার শুরা সরকারের প্রধান ইবনে জাহওয়ার তাদের...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ২২৮

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃ: ৩৩৩-৩৩৪

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ৭৩

...এর বিশেষ ছাত্র ছিলেন। [১]

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ.:

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার মালেকী রহ. (৩৬৮ হি. - ৪৬৩ হি.) এই যুগের অন্যতম মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। আন্দালুস ছাড়াও আফ্রিকার প্রখ্যাত উস্তাদদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। বাত্তালইউস-এর শাসক মুজাফফর আফতাসের শাসনামলে তিনি পশ্চিম আন্দালুসের শহর লিশবোনা (লিসবন) এবং শান্তামরিন-এর কাজী ছিলেন। এরপর পূর্ব আন্দালুসে এসে দানিয়া ও বালানসিয়ায় অবস্থান করেন এবং ৯৫ বছর বয়সে ৪৬৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মুয়াত্তা মালিকের একটি অত্যন্ত ব্যাপক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন যা ২৪ খণ্ডে “আত-তামহীদ লিমা ফিল মুয়াত্তা মিনাল মাআনি ওয়াল আসানিদ” নামে পরিচিত। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা হলো “আল-ইসতিয়াব ফি মা’রিফাতিল আসহাব”, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনী সম্বলিত একটি মূল্যবান সংকলন। [২]

শিক্ষা দান ও রচনার পাশাপাশি তিনি জাতিকে ঐক্যের দাওয়াতও দিতেন। [৩]

আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরী রহ.:

এই ধারায় আল্লামা আলী বিন আহমদ, ইবনে হাজম জাহেরী রহ. (৩৮৪ হি. - ৪৫৬ হি.)-এর নামও বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। যদিও তিনি তাঁর গবেষণামূলক চিন্তাধারার কারণে বিভিন্ন ফিকহি মাসআলায় জমহুর আহলে সুন্নাতের সাথে একমত ছিলেন না এবং এ কারণেই তিনি শাফেয়ী মাযহাব ছেড়ে জাহেরী চিন্তাধারা গ্রহণ করেছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর খেদমতকে সারা বিশ্ব স্বীকার করে। তাঁর পিতা আহমদ বিন সাঈদ কর্ডোভা দরবারে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ইবনে হাজম নিজেও কিছুকাল উচ্চ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল কর্ডোভায় পুনরায় উমাইয়া খিলাফত পুনরুজ্জীবিত করা, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধীরা বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের অত্যাচার এতটাই বেড়ে যায় যে ইবনে হাজমকে কর্ডোভা ছেড়ে পূর্ব আন্দালুসের উপকূলীয় শহর আলমেরিয়ায় হিজরত করতে হয়। এখানে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন হন এবং ইসলামী কুতুবখানায় অমূল্য সংযোজন করেন।

তিনি উসূলে ফিকহে পূর্ববর্তী ফকিহদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে নিজের মূলনীতি পেশ করেন এবং এই বিষয়ে ৮ খণ্ডে “আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম” রচনা করেন। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হলো “আল-মুহাল্লা বিল আসার”, যা ১২ খণ্ডে সমাপ্ত। পাঁচ খণ্ডে “আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল” লিখেছেন যাতে ইহুদি, নাসারা, শিয়া, খারিজি, মুতাজিলা এবং মুরজিয়াদের মতো বাতিল ফেরকাগুলোর আকিদাহর সদলিল খণ্ডন করেছেন। তিনি ইতিহাস ও বংশবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন যার প্রমাণ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ “জামহারাতু আনসাবিল আরব” থেকে পাওয়া যায়। তাফসীর শাস্ত্রে “আন-নাসিখ ওয়াল মানসুখ”ও তাঁর অত্যন্ত বিখ্যাত কিতাব।

কলম ও কাগজের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি চারপাশের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। কর্ডোভার রাজনৈতিক সংকট এবং মুসলমানদের...

[১] গয়াতুন নিহায়াহ ফি তাবাকাতিল কুররা লি ইবনিল জাযারি: ১/৩১৩

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/১৫৩, ১৫৪, মাতবাআতুর রিসালাহ

[৩] আয-যালাফাহ বি-মা’রাকাতি মিন মাআরিকিল ইসলাম লিল আসরি জামিল আব্দুল্লাহ: পৃ. ১৭৯, তাবা আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া বিল মদিনাতিল মুনাওয়ারা

তাদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধের সময় তিনি “তওকুল হামামাহ” এর মতো একটি বই লিখেছিলেন যাতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে সেই গুণাবলী গ্রহণের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে যা গ্রহণ করে উম্মাহ প্রতিটি যুগে সেই নৈতিক অবক্ষয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে যা রাজনৈতিক পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি পরিস্থিতির উপযোগী আরও অনেক পুস্তিকা লিখেছিলেন।

গ্রানাডার ইহুদি উজির ইবনে নাগরিলা যখন কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে একটি বই লিখেছিলেন, তখন ইবনে হাজম তার দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছিলেন যা “আর-রিসালাতু ফির-রাদি আলা ইবনি নাগরিলা” নামে পরিচিত হয়েছিল। অধিকাংশ মুলুকুত তাওয়াইফ ইবনে হাজমের বিরোধী ছিল, তাই তিনি তাঁর জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে তাদের পক্ষ থেকে বারবার কষ্ট ভোগ করেছেন। সেভিলে (ইশবিলিয়া) তাঁর বইগুলো প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। ৭২ বছরের ব্যস্ত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করে তিনি ৪৫৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা চারশ বলা হয়। তাঁর কলমের ক্ষিপ্ততা দেখে বলা হতো: “ইবনে হাজমের জিহ্বা এবং হাজ্জাজের তলোয়ার যমজ বোন।” [১]

ইবনে হাজম এই যুগে জিহাদি কবিতা ও পদ্যও রচনা করেছিলেন এবং জাতিকে নাসারাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। [২] এই ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরও অনেক উলামা ও গুণীজন মিল্লাতের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে গ্রানাডার আবুল ইসহাক আল-বিরি রহ. (মৃ. ৪৬০ হি.), টলেডোর (তলাইতলা) ইবনে আসসাল রহ. (মৃ. ৪৮৭ হি.) এবং সেভিলের (ইশবিলিয়া) আবু হাফস হাওজানি রহ. (৪৬০ হি.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। [৩]

কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি রহ.-এর আন্দোলন:

তবে যে ব্যক্তিত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি ছিলেন কাজী আবুল ওয়ালিদ রহ. (মৃ. ৪৭৪ হি.), যিনি বাদাজোজ (বাতালইউস) শহরের “আল-বাজা” এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে “আল-বাজি” নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল সুলাইমান বিন খালাফ। তিনি ৪০৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য এশিয়ার সফরে বের হন। চার বছর হিজাজে অবস্থান করে হারমাইনের উচ্চ সনদধারী মুহাদিসগণের কাছ থেকে উপকৃত হন এবং এই সময়ে হজ পালন করেন। তিন বছর বাগদাদে আবু ইসহাক শিরাজি রহ.-এর মতো যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কাছে ছাত্রত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর মসুল, দামেস্ক এবং আলেপ্পোতে (হালাব) বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। ১৩ বছর পর ৪৩০ হিজরিতে যখন তাঁর বয়স ৩৭ বছর হয়েছিল, তখন তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং জ্ঞান ও গুণের পূর্ণতার কারণে আন্দালুসের বিভিন্ন শহরের কাজী নিযুক্ত হন। তিনি একজন গবেষক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা আলেম ছিলেন। তিনি সাত খণ্ডে মুয়াত্তা ইমাম মালিকের চমৎকার ব্যাখ্যাগ্রন্থ “আল-মুনতাকা” লিখেছিলেন যা আজ অবধি জ্ঞানীদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। সহীহ বুখারীর রিজাল (বর্ণনাকারী) শাস্ত্রের ওপর তাঁর গবেষণামূলক কাজ “আত-তাদিল ওয়াত-তাজরিহ” তিন খণ্ডে আরও একটি অতুলনীয় ইলমি শাহকার। [৪]

[১] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/২৫৩, ত. দারুল ইলম [২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮/৪০৬, ত. আর-রিসালাহ

[৩] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলি: পৃ. ৩৫২ থেকে ৩৫৪

[৪] আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ৩/১২৫, ত. দারুল ইলম; আত-তাদিল ওয়াত-তাজরিহ লিল-বাজি: ১/৬৩ থেকে ৭৭, মুকাদ্দিমাহ

তিনি মুলুকুত তাওয়াইফের গৃহযুদ্ধ এবং খ্রিস্টান শক্তির উত্থান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। তাই তিনি পুরো আন্দালুস সফর করতে শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন শহরে কয়েক মাস করে অবস্থান করে সেখানে কাজা, ইফতা এবং হাদিসের দরস প্রদানের খিদমত আঞ্জাম দিতেন এবং সেই সাথে উলামা, কবি, লেখক ও আমিরদের জাগ্রত করার চেষ্টাও চালিয়ে যেতেন। জনসাধারণের ওপর প্রভাবশালী শ্রেণিকে জাগ্রত করার পর তিনি সেনাপতি এবং মুলুকুত তাওয়াইফের শাসকদের খ্রিস্টধর্মের এই প্লাবনের বিরুদ্ধে ঐক্যের দাওয়াত দিতেন। আমির ও রাষ্ট্রপ্রধানরা অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর কথা শুনতেন, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের নেশা তাঁদের জাতীয় লক্ষ্য ভুলিয়ে দিত।

মুলুকুত তাওয়াইফের মধ্যে বাতালইউসের শাসক উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবহারিকভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রহণ করেন এবং কাজী আবুল ওয়ালিদ (রহ.)-কে বিশেষ উপদেষ্টা ও কাজী নিযুক্ত করে উম্মাহর ঐক্যের এই আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থন দিয়ে বারবার তাঁকে বিভিন্ন দরবারে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি সারাগোসা, ভ্যালেন্সিয়া, আলমেরিয়া, মুরসিয়া এবং দানিয়াসহ অধিকাংশ রাজ্যের আমিরদের কাছে এই বার্তা নিয়ে যেতেন যে, শত্রুর মোকাবিলায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। এর পাশাপাশি শেষ বছরগুলোতে তাঁর প্রস্তাব ছিল যে, এই ঐক্যে মরক্কোর শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হোক, কারণ আলফনসো ষষ্ঠ-এর প্রচণ্ড শক্তির সামনে মুলুকুত তাওয়াইফের সেনাবাহিনী অপরিপুষ্ট হবে।

কাজী আবুল ওয়ালিদের জীবনের শেষ বছরগুলোতে, যখন তোলেদোর ওপর আলফনসো ষষ্ঠ-এর অতর্কিত হামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন দেশের অধিকাংশ আমির ও জেনারেল তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন। এই অভিযানের সময়ই ৪৭৪ হিজরির রজব মাসে কাজী আবুল ওয়ালিদ (রহ.) আলমেরিয়াতে ইন্তেকাল করেন। [১]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৩৩৮ থেকে ৩৪৩; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস:

মুরাবিতুন

যে সময় অনৈক্য ও বিভেদে জর্জরিত আন্দালুসের সভ্য ও সুসংস্কৃত শাসকরা মার্বেল পাথরের প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে অসহায় অবস্থায় উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে খ্রিস্টানদের প্লাবন ধেয়ে আসতে দেখছিলেন, তখন ভূমধ্যসাগরের ওপারে আফ্রিকার উপকূলে ঈমানদাররা তাদের তলোয়ার শাণিত করে এক নতুন পৃথিবী গড়ার সংকল্প করছিলেন।

বারবার বংশের ‘লামতুনা’ গোত্রের এই লোকেরা মরক্কোর মরু অঞ্চলে বসবাস করত এবং বালুঝড় থেকে সুরক্ষার জন্য সাধারণত তারা মুখে রুমাল বেঁধে রাখত, তাই তাদের ‘মুলসামিন’ (নেকাবধারী) বলা হতো। ৪০০ হিজরিতে এই গোত্রের কিছু লোক জনৈক অজ্ঞাতনামা দাঁড়ির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই নওমুসলিমদের মধ্য থেকে ‘জওহর’ নামক এক ব্যক্তি হজের সফরে গেলে ফেরার পথে তিউনিসিয়ার কায়রোয়ান শহরে এক ফকিহর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। জওহর যখন তাকে জানালেন যে কালিমা ও নামাজ ছাড়া দ্বীনের আর কোনো জ্ঞান আমাদের নেই, তখন ফকিহ তার ছাত্র আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনকে শিক্ষক হিসেবে তার সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন যখন লামতুনা গোত্রের এলাকায় পৌঁছালেন, তখন তাকে চমৎকারভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো। আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিনের তাবলিগি ও শিক্ষামূলক প্রচেষ্টায় সেখানে ইসলামের উন্নতি হলো, মানুষ দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করল এবং দ্বীনের নিদর্শনসমূহ ছড়িয়ে পড়ল। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি শক্তিতে পরিণত করল এবং এই পুরো মরু অঞ্চল যেখানে এই নওমুসলিমরা বসবাস করত, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করল। এমন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন অনুভূত হলো যে, এই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার জন্য একজন সরকার প্রধান নির্বাচন করা হোক। আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন নিজে শিক্ষা ও তাবলিগের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। জওহরের মধ্যেও গোত্রগুলোকে সামলানোর মতো সেই যোগ্যতা ছিল না, তাই লামতুনা গোত্রের সরদার আবু বকর বিন উমরকে এই দায়িত্ব অর্পণ করা হলো এবং তাকে ‘আমিরুল মুসলিমিন’ উপাধি দেওয়া হলো।

এই সময়ে কেবল মরক্কো ও আলজেরিয়ার অমুসলিম গোত্রগুলোই এই নতুন ইসলামি শক্তির আধিপত্যে বিপদ অনুভব করতে শুরু করেনি, বরং অনেক মুসলিম বারবার গোত্রও তাদের রাজনৈতিক শক্তিকে এই নতুন আন্দোলনের সাথে একীভূত করতে রাজি ছিল না। ফলে তারা সবাই আমির আবু বকর বিন উমরের বিরুদ্ধে জোট গঠন করল। এমন পরিস্থিতিতে ‘মুলসামিন’দের আধ্যাত্মিক নেতা আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন আবু বকর বিন উমরকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দিলেন এবং নিজের জামাতকে ‘মুরাবিতুন’ নাম দিলেন। আবু বকর বিন উমর অমুসলিম গোত্র এবং তাদের মিত্র বারবারদের সাথে বেশ কিছু যুদ্ধ করলেন এবং এক বিশাল এলাকা পদানত করলেন। তবে গোত্রগুলো এত সহজে নিয়ন্ত্রণে আসার মতো...

না। তারা “সুস”-এ বিদ্রোহ করেছিল যা দমন করার চেষ্টা করতে গিয়ে জামাদিউল আউয়াল ৪৫১ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন ইয়াসিন নিহত হন। [১]

তবে আবু বকর বিন উমর পাল্টা আক্রমণ করে সুসের বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার রাজ্য দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে বিস্তৃত হতে থাকে। তার শক্তিতে অভিভূত হয়ে অসংখ্য গোত্র তার সাথে যোগ দিয়েছিল, যাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব ধরনের লোক ছিল। ফলে এই লড়াই এবং গেরিলা আক্রমণগুলোতে তার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কিছু অসতর্ক কর্মকাণ্ডও ঘটেছিল যার জন্য আবু বকর বিন উমর অনুতপ্ত হয়েছিলেন। যখন এক বৃদ্ধা এসে অভিযোগ করলেন যে তার সৈন্যদের লুটপাটে তার উট হারিয়ে গেছে, তখন আবু বকর বিন উমর খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি তার নবগঠিত রাজ্যের জন্য একজন শ্রেষ্ঠ প্রশাসকের সন্ধান শুরু করলেন। [২]

ইউসুফ বিন তাশফিন

এই টানাপোড়েনের সময় আফ্রিকার দিগন্তে এমন এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যার মধ্যে নেতৃত্বের অসাধারণ যোগ্যতা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন “ইউসুফ বিন তাশফিন”। গমের মতো গায়ের রঙ, মাঝারি গড়ন, কোঁকড়ানো চুল, সুরমা মাখা চোখ, উঁচু নাক, পাতলা শরীর, হালকা দাড়ি এবং ধীরস্থির কথাবার্তার এই ব্যক্তিত্ব ছিলেন বীরত্ব ও সাহসিকতা, হিম্মত ও পুরুষত্ব এবং রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূর্ত প্রতীক। তিনি ছিলেন আবু বকর বিন উমরের ভাতিজা। কোমলতা, ধৈর্য ও উদারতা, সরলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি দূরদর্শিতা ও প্রশাসনিক দক্ষতাও ছিল তার বিশেষ গুণাবলি। ৪৫৩ হিজরিতে সিজিলমাসা বিজয়ের পর আবু বকর বিন উমর তাকে কেবল সেখানকার আমিরই বানাননি, বরং মুরাবিতুন সাম্রাজ্যের উত্তর অংশও তার হাতে সোপর্দ করে দেন। সে সময় তার বয়স ছিল প্রায় ৪৩ বছর। [৩]

ইউসুফ বিন তাশফিনের ইমারত:

৪৬২ হিজরিতে আবু বকর বিন উমরের ইন্তেকালের পর মুরাবিতুনরা ইউসুফ বিন তাশফিনকে তাদের আমির হিসেবে নির্বাচিত করে। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর মুরাবিতুন রাষ্ট্রকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত করেন। তার সাথে বিপুল সংখ্যক উলামা ও ফুকাহা ছিলেন যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলিকে শরয়ী সীমানার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। মুরাবিতুনদের পেশাদার সৈন্য ছিল চল্লিশ হাজার, যারা সীর বিন আবু বকরের মতো সেনাপতির নেতৃত্ব লাভ করেছিল। এই যুবক ছিলেন আমির ইউসুফের চাচাতো ভাই এবং ডান হাত। এমন যোগ্য জেনারেলদের সাহায্যে ইউসুফ বিন তাশফিন লমতুনাহ ছাড়াও সানহাজাহ, কাতামাহ, মাসমুদাহ এবং যানাতাহসহ ডজন ডজন

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৩২৮ থেকে ৩২৯, ত ত্বর-রিসালাহ

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৩৩০, ত ত্বর-রিসালাহ

[৩] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৮ / ৩৩০, ৩২৯ / ১৯ / ২৫৩, ত ত্বর-রিসালাহ; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২ / ৩১৩

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (খন্ড: ২)

বার্বার উপজাতিদের বশীভূত করে নিল। উত্তর আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলটি অসভ্য উপজাতিদের আবাসস্থল ছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত ছিল। উত্তর আফ্রিকার এই উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল যেখানে উপজাতীয় ডাকাতদের রাজত্ব ছিল। এই অঞ্চলটিকে স্থানীয় ভাষায় “মাররাকুশ” বলা হতো যার অর্থ হলো “দ্রুত চলে যাও”। ইউসুফ বিন তাশফিন এই অঞ্চলটি জয় করার পর ৪৬৫ হিজরিতে এখানে “মাররাকুশ” শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন, যার নামে পরবর্তীতে পুরো দেশটিও মাররাকুশ নামে পরিচিত হতে থাকে।

৪৬৬ হিজরিতে ফকিহদের পরামর্শে ইউসুফ বিন তাশফিন তার সরকারকে আব্বাসীয় খিলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্তর্ভুক্ত করেন। খলিফা মুসতাহযির বিল্লাহ মুরাবিতিন আমিরের জন্য খেলাত এবং ফরমান প্রেরণ করেন। মুরাবিতিনদের রাজ্যে খলিফার নামে মুদ্রা জারি করা হয়। এরপর মুরাবিতিনদের বাহিনী উত্তর আফ্রিকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বরাবর বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এক দশকের মধ্যে মুরাবিতিনরা ফাস, তানজাহ, তিলিমসান এবং ওরানের মতো বিখ্যাত ঐতিহাসিক শহরগুলো জয় করে ফেলে। তাদের রাজ্য পূর্বে তিউনিস এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অন্যদিকে উত্তরে এটি ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে সুদানের সীমান্ত স্পর্শ করছিল।

এত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও ইউসুফ বিন তাশফিনের জীবন ছিল সরলতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার দস্তুরখানে যবের রুটি, উটের গোশত এবং দুধ ছাড়া আর কিছুই থাকতো না। তখনও তিনি যাযাবরদের মতো পশমের মোটা পোশাক পরিধান করতেন। তার এবং একজন মরুচারী উটচালকের জীবনযাত্রায় কোনো পার্থক্য ছিল না। তিনি তার প্রজাদের ওপর কোনো কর আরোপ করেননি। যাকাত, উশর এবং জিম্মিদের জিজিয়া ছাড়া সরকার আর কিছুই গ্রহণ করতো না। [১]

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মুরাবিতিন ভীতি এবং পারস্পরিক পত্রালাপ:

আন্দালুস এবং মুরাবিতিনদের রাজ্যের মাঝখানে ভূমধ্যসাগরের সংকীর্ণ প্রণালী বাধা হয়ে ছিল। তাই এখানকার মানুষ শুরু থেকেই মুরাবিতিনদের বিজয় সম্পর্কে অবগত ছিল। মুলুকুত তাওয়ায়েফরা যেভাবে আলফনসো ষষ্ঠকে ভয় পেত, তেমনি তারা মুরাবিতিনদের পক্ষ থেকেও বিপদ অনুভব করছিল। মুতামিদের পিতা মুতাদিদ এজন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করেছিলেন যাতে মুরাবিতিনরা আক্রমণ করলে তিনি তার রাজ্য রক্ষা করতে পারেন।

ইউসুফ বিন তাশফিনের সিংহাসন আরোহণের পর মুলুকুত তাওয়ায়েফরা নিজেদের ওপর চাপ অনুভব করতে শুরু করে। তাই তারা পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে একটি পত্র তৈরি করে যাতে মুরাবিতিনদের প্রতি তাদের আনুগত্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এতে অনুরোধ করা হয়েছিল যে, তারা যেন মুলুকুত তাওয়ায়েফদের স্বাধীনতা হরণ করার কথা চিন্তা না করেন। তাদের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল মাররাকুশ গিয়ে মূল্যবান উপহারসহ ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে এই পত্র পেশ করে:

“যদি আপনি আমাদের আমাদের অবস্থায় ছেড়ে দেন তবে তা হবে আপনার মহানুভবতা, আমাদের দুর্বলতা নয়। আপনি এমন এক অবস্থানে আছেন যে কারো পক্ষেই আপনার মহানুভবতার সাথে পাল্লা দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি মুলুকুত তাওয়ায়েফদের বহাল রাখেন তবে তা আপনারই...”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৩১২।

“সরকারের ধারাবাহিকতা এবং প্রতিষ্ঠা হিসেবে গণ্য হবে।”

ইউসুফ বিন তাশফিন শুরার সাথে পরামর্শ করে মুলুকুত তাওয়ায়েফ-এর সীমানায় হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করেন এবং ফিরতি পত্রে লিখেন:

“আপনারা আপনাদের আনুগত্যের মাধ্যমে আমাদের আনুগত্য বজায় রাখুন। আপনাদের ভ্রাতৃত্বের বিনিময়ে আমাদের পক্ষ থেকেও ভ্রাতৃত্বের পয়গাম গ্রহণ করুন।” [১]

এই পত্র ও বার্তার পর ইউসুফ বিন তাশফিন তার পূর্ণ মনোযোগ আফ্রিকার বিজয়ের দিকে নিবদ্ধ করেন এবং বেশ কয়েক বছর আন্দালুসে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনেক বদলে যায় এবং ষষ্ঠ আলফনসোর আক্রমণ গ্রানাডা, সেভিল ও কর্ডোভার রাজপ্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করে।

কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পত্রবিনিময়:

এমন পরিস্থিতিতে কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার শেষ জীবনে উলামায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ইউসুফকে আন্দালুসে আসার আমন্ত্রণ জানান। ৪৭৪ হিজরিতে যখন কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ইন্তেকাল হয়, তখন আরেকটি দল উপস্থিত হয়ে একই অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করে। এবার ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের মুসলমানদের সাহায্য করার ওয়াদা করেন।

[২]

তবে এর আগে আফ্রিকায় বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে পুরোপুরি দমন করা এবং আন্দালুসে পৌঁছানোর জন্য একটি উত্তম বন্দর দখল করা জরুরি ছিল। ইউসুফ বিন তাশফিন টানা তিন বছর এই অভিযানে ব্যয় করেন এবং আফ্রিকান গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেন। এরপর ৪৭৭ হিজরিতে সেউতা বন্দর বিজয়ের পর একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করতে শুরু করেন যাতে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া যায়।

মুরাবিতুনদের সেউতা দখলের কয়েক দিন পরই ষষ্ঠ আলফনসো টলেডো দখল করে নেয়, যার পর আন্দালুসের উলামায়ে কেরাম দলে দলে সেউতায় আসতে শুরু করেন। আন্দালুসের মুসলমানদের করুণ দশা এবং চোখের পানি দেখে আমীরুল মুরাবিতুন তাদের আর্তনাদ শুনে ব্যথিত হন, যা তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। [৩]

আন্দালুসের মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন:

উলামায়ে কেরামের এই আন্দোলন একটি জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়েছিল এবং আন্দালুসের মুসলমানরা একযোগে মুলুকুত তাওয়ায়েফ-এর কাছে দাবি জানাচ্ছিল যে, তারা যেন তাদের রাজপ্রাসাদগুলো সেই বীর মুজাহিদদের জন্য খালি করে দেয় যারা তাদের ইজ্জত ও আত্ম রক্ষা করতে পারে। কবিরাত্ত এই আন্দোলনে शामिल ছিলেন এবং তারা তাদের কবিতার মাধ্যমে মুলুকুত তাওয়ায়েফ-এর আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত হানছিলেন। জনৈক কবির এই পঙক্তিগুলো প্রতিটি শিশুর মুখে মুখে ছিল:

[১] ওফায়াতুল আইয়ান: ৭/ ১১৩, ১১৫, ত. দার সাদির

[২] আয-যাল্লাকাহ আয-যাল্লাকাহ মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃ. ১৮২

[৩] নাফহত তীব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রতীব লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/ ৩৫৩

তোমরা শাসনভার পেয়েছিলে কিন্তু শাসক হিসেবে তোমরা ভালো কিছু করেনি। তোমরা তোমাদের নিজেদের রক্ষকদের হাত থেকে নিজেদের সম্মানটুকুও বাঁচাতে পারেনি।

তোমরা তো এমন আকাশ ছিলে যার নাগাল কেউ পেত না। কিন্তু এখন তোমরা তাদের পদতলে আছ যারা তোমাদের কাছে এটাও জিজ্ঞেস করে না যে তোমরা কোন জমিনের।

কালচক্র তোমাদের দেওয়া ঋণ ফেরত চাইবে। মনে রেখো! সে ধার ও ঋণ অবশ্যই ফেরত নেয়। [১]

ইবনুল ফারাজ আল-বিয়রি বলছিলেন:

“শাসকদের ডেকে বলে দাও... তোমরা এ কী কাণ্ড ঘটালে!”

“ইসলামকে শত্রুদের বন্দিশালায় সাঁপে দিয়ে তোমরা বসে রইলে।”

“তোমাদের ওপর জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া ওয়াজিব ছিল, অথচ তোমরা নাসারাদের সাথে দাঁড়িয়ে গেলে।”

“শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ায় অবাক হয়ে না। কারণ তোমরা নিজেরাই নবীর উম্মতকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছ।” [২]

আলফনসো ষষ্ঠকে উমর আল-মুতাওয়াক্কিলের জবাব:

এমন পরিস্থিতিতে মুতামিদসহ অনেক মুলুকুত তাওয়ায়েফ বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন তাদের নিজেদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সাহস প্রদর্শন করতে হবে, অন্যথায় জমিনের কোনো কোণ তাদের আশ্রয় দেবে না। মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে তখন কেবল বাতলিয়ুসের শাসক উমর আল-মুতাওয়াক্কিল এবং ইশবিলিয়ার মুতামিদের মধ্যেই কিছুটা তেজ অবশিষ্ট ছিল, নতুবা বাকি ছোট ছোট রাজ্যগুলোর কোনো গুরুত্বই ছিল না। আলফনসো ষষ্ঠও এই দুজনকে নিয়েই শঙ্কিত ছিলেন। তিনি প্রথমে উমর আল-মুতাওয়াক্কিলকে একটি হুমকিমূলক পত্র পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকারের নির্দেশ দেন, কিন্তু মুতাওয়াক্কিল জবাবে লিখলেন:

“আপনার পত্রটি হস্তগত হয়েছে, যাতে তাকদির এবং আল্লাহ আজিজ ও কাদির-এর ফয়সালার ওপর বিজয়ী হওয়ার দাবি ছিল এবং যা ছিল গর্জন ও হুঙ্কারে পূর্ণ। আপনি আপনার বিশাল বাহিনী নিয়ে গর্বিত। আফসোস! যদি আপনি জানতেন যে আল্লাহর এমন লশকর এখনও বিদ্যমান রয়েছে”

[১] তারিখুল আদাব আল-আন্দালুসি আসরুত তাওয়ায়েফ: ১/১২২; নাফহত তিব: ৫/৪২৭, ৪২৮।

[২] আয-যাখিরা ফি মাহাসিন আহলিল জাজিরা, লেখক: আলি বিন বাসসাম আশ-শান্তরিনি: ৪/৮৮৫, তাবা আদ-দারুল আরাবিয়্যাহ লিল কিতাব লিবিয়া।

যার মাধ্যমে তিনি ইসলামকে সম্মান দান করবেন এবং আমাদের নবী (সা.)-এর দ্বীনকে সমুন্নত করবেন। এরা সেই সৈন্য যারা আল্লাহর পথে জিহাদকারী, যাদের কারো ভয় নেই। আর আপনার মুসলমানদের তাদের দুর্বলতার খোঁটা দেওয়া, তা তাদের গুনাহের অশুভ পরিণতি। কিন্তু যদি ইসলামি দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তবে আপনি দেখবেন যে আমরা আপনাকে সেই স্বাদ আস্বাদন করাবো যার ঢোক আপনার পূর্বপুরুষদের গিলতে হয়েছিল।

আমাদের রাষ্ট্রের ব্যাপারে কথা হলো, আমরা সংখ্যায় কম হই এবং বাহ্যিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হই না কেন, তবুও আমাদের ও আপনার মাঝে এমন কোনো সমুদ্র বা পাহাড় প্রতিবন্ধক নেই যা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আমাদের কাছে সেই তলোয়ারগুলো রয়েছে যার ধারালো ফলার সাক্ষ্য আপনার জাতির অনেক কাটা গর্দান দেবে। আমরা দুটি সফলতার যেকোনো একটির অপেক্ষায় আছি। যদি বিজয় অর্জিত হয় তবে এর চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে। আর যদি আমরা শহীদ হই তবে জান্নাতের চেয়ে বড় আর কী হতে পারে। [১]

আলফনসোর ধৃষ্টতা এবং মুতামিদের ঈমানদীপ্ত জবাব:

আলফনসোর দ্বিতীয় চিঠিটি ছিল মুতামিদের নামে যাতে লেখা ছিল:

“দুই মিল্লাতের সম্রাট, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের সাহায্যকারীর পক্ষ থেকে মুতামিদের নামে! আল্লাহ তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক রাখুন এবং তোমাকে বাস্তবতা দেখিয়ে দিন। তুমি তলেদোর ওপর আক্রমণকারী বাহিনী দেখে নিয়েছ। তুমি নিজেই তোমার ভাইদের অসহায় অবস্থায় রেখেছ। এখন যে সজাগ আছে, সে যেন ফাঁদে পড়ার আগেই সতর্ক হয়ে যায়।”

মুতামিদ কিছু একটা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, তিনি জবাবে একটি অত্যন্ত দীর্ঘ, প্রাঞ্জল ও ছন্দময় পত্র লিখলেন যাতে তার এই আশ্বালনের ওপর ছাই ঢেলে দিয়ে বলা হয়েছিল:

“দুই মিল্লাতের নেতৃত্বের তোমার দাবি সঠিক নয়, মুসলমানরাই এর অধিক যোগ্য যারা এই দেশের কেন্দ্রীয় শহরগুলোর মালিক ছিল। যদি তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন থেকে থাকে তবে তোমার আওয়াজ তাদের জাগ্রত করে দিয়েছে। কখনো কখনো অপ্রীতিকর বিষয় পছন্দনীয় বিষয়ের পূর্বাভাস হয়ে দাঁড়ায়। তোমার বাপ-দাদাদের আমাদের বাপ-দাদাদের সামনে যে দশা হয়েছিল তা কেন ভুলে গেলে? আমরা তোমার সাথে চুক্তির কারণে আমাদের ভাইদের সাহায্য করিনি। এখন আমরা ইসলামবিদ্বেষীদের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষায় অবহেলার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাচ্ছি।” [২]

মুতামিদের সিদ্ধান্ত:

মুতামিদ এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে কেউই আলফনসো ষষ্ঠের মোকাবিলার ক্ষমতা রাখে না, তাই এই মুহূর্তে মরক্কোর আমিরের কাছে সাহায্য চাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, অন্যথায় খ্রিস্টবাদের তুফান পুরো আন্দালুসকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এটি সেই প্রস্তাব ছিল যা কাজী আবুল ওয়ালিদ কয়েক বছর আগেই জায়গায় জায়গায় পেশ করেছিলেন এবং আন্দালুসের প্রত্যেক মুসলমান এর পক্ষে ছিল। মুলুকুত তাওয়ায়েফরা এই পদক্ষেপের সাহস এই জন্য করত না যে, পাছে ইউসুফ বিন তাশফিন আলফনসো ষষ্ঠকে পরাজিত করার পর...

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, ড. আবদুর রহমান আলী, পৃষ্ঠা: ৩৩৭, ৩৩৮।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২/ ৭৭, ৭৮।

৫৪৭ তারিখ-এ উম্মত-এ মুসলিমা

এর পর তাদের রাজ্যগুলো দখল না করে নেয়, কিন্তু মুতামিদ এই ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তার ছেলেরা এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। তার আদরের শাহজাদা রশিদ বলল: “আব্বাজান! আপনি এমন এক ব্যক্তিকে নিজের দেশে হস্তক্ষেপের সুযোগ দিচ্ছেন যে আমাদের থেকে আমাদের শাসন ছিনিয়ে নেবে এবং আমাদের হিন্মভিন্ন করে দেবে।”

মুতামিদ বললেন: “বেটা! আমি চাই না যে ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এই কথা বলাবলি হোক যে, মুতামিদ আন্দালুসকে কুফরি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে, একে নাসারাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমি চাই না যে পৃথিবী আমাকে অভিশাপ দিক। আল্লাহর কসম! আমার কাছে শূকর চরানোর চেয়ে উট চরানো অনেক বেশি পছন্দনীয়।”

মুতামিদ ছাড়াও বাতালইউস-এর উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল এবং দানিয়া-এর সাহসী শাসক মুতাসিমও ইউসুফ বিন তাশফিনকে ডাকার পক্ষে ছিলেন। গ্রানাডার তরুণ বারবারি শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলকিনও (যিনি ৪৬৫ হিজরিতে তার দাদা বাদিস বিন হাব্বুস-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন) এ ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছিলেন না। [১]

ঐকমত্যের জন্য মুতামিদের ভাষণ:

যদিও এমন আমিরের সংখ্যাও কম ছিল না যারা আন্দালুসে মুরাবিতুনদের আগমনের বিরোধী ছিলেন, তাদের মধ্যে মালাকার শাসক ইবনে সুকুত ছিলেন অগ্রগণ্য। জাতীয় ঐকমত্য অর্জনের জন্য কর্তোভায় মুতামিদের সভাপতিত্বে আন্দালুসের রাজনীতিবিদ ও উলামাদের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠরা ইউসুফ বিন তাশফিনকে ডাকার পক্ষে ছিলেন, তাই পরামর্শ ও সংশোধনের পর ইউসুফ বিন তাশফিনকে আন্দালুসে ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। যে সকল আমির এখনো দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাদের আশ্বস্ত করার জন্য মুতামিদ নিজে একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন:

“এই মুহূর্তে একটি বিষয় সন্দেহজনক এবং একটি বিষয় নিশ্চিত। সন্দেহজনক বিষয়টি হলো, আমরা যদি আলফনসো বা আমির ইউসুফ—এই দুইজনের মধ্যে কারো একজনের সমর্থন লাভ করি, তবে আমাদের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে কি না। হতে পারে আলফনসো বা আমির ইউসুফ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন, আবার এও সম্ভব যে তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। তবে হ্যাঁ, একটি বিষয় নিশ্চিত, তা হলো—যদি আমরা আমির ইউসুফের সমর্থন লাভ করি তবে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকবেন। আর যদি আলফনসোর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করি তবে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিশ্চিত পথ কেন ত্যাগ করব? কেন সন্দেহজনক পথ অবলম্বন করব?” [২]

এই আলোচনা সকল বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দিল।

আমির ইউসুফের নামে আন্দালুসের শাসকদের পত্র:

এখন একটি পত্র লেখা হলো যাতে আমির-উল-মুরাবিতুনকে অনুরোধ করা হলো যে, তিনি যেন আন্দালুসের মুসলমানদের নাসারাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আলফনসো ষষ্ঠ-এর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। সেভিলের উজির ইবনে যাইদুনকে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলের প্রধান করা হলো।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২/৪৭৭ থেকে ৪৭৯

[২] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৩৫৯

তার সাথে কর্ডোভা, গ্রানাডা এবং বাদাজোজ-এর কাজীগণও ছিলেন। [১]

এই প্রতিনিধি দল সেউতা-তে গিয়ে ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে সাক্ষাৎ করলে এই মুজাহিদ ব্যক্তি পত্রটি পড়ে বললেন:

“আমি ইসলাম ধর্মের সাহায্যের জন্য সবার আগে লাববাইক বলছি। এই কাজ আমি নিজেই সম্পন্ন করব।” [২]

ইউসুফ বিন তাশফিনের দাবির প্রেক্ষিতে মুতামিদ মুরাবিতুনদের জন্য আলজাজিরা আল-খাদরা খালি করে দিলেন যাতে এটি যাতায়াতের জন্য একটি সেতু ও সেনানিবাস হিসেবে কাজ করতে পারে। [৩]

ইউসুফ বিন তাশফিনের আন্দালুসে আগমন ও অভ্যর্থনা:

ইউসুফ বিন তাশফিন ১৫ রবিউল আউয়াল ৪৭৯ হিজরিতে একশটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌবহরের মাধ্যমে আলজাজিরা আল-খাদরার দিকে যাত্রা করেন। সে সময় তাঁর বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি ছিল কিন্তু তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি ছিল যুবকদের মতো।

নৌবহরটি যখন উপসাগরের মাঝখানে ছিল, তখন হঠাৎ ঝড় শুরু হয় এবং ভয়াবহ ঢেউগুলো নৌকাগুলোকে বলের মতো ছুড়ে মারতে থাকে। ইউসুফ বিন তাশফিন হাত তুলে দোয়া করলেন:

“হে আল্লাহ! যদি এই সফর মুসলমানদের কল্যাণের জন্য হয় তবে আমাদের জন্য সমুদ্র পার হওয়া সহজ করে দিন। আর যদি তা না হয়, তবে আমাকে সমুদ্র পার হতে দেবেন না।”

তৎক্ষণাৎ ঢেউগুলো থেমে গেল এবং সমুদ্র শান্ত হয়ে গেল। আলজাজিরা আল-খাদরায় অবতরণকারী প্রথম নৌকাটি ছিল আমির দাউদ বিন আয়েশার এবং শেষটি ছিল আমির ইউসুফের। আমির ইউসুফ এই ভূমিতে পা রাখামাত্রই শোকরানার সিজদা আদায় করলেন।

এখানে মুতামিদের পুত্রসহ নামী-দামী আমির ও উলামায়ে কেরাম অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। আলজাজিরা আল-খাদরা মুরাবিতুনদের ক্যাম্পে পরিণত হলো। কেবলটি আমিরের জন্য খালি করে দেওয়া হলো। [৪]

এরপর মুতামিদ তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর সাথে মূল্যবান উপটোকন নিয়ে মুরাবিতুনদের সেনানিবাসে পৌঁছালেন এবং ইউসুফ বিন তাশফিনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। উভয়ে উষ্ণতার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং জিহাদের প্রস্তুতির জন্য পরামর্শ করতে লাগলেন।

[৫]

আলফনসো ষষ্ঠ-এর পত্র এবং ইউসুফ বিন তাশফিনের উত্তর:

এর আগে আলফনসো টলেডোর ধন-সম্পদ লুণ্ঠন শেষ করেছিল এবং এখন উত্তর আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্র সারাগোসা অবরোধ করে রেখেছিল, যেখানকার শাসক ইউসুফ মুতামান ইন্তেকাল করেছিলেন এবং তাঁর পুত্র মুস্তাইন সবেমাত্র সিংহাসনে বসেছিলেন। আলফনসো ষষ্ঠ-এর প্রস্তাব ছিল যে, সে মুসলমানদের ওপর শরয়ী বিধান অনুযায়ী শাসন করবে এবং তাদের সব ধরনের স্বাধীনতা প্রদান...

[১] আয-যাল্লাফাহ মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম, মিসরীয় জামিল আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ: পৃ. ১৮৩

[২] আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি: পৃ. ১৩২

[৩] আয-যাল্লাফাহ মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃ. ১৮৪

[৪] আয-যাল্লাফাহ মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃ. ১৮৪-১৮৫

[৫] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/ ৪৬২

করবে এবং শরয়ী ট্যাক্স ছাড়া তাদের থেকে কিছুই নেবে না। এদিকে মুস্তায়িন-এর পুরো চেষ্টা ছিল যে কোনোভাবে আলফনসো ষষ্ঠকে ফিরে যেতে রাজি করানো। সে আলফনসো ষষ্ঠকে বিপুল পরিমাণ করে প্রস্তাব দিল কিন্তু আলফনসো ষষ্ঠ তা মানল না। তার বক্তব্য ছিল যে, সে কসম খেয়ে এসেছে যে সে সারগোসা দখল করেই দম নেবে, অন্যথায় মারা যাবে।

সারগোসা অবরোধের কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন সারগোসার মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত ছিল যে হঠাৎ ৪৭৯ হিজরির শুরুর দিকে আমীরুল মুরাবিতীনের আন্দালুসে প্রবেশের খবর ছড়িয়ে পড়ল। আলফনসো এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই এমন ভাব দেখাল যেন সে মুরাবিতীনদের আগমন সম্পর্কে কিছুই জানে না, সে মুস্তায়িনকে বার্তা পাঠাল যে সে কর নিয়ে ফিরে যেতে প্রস্তুত।

মুস্তায়িনও মুরাবিতীনদের আগমনের খবর পেয়ে গিয়েছিল। সে উত্তর দিল: “এখন তুমি একটি দিরহামও পাবে না।” আলফনসো ষষ্ঠের কাছে এখন আর অবস্থান করার মতো সময় ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে গেল এবং দ্রুত নিজের সেনাবাহিনী একত্রিত করতে বেরিয়ে পড়ল। [১]

নিজে দেখে নেবে:

তারপর সে একজন ক্রীত মুসলিম সাহিত্যিককে দিয়ে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়ে আমীরের কাছে পাঠাল যাতে নিজের শক্তি-সামর্থ্য এবং শান-শওকতের দস্তোক্তি করা হয়েছিল এবং অশুভ পরিণতির ভয় দেখানো হয়েছিল। ইউসুফ বিন তাশফিন এই চিঠি দেখে মুতামিদের কাতিব ইবনে কাসীরাহকে উত্তর লেখার নির্দেশ দিলেন। সে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে ফেলল যাতে অলঙ্কার ও বাগ্মিতার নদী প্রবাহিত করা হয়েছিল এবং আলফনসো ষষ্ঠের প্রতিটি দস্তোক্তির জবাব দেওয়া হয়েছিল।

ইউসুফ বিন তাশফিন এই উত্তরপত্রের ওপর নজর বুলালেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন: “এটি অনেক দীর্ঘ উত্তর।” তারপর তিনি আলফনসোর পত্রটি আনালেন এবং তার উল্টো পিঠে লিখিয়ে দিলেন: “যা হবে, তা তুমি খুব শীঘ্রই নিজে দেখে নেবে।”

আলফনসো ষষ্ঠ এই উত্তর পড়ে কেঁপে উঠল এবং তার উপলব্ধি হলো যে এখন তার মোকাবিলা স্বপ্নে বিভোর কোনো কবির সাথে নয়, বরং একজন বাস্তববাদী মানুষের সাথে। [২]

আলফনসো ষষ্ঠের স্বপ্ন:

এই দিনগুলোতে আলফনসো ষষ্ঠ স্বপ্নে দেখল যে সে একটি হাতির ওপর সওয়ার হয়ে আছে, যার সামনে একটি দামামা বাঁধা আছে। হাতিটি চলার সময় নিজের শুঁড় দিয়ে সেই দামামায় আঘাত করছে, যা থেকে অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। সে পাদ্রিদের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল কিন্তু তারা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। অবশেষে আলফনসো ষষ্ঠ একজন ইহুদিকে ব্যাখ্যা জানার জন্য টলেডোর একজন মুসলিম আলেমের কাছে পাঠাল। সাথে এই তাগিদও দিল যে মুসলিম আলেমের কাছে যেন এটি প্রকাশ না করা হয় যে এটি কার স্বপ্ন।

ইহুদি আলেমের কাছে গিয়ে স্বপ্নটি এমনভাবে শোনাল যেন সে নিজেই তা দেখেছে। আলেম উত্তর দিলেন:

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২৮৭/২-২৮৮

[২] নাফহত তীব: ৩৬১/৪

“এটি এমন এক ব্যক্তির স্বপ্ন যে আসহাবে ফীলের মতো ধ্বংস হবে।” [১]

আলফনসো ষষ্ঠ সাময়িকভাবে বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর আত্মানে কেবল গ্যালিসিয়া, ভাসকোনিয়া, আস্তুরিয়াস, কাস্টিল, আরাগন, লিওন এবং পামপ্লোনার সেনাবাহিনী এক জায়গায় সমবেত হলো তা-ই নয়, বরং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি এবং ইতালি থেকেও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক তাঁর বাহিনীর অংশ হতে চলে এল, তখন তাঁর সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত দম্ভ ও অহংকারের সাথে বললেন:

“এই বাহিনী নিয়ে আমি কেবল মানুষের সাথেই নয়, বরং জিন ও ফেরেশতাদের সাথেও লড়াই করতে পারি। এই বাহিনী নিয়ে আমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর খোদার সাথেও টক্কর দিতে পারি।” (নাউয়ুবিল্লাহ) [২]

মুরাবিতুনদের অগ্রযাত্রা:

ইউসুফ বিন তাশফিন প্রথমে পূর্ব আন্দালুসের দিকে অগ্রসর হলেন, কারণ এই চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল যা দূর করা জরুরি ছিল। মুতামিদ আলমেরিয়ার ওপর নিজের অধিকার দাবি করতেন, কিন্তু তখন সেখানে ইবনে রাশিক নামক এক প্রধানের দখল ছিল। ইউসুফ বিন তাশফিন ইবনে রাশিক ও মুতামিদের মধ্যে মীমাংসা করিয়ে দিলেন, যার ফলে আলমেরিয়া মুতামিদকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো এবং ইবনে রাশিককে সেভিলের উপকণ্ঠে একটি জায়গির দেওয়া হলো। এই সময়ে থানাডায় আবদুল্লাহ বিন বুলুগগিন এবং আলমেরিয়ায় মুতাসিম বিন সুমাদিহের সাথেও সাক্ষাৎ হলো, সবাই আমিরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন কয়েক দিন পর আলফনসো ষষ্ঠের মোকাবিলা করার জন্য সেভিলের উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। সেভিলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুতামিদ পরামর্শ দিলেন যে, রাজপ্রাসাদে কয়েক দিন অবস্থান করে সতেজ হয়ে নেওয়া হোক, কিন্তু আমির ইউসুফ বললেন, “আমি জিহাদের নিয়তে এসেছি। শত্রু যেখানে থাকবে, আমি সেখানেই যাব।” [৩]

যাল্লাকার যুদ্ধ:

এই বাহিনী বাদাখোস পৌঁছাল যেখানে উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং বাহিনীকে সম্ভাব্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলেন। মুসলিমদের পেশাদার বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় বিশ হাজার। এছাড়া আন্দালুসের কোণায় কোণায় থেকে আসা আরও কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবকও এতে शामिल ছিলেন। আমির ইউসুফ স্থানীয় আমিরদের পরামর্শে বাদাখোস থেকে ৮ মাইল উত্তর-পূর্বে তাজা নদীর কাছে একটি ময়দান নির্বাচন করলেন, যাকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ “আয-যাল্লাকা” এবং ইউরোপীয়রা “সাকরাজাস” বলে থাকে। [৪]

অন্যদিকে আলফনসো ষষ্ঠ ব্যাপক প্রস্তুতির সাথে ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে যাল্লাকার দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাজা নদীর ওপারে তাবু গাড়লেন। ইউসুফ বিন তাশফিন তাঁর আগমনের খবর পেয়ে তাঁকে এই বার্তা পাঠালেন:

“আলফনসো! আমরা জানতে পেরেছি যে তুমি আমাদের সাথে সংঘর্ষের জন্য দোয়া করতে, তোমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে তুমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাদের...”

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ, সন ৪৭৯ হিজরি।

[২] আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাকুশি, পৃষ্ঠা ১২২।

[৩] আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, পৃষ্ঠা ১২২।

[৪] বর্তমানে এই জায়গাটি পর্তুগালে অবস্থিত।

পর্যন্ত পৌঁছেছে। দেখ, আমরা নিজেরাই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে এসেছি। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের এই ময়দানে একত্রিত করেছেন। তোমরা তোমাদের দোয়ার ফলাফল শীঘ্রই দেখতে পাবে: “কাফেরদের দোয়া কেবল ব্যর্থই হয়।” [১]

এখানে ইসলামী লশকরকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হলো। মুলুকুত তাওয়ায়েফের বাহিনী, যাদের নেতৃত্ব ছিল মুতামিদের হাতে, ইউসুফ বিন তাশফিনের নির্দেশে তারা তাদের তাঁবু একটি উঁচু মালভূমিতে এমনভাবে স্থাপন করল যাতে তারা নাসারাদের দেখতে পায় এবং নাসারারাও তাদের দেখতে পায়। সেখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ঝোপঝাড় ঘেরা একটি পাহাড়ের পেছনে মুরাবিতুনদের ক্যাম্প ছিল।

মুতামিদ এবং মুরাবিতুনদের মধ্যে যোগাযোগের দ্রুততম ব্যবস্থা ছিল। আমিরের পরিকল্পনা ছিল যেন নাসারাদের মুসলিম বাহিনীর প্রকৃত সংখ্যা জানতে না পারে। নিজের বাহিনীকে কম দেখিয়ে তাদের ধোঁকা দেওয়া এবং মুলুকুত তাওয়ায়েফকে সামনে রাখা যাতে তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যেতে না পারে। তাই মুতামিদ সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন যেন কোনো অপরিচিত ব্যক্তি কোনো অজুহাতে লশকরের আশেপাশে না আসে। মুতামিদ নিজে এই কাজের তদারকি করতে করতে শিবিরের চারদিকে ঘুরতে থাকলেন। তার গোয়েন্দারা আলফনসো ষষ্ঠের তাঁবুতে সক্রিয় হয়ে উঠল যাতে শত্রুর যুদ্ধকৌশল জানা যায়।

একদিন গোয়েন্দারা খবর দিল যে, খুব ভোরে নাসারা বাহিনী আক্রমণ করতে যাচ্ছে। মুসলিমরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে ময়দানে বেরিয়ে এল, কিন্তু আলফনসো ষষ্ঠ এই খবরটি ছড়িয়েছিল মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য। তবে তার এই কৌশল কার্যকর হয়নি কারণ মোকাবিলায় কেবল মুলুকুত তাওয়ায়েফের বাহিনী বেরিয়েছিল, যা দেখে মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে আলফনসো ষষ্ঠের ভুল ধারণা আরও বেড়ে গেল।

যুদ্ধের জন্য শনিবার দিন নির্ধারিত হয়েছিল কিন্তু আলফনসো ষষ্ঠ অসতর্ক অবস্থায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করতে চেয়েছিল। সে মুতামিদকে এই প্রতারণামূলক বার্তা পাঠাল: “শুক্রবার আপনাদের পবিত্র দিন, শনিবার ইহুদিদের দিন যারা আমাদের মুন্সি, উজির এবং কর্মচারী। রবিবার আমাদের ইবাদতের দিন। যুদ্ধ এর পরে সোমবার রাখা হোক।”

এরপর আলফনসো ষষ্ঠ তার সামরিক কাউন্সিলের সাথে আলাপকালে বলল: “এই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলনকারী ব্যক্তি হলো মুতামিদ। আফ্রিকার মরুচারীরা যদিও শক্তিশালী এবং যোদ্ধা, কিন্তু তারা আমাদের ভূখণ্ড সম্পর্কে পরিচিত নয়। তাদের কমান্ড মুতামিদ করছে। তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানাবে। যদি তার পা উপড়ে যায়, তবে বাকিদের নিশ্চিহ্ন করা সহজ হবে।”

গোয়েন্দারা এই কথোপকথন শুনে ফেলল। নাসারাদের শিবিরে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা থেকেও আন্দাজ করা গেল যে আগামীকাল যুদ্ধ হবে। গোয়েন্দারা এই সব খবর মুতামিদকে গিয়ে শোনাল। সেই রাতেই মুতামিদের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত কর্ডোভার একজন ফকিহ আহমদ বিন রুমিলা (রহ.) স্বপ্নে আকায়ে নামদার (সা.)-এর জিয়ারত লাভ করলেন। আপনি (সা.) তাকে আগামীকাল সকালে শাহাদাতের সুসংবাদ দেওয়ার পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য বিজয়ের বার্তা শোনালেন। এরপর ফকিহ-এর মাথায় তেল লাগিয়ে দিলেন এবং সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন।

মুতামিদ অবিলম্বে ইউসুফ বিন তাশফিনকে এই তথ্যগুলো পাঠিয়ে দিলেন এবং সতর্ক করলেন যে শত্রু আগামীকাল হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে।

[১] সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৩।

এই সংবাদে মুসলমানরা সারা রাত সতর্ক, জাগ্রত এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইউসুফ বিন তাশফিনের নির্দেশে মুরাবিতুনের দশ হাজার অশ্বারোহীকে দাউদ বিন আয়েশার নেতৃত্বে অগ্রবর্তী দল হিসেবে সবার সামনে মোতায়ন করা হয়েছিল।

১২ রজব ৪৭৯ হিজরি শুক্রবার সকালে খ্রিস্টানদের শিবির থেকে সৈন্যদের একটি প্লাবন ধেয়ে আসে, যার সংঘর্ষ প্রথমে দাউদ বিন আয়েশার অগ্রবর্তী দলের সাথে হয়। ইবনে আয়েশা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ করেন এবং খ্রিস্টানদের শত শত লাশ ফেলে এই তুফানি ঢেউয়ের শক্তি ভাঙার আশ্রয় চেষ্টা করেন, তবে প্রতিপক্ষ বিপুল জনশক্তির জোরে এগিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে শিবিরে সংবাদ পৌঁছে যায় যে শত্রু আক্রমণ করছে। মুসলমানরা ফজরের নামাজ শেষ করে দ্রুত কাতারবন্দী হতে শুরু করে। ইশবিলিয়ার সেনাবাহিনী মাঝখানে মুতামিদের অধীনে অবস্থান নেয়। ডান পার্শ্বে ওমর আল-মুতাওয়াক্কিল এবং বাম পার্শ্বে পূর্বদিকের শহরগুলোর আমিররা তাদের বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে যান। পাহাড়ের পেছনে মুরাবিতুন বাহিনী ছিল এবং এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন।

আলফনসোর ইশারায় আলবার হানিস, কাউন্ট গার্সিয়া এবং কাউন্ট রডরিক তাদের বাহিনী নিয়ে মুলুকুত তাওয়াইফের সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ শুরু করেন। এই আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, তা প্রতিহত করতে গিয়ে শত শত মুসলমান শহীদ হন। মুলুকুত তাওয়াইফের মধ্য থেকে গার্নাতা, আলমেরিয়া এবং বাতালইউসের বেশ কিছু দল পিছু হটে বাতালইউসের দিকে পালাতে শুরু করে।

মুতামিদের ছেলে আবদুল্লাহও পালিয়ে যায়, কিন্তু মুতামিদ অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে অটল থাকেন। নিজেদের বাদশাহকে এভাবে লড়তে দেখে ইশবিলিয়ার সৈন্যরাও দৃঢ়পদ হয়। মুতামিদ দীর্ঘক্ষণ একজন অভিজাত আরবের মতো লড়াই করতে থাকেন। এই সময়ে তার দুটি ঘোড়া আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তিনি নিজে রক্তে ভিজে যান। তার ডান হাত ও পাঁজরে আঘাত লাগে। এরপর তলোয়ার চালনার নৈপুণ্য দেখানোর সময় হঠাৎ তার শিরদ্বাণে তলোয়ারের এমন এক আঘাত লাগে যে মাথা কান পর্যন্ত জখম হয়ে যায়। তিনি ইশবিলিয়ায় তার ছোট সন্তান আবু হাশিমকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রেখে এসেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল:

“আবু হাশিম! ধারালো তলোয়ার আমার মাথা ফেড়ে দিয়েছে... সুতরাং এই উত্তাপে আমার ধৈর্য আল্লাহরই দান।”

“ধূলিকণার মেঘের নিচে তোমার দুঃখ-বেদনা আমার মনে পড়ে গেল... কিন্তু এই স্মৃতি আমাকে পলায়নে প্ররোচিত করতে পারেনি।”

মুরাবিতুন বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতা দাউদ বিন আয়েশা যখন মুতামিদকে ঘেরাওয়ার মধ্যে দেখলেন, তখন তৎক্ষণাৎ নিজের বাহিনী নিয়ে সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং খ্রিস্টানদের পিছু হটতে বাধ্য করলেন। [১]

এদিকে ইউসুফ বিন তাশফিন উচ্চস্থান থেকে যুদ্ধের পুরো দৃশ্য দেখছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে ষষ্ঠ আলফনসো তার সমস্ত...

শক্তি রণক্ষেত্রে নেমে এসেছে। তাদের যুদ্ধকৌশল ছিল এই যে, এই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টেনে নেওয়া হোক, তবে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী যুদ্ধের আগে শত্রুকে ভালোভাবে ক্লান্ত করে দেওয়া হোক।

এই সময়ে মুতামিদ তার সচিব ইবনে কাসিরাকে আমির ইউসুফের কাছে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন। ইবনে কাসিরা আসার সাথে সাথেই আমির ইউসুফ দ্রুত কয়েকটি দল পাঠিয়ে দিলেন যাতে ইশাবিলিয়ার বাহিনীর কদম মজবুত হয়। এর পরপরই তিনি তার চাচাতো ভাই আমির সির বিন আবু বকরকে বারবারদের সেরা এবং সতেজ বাহিনীর সাথে নাসারাদের দিকে পাঠালেন।

সির বিন আবু বকর কাস্তালিয়ার অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর আক্রমণকারী হলেন, যারা অভিজ্ঞ খ্রিস্টান কমান্ডার আলবার হানেসের কমান্ডে ছিল। খুব দ্রুতই কমান্ডারের মনে হলো যে তিনি মুরাবিতুনদের যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তিনি সির বিন আবু বকরের তীব্র আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটতে লাগলেন। অন্যদিকে মুলুকুত তাওয়ায়েফের পলায়নপর সৈন্যরাও পাশা উল্টে যেতে দেখে ফিরে আসতে শুরু করল এবং নিজেদের পুনরায় সংগঠিত করল। দীর্ঘক্ষণ ধরে তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকল, কখনো মুসলমানরা এগিয়ে যেত আবার কখনো নাসারারা তাদের পিছিয়ে দিত। মুলুকুত তাওয়ায়েফের দলগুলো প্রথমবারের মতো লজ্জিত হয়ে নাসারাদের কাছ থেকে পূর্বের অপমানের প্রতিশোধ নিচ্ছিল।

এই সময়ে আলফনসো ষষ্ঠ নিজেই রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের আসল চাবিকাঠি মুতামিদের হাতে নয় বরং মুরাবিতুনদের আমিরের হাতে। তিনি তার বাহিনী নিয়ে পাহাড় ঘুরে মুরাবিতুনদের শিবিরের দিকে পৌঁছালেন, কিন্তু ততক্ষণে ইউসুফ বিন তাশফিন নিজেই লামতুনা ও সানহাজা গোত্রের কঠোরপ্রাণ সৈন্যদের নিয়ে নাসারাদের পশ্চাৎভাগে পৌঁছে গিয়েছিলেন। চোখের পলকে তারা নাসারা শিবিরের রক্ষী সৈন্যদের হত্যা করে তাঁবুগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলেন।

আলফনসো ষষ্ঠ যখন নিজের তাঁবু থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখলেন, তখন তিনি দিশেহারা হয়ে ফিরে আসলেন এবং এক দীর্ঘ পথ ঘুরে মুরাবিতুনদের কাছে পৌঁছালেন। কিন্তু মুরাবিতুনদের সারিগুলো তার প্রত্যাশার বিপরীতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও মজবুত ছিল।

এখন বিউগল বাজানো হলো এবং মুসলমানরা আল্লাহ্ আকবার ধ্বনি দিয়ে ত্রুশ পূজারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুরাবিতুনদের শত শত আফ্রিকান ঢোল বাজানো হচ্ছিল, যার গর্জনে পৃথিবী ও আকাশের সাথে নাসারাদের অন্তরও কেঁপে উঠছিল।

কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত করার পর ইউসুফ বিন তাশফিনের ইশারায় মুরাবিতুনরা একপাশে সরে গেল এবং আলফনসো ষষ্ঠ দ্রুত নিজের তাঁবুর দিকে পৌঁছালেন, যার অধিকাংশ অংশ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে মুরাবিতুনরাও আলফনসো ষষ্ঠের পিছু পিছু তার শিবিরের ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং পেছন থেকে আক্রমণ করল। আলফনসো ষষ্ঠ দ্রুত নিজের সৈন্যদের পুনরায় সংগঠিত করলেন এবং পাল্টা আক্রমণ করলেন। মুরাবিতুনরা আমিরের নির্দেশে একবার ডানে আবার বামে সরে গেল এবং আলফনসো নিজের বাহিনীর কাছে পৌঁছে গেলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আমির ইউসুফ পুনরায় আলফনসোর ওপর পেছন থেকে আক্রমণ করলেন। এভাবে নাসারারা একদিকে মুলুকুত তাওয়ায়েফ এবং অন্যদিকে মুরাবিতুনদের মাঝে পিষ্ট হতে লাগল।

আমির ইউসুফের নির্দেশে উটগুলোকে সারির একেবারে সামনে রাখা হয়েছিল, যাদের চিৎকারে নাসারাদের ঘোড়াগুলো...

ঘোড়াগুলো ভড়কে যাচ্ছিল কারণ আন্দালুসে এটি একটি নতুন প্রাণী ছিল। মুরাবিতুনদের রণকৌশল প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল। তারা বারবার আক্রমণ করে খ্রিস্টানদের পিছু হটতে এবং তাদের ঘোড়াগুলোকে পেছনে দৌড়াতে বাধ্য করছিল। আসর পর্যন্ত যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতায় চলতে থাকে। ইউসুফ বিন তাশফিন এই সময়ে নিজের বিদ্যুৎগতির ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের মতো যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চক্কর দিচ্ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল:

“হে মুসলমানরা! আল্লাহর শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে অবিচলতা অবলম্বন করো। যাকে শাহাদাত নসিব করা হবে, সে জান্নাত পাবে। যে জীবিত থাকবে, সে সওয়াব ও গনিমত লাভ করবে।”

এই দিন তিনটি ঘোড়া আমিরের অশ্বারোহণের ধকল সহিতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছিল। সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময়ে ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের সমাপ্তির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং নিজের সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি ব্যবহার করলেন।

এরা ছিল চার হাজার সুদানীয় কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধা, যারা প্রতিটি বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে জানত। ইউসুফ বিন তাশফিন তাদের সাথে নিলেন এবং প্রতিপক্ষের ছত্রভঙ্গ সারিতে আঘাত হেনে আলফনসো ষষ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এক সুদানীয় যোদ্ধার খপ্পর আলফনসোর উরুতে বিঁধল এবং সে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। এখন তার সাথে মাত্র পাঁচশ লোক অবশিষ্ট ছিল। রাতের অন্ধকারে আলফনসো এবং তার আহত সঙ্গীরা টিলা ও গর্তে আশ্রয় নিয়ে তলেতলার দিকে রওনা হলো।

আলফনসো যখন তলেতলায় পৌঁছাল, তখন তার সাথে মাত্র একশ লোক অবশিষ্ট ছিল। বাকিরা ক্ষতের যন্ত্রণা সহিতে না পেরে পথেই মারা গিয়েছিল। জালাকার ময়দানে খ্রিস্টানদের লাশের স্তুপ জমে গিয়েছিল। তাদের মাথার খুলির স্তুপ এত উঁচু হয়েছিল যে তার ওপর দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিনরা তাওহিদ ও রিসালাতের আওয়াজ বুলন্দ করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্য থেকেও হাজার হাজার লোক শাহাদাতের সুখা পান করেছিলেন, যাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় উলামা ও মুহাদ্দিসগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা এই জিহাদের অনুপ্রেরণা ছিলেন এবং প্রথম সারিতে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আল্লামা আহমদ বিন রমিলা রহ. ও ছিলেন, যিনি যুদ্ধের আগে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে বিজয়ের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। আন্দালুসের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজম জহিরি রহ.-এর পুত্র আল্লামা আবু রাফি রহ. এবং মারাক্কোশ-এর কাজী আল্লামা আব্দুল মালিক মাসমুদি রহ. ও শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হন।

আমির ইউসুফ বিন তাশফিন জালাকায় খ্রিস্টানদের শক্তি চূর্ণ করে আন্দালুসের মুসলমানদের খ্রিস্টানদের দাসত্বের বিপদ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই উপদ্বীপের প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী ছিল। একজন ঐতিহাসিক বলেন:

“এটি ইয়ারমুক ও কাদিসিয়ার মতো এমন এক দিন ছিল যার উদাহরণ শোনা যায়নি। কী আর বলব, এটি কতই না মহান বিজয় এবং ইজ্জত ও সম্মানের কত বড় দিন ছিল। আহলে ইসলামের কদম যা টলমল করছিল, জালাকার যুদ্ধের পর তা আবারও দৃঢ় হলো। অন্ধকারের কবলে পড়া এই ভূখণ্ড আবারও আলোকিত হয়ে উঠল। এই উপদ্বীপের শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হলো এবং এখানকার মানুষ আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।”

আমির এই যুদ্ধ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জিহাদের দায়িত্ব পালনের জন্য লড়েছিলেন। তাঁদের ইখলাস এবং উত্তম নিয়তের...

এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষের ফেলে যাওয়া ধন-সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, সওয়ারি এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের স্তূপ এই বলে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যে, আমার উদ্দেশ্য ছিল কেবল জিহাদ এবং সওয়াব। [১]

সুস্পষ্ট বিজয়ের অভিনন্দন:

ইউসুফ বিন তাশফিন যুদ্ধের পর মুতামিদ বিন আব্বাদকে, যার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাভেজ বাঁধা ছিল, তার বীরত্ব ও দৃঢ়তার জন্য অভিনন্দন জানান। আলজেরিয়ার শাসক মুইজ বিন বাদিসকে এই বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত পত্রেও মুতামিদের অনেক প্রশংসা করেন। [২]

মুতামিদ রণক্ষেত্র থেকে ইশবিলিয়ায় তার পরিবারের কাছে বিজয়ের সুসংবাদ পাঠিয়েছিলেন যাতে লেখা ছিল:

“আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন, কাফির ও মুশরিকরা পরাজিত হয়েছে, আলফনসোর বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। ঈমানদাররা তাদের মাথার খুলি দিয়ে মিনার বানিয়ে আযান দিয়েছেন। আমার সামান্য কিছু জখমের কষ্ট ছিল যা এই বিজয়ের পর দূর হয়ে গেছে। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ কেবল আল্লাহরই। ওয়াসসালাম।” [৩]

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্ত থেকে ওলামায়ে কেরাম ইউসুফ বিন তাশফিনকে এই বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান। ইমাম গাজালি তার পত্রে লিখেছিলেন:

“মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল-গাজালির পক্ষ থেকে আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন তাশফিনের নামে। রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ হলো যে, কিয়ামতের দিন যখন কোনো ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেবেন। তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। আমরা আশা করি যে, আমীর মুহতারামও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, কারণ আল্লাহ আপনাকে যেমন রাজত্ব দিয়েছেন, তেমনি একে ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা সুশোভিত করেছেন। জনাবের সচ্চরিত্রের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আন্দালুসের মুসলমানরা মুশরিকদের আধিপত্যের কারণে লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার ছিল এবং মুসলিম আমীররা ক্ষমতার লোভে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। এমন অবস্থায় তারা যখন আপনাকে ডাকল, তখন আপনি লাভবাইক বলে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসলেন এবং জিহাদের হুক আদায় করে দিলেন। আল্লাহ আপনাকে মুশরিকদের নির্মূল করার তাওফিক দিয়েছেন। দোয়া করি আল্লাহ আমীরের শাসন ও তাঁর সাহায্য সর্বদা বজায় রাখুন।” [৪]

ইউসুফ বিন তাশফিনের প্রত্যাবর্তন এবং এর কারণসমূহ:

আমীর ইউসুফ যুদ্ধের পর মুতামিদের আমন্ত্রণে কিছু দিন ইশবিলিয়ায় অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি মরক্কোতে তার বড় ছেলে আবু বকরের মৃত্যুর সংবাদ পান। তিনি তৎক্ষণাৎ মরক্কোর উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি নিলেন এবং দ্রুত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে...

[১] মা'রাকা-এ-যাল্লাকার বিবরণের প্রাচীন উৎস: আল-কামিল ফিত তারিখ, ৪৭৯ হিজরি; আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব: ১/ ১০৮-১০৯; নাফহত তিব: ৩/ ৩৬০-৩৭০; ওফাতাতুল আইয়ান: ৭/ ১১৫-১১৭, তাবা দার সাদির।

আধুনিক উৎস: মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃ. ১৯০-১৯৫; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ৩১৫-৩২৩।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ৩৪৯। [৩] নাফহত তিব: ৩/ ৩৬৯।

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৩৩১-৩৩৩, ইমাম গাজালির পত্রের সারসংক্ষেপ।

করে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। তবে তিনি তাঁর সেনাপতি সীর বিন আবু বকরকে কয়েক হাজার সৈন্যসহ মুলুকুত তাওয়াইফের উত্তর সীমান্তে মোতায়ন করেছিলেন। [১]

কিছু পশ্চিমা ঐতিহাসিক এই পদক্ষেপের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, আমির যদি আন্দালুসে অবস্থান করে উত্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখতেন, তবে সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের দখলে চলে যেত।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইউসুফ বিন তাশফিনের ফিরে আসার পেছনে জোরালো কারণ ছিল। তিনি দেখেছিলেন যে, মুলুকুত তাওয়াইফের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা খ্রিস্টানদের এত বড় বিপদ এবং জিহাদের এমন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের মাঝেও শেষ হয়নি, কেবল দমে গিয়েছিল। এই বিজয়ের পরেও তাদের মধ্যে খ্রিস্টানদের এলাকায় অগ্রসর হওয়ার জন্য আন্তরিক ও মুজাহিদসুলভ ভঙ্গিতে মুরাবিতুনদের সাথে দেওয়ার মতো সাহস ছিল না। ইউসুফ বিন তাশফিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই আরামপ্রিয় আমিরদের স্বভাব কোনো দীর্ঘ অভিযান সহ্য করতে পারবে না। এই কারণেই তিনি যাল্লাকার যুদ্ধকে একদিনের মধ্যেই, মুলুকুত তাওয়াইফের সাহস ভেঙে যাওয়ার আগেই সমাপ্ত করেছিলেন।

বিজয়ের পর আন্দালুসের আমিরদের প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে অগ্রাধিকার পাওয়া এবং অন্যকে যেন পাত্তা না দেওয়া হয়। মুলুকুত তাওয়াইফরা নির্জনে ইউসুফ বিন তাশফিনের সামনে একে অপরের নিন্দা করত। আলমেরিয়ার শাসক মুতাসিম সচ্চরিত্রের মানুষ ছিলেন। জ্ঞান-সাহিত্য, কাব্যচর্চা এবং যুদ্ধ ও সভার বিচিত্র যোগ্যতায় তিনি প্রায় মুতামিদের সমকক্ষ ছিলেন। আন্দালুসে মুরাবিতুনদের ডাকা এবং তাদের সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রেও মুতামিদের পর তিনিই সবার আগে ছিলেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন মুতাসিম ও মুতামিদ সম্পর্কে বলতেন: “এই উপদ্বীপের পুরুষ কেবল এই দুজনই।”

কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কের দিক থেকে মুতামিদ ও মুতাসিম পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। যাল্লাকার যুদ্ধ পর্যন্ত একটি সামষ্টিক প্রয়োজন তাদের একত্রিত রেখেছিল, কিন্তু এই প্রয়োজন পূরণ হতেই উভয়ের পূর্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুরোপুরি জেগে উঠল। মুতাসিম মুতামিদকে আমির ইউসুফের নজরে খাটো করার জন্য এক অদ্ভুত চাল চাললেন। তিনি মুতামিদকে বিশ্বাস করাতে থাকলেন যে, মুরাবিতুনদের কাছে আন্দালুসের উর্বরতা ও সৌন্দর্য ভালো লেগে গেছে, তাই এখন তারা এখানে দখলদার হয়ে থাকবে। মুতামিদ ছিলেন কানপাতলা এবং একজন আবেগপ্রবণ মানুষ। তিনি এসব কথা শুনে ইউসুফ বিন তাশফিন সম্পর্কে অনুপযুক্ত শব্দ বলে ফেললেন। মুতাসিম এই কথাগুলো রঙ চড়িয়ে ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে পৌঁছে দিলেন; অন্য কিছু আমিরও এমনটিই করেছিলেন যাতে আমির তাদের নিজের সহানুভূতিশীল ও বিশ্বস্ত মনে করে ঘনিষ্ঠ করে নেন। [২]

এসব কথায় ইউসুফ বিন তাশফিনের মতো একজন পরিষ্কার হৃদয়ের মানুষের যতটুকু বিরক্তি হওয়ার কথা ছিল, তা কম ছিল না। তিনি এটি অনুভব না করে পারলেন না যে, মুলুকুত তাওয়াইফরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাঁকে ডেকেছে, অন্যথায় তারা মুরাবিতুনদের প্রতি হিংসা পোষণ করে। যাল্লাকার যুদ্ধের পর খ্রিস্টানদের বিপদ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং এখন মুলুকুত তাওয়াইফের ধূর্ত স্বভাব থেকে...

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৩৭০

[২] আল-মু'জিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাবুশি: ১৩৮

এটা অসম্ভব ছিল না যে তারা মুরাবিতুনদের আন্দালুসে ঘিরে ফেলার বা বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করত। ইউসুফ বিন তাশফিন এমন কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হওয়ার আগেই ফিরে যাওয়ার পথ বেছে নেন যাতে একটি ঐতিহাসিক বিজয়ের চমৎকার ফলাফলের ওপর অনৈক্যের ধুলো না পড়ে।

খ্রিস্টানদের পুনরায় আক্রমণ। সিড ক্যাম্পিডোর-এর উত্থান:

ইউসুফ বিন তাশফিন ফিরে গিয়ে আন্দালুসের অবস্থা সম্পর্কে বেখবর ছিলেন না। এক বছরের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবারও আন্দালুসে গিয়ে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

আন্দালুসে মুলুকুত তাওয়ায়েফরা জালাকার বিজয় থেকে কোনো ফায়দা তোলেনি। যদি তাদের জাতীয় চেতনা জাগ্রত হতো, তবে তারা নিজেদের কাতারে কোনো ফাটল সৃষ্টি হতে দিত না। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দালুসের উত্তরে বিজয়ের নতুন ইতিহাস রচনা করতে পারত এবং তোলেদোসহ তাদের প্রতিটি শহর ও দুর্গ পুনরুদ্ধার করতে পারত। কিন্তু তারা জালাকার শহীদদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীনতার নতুন মৌসুমে ভোগ-বিলাস এবং পারস্পরিক বিবাদের এক অন্তহীন ধারা শুরু করে দিল। খ্রিস্টানরা তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পূর্ণ সুযোগ নিল এবং বালানসিয়াকে কেন্দ্র বানিয়ে—যেখানে তারা পুতুল শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদিরের আড়ালে অঘোষিত ক্ষমতা লাভ করেছিল—মারিয়া এবং লোরকাকে তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের লক্ষ্যবস্তু বানাল। আক্রমণের এই নতুন ঢেউয়ে কমান্ডার “এল সিড ক্যাম্পিডোর” অগ্রভাগে ছিল। সে ছিল কাস্তিলের একজন বিখ্যাত নাইট। তার আসল নাম ছিল “রদ্রিগো ডিয়াজ” (Rodrigo Diaz)। আরবরা তাকে “আস-সাইয়িদ কানবিতুর” বলত। সে ছিল একজন পেশাদার যোদ্ধা। মুসলমানরা বেশি পারিশ্রমিক দিলে সে তাদের সাথে মিলে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়ত। খ্রিস্টানরা বেশি দিলে সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। [১]

জালাকায় পরাজয়ের পর কাস্তিলের বাহিনী বালানসিয়া থেকে চলে গেলে সেখানকার জনগণও পুতুল শাসক ইয়াহইয়া আল-কাদিরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহইয়া আল-কাদির সিড ক্যাম্পিডোর-এর মতো একজন পেশাদার খুনিকে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেয়। সিড যখন তার লুটেরা সঙ্গীদের নিয়ে বালানসিয়ায় আস্তানা গাড়তে আসে, তখন ইয়াহইয়া আল-কাদির নিজেই তাকে অভ্যর্থনা জানায়। নিজের গদি মুসলমানদের জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে সে তাকে প্রতি সপ্তাহে চার হাজার দিনার প্রদান করতে শুরু করে। সিড দানিয়া, শাতিবা থেকে আরিউলা পর্যন্ত প্রতিটি শহরকে লুণ্ঠনের লক্ষ্যবস্তু বানাল। তার এই কর্মকাণ্ড দেখে ১০৮৪ খ্রিস্টাব্দে আলফনসো ষষ্ঠ তাকে উত্তর-পূর্ব আন্দালুসের আরও কিছু দুর্গ প্রদান করে। এভাবে সিড এক প্রকার স্বাধীন শাসক হয়ে ওঠে, যে মুসলমানদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে তাদেরই দমন করছিল। [২]

হিসনুল লাইত। আলফনসোর নতুন সামরিক ছাউনি:

এদিকে আলফনসো ষষ্ঠ-ও ইশবিলিয়া এবং বাতলিয়ুস-এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তার অবশিষ্ট শক্তিকে পূর্ব রণাঙ্গনে একত্রিত করতে...

[১] এল সিড (El Cid) মূলত আরবি শব্দ “আস-সাইয়িদ”-এর বিকৃত রূপ। আলফনসো ষষ্ঠ যেভাবে নিজেকে “জুস সাইফাইন” বলত, তেমনি রদ্রিগো ডিয়াজ নিজেকে সাইয়িদ বলত, এই শব্দটিই সংক্ষিপ্ত হয়ে সিড হয়ে গেছে। ক্যাম্পিডোর (El Campeador) ছিল তার উপাধি যার অর্থ হলো “যোদ্ধা”।

[২] Story of the moors in Spain 205 to 207.

শুরু করে দিল। তলীতলা দখলের পর সে লোরকা ও মুরসিয়ার মাঝখানে একটি পাহাড়ের ওপর অত্যন্ত বিশাল ও মজবুত দুর্গ নির্মাণ করাল যাকে হিসনুল লীত বলা হতো। এটি এত বিশাল ছিল যে সেখানে পনেরো হাজার সৈন্য সহজেই থাকতে পারত। আলফনসো ষষ্ঠ যাল্লাকার পরাজয়ের পর নিজের তেরো হাজার সৈন্য সেখানে স্থানান্তরিত করে দিল। এই বাহিনী মুরসিয়া, শাতুরা, লোরকা এবং আলমেরিয়ার জেলাগুলোতে একের পর এক আক্রমণ করে সেই সমস্ত এলাকা ধ্বংস করে দিল।

এই সময়ে মুতামিদ, যে আগে থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব শহরগুলো দখলের চেষ্টা করছিল, সুযোগ বুঝে ইশবিলিয়া থেকে বের হলো যাতে লোরকা দখল করতে পারে, যার ওপর সে নিজের আইনি অধিকার মনে করত। কিন্তু লোরকার আমিররা তার একটি কথাও শুনল না। মুতামিদ লোরকার চিন্তা ছেড়ে মুরসিয়ার দিকে অগ্রসর হলো যেখানে ইবনে রুশাইক আগে থেকেই দখলদার ছিল। সেও মুতামিদকে প্রবেশ করতে দিল না। মুতামিদ নিরাশ হয়ে ইশবিলিয়ার দিকে ফিরে গেল। তার এই ব্যর্থতা খ্রিস্টানদের সাহস অনেক বাড়িয়ে দিল এবং তারা পূর্ণ সাহসিকতার সাথে কুরতুবা ও গ্রানাডা পর্যন্ত লুটতরাজ শুরু করল। [১]

ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে পুনরায় হস্তক্ষেপের আবেদন:

এই পরিস্থিতিতে আন্দালুসের উলামা ও ফুকাহাদের প্রতিনিধি দল একের পর এক ইউসুফ বিন তাশফিনের দরবারে উপস্থিত হতে লাগল যাতে তাদের খ্রিস্টানদের জুলুম থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অবশেষে মুতামিদ সালতানাতের কয়েকজন সদস্যের সাথে নিজেও আবেদনের জন্য সমুদ্র পাড়ি দিল এবং আমির ইউসুফের সাথে সাক্ষাৎ করে আরজি পেশ করল যে হিসনুল লীতের লুটেরাদের নির্মূল করা হোক। আমির এই আবেদন গ্রহণ করলেন এবং রবিউল আউয়াল ৪৮১ হিজরিতে আরও একবার আন্দালুসে পা রাখলেন। [২]

হিসনুল লীতের যুদ্ধ এবং মুলুকুত তাওয়ায়েফের সংকীর্ণমনা:

জাজিরাতুল খাদরা আরও একবার মুরাবিতুনদের ছাউনি হলো। এখান থেকে আমির ইউসুফ মুলুকুত তাওয়ায়েফদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে তারা যেন তাদের বাহিনী নিয়ে জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বেরিয়ে আসে। আমির ইউসুফ মুতামিদকে সাথে নিয়ে মালাগা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। গ্রানাডার আবদুল্লাহ বিন বুলকিন, তার ভাই তামীম এবং আলমেরিয়া থেকে মুতাসিম বিন সামাদিহও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে পৌঁছে গেলেন। হিসনুল লীতের কাছে ইবনে রুশাইক ছাড়াও শাতুরা, বাস্তা এবং জিয়ানের আমিররাও নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে মুরাবিতুনদের সাথে এসে মিলিত হলেন।

হিসনুল লীতে আলফনসো ষষ্ঠের তেরো হাজার সৈন্যের সাহায্যের জন্য বেশ কিছু খ্রিস্টান শাসকের বাহিনী একত্রিত হয়েছিল। মুসলমানরা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে এটি অবরোধ করল এবং দুর্গ ধ্বংসকারী যন্ত্রের সাহায্যে এর দেয়ালে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করতে লাগল। তবে দুর্গটি ইস্পাতের মতো মজবুত ছিল, মানজানিকের আঘাতেও তা সামান্যতম ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু যুদ্ধের কোনো ফলাফল বের হলো না। আমির ইউসুফ এই সময়ে দেখলেন যে মুলুকুত তাওয়ায়েফের সারিতে ঐক্য ও সংহতির নামগন্ধও নেই।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩৩৫/২

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩৩৫/২; আল-যাল্লাকা মা'রাকা মিন মা'আরিকিল ইসলাম: পৃ. ২০০-১৯৯

না—তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত। প্রত্যেকেই বলত যে অন্যজন তার ওপর জুলুম করেছে এবং আমির ইউসুফের উচিত তাকে ইনসাফ পাইয়ে দেওয়া এবং তার বিরোধী আমিরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া।

মুতাসিম বিন সামাদিহ এবং মুতামিদ বিন আব্বাদ একে অপরের মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করতে থাকতেন। গ্রানাডার আমির তামীম এবং আবদুল্লাহ আপন ভাই ছিলেন, কিন্তু তারা দুজনেই আমির ইউসুফের সাথে একান্তে দেখা করে অভিযোগ করতেন যে গ্রানাডা তার উত্তরাধিকার এবং তার ভাই অবৈধভাবে এর দাবিদার। মুতামিদ এবং ইবনে রশিকের মধ্যেও তীব্র শত্রুতা চলছিল। মুতামিদের দাবি ছিল যে মুরাবিতুনরা যেন ইবনে রশিকের কাছ থেকে মুরসিয়া ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ফেরত দেয়। ইবনে রশিক এই অবরোধে মুরাবিতুনদের সাথে ছিলেন, কিন্তু গোপনে তিনি ষষ্ঠ আলফনসোকে কেবল বন্ধুত্বের বার্তাই পাঠাননি, বরং তার ছোট রাজ্যের করও তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি অবরোধ চলাকালীন গোপনে অবরুদ্ধ খ্রিস্টানদের সাহায্যও করছিলেন। মুতামিদ তার গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এই ভয়াবহ রহস্য জানতে পেরে ইউসুফ বিন তাশফিনকে অবহিত করেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারলেন যে কেন কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পরও একটি দুর্গ জয় করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি ইবনে রশিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পর তাকে গ্রেপ্তার করেন এবং উলামা ও ফকিহদের পরামর্শে তাকে শাস্তি হিসেবে এই শর্তে মুতামিদের হাতে তুলে দেন যে তিনি তাকে হত্যা করবেন না।

এই সিদ্ধান্ত মূলুকুত তাওয়ায়েফদের সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল, কারণ মুরসিয়া এবং এর আশেপাশের অধিকাংশ আমির ইবনে রশিকের আত্মীয় ছিলেন। তারা কেবল প্রতিবাদস্বরূপ সেনাবাহিনী থেকে আলাদা হয়ে যাননি, বরং মুরসিয়া এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে মুরাবিতুনদের শিবিরের খাদ্য ও রসদ সরবরাহও বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে মুরাবিতুনদের পক্ষে হিসনুল লাইত অবরোধ অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে ষষ্ঠ আলফনসো একটি বাহিনী নিয়ে হিসনুল লাইতের অবরুদ্ধ খ্রিস্টানদের সাহায্যে পৌঁছে যান। দুর্গে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন যে তেরো হাজারের মধ্যে মাত্র এগারোশ লোক জীবিত আছে। তিনি বুঝতে পারলেন যে মুরাবিতুনরা যেকোনো সময় হিসনুল লাইত জয় করে নিতে পারে, তাই তিনি অবরুদ্ধ সৈন্যদের সাথে নিয়ে উত্তরের দিকে পিছু হটেন এবং যাওয়ার সময় দুর্গের দেয়ালগুলো ভেঙে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে যান। ইশবিলিয়ার বাহিনী এগিয়ে গিয়ে সেই ধ্বংসস্তুপের ওপর তাদের পতাকা উড়িয়ে দেয়। এটি ৪৮২ হিজরির ঘটনা।

ইউসুফ বিন তাশফিনের জন্য এখন আন্দালুসের আমিরদের ওপর আস্থা রাখার কোনো অবকাশ ছিল না। এই অভিযানের পরপরই তিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মরক্কো চলে যান। এর আগে তিনি আমির দাউদ বিন আয়েশাকে চার হাজার সৈন্যসহ বালেঙ্গিয়া এবং মুরসিয়ার সীমান্তে মোতায়েন করেছিলেন। এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমির ইউসুফ মূলুকুত তাওয়ায়েফদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের ক্ষমতার স্বাদ নেওয়ার আরও সুযোগ দেওয়াকে ইসলামী আন্দালুসের ধ্বংসের সমার্থক মনে করতেন।

অন্যদিকে মূলুকুত তাওয়ায়েফরাও হিসনুল লাইত অবরোধের সময় ইউসুফ বিন তাশফিনের পরিবর্তিত রূপ দেখে ফেলেছিলেন, তাই আমিরের প্রত্যাবর্তনের পরপরই তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে মুরাবিতুনদের পুনরায় আন্দালুসে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ দেবেন না...

মুরাবিতুনদের যে দলগুলো ইসলামী আন্দালুসের পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর সীমান্তে মোতায়েন ছিল, মুলুকুত তাওয়ায়েফরা তাদের খাদ্য ও রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিল। গ্রানাডার শাসক আবদুল্লাহ বিন বুলকিন এবং মুতামিদ বিন আব্বাদ নিরুদ্ভিতার চরম সীমায় পৌঁছে গেলেন এবং আবারও ষষ্ঠ আলফনসোর সাথে পত্রিনিময় করে তাকে মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে নিজেদের সমর্থনের নিশ্চয়তা দিলেন। এর পাশাপাশি তারা উভয়েই মুরাবিতুনদের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য নিজ নিজ শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে শুরু করলেন।

এই সংবাদগুলো ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে নিয়মিত পৌঁছাচ্ছিল। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে, বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদ মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সাহসকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। জালাকার মতো মহান যুদ্ধে জয়লাভ করার পরও তারা এই যোগ্য ছিল না যে নিজেদের বিলাসগৃহ থেকে বেরিয়ে সীমান্তের হেফাজতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে। আর পরিস্থিতি যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে আন্দালুসের মুসলমানরা খুব শীঘ্রই খ্রিস্টানদের দাসে পরিণত হবে। পরিশেষে মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের সাথে আঁতাত করে তারা অকৃতজ্ঞতার এক অত্যন্ত ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এই পরিস্থিতিতে ইউসুফ বিন তাশফিন কেবল আফ্রিকা নয়, বরং অন্যান্য দেশের প্রখ্যাত আলেমদের কাছেও ফতোয়া চাইলেন যে, মুলুকুত তাওয়ায়েফদের ক্ষমতাচ্যুত করা জায়েজ কি না। যেসব আলেম এটি জায়েজ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বাগদাদের ইমাম গাজালি এবং মিশরের আবু বকর তুরতুশির মতো ইলমের পাহাড়তুল্য ব্যক্তিত্বরূপে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কারণ এটি ছাড়া আন্দালুসের মুসলমানদের কাফেরদের দাসত্ব থেকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না। [১]

এই দিনগুলোতে মুতামিদ স্বপ্নে দেখলেন যে, কোনো এক ব্যক্তি জামে কর্ডোভার মিস্বরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছে:

سَكَتَ الدَّهْرُ زَمَانًا عَنْهُمْ ... ثُمَّ أَبْكَاهُمْ دِمَاءٌ حِينَ نَطَقَ

“কালচক্র দীর্ঘকাল তাদের অবস্থায় নীরব ছিল... অতঃপর যখন সে কথা বলল, তখন তাদের রক্তের অশ্রু বারিয়ে ছাড়ল।”

মুতামিদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তার রাজত্ব চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। [২]

মুলুকুত তাওয়ায়েফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ:

৪৮৩ হিজরিতে আমীরুল মুরাবিতুন নতুন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির সাথে তৃতীয়বারের মতো আন্দালুসে পা রাখলেন। এবার তিনি স্থানীয় আমিরদের আমন্ত্রণে নয়, বরং তাদের দমন করার জন্য এসেছিলেন। তার আগমনের আগেই মুতামিদ বিন আব্বাদ, উমর আল-মুতাওয়াফ্কিল এবং আবদুল্লাহ বিন বুলকিন মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ আলফনসোর সাথে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের চুক্তি সম্পন্ন করেছিলেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন তবুও মুলুকুত তাওয়ায়েফদের একটি সুযোগ দিলেন এবং তাদের কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে সরাসরি খ্রিস্টানদের এলাকার দিকে অগ্রসর হলেন, যাতে কারো মধ্যে দ্বীনি আত্মমর্যাদা থাকলে সে তাদের সাথে এসে যোগ দেয়। তিনি কাস্টিলের সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালাতে চালাতে টলেডো পর্যন্ত চলে গেলেন, যা তখন কাস্টিলের রাজধানী এবং ষষ্ঠ আলফনসোর সদর দপ্তর ছিল। মুরাবিতুনরা বেশ কয়েক দিন টলেডোর সামনে লড়াই চালিয়ে গেলেন, কিন্তু মুলুকুত তাওয়ায়েফদের কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে এল না। এভাবে ষষ্ঠ আলফনসোর সাথে তাদের জোট কার্যত প্রমাণিত হয়ে গেল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৩৩৫ থেকে ৩৩৮

[২] আল-ছল্লাতুস সিয়ারা: ২/ ৬৩

অবশেষে ইউসুফ বিন তাশফিন অবরোধ ছেড়ে গ্রানাডার দিকে যাত্রা করলেন, যেখানে আবদুল্লাহ বিন বুলকিন খ্রিস্টানদের সমর্থনে মুরাবিতুনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। গ্রানাডার সম্মানিত মুফতিগণ এই পরিস্থিতিতে আবদুল্লাহকে পদচ্যুত করার ফতোয়া দিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহর খাস খাদেম মুয়াম্মিল নিজেই এসে ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে আলফনসোর সাথে তার গোপন চুক্তির রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ বিন তাশফিন গ্রানাডা অবরোধ করলে আবদুল্লাহ বিন বুলকিন বেশিদিন প্রতিরোধ করতে পারলেন না এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন। মুরাবিতুনদের আমির তাকে প্রাণের নিরাপত্তা দিয়ে গ্রেপ্তার করলেন। এটি হিজরি ৪৮৩ সালের রজব মাসের ঘটনা। এর সাথে সাথেই গ্রানাডার উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ জনগণ আন্দালুসের ত্রাণকর্তার কাছে বায়আত হওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মালগার উলামায়ে কেরামও আবদুল্লাহর ভাই তামীম বিন বুলকিনের জুলুম এবং খ্রিস্টান-খ্রীতির কারণে অতিষ্ঠ হয়ে রুখে দাঁড়ালেন এবং শীঘ্রই মুরাবিতুনদের অন্য একটি বাহিনী মালগা আক্রমণ করে তামীমকে গ্রেপ্তার করে নিল।

আমির ইউসুফ মুলুকুত তাওয়ায়েফদের আন্দালুসে রাখা সমীচীন মনে করলেন না এবং অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে তাদের জন্য মরক্কোর “আগমাথ” নামক জনপদে একটি আলাদা কারাগার নির্মাণ করালেন। মুলুকুত তাওয়ায়েফদের প্রতিটি পরিবারের জন্য বেশ কয়েকটি বাড়ি সম্বলিত আলাদা আলাদা মহল্লা তৈরি করা হলো। আবদুল্লাহ বিন বুলকিন এবং তার ভাই তামীম সর্বপ্রথম এই কারাগারের মেহমান হলেন। আবদুল্লাহ বিন বুলকিন কয়েক বছর পর এই ইমারতেই মৃত্যুবরণ করেন, অন্যদিকে তার ভাই তামীমকে ক্ষমা করে মুক্তি দেওয়া হয়। হিজরি ৪৮৮ সালে তিনি মরক্কোতেই ইন্তেকাল করেন।

গ্রানাডায় মুরাবিতুনদের দখলের সংবাদে সেভিল এবং বাদাজোজের রাজপ্রাসাদগুলোও কেঁপে উঠল। উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল এবং মুতামিদ গ্রানাডায় পৌঁছালেন যাতে ইউসুফ বিন তাশফিনকে বিজয়ের মোবারকবাদ জানানোর পাশাপাশি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নবায়ন করতে পারেন, কিন্তু তারা আমিরের মনোভাব পরিবর্তিত দেখতে পেলেন। তাদের কোনো প্রকার অভ্যর্থনা ছাড়াই বিদায় করে দেওয়া হলো। উভয়েই বুঝতে পারলেন যে, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ইউসুফ বিন তাশফিন হিজরি ৪৮৩ সালের রমজান মাসে সীর বিন আবু বকর এবং অন্যান্য আমিরদের মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সাথে মোকাবিলা করার তাগিদ দিয়ে পুনরায় মরক্কোর দিকে যাত্রা করলেন এবং সেউতা ছাউনি থেকে মুরাবিতুনদের সতেজ বাহিনী আন্দালুসে পাঠানোর ধারা শুরু করলেন। সীর বিন আবু বকর শাওয়াল মাসে সেভিল রাজ্যের শহর জাইন এবং রন্ডা দখল করে নিলেন। মুতামিদের আহ্বানে কাস্টিলীয় বাহিনী মুরাবিতুনদের বাধা দিতে আসলেও তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। [১]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/৩২৫

মুতামিদ, জাইদা এবং রানী এলিজাবেথ: এখানে একটি ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করে নেওয়া জরুরি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুতামিদ বন্ধুত্বের খাতিরে আলফনসোর কাছে তার এক মেয়েকে, যার নাম ছিল “জাইদা”, বিয়ে দিয়েছিলেন এবং তার গর্ভেই আলফনসোর একমাত্র পুত্র “সানচো” জন্মগ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই বর্ণনাটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। আরবি ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদি এমনটি হতো, তবে আবু হাইয়ান, ইবনে আযারি এবং আল-মাক্কারির মতো ঐতিহাসিকগণ, যারা প্রতিটি বিষয় সংগ্রহ করেছেন, তাদের পক্ষে এত বড় একটি অসম্ভাবিক ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

প্রমাণিত সত্য শুধু এতটুকুই যে, একজন মুসলিম নারী থেকে, যে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল অথবা যাকে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়েছিল, আলফনসোর পুত্র সানচো (বাকি অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরগুলো বিজয়ের পর সীর বিন আবু বকর হঠাৎ কর্ডোভায় পৌঁছে যান, যেখানে মুতামিদের ছেলে ফাতহ আল-মামুন মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসে কিন্তু পরাজিত হয়ে নিহত হয়। ২৩ সফর ৪৮৪ হিজরিতে মুরাবিতুন বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে কর্ডোভায় প্রবেশ করে।

এরপর মুরাবিতুন সেভিল (ইশবিলিয়া) অবরোধ করে। ইউসুফ বিন তাশফিন সীর বিন আবু বকরকে তাকিদ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন আলোচনার মাধ্যমে মুতামিদকে রাজি করান যে, যদি সে আত্মসমর্পণ করে তবে তাকে তার পরিবার-পরিজন ও সমস্ত ধন-সম্পদসহ মরক্কোতে আরামদায়ক জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু মুতামিদের আলফনসো ষষ্ঠের ওয়াদার ওপর বিশ্বাস ছিল যে, সে মুরাবিতুনদের থেকে যাল্লাকার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে অবশ্যই সেভিলে আসবে। তাই সে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের পথ বেছে নেয়।

সীর বিন আবু বকর কয়েক সপ্তাহ ধরে সেভিল অবরোধ করে রাখেন। হঠাৎ তিনি খবর পান যে, কাস্তালিয়া থেকে বিশ হাজার অশ্বারোহী এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। সীর ইব্রাহিম বিন আল-হকের নেতৃত্বে দশ হাজার বাছাইকৃত অশ্বারোহী পাঠিয়ে কাস্তালিয়ার বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এভাবে মুতামিদের শেষ আশাটুকুও শেষ হয়ে যায়।

সেভিলের প্রাচীর চার মাস পর্যন্ত অপরাজেয় ছিল। অবশেষে সীর বিন আবু বকর শহরে অবস্থানরত তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমে প্রাচীরের একটি দুর্বল অংশের সন্ধান পান এবং তা মিনজানিক দিয়ে ভেঙে ফেলেন। মুতামিদ এই খবর পাওয়া মাত্রই বর্ম পরিধান না করেই উঠে দাঁড়ান এবং দৌড়ে সেই ফাটলের কাছে পৌঁছে যান। তিনি তলোয়ার ও বর্শার নৈপুণ্য দেখিয়ে মুরাবিতুনদের ভেতরে প্রবেশ করা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখেন যতক্ষণ না ফাটলটি মেরামত করা হয়। তবে সেই দিনই মুরাবিতুনরা ওয়াদিউল কাবীর নদীতে মুতামিদের নৌবহর ধ্বংস করে দেয়, যার পর ২২ রজব ৪৮৪ হিজরিতে চূড়ান্ত আঘাত হানা হয় এবং নদীর পথ দিয়ে মুরাবিতুনরা শহরে প্রবেশ করে। মুতামিদ প্রাসাদের চার দেয়ালের ভেতরে পাগলের মতো লড়তে থাকেন যাতে বন্দি হওয়ার লাঞ্ছনার আগেই মারা যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে জীবিত ধরে ফেলা হয়। তিনি আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শরীয়তের বিধানের কথা বিবেচনা করে তা থেকে বিরত থাকেন। তার চার ছেলে: মামুন, রাযী, মুতামিদ এবং মালিক বিভিন্ন সংঘর্ষে ইতিপূর্বেই নিহত হয়েছিল। তবে সীর বিন আবু বকর মুতামিদ এবং তার অবশিষ্ট পরিবার-পরিজনকে প্রাণের নিরাপত্তা দান করেন।

মুতামিদ, তার রানী রুমাইকিয়া এবং তার কন্যাদের বন্দি করে নৌকায় তোলা হয়। ওয়াদিউল কাবীর নদীর দুই তীরে মানুষের ভিড় তাদের বিদায়ের এই শিক্ষণীয় দৃশ্য দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে বনু আব্বাদের দ্বারা নির্যাতিত লোকেরাও ছিল এবং তারা...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাদটীকার অবশিষ্টাংশ) জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই মহিলার নাম কী ছিল? তিনি কি মুতামিদের কন্যা ছিলেন? প্রাচীন ঐতিহাসিক উৎসগুলোতে কোথাও এর উল্লেখ নেই। ইবনে আযারি ‘আল-বায়ান আল-মুগরিব’-এ ৫০১ হিজরির ঘটনাবলির অধীনে এতটুকু লিখেছেন যে, আলফনসোর ছেলে শানজাহ, মামুন বিন মুতামিদের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু মুতামিদের এই পুত্রবধূ আলফনসোর কাছে কীভাবে পৌঁছালেন? এর উত্তর কোথাও পাওয়া যায় না। যুক্তির খাতিরে দেখলে, আজকের দিনের অধঃপতিত মুসলমানরাও এমন নয় যে তারা তাদের পুত্রবধূ বা কন্যাদের কাফেরদের কাছে বিয়ের জন্য পেশ করবে, তাহলে মুতামিদের মতো শরীফ ব্যক্তিদের কাছ থেকে এমনটি কীভাবে আশা করা যায়? প্রবল ধারণা এটাই যে, কোনো যুদ্ধে এই মেয়েটি বন্দি হয়ে আলফনসোর হাতে পড়েছিলেন। কিছু পশ্চিমা ঐতিহাসিক মুসলিম শাসকদের অপমান করার জন্য নিজেদের পক্ষ থেকে এই কথা বাড়িয়ে বলেছেন যে, এটি মুতামিদের কন্যা ছিলেন যাকে বন্ধুত্বের চুক্তিস্বরূপ পেশ করা হয়েছিল। যেহেতু আজকের দিনের ঐতিহাসিকরা প্রাচ্যবিদদের (Orientalists) প্রতিটি কথা চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে নেন, তাই পশ্চিমের এই মনগড়া বর্ণনা বর্তমান ইতিহাসগুলোতে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। অধিকন্তু, এখন ব্রিটেনের রানী এলিজাবেথকেও যাইদার মাধ্যমে মুতামিদের বংশধর সাব্যস্ত করে “সায়িাদানি” বলা শুরু হয়েছে, অথচ মুতামিদ ছিলেন ইয়ামানি; হাশেমী তো দূরের কথা, তিনি কুরাইশও ছিলেন না। তার গোত্র বনু লাখম ইয়ামানের আরব গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এই লোকদের সাথে হাশেমী বা কুরাইশ পরিবারের কোনো বংশীয় সম্পর্ক নেই।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা, পৃষ্ঠা ৫৬৩

কবিগণও, যাদের ওপর মুতামিদের অনুগ্রহ বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো। একজন কবি আবু বকর বিন লুবানা এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন:

نَسِيتُ الْأَعْدَةَ النَّهَرَ نَحْوَهُمْ ... فِي الْمُنْشَاتِ كَأَمْوَاتٍ بِالْحَادِ

“আমি সবকিছু ভুলে গেছি কিন্তু নদীর সেই সকালটি ভুলতে পারিনি যখন তাদের নৌকাগুলোতে এমনভাবে রাখা হয়েছিল যেন মৃতদের কবরে রাখা হচ্ছে।”

وَالنَّاسُ قَدْ مَلُّوا الْعَبْرَيْنِ وَاعْتَبَرُوا ... مِنْ لَوْلُؤِ طَافِيَاتٍ فَوْقَ أَزْبَادِ

“মানুষ উভয় তীরে সমবেত হয়ে সেই মুক্তাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছিল যা ঢেউয়ের কাঁধে ভেসে উঠেছিল।”

سَارَتْ سَفَائِنُهُمْ وَالنَّوْحُ يَتَّبِعُهَا ... كَأَنَّهَا إِبِلٌ يُحْدِي بِهَا الْحَادِي

“নৌকাগুলো তাদের নিয়ে চলতে শুরু করল কিন্তু বিলাপ ও কান্নার শব্দ তাদের অনুসরণ করতে থাকল যেন এটি উটের কোনো কাফেলা যাকে হুদি গায়করা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।”

মুতামিদকে পরিবার-পরিজনসহ সমুদ্রপথে মরক্কো পাঠিয়ে দেওয়া হলো যেখানে আগমাতের বিশাল কারাগার তার অপেক্ষায় ছিল। এভাবেই বনু আব্বাদের জাদুকরী শাসন একটি বিস্মৃত উপাখ্যানে পরিণত হয়ে ইতিহাসের ধুলোয় মিশে গেল। [১]

+++

আগমাতের কারাগার:

মরক্কো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে তুষারাবৃত চূড়াবিশিষ্ট এটলাস পর্বতমালার পাদদেশে “আগমাত” আজও একটি বিখ্যাত জনপদ। ৪৮৪ হিজরির শেষের দিকে আগমাত পৌঁছানোর পর মুতামিদের জীবনের সেই অধ্যায় শুরু হলো, যখন তিনি সব ধরনের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি আকাশ থেকে জমিনে নেমে এসেছিলেন এবং এখন পৃথিবীর বাস্তবতা এবং প্রকৃত দুঃখ-বেদনা তার কাব্যিক সংবেদনশীলতার সাথে আরও অনেক বেশি গভীরতার সাথে অনুভব করতে পারছিলেন। তার অবশিষ্ট জীবন ছিল একজন অগ্নিহৃদয় কবির জীবন যার প্রতিটি কবিতা ছিল অশ্রু উদ্বেককারী। মুতামিদ এই সময়ে মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তা তাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

১. আগমাত যাওয়ার পথে মুতামিদ কিছু লোককে দেখলেন যারা বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিল। মুতামিদ বললেন:

خَرَجُوا لِيَسْتَسْقُوا فَقُلْتُ إِلَيْهِمْ ... دَمْعِي يَنْوِبُ لَكُمْ عَنِ الْأَنْوَاءِ

“মানুষ বাইরে বেরিয়ে এল যাতে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে পারে, তখন আমি বললাম: আমার অশ্রু তোমাদের জন্য বৃষ্টির কাজ করবে।”

قَالُوا حَقِيقٌ فِي دُمُوعِكَ مَقْنَعٌ ... لَكِنَّهَا مَمْزُوجَةٌ بِدِمَاءٍ

“লোকেরা বলল: “এটা সত্য যে আপনার অশ্রুই যথেষ্ট কিন্তু তাতে রক্ত মিশে আছে।” [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৩৬২-৩৬৩

[২] খারিদাতুল কাসর ওয়া জারিদাতুল আসর কিসম: শুআরাউল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস: ৩৯/১

ঈদের দিন তার কন্যারা যখন তাকে সালাম করতে উপস্থিত হলো, তখন তাদের মলিন মুখ দেখে তিনি নিজেকে বললেন:

“অতীতের ঈদগুলোতে তুমি আনন্দিত হতে... তবে কি আঘমাতের বন্দিদশায়ও ঈদ তোমাকে আনন্দ দিয়েছে?”

“তুমি তোমার কন্যাদের জীর্ণ পোশাকে ক্ষুধার্ত দেখছ... তারা মানুষের জন্য সুতা কাটছে, তাদের কাছে তুচ্ছ কোনো বস্তুও নেই।”

“তারা নগ্ন পায়ে মাটিতে হাঁটছে... যেন তারা কখনো মিশক ও কর্পূরের ওপর চলেনি।”

“তোমার পর যে ব্যক্তি রাজত্ব পেয়ে আনন্দিত হয়... সে তো প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।”

“তুমি এমন ঈদ অতিবাহিত করলে যার অকল্যাণ যেন আর ফিরে না আসে... কেননা তোমার এই ঈদ কলিজাকে বিদীর্ণ করে দেওয়ার মতো।” [১]

কিছু লোক তার কাছে পীড়াপীড়ি করে সম্পদ চাইল, তখন তিনি বলতে লাগলেন:

“লোকেরা বন্দীর কাছে সামান্য দান চাইল... অথচ তাদের চেয়ে এই দান পাওয়ার অধিক হকদার ও যোগ্য হলো এই বন্দী, আশ্চর্যের বিষয়!”

“যদি লজ্জা ও আত্মমর্যাদাবোধ অন্তরে গোপন না থাকত, তবে এই বন্দীই তাদের কাছে নিজের অভাবের কথা জানাত।”

একজন বিজ্ঞ ও গুণী বন্ধু দেখা করতে এলেন, তিনি বিদায় নেওয়ার সময় তাকে বিশ দিনার দিলেন এবং বললেন:

“এক বন্দীর হাত থেকে এটি আপনার প্রতি নজরানা... যদি আপনি তা গ্রহণ করেন তবে এটি আপনার মহানুভবতা হবে।”

“আপনি এই উপহার গ্রহণ করুন যা প্রদানকারীর লজ্জায় ঘাম ঝরিয়ে দিচ্ছে... যদিও দরিদ্র অবস্থা তার ওজর বা অপারগতা।” [২]

[১] নাফহত তীব: ৩/৪৭৩

[২] জরীদাতুল কাসর ওয়া জরীদাতুল আসর, বিভাগ: শুআরাউল মাগরিব ওয়াল আন্দালুস: ১/৩০৫-৩০৭

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ দিনার একটি বিশাল অংকের অর্থ ছিল, যা বর্তমান সময়ের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার লারা (এগারো লক্ষ পাকিস্তানি রুপি)-র সমান। এ থেকে বোঝা যায় যে, বন্দিদশায় মুতামিদের ওপর সাধারণ বন্দিদের মতো কঠোরতা ছিল না, অন্যথায় কারাগারে এত সম্পদ সাথে রাখা সম্ভব হতো না। দৃশ্যত এই অর্থ তাকে সহানুভূতিশীল আমীররা প্রদান করতেন এবং মুতামিদও উদারতার সাথে সেই হাদিয়া বা উপহার আলেম ও অভাবীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এ থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, মুতামিদের সাথে সাক্ষাৎ এবং উপহার আদান-প্রদানের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না।

কারাগারে মুতামিদের আত্ননাদ:

মুতামিদের বেদনাদায়ক কবিতা আল্লামা ইকবালকেও প্রভাবিত করেছিল এবং তিনি তার কিছু পঙক্তিকে উর্দুতে এভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন:

একটি স্ফুলিঙ্গহীন আত্ননাদ বক্ষে অবশিষ্ট রয়ে গেছে

দহনও বিদায় নিয়েছে, প্রভাবও চলে গেছে

মুক্ত পুরুষ আজ কারাগারে বর্শা ও তলোয়ারহীন

আমি লজ্জিত, লজ্জিত আমার কৌশলও

হৃদয় নিজে থেকেই শিকলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে

হয়তো আমার তলোয়ারও এই ইস্পাত দিয়েই তৈরি ছিল [১]

মুতামিদের কন্যার ঘটনা:

মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার বিবাহে বুসাইনা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল, যে তার পিতামাতার মতো বাগ্মী ও সুবক্তা ছিল। বিপ্লবের সময় সে হারিয়ে যায়। কেউ তাকে অপহরণ করে বিক্রি করে দেয়। তাকে ক্রয়কারী ব্যক্তি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী, যিনি তাকে তার পুত্রকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। যুবকের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বুসাইনা তার কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে, সে একজন স্বাধীন মেয়ে যাকে জোরপূর্বক বিক্রি করা হয়েছে; সে বিবাহ ব্যতীত কোনো পরপুরুষকে তার শরীর স্পর্শ করতে দেবে না।

এরপর যখন সে জানাল যে সে প্রাক্তন রাজা মুতামিদের কন্যা, তখন যুবকটি অবাক হয়ে গেল। বুসাইনা তাকে বলল যে সে বিবাহের জন্য তার পিতামাতার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। সে একটি কাব্যিক চিঠি লিখে তার পিতার কাছে পাঠাল, যাতে তার এই কবিতাগুলো ছিল:

لا تُكْرُوا أَنِّي سَيِّتٌ وَأَنْتِي ... بِنْتُ مَلِكٍ مِنْ بَنِي عَبَّادٍ

“আপনি অবাক হবেন না যে আমি বন্দিনী হয়েছি, যদিও আমি বনু আব্বাদের এক রাজার কন্যা।”

لَمَّا أَرَادَ اللَّهُ فُرْقَةَ شَمْلَنَا ... وَأَذَاقَنَا طَعْمَ الْأُسَى عَنْ زَادٍ

“যখন আল্লাহ আমাদের ঐক্যকে ছিন্ন করতে চাইলেন এবং সফরের খাবারের পরিবর্তে আমাদের নিঃস্বতার স্বাদ আস্বাদন করালেন।”

نَخَرَجْتُ هَارِبَةً فَخَازَنِي امْرُؤٌ ... لَمْ يَأْتِ بِالْعَجَالِ بِسَدَادٍ

“তখন আমি পালিয়ে বের হলাম, এরপর এক ব্যক্তি আমাকে ধরে ফেলল যে তার তাড়াহুড়োতে সঠিক কাজ করেনি।”

إِذْ بَاعَنِي بَيْعَ الْعَبِيدِ فَضَمَّنِي ... مَنْ صَانِنِي إِلَّا مِنَ الْأَنْكَادِ

“কেননা সে আমাকে ক্রীতদাসের মতো বিক্রি করে দিল, এরপর আমাকে এমন লোকদের কাছে পৌঁছাল যারা আমাকে কেবল দারিদ্র্যই দিয়েছে।”

وَأَرَادَنِي لِنِكَاحِ نَجْلٍ طَاهِرٍ ... حَسَنِ الْخِلَائِقِ مِنْ بَنِي الْأَنْجَادِ

“এবং আমার বিবাহ এক পবিত্র, সচ্চরিত্র এবং উচ্চবংশীয় পরিবারে করাতে চাইল।”

[১] বাল-ই-জিবরীল, পৃষ্ঠা ১০৬।

এখন সে আপনার দিকে মনোনিবেশ করে আপনার মতামত জানতে চায়, কারণ আপনি আমার জন্য কল্যাণের পথ দেখতে পারেন।

অতএব হে আব্বাজান! আশা করি আপনি এই ব্যক্তিকে চিনে নেবেন যদি সে আত্মীয়তার জন্য উপযুক্ত হয়।

আর আশা করি যে, রানী রুমাইকিয়া তাঁর মেহেরবানির সাথে... আমাদের জন্য বরকত ও কামিয়াবির দোয়া করতে থাকবেন।

মুতামিদ এবং তাঁর স্ত্রী রুমাইকিয়া তাঁদের এই কলিজার টুকরার জীবন বা মৃত্যু সম্পর্কে বেখবর এবং তাঁকে ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ ছিলেন। এই চিঠি পাওয়ার পর তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। মুতামিদ ফিরতি চিঠিতে খুশিমনে এই সম্পর্কের অনুমতি দিয়ে দিলেন। [১]

বন্দিশালার জীবন থেকে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন রুমাইকিয়া মুতামিদকে বলতে লাগলেন: “তুমি আমার সাথে কখনো কোনো ভালো ব্যবহার করোইনি।” মুতামিদ ধীরে থেকে বললেন: “সেই কাদা মাখা দিনেও কি নয়?” রুমাইকিয়া লজ্জিত হলেন এবং তাঁর রাগ ফেনার মতো থিতুয়ে গেল। [২]

মুতামিদ ও রুমাইকিয়ার মৃত্যু:

মুতামিদ ও রুমাইকিয়া চার বছর পর্যন্ত বন্দি জীবনের কঠোর সময় অতিবাহিত করেন। শেষ দিনগুলোতে মুতামিদের পায়ে বেড়িও পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ তাঁর এক ছেলে আবদুল জব্বার কাসতালিয়ার সাহায্যে আন্দালুসের একটি দুর্গ দখল করে বিদ্রোহ করেছিল। যদিও সির বিন আবু বকর দ্রুতই তা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যদিকে এমন তথ্যও পাওয়া গিয়েছিল যে, মুতামিদের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই কারণে মুতামিদকে শিকল পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিছু দিন পর মুতামিদের একমাত্র দুঃখের সাথী তাঁর জীবনসঙ্গিনী উম্মুর রবি (রুমাইকিয়া) ইন্তেকাল করেন। মুতামিদও এরপর বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। ১১ শাওয়াল ৪৮৮ হিজরিতে একদিন তিনি নীরবে তাঁর ক্ষতবিক্ষত রুহ খালেক-এ-হাকিকির নিকট সোপর্দ করেন। তাঁর কবর রুমাইকিয়ার পাশেই তৈরি করা হয়। [৩]

আগমাতে দুটি কবর:

মুতামিদ একজন সফল শাসক না হলেও একজন উচ্চমানের কবি অবশ্যই ছিলেন, এই কারণেই তাঁর মৃত্যুর পর বড় বড় বাগ্মী ও কবিগণ তাঁর কবরে এসে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকেন। আবু বকর নামক এক কবি ঈদের দিন তাঁর কবরে এসে বলতে লাগলেন:

[১] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাকারি আত-তিলমিসানি: ৩ / ২৮৩

[২] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাকারি আত-তিলমিসানি: ৩ / ৪৪০/১, ২৭৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২ / ৩৬০; আল-হিল্লাতুস সিয়ারা: ৬৩/২; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ১ / ৩৩৩

“যখন রাজপ্রাসাদ আপনার থেকে শূন্য হয়ে গেল এবং আপনি সেখানে ছিলেন না যেমনটি আপনি বিগত উৎসবগুলোতে থাকতেন।”

“আমি আপনার সামনে বিনম্র হয়ে এই মাটি চুম্বন করলাম এবং আপনার কবরকে কবিতা আবৃত্তির মজলিস বানিয়ে নিলাম।” [১]

এই কবিতাগুলো পড়ার সময় সে নিজেও কাঁদতে কাঁদতে বেহাল হয়ে পড়ল এবং উপস্থিতদেরও অশ্রুসিক্ত করে দিল। মুকতাদির এবং রুমাইকিয়ার কবরগুলো আজও তুষারাবৃত পাহাড়ের পাদদেশে জলপাই ও ডুমুর গাছে ঘেরা আগমাত শহরে শিক্ষণীয় দৃশ্য হয়ে রয়েছে। মরহুম মিশরীয় ঐতিহাসিক আবদুল্লাহ ইনান (সাতিবে দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস) ১৯৫৬ সালে মরক্কো সফরের সময় এই কবরগুলো দেখেছিলেন এবং সেগুলোর নির্জনতা ও জনশূন্যতা দেখে তাঁর মনও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। [২]

দেখো তো, হৃদয় থেকে নাকি প্রাণ থেকে উঠছে,

এই ধোঁয়ার মতো কোথা থেকে উঠছে?

হে আকাশ, এটি কোন দগ্ধ হৃদয়ের কবর,

যেখান থেকে প্রতিদিন সকালে একটি শিখা উঠছে। [৩]

পূর্ব আন্দালুসের মুলুকুত তাওয়ায়েফের সমাপ্তি:

আলমেরিয়ার পর বাকি মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে বিশেষ কোনো শক্তি ছিল না। মুতাসিমের মৃত্যুর পর বনু সামাদিহও খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তাই মুরাবিতুন সেনাপতি দাউদ বিন আইশা শাওয়াল ৪৮৪ হিজরিতে তাদের কাছ থেকে আলমেরিয়া কেড়ে নেন। পরের বছর শাতিবা, শাকুরা এবং দানিয়াও জয় করে নেওয়া হয়। [৪]

শাকুরা এবং দানিয়া তখন মুরকাসতাহ রাজ্যের অংশ ছিল। মুকতাদির বিন হুদ মৃত্যুর আগে তাঁর রাজ্যকে দুই ভাগে এভাবে ভাগ করেছিলেন যে, রাজধানী ও উত্তর জেলাগুলো উত্তরাধিকারী ইউসুফ মুতামিনকে এবং পূর্ব জেলাগুলো ছোট ছেলে মুনজির বিন হুদকে দিয়েছিলেন। মুনজির বিন হুদ ৪৮৩ হিজরিতে মারা গিয়েছিলেন এবং শাসনভার তাঁর নাবালক পুত্র সাদ উদ-দৌলার নামে হয়ে গিয়েছিল। যা-ই হোক, ৪৮৫ হিজরিতে মুরাবিতুন সেনাপতি ইবনে আইশা এই পুরো এলাকা জয় করে নেন, যার ফলে ইউসুফ আল-মুতামিন মুরকাসতাহ-তে এই ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন যে তাঁর দিনও ঘনিয়ে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে তিনি মুরকাসতাহ-র প্রাচীন খ্রিস্টান মিত্র সিড এবং খ্রিস্টান রাজ্য: আরাগন ও নাভারে-র সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন। এই চুক্তির আড়ালে সিড-কে

[১] নাফহত তিব মিন গুসনীল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/ ৩৫৯

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৩৬৩

[৩] মীর তাকি মীর

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৪৪০, ৪৪১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ৪০১, ৪০৫, তাবা দারুল ফিকর

সুযোগ পেল এবং সে পূর্ব আন্দালুসে প্রবেশ করে ৪৮৭ হিজরিতে বালেঙ্গিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর দখল করে নিল। [১]

বনু আফতাস রাষ্ট্রের পতন

অন্যদিকে সির বিন আবু বকর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহরগুলো জয় করছিলেন। বাতালইউস-এর শাসক উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল যখন দেখলেন যে মুরাবিতুনরা তার কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছে, তখন তিনি ষষ্ঠ আলফনসোর সাথে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন এবং এর বিনিময়ে তাকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ: ইশবুনাহ, শাতরাহ এবং শানতারিন দিয়ে দেন। এই পদক্ষেপে বাতালইউসের জনগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা মুরাবিতুনদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। অবশেষে সির বিন আবু বকর ৪৮৮ হিজরিতে বাতালইউস আক্রমণের জন্য সেনাবাহিনী পাঠান। উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল পরাজিত হন এবং তার দুই পুত্রসহ গ্রেফতার হন। তাকে তার পুত্রদেরসহ হত্যা করা হয়। এভাবে মুরাবিতুনরা বনু আফতাস শাসনের অবসান ঘটায়। মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোতে কেবল বনু হুদ-এর শাসন অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল, যারা মুরাবিতুনদের আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল।

[২]

+++

মুলুকুত তাওয়ায়েফ - তালিকা

এই তালিকা থেকে জানা যাবে যে মুলুকুত তাওয়ায়েফ প্রতিষ্ঠার ধারা কখন শুরু হয়েছিল এবং কোন প্রদেশ বা শহর কোন বছর স্বাধীন হয়েছিল।

নম্বর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্নতা

১ বালেঙ্গিয়া মুবারক আমেরি, মুজাফফর আমেরি ৪০০ হিজরিতে

২ দানিয়া, বালিয়ার মুজাহিদ আল-আমেরি ৪০০ হিজরিতে

৩ আল-বুয়ান্তু (আল-পান্ত) আবদুল্লাহ বিন কাসিম ৪০০ হিজরিতে

৪ আরকাশ বনু খাযরুন ৪০০ হিজরিতে

৫ ওয়ালবাহ আবু যায়েদ আবদুল আজিজ আল-বাকরি ৪০৩ হিজরিতে

৬ গ্রানাডা যাওয়ি বিন যিরি ৪০৩ হিজরিতে

৭ শানতারিয়া আল-শারক (সান্তামারিয়া) ছয়াইল বিন আবদুল মালিক ৪০৩ হিজরিতে

৮ মুরু নুহ বিন আবি তাযিরি দামরি ৪০৩ হিজরিতে

৯ কারমুনাহ খাইরান আমেরি ৪০৩ হিজরিতে

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ২/ ২৮৯-২৯০

[২] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ৪০৫, তাবা দারুল ফিকর; ফিকহত তামকিন ইনদা দাওলাতিল মুরাবিতিন লিস-সাল্লাবি: পৃ. ১২২ থেকে ১২৪

৫৬৯

১০. কারতুনা — আবু মুহাম্মদ বিন বারজাল ৪০৫ হিজরিতে

১১. আলমেরিয়া — খাইরান আমিরি ৪০৫ হিজরিতে

১২. রন্দা — বানু ইফরান ৪০৬ হিজরিতে

১৩. সারাগোসা — মুনজির বিন ইয়াহইয়া তুজিবি ৪০৮ হিজরিতে

১৪. বাদাজোজ — আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মাসলামাহ ইবনুল আফতাস ৪১৩ হিজরিতে

১৫. সেভিল — মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন আব্বাদ ৪১৪ হিজরিতে

১৬. নিবলা — আহমদ বিন ইয়াহইয়া ৪১৪ হিজরিতে

১৭. বেজা — হাজিব বিন মুহাম্মদ ৪২২ হিজরিতে

১৮. টলেডো — বানু যুন-নুন ৪২৩ হিজরিতে

১৯. সান্তা মারিয়া আল-গার্ব — আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ বিন হারুন ৪৩৩ হিজরিতে

২০. বারবাস্ত্রো — ইউসুফ বিন সুলাইমান ৪৩৮ হিজরিতে

মুলুকুত তাওয়াইফের গুরুত্বপূর্ণ সরকারসমূহ এবং তাদের প্রধানগণ

বানু হাম্মুদ — মালাগা ও কর্ডোভা (দক্ষিণ ও মধ্য আন্দালুস)

এরা ছিলেন আলভী এবং মরক্কোর রাজকীয় পরিবার ‘আদারিসা’ (ইদ্রিসীয়)-এর বংশধর। আলী বিন হাম্মুদ আন্দালুসের উমাইয়াদের পক্ষ থেকে মরক্কোর সেউতা শহরের গভর্নর ছিলেন। ৪০৬ হিজরিতে তিনি আন্দালুসে এসে মালাগা দখল করেন। এরপর কর্ডোভা অধিবাসীদের আমন্ত্রণে সেখানকার সিংহাসন গ্রহণ করেন, কিন্তু ৪০৮ হিজরিতে কর্ডোভার অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে তিনি নিহত হন। তার ভাই কাসিম বিন হাম্মুদ এবং পুত্র ইয়াহইয়া মুতালি কিছু সময়ের জন্য পর্যায়ক্রমে দুইবার করে কর্ডোভার শাসক ছিলেন, কিন্তু কাসিম ইয়াহইয়ার হাতে বন্দী হন। অন্যদিকে ৪১৭ হিজরিতে ইয়াহইয়া মুতালি কর্ডোভা থেকে বিতাড়িত হয়ে মালাগা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন। এরপর এই শাসন তার বংশধরদের মধ্যে চলতে থাকে।

১. আবুল হাসান আলী বিন হাম্মুদ, আন-নাসির ৪০৭ হিজরি থেকে ৪০৮ হিজরি (১০১৬ খ্রি. থেকে ১০১৮ খ্রি.) মালাগা ছেড়ে কর্ডোভার শাসক হন।

- ২ | কাসিম বিন হামুদ, আল-মামুন | ৪০৮ হি. থেকে ৪১৪ হি. (১০১৮ খ্রি. থেকে ১০২১ খ্রি.) | কুরতুবাতে (কর্ডোভা) শাসন করেছেন।
- ৩ | ইয়াহইয়া বিন আলী, আল-মু'তালি | ৪১৩ হি. থেকে ৪১৪ হি. (১০২১ খ্রি. থেকে ১০২২ খ্রি.) | ইয়াহইয়া কুরতুবাতে এবং কাসিম ইশবিলিয়াতে (সেভিল)।
- | কাসিম বিন হামুদ (দ্বিতীয়বার) | ৪১৪ হি. থেকে ৪১৪ হি. (১০২২ খ্রি. থেকে ১০২৩ খ্রি.) | কুরতুবাতে পুনরায় শাসন। গ্রেফতার হন।
- | ইয়াহইয়া আল-মু'তালি (দ্বিতীয়বার) | ৪১৪ হি. থেকে ৪১৬ হি. (১০২৩ খ্রি. থেকে ১০২৫ খ্রি.) | মালকা (মালাগা), আল-খাজরা (আলজাসিরাস) এবং ইশবিলিয়াতে শাসন।
- | ইয়াহইয়া আল-মু'তালি (তৃতীয়বার) | ৪১৬ হি. থেকে ৪১৭ হি. (১০২৫ খ্রি. থেকে ১০২৬ খ্রি.) | কুরতুবা ও মালকাতে শাসন।
- | ইয়াহইয়া আল-মু'তালি (চতুর্থবার) | ৪১৭ হি. থেকে ৪২৭ হি. (১০২৬ খ্রি. থেকে ১০৩৫ খ্রি.) | মালকাতে শাসন; যুদ্ধে নিহত হন।
- ৪ | ইদ্রিস আউয়াল বিন আলী, আল-মুতাঈদ | ৪২৭ হি. থেকে ৪৩১ হি. (১০৩৫ খ্রি. থেকে ১০৩৯ খ্রি.) | সাবতার (সেউটা) ওয়ালী। মালকাতে নতুন শাসক।
- ৫ | ইয়াহইয়া বিন ইদ্রিস, আল-কাসিম | মহররম থেকে জমাদিউল আখির ৪৩১ হি. (১০৩৯ খ্রি.) | অল্পবয়স্ক ও অযোগ্য; ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিহত হন।
- ৬ | হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-মু'তালি, আল-মুস্তানসির | জমাদিউল আখির ৪৩১ হি. থেকে ৪৩৪ হি. (১০৩৯ খ্রি. থেকে ১০৪৩ খ্রি.) | বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।
- ৭ | ইদ্রিস বিন ইয়াহইয়া, আল-আলী | ৪৩৪ হি. থেকে ৪৩৮ হি. (১০৪৩ খ্রি. থেকে ১০৪৬ খ্রি.) | জেল থেকে সিংহাসনে আনা হয়েছিল। আলেম, ফাজিল, আদীব, নেক ও সালেহ কিন্তু দুর্বল স্বভাবের। চাচাতো ভাই মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আলী বিন হামুদ বিদ্রোহ করলে তিনি সাবতাতে চলে যান।
- ৮ | মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন আলী, আল-মাহদী | ৪৩৮ হি. থেকে ৪৪৪ হি. (১০৪৬ খ্রি. থেকে ১০৫২ খ্রি.) | বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।
- ৯ | ইদ্রিস বিন ইয়াহইয়া বিন ইদ্রিস আউয়াল, আল-সামি | ৪৪৪ হি. (১০৫২ খ্রি.) | কিছুকাল শাসন করেছেন।
- | ইদ্রিস বিন ইয়াহইয়া, আল-আলী (দ্বিতীয়বার) | ৪৪৫ হি. থেকে ৪৪৬ হি. (১০৫৩ খ্রি. থেকে ১০৫৩ খ্রি.) | নিজের ছেলেকে মুহাম্মদকে স্থলাভিষিক্ত করেন।
- ১০ | মুহাম্মদ সানি, আল-মুস্তালি | ৪৪৬ হি. থেকে ৪৪৯ হি. (১০৫৩ খ্রি. থেকে ১০৫৭ খ্রি.) | শেষ শাসক।

সমাপ্তি: ৪৩৯ হিজরিতে গ্রানাডার শাসক বাদিস বিন হাবুস মালাগা দখল করে বনু হাম্মুদ রাষ্ট্রের অবসান ঘটান। মুস্তালি আফ্রিকায় চলে যান এবং সেখানে ৪৫৬ হিজরিতে (১০৬৪ খ্রিস্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন।

বনু হাম্মুদ আমিরগণ - আল-জাজিরা আল-খাদরা (দক্ষিণ আন্দালুস)

৪০৪ হিজরিতে আন্দালুসের উমাইয়ারা কাসিম বিন হাম্মুদকে আল-জাজিরা আল-খাদরার শাসক নিযুক্ত করেছিল। ৪১৬ হিজরিতে তার ভতিজা ইয়াহইয়া বিন আলী মুতালি মালাগার শাসনভার গ্রহণ করে তার সন্তানদের বন্দি করেন। ৪২৭ হিজরিতে মুতালি মারা গেলে কাসিম বিন হাম্মুদের পুত্র মুহাম্মদ পালানোর সুযোগ পান এবং আল-জাজিরা আল-খাদরায় চলে যান এবং ৪৩১ হিজরিতে সেখানে একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

নং শাসক শাসনকাল বিশেষ তথ্য

১ মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন হাম্মুদ আল-মুতাসিম ৪৩১ হি. থেকে ৪৪০ হি. (১০৩৯ খ্রি. থেকে ১০৪৮ খ্রি.) নতুন স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন

২ কাসিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াসিক ৪৪০ হি. থেকে ৪৭৬ হি. (১০৪৮ খ্রি. থেকে ১০৫৪ খ্রি.) দুর্বল শাসক

সমাপ্তি: মুতাদিদ বিন আব্বাদ (সেভিলের শাসক) ৪৪৬ হিজরিতে আল-খাদরা দখল করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তিনি আলমেরিয়ার শাসক মুতাসিম বিন সামাদিহের কাছে চলে যান এবং সেখানে ৪৫০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

বনু মুনাদ রাষ্ট্র (বনু জিরি) গ্রানাডা (দক্ষিণ আন্দালুস)

এরা ছিল সানহাজি বারবার। হাজিব আল-মানসুরের শাসনামলে তাদের নেতা জাবি বিন জিরি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য আন্দালুসে আসার অনুমতি চান এবং এসে নিজের গোত্রসহ মানসুরের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হন। এই লোকেরা ৪০০ হিজরি থেকে ৪০২ হিজরি পর্যন্ত মুহাম্মদ আল-মাহদির বিরুদ্ধে সুলাইমান মুস্তাইনের চারপাশে সমবেত হয়ে গৃহযুদ্ধ বৃদ্ধি করতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করতে লিপ্ত ছিল। সুলাইমান মুস্তাইন ৪০৩ হিজরিতে দ্বিতীয়বার কর্ডোভার শাসক হলে জাবি বিন জিরিকে তার সেবার বিনিময়ে গ্রানাডার প্রাদেশিক শাসনভার প্রদান করেন। জাবি বিন জিরি ৪০৩ হিজরিতে গ্রানাডায় একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।

নং শাসক শাসনকাল বিশেষ তথ্য

১ জাবি বিন জিরি বিন মুনাদ ৪০৩ হি. থেকে ৪১০ হি. (১০১২ খ্রি. থেকে ১০১৯ খ্রি.) সরকারের প্রতিষ্ঠাতা

২ হাবুস বিন মাকসান ৪১০ হি. থেকে ৪২৯ হি. (১০১৯ খ্রি. থেকে ১০৩৭ খ্রি.) জাবি বিন জিরির ভতিজা

৩ বাদিস বিন হাবুস ৪২৯ হি. থেকে ৪৬৫ হি. (১০৩৭ খ্রি. থেকে ১০৭৩ খ্রি.) বারবারদের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক

৫৭২ | তারিখ-ই-মিল্লাত | পঞ্চম খণ্ড

৪. আবদুল্লাহ বিন বুলুগগিন বিন বাদিস | ৪৬৫ হিজরি থেকে ৪৮৩ হিজরি (১০৭৩ খ্রি. থেকে ১০৯০ খ্রি.) | অল্পবয়সী ও অনভিজ্ঞ।

সমাপ্তি: আবদুল্লাহ বিন বুলুগগিন গ্রানাডার এবং তার ভাই তামীম বিন বুলুগগিন মালগার শাসক ছিলেন। ৪৮৩ হিজরিতে মুরাবিতুনরা তাদের উভয়কে এই শহরগুলো থেকে বিতাড়িত করে।

দৌলত বনু আব্বাদ - ইশবিলিয়া (দক্ষিণ আন্দালুস)

ইশবিলিয়ার এক প্রখ্যাত আলেম কাজী ইসমাইল বিন আব্বাদের পুত্র কাজী আবুল কাসিম ৪১৪ হিজরিতে কর্ডোবার রাজনৈতিক সংকটে হতাশ হয়ে শহরবাসীর পরামর্শে একটি স্থানীয় সরকার গঠন করেন, যা আন্দালুসের আরবদের আশ্রয় প্রদান করেছিল। কাজী আবুল কাসিমের যুদ্ধবাজ উত্তরসূরি মুতাদিদ তার প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে এটি দখল করে এই সরকারকে অনেক বিস্তৃত করেছিলেন।

নম্বর | শাসক | শাসনকাল | বিশেষ কথা

১. কাজী আবুল কাসিম বিন ইসমাইল | ৪১৪ হিজরি থেকে ৪৩৩ হিজরি (১০২৩ খ্রি. থেকে ১০৪২ খ্রি.) | আলেম-ই-দ্বীন, শরয়ী সরকার।

২. মুতাদিদ বিন আবুল কাসিম | ৪৩৩ হিজরি থেকে ৪৬১ হিজরি (১০৪২ খ্রি. থেকে ১০৬৮ খ্রি.) | কঠোর, বিজয়ী, জালিম।

৩. মুহাম্মদ মুতামিদ বিন মুতাদিদ | ৪৬১ হিজরি থেকে ৪৮৪ হিজরি (১০৬৮ খ্রি. থেকে ১০৯১ খ্রি.) | পণ্ডিত ও কবি, কোমল স্বভাবের।

সমাপ্তি: ৪৮৪ হিজরিতে ইশবিলিয়ার শেষ শাসক মুতামিদ মুরাবিতুনদের হাতে বন্দী হন এবং এই সরকারের পতন ঘটে।

দৌলত বনু জাহওয়ার - কর্ডোবা (মধ্য আন্দালুস)

কর্ডোবার রাজনৈতিক সংকট দেখে উজির আবুল হাজম জাহওয়ার বিন মুহাম্মদ বিন জাহওয়ার একটি ইসলামী পরামর্শমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন যা ৪৮ বছর স্থায়ী ছিল। এই সরকার সেই বিগত যুগে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এটি মুলুকুত তাওয়ায়েফ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিল কিন্তু সাধারণত তাদের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকত এবং কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে মীমাংসাও করে দিত।

নম্বর | শাসক | শাসনকাল | বিশেষ কথা

১. আবুল হাজম জাহওয়ার বিন মুহাম্মদ | ৪২২ হিজরি থেকে ৪৩৫ হিজরি (১০৩১ খ্রি. থেকে ১০৪৩ খ্রি.) | অভিজ্ঞ, দূরদর্শী।

২. আবুল ওয়ালিদ বিন জাহওয়ার | ৪৩৫ হিজরি থেকে ৪৫০ হিজরি (১০৪৩ খ্রি. থেকে ১০৫৮ খ্রি.) | নিজের ছেলেদের হাতে সরকার তুলে দেন।

৩. আব্দুল মালিক বিন আবুল ওয়ালিদ | ৪৫০ হিজরি থেকে ৪৬২ হিজরি (১০৫৮ খ্রি. থেকে ১০৭০ খ্রি.) | অযোগ্য শাসক।

সমাপ্তি: এই সরকারকে ইশবিলিয়ার (বনু আব্বাদ) শাসক মুতামিদ কর্ডোবা দখল করে সমাপ্ত করেন।

বনু যুন-নুন রাষ্ট্র - তলেতলে (মধ্য আন্দালুস)

এটি ছিল হাওয়ারা গোত্রের বারবারদের একটি পরিবার। তারা লুটতরাজ দিয়ে শুরু করে সিপাহীর স্তরে পৌঁছায় এবং পরে কর্ডোবার রাজনৈতিক সংকটের সুযোগ নিয়ে তলেতলে দখল করে নেয়। এর শাসক ইয়াহইয়া আল-মামুন খ্রিস্টানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং সেভিল, কর্ডোবা ও বাদাজোস ইত্যাদি প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য কণ্টক হয়ে থাকেন।

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান বিন যুন-নুন ৩২৯ হি. থেকে ৪৩৫ হি. (১০৩৭ খ্রি. থেকে ১০৪৩ খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতা

২ ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল, আল-মামুন ৪৩৫ হি. থেকে ৪৬৭ হি. (১০৪৩ খ্রি. থেকে ১০৭৫ খ্রি.) খ্রিস্টানদের হাতের পুতুল

৩ ইয়াহইয়া বিন ইসমাইল আল-কাদির ৪৬৭ হি. থেকে ৪৭৮ হি. (১০৭৫ খ্রি. থেকে ১০৮৫ খ্রি.) অযোগ্য, খ্রিস্টানদের হাতের পুতুল

সমাপ্তি: আলফনসো ষষ্ঠ তলেতলে দখল করে এই শাসনের অবসান ঘটান।

বনু আফতাস রাষ্ট্র - বাদাজোস (পশ্চিম আন্দালুস)

বাদাজোস রাষ্ট্রটি আন্দালুসের পশ্চিমে বর্তমান পর্তুগালের অধিকাংশ এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। কর্ডোবার কেন্দ্রীয় সরকারের পতনের যুগে এখানে শাপুর ফারসি নামক এক গোলাম নায়েব হিসেবে শাসন করছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার উজির মুহাম্মদ বিন মাসলামা ওরফে ইবনুল আফতাস (যার সম্পর্ক ছিল বারবারদের মিকনাসা গোত্রের সাথে) আল-মানসুর উপাধি ধারণ করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মর্যাদার দিক থেকে এটি ছিল মুলুকুত তাওয়ায়েফদের মধ্যে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র।

৪৩৩ হিজরি পর্যন্ত এটি বনু উমাইয়াদের দখলে ছিল, এরপর বনু যুন-নুনের সাথে সংঘর্ষ চলতে থাকে এবং পরে কাস্তিলিয়ার খ্রিস্টানরা এর ওপর আক্রমণ করতে থাকে। ৪৫৬ হিজরিতে প্রথম ফার্ডিনান্ড এর উত্তরের শহরগুলো দখল করে নেন।

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ শাপুর ফারসি মাওলা আল-মুস্তাসির উমাইয়া ৪০০ হি. থেকে ৪১৩ হি. (১০১০ খ্রি. থেকে ১০২৩ খ্রি.) কর্ডোবার পক্ষ থেকে নায়েব

২ আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা ইবনুল আফতাস ৪১৩ হি. থেকে ৪৩৫ হি. (১০২৩ খ্রি. থেকে ১০৪৩ খ্রি.) যোগ্য, বুদ্ধিমান, সাহসী

৩ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ ইবনুল আফতাস, আল-মুজাফফর ৪৩৫ হি. থেকে ৪৬০ হি. (১০৪৩ খ্রি. থেকে ১০৬৮ খ্রি.) সাহসী, সাহিত্যিক, কবি, লেখক

৪ ইয়াহইয়া আল-মানসুর ৪৬০ হি. থেকে ৪৭২ হি. (১০৬৮ খ্রি. থেকে ১০৮০ খ্রি.) নিজের ভাই উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিলের সাথে যুদ্ধ

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

৫ উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল ৪৬৩ হি থেকে ৪৭৮ হি (১০৭২ খ্রি থেকে ১০৯৫ খ্রি) কবিতা ও সাহিত্যের অনুরাগী, সাহসী।

সমাপ্তি: উমর আল-মুতাওয়াঙ্কিল মুরাবিতুনদের হাতে নিহত হন। এর সাথেই বনু আফতাস রাজবংশের পতন ঘটে।

+++

দৌলতে বনু তুজীব, বনু হুদ (সারাগোসা/উত্তর আন্দালুস)

সারাগোসার বনু তুজীব পরিবার দীর্ঘকাল ধরে উত্তর সীমান্ত রক্ষা করে আসছিল। কর্ডোবায় যখন রাজনৈতিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করল, তখন সেখানকার প্রধান মুনজির বিন ইয়াহইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার পুত্র এবং পৌত্র মুইজ উদ-দৌলা তার উত্তরসূরি হন। মুইজ উদ-দৌলার হত্যার পর ৪৩১ হিজরিতে সুলাইমান বিন হুদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং তার বংশধরদের মধ্যে শাসন চলতে থাকে।

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ মুনজির বিন ইয়াহইয়া ৪১১ হি থেকে ৪২১ হি (১০২০ খ্রি থেকে ১০৩২ খ্রি) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা - দক্ষ রাজনীতিবিদ।

২ ইয়াহইয়া বিন মুনজির, আল-মুজাফফর ৪২১ হি থেকে ৪৩০ হি (১০৩২ খ্রি থেকে ১০৩৯ খ্রি) খ্রিস্টানদের সাথে বন্ধুত্ব, দুর্বল, কিছু দুর্গ দিতে বাধ্য হন।

৩ মুনজির বিন ইয়াহইয়া, মুইজ উদ-দৌলা ৪৩০ হি (১০৩৯ খ্রি) প্রাসাদে এক ঘাতক হামলায় নিহত হন।

৪ সুলাইমান বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হুদ ৪৩১ হি থেকে ৪৩৮ হি (১০৩৯ খ্রি থেকে ১০৪৬ খ্রি) দক্ষ রাজনীতিবিদ, শাসন ক্ষমতা নিজের পরিবারে স্থানান্তরিত করেন।

৫ আহমদ বিন সুলাইমান, আল-মুকতাদির ৪৩৮ হি থেকে ৪৭৪ হি (১০৪৬ খ্রি থেকে ১০৮১ খ্রি) বিদ্বান ও গুণী, কবি ও সাহিত্যিক, সাহসী, চতুর।

৬ ইউসুফ বিন আহমদ, আল-মুতামিন ৪৭৪ হি থেকে ৪৭৮ হি (১০৮১ খ্রি থেকে ১০৮৫ খ্রি) গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী। ভাই মুনজিরের সাথে গৃহযুদ্ধ। সিড (El Cid) থেকে সাহায্য নিতেন।

৭ আহমদ বিন ইউসুফ, আল-মুসতাইন ৪৭৮ হি থেকে ৫০৩ হি (১০৮৫ খ্রি থেকে ১১০৯ খ্রি) মুরাবিতুনদের অনুগত ছিলেন। খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধে শহীদ হন।

৮ আবদুল মালিক বিন আহমদ, ইমাদ উদ-দৌলা ৫০৩ হি (১১০৯ খ্রি) মুরাবিতুনরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

আবদুল মালিক বিন আহমদ, ইমাদ উদ-দৌলা (পুনরায়) ৫০৩ হি থেকে ৫২৩ হি (১১০৯ খ্রি থেকে ১১৩০ খ্রি) খ্রিস্টানদের সাথে চুক্তি করে রুয়াতুল হিসন-এ শাসন করেন।

৫৭৫ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

৯. আহমদ বিন আব্দুল মালিক, সাইফ উদৌলা (৫৩৩ হিজরি থেকে ৫৩৬ হিজরি / ১১৩৮ থেকে ১১৪১ খ্রিস্টাব্দ)। আলফনসো সপ্তম একে দখল করে নেয়।

সমাপ্তি: মুরাবিতুনদের পতনের যুগে এই সরকার উত্তরের খ্রিস্টানদের হাতে শেষ হয়ে যায়।

+++

দাওলাত বনু আমির - বালেঙ্গিয়া (পূর্ব আন্দালুস)

ফিতনার যুগে ইবনে আবি আমিরের দুই সাকলাবি গোলাম মুবারক ও মুজাফফর মিলে পূর্ব আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর বালেঙ্গিয়াতে স্বাধীন সরকার গঠন করে। এই দুজনের মৃত্যুর পর সাহাবারা মানসুর আজম ইবনে আবি আমিরের নাতি আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান বিন ইবনে আবি আমিরকে বায়আত করে তাকে বালেঙ্গিয়ার শাসক বানিয়ে দেয়।

- নম্বর | হুকমরান | দাওরে হুকুমত | খাস বাত
- ১. মুবারক, মুজাফফর | ৪০০ হিজরি থেকে ৪০৮ হিজরি | আদর্শ ঐক্য, যোগ্য জুটি।
- ২. মুজাহিদ আমিরি | ৪০৮ হিজরি থেকে ৪১১ হিজরি | যোগ্য শাসক।
- ৩. আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান | ৪১১ হিজরি থেকে ৪৫৩ হিজরি | বুদ্ধিমান শাসক।
- ৪. আব্দুল মালিক আল-মুজাফফর বিন আব্দুল আজিজ | ৪৫৩ হিজরি থেকে ৪৫৭ হিজরি | অদূরদর্শী, মদ্যপ, বিলাসী।

আব্দুল মালিক আল-মুজাফফর তলেতলার শাসক ইয়াহইয়া আল-মামুনের জামাতা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায় এবং সে তাকে বন্দী করে বালেঙ্গিয়া দখল করে নেয় এবং আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজকে এখানে নিজের নায়েব (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করে।

- ৫. আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ | ৪৫৭ হিজরি থেকে ৪৬৭ হিজরি | নিয়াবত (প্রতিনিধিত্ব): ইয়াহইয়া আল-মামুন, তলেতলা।
- ৬. আবু বকর মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ | ৪৬৭ হিজরি থেকে ৪৭৮ হিজরি | নিয়াবত (প্রতিনিধিত্ব): ইয়াহইয়া আল-কাদির, তলেতলা।

৪৭৮ হিজরিতে আবু বকর বিন আব্দুল আজিজ এখানে স্বাধীন সরকার গঠন করেন।

- ৭. আবু বকর বিন আব্দুল আজিজ | ৪৭৮ হিজরি থেকে ৪৮৭ হিজরি | -
 - ৮. কাজী উসমান বিন আবু বকর | সফর ৪৮৭ হিজরি থেকে জিলকদ ৪৮৭ হিজরি | -
- সফর ৪৮৭ হিজরিতে তলেতলার পতনের পর বালেঙ্গিয়াতে ইয়াহইয়া আল-কাদির খ্রিস্টানদের সাহায্যে কাঠপুতলি শাসক হয়ে যায়।
- ৯. ইয়াহইয়া আল-কাদির | ৪৭৮ হিজরি থেকে ৪৮৫ হিজরি | জনগণ তাকে হত্যা করে।
 - ১০. সিড (খ্রিস্টান শাসক) | ৪৮৫ হিজরি থেকে ৪৯৫ হিজরি | খ্রিস্টানদের শাসন।

সমাপ্তি: মুরাবিতুনরা তীব্র যুদ্ধের পর এই শহরকে নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়।

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

দানিয়ার আমিরগণ (পূর্ব আন্দালুস)

এরা ছিল সেই সাকলাবি আমির যারা কর্ডোভার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং পতনের যুগে পূর্ব আন্দালুসের কিছু শহরে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে মুজাহিদ সাকলাবি দানিয়ায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

নম্বর শাসক শাসনকাল

১ মুজাহিদ বিন ইউসুফ ৪০৮ হি. থেকে ৪৩৬ হি. (১০১৭ খ্রি. থেকে ১০৪৪ খ্রি.)

২ আলী বিন মুজাহিদ ইকবাল উদ-দৌলা ৪৩৬ হি. থেকে ৪৬৮ হি. (১০৪৪ খ্রি. থেকে ১০৭৫ খ্রি.)

সমাপ্তি: এই শাসন সারগোসার বনু হুদ-এর হাতে শেষ হয়।

আলমেরিয়ার আমিরগণ (পূর্ব আন্দালুস)

কর্ডোভা থেকে আলাদা হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সাকলাবি নেতা খায়রান আল-আমিরিও ছিলেন, যিনি পূর্ব আন্দালুসের আলমেরিয়া শহরের সাকলাবি শাসককে পরাজিত করে সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ খায়রান আল-আমিরি সাকলাবি ৪০৫ হি. থেকে ৪১৯ হি. (১০১৪ খ্রি. থেকে ১০২৮ খ্রি.) যোগ্য শাসক

২ জুহাইর আল-আমিরি, আবুল কাসিম ৪১৯ হি. থেকে ৪২৯ হি. (১০২৮ খ্রি. থেকে ১০৩৮ খ্রি.) ভালো, সাহসী শাসক

জুহাইর আল-আমিরি ৪২৯ হিজরিতে গ্রানাডার শাসক বাদিস বিন হাবুসের সাথে যুদ্ধে নিহত হলে স্থানীয় আমিরগণ শাসনভার আব্দুল আজিজ বিন আবি আমির (ভ্যালেন্সিয়ার শাসক)-এর হাতে সোপর্দ করেন।

নম্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

৩ মান বিন সুমাদিহ (বনু তুজিব) ৪২৯ হি. থেকে ৪৩৩ হি. (১০৩৮ খ্রি. থেকে ১০৪১ খ্রি.) আব্দুল আজিজ বিন আবি আমিরের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব

৪ মান বিন সুমাদিহ (বনু তুজিব) ৪৩৩ হি. থেকে ৪৪৩ হি. (১০৪১ খ্রি. থেকে ১০৫১ খ্রি.) স্বাধীন শাসন

৫ মুহাম্মদ বিন মান বিন সুমাদিহ, মুতাসিম ৪৪৩ হি. থেকে ৪৮৪ হি. (১০৫১ খ্রি. থেকে ১০৯১ খ্রি.) আলেম ফাজিল, কবি, সাহিত্যিক, যোদ্ধা

৬ মুইজ উদ-দৌলা ৪৮৪ হি. (১০৯১ খ্রি.) কয়েক মাসের শাসন, অতঃপর পলায়ন

সমাপ্তি: এই শাসন ৪৮৪ হিজরিতে মুরাবিতুনদের হাতে শেষ হয়। এর আগে মুইজ উদ-দৌলা পালিয়ে আফ্রিকায় চলে যান এবং বেজাইয়ায় বনু হাম্মাদের কাছে আশ্রয় নেন।

মুরিয়ার (পূর্ব আন্দালুস) আমিরগণ

খাইরান আমেরি আলমেরিয়াকে কেন্দ্র করে মুরিয়ার ওপরও শাসন করেন এবং সেখানে জুহাইর আমেরিকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। খাইরান আমেরির মৃত্যুর পর জুহাইর সেখানকার স্বাধীন শাসক হন। জুহাইরের প্রতিনিধিত্বে সেখানে আবু বকর আহমদ বিন তাহের শাসন করতে থাকেন এবং পরবর্তীতে স্বাধীন হয়ে যান। এরপর এই শহরটি ইশবিলিয়ার অধীনে চলে আসে, কিন্তু পরবর্তীতে এখানকার ওয়ালি ইবনে রাশিক বিদ্রোহ করেন।

নস্বর শাসক শাসনকাল বিশেষ কথা

১ আবু বকর আহমদ বিন তাহের ৪১৯ হিজরি থেকে ৪২৯ হিজরি (১০২৮ খ্রি. থেকে ১০৩৮ খ্রি.) আলমেরিয়ার শাসক জুহাইরের প্রতিনিধি হিসেবে

২ আবু বকর আহমদ বিন তাহের ৪২৯ হিজরি থেকে ৪৫৫ হিজরি (১০৩৮ খ্রি. থেকে ১০৬৩ খ্রি.) বালানসিয়ার শাসক আবদুল আজিজের প্রতিনিধি হিসেবে

৩ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আবু আবদুর রহমান ৪৫৫ হিজরি থেকে ৪৫৭ হিজরি (১০৬৩ খ্রি. থেকে ১০৬৫ খ্রি.) বালানসিয়ার শাসক আবদুল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে

৪ মুহাম্মদ বিন আবু বকর আবু আবদুর রহমান ৪৫৭ হিজরি থেকে ৪৭১ হিজরি (১০৬৫ খ্রি. থেকে ১০৭৮ খ্রি.) স্বাধীন শাসন

৫ ইবনে আন্মার ৪৭১ হিজরি থেকে ৪৭৪ হিজরি (১০৭৮ খ্রি. থেকে ১০৮১ খ্রি.) মুতামিদের (ইশবিলিয়ার শাসক) প্রতিনিধি হিসেবে

৬ ইবনে রাশিক ৪৭৪ হিজরি থেকে ৪৮২ হিজরি (১০৮১ খ্রি. থেকে ১০৮৯ খ্রি.) স্বাধীন শাসন

৭ আবুল হাসান বিন আল-ইয়াসা ৪৮২ হিজরি থেকে ৪৮৪ হিজরি (১০৮৯ খ্রি. থেকে ১০৯১ খ্রি.) মুতামিদের (ইশবিলিয়ার শাসক) প্রতিনিধি হিসেবে

৮ ইবনে রাশিক ৪৮১ হিজরি থেকে ৪৮৪ হিজরি (১০৮৯ খ্রি. থেকে ১০৯১ খ্রি.) স্বাধীন এবং পরবর্তীতে অপসারিত

সমাপ্তি: মুরাবিতুনদের মোকাবিলায় ইবনে রাশিক পরাজিত ও অপসারিত হন এবং এই শহরটি মুরাবিতুন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

[১] মুলুকুত তাওয়ায়েফদের শাসনের উল্লিখিত তালিকাগুলো তৈরিতে নিচের বইগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

- আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়া ফিল আন্দালুস - আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি
- আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা - আলী আবদুর রহমান
- ফারমানরাওয়ায়ানে ইসলাম - ডক্টর গোলাম জিলানি বারক, আল-ফয়সাল লাহোর থেকে প্রকাশিত।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

আন্দালুসে মুরাবিতুনদের যুগ

৪৮৪ হিজরি থেকে ৫৪১ হিজরি

(১০৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

৫৭ বছর

আন্দালুস, মুরাবিতুনদের শাসনামলে

৪৮৩ হিজরী থেকে আন্দালুসে মুরাবিতুনদের যুগ শুরু হয়, যদিও আফ্রিকায় তাদের শাসন অনেক আগেই শুরু হয়েছিল যেমনটা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। মুরাবিতুনদের শাসন মুসলিম আন্দালুসকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে এক নতুন জীবন দান করেছিল এবং এটা স্পষ্ট যে এত বড় নেয়ামতের জন্য আন্দালুসকে কুরবানি দিতেই হতো। এর মধ্যে সেই খান্দানি শাসনগুলোর কুরবানিও शामिल ছিল যারা আলাদা আলাদা শহরে জেঁকে বসেছিল।

মুলুকুত তাওয়ায়েফদের যে পরিণতি হয়েছিল তা ছিল কর্মফল। এতে দুঃখিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, তবে মুতামিদের ইলম-প্রীতি, শরাফত এবং বীরত্বের মতো গুণাবলির কারণে ইতিহাসের ছাত্রের মনে তার প্রতি সহানুভূতি জাগা স্বাভাবিক। তার এবং তার পরিবারের সাথে যা কিছু ঘটেছে তাতে অবশ্যই আফসোস হয় কিন্তু এর মানে এই নয় যে তারা একেবারেই নির্দোষ ছিল এবং মুরাবিতুনরা তাদের ওপর জুলুম করেছিল। সাধারণত পশ্চিমা ঐতিহাসিকরা যারা মুরাবিতুনদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করেন, তারা এই ঘটনাগুলোকে এমনভাবে বর্ণনা করেন যেন মুরাবিতুনরা মুলুকুত তাওয়ায়েফদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছিল। অথচ মুরাবিতুনদের আচরণ সেই জালেম বিজেতাদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল যারা পরাজিতদের শিরশ্ছেদ করে ছেড়ে দিত।

মুরাবিতুনরা, যারা দরবেশসুলভ জীবনের প্রবক্তা ছিলেন, তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা বৃথা ছিল যে তারা মুলুকুত তাওয়ায়েফদের ওপর বিজয় লাভ করে তাদের আন্দালুসেই বিলাসিতার সুযোগ করে দেবেন। এটা সম্ভব ছিল না যে মুরাবিতুনরা সেই শাসকদের নিজেদের সারিতে সম্মানজনক স্থান দেবেন যারা নিজেদের স্বাধীন শাসক ছাড়া অন্য কোনো অবস্থানে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বারবার প্রমাণিত হয়েছিল, তাই তাদের সাথে রাখা ছিল আস্তিনে সাপ পালার নামান্তর এবং তাদের স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া ছিল বিদ্রোহকে আমন্ত্রণ জানানো। মুরাবিতুনদের দৃষ্টিতে তাদের সাথে উপযুক্ত আচরণ এটাই হতে পারত যে তাদের পরিবার-পরিজনসহ হেফাজতে রাখা হবে। যদি তাদের বিলাসিতার জীবন কাটানোর সুযোগ দেওয়া হতো তবে তা হতো সেই হাজার হাজার মানুষের প্রতি অবিচার যাদের রক্ত এই শাসকদের দায়িত্বহীনতা, অযোগ্যতা, বিলাসপ্রিয়তা, গৃহযুদ্ধ এবং খ্রিস্টান তোষণের বলি হয়েছিল।

এটা সত্য যে বন্দিশালায় তারা খুব বেশি আরাম-আয়েশ পাননি। পরার জন্য সাধারণ কাপড় এবং খাওয়ার জন্য সাধারণ খাবার মিলত কিন্তু মুরাবিতুনদের শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনের জীবনধারাও এর চেয়ে ভিন্ন ছিল না। অভিযোগ তখন সঠিক হতো যখন আমির ইউসুফ নিজের জন্য ইশবিলিয়া এবং কুরতুবাহর সুন্দর প্রাসাদগুলো পছন্দ করতেন।

বলেঙ্গিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন:

মুরাবিতুনদের বিজয় দেখে বলেঙ্গিয়ার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ খ্রিস্টানদের বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং ইয়াহইয়া আল-কাদির ও তার পৃষ্ঠপোষক সিড-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ইবনে জাহাফ নামক এক বিচারক তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। যখন তিনি দাউদ ইবনে আয়েশার কাছে গোপন বার্তা পাঠিয়ে বলেঙ্গিয়ায় হস্তক্ষেপের দাওয়াত দিলেন, তখন তিনি কালক্ষেপণ না করে কয়েকজন নির্বাচিত সৈন্যের একটি দল বলেঙ্গিয়ায় প্রবেশ করিয়ে দিলেন। একই সময়ে শহরের নেতৃবৃন্দও জেগে উঠলেন এবং তারা সিড-এর নায়েব ইবনুল ফারাজকে গ্রেপ্তার করলেন। এরপর তারা রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়লেন যেখানে দীর্ঘ তল্লাশির পর ইয়াহইয়া আল-কাদিরকে রত্নালঙ্কারের সিন্দুকসহ গোসলখানায় লুকানো অবস্থায় পাওয়া গেল। তাকে হত্যা করে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এটি ২৩ রমজান ৪৮৫ হিজরির ঘটনা। এই সাফল্যের পর শহরবাসী ইবনে জাহাফকে তাদের নেতা বানিয়ে খ্রিস্টানদের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিল। [১]

বলেঙ্গিয়ার ওপর সিড-এর দখল:

এই সময়ে একদিকে আলফনসো ষষ্ঠ মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যস্ত দেখে ৪৮৫ হিজরিতে হঠাৎ ‘জিয়ান’-এর ওপর চড়াও হলেন। মুসলমানরা প্রথমে পরাজিত হলেও খুব দ্রুত তারা নিজেদের সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করল এবং খ্রিস্টানদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল।

অন্যদিকে খ্রিস্টান কমান্ডার সিড কাম্পেডোর, যে দক্ষিণ-পূর্ব আন্দালুসকে নিজের জায়গির মনে করত, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো। ৪৮৬ হিজরিতে সে যখন বলেঙ্গিয়ায় পৌঁছাল, যা সে নিজের সিংহাসন মনে করত, তখন তার জন্য শহরের দরজা খোলা হলো না। সিড কঠোরভাবে শহরটি অবরোধ করল যা ২০ মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই সময়ে শহরবাসী ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ল কিন্তু তারা অস্ত্র সমর্পণ করা পছন্দ করল না। অবশেষে ২৮ জুমাদাল উলা ৪৮৭ হিজরিতে বলেঙ্গিয়ার প্রতিনিধিরা জান-মালের নিরাপত্তার শর্তে শহরটি সিড-এর হাতে তুলে দিল। এই সময় পর্যন্ত এই বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষ এক মুঠো খাবারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। সিড শহরটি দখলের পর এর চমৎকার ভবনগুলোকে ছাইয়ের স্তূপে পরিণত করল। শহরবাসীর নেতা ইবনে জাহাফকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে সে তার প্রতিশোধের আগুন নেভাল। সে নিজেকে ‘বাদশাহ’ ঘোষণা করল এবং পুরো আন্দালুসকে পদানত করার সোনালী স্বপ্ন দেখতে লাগল। [২]

মুহাম্মদ বিন তাশফিনের আগমন, বলেঙ্গিয়া পুনরুদ্ধার এবং সিড-এর মৃত্যু:

কিন্তু মুরাবিতুনদের উপস্থিতিতে এই স্বপ্ন বেশিদিন বাস্তবে রূপ নিতে পারল না। ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের নেতৃবৃন্দ, উলামায়ে কেরাম এবং সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ শোনার পর সিড-কে পুরোপুরি দমনের সংকল্প করলেন। তিনি তার ভাই মুহাম্মদ বিন তাশফিনকে মারাক্লেস, গ্রানাডা, আলমেরিয়া এবং টরটোসার বাহিনী নিয়ে পাঠালেন, যারা রমজান ৪৮৮ হিজরিতে বলেঙ্গিয়া অবরোধ করল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ২৩০, ২৩১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ২০১, ২০৫, তাবা দারুল ফিকর।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২/ ২৪৫।

একটি দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের সূচনা হলো যার মধ্যে ডজনখানেক সংঘর্ষ সংঘটিত হলো। মুসলমানরা পিছু হটেনি আর সিডও অস্ত্র সমর্পণ করেনি, বরং মাঝেমাঝে সে তার বাহিনী নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে থাকল। সিডের আহ্বানে আলফনসো ষষ্ঠও তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল এবং বালেঞ্জিয়ার আশেপাশে তার বাহিনীর সাথে মুরাবিতুনদের তীব্র সংঘর্ষ শুরু হলো। মুহাম্মদ বিন তাশফিন তার ঘেরাও ভাঙতে দেননি। অবশেষে খ্রিস্টান রাষ্ট্র আরাগনের শাসক পেড্রোও তার বাহিনী নিয়ে এই রণাঙ্গনে চলে এল এবং অবরোধের দ্বিতীয় বছর ৪৯০ হিজরির মহরম মাসে কুহ-ই মান্দিরের কাছে মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের এই সম্মিলিত বাহিনীর এক ভয়াবহ যুদ্ধ হলো। মুসলমানরা পরাজিত হলো এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

তবে আরাগনের শাসক নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার পর তারা টলেডোর দিকে অগ্রসর হলো। “কনসুয়েগ্রা”র ময়দানে শুধু আলফনসো ষষ্ঠই পরাজিত হয়নি, বরং সিডের একমাত্র পুত্র ডন ডিয়েগোও নিহত হলো। এই সময়ে মুরসিয়া থেকে দাউদ বিন আয়েশা হঠাৎ আক্রমণ করলেন এবং তুকার আশেপাশে কাস্টিলের আরেকটি বাহিনীকে, যা আলভার হানেসের কমান্ডে ছিল, পিষ্ট করে বালেঞ্জিয়ায় পৌঁছে গেলেন এবং শহরের বাইরে মোতায়েন বাহিনীকে এমনভাবে পদদলিত করলেন যে দু-একজন ছাড়া আর কেউ জীবিত রইল না।

সিড ক্যামপিয়াডোর আগেই অসুস্থ ছিল, পুত্রের মৃত্যু এবং তার বাহিনীর একের পর এক পরাজয় তাকে এমনভাবে ভেঙে দিল যে সে ৪৯২ হিজরির শাবান মাসে (জুন ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) আহাজারি করতে করতে এক করুণ মৃত্যুবরণ করল।

এগুলো ছিল সেই দিন যখন ইউরোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে শুরু করেছিল। ৪৮৭ হিজরিতে একদিকে খ্রিস্টানরা সিসিলি দ্বীপ দখল করে সেখানে মুসলমানদের ২৭২ বছরের শাসনের অবসান ঘটাল, অন্যদিকে পিটার সন্ন্যাসী প্রথম ত্রুসেডের দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল এবং পোপের নির্দেশে প্রত্যেক খ্রিস্টান শাসক তাদের সৈন্যবাহিনী সিরিয়ার উপকূলের দিকে পাঠাচ্ছিল। তবে পোপ স্পেনের খ্রিস্টানদের এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন যাতে তারা মুরাবিতুনদের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। যখন ইউরোপের ত্রুসেডার বাহিনী সিরিয়ায় ঢুকে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলছিল, তখন আন্দালুসে মুরাবিতুনরা স্বাধীনতার নতুন ইতিহাস রচনা করছিল। যখন খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে ত্রুসেডার পতাকা উড়িয়ে মসজিদে আকসাকে মুসলমানদের কসাইখানায় পরিণত করছিল, তখন মুরাবিতুনরা সিড এবং আলফনসো ষষ্ঠের মতো ফেরাউনদের অহংকার ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছিল।

সিডের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করে আরও দুই বছর শহর রক্ষা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি শহরটি আলফনসো ষষ্ঠের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। আলফনসো ষষ্ঠ ৪৯৫ হিজরির জমাদিউল আউয়াল মাসে (মার্চ ১১০২ খ্রিষ্টাব্দ) শহরে প্রবেশ করেন। ইসলামি বাহিনী তখন শাতিবার কাছে উপকূলীয় এলাকায় ছাউনি গেড়ে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আলফনসো ষষ্ঠ লড়াই নিরর্থক মনে করে খ্রিস্টানদের শহর ত্যাগের নির্দেশ দেন। যাওয়ার সময় তিনি সিডের মমি করা লাশের সাথে ধন-সম্পদের সমস্ত ভাণ্ডার নিয়ে যান এবং শহরের জায়গায় জায়গায় আগুন লাগিয়ে দেন। ৪৯৫ হিজরির শাবান মাসে যখন মুসলমানরা বালেঞ্জিয়ায় প্রবেশ করল, তখন সেখানে ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। [১]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, ২ / ৪২৮ থেকে ৪৩৬; স্টোরি অফ দ্য মুরস ইন স্পেন ২০৮ থেকে ২১৩।

আব্বাসীয় খিলাফত সম্পর্কে মুরাবিতুনদের কর্মপন্থা:

আমির ইউসুফ বিন তাশফিন এবং মুরাবিতুনরা আব্বাসীয় খিলাফতকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু মনে করতেন এবং এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে নিজেদেরকে এর খাদেম হিসেবে গণ্য করতেন। মুরাবিতুনরা আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতীক অর্থাৎ কালো পাগড়ি পরিধান করতেন এবং নিজেদের মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নাম খোদাই করতেন। ফলে আলফনসোকে পরাজিত করার এবং মুলুকুত তাওয়ায়েফদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর আমির ইউসুফ ৪৯১ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতাজহির বিল্লাহর দরবারে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে এই বিজয়সমূহের বিবরণ খলিফাকে অবহিত করার পাশাপাশি খিলাফতের সাথে পুনরায় আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন।

খলিফা আল-মুসতাজহির এই প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান এবং ফিরতি বার্তায় আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইসলামের জন্য তাঁর অবদানের কথা খোলা মনে স্বীকার করে বলেন:

“আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং আপনার ছায়া আরও বিস্তৃত করুন। আপনি ইখলাসের রশি আঁকড়ে ধরে থাকুন, কারণ আপনি দ্বীনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এর যোগ্য হয়েছেন যে, আপনার হাতে এই ব্যবস্থার সংস্কার হয়েছে এবং কাফেরদের মূলোৎপাটন হয়েছে।” [১]

আন্দালুস সম্পর্কে ইউসুফ বিন তাশফিনের রণকৌশল:

বালেঙ্গিয়া পুনরুদ্ধারের পর ৪৯৫ হিজরিতে ইউসুফ বিন তাশফিন চতুর্থবারের মতো আন্দালুস সফর করেন এবং এই উপদ্বীপের রাজনৈতিক কেন্দ্র কর্ডোভায় (কুরতুবা) তাঁর পুত্র আলীকে নিজের উত্তরসূরি নিযুক্ত করেন, যিনি তাঁর গুণাবলি ও কৃতিত্বের কারণে নিঃসন্দেহে এই পদের যোগ্য ছিলেন। ইউসুফ বিন তাশফিন আলীকে নিম্নোক্ত ওসিয়তসমূহ প্রদান করেন:

- আন্দালুসের সীমান্তগুলোর সর্বদা পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে।
- আন্দালুসবাসী বিশেষ করে কর্ডোভার বাসিন্দাদের সাথে সদয় আচরণ করতে হবে। তাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিতে হবে।
- আন্দালুসের সীমান্তে ১৭ হাজার সৈন্য মোতায়েন রাখতে হবে, যাদের মধ্যে সাত হাজার সেভিল (ইশবিলিয়া), চার হাজার সারাগোসা (সারাকুস্তা), তিন হাজার গ্রানাডা (গারনাতা) এবং এক হাজার কর্ডোভায় থাকবে। বাকি দুই হাজার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দুর্গে রাখা হবে।
- সারাগোসার বনু হুদকে বিরক্ত করা যাবে না যাতে তারা মুরাবিতুন এবং খ্রিস্টানদের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে থাকে। [২]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বনু হুদের শাসক আল-মুসতাসিন মুরাবিতুনদের ভয়ে সিড এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাষ্ট্রের সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু যখন বনু হুদ এর আড়ালে বালেঙ্গিয়া দখল করে নিল, তখন আল-মুসতাসিনকে তাঁর মত পরিবর্তন করতে হলো। ফলে তিনি ৪৯৬ হিজরিতে তাঁর পুত্র আব্দুল মালিককে আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে কর্ডোভায় পাঠান এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করেন। আব্দুল মালিক আমিরের পুত্র আলীর যুবরাজ হিসেবে বায়াত অনুষ্ঠানে শরিক হয়ে পুনরায় সারাগোসায় ফিরে যান।

[১] ফিকহত তামকিন ইনদাল মুরাবিতিন, আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি: পৃষ্ঠা ১৩১, ত. মুয়াসসাসাতু ইকরা কায়রো।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ২ / ৩৭২।

যেহেতু আমির ইউসুফ বিন তাশফিন জানতেন যে, বনু হুদ উত্তর দিকের নাসারাদের সাথে যুদ্ধ করার এবং রাজনৈতিক চাল চালার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রাখে, তাই আমির সারাকোস্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকতে দেন। [১]

ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যু:

মরক্কো ফিরে যাওয়ার পর ৪৯৮ হিজরিতে ইউসুফ বিন তাশফিনের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। দুই মাস অসুস্থ থাকার পর অবশেষে ১লা মহররম ৫০০ হিজরি (১৩ সেপ্টেম্বর ১১০৬ খ্রিষ্টাব্দ) ইসলামের ইতিহাসের এই মহান বীর ৯০ বছরের কঠোর পরিশ্রমী কিন্তু ঈর্ষণীয় জীবন অতিবাহিত করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। [২] ইসলামের এই সাহসী সন্তান আন্দালুসের ভূমিকে এমন জৌলুস দান করেছিলেন যে, আরও চার শতাব্দী পর্যন্ত এখানে আজান ধ্বনিত হতে থাকে এবং ক্রুশ অবনমিত থাকে।

আন্দালুসের মুসলমানদের ওপর মুরাবিতুনদের বিজয়ের প্রভাব:

ইউসুফ বিন তাশফিন আন্দালুসের মুসলমানদের এমন এক নতুন জীবন দান করেছিলেন যার শক্তি আরও চারশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। তার এই কৃতিত্বে সারা বিশ্বের মুসলমানরা আনন্দিত ছিল, তবে কবি ও সাহিত্যিকরা মন খুলে তার প্রশংসা করেননি।

লেন পুল আন্দালুসের সাহিত্যিক ও কবিদের মুরাবিতুনদের প্রতি অনীহার কথা উল্লেখ করে লেখেন:

“কবিরা এই বারবারদের কঠোর মেজাজ, উগ্র স্বভাব এবং অজ্ঞতার কারণে তাদের ঘৃণা করত। কারণ তারা কবিতার সৌন্দর্য বুঝতে অক্ষম ছিল।” [৩]

কিন্তু অন্যদিকে তিনি সাধারণ মানুষের আনন্দের কথা এভাবে উল্লেখ করেন:

“কিন্তু আন্দালুসের সাধারণ মানুষ মুরাবিতুনদের আন্দালুস দখলের ফলে অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশি ছিল কারণ তাদের জান ও মাল নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন শাসনের যুগে এটি সম্ভব ছিল না। সেই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকও বড়জোর তার দুর্গের আশেপাশে বসবাসকারী প্রজাদের রক্ষা করতে পারত, অন্যথায় মহাসড়কগুলো ডাকাতদের দ্বারা পূর্ণ থাকত এবং নাসারারা গ্রাম ও শহরগুলোতে লুটতরাজ চালাত। কিন্তু এখন সাময়িকভাবে হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষ আইনের অনুসারী হয়ে গিয়েছিল। নাসারারা পরাজিত হয়ে নিজেদের দুর্গে ফিরে গিয়েছিল।” [৪]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২/২৯১। এখানে এটি উল্লেখ্য যে, এরপর মুস্তাইন বিন হুদ নাসারা রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির পরিবর্তে জিহাদকে প্রাধান্য দেন। রজব ৫০৩ হিজরিতে তিনি নিজেই নাসারাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে শহীদ হন। (দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২/২৯১)

[২] আয-যাল্লাকা মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃষ্ঠা ২০২। নোট: ইউসুফ বিন তাশফিনের বয়স সম্পর্কে তিনটি মত রয়েছে। ১- ৮০ এর উপরে “বিদ্ব ওয়া সামানুন সানাহ” (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৯/৪৫৩) ২- ৯০ বছর “আন তিসঈন সানাহ” (আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৫০০ হিজরি) আশ তিসঈন সানাহ। (ওয়াফায়াতুল আইয়ান: ৭/১২৫) ৩- প্রায় ১০০ বছর (আয-যাল্লাকা মা'রাকাতুন মিন মা'রাকিল ইসলাম: পৃষ্ঠা ২০২)। যাই হোক, ৯০ বছরের মতটিই প্রচলিত যা ইবনে খাল্লিকান এবং হাফেজ যাহাবি বর্ণনা করেছেন।

[৩] Story of the moors in Spain 81

[৪] Story of the moors in Spain 82

আলী বিন ইউসুফ

৫০০ হিজরি থেকে ৫৩৭ হিজরি

(১১০৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)

ইউসুফ বিন তাশফিনের মৃত্যুর পর তাঁর ২৩ বছর বয়সী উত্তরসূরি আলী বিন ইউসুফের শাসনকাল শুরু হয়। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বুদ্ধিমান এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এবং তাঁর পিতার মতো জিহাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আবেগ ছিল। সুতরাং, পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি মজলুমদের ন্যায়বিচার প্রদান, জুলুম প্রতিরোধ, সীমান্ত রক্ষা এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদা প্রস্তুত ছিলেন। [১]

মুরাবিতুন সাম্রাজ্যে ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর “এহয়াউল উলুম”-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা:

আলী বিন ইউসুফ উলামা ও ফকিহদের প্রতিটি কথা মেনে চলতেন। সেই সময়ে ইমাম গাজ্জালি (রহ.)-এর বইগুলো চারদিকে খ্যাতি লাভ করেছিল। তাঁর বই ‘এহয়াউ উলুমিদ্দীন’-এ সেই সব আলেমদের ওপর স্থানে স্থানে সমালোচনা ছিল যারা মারেফাত থেকে বঞ্চিত থেকে কেবল কিতাব পাঠের ওপর নির্ভর করতেন এবং পদমর্যাদার প্রত্যাশী ছিলেন। মুরাবিতুন দরবারের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমদের আশঙ্কা হলো যে, এর ফলে সমাজে আলেমদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। তাই এই সমালোচনাকে ক্ষতিকর আখ্যা দিয়ে তারা আলী বিন ইউসুফকে রাজি করান যেন মুরাবিতুন রাষ্ট্রের সীমানায় ইমাম গাজ্জালির এই বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে ৫০৩ হিজরিতে সরকারি আদেশ অনুযায়ী এই বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যেখানেই এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত, তা পুড়িয়ে ফেলা হতো। [২]

হাফত যুদ্ধে বিজয়। ষষ্ঠ আলফনসোর মৃত্যু:

আলী বিন ইউসুফ তাঁর পিতার ওসিয়ত অনুযায়ী খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদি অভিযান অব্যাহত রাখেন। মুরাবিতুনদের লক্ষ্য ছিল তলিতলা (Toledo) জয় করা, কিন্তু রণকৌশল হিসেবে তারা প্রথমে এর চারপাশের দুর্গগুলো জয় করতে শুরু করেন।

৫০১ হিজরিতে ইসলামী বাহিনী আমির তামীম বিন তাশফিনের নেতৃত্বে তলিতলার পূর্ব জেলা উকলিশ (Ucles)-এ আক্রমণ করে। ষষ্ঠ আলফনসো তাঁর এগারো বছর বয়সী ছেলের সাথে দশ হাজার অশ্বরোহী পাঠিয়েছিলেন, যার সাথে তলিতলার নবাব,

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৫৮

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৭৮-৭৯

নবাব ‘আলবারহানস’ এবং ‘কুবরা’র নবাব ‘গারসিয়া আরদুন’ও ছিলেন।

১৬ শাওয়াল ৫০১ হিজরিতে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে খ্রিস্টানরা অপমানজনক পরাজয় বরণ করে। ৩০ হাজার খ্রিস্টান ছাড়াও আলফনসো ষষ্ঠ-এর একমাত্র উত্তরাধিকারী শানজাহ-ও নিহত হয়। এছাড়া সেনাবাহিনীর নেতৃত্বদানকারী সাতজন নামকরা খ্রিস্টান নবাবও নিহত হন, তাই এই যুদ্ধ তাদের কাছে ‘মা’রাকায়ে হাফত’ (সাতের যুদ্ধ) নামে পরিচিত। এই ভয়াবহ সংবাদ শোনার কয়েক মাস পর ৫০৩ হিজরিতে বৃদ্ধ আলফনসো ষষ্ঠ নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে আন্দালুসের মুসলমানরা এমন এক শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পায় যে অর্ধশতাব্দী ধরে তাদের জন্য এক আযাব হয়ে ছিল। আলফনসো ষষ্ঠ-এর মৃত্যুর পর কাস্টিল (কুস্তালিয়া) শাসনব্যবস্থা দুর্বল হতে থাকে এবং তার পরিবর্তে আন্দালুসের খ্রিস্টানদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্থান আরাগন (আরগুন) রাষ্ট্রের শাসকদের হাতে চলে যায়। [১]

তলাইতলার (টলেডো) শহরতলিতে আধিপত্য বিস্তার:

একই বছর আলী বিন ইউসুফ নিজে আন্দালুসে পদার্পণ করেন। তার আসল লক্ষ্য ছিল তলাইতলা, কিন্তু আশেপাশের শহর ও দুর্গগুলো জয় না করে এই বিশাল শহর অবরোধ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। ফলে উত্তর আন্দালুসে কাস্টিলের বাহিনীর সাথে কয়েক মাস ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। কিছু যুদ্ধে মুরাবিতুনদের পিছু হটতে হলেও এই সময়ের মধ্যে তলাইতলার আশেপাশে তলাইরা, ওয়াদিউল হিজারা এবং মাজরিত (যার নামানুসারে এখন তলাইতলাকে মাদ্রিদ বলা হয়) জয় করা হয়। [২]

তলাইতলা দখলে ব্যর্থতা:

৫০৩ হিজরির এই অভিযানে তলাইতলাও অবরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু সাত দিন পর মুসলমানরা অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে আসেন। [৩] সম্ভবত অবরোধের পূর্ণ প্রস্তুতি না থাকার কারণে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৫০৪ হিজরিতে আমির আবু মুহাম্মদ মাজদালি (কুরতুবাহর শাসক)-এর নেতৃত্বে তলাইতলায় পুনরায় আক্রমণ করা হয়, কিন্তু খ্রিস্টানরা মুরাবিতুনদের মিনজানিক এবং অবরোধের ভারী সরঞ্জামগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, যার ফলে অবরোধ আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

একই বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে আন্দালুসের প্রধান সেনাপতি সীর বিন আবু বকর এবং শাওয়াল ৫০৮ হিজরিতে আমির আবু মুহাম্মদ মাজদালি ইন্তেকাল করেন। এভাবে আন্দালুসের মুসলমানদের দুটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। [৪]

যাই হোক, এই ফিরে আসা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যদি মুরাবিতুনরা অটল থাকতেন, তবে এই শহর কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরেই বিজিত হতো। কিন্তু এরপর মুসলমানরা সেখানে পুনরায় আক্রমণের সুযোগ পাননি, যার ফলে উত্তর আন্দালুস বিজয়ের আর সুযোগ আসেনি। অন্যদিকে মধ্য আন্দালুসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদের হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটিটি রয়ে যায়, যা তারা ক্রমাগত ব্যবহার করতে থাকে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৯৩ থেকে ৯৭; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ২২৫

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/২৮০; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ২২৬

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৯৮-৯৯

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৭০, ৭১, ৭২

সারগোসা বিজয়

ইতিমধ্যে মুরাবিতুনরা সারগোসা দখলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যা মুলুকুত তাওয়ায়েফের একমাত্র অবশিষ্ট রাষ্ট্র ছিল। কারণ এখানকার আমিররা আলী বিন ইউসুফকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তারা তাদের নিজস্ব দুর্বলতার কারণে খ্রিস্টানদের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম নয়, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটিকে যেন তার অধীনে নেওয়া হয়। আলী বিন ইউসুফের নির্দেশে ৫০৩ হিজরিতে মুরাবিতুনদের সেনাপতি ইবনুল হাজ সারগোসা আক্রমণ করেন। এখানকার শাসক ইমাদুদ দাওলা আলী বিন ইউসুফকে একটি পত্র পাঠিয়ে পূর্বের সুসম্পর্কের দোহাই দেন এবং আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমার আবেদন করেন। আলী বিন ইউসুফ নরম হয়ে ইবনুল হাজকে অভিযান বন্ধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এই বার্তা পৌঁছানোর আগেই খেলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইমাদুদ দাওলা হতাশ হয়ে শহর থেকে বেরিয়ে অন্য একটি পাহাড়ি দুর্গে চলে গিয়েছিলেন। এভাবে সারগোসায় বনু হুদের সত্তর বছরের শাসনের অবসান ঘটে। [১]

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধার

৫০৮ হিজরিতে পূর্ব আন্দালুসে তিনটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র: পিসা (Pisa), জেনোয়া (Genoa) এবং বার্সেলোনার যৌথ বাহিনী আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ: মায়োর্কা, মাইনোর্কা এবং ইবিজা দখল করে নিয়েছিল। তবে এক বছর পর ৫০৯ হিজরিতে মুরাবিতুনরা তিনশ জাহাজের একটি নৌবহর নিয়ে সেখানে জিহাদ করে এবং ওই দ্বীপগুলোতে পুনরায় নিজেদের পতাকা উড্ডীন করে। খ্রিস্টানরা এই সুন্দর দ্বীপগুলোকে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুরাবিতুনরা বিপুল অর্থ ব্যয় করে সেখানে নতুন করে জনবসতি গড়ে তোলে এবং মহল্লা ও মসজিদ নির্মাণ করে। [২]

পর্তুগালে অগ্রযাত্রা

৫১১ হিজরিতে আলী বিন ইউসুফ তৃতীয়বারের মতো আন্দালুসে আসেন এবং পশ্চিম আন্দালুসে (পর্তুগাল) বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এটি ছিল একটি দীর্ঘ অভিযান যা কয়েক বছর ধরে চলেছিল। এই সময়ে ৫১২ হিজরিতে পর্তুগালের রাজধানী কয়িম্ব্রা (Coimbra)-ও জয় করা হয়। এই শহরটি ৪৫৬ হিজরিতে খ্রিস্টানরা আল-মুজাফফরের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। [৩]

প্রথম আলফনসোর উত্থান

এই সময়ে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আরাগনের শাসক রডমিয়ার (আলফনসো রডমিয়ার আউয়াল) এক নতুন আপদ হিসেবে আবির্ভূত হন। খ্রিস্টানরা তাকে ‘যোদ্ধা রাজা’ এবং মুসলমানরা ‘আলফনসো আল-হারব’ নামে স্মরণ করত। তিনি তার পূর্বপুরুষদের চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে যুদ্ধের পারদর্শিতা দেখান। তার প্রথম লক্ষ্য ছিল সারগোসা। ৫১২ হিজরিতে তিনি ফরাসি বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে সারগোসা পৌঁছান। আলী বিন ইউসুফ পর্তুগালে নিজের ব্যস্ততার কারণে এই রণাঙ্গনের দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। সফর ৫১২ হিজরি থেকে অবরোধ শুরু হয় যা সাত মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং মুরাবিতুনদের পক্ষ থেকে শহরের জন্য কোনো সাহায্য পৌঁছাতে পারেনি।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৭৩, ৭৪।

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃষ্ঠা ৩২৬, ৩২৭; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৭৬, ৭৭।

[৩] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আল-আবদ: পৃষ্ঠা ৩২৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৮০, ৮১।

শহরের অধিবাসীরা প্রাণপণ প্রতিরোধের পর অবশেষে ক্ষুধার তাড়নায় নিরুপায় হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করল, এভাবে ১২ রমজান ৫১৩ হিজরিতে সারাকুস্তা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল। এখানকার হাজার হাজার মুসলমান চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব শহরগুলোর দিকে হিজরত করল। রডমির এই মহান শহরকে আরাগন রাজ্যের রাজধানী বানিয়ে নিল। জামে মসজিদ গির্জায় রূপান্তরিত করা হলো এবং এভাবে এই শহরের চারশ বছরের ইসলামী ইতিহাসের অধ্যায় বন্ধ হয়ে গেল।

রডমির এরপর উত্তরের ইসলামী শহর ও দুর্গগুলোর ওপর একের পর এক আক্রমণ চালাল। তিন বছরের মধ্যে সে তুতিলা, আজুন, মালান, আইলা ছাড়াও আরাগন ও কাস্তিলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত অত্যন্ত সুদৃঢ় আইয়ুব দুর্গও জয় করে নিয়েছিল। [১]

কাতান্দার যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়:

আলী বিন ইউসুফ এই পরিস্থিতিতে তাঁর ভাই ইবরাহিমকে উত্তরের রণাঙ্গনে পাঠালেন যাতে সারাকুস্তা ও অন্যান্য অধিকৃত শহরগুলো পুনরুদ্ধার করা যায়। উলামা ও স্বেচ্ছাসেবকদের এক বিশাল দল অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এই জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য বেরিয়ে পড়ল। রডমির বারো হাজার অশ্বারোহী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে মোকাবিলায় এল। ২৪ রবিউল আউয়াল ৫১৩ হিজরিতে উত্তরের শহর কাতান্দা (Cutanda)-র কাছে এক অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো যাতে মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো। ২০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও হাজার হাজার সৈন্য এবং শত শত উলামা শাহাদাত বরণ করলেন। [২]

দক্ষিণ আন্দালুসে রডমির। গ্রানাডা আক্রমণ:

কাতান্দার যুদ্ধে বিজয় খ্রিস্টানদের মনোবল অনেক বাড়িয়ে দিল এবং তারা দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এই সময়েই সিরিয়ায় শুরু হওয়া ক্রুসেড যুদ্ধের প্রভাবে উত্তর আন্দালুসে ক্রুশের খাতিরে লড়াই করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো গড়ে উঠল। আলফনসো রডমির কাতান্দার যুদ্ধের পর এই সংগঠনগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেন যাদেরকে হসপিটালারস (আদ-দাওয়িয়াহ) বা টেম্পলারস (ফুরসানুল মা'বাদ) বলা হতো। পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে এই সংগঠনগুলো মুসলমানদের জন্য এক বড় বিপদ হিসেবে প্রমাণিত হলো। [৩]

এই দিনগুলোতেই গ্রানাডার খ্রিস্টান নাগরিকরা গোপনে রডমিরকে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে গ্রানাডা দখলের আমন্ত্রণ জানাল এবং সে শাবান ৫১৯ হিজরিতে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রানাডার দিকে রওনা হলো। তার গতি এত দ্রুত এবং অগ্রযাত্রার পথগুলো এত অনিশ্চিত ছিল যে মুরাবিতুনরা কোনো রণাঙ্গনেই বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারল না। গ্রানাডার খ্রিস্টানরা তার পথপ্রদর্শনের জন্য পৌঁছে গিয়েছিল এবং তাকে নিত্যনতুন পথে নিয়ে প্রতিটি লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

রমজানে সে ভ্যালেন্সিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল কিন্তু সেখানকার আমির আবু মুহাম্মদ তাকে আর এগোতে দিলেন না। তখন সে হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে প্রথমে শাকর এবং তারপর দানিয়া আক্রমণ করল। শাতিবা, মুরসিয়া এবং বাস্তা পর্যন্ত সে পার্শ্ববর্তী জনপদ ও গ্রামগুলো ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে চলল।

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃ. ৩২৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৮৮/১০৩

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃ. ৩২৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/১০২/১০৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৫১৮

৫৮৮ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

গেল। ফিলকদ মাসে সে ওয়াদি আতশ-এ পৌঁছে গেল। এই অভিযানে সে দক্ষিণ ও পূর্বের কোনো জেলাই বাদ রাখেনি। মুরাবিতুনদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি নিশ্চিতভাবেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাই সে শত্রুর পথের প্রতিটি বাধা অতিক্রম করতে করতে অবশেষে ফিলহজ মাসের শুরুতে (জানুয়ারি ১১২৬ খ্রি.) গ্রানাডার সামনে এসে উপস্থিত হলো। স্থানীয় খ্রিস্টানরা তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করল। তবে শহরের লড়াকু মুসলমানরা শত্রুর একটি চালও সফল হতে দেয়নি। এক মাস অবরোধ সত্ত্বেও ক্রুসেডার বাহিনী গ্রানাডায় প্রবেশ করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়া তাদের মনোবল ভেঙে দিল।

রোডমির ফেরার পথে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল; সে উত্তরের দিকে মুসহাব দুর্গের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ পশ্চিম দিকে মোড় নিল। কিন্তু এই সময়ে গ্রানাডার মুসলমানরা শত্রুর ওপর ডানে ও বামে আক্রমণ শুরু করে দিল। রোডমির গ্রানাডা থেকে কিছু দূরে তার বাহিনীকে সুসংগঠিত করল এবং মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসলমানরা সন্ধ্যা পর্যন্ত বীরত্বের সাথে মোকাবিলা করল। পরের দিন চূড়ান্ত যুদ্ধ হতে পারত, কিন্তু যখন গ্রানাডার আমিরের তাঁবু উপযুক্ত স্থানে স্থাপনের জন্য উপড়ে ফেলা হচ্ছিল, তখন এই গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে মুসলমানদের আমির পালিয়ে যাচ্ছে। এতে সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং অন্ধকারের মধ্যে তারা এমনভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল যে সকালে তাঁবুগুলো খালি পড়ে ছিল। রোডমির এই দৃশ্য দেখে আরও সাহসী হয়ে উঠল; সে পুনরায় দক্ষিণ-পূর্বের দিকে ফিরে গেল এবং লুটতরাজ করতে করতে ওয়ানিদাও পার করে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফেরার পথে তাকে আবারও মুসলিম অশ্বারোহীদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো যারা পেছন থেকে তার ওপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সে মার্সিয়া, শাতিবা এবং ভ্যালেন্সিয়া এড়িয়ে ভয়াত অবস্থায় কাস্টিলে ফিরে গেল। পনেরো মাসের এই কঠোর অভিযানে হাজার হাজার সৈন্য হারিয়েও সে একটি ছোট দুর্গও জয় করতে পারেনি। তবে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে দক্ষিণ-পূর্ব আন্দালুসে মুরাবিতুনদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। [১]

গ্রানাডার খ্রিস্টানদের দেশান্তর:

এই পুরো অভিযানটি গ্রানাডার বিশ্বাসঘাতক খ্রিস্টানদের সহায়তায় পরিচালিত হয়েছিল। তাই এই পরিস্থিতিতে বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে রুশদের দাদা কাজী আবুল ওয়ালিদ ইবনে রুশদ (৪৫০ হিজরি - ৫২০ হিজরি) ফতোয়া দিলেন যে, গ্রানাডায় অবস্থানরত খ্রিস্টানরা রাষ্ট্রের জন্য হুমকি। তাদের সমুদ্রের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া জরুরি। কাজী সাহেব নিজেই মরক্কো গিয়ে আমির আলী বিন ইউসুফকে এ বিষয়ে রাজি করালেন। এরপর গ্রানাডার সমস্ত খ্রিস্টান জনসংখ্যাকে মরক্কোতে স্থানান্তরিত করা হলো। সেখানে সত্তর হাজার দিনার ব্যয়ে মরক্কো শহরের সাথে লাগোয়া একটি আলাদা শহর তৈরি করে তাদের পুনর্বাসন করা হলো। ৫২০ হিজরিতে এই কাজ সম্পন্ন হওয়ার কয়েক মাস পরেই কাজী সাহেবের মৃত্যু হয়। [২]

কালআহ-এর ময়দানে মুসলমানদের পরাজয়:

৫২৩ হিজরিতে রোডমির আবারও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় এগিয়ে এল। মুসলমানরা উত্তরের দিকে অগ্রসর হলো এবং ইব্রো নদীর শাখা “সিংকা”-এর তীরে “কালআহ”-এর ময়দানে তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, কিন্তু এবারও

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩ / ১১০ থেকে ১১২, আত-তারিখুল ইসলামি ইলা সুকুতি গ্রানাডা: পৃষ্ঠা ৪৩১ থেকে ৪৩৩।

[২] আত-তারিখুল ইসলামি ইলা সুকুতি গ্রানাডা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৪৩৩, ৪৩৪।

তারা পরাজিত হলো। বারো হাজার মুজাহিদ শহীদ বা বন্দী হলেন।

আমির আলী বিন ইউসুফ এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে শাবান মাসে আন্দালুসের আমিরদের কাছে একটি সান্ত্বনাদায়ক ও উদ্দীপনামূলক পত্র পাঠান, যাতে বলা হয়েছিল যে ভাগ্যের লিখন অবশ্যই ঘটবে; যাই হোক, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জান ও মালের কুরবানি দিতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করা উচিত নয়। আমির লিখেছিলেন যে, তিনি যদি নিজে এই যুদ্ধে উপস্থিত থাকতেন, তবে তিনিও নিজের প্রাণ দিতে দ্বিধা করতেন না। [১]

আফরাগার যুদ্ধ, খ্রিস্টানদের পরাজয়, রডমিরের মৃত্যু:

বহু বছর ধরে আন্দালুসে শান্তি বজায় ছিল কারণ আরাগন ও কাস্তিলের খ্রিস্টান শাসকরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। এই বিবাদ থেকে মুক্ত হতেই ৫২৮ হিজরিতে আলফনসো রডমির বারো হাজার সৈন্য নিয়ে লারদার দক্ষিণ-পশ্চিমে সিনকা নদীর তীরে একটি উঁচু টিলার ওপর নির্মিত ‘আফরাগা’ (Fraga) দুর্গ অবরোধ করেন। মুরাবিতুনরা এবার পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল, তাই বালানসিয়ার শাসক ইয়াহইয়া বিন গানিয়া দ্রুত অগ্রসর হয়ে রডমিরের শিবিরের কাছে পৌঁছে যান।

আফরাগা অত্যন্ত সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, তাই রডমির শপথ করেছিলেন যে মৃত্যু আসলেও তিনি এই দুর্গ জয় না করে পিছু হটবেন না। ইয়াহইয়া বিন গানিয়ার আগমনে তাকে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে হয়। প্রাথমিক সংঘর্ষের পর ২৩ রমজান ৫২৮ হিজরিতে উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ওদিকে পেছন থেকে আফরাগার মুসলমানরাও ময়দানে বেরিয়ে আসেন। ক্রুসেডার বাহিনী মুসলমানদের দ্বিমুখী আক্রমণে আটকা পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। রডমির দীর্ঘক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধ করার পর অবশেষে হতাশ হয়ে পালিয়ে যান এবং একটি পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেন, কিন্তু মুরাবিতুনরা ধাওয়া করে সেখানেও পৌঁছে যায়। রডমির রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় সুরকুস্তা (সারাগোসা) পৌঁছান। কয়েক দিন পর তিনি সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতেই মারা যান। [২]

আল-বাকার যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্য:

সেই দিনগুলোতে অন্য একটি ফ্রন্টে কাস্তিলের খ্রিস্টানরা আক্রমণ চালায়। মুসলমানরা মুরাবিতুনদের যুবরাজ তাশফিন বিন আলীর নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করেন। এক পর্যায়ে শত্রুদের চাপ এতটাই বেড়ে যায় যে অধিকাংশ ইসলামী বাহিনী পিছু হটে যায় এবং তাশফিন বিন আলীর সাথে মাত্র চল্লিশজন অশ্বারোহী অবশিষ্ট থাকে। তাকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় কিন্তু তিনি বলেন:

“আমি উন্মতকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না, যতক্ষণ না এই আক্রমণ প্রতিহত হচ্ছে আমি এখানেই থাকব।”

এই কথা বলে তিনি তলোয়ার ও ঢাল হাতে নিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার বীরত্ব মুরাবিতুনদের টলায়মান পা স্থির করে দেয়। এক শক্তিশালী আক্রমণে কাস্তিলের সেনাপতি নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যবাহিনী পালিয়ে যায়। এই যুদ্ধ কর্ডোভা থেকে বিশ কিলোমিটার উত্তরে আল-বাকার (Albear) নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ১১৮, ১১৯

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃষ্ঠা ৩৩৭; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ১২৩

[৩] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৩৩৮, ৩৩৯

একটি ঐতিহাসিক বিচ্যুতি, খ্রিস্টানদের আক্রমণ অব্যাহত:

মুরাবিতুনরা যেভাবে যাল্লাকার যুদ্ধের পর তলেয়তোলা দখলের চেষ্টা করেনি, তেমনি একই সময়ে অর্জিত এই উভয় গৌরবময় বিজয়ের পরেও তারা তলেয়তোলা বা সারাগোসার দিকে অগ্রসর না হয়েই ফিরে আসার পথ বেছে নেয়, যদিও সেই সময়ে খ্রিস্টানদের এই কেন্দ্রগুলো অবরোধ করা খুব একটা কঠিন ছিল না। এটি ছিল একটি সামরিক ভুল যার ফলাফল পরবর্তীতে অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই ক্রুসেডার কেন্দ্রগুলো থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব আন্দালুসে ক্রমাগত আক্রমণ চলতে থাকে।

কাস্টিলের বাহিনী তলেয়তোলার দক্ষিণ দুর্গ “সুরাহ”-কে কেন্দ্র বানিয়ে কর্ডোভা ও সেভিলের শহরতলিতে আক্রমণ চালাতে থাকে। ৫৩৫ হিজরিতে (১১৪০ খ্রি.) তাশফিনের বাহিনী একটি তীব্র আক্রমণ চালিয়ে এই দুর্গটি জয় করে নেয়। এতে আলফনসো রেমন্ডস অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। সে পরের বছর একটি বাহিনী পাঠিয়ে কর্ডোভা ও সেভিলের গুরুত্বপূর্ণ শহরতলি দুর্গ “কুরিয়া” ছিনিয়ে নেয়। [১]

আলী বিন ইউসুফের মৃত্যু:

৭ রজব ৫৩৭ হিজরি (৬ ফেব্রুয়ারি ১১৪৩ খ্রি.) আলী বিন ইউসুফ ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। [২]

হাফেজ যাহাবী রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি সাহসী, মুজাহিদ, ন্যায়পরায়ণ, দ্বীনদার, মুত্তাকী ও নেককার ছিলেন। ওলামায়ে কেরামকে সম্মান করতেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন। তার যুগে ফিকহ ও আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল এত প্রসার লাভ করেছিল যে মানুষ হাদিসের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছিল। দর্শন ও ইলমে কালামকে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ আলীর মনে এটি গেঁথে গিয়েছিল যে ইলমে কালাম হলো বিদআত, যেমনটি আসলাফগণ মনে করতেন।” [৩]

আলী বিন ইউসুফের শেষ দিনগুলোতে মুরাবিতুন সাম্রাজ্যে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। এর একটি কারণ ছিল এই যে, আলী নিজে সাহসী ও পরহেজগার হওয়া সত্ত্বেও তার পিতার মতো দূরদর্শী ও সতর্ক ছিলেন না। তার পিতা কঠোর পরিশ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন জিহাদের মাধ্যমে যে বিশাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আলী কেবল তা রক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। আন্দালুসে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল সেগুলোও ছিল নিছক আত্মরক্ষামূলক। আলী তার ৩৭ বছরের দীর্ঘ শাসনামলে খ্রিস্টানদের কোনো বড় শহর জয় করতে পারেননি। অধিকন্তু, তিনি শেষ বছরগুলোতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ক্লান্ত হয়ে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে প্রশাসনিক কাজে সবদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে শুরু করেছিল। আলী এসব খবর শুনে দোয়া করতেন: “হে আল্লাহ! এমন রাষ্ট্র এমন লোকদের দান করুন যারা এটি পরিচালনা করতে পারে।” আলীর জীবনের শেষ বছরগুলোতে আফ্রিকা থেকে মুওয়াহহিদুনরা এক শক্তিশালী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং পরবর্তীতে পুরো মরক্কো ও ইসলামী আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে। [৪]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৫০৬, ৫০৭

[২] তারিখুল ইসলাম লিজ-যাহাবী: ১১/ ২৭, তাহকীক বাশার

[৩] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০/ ১২৩, ১২৫, ত তিবআতুর রিসালাহ

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০/ ১২৩, ১২৫, ত তিবআতুর রিসালাহ

তাশফিন বিন আলী

৫৩৭ হিজরি থেকে ৫৩৯ হিজরি

(১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১১৪৫ খ্রিষ্টাব্দ)

আলীর উত্তরসূরি তাশফিন বিন আলী ব্যক্তিগতভাবে একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন।

আল্লামা ইবনুল খাতিব তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন:

“তিনি ছিলেন বীর্যবান, সাহসী এবং আচার-আচরণে পছন্দনীয়। তিনি শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। সাধারণ ও বিশিষ্ট সকলের কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ছিল চমৎকার। তিনি সীমান্ত রক্ষা করতেন এবং শত্রুদের চোখে কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকতেন। তিনি দিনে রোজা রাখতেন, রাতে ইবাদত করতেন, প্রচুর পরিমাণে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন, গোপনে সদকা ও খয়রাত করতেন এবং ন্যায়বিচার ও সত্যকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন। তিনি প্রায়ই নিজেই মামলার শুনানি করতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানানুরাগী। ফকিহ ও শিক্ষার্থীদের তিনি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত করতেন। তিনি স্পেনে খ্রিস্টানদের বেশ কয়েকবার পরাজিত করেন।” [১]

আন্দালুসে মুরাবিতুনদের সাফল্য:

তাশফিন বিন আলী শাসনের জন্য মাত্র তিন বছর সময় পেয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি একই সাথে খ্রিস্টান এবং মুওয়াহহিদুনদের সাথে যুদ্ধরত ছিলেন। ৫৩৮ হিজরিতে (১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) স্পেনের দুই প্রখ্যাত জেনারেল: মার্টিন ফার্নান্দো এবং নুনিও আলফোনসোর নেতৃত্বে মুসলিম আন্দালুসের বিরুদ্ধে এক বিশাল সামরিক অভিযান চালানো হয়। তবে এবার মুরাবিতুনরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং কাস্টিলীয় বাহিনীকে হ্রস্বভিন্ন করে দেন। মার্টিন গুরুতর আহত হয়ে পালিয়ে যান। নুনিও আলফোনসো পালানোর সময় নিহত হন এবং তাঁর মস্তক কর্তন করে তাশফিনের কাছে মরক্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। [২]

মুওয়াহহিদুনদের সাথে যুদ্ধে তাশফিনের পরাজয়:

এদিকে তাশফিন মরক্কোতে মুওয়াহহিদুনদের মোকাবিলা করছিলেন। তিনি “ওরান”-এ থাকাকালীন মুওয়াহহিদুনরা শহরটি অবরোধ করে। তাশফিন শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে শহর থেকে পালিয়ে যান, কিন্তু মুওয়াহহিদুনরা খবর পেয়ে যায় এবং ছায়ার মতো তাঁর পিছু নেয়। তাশফিন একটি পাহাড় অতিক্রম করার সময় ঘোড়াসহ নিচে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে...

[১] আল-ইহাতা ফি আখবারিল গারনাতা: তালখিসুত তাজকিরা তাশফিন বিন আলী, ১ / ২২৭ থেকে ২২৯; আল-বায়ানুল মাগরিব: ৩ / ৮০, ৮৯

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩ / ৫০৬, ৫০৭

ইন্তেকাল করেন। এটি ২৭ রমজান ৫৩৯ হিজরি (২৩ এপ্রিল ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা।

[১]

আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন তাশফিন

৫৩৯ থেকে ৫৪১ হিজরি

(১১৪৫ থেকে ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

তাশফিন বিন আলীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর আমিরগণ তার ভাই আবু ইসহাক ইব্রাহিমকে, যার বয়স ছিল ষোলো বছর, সিংহাসনে বসিয়ে দেন, যিনি যোগ্য ছিলেন না। মুওয়াহহিদুনরা তাকে মারাকেশে ঘেরাও করে ফেলে। মুরাবিতুনরা সর্বাঙ্গিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং নয় মাস পর্যন্ত মুওয়াহহিদুনদের শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি। তবে ১৮ শাওয়াল ৫৪১ হিজরি (২৩ এপ্রিল ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) মুওয়াহহিদুন সৈন্যরা মই এবং দড়ির সাহায্যে প্রাচীরে আরোহণ করে এবং শহর দখল করে নেয়। এভাবে মুরাবিতুনদের শাসনকাল প্রতিষ্ঠার ৭৬ বছর পর মুওয়াহহিদুনদের হাতে শেষ হয়ে যায়। মুওয়াহহিদুনরা কেবল মুরাবিতুনদের অটেল ধন-সম্পদই লুণ্ঠন করেনি, বরং শহরে নারী ও শিশুদের বাদ দিয়ে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের গণহত্যা চালায় যা তিন দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

আবু ইসহাক ইব্রাহিম যিনি একটি কোণে লুকিয়ে ছিলেন, ধরা পড়েন। আব্দুল মুমিন তার প্রতি দয়া অনুভব করেন। তিনি তাকে জীবিত ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার আমিরগণ হত্যার জন্য জেদ ধরেন, ফলে তাকে হত্যা করা হয়। [২]

মুরাবিতুনদের শাসনকালের ওপর একটি মন্তব্য:

মুরাবিতুনদের শাসনকাল সাধারণ বিচারে আন্দালুসের জন্য একটি নেয়ামত ছিল। সেই যুগের আলেমগণ বিভিন্ন স্থানে এর প্রশংসা করেছেন। ইশবিলিয়ার কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি (মৃত্যু ৫৪৩ হিজরি) বলতেন:

“মুরাবিতুনরা হকের দাওয়াত এবং দ্বীনের সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তারা ছিলেন মুসলমানদের রক্ষক এবং মুজাহিদ।” [৩]

ইবনে আবি যার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন:

“লামতুনা গোত্রের লোকেরা দ্বীনদার, নেক নিয়ত এবং সঠিক আকিদার অধিকারী ছিলেন। তারা আন্দালুসে খ্রিস্টানদের সীমান্ত থেকে শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত, বিজায়া শহর থেকে মারাকেশের উপকূল পর্যন্ত এবং কুহিস্তান-ই-যাহাব থেকে সুদান পর্যন্ত শাসন করেছেন। তাদের দীর্ঘ শাসনকাল সত্ত্বেও কোনো ভুল প্রথা জন্ম নেয়নি, শহর বা গ্রামে কোনো ট্যাক্স ধার্য করা হয়নি, দুই হাজারেরও বেশি শহরে তাদের জন্য খুতবা দেওয়া হতো। তাদের যুগ ছিল দুশ্চিন্তামুক্ত, সমৃদ্ধি, প্রশস্ততা, নিরাপত্তা এবং শান্তির যুগ।”

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী, পৃষ্ঠা: ৩৩১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩ / ২৫১

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, পৃষ্ঠা: ৩৩১, ৩৩২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩ / ২৬০ থেকে ২৬৫

[৩] আল-হুলালুল মাওশিয়া ফি জিকরিল আখবারিল মাররাকুশিয়া: পৃষ্ঠা ১৩০, তাবা দারুর রাশাদ আল-হাদিসা

...না কোনো ষড়যন্ত্র ছিল, না কোনো ডাকাতি বা দস্যুতা। মানুষ তাদের পছন্দ করত। [১]

মুরাবিতুনদের পতনের কারণসমূহ:

মুরাবিতুনদের আকস্মিক পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- উত্তর স্পেনের খ্রিস্টানরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক বিশাল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, যারা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে মিলে ইসলামী সীমান্তে ক্রমাগত যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং মুরাবিতুনদের দুর্বল করে দিয়েছিল।
- মুরাবিতুনরা আন্দালুসের অনেক আমিরের আন্তরিক সমর্থন পায়নি। এই আমিররা বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশে অভ্যস্ত ছিল এবং মুরাবিতুনদের সাধারণ জীবনযাত্রাকে তুচ্ছাঙ্গন করত। বিশেষ করে আন্দালুসের অধিকাংশ আরব আমির মুরাবিতুনদের বারবার বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে শাসনের অযোগ্য মনে করত। অনারব আমিররাও মুরাবিতুনদের বিদেশি মনে করে তাদের ক্ষমতা অপছন্দ করত।
- মুরাবিতুনদের শাসনে কিছু দুর্বলতাও ছিল। শরীয়ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তারা কোনো কোনো স্থানে অহেতুক কঠোরতা অবলম্বন করেছিল। যারা তওবা করে তাদের আনুগত্য স্বীকার করত, তারা যদি পূর্ববর্তী অপরাধ বা গুনাহ স্বীকার করে নিত অথবা তাদের বিরুদ্ধে সেই পাপাচারের প্রমাণ পাওয়া যেত, তবে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হতো। এই কঠোরতা অনেক মানুষের বিমুখ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- মুরাবিতুনদের মধ্যেও ইসলামী শাসন উত্তরাধিকারসূত্রে রাজতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছিল, যদিও তাদের সকল শাসকই মুভাক্কী ও যোগ্য ছিলেন। কিন্তু একটি বারবার পরিবারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে অন্যান্য বারবার গোত্রগুলোর মধ্যে হিংসা ও আস্থার অভাব দেখা দিতে শুরু করে। মুওয়াহহিদুনরাও বারবার ছিল এবং তাদের উত্থানের মূল কারণ ছিল এই উত্তেজনা।
- মুওয়াহহিদুনরা খুব দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে পূর্ব দিক থেকে মুরাবিতুনদের ওপর আক্রমণ শুরু করে এবং তাদের বাহিনীকে একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। যদি মুওয়াহহিদুনদের উত্থান না হতো, তবে মুরাবিতুনরা আন্দালুসের খ্রিস্টানদের কাছে দমে যাওয়ার মতো ছিল না।

মুরাবিতুন আমিরদের তালিকা

ক্রমিক নং শাসকের নাম হিজরি সন ঈসায়ী সন শাসনের মেয়াদ

১ ইউসুফ বিন তাশফিন ৪৮৩ হি. থেকে ৫০০ হি. ১০৯১ খ্রি. থেকে ১১০৬

খ্রি. ১৬ বছর

২ আলী বিন তাশফিন ৫০০ হি. থেকে ৫৩৭ হি. ১১০৬ খ্রি. থেকে ১১৪৩

খ্রি. ৩৭ বছর

৩ তাশফিন বিন আলী ৫৩৭ হি. থেকে ৫৩৯ হি. ১১৪৩ খ্রি. থেকে ১১৪৫

খ্রি. ২ বছর

৪ আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন তাশফিন ৫৩৯ হি. থেকে ৫৪১ হি. ১১৪৫

খ্রি. থেকে ১১৪৭ খ্রি. ২ বছর

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, লেখক: আব্দুর রহমান আলী, পৃষ্ঠা ৪৩৬।

দ্রষ্টব্য: আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের শাসন আফ্রিকায় ৪৬২ হিজরি থেকে ৫০০ হিজরি (১০৭০ খ্রি. থেকে ১১০৬ খ্রি.) পর্যন্ত ছিল, যা সর্বমোট ৩৮ বছর হয়।

এখানে তালিকায় শুধুমাত্র আন্দালুসের শাসনের সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস | পঞ্চম খণ্ড

আন্দালুসে মুওয়াহহিদুনদের যুগ

৫৪১ হিজরি থেকে ৬২৯ হিজরি

(১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৩২ খ্রিস্টাব্দ)

৮৮ বছর

ইবনে তুমারত

তাশফীন বিন ইউসুফের যুগে আফ্রিকার মুওয়াহহিদিন আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এটি এমন এক সময় ছিল যখন মিশরের তথাকথিত ফাতেমী খিলাফত (বনু উবাইদ) এবং তাদের থেকে জন্ম নেওয়া বাতেনিয়াতের মতো গোমরাহীর অন্যান্য শাখাগুলো ইসলামের ওপর সরাসরি আক্রমণাত্মক ছিল। তাই ইসলামী আকিদা ও আসলাফদের মানহাজ কায়েম রাখতে এবং কুরআন ও সুন্নাহর মতাদর্শে মিশ্রণ দূর করার জন্য অনেক আলেম তৎপর হয়ে ওঠেন। এরই মধ্যে উত্তর মরক্কো থেকে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন তুমারত নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যিনি দেখতে দেখতে হাজার হাজার মানুষকে নিজের অনুসারী বানিয়ে প্রাচ্যে বনু উবাইদ এবং পাশ্চাত্যে মুরাবিতীনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেন।

মুরাবিতীনরা শুরুতে আল্লাহর পথে জিহাদ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং অপকর্ম ও বিদআত দূর করার জন্য জেগে উঠেছিল। কিন্তু যখন ক্ষমতা “লামতুনা” সম্প্রদায় এবং তাদের সানহাজি মিত্র গোত্র “কাদালা” ও “মাসুফা”র মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল এবং বংশীয় রাজতন্ত্রের প্রাচীন ধারা শুরু হলো, তখন বারবারদের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো। বারবারদের মাসমুদী গোত্রগুলো যাদের ক্ষমতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেওয়া হয়েছিল, তারা ক্ষুব্ধ হয়ে যেকোনো বিদ্রোহী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। মুহাম্মদ বিন তুমারত এই মাসমুদীদেরই একটি শাখা “হারগা”র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

ইবনে তুমারত ব্যক্তিগতভাবে আলেম ও ফাজিল হওয়ার পাশাপাশি অনেক বড় আবেদ, জাহিদ এবং মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। নিজের দাবি অনুযায়ী তিনি হযরত হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন, কিন্তু গবেষকদের মতে এটি একটি প্রমাণহীন দাবি ছিল যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, অন্যথায় প্রকৃতপক্ষে তিনি বারবার বংশোদ্ভূত ছিলেন। তার জন্ম ৪৮৭ হিজরিতে আফ্রিকার মরু অঞ্চলে হয়েছিল। ৫০১ হিজরিতে তিনি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বের হন। প্রথমে ফুসতাত পৌঁছান। এরপর এশিয়া সফর করেন, বাগদাদে আবু বকর আশ-শাশী থেকে ফিকহ এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় আবু বকর তারতুশী থেকে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন।

প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি ইমাম গাজালী (রহ.)-এর মজলিসে পৌঁছেছিলেন, যিনি সে সময় বাগদাদে (অথবা এক বর্ণনা অনুযায়ী শামে) ছিলেন। ইমাম গাজালী (রহ.) তখন আন্দালুসে তার বইপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আক্ষেপ করে বলছিলেন: “শীঘ্রই মুরাবিতীনদের শাসনের অবসান ঘটবে এবং তাদের সন্তানদের হত্যা করা হবে, আর এই কাজ যে ব্যক্তির হাতে হবে আমার মনে হয় সে এই মজলিসেই আছে।” [১]

এক বর্ণনা অনুযায়ী ইবনে তুমারত নিজেই তাদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে, আন্দালুসে “এহয়াউল উলুম” পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

[১] আল-মু'জিব ফি তালখিস আখবারিল মাগরিব, আব্দুল ওয়াহিদ আল-মাররাকুশী: ১৪৬/১

এর ওপর ইমাম গাজালি রহ. হাত তুলে মুরাবিতুনদের জন্য বদদোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! তাদের শাসনকে টুকরো টুকরো করে দিন যেমন তারা এই কিতাবটি ছিঁড়েছে। তাদের সালতানাত খতম করে দিন যেমন তারা এটি পুড়িয়েছে।” সকল ছাত্ররা ‘আমিন’ বলল। এরপর ইবনে তুমারত আবেদন করলেন যে, দোয়া করুন যেন এই কাজটি আমার হাতে হয়। ইমাম গাজালি রহ. তার জন্য এই দোয়াও করে দিলেন। [১]

বদদোয়ার বর্ণনার ওপর সমালোচনা ও পর্যালোচনা:

এই বর্ণনাটি গবেষণার মূলনীতির ওপর টিকে না। এর সন্দেহজনক হওয়ার কারণগুলো নিচে দেওয়া হলো:

- ইমাম গাজালি রহ. বাগদাদে ৪৮৮ হিজরি পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন। এই সময়ে তিনি মুরাবিতুনদের প্রশংসাকারী ছিলেন। আমির ইউসুফ বিন তাশফিনকে মুলুকুত তাওয়ায়েফদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বৈধতার ফতোয়া প্রদানকারীদের মধ্যে তিনিও অগ্রগণ্য ছিলেন। ৪৮৮ হিজরিতে তিনি তাসাউফের দিকে ঝুঁকে বাগদাদ ত্যাগ করেন। এগারো বছর পর্যন্ত দামেস্ক, বাইতুল মুকাদ্দাস, আলেকজান্দ্রিয়া, মক্কা ও মদিনায় জাহিদ ও রিয়াজতের জীবন অতিবাহিত করেন। জিলকদ ৪৯৯ হিজরিতে তিনি বাগদাদে ফিরে আসেন কিন্তু না থেমে নিশাপুরে চলে যান এবং সেখানে পড়ানো শুরু করেন। তবে ৫০০ হিজরির শুরুর দিকে সেখান থেকেও ইস্তফা দিয়ে দেন এবং আমির ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে যাওয়ার জন্য সফরের প্রস্তুতি নেন, কিন্তু যখন আমিরের মৃত্যুর খবর পেলেন তখন থেমে গেলেন। এরপর তার বাকি জীবন ইরানের তুস শহরে লেখালেখির কাজে অতিবাহিত হয়। জমাদিউল আখিরা ৫০৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

এর অর্থ হলো ৫০১ হিজরিতে ইবনে তুমারতের সফর শুরু হওয়ার আগেই ইমাম গাজালি রহ. ইরানে চলে গিয়েছিলেন, তাই এটি অত্যন্ত অসম্ভব যে ইবনে তুমারত বাগদাদ বা সিরিয়ায় তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই কারণেই আল্লামা ইবনুল আসির আল-জাযারি রহ.-ও এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন: “সঠিক কথা হলো ইবনে তুমারতের সাথে তার (ইমাম গাজালি) সাক্ষাৎ হয়নি।” [২]

- আন্দালুসে ‘এহয়াউ উলুমিদ্দীন’-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা ৫০৩ হিজরিতে আরোপ করা হয়েছিল। সেই সময় ইমাম গাজালি রহ. ইরানে ছিলেন। দুই বছর পর ইমাম গাজালি রহ. ইন্তেকাল করেন। আন্দালুসের খবর ইরানে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল। ইবনে তুমারত এই খবর ইমাম গাজালি রহ.-কে কেবল তখনই দিতে পারতেন যদি এই ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই তিনি আন্দালুস থেকে ইরানের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন।
- ইমাম গাজালি রহ.-এর উচ্চতর নৈতিকতা থেকে এটি সুদূরপর্যন্ত যে, তিনি একটি ইসলামি সরকারের বিরুদ্ধে কেবল এই কারণে ধ্বংসের বদদোয়া দেবেন যে তারা তার ইলমের প্রবক্তা ছিল না। মুরাবিতুনরা কুরআন ও হাদিস অস্বীকার করেনি। তারা কেবল একজন আলেমের রচনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাছাড়া এই পুরো বিষয়ে মূল ভূমিকা সরকারের ছিল না বরং সেই দরবারি আলেমদের ছিল যাদের সাথে ইমাম গাজালির মতভেদ ছিল। এই প্রেক্ষাপটে মুরাবিতুনদের ধ্বংসের বদদোয়া দেওয়া ইমাম গাজালির নৈতিকতার পরিপন্থী মনে হয়।

এমনটি মনে হয় যে, যেভাবে ইবনে তুমারতের হাসানি হওয়া কেবল একটি দাবি ছিল, তেমনি ইমাম গাজালি রহ.-এর মুরাবিতুনদের জন্য বদদোয়ার কাহিনীটিও রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আলাম।

[১] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব লি ইবনিল আযারি আল-মাররাকুশি: ৩/ ৭৭

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫১৩ হিজরি

ইবনে তুমারতের আন্দোলন:

ইবনে তুমারতের জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। একটি পেয়ালা এবং একটি লাঠি ছাড়া তার কাছে আর কিছুই থাকত না, এই ফকিরের বেশে তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি এক অমায়িক হাসির সাথে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাদের মন জয় করে নিতেন। তবে তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন এবং প্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলতেন না। [১]

ইসলামী সমাজে প্রচলিত ভুল আকিদা, হারাম কাজ এবং গুনাহের কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন, তাই যেখানেই যেতেন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাওহীদের ব্যাখ্যা করতেন। তার দাওয়াত গ্রহণকারীরা “মুওয়াহহিদুন” নামে পরিচিত হতে শুরু করে। তিনি অত্যন্ত কঠোরতার সাথে নেক কাজের আদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতেন। কিন্তু তার আকিদা ও মতাদর্শে কিছু বিষয় আপত্তিজনক ছিল, তাই বিভিন্ন স্থানে উলামায়ে কেরাম তার বিরোধিতা করেন, তাকে বারবার শহর থেকে বহিষ্কারের কষ্ট সহ্য করতে হয়। মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি মিশরে যান, সেখানেও বিরোধিতা হলে তিউনিসিয়ার শাসকদের নিজের ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারা প্রভাবিত করে মরক্কো পৌঁছে যান যেখানে মুরাবিতুনদের শাসন ছিল। আমির আলী বিন ইউসুফ প্রথমে তার কর্মকাণ্ডকে সন্দেহজনক মনে করে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু পরে একজন সাধারণ ফকির ও মজজুব মনে করে শহর থেকে বহিষ্কার করার ওপরই ক্ষান্ত হন।

৫১৫ হিজরিতে ইবনে তুমারত মরক্কোর “সুস” শহর থেকে কিছুটা দূরে পাহাড়ি এলাকা “তিন মালাল”-কে নিজের আস্তানা বানিয়ে নেন। স্থানীয় গোত্রগুলোর কয়েকজন সরদার তার মুরিদ হলে মানুষের ঢল নামতে শুরু করে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে নিজের পীর হিসেবে মানতে শুরু করে। তিনি নিজের সিলসিলাকে আধ্যাত্মিকতার রঙ দেন। তার অনুসারীরা তাকওয়া ও দ্বীনদারির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ইবনে তুমারতের ধারণা ছিল যে, কেবল মৌখিক দাওয়াত এবং ব্যবহারিক নমুনা পেশ করে মুসলিম বিশ্বে কোনো সর্বাঙ্গিক বিপ্লব আনা সম্ভব নয়, এর জন্য অনেক বড় রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। তিনি দেখেছিলেন যে এর আগে অনেক রাজনীতিবিদ মাহদী হওয়ার দাবি করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করেছেন এবং বড় বড় সরকারের তখত উল্টে দিয়েছেন। তাই ইবনে তুমারত শরীয়ত জারি করার জন্য এই পথই বেছে নেন এবং মাহদী হওয়ার দাবি করেন। তিনি নিজেকে “امام معصوم” (ইমামে মাসুম)-ও বলতেন। তার পদ্ধতিতে বনু উবাইদের দাওয়াতের মতো মকর ও ফরেবও (ছলচাতুরী) স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত। সেই সাথে মুতাজিলাদের আকিদা ও মতাদর্শের সংমিশ্রণও দেখা যেত।

তিনি একটি আলিশান মসজিদ নির্মাণ করে সেটিকে নিজের কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি এবং হিদায়াতের একটি বিশেষ পাঠ্যক্রম তৈরি করেন যাকে “মুরশিদা” বলা হতে থাকে। মুরিদদের স্তর নির্ধারণ করেন। দশজন বিশেষ খাদেমের একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং পঞ্চাশজন বারবার সরদারের একটি মজলিসে শূরা কায়েম করেন। সাধারণ মুরিদদের “মুমিন” বা “মুওয়াহহিদ” বলা হতো। তাদের সবাইকে এই বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে দুনিয়াতে তাদের মতো সত্যবাদী, পবিত্র এবং খাঁটি মুসলমান আর কোথাও নেই। তারা মুওয়াহহিদুন এবং বাকি সবাই তাওহীদ থেকে...

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৯/৫৩০, ৫৩১, ত. আর-রিসালাহ।

বিমুখ হয়ে গেছে। এই সময়ে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সরকার বাতিলের অনুসারী, তাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব।

এই সময়ে আব্দুল মুমিন নামক এক অত্যন্ত চতুর, যোদ্ধা এবং কুশলী যুবক তার ডান হাত হয়ে উঠেছিল। ইবনে তুমারত তাকে নিজের নায়েব বানিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক বিষয় তার হাতে সোপর্দ করেন এবং তাকে ‘আমিরুল মুমিনিন’ উপাধি দেন।

৫১৭ হিজরিতে তিনি আব্দুল মুমিনকে বলেন:

“মুরাবিতিনদের দাওয়াত দাও যেন তারা গুনাহ ও বিদআত বন্ধ করে এবং ইমাম মাসুমের ওপর ঈমান আনে। যদি তারা না মানে, তবে শরীয়ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়।”

এভাবে মুরাবিতিন ও মুওয়াহহিদিনদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। আমির আলী বিন ইউসুফের পুত্র জুবায়ের বিন আলী মুরাবিতিনদের সেনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন এবং আব্দুল মুমিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। ইবনে তুমারত এই পরাজয়ের খবর শুনে বলেন: “যদি আব্দুল মুমিন নিরাপদ থাকে, তবে মনে করো সবাই নিরাপদ আছে।”

ইবনে তুমারত আফ্রিকানদের এমনভাবে নিজের ভক্ত বানিয়েছিলেন যে, কোনোভাবেই তার শক্তির অবসান ঘটানো সম্ভব ছিল না। তার একটি ইশারায় ভাই নিজের ভাইয়ের শিরশ্ছেদ করে দিত। তার প্রভাব ও জনপ্রিয়তার অবস্থা এমন ছিল যে, সরকারি কর্মকর্তারা তার হাত চুম্বন করত। তিনি যদি কোনো বন্দিকে ছেড়ে দেওয়ার ইশারা করতেন, তবে কর্মকর্তারা সামান্যতম দ্বিধাবোধ করত না।

ইবনে তুমারত সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা নেকি প্রচারের জন্য মন্দ কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি তার বিরোধীদের জীবিত ছাড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না। কোহিস্তান তিনমালের গোত্রগুলো তাকে আশ্রয় দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তারা তার ইমাম মাসুম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করে। ইবনে তুমারত তাদের সবাইকে হত্যা করান। যখন তার উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত একজন ফকিহ এই হিতৈষী মেজবানদের হত্যা করার ব্যাপারে আপত্তি জানান, তখন ইবনে তুমারত তাকেও এই বলে হত্যা করান যে, সে আমার মাসুম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতে শুরু করেছে।

৫২৪ হিজরিতে ইবনে তুমারত ইন্তেকাল করেন এবং সমস্ত বিষয় আব্দুল মুমিনের হাতে চলে আসে। [১]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ১৯ / ৫৩৩ থেকে ৫৫৪, ত. আর-রিসালাহ; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩ / ১৫৫-২২০

আব্দুল মুমিন

৫২৭ হিজরি থেকে ৫৫৮ হিজরি (১১৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

আব্দুল মুমিন ৪৮৭ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন লালচে-সাদা বর্ণের, সুদর্শন, মাঝারি উচ্চতার এবং গম্ভীর কণ্ঠস্বরের অধিকারী একজন ব্যক্তি। কিছু ঐতিহাসিক তাকে আরব গোত্র বনু মুখবারের শাখা ‘কুমা’র সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেন এবং কেউ কেউ মুদার গোত্রের শাখা ‘কায়েস’ এর সাথে। তবে সঠিক কথা হলো তিনি ছিলেন বারবার। তার মুদারি আরব হওয়ার দাবিটি ঠিক তেমনই যেমন ইবনে তুমারতের আলভী হওয়ার দাবি।

আব্দুল মুমিন শৈশব থেকেই নেক আমল ও ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। তার মধ্যে ইখলাস, বুদ্ধিমত্তা, কঠোর পরিশ্রম, বাগ্মিতা এবং সাহসিকতাসহ সেই সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান ছিল যা উচ্চপর্যায়ের নেতাদের মধ্যে থাকা আবশ্যিক। জ্ঞান অর্জনের জন্য সফরের সময় ইবনে তুমারতের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। আব্দুল মুমিন তার মুরিদ হয়ে যান এবং বছরের পর বছর এমনভাবে খেদমত করেন যে, শেষ পর্যন্ত ইবনে তুমারত তাকেই নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।

আব্দুল মুমিন নেতৃত্ব গ্রহণ করে মুরাবিতুনদের এলাকায় হস্তক্ষেপ শুরু করেন। আলী বিন ইউসুফের শাসনামল পর্যন্ত তিনি বিশেষ কোনো সাফল্য পাননি, তবে যেহেতু মুওয়াহহিদুনরা অত্যন্ত দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় নিজেদের আস্তানা তৈরি করে রেখেছিল, তাই মুরাবিতুনরা তাদের পুরোপুরি দমন করতে পারেনি।

৫৩৭ হিজরিতে আলী বিন ইউসুফের মৃত্যুর সাথে সাথেই আব্দুল মুমিন মুরাবিতুনদের এলাকায় চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু করেন। মুরাবিতুন আমির তাশফিনের অধিক মনোযোগ ছিল আন্দালুসের জিহাদের দিকে এবং সেখানে খ্রিস্টানদের সাথে কঠিন যুদ্ধ চলছিল। এমন পরিস্থিতিতে মুরাবিতুনরা দুই ফ্রন্ট সামলাতে পারেনি। মুওয়াহহিদুনদের শক্তি ছিল অপারিসীম এবং তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল অতুলনীয়। ফলে ৫৪০ হিজরিতে ‘ফাস’ মুরাবিতুনদের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরের বছর তারা সেউতা, তাঞ্জিয়ার এবং আগমাত-এও ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

পরিশেষে মুওয়াহহিদুনরা মুরাবিতুনদের রাজধানী “মারাক্কেশ” অবরোধ করে এবং এগারো মাসের যুদ্ধের পর ৫৪২ হিজরিতে তা দখল করে মুরাবিতুনদের শেষ শাসক আবু ইসহাক ইব্রাহিম বিন আলীকে গ্রেপ্তার করে, যিনি তখনো কিশোর ছিলেন। আব্দুল মুমিন তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার অফিসাররা জেদ করে তাকে হত্যা করে। এভাবেই মুরাবিতুন শাসনের অবসান ঘটে। [১] মুওয়াহহিদুন এবং মুরাবিতুনদের মধ্যকার এই সংঘাত প্রকৃতপক্ষে দুঃখজনক ছিল। যদিও মুওয়াহহিদুনরা একে ধর্মীয় রঙ দিত।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ২৬০ থেকে ২৭০; তারিখুল ইসলাম লিজ-জাহাবি: ৩৭/ ৭, ৮, ১০; ইবনুল আসির।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বার্বারদের দুটি শক্তিশালী গোত্রের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই। মুরাবিতুনদের শাসনে এমন কোনো বড় ত্রুটি ছিল না যে তলোয়ারের জোরে তা শেষ করতে হতো। একই আকিদা, একই মতাদর্শ এবং একই ধর্মের অনুসারীদের এই পারস্পরিক লড়াইকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য কোনো নাম দেওয়া যায় না।

এ কথা সত্য যে মুওয়াহহিদুনরাও আন্দালুস পাহারা দিয়েছিল, কিন্তু আন্দালুসবাসীদের সাথে মুওয়াহহিদুনদের সহযোগিতাকে মুরাবিতুনদের সমতুল্য মনে করা যায় না। মুরাবিতুনরা আন্দালুসকে সেই সময় বাঁচিয়েছিল যখন মুলুকুত তাওয়ায়েফদের স্বার্থপরতা এবং নাসারাদের ভয়াবহতা এই দেশটিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু মুওয়াহহিদুনরা প্রথমে নিজেরাই আন্দালুসের রক্ষকদের দুর্বল করে নাসারাদের আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং পরে ক্ষতিপূরণের জন্য ময়দানে এসেছিল। যেন ক্ষত সৃষ্টিকারীও তারাই ছিল এবং মলম লাগানোর লোকও তারাই। মুরাবিতুনরা ছিল নিছক রক্ষক যারা আন্দালুস থেকে কিছু না নিয়েই নিজেদের সময় পূর্ণ করে চলে গিয়েছিল।

আন্দালুসে নাসারাদের তাণ্ডব:

এই সময়ে কাস্তিলিয়ার শাসক আলফনসো রেভস (অষ্টম আলফনসো) নিজের রাজ্য বিস্তার করতে করতে ৫২৭ হিজরি (১১৩৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে শেরিশ, ৫৩৩ হিজরি (১১৩৯ খ্রিস্টাব্দ) সালে হিসন আরনাব এবং ৫৩৬ হিজরি (১১৪২ খ্রিস্টাব্দ) সালে কোরিয়া দখল করে নিয়েছিলেন। ৫৩৯ হিজরি (১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ) সালে তিনি তাণ্ডব চালাতে চালাতে আলমেরিয়া এবং গ্রানাডা পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং এই পুরো এলাকা লণ্ডভণ্ড করে দেন।

মুরাবিতুন এবং মুওয়াহহিদুনদের পারস্পরিক রক্তপাতের ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, আন্দালুসে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি শেষ হয়ে গেল। মুলুকুত তাওয়ায়েফদের অবশিষ্টাংশের সাথে সম্পৃক্ত অনেক আমির মুরাবিতুনদের বিদেশি মনে করে তাদের শাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমন লোকেরা জায়গায় জায়গায় স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, ফলে আন্দালুসের ইসলামি ঐক্যের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিছু মুসলিম শাসক নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য আরাগন, কাস্তিলিয়া এবং পর্তুগালের নাসারা শাসকদের অভিভাবক বানিয়ে নেয়।

কর্ডোভার আমিররা আলফনসো রেভসকে ডেকে আনেন এবং তিনি ৫৪১ হিজরি সালে কর্ডোভায় এসে নিজের ইচ্ছামতো শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন।

তা সত্ত্বেও নাসারারা যেখানেই সুযোগ পেয়েছে, তারা সামরিক পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করেনি। কাস্তিলিয়ার সেনাবাহিনী ভেনিস এবং জেনোয়ার নৌবহরের সাহায্যে ৫৪২ হিজরি (অক্টোবর ১১৪৭ খ্রিস্টাব্দ) সালে আলমেরিয়া দখল করে নেয়। একই বছর আলফনসো রেভস কর্ডোভার রক্ষক দুর্গ হিসন রাবাহ মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। এদিকে বার্সেলোনার শাসক কাউন্ট চতুর্থ র্যামন ইতালির নৌবাহিনীর সাথে মিলে ৫৪৩ হিজরি সালে টরটোসা থেকে ইব্রো উপত্যকা পর্যন্ত এলাকা পদানত করে নেন। [১]

আন্দালুসে মুরাবিতুনদের ওপর মুওয়াহহিদুনদের বিজয়:

মুরাবিতুনদের নায়েব ইবনে জামে এই পরিস্থিতিতে দেশ ছেড়ে পূর্ব আন্দালুসের দ্বীপপুঞ্জ আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এটি দেখে আন্দালুসের ওলামায়ে কেরাম মুরাবিতুনদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন। তাদের একটি প্রতিনিধি দল মরক্কো পৌঁছায় এবং আব্দুল মুমিনের কাছে নাসারাদের দমনের আবেদন জানায়। আব্দুল মুমিন, যিনি ইতিমধ্যে আফ্রিকায় বিশাল এলাকা জয় করেছিলেন, এই ফরিয়াদের প্রতি তাৎক্ষণিক মনোযোগ দেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৫১৩ থেকে ৫১৪।

এবং নিজের সেনাপতি আবু উমর দামউয়িকে বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী দিয়ে আন্দালুসে প্রেরণ করেন।

আন্দালুসের মুসলমানরা এই বাহিনীকে পূর্ণ সমর্থন প্রদান করে। মুওয়াহহিদুন সেনাপতি প্রথমে সেই শহরগুলো দখল করেন যা মুরাবিতুনদের প্রতিনিধি বা নতুন স্বাধীন আমিরদের অধীনে ছিল। বাতলিয়ুসের বাহিনীও মুওয়াহহিদুনদের সাথে যোগ দেয়; ইশবিলিয়ার আমিরগণ, যারা এ পর্যন্ত মুরাবিতুনদের সাথে ছিলেন, দ্রুত আত্মসমর্পণ করেন। মালাকা কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই নতি স্বীকার করে। কুরতুবায় মুরাবিতুনদের সেনাপতি ইবনে গানিয়া মুওয়াহহিদুনদের আগমনে প্রতিরোধ করা নিরর্থক মনে করেন এবং শহরটি তাদের হাতে তুলে দেন।

মুওয়াহহিদুনদের এখন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আলমুরিয়া এবং বালানসিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আফ্রিকা থেকে সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আফ্রিকায় আব্দুল মুমিন এক নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সেখানে এক নতুন মাহদী আবির্ভূত হয়েছিল যে মূলত একজন ধোপা ছিল। সে বিভিন্ন ধরনের জাদুকরী কৌশল দেখিয়ে হাজার হাজার উপজাতীয়কে নিজের চারপাশে একত্রিত করেছিল। তার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে সে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মুওয়াহহিদুনদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। যা হোক, অবশেষে মুওয়াহহিদুনরা তাকে দমনে সফল হয় এবং তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা মুওয়াহহিদুনদের সাথে যোগ দেয়। এই ফিতনা থেকে মুক্ত হয়ে আব্দুল মুমিন আন্দালুসে বিশ হাজার সৈন্য পাঠান যারা ৫৫৩ হিজরির শেষভাগে সাত মাসের অবরোধের পর খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আলমুরিয়া পুনরুদ্ধার করে। [১]

মুওয়াহহিদুনদের বিজয়সমূহ:

এরপর ৫৫৩ হিজরিতে (১১৫৮ খ্রি.) মুওয়াহহিদুনরা কালআত রাবাহ দুর্গের দিকে অগ্রসর হয় যেখানে টেম্পলারদের দখল ছিল; তবে অন্যান্য খ্রিস্টান শাসকরা টেম্পলারদের জন্য বিশাল সাহায্য পাঠায় এবং সেখানে বিশ হাজার যোদ্ধা একত্রিত হয়, ফলে কালআত রাবাহর ওপর মুওয়াহহিদুনদের আক্রমণ সফল হতে পারেনি।

عبدالمومن (Abdul Mumin) আন্দালুসকে মরক্কোর সাথে সামরিকভাবে সংযুক্ত রাখার জন্য জাবালুত তারিকের পাশে একটি সুদৃঢ় শহর নির্মাণ করেন। যিলকদ ৫৫৫ হিজরিতে যখন এই শহরটি সম্পন্ন হয়, তখন আব্দুল মুমিন নিজে সেখানে আসেন এবং জাবালুত তারিককে ‘জাবালুল ফাতহ’ নাম দেন। তবে তিনি আন্দালুসের দিকে খুব বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি কারণ আফ্রিকায় তাকে চারপাশ থেকে প্রতিরোধকারী শক্তির মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। অবশ্য আন্দালুসে মুরাবিতুনদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে গার্নাতাহসহ সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করা হয়। এরপর গার্নাতাহকে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। সেই সাথে আন্দালুসের রাজনৈতিক কেন্দ্র ইশবিলিয়া থেকে পুনরায় কুরতুবায় স্থানান্তরিত করা হয়।

বেশ কয়েক বছর ধরে উত্তর আফ্রিকায় আব্দুল মুমিনের বাহিনী বন্যার মতো এগিয়ে যেতে থাকে। তার বিজয়সমূহ মুরাবিতুনদেরও ছাড়িয়ে যায়। ৫৫৬ হিজরি নাগাদ আব্দুল মুমিন আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মাহদিয়া এবং লিবিয়া দখল করে পুরো উত্তর আফ্রিকাকে নিজের শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

নিজের শেষ দিনগুলোতে আব্দুল মুমিন পুরো আন্দালুস দখলের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন, কিন্তু তার যাত্রার আগেই আব্দুল মুমিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং জমাদিউল আখিরা ৫৫৮ হিজরিতে (জুন ১১৬৩ খ্রি.) ৩৩ বছরের শাসনের পর...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৫১১ থেকে ৫১৮।

পূর্ণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। [১]

আব্দুল মুমিনের চরিত্রের ওপর এক নজর:

হাফেজ যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেন:

“তিনি ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী, প্রভাবশালী এবং উচ্চ সাহসী ছিলেন। তাঁর গুণাবলি ছিল অনেক। দ্বীনদারিতে তিনি ছিলেন অবিচল। তাঁর মতো মানুষ খুব কমই হয়। প্রতিদিন কুরআন মাজীদের এক মঞ্জিল তিলাওয়াত করতেন। রেশমি পোশাক পরিধান করতেন না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। জিহাদ ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন, যেন মনে হতো তাঁকে শাসনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।” [১]

তাঁর দরবারে ইসলামি বিশ্বের বড় বড় উলামা সমবেত হয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীতে নিজের রাজনীতি ও বিজয়ের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মুরাবিতুনদের বিপরীতে মুওয়াহহিদুনরা আব্বাসী খিলাফতকে বৈধ মনে করত না, তাই এই যুগে আফ্রিকা থেকে আব্বাসীদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। [২] [৩]

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২০/ ৩৭০-৩৭৫, তাবা আর-রিসালাহ; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ২৫৯

[২] আল-ইবার ফি খাবারি মান গাবার: ৩/ ১৬৫

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ১/ ১৭১

আবু ইয়াকুব ইউসুফ আউয়াল বিন আব্দুল মুমিন

৫৫৮-৫৮০ হিজরি

(১১৬৩-১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ)

আব্দুল মুমিনের পর তার পুত্র আবু ইয়াকুব মুওয়াহহিদিনদের শাসক হন। তিনি আফ্রিকা ও আন্দালুসের বিজিত অঞ্চলগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখেন এবং ন্যায়বিচারের সাথে শাসন করেন। তিনি তার কর্মকর্তাদের সর্বদা প্রকাশ্যে ও গোপনে পরহেজগারি এবং খোদাভীতির তাগিদ দিতেন। মুরসিয়ার শাসক ইবনে মারদানিশ খ্রিস্টানদের মিত্র ছিল। আবু ইয়াকুব তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ৫৬০ হিজরিতে একটি বাহিনী পাঠান। ইবনে মারদানিশ তার বাহিনীর সাথে ৩ হাজার মিত্র খ্রিস্টানকে যুক্ত করে মুরসিয়া থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণে মোকাবিলা করেন এবং পরাজিত হয়ে নিহত হন। তবে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুওয়াহহিদিনরা বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও জানমালের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, যার ফলে তারা মুরসিয়া দখল করতে পারেনি। [১]

পর্তুগাল সালতানাত প্রতিষ্ঠা এবং আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য নতুন সমস্যা:

মুওয়াহহিদিন সালতানাত প্রতিষ্ঠার আগেই পর্তুগাল একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাস্তিলিয়ার শাসক প্রথম ফার্নান্দো, যিনি মলুকুত তাওয়ায়েফদের বিবাদের সুযোগে ৪৫৬ হিজরিতে পশ্চিম আন্দালুসের কয়েকটি উপকূলীয় শহর জয় করে একটি অনুগত রাষ্ট্র ঘোষণা করেন এবং এর নাম রাখেন “পোর্ট কাল” (Porte calle), যার অর্থ বন্দর। এর কেন্দ্র ছিল “কুলামরিয়া”। আলী বিন ইউসুফ তাশফিন ৫১৪ হিজরিতে পর্তুগালে দীর্ঘ অভিযানের পর কুলামরিয়া জয় করেছিলেন, কিন্তু এরপর মুরাবিতুনরা এখানে দখল বজায় রাখতে তৎপরতা দেখায়নি এবং ইশবিলিয়া ফিরে যায়। এভাবে কুলামরিয়া পুনরায় খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়।

কয়েক বছর পর ৫৩৩ হিজরিতে (১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ) পর্তুগালের শাসক আলফোনসো হেনরি টিজ কাস্তিলিয়া থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাজতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং কাস্তিলিয়ার রাজা আলফোনসো রেমন্ডস সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেননি। আলফোনসো হেনরি টিজ (যাকে আরব ঐতিহাসিকরা ইবনে রিক বলেন) মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিলেন, আব্দুল মুমিনের শাসনামলেও তিনিই পর্তুগালের রাজা ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এবং জার্মানির বাহিনীকে সাথে নিয়ে লিশবুনাহ (লিসবন) অবরোধ করেন এবং ৫৪২ হিজরিতে (১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) এতে...

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী, পৃ. ৩৬০।

দখল করে নেন এবং এরপর সান্তারেন (Santrarem)-ও জয় করেন। ৫৫৫ হিজরিতে (১১৬০ খ্রি.) পর্তুগিজ বাহিনী লিসবন থেকে ৯৩ কিলোমিটার দক্ষিণে কাসর আবি দানিস নামক দুর্গটিও জয় করে নেয়। আব্দুল মুমিন তাঁর জীবদ্দশায় এর প্রতিকার করার সুযোগ পাননি। [১]

আবু ইয়াকুবের আন্দালুস আগমন ও জিহাদি অভিযানসমূহ:

যাইহোক, খলিফা আবু ইয়াকুব ৫৬৬ হিজরিতে নিজে আন্দালুস পৌঁছান এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত এখানে অভিযানে ব্যস্ত থেকে খ্রিস্টানদের আরও সামনে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখেন। ওয়াডি তাজো থেকে টলেডো পর্যন্ত এলাকাকে নিজের বিচরণক্ষেত্র বানিয়ে রাখেন এবং আল-কান্তারা নামক সীমান্ত দুর্গ জয় করেন। তিনি আন্দালুসের স্বাধীন আমিরদের কাছ থেকে ভ্যালেন্সিয়া, মুরসিয়া এবং লোরকাও ছিনিয়ে নেন। এই সময়ে তাঁর অবস্থান ছিল ইশবিলিয়া (সেভিল)-তে। এখানে তিনি নতুন নতুন প্রাসাদ, মসজিদ, সেতু, গণস্নানাগার এবং মিনার নির্মাণ করেন। শহরের মাঝখানে একটি চমৎকার মসজিদ নির্মাণ করেন যার মিনার ছিল অস্বাভাবিক উঁচু। এই মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। [২]

আবু ইয়াকুবের আন্দালুসে শেষ অভিযান ও শাহাদাত:

৫৭১ হিজরিতে তিনি মারাক্কানো ফিরে আসেন এবং পরবর্তী আট বছর পর্যন্ত পুনরায় আন্দালুস যেতে পারেননি। এই সুযোগকে গনিমত মনে করে খ্রিস্টানরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে দেয়। মুওয়াহহিদিনরা ৫৭৮ হিজরিতে উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে তালাবেরা নামক স্থানে ইশবিলিয়ার শাসক আলফনসো অষ্টম-এর মোকাবিলা করে। দুই বছর পর ৫৮০ হিজরিতে আবু ইয়াকুব সত্তর হাজার পদাতিক এবং ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী নিয়ে আন্দালুস পৌঁছান এবং সান্তারেন অবরোধ করেন। এই অভিযান চলাকালীন একটি যুদ্ধে আবু ইয়াকুব মারাত্মকভাবে আহত হন, যার ফলে তিনি ৫৮০ হিজরির রবিউল সানি মাসে মারাক্কানো ইন্তেকাল করেন। এরপর তাঁর পুত্র আবু ইউসুফ ইয়াকুব সিংহাসনে আরোহণ করেন। [৩]

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৩৬০, ৩৬১

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৩৬২

[৩] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৩৬

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

খুলাফায়ে আজম

আবু ইউসুফ ইয়াকুব, আল-মানসুর

৫৮০ হিজরি - ৫৯৫ হিজরি

(১১৮৪ খ্রিষ্টাব্দ - ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ)

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ‘আল-মানসুর’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুওয়াহহিদিন রাজবংশের সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন। তাঁর দানশীলতা, ন্যায়বিচার, বিজয়সমূহ এবং সুশাসনের খ্যাতি সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে একটি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেছিলেন, যাকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে তিনি কোনো ক্রটি রাখেননি। তিনি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান এবং আন্দালুসের পূর্বদিকের দ্বীপপুঞ্জও জয় করেন। [১]

ক্রুসেড, নাসারাদের অত্যাচার এবং পর্তুগালে আবু ইউসুফের আক্রমণ

তাঁর শাসনের দ্বিতীয় বছর ৫৮১ হিজরিতে পর্তুগালের প্রতিষ্ঠাতা শাসক আলফোনসো হেনরি মারা যান এবং তাঁর পুত্র সানচো শাসক হন। কয়েক বছর শান্তিতে অতিবাহিত হয়। কিন্তু এরপর হঠাৎ সিরিয়া ও মিশরে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তৃতীয় ক্রুসেড শুরু হয় এবং ইউরোপ থেকে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আটলান্টিক মহাসাগরের পথ ধরে রওনা হয় এবং পশ্চিমেরে তারা অনেক মুসলিম এলাকা লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। এতে কাস্তিলিয়ার নাসারাদের সাহস বেড়ে যায় এবং আলফোনসো অষ্টম ফরাসি স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়ে মুসলিম আন্দালুসে আক্রমণ শুরু করেন। পর্তুগালের নতুন রাজা সানচোও সাহসী হয়ে ওঠেন এবং একটি নৌবহর নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আন্দালুসের উপকূলীয় শহর সিলভেস আক্রমণ করেন এবং তিন মাস অবরোধের পর ৫৮৫ হিজরিতে তা জয় করেন।

এই পরিস্থিতিতে আবু ইউসুফ আল-মানসুর আন্দালুসে পৌঁছান এবং ৫৮৬ হিজরিতে সিলভেস পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম আক্রমণ করেন, যা সফল হয়নি। তিনি সেভিলে পৌঁছান এবং নতুন করে প্রস্তুতি ও পুনর্গঠনের পর ৫৮৭ হিজরির রবিউস সানি মাসে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন। এক জোরালো অভিযানে তিনি আলকাসার দো সাল দুর্গ জয় করেন এবং নাসারাদের পক্ষ থেকে সিলভেসে রসদ সরবরাহের পথ বিচ্ছিন্ন করে দেন। এরপর তিনি সিলভেস আক্রমণ করেন এবং তা জয় করেন। পর্তুগালের পরাজয় দেখে কাস্তিলিয়ার শাসকরাও দমে যান এবং তারা মুওয়াহহিদিনদের সাথে পাঁচ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। [২]

[১] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২১ / ৩১৩ হতে ৩১৬, ত আল-রিসালা

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গরনাতা, লি আবদুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৩৬১ হতে ৩৬৩

জঙ্গ-এ-আলার্ক

সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই কাস্টিলের রাজা আবু ইউসুফ আল-মানসুরকে আফ্রিকার অভিযানে ব্যস্ত দেখে ইসলামী সীমান্তে হস্তক্ষেপ শুরু করেন। শুধু তাই নয়, বরং অষ্টম আলফনসো আবু ইউসুফ আল-মানসুরের নামে একটি বিদ্রোহীক চিঠিতে লিখেছিলেন:

“হে আমির! কারো কাছে গোপন নেই যে, আমি যেমন খ্রিস্টান জাতির প্রধান, তেমনি আপনিও হানিফি জাতির প্রধান। আপনি এও জানেন যে, আন্দালুসের আমিররা অসহায়, অকর্মণ্য, প্রজাদের ব্যাপারে উদাসীন এবং ভোগ-বিলাসে মগ্ন। আমি তাদের পদদলিত করছি এবং এলাকাগুলো তাদের থেকে খালি করছি, শিশুদের গোলাম বানাচ্ছি, প্রৌঢ়দের নাক-কান কাটছি এবং যুবকদের হত্যা করছি। তাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসার জন্য আপনার কাছে কোনো অজুহাত নেই। আপনি তাদের সাহায্য করতে সক্ষম এবং আপনার বিশ্বাস হলো যে, আল্লাহ আমাদের দশজনের বিপরীতে আপনাদের একজনের ওপর জিহাদ ফরজ করেছিলেন। এরপর আপনাদের জন্য শিথিলতা করে দুজনের বিপরীতে একজনের ওপর জিহাদ ফরজ করেছেন। আমি আপনাদের জন্য এতে আরও শিথিলতা করে দিচ্ছি এবং এখন আপনাদের একজনের বিপরীতে আমাদেরও একজন হবে। এখন আপনাদের জন্য সম্ভব নয় যে, আপনারা যুদ্ধ থেকে নিজেদের রক্ষা করবেন এবং এই অভিযান থেকে বেঁচে যাবেন। আপনি নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এই অভিযানকে এক বছর থেকে অন্য বছরে পিছিয়ে দিচ্ছেন। এক কদম সামনে বাড়াচ্ছেন এবং এক কদম পিছিয়ে যাচ্ছেন।

এখন আমি আপনার সামনে একটি সহজ প্রস্তাব রাখছি যে, আপনি আপনার সমস্ত নৌকা ও যুদ্ধজাহাজ নিয়ে চলে আসুন এবং আমিও আমার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসছি। যে রণক্ষেত্র আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হবে, সেখানেই মোকাবিলা হবে। যদি আপনি জিতেন তবে আপনি বিশাল গনিমতের মাল পাবেন। যদি আমি জিতি তবে উভয় জাতির নেতৃত্বের অধিকার আমার হবে।”

এই পত্র পড়ে আল-মানসুরের ইসলামী আত্মমর্যাদা জেগে উঠল। তিনি সেই চিঠির উপরের মার্জিনে নিজের উত্তর হিসেবে কুরআন মাজিদের এই বরকতময় আয়াতটি লিখে পাঠিয়ে দিলেন: [১]

○ اَرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

“তাদের কাছে ফিরে যাও, কারণ এখন আমরা তাদের কাছে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছাব যাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না এবং তাদের সেখান থেকে এমনভাবে বের করে দেব যে তারা লাঞ্চিত হবে এবং অনুগত হয়ে থাকবে।” [২]

এই পরিস্থিতিতে আল-মানসুর পুনরায় এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মরক্কো থেকে বের হলেন এবং ৫৯১ হিজরির জমাদিউল আখিরা মাসে আন্দালুসে পৌঁছে গেলেন। আফ্রিকান উলামা ও ফকিহদের একটি বড় দল এই বাহিনীর সাথে ছিল। আবু ইউসুফ দুই সপ্তাহ ইশবিলিয়াতে অবস্থান করে সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করলেন এবং এরপর উত্তরের দিকে যাত্রা করলেন। তাঁর আদেশে ইশবিলিয়া থেকে কিছু দূরে একটি নতুন দুর্গ ‘হসনুল ফারাজ’ নির্মাণ করা হয়েছিল। অন্যদিকে কাস্টিলের রাজা অষ্টম আলফনসোও রাবাহ দুর্গের নিকটবর্তী একটি উঁচু টিলা “আলার্ক” (Alarcos)-এ একটি...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৫৯১ হিজরি

[২] সূরা আন-নামল: আয়াত ৩৭

নতুন কেব্লা তৈরি করে নিয়েছিল। সে নাভার ও লিওনের বাহিনীকে সাথে নিয়ে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ তলীতলা থেকে ‘আলার্ক’ পৌঁছে গেল।

[১]

খ্রিষ্টানরা নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিল যে, তাদের সাথে বড় বড় ইহুদি ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে এসেছিল যাতে বিজয়ের পর বেশি বেশি গনিমতের মাল ক্রয় করতে পারে এবং মুসলিম বন্দীদের গোলামের বাজারে নিয়ে যেতে পারে।

৫৯১ হিজরির শাবান মাসে ইসলামী বাহিনীও এখানে পৌঁছে গেল এবং প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে তাবু স্থাপন করল। কাস্তিলের বন্য দলগুলো মুসলমানদের শক্তি পরিমাপ করার জন্য বের হলে ইসলামী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের সাথে তাদের সংঘর্ষও হলো। এই সময়ে আবু ইউসুফ আল-মানসুরের সাথে আন্দালুসিয়া আমীরদের যুদ্ধকৌশল নিয়ে পরামর্শ চলছিল। আবু আবদুল্লাহ আবু ইয়াহইয়া নামক একজন অভিজ্ঞ আমীর ‘যাল্লাকার যুদ্ধ’-এর রণকৌশল মাথায় রেখে পরামর্শ দিলেন যে, শুরুতে আন্দালুসিয়া, আরব, বারবার এবং গোত্রীয় স্বেচ্ছাসেবকদের পাঠিয়ে যুদ্ধ শুরু করা হোক এবং খলিফা আবু ইউসুফ নিজে মুওয়াহহিদিনদের নিয়মিত বাহিনীর সাথে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকবেন। যদি মুসলমানরা পিছু হটতে শুরু করে, তবে এই সংরক্ষিত বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে।

৮ শাবান মুওয়াহহিদিনদের বাহিনী ‘হিসনুল আলার্ক’ থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে পৌঁছে গেল। মুওয়াহহিদিনরা একটি মালভূমির উপত্যকায় গিয়ে অবস্থান নিল, তাদের কয়েকটি দল লোকদেখানো অগ্রযাত্রার জন্য নিজেদের আশ্রয়স্থল থেকে বের হলো এবং হিসনুল আলার্কের কাছে চক্রর দিয়ে ফিরে এল। ৯ শাবান (১৮ জুলাই ১১৯৫ খ্রি.) পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী আন্দালুসিয়া, আরব, বারবার এবং গোত্রীয় স্বেচ্ছাসেবকরা আবু ইয়াহইয়া নামক আমীরের নেতৃত্বে মুওয়াহহিদিনদের পরিখা থেকে সামনে এগিয়ে গেল। আবু ইয়াহইয়া তখন আকাশবিদারী কণ্ঠে বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন: “আমীরুল মুমিনীন অনুরোধ করেছেন যে, তোমরা সবাই তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো, কারণ এটি আল্লাহর ক্ষমা লাভের সময়। একে অপরকে ক্ষমা করে দাও এবং অন্তরকে পবিত্র রাখো। নিয়ত আল্লাহর জন্য খাঁটি রাখো।”

এই ভাষণ শুনে মুজাহিদদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। খলিফার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হলো। এরপর কাজী আবু আলী বিন হাজ্জাজ জিহাদের ফজিলতের ওপর এমন এক জোরালো বক্তব্য দিলেন যে, সবার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয়ে গেল।

সূর্য উপরে উঠতেই খ্রিষ্টানদের অগ্রযাত্রা শুরু হলো, তাদের প্রথম সারিতে আট হাজার লৌহবর্ম পরিহিত নাইট ছিল যারা ঘোড়া ছুটিয়ে কালো ঝড়ের মতো ধেয়ে এল। মুসলমানরা বর্শা উঁচিয়ে এই আক্রমণের গতিপথ ঘুরিয়ে দিল। পেছনে খ্রিষ্টানদের ঢল ধেয়ে আসছিল। তাদের ডান বাহু ইসলামী বাহিনীর বাম বাহুর (মায়সারা) ওপর আক্রমণ করল যেখানে বেশিরভাগ স্বেচ্ছাসেবক ছিল, তারা এই তুফানি আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে পিছু হটে গেল। এখন খ্রিষ্টানরা তাদের সমস্ত শক্তি বাহিনীর মধ্যভাগের (কলব) ওপর প্রয়োগ করল যেখানে আবু ইয়াহইয়ার মাথার ওপর সাদা প্রতীকী পতাকা উড়ছিল, কারণ তারা নিশ্চিত ছিল যে খলিফা আল-মানসুর এখানেই আছেন।

খ্রিষ্টানদের আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে হাজার হাজার মুসলমান শহীদ হলেন, এমনকি সেনাপতি আবু ইয়াহইয়াও বীরত্বের সাথে লড়াই করে শাহাদাতের সুখ পান করলেন। এমন পরিস্থিতিতে আরব স্বেচ্ছাসেবক এবং তীরন্দাজরা উপযুক্ত স্থান দখল করে খ্রিষ্টানদের ওপর তীরের...

[১] আলার্ক স্পেনের বর্তমান প্রদেশ “সিউদাদ রিয়াল”-এর শহর “কারিয়ন” থেকে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃষ্টি শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে ইবনে সানাদিদ তার বাহিনীর সাথে সামনে এগিয়ে এলেন যারা প্রতিপক্ষের সামনে শত্রু অবস্থান নিলেন। বিকেল বেলা খলিফা আল-মানসুর সংরক্ষিত বাহিনীকে পেছনে রেখে সৈন্যদের সাহস জোগাতে নিজে সামনে এগিয়ে এলেন এবং বাহিনীকে সুসংগঠিত করে খ্রিষ্টানদের ওপর এমন তীব্র আক্রমণ করলেন যে তারা পিছু হটতে হটতে “আলারক” পাহাড় পর্যন্ত চলে গেল এবং জায়গায় জায়গায় তাদের লাশের স্তুপ জমে গেল। খ্রিষ্টানরা আলারক দুর্গে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু মুওয়াহহিদিনদের সংরক্ষিত বাহিনী একটি দীর্ঘ পথ ঘুরে তাদের পেছনে এসে ফেরার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। খ্রিষ্টানরা নিচু এলাকার দিকে পালাতে চাইল কিন্তু সেখানে স্বেচ্ছাসেবক তীরন্দাজদের দলগুলো তাদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিল। ক্রুসেডাররা ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে শোচনীয়ভাবে পিষ্ট হলো।

অষ্টম আলফনসো তার সংরক্ষিত বাহিনীর সাথে আলারক দুর্গে অবস্থান করছিল। খলিফা ময়দান খ্রিষ্টানমুক্ত করার পরপরই বিউগল বাজানোর এবং দামামা পেটানোর নির্দেশ দিলেন। অষ্টম আলফনসো এটি দেখে অবশিষ্ট বাহিনীর সাথে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু তার সৈন্যরা মুওয়াহহিদিনদের একটি আক্রমণও সহ্য করতে পারল না এবং শত শত লাশ ফেলে রেখে দ্রুত পুনরায় দুর্গে ঢুকে পড়ল। সূর্যাস্তের সময় যুদ্ধ সমাপ্ত হলো। এই যুদ্ধে বিশ হাজার মুসলমান শহীদ হন যেখানে নিহত খ্রিষ্টানদের সংখ্যা এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার বলা হয়।

আলফনসো রাতারাতি দুর্গের কোনো গোপন পথ দিয়ে পালিয়ে তলোয়তলায় পৌঁছে গেল কিন্তু ডন পেড্রো নামক এক নওয়ারের নেতৃত্বে পাঁচ হাজার সৈন্য তখনও দুর্গে অবস্থান করছিল। মুওয়াহহিদিনরা দুর্গ অবরোধ করলে ডন পেড্রো এই শর্তে আত্মসমর্পণ করল যে, এই পাঁচ হাজার সৈন্যের প্রাণভিক্ষা দিতে হবে, বিনিময়ে সে পাঁচ হাজার মুসলিম বন্দীকে মুক্তি দেবে। এই চুক্তি অনুযায়ী দুর্গ থেকে খ্রিষ্টানদের অপসারণ হলো এবং মুসলমানরা এর ওপর দখলদারিত্ব লাভ করল। [১]

আন্দালুসে আল-মানসুরের আরও বিজয়সমূহ:

পরবর্তী দিনগুলোতে মুওয়াহহিদিনরা রাবাহ দুর্গ ছাড়াও শালতারা দখল করে নিল যা অর্ধ শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টানদের দখলে ছিল। ২৭ শাবান ইশবিলিয়ায় পৌঁছালে আবু ইউসুফ মানসুরের জমকালো সংবর্ধনা হলো। কিন্তু এই মুজাহিদ শাসক দ্রুত মরক্কো ফিরে যাওয়ার ভুল করেননি এবং শীতকাল অতিবাহিত হতেই হুসনুল ফারাজকে নতুন অভিযানের কেন্দ্রে পরিণত করলেন। এই সময়ে কাস্টিলের রাজার পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাবও এল যা আবু ইউসুফ প্রত্যাখ্যান করলেন।

৫৯৩ হিজরিতে মুওয়াহহিদিনদের বাহিনী উত্তরে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ল। পর্তুগালের মুস্ত আমীশ, তারজালা, সানখা কারুত দুর্গ জয় করে তারা তাজা নদীর ওপারে চলে এল। এখানে অষ্টম আলফনসোর নির্মিত নতুন শহর “প্লাসেন্সিয়া”ও নতি স্বীকার করল। তলোয়তলা এবং মাগাদোর আশপাশের এলাকাগুলো তখনই করে অবশেষে মুওয়াহহিদিনরা উত্তর দিক ঘুরে তলোয়তলা অবরোধ করতে সক্ষম হলো। শহরটি প্রায় বিজিত হওয়ার পথে ছিল কিন্তু অষ্টম আলফনসোর মা এবং স্ত্রীরা আবু ইউসুফ ইয়াকুবের কাছে উপস্থিত হলেন এবং অত্যন্ত কান্নাকাটির সাথে শহরটি তাদের কাছে থাকতে দেওয়ার আবেদন জানালেন। আবু ইউসুফের দয়া হলো এবং তিনি এই শহরটি খ্রিষ্টানদের...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৪০৮-৪১৩

...সঁপে দিয়ে সেভিলে ফিরে এলেন। [১]

আবু ইয়াকুব আল-মানসুরের মৃত্যু:

তলেডো (টলেডো) জয় না করা আবু ইউসুফের ভুল ছিল, কারণ এরপর এই শহর আর কখনো মুসলমানদের হাতে আসেনি, বরং খ্রিস্টধর্মের এক অপরাজেয় দুর্গে পরিণত হয়ে দক্ষিণের মুসলমানদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে থাকে। এই অভিযানের পর তিনি কয়েক মাস কড়োভায় অবস্থান করেন। ৫৯৩ হিজরিতে তিনি পুনরায় মরক্কোতে ফিরে আসেন এবং ২২ রবিউল আউয়াল ৫৯৫ হিজরি (২৩ ফেব্রুয়ারি ১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। [২]

আবু ইয়াকুবের শাসনামলের ওপর এক নজর:

আবু ইয়াকুব আল-মানসুর তাঁর সময়ের একজন মহান শাসক ছিলেন। তিনি কর অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুষখোরদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছিলেন। রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়েছিলেন, স্থানে স্থানে সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন, জায়গায় জায়গায় কুয়ো খনন করেছিলেন। পুলিশ বিভাগকে উন্নত করে এতটাই সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন যে পুরো দেশ থেকে চুরি-ডাকাতির নাম-নিশান মুছে গিয়েছিল। তিনি সমস্ত পুরনো দুর্গ মেরামত করে সেগুলোকে অপরাজেয় করে তুলেছিলেন। সেচ ও কৃষিকাজে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল খুলেছিলেন। মরক্কোতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরকারি হাসপাতালটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম হাসপাতাল। তাঁর দেশ নামী-দামী আলেম, হেকিম, চিকিৎসক ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। [৩]

মুওয়াহহিদিন এবং ফকিহদের তাকলিদ:

আল-মানসুর এবং তাঁর পূর্ববর্তী অন্যান্য মুওয়াহহিদিন শাসকরা মূলনীতি ও আকিদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহের অনুসারী ছিলেন, তবে তাঁরা চার ইমামের তাকলিদ করার প্রবক্তা ছিলেন না, বরং ফিকহি মাসআলাসমূহে (তাকলিদ ভিত্তিক) গবেষণাকে অপছন্দ করতেন। আল-মানসুর ফকিহদের কিতাবসমূহ নষ্ট করে দিতেন; তার পরিবর্তে তিনি সরাসরি হাদিসের কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক এক আলেমের বর্ণনা হলো:

“আমি তাঁর কাছে গেলাম, তখন তিনি কোনো এক ফকিহ-এর কিতাব অধ্যয়ন করছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বলতে লাগলেন: ‘এগুলো কেমন মতামত যা দ্বীনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে? বলো তো দেখি! একেকটি মাসআলায় অনেকগুলো বক্তব্য রয়েছে, কোনটি সঠিক বলে মানা হবে? আর একজন মুকাল্লিদ কোনটি আমল করবে?’” আলেম তাঁকে বোঝানোর জন্য মুখ খুলতেই আল-মানসুর কুরআন মাজিদের দিকে ইশারা করে বলতে লাগলেন: “হয়তো এখান থেকে দলিল আনো।” তারপর সুনানে আবু দাউদের দিকে ইশারা করে বললেন: “অথবা এখান থেকে।” এরপর তলোয়ারের দিকে ইশারা করে বললেন: “নতুবা আমি এটি ব্যবহার করব।” [৪]

কাজী ইবনে রুশদের বহিষ্কার ও নজরবন্দি:

আবু ইয়াকুব আল-মানসুর অত্যন্ত বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং আলেমদের সাথে ইলমি আলোচনায় শরিক হতেন। তিনি যুক্তিনির্ভর বিদ্যায়...

[১] নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব লিল মাকারি আত-তিলমিসানি: ২/৪০৭

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি আবদুর রহমান আলি: পৃ. ৩৬৩

[৩] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ২১/৩১১, ত. আর-রিসালাহ

[৪] সিয়াকু আলামিন নুবালা: ২১/৩১৩, ত. আর-রিসালাহ

থেকেও অনেক সামঞ্জস্য ছিল। এই যুগে আন্দালুসের সবচেয়ে বিখ্যাত আলেম ছিলেন ইশবিলিয়ার কাজী আল্লামা ইবনে রুশদ, যাঁর শরয়ী ও আকলি (যৌক্তিক) জ্ঞানের ওপর দক্ষতার কথা সবাই স্বীকার করতেন এবং তাঁর রচনাবলি সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তার কারণে কিছু আলেম তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ইবনে রুশদের দার্শনিক বিষয়গুলোর ওপর আপত্তি তুলে তাঁকে পথভ্রষ্ট ও মূলহিদ ঘোষণা করেন। আল-মানসুর ৫৯৪ হিজরিতে আন্দালুসে আসেন, তখন আলার্ক বিজয়ের পর কিছুকাল কর্তোভায় অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি ইবনে রুশদের ইলমি কামালত (জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব) দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁকে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে হিংসুকদের শোরগোলও কম ছিল না।

অবশেষে কর্তোভায় আলেমদের একটি মজলিস ডাকা হয় যাতে ইবনে রুশদের বিতর্কিত বক্তব্যগুলো তদন্ত করা যায়। আলেমদের মজলিস ইবনে রুশদের ধর্মহীনতা প্রমাণিত হওয়ার ফয়সালা প্রদান করে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, কিছু বক্তব্যের মাধ্যমে ইবনে রুশদের ওপর বাদশাহর অবমাননার অভিযোগও আনা হয়েছিল। ইবনে রুশদের কোনো একটি বইয়ে আল-মানসুরের জন্য ‘মালিকুল বারবার’ (বারবারদের রাজা) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। হিংসুকরা এর অর্থ বের করেছিল যে, ইবনে রুশদ আল-মানসুরকে আরব নয় বরং বারবার মনে করেন। আল-মানসুর আল্লামা ইবনে রুশদকে অনেক সম্মান করতেন কিন্তু আলেমদের ফয়সালার বিরুদ্ধে যেতে পারতেন না। তবে তিনি কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেশান্তর ও গৃহবন্দীত্বের আদেশ দেন এবং ইবনে রুশদের বইপত্র নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন।

আল্লামাকে শনীল নদীর তীরে ‘আলিসানা’ নামক একটি দুর্গে বন্দী করে রাখা হয় যেখানে তিনি প্রায় তিন বছর অবস্থান করেন। সে সময় তাঁর বয়স ৭৫ বছর হয়েছিল। অবশেষে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আল-মানসুরের কাছে দয়ার আবেদন জানান। আল্লামা নিজেও তাঁর ওপর আরোপিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করেন। ‘মালিকুল বারবার’ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, সঠিক শব্দটি ছিল ‘মালিকুল বাররাইন’ (দুই মহাদেশের রাজা), কিন্তু অনুলিখনের ভুলের কারণে তা ‘মালিকুল বারবার’ হয়ে গেছে। অবশেষে আল-মানসুর আল্লামার সাজা মাফ করে দেন এবং তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তিনি আল-মানসুরের দরবারে হাজিরা দিতে মরক্কো চলে আসেন। এখানে মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত করার পর ৯ সফর ৫৯৫ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তাঁর মরদেহ কর্তোভায় স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে তাঁকে তাঁর পূর্বপুরুষদের কবরস্থানে দাফন করা হয়। [১]

ইবনে রুশদ ৭৫ বছর বয়স পেয়েছিলেন এবং প্রায় পঞ্চাশটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেছেন। উসুলুল ফিকহ-এ ‘বিদায়াতুল মুজতাহিদ’ ও ‘মিনহাজুল আদিল্লাহ’, মাকাসিদে শরিয়ত-এ ‘ফাসলুল মাকাল ফিমা বাইনাল হিকমতি ওয়াশ শারিয়াতি মিনাল ইত্তিসাল’ এবং ফিকহি মতপার্থক্য বিষয়ে ‘আত-তাহসিল’ লিখে নিজের ফিকহি দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি এরিস্টটলের বইগুলোর সারসংক্ষেপও তৈরি করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ইবনে সিনার রিসালা ‘আরজুজা’-এর ব্যাখ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে ‘হারাকাতুল ফালাক’-এর মতো রিসালা লিখেছেন।

ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি দর্শনের বিরুদ্ধে তাঁর লাজওয়াব গ্রন্থ ‘তাহাফুতুল ফালাসিফা’ লিখে দার্শনিকদের স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর জবাবে ইবনে রুশদ ‘তাহাফুতুত তাহাফুত’ লিখে মৃতপ্রায় আকলি জ্ঞানকে নতুন জীবন দান করেন। এই কারণেই ইউরোপের দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীরা ইবনে রুশদ দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ২২৮ থেকে ২৩৩।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ২১/ ৩০৭ থেকে ৩১০।

মুহাম্মদ আন-নাসির বিন ইয়াকুব

৫৯৫ হিজরি থেকে ৬১০ হিজরি

(১১৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

আবু ইউসুফের পুত্র মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব তার উত্তরসূরি হন। তিনি আন-নাসির উপাধি নিয়ে শাসন করেন। কিন্তু তিনি তার পিতার যোগ্য উত্তরসূরি প্রমাণিত হননি। তার প্রশাসনিক দুর্বলতা এই মহান সাম্রাজ্যকে খুব দ্রুত পতনের দিকে ঠেলে দেয়। তার সময়কাল বিদ্রোহ ও হাঙ্গামায় ভরপুর ছিল।

তার শুরুর দিনগুলোতেই আফ্রিকার শহর ফাসে বিদ্রোহ দেখা দেয় যা দ্রুত দমন করা হয়। তবে এদিকে আন্দালুসের পূর্ব জাজিরায় মুরাবিতুনের এক আমির ইয়াহইয়া বিদ্রোহ করেন যার কর্মকাণ্ড মুওয়াহহিদিনদের কঠিন সংকটে ফেলে দেয়। তিনি আফ্রিকার উপকূলে আক্রমণ করে তিউনিস শহর মাহদিয়াও দখল করে নেন। তবে এরপর কায়রোয়ানের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় মুওয়াহহিদিনদের সাথে মোকাবিলায় তিনি পরাজিত হন এবং সাহায্যে আজমের দিকে পিছু হটেন। [১]

উকাবের যুদ্ধ:

ওদিকে আন্দালুসে কাস্টিলের অষ্টম আলফনসো কর্ডোভা ও সেভিল পর্যন্ত আক্রমণ শুরু করেছিলেন। আন-নাসির আন্দালুসে পৌঁছান কিন্তু এবার ভাগ্য তার সহায় ছিল না। তিনি সেভিলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং আরও সামনে এগিয়ে সালতিয়ারা দুর্গ অবরোধ করেন। এই ছোট দুর্গটি জয় করতে তার আট মাস সময় লেগে যায়। এই সময়ে কাস্টিল, লিওন, আরাগন, নাভারা এবং পর্তুগালের বাহিনীগুলো পূর্ণ অবসরে ইউরোপের ক্রুসেডার ও স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধাদের সাথে মিলে এক বিশাল সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে, যাতে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।

আন-নাসির ৬০৯ হিজরির মহররম মাসে সৈন্য নিয়ে সেভিল থেকে জিয়ানের দিকে রওনা হন। এই সময়ে খ্রিস্টানরা রাবাহ দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গের আমির ইউসুফ বিন ক্বাদিস তীব্র প্রতিরোধ করেন এবং এই সময়ে আন-নাসিরের কাছে সাহায্যও চান কিন্তু আন-নাসির জিয়ানের মতো শক্তিশালী শহরে থাকা সত্ত্বেও কোনো সাহায্য পাঠাননি। হতাশ হয়ে ইউসুফ বিন ক্বাদিস প্রাণের নিরাপত্তার চুক্তিতে দুর্গটি খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন এবং নিজে তার শ্বশুরের সাথে রাবাহর ঘটনা শোনাতে সরাসরি আন-নাসিরের কাছে...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ২৭০ থেকে ২৭৩।

কাছে উপস্থিত হলো। আন-নাসিরের উজির আবু সাঈদ, ইউসুফ বিন কাদিসের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ছিল। সে ইউসুফ বিন কাদিসের শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তাকে বিশ্বাস করাল যে, এই সময়ে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করা কোনো শাস্তির কারণ হতে পারে। এরপর উজির নিজে খলিফার কাছে গিয়ে রাবাহ দুর্গ খ্রিস্টানদের দখলে যাওয়ার সংবাদ দিয়ে ইউসুফ বিন কাদিসকে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষ হিসেবে প্রমাণ করল।

আন-নাসির ছিলেন কানপাতলা, তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন এবং ইউসুফ বিন কাদিসকে নিজের সাফাই গাওয়ার কোনো সুযোগ না দিয়েই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেন। ইবনে কাদিস ছিলেন একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব, তাঁর হত্যাকাণ্ডে আন্দালুসের জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল। ইবনে সাঈদ যখন অনুভব করল যে আন্দালুসের আমিরগণ খলিফার এই সিদ্ধান্তে ব্যথিত, তখন সে আরও ভুল পথ অবলম্বন করে আন্দালুসি অফিসারদের পরিস্কার বলে দিল যে, খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য মুওয়াহহিদিনরাই যথেষ্ট। যে ফিরে যেতে চায়, সে সানন্দে ফিরে যেতে পারে। এ ধরনের বিদ্রোহাত্মক কথাবার্তা ইসলামি লঙ্করের মধ্যে আরও তিক্ততা সৃষ্টি করল।

অবশেষে ১৫ সফর ৬০৯ হিজরিতে আল-উকাব নামক স্থানে এক অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই স্থানটি ওয়াদিল কাবির নদীর ওপারে জাবালুশ শারাত (সিয়েরা মোরেনা)-এর পাদদেশে অবস্থিত ‘সান্তা এলেনা’ (Sta Elena) জনপদের উত্তর-পশ্চিমে। মুওয়াহহিদিন, আরব, বারবার গোত্রসমূহ, স্বেচ্ছাসেবক এবং আন্দালুসি পেশাদার সৈন্যরা আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করল, যাদের মোট সংখ্যা সতর্ক অনুমান অনুযায়ী প্রায় দুই লক্ষ ছিল এবং তারা নিজেদের বিজয়ের ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত ছিল।

খ্রিস্টানদের অগ্রবর্তী দল যখন ইসলামি বাহিনীর ওপর আক্রমণ করল, তখন অগ্রভাগে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকরা সিসাঢালা প্রাচীরের মতো দৃঢ়তা প্রদর্শন করল, এমনকি খ্রিস্টানরা পিছু হটতে শুরু করল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তারা সতেজ বাহিনীর সাহায্য পেয়ে গেল এবং তারা পুনরায় প্রবল বিক্রমে আক্রমণ শুরু করল। ঠিক সেই মুহূর্তে খ্রিস্টানদের ডান ও বাম পার্শ্ববাহিনী ইসলামি বাহিনীর বাম ও ডান পার্শ্বের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের পিছু হটিয়ে দিতে লাগল।

স্বেচ্ছাসেবক দলগুলো প্রতিটি স্থানে তাদের সামর্থ্যের বাইরে সাহস প্রদর্শন করল এবং খ্রিস্টানদের ক্রমাগত বাড়তে থাকা চাপের মুখে পিছু না হটে লড়াই চালিয়ে গেল। কিন্তু মুওয়াহহিদিনদের পেশাদার বাহিনী, আন্দালুসি আমিরগণ এবং আরব সৈন্যরা স্বেচ্ছাসেবকদের রক্তকে মূল্যহীন মনে করে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না এবং সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক দলগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

খ্রিস্টানরা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাচীর ভেঙে ফেলার পর আরও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে মূল কেন্দ্রে নিয়োজিত মুওয়াহহিদিনদের পেশাদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করল এবং তাদের কাতারগুলো ছিন্নভিন্ন করে দিল। তবে এরই মধ্যে ডান ও বাম পার্শ্বের মুসলমানরা পুনরায় সংগঠিত হয়ে ফিরে এল এবং খ্রিস্টানদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হলো। মনে হচ্ছিল যে মুওয়াহহিদিনরা বিজয়ী হতে চলেছে।

কিন্তু অষ্টম আলফোনসো, যে একটি উঁচু টিলা থেকে এই দৃশ্য দেখছিল, সে কাস্টিল ও লিওনের সংরক্ষিত বাহিনীগুলোকে হঠাৎ ময়দানে নিয়ে এল। সেই সাথে নাভারে ও আরাগন রাজ্যের রাজপুত্ররাও তাদের সেনাবাহিনীসহ ময়দানে নেমে পড়ল। ইসলামি বাহিনীর ডান ও বাম পার্শ্ব আবারও খ্রিস্টানদের শক্তিশালী আক্রমণের মুখে পড়ল। তাদের পা এমনভাবে টলে গেল যে তারা আর স্থির হতে পারল না। তাদের পিছু হটতে দেখে আন্দালুসি ও আরব সৈন্যদের কাতারগুলোও ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল।

এখন খ্রিস্টানরা সব দিক থেকে একত্রিত হয়ে মুওয়াহহিদুনদের মূল বাহিনীর (قلب) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যার ঠিক মাঝখানে খলিফা আন-নাসির হাবশি গোলামদের একটি ইম্পাতসম প্রাচীরের সুরক্ষায় অবস্থান করছিলেন এবং লাল গম্বুজটি তাঁর উপস্থিতির জানান দিচ্ছিল। নাভার, লিওন এবং কাস্তিলিয়ার নাইটরা অনবরত বর্শা ও তলোয়ার চালনার মাধ্যমে খলিফার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে লাগল, তবে হাবশি গোলামরা তাদের বারবার পেছনে ঠেলে দিল। খলিফা শেষ পর্যন্ত বাহিনীকে সাহস জোগাতে থাকলেন এবং হুঙ্কার দিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে থাকলেন, কিন্তু প্রতিটি সারিতেই সৈন্যদের পা টলে যাচ্ছিল। আন-নাসিরের অবিচলতার কারণে সমস্ত খ্রিস্টানদের শ্রোত মূল বাহিনীর দিকেই নিবদ্ধ ছিল এবং এই সময়ের মধ্যে পলায়নপর মুসলমানরা প্রাণ বাঁচিয়ে দূরে সরে যেতে সক্ষম হলো, অন্যথায় তাদের মধ্যে খুব কম লোকই জীবিত বাঁচতে পারত। শেষ পর্যন্ত খলিফার রক্ষীবাহিনীও বিধ্বস্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দশ হাজার হাবশি গোলামের লাশ আন-নাসিরের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এবং অবশিষ্টরা তাঁর চারপাশে বৃত্ত তৈরি করে লড়াই করছিল। এমন সময় একজন বেদুইন একটি বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন ঘোড়া নিয়ে খলিফার কাছে পৌঁছাল। খলিফা নিজের সামনে আসন্ন পরিণতি দেখে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়লেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের নিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে “জিয়ান”-এর দিকে রওনা হলেন।

এরপর অবশিষ্ট মুওয়াহহিদুনরাও ময়দান ছেড়ে চলে গেল। খ্রিস্টানরা প্রায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করল, যতক্ষণ না রাতের অন্ধকার নেমে এল। এই শিক্ষণীয় পরাজয়ের পর মুহাম্মদ আন-নাসির যখন সেভিলে ফিরে এলেন, তখন তাঁর দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে মাত্র চার হাজার সৈন্য তাঁর সাথে অবশিষ্ট ছিল। আন্দালুসের ইতিহাসে এই যুদ্ধকে জঙ্গ উক্কাব ছাড়াও, মা’রাকায়ে হিসাব এবং জঙ্গ উবেদা নামেও অভিহিত করা হয়। [১]

আন-নাসিরের মৃত্যু:

আন-নাসির এই পরাজয়ে এতটাই মর্মান্বিত হলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আন্দালুস থেকে মরক্কোতে ফিরে গেলেন। মুওয়াহহিদুনরা যদি নতুন করে প্রস্তুতি নিত, তবে উক্কাবের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু আন-নাসিরের মনে হলো যে আন্দালুসের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে গেছে। তিনি তাঁর ছেলের জন্য উত্তরাধিকারের বায়আত গ্রহণ করলেন এবং নিজে নির্জনে সময় কাটাতে লাগলেন। দুঃখ ভোলার জন্য তিনি নাচ-গান এবং মদ্যপানের আশ্রয় নিতে শুরু করলেন, কিন্তু সবকিছুই বৃথা গেল। তীব্র মানসিক চাপের কারণে তাঁর মস্তিষ্কে প্রদাহ দেখা দিল, যার ফলে কয়েক সপ্তাহ পর ১৩ শাবান ৬১০ হিজরি (৩ জানুয়ারি ১২১৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অন্যদিকে অষ্টম আলফনসো উক্কাবের বিজয়ের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন এবং নিজের বাহিনীকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই হিসনে উক্কাব, বিলজ এবং বানিউসের মতো ছোট ছোট শহরগুলো কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই জয় করে নিলেন। নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা করা হলো এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করা হলো। এই বাহিনী যখন বায়াসায় পৌঁছাল, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী এলাকা ত্যাগ করেছিল, কিন্তু ভ্রমণের শক্তি নেই এমন হাজার হাজার মানুষ তখনও সেখানে অবশিষ্ট ছিল। খ্রিস্টানরা তাদের অধিকাংশকে হত্যা করল এবং শহরের জামে মসজিদটি ভস্মীভূত করে দিল। পরবর্তী আক্রমণ উবেদার ওপর হলো।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৩/৪৯০, ফান ৩১।

উক্কাব হলো উক্বিব-এর বহুবচন, যার অর্থ গিরিপথ। এই যুদ্ধ যে স্থানে হয়েছিল তা ছিল পাহাড়ি এলাকা এবং সেখানে প্রচুর গিরিপথ ছিল। হিসাব হলো হাসবাহ-এর বহুবচন, যার অর্থ উপত্যকা। এই যুদ্ধ উপত্যকা অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। উবেদা হলো যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহরের নাম।

যেখানে মুসলমানরা তেরো দিন প্রতিরোধের পর শান্তির চুক্তিতে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল। খ্রিস্টানরা শহরে প্রবেশ করে চুক্তি ভঙ্গ করল, এখানে ষাট হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হলো এবং প্রায় এক লক্ষ মানুষকে বন্দী করা হলো। এই পরিস্থিতিতে আন্দালুসের হতাশ মানুষরা দেয়াল টপকে আফ্রিকার দিকে হিজরতের ধারা শুরু করল এবং কয়েক বছরের মধ্যে কমবেশি পাঁচ লক্ষ মুসলমান আন্দালুস ছেড়ে চলে গেল। [১]

আবু ইয়াকুব ইউসুফ সানি, মুস্তানসির বিল্লাহ

৬১০ হিজরি থেকে ৬২০ হিজরি

(১২১৩ খ্রি. থেকে ১২২৪ খ্রি.)

আন-নাসিরের মৃত্যুর পরের দিন ১১ শাবান ৬১০ হিজরিতে তার পুত্র আবু ইয়াকুব ইউসুফকে ‘মুস্তানসির বিল্লাহ’ উপাধিতে মুওয়াহহিদুনদের খলিফা করা হয়। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। সে ছিল একজন ভদ্র কিন্তু অনভিজ্ঞ যুবক। রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী, বিশ্বজয় বা যুদ্ধবিগ্রহে তার কোনো আগ্রহ ছিল না, তাই তার শাসনব্যবস্থা ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে।

তার এই যুগটি বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়কর ছিল কারণ এই সময়ে একদিকে মিশর ও সিরিয়ায় পঞ্চম ক্রুসেড যুদ্ধ চলছিল যা কয়েক বছর ধরে অব্যাহত ছিল। অন্যদিকে ঠিক এই বছরগুলোতেই মঙ্গোলিয়া থেকে চেঙ্গিস খানের আবির্ভাব ঘটে, যে মধ্য এশিয়া, খোরাসান, ইরান ও ইরাকের অধিকাংশ শহরে মুসলমানদের নির্মূল করে দেয়। তবে এই সময়ে আন্দালুসে সাধারণত শান্তি বজায় ছিল যার কারণ ছিল মুস্তানসিরের শাসনের তৃতীয় বছর ৬১২ হিজরিতে কাস্টিল মুওয়াহহিদুন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল। ফলে কাস্টিলের সাথে মুওয়াহহিদুনদের বেশ কয়েক বছর কোনো যুদ্ধ হয়নি।

তবে অন্যান্য খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো মাঝেমাঝে মুসলমানদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। এই সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো “কাসরে আবি দানিস” এর পতন, যা দক্ষিণ আন্দালুসের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ ছিল। ঘটনাটি হলো ৬১৪ হিজরিতে পর্তুগাল একটি জার্মান নৌবহরের সাথে মিলে এই শহরটি অবরোধ করে। মুওয়াহহিদুনরা শহরবাসীদের সাহায্যের জন্য পৌঁছালেও পর্তুগিজরা তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। চার মাস অবরোধের পর শহরবাসী সাহস হারিয়ে ফেলে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা কেন্দ্রটি পর্তুগালের অংশে পরিণত হয়। এটি ১৩ রজব ৬১৪ হিজরির ঘটনা। এই দুর্গটি হাতছাড়া হওয়ার ফলে সিলভস থেকে শুরু করে মরক্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমের সমস্ত উপকূলীয় শহর পর্তুগিজদের হুমকির মুখে চলে আসে।

১৩ জিলহজ ৬২০ হিজরি (১৮ জানুয়ারি ১২২৪ খ্রি.) মুস্তানসির বিল্লাহর মৃত্যু হয়। তার সময়ে আফ্রিকার শহর “ফাস”-এ বারবারদের একটি শাখা “বনু মারিন” নিজেদের শক্তি সঞ্চয় শুরু করে এবং পরবর্তী শাসকদের যুগে তারা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে মুওয়াহহিদুন শাসনের অবসান তাদের হাতেই ঘটে। [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩১৮ থেকে ৩২৫।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৩০ থেকে ৩৩৫।

আবদুল ওয়াহিদ বিন ইউসুফ

জিলহজ ৬২০ হিজরি থেকে শাবান ৬২১ হিজরি

(জানুয়ারি ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেপ্টেম্বর ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

মুওয়াহহিদুনদের আমিরগণ একজন যুবকের শাসনের ক্ষয়ক্ষতি দেখার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এখন ক্ষমতার জন্য কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত। অতএব, তারা আবদুল মুমিনের নাতি আবদুল ওয়াহিদ বিন ইউসুফকে খলিফা হিসেবে নির্বাচন করলেন, যার বয়স ষাট বছরের বেশি হয়ে গিয়েছিল। তিনি শান্ত স্বভাবের, মুত্তাকি এবং নির্জনতাপছন্দ ছিলেন। তিনি প্রচুর পরিমাণে জিকির, ইবাদত এবং তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা তার সাধ্যের বাইরে ছিল এবং তিনি নিজেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই পদ গ্রহণ করেছিলেন।

তার শাসনের দুই মাস অতিবাহিত হয়েছিল যখন আন্দালুসের মারিয়া শহরের শাসক আবদুল্লাহ (যিনি খলিফা আল-মানসুরের পুত্র, আন-নাসিরের ভাই এবং মুস্তানসিরের চাচা ছিলেন) আন্দালুসি আমিরদের সাথে নিয়ে বিদ্রোহ করে দিলেন। ১৩ সফর ৬২১ হিজরি (১৮ মার্চ ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ) আন্দালুসের আমিরগণ আবদুল্লাহর হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন এবং তিনি আল-আদিল উপাধি ধারণ করে আন্দালুসে শাসন শুরু করলেন। সেই সাথে তিনি মরক্কোর গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও তার আনুগত্য করার এবং আবদুল ওয়াহিদকে অপসারণ করার দাওয়াত দিলেন।

অবশেষে রাজধানী শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তির আবেদন আবদুল ওয়াহিদকে জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং আল-আদিলের হাতে বায়াত গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর ২২ শাবান ৬২১ হিজরি (২০ সেপ্টেম্বর ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ) আবদুল ওয়াহিদকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হলো। তিনি মুওয়াহহিদুনদের মধ্যে প্রথম শাসক ছিলেন যাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতি মুওয়াহহিদুন রাষ্ট্রের পতনের লক্ষণ ছিল কারণ শাসক পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সরকার প্রধানের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। [১]

আল-আদিল

শাবান ৬২১ হিজরি থেকে শাওয়াল ৬২৪ হিজরি

(সেপ্টেম্বর ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অক্টোবর ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

১৩ সফর ৬২১ হিজরি আন্দালুসে সিংহাসন আরোহণের সময় আল-আদিলের বয়স ছিল প্রায় ৩৩ বছর। তিনি একজন আলিম, ফাজিল, মর্যাদাবান এবং সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল ওয়াহিদের হত্যার পর আফ্রিকাতেও আল-আদিলের খিলাফতের ওপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৪৯-৩৫২

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৫৬

আন্দালুসে আবদুল্লাহ আল-বায়াসীর বিদ্রোহ:

কিন্তু আফসোস যে, আন্দালুসে মুওয়াহহিদুনদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। সর্বপ্রথম রাজপরিবারের একজন আমির আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-বায়াসী, যিনি বায়াসা ও জিয়ানের শাসক ছিলেন, বিদ্রোহ করে নিজের খিলাফত ঘোষণা করলেন। সেই সাথে তিনি কাস্তিলিয়ার শাসক তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথেও আঁতাত করলেন এবং এটি ভাবলেন না যে, অতীতে খ্রিস্টানদের সাথে হাত মেলানোর ফল ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। আল-আদিল ৬২১ হিজরির শেষের দিকে তাঁর ভাই আবুল আলা এবং ইদ্রিস বিন মনসুরকে, যিনি ইশবিলিয়ার শাসক ছিলেন, বায়াসীর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার নির্দেশ দেন। এই বাহিনী ইশবিলিয়া থেকে রওনা হয়ে যখন বায়াসায় পৌঁছাল, তখন শীতকাল শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং প্রবল বৃষ্টি ও তুষারপাত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। বায়াসীর মিত্র তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের আগমনের আশঙ্কাও ছিল। এদিকে বায়াসী আনুগত্য প্রকাশ করে আল-আদিলের বায়াত গ্রহণের নিশ্চয়তা দিলেন, ফলে আবুল আলা কোনো দৃঢ় চুক্তি ছাড়াই ফিরে আসা সমীচীন মনে করলেন। এটি দেখে আল-আদিল আমির আবু সাঈদ উসমান বিন আবি হাফসের নেতৃত্বে সেখানে আরেকটি বাহিনী পাঠালেন। এবার বায়াসী ময়দানে নেমে এলেন। তাঁর নিজের সৈন্য ছিল মাত্র একশ জন, কিন্তু তিনি কাস্তিলিয়া থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। আবু সাঈদ খ্রিস্টানদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ না করেই ফিরে এলেন। এই পরিস্থিতি বায়াসীর সাহস বাড়িয়ে দিল এবং তিনি কর্ডোভাও দখল করে নিলেন। [১]

খ্রিস্টানদের মোকাবিলায় মুওয়াহহিদুনদের পরাজয়:

মুসলমানদের এই বিশৃঙ্খলা অন্যান্য খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোকেও আরও অগ্রসর হওয়ার সুযোগ করে দিল। লিওন রাজ্যের বাহিনী মার্টিন শানিজ (যিনি পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় সানজোর অবৈধ পুত্র ছিলেন)-এর নেতৃত্বে শারা পর্বতমালা অতিক্রম করে দক্ষিণ আন্দালুসে পৌঁছে গেল এবং সেখানে লুটতরাজ শুরু করল।

শীঘ্রই খ্রিস্টানরা ইশবিলিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল। এটি দেখে সাধারণ মানুষ জামে মসজিদে প্রতিবাদ করল এবং আল-আদিলের কাছে জিহাদের প্রস্তুতির দাবি জানাল। জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে আল-আদিল জিহাদের নির্দেশ দিলেন এবং জামাদিউল উলা ৬২২ হিজরিতে ইশবিলিয়া থেকে বের হলেন। বাহিনীতে বেশিরভাগই ছিল স্বেচ্ছাসেবক, যারা পদাতিক ও নিরস্ত্র ছিল। অশ্বারোহী ছিল মাত্র একশ জন। অন্যদিকে খ্রিস্টান বাহিনী ছিল পুরোপুরি সশস্ত্র এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্যের সমন্বয়ে গঠিত। যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো, তখন মুসলমানদের অশ্বারোহীরা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হলো। বাহিনীর আমির আবদুল্লাহ বিন আবু বকর তাদের নিষেধ করলেন এবং বললেন যে, আত্মরক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অশ্বারোহীরা তা মানল না এবং তাঁকে গালিগালাজ করতে করতে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খ্রিস্টানরা তাদের পিষে ফেলল এবং এরপর ইসলামী বাহিনীর ওপর চড়াও হলো। ফলাফল এই হলো যে, মুসলমানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং এখানে প্রায় বিশ হাজার লোক শহীদ হলেন। [২]

একই বছরের রজব মাসে পূর্ব আন্দালুসের আমিরদেরও খ্রিস্টানদের মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করতে হয়।

আল-আদিলের আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন:

এই পরাজয়গুলোর ফলে আন্দালুসে মুসলমানদের দুর্বলতা পুরোপুরি প্রকাশ পেয়ে গেল। এদিকে মরক্কোতে সিংহাসন শূন্য পড়ে ছিল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৫২, ৩৫৩।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৫৩।

এবং সেখানকার আমিরগণ আল-আদিলকে ডাকছিলেন। ফলে আল-আদিল আন্দালুসে তার ভাই ইদ্রিস আবুল আলাকে নায়েব নিযুক্ত করেন এবং জিলকদ ৬২২ হিজরিতে নিজে মরক্কো চলে আসেন। [১]

আন্দালুসে খ্রিস্টানদের আধিপত্য বিস্তারে আল-বায়াসির ভূমিকা:

আল-আদিলের অনুপস্থিতিতে আবদুল্লাহ আল-বায়াসি এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান এবং তিনি মুওয়াহহিদুনদের থেকে বাকি এলাকাগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন। তার কাছে খুব বেশি সৈন্য ছিল না, কিন্তু তার মিত্র তৃতীয় ফার্ডিনান্ড তার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে যান। বায়াসি তার আত্মবহ হয়ে প্রথমে উবাইদাহ জেলার কাইতাজাহ (Quesada) শহরে পৌঁছান, যা সমৃদ্ধি ও সম্পদের জন্য বিখ্যাত ছিল। পাথর নিক্ষেপ করে শহরের প্রাচীর ভেঙে ফেলা হয় এবং সেখানে গণহত্যা চলাকালীন হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা ও বন্দি করা হয়। এরপর আরও বেশ কিছু দুর্গ জয় করা হয়। কাস্টিলের সেনাবাহিনী জিয়ানের আশপাশে দেড় হাজার মুসলমানকে শহীদ করে এবং শীতকাল আসার পর ৬২৩ হিজরির শেষের দিকে (নভেম্বর ১২২৫ খ্রি.) ফিরে যায়।

পরের বছর ৬২৩ হিজরিতে কাস্টিলের সেনাবাহিনী পুনরায় আসে এবং শারাত পর্বতমালা অতিক্রম করে আবদুল্লাহ বায়াসির সাথে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। বায়াসির এলাকাগুলো বাদ দিয়ে তারা মুসলমানদের প্রতিটি শহর ও জনপদ ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যায় এবং পরিশেষে জিয়ান অবরোধে লিপ্ত হয়, যেখানে মুওয়াহহিদুনদের আমির উমর বিন ঈসা অবস্থান করছিলেন। তিনি কয়েক দিন অবরুদ্ধ থেকে যুদ্ধ করার পর খোলা ময়দানে এসে মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হন। ১৮০ জন মুসলমান শহীদ এবং দুই হাজার বন্দি হন। উমর বিন ঈসা অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পুনরায় দুর্গে আশ্রয় নেন। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড ক্রমাগত আক্রমণ করেও তা জয় করতে পারেননি।

অবশেষে তিনি অন্যান্য দুর্গের দিকে অগ্রসর হন এবং লুশা ও আল-হান্মা জয় করে গ্রানাডা পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেই সময় বারিথ নামক এক খ্রিস্টান অফিসার ফার্ডিনান্ডের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে মুওয়াহহিদুনদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রানাডাবাসী তাকে ইশবিলিয়া থেকে ডেকে আনেন এবং তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে আলোচনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরিশেষে চুক্তি অনুযায়ী গ্রানাডাবাসী তেরোশ খ্রিস্টান বন্দিকে মুক্তি দেন, যারা পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে বন্দি হয়েছিল। বারিথ এই চুক্তির পর পুনরায় ফার্ডিনান্ডের অধীনে চলে যান এবং তার সাথেই ফিরে যান।

ফার্ডিনান্ডের পরবর্তী আক্রমণ ছিল মুওয়াহহিদুনদের প্রাদেশিক কেন্দ্র ইশবিলিয়ার ওপর। সেখানে আল-আদিলের নায়েব আবুল আলা খোলা ময়দানে খ্রিস্টানদের মোকাবিলা করেন, কিন্তু তাকে দুই হাজার লাশ ফেলে পিছু হটতে হয় এবং শহরে অবরুদ্ধ হতে হয়। এই পরাজয়ের খবর কর্ডোভায় পৌঁছালে সেখানকার গণ্যমান্য ব্যক্তির বায়াসির শক্তি স্বীকার করে তাকে মুওয়াহহিদুনদের নতুন শাসক হিসেবে মেনে নেন। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড বায়াসিকে এই শর্তে সামরিক সহায়তা দিয়েছিলেন যে, শাসক হওয়ার পর তিনি তার পছন্দের দুর্গ ও শহরগুলো তাকে হস্তান্তর করবেন। ফলে বায়াসি মারতিশ, আন্দুজার, শালবাত্রা, কাবালা এবং বুর্জ আল-হান্মার মতো দুর্গগুলো খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিয়ে আনুগত্যের পূর্ণ প্রমাণ দেন। [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৩৫২ থেকে ৩৫৫

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০

বিয়াসীর পরিণাম:

আবদুল্লাহ বিয়াসী নিজেকে আন্দালুসের মুসলমানদের একমাত্র বৈধ শাসক মনে করতেন। তিনি ইশবিলিয়ার ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করা জরুরি মনে করতেন। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি সসৈন্যে ইশবিলিয়ার ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু আবু আল-উলা সেখানে আগে থেকেই পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। ২৫ সফর ৬২৩ হিজরিতে সংঘটিত এই যুদ্ধে বিয়াসী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে প্রাণ বাঁচিয়ে কর্ডোভায় পৌঁছান। বিয়াসীর পরাজয়ের খবর পেয়ে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড কাস্টিল থেকে বের হন এবং কর্ডোভার উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হিসন কাবালা অবরোধ করেন। এটি দেখে কর্ডোভা অধিবাসীদের মনে এই আশঙ্কার সৃষ্টি হলো যে, বিয়াসী হয়তো কর্ডোভাও খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেবেন। তাই কর্ডোভার কিছু নেতা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। বিয়াসী বিষয়টি টের পেয়ে শহর থেকে পালিয়ে যান এবং কর্ডোভার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত হিসন মুদাওয়ারে আত্মগোপন করেন। তবে কর্ডোভা অধিবাসীরা তার পিছু ছাড়েনি এবং দুর্গটি অবরোধ করে সেখানে প্রবেশ করে বিয়াসীকে হত্যা করে। আবু আল-উলার প্রতিনিধিকে কর্ডোভার সিংহাসন অর্পণ করা হয়। তিনি বিয়াসীর মস্তক বিজয়ের সুসংবাদ সম্বলিত পত্রসহ আবু আল-উলার দরবারে পাঠিয়ে দেন।

বিয়াসীর বয়স ছিল ষাট বছর। তিনি তার জীবনের শেষ তিন বছর আন্দালুসের মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যুহগুলো ধ্বংস করার পেছনে ব্যয় করেন এবং খ্রিস্টানদের সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলো দিয়ে দেন, যা দখলের পর তাদের জন্য মধ্য ও দক্ষিণ আন্দালুস জয় করা আর কঠিন ছিল না। [১]

৬২৩ হিজরির শেষের দিকে ফার্ডিনান্ড হিসন কাবালা জয় করেন। ৯ জিলহজ খ্রিস্টানরা বিয়াসার একটি শক্তিশালী দুর্গের ওপরও দখল প্রতিষ্ঠা করে। পরের বছর বিয়াসার দক্ষিণে অবস্থিত হিসন শুয়ারও পদানত হয়। এভাবে খ্রিস্টান বাহিনী আন্দালুসের প্রাচীন রাজধানী কর্ডোভার একেবারে সন্নিকটে পৌঁছে যায়। আবু আল-উলা এই পরিস্থিতি দেখে এক বছরের জন্য ভারী কর প্রদানের শর্তে তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন। [২]

আল-আদিল কেবল আন্দালুস থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি, বরং আফ্রিকার পরিস্থিতিও তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। এমন অবস্থায় তার ভাই আবু আল-উলার মনে হলো যে, তিনি নিজেই খলিফা হয়ে যাবেন। তাই কর্ডোভা ও ইশবিলিয়ার নেতৃবৃন্দ এবং ওলামাদের সাথে পরামর্শের পর ২ শাওয়াল ৬২৪ হিজরিতে তিনি খেলাফতের ঘোষণা দেন এবং আল-মামুন উপাধি গ্রহণ করেন। মারাক্কেশের মুওয়াহহিদুনরাও তার প্রতি অনেক আশা নিয়ে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং তার নির্দেশে আল-আদিলের কাছে পদত্যাগের দাবি জানায়। যখন তিনি রাজি হননি, তখন তারা তাকে হত্যা করে। এটি ২২ শাওয়াল ৬২৪ হিজরি (১৭ অক্টোবর ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৬০, ৩৬১

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৬২, ৩৬৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৬৩, ৩৬৪

আবু আল-আলা এবং ইদ্রিস আল-মামুন

শাওয়াল ৬২৪ হিজরি থেকে জিলহজ ৬২৯ হিজরি

(অক্টোবর ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অক্টোবর ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

আপাতদৃষ্টিতে আন্দালুস এবং মরক্কোর ওপর আল-মামুনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহ পর মরক্কোতে মুওয়াহহিদিনরা তার আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) ভঙ্গ করে এবং ষোলো বছর বয়সী এক শাহজাদা ইয়াহইয়া বিন নাসিরকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করে। ২৮ শাওয়াল ৬২৪ হিজরিতে তারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে এবং তিনি ‘মুতাসিম’ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে অপমানজনক চুক্তি:

আল-মামুন এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যত দ্রুত সম্ভব সেনাবাহিনী নিয়ে আফ্রিকা যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কিন্তু কাস্টিল থেকে কর্ডোভার ওপর আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, কারণ যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আল-মামুন তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে আরও এক বছরের যুদ্ধবিরতির চুক্তি করেন, যাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্থির করা হয়:

- কাস্টিলকে দশ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করা হবে।
- ফার্ডিনান্ডের পছন্দমতো দশটি দুর্গ তাকে দিয়ে দেওয়া হবে।
- মরক্কোতে খ্রিস্টানদের জন্য একটি গির্জা নির্মাণ করে দেওয়া হবে।
- যদি (মামুনের এলাকায়) কোনো খ্রিস্টান ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তার ইসলাম গ্রহণ কবুল করা হবে না, বরং মুসলমানরা তাকে পাদ্রিদের হাতে সোপর্দ করে দেবে।
- যদি (ফার্ডিনান্ডের এলাকায়) কোনো মুসলমান খ্রিস্টান হয়, তবে কাউকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
- ফার্ডিনান্ড আল-মামুনকে আফ্রিকা দখল করতে সামরিক সহায়তা প্রদান করবে।

এই অপমানজনক চুক্তিটি ৬২৬ হিজরিতে (১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ) স্বাক্ষরিত হয় এবং একই বছরের রমজান মাসে কাস্টিলের পাঁচশ সৈন্য আল-মামুনের কাছে পৌঁছে যায়। [২]

বিদ্রোহী শাহজাদা ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয়:

আল-মামুন তার সৈন্য ও খ্রিস্টানদের নিয়ে জিলকদ মাসে আফ্রিকায় পৌঁছান, যেখানে মুওয়াহহিদিনদের কিছু আমিরও তাদের দলবল নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। এই বাহিনী ২৫ রবিউল আউয়াল ৬২৭ হিজরিতে মুতাসিমের বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। খ্রিস্টান বাহিনী মুতাসিমের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। তিনি কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং কোথাও আত্মগোপন করেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৩/৩৬৮

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৩/৩৬৮

আল-মামুন শীঘ্রই মরক্কো শহরও জয় করে নিলেন। সেখানে মুফতির কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে মুওয়াহহিদীনের একশ জন প্রাচীন ও অভিজ্ঞ আমীরকে, যারা তার বায়াত ভঙ্গ করেছিল, মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

এদিকে মুতাসিম তার শক্তি পুনরায় সঞ্চয় করেছিলেন। রমজান মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুতাসিম আবারও পরাজিত হন এবং পিছু হটেন। আল-মামুন বিদ্রোহকারী চার হাজার মুওয়াহহিদীনের শিরশ্ছেদ করিয়ে মরক্কো শহরের প্রাচীরে ঝুলিয়ে দেন। গরমের কারণে সেগুলোর দুর্গন্ধে শহরের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যখন তারা আল-মামুনের কাছে এই অভিযোগ পৌঁছাল, তখন তিনি বললেন: “এখানে কিছু পাগল বাস করে যাদের চিকিৎসা এটাই। এই মাথাগুলো দেখে তারা শিক্ষা পাবে। এগুলোর গন্ধ আমাদের বন্ধুদের জন্য আতর, আর শত্রুদের জন্য অসহনীয়।”

আল-মামুন ফার্ডিনান্ডের সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী মরক্কোতে একটি গির্জা নির্মাণ করেন এবং বাকি শর্তগুলোও পালন করেন। [১]

ইবনে তুমারতের মাহদীয়াত ও ইসমাতের খণ্ডন:

মামুন অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু একটি কাজ খুব ভালো করেছিলেন। মুওয়াহহিদীনের রাষ্ট্রে ইবনে তুমারতকে সরকারিভাবে মাহদী মাসুম বলা হতো। মুদ্রায় তার নাম খোদাই করা হতো এবং খুতবায় তার জন্য দোয়া করা হতো। মামুন খুতবা ও মুদ্রা থেকে তার নাম মুছে ফেলেন এবং একটি ঘোষণার মাধ্যমে স্পষ্ট করেন যে, তিনি মাহদীও ছিলেন না এবং মাসুমও ছিলেন না। ইসমাত কেবল আশ্বিয়ায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট। মামুন এক ফরমানের মাধ্যমে জানান যে, সাবেক খলিফা আবু ইউসুফ আল-মানসুর এই ঘোষণা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু তিনি সুযোগ পাননি, তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখন সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এই ফরমানের কোথাও কোনো বিরোধিতা হয়নি কারণ আফ্রিকা ও আন্দালুসে অধিকাংশ মানুষ আহলে সুনাত ছিলেন এবং তাদের আকিদাও এটাই ছিল। ইবনে তুমারত সংক্রান্ত মাহদীয়াত ও ইসমাত শব্দগুলো মুওয়াহহিদীনের মাঝে ভুল প্রথা হিসেবে চলে আসছিল যা মুছে ফেলার সাহস কারো ছিল না। মামুনের এই ঘোষণা ছিল তাদের অন্তরের কথা। এই ঘটনাটি ৬২৭ হিজরির। [২]

সেউতায় বিদ্রোহ:

মামুন চেষ্টা করছিলেন যেন কোনোভাবে জনগণকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং অন্তত উত্তর আফ্রিকায় নিজের অবস্থান মজবুত করা যায়, কিন্তু এরই মধ্যে ৬২৯ হিজরিতে তার ভাই আবু মুসা, যাকে তিনি সেউতার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন, বিদ্রোহ করে বসেন। মামুন সৈন্য সংগ্রহ করে সেউতায় পৌঁছান এবং শহরটি অবরোধ করেন। পেছনে মরক্কো রক্ষার জন্য বেশি সৈন্য ছিল না। সেউতার অবরোধ দীর্ঘ হতে থাকে এমনকি তিন মাস অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু শহরটি জয় করা সম্ভব হয়নি। [৩]

মরক্কোর ওপর ইয়াহইয়া মুতাসিমের দখল। মামুনের মৃত্যু:

এদিকে মামুনের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মুতাসিম সুযোগ বুঝে নিজের সমর্থকদের একত্রিত করে মরক্কো আক্রমণ করেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৬৮, ৩৭০

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৭০, ৩৭৪ [৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৮২

যেহেতু সেখানে কোনো সেনাবাহিনী ছিল না এবং শহরবাসীর পক্ষ থেকেও বিশেষ কোনো প্রতিরোধ হয়নি, তাই শহরটি দ্রুত বিজিত হয়ে গেল। মুতাসিম খিলাফতের প্রাসাদটি পুরোপুরি লুণ্ঠন করলেন এবং সমস্ত ধনভাণ্ডার নিজের পাহাড়ি আস্তানায় সরিয়ে নিলেন। অধিকন্তু, তিনি মামুনের নির্মিত গির্জাটি পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন এবং সেখানে বসবাসরত পাদ্রি ও খ্রিস্টানদের হত্যা করলেন। এছাড়া শহরে যে ইহুদিকেই পাওয়া গেল, তাকেও তিনি জীবিত ছাড়লেন না।

মামুন যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি সেউতার অবরোধ ছেড়ে দ্রুত ফিরে এলেন যাতে মুতাসিমকে শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে পারেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত খ্রিস্টানরা তাদের গির্জা ধ্বংসের কারণে অত্যন্ত উত্তেজিত ছিল। তিনি তাদের সাথে ওয়াদা করলেন যে, তিনি তিন দিনের জন্য মাররাকেশ তাদের হাতে তুলে দেবেন যাতে তারা যা খুশি করতে পারে, লুণ্ঠন করতে পারে এবং নিজেদের ক্ষোভ মেটাতে পারে। তবে এই অশুভ ওয়াদা পূর্ণ হতে পারেনি এবং পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে ২৯ জিলহজ ৬২৯ হিজরি (১৮ অক্টোবর ১২৩২ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন। [১]

মামুনের শাসনামলের ওপর এক নজর:

মামুন তাঁর পিতা আবু ইউসুফ আল-মানসুরের মতোই অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই সাথে তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলিম, একজন দক্ষ ফকিহ এবং সুসাহিত্যিকও ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও তিনি মুওয়াহহিদিন রাষ্ট্রকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। তিনি মাত্র পাঁচ বছর সময় পেয়েছিলেন, যা বিদ্রোহ দমনেই কেটে গিয়েছিল। [২]

তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ৬২৮ হিজরিতে তিনি সমস্ত মুওয়াহহিদিন ভূখণ্ডে একটি ইশতেহার জারি করেন যাতে সালাত কায়েম করা, জাকাত ও সদকা প্রদান, সৎকাজের আদেশ দেওয়া, গুনাহ থেকে বিরত থাকা, মদ্যপান ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে বেঁচে থাকা এবং দ্বীনের দাওয়াত সাধারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। [৩]

তাঁর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল খ্রিস্টানদের থেকে সাহায্য নেওয়া এবং তাদের নিজের সেনাবাহিনীর অংশ বানানো, কিন্তু নিজের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা ছাড়া তিনি আর কিছুই অর্জন করতে পারেননি; বরং পরিস্থিতি আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর সময়ে তিউনিসও মুওয়াহহিদিনদের হাতছাড়া হয়ে যায়। আগে সেখানে যারা মুওয়াহহিদিনদের পক্ষ থেকে শাসন করছিল, তারা ৬২৫ হিজরিতে মুওয়াহহিদিনদের দুর্বল দেখে স্বাধীন শাসক হয়ে বসে। এভাবে মুওয়াহহিদিনদের শক্তি আরও কমে যায়। এর আগে ৬২৩ হিজরিতে তিলিমসানের বনু জায়ানও স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। মোদ্বাকথা, মুওয়াহহিদিনদের শক্তি দিন দিন হ্রাস পাচ্ছিল, তাই তারা আন্দালুসের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না, যেখানে ফার্ডিনান্ড ৩য়-এর মতো শক্তিশালী শত্রু তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে ছিল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৮৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৮৫

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৮১

আর-রশিদের বায়াত

মামুনের মৃত্যু সফরের সময় হয়েছিল। তার চৌদ্দ বছর বয়সী ছেলে আবু মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ সাথে ছিল। লশকরের আমীরগণ ১লা মহররম ৬৩০ হিজরিতে তার বায়াত গ্রহণ করেন এবং তিনি আর-রশিদ উপাধি ধারণ করে খলিফা হন। মামুনের মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়েছিল এবং এটাই প্রকাশ করা হয়েছিল যে তিনি অসুস্থ এবং চলাফেরা করতে অক্ষম। [১]

ইয়াহইয়া মুতাসিমের পরাজয় ও হত্যা

এই লশকর একইভাবে মরক্কো পৌঁছায় যেখানে ইয়াহইয়া মুতাসিম দখলদার ছিল। যখন লশকর শহরের কাছে পৌঁছাল, তখন ইয়াহইয়া মুতাসিম বাইরে এসে মোকাবিলা করল কিন্তু পরাজিত ও নিহত হলো। তবে ততক্ষণে শহরবাসী খবর পেয়ে গিয়েছিল যে মামুন নাসরানিদের তিন দিন পর্যন্ত শহর লুণ্ঠনের অনুমতি দিয়েছেন। তাই তারা লশকরের জন্য শহরের দরজা খোলেনি এবং মরণপণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে শহরের প্রাচীরে সমবেত হলো। [২]

মরক্কোর ওপর আর-রশিদের দখল

অবশেষে লশকরের আমীরগণ শহরের উলামা ও ফুকাহাদের মধ্যস্থতায় স্পষ্ট করলেন যে মামুনের মৃত্যু হয়েছে এবং নাসরানিদের সাথে করা ওয়াদা বাতিল করা হয়েছে। আর-রশিদ শহরবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ছাড়াও কর মওকুফের ঘোষণা দিলেন। অবশেষে শহরবাসী আশ্বস্ত হয়ে দরজা খুলে দিল এবং আর-রশিদ তার লশকরসহ ভেতরে প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। নাসরানি বাহিনী ওয়াদা ভঙ্গের কারণে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল। এমতাবস্থায় আর-রশিদের মা পাঁচ লক্ষ দিনার দিয়ে তাদের দুঃখ ও ক্ষোভ দূর করে দিলেন। [৩]

আর-রশিদ এবং মুওয়াহহিদিনদের পরবর্তী শাসকদের সাথে আন্দালুসের ইতিহাসের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। সারসংক্ষেপ হিসেবে এতটুকু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট যে, মুওয়াহহিদিনরা মরক্কোতে আরও তিন দশক ক্ষমতায় ছিল। আর-রশিদের পর আস-সাইদ, উমর আল-মুরতাজা এবং আবুল আলা আল-ওয়াসিক একে একে মুওয়াহহিদিনদের প্রধান হন। শেষ সুলতান আবুল আলা আল-ওয়াসিক বারবার গোত্র বনু মারিনের সামনে একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েন এবং ৬৬৭ হিজরিতে বনু মারিন তাকে হত্যা করে মরক্কোতে নিজেদের শাসন কায়েম করে।

বাকি কেবল এক আল্লাহর নাম রয়ে গেল আদিম

সবকিছু ভাসিয়ে সময়ের নদী বয়ে গেল

মুওয়াহহিদিনদের ওপর এক নজর

মুওয়াহহিদিনদের মধ্যে বারোজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রথম চারজন অর্থাৎ: আব্দুল মুমিন, আবু ইয়াকুব, আবু ইউসুফ এবং আন-নাসির অত্যন্ত শানদার শাসক ছিলেন কিন্তু উকাবের যুদ্ধে পরাজয় তাদের মর্যাদাকে লান করে দেয়। এরপর আব্দুল ওয়াহিদ থেকে দুর্বল শাসকদের যুগ শুরু হয়। এই শাসকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩৮৩/৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৮৩/৩, ৩৮৪

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৮৪/৩

৬২৩

ক্রমিক শাসক সময়কাল বিশেষ বৈশিষ্ট্য

১ আবদুল মুমিন ৫৩৩ হি. থেকে ৫৫৮ হি. (১১৩০ থেকে ১১৬৩ খ্রি.) সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা, মুরাবিতুন শাসনের অবসান।

২ আবু ইয়াকুব ইউসুফ আউয়াল ৫৫৮ হি. থেকে ৫৮০ হি. (১১৬৩ থেকে ১১৮৩ খ্রি.) মুওয়াহহিদিনদের উন্নতির যুগ।

৩ ইয়াকুব আবু ইউসুফ আল-মানসুর ৫৮০ হি. থেকে ৫৯৫ হি. (১১৮৩ থেকে ১১৯৯ খ্রি.) আল-আরাক যুদ্ধের বিজয়ী, মহান শাসক।

৪ মুহাম্মদ আন-নাসির ৫৯৫ হি. থেকে ৬১০ হি. (১১৯৯ থেকে ১২১৩ খ্রি.) আল-উকাব যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়।

৫ আবু ইয়াকুব ইউসুফ সানি মুসতানসির ৬১০ হি. থেকে ৬২০ হি. (১২১৩ থেকে ১২২৩ খ্রি.) অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ, পতন ত্বরান্বিত হয়।

৬ আবদুল ওয়াহিদ জিলহজ ৬২০ হি. থেকে শাবান ৬২১ হি. (জানুয়ারি ১২২৪ থেকে সেপ্টেম্বর ১২২৪ খ্রি.) ইবাদতকারী ও পরহেজগার কিন্তু শাসন ক্ষমতার গুণাবলি বর্জিত।

৭ আল-আদিল ৬২১ হি. থেকে ৬২৪ হি. (১২২৪ থেকে ১২২৭ খ্রি.) আন্দালুসে বিয়াসার বিদ্রোহ।

৮ আবুল আলা ইদ্রিস আল-মামুন ৬২৪ হি. থেকে ৬২৯ হি. (১২২৭ থেকে ১২৩২ খ্রি.) ফিতনা ও বিদ্রোহের আধিক্য।

৯ আবদুল ওয়াহিদ আর-রশিদ ৬৩০ হি. থেকে ৬৪০ হি. (১২৩২ থেকে ১২৪২ খ্রি.)

১০ আবুল হাসান আস-সাইদ ৬৪০ হি. থেকে ৬৪৬ হি. (১২৪২ থেকে ১২৪৮ খ্রি.)

১১ আবু হাফস উমর আল-মুরতাজা ৬৪৬ হি. থেকে ৬৬৫ হি. (১২৪৮ থেকে ১২৬৬ খ্রি.)

১২ আবুল আলা আল-ওয়াসিক ৬৬৫ হি. থেকে ৬৬৭ হি. (১২৬৬ থেকে ১২৬৯ খ্রি.)

আন্দালুস থেকে মুওয়াহহিদিনদের বহিষ্কৃত হওয়ার কারণসমূহ:

মুরাবিতুনদের মতো মুওয়াহহিদিনরাও মরক্কোতে অবস্থান করে স্পেনে শাসন করার চেষ্টা করেছিল। এ কারণে এই বিশাল দেশটি, যা খ্রিস্টানদের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক সীমান্ত ছিল, কখনোই পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। যদিও মুওয়াহহিদিনরা খ্রিস্টানদের প্রতিটি আক্রমণ প্রতিহত করতে বা স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে কখনো দেরি করেনি, কিন্তু আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তারা আন্দালুসকে অবশ্যই তাদের শাসনের অংশ বানিয়েছিল এবং তা রক্ষার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু আল-মানসুর ছাড়া তাদের অন্য কোনো শাসক এখানে নতুন দুর্গ স্থাপন করার এবং খ্রিস্টানদের শক্তিশালী কেন্দ্রগুলো জয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। প্রায় এক শতাব্দীকাল শাসন করা সত্ত্বেও মুওয়াহহিদিনরা এখানে তাদের বিশেষ কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। পরিশেষে তারা আন্দালুস রক্ষায় অক্ষম হয়ে পড়ে এবং নিজেরা আপসে বিবাদে লিপ্ত হয়। তাদের ফিরে আসার বিশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই খ্রিস্টানরা গ্রানাডা এবং এর আশপাশের কিছু জেলা ছাড়া পুরো আন্দালুস জয় করে নিয়েছিল।

তারিখে উন্মতে মুসলিমা

৬২৪

আন্দালুস সগরা

৬৩৩ হিজরি থেকে ৮৯৭ হিজরি

(১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ)

২৬৫ বছর

মুওয়াহহিদুনদের পর

আন্দালুসি আমীরগণ মুওয়াহহিদুনদের শাসন কেবল এই আশায় গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা খ্রিস্টানদের হাত থেকে আন্দালুসকে রক্ষা করতে পারবে। যখন তারা দেখল যে মুওয়াহহিদুনরা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম নয়, তখন তারা নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অগ্রাধিকার দিল এবং এভাবে আন্দালুসে আবারও স্থানে স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। মুওয়াহহিদুনরা বিতাড়িত হলো এবং এর সাথে সাথেই এখানে আবারও তেমন রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো যেমনটি উমাইয়া শাসনের অবসানের পর মুলুকুত তাওয়ায়েফ-এর যুগে ছিল। তবে বড় পার্থক্য ছিল এই যে, মুলুকুত তাওয়ায়েফ রাষ্ট্রগুলোর সামগ্রিক আয়তন বেশ বিশাল ছিল এবং অর্ধেকের বেশি আন্দালুস তাদের অধীনে ছিল, যেখানে মুওয়াহহিদুনদের প্রস্থানের পর যে রাষ্ট্রগুলো অস্তিত্বে এল সেগুলো ছিল অত্যন্ত ছোট ও দুর্বল; অধিকন্তু, সেগুলোর সবগুলোর আয়তন মিলিয়েও আন্দালুসের এক-তৃতীয়াংশ হতো না।

এখানে স্থানীয় আমীরদের যে রাষ্ট্রগুলো অস্তিত্বে এল সেগুলো অনেকাংশেই খ্রিস্টানদের দয়ার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং তাদের পক্ষে নিজেদের স্বাধীন ও সার্বভৌম অবস্থান বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ছিল। পরিতাপের বিষয় এই যে, এই পরিস্থিতিতেও এই মুসলিম রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও সামরিক সহযোগিতা করতে পারেনি, বরং এর বিপরীতে তারা কাস্টিল, আরাগন বা পর্তুগালের খ্রিস্টানদের সাহায্য নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমীর তার প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য খ্রিস্টানদের সেনাবাহিনীর সাহায্য নিত এবং এর বিনিময়ে নিজের এক-দুটি দুর্গ তাদের হাতে তুলে দিত। এভাবে খ্রিস্টানরা কোনো জানমালের ক্ষতি ছাড়াই নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে থাকল এবং ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সীমানা দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সংকুচিত হতে থাকল। এমনকি খ্রিস্টানদের সন্তুষ্টির জন্য কিছু শীর্ষস্থানীয় মুসলিম আমীর মুরতাদও হয়ে গিয়েছিল, যাদের মধ্যে শাতিবার আবু যায়িদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কোনো এলাকা দখল করতে ব্যর্থ হওয়ার পর আরাগনে গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল যাতে গির্জার লোকদের সাহায্যে ক্ষমতা লাভ করতে পারে; এটি আলাদা কথা যে সে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল এবং কোথাও তার সুবিধা হয়নি। এমন ছোটখাটো রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রগুলোকে বাদ দিলে এই যুগে উল্লেখযোগ্য মুসলিম রাষ্ট্র ছিল মাত্র তিনটি: (১) বনু হুদ (২) বনু মারদানিশ (৩) বনু নাসর।

মুরসিয়ার বনু হুদ

এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, যিনি মুলুকুত তাওয়ায়েফ যুগে সারাগোসায় শাসনকারী বনু হুদের বংশধর ছিলেন, তাই তাকে সাধারণত ইবনে হুদ বলা হয়। তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং দরিয়ায়ে...

শাতুরার কাছে একটি ছোট দুর্গের মালিক ছিল। যখন মুওয়াহহিদিনদের শাসনের ভিত্তি নড়বড়ে হতে শুরু করল, তখন সে তার সমর্থকদের একটি দল নিয়ে মার্সিয়া আক্রমণ করল এবং আমীর আবুল আব্বাসকে (যিনি মুওয়াহহিদিন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মুমিনের প্রপৌত্র ছিলেন) তরবারির জোরে হত্যা করল। এটি রজব ৬২৫ হিজরির ঘটনা। কিছুকাল পর ভ্যালেন্সিয়ার শাসক আবু জায়েদ তাকে বিতাড়িত করার জন্য মার্সিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু ইবনে হুদ তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেন।

এই সাফল্যের পর রমজান ৬২৫ হিজরিতে ইবনে হুদ মার্সিয়ায় নিজের বায়াত গ্রহণ করেন এবং “আমীরুল মুসলিমীন” উপাধি গ্রহণ করেন। আন্দালুসের মুসলমানরা, যারা সেই সময় কোনো ত্রাতার অপেক্ষায় ছিল, দ্রুত ইবনে হুদের বায়াত গ্রহণ করতে শুরু করল। পূর্ব আন্দালুসে শাতবিয়া, জাজিরাতুল শুকার এবং এর আশপাশের এলাকাগুলোতে তার বায়াত সম্পন্ন হলো।

এই সময়ে মুওয়াহহিদিনদের কাছে বড় শহরগুলোর মধ্যে কেবল ইশবিলিয়া বাকি ছিল, যেখানে তাদের প্রধান আবু আল-উলা আল-মামুন স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবনে হুদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। ৬২৬ হিজরির শুরুতে লোরকার ময়দানে ইবনে হুদ পরাজিত হন এবং ভ্যালেন্সিয়ায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তবে তার এই পরাজয় সাময়িক ছিল এবং মানুষ তার দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। মারদা এবং বাতিলাউসের আমীররাও তার আনুগত্য স্বীকার করে নেন। আবু আল-উলা আল-মামুন প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখে জিলহজ ৬২৬ হিজরিতে আন্দালুস ছেড়ে আফ্রিকায় চলে যান। তার চলে যাওয়ার পর ইশবিলিয়াবাসীরাও ইবনে হুদের বায়াত গ্রহণ করে। [১] আলমেরিয়ার আমীর মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রুমাইতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইবনে হুদের বিশ্বস্ত আমীরদের অন্তর্ভুক্ত হন। [২] অন্যদিকে কর্ডোভা এবং গ্রানাডার মানুষও তার বলয়ে প্রবেশ করাকে অগ্রাধিকার দিল। [৩] এভাবে ইসলামী আন্দালুসের অধিকাংশ শহর তার অনুগত হয়ে গেল।

সুকুত-এ বাতিলাউস:

মুসলমানদের এত সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও ইবনে হুদ উত্তর দিক থেকে খ্রিস্টানদের স্রোত ঠেকাতে পারলেন না। সেই সময়ে লিওন রাজ্যের রাজা ছিলেন আলফনসো নবম এবং তার পুত্র ফার্ডিনান্ড তৃতীয় (কাস্টিল-এর রাজা) ইসলামী আন্দালুসের বাকি শহরগুলো গ্রাস করতে উদ্যত ছিলেন।

আলফনসো বাতিলাউস রাজ্যের উত্তরের শহর মারদার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন যেখানে ইবনে হুদের খুতবা পড়া হতো। এটি দেখে ইবনে হুদ তার দিকে অগ্রসর হলেন। সান হানশের কাছে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো। ইবনে হুদের মেজাজে স্থিরতা ছিল না। তিনি জোরালো খ্রিস্টান আক্রমণের সামনে টিকে থাকতে পারলেন না এবং পিছু হটলেন। এভাবে মারদা খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেল। এর কিছুকাল পরেই বাতিলাউসও তাদের দখলে চলে গেল। এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা যা ৬২৭ হিজরির মাঝামাঝি (মে ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে ঘটেছিল। [৪]

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪১৫/৪; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৯৩ ও ৩৮৯/৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪২৯/৩

[৩] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪১৯/৪ ও ৪২০; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪১৯/৩

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩৯৯/৩ ও ৪০০

ফার্ডিন্যান্ডের জিয়ান আক্রমণ এবং লিওনের রাজত্ব:

এদিকে শাবান ৬২৭ হিজরি (জুন ১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) মাসে ফার্ডিন্যান্ড তৃতীয় জিয়ানের সামনে এসে পৌঁছান এবং তা কঠোরভাবে অবরোধ করেন। তবে শহরবাসী প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং আক্রমণকারীদের শহরে প্রবেশ করতে দেননি। তিন মাসের ব্যর্থ অবরোধের পর ফার্ডিন্যান্ডকে ফিরে যেতে হয়। [১] এই সময়ে তার পিতা আলফনসো নবম মৃত্যুবরণ করেন। এই খবর শোনামাত্রই ফার্ডিন্যান্ড তার রাজধানী লিওনে পৌঁছান এবং সেখানকার শাসনভারও গ্রহণ করেন। এভাবে কাস্টিল রাষ্ট্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। [২]

মুস্তানসির বিপ্লব আকবাসীর পক্ষ থেকে শাসনের স্বীকৃতি:

যা-ই হোক, ইবনে হুদ এই পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ এবং তার আমিরাতের ওপর মুসলমানদের ঐকমত্যের জন্য সচেতন ছিলেন। ৬২৯ হিজরিতে তিনি জাজিরাতুল খাদরা এবং জিব্রাল্টার এবং একই বছর সমুদ্রের ওপারে মরক্কোর উপকূলীয় শহর সেউটাকেও অনুগত করে নেন। [৩] এই সময়ে তিনি বাগদাদের আকবাসী খলিফা মুস্তানসির বিপ্লবের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং ৬৩০ হিজরিতে তার কাছ থেকে আমিরাতের সনদ লাভ করে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করেন। [৪]

ফার্ডিন্যান্ডের মোকাবিলায় পরাজয় এবং কর প্রদানের চুক্তি:

ইবনে হুদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে ৬৩০ হিজরিতে ফার্ডিন্যান্ড তৃতীয় তার ভাই আলফনসোর নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পাঠান, যারা কর্ডোভার আশপাশে লুটতরাজ করার পর জেরেসের দিকে অগ্রসর হয়। এখানে ইবনে হুদ “ফাহস শুরিস” নামক ময়দানে তাদের মোকাবিলা করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। ফার্ডিন্যান্ড তৃতীয় এবার “উবেদা” নামক সুরক্ষিত শহর আক্রমণ করেন এবং দীর্ঘ অবরোধের পর ৬৩০ হিজরির শেষের দিকে তা দখল করে স্থানীয় মুসলমানদের দেশত্যাগে বাধ্য করেন। এই পরিস্থিতিতে ইবনে হুদ ফার্ডিন্যান্ড তৃতীয়র পরবর্তী আক্রমণ থেকে বাঁচতে তাকে দৈনিক এক হাজার দিনার প্রদানের শর্তে সন্ধি করেন। এই চুক্তি ৬৩০ হিজরিতে সম্পন্ন হয়। [৫]

ইবনুল আহমারের সাথে সন্ধি:

ইবনুল আহমার এবং ইবনে হুদের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ চলে আসছিল। বিশেষ করে কর্ডোভাকে উভয়েই নিজেদের অধীনে রাখতে চেয়েছিলেন। এদিকে কর্ডোভা অধিবাসীদের অবস্থা ছিল এমন যে, কখনো তারা ইবনে হুদের অনুগত হয়ে যেত আবার কখনো ইবনুল আহমারকে নিজেদের শাসক মেনে নিত। পরিশেষে তারা ইবনে হুদের পক্ষ অবলম্বন করে এবং ইবনুল আহমারকে কর্ডোভা থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এই ঘটনায় ইবনুল আহমার অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন এবং তিনি কর্ডোভা অধিবাসীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪০১/৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪০১/৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪০০/৩

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪১১, ৪১২/৩

[৫] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪০১, ৪০৪/৩

তবে এই সময়ে খ্রিস্টানদের উপর্যুপরি আক্রমণ ইবনে আল-আহমারকে চিন্তিত করে তুলল এবং তিনি ইবনে হুদের সাথে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। খলিফা মুস্তানসিরের পক্ষ থেকে ইবনে হুদের জন্য শাসনের সনদ আসার পর ইবনে আল-আহমার ৬৩১ হিজরির শাওয়াল মাসে এই শর্তে ইবনে হুদের আনুগত্য স্বীকার (বাইয়াত) করলেন যে, তাকে জিয়ান এবং এর আশপাশের দুর্গ ও জনপদগুলোর শাসনে বহাল রাখা হবে। এই চুক্তির ফলে মুসলমানদের মধ্যকার অনৈক্য হ্রাস পেল এবং আন্দালুসের দুই বড় রাজনীতিবিদ এক কাতারে চলে এলেন। [১]

ফার্ডিনান্ড তৃতীয়-এর ধূর্ততা এবং ইবনে হুদের অদূরদর্শিতা:

ফার্ডিনান্ড তৃতীয়-এর জন্য এই ঐক্য বিপদের সংকেতের চেয়ে কম কিছু ছিল না। তিনি কালক্ষেপণ না করে ৬৩২ হিজরিতে দক্ষিণের দিকে এমনভাবে আক্রমণ শুরু করলেন যে, ইবনে আল-আহমার এবং ইবনে হুদ উভয়েই তাদের সীমান্তকে বিপন্ন দেখতে পেলেন।

ফার্ডিনান্ড কাছে এসে তার বাহিনীকে ইবনে আল-আহমারের এলাকা জিয়ানের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং দূত পাঠিয়ে ইবনে হুদের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। ফার্ডিনান্ডের প্রথম শর্ত ছিল এই যে, ইবনে হুদ তাকে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দিনার প্রদান করবেন, যার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার তৎক্ষণাৎ দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত ছিল এই যে, তিনি জাবাল শারাতের ত্রিশটি দুর্গ কাসতালিয়া-র হাতে তুলে দেবেন। এর বিনিময়ে তিন বছর পর্যন্ত তার সীমান্তকে সম্মান করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে ইবনে আল-আহমারকে কোনো সামরিক সহায়তা দেওয়া হবে না।

প্রকৃতপক্ষে ফার্ডিনান্ড এই চুক্তির মাধ্যমে ইবনে আল-আহমার এবং ইবনে হুদের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে তাদের সন্ধি ভেঙে দিচ্ছিলেন। তাছাড়া ফার্ডিনান্ডের প্রস্তাবের ছত্রে ছত্রে এই হুমকি বিদ্যমান ছিল যে, যদি ইবনে হুদ চুক্তি না করেন, তবে ফার্ডিনান্ড ইবনে আল-আহমারকে সাথে নিয়ে তার বিরুদ্ধে ফ্রন্ট গঠন করবেন। মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ছিল যে, ইবনে হুদ—যিনি ফার্ডিনান্ড দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন—প্রতিটি শর্ত মেনে নিলেন এবং এই চুক্তি সম্পাদন করলেন। এভাবে তার এবং ইবনে আল-আহমারের মধ্যে হওয়া শান্তি চুক্তিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নস্যাৎ হয়ে গেল, যার প্রমাণ হলো ইবনে আল-আহমার এই চুক্তিতে শরিক ছিলেন না। যদিও তিনি ইবনে হুদের সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং সেই হিসেবে এই চুক্তিতে তার অংশগ্রহণ আবশ্যিক ছিল। তার অংশগ্রহণ না করার অর্থ ছিল এই যে, তিনি ইবনে হুদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন।

এই চুক্তির সবচেয়ে বড় ক্ষতি এই হলো যে, এমন ত্রিশটি দুর্গ ফার্ডিনান্ডের দখলে চলে গেল, যেগুলোর দখলের পর কাসতালিয়ার জন্য একদিকে কর্ডোভা এবং অন্যদিকে ইবনে আল-আহমারের রাজধানী জিয়ানের ওপর আক্রমণ করা অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। চুক্তির পর ফার্ডিনান্ড ফিরে গেলেন এবং তিন বছরের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। [২]

বনু মারদানিশ এবং আবু জামিল

মুওয়াহহিদুনদের উত্থানকালে মুহাম্মদ বিন সাদ বিন মারদানিশ নামক এক সর্দার বালেন্সিয়াকে কেন্দ্র করে পূর্ব আন্দালুসে প্রায় এক চতুর্থাংশ শতাব্দী ধরে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তবে ৫৬৭ হিজরিতে তার মৃত্যু হলে তার পুত্র...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৩১৬

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৩১৭

মুওয়াহহিদুনদের সাথে যোগ দেন এবং তাদের কাছ থেকে বড় বড় পদ লাভ করে পূর্ব আন্দালুসের রাজনীতিতে জড়িত থাকেন।

সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে যখন মুওয়াহহিদুনদের পতন শুরু হয়, তখন একই পরিবারের একজন রাজনীতিবিদ আবু জামিল জাইয়ান অন্যান্য স্থানীয় আমিরদের পরাজিত করে ২৬ সফর ৬৩৬ হিজরিতে বালানসিয়ার (ভ্যালেন্সিয়া) ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেন এবং এখান থেকে মুওয়াহহিদুন শাহজাদা আবু যায়েদকে (যিনি আবু আবদুল্লাহ বায়াসির ভাই ছিলেন) বের করে দেন। বালানসিয়ার স্বাধীন শাসক হওয়ার পর আবু জামিল জাইয়ান আব্বাসীয় খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহর নামে খুতবা জারি করে মুওয়াহহিদুনদের সাথে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। [১]

মুওয়াহহিদুন শাহজাদা আবু যায়েদ খ্রিস্টান হয়ে গেলেন:

কিন্তু এই ঘটনার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো, মুওয়াহহিদ শাহজাদা আবু যায়েদ তার পরিবার-পরিজনসহ বালানসিয়া থেকে বের হয়ে আরাগনের খ্রিস্টান রাজা প্রথম জেইম (জেমস পেড্রো)-এর আশ্রয়ে চলে যান এবং এই আশায় যে তিনি তাকে বালানসিয়ার সিংহাসন ফিরিয়ে দেবেন, অনেকগুলো দুর্গ তার অধীনে দিয়ে দেন। এর চেয়েও বড় কথা হলো, তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজের নামও পরিবর্তন করে ফেলেন। অধিকন্তু, তিনি সোসেটার এক খ্রিস্টান রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। [২]

যা-ই হোক, পূর্ব আন্দালুসে আবু জামিল জাইয়ানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং উপকূলীয় শহর দানিয়া ছাড়াও বেশ কিছু দুর্গের মুসলমানরাও তার অনুগত হয়ে যায়। [৩]

আবু জামিল এবং ইবনে হুদের মধ্যে দ্বন্দ্ব:

তবে আবু জামিল জাইয়ানের জন্য মুরসিয়ার শাসক ইবনে হুদ (মুহাম্মদ বিন ইউসুফ) একজন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যিনি আমীরুল মুসলিমীন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেকে আন্দালুসের মুসলমানদের একমাত্র শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছিলেন। আবু জামিল তার নেতৃত্ব মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। এই কারণে পূর্ব আন্দালুসের মুসলমানরা বছরের পর বছর একে অপরকে পরাজিত করার নিরর্থক প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। হায়! সেই সময় যদি আবু জামিল, ইবনে হুদ এবং ইবনে আল-আহমার ঐক্যবদ্ধ হতেন, তবে হয়তো আন্দালুসের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

বনু নাসর

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন নাসর, যিনি ইতিহাসে ইবনে আল-আহমার উপাধিতে পরিচিত। তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমান, কর্মঠ, সাহসী, সাদাসিধে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এবং কঠোর পরিশ্রমী। তার মূল এলাকা ছিল কর্ডোভা থেকে বিশ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ছোট শহর “আরজোনা”, যেখানে তিনি ৫৯১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। বনু মারদানিশ এবং বনু হুদকে সরকার গঠন করতে দেখে তিনিও আরজোনাকে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তার জোরে খুব দ্রুত এত প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন যে ওয়াদি আশ...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৯৫, ৩৯৬

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৯৯, ৪০৭

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩৯৫

জিয়ান এবং বাজার লোকেরাও তার সাথে যোগ দিল। পরবর্তী বছরগুলোতে সে বনু হুদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রমাণিত হলো। [১]

ইবনুল আহমার ইশবিলিয়ার প্রধান আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-বাজির সাথে আঁতাত করেন এবং তাকে নিজের জামাতা বানিয়ে বশীভূত করে ফেলেন। তারপর তার মাধ্যমে ইশবিলিয়াতে ইবনে হুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করান। জামাতা ও শ্বশুর মিলে ৬৩১ হিজরির শুরুর দিকে ইশবিলিয়ার কাছে ইবনে হুদকে পরাজিত করে তাকে সেই এলাকা থেকে বিতাড়িত করেন। তবে ইবনুল আহমার ইশবিলিয়ার শাসন ক্ষমতা লাভের পর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজের জামাতাকে হত্যা করান। এই কথা জানাজানি হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তির তাকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং মাত্র দেড় মাস পর পুনরায় ইবনে হুদের বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬৩১ হিজরিতে ইবনুল আহমার খ্রিস্টানদের বিপদের আশঙ্কা দেখে ইবনে হুদের বাইয়াত গ্রহণ করেন, কিন্তু পরের বছরই ফার্ডিনান্ড ইবনে হুদকে নিজের মিত্র বানিয়ে এই ঐক্য ভেঙে দেন। [২]

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ২/৫১-৫৬, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; আল-মুগরিব ফি হলাল মুগরিব: ২/১০৯; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/২১৮-২২০; নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/৪৩৭, ৪৩৮।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/৩১৫, ৩১৬, ৩১৭।

সুকুত-ই-আন্দালুস-ই-কুবরা

সেই সময়ে উত্তরে আরাগন রাজ্যে প্রথম জেমস (জেমস পিড্রো), কাস্টিল রাজ্যে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড এবং লিওন রাজ্যে নবম আলফনসো-র রাজত্ব ছিল। পূর্ব আন্দালুসকে প্রথম জেমস, মধ্য আন্দালুসকে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড এবং পশ্চিম আন্দালুসকে নবম আলফনসো মুসলমানদের থেকে মুক্ত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন। মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে তারা বছরের পর বছর অগ্রসর হতে থাকে, এমনকি আন্দালুসের বড় বড় সমস্ত ইসলামী শহরগুলো তাদের দখলে চলে যায়, যেগুলোকে ঐতিহাসিকগণ “আন্দালুস-ই-কুবরা” বলে অভিহিত করেন।

মুসলমানদের কাছে কেবল দক্ষিণের কিছু অংশ অবশিষ্ট ছিল যা ইতিহাসে “আন্দালুস-ই-সুগরা” নামে পরিচিত। আন্দালুস-ই-কুবরা পতনের বেদনাদায়ক ও শিক্ষণীয় কাহিনীর সারসংক্ষেপ নিচে পেশ করা হলো।

পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের পতন

আন্দালুসের পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জ: মায়োর্কা, মেনোর্কা এবং ইবিজা-তে বনু গানিয়ার শাসন ছিল, যারা মুওয়াহহিদিনদের অবশিষ্টাংশ ছিল। এই দ্বীপগুলো বাণিজ্যিক বন্দর হওয়ার কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এগুলোর ওপর ইউরোপীয় নৌ-কর্মকর্তারা, বিশেষ করে কাতালোনিয়া, পিসা এবং জেনোয়ার জাহাজগুলো এবং কখনও উত্তর আন্দালুসের নবাবরা আক্রমণ করতে থাকত। ৫০৮ হিজরিতে একটি বড় আক্রমণ হয়েছিল যাতে খ্রিস্টানরা এখানে দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল, কিন্তু মুরাবিতুনরা শীঘ্রই এই দ্বীপগুলো পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল।

আরাগনের বাদশাহ প্রথম জেমস (জেমস পিড্রো) পূর্ব আন্দালুসের দ্বীপগুলো দখল করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বিশেষ করে যখন বালেন্সিয়ার প্রাক্তন শাসক আবু য়ায়েদ তার কাছে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন আরাগনের বাদশাহর আশা অনেক বেড়ে যায়। তিনি কাতালোনিয়ার নবাবের সহায়তায় নিজের নৌ-বহর প্রস্তুত করেন। এই আক্রমণের প্রস্তুতির কারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে জোশ ও উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরাও বিপুল সংখ্যায় এতে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ইউরোপের অনেক নবাব এতে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসেন এবং বিজিত শহরগুলো বণ্টনের চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১লা শাওয়াল ৬২৬ হিজরিতে নৌ-জাহাজ এবং অনেক নৌকার সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল বাহিনী পূর্বাঞ্চলীয় দ্বীপপুঞ্জের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। [১]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৩০৩, ৩০৪।

মিওরকার পতন

ইতালি ও ফ্রান্সের নবাবরাও এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম আক্রমণটি হয়েছিল সবচেয়ে বড় দ্বীপ মিওরকার ওপর। এখানকার মুসলমানরা অত্যন্ত সাহসিকতা ও হিম্মতের সাথে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করতে থাকেন। যখন কোনো আশা অবশিষ্ট থাকল না, তখন তারা প্রাণের নিরাপত্তার বিনিময়ে শহর হস্তান্তরের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আক্রমণকারীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে ১৩ সফর ৬২৭ হিজরিতে মিওরকার ওপর খ্রিস্টানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ২৪ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। শহরের ওয়ালি আবু ইয়াহইয়া বিজয়ীদের হাতে দেড় মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সহ্য করার পর শাহাদাত বরণ করেন। অনেক নামকরা জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি শহীদ হন, যাদের মধ্যে ইমামুল কিরাআত ও নাজ্জ আব্দুল মালিক বিন ইবরাহিম আবদরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং প্রখ্যাত কবি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বাকরি উল্লেখযোগ্য।

এই দুর্ঘটনার সময় প্রায় ৩০ হাজার নাগরিক প্রাণ বাঁচাতে পাহাড়ি কেল্লাগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা ইবনে সেরি নামক এক আমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে এক বছর পর্যন্ত খ্রিস্টানদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকেন। অবশেষে ১০ রবিউস সানি ৬২৮ হিজরিতে এক চূড়ান্ত যুদ্ধে তারাও পরাজিত হন এবং পুরো দ্বীপটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যায়। [১]

বাকি দ্বীপগুলোর অবস্থা

মিওরকা দখলের পর খ্রিস্টান মিত্ররা ফিরে যায়। সবচেয়ে ছোট দ্বীপ ইয়াবিসার পতন কয়েক বছর পর ঘটে, যেখানে মিনোরকা দখল হয় ষাট বছর পর ৬৮৬ হিজরিতে। [২]

কর্ডোভার পতন

এই সময়টি ছিল আন্দালুসের মুসলমানদের জন্য অন্তিম মুহূর্তের মতো। মুওয়াহহিদুনরা যদিও বিদেশি ছিলেন, কিন্তু তাদের বিশাল সাম্রাজ্য যা আফ্রিকা থেকে বিশাল বাহিনী আনানোর সক্ষমতা রাখত, তাতে খ্রিস্টানরা ভীত ছিল। মুওয়াহহিদুনদের বিতাড়িত হওয়ার পর আন্দালুসের ওপর সেই অন্ধকার রাত নেমে আসে যার সকাল আর কখনো হয়নি। কাস্টিল ও আরাগনের খ্রিস্টানরা একে একে মুসলমানদের শতাব্দী প্রাচীন কেন্দ্রগুলো দখল করতে থাকে। আন্দালুসের মুসলমানদের স্বাধীনতা ইবনে হুদ, ইবনে আল-আহমার এবং আবু জামিল জিয়ানের রাজনীতির বলি হতে থাকে।

৬২৭ হিজরিতে কাস্টিলের বাহিনী মারদা এবং বাতলিয়ুস দখল করে নেয়। এভাবে পশ্চিমা শহরগুলো পুরোপুরি মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। ৬২৮ হিজরিতে মিওরকা দ্বীপের পতনের পর পূর্ব আন্দালুসও অসুরক্ষিত হয়ে পড়ে। পরের বছর কর্ডোভার পতনের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে যা আন্দালুসি মুসলিম রাজনীতিবিদদের অযোগ্যতা ও সাহসহীনতার এক মূর্ত প্রতীক। মুসলমানদের এই প্রাচীনতম ও মহিমান্বিত শহরটি কত সহজে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, তা ভেবে আজও হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৪০৩-৪০৭

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা: পৃ. ৩৭১

অপরাজেয় কুরতুবা কীভাবে বিজিত হলো?

কুরতুবা তখন বনু হুদের ইমারতের অধীনে ছিল, কিন্তু তারা এই মহান ঐতিহাসিক শহরের প্রতি কোনো মনোযোগ দেয়নি। তারা কুরতুবাবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করে নিজেদের কেন্দ্র মুরসিয়ায় নিশ্চিন্তে বসে ছিল। হঠাৎ রবিউস সানি ৬৩৩ হিজরিতে এক যোদ্ধা খ্রিস্টান সংগঠনের অশ্বারোহীরা কুরতুবা আক্রমণ করে বসে। কুরতুবার প্রাচীরগুলো ছিল দ্বিস্তর-ত্রিস্তর বিশিষ্ট, অত্যন্ত উঁচু, মজবুত এবং অপরাজেয়। আর আক্রমণকারীদের সংখ্যা এক হাজারও ছিল না, তাই কারো কল্পনাতেও ছিল না যে এই শহর পদানত হবে। কিন্তু কুরতুবার স্থানীয় খ্রিস্টানরা আক্রমণকারীদের বাইরের প্রাচীরে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দেয়। এভাবে তারা পূর্বদিকের বাইরের প্রাচীর দখল করে নেয়। এই অভাবনীয় সাফল্যের পর তারা কাস্টিল (কাসতালিয়া) থেকে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে এবং দেখতে দেখতে কাস্টিলের কয়েক হাজার সৈন্য পাদ্রিদের তত্ত্বাবধানে কুরতুবার সামনে পৌঁছে যায়।

এরপর তৃতীয় ফার্ডিনান্ড নিজেই এই অভিযানের নেতৃত্ব দিতে চলে আসে। সেই সময় কুরতুবা চরম রাজনৈতিক সংকটের শিকার ছিল। সেখানে কোনো শক্তিশালী বাহিনী ছিল না, আর না ছিল কোনো জেনারেল বা রাজনৈতিক নেতা, যে পরিকল্পনা ও উচ্চ সাহসিকতার সাথে শহর রক্ষার ব্যবস্থা করত।

শহরবাসীর অনুরোধে ইবনে হুদ মুরসিয়া থেকে ৩৫ হাজার সৈন্য নিয়ে কুরতুবাকে সাহায্য করতে বের হয়, কিন্তু সে কাস্টিল বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করে এবং কয়েক মঞ্জিল দূরে তাবু গেড়ে বসে থাকে। সে যদি আক্রমণ করত, তবে নিশ্চিতভাবেই কাস্টিল বাহিনীকে অবরোধ তুলে নিতে হতো, কারণ তখন অবরোধকারী খ্রিস্টানদের সংখ্যা দশ-পনেরো হাজারও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আক্রমণে রাজি হয়নি। এর একটি কারণ ছিল এই যে, এক খ্রিস্টান গোয়েন্দা—যার ওপর ইবনে হুদের পূর্ণ আস্থা ছিল—মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাকে বলেছিল যে, কাস্টিলের বাহিনী অনেক বিশাল, যাদের সাথে লড়াই করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় এবং আসল কারণ ছিল এই যে, ইবনে হুদ কাস্টিলের সাথে শান্তি চুক্তি করেছিল এবং এর বিনিময়ে বার্ষিক একটি মোটা অংকের অর্থ প্রদান করছিল।

যদিও তখন কাস্টিল ও বনু হুদের মধ্যে শান্তি চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল, আর এ কারণেই কাস্টিল বাহিনী পূর্ণ দাপটের সাথে বনু হুদের এই শহরটি ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু ইবনে হুদ ভবিষ্যতেও তার মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য কাস্টিলের সাহায্য নিতে চেয়েছিল। তাই সে তাদের সাথে শান্তি চুক্তি নবায়নে সম্মত হয়ে গেল।

কুরতুবাবাসী ইবনে হুদের সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হওয়ার পর কয়েক মাস পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লক্ষাধিক জনসংখ্যার এই শহরে খাদ্যের মজুদ একেবারে শেষ হয়ে যায় এবং নাগরিকরা ক্ষুধায় মরতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে তাদের নেতারা তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের কাছে উপস্থিত হন। সিদ্ধান্ত হয় যে, শহরবাসীকে জীবনের নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণভাবে শহর ত্যাগের সুযোগ দেওয়া হবে।

রবিবার ২৩ শাওয়াল ৬৩৩ হিজরিতে কাস্টিল বাহিনী কুরতুবায় প্রবেশ করে। পাদ্রিরা ওই দিনই প্রথম আবদুর রহমানের জামে কুরতুবা-কে গির্জায় রূপান্তরিত করে ফেলে। এর মিনারে ত্রুশ বুলিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন ফার্ডিনান্ড তার মিছিলসহ শহরে প্রবেশ করে এবং উমাইয়া খলিফাদের জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদে গিয়ে আসন গ্রহণ করে। ৩৮৭ হিজরিতে হাজিব আল-মানসুর উত্তর-পশ্চিমের গির্জা সেন্ট জেমস (সেন্ট ইয়াকুব) থেকে যে ত্রুশগুলো নামিয়ে এনেছিলেন, সেগুলো তখন পর্যন্ত কোষাগারে সংরক্ষিত ছিল। ফার্ডিনান্ড সেই ত্রুশগুলো মুসলিম...

বন্দীদের কাঁধে চাপিয়ে পুনরায় সেন্ট ইয়াকুব পাঠিয়ে দেন। এভাবে ৯২ হিজরিতে তারিক বিন জিয়াদের বিজয় করা কর্ডোভা, পাঁচশ পঁচিশ বছর পর আজান ও নামাজের মাধ্যমে আবাদ হওয়ার পর গির্জার ঘণ্টার শব্দে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। [১]

কর্ডোভার মাটিও ছিল মুসলিমের চোখের নুর

পশ্চিমের অন্ধকারে যা ছিল প্রদীপের মতো উজ্জ্বল

উম্মতের মজলিস থেকে সেই শুভ্র হাত হারিয়ে গেল

আর বর্তমান সভ্যতার প্রদীপকে প্রজ্বলিত করে গেল [২]

কর্ডোভা থেকে হিজরতকারীদের মধ্যে বড় বড় উলামা ও ফুকাহাগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে আল্লামা আবু আবদুল্লাহ আল-কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৩ বছর। তিনি আন্দালুস ছেড়ে মিশরে চলে আসেন, সেখানে নির্জনে অবস্থান করে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে ব্যস্ত থাকেন। এরই মধ্যে তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর সম্পন্ন করেন। তিনি ৬৭১ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। [৩]

বালেজিয়ার পতন

ওদিকে পূর্বদিকের অঞ্চলগুলোতে আরাগন রাজ্যের শাসক প্রথম জেমস (জেমস পিটার)-এর আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ৬৩১ হিজরিতে আরাগনের সেনাবাহিনী বালেজিয়ার কেন্দ্রস্থলের চারপাশ ঘিরে ফেলে, যাদের মধ্যে খ্রিস্টান জেনারেলদের সাথে মুরতাদ আবু জায়েদও ছিল। পোপ গ্রেগরি নবম এই অভিযানে আরাগনকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন, ফলে অনেক স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এই অভিযানে বালেজিয়ার আশেপাশের প্রায় সমস্ত ছোট শহর (যেমন: আরশ, মোরেলা ও রিবানা) এবং কেল্লাসমূহ (যেমন: পেনিসকোলা, শিভিট, বুরিয়ল, কুয়েনকা এবং মনসুরা) জয় করে বালেজিয়া বিজয়ের পথ সুগম করা হয়েছিল। [৪]

আনিশার যুদ্ধ

দুই বছর পর ৬৩৩ হিজরিতে আরাগনের রাজা বালেজিয়া থেকে সাত মাইল উত্তরে অবস্থিত মুসলমানদের অত্যন্ত মজবুত কেল্লা “আনিশা” (এনেসা) দখল করে তা ধ্বংস করে দেন এবং সেখানে কিছু দূরে নিজের বাহিনীর জন্য একটি নতুন কেল্লা নির্মাণ করেন যাতে বালেজিয়া দখলে সুবিধা হয়।

এটি দেখে বালেজিয়ার শাসক আবু জামিল জিয়ান শহরে জিহাদের ঘোষণা দেন এবং এক বিশাল জনসমাবেশ নিয়ে আনিশার দিকে অগ্রসর হন। ২০ জিলহজ ৬৩৩ হিজরিতে খ্রিস্টানদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এই বাহিনীতে উলামা ও ফুকাহাদের একটি বড় দল শরীক ছিল, যাদের মধ্যে সত্তর বছর বয়সী মুহাদ্দিস আবু আল-রাবি সুলাইমান বিন সালিম আল-কালান্সি রহমাতুল্লাহি আলাইহিও ছিলেন। তিনি একজন মুজাহিদ স্বভাবের আলেম ছিলেন এবং...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৪২৯, ৩১৫

[২] আল্লামা ইকবাল

[৩] আল-আলাম ঘিরিকলি: ৫/ ৩২২

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৩৩০, ৩৩৮

এর আগে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধে নিজের বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছিলেন। এই যুদ্ধেও তিনি বাহিনীর পতাকা হাতে প্রথম সারিতে ছিলেন এবং মুজাহিদদের সাহস বাড়চ্ছিলেন। যাই হোক, মুসলমানরা পরাজিত হলো এবং তারা পিছু হটতে শুরু করল, কিন্তু আবুল রাবি রহমাতুল্লাহ তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত নিজ স্থানে অটল রইলেন এবং ডাকতে থাকলেন: “হে মুসলমানগণ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?” এই যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক উলামা, ফুকাহা এবং নেককার লোক শহীদ হন। বালানসিয়ার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের প্রথম সারিতে নামাজ আদায়কারী সত্তর জন মুসল্লি হঠাৎ কমে গেলেন, কারণ তাঁরা এই যুদ্ধের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আনিশার যুদ্ধে পরাজয় অচিরেই বালানসিয়ার পতনের পূর্বাভাস ছিল। [১]

ইবনে হুদের পরিণতি:

আবু জামিল বিপদের সঠিক আন্দাজ করে ৬৩৫ হিজরির শুরুর মাসগুলোতে ফকিহ মুহাম্মদ বিন খালাফ আনসারিকে ইবনে হুদের কাছে সাহায্য চাইতে মুরসিয়ায় পাঠান। ইবনে হুদ এই আবেদনের ইতিবাচক উত্তর দেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু বাস্তবে কিছুই করেননি। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই হয়েছিল যে, কিছুদিন পর তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির অজুহাতে আলমেরিয়ায় পৌঁছান। কিন্তু এটি ছিল কেবল আলমেরিয়ায় প্রবেশের একটি বাহানা। আসল কারণ ছিল অন্য কিছু। ঘটনাটি ছিল এই যে, কিছুদিন আগে ইবনে হুদ অত্যন্ত রূপবতী এক দাসী পেয়েছিলেন এবং তিনি তার প্রেমে পড়ে যান, কিন্তু নিজের স্ত্রীর ভয়ে তাকে প্রাসাদে আনতে পারেননি এবং আমানত হিসেবে তাকে নিজের নায়েব রুমাইতির কাছে আলমেরিয়ায় পাঠিয়ে দেন। পরে তিনি জানতে পারেন যে, রুমাইতি নিজেই সেই দাসীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে এবং তাকে নিজের হেরেমের শোভা বানাতে চায়। এই খবরে ইবনে হুদ অগ্নিশর্মা হয়ে যান। আলমেরিয়ায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছিল রুমাইতিকে শাস্তি দেওয়া।

তবে আলমেরিয়ায় পৌঁছে তিনি নিজের রাগকে রাজনৈতিক হাসির আড়ালে লুকিয়ে ফেলেন এবং রুমাইতিকে এই ধারণাই দেন যে, তিনি জিহাদের প্রস্তুতির জন্য এসেছেন। কিন্তু রুমাইতি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিল। সেও বাহ্যিকভাবে একজন অনুগত দাসের মতো ইবনে হুদকে জাঁকজমকপূর্ণভাবে অভ্যর্থনা জানায় এবং নিজের প্রাসাদে তাঁর সম্মানে এক রাজকীয় ভোজের আয়োজন করে। সেই সাথে জানায় যে, মাহফিলের পর নির্জন কক্ষে প্রিয় দাসীটি আপনার নজরানা হিসেবে পেশ করা হবে।

ইবনে হুদ আশ্বস্ত হয়ে ভোজে শরিক হলেন। ভোজ শেষ হলে তাঁকে নির্জন কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে গোসলখানায় রুমাইতি চারজন বিশেষ ভৃত্যকে লুকিয়ে রেখেছিল। ইবনে হুদ সেখানে প্রবেশ করলে সেই চারজন তাঁর গলা টিপে তাঁকে হত্যা করে। এটি ২৩ জমাদিউল আউয়াল ৬৩৫ হিজরির ঘটনা। পরের দিন ঘোষণা করা হলো যে, তিনি মৃগী রোগের আক্রমণে মারা গেছেন। লাশ কফিনে ভরে মুরসিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এভাবেই বনু হুদের এই নামী রাজনীতিবিদ মাত্র নয় বছর শাসনের পর দৃশ্যপট থেকে হারিয়ে গেলেন। [২]

আমরা দেখার ধরনই বুঝতে থাকলাম আদম

এরই মধ্যে জীবনের তামাশা শেষ হয়ে গেল

[১] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, পৃ. ৪৭৩-৪৭৪

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৪/৪৪৬-৪৪৭

ইবনে হুদ অত্যন্ত অসতর্ক সাহসী এবং হঠকারী ছিলেন, যার ফলে তিনি খ্রিস্টানদের কাছে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি যে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা অর্ধশতাব্দীও টেকেনি। তিনি আন্দালুস থেকে মুওয়াহহিদিনদের বিতাড়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, কিন্তু নিজে এখানকার মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি এবং এভাবেই আন্দালুস কুবরা (বৃহত্তর আন্দালুস) বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

বালানসিয়ার ওপর আক্রমণ:

এদিকে আন্দালুসের আমিররা নিজেদের শত্রুতা মেটাতে ব্যস্ত ছিলেন, যার মধ্যে ইবনে হুদ এক দুঃখজনক পরিণতির শিকার হন এবং ওদিকে রজব ৬৩৫ হিজরিতে আরাগনের বাহিনী বালানসিয়ার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। রাজ্যের বেশ কিছু দুর্গ যেমন: আল-মানারা, নুলিস, বেলাট, বুলিয়া এবং আদশু কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই বিজিত হয়। শুরুতে আরাগনের বাহিনী মাত্র কয়েক হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, কিন্তু বালানসিয়া পৌঁছে তারা ইউরোপের অন্যান্য খ্রিস্টান নবাবদের সাহায্যও পেয়ে যায়।

অবশেষে রমজান ৬৩৫ হিজরিতে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে বালানসিয়ার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ চালানো হয়। শহরটির তখন বাইরের সাহায্যের কঠোর প্রয়োজন ছিল। মুওয়াহহিদিনরা তখন আফ্রিকায় সংকুচিত হয়ে তীব্র রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তাই তাদের কাছ থেকে সহযোগিতার কোনো আশা ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে আবু জামিল জিয়ান তার উজির, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আল-আব্বারের মাধ্যমে তিউনিসের হাফসি সরকারের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। ইবনে আল-আব্বার সেখানে শাসক আবু জাকারিয়া হাফসির দরবারে তার বিশ্ববিখ্যাত কবিতা পাঠ করেন যা “আল-কাসিদাতুস সিনিয়্যাহ” শিরোনামে পরিচিত। এতে বলা হয়েছিল:

“আপনার বাহিনীকে নিয়ে আন্দালুসকে সাহায্য করুন যা আল্লাহর বাহিনী। নিশ্চয়ই এর মুক্তির পথ মুছে যাচ্ছে।”

“আন্দালুসের প্রার্থনায় তাকে পূর্ণাঙ্গ সাহায্য দান করুন। আপনার কাছে সর্বদা পূর্ণাঙ্গ সাহায্যই প্রার্থনা করা হয়।”

“রক্ষা করুন এই উপদ্বীপকে যার অধিবাসীরা বিপদে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং তাদের সৌভাগ্য বিলীন হয়ে গেছে।”

“এই শহরগুলোতে শিরক হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দিত চিত্তে প্রবেশ করেছে এবং ঈমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে।”

“এগুলো নিকট থেকে আপনাকে আহ্বানকারীদের পত্র। আপনি নিরাশদের জন্য সর্বোত্তম আশার স্থল।” [১]

সুলতান এই আবেদনের প্রতি তাৎক্ষণিক মনোযোগ দেন এবং এক লক্ষ দিনার (৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ডলার) ব্যয় করে দশটি জাহাজে খাদ্য, রসদ ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রেরণ করেন।

কিন্তু ততক্ষণে বালানসিয়ার বন্দরটিও অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং সেখানে...

[১] নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/ ৪৫৭, ৪৫৮

খ্রিস্টানদের যুদ্ধজাহাজ মোতায়ন ছিল, তাই সুলতানের নৌবহরকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। পাঁচ মাস অবরোধের পর অবশেষে বালেন্সিয়াবাসীদের শক্তি ফুরিয়ে যায় এবং আবু জামিল জিয়ান সফর ৬৩৬ হিজরিতে এই শর্তে শহরটি খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন যে, বালেন্সিয়াবাসীদের তাদের সমস্ত আসবাবপত্রসহ অন্য ইসলামী শহরগুলোতে স্থানান্তরিত হতে দেওয়া হবে। ২৭ সফর রাজা আরাগন বিজয়ীর বেশে শহরে প্রবেশ করেন এবং এখান থেকে ইসলামী শাসনের অবসান ঘটে। [১]

আবু জামিল এবং ইবনুল আব্বারের পরিণতি:

বনু মারদানিশের উত্তরাধিকারী আবু জামিল জিয়ানের কাছে কেবল দানিয়া অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু জিলহজ ৬৩৮ হিজরিতে আরাগনবাসীরা দানিয়াও জয় করে নেয়। আবু জামিল কয়েক বছর অজ্ঞাতবাস কাটানোর পর তিউনিসিয়ায় চলে যান এবং ৬৬৮ হিজরিতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উজির ঐতিহাসিক ইবনুল আব্বার হিজরত করে তিউনিসিয়ায় চলে যান এবং সেখানে ৬৫৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আন্দালুস এবং আন্দালুসের ওলামায়ে কেরামের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য ‘আল-হুন্লাতুস সিয়ারা’, ‘তুহফাতুল ক্বদিম’ এবং ‘আত-তাকমিলা লি-কিতাবিস সিলাহ’-এর মতো কিতাবসমূহ রচনা করেন, যা আন্দালুসের ইতিহাসের অন্যতম সেরা উৎস।

এদিকে পূর্ব আন্দালুসে আরাগনবাসীদের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে, ৬৩৩ হিজরিতে তারা শাতিবা এবং লুকান্তও দখল করে নেয়। এভাবে মাত্র কয়েক বছরে পূর্ব আন্দালুসের সমস্ত শহর আরাগন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মায়োর্কা এবং মিনোর্কা দ্বীপপুঞ্জ আগেই আত্মসমর্পণ করেছিল। কেবল আলমেরিয়াতে ইবনে হুদের উত্তরাধিকারীরা কাস্টিলের করদ রাজ্যে পরিণত হয়ে কোনোমতে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছিল। [২]

ইবনুল আহমারের ইশবিলিয়া এবং গ্রানাডা শাসন:

বনু হুদ কর্ডোভা হারানোর পর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এরপর ৬৩৫ হিজরিতে ইবনে হুদের মৃত্যুর ফলে এই বংশের শান-শওকত প্রায় শেষ হয়ে যায়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জিয়ানের রাজনীতিবিদ ইবনুল আহমার নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে শুরু করেন এবং ইবনে হুদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে তাঁর শক্তি তখনও বনু হুদের চেয়ে কম ছিল। তাই তিনি একদিকে ইশবিলিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করেন এবং অন্যদিকে কাস্টিলের সাথে শান্তি চুক্তি করেন। এরপর তিনি গ্রানাডার আমিরদের সাথে যোগাযোগ করেন। ইবনে হুদের মৃত্যুর পর গ্রানাডাবাসীরা শহরটি খ্রিস্টানদের দখলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছিল, তাই তারা এই বিপদ থেকে বাঁচতে ইবনুল আহমারের নেতৃত্ব মেনে নেয়। তিনি জিয়ান থেকে গ্রানাডায় পৌঁছান এবং ২৫ রমজান ৬৩৫ হিজরিতে এখানকার শাসক হন। এক বছরের মধ্যে তিনি মালাগা এবং আলমেরিয়াও নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। এভাবে আন্দালুসের মুসলিম আমিরদের মধ্যে তিনি শক্তির বিচারে প্রথম স্থানে চলে আসেন।

গ্রানাডা ইসলামী যুগের আগে আলবির শহরের একটি ছোট বসতি ছিল, কিন্তু ইসলামী যুগে ধীরে ধীরে এটি একটি বড় শহরে পরিণত হয়। সপ্তম হিজরি শতাব্দীতে আন্দালুসে কুবরার পতনের পর ইবনুল আহমার এই গ্রানাডাকেই আন্দালুসের মুসলমানদের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/ ৩৩৮-৩৫০

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/ ৩৫০-৩৬০

...এর শেষ প্রতিরক্ষা ব্যুহ বানিয়ে নিলেন যা আড়াইশ বছর পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে রইল।

খ্রিস্টানরা ইবনুল আহমারকে বেশি শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দিতে চাচ্ছিল না, তাই তারা তার গুরুত্বপূর্ণ শহর জিয়ানের ওপর আক্রমণ করে দিল। ইবনুল আহমার গ্রানাডা থেকে সাহায্য পাঠিয়ে জিয়ানকে বাঁচানোর আশ্রয় চেষ্টা করলেন কিন্তু অবরোধের দীর্ঘসূত্রতা শহরবাসীদের মনোবল ভেঙে দিল। জিয়ানের পর নিশ্চিতভাবে ইশবিলিয়াহ এবং তারপর গ্রানাডার পালা আসার কথা ছিল। ইবনুল আহমার এমন পরিস্থিতিতে কাস্টিলের সাথে আলোচনা করে তার আধিপত্য মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না।

তিনি তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে সাক্ষাৎ করলেন যাতে স্থির হলো যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিশ বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি থাকবে, ইবনুল আহমার কাস্টিলকে বার্ষিক দেড় লক্ষ দিনার প্রদান করবেন, জিয়ান কাস্টিলের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং ইবনুল আহমার গ্রানাডা ও এর অবশিষ্ট দুর্গ ও শহরগুলোর শাসক হিসেবে বহাল থাকবেন।

৬৪৩ হিজরির শেষ দিকে এই চুক্তির পর জিয়ান কাস্টিলের অংশে পরিণত হলো এবং সেখানকার মুসলমানরা দক্ষিণের শহরগুলোর দিকে হিজরত করল। [১]

ইশবিলিয়াহর পতন

ফার্ডিনান্ড এখন ইশবিলিয়াহর দিকে নজর দিলেন, যা কর্ডোভা ও টলেডোর পর আন্দালুসের তৃতীয় বৃহত্তম শহর ছিল। মুওয়াহহিদদের পর এই শহরটি চরম রাজনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত ছিল। কখনো এর ওপর হাফসীয়রা দখলদারিত্ব কায়েম করত, আবার কখনো ইবনুল আহমারের প্রতিনিধিরা। এই টানাপোড়েনের পর ৬৩৫ হিজরিতে মরক্কোর মুওয়াহহিদদের আনুগত্য স্বীকার করার ঘোষণা দেওয়া হয়। কিন্তু এর মর্যাদা ছিল নিছক নামমাত্র, কারণ মুওয়াহহিদদের কাছে আন্দালুসের শহরগুলো সামলানোর মতো শক্তি ছিল না।

৬৪৩ হিজরিতে ইশবিলিয়াহর প্রখ্যাত নেতা ইবনুল জিদ মরক্কো থেকে হতাশ হয়ে তিউনিসের হাফসীয় সালতানাতের অধীনে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু হাফসীয়দের আফ্রিকান অফিসাররা ইশবিলিয়াহতে এসে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করল যে শহরবাসী উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং তারা কেবল সেই অফিসারদেরই শহর থেকে বের করে দিল না, বরং তাদের ডাকার অপরাধে ইবনুল জিদকেও হত্যা করল।

ইবনুল জিদ তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে নিজের নেতৃত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু যখন ইশবিলিয়াহবাসী ফার্ডিনান্ডের ঘৃণ্য রাজনীতির অংশ হতে অস্বীকার করল, তখন ফার্ডিনান্ড ইশবিলিয়াহ জয় করা জরুরি মনে করলেন এবং ৬৪৪ হিজরিতে ইশবিলিয়াহর চারপাশের চৌকি ও দুর্গগুলোর ওপর দখলদারিত্ব শুরু করলেন। তার বাহিনী বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে অভিযান চালাতে লাগল। ইশবিলিয়াহর উত্তরের প্রতিরক্ষা শহর কারমোনা ছয় মাসের অবরোধের পর বিজিত হলো। একইভাবে লোরা, কান্টিলানা, গুইলেনা, গেরেনা এবং আলকালা আল-কবিরের দুর্গগুলো খ্রিস্টানদের দখলে চলে গেল। এভাবে ইশবিলিয়াহর প্রতিরক্ষামূলক বাহুগুলো কেটে ফেলা হলো।

এরপর জমাদিউল আউয়াল ৬৪৫ হিজরিতে খ্রিস্টানরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলমানদের এই অতুলনীয় জ্ঞান ও

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৩৭০।

৬৩৯ - তারিখ উম্মাতে মুসলিমা

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অবরোধ যা পনেরো মাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ইশবিলিয়ার মুসলমানরা সাহস ও বীরত্বের এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছিল এবং পেটে পাথর বেঁধে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করেছিল। তাদের নেতাদের মধ্যে আবুল হাসান আশ-শাক্কাফ এবং ইবনে শুয়াইব-এর নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। তারা শত্রুর জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল এবং অনেকবার তাদের শহরের প্রাচীর থেকে দূরে হটিয়ে দিয়েছিল। তারা মরক্কো এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে বারবার বার্তা পাঠিয়েছিল। তারা তাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে সাহায্যের আবেদন করতে থাকে।

হে বাগানের অধিবাসী! রঙের পরিবর্তন ও সুগন্ধ জ্বলে গেল

প্রতিটি পথে চোখের মর্যাদা জ্বলে গেল

আবার জীবনের অভিধানে কোনো উন্মাদনার শব্দ

হে বুদ্ধিমানরা! কথা বলার ভঙ্গি জ্বলে গেল [১]

কিন্তু অনুভূতিহীনতার এই অবস্থা ছিল যে, কোথাও থেকে কোনো সাহায্যই তাদের কাছে পৌঁছায়নি। সবচেয়ে বেশি পরিতাপের বিষয় ছিল এই যে, গ্রানাডার শাসক ইবনে আল-আহমারের বাহিনীও কাস্টিলীয়দের সারিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশেষে কাস্টিলীয়দের সাহায্যে পর্তুগাল এবং অন্যান্য খ্রিস্টান রাষ্ট্র ও ক্রুসেডারদের সাহায্যও পৌঁছে গেল। এভাবে অবরোধ এতটাই কঠোর হলো যে, চারদিক থেকে এই শহরটি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় ইশবিলিয়াবাসীদের অবস্থা:

ইশবিলিয়াবাসীরা যুদ্ধ করতে করতে আহত ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অবরোধের কঠোরতা অবশেষে শহরকে খাদ্যশস্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ইবনে ইয়ারি বলেন:

“ইশবিলিয়াবাসী সব ধরনের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল, তা ছোট হোক বা বড়। হ্যাঁ, কিছু ধনীদের ঘরে যা কিছু ছিল তা কাজে আসছিল, যেমন কাজী ইবনে মনজুর, যিনি সেই সময় খ্রিস্টানদের পরাজিত করার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন এবং মানুষকে লড়াই ও তীরন্দাজির জন্য সাহস দিচ্ছিলেন। কিন্তু মানুষ ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও পেরেশান। তারা এমনভাবে টলমল করছিল যেন তারা নেশাগ্রস্ত, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত ছিল না।

ক্ষুধায় মানুষের এক বিশাল সংখ্যা প্রাণ হারাল। গম ও যব দুপ্রাপ্য হয়ে গেল। মানুষ চামড়া খেতে বাধ্য হলো। লড়াকু মানুষ ও সৈন্যরা শেষ হয়ে গেল।” [৩]

ইশবিলিয়ার শোকগাথা:

অবশেষে শহরবাসী ৬৪৬ হিজরীর শাবান মাসে অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে প্রাণভিক্ষা এবং নিরাপদ প্রস্থানের শর্তে শহরটি খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিল।

[১] সাগড় সিদ্দিকী

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-আসরি: ৩/ ৪৭৫ থেকে ৪৮৩

[৩] আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব, ইবনে ইয়ারি আল-মাররাবুশি: ৩/ ৩৮১

হস্তান্তর করে দিল। এখানে জনসংখ্যা এত বেশি ছিল যে, উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় প্রায় এক মাস সময় লেগেছিল। তাদের মধ্যে এক লক্ষ লোক সমুদ্রপথে মরক্কোতে চলে যায়, আর তিন লক্ষ লোককে ইবনুল আহমার গ্রানাডায় আশ্রয় দেন।

মুসলমানদের পূর্ণ উচ্ছেদের পর রমজান মাসে ফার্ডিন্যান্ডের মিছিল সেভিলে প্রবেশ করে। অন্যান্য শহরের মতো এখানেও জামে মসজিদসহ সকল মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয় এবং সমস্ত ঘরবাড়ি খ্রিস্টানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এরপর টলেডোর পরিবর্তে সেভিলকেই কাস্টিলের রাজধানী করা হয় যাতে দক্ষিণ দিকের ইসলামী শহরগুলোতে সামরিক অভিযান চালানো সহজ হয়। [১]

সেভিলের পতনের সাথে সাথে সেই বৃহত্তর আন্দালুসের ইতিহাসেরও সমাপ্তি ঘটে যা তারিক বিন জিয়াদ এবং মুসা বিন নুসাইর জয় করেছিলেন। বৃহত্তর আন্দালুস, যা এই উপদ্বীপের ভৌগোলিক আয়তনের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল, সোয়া পাঁচ শতাব্দী ধরে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির লালনভূমি থাকার পর অবশেষে সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ক্রুশ পূজারীদের আবাসস্থলে পরিণত হয়।

হে পর্যটক! তুমি বুকে অনেক ক্ষত নিয়ে ফিরবে;

দেখো, এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে কক্ষনো যেও না।

এখানে মাটির নিচে একের পর এক অনন্য মুক্তা চাপা পড়ে আছে,

এত বড় ধনভাণ্ডার আর কোথাও কক্ষনো দাফন হবে না।

তোমার মুছে ফেলার চিহ্নগুলোও এখন মুছে গেছে;

হে আকাশ, এর চেয়ে বেশি আর কক্ষনো মুছে না। [২]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৩/৪৮৫ থেকে ৪৮৯।

[২] আলতাফ হোসেন হালি।

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

দৌলত বনু নসর

(১) মুহাম্মদ ইবনুল আহমার, মুহাম্মদ আউয়াল, আল-গালিব বিল্লাহ

(৬৩৫ হিজরি থেকে ৬৭১ হিজরি / ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দ)

ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে আন্দালুসের কেবল একজন মুসলিম শাসক মুহাম্মদ ইবনুল আহমার (মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে নসর)-এর শাসন অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। তিনি ৫৯১ হিজরিতে কর্ডোভার নিকটবর্তী শহর ‘আরজুনা’-তে জন্মগ্রহণ করেন। মুওয়াহহিদিনদের পতনের যুগে তিনি জিয়ানে নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজনৈতিক উত্থান-পতনের অংশীদার হয়ে বনু মাদানিশ ও বনু হুদ-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন। ২৫ রমজান ৬৩৫ হিজরি (২৩ মে ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে তিনি গ্রানাডার অধিবাসীদের আমন্ত্রণে সেখানেও নিজের বায়াত গ্রহণ করেন এবং এক বছরের মধ্যে মালাগা ও আলমেরিয়াকেও নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। তিনি বংশগতভাবে মদিনা মুনাওয়ারার আনসারী গোত্র বনু খাযরাজ-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং হযরত সাদ ইবনে উবাদাহ (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। [১] এরপর তাঁর অনেক উত্তরসূরির নাম ‘মুহাম্মদ’ হয়েছিল, তাই ইবনুল আহমারকে মুহাম্মদ আউয়ালও বলা হয়। তাঁর পরিবার বনু নসর নামে পরিচিত হয়, যারা সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল প্রদান করেছিল।

মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের কিছু ইসলামী শহরের ওপর আক্রমণে খ্রিষ্টানদের সাহায্য করা নিশ্চিতভাবেই একটি ট্র্যাজেডি ছিল, তবে অন্যদিকে এটিও সত্য যে, তিনি গ্রানাডাকে আন্দালুসের সমস্ত মুসলমানদের জন্য একটি দুর্গে পরিণত করেছিলেন যেখানে অবস্থান করে তারা উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে পারত এবং সুযোগ পেলে নিজেদের এলাকা পুনরায় উদ্ধার করতে পারত। মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের মতে, এমন সময় আসা পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করাই ছিল উপযুক্ত কৌশল, এই কারণেই তিনি প্রয়োজনের সময় খ্রিষ্টানদের সাহায্যও করেছিলেন এবং প্রয়োজনের সময় তাদের থেকে সুবিধাও গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে যে তীব্র ও নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাতে আন্দালুসে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও ছিল অনেক বড় খেদমত যাতে তিনি সফল হয়েছিলেন। তিনি সারাজীবন গ্রানাডাকে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন যেখানে আন্দালুসের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো মুসলমানদের পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়।

তিনি বাহ্যিক বিপদ দূর করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবেও বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য...

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ১/ ৩৩৭; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ২১৮

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা ৬৪২

বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। রেশম শিল্পকে এতোটা উন্নত করেছিলেন যে, এখানকার রেশম সারা বিশ্বে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি ইঞ্চি জমি কৃষিকাজের জন্য এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যে, অতিরিক্ত উৎপাদন রপ্তানি করা হতে লাগল। বন্দরগুলোকে এতোটা প্রশস্ত ও কার্যকর করা হয়েছিল যে, ইউরোপ থেকেও জাহাজ চালকরা এখানে পণ্য খালাস করতে শুরু করল। গ্রানাডা রাষ্ট্রের বাজারগুলো পণ্যে ভরে গেল এবং চারদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা হয়ে উঠল। কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নন, সাধারণ মানুষও বিত্তবান ও সচ্ছল হয়ে উঠল।

এতো আয় ও উন্নতি সত্ত্বেও মুহাম্মদ ইবনে আল-আহমারের ব্যক্তিগত জীবন তেমনই সাধারণ ও অনাড়ম্বর ছিল যেমনটা শুরুতে ছিল। তিনি সবসময় রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো বিলাসিতার ধারেকাছেও যেতেন না। সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব তিনি নিজেই পরীক্ষা করতেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও ব্যবস্থাপনার কারণে গ্রানাডা আন্দালুসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তিনি প্রচুর পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর দরবারের ব্যস্ততা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুশৃঙ্খল, যেখানে বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা মজলিস বসত। একটি অধিবেশন হতো কেবল ফরিয়াদিদের জন্য, যাদের কোনো দ্বিধা ছাড়াই ন্যায়বিচার প্রদান করা হতো। একটি মজলিসে কেবল উলামা, ফুকাহা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শরিক হতেন। সেখানে তাফসির ও হাদিসের পাঠ হতো এবং দশটি অংশে কুরআন মাজিদ খতম করা হতো। একটি মজলিস কবি ও সাহিত্যিকদের কালাম শোনা এবং তাঁদের উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। একটি বিশেষ অধিবেশন হতো যেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে পরামর্শ করা হতো।

তিনি স্থাপত্যশিল্পেরও অনুরাগী ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি গ্রানাডায় আলহামরা প্রাসাদের মতো অতুলনীয় ইমারত নির্মাণ করিয়েছিলেন, যা আজও পর্যটকদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে। তিনি প্রচুর পরিমাণে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্ঞানীদের প্রাণখুলে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি একটি বিশাল কুতুবখানা স্থাপন করেন এবং কনস্টান্টিনোপলসহ প্রতিটি শহর থেকে বই আনিয়ে সেখানে জমা করেন। আল-হাকাম উমাইয়ার বিখ্যাত কুতুবখানার একটি বিশাল ভাণ্ডার গ্রানাডার এই নতুন কুতুবখানায় সংরক্ষিত হয়েছিল।

মুহাম্মদ ইবনে আল-আহমার খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে চাইতেন না; তিনি সবসময় যুদ্ধের চেয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন। এই সিলসিলায় তিনি কখনো কখনো আপত্তিকর পর্যায় পর্যন্তও পৌঁছে যেতেন। তবে এই কৌশলের ফলে তাঁর শাসনামল সাধারণভাবে শান্তিময় ছিল। যেহেতু সমস্ত চুক্তির পেছনে উভয় পক্ষের স্বার্থ বা বাধ্যবাধকতা কার্যকর থাকে, তাই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে লক্ষ্যও বদলে যায় এবং শান্তি চুক্তির প্রবক্তারা পুনরায় অস্ত্র তুলে নেয়। এজন্য ইবনে আল-আহমার খ্রিস্টানদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব অবশ্যই বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু কখনো তাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে করার ভুল করেননি। তিনি গ্রানাডার ওপর খ্রিস্টানদের দখলের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। তিনি গোপনে শজোনা, মুরসিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুসলমানদের সাহায্যও প্রদান করতে থাকেন। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যে, কখন খ্রিস্টানরা দুর্বল হবে এবং তিনি তাদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

৬৫০ হিজরিতে তৃতীয় ফার্ডিনান্ড মারা যায়। কিছুকাল পর্যন্ত শান্তি ও শৃঙ্খলা এভাবেই বজায় ছিল, কিন্তু ৬৬০ হিজরিতে কাস্টিলের নতুন শাসক দশম আলফনসো যুদ্ধ ঘোষণা করে দেয় এবং আক্রমণ করে গ্রানাডার কিছু দুর্গ দখল করে নেয়। যুদ্ধের পরিবেশ বেশ কয়েক বছর ধরে বজায় ছিল। ইবনে আল-আহমার ৬৬১ হিজরিতে মালাগা এবং ওয়াদি আশ-এর ওপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন এবং লারিয়াল দুর্গের...

প্রায় তাদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে ৬৬৫ হিজরিতে তাকে কয়েকটি দুর্গ দিয়ে আলফনসো দশমের সাথে সন্ধি করতে হয়েছিল।

এই সময়ে তিনি তার করদ রাজ্যকে অত্যন্ত দ্রুত শক্তিশালী করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করেন যার সেনাবাহিনী নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করতে সক্ষম ছিল। আলফনসো দশম এটি সহ্য করতে পারলেন না এবং আবারও তিনি গ্রানাডার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চাইলেন। সেই সময়ে মরক্কোতে মুওয়াহহিদুনদের স্থলে বনু মারিন একটি নতুন সরকার গঠন করেছিল। ইবনুল আহমার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে বনু মারিনের সুলতান ইয়াকুব বিন আব্দুল হকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং খ্রিস্টানদের হাত থেকে রক্ষার জন্য তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

তবে বনু মারিনের সেনাবাহিনী পৌঁছানোর আগেই মুহাম্মদ ইবনুল আহমার ঘোড়া থেকে পড়ে আহত হয়েছিলেন। এই আঘাতের কারণেই ২৯ জুমাদাল আখিরা ৬৭১ হিজরি (১ ফেব্রুয়ারি ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ) ইবনুল আহমারের মৃত্যু হয়। তিনি প্রায় অর্ধ শতাব্দী শাসন করেন। তিনি তার সময়ের একজন সৌভাগ্যবান রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি আন্দালুসের মুসলমানদের বিলীয়মান অস্তিত্বকে শক্তিশালী অবলম্বন প্রদান করেছিলেন এবং আন্দালুসে কুবরার স্থলে আন্দালুসে সুগরার দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। [১]

মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের উত্তরসূরিদের শাসন:

মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের পর তার বংশধরদের মধ্যে সোয়া দুইশ বছর শাসন টিকে ছিল। ঐতিহাসিকগণ তার রাষ্ট্রকে “আন্দালুসে সুগরা” বলেন, যাতে গ্রানাডা ছাড়াও মালাগা এবং আলমেরিয়াও দুটি বড় শহর ছিল। অন্যদিকে জাজিরাতুল খাদরা, লুশা এবং ওয়াদিয়ে আশ ছিল ছোট শহর বা দুর্গ। এই রাষ্ট্রটি আন্দালুসের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল। ইবনুল আহমারের অধিকাংশ উত্তরসূরি শাসন ও রাজনীতিতে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। ইবনুল আহমারকে প্রথম শাসক গণ্য করে এখন তার উত্তরসূরিদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

[১] আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা: ২/ ৫১ থেকে ৫৬, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; তারিখে ইবনে খালদুন: ৪/ ২১৮ থেকে ২২০; আল-আলাম যিরিকলি: ৭/ ১৫০, ১৫১; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আব্দুর রহমান আলী: পৃ. ৫৩৩ থেকে ৫৩৯।

২. আল-ফকিহ, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ দ্বিতীয়

রজব ৬৭১ হিজরি থেকে শাবান ৭০১ হিজরি (জুলাই ১২৭৩ খ্রি. থেকে এপ্রিল ১৩০২ খ্রি.)

মুহাম্মদ ইবনুল আহমারের উত্তরসূরি মুহাম্মদ দ্বিতীয় ৬৩৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮ বছর বয়সে ১লা রজব ৬৭১ হিজরিতে (১১ জুলাই ১২৭৩ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ও পণ্ডিত শাসক ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ও অধ্যয়নের কারণে তাঁকে মুহাম্মদ আল-ফকিহ বলা হতো। কাব্য ও সাহিত্যে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি বেশ কয়েকটি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সাহসিকতা, বীরত্ব এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তিনি তাঁর পিতার মতোই ছিলেন। তিনি গ্রানাডা রাষ্ট্রকে আরও উন্নত করেন এবং ধন-সম্পদ ও শক্তিতে একে কাস্টিলের প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলেন।

তাঁর রাজনীতিও ছিল অত্যন্ত বিচিত্র। কখনও কখনও তিনি দুই খ্রিস্টান শাসকের একজনের সাথে মিত্রতা করে অন্যজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। তাঁর পিতার মতো তিনিও মরক্কোর বনু মারিনের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন, কিন্তু কখনও কখনও তিনি তাদের বিরুদ্ধেও খ্রিস্টানদের সাথে মিত্রতা করতেন। তাঁর রাজনীতি সবার বোধগম্য ছিল না, তবে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের দিক থেকে তিনি সর্বদা খ্রিস্টানদের পর্যুদস্ত করেছেন এবং ইসলামী সীমান্ত রক্ষায় পুরোপুরি সফল হয়েছেন।

তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময় গ্রানাডা ও কাস্টিলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং এই বিপদের কথা মাথায় রেখে তাঁর পিতা আগেই বনু মারিনের সাথে সামরিক সহযোগিতার চুক্তি করেছিলেন। যখন ৬৭৩ হিজরিতে কাস্টিল গ্রানাডা আক্রমণ করে, তখন আল-ফকিহ বনু মারিন শাসক আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-মানসুরের কাছে সাহায্য চান। তিনি অবিলম্বে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রানাডাবাসীদের সাহায্য করতে পৌঁছে যান। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা ৯০ হাজার সৈন্য ময়দানে নামিয়েছিল।

১৫ই রবিউল আউয়াল ৬৭৪ হিজরিতে দক্ষিণ কর্ডোভার এসিজা (Écija) শহরের বাইরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আবু ইউসুফ ইয়াকুব নিজে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর ছেলে ইউসুফকে প্রথম সারিতে মোতায়ন করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর আগে আবু ইউসুফ ঘোড়া থেকে নেমে অজু করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করেন, তারপর হাত তুলে উচ্চস্বরে দোয়া করেন:

“হে আল্লাহ! এই জামাতকে বিজয় দান করুন! আপনার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাদের সাহায্য করুন।”

পুরো লঙ্কর আমিন বলল। আবু ইউসুফ দোয়া শেষ করে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে মুজাহিদদের ডেকে বললেন:

“হে মুসলমানরা! হে আল্লাহর মুজাহিদগণ! তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী হও। তোমরাই এই সীমান্তের রক্ষক এবং তাঁর দ্বীনের শত্রুদের মোকাবিলা করছ। আজ একটি ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। আগামীকাল যা হবে তা এরই ওপর নির্ভর করছে। শোনো! জান্নাতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা রয়েছে। হুররা সুসজ্জিত হয়েছে। তাদের দিকে ধাবিত হও। তাদের অশ্বেষণে শ্রেষ্ঠত্ব দেখাও। তোমাদের জীবনকে তাদের মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করো। শোনো! জান্নাত তলোয়ারের ছায়াতলে।”

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই জন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন [১]।”

এই লাভজনক ব্যবসাকে গণীমত মনে করো। নেক আমল করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও। আল্লাহর অস্বীকারকারী শত্রু এবং পাপাচারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য কোমর বেঁধে নাও। যে মারা যাবে সে শহীদ হবে, আর যে জীবিত ও সহিহ-সালামতে ঘরে ফিরবে সে সওয়াবও পাবে এবং সুখ্যাতিও।

হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ করো, মোকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকো, পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকো... এবং আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকো... যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো [২]।

এই ভাষণ মুসলমানদের অন্তরকে এমনভাবে নাড়া দিল যে, অশ্রু ঝরতে লাগল এবং রক্ত গরম হয়ে উঠল। এরপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। অবশেষে খ্রিস্টানরা আট হাজার লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা সামনে এগিয়ে গিয়ে কাস্তিলিয়ার নতুন রাজধানী ইশবিলিয়ার (সেভিল) অবরোধ করল এবং শেষ পর্যন্ত গ্রানাডার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের শর্তে সন্ধি গ্রহণ করল। আবু ইউসুফ মারিনি ৬৭৪ হিজরির রজব মাসে মরক্কো ফিরে যান এবং পেছনে তিন হাজার সৈন্য গ্রানাডার শক্তি বৃদ্ধির জন্য রেখে যান [৩]।

আলফনসো এই সময়ের মধ্যে এই আশঙ্কায় পড়লেন যে, পাছে বনু মারিন, মুরাবিতুন এবং মুওয়াহহিদুনদের মতো আন্দালুস দখল করে না নেয়। তাই তিনি আন্দালুসে বনু মারিনদের বন্দর জাজিরাতুল খাদরাকে নিজের দখলে নেওয়ার জন্য কাস্তিলিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তি করলেন এবং উভয়ের যৌথ বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হলো।

এটি আলফনসোর একটি মারাত্মক ভুল ছিল, কিন্তু মরক্কোর সুলতান আবু ইউসুফ মারিনি এই পরিস্থিতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সামাল দিলেন। তিনি ৬৭৮ হিজরিতে নিজের ছেলের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী নৌবহর পাঠিয়ে কাস্তিলিয়ার নৌবাহিনীকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিলেন এবং জাজিরাতুল খাদরায় নিজের সৈন্য মোতায়েন করলেন। এরপর তিনি দূত পাঠিয়ে আলফনসোর ভুল বোঝাবুঝি দূর করলেন এবং উভয় ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে পুনরায় সুসম্পর্ক স্থাপিত হলো।

কিছুকাল পর উভয় সরকারের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হলো যে, আন্দালুসে বনু মারিনদের কোনো অভিজ্ঞ নেতার স্থায়ী নিয়োগ হবে যিনি জিহাদের নেতৃত্ব দেবেন। এই পদকে ‘মশইয়খাতুল গুজাত’ এবং পদাধিকারীকে ‘শাইখুল গুজাত’ নাম দেওয়া হলো। প্রথম শাইখুল গুজাত ছিলেন আবদুল্লাহ বিন আবিল আলা, যিনি ৬৯৩ হিজরির এক যুদ্ধে শহীদ হন। এরপর তার ভাই আবু সাঈদ উসমান বিন আবিল আলা এই পদ লাভ করেন।

[১] সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১১

[২] সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২০০

[৩] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি-আবদুর রহমান আলী, পৃ. ৫৩৬ থেকে ৫৩৮

মরক্কোর মুজাহিদ শাসক আবু ইউসুফ ইয়াকুব আল-আন্দালুসের প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং একটি অভিযানের সময় ৬৮৫ হিজরিতে এখানেই ইন্তেকাল করেন। খ্রিস্টানরা জাজিরাতুল খাদরায় বানু মারিনের উপস্থিতি সহ্য করতে পারছিল না। তারা জানত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রানাডার সাথে আফ্রিকার সাহায্যের পথ বন্ধ করা না যাবে, ততক্ষণ আন্দালুস থেকে মুসলমানদের নির্মূল করা সম্ভব নয়। তাই তারা পুনরায় জাজিরাতুল খাদরা আক্রমণ করে, কিন্তু মরক্কো ও গ্রানাডার যৌথ বাহিনী তাদের বিতাড়িত করে।

মুহাররম ৬৯৫ হিজরিতে আরাগোনের শাসক রাজা প্রথম জেমস গ্রানাডার দিকে সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু আল-ফকিহ জিয়ান নামক স্থানে এই বাহিনীকেও শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন, যেখানে রাজা জেমসের পুত্র সানচোও নিহত হন। খ্রিস্টানদের পিছু হটতে বাধ্য করে আল-ফকিহ তাদের শহর “কিজাতা” (Quesada) দখল করে নেন। ৬৯৯ হিজরিতে তিনি কর্ডোভার নিকটবর্তী শহর কুবদাকও জয় করেন।

মোটকথা, তাঁর শাসনামলে কেবল গ্রানাডার সীমান্তই সফলভাবে রক্ষা করা হয়নি, বরং রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডও সম্প্রসারিত হয়েছিল। ত্রিশ বছরের প্রশংসনীয় শাসনের পর ৮ শাবান ৭০১ হিজরি (১৯ এপ্রিল ১৩০২ খ্রিস্টাব্দ) মুহাম্মদ দ্বিতীয় সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

[১]

দৌলতে মারিনিয়ার ওপর এক নজর

এই সরকার সপ্তম হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দুইশ বছরেরও বেশি সময় টিকে ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল হক বিন মাহইউ বারবার গোত্র জানাতার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। একটি মত এমনও আছে যে, এই লোকেরা মূলত আরব ছিল কিন্তু বারবারদের সাথে মিশে গিয়েছিল। যখন জঙ্গি উকাবে (৬০৯ হিজরি) মুওয়াহহিদুনরা খ্রিস্টানদের কাছে পরাজিত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আন্দালুস ছাড়াও মরক্কোতে রাজনৈতিক সংকট বাড়তে থাকে, তখন আব্দুল হক মরক্কোর কিছু এলাকা দখল করে নেন। মুওয়াহহিদুন এবং বানু মারিনের এই দ্বন্দ্ব আব্দুল হকের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শেষ হয়, যার পর এই দল আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর আব্দুল হকের পুত্রগণ: উসমান আবু সাঈদ (৬১৩ হিজরি থেকে ৬৩৮ হিজরি) এবং মুহাম্মদ (৬৩৮ হিজরি থেকে ৬৪২ হিজরি) বানু মারিনের নেতৃত্ব দেন। তৃতীয় পুত্র আবু বকর ইয়াহইয়া ৬৪২ হিজরিতে মেকনেসসহ বেশ কিছু জেলা জয় করেন। ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ) আবু বকরের মৃত্যুর পর আব্দুল হকের চতুর্থ পুত্র ইয়াকুব শাসনভার গ্রহণ করেন এবং অবশেষে ৬৬৭ হিজরিতে (১২৬৯ খ্রিস্টাব্দ) মুওয়াহহিদুন শাসনের অবসান ঘটান। বানু মারিন শাসন উত্তর আফ্রিকায় ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেয় এবং চমৎকার স্থাপত্য কাজ সম্পন্ন করে। মরক্কোর ফাস শহর ছিল এর রাজধানী। উন্নতির চরম শিখরে থাকাকালীন এটি আন্দালুসের কিছু উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও বর্তমান আলজেরিয়া এবং তিউনিসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন:

- ইয়াকুব বিন আব্দুল হক (৬৫৬ হিজরি থেকে ৬৮৫ হিজরি)
- ইউসুফ বিন ইয়াকুব আন-নাসির (৬৮৫ হিজরি থেকে ৭০৬ হিজরি)
- আবুল রাবি সুলাইমান (৭০৮ হিজরি থেকে ৭১০ হিজরি)
- আবু সাঈদ উসমান বিন ইয়াকুব (৭১০ হিজরি থেকে ৭৩২ হিজরি)
- আবুল হাসান আলী বিন উসমান (৭৩২ হিজরি থেকে ৭৪৯ হিজরি)
- আবু ইনান ফারিস বিন আলী (৭৪৯ হিজরি থেকে ৭৫৯ হিজরি)

এর পর রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। কয়েক বছরে ছয়জন দুর্বল শাসক অতিবাহিত হন।

- আবু ফারিস আব্দুল আজিজ (৭৬৮ হিজরি থেকে ৭৭৪ হিজরি)

এর পর পুনরায় দুর্বল শাসকদের যুগ আসে। ৭৭৪ হিজরি থেকে ৮০১ হিজরি পর্যন্ত ২৭ বছরে নয়জন শাসক অতিবাহিত হন, অর্থাৎ রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ছিল।

- আবু সাঈদ উসমান সানি (৮০১ হিজরি থেকে ৮২৩ হিজরি)

এর পর শেষ শাসক আব্দুল হক সানি ৮৬৯ হিজরি (১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শাসন করেন।

দৌলতে মারিনিয়া তার উন্নতির যুগে কেবল উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তম সাম্রাজ্যই ছিল না, বরং ৬০০টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তারা ভূমধ্যসাগরে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকে। বানু মারিন ইসলামি আন্দালুসকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয় এবং বারবার এখানকার মুসলমানদের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠায়।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/ ২২১ থেকে ৫৪৪; আল-ইহাতা ফি আখবার গ্রানাডা: ১/ ৩২৬ থেকে ৩৩২, তবা আল-ইলমিয়াহ; আদ-দুরার আল-কামিনাহ ফি আয়ান আল-মিয়াত আল-সামিনাহ: ৫/ ৫১৫; আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৭/ ৩২; আত-তারিখ আল-আন্দালুসি মিন আল-ফাতহ আল-ইসলামি ইলা সুকুত গ্রানাডা: পৃষ্ঠা ৫৩৯ থেকে ৫৪১; দৌলতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/ ৯৩ থেকে ১১২।

(৩) মুহাম্মদ সউম, আল-মাখলু', আবু আবদুল্লাহ

শাবান ৭০১ হিজরি থেকে শাওয়াল ৭০৮ হিজরি (১৩০২ থেকে ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দ)

মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ, আবু আবদুল্লাহ আল-মাখলু' ৬৫৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬ বছর বয়সে ৯ শাবান ৭০১ হিজরিতে (১০ এপ্রিল ১৩০২ খ্রিস্টাব্দে) শাসক হন। তার পিতা ও পিতামহের নামও মুহাম্মদ ছিল, পার্থক্যের জন্য তাকে মুহাম্মদ সউম (তৃতীয় মুহাম্মদ) বলা হতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান, সাহসী এবং দূরদর্শী ব্যক্তি। তিনি তার পিতার শাসনামলে রাজনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। শাসক হওয়ার পর তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো দেখাশোনা করতেন এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করতেন না। তিনি তার কয়েক বছরের শাসনামলে অনেক ভালো কাজ করেছেন। কাসরুল হামরার কাছে তিনি একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন যাতে রূপার কারুকাজ করা হয়েছিল।

তিনি কঠোর স্বভাবের ছিলেন। একবার কিছু আমিরের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের একটি কক্ষে বন্দি করে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবি নিজের কাছে রেখে দেন। তারা সবাই কয়েক দিন পর ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যান। এই সময়ে একজন দারোয়ান একটি জানালা দিয়ে তাদের কিছু খাবার দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আল-মাখলু' যখন তা জানতে পারলেন, তখন তিনি সেই দারোয়ানকেও হত্যা করালেন।

আল-মাখলু'-এর শাসনামলে মরক্কোর বনু হাফসিনের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং গ্রানাডা রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। আলমেরিয়া এবং ওয়াডি আশের আমিররা একের পর এক বিদ্রোহ করেন, কিন্তু আল-মাখলু' সবাইকে দমন করেন।

খ্রিস্টানরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। কাস্টিলের রাজা চতুর্থ ফার্ডিনান্ড এবং আরাগনের রাজা দ্বিতীয় জেমস (খাইমে) গ্রানাডার সাথে শান্তি চুক্তি লঙ্ঘন করে জাবালুত তারিক এবং আলজেরিয়া আক্রমণ করেন। শায়খুল গুজাত উসমান বিন আবিল উলা আলজেরিয়ার কাছে আরাগন বাহিনীর মোকাবিলা করেন এবং তাদের অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য করেন। তবে অন্য ফ্রন্টে কাস্টিল বাহিনী জাবালুত তারিক এবং জাজিরাতুল খাদরা আক্রমণ করে। আল-মাখলু' জবাবে খ্রিস্টান এলাকায় তার সেনাবাহিনী প্রবেশ করান, যার ফলে খ্রিস্টানরা আতঙ্কিত হয়ে আলজেরিয়ার অবরোধ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আল-মাখলু' রাতে বড় বড় মোমবাতির তীব্র আলোতে পড়াশোনা করতেন, যার ফলে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি অন্ধ হয়ে যান। এরপর রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তার উজির মুহাম্মদ বিন হাকিম লাখমি প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। তিনি আল-মাখলু'র ক্ষমতা সীমিত করে দেন, যার ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১ শাওয়াল ৭০৮ হিজরিতে (১৪ মার্চ ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে) আল-মাখলু'র বিরুদ্ধে তার ভাই নসর বিন মুহাম্মদ বিদ্রোহ করেন। কাসরুল হামরায় হাঙ্গামা শুরু হয়। বিদ্রোহী সৈন্যরা সাধারণ মানুষের সাথে প্রাসাদে ঢুকে পড়ে এবং লুটতরাজ চালায়। যাই হোক, মুহাম্মদ সউমকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারারুদ্ধ করা হয়। [১] তিনি বনু নাসরের প্রথম শাসক ছিলেন যাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল, এই কারণে তাকে “মাখলু” বলা হয়।

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ৩১৬/১ থেকে ৩২৩, তাবা আল-ইলমিয়া; আল-আলাম লিল-জিরকালি: ৭/৩৩; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১১২ থেকে ১১৩। ক্ষমতাচ্যুতির তিন বছর পর ৩ শাওয়াল ৭১৩ হিজরিতে (২১ ফেব্রুয়ারি ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে) তাকে কারাগারে হত্যা করা হয়। (আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ৩/১, আল-ইলমিয়া)।

(৪) আবুল জিউশ নসর বিন মুহাম্মদ

৭০৮ হি. থেকে ৭১৩ হি. (১৩০৯ খ্রি. থেকে ১৩১৪ খ্রি.)

আবুল জিউশ নসর বিন মুহাম্মদ ৬৮৬ হিজরির রমজান মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বছর বয়সে ১লা শাওয়াল ৭০৮ হিজরি (২৬ মার্চ ১৩০৯ খ্রি.) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুদর্শন, কোমল স্বভাবের, পবিত্র ও শান্তিপ্রিয় যুবক ছিলেন। তিনি রক্তপাত অপছন্দ করতেন। তার মধ্যে রাজনৈতিক চাতুর্য একেবারেই ছিল না। নিজের ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তিনি কোনো প্রশংসনীয় সময় কাটাতে পারেননি। তার শাসনকাল ছিল পাঁচ বছর এক মাস। এই দিনগুলো ছিল ক্রমাগত বিদ্রোহ ও অস্থিরতার সময়।

৭০৯ হিজরিতে কাস্টিলের শাসক চতুর্থ ফার্দিনান্দ দীর্ঘ অবরোধের পর জাবাল আল-তারিক (জিব্রাল্টার) দখল করেন এবং এরপর গ্রানাডার প্রাণকেন্দ্র জাজিরাতুল খাদরা (আলজেসিরাস) ঘেরাও করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে বাসেলোনার খ্রিস্টানরা পুনরায় আলমেরিয়া আক্রমণ করে। আবুল জিউশ ভীত হয়ে কাস্টিলের বশ্যতা স্বীকার করে নেন।

কিছুকাল পর চতুর্থ ফার্দিনান্দ মারা যান এবং তার নাবালক পুত্র সিংহাসনে বসেন, যার ফলে কাস্টিলে চরম রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং খ্রিস্টান রাজপুত্ররা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। সেই সময় যদি গ্রানাডার শাসকরা ঐক্যবদ্ধ ও সংহতি বজায় রাখতেন, তবে তারা খ্রিস্টানদের ওপর আঘাত হানতে পারতেন, কিন্তু গ্রানাডায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল।

জমাদিউল আখিরা ৭১০ হিজরিতে আবুল জিউশ এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তার বেঁচে থাকার আশা ছিল না। আমিররা এই পরিস্থিতিতে প্রাক্তন শাসক আল-মাখলু মুহাম্মদ তৃতীয়কে কারাগার থেকে বের করে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু আবুল জিউশ হঠাৎ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং এই বিদ্রোহ থেকে বাঁচতে আল-মাখলুকে কারাগারেই হত্যা করান। এর পরেও গ্রানাডায় ক্ষমতার টানাটানি চলতে থাকে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত মালাগাতে আবুল জিউশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং বিদ্রোহী বাহিনী আশেপাশের অনেক দুর্গ দখলের পর গ্রানাডা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সরকারি বাহিনীকে পরাজিত করে। এরপর ১৩ই জিলকদ ৭১৩ হিজরি (১৪ মার্চ ১৩১৪ খ্রি.) আবুল জিউশকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তবে তাকে ওয়াদি আশ-এর শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।

যদিও আবুল জিউশের মধ্যে শাসনের যোগ্যতা ছিল না, তবে তিনি বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তার যুগে বিজ্ঞান ও দর্শনের ওপর অনেক নতুন বই লেখা হয় এবং প্রাচীন বিদেশি বইয়ের অনুবাদ করা হয়। ক্ষমতাচ্যুতির পরও আবুল জিউশ পুনরায় ক্ষমতায় আসার জন্য কিছু না কিছু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কখনো গ্রানাডার শাসক আবুল ওয়ালিদের সাথে তার সমঝোতা হতো আবার কখনো উত্তেজনা দেখা দিত। ৭ই জিলকদ ৭২২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। তার বয়স ছিল ৩৯ বছরের কিছু বেশি। [১]

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাটা: ১/৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬; তাবারী: ৩/৫৬৩; দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/২২১, ২২২; আল-আলাম লিল-জিরিকলি: ৮/২৮; নাফহত তিব: ৫/১২০; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/১৪২।

(৫) আবুল ওয়ালীদ, ইসমাইল আউয়াল বিন ফারাজ

(৭১৩ থেকে ৭২৫ হিজরি / ১৩১৩ থেকে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ)

আবুল জিউশের স্থলে এই বংশের এক সাহসী ব্যক্তি আবুল ওয়ালীদ ইসমাইল বিন ফারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ইবনুল আহমারের ভাই ইসমাইলের পৌত্র ছিলেন। ৭ই শাওয়াল ৬৭৭ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ই জিলকদ ৭১৩ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল ৩৬ বছর।

আবুল ওয়ালীদ অত্যন্ত শরীফ, বুদ্ধিমান এবং উচ্চ সাহসী মানুষ ছিলেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে সাবেক শাসক নসর বিন মুহাম্মদের সাথেও ভালো আচরণ করেন এবং তাকে ওয়াদিউল আশ-এর আমীর নিযুক্ত করেন। আবুল ওয়ালীদ ধর্মীয় সংস্কারও করেন, বিদআত দূর করেন, আহলে সুন্নাতকে সম্মান দান করেন এবং সাদাতদের অনেক অনুগ্রহ করেন। শরয়ী আইন বাস্তবায়নে কোনো ত্রুটি রাখেননি। সমাজে প্রচলিত মন্দ কাজগুলো দূর করার চেষ্টা করেন। নর্তকীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। ইহুদিদের শনাক্ত করার জন্য হলুদ ফিতা বাঁধার নির্দেশ দেন।

আবুল ওয়ালীদ গ্রানাডার সীমানা বৃদ্ধির জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেন। মরক্কোর বনু মারিনের সাথে তিক্ততা তখনও চলছিল। এই সময়ে আবুল ওয়ালীদ বনু মারিনের কাছ থেকে আন্দালুসের দুর্গ: তরীফ এবং রন্দাহ পুনরায় দখল করে নেন। [১]

মনযরাহ বিনুসের ঐতিহাসিক যুদ্ধ:

কাস্টিলের রাজা আলফনসো একাদশ গ্রানাডাকে একজন সাহসী ও শক্তিশালী শাসকের অধীনে দেখে কঠোর বিপদ অনুভব করেন। গ্রানাডার ক্রমবর্ধমান শক্তি পুরো ইউরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাদ্রিরা জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে ক্রুসেড যুদ্ধের মতো পরিবেশ তৈরি করে। স্পেনের বিশপ এই অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পুরো মহাদেশের গির্জাগুলোতে আন্দালুস থেকে মুসলমানদের নির্মূলের জন্য প্রার্থনা করা হতে থাকে। টলেডোতে খ্রিস্টানদের একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ হয় যাতে বিশ হাজার নবাব শরিক হন। পোপ প্রত্যেকের মাথায় হাত বুলিয়ে বরকতের দোয়া করেন।

কাস্টিলের যুবরাজ ডন পেড্রো (Don Pedro)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। এবং অন্য একজন সেনাপতি ডন খোয়ান (Don Juan)-কে তার নায়েব বানানো হয়। তিনি পোপের কাছে আন্দালুসের অবশিষ্ট মুসলমানদের নির্মূলের জন্য দোয়ার আবেদন করেন। যার পর দুই লক্ষ পদাতিক বাহিনী গ্রানাডা জয়ের জন্য এবং উপদ্বীপ আন্দালুস থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য রওনা হয়, যার মধ্যে ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই বাহিনী শুরুতে অনেক সীমান্ত দুর্গ দখল করে নেয়। তবে আবুল ওয়ালীদ এত বড় আকারের সৈন্য অভিযানের খবর শুনেও হতাশ হননি। তিনি মরক্কোর শাসক আবু সাঈদের কাছে সাহায্য চান কিন্তু দুই রাজ্যের মধ্যে তিক্ততা চলছিল তাই কোনো সাহায্য আসেনি। এই সময়ে খ্রিস্টানদের প্লাবন গ্রানাডার সীমান্তে পৌঁছে যায় এবং শহর থেকে দশ মাইল দূরে আলবীরা পাহাড়ের কাছে...

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার গ্রানাডা: ১/৪০০ ও ৪০৬, ত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ।

পাদদেশে “ফরতুনাহ” নামক উপত্যকায় তাঁবু স্থাপন করলেন।

গ্রানাডার মুসলমানরা কোনো সাহায্য না পেয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং কান্নাকাটি করে দোয়া চাইলেন। আবুল ওয়ালিদ তাৎক্ষণিকভাবে যে সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তাদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি ছিল না। তারা সবাই নিয়তকে খাঁটি এবং সংকল্পকে সুদৃঢ় করলেন, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হলেন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে ২০ রবিউস সানি ৭১৯ হিজরিতে গ্রানাডা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

আবুল ওয়ালিদ খ্রিস্টানদের শিবিরের কয়েক মাইল দূরে পৌঁছে শায়খুল গুজাত উসমান বিন ইদ্রিসকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন অগ্রবর্তী দলের পাঁচশ বাছাইকৃত সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান এবং খ্রিস্টানদের অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। শায়খুল গুজাত এগিয়ে গিয়ে খ্রিস্টানদের অগ্রবর্তী দলের ওপর আক্রমণাত্মক হামলা চালালে এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে খ্রিস্টানদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল, তারা আতঙ্কিত হয়ে পিছু হটে গেল এবং ভাবল যে মুসলমানদের কাছে যথেষ্ট শক্তি রয়েছে।

শায়খুল গুজাত তার মুজাহিদদের নিয়ে আবুল ওয়ালিদের কাছে ফিরে এলেন। কয়েক দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী নিজ নিজ অবস্থানে স্থির রইল। আবুল ওয়ালিদ যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করলেন এবং তার একজন সেনাপতি আবুল জিউশকে এক হাজার সৈন্য নিয়ে নিকটবর্তী জঙ্গলে ওত পেতে থাকার নির্দেশ দিলেন। এরপর শায়খুল গুজাতকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন পাঁচশ সৈন্য নিয়ে খ্রিস্টানদের ওপর লোকদেখানো আক্রমণ করেন এবং পিছু হটার ভান করে খ্রিস্টানদের নিজেদের পেছনে টেনে আবুল জিউশের ওত পেতে থাকা স্থানের সামনে নিয়ে যান।

এই সময়ে আবুল ওয়ালিদ তিনশ সৈন্য নিয়ে অন্য এক দিকে অবস্থান নিলেন। বাকি চার হাজার সৈন্যকে চতুর্থ দিকে চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য সংরক্ষিত রাখা হলো। শায়খুল গুজাত মুজাহিদদের নিয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর কাছে পৌঁছালেন, ঘোড়া থেকে নেমে দীর্ঘ সিজদা করলেন এবং কান্নাকাটি করে আল্লাহর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করলেন। তারপর উচ্চস্বরে বললেন: “আক্রমণ করো।”

মুজাহিদরা একযোগে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর পরিকল্পনা অনুযায়ী পিছু হটেতে শুরু করলেন। এটি দেখে খ্রিস্টানদের পুরো বাহিনী এক বিশাল বিজয়ে অংশ নেওয়ার আশায় তাদের পিছু ধাওয়া করল, এমনকি শায়খুল গুজাত জঙ্গলে ঢুকে অনেক দূরে চলে গেলেন। পিছু ধাওয়া করা খ্রিস্টান অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী জঙ্গলে প্রবেশের পর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারল না এবং বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নরত মুসলমানদের পেছনে ছুটতে থাকল। যখন তারা আবুল জিউশের ওত পেতে থাকা স্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করল, তখন তিনি পেছন থেকে এমন জোরালো আক্রমণ করলেন যে খ্রিস্টানদের নাভিশ্বাস উঠে গেল। ওদিক থেকে শায়খুল গুজাতও ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করলেন। খ্রিস্টানরা দিশেহারা হয়ে তৃতীয় দিকে পালাতে শুরু করলে সেখানে আবুল ওয়ালিদ তার তিনশ সৈন্য নিয়ে তাদের তীরের লক্ষ্যবস্তু বানালেন। জঙ্গলে গাছের আধিক্যের কারণে খ্রিস্টানরা বুঝতে পারছিল না যে তাদের ওপর আক্রমণকারীদের সংখ্যা কত। তারা যখন খোলা ময়দানের দিকে বেরিয়ে এল, তখন বাকি চার হাজার অশ্বারোহী মুজাহিদ বর্শা উঁচিয়ে তাদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করলেন এবং খ্রিস্টানদের পিষ্ট করে ফেললেন। এই যুদ্ধ ৬ জমাদিউল আউয়াল ৭১৯ হিজরিতে আলী কুম-এর ময়দানে লড়াই ছিল।

শায়খুল গুজাত দুই হাজার অশ্বারোহী নিয়ে ঝড়ের মতো খ্রিস্টানদের তাঁবুতে ঢুকে পড়লেন। ডজন খানেক নবাব যারা...

তারা মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয়ের খবরের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু এই আকস্মিক আক্রমণের কবলে পড়ে সেখানেই স্তূপ হয়ে গেল। অবশিষ্ট খ্রিস্টানরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে তলিতলার দিকে পালিয়ে গেল, মুসলমানরা ক্রমাগত তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকল এবং পদে পদে তাদের লাশ ফেলতে থাকল। এটি ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর যুদ্ধ ছিল যাতে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার মুসলমান আল্লাহর সাহায্য, নিজেদের ঈমানি শক্তি, জিহাদের জজবা, শাহাদাতের তামান্না, সাহস ও কৌশল এবং সংগঠন ও ঐক্যের বদৌলতে দুই লক্ষের বাহিনীর ওপর বিজয় লাভ করেন। ইয়াল কুম থেকে তলিতলার মহাসড়ক পর্যন্ত ষাট হাজার (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ৮০ হাজার) খ্রিস্টানের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যার মধ্যে কাসতালিয়ার যুবরাজ ডন পেড্রোসহ পাঁচশজন প্রখ্যাত খ্রিস্টান নেতাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, এই পুরো যুদ্ধে মাত্র তেরোজন মুসলমান শহীদ হন। ডন পেড্রোর স্ত্রী-সন্তানসহ সাত হাজার খ্রিস্টান বন্দী হয়। পেড্রোর লাশ গ্রানাডার দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে দুনিয়া দেখে নিতে পারে যে মুসলমানদের মিটিয়ে দেওয়া কোনো হাসি-তামাশার বিষয় নয়। এভাবে খ্রিস্টান শাসকদের প্রতাপ ও দাপট ধুলোয় মিশে গেল এবং তারা গ্রানাডার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলো।

আবুল ওয়ালিদের বিজয় অভিযান এর পরেও অব্যাহত থাকে। ২৪ রজব ৭২৪ হিজরিতে তিনি খ্রিস্টানদের মজবুত দুর্গ ‘হিসন শাকার’ জয় করেন। পরের বছর রজব ৭২৫ হিজরিতে তিনি জিয়ান থেকে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মারতাশ দুর্গের ওপর দখল কায়েম করে নিজের রাজ্যকে আরও বিস্তৃত করেন।

তবে ইসলামের এই উচ্চাভিলাষী মুজাহিদ, যাকে পুরো ইউরোপ মিলেও পরাস্ত করতে পারেনি, আপনজনদের হাতেই নিহত হন। তিনি মারতাশ দুর্গ জয় করে নিজের সহচর ও অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করছিলেন, এমন সময় তার ভতিজা মুহাম্মদ বিন ইসমাইল কোলাকুলির জন্য এগিয়ে আসে; আবুল ওয়ালিদ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেই সে খঞ্জর বের করে একের পর এক তিনটি আঘাত করে, যার মধ্যে একটি ঘাড়ে লাগে। ঘাতককে ঘটনাস্থলেই হত্যা করা হয় এবং আবুল ওয়ালিদকে গ্রানাডায় নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে জখমের যত্ননা সইতে না পেরে তিনি ইন্তেকাল করেন। এটি ২৭ রজব ৭২৫ হিজরি (২১ জুলাই ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) এর ঘটনা। আবুল ওয়ালিদের বয়স ছিল ৪৮ বছর। [১]

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ১ / ২০০ থেকে ২১০, ত. আল-ইলমিয়াহ; নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, আল-মাক্কারি আল-তিলিমসানি: ১ / ৩৩৯ থেকে ৩৫৪, ত. দার সাদির; আল-আলাম লিয়-যিরিকলি: ১ / ৩২১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪ / ৪২২; আইয়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নাসর, সালাহউদ্দিন আল-সাফাদি: ১ / ৫১২, ৫১৩, ত. দারুল ফিকর আল-মুয়াসির বৈরুত; আস-সাহলুস সাফি ওয়াল মুসরিফি বাদাল ওয়াফি, আল্লামা ইউসুফ বিন তাগরি বারদি: ২ / ৩১৬; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, আবদুর রহমান আলী: পৃ. ৫৪২, ৫৪৩। ওয়াদি ফারতুনা যুদ্ধের (৭১৯ হিজরি) বিস্তারিত বিবরণ সবচেয়ে বেশি নাফহত তিব-এ রয়েছে।

(৬) চতুর্থ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ফারাজ

(৭২৫ হিজরি থেকে ৭৩৩ হিজরি / ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)

আবুল ওয়ালিদ ইসমাইলের মৃত্যু ছিল এক বিরাট দুর্ঘটনা, যা খ্রিস্টানদের অন্তরকে শীতল এবং ঈমানদারদের বিষণ্ণ করে দিয়েছিল। আবুল ওয়ালিদের ওসিয়ত অনুযায়ী তার হত্যার পরপরই ২৭ রজব ৭২৫ হিজরি (২১ জুলাই ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে সালতানাতের আমীরগণ তার পুত্র চতুর্থ মুহাম্মদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি ৮ মহরম ৭১৫ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেই সময় তার বয়স ছিল সাড়ে দশ বছর। আল্লামা লিসানুদ্দিন খতিব (রহ.)-এর মতে, তিনি ছিলেন একজন সুদর্শন, সচ্চরিত্রবান, উদার ও সাহসী যুবক। তার বীরত্ব দুঃসাহসিকতার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। তিনি ঘোড়সওয়ারিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। ঘোড়ার বিভিন্ন বংশ ও প্রকার সম্পর্কে তার ভালো জ্ঞান ছিল। তিনি শিকারের অত্যন্ত শৌখিন এবং কাব্য ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তবে এই গুণাবলির পাশাপাশি তার দুর্বলতা ছিল এই যে, যখন তিনি রাগান্বিত হতেন, তখন আমীরদের অত্যন্ত কঠোরভাবে তিরস্কার করতেন এবং তাদের জন্য এমন শব্দ ব্যবহার করতেন যা অনেকের জন্য অসহনীয় ছিল।

শুরুতে তিনি উজিরদের প্রভাবাধীন ছিলেন, কিন্তু চৌদ বছর বয়সে তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে উজির ইবনে মাহরুক, যিনি তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তাকে দাবিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। অবশেষে চতুর্থ মুহাম্মদ ৭২৯ হিজরিতে সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করান।

চতুর্থ মুহাম্মদ সালতানাতের হেফাজতের ব্যাপারে অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধ করেছেন এবং অধিকাংশেই বিজয়ী হয়েছেন। অন্য একটি যুদ্ধে তিনি ‘কাবরা’ শহরের বাইরে খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন। বিভিন্ন অভিযানে তিনি বাগুরা, হিসন কাসতালিয়া এবং হিসন কুশরা-এর মতো দুর্গগুলো জয় করে আন্দালুস সগরার (ক্ষুদ্র আন্দালুস) আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। তিনি বনু মারিনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটান এবং ৭৩৩ হিজরিতে তাদের সাহায্যে জিব্রাল্টার (জাবালুত তারিক) খ্রিস্টানদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করেন। এটি তার একটি বিরাট কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য হয়।

এই তরুণ শাসকের পরিণতিও ছিল বেদনাদায়ক। কিছুকাল আগে তার সাথে শায়খুল গুজাত উসমান বিন আবিল আলার মতপার্থক্য তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং তিনি শায়খুল গুজাতকে পদচ্যুত করেছিলেন। যখন চতুর্থ মুহাম্মদ জিব্রাল্টার অভিযান শেষ করে ফিরে আসছিলেন, তখন শায়খুল গুজাতের সন্তানদের প্ররোচনায় সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা হঠাৎ আক্রমণ করে এই সাহসী শাসককে হত্যা করে। তার বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর। এই দুঃখজনক ঘটনাটি ১৩ জিলহজ ৭৩৩ হিজরি (৫ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এর। সালতানাতের আমীরগণ তার লাশ সেখানেই ফেলে রেখে যান। পরবর্তীতে লোকজন তাকে মালাগায় (মালকা) নিয়ে গিয়ে দাফন করে।

[১] আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা: ১/৩০৬ থেকে ৩১৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/২২২, ২২৩; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১২১ থেকে ১২৩; আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মায়াতিস সামিনাহ লি ইবনে হাজার আল-আসকালানি: ৫/১২৫; আল-আলাম যিরিকলি: ৬/৩১৬।

৭. আবুল হাজ্জাজ, ইউসুফ বিন ইসমাইল, ইউসুফ আউয়াল

(৭৩৩ হিজরি থেকে ৭৫৫ হিজরি / ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ) :

এখন মুহাম্মদ চতুর্থের ভাই আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ বিন ইসমাইল বিন ফারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন যাকে ইউসুফ আউয়াল বলা হয়। তার বায়াত ১৩ জিলহজ ৭৩৩ হিজরি (৬ সেপ্টেম্বর ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় তার বয়স ছিল পনেরো বছর আট মাস, কিন্তু তিনি ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও চতুর। তিনি মিষ্টভাষী, মেধাবী, সূক্ষ্মদর্শী এবং প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভালো দখল রাখতেন। তিনি রক্তপাত এড়িয়ে চলতেন এবং শান্তিপ্রিয় ছিলেন।

তিনি তার ভাইয়ের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হন। তার শাসনকালে খ্রিস্টানরা আবারও জাবাল আল-তারিক আক্রমণ করে যাতে মরক্কো ও স্পেনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। ইউসুফ আউয়াল মরক্কোর শাসক আবুল হাসান মারিনির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, যিনি তার পুত্র আব্দুল মালিকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠান। ইউসুফ আউয়াল মরক্কোর বাহিনীকে সাথে নিয়ে জাবাল আল-তারিকের কাছে খ্রিস্টানদের পিছু হটতে বাধ্য করেন এবং দক্ষিণ আন্দালুসের অধিকাংশ এলাকা তাদের থেকে মুক্ত করে নেন। কিন্তু যখন মরক্কোর বাহিনী ফিরে যেতে শুরু করে, তখন খ্রিস্টানরা হঠাৎ ফিরে এসে আক্রমণ করে যাতে মরক্কোর মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং তাদের আমির আব্দুল মালিক দশ হাজার সৈন্যসহ শহীদ হন।

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে ৭৪০ হিজরিতে মরক্কোর আমির আবুল হাসান স্বয়ং ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে আন্দালুসের পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করেন এবং আবুল হাজ্জাজের বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে খ্রিস্টানদের শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানিয়ে তারিফ অবরোধ করেন। এই অবস্থা দেখে কাস্টিল, আরাগন এবং পর্তুগালের বাহিনী একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করে বিপুল শক্তির সাথে অগ্রসর হয়। তারিফের বাইরে ‘সালাদো’-এর কাছে ৭ জমাদিউল আউয়াল ৭৪১ হিজরি (৩০ অক্টোবর ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে আন্দালুসের মুসলমানরা প্রথমবারের মতো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে যা পরবর্তীতে প্রথাগত অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। তা সত্ত্বেও এবার খ্রিস্টানরা বিজয়ী হয় এবং ইসলামী শিবিরের দখল নিয়ে সমস্ত রসদ ও অস্ত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। গ্রানাডা রাজ্যের একটি অংশ তাদের দখলে চলে যায়। ইতিহাসে তারিফের যুদ্ধকে জঙ্গ ওকাবের মতো আন্দালুসের মুসলমানদের একটি বিশাল পশ্চাদপসরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুলতান আবুল হাসান অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মরক্কোর দিকে যাত্রা করেন এবং আবুল হাজ্জাজ গ্রানাডায় আশ্রয় নেন। মরক্কোর ক্ষয়ক্ষতি এত বেশি ছিল যে এরপর মরক্কোর শাসকরা আন্দালুসে আর কোনো বড় সামরিক অভিযানের সাহস করেননি এবং গ্রানাডাবাসীদের বেশিরভাগই নিজেদের শক্তির ওপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে হাজার হাজার মুসলমান এবং শত শত উলামা ও মাশায়েখ শহীদ হন যাদের মধ্যে গ্রানাডার উজির, আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব রহ. এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন সাঈদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনুল খাতিব রহ. এর উস্তাদ কাজী মুহাম্মদ বিন বকর আল-মালিকি রহ. (৬৭৩ হিজরি - ৭৪১ হিজরি) ও মুজাহিদদের মধ্যে

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের রচিত গ্রন্থ “আত-তামহীদ ওয়াল বায়ান ফি মাকতালিশ শহীদ উসমান” বিশ্ববিখ্যাত। পরাজয় সামনে দেখে যখন তাঁর বন্ধুরা পালাতে শুরু করল, তখন তারা তাঁকেও পিড়াপিড়ি করে সাথে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু তিনি বললেন: “এই খুশির দিন ছেড়ে আমি কীভাবে ফিরে যাব।” তাঁর ইঙ্গিত ছিল শহীদদের প্রশংসায় বর্ণিত এই আয়াতের দিকে:

“আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা তাঁদের দান করেছেন তাতে তাঁরা আনন্দিত। আর তাঁরা তাঁদের পরবর্তী যারা এখনও তাঁদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের ব্যাপারে সুসংবাদ গ্রহণ করে যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।” [১]

৭৫০ হিজরিতে একাদশ আলফনসো জাবালুত তারিক (জিব্রাল্টার) দখলের আরও একটি চেষ্টা করেন এবং এক বছর পর্যন্ত দুর্গটি অবরোধ করে রাখেন। মুসলমানরা জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং প্রতিপক্ষের কোনো চালই সফল হতে দেননি। এই সময়ে আন্দালুস এবং ভূমধ্যসাগরীয় অনেক দেশে প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। [২] একাদশ আলফনসো নিজেও মহামারিতে মারা যান এবং তাঁর সেনাবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়। মুসলমানরা চাইলে তখন সহজেই খ্রিস্টানদের লক্ষ্যবস্তু বানাতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা চিরাচরিত মহানুভবতার পরিচয় দেন এবং মহামারি আক্রান্ত ও শত্রু রাজার জানাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পিছু ধাওয়া করেননি। আফসোস যে, কাস্টিলীয়রা এরপরও সীমান্ত সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকেনি। তবে আরাগোনের শাসক চতুর্থ পেড্রো গ্রানাডার সাথে সন্ধি করে নেন।

ইউসুফ আউয়াল (প্রথম ইউসুফ) একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি কাস্টিলীয়দের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ৭৫৫ হিজরিতে তিনি সৈন্য পরিচালনার সংকল্প করেছিলেন, এমন সময় ঈদের নামাজের সেজদারত অবস্থায় কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করে, যার ফলে এই স্বাধীনচেতা মানুষটি শহীদ হন। হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করা হলেও তার নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি, কারণ তার আচরণ ছিল পাগলের মতো। ধারণা করা হয় যে, সে ছিল খ্রিস্টানদের কোনো চর, যে তদন্তের পথ বন্ধ করার জন্য পাগলামির নাটক সাজিয়েছিল। সুলতান প্রথম ইউসুফকে কাসরুল হামরায় (আলহামরা প্রাসাদ) দাফন করা হয়। আল্লামা লিসানুদ্দিন খতিবের মতে, তাঁর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফর্সা, দাঁত অত্যন্ত উজ্জ্বল, হাত-পা খুব মজুত, দাড়ি বেশ ঘন এবং চুল ছিল অত্যন্ত কালো ও কোঁকড়ানো। [৩]

[১] সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৭০।

[২] ইতিহাসে এই প্লেগ মহামারিকে “ব্ল্যাক ডেথ” (Black Death) বলা হয়। এর প্রকোপ ৭৪৯ হিজরি থেকে ৭৫০ হিজরি (১৩৪৮-১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ছিল। এই রোগ পূর্ব ও পশ্চিমের ইসলামি দেশগুলো থেকে শুরু করে ইউরোপীয় দুনিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আন্দালুসে এর কারণে প্রচুর সংখ্যক খ্রিস্টান ও মুসলমান মৃত্যুবরণ করেন, যাদের মধ্যে প্রখ্যাত আলেম ও সাহিত্যিকরাও ছিলেন। এই মহামারিতে গবাদি পশু, পাখি এমনকি মাছও আক্রান্ত হয়েছিল। দ্রষ্টব্য: আল-সুলুক লি-মা’রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক লিল-মাকরিজি: সন ৭৪৯ হিজরি; অধিকতর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য: এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় নিবন্ধ: “Black Death”; এছাড়াও ইবনে বতুতাও এর উল্লেখ করেছেন।

[৩] আল-ইহাতা ফি আখবারি গ্রানাডা: ৩/৪৮০ থেকে ৪৯১; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৩৩২, ৩৩৩; নাফহত তিব: ৫/৮০, ৮১; আল-আ’লাম লিয়-ঘিরিকলি: ৮/২১৪; আত-তারিখুল আন্দালুসি লি-আবদুর রহমান আলি: পৃষ্ঠা ৫৩৩ থেকে ৫৩৯, ৫৪৮।

(৮) মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, পঞ্চম মুহাম্মদ, গনি বিল্লাহ

(৭৫৫ হি. থেকে ৭৬০ হি. (১৩৫৩ খ্রি. থেকে ১৩৫৯ খ্রি.))

সুলতান প্রথম ইউসুফ তাঁর উম্মে ওয়ালাদ মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র ইসমাইলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং তাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। তবে সুলতানের হত্যাকাণ্ডের পর আমীরগণ মা ও ছেলেকে বন্দি করে সুলতানের বড় ছেলে মুহাম্মদের হাতে বায়াত গ্রহণ করেন [১]।

২১ বছর বয়সী মুহাম্মদ (বিন ইউসুফ বিন ফারাজ) ১লা শাওয়াল ৭৫৫ হিজরি (২১ অক্টোবর ১৩৫৪ খ্রি.) ‘গনি বিল্লাহ’ উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পঞ্চম মুহাম্মদ নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, মহৎ, বুদ্ধিমান, ধৈর্যশীল, দয়ালু এবং নেক কাজের প্রতি অনুরাগী। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন যাকে সাধারণ ও বিশিষ্ট সবাই পছন্দ করত। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি তাঁর পিতার হাজিব রিজওয়ানের ওপর বেশি ন্যস্ত করেছিলেন, আর উজিরের দায়িত্ব আল্লামা লিসানুদ্দিন খতিবকে অর্পণ করেছিলেন [২]। এভাবে দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বেশ ভালোভাবে চলতে থাকে।

এই সময়ে খ্রিস্টানদের দুই রাজ্য ক্যাস্টিল এবং আরাগনের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, তাই মুসলমানদের সীমান্ত নিরাপদ ছিল। গনি বিল্লাহ এই সুযোগে একটি রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন যে, তিনি আরাগন রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্যাস্টিলের শাসক প্রথম পিটার (Peter the Cruel)-এর সাথে চুক্তি করেন [৩]। এতে প্রথম পিটারের অবস্থান শক্তিশালী হয়।

গনি বিল্লাহ বনু মারিনদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ৭৫৫ হিজরিতে সালতানাতের উজির আল্লামা লিসানুদ্দিন খতিবকে মরক্কোর সুলতান আবু সালিম বিন আবুল হাসান মারিনির কাছে পাঠান, যেখানে তাঁকে অত্যন্ত সম্মান জানানো হয় [৪]।

তবে গনি বিল্লাহর জন্য বিপদ অপেক্ষা করছিল। তাঁর পিতা প্রথম ইউসুফ রাজপরিবারে ছেলের অভাবের কারণে বাধ্য হয়ে নিজের মেয়েকে রাজপরিবারের এক দুশ্চরিত্র শাহজাদা মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (বিন মুহাম্মদ বিন ফারাজ)-এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, যাকে রইস আবু আবদুল্লাহ বলা হতো। তার ফিতনা সৃষ্টিকারী স্বভাবের কারণে কাসরুল হামরায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। অন্যদিকে শাহজাদা ইসমাইল এবং তার মা মরিয়ম বন্দি ছিলেন। মরিয়ম সুলতানের হত্যাকাণ্ডের পর প্রচুর ধন-সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। তিনি আবু আবদুল্লাহর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের মুক্ত করার বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রস্তাব দেন। ফলে আবু আবদুল্লাহ বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন [৫]।

২৮ রমজান ৭৬০ হিজরি (২৩ আগস্ট ১৩৫৯ খ্রি.) রাতে তিনি একটি দল নিয়ে কাসরুল হামরায় প্রবেশ করেন, যেখানে গোলাম এবং প্রহরীরা আগেই তার সাথে যোগ দিয়েছিল। প্রাসাদের ওপর দখল কয়েম করে তিনি হাজিব রিজওয়ানকে হত্যা করেন এবং ইসমাইলকে মুক্ত করেন।

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৩০৫, দারুল ফিকর।

[২] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ২/৩৩, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ; আমালুল আলাম লিসানুদ্দিন আল-খতিব: ২/২৬৭, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ।

[৩] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ২/৩; গারনাতা ফি জিল্ল বানি আল-আহমার ড. ইউসুফ শুকরি: পৃষ্ঠা ৭৩, দারুল জিল বৈরুত।

[৪] আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মিয়াহ আস-সামিনাহ ইবনে হাজার আসকালানি: ৫/১২৬, ১২৭, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য; আমালুল আলাম: ২/২৬৭।

[৫] আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ১/৪১৩, ৪১৫, ৪১৬, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ; তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/৩২৩।

...করে তখতে বসিয়ে দিল। গনি বিল্লাহ তখন কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি প্রতিরোধ করা নিরর্থক মনে করলেন এবং ওয়াদি আশ চলে গেলেন। সেখানে তিনি মরক্কোর সুলতান আবু সালিমের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলেন এবং ১১ জিলহজ ৭৬০ হিজরিতে ওয়াদি আশ থেকে রওনা হয়ে ২৪ জিলহজ মরক্কোর উপকূলীয় শহর সবতায় পৌঁছে গেলেন। তার চলে যাওয়ার ফলে নতুন শাসক ইসমাইল বিন ইউসুফের জন্য পথ একদম পরিষ্কার হয়ে গেল। [১]

৯. ইসমাইল বিন ইউসুফ, ইসমাইল সানি

(৭৬০ হিজরি থেকে ৭৬১ হিজরি / ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ)

ইসমাইল বিন ইউসুফ ৭৪০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অনভিজ্ঞ এবং আরামপ্রিয়। তার সহচররা ছিল তার চেয়েও বেশি অযোগ্য বন্ধু। তাকে সিংহাসনে বসানো আবু আবদুল্লাহ একদিকে রানী মরিয়মের প্রতি আনুগত্যের ভান করতেন এবং অন্যদিকে রাজার সামনে একজন সাধারণ ভৃত্যের মতো বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কিন্তু সেই সাথে তিনি গোপন ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকতেন। তার চেষ্টা ছিল তরুণ রাজাকে যতটা সম্ভব ভোগবিলাসে মগ্ন রাখা যাতে দরবারী এবং সাধারণ মানুষ তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। তিনি মানুষের সামনে রাজার মন্দ কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতেন এবং নিজেকে এ ব্যাপারে নির্দোষ জাহির করতেন। সেই সাথে তিনি রাজকোষ থেকে মানুষের ওপর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন যাতে মানুষ তার ওপর আস্থা রাখে এবং রাজার পরিবর্তে তার চারপাশে সমবেত হয়। আবু আবদুল্লাহর ষড়যন্ত্র সফল হলো এবং মানুষ দিন দিন শাসকের প্রতি বিরক্ত হতে লাগল। অবশেষে আবু আবদুল্লাহ তাকে হত্যা করালেন। এটি ২৭ শাবান ৭৬১ হিজরি (২৪ জুলাই ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ)-এর ঘটনা। [২]

১০. আবু আবদুল্লাহ, আবু সাঈদ, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বিন ফারাজ, মুহাম্মদ ষষ্ঠ

(৭৬১ হিজরি থেকে ৭৬৩ হিজরি / ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ)

আবু আবদুল্লাহ আল-নাসর পরিবারের একজন রাজপুত্র ছিলেন। তার নাম ছিল মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (বিন ফারাজ বিন ইসমাইল)। তিনি ৭৩২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইসমাইল বিন ইউসুফকে হত্যা করার পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মানুষ পূর্ববর্তী শাসকদের প্রতি এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, তার সিংহাসন আরোহণের সময় কোনো আমির বিরোধিতা করেননি এবং সবাই বিনা দ্বিধায় আনুগত্যের শপথ (বায়াত) গ্রহণ করেন। আবু আবদুল্লাহ ষষ্ঠ-কে মুহাম্মদ ষষ্ঠ-ও বলা হয়। তিনি ছিলেন একজন ধূর্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং মন্দ স্বভাবের মানুষ। মানুষ তার খারাপ অভ্যাসের...

[১] আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা: ১/১২০, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ।

[২] আল-ইহাতা ফি আখবারি গারনাতা: ১/২১৩ থেকে ২১৭, ৩০৪, তাবা দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ; আমালুল আলাম আয লিসানুদ্দিন আল-খতিব: ২/২৬৬, তাবা আল-ইলমিয়াহ; আল-আলাম লিয-যিরিকলি: ১/৩২৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৩/১২১; গারনাতা ফি জিল্লি বানি আহমার: পৃষ্ঠা ৩৮ সাথে হাশিয়া এবং আপনি যদি এই ঘটনাগুলোর আরও বিস্তারিত বিবরণ চান, তবে দেখুন: প্রবন্ধ “আস-সিরাউ বাইনা ইউসুফ আল-আউয়াল ওয়া আস-সাওরাতু ফি ইত্তিহাফি মামলিকাতি গারনাতা” ডক্টর নুরা বিনতে মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আল-তুওয়াইজিরি, যা জামিয়া উম্মুল কুরা-র ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে, দশম বর্ষ, ১৫তম সংখ্যা, ১৪৩১ হিজরি।

...উপেক্ষা করে ভালো প্রত্যাশা নিয়ে তার বাইয়াত গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের স্বপ্ন তখন চুরমার হয়ে গেল যখন তারা দেখল যে, নতুন শাসক সালতানাতের অশুভাকাঙ্ক্ষী ও দুষ্ট লোকদের নিজের চারপাশে সমবেত করে তাদের বড় বড় পদে ভূষিত করে চলেছেন। মোদাকথা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেল এবং জনগণের অসন্তোষ দিন দিন বাড়তে থাকল। [১]

পূর্ববর্তী শাসক গনি বিল্লাহ রাজনৈতিক প্রয়োজনে কাস্টিলকে কর প্রদান করতে সম্মত হয়েছিলেন, কিন্তু আবু আবদুল্লাহ ক্ষমতায় এসেই এই চুক্তি ভেঙে ফেললেন। এর ফলে কাস্টিলের রাজা প্রথম পিটার ভয় দেখানোর জন্য একটি বাহিনী পাঠালেন, যা পরাজিত হলো। [২] সেই সময় তিনি আরাগন রাজ্যের সাথে সংঘর্ষের কারণে অত্যন্ত সংকটে ছিলেন, তাই তিনি আবু আবদুল্লাহর কাছে শান্তি চুক্তির প্রস্তাব দিলেন। আবু আবদুল্লাহ সন্ধির বিনিময়ে কাস্টিলের রাজার ওপর অত্যন্ত অপমানজনক শর্তারোপ করলেন, যা তিনি সময়ের প্রয়োজনে আপাতদৃষ্টিতে মেনে নিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি চরম ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। [৩] তিনি আরাগন রাজ্যের কারণে আগে থেকেই অতিষ্ঠ ছিলেন। এখন গ্রানাডার কাছে পরাজয় আরও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এমন পরিস্থিতিতে শান্তিপ্রিয় শাসক গনি বিল্লাহর প্রত্যাবর্তনও একটি অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়াল। [৪]

এদিকে মরক্কোর শাসকও কাস্টিলের রাজার সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাকে গনি বিল্লাহর সাথে ঐক্য ও সহযোগিতার পরামর্শ দিলেন, যা কাস্টিলের রাজা গ্রহণ করে নিলেন। [৫] পরিবেশ অনুকূল দেখে গনি বিল্লাহ মরক্কো থেকে বের হলেন এবং একটি নৌবহরে করে আন্দালুসের উপকূলে পৌঁছে গেলেন। যখন আবু আবদুল্লাহ খবর পেলেন যে, মানুষ সব দিক থেকে সমবেত হয়ে গনি বিল্লাহর বাইয়াত গ্রহণ করছে, তখন তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। এই অবস্থায় তিনি কোষাগারের মুখ খুলে দিলেন এবং মানুষকে নিজের চারপাশে সমবেত করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এই কৌশলও ব্যর্থ হলো।

অবশেষে তিনি চারদিকে মৃত্যু দেখতে পেলেন। তিনি কোষাগার থেকে যা কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল তা সংগ্রহ করলেন এবং তার তিনশ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও খাদেমসহ ৭ জমাদিউল আখিরা ৭৬৩ হিজরি রাতে অন্ধকারের মধ্যে গ্রানাডা থেকে বের হয়ে কাস্টিলের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ঘাবড়ে গিয়ে তার সমস্ত চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং তিনি কাস্টিলে প্রবেশের আগে জান ও মালের নিরাপত্তা চাইতেও ভুলে গেলেন। তার মনেই রইল না যে কাস্টিলের রাজা তার ওপর কতটা অসন্তুষ্ট। এই বোকামির পরিণাম এই হলো যে, যখন তিনি প্রথম পিটারের কাছে সেভিলে পৌঁছালেন এবং আশ্রয় প্রার্থনা করলেন, তখন তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন এবং তার ক্ষোভ এভাবে মেটালেন যে, তার নাক-কান কাটিয়ে তাকে নিজ হাতে হত্যা করলেন। এরপর তার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা ও খাদেমদেরও হত্যা করা হলো এবং তাদের সমস্ত আসবাবপত্র ও ধন-সম্পদ দখল করে নেওয়া হলো। এই ঘটনাটি ২ রজব ৭৬৩ হিজরি (৯ মে ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দ) এর। [৬]

[১] আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ২/ ১১, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[২] তারীখ-ই-ইবনে খালদুন: ৪/ ৩৩৩

[৩] আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ১/ ৩০২, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

[৪] তারীখ-ই-ইবনে খালদুন: ৪/ ৩৩৩

[৫] আমালুল আলাম ফিমান বুয়্যা কাবলাল ইসলাম: ২/ ২২৭

[৬] আল-ইহাতা ফি আখবার-ই-গারনাতা: ১/ ৩০২, ৩০৩, ত. দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, গনি বিল্লাহ, মুহাম্মদ পঞ্চম (পুনরায়)

(৭৬৩ হিজরি থেকে ৭৯৩ হিজরি / ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান মুহাম্মদ পঞ্চম গনি বিল্লাহ সালতানাতের আমিরদের সমর্থনে ২০ জুমাদাল আখিরা ৭৬৩ হিজরি (২৮ এপ্রিল ১৩৬২ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে পুনরায় গ্রানাডার শাসক হন। মুহাম্মদ পঞ্চম তাঁর শাসনের এই দ্বিতীয় মেয়াদে ত্রিশ বছর দেশ ও জাতির সেবা করেন। তিনি ঈমানি জজবা, জিহাদের চেতনা, দৃঢ়তা, বীরত্ব, দয়া ও মেহেরবানির গুণে গুণাবিত ছিলেন। তিনি মজলিস ও ওয়াজে অংশগ্রহণ করতেন এবং অঝোরে কাঁদতেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে পূর্ণ ইনসাফ করতেন। জুলুমকারী পুলিশ অফিসারদের কঠোর শাস্তি দিতেন। বন্দিদের সাথে ভালো ব্যবহারের তাকিদ দিতেন। ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। জিহাদের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল। তিনি জায়গায় জায়গায় মাদ্রাসা ও খানকাহর প্রসার ঘটান। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এমন একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন যার উদাহরণ পুরো ইসলামি বিশ্বে ছিল না। তিনি গ্রানাডার নৌবহরকে একটি শক্তিশালী শক্তিতে রূপান্তরিত করেন। তিনি বাণিজ্য, কৃষি, সেচ এবং কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

শান্তিকামী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সীমানা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতেন এবং এই সময়ে তাঁর মধ্যে জিহাদের চেতনা ভরপুর ছিল। শাবান ৭৭২ হিজরিতে গ্রানাডার বাহিনী রন্ডার মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জয় করে নিজেদের শক্তির মহড়া দেখায়। পূর্ববর্তী শাসকরা গ্রানাডাকে খ্রিস্টানদের করদ রাজ্যে পরিণত করেছিল। মুহাম্মদ পঞ্চম কাস্টিলের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের সুযোগ নেন এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা দূর করার পর ৭৭২ হিজরিতে কাস্টিলকে কর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজের দেশকে এতটাই শক্তিশালী করেছিলেন যে, সংকটগ্রস্ত কাস্টিল পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কিছুই করতে পারেনি। এভাবে গ্রানাডা পতনের শিকার হওয়ার পরিবর্তে পুনরায় সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হয়। [১]

গনি বিল্লাহর যুগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন কিছুকাল গ্রানাডার দরবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। ৭৬৫ হিজরিতে তিনি গ্রানাডার দূত হিসেবে কাস্টিলের শাসক প্রথম পিটারের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেভিলে গিয়েছিলেন। [২] গনি বিল্লাহ গ্রানাডাকে শক্তিশালী ও সুসংহত রাখার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করেন এবং এতে সফল হন। তাঁর উত্তরসূরিদের মধ্যে তাঁর মতো আর কেউ ছিল না। গনি বিল্লাহ মুহাম্মদ পঞ্চম দীর্ঘ ত্রিশ বছর শাসনের পর ১০ সফর ৭৯৩ হিজরি (২৯ জানুয়ারি ১৩৯১ খ্রিষ্টাব্দ) তারিখে ইন্তেকাল করেন। [৩]

আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিব:

গনি বিল্লাহর দরবার গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা সুশোভিত ছিল, তাঁদের মধ্যে আল্লামা লিসানুদ্দিন ইবনুল খতিবও ছিলেন। তিনি...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন: ৪/২২৫; আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা: ২/৩ থেকে ২৩, মাতবা আল-ইলমিয়াহ আদ-দাওলা আল-ইসলামিয়াহ ফিল আন্দালুস: ৫/১৩৭, ১৩৮; আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৭/১৫২, ১৫৩।

[২] আত-তারিফ বি-ইবনে খালদুন: পৃষ্ঠা ৮৩; আদ-দাওলা আল-ইসলামিয়াহ ফিল আন্দালুস: ৫/১৩৭।

[৩] গারনাতা ফি জিল্ল বানি আল-আহমার: পৃষ্ঠা ৩১।

৭৩৯ হিজরিতে তিনি ইউসুফ আউয়ালের উজির নিযুক্ত হন। গনি বিল্লাহর যুগেও তিনি দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আন্দালুসের সেই প্রখ্যাত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের জ্ঞান থেকে আজও বিশ্ব উপকৃত হচ্ছে। ইতিহাস ও সাহিত্যেও তাঁর ব্যাপক দক্ষতা ছিল। তাঁর রচনার সংখ্যা ৬০-এরও বেশি। আন্দালুস ও মাগরিবের অবস্থার ওপর তাঁর রচিত “আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা” থেকে অধিক পূর্ণাঙ্গ কোনো কিতাব দেখা যায়নি। ইসলামী আন্দালুসের শেষ শতাব্দীগুলোর অবস্থা সম্পর্কে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আন্দালুসের কবিদের সম্পর্কে তাঁর রচিত “আল-কাতিবাতুল কামিনা ফি মান লাকাইনাহ্ বিল আন্দালুস মিন শুয়ারাউল মিয়াতুস সামিনা”-ও আপন মহিমায় অনন্য। “রায়হানাতুল কিতাব” কেবল এই যুগের সরকারি চিঠিপত্র ও নথিপত্রের সংকলনই নয়, বরং এতে আন্দালুসের নামকরা শাসক, উজির ও আমিরদের অবস্থাও বর্ণিত হয়েছে। “মেয়ারুল ইখতিয়ার” আন্দালুসের ভূগোলের ওপর একটি শ্রেষ্ঠ কর্ম। “নুফাযাতুল জিরাব”-এ তিনি নিজের যুগের অবস্থা অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সকল রচনা সাহিত্যিক দিক থেকেও অত্যন্ত উচ্চমানের।

আন্দালুসে তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তির অভাব ছিল না, তাদের মধ্যে তাঁর নিজের এক ছাত্র ইবনে যুমরাক অগ্রগণ্য ছিল এবং সে দরবারে তাঁর স্থান দখল করতে চাইত। আল্লামা ইবনে খতিব রহ. এই পরিবেশ থেকে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে বনু মারিনের আমন্ত্রণে ৭৭৩ হিজরিতে মরক্কো চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইবনে যুমরাক তাঁকে আরও বেশি কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে, এমনকি একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মরক্কোর আমিরকে বিশ্বাস করায় যে ইবনে খতিব যিনদিক এবং ধর্মহীন। ফলে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৭৭৬ হিজরিতে মরক্কোর পুলিশ প্রধান একটি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেন [১]।

শত আফসোস যে নিজের যুগের এত বড় একজন আলেমের সাথে এমন জঘন্য আচরণ করা হলো। যখন কোনো সমাজে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের সাথে এমন আচরণ করা হয়, তখন সেখানে যোগ্যতার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।

এই যুগের অমুসলিম শাসকরাও আল্লামা ইবনে খতিব রহ.-এর যোগ্যতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। একবার গ্রানাডায় কোনো এক ফিরিজি শাসকের দূত এল। মূল বিষয়ে আলোচনার পর গ্রানাডার শাসক আল্লামা ইবনে খতিব রহ.-এর লেখা একটি পত্র বের করে দূতকে দেখালেন যা সাবলীলতা ও বাগ্মিতায় অতুলনীয় ছিল। ফিরিজি শাসক বললেন: “এমন মানুষও কি এই যোগ্য যে তাকে হত্যা করা হবে?” [২] এ কথা বলে সেই ফিরিজি শাসক (আবেগে) তাঁর পোশাক সিন্ত করে ফেললেন।

আল্লামা ইবনে খতিব রহ.-এর সাথে শত্রুতা পোষণকারী ইবনে যুমরাকও নিজের কৃতকর্মের ফল দ্রুতই পেয়ে যান। তিনি উচ্চপদ ও মর্যাদার চরম শিখরে পৌঁছে লাঞ্ছিত হন। প্রথমে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় এবং পরে ৭৯৫ হিজরিতে পরিবার-পরিজনসহ তাঁকে হত্যা করা হয় [৩]।

[১] ইনবাউল গুমর বি আবনাউল উমর লি ইবনে হাজার আসকালানি: ১/৯১ থেকে ৯৩, ত: লজনাতে এহইয়াউত তুরাসিল ইসলামি; আল-আলাম লিয যিরিকলি: ৬/২৩৫।

[২] ইনবাউল গুমর বি আবনাউল উমর লি ইবনে হাজার আসকালানি: ১/৯৩, ত: লজনাতে এহইয়াউত তুরাসিল ইসলামি মিসর।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১১৫০; আল-আলাম লিয যিরিকলি: ৭/১৫৩।

বনুনসরের পতনের যুগ

গনি বিল্লাহ মুহাম্মদ পঞ্চমের পর থানাডায় বনুনসরের শাসন আরও এক শতাব্দী স্থায়ী ছিল, তবে এটি ছিল তাদের পতনের যুগ। এই সময়ে কোনো শাসকই স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারেননি। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার রদবদল আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এক শতাব্দীতে সতেরো বার শাসন পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো শাসক দুই বা তিনবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পতনের যুগের এই শাসকদের বর্ণনা পেশ করা হলো।

(১১) ইউসুফ দ্বিতীয়, আবুল হাজ্জাজ

৭৯৩ হিজরির শুরু থেকে ৭৯৫ হিজরির শুরু পর্যন্ত (১৩৯১ খ্রি. থেকে ১৩৯৩ খ্রি.)

মুহাম্মদ পঞ্চম গনি বিল্লাহর পর তার পুত্র আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ দ্বিতীয় শাসক হন। তার শাসনামলে তার পিতার মুক্ত করা গোলাম খালিদ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর ওপর প্রভাবশালী ছিল। সে ইউসুফের তিন ভাই: সাদ, মুহাম্মদ এবং নসরকে, যারা কারাগারে ছিল, হত্যা করিয়ে দেয় এবং এরপর ইউসুফকে বিষ প্রয়োগ করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ইউসুফ বিষয়টি টের পেয়ে যান এবং খালিদকে কাবু করে তাকে হত্যা করিয়ে দেন।

সেই সময়ে কাস্টিল এবং থানাডা উভয়ের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ভালো ছিল না। ইউসুফ দ্বিতীয় কাস্টিলের রাজা তৃতীয় হেনরির সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেন এবং পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলোতে বন্দী হওয়া খ্রিস্টান অফিসার ও সৈন্যদের সসম্মানে কাস্টিলে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এভাবে কিছু সময়ের জন্য সবদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই সন্ধি ভেঙে যায় এবং মুসলমানরা খ্রিস্টানদের এলাকা মুরসিয়া ও লোরকায় আক্রমণ করে। জবাবে খ্রিস্টানদের একটি বাহিনী থানাডার চারণভূমিতে ঢুকে পড়ে, তবে মুসলমানরা তাদের তাড়িয়ে দেয়। এরপর উভয় পক্ষ পুনরায় যুদ্ধবিরতি করে।

ইউসুফ দ্বিতীয় দুই বছর কয়েক মাস শাসনের পর ৭৯৫ হিজরিতে অসুস্থতার কারণে ইন্তেকাল করেন। [১]

(১২) মুহাম্মদ সপ্তম, আবু আবদুল্লাহ মুস্তাইন বিল্লাহ

৭৯৫ হিজরি থেকে ৮১১ হিজরি (১৩৯৩ খ্রি. থেকে ১৪০৮ খ্রি.)

ইউসুফ দ্বিতীয় মৃত্যুর পূর্বে তার বড় ছেলে ইউসুফ তৃতীয়কে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু ছোট ছেলে মুহাম্মদ, যে একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল, এটি সহ্য করতে পারেনি এবং বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। যদিও সে সফল হতে পারেনি, তবে পিতার মৃত্যুর পর সে তার ক্ষিপ্ততা এবং...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫০।

বুদ্ধিমত্তার সাথে ইউসুফ তৃতীয়কে পথ থেকে সরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং নিজে সিংহাসনে আরোহণ করলেন এবং সপ্তম মুহাম্মদ নামে পরিচিত হলেন এবং মুস্তায়ীন বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করে মসনদে আসীন হলেন।

তঁার প্রাথমিক যুগে আবু আবদুল্লাহ ইবনে যামরাক তঁার উজির নিযুক্ত হন। ইনি সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি আল্লামা লিসানুদ্দিন আল-খতিব রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। উজিরের পদে আসীন হওয়ার পর তঁার কর্মদক্ষতা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং অন্যদের সাথে তঁার আচরণও ভালো ছিল না। অবশেষে সালতানাতের আমীরগণ তঁার বিরুদ্ধে চলে যান। তঁারা ৭৯৭ হিজরির শেষ দিকে ইবনে যামরাককে তঁার প্রাসাদে হত্যা করেন। তঁার উজিরের পদ মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হতে পেরেছিল।

সপ্তম মুহাম্মদের যুগে কাসতালিয়ার শাসক ছিলেন তৃতীয় হেনরি, যিনি গার্নাতা দখলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। সপ্তম মুহাম্মদ তঁার সংকল্প সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই নিজের প্রতিরক্ষা মজবুত রাখার জন্য সতর্ক থাকতেন। একই সাথে তিনি কাসতালিয়ার সাথে সন্ধির চেষ্টা করেন এবং অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু চুক্তির কিছুকাল পর খ্রিস্টানরা সীমান্ত লঙ্ঘন করে এবং গার্নাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে লুটতরাজ চালায়। সপ্তম মুহাম্মদ এর জবাবে পশ্চিম স্পেনের দিকে অভিযান চালান এবং বিশাল এলাকা তখনই করার পর আয়ামুন্সি দুর্গের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করেন এবং বিপুল পরিমাণ গনিমত ও যুদ্ধবন্দী নিয়ে ফিরে আসেন। কাসতালিয়ার সাথে এই যুদ্ধের সময় সপ্তম মুহাম্মদ অন্য খ্রিস্টান রাষ্ট্র আরগুনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং দুই শত্রুকে নিজের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে দেননি।

এই সময়ে সপ্তম মুহাম্মদ তিউনিসের বাদশাহ এবং তিলিমসানের বাদশাহর কাছে সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁদের পক্ষ থেকে নৌবহর পাঠানো হয়েছিল কিন্তু জাবালুত তারিকের কাছে তাদের পরাজয় ও পিছু হটতে হয়। এই সংঘাতের পর রবিউস সানি ৮০৯ হিজরি (অক্টোবর ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ) গার্নাতা ও কাসতালিয়ার মধ্যে পুনরায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই সময়ে বনু মারিনের পতন শুরু হয়েছিল এবং তারা অতি কষ্টে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া এই বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, বাইরের সাহায্যকারীরা আন্দালুসীয়দের সাথে একটি সীমার বেশি সহযোগিতা করতে পারবে না। অতএব, এখন আন্দালুসের মুসলমানদের নিজেদের বাহুবল, নিজেদের উপায়-উপকরণ এবং নিজেদের রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমেই আত্মরক্ষা করতে হতো।

সন্ধিপত্রের কয়েক সপ্তাহ পর কাসতালিয়ার রাজা তৃতীয় হেনরি মারা যান এবং তঁার দুগ্ধপোষ্য পুত্র দ্বিতীয় জন (ইউহান্না) তঁার উত্তরাধিকারী হন। তঁার চাচা ফার্ডিনান্ড রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করে চুক্তি ভঙ্গ করেন এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে রণক্ষেত্রকে অনেক বিস্তৃত করে দেন। তিনি আয়ামুন্সি দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন এবং আরও অগ্রসর হয়ে সাখরা দুর্গ ও জাহরা দুর্গও দখল করে নেন।

এমন পরিস্থিতিতে সপ্তম মুহাম্মদ প্রতিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর জিয়ানের ওপর আক্রমণ করেন। খ্রিস্টানদেরও সব দিক থেকে গুটিয়ে এসে জিয়ান রক্ষার জন্য আসতে হয়, কিন্তু মুসলমানরা সেখানে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে ফেলেছিলেন। বাধ্য হয়ে কাসতালিয়া সন্ধি করে এবং দুই বছরের জন্য যুদ্ধবিরতি হয়। সপ্তম মুহাম্মদ এই অভিযানের পর ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৮১১ হিজরি (১৪০৮ খ্রিস্টাব্দ) ইন্তেকাল করেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫০, ১৫১, ১৫২।

১৩ ইউসুফ সুয়ুম, আন-নাসির

(৮১১ হিজরি থেকে ৮২০ হিজরি / ১৪০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ)

মুহাম্মদ সপ্তম-এর পর তাঁর ভাই ইউসুফ সুয়ুম, যিনি দীর্ঘকাল কারাগারে ছিলেন, মুক্তি পান এবং সিংহাসনে আরোহণ করে আন-নাসির উপাধি ধারণ করেন। তিনি যুদ্ধের পরিবেশ সমাপ্ত করে দেশকে অভ্যন্তরীণভাবে মজবুত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কাস্তালিয়ার (Castile) সাথে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করেন। কাস্তালিয়ার রাজা দ্বিতীয় জন-এর চাচা ফার্দিনান্দ মুসলমানদের দুর্বল মনে করে সন্ধির বিনিময়ে বার্ষিক কর প্রদানের শর্ত আরোপ করেন। আন-নাসির কর দিতে অস্বীকার করলে কাস্তালিয়া ও গ্রানাডার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ফার্দিনান্দ বাহিনী নিয়ে মালাগার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সীমান্ত দুর্গ “আন্তিকেরা” (Antequera) ঘেরাও করেন।

মুসলমানরা দুর্গটি উদ্ধারের জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে এবং খোলা ময়দানে খ্রিস্টানদের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ লড়ে কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে ৮১৫ হিজরিতে (১৪১২ খ্রিস্টাব্দ) খ্রিস্টানরা এই দুর্গটি দখল করে নেয়। [১] এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে এই শর্তে সন্ধি হয় যে, মুসলমানরা সাম্প্রতিক যুদ্ধগুলোতে বন্দি হওয়া শত শত খ্রিস্টান সৈন্যকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেবে।

এই সন্ধির পর কয়েক বছর পর্যন্ত গ্রানাডা ও কাস্তালিয়ার মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় ছিল। উভয় পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল ও বণিকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে কাস্তালিয়ার নবাব ও আমিররা গ্রানাডার সৌন্দর্য এবং আলহামরার আকর্ষণ দেখার জন্য দলে দলে সেখানে আসতেন। তাঁদের সম্মানে শহরের বড় বড় ময়দানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ঘোড়দৌড়, নেজাবাজি (বর্শা নিক্ষেপ), তীরন্দাজি এবং তলোয়ার চালনার মতো যুদ্ধবিদ্যার প্রতিযোগিতা হতো, যা দেখার জন্য গ্রানাডার সাধারণ মানুষ ভেঙে পড়ত। সেই যুগে মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দার প্রথা কমে গিয়েছিল, তাই নারীরাও বড় সংখ্যায় খোলা মুখে এই খেলাগুলো দেখতে আসতেন। তবে খ্রিস্টানদের গ্রানাডায় অধিক হারে আসার একটি বড় ক্ষতি এই হয়েছিল যে, এই লোকেরা এখানকার রাজকীয় কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং ভবিষ্যতে প্রাসাদের ষড়যন্ত্রে নিজেদের অংশগ্রহণের পথ সুগম করে।

আন-নাসিরের শাসনামলে জাবাল আল-তারিক (জিব্রাল্টার)-এর বাসিন্দারা এই ভেবে যে বনু মারিন তাদের দেশের সুরক্ষা আরও ভালোভাবে করতে পারবে, তাদের এলাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের আমন্ত্রণে বনু মারিনের প্রধান আবু সাঈদ তাঁর ভাই আবু আবদুল্লাহকে একটি বাহিনী দিয়ে সেখানে পাঠান। তবে ইউসুফ সুয়ুম তৎক্ষণাৎ এই প্রচেষ্টা দমন করার জন্য তাঁর প্রতিনিধিকে সাহায্যকারী বাহিনীসহ পাঠান। বনু মারিন পরাজিত হয় এবং আবু আবদুল্লাহ বন্দি হন। ইউসুফ সুয়ুম তাঁকে কেবল সম্মান ও মর্যাদার সাথেই রাখেনি, বরং তাঁকে অর্থ, উজির এবং সৈন্যও দেন যাতে তিনি বনু মারিনের রাজধানী দখল করতে পারেন। আবু আবদুল্লাহ এই প্রচেষ্টায় সফল হন এবং তাঁর ভাই আবু সাঈদকে পরাজিত করে বনু মারিনের শাসনভার গ্রহণ করেন।

[১] একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এই সীমান্ত উত্তেজনা চলছিল কারণ কাস্তালিয়ার প্রকৃত শাসক জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন এবং তাঁর চাচাকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁর মায়ের পরামর্শে ইউসুফ সুয়ুমের সাথে দুই বছরের জন্য সন্ধি করেছিলেন।

ইউসুফ তৃতীয় নয় বছর রাজত্ব করেন এবং ৮২০ হিজরিতে (১৪১৭ খ্রিস্টাব্দে) ইন্তেকাল করেন। তিনি অভ্যন্তরীণভাবে দেশকে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রেখেছিলেন, তাই ঐতিহাসিকগণ তাকে প্রশংসনীয় শাসকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। [১]

(১৪) মুহাম্মদ অষ্টম, আবু আবদুল্লাহ, আল-আইসার

৮২০ হি. থেকে ৮৩১ হি. (১৪১৭ খ্রি. থেকে ১৪২৮ খ্রি.)

ইউসুফ তৃতীয়ের পর তার পুত্র মুহাম্মদ অষ্টম “আল-আইসার” উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [২] তিনি কঠোর মেজাজের এবং অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় কাজে কোনো আগ্রহ দেখাতেন না। তার বেশিরভাগ নির্ভরতা ছিল তার উজির ইউসুফ বিন সিরাজের ওপর, যিনি একজন অত্যন্ত যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। আল-আইসারের শাসনামলে সরকারি ব্যবস্থাপনা এই উজিরই পরিচালনা করতেন।

আল-আইসারের অনভিজ্ঞতার কারণে গ্রানাডায় দুর্দিন শুরু হয় এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই রাজনৈতিক সংকটকে উসকে দিতে ক্যাস্টিলের শাসকরা পুরোপুরি শরিক ছিল। কিছু আমির ও কর্মকর্তা ক্যাস্টিল সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাদের ইশারায় কাজ করতেন। ৮৩১ হিজরিতে (১৪২৮ খ্রিস্টাব্দে) ক্যাস্টিলের বাহিনী গ্রানাডাকে দুর্বল পেয়ে এর সীমান্তে ঢুকে পড়ে এবং লুটতরাজ শুরু করে। রাষ্ট্রের অনুগত আমিররা এই পরিস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ হন এবং তারা বিদ্রোহ করেন। আল-আইসার পালিয়ে তিউনিস চলে যান এবং আমিররা তার পরিবর্তে মুহাম্মদ আস-সাগীরকে সিংহাসনে বসান। আল-আইসারের শাসনকাল সাড়ে দশ বছর ছিল। [৩]

(১৫) মুহাম্মদ নবম, আল-যাগীর

৮৩১ হি. থেকে ৮৩৩ হি. (১৪২৮ খ্রি. থেকে ১৪৩০ খ্রি.)

আল-আইসারের পরিবর্তে এখন মুহাম্মদ নবমকে সিংহাসনে বসানো হয় যাকে মুহাম্মদ আস-সাগীর (আল-সাগীর) বলা হয়। তিনি একজন ভালো সৈনিক ছিলেন কিন্তু রাজনীতির বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাই রাজনৈতিক সংকট কেবল বজায় থাকেনি বরং তা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে পরবর্তী বছরগুলোতে গ্রানাডার সিংহাসন লাভের প্রতিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রথমে ক্যাস্টিলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা জরুরি মনে করতে লাগল।

এই সময়ে রাজদরবারে বনু সিরাজের আধিপত্য ছিল যারা আল-যাগীরের শাসনের বিরোধী ছিল। আল-যাগীর তাদের সুন্দরভাবে সরিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে শক্তি প্রয়োগ করে দমানোর চেষ্টা করেন। এটি দেখে এই পরিবারের সদস্যরা গ্রানাডা ছেড়ে ক্যাস্টিলের রাজা দ্বিতীয় জনের কাছে চলে যান এবং তাকে প্ররোচিত করেন যে মুহাম্মদ আল-আইসার যিনি তিউনিসে আশ্রয় নিয়ে আছেন, তাকে পুনরায় গ্রানাডার রাজা বানানো উচিত। ক্যাস্টিলের রাজা এতে রাজি হয়ে যান। ফলে ইবনে সিরাজ মুহাম্মদ আল-আইসারকে দাওয়াত দেন যেন তিনি ফিরে আসেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫৩, ১৫৪।

[২] কিছু ঐতিহাসিকের মতে তিনি ‘মুতামাসসিক’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫৪, ১৫৫।

...এসে নিজের সিংহাসন পুনরায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে।

মুহাম্মদ আল-আইসার খুব খুশি হলেন। তিনি তিউনিসের আমির আবু ফারেসকেও নিজের পক্ষে নিয়ে নিলেন এবং তার কাছ থেকে সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে আন্দালুসের বন্দর আলমেরিয়াতে অবতরণ করলেন। আল-জুগাইর যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি আল-আইসারের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন, কিন্তু সৈন্যদের অধিকাংশ আল-জুগাইরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল-আইসারের সাথে যোগ দিল। আল-জুগাইরের অনুগতদের পরাজয় হলো এবং ৮৩৩ হিজরিতে মুহাম্মদ অষ্টম গ্রানাডায় পৌঁছে আল-জুগাইরকে হত্যা করলেন। তার শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর কয়েক মাস।

মুহাম্মদ অষ্টম, আল-আইসার - পুনরায়

(৮৩৩ হিজরি থেকে ৮৩৫ হিজরি / ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ)

মুহাম্মদ আল-আইসার যখন পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করলেন, তখন তার চেষ্টা ছিল তিনি যেন স্বাধীন শাসক হিসেবে থাকেন। কিন্তু কাসতালিয়ার সাথে যুদ্ধের উপক্রম হলে তিনি তাকে সিংহাসনে বসানোর পর কাসতালিয়ার রাজা দ্বিতীয় জন দাবি করলেন যে, তাকে সিংহাসনে বসানোর জন্য যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা পরিশোধ করতে হবে। গ্রানাডায় যত খ্রিস্টান বন্দি আছে তাদের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাদের সবার চেয়ে বড় কথা হলো গ্রানাডাকে একটি করদ রাজ্যে পরিণত হতে হবে, যার জন্য তাকে বার্ষিক মোটা অংকের কর প্রদান করতে হবে, অন্যথায় তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

আল-আইসার দেখেছিলেন যে, কাসতালিয়া সেই সময় অভ্যন্তরীণভাবে রাজনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তাই তিনি কর দিতে রাজি হলেন না। কাসতালিয়াও সেই সময় সৈন্য পাঠানোর অবস্থায় ছিল না। কিন্তু কিছু সময় পর কাসতালিয়া রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্ত হলো, যার পরপরই রাজা দ্বিতীয় জন গ্রানাডার ওপর একটি বড় আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। এর আগে তিনি তিউনিসের শাসক আবু ফারেস এবং মরক্কোর শাসক আব্দুল হক বিন উসমান মারিনির কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, তারা যেন গ্রানাডা ও কাসতালিয়ার দ্বন্দ্ব হস্তক্ষেপ না করেন। উভয় শাসকই তা মেনে নিলেন।

এখন কাসতালিয়া ও গ্রানাডার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো, যাতে কখনো মুসলমানরা বিজয়ী হতো আবার কখনো খ্রিস্টানরা। যুদ্ধ চলছিলই যে, বনু নাসরের এক বয়োবৃদ্ধ শাহজাদা ইউসুফ ইবনুল আহমার সুযোগ বুঝে আলমেরিয়াতে বিদ্রোহ করে বসলেন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ বিন গনি বিল্লাহর নাতি ছিলেন। তিনি কাসতালিয়ার রাজার কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, যদি তাকে গ্রানাডার শাসক হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়, তবে তিনি সমস্ত খ্রিস্টান বন্দিদের মুক্তি দেবেন, কাসতালিয়াকে বার্ষিক আট হাজার দিনার কর প্রদান করবেন এবং কাসতালিয়া কোনো মুসলিম বা খ্রিস্টান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলে তিনি দেড় হাজার সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। কাসতালিয়ার রাজা আর কী চাইতেন! তিনি এর জবাবে তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তার আনুগত্যের বিনিময়ে গ্রানাডার শাসনভার ভবিষ্যতে সর্বদা তার পরিবারের হাতেই রাখা হবে। পরিশেষে ৫ মহররম ৮৩৫ হিজরি (১২ সেপ্টেম্বর ১৪৩১ খ্রিস্টাব্দ) কাসতালিয়ার রাজা ও ইউসুফ ইবনুল আহমারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

এখন ইউসুফ ইবনুল আহমার মুহাম্মদ অষ্টমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাসতালিয়ার রাজা তাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করলেন। আল-আইসার...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫৩ থেকে ১৫৬।

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, ফলে আলমেরিয়া ও গ্রানাডার মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করে। এই লড়াইগুলোতে কোনো ফলাফল আসেনি বরং হাজার হাজার মুসলমান অকারণে নিহত হয়। কাস্টিলের রাজা আরামের সাথে এই তামাশা দেখছিলেন। অবশেষে তিনি কর্ডোভায় দরবার করে ইউসুফ ইবনুল আহমারকে গ্রানাডা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন এবং তারপর তাকে সৈন্য দিয়ে গ্রানাডার দিকে পাঠিয়ে দেন। ৮৩৫ হিজরিতে গ্রানাডার সরকারি বাহিনী এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয় যাতে বিদ্রোহীরা জয়ী হয়। আল-আইসার প্রায় দুই বছর শাসন করার পর গ্রানাডার সমস্ত রাজকোষ নিয়ে মালাগাতে চলে যান। ১৫ রবিউল আখির ৮৩৫ হিজরি (১ জানুয়ারি ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ) ইউসুফ ইবনুল আহমার আলহামরায় প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। [১]

(১৬) ইউসুফ চতুর্থ, ইবনুল আহমার

(রবিউল আখির থেকে শাওয়াল ৮৩৫ হিজরি / জানুয়ারি থেকে জুলাই ১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

ইউসুফ ইবনুল আহমার গ্রানাডার সিংহাসনে আসীন হন এবং ইউসুফ চতুর্থ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হন। তিনি কাস্টিলের রাজাকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও অসুস্থ। মাত্র ছয় মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

মুহাম্মদ অষ্টম, আল-আইসার - তৃতীয় বার

(৮৩৫ থেকে ৮৪৬ হিজরি / ১৪৩২ থেকে ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)

আল-আইসার তখন মালাগাতে শাসন করছিলেন। ইউসুফ ইবনুল আহমারের মৃত্যুর পরপরই গ্রানাডার আমিরগণ মুহাম্মদ আল-আইসারকে পুনরায় নিজেদের শাসক বানানোর ব্যাপারে একমত হন। ফলে আল-আইসার তৃতীয়বারের মতো গ্রানাডায় এসে রাজমুকুট ও সিংহাসন গ্রহণ করেন। এখন তিনি বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন এবং কাস্টিলের ষড়যন্ত্রগুলোও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই গ্রানাডার স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে তিনি কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাস্টিলের সাথে নতুন করে একটি শান্তি চুক্তি করেন। কাস্টিল এই নতুন চুক্তিটি করেছিল সুযোগ পাওয়ার জন্য। ফলে গ্রানাডাবাসীকে অসতর্ক মনে করে কয়েক দিন পরই খ্রিস্টান বাহিনী গ্রানাডার পূর্ব সীমান্তে প্রবেশ করে। গ্রানাডার মুসলমানরা তাদের উজির ইবনে আব্দুল বার বিন সিরাজের নেতৃত্বে তাদের মোকাবিলা করে এবং তাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। “আরশদুনা” শহরের কাছে দ্বিতীয় একটি যুদ্ধ হয়। এখানে মুসলমানরা বিজয়ী হয় এবং খ্রিস্টানরা বিপুল সংখ্যায় নিহত ও বন্দী হয়। এভাবে গ্রানাডার মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো ৮৩৮ হিজরির (১৪৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) ঘটনা। ৮৩৯ হিজরিতে (১৪৩৫ খ্রিষ্টাব্দ) আল-আইসার নিজে সৈন্য নিয়ে গ্রানাডা থেকে বের হন এবং গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী এলাকা ও আশ উপত্যকা থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করেন। কয়েক দিন পর খ্রিস্টানরা আরও বেশি প্রস্তুতি নিয়ে গ্রানাডা ও আশ উপত্যকার আশেপাশে লুটতরাজ চালায় এবং কিছু দুর্গের ওপর দখলদারিত্ব কায়েম করে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৫৭ থেকে ১৬০

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৬০, ১৬১

৮৪০ হিজরি (১৪৩৬ খ্রিষ্টাব্দ)-এ খ্রিস্টানদের একটি বড় বাহিনী জাবাল আল-তারিক দখলের জন্য পৌঁছে গেল। এটি জয় করা তাদের পুরনো আকাঙ্ক্ষা ছিল কারণ এর হাতছাড়া হওয়ার ফলে আন্দালুসের মুসলমানদের বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তবে মুসলমানদের কমান্ডার ইবনে সিরাজের নেতৃত্বে আক্রমণকারীদের জোরালো মোকাবিলা করলেন এবং তাদের পরাজিত করলেন। তবে এই যুদ্ধে কমান্ডার ইবনে সিরাজ শহীদ হয়ে গেলেন যা গ্রানাডার মুসলমানদের জন্য অনেক বড় আঘাত ছিল। মোটকথা এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে কাস্টিল রাজ্য ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পর যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলো।

আল-আইসার কিছু সময় পর খ্রিস্টানদের হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মিশরের সুলতানের কাছে একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন যাতে তাকে আন্দালুসের মুসলমানদের দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করে পূর্ণ সামরিক সাহায্য লাভ করা যায়। আন্দালুসের সুলতানদের পক্ষ থেকে মিশরের কাছে সাহায্য চাওয়ার এটিই ছিল প্রথম সুযোগ। এর আগে আন্দালুসের শাসকরা সবসময় উত্তর আফ্রিকার সুলতানদের কাছে সাহায্য চাইতেন। কিন্তু উত্তর আফ্রিকার হাফসিয়া রাজবংশ যারা এক সময় আন্দালুসের মুসলমানদের সাহায্য করত, তারা নিজেরা পতন ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, তাই আল-আইসার মিশর থেকে সাহায্য চাইলেন। এই প্রতিনিধি দল রজব ৮৪৩ হিজরিতে মিশরে পৌঁছাল। সেই সময় মিশরে মামলুক বাদশাহ আল-মালিকুজ জাহির জাকমাক-এর শাসন ছিল যিনি একজন নেক সীরাত ও শক্তিশালী সুলতান ছিলেন [১]। কিন্তু তিনি দীর্ঘ দূরত্বের কারণে সামরিক সাহায্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন, তবে আর্থিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যাই হোক সামগ্রিকভাবে এই প্রতিনিধি দল নিষ্ফল রইল।

আল-আইসার খ্রিস্টানদের মোকাবিলায় যতটা মজবুত প্রমাণিত হয়েছিলেন, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তিনি ততটাই দুর্বল হয়ে পড়লেন। এই সময় গ্রানাডা রাজ্যের আমিররা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন: প্রথম দল আল-আইসারের সমর্থক এবং খ্রিস্টানদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। দ্বিতীয় দল আল-আইসারের চাচাতো ভাই ইউসুফ বিন আহমদের সমর্থক ছিল যারা কাস্টিল রাজ্যের সাথে বন্ধুত্বের প্রবক্তা ছিল। এই ইউসুফ বিন আহমদকে মাগরিবি উৎসগুলোতে সাধারণত ইবনে ইসমাইল বলা হয় কারণ তার বংশধারা সুলতান আবুল ওয়ালিদ ইসমাইলের সাথে মিলিত হয়। এছাড়া তাকে সাদ বিন ইসমাইলও বলা হয়। তার দল কাস্টিলের সাথে সুসম্পর্কের মধ্যেই মুক্তি মনে করত।

তৃতীয় দল “আল-মারিয়া” এর আমির শাহজাদা মুহাম্মদ আহনাফ (মুহাম্মদ বিন নাসর বিন গনি বিল্লাহ)-এর সমর্থক ছিল, যাকে তারা শাসক বানাতে চেয়েছিল। অবশেষে আহনাফ তার দলের কিছু বাছাইকৃত লোককে নিয়ে গোপনে গ্রানাডায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি সেখানে গোপনে নিজের সমর্থক তৈরি করলেন এবং তারপর একদিন তাদের নিয়ে কাসরুল হামরায় আক্রমণ করলেন, আল-আইসারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং নিজের শাসনের ঘোষণা দিলেন। এটি ৮৩৯ হিজরি (১৪৩২ খ্রিষ্টাব্দ)-এর ঘটনা [২]।

[১] মামলুক চেরাকসিয়া সুলতান আল-মালিকুজ জাহির জাকমাক-এর শাসন ৮৪২ হিজরি থেকে ৮৫৭ হিজরি পর্যন্ত ছিল। তাকে মামলুকদের মহান শাসকদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি গুনাহ থেকে বেঁচে চলতেন, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং মিষ্টভাষী মানুষ ছিলেন। উলামা ও দরবেশদের অনেক ভালোবাসতেন। কিছু ঐতিহাসিকের মতে মামলুক চেরাকসিয়াতে তার চেয়ে বেশি শরীফ শাসক আর কেউ অতিবাহিত হয়নি। (সিমতুত নুজুমুল আওয়ালি: ৪/৩৯, ৫০)

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৬১ থেকে ১৬৩।

(১৭) মুহাম্মদ আল-আহনাফ বিন নাসর, দশম মুহাম্মদ

(৮৩৬ হিজরি থেকে ৮৩৯ হিজরি / ১৪৩২ খ্রি. থেকে ১৪৩৫ খ্রি.)

মুহাম্মদ আল-আহনাফের শাসনের সূচনা দুর্বলতার মধ্য দিয়ে হয়েছিল। আল-আইসারের উজির ইবনে আব্দুল বার তখন রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমের দুর্গ “মোন্তেফ্রিও”-তে ছিলেন। তিনি আল-আহনাফের পরিবর্তে আল-আইসারের দ্বিতীয় ভতিজা সাদ বিন ইসমাইলকে শাসনের দায়িত্ব দিতে শুরু করেন। সাদ বিন ইসমাইল তখন কাস্টিলের রাজধানী সেভিলে ছিলেন এবং সেখানকার শাসকও তাকে গ্রানাডার শাসক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। ফলে সাদ বিন ইসমাইল একটি খ্রিস্টান বাহিনী নিয়ে গ্রানাডায় পৌঁছান এবং আল-আহনাফের মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে সাদ বিন ইসমাইল জয়লাভ করেন এবং তিনি আলহামরা প্রাসাদ দখল করে নিজের শাসনের ঘোষণা দেন। [১]

মুহাম্মদ আল-আহনাফের শাসনকাল ছিল প্রায় আড়াই বছর।

(১৮) সাদ বিন আলী বিন ইসমাইল, পঞ্চম ইউসুফ, মুস্তাইন বিল্লাহ

(৮৩৯ হিজরি / ১৪৩৫ খ্রি.-এর শেষভাগ থেকে ১৪৩৬ খ্রি.-এর শুরু পর্যন্ত)

সাদের পিতার নাম ছিল আলী এবং দাদার নাম ছিল ইসমাইল। দাদার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে ইবনে ইসমাইল বলা হয় এবং যেহেতু তার আসল নাম ছিল ইউসুফ, তাই তাকে পঞ্চম ইউসুফও বলা হয়। তিনি মুস্তাইন বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস শাসন করতে পেরেছিলেন। এই সময়ে কাস্টিলের সাথে যুদ্ধ বিরতি ছিল এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। তবে ইবনে ইসমাইলের খ্রিস্টানপ্রীতির কারণে জনমত তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুহাম্মদ আল-আহনাফ তার সমর্থক আমিরদের সহায়তায় ৮৩৯ হিজরির শাওয়াল মাসে (১৪৩৬ খ্রি.-এর শুরুতে) পুনরায় গ্রানাডার শাসক হন। ইবনে ইসমাইল পালিয়ে গিয়ে মোন্তেফ্রিও দুর্গে আশ্রয় নেন এবং কিছু এলাকায় শাসন কায়েম করেন। [২]

মুহাম্মদ আল-আহনাফ বিন নাসর, দশম মুহাম্মদ, দ্বিতীয়বার

(৮৩৯ হিজরি থেকে ৮৫৮ হিজরি / ১৪৩৬ খ্রি. থেকে ১৪৫৪ খ্রি.)

ইবনে ইসমাইলকে গ্রানাডা থেকে বের করে দেওয়ার পর আল-আহনাফ তার পৃষ্ঠপোষক খ্রিস্টানদের শান্তি দেওয়ার প্রস্তুতি নেন এবং বাহিনী নিয়ে কাস্টিলের সীমান্তবর্তী দুর্গ: বেনিমোরেল দুর্গ এবং ইবনে সালামা দুর্গে আক্রমণ করেন। সেই সাথে তিনি ইবনে ইসমাইলের সাথে লড়াই করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। যখন উভয় পক্ষের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ চলছিল, তখন খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য চরমে পৌঁছায়, যার ফলে আরাগন ও নাভারে-এর খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাস্টিল আক্রমণ করে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৬৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/১৬৩, ১৬৪; আল-আলাম লিয়-যিরিকলি: ৩/৮৬

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

খ্রিস্টানদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হতে দেখে মুহাম্মদ আখনাফও আরগুন ও আরবুনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং একটি চুক্তির অধীনে কাস্টিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশীদার হন। তিনি মুরসিয়ার দিক থেকে কাস্টিলের দিকে অগ্রসর হন এবং প্রতিপক্ষকে ‘বাঞ্জালা’র ময়দানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং ৮৫৩ হিজরি (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) সালে বিপুল পরিমাণ গনিমতসহ ফিরে আসেন।

খ্রিস্টানদের এই পারস্পরিক যুদ্ধের সময় মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হলে তারা কুয়েনকা, তোলেদো এবং সেভিলও জয় করতে পারত, কিন্তু আফসোস যে এই সুযোগ কাজে লাগানো হয়নি। কয়েক মাস পর যুদ্ধরত খ্রিস্টান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়ে যায় এবং তাদের লক্ষ্য আবারও মুসলমানদের দিকে ফিরে আসে। তবে কাস্টিল সরাসরি সামরিক অভিযান চালানোর পরিবর্তে ইবনে ইসমাইলকে সামরিক সহায়তা দিয়ে গ্রানাডার সরকারের দাবিদার বানিয়ে দেয়, যিনি সেই সময় ‘কেল্লা মুনি ফরিক’-এ ছিলেন। ইবনে ইসমাইলের জন্য পরিবেশ দ্রুত অনুকূল হয়ে ওঠে কারণ মুহাম্মদ আখনাফের মেজাজে উত্তেজনা ও রাগ অনেক বেশি ছিল, যার ফলে গ্রানাডার অনেক আমির মনে মনে তার প্রতি ভীত ও অসন্তুষ্ট ছিলেন। ফলে তাদের সহানুভূতি ইবনে ইসমাইলের সাথে হয়ে যায়।

অবশেষে ইবনে ইসমাইল ও আখনাফ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে মুখোমুখি হন। গ্রানাডার বাইরে উভয়ের মধ্যে তীব্র যুদ্ধ হয় যাতে ইবনে ইসমাইল বিজয়ী হন এবং মুহাম্মদ আখনাফকে পালিয়ে যেতে হয়। ইবনে ইসমাইল গ্রানাডায় প্রবেশ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুহাম্মদ আখনাফের দ্বিতীয় দফার শাসনকাল ছিল প্রায় সাত বছর। [১]

ইবনে ইসমাইল, ইউসুফ পঞ্চম, মুস্তাইন বিল্লাহ

পুনরায়: ৮৫৩ হিজরি থেকে ৮৬৭ হিজরি (১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৬৩ খ্রিস্টাব্দ)

ইবনে ইসমাইল যখন পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ পান, তখন তিনি টানা ষোলো বছর শাসন করেন এবং নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, সচ্চরিত্রবান, সাহসী, বুদ্ধিমান ও চতুর শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি তার রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, অনেক নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সীমান্ত রক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা করেন। তিনি একজন দক্ষ অশ্বারোহী ছিলেন এবং নেজা-বাজি (বর্শা নিক্ষেপ) ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিতেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি কাস্টিলের রাজা দ্বিতীয় জনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে সীমান্ত সম্মানের চুক্তি করেন, কিন্তু কয়েক মাস পর কাস্টিলের রাজার মৃত্যু হয় এবং তার উত্তরসূরি চতুর্থ হেনরি সাদ ইবনে ইসমাইলকে কর প্রদানে বাধ্য করার চেষ্টা করেন। ইবনে ইসমাইল সরাসরি অস্বীকার করেন এবং কিছু সৈন্য পাঠিয়ে কাস্টিলের সীমান্তে আকস্মিক হামলা চালিয়ে নিজের শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটান। চতুর্থ হেনরি আবারও জোর দেন যে গ্রানাডা যেন কাস্টিলের আধিপত্য মেনে নেয়, অন্যথায় ফলাফল ভালো হবে না। যখন ইতিবাচক উত্তর আসেনি, তখন তিনি এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো ধ্বংস করতে শুরু করেন। এই লুটতরাজে অনেক গ্রাম ধ্বংস হয় এবং প্রচুর সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষ বন্দী হন। এই সময়ে গ্রানাডার মুসলমানরা ছোট ছোট দলের আকারে...

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫ / ১৬২, ১৬৩

তারা এই লশকরের চারপাশে পৌঁছে গেল। তাদের উপর্যুপরি হামলায় নাসারা বাহিনী চরম ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলো। পরের বছর কাস্তিল একইভাবে পুনরায় আক্রমণ করল, যার জবাবে মুসলমানরা ‘জিয়ান’-এর কাছে নাসারাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করল। পরবর্তী বছরগুলোতেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। কখনো মুসলমানরা বিজয়ী হতো আবার কখনো নাসারারা, তবে সামগ্রিকভাবে নাসারাদের পাল্লা কিছুটা ভারী ছিল কারণ এই বছরগুলোতে তারা কয়েকটি দুর্গ দখল করতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যদিকে কিছু দুর্গ যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী নাসারাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে ইসমাইলের শাসনামলের সবচেয়ে বড় ঘটনা এবং চরম বিয়োগান্তক ট্র্যাজেডি হলো জাবাল আল-তারিক-এর পতন। কাস্তিলের বাহিনী ৮৬৭ হিজরিতে (১৪৬২ খ্রিস্টাব্দ) আকস্মিক আক্রমণের মাধ্যমে এখানে দখলদারিত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়। গ্রানাডার মুসলমানরা এই সুযোগই পেল না যে তারা এই রণাঙ্গনে পৌঁছে শত্রুকে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। জাবাল আল-তারিক হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় মরক্কো থেকে গ্রানাডায় সাহায্য আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ বন্ধ হয়ে গেল।

৮৬৯ হিজরিতে মরক্কো থেকে বনু মারিন শাসনের অবসান ঘটে, যারা দুই শতাব্দী ধরে আন্দালুসিয়ার মুসলমানদের সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছিল। এভাবে গ্রানাডা তার বহিরাগত সাহায্যকারীদের থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ল।

৮৭০ হিজরিতে সাদ বিন ইসমাইল ইন্তেকাল করেন। সেই সময় কাস্তিলের সাথে উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝেমধ্যেই যুদ্ধ চলছিল। এই যুদ্ধগুলোতে সাদ বিন ইসমাইলের উত্তরাধিকারী আবুল হাসান আলী বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। [১]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/ ১৬৪, ১৬৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা ৬৭০

আন্দালুসের ইতিহাসের শেষ বেদনাদায়ক অধ্যায়

এখন আমরা আন্দালুসের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি খুলছি যার প্রতিটি ছত্র শিক্ষণীয় এবং যার প্রতিটি শব্দ প্রমাণ করে যে, যে জাতির মধ্যে ঐক্য অনুপস্থিত থাকে, তারা কখনো সফল হতে পারে না। আন্দালুসের ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায়টি সুলতান আবুল হাসান আলীর সময় থেকে শুরু হয়, যিনি বনু নাসরের ঊনবিংশতম শাসক ছিলেন।

১৯ সুলতান আবুল হাসান আলী, আল-গালিব বিল্লাহ

(৮৭০ হিজরি থেকে ৮৯০ হিজরি / ১৪৬৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান আবুল হাসান আলী গ্রানাডার শেষ শাসক ছিলেন যার মধ্যে স্বাধীনতা এবং আত্মমর্যাদাবোধের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল। নিজের যুবরাজ থাকাকালীন সময়ে তিনি তাঁর সামরিক বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতিকে নিজের অনুরাগী করে তুলেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি ‘আল-গালিব বিল্লাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কাস্টিল এবং গ্রানাডার মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল এবং সীমান্ত সংঘর্ষ চলছিল, সুলতান আবুল হাসান আলী পূর্ণ তৎপরতার সাথে সীমান্ত রক্ষা করে যাচ্ছিলেন।

দেশ ও জাতির প্রতি একনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে শিথিল ছিলেন এবং দ্বীনদারির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। এই সময়ে তাঁকে তাঁর ভাই মুহাম্মদ আল-জাগালের বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হয়, যিনি মালাগার আমির এবং একজন বড় নামী সেনাপতি ছিলেন। ভাইদের বিরোধের কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে এই ছোট রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সময়ে কাস্টিলে চতুর্থ হেনরির শাসন ছিল, যিনি নিজের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এই দুই ভাইয়ের বিরোধ থেকে বিশেষ কোনো ফায়দা হাসিল করতে পারেননি।

আবুল হাসান যখন বেশ কয়েক বছর ধরে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে থাকলেন, তখন তিনি নিজের সংশোধনের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি গ্রানাডার জনগণের সামনে প্রকাশ্যে তওবা করলেন এবং ওয়াদা করলেন যে, তিনি শরীয়ত বাস্তবায়ন এবং সীমান্ত রক্ষায় কোনো ত্রুটি রাখবেন না। যেহেতু স্বভাবগতভাবে তিনি একজন খাঁটি মানুষ ছিলেন, তাই গ্রানাডাবাসী তাঁর ওপর আস্থা রেখে তাঁর বিরোধীদের থেকে দূরে সরে গেল। আল-জাগালও সন্ধি করে নিলেন এবং বিদ্রোহের অবসান ঘটল। সুলতান আবুল হাসান আলী ওয়াদা পালন করে মুত্তাকি ও মুজাহিদসুলভ জীবন বেছে নিলেন এবং তাঁর শাসন মজবুত হয়ে গেল। সুলতান আবুল হাসান আলীর শক্তি...

এটি দেখে কাস্টিলও যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদন করল এবং চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো। [১]

ভয়াবহ বন্যা

৮৮২ হিজরির ঈদুল আযহার পর সুলতান আবুল হাসান আলী গ্রানাডার বাইরে একটি উন্মুক্ত উপত্যকায় সামরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন যাতে নতুন ও পুরাতন সবাই গ্রানাডার সামরিক শক্তি দেখে প্রভাবিত হয়। ১৯ জিলহজ এই প্রদর্শনী শুরু হয় এবং প্রায় এক মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আল্লামা মাক্কারি (নাফহত তিব-এর লেখক)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, এই অনুষ্ঠানে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রদর্শনীও হচ্ছিল। গ্রানাডার নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা দলে দলে এই মেলা দেখতে আসত এবং নিজেদের সেনাবাহিনীর যুদ্ধকৌশল ও অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুক দেখে আনন্দিত হতো। ২২ মহরম ৮৮৩ হিজরি ছিল প্রদর্শনীর শেষ দিন। হঠাৎ ঘন কালো মেঘ ঘনীভূত হয়ে এল এবং এমন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো যে মুহূর্তের মধ্যে পুরো উপত্যকা তলিয়ে গেল। সৈন্য ও সাধারণ মানুষ কোনোমতে এদিক-সেদিক পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল এবং তারপর পানি ঘরবাড়ির দিকে ধাবিত হলো। বৃষ্টি থামার নাম নিচ্ছিল না। গ্রানাডা শহরের অলিগলি, রাস্তাঘাট এবং আশপাশের সমস্ত উপত্যকা ঝিলের রূপ ধারণ করল। গ্রানাডার খালের পাড়ে লাগানো আখরোট ও ডালিমের বিশাল বিশাল গাছ উপড়ে বন্যার পানিতে ভেসে গেল। গাছের এই স্তূপ খালের বাঁকগুলোতে ধাক্কা খেয়ে বাঁধের রূপ নিল এবং পানি সেগুলোকে সাথে নিয়ে ডানে-বামে পথ তৈরি করতে করতে দোকানপাট, ঘরবাড়ি, মসজিদ ও গুদামগুলোতে ঢুকে পড়ল। বড় বড় স্তম্ভের সাথে ধাক্কা লেগে কয়েক ডজন সুউচ্চ ভবন ধসে পড়ল এবং অনেক সেতু ধ্বংস হয়ে গেল। জামে মসজিদ পর্যন্ত নিরাপদ ছিল না। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই বন্যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আকস্মিক বিপদের পূর্বাভাস মনে করছিলেন। [২]

শাসকদের উদাসীনতা

কিন্তু অন্যদিকে আশ্চর্যের বিষয় এই ছিল যে, সুলতান আবুল হাসান আলী, যিনি কিছুকাল আগে পর্যন্ত পরহেজগার ও মুত্তাকি ছিলেন, এই আকস্মিক বিপদের পর হঠাৎ বদলে গেলেন এবং ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়লেন। আল্লামা মাক্কারির বর্ণনা অনুযায়ী, খ্রিস্টান শাহজাদাদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ দেখে তিনি এই বিভ্রান্তিতে পড়েছিলেন যে তারা সর্বদা নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকবে, তাই মুসলমানরা এখন নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ৩৩, তাবা দার ইহসান দামেস্ক; নাফহত তিব: ৩/৫১১, ৫১২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/১৯৮, ১৯৯; আল-আলাম লিয়-যিরিকলি: ৪/২৯০।

মনে রাখা দরকার যে, গ্রানাডার ইতিহাসের এই শেষ অধ্যায়ের অধিকাংশ বিবরণ “নুবজাতুল আসর” নামক একটি ঐতিহাসিক পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে, যা গ্রানাডার পতনের পর কোনো এক মুসলিম আলেম লিখেছিলেন। সেই যুগে আন্দালুসের মজলুম মুসলমানদের জন্য বেঁচে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল, তাই এই আলেম নিজের নাম প্রকাশ করতে পারেননি, যার ফলে কেউ জানে না এটি কার রচনা। ধারণা করা হয় যে, এর লেখক গ্রানাডার কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলেম ছিলেন যিনি দরবার ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিলেন।

[২] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ৩৩ থেকে ৩৫; নাফহত তিব মিন গুসনিল আন্দালুসিল রাতিব, লিল মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৫১১, ৫১২; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, লি আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/১৯৮, ১৯৯।

তার অধিকাংশ সময় গায়ক-গায়িকাদের মজলিসে কাটতে লাগল। সে সেনাবাহিনীর বাজেটে কাটছাঁট করল এবং অনেক দক্ষ বাহিনীকে বরখাস্ত করে দিল। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের ওপর নতুন কর আরোপ করল, যার ফলে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে মন্দা দেখা দিল। সংক্ষেপে, এখান থেকেই আবুল হাসান আলীর শাসনের দ্রুত পতন শুরু হলো। [১]

আবুল কাসিমের মন্ত্রণালয়:

নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখার জন্য সুলতান আবুল হাসান রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয় তার উজির আবুল কাসিম বিন রিজওয়ানের হাতে সোপর্দ করলেন, যে বাহ্যিকভাবে সালতানাতের অত্যন্ত অনুগত কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে অত্যন্ত ধূর্ত ছিল। তার দাদা একজন খ্রিস্টান ছিল যে একটি যুদ্ধে বন্দী হয়ে গ্রানাডায় এসেছিল। তার বংশধররা নিজেদের যোগ্যতার কারণে গ্রানাডার উজিরের পদ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। [২]

আবুল হাসান এবং বেগমগণ:

আবুল হাসান সরকারি দায়িত্ব থেকে বিমুখ হয়ে ভ্রমণ, আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হয়ে পড়লেন। তার অধিকাংশ সময় নিজের হারেমে বেগম ও দাসীদের সাথে কাটতে লাগল। তার এক স্ত্রী ছিল আরব এবং দ্বিতীয়জন ছিল ইউরোপীয় নওমুসলিম। আরব স্ত্রীর নাম ছিল আয়েশা, যিনি তার চাচাতো বোনও ছিলেন। তার দুই পুত্র ছিল: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ এবং ইউসুফ। রানী আয়েশা অত্যন্ত সাহসী ও আত্মমর্যাদাশীল নারী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে সালতানাতের উত্তরাধিকারী তার কোনো পুত্র হোক, কিন্তু তার ইউরোপীয় সতীন এক বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পথে এসে দাঁড়াল।

ইউরোপীয় রানীর আসল নাম ছিল ‘জুরায়দা’, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সুরাইয়া নামে পরিচিত হন। তিনি তার রূপ-লাবণ্যের কারণে সুলতানের ওপর অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তারও দুই পুত্র ছিল। সুলতান আবুল হাসান তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রানী আয়েশা এবং তার পুত্রদের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করতে শুরু করলেন। এই পরিস্থিতির কারণে সুলতানের আত্মীয়-স্বজন, প্রাসাদের কর্মচারী এবং সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে দুটি দল তৈরি হয়ে গেল। কিছু লোক সুলতানের আরব স্ত্রীকে বেশি সম্মানযোগ্য মনে করত এবং তার সন্তানদের সালতানাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে দেখতে চাইত। দ্বিতীয় দলটি সুলতানের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে সুরাইয়া এবং তার পুত্রদের সমর্থক ছিল। আবুল হাসান আলী অত্যন্ত কঠোর মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি প্রাসাদের এই গুমোট পরিবেশে অতিষ্ঠ হয়ে রানী আয়েশা এবং তার দুই পুত্র আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ও ইউসুফকে শাহী প্রাসাদের একটি আলাদা টাওয়ারে নজরবন্দি করে দিলেন এবং তাদের আসা-যাওয়ার ওপর কড়া পাহারা বসালেন। এমন অবস্থায় রানী আয়েশা সবসময় এই আশঙ্কায় থাকতেন যে, আবুল হাসান হয়তো তার ইউরোপীয় স্ত্রীর প্ররোচনায় তাদের হত্যা না করে ফেলেন। [৩]

উজির আবুল কাসিমের দুর্নীতি:

এই সময়ে উজির আবুল কাসিম জনগণের ওপর কর বাড়িয়ে তাদের নাজেহাল করে তুললেন। করের টাকা প্রতিরক্ষা বা উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশিমতো ওড়ানো হতো। সৈন্যদের সময়মতো বেতন পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। তারা নিজেদের অস্ত্র বিক্রি করে জীবন ধারণ করতে লাগল। অবশেষে প্রতিরক্ষা ব্যয়ের জন্য সেনাবাহিনীর আরও একটি অংশকে ছাঁটাই করা হলো। মানুষ এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করল।

[১] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৪৫, নাফহত তীব: ৩/ ৫১২

[২] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৩৬ থেকে ৩৯, নাফহত তীব: ৩/ ৫১২

[৩] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৫০, নাফহত তীব: ৩/ ৫১২-৫১৩, দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/ ৯৯ থেকে ২০০

...করতে করতে উজির আবুল কাসেমের বরখাস্তের দাবি শুরু করেন কিন্তু কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। [১]

পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা:

আন্দালুসে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সময় প্রাচ্যের উসমানীয় সাম্রাজ্য তার উন্নতির চরম শিখরে ছিল। ৮৫৭ হিজরিতে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) সুলতান মুহাম্মদ খান ফাতিহ কনস্টান্টিনোপল জয় করে সমগ্র ইউরোপকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে স্পেনের খ্রিষ্টানদের মধ্যে মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার স্পৃহা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তারা খুব শীঘ্রই এই সুযোগ পেয়ে যায় যখন ৮৭৪ হিজরিতে কাস্টিলের তরুণ রাজা পঞ্চম ফার্ডিনান্ডের সাথে আরাগনের রাজকুমারী ইসাবেলার বিয়ে হয়। তারা উভয়ই অত্যন্ত ধূর্ত, মক্কার এবং মুসলমানদের ঘোর শত্রু ছিল। তারা আন্দালুসের মুসলমানদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। [২]

আবুল হাসান আলীর খরাজ দিতে অস্বীকার... আরাগন ও কাস্টিলের একীভূতকরণ:

৮৮০ হিজরিতে পঞ্চম ফার্ডিনান্ড আবুল হাসানের কাছে এই বার্তা পাঠান যে, যদি তুমি শান্তি চাও তবে আমাদের খরাজ দিতে রাজি হও। সুলতান আবুল হাসান আলী জবাবে এই ঐতিহাসিক বাক্যটি পাঠান: “খরাজ প্রদানকারী শাসকরা মারা গেছেন। গ্রানাডার টাঁকশালে এখন আর মুদ্রা নয়, তলোয়ার তৈরি হয়।” [৩]

পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এই উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে যান এবং কয়েক বছর পর্যন্ত তার কিছু করার সাহস হয়নি। এই সময়ে তিনি গ্রানাডা জয়ের জন্য তার রানী ইসাবেলার সাথে পরামর্শ করতে থাকেন। অবশেষে উভয়ের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, নিজেদের শক্তিকে সুসংগঠিত ও সুসংহত করার জন্য আরাগন ও কাস্টিল রাজ্যকে একীভূত করা হবে। এভাবে ৮৮৩ হিজরিতে খ্রিষ্টানদের একটি বিশাল ঐক্যবদ্ধ শক্তি আত্মপ্রকাশ করে যা প্রায় সোয়া লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল, যেখানে গ্রানাডা রাজ্যের আয়তন সংকুচিত হয়ে তখন মাত্র চার হাজার বর্গমাইল অবশিষ্ট ছিল। [৪]

জিহাদ ঘোষণা, আস-সাখরা বিজয়:

খ্রিষ্টানদের এত বড় শক্তির উত্থান আন্দালুসের মুসলমানদের পতনের লক্ষণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে উলামা, নেককার লোক এবং মুজাহিদদের অনুরোধে সুলতান আবুল হাসান জিহাদ ঘোষণা করেন এবং ৮৮৬ হিজরিতে নিজেই অগ্রসর হয়ে ওয়াডিউল কাবীর নদীর তীরে অবস্থিত খ্রিষ্টানদের শক্তিশালী সীমান্ত দুর্গ ‘আস-সাখরা’ জয় করেন, যা পঞ্চম ফার্ডিনান্ডের দাদা মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ফার্ডিনান্ড তাৎক্ষণিকভাবে কোনো জবাব দিতে পারেননি এবং এর পরিবর্তে উভয় রাজ্যের মধ্যে সাময়িক শান্তি স্থাপিত হয়। [৫]

আল-হামার যুদ্ধ:

সুলতান আবুল হাসান তার শাসনের ভিত্তি মজবুত মনে করছিলেন এবং ভুলে গিয়েছিলেন যে খ্রিষ্টানরা শান্তি সত্ত্বেও সুযোগের...

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বানি নাসর: পৃষ্ঠা ১৫১, নাফহত তীব: ৩/৫১২

[২] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৫৩৮ থেকে ৫৫০

[৩] লেন পুল, মুরস ইন স্পেন: পৃষ্ঠা ১৩৯

[৪] আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গুরনাতা, লি-আব্দুর রহমান আলী: পৃষ্ঠা ৫৩৮ থেকে ৫৫০

[৫] মুরস ইন স্পেন, লেন পুল: পৃষ্ঠা ১৩৯

ওত পেতে আছে। ১৮ মহরম ৮৮৭ হিজরিতে কাস্টিলের সাথে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এর সাথে সাথেই কাস্টিলের দশ হাজার সৈন্য রাতারাতি গ্রানাডার সীমান্তবর্তী শহর আলহামার ওপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়। দুর্গের মুষ্টিমেয় সৈন্য কোনো প্রতিরোধ করতে পারেনি এবং খ্রিস্টানরা শহরটি দখল করে নারী ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে এবং বন্দি করে নেয়। এটি ১৯ মহরম ৮৮৭ হিজরির ঘটনা।

সেই সময় গ্রানাডা ও এর আশপাশের মুসলমানদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে জিহাদের চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। গ্রানাডার অনেক আলেম, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আমীরগণ তাদের সাথে একমত ছিলেন। তারা সুলতান আবুল হাসানের উজির আবুল কাসেমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং অবিলম্বে পাল্টা আক্রমণের দাবি জানান। উজির তাদের ভুলিয়ে রাখতে এবং আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন যে, এখন পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া নিরর্থক, কিন্তু জনগণের প্রতিনিধি দলটি বলল: “হয়তো আমরা লড়তে লড়তে মারা যাব, না হয় আমাদের ভাই-বোনদের মুক্ত করে আনব।”

অবশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের একটি দল প্রস্তুত হয়ে আলহামায় পৌঁছাল। তারা দেখল যে, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বন্দি করে কাস্টিলের দিকে রওনা হচ্ছে এবং তাদের মালবাহী পশুগুলো গনিমতের মালের ভারে নুয়ে পড়েছে। মুসলমানদের আসতে দেখে খ্রিস্টানরা ধন-সম্পদ ও বন্দিদের সেখানেই ফেলে রেখে দ্রুত দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ল। মুজাহিদগণ পূর্ণ শক্তি দিয়ে শহর আক্রমণ করলেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। মুজাহিদগণ শহরের দরজা ভেঙে ফেললেন এবং প্রাচীরের ওপর উঠে পড়লেন। তারা প্রাচীর জয় করার উপক্রম হয়েছিলেন, এমন সময় আবুল কাসেমের পক্ষ থেকে অভিযান অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসার নির্দেশ এল। গ্রানাডাবাসীরা তা অস্বীকার করে বলল: “আমরা দুর্গ জয় করেই দম নেব।” আবুল কাসেম খবর পাঠালেন: “আজ রাতে বিশ্রাম নেওয়া হোক, সকালে দুর্গ জয় হয়ে যাবে।”

কিন্তু সকাল হওয়ার আগেই খ্রিস্টানরা প্রাচীরের ভাঙা অংশগুলো মেরামত করে নিল এবং আগের চেয়ে বেশি সতর্ক হয়ে গেল। মুজাহিদগণও সাহস হারাননি এবং দুর্গে আক্রমণ অব্যাহত রাখলেন, তবে তারা সরকারের ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন যারা এই যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কোনো ভূমিকা পালন করেনি। মুজাহিদদের এই মনোভাব আবুল কাসেমের কাছে গোপন ছিল না। তার ভয় হলো যে, এই জনসমাবেশ যদি গ্রানাডার দিকে মুখ করে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা শুরু করে, তবে মোকাবিলা করা খুব কঠিন হবে। সে তার অনুচরদের মাধ্যমে এই গুজব ছড়িয়ে দিল যে, কাস্টিলের রাজা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আলহামায় পৌঁছাচ্ছেন। এই খবরে মুজাহিদদের মনোবল ভেঙে গেল, যাদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের কোনো সরঞ্জাম ছিল না। তারা আলহামার অবরোধ ছেড়ে নিজ নিজ এলাকার দিকে ফিরে গেল।

সুলতান আবুল হাসান যা-ই হোক দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষায় একনিষ্ঠ ছিলেন। আলহামার ওপর খ্রিস্টানদের দখল তাকে নাড়া দিল এবং তিনি একটি বাহিনী প্রস্তুত করে সেখানে পাঠালেন, যারা খ্রিস্টানদের ওপর হঠাৎ নৈশকালীন আক্রমণের চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে সেখানে খ্রিস্টানরা শক্তভাবে পা গেড়ে বসেছিল এবং পুরোপুরি সতর্ক ছিল, তাই এই অভিযানও ব্যর্থ হলো। এই আক্রমণে অংশগ্রহণকারী ওয়াদিয়ে আশ ও বাস্তার অধিকাংশ মুজাহিদ শহীদ হলেন। [১]

লোশার রণাঙ্গন:

গ্রানাডার দুর্বলতা আঁচ করতে পেরে পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং নিজে তার নেতৃত্ব দিয়ে গ্রানাডার সীমান্তবর্তী...

শহর লুশায় পৌঁছে গেল। এটিই ছিল আল্লামা লিসান উদ্দিন ইবনুল খতিব (রহ.)-এর জন্মস্থান। এই সময়ে এখানে শায়খ আলী আল-আত্তার (রহ.) মুজাহিদদের প্রধান ছিলেন, যাঁর বয়স ৮০ বছর হয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টানদের অগ্রযাত্রার খবর শুনে গ্রানাডার হাজার হাজার মুজাহিদ নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে লুশার প্রতিরক্ষার জন্য শায়খ আলী আল-আত্তার (রহ.)-এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে খ্রিস্টানদের মোকাবিলা করেন এবং তাঁদের সামনে এগোতে দেননি।

এই সময়ে সুলতান আবুল হাসান আলী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে লুশার মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যান। সাহায্য পাওয়ায় মুজাহিদদের মনোবল অনেক বেড়ে যায় এবং তাঁরা ২৭ জুমাদাল উলা ৮৮৭ হিজরিতে লুশার ময়দানে খ্রিস্টানদের এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করান যে, তারা হাজার হাজার লাশ এবং সমস্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। [১]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের বিদ্রোহ:

এই বিজয়ের সুসংবাদ যখন গ্রানাডায় পৌঁছাল, সেখানে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। কিন্তু শাহী মহলের বুর্জ (দুর্গ)-এ নজরবন্দি শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের মেজাজ বিগড়ে গেল। চাটুকার পারিষদবর্গ তাকে পিতার ঘোর বিরোধী বানিয়ে দিয়েছিল এবং সেই সাথে তাকে এই বিশ্বাসও জন্মিয়ে দিয়েছিল যে, সুলতান আবুল হাসান খুব শীঘ্রই নিজের ইউরোপীয় স্ত্রী সুরাইয়ার ইশারায় তাকে হত্যা করিয়ে দিতে পারেন। এই বন্ধুবেশী শত্রুরা শাহজাদাকে পরামর্শ দিচ্ছিল যে, পিতার পাকড়াও থেকে চিরতরে নিরাপদ থাকার সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ করে মুকুট ও সিংহাসন দখল করে নেওয়া। যেহেতু শাহী মহলে শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ এবং তাঁর ভাই ইউসুফ আগে থেকেই পাহারায় ছিল, তাই তারা রাতের অন্ধকারে বুর্জ থেকে পালিয়ে যায় এবং ওয়াদিয়ে আশ-এ নিজের সমর্থকদের কাছে পৌঁছে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, যাঁর বয়স তখন ২৫ বছর ছিল, নিজের বাদশাহীর ঘোষণা দেন। [২]

মালকায় খ্রিস্টানদের পরাজয়:

লুশার বিজয়ীদের যখন এই সংবাদ পৌঁছাল, তখন তাদের বিজয়ের আনন্দ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সুলতান আবুল হাসান আলীর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল এবং তিনি লুশা ত্যাগ করে সেখানে নিজের ভাই আয-যাগাল-এর কাছে আশ্রয় নিলেন।

এখন গ্রানাডার ছোট এই রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল: গ্রানাডা, ওয়াদিয়ে আশ, আল-মেরিয়া এবং দক্ষিণের শহরগুলোর বাদশাহ ছিলেন আবু আবদুল্লাহ। অন্যদিকে মালকা, বাখশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু দুর্গে সুলতান আবুল হাসান আলীর শাসন ছিল।

ফার্দিনান্দ পঞ্চম আসল বিপদ আবুল হাসান আলীকে মনে করতেন, তাই তাঁকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সফর ৮৮৮ হিজরিতে কাস্টিলের সেনাবাহিনী দুই দিক থেকে মালকার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। আবুল হাসান আলী এই সময়ে “আল-মুনাক্কাব” [৩]-এ অবস্থান করছিলেন এবং মালকায় তাঁর ভাই...

[১] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৫৫ থেকে ৬০; নাফহত তীব: ৩/৫১৩; আত-তারিখুল ইসলামি মিনাল ফাতহিল আন্দালুসি ইলা সুকুতি গ্রানাডা: আবদুল রহমান আলী: পৃ. ৫৫১, ৫৫২। শায়খ আলী আল-আত্তারের তলোয়ার আজও মাদ্রিদের সামরিক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

[২] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ৬০ থেকে ৬৪; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩০৩-৩০৪।

[৩] গ্রানাডা থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আলমেরিয়াতে একটি উপকূলীয় দুর্গ শহর ছিল।

মুহাম্মদ আয-যাগাল উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কমান্ডে মুজাহিদ ও সরকারি বাহিনী বাজা (Baza) অভিমুখে আসা খ্রিস্টানদের ওপর উপত্যকা ও গিরিপথগুলোতে অতর্কিত হামলা শুরু করে। অবশেষে খ্রিস্টানরা পদে পদে লাশ ফেলে রেখে পিছু হটে পালায়। অন্য দিক থেকে আক্রমণকারী বাহিনীকে আয-যাগাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিন হাজার খ্রিস্টান নিহত হয় এবং দুই হাজার অফিসার ও সৈন্য বন্দি হয়। এটি ৮৮৮ হিজরির ১১ সফরের ঘটনা।

এটি আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও রহমত ছিল যে, এত দুর্বল অবস্থায়ও মুসলমানরা কাস্টিলের বাহিনীকে পরাজিত করছিল। কিন্তু এই বিজয়ের পর যখন গনিমতের মাল বণ্টনের পর্যায় এল, তখন শরয়ি বিধানের বিরোধিতা করা হলো। শরিয়ত অনুযায়ী গনিমতের মালের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয় এবং পঞ্চম ভাগ সরকারি কোষাগারে যায়। কিন্তু সরকার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্য ও মুজাহিদদের কিছুই দেয়নি এবং সমস্ত মাল সরকারি মালিকানায় বাজেয়াপ্ত করে নেয়। এতে চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ ধারণা তৈরি হয় যে, শাসকদের উদ্দেশ্য মানুষকে লড়িয়ে নিজেদের কোষাগার পূর্ণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। [১]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের গ্রেফতারি ও পদচ্যুতি:

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের মধ্যেও সৈনিকসুলভ গুণাবলি ছিল, কিন্তু তিনি নেতৃত্বসুলভ গুণাবলি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। দূরদর্শিতার পরিবর্তে তিনি হঠকারিতায় অভ্যস্ত ছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এতই দুর্বল ছিল যে, সামান্য সমস্যায় দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং কখনও কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনেক বড় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতেন এবং পরে তার ফলে সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের জন্য আফসোস করতে থাকতেন। [২]

গ্রানাডা দখলের পর আবু আবদুল্লাহ তাঁর পিতা ও চাচার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেরি করেননি এবং শীঘ্রই তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে মালগার দিকে যাত্রা করেন। আয-যাগালও মুজাহিদ ও সৈন্যদের নিয়ে ময়দানে বেরিয়ে আসেন। আবু আবদুল্লাহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং গ্রানাডার দিকে পালিয়ে যান। গ্রানাডায় ফিরে এসে তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি জনসমর্থনহীন এবং নিজের রাজনৈতিক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর পিতা ও চাচার মতো দু-চারটি ময়দানে খ্রিস্টানদের অবশ্যই পরাজিত করতে হবে। ফলে তিনি গ্রানাডার সেনাবাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ৮৮৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে উত্তর-পশ্চিম দিকে কাস্টিলের লুশেনা (Lucena) শহরের দিকে অভিযান চালান। পথে তিনি বেশ কিছু দুর্গ জয় করেন এবং কয়েকটি সংঘর্ষে খ্রিস্টানদের পরাজিত করেন।

এই বিজয়ের পর তিনি গনিমতের মালে বোঝাই হয়ে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় লুশেনা দুর্গের কাছে খ্রিস্টানদের একটি বাহিনী পেছন থেকে তাঁর ওপর আক্রমণ করে। শত শত মুসলমান নিহত হয় এবং বাকিরা পিছু হটে, কিন্তু খ্রিস্টানরা কয়েক ডজন লোককে ঘিরে ফেলে বন্দি করে নেয়, যাদের লুশেনা দুর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জানা যায় যে, বন্দিদের মধ্যে শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদও রয়েছেন। তাঁকে কড়া পাহারায় কর্ডোভায় ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর কাছে পাঠানো হয়, যিনি সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের মাধ্যমে শাহজাদার নিবুদ্ধিতা আঁচ করতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, গ্রানাডা তখনই দখল করা সম্ভব যখন এমন একজন নির্বোধ যুবক সেখানে সিংহাসনে আসীন থাকবে। তিনি শাহজাদার ওপর অনুগ্রহ এবং...

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ৬৩, ৬৪; নাফহত তিব: ৩ / ৫১৫

[২] মরিস ইন স্পেন, লেন পুল: পৃ. ১৩৬

অনুগ্রহের বর্ষণ করে তাকে বিশ্বাস করিয়ে দেওয়া হলো যে, দুনিয়াতে তার প্রকৃত বন্ধু কেবল ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলাই। [১]

সুলতান আবুল হাসান আলীর ইন্তেকাল

শাহজাদার গ্রেপ্তারের ফলে গ্রানাডার ক্ষমতার মসনদ কেঁপে উঠেছিল। আন্দালুসে মুসলমানদের আটশ বছরের ইতিহাসে তারা কখনো এমন লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়নি। রাজপরিবারের আমীরগণ এবং গ্রানাডার নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন যে এখন কী করা উচিত।

এমন পরিস্থিতিতে রানী আয়েশা অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করে সকলের সাহস বজায় রাখেন। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুনরায় আবুল হাসান আলীকে সুলতান হিসেবে মেনে নেয় এবং তাদের একটি প্রতিনিধি দল সুলতানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে পুনরায় সিংহাসন গ্রহণের অনুরোধ জানায়। আবুল হাসান পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তবুও তিনি আমীরদের সাথে গ্রানাডায় চলে যান এবং শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন যাতে প্রার্থিত পরিমাণ অর্থ দিয়ে নিজের পুত্র আবু আবদুল্লাহকে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা যায়। এই প্রচেষ্টার পেছনে পিতৃশ্রমেহের চেয়েও বড় চিন্তা ছিল এই যে, শাহজাদা যেন ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের হাতে শত্রুর হাতিয়ারে পরিণত না হয়, বরং গ্রানাডায় ফিরে আসলে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। আবুল হাসান শাহজাদার বিনিময়ে ফার্ডিনান্ডকে অনেক খ্রিস্টান যুদ্ধবন্দী ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কিন্তু ফার্ডিনান্ড পঞ্চম তাতে রাজি হননি।

আবুল হাসান আলী গুরুতর অসুস্থতা এবং মানসিক বিষণ্ণতার কারণে কিছুকাল পর সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং নিজের ভাই মুহাম্মদ আল-জাগালকে নতুন সুলতান নিযুক্ত করে নিজে আলমুনেকারে চলে যান, যেখানে কিছুদিন পর তার মৃত্যু হয়। এটি ৮৯০ হিজরীর ঘটনা। [২]

এখানে প্রতিটি পদক্ষেপে কল্যাণ ও অকল্যাণ একে অপরের মুখোমুখি... আমরাও কোন যুদ্ধ ও বিবাদের ময়দানে এসে পড়লাম।

যাদের কল্পনায় জীবন উজ্জ্বলতা পেত... হায়! তারা কেমন মানুষ ছিলেন যারা মৃত্যুর জালে আটকা পড়লেন। [৩]

(২০) সুলতান মুহাম্মদ বিন সাদ আল-জাগাল, মুহাম্মদ দশম

(৮৯০ হিজরী থেকে ৮৯৫ হিজরী / ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

সুলতান আবুল হাসান আলীর মৃত্যুর সাথে সাথেই ফার্ডিনান্ড পঞ্চম গ্রানাডার বিরুদ্ধে নতুন অভিযান শুরু করেন। রবিউল আউয়াল ৮৯০ হিজরীতে তার বাহিনী কারমাতা এবং জাকউইন দুর্গ আক্রমণ করে দখল করে নেয়। পরবর্তী মাসে তারা বারুদ বিস্ফোরণের মাধ্যমে রোন্ডা শহরের প্রাচীর ভেঙে তা দখল করে নেয়। এরপর একে একে তারা কয়েন, কারতামা, আলহাওরিন এবং মোন্ডা দুর্গও মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এর আগে ৮৮৯ হিজরীতে খ্রিস্টানরা আলোরা এবং সেতেনিল দুর্গ জয় করেছিল। এভাবে গ্রানাডার পশ্চিম দিকের প্রায় সমস্ত প্রতিরক্ষা চৌকিগুলো একে একে হাতছাড়া হয়ে যায়।

এই পরিস্থিতিতে ১৯ শাবান ৮৯০ হিজরীতে আমীর আল-জাগাল গ্রানাডার স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে মাকলিন দুর্গ মেরামতের জন্য...

[১] নুবদাতুল আসর ফি আখবার মুলুক বনী নাসর, পৃষ্ঠা: ৬৬।

[২] নুবদাতুল আসর, পৃষ্ঠা: ৬৭, ৬৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরী, ৫/২০৩, ২০৫।

[৩] আমীর আলী।

বের হল কারণ সে সংবাদ পেয়েছিল যে খ্রিস্টানরা এটিও দখল করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানদের এই কাফেলা দুর্গে পৌঁছে তাঁরু গাড়তে না গাড়তেই রাতে খ্রিস্টান বাহিনীও কাছে এসে ডেরা ফেলল। উভয় দল একে অপরের সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। ভোরের অন্ধকারে খ্রিস্টানরা দুর্গের দিকে অগ্রসর হলে আল-জাগালের সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষ বেধে গেল। লোকজন একে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়ল, কিছুক্ষণ পর তাকবীরের ধ্বনি এবং শব্দের আওয়াজে পরিস্থিতি স্পষ্ট হল এবং তলোয়ারগুলো খাপ থেকে বেরিয়ে এল। খ্রিস্টানরা এগোতে এগোতে আল-জাগালের তাঁরু পর্যন্ত পৌঁছে গেল কিন্তু মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিল এবং পাল্টা হামলায় লাশের স্তুপ বানিয়ে দিল। অবশেষে খ্রিস্টানরা শত শত লোক হারিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের ছাউনি থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ হস্তগত হল। [১]

আল-জাগাল গ্রানাডার উত্তর-পশ্চিমের এই অভিযানগুলোতে ব্যস্ত ছিল, এদিকে পূর্ব দিকে আলমেরিয়াতে তার ভতিজা ইউসুফ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করল। আসলে আবুল হাসান আলীর সন্তানরা আল-জাগালের শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না এবং এর ওপর নিজেদের অধিকার মনে করত। আল-জাগাল দ্রুত আলমেরিয়া পৌঁছাল এবং তলোয়ারের জোরে তা পুনরায় দখল করে নিল। এই লড়াইয়ে শাহজাদা ইউসুফ নিহত হল। [২]

ফার্ডিনান্ড এবং রানী আয়েশার মধ্যে গোপন চুক্তি:

এই সময়ে রানী আয়েশা পঞ্চম ফার্ডিনান্ডের কাছে দূত পাঠিয়ে আরও একবার শাহজাদা আবু আবদুল্লাহর মুক্তির চেষ্টা করলেন। পঞ্চম ফার্ডিনান্ড মুক্তির জন্য চড়া মূল্য নির্ধারণ করলেন এবং দাবি করলেন যে শাহজাদার বিনিময়ে চারশ খ্রিস্টান বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, শাহজাদা মুক্তির পর গ্রানাডার সিংহাসন গ্রহণ করে পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলার অনুগত থাকবে এবং আন্দালুসের বাকি শহরগুলো বিজয়ে কাস্টিলকে সাহায্য করবে, প্রতি বছর বারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর দেবে, চুক্তির বাধ্যবাধকতার নিশ্চয়তা হিসেবে আবু আবদুল্লাহর ছেলে আল-জাকা কাস্টিলে জিম্মি থাকবে। চুক্তিটি শাহজাদার মুক্তির দিন থেকে দুই বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং এই সময়ে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। রানীর পক্ষ থেকে এই দাবিগুলো মেনে নেওয়া হল এবং একটি গোপন চুক্তি সম্পন্ন হল। [৩]

পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গীকার হয়েছে

আমি তোমার আর তুমি আমার সাক্ষী

প্রতি মুহূর্তে সে কানে কানে বলে

কেউ যেন এই কথা জানতে না পারে

দর্দ নিজের পক্ষ থেকে হাজির আছে

সামনে এখন তোমার হাতেই রক্ষা [৪]

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ৭১ থেকে ৭৩, নাফহত তিব: ৫১৬/৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২১১/৩

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ২০৫, ২০৬/৫

[৪] মীর দর্দ

আবু আবদুল্লাহর মুক্তি এবং লোশার ওপর খ্রিস্টানদের দখল:

বাস্তবতা এই যে, গ্রানাডার পতনের পেছনে সেই গোপন চুক্তির বড় হাত ছিল যা সুলতান মুহাম্মদ আল-জাগালের অগোচরে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে আমির মুহাম্মদ আল-জাগালের হাতে দুই-তিনটি ময়দানে পরাজয়ের পর ফার্ডিনান্ড বুঝে গিয়েছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেওয়া না যাবে, ততক্ষণ গ্রানাডা দখল করা কঠিন। তাই সে এই গোপন চুক্তির মাধ্যমে পিতা ও পুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিল। সে শাহজাদাকে (আবু আবদুল্লাহ) মুক্তি দিল এবং তার বাহিনীর একটি দলকে তার সাথে পাঠিয়ে দিল। শাহজাদাকে সবার আগে গ্রানাডার সিংহাসন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়েছিল যাতে সে চুক্তির বাকি শর্তগুলো পালন করতে সক্ষম হয়। ফার্ডিনান্ড তার সাথে এই প্রতিশ্রুতিও করেছিল যে, যদি সে গ্রানাডার আমিরদের সাথে নিয়ে গ্রানাডা দখল করতে পারে, তবে সে কাস্টিল চুক্তির প্রতি অনুগত থেকে গ্রানাডার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখবে। ফার্ডিনান্ড আবু আবদুল্লাহকে আমিরদের আনুগত্য কেনার জন্য অটেল অর্থও দিয়েছিল।

আবু আবদুল্লাহ প্রথমে পূর্ব আন্দালুসে পৌঁছাল এবং ফার্ডিনান্ডের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে কাজ শুরু করল। ভবিষ্যতের ভয় এবং ফার্ডিনান্ডের সাথে তার বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সে বাজা এবং গুয়াডিক্সের অনেক আমিরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ফেলল এবং তারা আবু আবদুল্লাহর হাতে বায়আত গ্রহণ করল যাতে তারা ফার্ডিনান্ডের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

বিদ্রোহীদের একটি দল গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একই ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছিল। প্রাচীন গ্রানাডা শহরের প্রাচীর সংলগ্ন আল-বায়্যাজিন এলাকার মানুষ বনু নসর পরিবারের কটুর সমর্থক ছিল। তাদের মধ্য থেকে হাজার হাজার লোক আমির আল-জাগালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গ্রানাডা অবরোধ করল। ৩ রবিউল আউয়াল ৮৯১ হিজরি থেকে শুরু হওয়া এই অবরোধ আড়াই মাস পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আমির আল-জাগাল তখন পূর্বদিকের এলাকাগুলো পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। [১]

আল-জাগাল ও আবু আবদুল্লাহর চুক্তি:

এই সময়ে শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ লোশায় পৌঁছে গিয়েছিল। আল-জাগাল তার সাথে যোগাযোগ করলেন এবং তাকে অনেক কষ্টে বোঝালেন যে, এই সময়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলাফল আন্দালুস থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। অবশেষে আবু আবদুল্লাহ মেনে নিলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, গ্রানাডার সিংহাসন আল-জাগালের কাছেই থাকবে এবং শাহজাদা আবু আবদুল্লাহকে বাজা বা তার পছন্দের কোনো শহরের ইমারত দেওয়া হবে। বিরোধ মিটে যাওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করল। আবু আবদুল্লাহর শত শত সমর্থক, যারা আল-বায়্যাজিন থেকে এসেছিল, বিদ্রোহ ত্যাগ করে লোশায় পৌঁছে গেল যাতে জিহাদে শাহজাদার সাথে যোগ দিতে পারে। [২]

লোশার ওপর খ্রিস্টানদের আক্রমণ—আবু আবদুল্লাহর পুনরায় বন্দিত্ব:

আবু আবদুল্লাহ এবং আল-জাগালের এই ঐক্য ফার্ডিনান্ডের আশায় পানি ঢেলে দেওয়ার শামিল ছিল। শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ তখন লোশায় ছিলেন যখন ফার্ডিনান্ড একটি বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে শহরটি অবরোধ করল। মুসলমানরা প্রাণপণ লড়াই করে প্রতিরোধ করল কিন্তু...

[১] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৭৯, ৮০; নাফহত তিব: ৩/৫১৭, ৫১৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/২১৩, ২১৪।

[২] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৭৯, ৮০; নাফহত তিব: ৩/৫১৭, ৫১৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/২১৩, ২১৪।

তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, গ্রানাডা থেকেও কোনো সাহায্য আসেনি এবং শেষ পর্যন্ত শহরটি বিজিত হলো। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদকে গ্রেফতার করে সাথে নিয়ে গেলেন যাতে তাকে দিয়ে আরও কাজ করানো যায়। এই ঘটনাটি ২৬ জমাদিউল আউয়াল ৮৯১ হিজরির। [১]

এরপর খ্রিস্টানরা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আলবিরা, কালনিরা, মানকালিন, মাস্ত ফরিদ এবং জুহা-র দুর্গগুলো দখল করে নিল। কিছুকাল আগেই কামান আবিষ্কৃত হয়েছিল। খ্রিস্টানরা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার মুসলমানদের কাছ থেকে শিখেছিল যারা ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দী থেকে এটি সফলতার সাথে ব্যবহার করে আসছিল। আন্দালুসের খ্রিস্টানরা ধীরে ধীরে এই বিদ্যায় মুসলমানদের ছাড়িয়ে গেল। উশতা তাদের কামান তৈরির বড় কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং কনস্টান্টিনোপল পাহাড়ে কামানের গোলা তৈরি করা হতো। কামানের গোলাবর্ষণের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের জন্য দুর্গের দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলা আর খুব বেশি কঠিন ছিল না।

এই সমস্ত শহর, দুর্গ এবং জনপদ থেকে জনসংখ্যা সরিয়ে নেওয়া হলো। গ্রানাডা ছাড়া মানুষের আর কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। ফলে সব দিক থেকে গুটিয়ে এসে মুসলিম জনসংখ্যা গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম গ্রানাডার চারপাশের নববিজিত সমস্ত দুর্গগুলোকে সৈন্যবাহিনী, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন যাতে গ্রানাডার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের সময় এই সমস্ত দুর্গগুলোকে ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। [২]

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং আবু আবদুল্লাহর মধ্যে বিবেচনাধীন গোপন চুক্তি:

শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের বন্দিশালায় ছিলেন এবং তাকে এই বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে গ্রানাডা মাত্র কয়েক দিনের মেহমান, তাই খ্রিস্টান বাহিনী গ্রানাডা দখল করে মুসলমানদের গণহত্যা করার আগেই এমন কোনো চুক্তির কথা বিবেচনা করা উচিত যা আবু আবদুল্লাহ ও তার পরিবারকেও নিরাপত্তা দেবে এবং মুসলমানদেরও। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি গ্রানাডা হস্তান্তরের একটি শর্তনামা তৈরি করলেন যার প্রধান ধারাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

- গ্রানাডা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সম্পদ নিরাপদ থাকবে এবং তাদের হয়রানি করা হবে না।
- গ্রানাডায় বসবাসকারী বা স্থানান্তরিত ব্যক্তিদের কখনোই নিরস্ত্র করা হবে না।
- যারা স্থানান্তরিত হবে তাদের সম্পদ বিক্রি করার বা সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি থাকবে।
- খ্রিস্টানদের মুসলমানদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
- মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধের ক্ষেত্রে মুসলিম কাজীরাই তাদের মামলার ফয়সালা করবেন।
- কোনো মুসলমানকে অন্যের অপরাধের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে বা ভাইয়ের অপরাধের জন্য ভাইকে জবাবদিহি করতে হবে না।
- মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত বলে গণ্য করা হবে।

[১] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৭৯, ৮০; নাফহত তিব: ৩/ ৫১৮, ৫১৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/ ২১৩, ২১৪।

[২] নুবজাতুল আসর: পৃ. ৮০, ৮১; নাফহত তিব: ৩/ ৫১৮, ৫১৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস: ৫/ ২১৩, ২১৪।

- পাঁচ বছর পর্যন্ত মুসলমানরা কর থেকে অব্যাহতি পাবে, তারপর তারা ততটুকুই কর দেবে যতটুকু তারা মুসলিম শাসনামলে দিত।

আবু আবদুল্লাহর গ্রানাডা দখল:

এটা নিশ্চিত ছিল যে গ্রানাডার বর্তমান শাসক আল-জাগাল কোনো চুক্তিতে সম্মত হবেন না, বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করার চেষ্টা করবেন। গ্রানাডাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর চিন্তাধারার সাথে সংগতিপূর্ণ একজন শাসকের সিংহাসনে বসা জরুরি ছিল, যার হাতে এই ‘মহান কীর্তি’ সম্পন্ন হবে। ফার্ডিনান্ড শাহজাদা আবু আবদুল্লাহকে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তাকে গ্রানাডার বৈধ শাসক ও নিজের বন্ধু ঘোষণা করে মুক্ত করে দেন, যাতে সে আল-জাগালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গ্রানাডাকে আরও দুর্বল ও অসহায় করে দেয়। শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ডের প্রত্যাশা অনুযায়ী দক্ষিণ-পূর্ব আন্দালুসিয়ার দুর্গপতিদের কাছে পৌঁছান এবং তাদের নিজের বাইয়াতের বিনিময়ে খ্রিস্টানদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার রঙিন স্বপ্ন দেখান। দুর্গপতিরা প্রথমে প্রলোভনে প্যাঁদেয়নি, কিন্তু পরে ফার্ডিনান্ডের ক্রমবর্ধমান বিপদের কথা বিবেচনা করে তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার বাইয়াত গ্রহণ করে নেয়।

আবু আবদুল্লাহ তার দূত পাঠিয়ে গ্রানাডা রাজ্যের প্রতিটি শহর ও দুর্গের অধিবাসীদের তার বাইয়াতের দাওয়াত দেন। তবে অধিকাংশ মানুষ আবু আবদুল্লাহর দেহের মধ্যে ফার্ডিনান্ডের আত্মা দেখতে পাচ্ছিল, তাই তার বিরোধিতার তীব্রতা কমে গেল। তা সত্ত্বেও গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে কিছু জাতি-বিক্রেতা আবারও তার সমর্থক হয়ে ওঠে, তবে এবার তারা তাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখে।

ষড়যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, মুহাম্মদ আল-জাগালকে অজ্ঞাত রেখে কিছু লোক শাহজাদা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদকে নিয়ে বায়াজিনে প্রবেশ করবে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে আগে থেকে অবস্থানরত ষড়যন্ত্রের হোতারা শাহজাদার চারপাশে সমবেত হয়ে একটি মিছিলের রূপ নেবে এবং ঘোষণা করে দেওয়া হবে যে, শাহজাদার মাধ্যমে খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধি হয়ে গেছে, তাই যারা সন্ধি ও শান্তি চায় তারা শাহজাদার সাথে যোগ দিক। এভাবে জনগণের সমর্থনের মাধ্যমে সিংহাসন দখল করা হবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬ শাওয়াল ৮৯১ হিজরিতে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ গ্রানাডার বায়াজিন মহল্লায় পৌঁছান এবং সেখানে তার বাইয়াত গ্রহণ করে খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়। গ্রানাডার নাগরিকরা এই ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে এবং শাহজাদার জন্য শহরের প্রাচীরের দরজা খোলেনি। অবশেষে শাহজাদার সমর্থকরা সশস্ত্র হয়ে গ্রানাডা আক্রমণ করে। সেই সাথে তারা ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর সামরিক সাহায্যও পেয়ে যায়। আমির আল-জাগাল বেশ কয়েক দিন ধরে এই হাঙ্গামা সহ্য করতে থাকেন। অবশেষে তিনি গ্রানাডার আমিরদের এক সভায় বলেন:

“এই লোকগুলো খ্রিস্টানদের ক্রীড়নক হয়ে নিজেদের রক্ত হালাল করে নিয়েছে। এখন তলোয়ারই তাদের ফয়সালা করবে।”

[১] মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই চুক্তিটি সেই সময় কার্যকর হয়নি, এটি ছিল কেবল চুক্তির প্রস্তাবনা যা বিবেচনাধীন ছিল। পরবর্তীতে আবু আবদুল্লাহ গ্রানাডাকে বাঁচানোর জন্য কিছু শর্তও জুড়ে দিয়েছিলেন যা চুক্তির পরিপন্থী ছিল না। অবশেষে যখন সব দিক থেকে হতাশা নেমে আসে, তখন সেই গোপন চুক্তিতে কিছু ধারা যোগ করে পুনরায় আলোচনা করা হয় এবং সেগুলো বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা নিয়ে গ্রানাডাকে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই দলিলটি মে ১৩৮৫ খ্রিস্টাব্দের, যা স্পেনের মাদ্রিদ আর্কাইভে আজও সংরক্ষিত আছে। ডক্টর হিট্রি হক তার গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘ছয়ে তুম দোস্ত জিসকে’-তে এর অনুবাদ ও ছবি উপস্থাপন করেছেন। দেখুন পৃষ্ঠা ১১১ থেকে ১১৬। এই দলিলে আরও অনেক ধারা ছিল এবং প্রায় তার সবগুলোই গ্রানাডার পতনের ৬৭টি ধারা সম্বলিত মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

ওলামায়ে কেরামও তার সিদ্ধান্তের সমর্থন করেন এবং খ্রিস্টানদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা জরুরি বলে ঘোষণা করেন। ২৭ মহরম ৮৯২ হিজরিতে আমির আল-জাগাল ওয়াদি আশ এবং ওয়াদি বাস্তার মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য তলব করেন এবং গ্রানাডার দরজা খুলে নিজের সমর্থকদের সাথে নিয়ে আবু আবদুল্লাহর মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। বেশ কয়েক দিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম দীর্ঘ সময় ধরে এই তামাশা উপভোগ করতে থাকেন। এরপর তিনি যুদ্ধের দাবার এক অত্যন্ত বিপজ্জনক চাল চালেন এবং রবিউস সানি মাসে হঠাৎ বেলজ এবং মালাগার দিকে অগ্রসর হন, যা ছিল গ্রানাডা রাজ্যের শেষ উপকূলীয় শহর। খ্রিস্টানদের দখলে এটি চলে গেলে মুসলমানদের সমুদ্রপথে যাতায়াতের সব পথ বন্ধ হয়ে যেত।

আল-জাগাল বেলজ এবং মালাগার ওপর ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের আক্রমণের খবর শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি গ্রানাডায় তার সমর্থকদের আবু আবদুল্লাহর মোকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ দেন এবং সেনাবাহিনীর একটি বড় অংশ নিয়ে ২৩ রবিউস সানি দ্রুত বেলজ ও মালাগার দিকে রওনা হন। কিন্তু বেলজের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি দেখলেন যে খ্রিস্টানরা এত কঠোরভাবে অবরোধ করেছে যে শহরবাসীদের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। আল-জাগাল তার সেনাবাহিনী নিয়ে পিছু হটেন এবং পরামর্শ করতে শুরু করেন।

সন্ধ্যায় তিনি শত্রুর শিবিরের ওপর অতর্কিত হামলা চালানোর জন্য রওনা হন, কিন্তু হঠাৎ সেনাবাহিনীর আমিরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য জেদ ধরে। লক্ষ্য তাদের তাঁবুতে ফিরে আসে এবং সকালে খবর পাওয়া যায় যে খ্রিস্টানরা বেলজ দখল করে নিয়েছে। এটি ১০ জমাদিউল আউয়াল ৮৯২ হিজরির ঘটনা। এই খবরে আল-জাগালের সৈন্যদের মধ্যে চরম হতাশা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ শহর ও জনপদের দিকে চলে যায়। আল-জাগাল অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে দ্রুত গ্রানাডার দিকে রওনা হন, কিন্তু পথে খবর পান যে পাঁচ দিন আগেই আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ গ্রানাডা দখল করে নিয়েছেন। ৫ জমাদিউল আউয়াল কিছু বিশ্বাসঘাতক তার জন্য শহরের দরজা খুলে দিয়েছিল, শহরের অবশিষ্ট রক্ষীবাহিনীকে হত্যা করা হয়েছিল। এভাবে গ্রানাডার সিংহাসনে খ্রিস্টানদের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন দুর্বল শাসক আসীন হন। আল-জাগাল এই খবর পেয়ে হতাশ হয়ে কোহে আল-বাশারা অতিক্রম করে ওয়াদি আশ-এ চলে যান এবং সেখানকার কিছু দুর্গে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। [১] এভাবে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট গ্রানাডা রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রানাডা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় আবু আবদুল্লাহর শাসন চলত এবং দক্ষিণ-পূর্বে ওয়াদি আশ, মালাগা, বাস্তা ও আলমেরিয়াতে আল-জাগালের শাসন ছিল।

মালাগার পতন:

এদিকে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের বাহিনী বেলজের পর সরাসরি মালাগা ঘেরাও করে। মালাগার মুসলমানরা খোলা ময়দানে এসে খ্রিস্টানদের প্রতিরোধ করে এবং তাদের ওপর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় যে মাত্র একদিনে সাড়ে বারো হাজার খ্রিস্টান নিহত হয়। তবে খ্রিস্টানরা শহরটিকে স্থল ও জলপথে অবরোধ করে বাকি দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর অবরুদ্ধ যুদ্ধ কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে। মালাগার রণাঙ্গন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানদের সমুদ্রের ওপর থেকে কোনো সাহায্য...

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ৬০ থেকে ৬২।

মানা সম্ভব হতো। যেহেতু মালকা (মালাগা) আয-যাগালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই গ্রানাডা থেকে মালকায় কোনো সাহায্য পৌঁছেনি, তাছাড়া আবু আবদুল্লাহ কাস্টিলের রাজার সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন।

আয-যাগালের কাছে এত শক্তি ছিল না যে তিনি মালকার অবরোধ ভাঙতে পারেন। তবে তাঁর পূর্ণ চেষ্টা ছিল যে বহির্বিশ্বের ইসলামি দেশগুলো থেকে সাহায্য নিয়ে কোনোভাবে আন্দালুসের শেষ নিঃশ্বাসগুলোকে বাঁচিয়ে নেওয়া যায়। তাঁর দূতগণ ৮৯২ হিজরির শেষভাগে মিশরের মামলুক শাসক সুলতান আশরাফ কাইতবে (মৃ. ৯০১ হি.)-এর দরবারে পৌঁছান এবং মালকাকে বাঁচানোর জন্য নৌবাহিনী পাঠানোর আবেদন করেন। মিশর তখন শান-শওকতের শিখরে ছিল, তবে মিশর ও উসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল এবং যুদ্ধের আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এমন পরিস্থিতিতে কাইতবে আন্দালুসীয়দের জন্য সাহায্য পাঠানোর পরিবর্তে কূটনৈতিক সাহায্যের পথ বেছে নেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের কিছু পাদ্রিকে প্রতিনিধি বানিয়ে স্পেনের খ্রিস্টান শাসক ও পোপের কাছে পাঠান যাতে আন্দালুসের মুসলমানদের গণহত্যা বন্ধ করা হয়।

সুলতান কাইতবের দূতগণ তখনো পথেই ছিলেন যখন মালকার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। সৈন্য ও নাগরিকরা ক্ষুধায় মরতে শুরু করে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই পরিস্থিতিতে জান ও মালের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে মালকার দরজা খুলে দেন, কিন্তু খ্রিস্টানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নারী ও শিশুসহ সবাইকে বন্দি করে নেয় এবং পুরো শহর লুণ্ঠন করে। এই ট্র্যাজেডি ৮৯২ হিজরির শাবান মাসের শেষ দিকে ঘটেছিল। এরপর পুরো আন্দালুসে গ্রানাডা শহর ছাড়া মুসলমানদের কাছে এমন কোনো বড় শহর অবশিষ্ট ছিল না যা স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল। [১]

এই যুগের পরিবর্তন, এই সুখ ও দুঃখের শিরোনাম... যেন প্রকৃতির ভাষা কোনো উপাখ্যান বলছে। [২]

মিশরের বাদশাহর পত্র এবং পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের উত্তর:

মালকার পতনের কয়েক মাস পর সুলতান কাইতবের দূতগণ প্রথমে পোপ এবং তারপর পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের কাছে পৌঁছান। কাইতবে তাঁর পত্রে কাস্টিলের রাজাকে এই হুমকিও দিয়েছিলেন যে, যদি তাঁর বাহিনী ফিরে না যায় তবে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা ‘কিয়ামাহ’ (সেন্ট জন) বন্ধ করে দেবেন। তবে এই সতর্কবার্তায় কোনো ফল হয়নি। পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড উত্তরে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে সুলতান কাইতবেকে লিখেছিলেন:

“আমরা প্রজাদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রিস্টান হিসেবে কোনো পার্থক্য করি না। কিন্তু আমরা আমাদের ভূমি বিদেশিদের দখলে দেখতে পারি না। মুসলমানরা নিজেরাই আমাদের নেতৃত্বে মনেপ্রাণে সম্মত।”

অন্যান্য দেশেও আয-যাগালের দূতগণ ব্যর্থ হন। তবে স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদের কিছু দল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আয-যাগালের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। [৩]

পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলোর পতন। আয-যাগালের আত্মসমর্পণ:

পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড গ্রানাডা দখলের আগে সমস্ত পূর্বাঞ্চলীয় শহর জয় করতে চেয়েছিলেন যাতে পূর্ব দিক থেকে গ্রানাডায় সাহায্য বা রসদ পৌঁছানো...

[১] নাইলাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ৯০ থেকে ৯৫, দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৪২৪ থেকে ৪২৭।

[২] শাকিল বাদায়ুনি।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৪১৯ থেকে ৪৩১।

এর প্রতিটি সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু শহর সুলতান আল-জাগালের অধীনে ছিল এবং কিছু আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের সাথে চুক্তিতে শরিক হয়ে কাস্টিলকে করও প্রদান করছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী খ্রিস্টানরা এই শহরগুলোর বাসিন্দাদের সমস্ত অধিকার দিতে, শরয়ী আদালতগুলো বহাল রাখতে এবং নাগরিকদের সম্মান ও মর্যাদা এবং জান-মালের পূর্ণ খেয়াল রাখতে বাধ্য ছিল। তা সত্ত্বেও কাস্টিলের বাহিনী ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে (৮৯৩ হিজরি) বসন্তকালে এই শহরগুলোতে আক্রমণ করে এবং কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সব দখল করে নেয়। এই শহরগুলোর মধ্যে বেরা, পালিশটিন এবং লশকর উল্লেখযোগ্য। বিজয়ের পর খুব শীঘ্রই চুক্তির প্রতিটি ধারাকে বিন্ধিত করে দেওয়া হয় এবং মানুষের সাথে অমানবিক আচরণে কোনো ত্রুটি রাখা হয়নি।

রজব ৮৯৪ হিজরিতে কাস্টিল মোনজার দুর্গ জয় করে নেয়। এরপর আল-মুনাক্কাবের ওপর আক্রমণ হয় যা মালাগা এবং আলমেরিয়া উভয় থেকে সমান দূরত্বে ছিল। এখানকার শাসক মুহাম্মদ বিন আল-হাজ পরিণতির পরোয়া না করে তিন মাস পর্যন্ত শহর রক্ষা করেন। পরিশেষে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম তাকে সমস্ত আমির ও জেনারেলসহ সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চুক্তি করেন যাতে স্থির হয় যে, মুসলমানরা তাদের শহরে পূর্ণ স্বাধীনতায় বসবাস করবে, মসজিদগুলো আবাদ থাকতে দেওয়া হবে, জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা পাবে, বারুদ ছাড়া তারা সব ধরনের অস্ত্র সাথে রাখতে পারবে। এভাবে মহররম ৮৯৫ হিজরিতে (ডিসেম্বর ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ) আল-মুনাক্কাবও কাস্টিলের অংশ হয়ে যায়।

এই সময়ে খ্রিস্টানরা বাজা-র ওপরও আক্রমণকারী হয়েছিল যার পর আলমেরিয়ার বেঁচে থাকাও কঠিন ছিল কারণ এর প্রতিরক্ষা বাজা-র হেফাজতের ওপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতান আল-জাগাল যদি তার কেন্দ্র ওয়াদি আশ থেকে বের হয়ে বাজা-র হেফাজতের জন্য যেতেন তবে ওয়াদি আশের ওপর আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তাই আল-জাগাল তার জামাতা ইয়াহইয়া আন-নাইয়ারকে, যিনি আলমেরিয়ার শাসকও ছিলেন, কিছু সৈন্য দিয়ে বাজা-তে পাঠিয়ে দেন। তিনি এখানকার যোদ্ধা মুসলমানদের সাথে নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কয়েক মাস পর্যন্ত কাস্টিলের বাহিনীকে রুখে রাখেন। অবশেষে মহররম ৮৯৫ হিজরির শেষে এখানেও খাদ্যের মজুদ শেষ হয়ে যায় এবং ইয়াহইয়া আন-নাইয়ার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

২৫ ডিসেম্বর ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে (১৯ মহররম ৮৯৫ হিজরি) আলমেরিয়ার নিকট খ্রিস্টানদের সামরিক ছাউনিতে একটি চুক্তি হয় যাতে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম বাজা এবং আলমেরিয়া হস্তান্তরের বিনিময়ে ইয়াহইয়া আন-নাইয়ারকে কাস্টিলে রাজপুত্রদের মতো সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার এবং বাজা-বাসীদের সব ধরনের স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। এভাবে আন-নাইয়ার বাজা খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন।

এরপর পূর্ব আন্দালুসে আল-জাগালের ঘাঁটি, ওয়াদি আশ এবং আলমেরিয়া ছাড়া মুসলমানদের কাছে আর কোনো দুর্গ অবশিষ্ট রইল না। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম আলমেরিয়া থেকে আল-জাগালের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাব্য পথগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে প্রথমে ওয়াদি আশের দিকে অগ্রসর হন। আল-জাগাল তার সাহস ও বীরত্ব সত্ত্বেও এখন কিছু করার সামর্থ্য রাখতেন না। তার কাছে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ এবং সংক্ষিপ্ত এক বাহিনী ছাড়া আর কিছুই ছিল না যারা একটি শহরকে কোনোমতে সামলে রেখেছিল। কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। হতাশ হয়ে আল-জাগাল নিজেই ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং নিজের জন্য আন্দারুশ-এর দুর্গসহ কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করিয়ে ওয়াদি আশ খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেন। এটি সফর ৮৯৫ হিজরির ঘটনা।

গত বছর তো কেবল কলিগুলোই ঝরেছিল কিন্তু এবার...

বাগানে শরতের লক্ষণগুলো অন্যরকম।

না আছে লস্কর, না আছে পতাকা, না আছে দৌলত, না আছে ঐশ্বর্য... ধূলিধূসরিতদের চিহ্নগুলো অন্যরকম। [১]

এখন পর্যন্ত আলমেরিয়ার আমিররা ইয়াহইয়া আন-নায়ারের পরাজয় স্বীকার করা সত্ত্বেও আলমেরিয়া হস্তান্তর করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু আল-জাগাল আত্মসমর্পণ করার পর ফার্ডিনান্ড তাদেরও একইভাবে একটি চমৎকার চুক্তি ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে শহরের দরজা খুলতে রাজি করিয়ে নেন। এভাবে রবিউল আউয়াল ৮৯৫ হিজরিতে পূর্ব আন্দালুসের শেষ শহর বাযাতাও পতন ঘটে। [২]

সাধারণত মনে করা হয় যে, আমির আল-জাগাল শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের ভতিজা আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ফার্ডিনান্ডের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন, যাতে আবু আবদুল্লাহর নিজের শাসনসহ ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এটি কেবল একটি ধারণা মাত্র, যার কোনো প্রমাণ নেই। যদি দেখা যায়, তবে আল-জাগাল বহু বছর ধরে খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং বীরত্বের সাথে তার বড় ভাই আবুল হাসানের মতো যথাসম্ভব নিজের দেশকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আবু আবদুল্লাহর বোকামি, ফার্ডিনান্ডের চাল এবং এই দুনিয়ার প্রতি ইসলামী বিশ্বের উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত তাকে একেবারে অসহায় করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আন্দালুসের বাঁচার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তখন তলোয়ার ফেলে দিয়েছিলেন যখন তা চালানো নিরর্থক ছিল। তবে এতটুকু কথা অবশ্যই সত্য যে, তিনি যদি শেষ পর্যন্ত লড়তেন এবং এই প্রচেষ্টায় প্রাণ দিতেন, তবে ইতিহাসে তার নাম সোনালী অক্ষরে লেখা হতো এবং তাকে নিজের ত্রাণকর্তা মনে করা অনেক মুসলমান তার বিরুদ্ধে দুঃখ ও ক্ষোভে লিপ্ত হতো না। [৩]

(২১) আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ একাদশ

(৮৯৫ হিজরি থেকে ৮৯৭ হিজরি / ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ)

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের শাসনকাল নির্ধারণে দুটি বড় ভুল ধারণা রয়েছে: এক হলো, আবু আবদুল্লাহ যখন সুলতান আবুল হাসানের আমলে বিদ্রোহ করে এক বছর গ্রানাডা দখল করে রেখেছিলেন, তখন তাকে সেই সময়ের সুলতান মনে করা হয়; অথচ প্রকৃত সুলতান তখন আবুল হাসান ছিলেন যার শক্তি মালাগাতে বহাল ছিল। দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি হলো, আবু আবদুল্লাহ যখন ৮৯২ হিজরিতে পুনরায় গ্রানাডা দখল করেন, তখন থেকে তাকে গ্রানাডার সুলতান মনে করা হয়; অথচ সুলতান আবুল হাসানের পক্ষ থেকে আল-জাগাল সুলতান মুহাম্মদ আল-জাগাল হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন এবং তার পদত্যাগ অর্থাৎ সফর ৮৯৫ হিজরি পর্যন্ত পূর্ব গ্রানাডার সুলতান তিনিই ছিলেন। সুতরাং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের সালতানাতের আসল সময়কাল সফর ৮৯৫ হিজরি (জানুয়ারি ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু হয়।

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ এবং মুসা বিন আবি আল-গাসসান:

গ্রানাডার নতুন বাদশাহ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের ফার্ডিনান্ডের প্রতিটি বিজয়কে নিজের বন্ধুর বিজয় মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, তিনি তার শান্তিপ্রিয় নীতি দ্বারা খ্রিস্টানদের নিজের একনিষ্ঠ বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। তাকে...

[১] নাসির কাজমি

[২] নুবদাতুল আসর: পৃ. ৯০ থেকে ৯৯; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৪৩০/৫-৪২৫

[৩] নুবদাতুল আসর: পৃ. ৯০ থেকে ১০১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৪৩০/৫

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা — ৬৮৬

বিশ্বাস ছিল যে তিনি একটি দীর্ঘ ও শান্তিপূর্ণ শাসনকাল লাভ করবেন এবং বিশ্ব তাকে আন্দালুসের মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করবে। তবে হঠাৎ করেই তার চিন্তাধারায় এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তিনি পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের মোকাবিলায় কোমর বেঁধে নামেন। ঐতিহাসিকদের মতে, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তনের পেছনে গ্রানাডার সেনাপতি মুসা বিন আবি আল-গাসসানের বড় হাত ছিল। মুসা বিন আবি আল-গাসসান গ্রানাডার ইতিহাসের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের স্বাধীনতা, মুক্তি এবং জিহাদের চেতনার সেই উজ্জ্বল মিনার ছিলেন, যার মহত্ত্ব ও বীরত্ব সারা বিশ্ব স্বীকার করেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে যখন গ্রানাডা চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়েছিল, মুসা বিন আবি আল-গাসসানই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আন্দালুসের মুসলমানদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করার বার্তা দিচ্ছিলেন। তিনি রাজপরিবারের সদস্য এবং আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তার বাগ্মিতায় মানুষের আবেগ পরিবর্তনের এক অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আবু আবদুল্লাহকে ক্রমাগত উৎসাহিত করতে থাকেন যে, এটি জাতীয় ও ধর্মীয় আত্মমর্যাদায় সজ্জিত হয়ে জিহাদের ময়দানে নামার সময়। আবু আবদুল্লাহ হয়তো মুসার কথায় কখনোই এতটা প্রভাবিত হতেন না, কিন্তু ৮৯৫ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে যখন পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড তার মুখ থেকে বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলেন, তখন আবু আবদুল্লাহকে মুসা বিন আবি আল-গাসসানের মত মেনে নিতে হয়।

পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড হঠাৎ গ্রানাডার সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ভেঙে ফেলেন এবং তার অন্যান্য সীমান্ত দুর্গ মালাহাদা ও হামদানকে বিশাল সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং খাদ্য ও রসদ দিয়ে পূর্ণ করতে শুরু করেন। এরপর তিনি আবু আবদুল্লাহর কাছে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন রাজপ্রাসাদ আলহামরা, সরকারি ভবনসমূহ এবং গ্রানাডার কেন্দ্রীয় অংশ তার হাতে তুলে দেন এবং তার অনুগত হয়ে গ্রানাডায় অবস্থান করেন অথবা আন্দালুসের অন্য কোনো শহরে বসবাস শুরু করেন। তার পূর্ণ আর্থিক ভরণপোষণ নিশ্চিত করা হবে।

আবু আবদুল্লাহ নীতিনির্ধারকদের (আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ) একটি সভা ডেকে পরিস্থিতি তুলে ধরেন। মুসা বিন আবি আল-গাসসানসহ অধিকাংশ আমির পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের দাবি প্রত্যাখ্যান করার ওপর জোর দেন। তাদের আশা ছিল যে খ্রিস্টানদের পিছু হটানো সম্ভব।

রবিউল আউয়াল ৮৯৫ হিজরি (ফেব্রুয়ারি ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ) মাসে আবু আবদুল্লাহ আবুল কাসেম আব্দুল মালিককে দূত হিসেবে পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের কাছে পাঠান এবং গ্রানাডার পরিস্থিতি বর্ণনা করে অনুরোধ করেন যেন শহর হস্তান্তরের বিষয়ে জেদ না করা হয়। কিন্তু পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড তার দাবি বহাল রাখেন। আবুল কাসেমের ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসায় আবু আবদুল্লাহ অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তার উজির ইউসুফ বিন কামাশাকে আন্দালুসের একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ইব্রাহিম কায়সির সাথে আবারও একই অনুরোধ নিয়ে কাস্টিলে (কুস্তালিয়া) পাঠান। খ্রিস্টানদের সাথে ইব্রাহিম কায়সির অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এই বিষয়ে তার সুপারিশও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই প্রতিনিধি দলটিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। [১]

আবু আবদুল্লাহর সাহস এবং ফার্ডিন্যান্ডের সাথে যুদ্ধ:

এরই মধ্যে আবু আবদুল্লাহ পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডকে আলহামরায় আসার আমন্ত্রণ জানান। তাকে কিছু বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জবাব যেন প্রতারণার মাধ্যমে দেওয়া হয় এবং তাকে আলহামরায় ডেকে এনে হঠাৎ ঘেরাও করা হয়। যদি কাস্টিলের রাজা বন্দী হন, তবে বিনিময়ে খ্রিস্টানদের কাছ থেকে যেকোনো দাবি আদায় করা সম্ভব হবে। আবু আবদুল্লাহ এতে সম্মতি দেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে...

মজলিসে খ্রিস্টানদের গোয়েন্দা উপস্থিত ছিল। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম যখনই আবু আবদুল্লাহর সংকল্পের কথা জানতে পারল, সে সৈন্যবাহিনী নিয়ে গ্রানাডার ওপর চড়াও হলো এবং আশেপাশের ফসল ও বাগানগুলো পুড়িয়ে দিতে লাগল। [১] আবু আবদুল্লাহর মতো একজন দুর্বল শাসক তখন এমন এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা সহ্য করা পাহাড়ের মতো কলিজা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যও কঠিন ছিল। গ্রানাডা ছাড়া পুরো আন্দালুস খ্রিস্টানদের দখলে চলে গিয়েছিল। আশেপাশের এলাকা থেকে হিজরত করে আসা মুসলমানদের মিলিয়ে এখন গ্রানাডায় প্রায় চার লক্ষ মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল। এই লোকেরা কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না যে গ্রানাডাকে খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে মানুষ বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করত না। অবশেষে আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ড পঞ্চমকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে, বিষয়টি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সে গ্রানাডাকে তার হাতে তুলে দেবে না। এমনটা করা হলে আমীররা বিদ্রোহ করে বসবে।

সে প্রথমবারের মতো ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের বিরুদ্ধে তলোয়ার কোষমুক্ত করল এবং গ্রানাডার মুজাহিদদের নিয়ে মোকাবিলায় বেরিয়ে এল। এটি ছিল তার এক নতুন রূপ, যা ফার্ডিনান্ড পঞ্চম মোটেও আশা করেনি। রবিউল আউয়াল থেকে রজব ৮৯৫ হিজরি পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হলো। মুসা বিন আবি আল-গাসসান এবং আবু আবদুল্লাহর নেতৃত্বে গ্রানাডাকে নিজেদের শেষ দুর্গ মনে করে লড়াইরত মুসলমানদের জোশ ও জযবার সামনে ক্রুশপূজারীদের বারবার পিছু হটতে হলো। অবশেষে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম তার বাহিনী নিয়ে ফিরে গেল। আবু আবদুল্লাহ তার ফিরে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে বুজদাল এবং বাশরাহ-র মতো কিছু পার্শ্ববর্তী দুর্গ জয় করে নিলেন।

আন্দালুসের মুসলমানরা আবু আবদুল্লাহকে একজন সাহসী সৈনিকের রূপে দেখে এক ক্ষীণ আশায় তার সাথে যোগ দিয়েছিল। আল-বাশারাত এবং ওয়াদি আশ-এর পরাধীন মুসলমানরা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং তারা খ্রিস্টান শাসকদের বিতাড়িত করে আবু আবদুল্লাহর আনুগত্য ঘোষণা করল। [২] আবু আবদুল্লাহর এই সাহস অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য ছিল, তবে এটিও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা যে মুসলমানদের এই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে তার বোকামিগুলোর বড় ভূমিকা ছিল। যদি সে কয়েক বছর আগে তার পিতার বিরুদ্ধে ঠিক সেই সময়ে বিদ্রোহ না করত যখন মুসলমানরা ফার্ডিনান্ডের দৃঢ় মোকাবিলা করছিল, তবে হয়তো আন্দালুসের ইতিহাস ভিন্ন হতো। এখন যখন আবুল হাসান মারা গেছেন এবং কত শত শ্রেষ্ঠ সৈনিক বিভিন্ন রণাঙ্গনে পিছু হটার সময় শহীদ হয়ে গেছেন এবং কত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তার যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসা ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করতে পারত না।

যাদের দেখার শখ ছিল, তারা তো বিদায় নিয়েছেন

হে সাকি! মাহফিলে তুমি আগুনের পেয়ালা নিয়ে এলে তো কী হয়েছে?

হায়! যখন বাগানের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে

তখন ফুলের কাছে বসন্তের বাতাসের বার্তা এলে তাতে কী আসে যায়? [৩]

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৩৭; নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১০০ থেকে ১০৯

[৩] ইকবাল

শাবান মাসে আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ পুনরায় খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করতে বের হলেন, তিনি গ্রানাডার দক্ষিণ-পূর্বে উপকূলের নিকটবর্তী আন্দারশ দুর্গের দিকে অগ্রসর হলেন। [১]

আল-জাগালের আফ্রিকা গমন:

আবু আবদুল্লাহর চাচা আল-জাগাল সন্ধির পর এখানেই অবস্থান করছিলেন। আবু আবদুল্লাহর আগমনের খবর শুনে তিনি আন্দারশ থেকে বের হয়ে আল-শুবানিয়াতে গিয়ে অবস্থান নিলেন। এখন তার কাছে নামমাত্র শাসনের জন্য কোনো শহর বা দুর্গ অবশিষ্ট ছিল না। তিনি দীর্ঘ সময় এই পরাধীন জীবন সহ্য করতে পারলেন না এবং অবশেষে চিরতরে আন্দালুস ছেড়ে মরক্কোর তিলিমসান শহরে চলে গেলেন এবং সেখানেই অজ্ঞাতনামা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেন। [২]

আবু আবদুল্লাহর কয়েকটি দুর্গ ও অস্ত্রভাণ্ডার দখল:

এদিকে আবু আবদুল্লাহ আন্দারশ দখল করে নিলেন এবং এরপর বারজাহ ও দালিয়াদ দুর্গও কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই জয় করলেন। তবে রমজান মাসে খ্রিস্টানরা পাল্টা আক্রমণ করে আন্দারশ দুর্গ পুনরায় দখল করে নেয়। আবু আবদুল্লাহ এই খবর শুনে মুজাহিদদের সাথে নিয়ে খ্রিস্টানদের অন্য একটি শক্তিশালী দুর্গ হামদানের ওপর আক্রমণ করলেন। এখানে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে শত শত মুসলমান প্রাণ বিসর্জন দেন। তারা দুর্গের প্রাচীর ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং এখানকার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যভাণ্ডার দখল করে নেন, যা গ্রানাডার ওপর চূড়ান্ত আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল।

গ্রানাডার প্রতিরক্ষার জন্য বিদেশি রাষ্ট্রগুলো থেকে রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। রমজানের শেষ দিকে আবু আবদুল্লাহ আল-মুশাব্বাক অভিমুখে যাত্রা করলেন যাতে মরক্কো ও আন্দালুসের মধ্যবর্তী পথ পুনরুদ্ধার করা যায়। তিনি শুলুবানিয়া দুর্গ আক্রমণ করে তা কঠোরভাবে অবরোধ করলেন। কিন্তু এরই মধ্যে সংবাদ এলো যে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম গ্রানাডার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আবু আবদুল্লাহ অবরোধ ছেড়ে গ্রানাডায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের গ্রানাডা আক্রমণ:

তিন-চার দিন পর ফার্ডিনান্ড তার বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রানাডার প্রাচীরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তার সাথে ছিল বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থান্বেষী ও মুরতাদদের একটি দল যারা গ্রানাডার প্রতিরক্ষা দুর্বলতা এবং তা দখলের সফল উপায় সম্পর্কে তাকে অবহিত করছিল। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এক সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রানাডার সামনে অবস্থান করলেন। তিনি আক্রমণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিলেন। আসলে সেই দিনগুলোতে ক্যাস্টিল ও ফ্রান্সের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল এবং ফার্ডিনান্ডকে তার উত্তর সীমান্তে যেতে হয়েছিল। তার ধারণা ছিল যে আবু আবদুল্লাহ বারবার বাইরে বের হবেন এবং ক্যাস্টিলের সীমান্তের সমস্ত ছোট ছোট দুর্গ বিনা বাধায় জয় করে নেবেন। তাই ফিরে যাওয়ার পথে তিনি মালাহা, রুমা, মারতিন, কুরনিয়া, বিলুজাত, আন্দারশ এবং...

[১] নুবদাতুল আসর ফি আহওয়াল মুলুক বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১১১; নাফহত তিব: ৩/৫২৩; আল-আলাম লিজ-জিরিকলি: ৬/২৮৯, ২৯০।

[২] নুবদাতুল আসর ফি আহওয়াল মুলুক বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১১১; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস লি-আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৩৭।

আলমুদাওয়ারসহ বেশ কিছু দুর্গ ধ্বংস করে দেওয়া হলো। এই সময়ে ওয়াদিয়ে আশ অতিক্রম করার সময় সেখানকার সেই সমস্ত মুসলমানদের অত্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে নির্বাসিত করা হলো, যারা আগে আল-গারনাতে ওপর আস্তা রেখে কাস্টিলের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল এবং এখন আবু আবদুল্লাহর সাথে যোগ দিয়েছিল। [১]

অসহায় মুসলমানদের আফ্রিকা ও গ্রানাডায় স্থানান্তর:

ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের প্রস্থানের সুযোগ নিয়ে গ্রানাডার মুসলমানরা পুনরায় জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ল। মারশানা, আলফিয়ানা, ওয়াদিয়ে আশ এবং ওয়াজরের মুসলমানরা আবারও গ্রানাডার পতাকাতলে সমবেত হলো। তবে এসব স্থানের কোনোটিই নিরাপদ ছিল না, তাই আবু আবদুল্লাহর নির্দেশে এখানকার হাজার হাজার মুসলমানকে গ্রানাডায় স্থানান্তরিত করা হলো। সেই সাথে এখানকার বিশাল কৃষি অঞ্চলের ফসল কেটে শস্যও গ্রানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো, যাতে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় গ্রানাডা দীর্ঘস্থায়ী অবরোধ সহ্য করতে পারে। এই অভিযানের পর আবু আবদুল্লাহ ২৩শে জিলকদ গ্রানাডায় ফিরে আসেন। [২]

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এই সময়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করতে থাকেন। তিনি বিজিত শহরগুলোর মুসলমানদের অনুমতি দিলেন যে তারা যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আস-সাকরিয়া এবং বাস্তার অসংখ্য মুসলমান গ্রানাডায় চলে আসে। তাদের একটি বিশাল অংশ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মরক্কোতে চলে যায় এবং একের পর এক শহর মুসলমান শূন্য হয়ে পড়ে। [৩]

এটি দেখে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম ঘোষণা করে দিলেন যে, যেসব মুসলমান নিজেদের এলাকা ছেড়ে গ্রানাডায় চলে গেছে, তাদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা রয়েছে, তারা যেন ফিরে আসে। এই ঘোষণায় বিশ্বাস করে গ্রানাডায় আসা হাজার হাজার মুসলমান পুনরায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গেল। [৪]

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১১২ থেকে ১১৩

[২] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১১৬

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/ ৩৩৮

[৪] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১১৭

সুকূতে গ্রানাডা (গ্রানাডার পতন)

ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলার এই বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রানাডা বিজয় না হচ্ছে, আন্দালুসের মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার শিখা জ্বলতেই থাকবে। তাই ৮৯৬ হিজরির জমাদিউল আখিরা (এপ্রিল ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ) বসন্তকালে তারা এই সংকল্প নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো যে, এবার আল-হামরা বিজয় না করে তারা কিছুতেই ফিরে যাবে না। তারা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্রানাডার দিকে রওনা হলো (কিছু ঐতিহাসিক এই সংখ্যা আশি হাজার বলেছেন)। খ্রিষ্টানরা গ্রানাডার কাছে পৌঁছে গমের প্রস্তুত ফসল ধ্বংস করে দিল। ফার্ডিনান্ড গ্রানাডার সামনে একটি প্রাচীরবেষ্টিত ছাউনি তৈরি করালো যাতে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এখানে অবস্থান করা যায়। এই ছাউনিটি একটি শহরের রূপ ধারণ করল যা “সান্টা ফে” নামে পরিচিত হলো। এটি আন্দালুসের একমাত্র শহর ছিল যেখানে কোনো মুসলমান কখনো পা রাখেনি। [১]

মুসার স্লোগান:

গ্রানাডার মুসলমানরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফার্ডিনান্ডের বিশাল বাহিনীর মোকাবিলা করতে থাকল। তাদের সাহস বাড়ানোর জন্য সেনাপতি মুসা বিন আবি আল-গাসসান অগ্রভাগে ছিলেন। তার এই স্লোগান সবার মুখে মুখে ছিল:

“খ্রিষ্টান রাজারা জেনে রাখুক যে, আরবরা কেবল ঘোড়সওয়ারি এবং নেজাবাজির জন্যই জন্ম নিয়েছে।”

গ্রানাডার নামকরা জেনারেল নাজ্জিম বিন রিজওয়ান এবং মুহাম্মদ বিন জায়েদা মুসার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিলেন, যারা খ্রিষ্টানদের এই প্লাবনকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তারা আল-সুগরি শহরের প্রাচীরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। [২]

গেরিলা যোদ্ধাদের সফল অভিযান:

এই সময়ে গ্রানাডার দক্ষিণ-পূর্ব দিক নিরাপদ ছিল এবং আল-বাশারাতে গ্রামবাসীরা আল-হুলাইমের পথ দিয়ে গ্রানাডায় নিয়মিত রসদ পাঠাচ্ছিল। যার মধ্যে ছিল গম, যব, খড়, জয়তুনের তেল, কিশমিশ এবং অন্যান্য স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য। এই সময়ে ছোট ছোট দুর্গের মুজাহিদিনরা খ্রিষ্টানদের ওপর গেরিলা হামলা শুরু করে দিল। আল-ফাখার, বালিয়ানা, রাসানা, বালফির, বাখুর, জাদওয়াতি, রামলা আল-কাওম, আল-রাবিত এবং ওয়াদি মিশিলের লড়াকু মুসলমানরা তাদের শত শত অভিযানে হাজার হাজার খ্রিষ্টানকে মৃত্যুর মুখে পাঠাল। গেরিলা যোদ্ধারা খ্রিষ্টানদের রসদ এবং গবাদি পশুও লুট করে নিল।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৩৬; মুরস ইন স্পেন, লেন পুল: পৃ. ১৫৩

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৩৯

...তীব্রতা দেখাল, এমনকি গ্রানাডায় মাংস সস্তা হয়ে গেল। [১]

তুষারপাত এবং গ্রানাডায় দুর্ভিক্ষ:

তবে বাস্তবতা এটাও ছিল যে, মুসলমানরা কেবল সময়ক্ষেপণের জন্য লড়ছিল। কোনো গৌরবময় বিজয়ের সম্ভাবনা দূর-দুরান্ত পর্যন্ত ছিল না। বাইরের সাহায্যের সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বনু মারিনের পর মরক্কোতে ক্ষমতায় আসা বনু ওয়াভাসদের সরকার এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, পর্তুগালের বাহিনী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাদের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর তানজাহ এবং সাবতাহ দখল করে নিয়েছিল। গ্রানাডার মুসলমানরা সমুদ্র ও স্থল উভয় দিক থেকেই অবরুদ্ধ ছিল। সাত মাস ধরে এই সংঘর্ষ চলতে থাকে। নাসারাদের দূর-দুরান্তের শহরগুলো থেকে ক্রমাগত সাহায্য আসছিল, অন্যদিকে মুসলমানদের জনশক্তি ছিল সীমিত।

এই সময়ে শীতকাল শুরু হয়ে গেল। তুষারপাত হতে লাগল, কোহে শালির এবং সিয়েরা নেভাদার চূড়া ও ঢালগুলো বরফে ঢেকে গেল। আল-বাশারাত থেকে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে গেল। গ্রানাডায় স্থানীয় জনসংখ্যার সাথে আশেপাশের লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষ একত্রিত হয়েছিল, তাই রসদ বন্ধ হতেই শহরে খুব দ্রুত দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলো। বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ শহীদ বা আহত হয়েছিলেন। সংঘর্ষের ধারা মন্তর হয়ে পড়ল। দুই মাস পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি। শহরবাসী যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত না হলেও অনাহার তাদের অসহায় করে তুলল। [২]

অবশেষে আবুল কাসেম আব্দুল মালিক দরবারে ঘোষণা করলেন যে, মাত্র কয়েক দিনের রেশন বাকি আছে, সেনাবাহিনী এবং জনগণ সাহস হারিয়ে ফেলেছে। আরও প্রতিরোধ নিরর্থক। মুসা বিন আবি আল-গাসসান ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি আত্মসমর্পণ করার কথা বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন এবং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, শহরের প্রতিরক্ষা আমাদের ওপর ফরজ। তিনি সালতানাতের আমিরদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করতে উৎসাহিত করেন। আবু আব্দুল্লাহ হতাশাজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও তার কথা মেনে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। [৩]

শেষ লড়াই:

শহরের দরজাগুলো দীর্ঘকাল ধরে বন্ধ ছিল। মুসা সেগুলো খোলার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন: “আমরা আমাদের দেহ দিয়ে দরজাগুলো রক্ষা করব।”

তার কথাগুলো শহরে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করল এবং চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। গ্রানাডার যুবকরা নতুন সাহসের সাথে নাসারাদের ওপর জোরালো আক্রমণ শুরু করল। নাসিম বিন রিদওয়ান এবং মুহাম্মদ বিন জায়েদা প্রথম সারির যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এই বাহিনী দিনরাত ক্রুসেডার বাহিনীর ওপর বজ্রের মতো আঘাত হানতে থাকে। যখনই নাসারাদের কোনো দল শহরের কাছে আসত, এই লোকেরা ঈগলের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। মুসা তার সৈন্যদের বলতেন: “আমাদের জন্য এই...

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ১১৮, ১১৯

[২] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ১২০ থেকে ১২৪; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/ ২৩০

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/ ২৩৯, ২৪০

...ব্যতীত এমন কোনো ভূমি নেই যার ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি। একে হারিয়ে আমরা আমাদের নাম-পরিচয়, ঘরবাড়ি এবং স্বদেশ সবকিছুই হারিয়ে ফেলব।

অবশেষে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম শহরে বড় ধরনের আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। খ্রিস্টানরা একটি স্রোতের মতো সারি বেঁধে গ্রানাডার প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হলো। ওদিকে মুসলমানরাও মাথায় কাফন বেঁধে বেরিয়ে এল। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ সরকারি সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, আর মুজাহিদদের কমান্ড ছিল মুসা বিন আবি আল-গাসসানের হাতে। উভয় পক্ষের মধ্যে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো।

স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত মুসলিম পদাতিক বাহিনী ছিল অনভিজ্ঞ; তারা আবেগ ও উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের চাপ সহ্য করতে পারল না এবং যুদ্ধের ভয়াবহ মুহূর্তে তাদের পা টলে গেল। এটি দেখে সরকারি বাহিনীও শক্ত হয়ে লড়তে পারল না এবং আবু আবদুল্লাহ তাদের সামলাতে সামলাতে গ্রানাডার ফটকের দিকে পিছু হটে গেলেন।

মুসা বিন আবি আল-গাসসান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুজাহিদদের পুনরায় সংগঠিত করে পা জমানোর চেষ্টা করতে থাকেন, তবে এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিশেষে তিনি তার মুষ্টিমেয় একনিষ্ঠ অনুসারীদের নিয়ে খ্রিস্টানদের বিশাল জনসমুদ্রের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ তলোয়ার ও বর্শার নৈপুণ্য প্রদর্শন এবং কয়েক ডজন খ্রিস্টানকে ধরাশায়ী করার পর তাকেও পিছু হটতে হলো। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ ও শোকাবহ অবস্থায় শহরের দিকে ফিরে গেলেন। এই ব্যর্থ যুদ্ধের পর শহরের ফটকগুলো শক্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আক্রমণকারীদের হটিয়ে দেওয়ার সব আশা শেষ হয়ে গেল। গ্রানাডার ওপর হতাশার মেঘ ছেয়ে গেল। [১]

কাসরুল হামরার অধিবেশন:

এই সময়ে গ্রানাডা সরকার মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্য চাওয়ার জন্য দূত পাঠিয়েছিল, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো সাহায্য আসেনি। মরক্কোও, যারা অতীতে আন্দালুসের সাহায্যকারী ও রক্ষক ছিল, নীরবতা অবলম্বন করে রইল।

সফর মাসে আবু আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে উলামা, সামরিক প্রধান এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। সবাই কাসরুল হামরার কেন্দ্রীয় হল “কোমারেস”-এ সমবেত হলেন। তাদের চেহারায় ভয়, উদ্বেগ ও হতাশা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হলো। মাত্র দুটি পথ ছিল: পরিণতির পরোয়া না করে লড়াই করা, অথবা অস্ত্র সমর্পণ করে নিজেদের শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া।

আবুল কাসিম অবহিত করলেন যে, আমাদের অস্বারোহী বাহিনীর সেরা অংশটি শেষ হয়ে গেছে, প্রতিরক্ষার আশা শেষ হয়ে গেছে, খাদ্যশস্য ফুরিয়ে আসছে এবং কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই পরিস্থিতিতে সমস্ত আমীর একমত হলেন যে, শত্রুর সাথে সম্মানজনক শর্তে সন্ধি করে নেওয়া উচিত। তবে মুসা বিন আবি আল-গাসসান উচ্চকণ্ঠে এই প্রবণতার বিরোধিতা করলেন। তিনি গর্জে উঠে বললেন:

“এখনো পথ বন্ধ হয়ে যায়নি। এমন একটি পথ আছে যার মাধ্যমে কোনো অলৌকিক কিছু দেখানো সম্ভব। আমাদের হতাশাই আমাদের এই অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আমরা জনগণকে লড়াই করতে ও মরতে প্রস্তুত করব, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেব,”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৫ / ৩৩০-৩৩৯; মুরস ইন স্পেন, লেন পুল: পৃ. ১৫৩

আমরা শেষ নিঃশ্বাস এবং শেষ প্রাণ পর্যন্ত শত্রুর সাথে লড়াই করব। আমি এটা সহ্য করতে পারি না যে গ্রানাডাকে শত্রুর সামনে মাথা নত করতে দেখব। আমি এতে গর্বিত হব যে আমার লাশ সেই সব লোকদের মধ্যে পাওয়া যাবে যারা গ্রানাডার প্রতিরক্ষায় কুরবান হয়ে গেছে। [১]

হে মূর্তিপূজার যুগ, ফিতনার যুগ, গোলামির যুগ

তোমার আয়ুর পেয়ালা আমরা পূর্ণ করেই সরব

বিপদের তুফান থেকে জানবাজরা মুখ ফিরিয়ে নেবে না

এই সাঁতারুঁরা কখনোই সমুদ্র থেকে সরবে না [২]

কিন্তু এবার মুসা বিন আবি আল-গাসসানের অগ্নিঝরা বক্তব্য দরবারের পরিবেশে কোনো পরিবর্তন আনতে পারল না। মানুষ এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে বীরদের হুঙ্কার এবং কবিদের বীরত্বগাথার চেয়ে বৃদ্ধদের উপদেশের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়।

সন্ধিপন্থী আমীররা বলল:

“আমরা মরক্কোতে দূত পাঠিয়ে দেখেছি, আমাদের ফরিয়াদ শুনেও কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। শত্রু আমাদের বিপরীতে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে বসবাস শুরু করেছে। তাদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছি। বিভিন্ন শহর থেকে তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছাচ্ছে। আমাদের সাহায্য ও রসদ বন্ধ। এখন শীতকাল শুরু হয়েছে। এই সময়ে শত্রু তাদের সৈন্যবাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ রয়েছে। এখনই যদি আমরা তাদের সাথে আলোচনা করি তবে আমাদের সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হবে। যদি আমরা দেরি করি এবং বসন্তকাল শুরু হয়ে যায়, তবে ততক্ষণে প্রতিপক্ষের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লস্কর পুনরায় একত্রিত হয়ে যাবে এবং আমরা আরও দুর্বল ও সংখ্যায় অল্প হয়ে পড়ব, এমন অবস্থায় সে আমাদের দাবি মানবে না, এমনকি আমরা আমাদের প্রাণের নিরাপত্তাও পাব না। আমাদের ছাউনি থেকে অনেক লোক পালিয়ে শত্রুর সাথে যোগ দিয়েছে এবং তাকে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করেছে। শত্রু তাদের থেকেও আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য নিচ্ছে।”

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় বললেন:

“আপনাদের যা ভালো মনে হয় এবং আপনারা যে বিষয়ে একমত হন, তাই করুন।” [৩]

আবু আবদুল্লাহর এই চিন্তাধারা থেকে স্পষ্ট যে, তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পুরোপুরি জবাব দিয়ে দিয়েছিল। এমন অবস্থায় দরবারের আমীরদের মাঝে সাহস কোথা থেকে আসবে এবং তারা হতাশার অন্ধকার থেকে কীভাবে বের হবে। শাসকদের এবং নেতাদের এমন হীনম্মন্যতা সর্বদা জাতির ধ্বংসের পূর্বাভাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মজলিসের মোমবাতি হয়েও যখন তুমি দহনহীন রইলে

তোমার পতঙ্গরাও সেই স্বাদ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আস-সুগরা: ৫/২৩১

[২] খাজা মাজজুব

[৩] নুবজাতুল আসর: পৃষ্ঠা ১২৩

যখন তাদের ভালোবাসার সুতোয় গাঁথা যেত,
তবে কেন তোমার তসবির দানাগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে রইল?
উদাসীন শখ চলে গেল, আকাশচুম্বী ফকিরি চলে গেল,
তোমার মাহফিলে না রইল দিওয়ানা, না রইল জ্ঞানী। [১]

গ্রানাডা পতনের সন্ধিপত্র:

আমিরগণ পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে এটি স্থির করলেন যে, কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কূটনীতিক আবুল কাসিম আব্দুল মালিক এবং উজির ইউসুফ বিন কামাশার নেতৃত্বে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর সাথে সন্ধির আলোচনা শুরু করবেন এবং তার সাথে এমন একটি চুক্তি করবেন যাতে মুসলমানদের স্বার্থের পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। ৮৯৬ হিজরির জিলহজ মাসের শেষ দিকে (অক্টোবর ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ) আলোচনা শুরু হয় এবং তিন সপ্তাহ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আলোচনা গোপন রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছিল কারণ ভয় ছিল যে, যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া সৈনিক এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যদি টের পায় তবে তারা বিদ্রোহ করে বসবে। অবশেষে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যাতে কিছু গোপন ধারাও ছিল, যার মাধ্যমে আবু আব্দুল্লাহ, তার আমিরগণ এবং তাদের সকলের পরিবার-পরিজনের জন্য সম্ভাব্য সুযোগ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। [২]

সাধারণত এটি মনে করা হয় যে, আবু আব্দুল্লাহ এবং তার ঘনিষ্ঠ আমিরগণ বিশেষ করে আবুল কাসিম গ্রানাডাবাসীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্য ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর সাথে আঁতাত করেছিলেন এবং এমন এক সময়ে যখন শহরের প্রতিরক্ষা সম্ভব ছিল, মুসলমানদের এক নির্দয় শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করলে বাস্তব পরিস্থিতি এই ধারণাকে খণ্ডন করে। আমরা দেখেছি যে, আবু আব্দুল্লাহ শেষ পর্যন্ত মুসা বিন আবি আল-গাসসানের পরামর্শ অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। সন্ধির চুক্তি সেই সময়ে করা হয়েছিল যখন লড়াই করার আর কোনো ফায়দা অবশিষ্ট ছিল না। মুসার মতো বীরের জন্য এটিই শোভনীয় ছিল যে তিনি যুদ্ধের ওপর জেদ ধরবেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জান-মাল ও ইজ্জতের দায়িত্ব যেভাবে আবু আব্দুল্লাহর কাঁধে ছিল, তার কাছে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর সাথে কোনো উপযুক্ত চুক্তি করে মুসলমানদের জন্য সম্ভাব্য সকল সুযোগ-সুবিধা অর্জন করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। তিনি তাই করেছিলেন। অবশ্য এর পাশাপাশি তিনি নিজের এবং নিজের আমিরদের জন্য একটি আরামদায়ক জীবনের নিশ্চয়তাও নিয়েছিলেন এবং সাধারণ চুক্তির সাথে কিছু গোপন শর্তও স্থির করে নিয়েছিলেন। স্পষ্টতই এটি কোনো গুনাহ ছিল না। আবু আব্দুল্লাহর জায়গায় অন্য কেউ হলেও নিজের পূর্বের শান-শওকত হারানোর পর কিছু না কিছু সম্পদ ও ঐশ্বর্য অবশিষ্ট রাখার চেষ্টা অবশ্যই করত। আবু আব্দুল্লাহ যত বড় সালতানাত, সম্পদ ও সম্পত্তি ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর হাতে তুলে দিচ্ছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি নিজের জন্য যা কিছু নিয়েছিলেন তা খুব বেশি কিছু ছিল না।

নিচে এই চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি উল্লেখ করা হচ্ছে যার ওপর ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং আবু আব্দুল্লাহ একমত হয়েছিলেন।

[১] ইকবাল

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আব্দুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৪২৩

১. মুসলমানদের বাদশাহ, সেনাপতি এবং কাজী, ষাট দিনের মধ্যে গ্রানাডা, এর আশপাশ এবং আলহামরা প্রাসাদ কাস্টিলের রাজার প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করছেন।
২. শহর হস্তান্তরের নিশ্চয়তার জন্য আবু আবদুল্লাহর ছেলে, তার বিশেষ উপদেষ্টা আবুল কাসেম এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পাঁচশ ব্যক্তি গ্রানাডার পতন পর্যন্ত জিম্মি হিসেবে কাস্টিলের কাছে থাকবে।
৩. ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর সেনাবাহিনী এই ষাট দিন গ্রানাডার ওপর আক্রমণ স্থগিত রাখবে।
৪. মুসলমানদের কাছে বন্দী সমস্ত খ্রিস্টান কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেওয়া হবে।
৫. আবু আবদুল্লাহ এবং সমস্ত মুসলিম আমিরগণ কাস্টিলের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন।
৬. আল-বশারা আবু আবদুল্লাহকে দেওয়া হবে। তাকে এবং তার আমিরদের ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হবে না।
৭. ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড় সমস্ত মুসলমানকে জান ও মালের নির্বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।
৮. মুসলমানদের সামষ্টিক সম্পদ, ওয়াকফ, মিনার এবং মিস্বরসমূহ সুরক্ষা পাবে। মসজিদের সম্পত্তিগুলো আগের মতোই সংরক্ষিত থাকবে। খ্রিস্টানরা এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।
৯. মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধের ফয়সালা ইসলামী আইন অনুযায়ী করা হবে, যার জন্য কেবল মুসলিম কাজীগণই ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।
১০. তিন বছর পর্যন্ত মুসলমানরা কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এরপর তারা ততটুকুই কর প্রদান করবে যতটুকু মুসলিম শাসনামলে প্রদান করত।
১১. ষাট দিন পর্যন্ত কাস্টিলের দশটি বড় সামুদ্রিক জাহাজ মুসলমানদের বিনামূল্যে আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। তিন বছরের মধ্যে যে সকল মুসলমান আফ্রিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করতে চাইবে, তাদেরকে যেকোনো বন্দর থেকে বিনামূল্যে আফ্রিকা সফরের অনুমতি দেওয়া হবে। তিন বছর পরেও মুসলমানদের ভাড়া পরিশোধ করে আফ্রিকা যাওয়ার অনুমতি থাকবে। আফ্রিকা গমনকারীরা হালকা অস্ত্র এবং অস্ত্রাবর সম্পদ সাথে নিয়ে যেতে পারবে।
১২. গ্রানাডার মুসলমানদের শহরের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো স্থানে বসবাস করার অনুমতি থাকবে।
১৩. মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না।
১৪. কোনো খ্রিস্টান বা ইহুদিকে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। মুসলমানদের ঘরবাড়ি বা মসজিদে খ্রিস্টান প্রহরী মোতায়ন করা হবে না। কোনো খ্রিস্টানকে মুসলমানদের ঘরবাড়িতে উঁকি দেওয়ারও অনুমতি দেওয়া হবে না।
১৫. কোনো মুসলমানকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না।
১৬. এই চুক্তির পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী খ্রিস্টান নারী-পুরুষকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করা হবে না।
১৭. কোনো মুসলমান চাইলে স্বেচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে পারে। এর জন্য তাকে মুসলিম এবং খ্রিস্টান আলেমদের...

- মুসলমানদের রাজকীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হবে না।
- মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জবাইখানা আলাদা হবে।
- ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এমন কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করবেন যারা মুসলমানদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করবেন।

এই চুক্তি (২৫ নভেম্বর ১৪৯১ খ্রি.) সম্পন্ন হয়েছিল। এতে ৬৭টি শর্ত ছিল। এতে আবু আবদুল্লাহ, আবুল কাসিম আবদুল মালিক, ফার্ডিনান্ড, ইসাবেলা এবং কাস্টিলের মন্ত্রীদের স্বাক্ষর ছিল। ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা তাদের সমস্ত আমীরসহ অঙ্গীকার করেছিলেন যে এই চুক্তির কোনো লঙ্ঘন করা হবে না এবং এতে কখনোই কোনো পরিবর্তন করা হবে না।

গোপন চুক্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে:

- বেরজা, দালায়া, মারশানা, লাউজার এবং আন্দারাক্স চিরকাল আবু আবদুল্লাহ এবং তার সন্তানদের জায়গির হিসেবে থাকবে।
- আলহামরা হস্তান্তরের পর ফার্ডিনান্ড আবু আবদুল্লাহকে ৩০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবেন।
- গ্রানাডার শহরতলী এবং আলপুজারাতে পৈতৃক জমি ও বাগানগুলো পূর্বের মতো আবু আবদুল্লাহ এবং তার উত্তরাধিকারীদের জায়গির হিসেবে থাকবে।
- যদি আবু আবদুল্লাহ এবং তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আফ্রিকায় যেতে চান, তবে কাস্টিলের রাজা তাদের সমস্ত স্থাবর সম্পদসহ কোনো বিনিময় ছাড়াই সেখানে পৌঁছে দেবেন। [১]

তারা আমাদের মেরে ফেলবে, চলো চলে যাই।

আবুল কাসিম এবং ইউসুফ বিন কুমাশা চুক্তির দলিল ফার্ডিনান্ডকে দিয়ে অনুমোদন করানোর পর গোপনে গ্রানাডায় পৌঁছান। আলহামরার আইওয়ানে কোমারেশে গ্রানাডার আমীরদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তির দলিলের ওপর বিতর্কের পর তা চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়া হয়। কেবল মুসা বিন আবি আল-গাসসান এর বিরোধিতা করেন এবং ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে বলেন:

“বিলাপ ও আহাজারি নারী ও শিশুদের জন্য ছেড়ে দাও। আমরা পুরুষ। আমরা চোখের পানি ফেলার জন্য জন্মাইনি। আমি দেখছি যে স্বাধীনতার আত্মা মরে গেছে এবং গ্রানাডাকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবে একটি জিনিস বাকি আছে যা সাহসী মানুষ পছন্দ করবে। তা হলো সম্মানের মৃত্যু। আমরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য এবং শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে প্রাণ দেব। বিজয়ীদের হাতে জুলুমের শিকল পরার চেয়ে মাতৃভূমিতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাওয়া অনেক ভালো। বিজয়ীদের হাতে জুলুমের শিকল পরার চেয়ে মাতৃভূমিতে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে করতে মরে যাওয়া অনেক ভালো। যদি আমাদের হাডুগুলো একটি কবরে আশ্রয় না পায়, তবে অন্তত এই আকাশের ছায়া তো তাদের ওপর বাকি থাকবে।”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি, ৫/২৩৩-২৫০। এর মূল পাঠ ‘সিমানকাস আর্কাইভ’-এ সংরক্ষিত আছে। ছবির জন্য দেখুন: ‘হোন তুম দোস্ত জিন কে’, আজাদ বিন হক, পৃ. ৫২৫।

“আল্লাহ না করুন যে কাল কেউ বলুক যে গ্রানাডার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য মরতে ভয় পেত।”

মুসা এ কথা বলে চুপ হয়ে গেলেন। মজলিসে মৃত্যুর নীরবতা নেমে এল। আবু আবদুল্লাহ দরবারের দিকে তাকালেন, সবার মুখে হতাশা ছেয়ে ছিল। আবু আবদুল্লাহর মুখ থেকে বের হলো: “আল্লাহ আকবার! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ... আল্লাহর তাকদীর কে এড়াতে পারে। নিশ্চয়ই আমি দুর্ভাগা... এই রাজত্ব আমার হাতেই পতন হওয়ার ছিল।” মজলিসে উপস্থিতরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে উঠলেন: “আল্লাহ আকবার! আল্লাহর ফয়সালা এড়ানো যায় না।”

এরপর আমীরদের প্রত্যেকের আলোচনার সারমর্ম এটাই ছিল যে, তাকদীর তার ফয়সালা দিয়ে দিয়েছে। যুদ্ধ নিরর্থক এবং এই চুক্তি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনো ভালো পথ নেই।

[১]

চাঁদ ডুবে গেছে, রাত শেষ হয়েছে, চলো ঘুমিয়ে পড়ি

তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, চলো ঘুমিয়ে পড়ি

দূর পর্যন্ত কোনো সানাইয়ের প্রতিধ্বনি নেই

আশার বরষাত্রী লুণ্ঠিত হয়েছে, চলো ঘুমিয়ে পড়ি

এখানে যে জেগে আছে, তার জন্য বেঁচে থাকা কঠিন

এই পরিস্থিতি আমাদের মেরে ফেলবে, চলো ঘুমিয়ে পড়ি [২]

মুসা বিন আবি আল-গাসসানের চোখ খুলে দেওয়া ভাষণ:

মুসা বিন আবি আল-গাসসান দেয়ালের লিখন পড়ে ফেলেছিলেন। তিনি শেষবারের মতো গ্রানাডার আমীরদের সম্বোধন করে স্পষ্ট ভাষায় বললেন:

“নিজেদের ধোঁকা দেবেন না। আপনারা কি মনে করেন যে খ্রিস্টানরা চুক্তি রক্ষা করবে? আশাদ ও আনসারদের শান-শওকতে মুগ্ধ হবেন না! এই লোকেরা আমাদের রক্তের তৃষ্ণার্ত। আমাদের ভীত করার মতো বিষয়গুলোর মধ্যে মৃত্যু সবচেয়ে সহজ। আমাদের সামনে রয়েছে আমাদের শহরগুলোর ধ্বংস ও বিনাশ, আমাদের মসজিদের অবমাননা, আমাদের ঘরবাড়ির পদদলন, আমাদের নারীদের সম্ভ্রমহানি। আমাদের সামনে রয়েছে প্রকাশ্য জুলুম এবং উন্মাদনার পর্যায় পর্যন্ত গোঁড়ামি। আমাদের সামনে রয়েছে চাবুক, বেড়ি, শিকল, জেলখানা, নির্যাতন কক্ষ এবং আগুনের কুণ্ডলী। খুব শীঘ্রই আমরা এই সমস্ত নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হব। যে কাপুরুষরা আজ একটি সম্মানজনক মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছে, তারা অচিরেই এই সবকিছু নিজের চোখে দেখবে। কিন্তু আমি কখনোই তা দেখব না।”

মুসা বিন আবি আল-গাসসান এ কথা বলে দ্রুত দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন। সবাই চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুসা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভারী বর্ম পরলেন, অস্ত্র নিলেন, নেজা হাতে নিয়ে নিজের বিদ্যুৎগতি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং গ্রানাডার রাজপথ দিয়ে অতিক্রম করে বাব আল-বিরাদিয়ে বাইরে চলে গেলেন। এরপর আর কেউ তাকে দেখেনি।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/ ৪৫৫-৪৫৬

[২] কাতিল শিফায়ি

ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী, সেই একই দিনে শহরের বাইরে এক বর্মধারী ব্যক্তি শনীল নদীর তীরে পাহারারত পনেরো জন খ্রিস্টানের একটি দলের ওপর একাকী আক্রমণ করেন। তিনি বর্শার উপর্যুপরি আঘাতে বেশ কয়েকজন খ্রিস্টানকে ধরাশায়ী করেন। পাল্টা আক্রমণে তিনি নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হন, কিন্তু একইভাবে বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে তাঁর ঘোড়াটি একটি মারাত্মক আঘাত পায় এবং ঘোড়ার সাথে সওয়ারিও মাটিতে পড়ে যান। খ্রিস্টানরা তাঁকে জীবিত ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই অবস্থায়ও তিনি হাঁটু গেড়ে বসে খঞ্জর চালাতে থাকেন এবং যখন লড়াই করার শেষ শক্তিটুকুও ফুরিয়ে যায়, তখন তিনি নিজেকে শনীল নদীতে ফেলে দেন। ভারী বর্মের কারণে তিনি সাঁতার কাটতে পারেননি এবং দেখতে দেখতেই ডুবে যান। তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি। [১]

পরিস্থিতির চরণে কলন্দর কখনো লুটিয়ে পড়ে না,
তারা যদি খসেও পড়ে, তবে তা মাটিতে পড়ে না।

নদীগুলো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে,
কিন্তু কোনো নদীতে কখনো সমুদ্র গিয়ে পড়ে না। [২]

কাস্টিল বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত কিছু আরব, যাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়েছিল, মৃত ঘোড়াটি দেখে সাক্ষ্য দেয় যে এটি মুসা বিন আবি আল-গাসসানের সওয়ারি ছিল। [৩]

গ্রানাডার শেষ সকাল:

শহরটি খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে—এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই গ্রানাডার অলিগলিতে তীব্র অস্থিরতার ঢেউ বয়ে যায়। আবু আবদুল্লাহ এবং তাঁর আমিরদের মনে ভয় জাগল যে, ষাট দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই না জানি শহরে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, যত দ্রুত সম্ভব শহরটি পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর জন্য ২ রবিউল আউয়াল ৮৯৭ হিজরি (২ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখ নির্ধারণ করা হলো।

এটি ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের এক অত্যন্ত শিক্ষণীয় দিন। মুয়াজ্জিনরা শেষবারের মতো আন্দালুসিয়ার এই শেষ স্বাধীন শহরে তাওহিদ ও রিসালাতের ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, যেখানে কয়েক ঘণ্টা পরই দাসত্বের অন্ধকার রাত নেমে আসার কথা ছিল। সকালের সময় গ্রানাডার রাস্তা থেকে আল-হামরা প্রাসাদ পর্যন্ত মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল; হিমশীতল বাতাসের কারণে সবকিছু ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। আল-হামরার প্রতিটি কোণ থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ আসছিল। প্রাসাদের খাদেমরা মালামাল গোছাতে এবং তা স্থানান্তরে ব্যস্ত ছিল। আবু আবদুল্লাহর মা রানী আয়েশা নিজের ঘোড়ার জিন কষছিলেন।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৫৫, ২৫৬।

[২] মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই যুগের কোনো ইসলামি উৎসে মুসা বিন আবি আল-গাসসানের উল্লেখ নেই। আসলে গ্রানাডার এই শেষ দিনগুলোর কাহিনী লেখার জন্য কেউ অবশিষ্ট ছিল না, তাই মুসার মতো প্রখ্যাত মুজাহিদের অবস্থা সেই যুগের খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের বইয়েই পাওয়া যায়। ‘দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস’-এর লেখক বিভিন্ন ইউরোপীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করে সেই দিনগুলোর ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। লেখক মুসা বিন আবি আল-গাসসানের পুরো বিবরণ তাদের থেকেই নিয়েছেন।

[৩] কাতিল শিফাই।

[৪] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৫৬।

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং গ্রানাডায় যাওয়ার ক্ষেত্রে নিজে অগ্রণী ভূমিকা নিলেন না। তিনি নিজের পরিবর্তে প্রধান যাজক কার্ডিনাল মেভোজাকে তিন হাজার সৈন্য এবং নামকরা খ্রিস্টান আমিরদের সাথে গ্রানাডায় পাঠালেন। এই মিছিলটি সাধারণ মহাসড়ক থেকে সরে গিয়ে জোহরের সময় কাসরুল হামরায় পৌঁছাল, যেখানে গ্রানাডার উজির ইউসুফ বিন কামাশা খ্রিস্টান নেতাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং গ্রানাডার সেনাবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে তুলে দিল।

আবু আবদুল্লাহ তার মা, স্ত্রীগণ, বোন এবং সন্তানদেরসহ প্রায় পঞ্চাশজন ব্যক্তির সাথে ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। কার্ডিনাল তাকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। আবু আবদুল্লাহ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন:

“নিন! এই প্রাসাদ আপনাদের হাতে সোপর্দ করলাম। আল্লাহ আমাদের ভুলের কারণে আমাদের এটি থেকে বঞ্চিত করেছেন... ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং ইসাবেলাকে তাদের যোগ্যতার কারণে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।”

কার্ডিনাল আবু আবদুল্লাহকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কয়েকটি বাক্য বললেন। আবু আবদুল্লাহ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শহরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আন্দালুসের শেষ মুসলিম শাসকের চিরতরে এই শেষ ইসলামী শহর থেকে বিদায় নেওয়ার দৃশ্যটি এতটাই বেদনাদায়ক ছিল যে, কোনো প্রত্যক্ষদর্শীই নিজের চোখের পানি ধরে রাখতে পারছিলেন না।

এখন খ্রিস্টান সৈন্যরা আলহামরার দরজা এবং বুরজগুলোতে মোতায়ন হলো। কার্ডিনাল এবং খ্রিস্টান নেতৃবৃন্দ আলহামরার সর্বোচ্চ মিনার “বুর্জুল হিরাসা”-তে আরোহণ করলেন। শত শত বছর ধরে উড্ডীন ইসলামী পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো এবং সেখানে একটি রূপালী ক্রুশ বুলিয়ে দেওয়া হলো। আলহামরার বুরজগুলোতে গির্জার পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হলো। একদিকে হাজার হাজার মুসলমান স্তব্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন, অন্যদিকে বিজয়ী জাতির অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনার অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। একদিকে ছিল অশ্রুর বৃষ্টি, আর অন্যদিকে বিজয়োল্লাস ধ্বনিত হচ্ছিল।

“গ্রানাডা ডন ফার্নান্দোর... গ্রানাডা ডোনা ইসাবেলার...”

কার্ডিনালের ইশারায় গির্জার গায়করা বাদ্যযন্ত্রের সাথে প্রার্থনামূলক সংগীত শুরু করল। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম শহরের বাইরে আলহামরার বুরজগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ছিলেন। সেখানে ক্রুশ বুলতে দেখে তিনি পুরো সেনাবাহিনীসহ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে লাগলেন।

আবু আবদুল্লাহ শহর থেকে বেরিয়ে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের কাছে পৌঁছালেন, যিনি শনীল নদীর তীরে ঘোড়ায় চড়ে এক বিশাল মিছিলসহ তার অপেক্ষায় ছিলেন। আবু আবদুল্লাহ ঘোড়া থেকে নামতে চাইলেন কিন্তু ফার্ডিনান্ড পঞ্চম তাকে নিষেধ করলেন এবং তাকে আলিঙ্গন করলেন।

আবু আবদুল্লাহ তাকে কাসরুল হামরা এবং শহরের চাবিকাঠি পেশ করে বললেন:

“এগুলো সেই জান্নাতের চাবি, এগুলো আন্দালুসে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন। এখন তুমি আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ভূমি এবং আমাদের প্রজাদের মালিক। এটাই আল্লাহর ফয়সালা ছিল। তুমি এই বিজয়ের পর দয়া ও ইনসাফের সাথে কাজ করো।”

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম বললেন: “আমাদের ওয়াদাগুলোর ওপর সন্দেহ করবেন না। ভাগ্য আপনার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিয়েছে, তা আমাদের বন্ধুত্বের রূপে পাবেন।”

“আপনি এর সর্বোত্তম প্রতিদান পাবেন।”

সামনে এগিয়ে আবু আবদুল্লাহর কাফেলার সাথে রানী ইজাবেলার শোভাযাত্রার সাক্ষাৎ হলো। ইজাবেলা আবু আবদুল্লাহর ছোট ছেলেকে তার হাতে তুলে দিল, যাকে গ্রানাডার পতন পর্যন্ত জিম্মি করে রাখা হয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ কয়েক দিন ইজাবেলার তাঁবুতে অবস্থান করেন। কয়েক দিন পর তিনি তার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীদের নিয়ে আল-বুশরাতে দিকে রওনা হলেন।

তিনি গ্রানাডা থেকে কিছু দূরে “আল-বাদুল” পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছালেন, যেখান থেকে গ্রানাডা চিরতরে দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ ফিরে শেষবারের মতো সেই পার্থিব জান্নাতের দিকে তাকালেন যেখানে আটশ বছরের মুসলিম শাসনামলে তিন শতাব্দী ধরে বনু নাসর অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে শাসন করেছিল। এখন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবং তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রানী আয়েশা ধমক দিয়ে বললেন: “হ্যাঁ হ্যাঁ! যে রাজা পুরুষদের মতো নিজের দেশ রক্ষা করতে পারে না, তাকে নারীদের মতো চোখের পানি ফেলতে হয়।” [১]

এদিকে গ্রানাডার ওপর সামরিক আধিপত্য পূর্ণ হওয়ার পর এবং কোনো প্রকার প্রতিরোধের আশঙ্কা না থাকায় ৬ জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে ইজাবেলা ও ফার্ডিনান্ড আলহামরা প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং বিজয়ের উৎসব পালনকালে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের এক জাঁকজমকপূর্ণ ভোজের আয়োজন করেন।

গ্রানাডা দখল সম্পন্ন হওয়ার পর চুক্তির শর্তগুলো একে একে লঙ্ঘন করা হতে থাকে। গ্রানাডার পতনের চতুর্থ দিনে মুসলমানদের সাথে প্রথম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয় এবং গ্রানাডার জামে মসজিদকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়।

কাস্টিলবাসীরা গ্রানাডার পতনের দিন অর্থাৎ ১ জানুয়ারিকে তাদের জাতীয় উৎসব হিসেবে ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে প্রতি বছর এই দিনে উৎসব পালন করা হতে থাকে। [২]

আল্লামা আবু ইয়াহইয়া ইবনে আসিম (রহ.) তার রচিত “জান্নাতুর রিদা ফিত তাসলিম লিমা কাদারাল্লাহ তাআলা ওয়া কাদা” গ্রন্থে এই বিয়োগান্তক ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন:

“যে ব্যক্তিই ইতিহাসের ব্যাপক অধ্যয়ন করেছে সে জানতে পারবে যে, খ্রিস্টানরা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে কোনো ক্রটি রাখে না, এতে তারা কোনো লজ্জাবোধ করে না। তারা আন্দালুস উপদ্বীপের জনপদ এবং ছোট-বড় শহরগুলো তখনই দখল করতে সক্ষম হয়েছে যখন তারা মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করতে এবং দলাদলি উসকে দিতে সফল হয়েছে। খ্রিস্টানরা আন্দালুসের আমিরদের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়েছে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই দেশের রক্ষকদের পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী ফিতনায় লিপ্ত করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং উলামায়ে কেরাম একমত ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে কখনো মুসলমানরা জিতত আবার কখনো খ্রিস্টানরা।”

“মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সন্ধি ও বিগ্রহ, লড়াই ও যুদ্ধবিরতির একটি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছিল।”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৫ / ২৬৯-২৭২

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ আনান আল-মিসরি: ৫ / ২৮৫, ৩৬০

কাফেরদের উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, তারা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ সংকল্প তাদের থেকে গোপন রেখে এখান থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের মিটিয়ে দেবে। তারা এটা প্রকাশ করত যে, তারা স্বদেশের ভবিষ্যৎ উন্নত করতে, উচ্চতর লক্ষ্যসমূহ পূরণ করতে এবং এখানকার সাধারণ ও বিশিষ্ট বাসিন্দাদের খেয়াল রাখতে চায়; অথচ তারা প্রতারণার চাল চালছিল এবং দেশ দখল ও দেশবাসীকে ধ্বংস করার পেছনে লেগে ছিল। সুতরাং আফসোস সেই সব মস্তিষ্কের জন্য যারা এই অসম্ভব কথা মেনে নিয়েছিল এবং এই মিথ্যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। [১]

আবু আবদুল্লাহর পরিণতি:

আবু আবদুল্লাহ, গ্রানাডার পতনের সময় যার বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ বছর, প্রায় এক বছর পর্যন্ত আল-বশারাতের আন্দরাশ দুর্গে বসবাস করেন। রমজান ৮৯৮ হিজরি (এপ্রিল ১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দে) কাস্টিলের রাজা তাকে তার সমস্ত জায়গির ত্যাগ করে আন্দালুস ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন, কারণ একজন প্রাক্তন মুসলিম শাসকের পক্ষ থেকে যেকোনো সময় বিদ্রোহের আশঙ্কা ছিল। আবু আবদুল্লাহ অত্যন্ত বিচলিত হলেন, কিন্তু আবুল কাসিম—যিনি ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং তার মধ্যে দূতের ভূমিকা পালন করছিলেন—তাকে বোঝালেন যে, খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে যেকোনো সময় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশঙ্কা রয়েছে, তাই নিরাপত্তার সাথে এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম। [২]

আবু আবদুল্লাহর অশ্রুসিক্ত পত্র:

আবু আবদুল্লাহ এই সুযোগে মরক্কোর বনু ওয়াত্তাস বংশের আমির মুহাম্মদ বিন জাকারিয়াকে একটি পত্র লিখে আশ্রয়ের আবেদন করেন, যার প্রতিটি অক্ষর এক একটি শিক্ষণীয় কাহিনী। তিনি একজন অযোগ্য ও বিশ্বাসঘাতক শাসক হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন; এই পত্রে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করার পাশাপাশি জাতি বিক্রয় ও গাদ্দারির অভিযোগ থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করে লেখেন:

“হে ইলাহি! আমি দায়মুক্ত নই যে নিজের ওজর পেশ করব, শক্তিশালী নই যে প্রতিশোধ নিতে পারব; হ্যাঁ, তবে আমি ক্ষমা প্রার্থী, ইস্তিগফার করছি। পরিস্থিতি যে ব্যক্তিকে ন্যায়ের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, তার সাফাইয়ে অন্তত এতটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে।”

যেখানে প্রকৃত বিষয়ের প্রশ্ন, আমি সেটাই বলছি যা হযরত আবু বকর সিদ্দিক এর সাহেবজাদী (সৈয়দা আয়েশা সিদ্দিকা) বলেছিলেন যে, আল্লাহর কসম! মানুষ যে অভিযোগ আরোপ করছে, আমি যদি তা থেকে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করি, তবে আপনারা কখনোই আমাকে বিশ্বাস করবেন না। সুতরাং ইউসুফ এর পিতার মতো আমাকে এটাই বলতে হচ্ছে যে, সবরে জামিল (উত্তম ধৈর্য) ই শ্রেয়। এই সমস্ত কথা সত্ত্বেও আমি নিজের দোষ অস্বীকার করছি না, বরং আমি তো দোষে পরিপূর্ণ। আমি নিজের গুনাহসমূহ অস্বীকার করতে পারি না, কারণ আমি তো পাপাচারের পাহাড়। আমি আমার বিনয় ও ভগ্নদশা, আমার পদস্থলন ও ভুলত্রুটির কথা কেবল আল্লাহর কাছেই বলছি... আমাদের ওপর মিথ্যা গুজবের পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং এমন সব অভিযোগ লাগানো হয়েছে যা কাফেরদের ওপরও লাগানো হয় না।

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুসির রাতীব, আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি: ৩/৫০৮, ৫০৯

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/২৮৫

তারিখ উম্মতে মুসলিমা — পঞ্চম খণ্ড — ৭০২

যেতেন। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন... আমরা যা চাই তা সর্বদা অর্জিত হয় না, অনেক সময় আমরা তা থেকে অক্ষম থেকে যাই। রাসূল ﷺ-এর ইরশাদ হলো: “প্রত্যেকটি বিষয়ই তকদিরে লিখিত আছে, এমনকি মানুষের বুদ্ধিমান বা নির্বোধ হওয়াও।” [১]

আবু আবদুল্লাহ তার পরিবার-পরিজনসহ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মরক্কোর ফাস শহরে আশ্রয় নেন। আমির মুহাম্মদ বিন জাকারিয়া তাকে বসবাসের জন্য এক খণ্ড জমি দান করেন, যেখানে তিনি গ্রানাডার প্রাসাদের আদলে একটি সুন্দর ঘর তৈরি করেন। তবে আক্ষেপ ও হতাশা কখনোই তার পিছু ছাড়েনি।

দুঃখের আধিক্যও আমার দুঃখের প্রতিকার হলো না

আমার অস্থির ভাবনাগুলো প্রশান্তি পেল না

হৃদয় দুনিয়ার প্রতিটি বেদনাকে আপন করে নিয়েছে

ক্লান্ত আত্মা উন্মাদনার ধরন খুঁজে পেল না [২]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে দিন কাটিয়ে ৯৪০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল প্রায় ৭৫ বছর। তার দুই ছেলে ইউসুফ ও আহমদের মাধ্যমে তার বংশধারা চলতে থাকে, কিন্তু সৌভাগ্য এই পরিবারকে ছেড়ে গিয়েছিল; তারা আফ্রিকায় অত্যন্ত দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। [৩]

[১] নাফহত তীব মিন গুসনি আন্দালুস আর-রাতিব লিল মাক্কারি আত-তিলমিসানি: ৩/ ৫৩০ থেকে ৫৩৩

[২] সাহির লুখিয়ানভি

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস লি আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/ ২৮৭, ২৮৮; আত-তারিখুল আন্দালুসি মিনাল ফাতহিল ইসলামি ইলা সুকুতি গারনাতা, লি আবদুর রহমান আলি: পৃষ্ঠা: ৫৫৭

মুসলিম আন্দালুস সগরার দীর্ঘকাল টিকে থাকার কারণসমূহ

এটা আশ্চর্যজনক মনে হয় যে, কাস্টিল ও আরাগন রাজ্যগুলো মুওয়াহহিদুনদের শাসনের অবসানের পর দুই ও আড়াইশ বছর পর্যন্ত মুসলিম আন্দালুস সগরাকে জয় করতে পারেনি।

এর আসল কারণ হলো সেই তাকদির বা ঐশী ইচ্ছা, যা প্রতিটি জাতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়। একটি বিশাল শাসনব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর আল্লাহ আন্দালুসের মুসলমানদের একটি দীর্ঘ সময় দিয়েছিলেন যাতে তারা নিজেদের ভুল সংশোধন করে পূর্বের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। এই কারণেই খ্রিস্টানরা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আড়াইশ বছর পর্যন্ত গ্রানাডা দখল করতে পারেনি। তবে তাকদির ছাড়াও এর কিছু বাহ্যিক কারণও বোঝা যায়, যা নিম্নরূপ:

- ১. মুওয়াহহিদুনদের শাসনের অবসান এবং আন্দালুস কুবরার পতনের সময়কালটি বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়কর ছিল। এই সময়ে সিরিয়া ও মিশর ক্রমাগত ক্রুসেড যুদ্ধের কবলে ছিল। আইয়ুবী সালতানাতের মহান সাম্রাজ্য হ্রাসিত হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকায় মুওয়াহহিদুনরা অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মধ্য এশিয়া থেকে ইরাক পর্যন্ত তাতারদের দখলে চলে গিয়েছিল। এরপর হালাকু খানের হাতে বাগদাদ ধ্বংস হয় এবং আব্বাসীয় খিলাফত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে পুরো ইসলামি বিশ্ব মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তাই আন্দালুসের মুসলমানদের মনোবলও ভেঙে পড়েছিল। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ধ্বংস দেখে খ্রিস্টানদের সাহস আকাশচুম্বী হয়েছিল। সাহস ও সংকল্পের এই পার্থক্যই ছিল আন্দালুস কুবরার পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

তবে অর্ধশতাব্দী পর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। মিশরে আব্বাসীয় খিলাফত পুনর্জীবিত হয় এবং মামলুকদের হাতে তাতাররা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। রুকনউদ্দিন বাইবার্স এবং সাইফউদ্দিন কালাউন খ্রিস্টানদের এমন মার দিয়েছিলেন যে তারা চিরতরে সিরিয়ার দিকে মুখ করা থেকে বিরত থাকে। এরপর এশিয়া মাইনরে উসমানীয়রা এমন উত্থান লাভ করে যে রোম পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের নামে কাঁপতে শুরু করে।

বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের এই পুনর্জাগরণের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই আন্দালুসের ওপরও পড়ে; এখানকার মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, যেখানে খ্রিস্টানদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তাদের মনে এই ভয় কাজ করতে থাকে যে, তারা যদি গ্রানাডা শেষ করার চেষ্টা করে তবে মামলুক বা উসমানীয়রা তাদের ভাইদের সাহায্যে চলে আসতে পারে।

- ২. আন্দালুস কুবরার পতন সত্ত্বেও ওইসব এলাকায় মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় ছিল। কাস্টিল ও আরাগনের শাসকদের দক্ষিণে অগ্রসর হওয়ার আগে তাদের সাথে মোকাবিলা করতে হতো এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য...

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নতুন দুর্গ নির্মাণ এবং পুরনো দুর্গগুলোর মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। এভাবে গ্রানাডাবাসী যথেষ্ট সময় পেয়ে গেল যাতে তারা তাদের সীমান্তগুলো সুরক্ষিত করে নিতে পারে।

- (৩) স্পেনের নাসারাদেরও উত্থানের পর পতন হয়েছিল। অনেকবার তাদের রাজপুত্রদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হয়েছে যা কখনো কখনো বছরের পর বছর চলেছে। বহুবার এমন হয়েছে যে তাদের বড় বড় সাম্রাজ্য ভেঙে ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যার কোনোটিই এককভাবে গ্রানাডা দখল করার যোগ্য ছিল না। এই পরিস্থিতিও মুসলমানদের অনুকূলে ছিল।

- (৪) গ্রানাডা এবং এর পার্শ্ববর্তী দুর্গ ও শহরগুলোতে পুরো আন্দালুসের প্রতিভাবান উলামা, সাহিত্যিক, কবি, মুজাহিদ এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীরা সমবেত হয়েছিলেন। এই জনশক্তি নাসারাদের জন্য সিসা ঢালা প্রাচীর হিসেবে প্রমাণিত হতে থাকল।

- (৫) গ্রানাডার আমিরদের রাজনীতি ছিল আপসকামিতা, সুযোগ চেনা, কূটকৌশল, নিজের শক্তি সঞ্চয় করা এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই শত্রুর থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার ওপর ভিত্তি করে। এই নীতি সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে নাসারাদের মোকাবিলায় অত্যন্ত সফল ছিল।

এই সময় গ্রানাডার অবস্থা ঠিক তেমনই হয়ে গিয়েছিল যেমনটা আব্দুর রহমান আন-নাসির এবং হাজিব আল-মানসুরের যুগে লিওন, আস্তুরিয়াস এবং কাস্টিলের শাসকদের ছিল যে, যখনই তাদের ওপর আক্রমণ হতো তারা খরাজ দিতে রাজি হয়ে যেত, সেই সাথে এক-দুটি দুর্গ হস্তান্তর করে নিজেদের বাঁচিয়ে নিত। এরপর যখনই মুসলমানরা অন্যদিকে মনোনিবেশ করত অথবা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি হতো, এই রাষ্ট্রগুলো খরাজ দেওয়া বন্ধ করে দিত এবং মুসলমানদের থেকে এক-দুটি দুর্গ ছিনিয়ে নিত। বনু নাসরও এই কৌশল অবলম্বন করে আরও সোয়া দুই শতাব্দী কাটিয়ে দিল।

- (৬) বাহ্যিকভাবে গ্রানাডা মরক্কোর বনু মারিনের রূপে সাহায্যকারী পেয়েছিল। বনু মারিনের শাসকরা অনেকবার নিজেরাই সৈন্যবাহিনী নিয়ে আন্দালুসের উপকূলে অবতরণ করেছেন এবং নাসারাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছেন। কঠিন সময়ে তারা গ্রানাডায় সাহায্য পাঠাতেন। গ্রানাডার অধিকাংশ শাসক বনু মারিনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। যদিও মাঝেমধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা এবং উত্তেজনার কিছু সাময়িক বিরতি এসেছিল, তবে সাধারণভাবে বন্ধুত্ব বজায় ছিল এবং মরক্কোর শাসকদের সহযোগিতার কারণে নাসারাদের বারবার পিছু হটতে হয়েছিল।

- (৭) গ্রানাডা ভৌগোলিক দিক থেকেও অত্যন্ত সুরক্ষিত এলাকা ছিল। সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালা এবং জাবাল আল-বশারাত একে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক থেকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল। সমুদ্রও কাছে ছিল, ফলে উত্তর আফ্রিকা থেকে যেকোনো দেশ থেকে সাহায্য পৌঁছাতে পারত। ওয়াদিউল কাবির, এর নদী, এর সংলগ্ন বনভূমি এবং টিলার বিশাল সারি একে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সুরক্ষা প্রদান করত।

গ্রানাডার ইতিহাসে দুই-তিনটি সুযোগ এমনও এসেছিল যে মুসলমানরা নাসারাদের থেকে পূর্বের পরাজয়গুলোর প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিল। যদি তারা এমন সময়ে ঐক্যবদ্ধ থাকত তবে তারা তাদের সমস্ত এলাকা ফিরে পেতে পারত এবং আন্দালুসে কুবরার মহান সাম্রাজ্য পুনরায় পুনরুজ্জীবিত করতে পারত। কিন্তু আফসোস যে, পারস্পরিক বিভেদ ও অনৈক্যের ব্যাধি গ্রানাডার রাজপ্রাসাদগুলোতে সর্বদা লালিত হতে থাকল। এই...

এর জন্য এমন চমৎকার সুযোগগুলো বৃথা চলে গেল। বনু আহমারের শেষ শাসকদের আমলে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ এবং ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর পারস্পরিক লড়াইয়ের এক অন্তহীন ধারা দেখা যায়। অবশেষে এই অপকর্মই গ্রানাডার সরকারকে ডুবিয়ে দেয়।

মুসলমানদের সহনশীলতার বিপরীতে খ্রিস্টানদের সংকীর্ণমনা মনোভাব

ইতিহাস সর্বদা এই প্রশ্ন করতে থাকবে যে, গ্রানাডা রাজ্যকে টিকে থাকতে দিলে খ্রিস্টান রাজত্বের কী ক্ষতি হতো? এর আগে মুসলমানরা আট শতাব্দী খ্রিস্টানদের সাথে অতিবাহিত করেছে। তারা কখনো অন্য ধর্মকে সমূলে উৎপাটন করার চেষ্টা করেনি। আবদুর রহমান আন-নাসির উত্তরের খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। মুসলমানদের শহরগুলোতে লক্ষ লক্ষ খ্রিস্টান পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করত।

খ্রিস্টানরা অগণিত বিজয় অর্জন করে তিনটি বিশাল ও বিস্তৃত রাষ্ট্র গঠন করেছিল এবং নিজেদের সীমানার মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে বসবাস করছিল। মুসলিম জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দক্ষিণের দিকে সংকুচিত হয়ে এসেছিল। তাদের নিজেদের দ্বীন ও ধর্ম অনুযায়ী বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়া একটি মানবিক দাবি ছিল। মুসলমানদের অতীত সহনশীলতা দেখে খ্রিস্টানদের লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল যে তারা তাদের এই শেষ সীমানাটুকুতেও থাকতে দেয়নি। কিন্তু এর বিপরীতে খ্রিস্টানরা গ্রানাডার বিরুদ্ধে আড়াইশ বছর ধরে এখানে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে এবং কখনো মুসলমানদের সাথে একজন ভদ্রোচিত আচরণ করতে প্রস্তুত ছিল না।

গ্রানাডার বনু আহমার সুলতানদের তালিকা

ইবনুল আহমার থেকে শুরু করে গনি বিল্লাহ পর্যন্ত দশজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন যাদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ক্রমিক শাসকের নাম হিজরি সন ঈসায়ী সন শাসনের মেয়াদ

১ ইবনুল আহমার, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ প্রথম ৬৩৫ হি. থেকে ৬৭১ হি. ১২৩৮ খ্রি. থেকে ১২৭৩ খ্রি. ৩৬ বছর

২ আল-ফকিহ, মুহাম্মদ দ্বিতীয় ৬৭১ হি. থেকে ৭০১ হি. ১২৭২ খ্রি. থেকে ১৩০২ খ্রি. ৩০ বছর

৩ আল-মাখলু, মুহাম্মদ তৃতীয় বিন মুহাম্মদ দ্বিতীয় ৭০১ হি. থেকে ৭০৮ হি. ১৩০২ খ্রি. থেকে ১৩০৯ খ্রি. ৭ বছর

৪ আবুল জিউশ, নাসর বিন মুহাম্মদ দ্বিতীয় ৭০৮ হি. থেকে ৭১৩ হি. ১৩০৯ খ্রি. থেকে ১৩১৪ খ্রি. ৫ বছর

৫ আবুল ওয়ালিদ ইসমাইল বিন ফারাজ ৭১৩ হি. থেকে ৭২৫ হি. ১৩১৪ খ্রি. থেকে ১৩২৫ খ্রি. ১১ বছর

৬ মুহাম্মদ বিন আবুল ওয়ালিদ ইসমাইল, মুহাম্মদ চতুর্থ ৭২৫ হি. থেকে ৭৩৩ হি. ১৩২৫ খ্রি. থেকে ১৩৩৩ খ্রি. ৮ বছর

৭ আবুল হাজ্জাজ বিন আবুল ওয়ালিদ, ইউসুফ প্রথম ৭৩৩ হি. থেকে ৭৫৪ হি. ১৩৩৩ খ্রি. থেকে ১৩৫৪ খ্রি. ২১ বছর

৮ মুহাম্মদ পঞ্চম গনি বিল্লাহ, বিন ইউসুফ প্রথম ৭৫৪ হি. থেকে ৭৬০ হি. ১৩৫৪ খ্রি. থেকে ১৩৫৯ খ্রি. ৬ বছর

৯ ইসমাইল বিন ইউসুফ প্রথম ৭৬০ হি. থেকে ৭৬১ হি. ১৩৫৯ খ্রি. থেকে ১৩৬০ খ্রি. এক বছর

৭০৬ | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

ক্রম শাসকের নাম হিজরি সন ঈসায়ী সন মেয়াদ

১০ মুহাম্মদ ষষ্ঠ আবু সাঈদ বিন ইসমাইল ৭৬১ হি. হতে ৭৬৩ হি. ১৩৬০ খ্রি. হতে ১৩৬২ খ্রি. দুই বছর

মুহাম্মদ পঞ্চম গনি বিল্লাহ, পুনরায় ৭৬৩ হি. হতে ৭৯৩ হি. ১৩৬২ খ্রি. হতে ১৩৯১ খ্রি. ৩০ বছর

পতন যুগের শাসকদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ক্রম শাসকের নাম হিজরি সন ঈসায়ী সন মেয়াদ

১১ ইউসুফ দ্বিতীয়, আবুল হাজ্জাজ বিন মুহাম্মদ পঞ্চম ৭৯৩ হি. হতে ৭৯৭ হি. ১৩৯১ খ্রি. হতে ১৩৯৫ খ্রি. চার বছর

১২ মুহাম্মদ সপ্তম মুস্তাইন বিল্লাহ, বিন ইউসুফ দ্বিতীয় ৭৯৭ হি. হতে ৮১১ হি. ১৩৯৫ খ্রি. হতে ১৪০৮ খ্রি. চৌদ্দ বছর

১৩ ইউসুফ তৃতীয় আন-নাসির বিন ইউসুফ দ্বিতীয় ৮১১ হি. হতে ৮২০ হি. ১৪০৮ খ্রি. হতে ১৪১৭ খ্রি. নয় বছর

১৪ মুহাম্মদ অষ্টম, আল-আইসার, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ তৃতীয় ৮২০ হি. হতে ৮৩১ হি. ১৪১৭ খ্রি. হতে ১৪২৭ খ্রি. এগারো বছর

১৫ মুহাম্মদ নবম আজ-জুগাইর (আস-সাগির) বিন নাসর ৮৩১ হি. হতে ৮৩৩ হি. ১৪২৭ খ্রি. হতে ১৪৩০ খ্রি. দুই বছর

মুহাম্মদ অষ্টম আল-আইসার, পুনরায় ৮৩৩ হি. হতে ৮৩৫ হি. ১৪৩০ খ্রি. হতে ১৪৩১ খ্রি.-এর শেষভাগ দুই বছর

১৬ ইউসুফ চতুর্থ বিন মুহাম্মদ ষষ্ঠ ও ইবনুল আহমার রবিউস সানি হতে শাওয়াল ৮৩৫ হি. জানুয়ারি হতে জুলাই ১৪৩২ খ্রি. ছয় মাস

মুহাম্মদ অষ্টম, আল-আইসার, তৃতীয়বার ৮৩৫ হি. হতে ৮৪৯ হি. ১৪৩২ খ্রি. হতে ১৪৪৫ খ্রি. সোয়া দশ বছর

১৭ আল-আহনাফ, মুহাম্মদ বিন নাসর, মুহাম্মদ দশম ৮৪৬ হি. হতে ৮৪৯ হি. ১৪৪২ খ্রি. হতে ১৪৪৫ খ্রি. আড়াই বছর

১৮ ইউসুফ পঞ্চম, আসআদ বিন আলী বিন ইসমাইল ৮৪৯ হি. ১৪৪৫ খ্রি.-এর শেষভাগ হতে ১৪৪৬ খ্রি.-এর শুরু কয়েক মাস

আল-আহনাফ, মুহাম্মদ বিন নাসর, মুহাম্মদ দশম, পুনরায় ৮৪৯ হি. হতে ৮৫৭ হি. ১৪৪৬ খ্রি. হতে ১৪৫৩ খ্রি. পাঁচ বছর

ইউসুফ পঞ্চম, আসআদ বিন ইসমাইল, পুনরায় ৮৫৭ হি. হতে ৮৬৭ হি. ১৪৫৩ খ্রি. হতে ১৪৬৩ খ্রি. ষোলো বছর

১৯ আবুল হাসান আলী বিন সাদ ৮৬৭ হি. হতে ৮৯০ হি. ১৪৬৩ খ্রি. হতে ১৪৮৫ খ্রি. সতেরো বছর

গ্রানাডায় আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদের বিদ্রোহী শাসন। মালাকায় আবুল হাসানের শাসন ৮৮৭ হি. হতে ৮৮৮ হি. ১৪৮২ খ্রি. হতে ১৪৮৩ খ্রি. এক বছর

২০ আজ-জাগাল, মুহাম্মদ বিন সাদ ৮৯০ হি. হতে ৮৯২ হি. ১৪৮৫ খ্রি. হতে ১৪৮৭ খ্রি. পাঁচ বছর

২১ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (মুহাম্মদ একাদশ) ৮৯২ হি. হতে ৮৯৭ হি. ১৪৮৭ খ্রি. হতে ১৪৯২ খ্রি. দুই বছর

আন্দালুসে গোলামদের দিনরাত

গ্রানাডার পতনের পর আন্দালুসে এক ইঞ্চিও জমিও মুসলমানদের দখলে রইল না। কিছু আলেম, যাদের মধ্যে গ্রানাডার কাজী আল্লামা ইবনুল আজরাক আল-মুসফার বি (রহ.)-এর নাম সংরক্ষিত আছে, গ্রানাডা পুনরুদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইতে মরক্কো গিয়েছিলেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপর তিনি মিশরের সুলতান কাইতবের কাছে যান, কিন্তু তিনি তুর্সকের শাসক দ্বিতীয় বায়েজিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন; আন্দালুসের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো কেউ অবসর ছিল না। [১]

যারা চোখে নক্ষত্র নিয়ে আসত

জানি না আমাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে তারা কোন দেশে চলে গেল

যারা তীরে শান্তিতে আছে তারা কী করে জানবে

এবার ঢেউ এলে তা তীরগুলোকেও সাথে নিয়ে ফিরবে [২]

ফার্ডিনান্ডের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ:

পঞ্চম ফার্ডিনান্ড বিজয়ের পর কিছুদিন গ্রানাডাবাসীদের সাথে নরম আচরণ করেন এবং যে মুসলমানরা আফ্রিকা যেতে চেয়েছিল তাদের জন্য পথ খোলা রাখেন এবং সমুদ্রগামী জাহাজও সরবরাহ করেন। গ্রানাডার অসংখ্য মানুষ খ্রিস্টানদের সাথে হওয়া চুক্তিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখত। তারা তাদের সমস্ত সম্পদ সস্তা দামে খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে আফ্রিকায় হিজরত করে। তারা তাদের জান ও ঈমান বাঁচিয়ে নেয়।

আফ্রিকায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। হিজরতকারীদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মারা যায় এবং কিছু লোক পালিয়ে পুনরায় আন্দালুসে ফিরে আসে। তাদের মুখে সেখানকার কঠিন পরিস্থিতির কথা ছড়িয়ে পড়লে বাকি মুসলমানরা আন্দালুসে থাকাকেই অগ্রাধিকার দেয়। এরা ছিল সেই সব লোক যাদের সফরের সামর্থ্য ছিল না অথবা যারা খ্রিস্টানদের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত ছিল।

পঞ্চম ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা শুরুর সাত বছর নমনীয়তা প্রদর্শন করেন যাতে মুসলমানদের মনে কোথাও অস্ত্র ধরার চিন্তা না আসে এবং খ্রিস্টান রাজ্য পুরোপুরি সুসংহত হয়ে যায়। এই সাত বছর মুসলমানরা শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। তাদের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, খ্রিস্টানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে তারা কোনো ভুল করেনি।

[১] আল-উনসুল জলিল বি-তারিখিল কুদস ওয়াল খলিল, লি-আবিল ইয়ামান আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-হাম্বলি: ২/ ২৫৫, ত. মাকতাবা দানদিস আম্মান।

[২] আহমদ ফারাজ।

৭০৮

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

কিন্তু ধর্মাত্মক পাদ্রিরা এই দেশ থেকে মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে দিতে চেয়েছিল। যখন তারা দেখল যে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে মুসলমানরা শান্তিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছে, তখন তারা তা সহ্য করতে পারল না এবং তারা কর্মকর্তাদের মুসলমানদের নির্মূল করার জন্য প্ররোচিত করতে লাগল। তাদের বক্তব্য ছিল যে মুসলমানদের জন্য কেবল দুটি পথ থাকা উচিত: তারা হয় আন্দালুস ত্যাগ করবে অথবা খ্রিস্টান হয়ে থাকবে। তলেতলার কেন্দ্রীয় গির্জার কার্ডিনাল এবং ইসাবেলার বিশেষ পাদ্রি ফ্রান্সিস জিমেনেস সিসনেরোস এই মানসিকতা তৈরিতে সবার আগে ছিলেন। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং ইসাবেলা ছিলেন কটুর ধর্মীয়। যখন তাদের ধর্মীয় নেতারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গের প্ররোচনা দিতে লাগলেন, তখন তাদেরও এতে কোনো দ্বিধা রইল না। [১]

তারা ধীরে ধীরে চুক্তির সমস্ত ধারা উপেক্ষা করতে শুরু করল। প্রথমে গ্রানাডাবাসীদের ওপর কঠোর কর আরোপ করা হলো, মসজিদের মিনার থেকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। হাজার হাজার মুসলমানকে বের করে দিয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে চলে যেতে বাধ্য করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে মসজিদগুলোকে গির্জায় রূপান্তরিত করা হলো। মুসলমানরা কেবল ঘরে নামাজ পড়তে পারত। ৯০৪ হিজরিতে ইসলামের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো এবং মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর অভিযান শুরু করা হলো। [২]

অন্ধকার বাড়তে লাগল:

৯০৫ হিজরিতে পাদ্রি ‘ফ্রান্সিস জিমেনেস সিসনেরোস’ গ্রানাডায় আসেন এবং শহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি ও আলেমদের একত্রিত করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্ররোচনা দেন, বিনিময়ে তাদের মূল্যবান উপহার প্রদান করেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, যা দেখে সাধারণ মানুষের অনেকেই তাদের অনুসরণ করে। পাদ্রিরা প্রথমে ওয়াজ-নসিহত এবং আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করতে থাকেন। ঘোষণা করা হলো যে যারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে তাদের সমস্ত কর মওকুফ করে দেওয়া হবে এবং তাদের জমির মালিকানার অধিকার দেওয়া হবে।

সাধারণ মুসলমানদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। কোনো মুসলমানের অস্ত্র তো দূরের কথা, ছুরি নিয়ে বাইরে বের হওয়ারও অনুমতি ছিল না। গ্রানাডার কিছু মুসলমান মিশরের বাদশাহ আল-জাহির বারকুককে পত্র লিখে এই বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো অবহিত করেন এবং অনুরোধ করেন যে তিনি যেন ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের ওপর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এখানকার মুসলমানদের অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। মিশরের সুলতানের পক্ষ থেকে ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের কাছে প্রতিবাদী দূতাবাস এলে তিনি জবাবে একজন বাকপটু প্রতিনিধিকে কায়রোতে পাঠান, যিনি (১৫০১ খ্রিস্টাব্দে কায়রো পৌঁছে) মিশরের সুলতানকে আশ্বস্ত করেন যে আন্দালুসে মুসলমানদের সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়েছে, তবে অনেক মুসলমান স্বেচ্ছায় খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তাদের মোটেও বাধ্য করা হয়নি। মিশরের সুলতান এতে সন্তুষ্ট হয়ে যান।

নিজেদের ফরিয়াদ বৃথা যেতে দেখে আন্দালুসের মুসলমানরা যেকোনো বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল। অন্যদিকে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম বিদেশি মুসলিম দেশগুলোর সাথে যোগাযোগের এই প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করেন এবং মুসলমানদের ওপর আরও কঠোরতা শুরু করেন। [৩]

[১] দৌলতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩১১ থেকে ৩১৫

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

[৩] দৌলতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩৩০ থেকে ৩৩৪

একটি লোমহর্ষক কাব্যিক পত্র:

আন্দালুসের উলামা, সাহিত্যিক ও কবিরা গদ্য ও পদ্যে অনেক পত্র অত্যন্ত গোপনে লিখে কনস্টান্টিনোপল, কায়রো এবং অন্যান্য শক্তিশালী মুসলিম শাসকদের কাছে বারবার তাদের বেদনাদায়ক কাহিনী শুনিয়েছেন, কিন্তু তাদের দুঃখের রাতে প্রদীপ জ্বালানোর মতো কেউ আসেনি। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে (৯১০ হিজরি) একজন মুসলমান তার কাব্যিক পত্রে উসমানীয় সুলতান বায়েজিদ সানিকে লিখেছিলেন:

“যখন আমরা তাদের জিন্মাদারির অধীনে আসলাম... তখন তাদের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পেল।”

“তারা আমাদের সাথে করা সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে... আমাদের জোরপূর্বক, কঠোরতা ও প্রতাপের সাথে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে।”

“আমাদের দ্বীনি প্রতিটি কিতাব অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে।”

“কোনো মুসলমানের কাছে কোনো কিতাব তো দূরের কথা, এমনকি কুরআন মাজীদে কোনো কপিও রাখা হয়নি যা সে তিলাওয়াত করতে পারে।”

“কারো নামায পড়া বা রোযা রাখার খবর যদি তারা জানতে পারে, তবে তাকে যে কোনো অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করে।”

“আমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের কুফরি কেন্দ্রে (গির্জায়) না যায়, তাকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দেওয়া হয়।”

“তার গালে চড় মারা হয়, মাল ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।”

“রমযান মাসে তারা আমাদের বারবার পানাহার করতে বাধ্য করে আমাদের রোযা নষ্ট করে দেয়।”

“তারা আমাদের নির্দেশ দেয় যেন আমরা আমাদের নবীকে গালি দেই এবং সুখে-দুঃখে কোনো অবস্থাতেই তাঁকে স্মরণ না করি।”

“তারা যখন আমাদের কিছু লোককে নাত পড়তে দেখেছে, তখন তাদের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে।”

“শাসকরা তাদের মারধর, জরিমানা, লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ডের শাস্তি দিয়েছে।”

তারা আমাদের নামগুলোও বদলে দিয়েছে, অথচ আমরা তা চাইনি এবং এতে আমরা সন্তুষ্টও ছিলাম না।

হায়! মুহাম্মদ-এর দীনের পরিবর্তে রোমীয় কুকুরদের দীন চলে এসেছে, যারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম।

হায়! সেই মিনারগুলোর জন্য, যেখানে এখন শাহাদাত বাণীর পরিবর্তে তাদের ঘণ্টাগুলো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হায়! সেই শহরগুলো এবং তাদের সৌন্দর্যের জন্য, কুফরির কারণে সেখানে চরম অন্ধকার ছেয়ে গেছে।

সেগুলো এখন ক্রুশ পূজার দুর্গে পরিণত হয়েছে এবং তারা সেখানে কোনো আক্রমণের ভয় থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।

আমরা দাসে পরিণত হয়েছি, এমন বন্দী নই যাদের মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়; আর না আমরা এমন মুসলিম যারা শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করতে পারে।

যদি আপনার চোখ আমাদের বর্তমান অবস্থা দেখত, তবে তা থেকে প্রচুর অশ্রু প্রবাহিত হতো।

হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমাদের ওপর কী কঠিন বিপদ ও মুসিবত আপতিত হয়েছে এবং অপমানের কী পোশাক আমাদের পরানো হয়েছে!

আপনাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র তাদের কাছে পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা তার একটি শব্দও পালন করেনি।

বরং এটি আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সীমালঙ্ঘন, ধৃষ্টতা এবং প্রতিটি মন্দ কাজে তাদের অগ্রসর হওয়াকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মিসরবাসীদের দূতও তাদের কাছে এসেছিল, কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অবমাননাকর আচরণ করেছে।

তারা সেই দূতদের আমাদের সম্পর্কে বলেছে যে, আমরা কোনো জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায় কুফরি ধর্ম গ্রহণ করেছি।

তারা তাদের কথা ও বক্তব্যে ডাহা মিথ্যা বলেছে; আমাদের বিরুদ্ধে এটি এক চরম অপবাদ।

“কিন্তু হত্যা এবং পুড়িয়ে মারার শাস্তির ভয় আমাদের বাধ্য করেছে যে, আমরা নিয়ত ছাড়াই তা-ই বলি যা তারা বলে।” [১]

স্বাধীনতার প্রথম আন্দোলন এবং এর পরিণতি:

জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযানে পাহাড়ি এবং গ্রামীণ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। গ্রানাডার (গার্নাতা) পার্শ্ববর্তী শহরসমূহ: বিয়াজিন, আল-বাশারাত এবং বালতিকে মুসলমানরা অস্ত্র তুলে নেয় এবং জুলুম ও লাঞ্ছনার সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করে। আন্দারুশে যেখানে খ্রিস্টান শাসক জামে মসজিদকে বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল, মুজাহিদিনরা সেখানে জিহাদ ঘোষণা করে দেয়। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা গেরিলা বাহিনীর সাথে লড়াই করতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পরাজিত হয় এবং খ্রিস্টানরা এই এলাকাগুলোতে অত্যাচারের চরম সীমা অতিক্রম করে। “নুবদাতুল আসর”-এর লেখক লিখেছেন:

“আন্দালুসের কিছু লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের প্রতিরক্ষার সংকল্প করে, যেমনটি কুরনি, ফজর, আল-বাশারাত, আন্দারুশ এবং বালতিকের মুসলমানরা করেছিল। কাস্টিলের রাজা সৈন্য সমাবেশ করে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং তাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে সে কঠিন লড়াইয়ের পর তলোয়ারের জোরে এই এলাকাগুলো দখল করে নেয়। সে সেখানে পুরুষদের হত্যা করায়, নারী ও শিশুদের বন্দি করে খ্রিস্টান বানিয়ে নেয় এবং তাদের দাস হিসেবে ঘোষণা করে।” [২]

পশ্চিম আন্দালুসে স্বাধীনতার সংগ্রাম:

পশ্চিম আন্দালুসেও মুজাহিদিনরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং তারা বারবার আগুন ও লোহার প্লাবনকে প্রতিহত করে। “নুবদাতুল আসর”-এর লেখক লিখেছেন:

“পশ্চিম আন্দালুসে কিছু লোক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে, তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ একটি দুর্গম পাহাড়ে একত্রিত হয় এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। কাস্টিলের রাজা সৈন্য সমাবেশ করে তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং অন্যান্য স্থানের মতো সেখানেও লড়াই করে দখল করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার আশা পূর্ণ হতে দেননি। আল্লাহ মুমিনদের সাহায্য করেন এবং ২৩টি যুদ্ধের পর তাকে ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন। তার প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও অশ্বারোহী নিহত হয়। যখন সে দেখল যে তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব নয়, তখন সে তাদের নিরাপত্তা দিয়ে মরক্কো পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। তারা এতে সানন্দে রাজি হয়ে গেল। কিন্তু তাদের পরনের কাপড় ছাড়া অন্য কোনো আসবাবপত্র সাথে নিতে দেওয়া হয়নি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের সমুদ্র পার করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাদের পর আর কারো আশা রইল না যে আন্দালুসে কোথাও ইসলাম টিকে থাকতে পারে। সমস্ত শহর ও গ্রামে কুফর ছড়িয়ে পড়ল এবং ইসলাম ও ঈমানের আলো আন্দালুস থেকে পুরোপুরি নিভে গেল। এটি এমন এক দুর্ঘটনা যার ওপর ক্রন্দনকারীরা কাঁদুক এবং শোক পালনকারীরা শোক পালন করুক।” [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মাইরি: ৫/ ৩২৭, ৩২৮

[২] নুবদাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃ. ১২৩, ১২৪

[৩] নুবদাতুল আসর: পৃ. ১৩৪, ১৩৫

পাঠাগারসমূহের ধ্বংসযজ্ঞ

প্রতিরোধে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রতিশোধমূলক অভিযানের সময় খ্রিস্টান পাদ্রিরা মুসলমানদের সমস্ত জ্ঞান-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। গ্রানাডা এবং এর আশপাশের জনপদগুলোতে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে সমস্ত ইসলামি কিতাব ছিনিয়ে নেওয়া হয়। শহরের সবচেয়ে বড় চত্বর বাব আল-রামলা-তে একযোগে লক্ষ লক্ষ কিতাব স্তুপ করা হয়। এগুলোর মধ্যে স্বর্ণখচিত কুরআন মাজীদের সেই পাণ্ডুলিপিগুলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, যা আন্দালুসের লিপিকাররা অত্যন্ত আগ্রহ ও ভালোবাসার সাথে তৈরি করেছিলেন। পাদ্রিরা এই স্তুপ থেকে চিকিৎসার তিনশটি কিতাব আলাদা করে বাকি সমস্ত ভাণ্ডার অগ্নিদগ্ধ করে দেয়। এভাবে আন্দালুসের মুসলমানদের আটশ বছরের অর্জিত জ্ঞান ও সম্পদ ছাইয়ের স্তুপে পরিণত হয়। [১]

পর্তুগালের মুসলমানদের পরিণতি

একই কিয়ামত আন্দালুসের পশ্চিম অংশেও নেমে আসে, যা ‘পর্তুগাল’ নামক একটি পৃথক রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সেখানেও লক্ষ লক্ষ মুসলমান বসবাস করতেন। পর্তুগালের রাজা তাদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার অথবা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ দেন। যারা হিজরত করার সামর্থ্য রাখতেন না, তাদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। বাকি সবাই দেশ ছেড়ে চলে যান। যারা আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তারা বেঁচে যান, কিন্তু যারা ফার্ডিনান্ড পঞ্চমকে দয়ালু এবং কাস্টিলকে নিরাপদ মনে করে সেদিকে গিয়েছিলেন, তারা চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হন। [২]

আন্দালুসের মোরিস্কো এবং তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

এই বিপ্লবের পরেও মুসলমানরা শেষ হয়ে যায়নি, বরং তারা একটি নতুন শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয় যাদের ‘মোরিস্কো’ বা ‘মোরাসকি’ (তুচ্ছ মুসলমান) বলা হতো। এরা ছিল সেই সব মুসলমান যাদের জোরপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে সম্ভবত এমন কেউ ছিল না যে অন্তর থেকে খ্রিস্টান হয়েছিল। খ্রিস্টানদের নিজেদেরও এই বিষয়ে ধারণা ছিল, তাই তারা জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারীদের কখনোই সাধারণ খ্রিস্টান মনে করত না, বরং তাদের ‘অন্তরে মুসলমান’ বলে গণ্য করত। তাদের নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করার বা অন্য কোনো শহরে ভ্রমণ করার অনুমতি ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন ও নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কার্ডিনাল ফ্রান্স, ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এবং ইসাবেলার পৃষ্ঠপোষকতায় মোরিস্কোদের ‘ঈমান’ পরীক্ষার জন্য তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পাদ্রিরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং তাদের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সমস্ত কার্যক্রম গোপন রাখা হতো। ‘তদন্ত বিভাগ’-এর প্রধান ডন ডিয়েগো ডি সানামি ছিলেন একজন পাষণ্ড হৃদয়ের পাদ্রি। তার কাজ ছিল বেছে বেছে সেই সব মানুষকে গ্রেপ্তার করা যাদের ওপর মুসলমান হওয়ার সন্দেহ হতো। সামান্য বিষয়কেও সন্দেহের কারণ হিসেবে গণ্য করা হতো। তদন্তকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে জারি করা একটি সার্কুলারে বলা হয়েছিল:

“নিম্নোক্ত অবস্থায় যেকোনো মোরিস্কোর ইসলামের দিকে ফিরে যাওয়া প্রমাণিত হবে:”

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩১৬

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩২২

যখন সে ইসলামের প্রশংসা করে... অথবা বলে যে যিশু খোদা নন... অথবা বলে যে তিনি কেবল রসূল ছিলেন। প্রত্যেক খ্রিস্টানের ওপর আবশ্যিক যে সে এই ধরনের কথা আমাদের কাছে পৌঁছে দেবে। এর ওপর এটাও আবশ্যিক যে যদি সে কোনো মুরিস্কিকে দেখে যে সে কিছু ইসলামী অভ্যাসের ওপর আমল করছে তবে আমাদের অবহিত করবে; যেমন মুরিস্কি জুমার দিন গোশত খাওয়াকে হালাল মনে করে, জুমার দিন পরিষ্কার কাপড় পরে কিবলার দিকে মুখ করে আল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করার আগে তার পা বাঁধে, অথবা জবাই না করা পশুর গোশত খায় না, অথবা শিশুদের খতনা করায়, অথবা শিশুদের আরবি নাম রাখে, অথবা কুরআন পাঠ করে, অথবা রমজানে রোজা রাখে, অথবা রমজানে সদকা দেয়, অথবা রমজানে সাহরি ও ইফতারের সময় খাবার খায়, অথবা শূকরের গোশত থেকে বিরত থাকে, অথবা মদ পান না করে, অথবা অজু করে, অথবা নামাজ পড়ে, অথবা ইসলামী পদ্ধতিতে বিয়ে করে, অথবা আরবি কবিতা পড়ে, অথবা মৃতদের গোসল ও কাফন দেয়, অথবা নিজের পূর্বপুরুষদের মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করার কারণে তাদের ‘মরহুম ও মাগফুর’ বলে অভিহিত করে। [১]

যেসব লোক ইসলামের সন্দেহে গ্রেফতার হতো, তাদের কোনো আদালতে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন বা সাফাই পেশ করার অধিকার ছিল না। তাদের নির্যাতন কক্ষে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হতো, চাবুক মারা হতো, আগুনে পোড়ানো হতো, এমনকি তারা যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা যেত অথবা খ্রিস্টধর্মের ওপর নিজের ঈমানের বিশ্বাস জন্মাত।

ঐ সময়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে ঘৃণা চরম পর্যায়ে ছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত আন্দালুসে মুসলমানদের শাসন ছিল, ইহুদিরা সব ধরনের জান ও মালের নিরাপত্তা ভোগ করত। গ্রানাডায় তারা শেষ পর্যন্ত আরাম-আয়েশে জীবন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু গ্রানাডা পতনের পর যখন ফার্ডিনান্ড এবং ইসাবেলা আন্দালুসকে একটি খাঁটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার সংকল্প করল, তখন ইহুদিদের জন্যও আন্দালুসের মাটি সংকীর্ণ করে দেওয়া হলো। তাদেরও একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আন্দালুস ত্যাগ করার অথবা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হলো। মুসলমানদের সাথে ইহুদিরাও তদন্তকারী সংস্থাগুলোর নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হলো। তাদের মাটির নিচে অন্ধকার বন্দিশালায় রাখা হতো। তাদের মধ্যে খুব কম লোকই জীবিত বের হতে পারত। অধিকাংশ নির্যাতন বা অসুস্থতার শিকার হয়ে প্রাণ হারাত। [২]

যেসব লোক এই অসহনীয় পরীক্ষা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দালুস থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত, তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাদের পিছু নিত। ৯১৮ হিজরি (১৫০৩ খ্রিস্টাব্দ) সালে এই আদেশ জারি করা হলো যে কোনো মুরিস্কি বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া নিজের নৌকা বা জাহাজে ভ্রমণ করতে পারবে না। অনুমতিপত্র ছাড়া ভ্রমণকারীদের গ্রেফতার করে তদন্তকারী সংস্থাগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হতো। [৩]

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ এনান আল-মিসরি: ৫/৩৩৫, ৩৩৬।

[২] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ এনান আল-মিসরি: ৫/৩৩৬, ৩৩৭।

[৩] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ এনান আল-মিসরি: ৫/৩৩১।

জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ:

এই বেদনাদায়ক ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ‘নুবজাতুল আসর’-এর লেখক লিখেছেন:

“মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছিল, পুরো আন্দালুস খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল। এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যে প্রকাশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাক্ষ্য দিতে পারে। কেবল নিজের মনে মনে অথবা মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে কালিমা পাঠকারী কিছু লোক বাকি ছিল। মিনারে আজানের পরিবর্তে বিউগল বাজানো হতে লাগল। মসজিদগুলোতে জিকির ও তিলাওয়াতের পরিবর্তে ছবি ও ক্রুশ স্থান পেল। কত চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। কত হৃদয় শোকার্ত ছিল। কত দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমান ছিল যারা হিজরত করার এবং নিজেদের ভাইদের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার সামর্থ্য রাখত না। তাদের হৃদয়ে আগুন জ্বলছিল এবং তাদের অশ্রু বন্যার মতো প্রবাহিত হচ্ছিল। তারা তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের দেখছিল যে তারা ক্রুশ ও মূর্তিকে সিজদা করছে, শূকর ও মৃত প্রাণী খাচ্ছে এবং সমস্ত গুনাহের মূল মদ পান করছে। কিন্তু তারা তাদের নিষেধ করতে পারছিল না। যে এমন করত তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। আহ! এটি কেমন ট্র্যাজেডি ছিল, হায়! এটি কত বড় বিপদ ছিল। এটি তো ছিল কিয়ামতে কুবরা।” [১]

ফকিহদের ফতোয়া:

বিপদগ্রস্ত মুসলমানদের এই পরিস্থিতিতেও নিজেদের দ্বীন নিয়ে চিন্তা ছিল, তারা কোনো না কোনোভাবে আফ্রিকার ফকিহদের সাথে যোগাযোগ করে নিজেদের অবস্থা জানালেন এবং এই ধরনের জীবন সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন। একজন বড় ফকিহর পক্ষ থেকে উত্তর এল:

“এই পরিস্থিতিতে আপনারা ইশারায় সালাত আদায় করে নিন, জাকাত হাদিয়ার নামে কোনো فقير (ফকির)-কে দিয়ে দিন, আল্লাহ সুরত দেখেন না বরং অন্তর দেখেন। গোসলে জানাবাত সমুদ্রে ডুব দিয়ে করা যেতে পারে, সালাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে দিনের সালাতগুলো রাতে আদায় করে নিন, আপনাদের জন্য পানির পবিত্রতা অর্জন অসম্ভব হলে তায়াম্মুম করে নিন চাই তা দেয়ালের ওপর হাত লাগিয়ে হোক, যদি এটিও সম্ভব না হয় তবে প্রসিদ্ধ মত হলো আপনাদের ওপর থেকে সালাত ও পবিত্রতা রহিত এবং কাজাও নেই। অথবা এতটুকু করুন যে যেসব জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা হয় সেগুলোর দিকে ইশারা করে তায়াম্মুমের নিয়ত করে নিন। যদি আপনাদের মূর্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে তা করুন এবং নিয়ত আল্লাহর দিকে রাখুন। যদি তারা মদ্যপানে বাধ্য করে তবে তা ব্যবহারের নিয়ত ছাড়াই পান করে নিন। যদি শূকর ভক্ষণে বাধ্য করে তবে তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা ও হারাম মনে করে খেয়ে নিন, যদি তারা আপনাদের ছেলেদের খ্রিস্টান মেয়েদের সাথে বিবাহ দিতে বলে তবে তা করে নিন কারণ তারা আহলে কিতাব। যদি তারা আপনাদের মেয়েদের তাদের ছেলেদের সাথে বিবাহ দিতে বাধ্য করে তবে তাকে হারাম এবং অন্তর থেকে ঘৃণাযোগ্য মনে করুন। যদি সম্ভব হয় তবে এমনটি করতে দেবেন না। যদি তারা সুদ গ্রহণে বাধ্য করে তবে সুদি লেনদেন করুন কিন্তু নিজেদের আসল মূলধন ছাড়া যা পাবেন তা সদকা করে দিন, যদি তারা কুফরি বাক্য উচ্চারণে বাধ্য করে তবে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলুন বা ভুল উচ্চারণে বলুন এবং তাকে ঘৃণাযোগ্য মনে করুন, অন্তরকে ঈমানের ওপর [অটল রাখুন]।”

[১] নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর: পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২

...অটল রাখুন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনারা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

ওয়াসসালাম। ১লা রজব ৯১০ হিজরি। [১]

কলম্বাস এবং আমেরিকা আবিষ্কার

গ্রানাডার পতনের চার দশক আগে ইউরোপের সাথে এশিয়ার বাণিজ্যের একমাত্র সমুদ্রপথ যা ভূমধ্যসাগর দিয়ে অতিক্রম করত, উসমানীয় তুর্কিদের বিজয়ের কারণে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপীয় ভূগোলবিদ এবং নাবিকরা তখন থেকেই এই চিন্তায় ছিলেন যে কীভাবে পূর্ব এশিয়ার জন্য কোনো নতুন পথ খুঁজে বের করা যায়। ইউরোপীয় শাসকদের সাথে এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ চলত। স্পেনের একজন ইহুদি নাবিক কলম্বাস এই সিলসিলায় অগ্রগামী ছিলেন। তার পরিকল্পনা ছিল এই যে, যদি পশ্চিম দিকে যাত্রা করা হয় তবে কোনো না কোনোভাবে পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছানো সম্ভব। তিনি এই পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মালকা, আস-সারিফা, গ্রানাডা এবং কর্ডোভায় অবস্থান করেন কিন্তু তার পরিকল্পনা সব জায়গায় প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং কেউ এতে বিনিয়োগ করতে রাজি হয়নি।

গ্রানাডা বিজয়ের পরপরই ইসাবেলা ইহুদি নাবিক কলম্বাসকে এই অভিযানের অনুমতি দেন এবং গ্রানাডার ইহুদি আমীররা এই অভিযানের জন্য মুক্তহস্তে অর্থ সরবরাহ করেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ক্যাথলিক খ্রিস্টান শাসকরা তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে খুব শীঘ্রই তাদের সমৃদ্ধি ও সম্পদ ধূলিসাৎ করে দেবে, তাই তারা একটি নতুন আশ্রয়স্থল খোঁজার অভিযানে পূর্ণ অংশ নেন। কলম্বাস আটলান্টিক মহাসাগরে ভ্রমণ করে ভারত খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হন কিন্তু ১২ অক্টোবর ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে (১৮ জিলহজ ৮৯৭ হিজরি) তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলের “গুয়ানাহানি” দ্বীপে পৌঁছে যান এবং সেই দ্বীপগুলোতে স্পেনের পতাকা উড়িয়ে দেন। এভাবেই নতুন পৃথিবী আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও উৎপাদন স্পেনকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করে। [২]

ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর উত্তরসূরি এবং স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদের উত্থান

১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে (৯০৯ হিজরি) ইসাবেলা মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফার্ডিনান্ড পঞ্চমকে ওসিয়ত করেছিলেন যেন তিনি উত্তর আফ্রিকা জয়ের চেষ্টা করেন। ফার্ডিনান্ড পঞ্চম এই ওসিয়ত অনুযায়ী উত্তর আফ্রিকায় অভিযান পাঠান যা খুব একটা সফল হতে পারেনি। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে (৯২২ হিজরি) ফার্ডিনান্ড পঞ্চমও পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মুসলমানরা তার শাসনের শেষ চৌদ্দ বছর অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে ফার্ডিনান্ড পঞ্চম ৩৭ বছর শাসন করেন। তিনি ধূর্ততা, প্রতারণা এবং জঘন্য রাজনীতির মাধ্যমে যেভাবে মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তারপর যেভাবে নিষ্ঠুর ও পাশবিক কায়দায় তাদের পিষে ফেলেছিলেন, তার কলঙ্ক ইউরোপের ইতিহাসের ললাট থেকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না।

১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে (৯২২ হিজরি) ফার্ডিনান্ড পঞ্চম-এর মৃত্যুর পর তার নাতি চার্লস পঞ্চম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে (৯০৫ হিজরি) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। তার শাসনামলে স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে।

[১] দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/৩৩৩

[২] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ক্রিস্টোফার কলম্বাস

গ্রহণ করল। সে জার্মানি, হল্যান্ড এবং দক্ষিণ ইতালি সহ ইউরোপের বিশাল এলাকা জয় করে নিল। ১৫২২ খ্রিস্টাব্দে (৯২৮ হিজরি) স্প্যানিশ নাবিক ম্যাগেলান দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে দূরপ্রাচ্যের ফিলিপাইন দ্বীপে পৌঁছে যান, যেখানে মুসলমানরা বসবাস করত। এরপর তিনি ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে স্পেনে ফিরে আসেন। এভাবে স্প্যানিশরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল এবং নতুন শিকারভূমির সন্ধান পেল। স্প্যানিশ বাহিনী ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৪১ হিজরি) উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে তিউনিসিয়াও দখল করে নেয়। এরপর আলজেরিয়ার ওপরও আক্রমণ চালায় এবং সেখানকার শাসকদের করদ রাজ্যে পরিণত করে। এই সময়ে স্পেনের নৌবাহিনীকে উসমানীয় তুর্কিদের বিখ্যাত নৌ-কমান্ডার খায়রুদ্দিন বারবারোসার মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তিনি না থাকলে স্প্যানিশ বাহিনী পুরো উত্তর আফ্রিকা জয় করে নিত। ফ্রান্সের সাথেও চার্লসের যুদ্ধ অব্যাহত ছিল এবং তিনি পুরো ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৬৩ হিজরি) তিনি শাসনভার তার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপের হাতে তুলে দেন এবং নিজে সন্ন্যাসী হয়ে যান। সেই সময় স্পেন সাম্রাজ্য জার্মানি, হল্যান্ডের উপকূলীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইতালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো এবং পেরুর ওপরও প্রভাবশালী ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনামলে স্পেন ফিলিপাইনে নিয়মিত সামরিক অভিযান চালায়। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে (৯৭২ হিজরি) স্প্যানিশরা ফিলিপাইনের উপকূলে দখলদারিত্ব কায়েম করে, রাজা ফিলিপের নামানুসারে এই দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখা হয় ফিলিপাইন। ফ্রান্স ও হল্যান্ডের সাথেও স্পেনের যুদ্ধ চলতে থাকে।

দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে (১০০৬ হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র তৃতীয় ফিলিপ তার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি স্পেন থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার কালো অধ্যায় রচনা করেন। এই সোয়া শতাব্দীতে আন্দালুসের মুসলমানরা কোনো না কোনোভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এটা আলাদা কথা যে, তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত। [১]

মোরিস্কো মুসলমানদের দুর্দশা:

এই সময়ে স্পেনে মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযান অব্যাহত ছিল, যার জোর ছিল মূলত দক্ষিণ গ্রানাডা এবং এর আশপাশের এলাকায়। ভ্যালেন্সিয়া, লিওন, আরাগন এবং অন্যান্য শহরের মুসলমানরা, যারা গত দুই-তিন শতাব্দী ধরে খ্রিস্টানদের অধীনে ছিল, তারা কিছুটা নিরাপদ ছিল। কারণ শতাব্দীকাল ধরে স্পেনের কৃষি এবং শিল্প ও বাণিজ্য এই দক্ষ মুসলমানদের যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থার চমৎকার অভিজ্ঞতার কারণে এখানকার মুসলিম কৃষকরা পুরো ইউরোপে বিখ্যাত ছিল এবং খ্রিস্টান জমিদাররা তাদের হারাতে চাইত না। যদিও পাদ্রিদের আশ্রয় চেষ্টা ছিল যাতে সব শহরের মুসলমানদের যত দ্রুত সম্ভব খ্রিস্টান বানানো যায়, কিন্তু শাসকদের ও জমিদারদের অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং রাজনৈতিক কৌশল এতে বাধা হয়ে দাঁড়াত।

যখন পঞ্চম চার্লস সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তার অল্প বয়সের কারণে আন্দালুসের মুসলমানরা দয়া ও করুণার আশা করেছিল। তারা টলেডোতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানোর অভিযান বন্ধ করার এবং ন্যায়বিচারের আবেদন জানায়। পঞ্চম চার্লস পাদ্রিদের ডেকে পরামর্শ করলেন যে, মোরিস্কো মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে তা কি জুলুম নাকি ইনসাফ। পাদ্রিরা তাদের...

[১] আল-আন্দালুসিউন আল-মুওয়্যারিকা, ডক্টর আদিল সাঈদ বিশতাভি, পৃষ্ঠা ১২৫, ১৩০; তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ, মুহাম্মী, পৃষ্ঠা ২০৩ থেকে ২০৫ টীকা।

কথা মানানো হলো। ফলে সিদ্ধান্ত হলো যে, মোরিস্কোরা এই আচরণেরই যোগ্য এবং এটাই তাদের জন্য ন্যায়বিচার ও ইনসাফ। এই সিদ্ধান্তের পর আইনগতভাবে সমস্ত মুসলমান এবং তাদের সন্তানদের চিরতরে খ্রিস্টান ঘোষণা করা হলো। এটি ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দ (৯৩১ হিজরি) এর ঘটনা।

ভ্যালেন্সিয়ায় মুসলমানদের ২৭ হাজার পরিবার ছিল যারা এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং হাঙ্গামা শুরু করে। সরকার অনেক কষ্টে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে গ্রানাডার মুসলমানরাও জেগে ওঠে এবং জুলুমমূলক আইনগুলো বাতিলের দাবি জানাতে থাকে। তারা ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৩ হিজরি) কিছু মধ্যপন্থী খ্রিস্টান নেতাদের প্রতিনিধি বানিয়ে পঞ্চম চার্লসের কাছে পাঠায় যাতে তাদের সাথে কিছু শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়। চার্লস মুসলমানদের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার ওপর পাদ্রিদের চাপও ছিল। তিনি সমস্ত মুসলমানদের খ্রিস্টান ঘোষণা করার আইন বহাল রাখেন, তাদের নাম, পোশাক, ভাষা এবং রীতিনীতিতে ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণের নির্দেশ দেন, তবে সাথে এই ছাড়ও দেন যে, খ্রিস্টান ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের চল্লিশ বছরের সময় দেওয়া হলো। তারা এই সময়ের মধ্যে পাকাপোক্ত খ্রিস্টান হয়ে যাবে।

এগুলো সেই দিন ছিল যখন ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছিল যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জার্মানির একজন পাদ্রি মার্টিন লুথার (১৩৮৩-১৫৪৬ খ্রি.)। তিনি প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, জনগণকে অধিকার দেন যে তারা নিজেরাই বাইবেল বুঝতে পারে। তিনি পোপের অস্বাভাবিক ক্ষমতা অস্বীকার করে দাবি করেন যে ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করা উচিত, পোপের গির্জার বাইরের কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যেহেতু পাদ্রিদের একাধিপত্যে ইউরোপীয় রাজারা আগে থেকেই বিরক্ত ছিলেন, তাই মার্টিন লুথারের এই চিন্তাধারা অনেক রাজপরিবারেও গৃহীত হলো। জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালির শাসকরা এই আন্দোলনকে স্বাগত জানান। ব্রিটিশ রাজা অষ্টম হেনরি এবং চতুর্থ এডওয়ার্ড এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। লুথারের সমর্থকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৩ হিজরি) পোপ এবং ইউরোপীয় রাজারা একটি সম্মেলন করেন যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রতিটি দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে (৯৩৫ হিজরি) গির্জা এই সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করে। এর প্রতিবাদে অনেক রাজা ও রাজপুত্র বিক্ষোভ করেন। এই কারণেই লুথারের সমর্থকদের “প্রতিবাদী দল” (প্রোটেষ্ট্যান্ট) বলা হতে থাকে। অবশেষে রোমের পোপ হার মানেন এবং স্থির হয় যে প্রতিটি শাসক তার দেশে নিজের পছন্দের ধর্ম প্রচার করতে পারবেন। এরপর ইউরোপে রোমান চার্চের বিপরীতে প্রোটেষ্ট্যান্ট চার্চও প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইউরোপের অনেক জাতি ক্যাথলিক গির্জা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

এই বিপ্লবের স্পেনে খুব বেশি প্রভাব পড়েনি কারণ চার্লস ছিলেন কটুর ক্যাথলিক, তবে এতটুকু অবশ্যই হয়েছিল যে মুসলমানদের বংশ নিধনের উন্মাদনা কিছুটা কমে গিয়েছিল। এই যুগে মুসলমানদের ওপর কখনো কঠোরতা করা হতো, কখনো কোমলতা। সরকার নিত্যনতুন আইন তৈরি করত, কখনো মুসলমানদের জন্য কিছু ছাড় দিত, কখনো সমস্যা বাড়িয়ে দিত। শূকরের মাংস এবং মদ বিক্রি না করা ব্যবসায়ীদের শাস্তি দেওয়া হতো। আরবি ভাষা বলা এবং আরবি পোশাক ব্যবহারের অনুমতি ছিল কিন্তু তার ওপর কর ধার্য ছিল।

এই পরিস্থিতিতেও অধিকাংশ মুসলমান তাদের দ্বীন ও ঈমানের ওপর অটল ছিলেন।

১৫৫৬ থেকে ১৫৯৮ সাল পর্যন্ত চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপের শাসনকাল ছিল। সে পূর্ববর্তী সময়ের নামমাত্র শিথিলতাও খতম করে দেয়। জানুয়ারি ১৫৬৫ (জমাদিউল আউয়াল ৯৭২ হিজরি) সালে মুসলমানদের দেওয়া চল্লিশ বছরের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই নতুন আইন জারি করা হয়; এখন প্রতিদিন গোসল করাকেও ইসলামের প্রতীক হিসেবে গণ্য করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। ফিলিপের আদেশে কাসরুল হামরার সমস্ত হাম্মামখানাও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। ১ জানুয়ারি ১৫৬৭ (৮ জমাদিউস সানি ৯৭৪ হিজরি) সালে ঘোষণা করা হয় যে, তিন বছরের মধ্যে সমস্ত মরিস্কোদের কাস্টিলিয়ান ভাষা শিখে নিতে হবে। এরপর কাউকে আরবিতে একটি বাক্য বলা বা লেখারও অনুমতি দেওয়া হবে না। এই আদেশও জারি করা হয় যে, পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম শিশুদের নাম নিবন্ধিত করতে হবে যাতে তাদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া যায়। নারীদের পর্দা করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। মুখ খোলা রেখে বাইরে বের হওয়া তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। এই যুগে যদি কোথাও মুসলমানদের প্রতি শিথিলতা দেখানো হতো, তবে তার কারণ ছিল এই যে, কিছু বিত্তবান মুসলমান তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের ঘুষ হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতেন এবং এর বিনিময়ে নিজ এলাকার লোকদের কোনো না কোনোভাবে এই পাশবিক আইনের কবল থেকে রক্ষা করতেন। [১]

শেষ স্ফুলিঙ্গ:

চরম হতাশা অনেক আত্মমর্যাদাশীল মুসলমানকে এই পরিস্থিতিতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে তোলে। দমিত ও নিষ্পেষিত মানুষের মধ্যে প্রতিরোধের স্ফুলিঙ্গ আবারও জ্বলে ওঠে। হাজার হাজার যুবক স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য গোপন প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়। এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গ্রানাডার “বায়াজিন” মহল্লার এক ব্যক্তি ফারাজ বিন ফারাজ। তার সাথে ইবনে দাউদ নামক এক মুসলিম সাহিত্যিক শরীক ছিলেন, যিনি জাতির মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির জন্য একটি পুস্তিকা লিখে গোপনে একদিকে কাস্টিলিয়ার শাসিত মুসলমানদের কাছে এবং অন্যদিকে মরক্কোর আমিরদের কাছে পৌঁছে দেন, যাতে মুসলমানদের আত্মমর্যাদাবোধকে জাগ্রত করা হয়েছিল এবং তাদের খ্রিস্টানদের অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আহ্বান জানানো হয়েছিল। মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ও গোপন প্রস্তুতির পর ডিসেম্বর ১৫৬৮ (জমাদিউস সানি ৯৭৬ হিজরি) সালে ফারাজ বিন ফারাজ গ্রানাডার পথে খ্রিস্টানদের একটি অস্ত্রবাহী কাফেলার ওপর অতর্কিত হামলা চালান, যা বন্দুকের একটি বিশাল চালান নিয়ে যাচ্ছিল। (সেই যুগে বন্দুক আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং মুজাহিদিনরা পরবর্তী গেরিলা হামলায় এগুলো পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন)। অস্ত্র সংগ্রহের পরপরই ফারাজ বিন ফারাজ দুইশ মুজাহিদকে সাথে নিয়ে গ্রানাডার পার্শ্ববর্তী জনপদ বায়াজিনে পৌঁছান এবং লোকদের সাথে দেওয়ার আহ্বান জানান। সিদ্ধান্ত হয় যে, বায়াজিন ও গ্রানাডার মতো শহরের মুসলমানরা আর্থিক সহযোগিতা অবশ্যই করবেন, তবে সামরিক কেন্দ্রগুলো কেল্লাবেষ্টিত শহরের পরিবর্তে পাহাড়ে তৈরি করা হবে যাতে মুসলিম জনবসতিগুলো প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু না হয়।

ফারাজ বিন ফারাজ মুজাহিদদের নিয়ে জাবালে শালিরের দিকে চলে যান। মানুষ তার চারপাশে সমবেত হতে থাকে। গ্রানাডার এক সাহসী

[১] আল-আন্দালুসিউন আল-মুয়ারিকা, ড. আদিল সাঈদ বিশতাওয়ী, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৬।

এবং সম্পদশালী উমাইয়া যুবক মুহাম্মদ বিন উমাইয়া শহর ছেড়ে নিজের পরিবারসহ সেখানে পৌঁছালে লোকেরা বনু উমাইয়ার আমিরাত পুনরুজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিল। এই বিশ বছর বয়সী যুবককে আমির মেনে নিয়ে বায়াত গ্রহণ করা হলো এবং একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার রাজ্যাভিষেক করা হলো। তার চাচা মুসলিম বিন জওহরকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। দীর্ঘকাল পর মুসলমানরা কিবলামুখী হয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করল, ইসলামী রাষ্ট্রের পতাকা তৈরি করা হলো। ইবনে উমাইয়া জাবালে আহমারের সবচেয়ে নিরাপদ দুর্গ হিসনুল লুজকে কেন্দ্র বানালেন, যেখানে সারা বছর বরফ পড়ত এবং হিমবাহ থেকে নদী প্রবাহিত হতো।

এই শীতলতম স্থানে বসবাস করা কোনো সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু জীবন বাজি রাখা ব্যক্তিদের সাহস কোনো সমস্যাকেই তোয়াক্কা করত না। মুহাম্মদ বিন উমাইয়া অসাধারণ বীরত্ব, সাহস ও বিচক্ষণতার সাথে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ফারাজ বিন ফারাজ তার পতাকাতলে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ করতে থাকলেন। তার নাম আর কখনো শোনা যায়নি।

বিপ্লবের দামামা বেজে উঠতেই মৃত জাতির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল এবং জায়গায় জায়গায় ঈমানদাররা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তদন্তকারী সংস্থাগুলোর পাষণ্ড হৃদয়ের পাদ্রি, মুসলমানদের ওপর জুলুমকারী পশুতুল্য অফিসার এবং সরকারি কর্মচারীদের বেছে বেছে হত্যা করা হলো। আল-বামাশা-এর পার্বত্য অঞ্চল মুজাহিদদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলো, যার পরিধি এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো যে গ্রানাডাসহ সমগ্র দক্ষিণ স্পেন থেকে খ্রিস্টানদের আধিপত্য শেষ হতে দেখা যাচ্ছিল। আন্দরাশ, লোরোহ, কুহিস্তানে রান্দাহ, জাবালে আহমার, ওয়াদিউল আতশ, বেরুন এবং আল-হামাহসহ বহু জেলা কাস্তিলিয়ার দখল থেকে বেরিয়ে গেল। আলমেরিয়া এবং মালাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও শহরতলিতে মুজাহিদদের পাল্লা ভারী ছিল।

খ্রিস্টানদের মোটেও প্রত্যাশা ছিল না যে গ্রানাডার পতনের পৌনে এক শতাব্দী পরেও এই জাতির মধ্যে প্রতিরোধের কোনো লেশ অবশিষ্ট থাকবে। কাস্তিলিয়ার রাজপ্রাসাদে হুলস্থূল পড়ে গেল। সেখান থেকে একের পর এক সৈন্যবাহিনী পাঠানো হলো। মুজাহিদদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র ছিল পুরনো ও সীমিত, কিন্তু তারা পাহাড়ি পথ ও গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল, তাই কাস্তিলিয়ার বাহিনী ক্রমাগত পরাজয়ের সম্মুখীন হতে থাকল। যদিও কিছু যুদ্ধে মুসলমানরাও চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, একটি যুদ্ধে ইবনে উমাইয়া পরাজিত হন এবং পিছু হটতে বাধ্য হন। তার মা, স্ত্রী, বোন এবং অনেক অফিসার শত্রুদের হাতে বন্দি হন। তাদের মধ্যে আল-তারমার নামক মুজাহিদ নেতাকে গ্রানাডার চকে শরীরের প্রতিটি অংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হত্যা করা হলো। খ্রিস্টান সৈন্যরা তাদের ব্যর্থতার ক্ষোভ বন্দিদের ওপর ঝাড়তে থাকল। গ্রানাডার জেলে বন্দি সমস্ত কয়েদিকে একদিনেই এই বলে জবাই করা হলো যে, তারা যেন জেল ভেঙে মুজাহিদদের সাথে যোগ দিতে না পারে।

কিন্তু ইবনে উমাইয়া হার মানেননি। এই প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে মুজাহিদদের মধ্যে আরও উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে থাকল এবং তাদের এই আদর্শ আরও দৃঢ় হলো যে, ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে মরা দাসত্ব ও বন্দিত্বের কষ্টের চেয়ে অনেক ভালো।

চার বছর ধরে এই মুজাহিদরা খ্রিস্টান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকল। যোদ্ধাদের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও शामिल ছিল। এই সময়ে ইবনে উমাইয়া ইস্তাম্বুল, আলজেরিয়া এবং মরক্কোর দরবারে আবেদন পাঠালেন যেন তাদের সাহায্য পাঠানো হয়, কিন্তু কোথাও থেকে কোনো সাহায্য আসেনি। যদি বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যেত, তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে অন্তত দক্ষিণ...

আন্দালুসকে স্বাধীন করে নেওয়া যেত, কিন্তু আফসোস শত আফসোস যে, মুসলিম সরকারগুলো আন্দালুসের মুসলমানদের জীবিত থাকাবস্থায়ই তাদের ওপর ফাতেহা পড়ে নিয়েছিল।

ক্ষতগুলো আমাকে প্রদীপ্ত বৃক্ষে পরিণত করেছে

কখনো তুমি এসে এই দৃশ্য দেখলে না

তোমার অবহেলা এই দিনগুলো দেখিয়েছে

এদিকে তুমি তাকালে না, তাকালে না [১]

হ্যাঁ, সাধারণ মুসলমানরা অবশ্যই এই রণক্ষেত্রের দিকে মনোনিবেশ করেছিল এবং আফ্রিকা ও তুরস্কের শত শত স্বেচ্ছাসেবক সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আন্দালুসি ভাইদের কাছে পৌঁছাতে শুরু করেছিল।

এই সময়ে মুজাহিদদের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া নামক এক অত্যন্ত চতুর ও উচ্চ সাহসী নেতা সামনে আসেন। তিনি ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে (৯৭৭ হিজরি) গ্রানাডার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত “আরজাবাহ” দুর্গ অবরোধ করে তা দখল করে নেন। খুব শীঘ্রই তার সঙ্গীরা আল-বাশারাত এবং রানদাহ থেকে মালাগা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন যখন সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন দ্বিতীয় শাহ ফিলিপের ভাই ডন হুয়ান, যিনি দক্ষিণ আন্দালুস নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন, তার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া এবং মুহাম্মদ বিন উমাইয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেন। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আবদুল্লাহ বিন উমাইয়ার সমর্থকরা মুহাম্মদ বিন উমাইয়াকে হত্যা করল।

এখন মুজাহিদদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আবদুল্লাহ বিন উমাইয়া গ্রহণ করলেন। তিনিও তার বাহিনী নিয়ে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করলেন এবং মাথা নত করলেন না। বেশ কিছু ব্যর্থ যুদ্ধের পর অবশেষে দ্বিতীয় ফিলিপ ডন হুয়ানকে এক বিশাল বাহিনী দিয়ে দক্ষিণ আন্দালুসে পাঠান। তিনি গ্রানাডাসহ সমস্ত দক্ষিণ শহরগুলোতে পুরুষদের চলাচলের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, বিদ্রোহে অংশগ্রহণের সন্দেহে হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করেন। মহাসড়ক থেকে শুরু করে পাহাড়ের গিরিপথ পর্যন্ত সব জায়গায় কঠোর পাহারা বসিয়ে দেন এবং মুজাহিদদের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। তার বাহিনী একটি সুসংহত পরিকল্পনার অধীনে মুজাহিদদের আস্তানাগুলো ঘিরে রাখতে থাকে। বেশ কয়েক মাস ধরে এই অভিযান চলতে থাকে। ডন হুয়ান বাস্তার নিকটবর্তী ‘হিসনে গালেরা’ অবরোধ করেন যেখানে তুরস্ক থেকে আসা স্বেচ্ছাসেবকসহ তিন হাজার নারী-পুরুষ অবস্থান নিয়েছিলেন। মুজাহিদগণ কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই চালিয়ে যান। অবশেষে অনাহারে নিরুপায় হয়ে ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে (৯৭৮ হিজরি) তারা প্রাণের নিরাপত্তার শর্তে আত্মসমর্পণ করেন। ডন হুয়ান তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নারীদের দাসী বানানো হয় এবং সমস্ত পুরুষকে শহীদ করে দেওয়া হয়।

এই সময়ে “হাবকি” নামক অন্য এক মুজাহিদ নেতা, যিনি সিরুন, জওলা এবং বারশানদাহর দায়িত্বে ছিলেন, ক্রুসেডার বাহিনীর মোকাবিলা করতে পৌঁছান এবং ডন হুয়ানকে নাস্তানাবুদ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেন। ডন হুয়ান গিয়ে ফিলিপকে সমস্ত পরিস্থিতি জানান, যার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে আলোচনা এবং আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করা হবে। ডন হুয়ান মুজাহিদ নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের এই নিশ্চয়তা দেন যে, যদি তারা ৩০ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করেন তবে তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদান করা হবে।

[১] দাগ দেহলভি

অন্যথায় চৌদ্দ বছরের বেশি বয়সী প্রত্যেক মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

মুজাহিদগণ এই ঘোষণাকে খড়্‌কুটোর সমানও গুরুত্ব দেননি, কারণ এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল যে নাসারাদের প্রতিশ্রুতি পানির ওপর লেখার মতো। তবে হাবকি সন্ধিতে সম্মত হলেন এবং তার দখলকৃত এলাকাগুলো খালি করে দিলেন, অন্যদিকে অধিকাংশ স্বাধীনতাকামী তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন আবিহ-এর পক্ষ নিলেন এবং অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ সেই দিনগুলোতে আফ্রিকান মুজাহিদদের নতুন সাহায্য এসেছিল এবং আরও কয়েক বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আশা ছিল।

ডন জুয়ান হাবকিকে পাঠিয়ে মুজাহিদদের নরম করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মুজাহিদগণ হাবকিকে গাদ্দার ঘোষণা করে হত্যা করেন।

ডন জুয়ান দূত পাঠিয়ে আবারও সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। ইবনে আবিহ উত্তর দিলেন:

“আমি আমার সাথীদের নিষেধ করি না, তারা যা চায় করুক। কিন্তু তুমি গিয়ে তোমার মনিবকে বলে দাও যে, যতক্ষণ আমার শরীর ঢাকার জন্য একটি চাদরও অবশিষ্ট আছে, আমি তাদের পথে চলব না। যদি আমাদের একজন লোকও অস্ত্র না ধরে, তবুও আমি অস্ত্র ধরেই থাকব। আমি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকা এবং মরা পছন্দ করি। দ্বিতীয় ফিলিপের সুযোগ-সুবিধাগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।”

বেঁচে থাকার কাহিনী থাকতে দাও, এখন সেগুলোতে জড়িয়ে কী লাভ হবে

একটি মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি বাকি আছে, যখন চাইব জেনে নেব [১]

অবশেষে ডন জুয়ান বিশাল সৈন্যবাহিনী আনিয়ে আল-বান্সারা এবং মুজাহিদদের অন্যান্য সামরিক কেন্দ্রগুলোতে আক্রমণ শুরু করলেন। তিনটি বাহিনী একযোগে আক্রমণ শুরু করল। একটি বাহিনী গ্রানাডা থেকে আল-বান্সারার দিকে অগ্রসর হলো। দ্বিতীয়টি রন্দার দিকে যাত্রা করল। ডন জুয়ান ওয়াডি আশ-এর দিকে অগ্রসর হলেন। তার ঘোষণা ছিল: “কোনো দয়া বা কোমলতা দেখানো হবে না।”

এই বাহিনীগুলো প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি জনপদ, প্রতিটি খেত, প্রতিটি বাগান, প্রতিটি পুকুর এবং প্রতিটি কুয়ো ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকল যাতে মুসলমানদের জন্য এখানে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। মুজাহিদগণ জনপদগুলো থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের চূড়া এবং গুহাগুলোর দিকে পিছু হটতে থাকলেন। অনেক মুজাহিদ এবং হাজার হাজার মরিস্কো ভাগ্যের লিখন মেনে নিয়ে আফ্রিকান ভাইদের সাহায্যে সমুদ্র পাড়ি দিলেন।

অবশিষ্ট মুজাহিদগণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। নাসারাদের প্লাবন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাদের পাহাড়ের মধ্যে ঘিরে ফেলেছিল। মুজাহিদগণ স্থানে স্থানে পরিখা খনন করে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হচ্ছিলেন এবং পিছু হটছিলেন। আবদুল্লাহ বিন আবিহ তার স্ত্রী-সন্তান এবং প্রায় সত্তর জন সাথীর সাথে একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাসারারা গুহার মুখে দখল করে আগুন ধরিয়ে দিল, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে গুহার ভেতরে থাকা সমস্ত লোক শহীদ হয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন আবিহ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্তু পরে একজন গাদ্দার নাসারাদের কাছ থেকে পুরস্কারের আশায় তাকে হত্যা করে এবং লাশ গ্রানাডায় পৌঁছে দেয়। এই সাহসী নেতার মাথা কেটে গ্রানাডার ফটকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। এটি ১৫৭১ সালের মার্চ (শাওয়াল ৯৭৮ হিজরি) মাসের ঘটনা।

[১] লিস আবরিক

১৫৮২ সালে (৯৯০ হিজরি) ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানরা শেষবারের মতো তাদের প্রদেশে খ্রিস্টান শাসনের তখত উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়েছিল কিন্তু তারা পরাজিত হয়েছিল।

খ্রিস্টানরা এই প্রতিরোধ আন্দোলনের ভয়াবহ প্রতিশোধ নিয়েছিল। আল-বুশারা (Al-Bujarra) এর পুরো এলাকাকে কসাইখানায় পরিণত করা হয়েছিল। হাজার হাজার পুরুষ, নারী ও শিশুকে জবাই করা হয়েছিল। সর্বত্র মুসলমানদের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। হাজার হাজার মানুষকে কেবল বিদ্রোহের সমর্থনের সন্দেহে হত্যা করা হয়েছিল, লাশগুলো পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আন্দালুসের নদীগুলো মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। অসংখ্য মানুষকে বন্দি করা হয়েছিল এবং বাকিদের বড় পরিসরে এদিক-ওদিক সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

স্প্যানিশ শাসকদের আশঙ্কা ছিল যে উপকূলের কাছাকাছি বসবাসকারী মুসলমানরা যেকোনো সময় বাইরের মুসলিম বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তাই ১৬০৫ সালে (১০১৩ হিজরি) ভূমধ্যসাগরের উপকূল থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে তাদের দেশের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর যদি কোনো মুসলমানকে উপকূলের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করতে দেখা যেত, তবে তাকে হত্যা করা হতো। [১]

স্মরণ করো সেই দিনগুলোকে যখন এখানে জনবসতি ছিল

রাস্তাগুলো যা ধূলি ও রক্তের আতঙ্কে ভরে গিয়েছিল

কেমন পিতা ছিলেন এখানে যারা কখনো হাসেননি

কেমন দোয়া ছিল এখানে যা নিস্বফল হয়ে গিয়েছিল

মুসলমানদের পুরোপুরি বহিষ্কার:

প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ হওয়ার পর মরিকোরা একেবারে নিস্তব্ধ ও নিখর হয়ে গিয়েছিল। জুলুম ও নির্যাতনের তীব্র আগুনের আঁচ তারা নীরবে সহ্য করছিল। তারা তাদের শেষ পরিণতি জানত, যা সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা কেবল শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। ১৫৯৮ সালে (১০০৬ হিজরি) ফিলিপ তৃতীয় রাজা হন যার নির্ধুরতা ছিল নজিরবিহীন। এক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানদের পিষে ফেলা, চূর্ণ করা এবং ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, যা খ্রিস্টান শাসক ও ধর্মীয় নেতারা করেছিলেন, গুটিকয়েক লোক ছাড়া মরিকোদের মধ্যে কেউ মন থেকে খ্রিস্টান হয়নি। তিন প্রজন্ম অতিবাহিত হওয়ার পরও তারা ভেতর থেকে মুসলমানই ছিল। তাদের কখনোই খ্রিস্টান বানানো যায়নি।

লর্ড পাদ্রি ক্যাসপার ডি কুইরোগা ১৫৮৮ সালে একটি সরকারি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

“শয়তানি আকিদার ধারক এই মুসলমানরা না তো খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনায় শরিক হয়, না তাদের রাস্তায় পবিত্র ক্রুশ শোভাযাত্রায় দেখা যায়। নিজেদের পাদ্রিদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা কেবল পাপ স্বীকারের জন্য পাদ্রিদের কাছে আসে। তারা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে যাতে তাদের সন্তানদের বাঁচানোর জন্য...”

[১] আন্দালুসিয়ান মরিকোস: ১৩৫ থেকে ১৮৮; দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস, আবদুল্লাহ ইনান আল-মিসরি: ৫/১৬৫ ও ৩৫৬।

“লুকিয়ে রাখেন।” [১]

মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পর খ্রিস্টানদের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল: মানবতার পরিচয় দিয়ে মুসলমানদের নিজেদের সাথে বসবাস করতে দেওয়া অথবা পাশবিকতা প্রদর্শন করে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া। মানবতাহীন শাসকরা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিল। ৪ আগস্ট ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে (১ জমাদিউল আউয়াল ১০১৮ হিজরি) ফিলিপ তৃতীয় চূড়ান্তভাবে মুসলমানদের বহিষ্কারের অনুমোদন দেন এবং ২২ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, মুসলমানদের অবিলম্বে স্পেন ত্যাগ করতে হবে। জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো ব্যক্তিদের মধ্যে কেবল সেই ব্যক্তিদেরই দেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যারা গির্জায় উপস্থিত হচ্ছিল। তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মুসলমান, যাদেরকে সরকারি নথিপত্রে খ্রিস্টান হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ইবাদতে অনুপস্থিত থেকে সন্দেহভাজন হয়ে পড়েছিল, তাদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।

নয় শতাব্দী ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রজন্মকে চলে যাওয়ার জন্য মাত্র তিন দিনের সময় দেওয়া হলো। এত অল্প সময়ে তারা আর কোথায় যেতে পারত। তাদের এক বিশাল অংশ ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, শহর ও গ্রাম থেকে বিপদগ্রস্ত ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বেরিয়ে পড়ল এবং কোনো এক অজানা গন্তব্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। খ্রিস্টান শাসকদের উদ্দেশ্যই ছিল মুসলমানদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা, তাই তাদের দেশান্তর করার সময় তাদের জানমালের নিরাপত্তার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করা হয়নি। তাদের সাথে অত্যন্ত লজ্জাজনক আচরণ করা হলো। এমনকি তাদের পানীয় জলও অত্যন্ত চড়া মূল্যে দেওয়া হতো। তারা গরম থেকে বাঁচতে কোনো গাছের নিচে বসলে তার জন্যও মূল্য আদায় করা হতো।

মধ্য অঞ্চলের শহরগুলোর ১৩ হাজার নিরস্ত্র ও নিঃস্ব মুসলমানকে পাহাড়ি গিরিপথ দিয়ে ফ্রান্সের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু ফ্রান্স তাদের আশ্রয় দিতে অস্বীকার করল এবং তারা নিরুপায় হয়ে পিরেনিজ পর্বতমালার বরফাবৃত উপত্যকায় আটকা পড়ে রইল। অসংখ্য নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলোর দিকে ঠেলে দেওয়া হলো। হাজার হাজার গৃহহীন মানুষকে উত্তর আফ্রিকা বা অন্য কোনো নিরাপদ দেশে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরিবর্তে বলকোনিয়ার পথে বিস্ফে উপসাগরে নামিয়ে দেওয়া হলো, যেখানে তারা জলদস্যুদের শিকারে পরিণত হলো।

ভ্যালেন্সিয়ার মুসলমানরা এই পরিস্থিতিতে আরও একবার লড়াই করার সাহস দেখাল কিন্তু তাদের নির্মমভাবে দমন করা হলো। এই শহরের মুসলমানদের এমন অবস্থায় সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো যে তাদের কাছে পরার মতো উপযুক্ত কাপড় এবং খাবারের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাদের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার লোক ভ্যালেন্সিয়ার পাহাড়ে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করল। তিন বছর পর্যন্ত তারা সরকারের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে রইল। অবশেষে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে (১০৩২ হিজরি) শাসকরা আলোচনার মাধ্যমে তাদের আলজেরিয়ায় নির্বাসিত করে। এভাবে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের (১০২৩ হিজরি) শেষ নাগাদ দৃশ্যত আন্দালুসে এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট রইল না যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে সে ইসলামের অনুসারী। [২]

[১] হয়ে তুম দোস্ত জিস কে, ড. হক উল হক, পৃষ্ঠা ৭২।

[২] আল-আন্দালুস আল-মুওয়াররাকা: ২৩৩ থেকে ১৮৮।

৭২৪

তারিখ-ই-উম্মতে মুসলিমা

আন্দালুসে মুসলিম শাসনের অবসানের পর ১৬০৯ সাল পর্যন্ত ১১৮ বছরের দাসত্বের যুগে নিহত, নিখোঁজ বা উত্তর আফ্রিকার দিকে পালিয়ে যাওয়া অগণিত মুসলিমের সংখ্যা উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত আন্দালুসে আরব ও বারবার মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ পর্যন্ত। তাদের মধ্যে দেড় লক্ষ মানুষকে তুর্কি নাবিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আলজেরিয়ার উপকূলে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলিম তারা ছিলেন যারা স্পেনের প্রতিরোধ ভাঙার সময় নিহত হয়েছিলেন। দশ-বিশ হাজার ব্যক্তি তারা ছিলেন যারা উত্তর আন্দালুস থেকে বেরিয়ে পশ্চিম ইউরোপে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তুর্কি কর্তৃপক্ষ ব্রিটেনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের জাহাজে করে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত করেছিল।

তারা ছাড়া বাকি প্রায় চার লক্ষ মুসলিমের কোনো হদিস পাওয়া যায় না। তারা একেবারে নাম-নিশানা বিহীন হয়ে গেছেন। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে, দেশত্যাগের ঘোষণা দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ মুসলিমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, আর খুব কম লোকই মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া বা তুরস্কের মতো নিরাপদ অঞ্চলে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। [১]

যাদের কোলাহলে একদা আবাদ ছিল মরুপ্রান্তর

তাদের শহরগুলো মুছে গেছে, জনপদগুলো নিস্তব্ধ হয়ে গেছে

জগতে চিরস্থায়ী সুখ নিয়মের পাবন্দিতেই নিহিত

তরঙ্গের জন্য স্বাধীনতা বিলাপের উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

যাদের দর্শনের জন্য স্বয়ং জ্যোতিও লালায়িত ছিল

সেই চোখগুলো নূর-ই-আইমানের আশায় নিরাশ হয়ে গেছে [২]

পতনের কারণসমূহ

আন্দালুসে মুসলিমদের পতন এবং ইসলামী শাসনের অবসানের অনেক কারণ ছিল। বিস্তারিত আলোচনা করলে এই বিতর্ক অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে বিস্তৃত হবে, তবে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের দিকে ইঙ্গিত করছি। এগুলোর উদাহরণ পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে।

- আন্দালুসের মুসলিমরা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতসমূহের হক আদায় করতে গাফেল হয়ে গিয়েছিলেন। শতাব্দীকাল ধরে তারা ধন-সম্পদ অর্জনে মগ্ন ছিলেন, দুনিয়াকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন, আখেরাতের প্রস্তুতির চিন্তা পেছনে পড়ে গিয়েছিল; এমন অবস্থায় যেকোনো জাতিই পতনের শিকার হয়ে থাকে।
- দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমের ওপর অর্পিত। আন্দালুসের মুসলিমদের কাছে কাজ করার অনেক...

[১] তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া, ইলমাজ ওজতুনা: ১/ ৩৩৬-৩৩৭

[২] ইকবাল

৭২৫

এটি একটি বড় ময়দান ছিল। তারা আট শতাব্দীকাল ইউরোপের অধিবাসীদের সাথে অতিবাহিত করেছে। খ্রিস্টানদের সাথে তাদের গভীর মেলামেশা ছিল। তা সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের ইসলামের সাথে পরিচিত করার ব্যাপারে কোনো বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি। সাধারণ পর্যায়ে খ্রিস্টানদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কোনো আন্দোলন শুরু হয়নি। মুসলমানরা চার-পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত আন্দালুসে প্রভাবশালী শক্তি এবং সবচেয়ে সম্মানিত শ্রেণী হিসেবে ছিল। এই সময়ে তাদের দাওয়াত অবশ্যই অত্যন্ত কার্যকর হতো। যদি ধীরে ধীরে দাওয়াতের কাজ হতো, তবে এটি অসম্ভব ছিল না যে আন্দালুসও সিরিয়া ও মিসরের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে পরিণত হতো। দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই অবহেলার ফল এই দাঁড়াল যে, খ্রিস্টানরা একটি শত্রুরূপে সর্বদা তাদের সাথে লড়াই করতে থাকল এবং তাদের পূর্ণ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

.

৩. রাজনৈতিক মতভেদ, বংশীয় ও গোষ্ঠীগত কোন্দল এবং গৃহযুদ্ধ বড় বড় মুসলিম সালতানাতগুলোর ধ্বংসের কারণ হয়েছে। আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের মধ্যে এই ধরনের মতভেদ অনেক বেশি দেখা যেত। এটাই কারণ যে, এখানকার প্রতিটি সরকার খুব দ্রুত পতনের শিকার হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। আন্দালুসে আবু আবদুল্লাহ এবং আল-জাগালের মতো মুসলিম আমিররা সেই সময়েও নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিলেন যখন ফার্ডিনান্ড তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। এই বিশৃঙ্খলা মুসলমানদের ডুবিয়ে দিয়েছে।

.

৪. আন্দালুসে মুসলমানরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে খ্রিস্টান তামাদুন ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে। ইসলামের জৌলুস মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকাহগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফ্রাঙ্কিশ সভ্যতা মুসলমানদের মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিপুল সংখ্যক মুসলমান নাচ-গান, মদ্যপান এবং অন্যান্য বিলাসিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম আমিররা খ্রিস্টান স্ত্রী ও দাসীদের রূপ-যৌবনের ওপর মন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে শুরু করেন।

.

৫. আন্দালুসের মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা কিতাব ও সুন্নাহকে পথপ্রদর্শক ও অস্ত্র বানিয়ে এই ভূখণ্ড জয় করেছিলেন। পরবর্তী মুসলমানরা ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। তলোয়ার ও বল্লমের জায়গায় কবিতা ও গান তাদের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে খ্রিস্টানরা ধর্মীয় জোশ ও জযবার সাথে অস্ত্র তুলে নেয় এবং সামরিক গুণাবলী অর্জন করে বংশপরম্পরায় মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে থাকে। একের পর এক আলফনসো এবং তারপর ফার্ডিনান্ড তাদের জন্য ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসতে থাকে। তা সত্ত্বেও মুসলমানরা গাফলতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয়নি এবং অবশেষে ধ্বংস হয়ে যায়।

.

৬. বনু উমাইয়ার পর আন্দালুসের স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের জযবা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর মরক্কোর মুরাবিতিন, মুওয়াহহিদিন এবং বনু মারিন তাদের প্রতিরক্ষার কাজ চালিয়ে যায়। যদি তাদের মধ্যে বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার গুণাবলী জীবিত থাকত, তবে তাদের কোনো বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হতো না। আন্দালুসে শেষ সময় পর্যন্ত পনেরো লক্ষ মুসলমান বিদ্যমান ছিল। যদি সঠিক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, তবে এই জনসংখ্যা থেকে এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনী তৈরি করা কঠিন ছিল না।

গ্রানাডা অবরোধকারী ফার্ডিনান্ডের কাছে আশি হাজার সৈন্য ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বনু নসরের গ্রানাডার পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যা থেকে চল্লিশ হাজার সৈন্যও তৈরি করা সম্ভব হয়নি। যদি শাসকরা সাধারণ জীবনযাপন করতেন এবং তাদের অর্থনৈতিক সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করতেন, তবে একটি শক্তিশালী বাহিনী পরিচালনা করা কঠিন ছিল না। কিন্তু জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের আয়োজন...

করার পর তারা মাত্র কয়েক হাজার সৈন্যের বোঝাও সহ্য করতে পারত।

৭. আন্দালুসের আমিরগণ খ্রিস্টানদের বন্ধু মনে করার মারাত্মক ভুল করেছিলেন। অথচ কুরআন মাজীদ বলে:

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।” [১]

মুলুকুত তাওয়াইফ আলফনসোকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক বানিয়েছিল। আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিনান্ড পঞ্চমের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই আস্থা তাদের ডুবিয়ে দিল।

৮. বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা শতাব্দীকাল ধরে মুসলমানদের বড় বড় সরকারকে দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন করে আসছিল। আন্দালুসের শাসকরা এই জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। এর ফলে একই ঘরে একই সময়ে দুই-তিনজন শাসনের দাবিদার দাঁড়িয়ে যেত। এর ফলাফল যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছিল।

৯. আন্দালুসের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো মুসলমানদের টিকে থাকা তাদের ঐক্যের মধ্যে নিহিত এবং বিভেদ তাদের জন্য মৃত্যুর বার্তা।

ব্যক্তি জাতির সাথে সম্পর্কের মাধ্যমেই টিকে থাকে, একা সে কিছুই নয়
তরঙ্গ নদীর মধ্যেই থাকে, নদীর বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নেই

[১] সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত ৫১।

মুসলিম যুগে স্পেনের খ্রিস্টান রাষ্ট্রসমূহ

লিওন ও আস্তুরিয়াস রাষ্ট্র

নম্বর প্রধান শাসকগণ শাসনকাল সমসাময়িক মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্রসমূহ

১ প্লায়ো (বানি), রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ১০৩ হিঃ থেকে ১১৯ হিঃ (৭২২ খ্রিঃ থেকে ৭৩৭ খ্রিঃ)

আন্দালুসের বিভিন্ন ওয়ালিগণ রাষ্ট্রসমূহ

২ আলফান্সো প্রথম (আদফুনশ) ১২১ হিঃ থেকে ১৩০ হিঃ (৭৩৯ খ্রিঃ থেকে ৭৫৭ খ্রিঃ)

আবদুর রহমান প্রথম

৩ আলফান্সো দ্বিতীয় ১৭৫ হিঃ থেকে ২২২ হিঃ (৭৯১ খ্রিঃ থেকে ৮৩৩ খ্রিঃ) হিশাম প্রথম,

হাকাম প্রথম, আবদুর রহমান দ্বিতীয়

৪ রামিরো প্রথম ২২৭ হিঃ থেকে ২৩৬ হিঃ (৮৩৩ খ্রিঃ থেকে ৮৫০ খ্রিঃ) আবদুর রহমান

দ্বিতীয়

৫ অর্ডুনো প্রথম ২৩৬ হিঃ থেকে ২৫২ হিঃ (৮৫০ খ্রিঃ থেকে ৮৬৬ খ্রিঃ) মুহাম্মদ প্রথম

৬ আলফান্সো তৃতীয় ২৫২ হিঃ থেকে ২৯৭ হিঃ (৮৬৬ খ্রিঃ থেকে ৯১০ খ্রিঃ) মুহাম্মদ প্রথম,

মুনজির, আবদুল্লাহ

৭ গার্সিয়া প্রথম (Garcia) ২৯৭ হিঃ থেকে ৩০১ হিঃ (৯১০ খ্রিঃ থেকে ৯১৩ খ্রিঃ)

আবদুল্লাহ

৮ অর্ডুনো দ্বিতীয় ৩০১ হিঃ থেকে ৩১২ হিঃ (৯১৩ খ্রিঃ থেকে ৯২৩ খ্রিঃ) আবদুর রহমান

আন-নাসির

৯ আলফান্সো চতুর্থ ৩১৩ হিঃ থেকে ৩২০ হিঃ (৯২৫ খ্রিঃ থেকে ৯৩৩ খ্রিঃ) আবদুর রহমান

আন-নাসির

১০ রামিরো দ্বিতীয় ৩২০ হিঃ থেকে ৩৩৯ হিঃ (৯৩৩ খ্রিঃ থেকে ৯৫০ খ্রিঃ) আবদুর রহমান

আন-নাসির

১১ অর্ডুনো তৃতীয় ৩৩৯ হিঃ থেকে ৩৪৫ হিঃ (৯৫০ খ্রিঃ থেকে ৯৫৬ খ্রিঃ) আবদুর রহমান

আন-নাসির

১২ সানচো প্রথম (Sancho) ৩৪৫ হিঃ থেকে ৩৫৫ হিঃ (৯৫৬ খ্রিঃ থেকে ৯৬৬ খ্রিঃ)

আবদুর রহমান আন-নাসির, হাকাম দ্বিতীয়

১৩ অর্ডুনো চতুর্থ — হাকাম দ্বিতীয়

১৪ রামিরো তৃতীয় ৩৫৫ হিঃ থেকে ৩৭৫ হিঃ (৯৬৬ খ্রিঃ থেকে ৯৮৫ খ্রিঃ) হাকাম দ্বিতীয়,

হাজিব মনসুর

১৫ আলফান্সো পঞ্চম ৩৮৯ হিঃ থেকে ৪১৮ হিঃ (৯৯৯ খ্রিঃ থেকে ১০২৪ খ্রিঃ) হাজিব

মনসুর, হাজিব আল-মুজাফফর, মুলুকুত তাওয়াইফ

তারিখ উন্মতে মুসলিমা (৭২৮)

ক্রমিক প্রধান শাসকগণ শাসনকাল সমসাময়িক মুসলিম শাসকগণ রাজ্যসমূহ

১৬ আলফনসো ষষ্ঠ ৪৬৫ হিজরি থেকে ৫০২ হিজরি (১০৭২ খ্রি. থেকে ১১০৯ খ্রি.)

মুলুকুত তাওয়াইফ, ইউসুফ বিন তাশফিন আস্তুরিয়াস, লিওন

১৭ রানী উরাকা, কাউন্ট রেমন্ড ৫০২ হিজরি থেকে ৫২০ হিজরি (১১০৯ খ্রি. থেকে ১১২৬ খ্রি.)

•

লিওন, কাস্তিল

নাভারে রাজ্য

ক্রমিক প্রধান শাসকগণ শাসনকাল সমসাময়িক মুসলিম শাসকগণ রাজ্যসমূহ

১ সানচো ২৩১ হিজরি থেকে (৮৪৬ খ্রি.) আবদুর রহমান সানি

•

২ গার্সিয়া বিন ওয়াইকা ২৩৮ হিজরি থেকে (৮৬২ খ্রি.) আবদুর রহমান সানি, মুহাম্মদ আউয়াল

•

৩ ফরতুন

•

•

•

৪ সানচো গার্সিয়া প্রথম ২৯৩ হিজরি থেকে ৩১৩ হিজরি (৯০৫ খ্রি. থেকে ৯২৬ খ্রি.)

আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান আন-নাসির

•

৫ গার্সিয়া সানচো প্রথম ৩১৩ হিজরি থেকে ৩৫৯ হিজরি (৯২৬ খ্রি. থেকে ৯৭০ খ্রি.)

আন-নাসির, হাকাম সানি

•

৬ সানচো গার্সিয়া দ্বিতীয় (এবারকা) ৩৫৯ হিজরি থেকে ৩৮৫ হিজরি (৯৭০ খ্রি. থেকে ৯৯৪ খ্রি.) হাকাম সানি, হাজিব মনসুর

•

৭ গার্সিয়া সানচো দ্বিতীয় ৩৮৫ হিজরি থেকে ৩৯১ হিজরি (৯৯৪ খ্রি. থেকে ১০০০ খ্রি.) হাজিব মনসুর

•

৮ সানচো গার্সিয়া তৃতীয় ৩৯১ হিজরি থেকে ৪২৬ হিজরি (১০০০ খ্রি. থেকে ১০৩৫ খ্রি.) হাজিব মুজাফফর, মুলুকুত তাওয়াইফ

•

কাস্তিল রাজ্যের প্রধান শাসকগণ

ক্রমিক প্রধান শাসকগণ শাসনকাল সমসাময়িক মুসলিম শাসকগণ রাজ্যসমূহ

১ ফার্নান্দ গঞ্জালেজ ৩১৮ হিজরি থেকে ৩৫৯ হিজরি (৯৩০ খ্রি. থেকে ৯৭০ খ্রি.) আন-নাসির, হাকাম সানি রাজ্যসমূহ

২ গার্সিয়া ফার্ডিনান্ড ৩৫৯ হিজরি থেকে ৩৮৯ হিজরি (৯৭০ খ্রি. থেকে ৯৯৫ খ্রি.) হাজিব মনসুর

•

৩ সানচো ৩৮৯ হিজরি থেকে ৪১২ হিজরি (৯৯৫ খ্রি. থেকে ১০২১ খ্রি.) হাজিব মনসুর, হাজিব মুজাফফর, মুলুকুত তাওয়াইফ

•

৪ ফার্ডিনান্ড, ফার্নান্দ প্রথম ৪২৬ হিজরি থেকে ৪৫৮ হিজরি (১০৩৫ খ্রি. থেকে ১০৬৫ খ্রি.) মুলুকুত তাওয়াইফ

•

৫ সানচো দ্বিতীয়

•

•

•

৬ আলফনসো ষষ্ঠ ৪৬৫ হিজরি থেকে ৫০২ হিজরি (১০৭২ খ্রি. থেকে ১১০৯ খ্রি.) মুলুকুত তাওয়াইফ, মুরাবিতুন আস্তুরিয়াস এবং লিওন

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস | উপসংহার | আন্দালুস খিলাফত

- ৭. আলফনসো সপ্তম | ৫২৬ হিজরি (১১৪৭ খ্রি.) | গ্যালিসিয়া, কাস্টিল এবং লিওন
- ৮. ফার্ডিনান্ড দ্বিতীয় | ৫৪৮ হিজরি (১১৮৮ খ্রি.)
- ৯. আলফনসো অষ্টম | ৫৬১ হিজরি (১২১৩ খ্রি.)
- ১০. আলফনসো নবম | ৬২৮ হিজরি (১২৩০ খ্রি.)
- ১১. ফার্ডিনান্ড তৃতীয় | ৬৫০ হিজরি (১২৫২ খ্রি.) | কাস্টিল, লিওন

থানাডা সালতানাতের সমসাময়িক কাস্টিলের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ

- ১. আলফনসো দশম | ৬৮১ হিজরি (১২৮৪ খ্রি.)
- ২. সানচো চতুর্থ, সাহসী | ৬৯৫ হিজরি (১২৯৫ খ্রি.)
- ৩. ফার্ডিনান্ড চতুর্থ | ৭১২ হিজরি (১৩১২ খ্রি.)
- ৪. আলফনসো একাদশ | ৭৫১ হিজরি (১৩৫০ খ্রি.)
- ৫. পিটার প্রথম | ৭৬৯ হিজরি (১৩৬৯ খ্রি.)
- ৬. হেনরি দ্বিতীয় | ৭৮০ হিজরি (১৩৭৯ খ্রি.)
- ৭. জন (ইউহানা) প্রথম | ৭৯২ হিজরি (১৩৯০ খ্রি.)
- ৮. হেনরি তৃতীয় | ৮০৯ হিজরি (১৪০৬ খ্রি.)
- ৯. জন দ্বিতীয় | ৮৫৮ হিজরি (১৪৫৩ খ্রি.)
- ১০. হেনরি চতুর্থ | ৮৭৯ হিজরি (১৪৭৪ খ্রি.)
- ১১. রানী ইসাবেলা | ৯১০ হিজরি পর্যন্ত (১৫০৩ খ্রি. পর্যন্ত)

আরাগন রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ

- ১. সানচো রামিরেজ | ৪৮৭ হিজরি (১০৯৪ খ্রি.)
- ২. আলফনসো প্রথম | ৫২৮ হিজরি (১১৩৩ খ্রি.)
- ৩. রামিরো সন্ন্যাসী | ৫৩১ হিজরি (১১৩৭ খ্রি.)
- ৪. রেমন্ড বেরেস্কার চতুর্থ | ৫৫৮ হিজরি (১১৬২ খ্রি.)

তারিখে উম্মতে মুসলিমা ৭৩০

৫. আলফনসো নবম (৫৯৩ হিজরি (১১৯৬ খ্রি.) পর্যন্ত)
৬. পিটার দ্বিতীয় ক্যাথলিক (৬১০ হিজরি (১২১৩ খ্রি.) পর্যন্ত)
৭. জেমস প্রথম (৬৭৫ হিজরি (১২৭৬ খ্রি.) পর্যন্ত)

থানাডা সাম্রাজ্যের সমসাময়িক আরাগনের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ

১. পিটার তৃতীয় (৬৮৪ হিজরি (১২৮৫ খ্রি.) পর্যন্ত)
২. আলফনসো তৃতীয় (৬৯০ হিজরি (১২৯১ খ্রি.) পর্যন্ত)
৩. আলফনসো তৃতীয় (৭২৭ হিজরি (১৩২৭ খ্রি.) পর্যন্ত)
৪. জেমস দ্বিতীয় (৭৩৬ হিজরি (১৩৩৬ খ্রি.) পর্যন্ত)
৫. আলফনসো চতুর্থ (৭৮৯ হিজরি (১৩৮৭ খ্রি.) পর্যন্ত)
৬. পিটার চতুর্থ (৮১৩ হিজরি (১৪১০ খ্রি.) পর্যন্ত)
৭. ইউহানা প্রথম (৮১৯ হিজরি (১৪১৬ খ্রি.) পর্যন্ত)
৮. ফার্দিনান্দ এনটেকুয়েরা বা (৮৬২ হিজরি (১৪৫৮ খ্রি.) পর্যন্ত)
৯. আলফনসো পঞ্চম (৮৮৪ হিজরি (১৪৭৯ খ্রি.) পর্যন্ত)
১০. ইউহানা দ্বিতীয় (৯২১ হিজরি (১৫১৬ খ্রি.) পর্যন্ত)
১১. ফার্দিনান্দ পঞ্চম

পর্তুগাল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ শাসকগণ

১. আলফনসো হেনরিকেস, (ইবনে আরিক) (৫৮১ হিজরি (১১৮৫ খ্রি.) পর্যন্ত)
২. সানচো প্রথম (৬০৮ হিজরি (১২১১ খ্রি.) পর্যন্ত)
৩. আলফনসো দ্বিতীয় (৬২০ হিজরি (১২২৩ খ্রি.) পর্যন্ত)
৪. সানচো দ্বিতীয়
৫. আলফনসো তৃতীয়

[১] কিতাবুল হিন্দ আল-বিরুনি, পৃ. ৩৩২

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

উপমহাদেশের ইতিহাস (১)

সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ

ইসলাম-পূর্ব উপমহাদেশ

উপমহাদেশ একটি দেশ নয়, বরং একটি মহাদেশ। একে ‘উপমহাদেশ’ বলা মূলত এর প্রকৃত স্বরূপকে আড়াল করে দেয়। এটি আয়তনের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কাছাকাছি এবং জনসংখ্যার দিক থেকে দুটি মহাদেশ: ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। প্রাচীন ভূগোলবিদদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধুকে হিন্দুস্তান থেকে আলাদা একটি দেশ হিসেবে গণ্য করেছেন, যা তাদের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যদিও অনেক ঐতিহাসিক সিন্ধুকে ‘হিন্দ’-এর অধীনেও বর্ণনা করেছেন। এই পার্থক্যের কারণ হলো, যেসব ব্যক্তি ‘হিন্দ’-কে অনেকগুলো দেশের সমষ্টি অর্থাৎ একটি মহাদেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তারা সিন্ধুকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন; আর যেসব ভূগোলবিদ প্রতিটি দেশকে আলাদা আলাদাভাবে বর্ণনা করছিলেন, তারা সিন্ধুকে পৃথক হিসেবে গণ্য করেছেন।

এই যুগে পাঞ্জাব, মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত এবং বাংলা ও বিহারে অধিকাংশ সময় আলাদা আলাদা শাসনব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের ভাষাতত্ত্ব এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ঠিক তেমনই বৈচিত্র্য দেখা যায় যেমনটি ইউরোপে দেখা যায়। এই কারণেই উপমহাদেশের ইতিহাস অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এবং এই কারণেই একে একক প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন বরং অসম্ভব। এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমরাও উপমহাদেশের ইতিহাসকে আলাদা আলাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করব।

উপমহাদেশের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের প্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এখান থেকে উদ্ধারকৃত মানব সভ্যতার নিদর্শনগুলো অন্তত পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। মধ্য ভারতের উর্বর অঞ্চলে কৃষিকাজ করা প্রাচীন জাতিগুলোকে ‘দ্রাবিড়’ বলা হতো। সেই সময়ের ইতিহাস কোথাও সংরক্ষিত নেই। তবে হিন্দুদের প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থগুলো থেকে খ্রিস্টপূর্ব দুই থেকে দেড় হাজার বছরের ইতিহাসের কিছু অস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এখানে কৃষিভিত্তিক মানুষ বসবাস করত।

এই যুগে সিন্ধু নদের সভ্যতা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল যা সিন্ধু নদ এবং এর উপনদীগুলোর উপত্যকায় বিকশিত হয়েছিল। এর নিদর্শন সিন্ধুর লারকানার কাছে মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের রাভি নদীর তীরে হরপ্পায় (সাহিয়াল জেলা) পাওয়া যায় এবং এগুলো খ্রিস্টপূর্ব দুই থেকে তিন হাজার বছরের পুরনো বলে জানানো হয়। এই ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত সিলমোহরগুলোতে দেবী-দেবতাদের ছবি থেকে জানা যায় যে, এই লোকেরা মূর্তিপূজারী ছিল। ঘাঁড়, গণ্ডার, বাঘ এবং হাতির মতো প্রাণীর পাশাপাশি তারা গাছপালাকেও বরকতময় মনে করে সেগুলোর পূজা করত। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, এই সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে ভূমিকম্প বা বন্যার কারণে হঠাৎ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সম্ভবত এটি কোনো আসমানি আজাব ছিল, যেমনটি কুফর ও শিরক এবং নবীদের অস্বীকার করার কারণে অন্যান্য ভূখণ্ডের অবাধ্য লোকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। এমন...

ধ্বংসাবশেষগুলো বর্তমান অবস্থার ভাষায় শিক্ষা দেয় এবং অবাধ্যতা ত্যাগ করে আখেরাতের প্রস্তুতির চিন্তা জাগ্রত করে।

ইসলামের পূর্বে উপমহাদেশের অবস্থা:

খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়ার আর্য উপজাতিরা তাদের গবাদি পশুর জন্য চারণভূমির অভাবের কারণে দেশান্তরী হতে বাধ্য হয়েছিল এবং হিন্দুস্তানের দিকে যাত্রা করেছিল। এই উপজাতিগুলো ইরান ও আফগানিস্তান হয়ে পাঞ্জাবে প্রবেশ করেছিল। ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় যে, এই আর্য উপজাতিগুলো খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর থেকে খ্রিস্টপূর্ব বারোশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন দলের আকারে কাবুল ও হেলমান্দ উপত্যকা হয়ে কোহ-ই-সুলাইমানের গিরিপথ দিয়ে পাঞ্জাবে অবতরণ করতে থাকে।

আর্যরা স্থানীয় লোকদের জোর-জবরদস্তি করে দমন করে এখানে তাদের শাসন ও বসতি স্থাপন করেছিল। মহেঞ্জোদারোর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আর্যরা স্থানীয় লোকদের ব্যাপক গণহত্যা করেছিল এবং অবশিষ্টদের দাসে পরিণত করেছিল। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ এবং হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থ “বেদ” থেকে ধারণা করা হয় যে, রাভি নদীর তীরে একটি বড় যুদ্ধ হয়েছিল যা হরপ্পা রাজ্যের বিরুদ্ধে ছিল। দাসে পরিণত করা লোকদের ‘শূদ্র’ অর্থাৎ নিম্নতম বর্ণ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যাদের সদস্যদের আর্যদের সাথে কথা বলারও অনুমতি ছিল না। এভাবেই আর্য ও অনার্যদের মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে বর্ণপ্রথা বা জাতপাত ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

আর্যরা সিন্ধু নদের উপত্যকাকে তাদের স্থায়ী আবাসভূমি করেনি, বরং আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে মধ্য ভারতের গঙ্গা-যমুনা উপত্যকাকে পছন্দ করেছিল এবং সেখানেই তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল। এই ভূখণ্ডের নাম রাখা হয়েছিল “আর্যাবর্ত”। এখানে আর্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা খ্রিস্টপূর্ব চারশ বছর পর্যন্ত একে অপরের ওপর চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। আর্যরা নাচ-গান ও সংগীতের অনুরাগী ছিল, তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করত। তবে তারা মূর্তিপূজার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতীয়দের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে স্থানীয় জনগণ আর্যদের কাছ থেকে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান শিখেছিল। এই লোকেরা মূর্তিপূজারি হয়ে ওঠে। দেবী-দেবতাদের সম্ভ্রষ্ট করার জন্য তারা নৈবেদ্য পেশ করতে শুরু করে। তারা জাদু-টোণায় বিশ্বাস করত। তারা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলত। ঋগ্বেদ ছিল তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ। ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, অগ্নি, ইন্দ্র এবং গণেশ ছিল তাদের বিখ্যাত দেবতা। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতেই একে একে সাতবার জন্ম নেয়। যার কর্ম ভালো হবে সে পরবর্তী জন্মে ভালো রূপে জন্মগ্রহণ করবে, আর দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পরবর্তী জন্ম হবে কোনো নিকৃষ্ট রূপে। এই বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে হিন্দু ধর্ম আত্মপ্রকাশ করে।

হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার প্রবর্তক ছিলেন সেই যুগের ধর্মীয় নেতারা, যারা একটি বিশেষ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই ধর্মীয় নেতারা প্রচার করেছিলেন যে, তারা ব্রহ্মার মুখ থেকে জন্ম নিয়েছেন এবং ধর্মের সুরক্ষা করাই তাদের কাজ। তারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং সাধারণের উর্ধ্ব ঘোষণা করেন এবং দেবতাদের নৈবেদ্যের নামে মন্দিরগুলোকে নিজেদের জন্য স্থায়ী আয়ের উৎস বানিয়ে নেন। সেই সাথে সরকারি দায়িত্ব পালনের ঝামেলা থেকে বাঁচতে এই কঠিন কাজগুলো আর্য উপজাতিদের সর্দারদের ওপর অর্পণ করেন। এই সর্দাররা “ক্ষত্রিয়” নামে পরিচিত হতে থাকেন। এভাবে ব্রাহ্মণরা নিজেরা যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা পান। হিন্দুস্তানের...

অধিকাংশ রাজা, মহারাজা এবং সেনাপতি ছিলেন ক্ষত্রিয় অর্থাৎ আর্য।

উৎপাদন ও ব্যবসার বিষয়টি সেই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল যারা আগে থেকেই কৃষক, কারিগর বা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদেরকে “বৈশ্য” বলা হতে লাগল। দাস বানানো স্থানীয় লোক, তাদের সন্তান-সন্ততি এবং সাধারণ কাজকর্ম করা অভাবী লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য “শূদ্র” নাম দিয়ে কঠিন কাজের সমস্ত বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলো এবং তাদেরকে জন্মগত পাপী ও অপবিত্র সাব্যস্ত করা হলো। তাদের জীবন-মরণ সবকিছু ছিল উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য, যাদের ধারণা ছিল যে শূদ্রকে স্পর্শ করলে এমনকি তার ছায়া পড়লেও উচ্চবর্ণের লোক অপবিত্র হয়ে যায়।

বর্ণপ্রথার এই ব্যবস্থাকে মনু নামক এক ব্রাহ্মণ একটি বিধিবদ্ধ রূপ দান করেন। তিনি ধর্মীয় ও শাসক শ্রেণির জন্য “ধর্মশাস্ত্র” তৈরি করেন, যাকে মনুস্মৃতিও বলা হয়। এতে হিন্দু সমাজকে চারটি শ্রেণিতে: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় (খতরি), বৈশ্য এবং শূদ্রে বিভক্ত করে তাদের জন্য বিস্তারিত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণদের আধিপত্য চিরস্থায়ী করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার:

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ বর্ণপ্রথার এই গোলকধাঁধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই নতুন ব্যবস্থা নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বৌদ্ধধর্ম মূলত দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ছিল। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ যাকে গৌতম বুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়। তিনি কপিলাবস্তুর রাজার পুত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম “৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” হয়েছিল। ২৯ বছর বয়সে তাঁর ঝোঁক ধর্মের দিকে চলে যায় এবং তিনি লোকালয় ছেড়ে নির্জনতা অবলম্বন করেন। তিনি হিন্দু ধর্মে বর্ণপ্রথার অমানবিক সীমাবদ্ধতা এবং জনগণের কষ্টে ব্যথিত ছিলেন, তাই তিনি চিন্তা-ভাবনার পর একটি নতুন নৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করেন যাতে সকল মানুষ সমান ছিল।

কয়েক বছর পর তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে আসেন যেখানে তাঁর পিতা তখনও রাজত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারকে তাঁর ধর্ম “বৌদ্ধধর্মের” অনুসারী করেন এবং নিজে সন্ন্যাসী হতে অস্বীকার করেন। তিনি সারাজীবন তাঁর চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিক্রিয়ায় তিনি কোটি কোটি দেব-দেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন কিন্তু তাঁর শিক্ষা ওহীর আলো থেকে বঞ্চিত ছিল, তাতে আল্লাহর তাওহীদ বা আশ্বিয়ায়ে কেরামের ওপর ঈমানের কোনো উল্লেখ ছিল না, ফলে এই ধর্ম কোনোভাবেই পরকালীন সাফল্যের নিশ্চয়তা দিতে পারত না। দুই শতাব্দী পর বুদ্ধের অনুসারীরা তাঁর মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়, তারা মূর্তিপূজা ও ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে কুফর ও শিরককে প্রসার দিয়ে এক নতুন সভ্যতার জন্ম দেয় যা “গান্ধার্য সভ্যতা” নামে পরিচিত, যার ধ্বংসাবশেষ ট্যাক্সিলা এবং সোয়াত উপত্যকায় বিদ্যমান।

জৈন ধর্ম:

“৫৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” পাটনার একটি শহর বৈশালীতে মহাবীর নামক এক জ্ঞানীর জন্ম হয়। তিনিও ব্রাহ্মণদের

ধর্মীয় একাধিপত্যে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম পেশ করেন যা “জৈন মত” নামে পরিচিত হয়। এই ধর্ম কৃষ্ণসাধন, দুনিয়া বিমুখতা এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতার শিক্ষা দিত। এতে গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল এবং ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তি রাখারও অনুমতি ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এটি বৈরাগ্যবাদ এবং মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা ছিল, যাতে মানবিক সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না।

সেকান্দারের আক্রমণ:

উপমহাদেশের ইতিহাসের সেই যুগ যার ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, তা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু হয়। ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পশ্চিমে গ্রিক শাসক সেকান্দার আজম (আলেকজান্ডার)-এর আবির্ভাব ঘটে, যিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে এক ঝড়ের মতো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেন। তিনি গ্রিসের বাদশাহ ফিলিপের পুত্র এবং বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ছাত্র ছিলেন। তিনি ৩৫৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যৌবনেই ইউরোপের বাইরে বিজয় অভিযান শুরু করেন এবং দানিউব নদী পার হয়ে মিশরে পৌঁছান। মিশর ও সিরিয়া জয় করার পর তিনি ইরান আক্রমণ করেন এবং ইরানি বাদশাহ দারা-কে পরাজিত করে নিজের সাম্রাজ্যকে অত্যন্ত বিস্তৃত করেন।

এরপর তিনি মধ্য এশিয়া এবং বর্তমান আফগানিস্তানের এলাকাগুলো পদানত করেন এবং ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কাবুল জয় করে হিন্দুস্তানের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁছান। তার এই আক্রমণের একটি বড় কারণ ছিল হিন্দুস্তানের সেই ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির কাহিনী যা তিনি শুনেছিলেন। এখানকার সোনার খনিগুলো সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল যেখান থেকে বালির পরিবর্তে সোনার দানা পাওয়া যেত। গ্রিকরা হিন্দুস্তানে আখ এবং তুলার ফলন দেখেও অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিল। একজন গ্রিক ঐতিহাসিক লিখেছেন: “এই দেশে এমন গাছ পাওয়া যায় যাতে পশম জন্মায়।”

হিন্দুস্তানের সীমান্তে সেকান্দারকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। তিনি সতর্ক হয়ে খাইবার পাসের পরিবর্তে সোয়াত ও বাজোর-এর পথ অবলম্বন করেন। অবশেষে ৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি সিন্ধু নদ পার হয়ে তক্ষশীলায় পৌঁছান যেখানে সেখানকার রাজা তাকে স্বাগত জানান এবং উপহার পেশ করেন।

এখান থেকে কিছুটা দূরে ঝিলাম থেকে চেনাব উপত্যকা পর্যন্ত রাজা পুরুর রাজত্ব ছিল। সেকান্দার তাকে তক্ষশীলায় উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দেন, কিন্তু পুরু উত্তর দেন যে তিনি নিজের রাজ্যের সীমান্তে অস্ত্র হাতে তার জন্য অপেক্ষা করবেন। পুরুর শিবির ছিল ঝিলাম নদীর পূর্ব তীরে। সেকান্দার তার বিপরীতে এই নদী পার হওয়ার সাহস পাচ্ছিলেন না। এক তুফানি বৃষ্টির রাতে সেকান্দার তার সেনাবাহিনীর একটি অংশ নিয়ে কয়েক মাইল উত্তরে গিয়ে নদী পার হন। পুরু এ খবর পাননি এবং সেকান্দার হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন।

সেকান্দার যুদ্ধে জয়ী হলেও রাজা পুরুর বীরত্বে অত্যন্ত প্রভাবিত হন। যখন পুরুকে গ্রেপ্তার করে তার সামনে পেশ করা হলো, তখন সেকান্দার তাকে জিজ্ঞেস করলেন: “তোমার সাথে কেমন আচরণ করা উচিত?” পুরু উত্তর দিলেন: “ঠিক তেমনটিই যা একজন রাজা অন্য রাজার সাথে করে থাকেন।”

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

সিকান্দার তাকে তার রাজত্ব ফিরিয়ে দিলেন।

সিকান্দার আরও অগ্রসর হয়ে বিয়াস নদীর তীরে পৌঁছালেন, কিন্তু এই সময়ে স্থানীয় উপজাতিদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ তার সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। রাভি ও চেনাব নদীর মধ্যবর্তী স্থানে তাকে মালহি সম্প্রদায়ের সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়, যাতে তাকে জানমালের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যার পর সিকান্দার খুব দ্রুত ফিরে যাওয়ার পথ বেছে নেন। নিজ দেশে পৌঁছানোর আগেই ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি এই অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন।

সিকান্দারের আক্রমণের ফলে ইউরোপের মানুষ উপমহাদেশের পথগুলোর সাথে পরিচিত হয় এবং এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। সিকান্দারের সাথে অনেক গ্রীক এসেছিল এবং এখানেই বসতি স্থাপন করেছিল। অনেকে পরে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে এসেছিল এবং এখানেই থেকে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেক দক্ষ পাথর খোদাইকারীও ছিল যারা মূর্তিনির্মাণ ও শিরকপূর্ণ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের তৈরি মূর্তিগুলো আজও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বা জাদুঘরে বিদ্যমান।

মৌর্য বংশের শাসন:

সেই যুগে বিহার রাজ্যে নন্দ বংশের রাজত্ব ছিল যার কেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র। এই বংশের একজন বিখ্যাত রাজপুত্র ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, যাকে নন্দ বংশের শেষ রাজা দেশ থেকে বহিস্কার করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য স্থানান্তরিত হয়ে পাঞ্জাবে চলে আসেন এবং এখানে সিকান্দারের সাথেও তার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সিকান্দার তার বিজিত এলাকাগুলোতে নায়েব নিযুক্ত করে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার ফিরে যাওয়ার পর পুরো ভারতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য একটি নতুন সরকার গঠনের সুযোগ পান। তিনি স্থানীয় উপজাতিদের একত্রিত করে গ্রীক শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পাঞ্জাব থেকে খাইবার পাস পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। এরপর তিনি বিহার ও পাটনার দিকে অগ্রসর হন এবং পাটলিপুত্র থেকে নন্দ বংশের অবসান ঘটিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। এই সাম্রাজ্য “৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ” থেকে “১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ” পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৭ বছর স্থায়ী ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ইউপি, মালব এবং দক্ষিণ পাঞ্জাব জয় করেন। তার কাছে উপমহাদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল যাতে বিপুল সংখ্যক হাতি অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখান থেকে বর্শা নিক্ষেপ করা হতো।

সেই সময় পাঞ্জাব থেকে ইরাক পর্যন্ত একজন গ্রীক জেনারেল সেলুকাস শাসন করছিলেন যার সরকার “সেলুকিড” নামে পরিচিত ছিল। ইরাকের “ব্যাবিলন” শহর ছিল এর কেন্দ্র। ৩০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেলুকাস এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। চন্দ্রগুপ্ত পাঁচশ হাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন এবং সিকান্দার আজমের নায়েবকে পরাজিত করে সিন্ধু নদের ওপারে তাড়িয়ে দেন। সেলুকাস কাবুল, কান্দাহার এবং হেরাত চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দেন এবং সন্ধি করে কেবল খোরাসান ও ইরাকের ওপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এরপর চন্দ্রগুপ্ত কাশ্মীর, উত্তর ভারত, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান এবং দক্ষিণে মহীশূরও জয় করেন।

সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর থেকে হিমালয় পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই যুগে ট্যাক্সিলা তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির কারণে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েছিল। এই শহরটি তিনবার ধ্বংস হয়ে পুনরায় আবাদ হয়েছিল। এর ধ্বংসাবশেষ থেকে এর বিশালতা এবং দালানকোঠার মজবুত হওয়ার আন্দাজ করা যায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাফল্যে এই যুগের একজন রাজনীতিবিদ চাণক্যের পরামর্শের বড় ভূমিকা ছিল, যিনি ট্যাক্সিলার বাসিন্দা ছিলেন। তার চিন্তাধারা হিন্দুদের রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। চাণক্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের ছলচাতুরী ও প্রতারণাকে সঠিক মনে করতেন। তিনি গোয়েন্দাগিরি এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শত্রুকে কাবু করাকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। আজও ব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদদের মেজাজে চাণক্যের শিক্ষার পূর্ণ প্রভাব রয়েছে।

অশোকা:

“২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” চন্দ্রগুপ্তের নাতি অশোকা তার পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যৌবনে ট্যাক্সিলার শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর যোদ্ধা। তিনি তার ভাইদের হত্যা করে সাম্রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ মজবুত করেন। ২৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং এক লক্ষ মানুষের রক্তপাতের পর বিজয় লাভ করেন।

কিছুকাল পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিগ্রহ ছেড়ে এর প্রচারে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি শুধু পুরো উপমহাদেশেই নয় বরং পূর্ব ও মধ্য আফগানিস্তান পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেন। তিনি জায়গায় জায়গায় বুদ্ধের মূর্তি ও স্তূপ নির্মাণ করান এবং আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, ইরান, সিরিয়া, মিশর, গ্রিস, লঙ্কা, বার্মা এবং চীন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক পাঠান। তার যুগে বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাগুলোকে পাহাড়ের গায়ে এবং স্তম্ভে খোদাই করার ধারা শুরু করেন। এই ধরনের একটি শিলালিপি আজও মানসেহরার কাছে একটি পাহাড়ের গায়ে বিদ্যমান রয়েছে। অশোকা ২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বিভিন্ন বিদেশী সরকার:

বৌদ্ধ শাসকরা উপমহাদেশের বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছিলেন কিন্তু তারা গ্রীকদের শক্তি পুরোপুরি ভাঙতে সক্ষম হননি। ১৭৩ বছরের উত্থানের পর মৌর্য বংশের শাসন তখন দুর্বল হয়ে পড়ে যখন অশোকের উত্তরসূরিদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং হিন্দুস্তান অনেকগুলো টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে কিছু গ্রীক ভাগ্যসন্ধানী উপমহাদেশের পশ্চিম অংশ জয় করে একটি নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন যার রাজধানী ছিল শিয়ালকোট।

এই যুগে উপমহাদেশ ভ্রমণকারী চীনা পর্যটক “হিউয়েন সাং” শিয়ালকোটের বাগান, বাজার এবং পুকুরগুলোর অনেক প্রশংসা করেছেন। এই রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রীক শাসক ছিলেন “মিনান্দার” যিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার সাম্রাজ্য পূর্বে মথুরা এবং মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চীনা তুর্কিস্তানের ইউচি উপজাতি:

“১৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” চীনা তুর্কিস্তান (মধ্য চীন) থেকে ইউচি উপজাতিদের উত্থান ঘটে। তারা সাকিয়া থেকে শুরু করে পেশোয়ার, সোয়াত এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করে নেয়। “১২৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে” তারা গ্রীকদের “ব্যাকট্রিয়া” রাজ্যকে পরাজিত করে...

তারা উত্তর আফগানিস্তানও দখল করে নেয়। তাদের পর চীনের অন্য একটি গোত্র ‘চিউনি’ এই অঞ্চলে দীর্ঘকাল শাসন করে।

কুশান বংশ ও কনিষ্ক:

৪০ খ্রিস্টাব্দে ইউচি গোত্রের একজন সর্দার ক্যাডফিসেস প্রথম পেশোয়ারে কুশান বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং ‘গান্ধার সরকার’ প্রতিষ্ঠা করেন। ৮৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাডফিসেস প্রথম-এর উত্তরসূরি এই সাম্রাজ্যকে বেনারস পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং সিন্ধু, রাজপুতানা ও কাথিয়াওয়ার থেকে পার্থিয়ানদের শাসনের অবসান ঘটান।

১২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কুশান বংশের একজন বিখ্যাত রাজা কনিষ্ক দ্য গ্রেট-এর শাসন ছিল। তিনি পেশোয়ারকে রাজধানী করে কেবল কাশ্মীরই জয় করেননি, বরং পামির মালভূমি অতিক্রম করে চীনের প্রদেশ: খোটান, ইয়ারকান্দ এবং কাশগরকেও নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি চীন থেকে অনেক বন্দি নিয়ে আসেন যাদের পেশোয়ারের উপকণ্ঠে এবং রাভি নদীর ওপারে পুনর্বাসিত করা হয়। এই বন্দির বাগান করায় পারদর্শী ছিলেন এবং নিজেদের সাথে পিচ ও নাশপাতির চারা নিয়ে এসেছিলেন। তারা এই এলাকাগুলোতে এই ফলগুলোর চাষাবাদ জনপ্রিয় করেন।

এই যুগে তক্ষশীলা চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। উপমহাদেশের বিখ্যাত চিকিৎসক চরক এই শহরেরই লোক ছিলেন, যিনি কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর তাঁর লেখা একটি বইয়ের আরবি অনুবাদও করা হয়েছিল।

কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তিনি পেশোয়ারে একটি বিশাল ‘স্তূপ’ (বৌদ্ধ উপাসনালয়) নির্মাণ করেন। তাঁর দাবি ছিল যে, এতে গৌতম বুদ্ধের অস্থি সংরক্ষিত আছে।

বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের ধারণা স্পষ্ট ছিল না, তাই তখন পর্যন্ত এটি খুব বেশি জনপ্রিয়তা পায়নি। কনিষ্ক যখন এর প্রচার শুরু করেন, তখন হিন্দুদের প্রভাবিত করার জন্য তিনি গৌতম বুদ্ধকেই ঈশ্বর ঘোষণা করেন এবং তাঁর মূর্তিপূজাকে এতটাই প্রচলিত করেন যে হিন্দুদের মূর্তিনির্মাণও পেছনে পড়ে যায়। মধ্য এশিয়া থেকে সুদূর প্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বুদ্ধের মূর্তি স্থাপিত হয়। এভাবে বৌদ্ধধর্মে একটি নতুন ফেরকার সূচনা হয় যাকে ‘মহাযান’ বলা হয়। এই ফেরকার প্রভাব চীন ও জাপান পর্যন্ত পৌঁছে যায় যেখানে আজও বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বিদ্যমান। কনিষ্ক বামিয়ানে গৌতম বুদ্ধের ১২০ এবং ১৭৫ ফুট উঁচু মূর্তি খোদাই করিয়েছিলেন, যা বৌদ্ধদের কাছে সবচেয়ে বড় মূর্তির মর্যাদা লাভ করেছিল।

কনিষ্ক তক্ষশীলা জেলায় সিরখ নামক স্থানে একটি নতুন শহরও পত্তন করেন।

এই যুগে সিন্ধু রোডের মাধ্যমে উপমহাদেশ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। কনিষ্কের পর গান্ধার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এটি ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত হয়ে যায়।

গুপ্ত শাসকগণ:

হিন্দুস্তানে বৌদ্ধধর্মের উত্থান আট-নয় শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, মগধ (বর্তমান বিহার এবং...

পাটনা) এ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এই পৈতৃক রাজ্যকে সম্প্রসারিত করে গঙ্গা-যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি তিব্বতও জয় করেন এবং হিন্দুস্তানকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করতে সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর উত্তরসূরি সমুদ্রগুপ্ত চল্লিশ বছর শাসন করেন এবং এই সাম্রাজ্যকে আরও সম্প্রসারণ ও স্থায়িত্ব দান করেন।

সমুদ্রগুপ্তের পর ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পুত্র ‘চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য’ শাসক হন, যিনি ছিলেন একজন কটুর হিন্দু। তিনি ৩৮ বছর শাসন করেন। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার বন্ধ করে কেবল ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেই প্রচলিত করেননি, বরং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগুরুরা তাদের ধর্মকে নতুন করে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করেন। আজকের হিন্দুধর্ম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের যুগেরই ফসল। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। মন্দির নির্মাণ করান। মূর্তিপূজা, ভাস্কর্য এবং সংগীতকে উৎসাহিত করেন। এভাবে হিন্দুধর্ম এবং বর্ণপ্রথা পুনরায় শিকড় গেড়ে বসে এবং এটি প্রমাণিত হয় যে, হিন্দু শাসকদের আধিপত্য থাকাকালীন এই অঞ্চলে সমাজ সংস্কারের কোনো আন্দোলন সফল হতে পারে না।

গুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত ২৭ বছর শাসন করেন এবং ৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র স্কন্দগুপ্তের আমলে মধ্য এশিয়া থেকে ‘শ্বেত হনরা’ আক্রমণ করে প্রথমে কাবুল ও গজনির গান্ধার সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দেয়, তারপর পশ্চিম ভারত ও ইরানের দখলদার পার্থিয়ানদের বিতাড়িত করে। এর পাশাপাশি তারা গুপ্ত সাম্রাজ্যেরও অবসান ঘটায়। ৫৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হনদের উত্থান অব্যাহত ছিল।

নতুন রাষ্ট্রসমূহ

৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা হর্ষ হিন্দুস্তানের দিগন্তে আবির্ভূত হন, যিনি দক্ষিণ পাঞ্জাব, কনৌজ, বাংলা, উড়িষ্যা এবং মালব জয় করে একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সিন্ধু ও নেপালকে পদানত করে উত্তর ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কেবল দাক্ষিণাত্য অভিযানে তিনি ব্যর্থ হন। ৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর রাজপুতরা উত্তর ভারতে অনেকগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এই ভূখণ্ড আবারও রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার হয়। হিন্দুস্তানের এই নতুন রাষ্ট্রগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:

কনৌজ:

রাজপুতদের বিখ্যাত রাজা ছিলেন ‘রাজা ভোজ’, যাঁর রাজধানী ছিল ‘কনৌজ’। নবম ও দশম শতাব্দীতে তাঁর রাজ্য গুজরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মালব ও রাজপুতানাও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজপুতরা দ্বাদশ শতাব্দীতে দিল্লিও জয় করে নেয়। রাজপুতদের মধ্যে আজমিরের ‘পৃথ্বীরাজ চৌহান’ বিখ্যাত, যিনি ১১৬৫ থেকে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম বিজয়ী সুলতান শাহাবুদ্দিন ঘুরীর সাথে যুদ্ধে নিহত হন।

দিল্লি:

দশম শতাব্দীর শেষভাগে তোমার বংশ দিল্লির দখল নেয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা অনঙ্গপাল। ৭১০ খ্রিস্টাব্দ...

...এ রাজপুতরা দিল্লি দখল করে নিয়েছিল।

তামিল:

দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে তামিল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা দাক্ষিণাত্য থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাংলা ও বিহার:

অষ্টম শতাব্দীতে পাল বংশ এখানে দখল প্রতিষ্ঠা করেছিল। একাদশ শতাব্দীতে সেন বংশ এখানে আধিপত্য অর্জন করে।

দক্ষিণ ভারত:

এখানে নবম শতাব্দীর শুরু থেকে ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূট বংশের শাসন ছিল। এরপর “চালুক্য” বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০০ খ্রিস্টাব্দে এখানে “যাদব” বংশ দখলদার হয়। [১]

[১] উপমহাদেশের এই সমস্ত শাসনের অবস্থার জন্য নিচের উৎসগুলো দেখুন:

- (১) তারিখ-ই-ফেরেশতা, মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, খণ্ড ১
- (২) তারিখ-ই-হিন্দ ওস্তান, মৌলভী জাকাউল্লাহ দেহলভী থেকে, খণ্ড ১
- (৩) তারিখ-ই-হিন্দ ওস্তান, প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখা, জে. ডব্লিউ. ম্যাকক্রিডল থেকে, নওল কিশোর প্রেস লখনউ থেকে মুদ্রিত, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ
- (৪) কাদীম তারিখ-ই-হিন্দ, ভিনসেন্ট এ. স্মিথ থেকে, অনুবাদক: মৌলভী জামিলুর রহমান, জামিয়া ওসমানিয়া দাক্ষিণাত্য থেকে মুদ্রিত, ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ
- (৫) তারিখ-ই-তামাদুন-ই-হিন্দ, মুহাম্মদ মুজিব, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ নয়াদিল্লি থেকে মুদ্রিত, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
- (৬) আয়না-ই-তারিখ-ই-হিন্দ, পি. এফ. লিন থেকে, রাম দয়াল অ্যান্ড সন্স আগ্রা থেকে মুদ্রিত, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
- (৭) তারিখ-ই-হিন্দ, তারা চাঁদ থেকে, সেন্টার ফর রিসার্চ অন রায়ান, ইসফাহান থেকে মুদ্রিত
- (৮) কাদীম হিন্দুস্তান কি তারিখ, আর. কে. মুখার্জি থেকে, অনুবাদক: সৈয়দ তকি হাসান নকভি, ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর প্রমোশন অফ উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ নয়াদিল্লি থেকে মুদ্রিত
- (৯) তারিখ-ই-বাগদাদ, ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল, লালা রাম প্রসাদ ও প্রফেসর হিন্দ্রি গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর থেকে, এডুকেশনাল পাবলিশার্স লাহোর থেকে মুদ্রিত, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
- (১০) আহাদ-ই-ইসলামি কা হিন্দুস্তান, মাওলানা রিয়াসত আলী নদভী থেকে, পৃষ্ঠা ৩ থেকে ৩৯, ইদারা-ই-মুসান্নিফীন পাটনা থেকে মুদ্রিত, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
- (১১) মুতাল্লা-ই-পাক ও হিন্দ, ডক্টর মাকসুদ চৌধুরী, পাবলিশার্স একাডেমি, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ

সিন্ধুর অমুসলিম শাসকগণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় সিন্ধুর অধিবাসীরা বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। এখানে রায় সেহরাস বিন সাহসি নামক এক রাজার শাসন ছিল, যার রাজ্য ছিল অত্যন্ত বিশাল এবং তার রাজধানী ছিল সিন্ধুর প্রাচীন শহর “অরোর”। [১] এই পরিবার বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল।

রায় সেহরাসের শাসন:

রায় সেহরাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র রায় সাহসি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসনও অত্যন্ত সুসংহত ছিল। এই সময়ে চচ নামক এক ব্রাহ্মণ পূজারি তার অধীনে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হন। ধীরে ধীরে রাজার তার ওপর এমন আস্থা তৈরি হয় যে, তাকেই নিজের উজির বানিয়ে নেন। রাজার মৃত্যুর পর চচ তার স্ত্রী রানী সোহন্দিকে বিয়ে করেন এবং রাজা হয়ে যান।

চচ চল্লিশ বছর শাসন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতের যুগে ছিলেন। ফাতহনামা-এ-সিন্ধু অনুযায়ী, তিনি যখন করমান সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতে মদিনার দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। তিনি ভালিয়া (বাহাওয়ালপুর রাজ্য), ইসকান্দা (উচ) এবং মুলতান থেকে শুরু করে সিউস্তান (সেহওয়ান), ব্রাহ্মণাবাদ এবং মাকরান পর্যন্ত এলাকাগুলো জয় করেন। যেহেতু চচ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাই তিনি আবারও তার অধিকৃত অঞ্চলের নিম্নবর্ণের জাতিগুলোকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে রাখেন এবং তাদের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। এই কারণেই সিন্ধুর মানুষ, যারা বেশিরভাগই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, তার শাসনে সন্তুষ্ট ছিল না। [২]

চন্দর:

চচের পর তার ভাই চন্দর বিন সিলাইজ সিংহাসনে বসেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং সাধারণত বৌদ্ধদের মন্দিরে পূজা-অর্চনা করতেন। তিনি সাত বছর শাসন করেন।

দাহির ও রাজ চন্দরের রাজত্বকাল:

চন্দরের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়: দাহির বিন চচ অরোরের সিংহাসনে বসেন, অন্যদিকে রাজ বিন চন্দর ব্রাহ্মণাবাদের শাসনভার গ্রহণ করেন। তবে তিনি মাত্র এক বছর শাসন করতে পেরেছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেন।

[১] এই শহর সিন্ধু নদের তীরে রোহড়ির কাছে অবস্থিত ছিল।

[২] চচ নামা, পৃ: ১৮ থেকে ৫০।

দাহির ও দাহরসিংহের রাজত্ব:

চচের পর তার বড় ছেলে দাহরসিংহ ব্রাহ্মণাবাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন, আর দাহির যথারীতি অরোর-এ শাসন করতে থাকেন। দাহরসিংহ “আঘাম”-এর শাসকের মেয়েকে বিয়ে করেন এবং পাঁচ বছর অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি রাওয়ার দুর্গের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন, যার ভিত্তি তার পিতা চচ স্থাপন করেছিলেন কিন্তু তা সমাপ্ত করতে পারেননি।

অন্যদিকে তার বোন মায়ীন বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। দাহরসিংহ তার বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজছিলেন, এমন সময় মালিক রহল (চোলিস্তান)-এর রাজা সোহন রায়ের প্রতিনিধিরা মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। দাহরসিংহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তার জন্য রাজকীয় যৌতুক প্রস্তুত করে পাঁচশ ঘোড়া ও সাতশ উটের সাথে তাকে অরোর-এর দিকে পাঠিয়ে দেন এবং দাহিরকে লিখে পাঠান যে, মেয়েটিকে যেন রায় সাহাসির ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যখন এই কাফেলা অরোর পৌঁছাল, তখন বিয়ের তারিখের মাত্র এক মাস বাকি ছিল।

সেই দিনগুলোতে দাহিরের সাথে একজন দক্ষ জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তার বোনের কোষ্ঠী গণনা করালেন। জ্যোতিষী বললেন: “গণনা অনুযায়ী এই মেয়েটি কখনো অরোর দুর্গ থেকে বের হবে না। যে ব্যক্তি তার পাণিগ্রহণ করবে এবং তাকে নিজের দখলে রাখবে, হিন্দুস্তানের রাজত্ব তারই হবে এবং এই মেয়েটি তার বিবাহবন্ধনে আসবে।”

এ কথা শুনে দাহির অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তার উজির বুদ্ধিমানের সাথে পরামর্শ করলেন। সে বলল: “আপনি বোনকে বিয়ে করে নিন, তবে শারীরিক সম্পর্ক রাখবেন না। এভাবে তিনি আপনার স্ত্রী হিসেবেও পরিচিত হবেন এবং রাজত্বও আপনার কাছেই থাকবে।”

দাহির এই কথা মেনে নিলেন এবং রায় সাহাসির সাথে বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। তিনি মহলে গিয়ে বোনের মাথায় চাদর দিলেন, তাকে অলঙ্কার পরালেন এবং তার কোলে নিজের তলোয়ার রাখলেন যা ছিল বিয়ের প্রতীক। তারপর তার চাদরের আঁচল নিজের চাদরের সাথে বেঁধে তাকে দরবারে নিয়ে এলেন এবং সিংহাসনে নিজের পাশে বসালেন।

দাহিরের এই কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীর অধিকাংশ আমির অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন, এমনকি তার ভাই দাহরসিংহ, যিনি ব্রাহ্মণাবাদের স্বাধীন শাসক ছিলেন, তিনিও অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তিনি তার ভাইকে চিঠি লিখে সতর্ক করলেন যে, তিনি যেন এই কাজ থেকে তওবা করেন, অন্যথায় চারদিকে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু দাহির কর্ণপাত করলেন না এবং ভিত্তিহীন ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই সম্পর্ককে বৈধ ঘোষণা করলেন।

দাহির ও দাহরসিংহের মধ্যে এই টানাপোড়েন চলতে থাকে। অবশেষে দাহরসিংহ অরোর দুর্গে আসার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে তাকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে এমন প্রতারণা ও মুনাফেকী আচরণের সম্মুখীন হতে হয় যে তিনি মনঃকষ্টে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন। তার বয়স ছিল ১০০ বছর। দাহির তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন এবং এক মাস পর তার স্ত্রীকে বিয়ে করেন, যিনি আঘাম-এর শাসকের মেয়ে ছিলেন।

রাজা দাহির বছরের চার মাস নবনির্মিত রাওয়ার দুর্গে অতিবাহিত করতেন কারণ সেখানকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ এবং পানি ছিল মিষ্টি। শীতের চার মাস তিনি ব্রাহ্মণাবাদে থাকতেন এবং বসন্তের চার মাস অরোর-এ কাটাতেন। এভাবে তার শাসনের আট বছর অতিবাহিত হলো। অবশেষে মালিক রহল (চোলিস্তানের শাহ) তার ওপর আক্রমণ করলেন এবং অরোর-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। দাহির তার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু খোলা ময়দানে জয়ের আশা কম ছিল। এটি বনু উমাইয়াদের শাসনকালের ঘটনা। সেই সময়ে একজন পলাতক আরব সরদার মুহাম্মদ আল্লাফি দাহিরের নিকট নিয়োজিত ছিলেন। [১] তিনি দাহিরকে সাহস যোগালেন এবং একটি আরব সেনাদলের সাথে দাহিরের বাছাইকৃত সৈন্যদের মিলিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর এমন এক নৈশ অভিযান চালালেন যে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালিয়ে গেল এবং দাহির জয়লাভ করলেন। [২]

এ থেকে বোঝা যায় যে, রটীল রাজ্যের শক্তি অনেক বেশি ছিল এবং এও জানা যায় যে, সেই সময়েও বনু উমাইয়াদের থেকে বিচ্যুত কিছু আরব মুসলমান সিন্ধি সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিলেন।

[১] আল্লাফির রাজা দাহিরের সাথে যুক্ত হওয়ার কাহিনী সামনে বিস্তারিত আসবে।

দ্রষ্টব্য: চচ এবং তার সন্তানদের অবস্থার অধিকাংশ তথ্য চচ নামা থেকে নেওয়া হয়েছে, তাই যেকোনো ঘটনার সূত্রের জন্য সেটিই দেখা উচিত।

দ্রষ্টব্য: চচ নামায় সিন্ধু সাম্রাজ্যের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানের নাম এসেছে যেগুলোর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো:

- কাশ্মীর ও পাঞ্জ নাহিয়াত: সেই সময়ের কাশ্মীর ঝিলামের আশপাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কনৌজের সীমান্ত উত্তরে এখানকার একটি স্থান “পাঞ্জ নাহিয়াত” পর্যন্ত ছিল।
- দরিয়া-এ মুহিত: এর দ্বারা আরব সাগর বোঝানো হয়েছে।
- আরোর: এটি “রাওয়ার” থেকে আলাদা একটি দুর্গ ছিল। এটি রোহড়ির কাছে ছিল এবং রায় বংশের শাসনের আগে রায় বংশের আমলেও সিন্ধুর রাজধানী ছিল। এরপর ১২৫ হিজরি পর্যন্ত অর্থাৎ মানসুরা নির্মাণের আগ পর্যন্ত এটি মুসলমানদের রাজধানীও ছিল। রাওয়ারের আলোচনা সামনে আসছে।
- দেবল: সিন্ধু নদ এবং সাগরের একটি খাঁড়ির মোহনায় অবস্থিত প্রাচীন শহর। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ভাস্কোর এবং দেবল একই শহরের দুটি নাম।
- লোহানা: মুসলমানদের আগমনের সময় এটি সিন্ধু সাম্রাজ্যের একটি বিশাল প্রদেশ ছিল যা শাহদাদপুর, তান্দা আদম এবং “হালা”কে পরিবেষ্টন করে ছিল। লাখাহ, সাম্মাহ এবং সাহতাহ নামক ভূমি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই নামগুলো সেই ভূমিতে বসবাসকারী জাতিগুলোর নামে ছিল।
- রটীল: এর দ্বারা বেলুচিস্তান বোঝানো হয়েছে।
- সিউস্তান: সিহওয়ান শরীফ বোঝানো হয়েছে।

[২] চচ নামা, পৃষ্ঠা ৩০ থেকে ৩৭।

- বুধিয়া: এটি সিন্ধু সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ছিল যাতে লারকানা এবং জ্যাকোবাবাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর সীমান্তে অবস্থিত শহর কালাত এবং কান্দাবিলও এর মধ্যে গণ্য করা হতো এবং কখনো বেলুচিস্তান প্রদেশ তুরানে।
- দিনকান: সম্ভবত সেই শহরকে বোঝানো হয়েছে যাকে ইবনে বতুতা জনানি নামে অভিহিত করেছেন এবং সেটি বেলুচিস্তান থেকে আসার পথে সিহওয়ানের আগে পড়ে।
- কোহ পায়াহ: এটি সম্ভবত কোহ খিরথারের সাথে সংযুক্ত “কোহ বাব”, যার নালা ও নদীগুলো মিলিত হয়ে “হাব নদী”র রূপ ধারণ করে। কোহ পায়াহ এবং কালাতের উল্লেখ অনেক জায়গায় একসাথে আসে, অর্থাৎ উভয়টি কাছাকাছি ছিল। কোহ বাব-ও খিরথার পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত যা কালাতের দ্বিতীয় নাম।
- রোজহান: জ্যাকোবাবাদ জেলার সাথে সংযুক্ত এই নামের দুটি শহর আছে: রোজহান জামালি এবং রোজহান মজারি। সম্ভবত প্রাচীন রোজহান এই পুরো এলাকাকে বলা হতো।
- করুর: সম্ভবত এর দ্বারা “করুর পাক্লা” বোঝানো হয়েছে যা মধ্য পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত শহর।
- আশহার: সম্ভবত এর প্রয়োগস্থল “ট্যাক্সিলা”। বৌদ্ধদের পরিভাষায় “হার” মন্দির অর্থে ব্যবহৃত হয়।
- তাকিয়া: একে “তাক্লাহ”ও লেখা হয়েছে এবং কেউ কেউ “কুতবাহ” লিখেছেন। পাঞ্জাব থেকে উপরে কাশ্মীর পর্যন্ত এলাকা “তাকাদিশ” নামে পরিচিত ছিল, এখানে সেই এলাকাই বোঝানো হয়েছে।
- চতুর: চাতরুর। চচ নামায় এর নাম “চতুর” বলা হয়েছে। সম্ভবত মূলতানের আশপাশের জনপদ চিতোরগড় বা রাজপুতানার কোনো শহর বোঝানো হয়েছে।
- পুরানি: এটি সেই নদী যা লু বেল-র পশ্চিমে প্রবাহিত হয় এবং সোন মিয়ানি উপসাগরে গিয়ে পড়ে।
- আমরিতি: সম্ভবত এর দ্বারা “লাসি” বোঝানো হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, সেই যুগে লাসিতে কোনো খালও ছিল।
- শাকলহার: এটি কাশ্মীরের শহরতলির কোনো এলাকা ছিল। সম্ভব যে এটি সেই এলাকাই হোক যাকে এখন গিলগিট বলা হয়।

নোট: এই অধিকাংশ স্থানের গবেষণায় ডক্টর মুহাম্মদ উমর বিন দাউদপোতা এবং ডক্টর নবী বখশ খান বালুচের গবেষণার (মাকতুবা হাওয়াশি চচ নামা) ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

উপমহাদেশ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে

অষ্টম শতাব্দীতে উপমহাদেশ কুফর, শিরক এবং বর্ণপ্রথার শৃঙ্খলে মারাত্মকভাবে আবদ্ধ ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলটি অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল। জাতিগত ও ভাষাগত বিভেদ ছাড়াও ধর্মীয় ও আদর্শিক মতপার্থক্যও কম ছিল না। এটিই ছিল সেই সময় যখন মুসলমানরা এই অঞ্চলে এসেছিল। উপমহাদেশে (দক্ষিণ এশিয়া) মুসলমানদের আগমন খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই শুরু হয়েছিল। আরবদের প্রাচীন পেশা পশুপালনের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল, তাই তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করত। হিন্দুদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, বরং তাদের ধর্মে সমুদ্রযাত্রা বৈধই ছিল না, তাই তাদের পণ্য আরব বণিকদের মাধ্যমেই বিশ্বের বাকি অংশে পৌঁছাত। আরব বণিকরা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে এসে এখান থেকে পণ্যসামগ্রী নৌকার মাধ্যমে সিরিয়া ও মিশর পর্যন্ত নিয়ে যেত। ইসলামি যুগে বাণিজ্যের আরও উন্নতি হলে উপমহাদেশে আরব বণিকদের যাতায়াতও বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় জনগণের সাথে তাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

আরব বণিকদের জাহাজ বসরা বন্দর থেকে রওনা হয়ে উপমহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে থামতে থামতে বাংলার চাটগাঁ পর্যন্ত পৌঁছাত। কিছু বণিক নৌকায় করে সিলন পর্যন্ত চলে যেত। এই অঞ্চল রেশম, চিনি এবং নারকেলের জন্য খুব বিখ্যাত ছিল। এই জিনিসগুলো আরব বণিকদের মাধ্যমে বিশ্বের বাকি অংশে পৌঁছাত। [১]

খিলাফতে রাশেদার সময় ইসলামি বাহিনী হিন্দুস্তানের পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কড়া নেড়েছিল। এখানে সামরিক অভিযানের প্রয়োজন এই কারণে ছিল যে, এখানকার যুদ্ধবাজ শাসকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্য ও খোরাসানের মজুসি শাসকদের সাহায্য করত এবং সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালিয়ে মুসলিম আমির ও সৈন্যদের শহীদ করে দিত।

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগের অভিযানসমূহ: গুজরাট ও দেবল আক্রমণ: ১৫ হিজরি

উপমহাদেশের পশ্চিম বন্দরগুলোতে সর্বপ্রথম আক্রমণ হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে সেই সময় হয়েছিল যখন তিনি হযরত উসমান বিন আবিল আস সাকাফি (রা.)-কে বাহরাইন ও ওমানের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। এটি ১৫ হিজরির ঘটনা। হযরত উসমান সাকাফি (রা.) বাহরাইনের প্রশাসনিক দায়িত্ব তার ভাই হযরত হাকাম বিন আবিল আস সাকাফি (রা.)-এর হাতে ন্যস্ত করেন এবং ওমানে পৌঁছে সেখানকার উপকূল থেকে নৌকার মাধ্যমে বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী বিখ্যাত বন্দর “থানা”-তে আক্রমণ করেন। কিছুদিন পর হযরত উসমান বিন আবিল আস (রা.) তার ভাই হাকাম বিন আবিল আস (রা.)-কে বারুস (ভারুচ, গুজরাট)-এ অতর্কিত অভিযানের জন্য পাঠান। এছাড়া...

[১] আরব ও হিন্দের সম্পর্ক, সৈয়দ সুলাইমান নদভী, পৃষ্ঠা: ৫০ থেকে ৫৬; পাকিস্তান ও হিন্দের অধ্যয়ন, ডক্টর মাহমুদ চৌধুরী, পৃষ্ঠা: ৩৫

তাঁর অন্য ভাই হযরত মুগীরা বিন আবিল আস (রা.)-কে সিন্ধুর উপকূলীয় শহর দেবল আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ইসলামী বাহিনী “খুর আদ-দেবল” (দেবলের খাঁড়ি)-এ প্রবেশ করল। [১] শত্রু বাহিনী বাইরে এসে যুদ্ধ করল। উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে হযরত মুগীরা বিন আবিল আস (রা.) তলোয়ার কোষমুক্ত করলেন এবং “বিসমিল্লাহ ওয়া ফী সাবীলিল্লাহ” বলে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হলেন। [২] তবে মুসলমানরা রণক্ষেত্রে অটল থাকলেন এবং বিজয়ী হলেন।

এই সমস্ত আক্রমণ ছিল “রেকি” (অনুসন্ধানমূলক) প্রকৃতির, তাই এগুলোর মাধ্যমে কোনো স্থান দখল করা হয়নি বরং মুজাহিদরা এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং শত্রুর শক্তির আন্দাজ করে ফিরে আসেন।

মকরান বিজয়:

১৭ হিজরিতে হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং একই বছর হাকাম বিন উমাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে মকরান বিজয়ের জন্য একটি বাহিনী পাঠানোর প্রস্তুতি নেন [৩] কিন্তু যাত্রার আয়োজন সম্পন্ন হতে পারেনি এবং পরবর্তী বছর শুরু হয়ে যায়। এভাবে এই বাহিনী ১৮ হিজরিতে মকরানে পৌঁছায়। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) বেলুচিস্তান বাহিনীর সহায়তার জন্য কুফা থেকে আরও মুজাহিদ প্রেরণ করেন। [৪]

এই সময়ে হযরত উমর ফারুক (রা.) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে লিখলেন যে, হিন্দ ও কিরমানের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে পারলেন যে, সিন্ধুতে বর্তমানে এক অবাধ্য রাজার উত্থান ঘটেছে যে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। [৫]

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৩১৬। উসমান বিন আবিল আস (রা.)-কে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হওয়া সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (সিয়রু আলামিন নুবালা: ২/৩৭৩), তবে তাঁর ভাই হাকাম বিন আবিল আস এবং মুগীরা বিন আবিল আস সম্পর্কে এমন কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না, তাই তাঁদেরকে তাবেরীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭৭।

[৩] ফুতুহুল বুলদান পৃ. ৩১৬।

[৪] তারিখ তাবারীতে এই নাম “আল-হাকাম বিন উমাইর আস-সালাবী” লেখা হয়েছে এবং সেখান থেকেই ইবনুল আসীর ‘আল-কামিল ফিত তারিখ’-এ এবং ইবনে খালদুন তাঁর ইতিহাসে এটি গ্রহণ করেছেন, অথচ আসমা-উর-রিজালে এমন কোনো ব্যক্তিত্বের উল্লেখ নেই। তবে “আল-হাকাম বিন উমাইর আস-সুমালী” অবশ্যই একজন সাহাবী ছিলেন। (তাবাকাত ইবনে সাদ: ৭/৫১৩, তাবারী: আল-ইসাবাহ ফী তামীযিস সাহাবাহ: ২/৯৫), তাই সম্ভব যে তাবারীর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোতে লিপিকারের ভুলের কারণে এটি ঘটেছে এবং প্রকৃতপক্ষে মকরান বিজয়ী হাকাম বিন উমাইর আস-সুমালীই ছিলেন।

[৫] তারিখুত তাবারী: ১৭ হিজরি। এই সমস্ত বিষয় বসরার গভর্নর হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর হাতে ছিল কারণ মকরানের বিষয়গুলো বসরার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) কিরমান ও মকরানে রাবী বিন যিয়াদ আল-হারিসীকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। রাবী বিন যিয়াদ অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর যুগে যখন তিনি হযরত হুজর বিন আদি (রা.)-এর হত্যার সংবাদ পেলেন, তখন নিজের মৃত্যুর জন্য দোয়া করলেন এবং সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবরণ করলেন। (তারিখুল ইসলাম যাহাবী: ২/৩৭৮, তাবারী)।

[৬] এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাজা দাহিরের পিতা “চাচ” ছিল যে সেই সময়ে বিজয় অর্জন করেছিল। যদিও তার শাসনকাল অনেক বছর আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু তার ক্ষমতার খুঁটিগুলো নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য তার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) যখন হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন, তখন তিনি হিন্দুস্তানে অগ্রসর হতে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে এই বাহিনী প্রায় পাঁচ বছর পর্যন্ত হিন্দুস্তানে আক্রমণ করতে পারেনি। [১]

সম্ভবত এই সতর্কতার একটি কারণ এটিও ছিল যে, সেই সময় ইসলামী বাহিনী বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাই জরুরি প্রয়োজনে বেলুচিস্তান সীমান্তে কোনো বড় ধরনের সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিল না।

তবে ২১ হিজরিতে এমন একটি ঘটনা ঘটল যে সিন্ধুর দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ল। সেই দিনগুলোতে সাসানি সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট ইয়াজদগিরদ মুসলমানদের কাছে ক্রমাগত পরাজয় বরণ করার পর তার সিংহাসন হারিয়ে মাৰ্ভে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ইরানি আমিররা মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার শেষ চেষ্টা হিসেবে আবারও তার পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করল। তারা আশেপাশের দেশগুলোকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিল এবং তাদের নিজেদের মিত্র বানিয়ে নিল। এই প্রেক্ষিতে সিন্ধুর শাসকদের সাথেও তাদের চিঠিপত্র আদান-প্রদান হলো এবং সিন্ধুরাও তাদের সাথে একমত হলো। এভাবে ইরানি, খোরাসানি এবং সিন্ধুদের দেড় লক্ষ লোকের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত হয়ে “নাহাওয়ান্দ”-এ পৌঁছাল। অন্যদিকে মুসলমানরা হযরত নুমান বিন মুকাররিন (রা.)-এর নেতৃত্বে তাদের মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন। বেশ কিছু ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং চূড়ান্ত লড়াইয়ে মুসলমানদেরও বেশ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হলো, এমনকি স্বয়ং সেনাপতি নুমান বিন মুকাররিন (রা.) এই যুদ্ধে শহীদ হলেন। পরিশেষে আল্লাহ মুসলমানদের জয়ী করলেন এবং মিত্র বাহিনী পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। [২]

এই যুদ্ধের পর ইরানিদের মিত্র খোরাসানি এবং সিন্ধুদের শিক্ষা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। ফলে হযরত আহনাফ বিন কায়েস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি বাহিনী ২২ হিজরিতে খোরাসান এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো জয় করতে বের হলো। একইভাবে সিজিস্তান এবং কিরমানের ওপরও আক্রমণ চালানো হলো। ২৩ হিজরিতে এই অভিযানগুলো সমাপ্ত হলো। সিজিস্তান ও কিরমান বিজয়ের পর সেখানকার প্রাদেশিক গভর্নররা সিন্ধু অভিযানে সহযোগিতার জন্য অবসর পেলেন। ফলে ২৩ হিজরিতে ইসলামী বাহিনী হাকাম বিন উমাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে মাকরানের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। এই সময়ে দুই কর্মকর্তা: সুহাইল বিন আদি এবং আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন ইতবান, যারা কিরমানে নিজেদের বাহিনীর সাথে অবস্থান করছিলেন, তারাও এই রণাঙ্গনে পৌঁছে গেলেন। [৩]

এভাবে হাকাম বিন উমাইর (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী একত্রিত হলো। যখন এই বাহিনী মাকরান শহরের কাছে পৌঁছাল, তখন মাকরানের রাজা তার সেনাবাহিনী নিয়ে শহর ছেড়ে দিয়ে দুয়িন নদীর দিকে চলে গেল। [৪]

এবং সেখানে পরিখা খনন করে অবস্থান নিতে লাগল। এর আগেই সে সিন্ধুর শাসক রাসিলের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিল। ফলে রাসিল এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছাল এবং তার দলগুলো নদী পার হতে শুরু করল। যখন তার পুরো বাহিনী নদী...

[১] তারিখ ইবনে খালদুন

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ, ২১ হিজরি

[৩] তারিখুত তাবারী, ২৩ হিজরি

[৪] দুয়িন বলতে সম্ভবত দশত নদী বোঝানো হয়েছে যা মাকরানের খুব কাছে এবং এই জেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে।

যখন তারা নদী পার হলো, তখন রাসিল এবং মাকরানের রাজা মুসলমানদের দিকে অগ্রসর হলো। মুসলমানরাও কাতারবদ্ধ হয়ে ময়দানে উপস্থিত হলো। মাকরানের একটি উপত্যকায়, যা নদী থেকে মাত্র কয়েক মাইলের দূরত্বে ছিল, অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলো। অবশেষে আল্লাহর সাহায্য শামিল হলো এবং কাফেররা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। মুসলমানরা পলায়নপরদের হত্যা করতে করতে দুই দিন পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করল এবং পুনরায় নদীর তীরে ফিরে এল। [১]

হাকাম বিন আমর (রা.) বিজয়ের সুসংবাদ এবং গনিমতের মালের খুমস (পঞ্চমাংশ) সহ সাহার আল-আবদীকে মদিনা মুনাওয়ারায় পাঠালেন। যখন তিনি মদিনায় পৌঁছালেন, তখন হযরত উমর (রা.) তাকে মাকরানের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় বললেন:

يا أمير المؤمنين! هي أرض سهلها جبل، وماؤها وشل، وتمرها دقل، وعدوها بطل، وخيرها قليل، وشرها طويل، والكثير فيها قليل، والقليل فيها ضائع، وما وراءها شر منها

“হে আমিরুল মুমিনিন! এটি এমন এক ভূখণ্ড যার সমতল ভূমিও পাহাড়ের মতো (দুর্গম)। এর পানি সামান্য ও ঘোলাটে। এর খেজুর নিম্নমানের। সেখানকার শত্রু অত্যন্ত সাহসী। সেখানে কল্যাণ সামান্য এবং অকল্যাণ দীর্ঘস্থায়ী। সেখানে যা বেশি তা-ও সামান্য মনে হয়, আর যা সামান্য তা হারিয়ে যায়। আর এর পরবর্তী এলাকা এর চেয়েও মন্দ।”

হযরত উমর (রা.) এই কথাগুলোকে অতিরঞ্জন মনে করে জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি ছন্দ মেলাচ্ছ নাকি সত্য সংবাদ দিচ্ছ?”

যখন নিশ্চিত হওয়া গেল যে সাহার আল-আবদীর বক্তব্য আক্ষরিক অর্থেই সত্য, তখন আপনি (উমর রা.) হাকাম বিন আমর এবং তার সহযোগী সুহাইল বিন আদীকে নির্দেশ পাঠালেন: “তোমাদের বাহিনীর কেউ যেন মাকরানের সীমানা অতিক্রম করে আর সামনে না বাড়ে।”

মাকরান বিজয়ের সময় অগণিত গনিমতের মালের পাশাপাশি অনেক হাতিও হস্তগত হয়েছিল। হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে সেই হাতিগুলো দারুল ইসলামে বিক্রি করে সেগুলোর মূল্য মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হলো। [২]

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে:

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাতের সময় ইসলামী বাহিনী মাকরান এবং কান্দাবিলের আশেপাশে অবস্থান করছিল। হযরত উসমান (রা.) চেয়েছিলেন ইসলামী বাহিনী আরও সামনে অগ্রসর হোক। তাই তিনি ২৯ হিজরিতে উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার তামীমী (রা.)-এর নেতৃত্বে মাকরানে একটি বাহিনী পাঠান, যারা শত্রুদের পরাজিত করে পুনরায় নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। [৩]

[১] তারিখ আল-তাবারী, ৪৩ হিজরি।

[২] তারিখ আল-তাবারী, ৩/১৮১, ১৮২; উয়ুন আল-আখবার ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী, ২/২১৭; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/৩২৫। নোট: সাহার বিন আব্বাস আল-আবদী। ইমাম বুখারী, ইবনে সাকান এবং ইবনে হিব্বান তাকে সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (আল-ইসাবাহ, ৩/৩২৯)

[৩] তারিখ আল-তাবারী, ২৯ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ, ২৯ হিজরি। নোট: উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁর সাহচর্য নিয়ে মতভেদ রয়েছে। (মা'রিফাতুস সাহাবাহ লিল আসবাহানী, ৩/১৮৭৬; আল-ইসাবাহ, ৫/২৪; আল-ইসতিয়াব, ৩/১০১৩) তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে গরুর হাড় যা কুড়াল দিয়ে কাটা যায়, তা হাত দিয়ে মটকে ভেঙে ফেলতেন। (তারিখ আল-তাবারী, ৩/৩২৭)

এই বিজয়ের পর একই বছর মকরানে প্রথমে উমাইর বিন উসমান বিন সাদ এবং পরে ইবনে কালদাহ আল-কুশাইরীকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। [১] পরিশেষে ইরাকের আমীর হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির এই দায়িত্ব আবদুল্লাহ বিন সাওয়ারকে অর্পণ করেন। [২] হযরত উসমান-এর শাহাদাতের সময় তিনি হিন্দুস্তান সীমান্তের আমিল ছিলেন।

হযরত আলী-এর যুগে কান্দাবিল ও কিকান বিজয়

৩৯ হিজরীর শুরুতে হযরত আলী-এর নির্দেশে মুসলমানরা বেলুচিস্তানে আরও অগ্রসর হন। এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন হারিস বিন মুররাহ আল-আবদী নামক একজন সাহসী অফিসার। [৩] ইসলামী লশকর অগ্রসর হওয়ার খবর কিকানবাসীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। পাহাড়ের পাদদেশ ও কিকানের বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত ছিল। [৪]

মুসলমানরা পৌঁছামাত্রই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক ভয়াবহ যুদ্ধের পর ময়দান মুসলমানদের দখলে আসে এবং কাফেররা পিছু হটে পাহাড়ি উপত্যকায় আশ্রয় নেয়। ইসলামী লশকর পথ পরিষ্কার দেখে কিকান শহরের দিকে রওনা হয়, কিন্তু মুজাহিদগণ যখন কিকানের গিরিপথ দিয়ে নিচে নামছিলেন, তখন হঠাৎ কাফেররা তাদের গিরিপথে ঘেরাও করতে শুরু করে। এই নাজুক মুহুর্তে মুসলমানরা পূর্ণ শক্তিতে তাকবীরের ধ্বনি উচ্চারণ করেন, যার প্রতিধ্বনিতে পাহাড় কেঁপে ওঠে এবং চারদিক থেকে তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কাফেরদের ওপর এমন ভীতি সঞ্চার হয় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখনই এগিয়ে এসে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, আর বাকিরা পালিয়ে যায়। [৫]

উমাইয়া শাসনের যুগে উপমহাদেশ

হযরত আলী-এর শাহাদাতের সময় সিন্ধু ও বেলুচিস্তান ফ্রন্টের আমীর ছিলেন হারিস বিন মুররাহ। হযরত মুয়াবিয়া...

[১] তারিখুত তাবারী: ২৯ হিজরী, আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯ হিজরী। দ্রষ্টব্য: উমাইর বিন উসমান বিন সাদকে আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের কিতাবসমূহে “উমাইর বিন সাদ বিন উবায়্যেদ” নামে স্মরণ করা হয়েছে। তিনি বড় মাপের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উমর তাকে হিমসের ওয়ালী নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলতেন: আফসোস, যদি আমার কাছে তার মতো আরও কিছু লোক থাকত। (আল-ইসাবাহ: ৩/৫৯৬) ইবনে কালদাহ আল-কুশাইরীর অবস্থা আসমাউর রিজাল শাস্ত্রে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায়নি, তবে তার আমীর হওয়া এই কথার প্রমাণ যে তিনি সাধারণ কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। আসমাউর রিজাল শাস্ত্রের ভাণ্ডারে সাদ্দ বিন হাইদাহ আল-কুশাইরী (বা হাইয়্যাহ) নামক একজন সাহাবীর উল্লেখ আছে, যার এক ছেলের নাম ছিল কালদাহ, যার সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হতে পারে সাদ্দ বিন হাইদাহকে তার ছেলে কালদাহর সাথে সম্বন্ধ করে আবু কালদাহ আল-কুশাইরী বলা হতো এবং তারিখুত তাবারী ইত্যাদিতে আবু কালদাহর পরিবর্তে ইবনে কালদাহ নকল করার প্রাচীন ভুল চলে আসছে।

[২] আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার বিন হান্মাম আল-আবদী একজন প্রখ্যাত তাবিঈ ছিলেন। (আল-মুহাব্বার: পৃষ্ঠা ১৫৩) নবী আকরাম-এর পক্ষ থেকে বাহরাইনের আমিল নিযুক্ত হয়েছিলেন। (আল-ইসাবাহ: ৫/১৭) কিন্তু সম্ভবত সাহচর্য নসিব হয়নি, তাই ইবনে আসাকির তাকে তাবিঈ হিসেবে গণ্য করেছেন। (মুখতাসার তারিখু দামেশক: ২৯/৯৬)

[৩] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ১৮০

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ১৯১, ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৮

[৫] চাচনামা: পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০। দ্রষ্টব্য: কোহ-পায়াহ হলো খিরকামার সংলগ্ন “কোহ-বাব”, যার নালা ও নদীগুলো মিলিত হয়ে হাব নদীর রূপ ধারণ করে। (তারিখু সিন্ধু: পৃষ্ঠা ১৯, মাওলানা হালীম শারার থেকে)

[৬] চাচনামা: পৃষ্ঠা ৮৯, ৯০

...খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ৩২ হিজরিতে তিনি এই অভিযান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন শত্রু একটি গিরিপথে অবরোধ করে তাদের ঘিরে ফেলে। হারিস বিন মুররাহ (রা.) তার অধিকাংশ সঙ্গীসহ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হন। [১]

রাশিদ বিন আমর জুদাইরি। প্রথমবার:

তাদের পর বসরার আমির আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.) রাশিদ বিন আমর জুদাইরি (রা.)-কে হিন্দুস্তান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি ৩২ হিজরিতে সেনাবাহিনী নিয়ে হিন্দুস্তানে প্রবেশ করেন এবং মাকরান হয়ে সিন্ধুর অনেক দূর পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে যান। [২]

আবদুল্লাহ বিন সাওয়ারের অভিযান, কিকানের নতুন করে বিজয়:

রাশিদ বিন আমর (রা.) আরও বিজয়ের সময় পাননি এবং ৩৩ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.)-কে বেলুচিস্তানের আমির নিযুক্ত করেন। [৩] অবশেষে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.) হিন্দুস্তান সীমান্তে পৌঁছান এবং কিকানে অগ্রসর হন। [৪]

কিকানের পাহাড়ি অঞ্চল ছিল অত্যন্ত দুর্গম। এখানে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যার শুরুতে স্থানীয় যোদ্ধারা বিজয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়। [৫]

এই বিজয়ে অনেক কিকানি ঘোড়াও হস্তগত হয়। আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.) এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে হাযায বিন আমর আবদিকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন এবং নিজে গনিমতের মালের কিকানি ঘোড়াগুলো নিয়ে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দরবারে দামেস্কে পৌঁছান এবং এই ঘোড়াগুলো তাকে পেশ করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) অত্যন্ত খুশি হন এবং তাকে পুনরায় বেলুচিস্তান ফ্রন্টে নিযুক্ত করেন। [৬]

মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা (রা.)-এর অভিযানসমূহ। বান্নু ও সোয়াবি পর্যন্ত আক্রমণ:

আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.)-এর অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্তান সীমান্তে আক্রমণ অব্যাহত থাকে। ৪৪ হিজরিতে এক অনন্য ধরনের আক্রমণ হয় যার নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত ইসলামী তলোয়ারবাজ মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা (রা.)। তিনি তার তুখোড় বাহিনী নিয়ে কান্দাবিল হয়ে উত্তরের দিকে অগ্রসর হন এবং বান্নাহ (বান্নু) জয় করেন। [৭]

এখানে অত্যন্ত কঠিন অভিযানের সম্মুখীন হতে হয়। এক পর্যায়ে স্থানীয় যোদ্ধারা হঠাৎ নৈশকালীন আক্রমণ চালায় কিন্তু বনু আযদ-এর যুবকদের দৃঢ়তা মুসলমানদের রক্ষা করে। যার ওপর এক কবি বলেছিলেন:

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭, ত. আল-হিলাল

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৩, ২০৫

[৩] চাচনামা, পৃ. ৮১

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭

[৫] চাচনামা, পৃ. ৭৯

[৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭, ত. আল-হিলাল; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৭, ২০৮

[৭] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْأَزْدَ لَيَلَّةٌ يَبْتَؤُا... بَيْنَهُ كَانُوا خَيْرَ جَيْشِ الْمُهَلَّبِ

“তুমি কি বনু আযদকে দেখনি যে, যে রাতে বনুতে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করা হয়েছিল, তখন তারা মুহাল্লাবের বাহিনীতে সবচেয়ে উত্তম প্রমাণিত হয়েছিল।” [১]

এরপর তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে করতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং “আলাহোর”-এর নিকটবর্তী হন। এখানে একটি বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে হিন্দুরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং হযরত মুহাল্লাব রহ. শহরে দখল প্রতিষ্ঠা না করেই বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল নিয়ে ফিরে আসেন। [২]

ফেরার পথে মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা রহ. কাইকান (কিরথার পর্বতমালা) হয়ে পুনরায় বেলুচিস্তানে প্রবেশ করেন। কাইকানে এক স্থানে তিনি একা ছিলেন, তখন আঠারোজন তুর্কি অশ্বারোহী হঠাৎ তাঁর ওপর আক্রমণ করে বসে, কিন্তু মুহাল্লাব একাই তাদের সবাইকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেন। সেই তুর্কিদের ঘোড়াগুলোর ঘাড়ের কেশর এবং লেজ ছাঁটা ছিল, যার ফলে ঘোড়াগুলোকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। মুহাল্লাব বিন আবি সুফরা রহ.-এর কাছে এই ভঙ্গিটি পছন্দ হয় এবং তিনি বলেন: “এই অনারবদের তুলনায় আমরা এটি করার অধিক হকদার।” ফলে তিনি ঘোড়ার চুল ছাঁটার ধারা চালু করেন। মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। [৩]

আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রহ.-এর পুনরায় বেলুচিস্তানের আমীর হওয়া:

কিছুদিন পর আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রহ. দামেস্ক থেকে ফিরে এসে তাঁর পূর্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ৪৭ হিজরিতে উপজাতীয় যোদ্ধারা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা “তুর্কিদের” সাহায্য নিয়ে এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে। [৪]

এবার শত্রু পাহাড়গুলোতে অবরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এমনকি মুসলমানরা পুরোপুরি তাদের ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে যায় এবং তাদের চাপ সহ্য করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে। তবে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রহ. তাঁর বিশেষ সৈন্য ও জানবায়দের নিয়ে নিজ স্থানে অটল থাকেন। তিনি জীবন-মরণের লড়াই সামনে দেখে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন: “হে মুহাজিরগণ! হে আনসারগণ! কাফেরদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, পাছে তোমাদের ঈমানে কোনো ক্রটি না আসে। এসো, শাহাদাতের মর্যাদায় ভূষিত হও।”

এটি শুনে ছত্রভঙ্গ মুসলমানরা তাদের আমীরের পতাকাতলে সমবেত হলো। শত্রু এখন মুসলমানদের ঘেরাও করার পাশাপাশি সামনে কাতারবন্দী হচ্ছিল। এটি দেখে আব্দুল কায়েস গোত্রের এক নেতা শত্রুদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালেন। উপজাতীয় যোদ্ধাদের এক সর্দার মোকাবিলায় এগিয়ে এল। কয়েক মুহূর্তের ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আব্দুল কায়েসের নেতা শত্রু সর্দারকে হত্যা করলেন। এটি দেখে...

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ ৩/৪৩

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৬ - লাহোর বলতে সম্ভবত পাকিস্তানের কেপিকে প্রদেশের সোয়াবি জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর “ছোট লাহোর” বোঝানো হয়েছে।

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৭১, ত. আল-হিলাল

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৭১; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৭, ২০৮

করে শত্রু সাধারণ আক্রমণ করে দিল। আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রাদিআল্লাহু আনহু এবং তাঁর সঙ্গীরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং প্রতিপক্ষের অসংখ্য লোককে হত্যা করার পর শাহাদাতের সুখা পান করলেন। তবে শেষ মুহুর্তে তিনি সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের আমির নিযুক্ত করেছিলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের এত বেশি লোক নিহত হয়েছিল যে, এখানকার উপত্যকা ও পাহাড়গুলো লাশে পরিপূর্ণ দেখাচ্ছিল। যুদ্ধ থেকে বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা কোনোভাবে মাকরানের কেলা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। [১]

এর বাইরের সমস্ত এলাকার ওপর মুশরিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। [২]

সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুর বিজয়সমূহ:

عبدالله بن سوار رضى الله عنه كى شهادت كى خبر سن كر حضرت معاويه رضى الله عنه نے امير زياد كو درج ذيل مراسله بهيجا: “تم غور كرو كه محاذ هند كے ليے كونسا شخص موزوں ترين ہے۔

জিয়াদ চিন্তা-ভাবনার পর হযরত সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুকে আমিল নিযুক্ত করলেন, আর আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রাদিআল্লাহু আনহুর ওসিয়তও এটাই ছিল। এটি ৪৮ হিজরির ঘটনা। সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহু দুই বছর এক মাস শাসন করেন এবং নিজেকে বিজিত এলাকাগুলোর প্রতিরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। [৩]

রাশিদ বিন আমর জুদাইরির পুনরায় আমাত:

৫০ হিজরিতে ইরাকের আমির জিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান রাদিআল্লাহু আনহু সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুকে বেলুচিস্তানের শাসনভার থেকে অপসারিত করেন [৪] এবং এই পদটি রাশিদ বিন আমর জুদাইরি রাদিআল্লাহু আনহুকে অর্পণ করেন। রাশিদ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু মাকরানে পৌঁছে সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে স্বীকার করেন যে, তিনি এমন এক মহান ও সাহসী মানুষ যিনি প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব ও সেনাপতিত্বের যোগ্য। যেহেতু সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহু এই দুর্গম এলাকায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন, তাই রাশিদ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর কাছ থেকে ভালোভাবে তথ্য ও পরামর্শ গ্রহণ করতে থাকেন।

মনে হয় যে হযরত সিনান বিন সালামা রাদিআল্লাহু আনহুর শাসন পদ্ধতি ছিল কোমলতাপূর্ণ, তাই গত দুই বছর তিনি কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি, যদিও এই সময়ে অনেক অধীনস্থ গোত্র এমনকি কর (খরাজ) পর্যন্ত প্রদান করেনি। সম্ভবত রাশিদ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিয়োগ এই নীতি পরিবর্তনের জন্যই হয়েছিল। সুতরাং রাশিদ বিন আমর রাদিআল্লাহু আনহু সমস্ত তথ্য নেওয়ার পর বিলম্ব না করে সেই এলাকাগুলোতে আক্রমণ শুরু করেন যেখান থেকে কর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ‘কোহ পায়্যা’ এবং ‘কিকান’ পৌঁছে জোরপূর্বক কর আদায় করেন। [৫]

[১] চচ নামা: পৃ. ৭৯

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ: ৩১৭, তবা আল-হিলাল; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ: ২০৭-২০৮

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৯, ২১১; ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৩১৮

[৪] চচ নামা: পৃ. ৮১

[৫] চচ নামা: পৃ. ৮১ - মনে রাখতে হবে যে কোহ পায়্যা কাইর কানবিলের দক্ষিণে অবস্থিত।

তারপর তারা জলদস্যুতা করা ‘মেদ’ গোত্রগুলোর বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বের হলেন। এই কঠিন অভিযান এক বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল [১]। তাদের ফেরার পথে অমুসলিম গোত্রগুলো তাদের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করে তাদের পথ রোধ করল। সকাল থেকে যোহরের সালাত পর্যন্ত অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ হলো যাতে রাশিদ বিন আমর (রা.) শহীদ হলেন [২]। কাফিররা আবারও বিজয় লাভ করল এবং মকরানসহ বেশ কিছু এলাকা পুনরায় মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গেল [৩]।

হারিস বিন মুররা (রা.) এবং আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার (রা.)-এর পর তিনি ছিলেন তৃতীয় উচ্চপদস্থ ইসলামী কর্মকর্তা যিনি হিন্দুস্তান সীমান্তে শাহাদাত বরণ করেন।

সিনান বিন সালামা (রা.)-এর নেতৃত্ব:

তাদের শাহাদাতের খবর পাওয়ার পর সীমান্তের বিষয়াদি আবারও সিনান বিন সালামা (রা.) নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং ইরাকের আমীর যিয়াদও হিন্দুস্তান সীমান্তের নেতৃত্ব তার নামেই করে দিলেন। সিনান বিন সালামা (রা.) খুব দ্রুত সৈন্যবাহিনী বিন্যস্ত করে হাতছাড়া হওয়া এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের প্রস্তুতি নিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি বলছেন: “তোমার পিতা তোমার বীরত্বের জন্য গর্বিত। আজকের দিনটি তোমার বিজয়ের দিন। অনেক এলাকা তোমার দখলে আসবে। সেখানে ন্যায়বিচার ও সংস্কারের সাথে শাসন করবে।” এই সুসংবাদ পূর্ণ হলো। সিনান বিন সালামা (রা.) বিভিন্ন এলাকা জয় করতে থাকলেন এবং প্রতিটি স্থানে অত্যন্ত সুচারুভাবে ও দয়ার সাথে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন [৪]।

প্রথমে তিনি খুজদার এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো জয় করলেন [৫]। তারপর শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ ‘কিকান’-এর দিকে অগ্রসর হলেন [৬]। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো, তখন দেখা গেল যে প্রতিপক্ষের সৈন্যবাহিনী পঙ্গপালের মতো অগণিত [৭]। হযরত সিনান বিন সালামা (রা.) তাঁর মুজাহিদদের শপথ করিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধ থেকে পালাবে তার স্ত্রীকে তালাক [৮]। শত্রুর আধিক্য দেখে তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাহস দিলেন এবং বললেন: “সুসংবাদ! তোমরা দুটির মধ্যে একটি সাফল্য অবশ্যই পাবে: হয় জান্নাত অথবা বিজয়।” তারপর তিনি সাতটি পাথর তুললেন এবং মুজাহিদদের সামনে এসে বললেন: “যখন আমাকে আক্রমণ করতে দেখবে, তখন তোমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বে।” হযরত সিনান বিন সালামা (রা.) বাহিনীকে প্রস্তুত অবস্থায় রাখলেন। যখন সূর্য ঠিক মাথার উপরে এল, তখন তাকবীর বলতে বলতে একের পর এক [৯]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৯, ২১১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

[২] চচ নামা, পৃ. ৮২

[৩] চচ নামা, পৃ. ৮২

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৯, ২১১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

[৬] চচ নামা, পৃ. ৮২

[৭] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

[৮] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২১২

[৯] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭

শত্রুর দিকে পাথর নিক্ষেপ করলেন। এরপর আরও অপেক্ষা করলেন, যখন সূর্য কিছুটা ঢলে পড়ল তখন সপ্তম পাথরটি ছুঁড়ে মারার সময় স্লোগান দিলেন: “হা-মীম লা ইউনসারুন”। তারপর আল্লাহ আকবার বলে মূর্তিপূজারীদের ওপর আক্রমণ করলেন।

মুসলমানরাও শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই মুশরিকদের লাশের স্তুপ জমে গেল এবং বাকিরা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা বারো মাইল (সাড়ে ১৯ কিলোমিটার) পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করল। অবশেষে পলায়নকারীরা একটি মজবুত দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। মুসলমানরা যখন দুর্গটি ঘেরাও করল, তখন স্থানীয় লোকেরা ভেতর থেকে বলে পাঠাল: “আল্লাহর কসম! তোমরা আমাদের মারোনি, বরং চিত্রবিচিত্র ঘোড়ায় সওয়ার সাদা পাগড়ি পরিহিত ব্যক্তিরা আমাদের মেরেছে।” মুসলমানরা বলল: “এটি আল্লাহর সাহায্য ছিল।”

এই যুদ্ধে মুসলমানদের মাত্র একজন ব্যক্তি শহীদ হন। পরে কোনো এক সৈনিক হযরত সিনান বিন সালামাহ (রা.)-এর কাছে শত্রুর ওপর আক্রমণে এত বিলম্ব করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন: “রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবেই করতেন।” [১]

হযরত সিনান বিন সালামাহ (রা.) এই অভিযানে মকরানকে তরবারির জোরে পুনরায় জয় করেন এবং এই পুরো এলাকাকে নতুন করে আবাদ ও সুসংগঠিত করেন। তিনি দুই বছর (৫০ হিজরি থেকে ৫২ হিজরি) পর্যন্ত নিজ পদে বহাল ছিলেন এবং এখানে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। [২]

সিনান বিন সালামাহ (রা.)-এর পর:

হযরত সিনান (রা.)-এর পর ইরাকের আমির যিয়াদ বিন আবি সুফিয়ান ৫৩ হিজরিতে নিজ পুত্র আব্বাদ বিন যিয়াদকে হিন্দুস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আব্বাদ হেলমান্দ নদীর আশপাশের এলাকা এবং কান্দাহার পুনরায় জয় করেন। [৩]

এই সময়ে একটি হিন্দুস্তানি বাহিনী অগ্রসর হয়ে সীমান্তে চলে আসে, কিন্তু আব্বাদ তাদের পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করেন। আব্বাদের অভিযানসমূহ সিজিস্তানের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর পরিধি বেলুচিস্তান বা সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারেনি। [৪]

মুনযির বিন জারুদ:

৬৩ হিজরিতে ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়ার আমির উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুনযির বিন জারুদকে “কান্দাবিল”-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন, যা হিন্দুস্তান সীমান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গন ছিল। [৫] মুনযির বিন জারুদ বুকান, কিকান এবং খুজদারসহ সেই সমস্ত এলাকা পুনরায় জয় করেন যেখানে সিনান বিন সালামাহ (রা.)-এর পর লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল। এই অভিযানগুলোতে ইসলামি বাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর পরিমাণে গনিমত তাদের হস্তগত হয়। মুনযির এই রণাঙ্গনেই ইন্তেকাল করেন। [৬]

[১] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২১২, ২১৩

[২] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮, তবা আল-হিলাল

[৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

[৪] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২১৯

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮

সম্ভবত সেই সময় প্রশাসনিক দিক থেকে কান্দাবিলকে কেন্দ্র বানানো হয়েছিল, তাই সেখানকার গভর্নর বানানোর অর্থ ছিল সমগ্র হিন্দুস্তান সীমান্তের গভর্নর বানানো।

[৬] তারিখ খলিফা বিন খইয়াত, পৃ. ২৩৬ নোট: উল্লিখিত বর্ণনায় বুকান বলতে সম্ভবত “বোলান” (বেলুচিস্তান) বোঝানো হয়েছে।

তারিখ উম্মতে মুসলিমা (অংশ ২)

তাদের পর তাদের পুত্র হাকাম বিন মুনজির কেন্দ্র থেকে বিদ্রোহ করেন এবং কান্দাবিলে নিজের স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। [১] কিছুকাল পর ইরাকের আমির উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হারি বিন হারি আল-বাহিলিকে হিন্দুস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। হারি বিন হারি সেখানে অত্যন্ত কঠিন যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হয়ে প্রচুর পরিমাণে গনিমতের মাল লাভ করেন। [২]

এরপর হিন্দুস্তানের সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে ইতিহাস নীরব হয়ে যায় এবং আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকাল পর্যন্ত সেখানে কোনো প্রশাসনিক পরিবর্তন বা নতুন কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইয়াজিদের শাসনামলের অশুভ পরিণতির কারণে বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলের সমস্ত বিজিত এলাকা সিরিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং এরপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মুসলমানরা এখানে কোনো বিজয় অর্জন করতে পারেনি। ৬৪ হিজরি থেকে ৭৩ হিজরি পর্যন্ত সিরীয় আমিরগণ ইরাক ও হিজাজের জুবাইরি খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ধারা অব্যাহত রাখেন, যার সমাপ্তি ঘটে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের বিয়োগান্তক ঘটনার মাধ্যমে। গৃহযুদ্ধের এই দীর্ঘ সময়ে হিন্দুস্তান ও সিন্ধু ফ্রন্টে কোনো মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি।

সাইদ বিন আসলাম:

৭৮ হিজরিতে ইরাকের আমির হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হিন্দুস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের ব্যবস্থাপনার দিকে মনোযোগ দেন এবং সাইদ বিন আসলামকে মাকরানের আমির বানিয়ে পাঠান। কিছুকাল পর তিনি কোনো কারণে আলাফি পরিবারের কিছু লোককে হত্যা করান, যার ফলে আলাফিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এই পরিবারের একজন প্রধান মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি, যার বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু সামা বিন লুয়াইয়ের সাথে, নিজের ভাই মুয়াবিয়ার সাথে মিলে বিদ্রোহ করেন এবং সাইদ বিন আসলামকে হত্যা করে মাকরান দখল করেন। [৩]

মুজাআ বিন সিআর:

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হন। [৪] তিনি মুজাআ বিন সিআর তামিমিকে হিন্দুস্তানের সীমান্ত অঞ্চলের আমির বানিয়ে পাঠান। মুজাআ বিন সিআর ৭৯ হিজরিতে মাকরান পুনরায় দখল করেন এবং আলাফি ভ্রাতৃদ্বয় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুজাআ আরও অগ্রসর হয়ে কান্দাবিলের কিছু পার্শ্ববর্তী এলাকাও জয় করেন। তবে এর কিছুদিন পরই তার মৃত্যু হয়। [৫]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ২৩৬। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইয়াজিদের অদূরদর্শিতা ও বাড়াবাড়ি পুরো মুসলিম বিশ্বে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে একই বছর ৬৩ হিজরিতে কাবুলের অধিবাসীরাও বিদ্রোহ করে, হিজাজেও ইয়াজিদের আনুগত্যের জোয়াল গলা থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। এদিকে আফ্রিকাতেও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশাল বিজিত এলাকা হাতছাড়া হয়ে যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তারিখুত তাবারি: সন ৬৩ হিজরি, সন ৬৪ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৬৩ হিজরি, সন ৬৪ হিজরি। সম্ভবত হাকাম বিন মুনজিরের বিদ্রোহও এই প্রেক্ষাপটেরই অংশ ছিল।

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪১৯।

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ২৭৭; চচনামা: পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

[৪] চচনামা: পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ২৭৮; ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪১৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ৭৯ হিজরি।

মুহাম্মদ বিন হারুন বিন জিরা:

এখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুর সীমান্ত অঞ্চলের শাসনভার মুহাম্মদ বিন হারুন বিন জিরা নমরীর হাতে অর্পণ করলেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে তিনি যেন যেকোনো মূল্যে আলানি ভাইদের নির্মূল করেন। [১] মুহাম্মদ বিন হারুন আশ্রয় চেষ্টা করে মুয়াবিয়া বিন হারিস আলানিকে খতম করে দিলেন, তবে মুহাম্মদ বিন হারুন আলানি হাতে আসেনি। [২]

এই সময়েই খোরাসানের সেনাপতি আব্দুর রহমান বিন আশআস হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। মুহাম্মদ বিন হারিস আলানি তার সঙ্গীদের নিয়ে এই অভিযানে শরিক হন, কিন্তু যখন আব্দুর রহমান বিন আশআস পরাজিত হন এবং তার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, তখন মুহাম্মদ বিন হারিস আলানি পাঁচশ আরবের সাথে সিন্ধুতে চলে আসেন এবং রাজা দাহিরের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তার সেনাপতিদের অন্তর্ভুক্ত হন। [৩]

এদিকে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ছিলেন যে মুহাম্মদ বিন হারিস আলানি কীভাবে বেঁচে পালালো। তিনি এই ফিকিরে ছিলেন যে কোনোভাবে সুযোগ পেলে তাকেও নির্মূল করে দেওয়া হবে। কিছুদিন পর এমন এক ঘটনা ঘটল যে সিন্ধু আক্রমণ করা জরুরি হয়ে পড়ল।

ঘটনাটি ছিল এই যে, শ্রীলঙ্কায় বসবাসরত আরব বণিকদের কিছু পরিবার নিজ দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল বাইতুল্লাহর হজ পালন করে দামেস্কে যাওয়া যাতে খলিফা ওয়ালিদের সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। শ্রীলঙ্কার রাজা ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ, তিনি খলিফার জন্য বড় মূল্যবান উপহার সামগ্রীও সেই বছরের সাথে পাঠিয়েছিলেন যাতে আটটি নৌকা ছিল। সিন্ধুর কাছে সামুদ্রিক ঝড় বছরের গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে দেবল-এর সামনে পৌঁছে দেয় এবং এখানকার জলদস্যুরা নৌকাগুলোকে ঘিরে ফেলে।

সারানদীপের কর্মকর্তারা এই দৃশ্য দেখে বলল:

“আমরা মুসলমানদের খলিফার কাছে যাচ্ছি, এই মাল ও আসবাবপত্র তারই জন্য।”

কিন্তু আক্রমণকারীদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না। তারা নারীদের বন্দি করে নিল এবং সমস্ত মালামাল লুট করে নিল। সাথে সাথে বলল:

“যদি মুক্তি চাও তবে এর মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।”

সেই সময় বনী ইয়ারবু গোত্রের এক নারী চিৎকার করে বললেন: “হে হাজ্জাজ! হে হাজ্জাজ! সাহায্যের জন্য এসো!”

কয়েকজন ভাগ্যবান মুসলমান এই সুযোগে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তারা সরাসরি হাজ্জাজের কাছে পৌঁছান এবং সেই নারীদের ফরিয়াদ শোনান। এই ঘটনা শোনার সাথে সাথেই হাজ্জাজের মুখ থেকে বের হলো: “হয়তো আমি ঘুমাছিলাম। এই আওয়াজ আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে।” তারপর তিনি ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে উঠলেন: “লাববাইক! লাববাইক!” [৪]

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত-এ ৭৯ হিজরির অধীনে আমিরের নাম হারুন বিন জিরা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ৮৬ হিজরির অধীনে যেখানে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সমস্ত আমিলদের নাম একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এই আমিরের নাম মুহাম্মদ বিন হারুন বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সঠিক, যেমনটি ফুতুখুল বুলদান এবং চচ নামা-তেও এই নাম উল্লিখিত আছে।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ২৭৮; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩৩৮/৫, ত তদমুরী।

[৩] চচ নামা: পৃষ্ঠা ৭১।

[৪] চচ নামা: পৃষ্ঠা ৮৯।

তারিখ উম্মত-এ-মুসলিমা

অংশ: দ্বিতীয়

তিনি অবিলম্বে একজন দূতের মাধ্যমে রাজা দাহিরের কাছে একটি পত্র পাঠালেন যে, এই বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে এবং লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় সিন্ধু রাষ্ট্রকে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে।

হাজ্জাজ দূতকে এই তাকিদও দিলেন যে, তিনি যেন অপহৃত কাফেলার সন্ধান করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

দূত সিন্ধু পৌঁছে হাজ্জাজের পয়গাম পৌঁছে দিলেন। দাহির ক্ষমতার নেশায় এই পত্রের কোনো পরোয়া করলেন না এবং বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বললেন: “এটি জলদস্যুদের কাজ। তাদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।” [১]

হাজ্জাজকে এমন টালবাহানা দিয়ে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি খিলাফত দরবার থেকে সিন্ধুতে জিহাদের অনুমতি চাইলেন এবং অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই বেলুচিস্তানের শাসক উবায়দুল্লাহ বিন নাবহানকে সিন্ধুতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উবায়দুল্লাহ বিন নাবহান রণাঙ্গনে পৌঁছালে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। উবায়দুল্লাহ শহীদ হলেন এবং বাহিনীকে পিছু হটতে হলো।

হাজ্জাজ খবর পেয়ে তার দ্বিতীয় সেনাপতি বুদাইল বিন তাহফাহকে এই অভিযানে পাঠালেন। এবারও এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হলো যার মধ্যে বুদাইল বিন তাহফাহ শহীদ হলেন এবং ইসলামী বাহিনীকে আবারও পিছু হটতে হলো।

অবশেষে হাজ্জাজ অনেক পীড়াপীড়ির পর খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছ থেকে উপমহাদেশে একটি বড় অভিযান শুরু করার অনুমতি লাভ করলেন এবং অনুমোদন পাওয়ার সাথে সাথেই যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। রাজধানী থেকে ছয় হাজার রাজকীয় সৈন্যের সাহায্য আনালেন এবং এই অভিযানের নেতৃত্বের জন্য বসরার প্রাক্তন শাসক কাসিম বিন মুহাম্মদের তরুণ পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমকে নির্বাচন করলেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বাহিনীকে সমস্ত সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহ প্রস্তুত করলেন। দুর্গ ধ্বংসকারী মানজানিক এবং অগ্নিসংযোগের জন্য বারুদ থেকে শুরু করে সুতা পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস সাথে রাখলেন। আরব সৈন্যরা সালুন (তরকারি) রান্নার জন্য সিরকা ব্যবহার করত যা সিন্ধুতে দুপ্রাপ্য ছিল। সিন্ধুর গরমের কারণে বোতলে পাঠানো সিরকাও নষ্ট হয়ে যেতে পারত; তাই হাজ্জাজ সিরকা তুলায় ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিলেন এবং সেই তুলার বস্তাগুলো এই নির্দেশ সহ পাঠিয়ে দিলেন যে, যখনই প্রয়োজন হবে, এই তুলা পানিতে ভিজিয়ে প্রয়োজনমতো সিরকা সংগ্রহ করে নেওয়া হবে। এই সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত জিনিস ছিল “আরুস” নামক মানজানিক যা খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ছিল এবং বিশেষ করে রাজধানী দামেস্ক থেকে পাঠানো হয়েছিল। এটি পাঁচশ লোক মিলে পরিচালনা করত।

৯২ হিজরির মাঝামাঝি সময়ে এই বাহিনী রওনা হলো এবং হাজ্জাজের নির্দেশ অনুযায়ী শিরাজ পৌঁছে অবস্থান করল। যখন দামেস্ক থেকে পাঠানো সামরিক সরঞ্জাম এসে পৌঁছাল, তখন মুহাম্মদ বিন কাসিম তা নৌকার মাধ্যমে দেবলের দিকে পাঠালেন এবং নিজে স্থলপথে মকরানের দিকে যাত্রা করলেন। মকরানে স্থানীয় আমির মুহাম্মদ বিন হারুন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে স্বাগত জানালেন। [২]

[১] চাচনামা, পৃ. ৮৯-৯০। দাহিরের এই কথাটি সম্পূর্ণ ভুল ছিল কারণ পরবর্তীতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এই বন্দীদের দাহিরের দুর্গগুলো থেকে উদ্ধার করেছিলেন, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি এই ধরনের জলদস্যুদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

[২] চাচনামা, পৃ. ৯১ থেকে ১০০।

কয়েক দিনের প্রস্তুতির পর ইসলামের বাহিনী সামনে অগ্রসর হলো এবং পাঞ্জপুর জয় করল। [১]

এরপর বাহিনী আরমাইল (লাসবেলা) পৌঁছাল। মুহাম্মদ বিন হারুন অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও বাহিনীর সাথে থেকে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু আরমাইলের কাছাকাছি পৌঁছে তার অবস্থা এতটাই অবনতি হয় যে শেষ পর্যন্ত সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। [২]

মুহাম্মদ বিন কাসিম:

হারুন বিন যিরা-এর ইন্তেকালের পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ মুহাম্মদ বিন কাসিমকে সিন্ধু এবং সমস্ত নববিজিত অঞ্চলের ওয়ালি নিযুক্ত করেন। এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম আরমাইল (লাসবেলা) আক্রমণ করে তা জয় করে নেন। [৩]

বিজয়ের পর তার কাছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি নির্দেশনামা পৌঁছায় যাতে দেবল যুদ্ধের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের বাহিনী এখন উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হলো এবং সিন্ধুর সীমানায় প্রবেশ করে জুমার দিনে দেবলের সামনে ছাউনি ফেলল। ব্যবস্থাপনা এতটাই চমৎকার ছিল যে, সেই দিনই সমুদ্রপথে নৌবাহিনীও যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং দুর্গ ধ্বংসকারী যন্ত্রপাতির সাথে পৌঁছে গেল। [৪]

এই সময়ে রাজা দাহিরের পুত্র জয় সিং নিরুন কোট (হায়দ্রাবাদ)-এ ছিল। সে তার পিতাকে এই বাহিনীর আগমনের সংবাদ দিল এবং তাদের ওপর আক্রমণ করার অনুমতি চাইল। দাহির মিত্রদের সাথে পরামর্শ করার পর জয় সিংকে অগ্রসর হতে নিষেধ করে দিল।

দেবলের মন্দির:

দেবলের মন্দির অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল যাতে গৌতম বুদ্ধের একটি বিশাল মূর্তি স্থাপিত ছিল। এর ভবনটি ছিল ষাট ফুট উঁচু যার ওপর আরও ষাট ফুট উঁচু একটি গম্বুজ ছিল। গম্বুজের চূড়ায় একটি খুঁটি ছিল যার ওপর অত্যন্ত নিপুণ কারুকার্যে তৈরি একটি বিশাল রেশমি লাল পতাকা ছিল। সেটি চার দিকে চারটি পতাকার আকারে উড়ত এবং যখন বাতাস বইত তখন এই চারটি পতাকা পাখার মতো ঘুরত। দেবলের মানুষ একে একটি জাদুকরী বিষয় মনে করত। [৫]

শহরের সামনে ছাউনি ফেলার পর এবং নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম মানজানিক স্থাপন করালেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরায় বসে এই রণাঙ্গনের প্রতিটি খবরের খোঁজ রাখতেন; মুহাম্মদ বিন কাসিমের চিঠি তিন দিনে হাজ্জাজের কাছে এবং হাজ্জাজের চিঠি তিন দিনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছে যেত।

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৩

[২] চচ নামা: পৃষ্ঠা ১০০

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৩

[৪] চচ নামা: পৃষ্ঠা ১০২

চচ নামা অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনী ৯৩ হিজরির মহরমের শুরুতে দেবল পৌঁছেছিল। পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী এটি হবে ৭ই মহরম, মোতাবেক ৫ই নভেম্বর ৭১১ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু এই তারিখটি সঠিক বলে মনে হয় না কারণ চচ নামা অনুযায়ীই দেবল জয় করতে এক মাসও সময় লাগেনি। আর এটিও চচ নামার বর্ণনা যে, দেবল বিজয়ের সুসংবাদপত্রের জবাবে হাজ্জাজের যে পত্রটি পৌঁছেছিল তা ৯৩ হিজরির রজব মাসে লেখা হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে এই অভিযানের প্রতিটি বিষয় হাজ্জাজকে জানানোর নিয়ম ছিল এবং ষষ্ঠ বা সপ্তম দিনে তার জবাব চলে আসত। দেবল বিজয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সংবাদ দিতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে যেমন বিলম্ব হতে পারত না, তেমনি হাজ্জাজের পক্ষ থেকে জবাবে কোনো শিথিলতার সম্ভাবনা ছিল না। তাই মহরম মাসে দেবল বিজয় হওয়া লেখক বা বর্ণনাকারীর ভুল বলে মনে হয়। হাজ্জাজের ৯৩ হিজরির রজব মাসের পত্রটি বিবেচনায় নিলে ধারণা করা যায় যে, দেবল ৯৩ হিজরির জমাদিউল আখির মাসের শেষের দিকে ঘেরাও করা হয়েছিল এবং রজব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে তা বিজয় হয়েছিল।

[৫] চচ নামা: পৃষ্ঠা ১০০

চচ নামা: পৃষ্ঠা ১০৩; ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৪০; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/১৯

জবাবি নির্দেশনামা তিন দিনের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছে যেত। [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পক্ষ থেকে প্রতিদিনের অবস্থা লিখে পাঠানো হতো এবং হাজ্জাজের পক্ষ থেকে প্রতিদিন পত্র আসত যাতে আক্রমণ বা বিরতির নির্দেশ থাকত। অষ্টম দিনে হাজ্জাজের পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া গেল। এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল শহরের ওপর আক্রমণ করলেন। শহরের সৈন্যরা আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এই সময়ে শহরের কিছু বিশেষ ব্যক্তি গোপনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে একজন জ্যোতিষীও ছিলেন যিনি আরজ করলেন: “আমাদের গণনা বলছে যে, এখানকার রাজার রাজত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং এখন মুসলমানদের আগমনের সময়। তাই আমরা দেবলের কারাগারে বন্দি মুসলমানদের সান্ত্বনা দিতাম।” মুহাম্মদ বিন কাসিম তার অনুরোধে তাকে একটি আমাননামা লিখে দিলেন এবং সে গিয়ে বন্দিদের এই সুসংবাদ শোনাতে গেল যে, হাজ্জাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ বিন কাসিম এসেছেন, তার হাতেই দুর্গ জয় হবে এবং তোমরা মুক্তি পাবে।

একইভাবে একজন ব্রাহ্মণ গোপনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জানান যে, শহরবাসীর বিশ্বাস অনুযায়ী যতক্ষণ মন্দিরের ওপর উড়তে থাকা পতাকাটি না পড়বে, ততক্ষণ এই শহর জয় করা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে মুহাম্মদ বিন কাসিম তার বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ পাথর নিক্ষেপকারী জাওহ্নাকে ডেকে প্রস্তাব দিলেন যে, সে যদি পাথর নিক্ষেপ করে ওই পতাকা এবং গম্বুজটি ফেলে দিতে পারে, তবে তাকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দেওয়া হবে। জাওহ্না রাজি হলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম জিজ্ঞেস করলেন: “যদি তুমি ব্যর্থ হও তবে তোমার শাস্তি কী হবে?” জাওহ্না বললেন: “আমার হাত কেটে ফেলা হোক।” [২]

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার পত্রে হাজ্জাজকে এই সমস্ত অবস্থা জানালেন এবং জাওহ্নার সাথে নির্ধারিত পুরস্কার ও ব্যর্থতার ক্ষেত্রে শাস্তির কথাও লিখে পাঠালেন। হাজ্জাজ জাওহ্নার সাথে নির্ধারিত শর্তাবলি অনুমোদন করলেন এবং এই তাকিদও দিলেন যে, দেবলের অধিবাসী ছাড়া অন্য যে কেউ নিরাপত্তা চাইবে তাকে যেন নিরাপত্তা দেওয়া হয়।

[৩]

দেবল বিজয়:

এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম জাওহ্নাকে আরুসের মাধ্যমে পতাকায় পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এই মুজাহিদ প্রথম লক্ষ্যেই পতাকাকে মুক্ত করে দিলেন। দ্বিতীয় লক্ষ্যভেদে তিনি গম্বুজটি ভেঙে ফেললেন। এখন দেবলের মূর্তিপূজারীদের বিশ্বাস হয়ে গেল যে তাদের পরাজয় নিশ্চিত, কারণ তাদের মতে দেবতাদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে হলে লড়াই করে মরা জরুরি ছিল, তাই তারা শহরের দরজা খুলে ময়দানে বেরিয়ে এল।

[১] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২০।

[২] চাচনামা, পৃ. ১০৫।

[৩] চাচনামা, পৃ. ১০৬। এখানে বালায়ুরীর বর্ণনা হলো যে, হাজ্জাজ মন্দিরে পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং জবাবে লিখেছিলেন: “আরুসকে পূর্ব দিকে স্থাপন করো এবং এর একটি কোণকে লক্ষ্যবস্তু বানাও।” (ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪২১)। কিন্তু চাচনামার বর্ণনা অনুযায়ী লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণে হাজ্জাজের কোনো ভূমিকা ছিল না। এটি মুহাম্মদ বিন কাসিম ও জাওহ্নার মধ্যকার বিষয় ছিল এবং জাওহ্নাই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে মিনজানিকটি কীভাবে স্থাপন করা উচিত। চাচনামার বর্ণনাটিই অধিক সঠিক মনে হয়। বালায়ুরীর বর্ণনাটি বাস্তবসম্মত নয়। হাজ্জাজের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা তার জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু কুফায় বসে তিনি মিনজানিকের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে দেবেন আর কেবল চিঠি পড়েই লক্ষ্যভেদ হয়ে যাবে—এটি বাস্তবসম্মত নয়। বরং সঠিক হলো এই যে, জাওহ্না একজন দক্ষ লক্ষ্যভেদকারী ছিলেন এবং তিনি পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে সঠিক লক্ষ্যভেদ করেছিলেন।

কিন্তু মুসলমানরা এক শক্তিশালী আক্রমণ করে তাদের পিছু হটিয়ে দিলেন। দেবলবাসীরা শহরে ঢুকে ফটক বন্ধ করে দিল। তবে মুজাহিদিনরা রশির সাহায্যে প্রাচীরে চড়ে বসলেন এবং সেখানে দখল করে নিলেন। বনু মুরাদের একজন সৈনিক সর্বপ্রথম প্রাচীরের ওপর ইসলামি পতাকা স্থাপন করেন। এখন দেবলের সৈন্যরা শহরের দরজা খুলে দিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল, কিন্তু শহরটি তলোয়ারের জোরে বিজিত হয়েছিল, তাই মুহাম্মদ বিন কাসিম বললেন, “আমার এর অনুমতি নেই।”

ফলে তিন দিন পর্যন্ত দেবলে যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকে। তবে মূর্তিপূজার মন্দিরের পুরোহিত জাহিন দুর্গের প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান এবং সিন্ধু নদ পার হয়ে রাজা দাহিরের কাছে পৌঁছে যান এবং তাকে পরাজয়ের সংবাদ শোনান। একইভাবে দেবলের শাসক, যাকে রায় বলা হতো, তার অবশিষ্ট পলাতক সৈন্যদের নিয়ে নিরুন্ন কোটে পৌঁছে যান, যেখানকার শাসক ছিল দাহিরের পুত্র জয় সিংহ।

এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম দেবল দখল করার পর সেই বন্দি মুসলমান নারী ও পুরুষদের উদ্ধার করেন যাদের সিন্ধুরা গ্রেপ্তার করেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের সব ধরনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন যাতে তাদের কষ্টের উপশম হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম সাধারণ নাগরিকদের সাথেও ভালো ব্যবহার করেন। এছাড়া চার হাজার মুসলমানকে এখানে আবাদ করে উপমহাদেশে প্রথম মুসলিম জনবসতির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এই অঞ্চলে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করান। [১]

ওয়াদিয়ে মেহরানের পূর্ব অংশ বিজয়:

রাজা দাহিরের অভ্যাস ছিল যে, সে গরমের দিনগুলো তার দক্ষিণ রাজধানী “রাওয়ার”-এ কাটাত। [২]

তখন গ্রীষ্মকাল ছিল এবং রাজা দাহির সেখানেই ছিল, তাই তার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিটি সংবাদ পৌঁছাচ্ছিল। সে দেবল বিজয়ের খবর শোনামাত্রই তার পুত্র জয় সিংহকে নির্দেশ দিল যে, সে যেন সরাসরি ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছায় এবং নিরুন্ন কোটকে “বশনি” নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর হাতে সোপর্দ করে তাকে শহরের নিরাপত্তার কঠোর তাকিদ দেয়। [৩]

নিরুন্ন কোট বিজয়:

রাজা দাহিরের সাথে মোকাবিলা করার আগে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু নদের পশ্চিম অঞ্চলগুলোতে দখল মজবুত করা জরুরি মনে করলেন যাতে রাওয়ার আক্রমণের সময় পেছন থেকে কোনো হামলার আশঙ্কা না থাকে। ফলে ইসলামি বাহিনী নিরুন্ন কোটের দিকে যাত্রা করল। [৪]

মুহাম্মদ বিন কাসিম মানজানিক এবং অন্যান্য ভারী সরঞ্জাম নৌকায় বোঝাই করে সেগুলোকে সিন্ধু নদের শাখা “সাকরা”-র...

[১] চচ নামা, পৃ. ১০৭ থেকে ১১০; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩৩০, ৩৩১; তারিখ ইয়াকুবি, পৃ. ২২৬; আল-কামিল ফিত তারিখ, ৩/ ১৮, ১৯।

[২] চচ নামা, পৃ. ১২১। “রাওয়ার” এবং “আরোর”-এর মধ্যে প্রায়ই বিভ্রান্তি ঘটে। “আরোর” উত্তর সিন্ধুর রোহড়ির কাছে ছিল এবং এটি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন দুর্গ, যেখানে রাওয়ারের ভিত্তি চচ স্থাপন করেছিলেন এবং দাহির তা সম্পন্ন করেছিলেন। এটি দক্ষিণ সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ ও ঠাট্টার মাঝে সিন্ধু নদের পূর্বে অবস্থিত ছিল। (চচ নামা, পৃ. ৫৪)

[৩] চচ নামা, পৃ. ১২৩, ১২৪।

[৪] চচ নামা, পৃ. ১১৫। হায়দ্রাবাদ সিন্ধু মূলত “নিরুন্ন” বা (নিরুন্ন কোট)-এর প্রাচীন জনবসতির স্থানে গড়ে উঠেছে। (নবী বখশ বালুচ, হাওয়াশি চচ নামা)

মাধ্যমে রওনা করলেন এবং নিজে স্থলপথে নিরুনের দিকে অগ্রসর হলেন। নিরুনের কাছে পানি পাওয়া যাচ্ছিল না। মুজাহিদদের তৃষ্ণায় নাজেহাল অবস্থা হয়ে গেল। এটি দেখে মুহাম্মদ বিন কাসিম দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং এই দুআ পড়লেন:

ইয়া দালীলুল মুতাহাইয়ীরীন ওয়া ইয়া গিয়াসাল মুস্তাগীসীন, আগিসনী বি-হাক্কি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(হে পথহারাদের পথপ্রদর্শক! হে ফরিয়াদীদের বিপদ উদ্ধারকারী! বিসমিল্লাহর বরকতে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।)

দেখতে দেখতেই চারদিক পানিতে ভরে গেল এবং সবদিকে পানির পুকুরগুলো পূর্ণ হয়ে গেল। ওদিকে নিরুনের অধিবাসীরা সন্ধির মাধ্যমে শহরটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে তুলে দিল এবং মুজাহিদদের সওয়ারিগুলোর জন্য ঘাস-পানির ব্যবস্থাও করল। মুহাম্মদ বিন কাসিমও তাদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করলেন। [১]

উত্তর সিন্ধু বিজয়:

এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম উত্তর সিন্ধুর দিকে মুখ করলেন। ইসলামের বাহিনী যেখানেই পৌঁছেছে, বিজয় ও সাহায্য তাদের কদম চুম্বন করেছে। [২] ইসলামের বাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই প্রথমে সেহওয়ানে নিজেদের পতাকা গাড়ল এবং তারপর মানছার হ্রদের তীরে অবস্থিত সীসাম দুর্গ জয় করে নিল। এরপর সেহওয়ানের উত্তরে বুধিয়া প্রদেশ (লারকানা, জ্যাকোবাবাদ এবং শিকারপুর)-এর শেষ সীমানা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা বিজিত হয়ে গেল যেখানে সিন্ধু নদের ওপারে ভাক্কার দুর্গ ছিল। [৩]

সেহওয়ানের উত্তর থেকে শিকারপুর পর্যন্ত বিশাল এলাকায় সামরিক অভিযানের প্রয়োজন পড়েনি এবং দাহিরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ স্থানীয় সর্দাররা মুসলমানদের সদাচরণের খবর শোনার পর নিজেরাই তাদের আনুগত্যকে প্রাধান্য দিল।

নিরুনে প্রত্যাবর্তন:

ভাক্কার জয় করে রাজা দাহিরের রাজধানী ‘অরোর’-এ হামলা করা খুব বেশি কঠিন ছিল না এবং সম্ভবত মুহাম্মদ বিন কাসিমের ইচ্ছাও এটাই ছিল, কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, মুসলমানরা সমস্ত এলাকা ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে নিরুনে ফিরে আসুক এবং নদী পার হয়ে রাজা দাহিরকে দমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুক। মুহাম্মদ বিন কাসিম নির্দেশ পালন করলেন। ইসলামের বাহিনী নিরুনে ফিরে এল এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। হাজ্জাজ জবাবে পূর্ণ সতর্কতার সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান দিয়ে সিন্ধু নদ পার হওয়ার নির্দেশনা দিলেন এবং তাকিদ দিলেন যে, দাহিরকে যেন নদীর এপারে আসতে না দেওয়া হয়। [৪]

সিন্ধু নদ কীভাবে পার হওয়া গেল?

অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু নদের তীরের দিকে যাত্রা করলেন এবং শোভার (গুন্দা মুহাম্মদ খান) জয় করে নদীর সমান্তরালে দক্ষিণ দিকে সফর শুরু করলেন। গ্রীষ্মকালের কারণে বরফ গলে নদীর পানি সাধারণ দিনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল...

[১] চচনামা, পৃ. ১১৫-১১৬।

[২] ফুতুখুল বুলদান, পৃ. ৪৪১।

[৩] চচনামা, পৃ. ১১৯-১২২।

[৪] চচনামা, পৃ. ১২৬-১৩০।

উচ্চ ছিল, তাই এটি অতিক্রম করা সহজ ছিল না। তবে জুলাই মাস শুরু হতে চলেছিল এবং আরও কিছু দিন অতিবাহিত হলে বর্ষার কারণে মেহরান নদী অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। সৌভাগ্যবশত মুসলমানরা এখানে একজন সাহায্যকারী পেয়ে গেল। সে ছিল সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত “ভাট” দুর্গের শাসক ওয়াসায়োর পুত্র মোকো। সে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে তার পূর্ণ সমর্থনের নিশ্চয়তা দিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম বিনিময়ে তাকে একটি বড় জায়গির দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মোকো মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু স্বজাতির মধ্যে সম্মান বজায় রাখার জন্য সে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে লিখল:

“আমি যদি যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করি, তবে তা শত্রুদের তিরস্কার এবং বংশের অপমানের কারণ হবে। এখন আমি সাকরাহ (সাকরো)-এর রানার সাথে আমার মেয়ের বিয়ের (কথা বলার) অজুহাতে সেখানে যাচ্ছি। আপনি এই সময়ের মধ্যে এক হাজার সৈন্য পাঠিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করে নিন।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। মোকো একশ জন খাদেম ও সৈন্য নিয়ে সাকরাহ (সাকরো)-এর দিকে রওনা হলো এবং এদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সেনাপতি বানানা বিন হানজালা পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে ধাওয়া করে গ্রেপ্তার করে নিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম মোকোকে অনেক সমাদর করলেন এবং সেই সাথে একটি ফরমান লিখে দিলেন যে, ভাট জেলার শাসনভার বংশপরম্পরায় তারই কাছে থাকবে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এখন নদী অতিক্রম করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মঠিহলা নিচু এলাকায় এমন এক স্থানে অবস্থান নিলেন, যার নদীর ওপারে রাওয়ার দুর্গ অবস্থিত ছিল। এখানেই মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু নদ পার হওয়ার জন্য মোকোর কাছে নৌকা চাইলেন এবং সেই সাথে রাজা দাহিরের কাছে একজন দূত পাঠালেন, যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই বার্তা শোনাল:

“যদি তুমি নদী পার হয়ে এপারে আসতে চাও, তবে তোমার সেই অধিকার আছে। পথ খোলা আছে। তোমার কোনো বাধা হবে না। অন্যথায় তুমি পথ খোলা রাখো যাতে আরব বাহিনী নদী পার হয়ে তোমার দিকে চলে আসতে পারে।”

দাহির তার উজির “সিয়াকার”-এর সাথে পরামর্শ করল। সে বলল: “আরব বাহিনীকে নদী পার হতে দেওয়া হোক। এভাবে মেহরানের পানি তাদের পেছনে থাকবে এবং তাদের কাছে কোনো সাহায্য পৌঁছাতে পারবে না।”

দাহির সেই দিনগুলোতে নিজেকে নির্ভীক জাহির করার জন্য মদ্যপান, কাবাব, দাবা ও পাশা খেলা এবং ভ্রমণ ও শিকারে মগ্ন থাকতে শুরু করেছিল। তার একজন উপদেষ্টা পরামর্শ দিল যে, সে যেন “সাহরা-এ-গজ”-এ চলে যায় এবং হিন্দুস্তানের শাসকদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আসে, কিন্তু দাহির তা প্রত্যাখ্যান করল এবং যুদ্ধের জন্য অনড় রইল।

এদিকে ইসলামি বাহিনী আরও দক্ষিণে গিয়ে মীরপুর সাকরোতে সিন্ধু নদের সেই ঘাটে পৌঁছে গেল, যার অপর পাশে ভাট দুর্গ অবস্থিত ছিল। মোকো বিন ওয়াসায়ো বাহিনীকে নদী পার করানোর জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নৌকা ও তক্তার ব্যবস্থা করে দিল। দাহির এই খবর পেয়ে গিয়েছিল যে, ভাট জেলার শাসক ওয়াসায়োর পুত্র মোকো মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে হাত মিলিয়েছে এবং নৌকা সরবরাহ করে সহযোগিতা করছে। সে মোকোর ভাই রাসিলকে নির্দেশ দিল যেন সে ভাট দুর্গে পৌঁছে মুসলমানদের বাধা দেয়।

যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম নদীতে নৌকা দিয়ে সেতু তৈরির চেষ্টা করলেন, তখন রাসিল বিন ওয়াসায়ো তার বাহিনীর সাথে তাদের ওপর

৭৬২ | উমাইয়া খিলাফত | উম্মতে মুসলিমার ইতিহাস

হামলার ধারা শুরু করে দিল। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম নৌকাগুলোকে নদীর মাঝখানে বাঁধার পরিবর্তে অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। নদীর প্রস্থ মেপে নিয়ে নদীর পশ্চিম তীরে নৌকাগুলোকে আড়াআড়িভাবে বেঁধে একটি দীর্ঘ শিকল তৈরি করা হলো এবং তাতে বাছাইকৃত সৈন্যদের বসিয়ে দেওয়া হলো। এই শিকলের এক প্রান্ত একটি মজবুত খুঁটির সাথে বেঁধে বাকি অংশ নদীতে ছেড়ে দেওয়া হলো। পানির স্রোত নিজে থেকেই নৌকাগুলোর এই সেতুকে ঠেলে অন্য পাড়ে নিয়ে গেল। নৌকায় বসা সৈন্যরা ঢালের মাধ্যমে নিজেদের শত্রুর তীর থেকে রক্ষা করতে থাকল এবং অন্য পাড়ে পৌঁছাতেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবশেষে শত্রু পালাতে বাধ্য হলো। এখন নৌকাগুলোর সেতুকে খুঁটি থেকে খুলে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হলো এবং পুরো বাহিনী সারিবদ্ধভাবে সেতুর ওপর দিয়ে পার হতে লাগল। এই সময়ে মাত্র একজন মুজাহিদ নদীতে ডুবে শহীদ হলেন। বাকি সবাই নিরাপদে পার হয়ে গেলেন এবং তাদের আক্রমণের মুখে রাসিল ও বিন বাসায়ুর সৈন্যরা পিছু হটে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। [১]

রাজা দাহিরের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ:

মুহাম্মদ বিন কাসিম নদী পার হয়ে বাহিনীর সামনে এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দিলেন, যাতে তিনি বললেন:

“হে ইসলামের লস্কর! মেহরানের পানি তোমাদের পেছনে এবং কাফেরদের লস্কর তোমাদের সামনে মোকাবিলার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যার মনে ফিরে যাওয়ার চিন্তা আসবে, সে সেখানেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ যখন শত্রুর মুখোমুখি হওয়া হবে এবং যুদ্ধ শুরু হবে, তখন যে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেবে তার বাকি লস্করও মনোবল হারিয়ে ফেলবে এবং শত্রু বিজয়ী হয়ে যাবে। এটি হবে বড় লাঞ্ছনা। পলায়নকারী অপমানের মৃত্যু বরণ করবে এবং আখেরাতের আজাবে লিপ্ত হবে।”

প্রথম দিনের লড়াই:

ওদিক থেকে দাহির তার পুত্র জয়সিংহকে এক লস্কর দিয়ে পাঠাল যাতে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রোধ করা যায়। জয়সিংহ তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা করল কিন্তু পরাজিত হলো এবং তার প্রায় সব সৈন্য মারা গেল। জয়সিংহ ঘেরাওয়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু তার হাতি ব্যুহ ভেঙে দ্রুতবেগে পালিয়ে গেল, এভাবে জয়সিংহের প্রাণ বেঁচে গেল। দাহির এই সময়ে অগ্রসর হয়ে রাওয়ারের সীমান্তবর্তী ঝিলের পূর্বে পৌঁছে গিয়েছিল। জয়সিংহ জীবিত অবস্থায় তার কাছে পৌঁছাল এবং পরাজয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

এই সময়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নতুন পত্র মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে পৌঁছাল যে যুদ্ধকে দ্রুত সমাপ্তিতে পৌঁছাতে হবে। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের লস্কর দ্রুত অগ্রসর হলো এবং রাওয়ারের কাছে একটি নদীর শাখার তীরে তাবু ফেলল।

এখন লস্কর একে অপরের এত কাছে চলে এল যে যুদ্ধের জন্য মাঝখানে মাত্র দেড় মাইলের ব্যবধান রইল। যার এক তীরে একটি ঝিল ছিল। পরের দিন উভয় লস্করের মধ্যে নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হলো। প্রথম দিন দাহিরের একটি বিশেষ দল ‘হামসারদার’ লস্কর মোকাবিলার জন্য বের হলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলল কিন্তু কোনো ফয়সালা হলো না।

[১] চচনামা, আলী বিন হামিদ আল-কুফি, পৃষ্ঠা ১২২ থেকে ১৩৩; ফুতুহুল বুলদান, পৃষ্ঠা ৪২১।

দ্বিতীয় দিন দাহির দেবল ও ভন্টের প্রাক্তন কেহ্লাদার জাহিনকে মোকাবিলার জন্য পাঠাল। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সে নিহত হলো। এটি দেখে উজির সি সাগর দাহিরকে আরজ করল: “যুদ্ধের এই পদ্ধতি ভুল। আপনি বারবার ভুল করেছেন এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেননি। আপনার উচিত ছিল আরবদের তখন মোকাবিলা করা যখন তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মেহরান পার হচ্ছিল। এখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং মোকাবিলায় যাওয়া প্রতিটি ঠাকুরই মারা যাচ্ছে। এখন এটাই ভালো হবে যে, আপনি সমস্ত অশ্বারোহী, পদাতিক এবং হাতি নিয়ে একযোগে আক্রমণ করুন।”

দাহির নিরুপায় হয়ে তাই করল। পরের দিন ৯ রমজান ৯৩ হিজরিতে সে লস্কর নিয়ে বের হলো। সেদিন তার লস্করে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, বিশ হাজার পদাতিক এবং ষাটটি হাতি ছিল। সে লস্করকে দুই ভাগে বিভক্ত করল: এক অংশ তার পুত্র জয়সিংহের কমান্ডে দিল এবং অন্য অংশ নিয়ে নিজে অগ্রসর হলো। সে বর্ম পরিহিত ছিল এবং নিজের বিশেষ ধনুক হাতে রেখেছিল। সে ইস্পাতের আবরণে ঘেরা একটি পালকিতে হাতির পিঠে সওয়ার ছিল, যার সাথে দুইজন দাসীও ছিল। তার ডান দিকে ছিল তীরন্দাজদের দল। বাম দিকে ছিল অশ্বারোহী, মাঝখানে ছিল হাতির পাল এবং পেছনে ছিল পদাতিকদের সারি।

ওদিকে লস্করে ইসলামে মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভাষণ চলছিল: “হে আরববাসী! আজ সংগ্রামের দিন। ইসলামের বিজয়ের জন্য চেষ্টা করো। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। যাতে তোমরা মুশরিকদের পিছু হটিয়ে দিতে পারো এবং তাদের দেশ ও সম্পদ তোমাদের দখলে আসে। যদি তোমরা মজবুত না থাকো, যদি তোমরা পেরেশান ও ভগ্নহৃদয় হয়ে পড়ো, যদি তোমরা হীনম্মন্যতা ও দুর্বলতাকে স্থান দাও, তবে মুশরিকরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে, ময়দান তাদের হাতে চলে যাবে। তারা তোমাদের সবাইকে হত্যা করবে। একজনকে ও জীবিত ছাড়বে না। মনে রেখো! যদি তোমরা কাফেরদের মোকাবিলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের সম্মানে কলঙ্ক লেগে যাবে।”

এরপর মুহাম্মদ বিন কাসিম কাতার বিন্যস্ত করলেন। মুহরিজ বিন সাবিতকে কলবে নিজের সাথে রাখলেন। জহম বিন জুহরকে ডান বাহুতে, যাকওয়ান বিন আলওয়ানকে বাম বাহুতে, আতা বিন মালিক কায়সীকে অগ্রবর্তী দলে এবং নুবাতা বিন হানজালাকে পশ্চাৎবর্তী দলে নিযুক্ত করে ঘোষণা করলেন: “যদি আমি শহীদ হয়ে যাই, তবে মুহরিজ বিন সাবিত আমার হবেন।”

মুহাম্মদ বিন কাসিমের আদেশে প্রথমে মুহরিজ বিন সাবিত এবং উওয়াইস বিন কায়স ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে ঝিল পার হলেন এবং দাহিরের লস্করের সামনে পৌঁছে গেলেন। তাদের পেছনে পেছনে আতা বিন মালিক কায়সী এবং যাকওয়ান বিন আলওয়ান আল-বাকরীও ঝিল পার হয়ে নিজ নিজ দল নিয়ে রণক্ষেত্রে কাতারবদ্ধ হলেন।

দাহির তৎক্ষণাৎ সমস্ত শক্তি নিয়ে সেদিকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিল। এটি দেখে মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজের কাছে মাত্র কয়েকটি দল রেখে বাকি সমস্ত সৈন্য সেদিকে পাঠিয়ে দিলেন এবং পেছনে পেছনে নিজেও মওকাব বিন ওয়াসায়ুর সাথে ঝিল পার হয়ে রণক্ষেত্রে কদম রাখলেন। দেখতে দেখতে অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মত্ত হাতির পাল সামনে এলে মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাদের ঘিরে ফেলল এবং নয়টি হাতিকে জখম করে তাড়িয়ে দিল। এরপর মুসলমানরা কাফেরদের...

...ঠেলে ময়দানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিল। তবে সেদিন যুদ্ধের কোনো ফয়সালা হতে পারেনি। মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছিল এই যে, তাদের নায়েবে আমির মুহরিজ বিন সাবিত শহীদ হয়ে যান।

পরের দিন বৃহস্পতিবার ১০ রমজান ৯৩ হিজরিতে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। [১]

মুসলমানরা ফজরের নামাজ এমনভাবে আদায় করলেন যে লশকর পাঁচ সারিতে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথম সারিতে বনু আলিয়া, দ্বিতীয় সারিতে বনু তামীম, তৃতীয় সারিতে বনু বকর বিন ওয়ায়েল, চতুর্থ সারিতে আব্দুল কায়েস এবং পঞ্চম সারিতে বনু আজদ-এর জানবাজরা ছিলেন। ফরজ আদায় করার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম লশকরের উদ্দেশ্যে এভাবে ভাষণ দিলেন:

“হে আরববাসী! কাফেরদের বাহিনী যুদ্ধের জন্য আমাদের দিকে মুখ করেছে। তোমরা সাহসের সাথে কাজ করো। আল্লাহর সাহায্যে তাদের ওপর আক্রমণ করো। আমরা আল্লাহর শক্তির ওপর ভরসা করে তাদের তলোয়ারের খোরাক বানিয়ে দেব। তোমরা অবিচল থেকো। পেরেশান হয়ো না। নীরবতাকে নিজের অলঙ্কার বানাও। নিজ নিজ অবস্থানে অটল থেকে তা রক্ষা করো। কেউ যেন মূল বাহিনী (কলব) থেকে ডান পার্শ্বে এবং ডান পার্শ্ব থেকে বাম পার্শ্বে গিয়ে অন্যদের সাহায্যে লিপ্ত না হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়গায় এবং নিজ নিজ সারিতে অটল থাকো। আল্লাহ তাআলা পরহেজগারদের শেষ পরিণাম শুভ করেন। তোমরা সবসময় জিহ্বায় কালামুল্লাহর তিলাওয়াত জারি রেখো। ‘লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম’ পাঠ করতে থাকো। হে মুসলমানগণ! অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করো। আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য দুটি বিশেষ জিনিস পাঠিয়েছেন: এক, হুজুর (সা.)-এর ওপর দরুদ ও সালাম পাঠানো। দুই, গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করা। তোমাদের নিজেদের অন্তরকে মজবুত রাখা উচিত যাতে আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল তোমাদের শত্রুর ওপর বিজয়ী করেন।”

এই সময়ে বনু বকর বিন ওয়ায়েল এবং বনু তামীমের কিছু লোক এসে সংবাদ দিল:

“কাফের বাহিনী এক বিশাল বিপদের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে ফেলেছে, আনন্দ উদযাপন করছে এবং লড়াইয়ের জন্য তাড়াহুড়ো প্রদর্শন করছে।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম জবাবে বললেন: “হে বনু তামীমের প্রিয়জনেরা! শত্রু তোমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তাই তোমাদেরও পূর্ণ শক্তি ও প্রাণপণ চেষ্টার সাথে লড়াই করতে হবে।”

মুহাম্মদ বিন কাসিমের এই উদ্দীপনামূলক ভাষণ শেষ হলে সবার হৃদয়ে এক নতুন উদ্দীপনা জেগে উঠল। পাঁচ সারিতে...

[১] চচনা-নামায় এখানে তারিখ ১০ শনি (বৃহস্পতিবার) ১০ রমজান ৯৩ হিজরি উল্লেখ আছে এবং আজ পর্যন্ত সবাই এই তারিখই নকল করে আসছেন, কিন্তু এখানে সঠিক সাল হলো ৯৪ হিজরি। কারণ চচনা-নামা অনুযায়ী দেবল থেকে নিরুনের সফর ৯৩ হিজরির রজব মাসের শেষে হয়েছিল। এরপর নিরুন অবরোধ করা হয়। তারপর সিওয়ান এবং এরপর সিসাম অবরোধ করা হয়। এরপর পুনরায় নিরুনে আসা হয়। এরপর ইশবেহার অবরোধ করা হয়। এরপর লশকর পর্যায়ক্রমে জেওয়ার, রাওয়ার, বাহরুর, সাকর এবং এরপর ভাটে পৌঁছায়। এখানে পঞ্চাশ দিন অপেক্ষা করা হয়। এরপর নদী পার হওয়া হয়। এরপর বেত অবরোধ করা হয়।

যদি দাহিরের সাথে যুদ্ধ ১০ রমজান ৯৩ হিজরিতে হয়ে থাকে, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে যে এই সমস্ত অভিযান মাত্র চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়েছে, যা একেবারেই অসম্ভব। এতগুলো অভিযান তো দূরের কথা, শুধু সফরের জন্যই কয়েক মাস প্রয়োজন ছিল। যদি দাহিরের সাথে যুদ্ধকে ৯৪ হিজরিতে ধরা হয়, তবে বিষয়টি সঠিক হয়। ডক্টর আব্দুল আজিজ নালমের ক্যালেন্ডার সফটওয়্যার থেকেও এরই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে, কারণ তার মতে ১০ রমজান ৯৪ হিজরিতে বৃহস্পতিবার পড়েছিল, যেখানে ৯৩ হিজরিতে এই তারিখটি রবিবারে এসেছিল।

দাঁড়িয়ে থাকা নামাযীদের প্রত্যেকে একে অপরকে সাহস দিচ্ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম নতুন রণকৌশলে সৈন্যবাহিনীকে সারিবদ্ধ করলেন। ডান পার্শ্বের কমান্ড ছিল নুবাতা বিন হানযালার হাতে এবং বাম পার্শ্বের কমান্ড ছিল যাকওয়ান বিন আলওয়ানের হাতে। বনু আযদ-এর হুযায়ল বিন সুলায়মান এবং যিয়াদ বিন হাওয়ারীকে বাছাইকৃত সেনাদলসহ কাফিরদের মূল বাহিনীর (কেন্দ্রের) বিপরীতে মোতায়েন করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন মুসআব বিন আবদুর রহমান এবং খুরাইম বিন আমর সরাসরি রাজা দাহিরের বাহিনীর সামনে ছিলেন। অগ্রবর্তী দলের (হারায়েল) অফিসার ছিলেন সুলায়মান বিন নাবহান এবং আবু হাফসা কুশায়রী, যাদের অধীনে বনু কিনদাহর দুইশত মুক্ত করা যোদ্ধা গোলাম ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম তার বিশেষ অশ্বারোহীদের তিন ভাগে বিভক্ত করে বাহিনীর ডান পার্শ্ব, বাম পার্শ্ব এবং পশ্চাত্ত্বর্তী দলের সাথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। অগ্নিবাণ নিক্ষেপে পারদর্শী নয়শত সৈন্যও বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে তিনশত জনকে ডান পার্শ্ব, তিনশত জনকে বাম পার্শ্ব এবং তিনশত জনকে কেন্দ্রে দাঁড় করানো হয়েছিল। তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তারা তাদের মশালগুলো জ্বালিয়ে রাখে এবং অগ্নিবাণ প্রস্তুত রাখে। দেখতে দেখতেই সেই তীরন্দাজরা ধনুকে অগ্নিবাণ চড়িয়ে নিল।

এটি ছিল প্রচণ্ড গরমের মৌসুম এবং রমজান মাস। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় নিজেও রোজা রাখেননি এবং সাহাবীদেরও একই পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে শত্রুর মোকাবিলায় শক্তি অটুট থাকে। [১] ফলে সিন্ধুর এই চূড়ান্ত যুদ্ধেও অধিকাংশ মুসলমান রোজা অবস্থায় ছিলেন না এবং এই কারণেই মুহাম্মদ বিন কাসিম যুদ্ধের আগে বাহিনীর প্রতিটি কোণে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন: “মশকগুলো পানিতে পূর্ণ করে সারিতে সারিতে টহল দিতে থাকো।” সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন: “(যুদ্ধের সময়) কেউ যেন পানির খোঁজে নিজের জায়গা থেকে এদিক-ওদিক না সরে।”

এদিকে রাজা দাহিরও তার শক্তি আরও বৃদ্ধি করে আবির্ভূত হয়েছিল। আজ তার বর্মধারী অশ্বারোহীদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দশ হাজারে পৌঁছেছিল, যারা বাহিনীর মূল কেন্দ্র হিসেবে তার ছেলে জয়সিংহের অধীনে ছিল। ডান ও বাম পার্শ্ব সিন্ধুর বড় বড় ঠাকুর ও সর্দারদের বাহিনী ছিল। পেছনে ছিল হাতির দল। অত্যন্ত লড়াকু বাছাইকৃত সৈন্যদের বাহিনীর সামনের সারিতে রাখা হয়েছিল। হাতির দলগুলো জাহিনের অধীনে ছিল এবং তাদের দলগুলোকে ডান ও বাম উভয় পার্শ্বে বিভক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। দাহির নিজেও হাতির একটি দলের মাঝখানে আসীন ছিল।

যুদ্ধের শুরুতে উভয় পক্ষের অগ্রবর্তী দল একে অপরের দিকে অগ্রসর হলো। ইসলামী অগ্রবর্তী দলের অফিসার সুলায়মান বিন নাবহান এবং আবু হাফসা কুশায়রী তাদের দুইশত মুজাহিদ নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাফিরদের অগ্রবর্তী দল কিছুক্ষণ মোকাবিলার পর অনেক লাশ ফেলে রেখে পিছু হটে গেল। দাহির এটি দেখে অগ্রবর্তী দলকে নতুন সৈন্য সরবরাহ করল যারা পুনরায় আক্রমণ করল। এবার আবু হাফসা তাদের নাভিশ্বাস তুলে ছাড়লেন। দাহির তৃতীয়বার কিছু ঠাকুরকে পাঠাল কিন্তু আবু হাফসা তাদের এমন দাঁতভাঙা জবাব দিলেন যে তারা নিজেদের তাঁবু পর্যন্ত পালিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতায় চলতে থাকল এমনকি সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করল।

[১] সুনান আত-তিরমিযী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭০, আবওয়াবুস সাওম, বাব মা জাতা ফি কারাহিয়াতুস সাওম ফিস সাফার।

বিকেলের দিকে কিছু স্থানীয় সৈন্য দাহিরের সঙ্গ ত্যাগ করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের খিদমতে হাজির হলো এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করার পর পরামর্শ দিল যে, যদি একটি দল তাদের সাথে দেওয়া হয় তবে তারা দাহিরের বাহিনীর ওপর পেছন থেকে আক্রমণ করার জন্য পথপ্রদর্শন করতে পারে। মুহাম্মদ বিন কাসিম মারওয়ান বিন আশহাম এবং তামিম বিন জাইদের বাহিনীকে দুটি পতাকা দিয়ে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

এই জানবাজরা হঠাৎ গিয়ে কাফের বাহিনীর ওপর পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দাহিরের বাহিনীর মধ্যে এই হুলস্থুলে এক হাহাকার পড়ে গেল। যদিও পেছন থেকে আক্রমণকারী মুজাহিদদের সংখ্যা বেশি ছিল না, কিন্তু দাহির আতঙ্কিত হয়ে এক বিশাল সংখ্যা সৈন্যকে পাঠিয়ে দিল। এভাবে তার বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এটি দেখামাত্রই মুহাম্মদ বিন কাসিম হুঙ্কার দিয়ে বললেন:

“হে আরবের মুজাহিদগণ! শত্রু দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। আক্রমণ করো, আজ তোমাদের সংগ্রামের দিন।”

এদিকে রাজা দাহিরও তার শেষ পরিণতি কাছে দেখে নিয়েছিল। সে চারশ বর্মধারী দেহরক্ষীর বেষ্টনীতে তার সাদা হাতির ওপর সওয়ার হলো, যা শক্তি ও ভীতিকর দিক থেকে ছিল অতুলনীয় এবং যার সামনে কারও টিকে থাকা ছিল কঠিন। দাহিরের মাহুত হাতিটিকে মুসলমানদের ওপর চালিয়ে দিতে শুরু করল। সেই সাথে দাহিরের চারশ দেহরক্ষী তলোয়ার ও বর্শাগুলোকে পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে ঘোরাতে লাগল। দাহিরের দুই দাসী তার সাথে হাওদায় বসে ছিল। একজন তাকে পান খাওয়াচ্ছিল আর অন্যজন তাকে তীর এগিয়ে দিচ্ছিল। দাহিরের ধনুক ছিল অত্যন্ত শক্ত, যার ছিলা টানা সাধারণ সৈন্যদের সাধের বাইরে ছিল। তার কাছে দুই ধরনের তীর ছিল। এক প্রকার ছিল সুচালো যা শরীরকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে যেত। অন্যটি ছিল কাঁচির মতো দ্বিশাখা বিশিষ্ট যা ঘাড়কে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিত। তবে দাহিরের সবচেয়ে অদ্ভুত অস্ত্র ছিল ফাঁসের মতো একটি গোল চক্র যাতে আয়নার মতো উজ্জ্বল ছুরি লাগানো ছিল। যখন দাহিরের মাহুত হাতিটিকে মুসলমানদের ওপর চালিয়ে দিত, তখন দাহির সেই চক্রটি ঘোরাতে শুরু করত। যে মুজাহিদই হাতির ওপর আক্রমণ করার জন্য কাছে আসত, দাহির চক্রটি ছুড়ে তাকে নিজের দিকে টেনে নিত এবং তার শিরশ্ছেদ করে ফেলত। এভাবে দাহিরের হাতি এবং তার তুফানি বাহিনী মুসলমানদের জন্য বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল, যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে দাহিরের হাতিকে ভূপাতিত করা জরুরি ছিল।

এটি দেখে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বাহিনীর এক অত্যন্ত সাহসী ও অভিজ্ঞ সৈন্য “শুজা হাবশি” কসম খেল যে, সে দাহিরের হাতিকে আহত না করে দম নেবে না। সে তার কালো ঘোড়াকে ইশারা করল এবং সেটিকে দ্রুত ছুটিয়ে দাহিরের দিকে গেল। দাহিরের কোনো এক সঙ্গী তাকে সতর্ক করে বলল: “এই অশ্বারোহী আপনার ওপর আক্রমণ করতে আসছে।”

দাহির এটি শোনামাত্রই মাহুতকে নির্দেশ দিল হাতিটিকে তার ওপর চালিয়ে দিতে। এদিকে শুজা হাবশি তার ঘোড়াকে হাতির সামনে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু এই বিশালদেহী প্রাণীকে দেখে ঘোড়াটি ভয় পেয়ে পেছাতে লাগল। শুজা তৎক্ষণাৎ নিজের পাগড়ি খুলে ঘোড়ার চোখের ওপর বেঁধে দিল এবং পুনরায় ইশারা করে হাতির ওপর আক্রমণ করল। তার তলোয়ারের আঘাতে হাতির শঁড় জখম হলো, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দাহির তার ধনুকে দ্বিশাখা তীর চড়িয়ে ফেলেছিল। যখন সে ছিলা ছাড়ল, তখন কাঁচি সদৃশ তীরটি শুজার মাথা উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

মুসলমানরা যখন শুজার মস্তকহীন দেহ দেখল, তখন তারা উত্তেজিত হয়ে এক অত্যন্ত তীব্র ও প্রচণ্ড আক্রমণ করল। কিন্তু শত্রু অবিচল থেকে সেই আক্রমণ প্রতিহত করল এবং এরপর এমন জোরালো পাল্টা জবাব দিল যে মুসলমানদের কাতারগুলো এলোমেলো হতে লাগল। দাহিরের পিছু হটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া...

৭৬৭ তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা অংশ: ২

যারা পিছু হটেছিল তারাও ফিরে এল এবং এভাবে এই সম্মিলিত শক্তি এমন এক আক্রমণ করল যে মুসলমানদের পা টলে গেল। যুদ্ধের এটিই ছিল একমাত্র মুহূর্ত যখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপরও এক মুহূর্তের জন্য অস্থিরতা ছেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরের মুহূর্তেই ইসলামের এই মুজাহিদ নিজেকে সামলে নিয়ে বাহিনীকে হাঁক দিলেন: “হে আরবরা! কোথায় পালাচ্ছ? আমি মুহাম্মদ বিন কাসিম, তোমাদের আমি। আমি আমার জায়গায় উপস্থিত আছি।”

এই ডাক শুনে বিক্ষিপ্ত বাহিনী মুহাম্মদ বিন কাসিমের চারপাশে সমবেত হলো। মোকু বিন বাসায়া তার সৈন্যদের নিয়ে পদব্রজে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মুহাম্মদ বিন কাসিম বাহিনীর অফিসারদের নাম ধরে ধরে ডাকলেন এবং তারপর আওয়াজ দিলেন:

“বন্ধুরা! প্রিয়জনেরা! সশস্ত্র জোয়ানরা! তলোয়ারবাজরা! বর্শাধারীরা! তোমরা ইসলামের অবলম্বন। নিজেদের কাতার ঠিক করো। নিজ নিজ জায়গায় অটল থাকো। দৃষ্টিভঙ্গি করো না। সাহস বজায় রাখো।”

এখন মুসলমানরা আবারও সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করল এবং যুদ্ধ এমন তীব্রতার সাথে শুরু হলো যে পূর্ববর্তী সমস্ত লড়াই এর সামনে লীন হয়ে গেল। মাথার ফসল কাটা হচ্ছিল। তলোয়ার ও বর্শার আঘাত এত তীব্র ছিল যে আঘাতকারীদের হাতের চামড়া জ্বলে যাচ্ছিল। শত শত সৈন্যের অস্ত্র ভেঙে শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং জায়গায় জায়গায় লাথি ও ঘুষি দিয়ে লড়াই চলছিল। অবশেষে শত্রুদের সাহস ফুরিয়ে গেল এবং তাদের পা টলে গেল। তাদের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হলো এবং হাজার হাজার সৈন্য পলায়নের পথ বেছে নিল। তখন সূর্য হলুদ হয়ে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যার ছায়া দীর্ঘ হচ্ছিল। দাহিরের কাছে এখন মাত্র এক হাজার দেহরক্ষী সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, যাদের নিয়ে সে পিছু হটতে হটতে নিজের শিবিরের দিকে পালাল। কিন্তু কিছু মুসলিম সৈন্য আগেই তার শিবিরে পৌঁছে তার দাসীদের বন্দি করে ফেলেছিল। সন্ধ্যার আবছা আলো এবং যুদ্ধের ধূলিকণার কারণে দাহির বুঝতে পারল না যে শিবিরের কাছে টহলরতরা কারা। সে তাদের নিজের সৈন্য মনে করে চিৎকার করে বলল: “আমি এদিকে। আমার কাছে এসো।”

তার কণ্ঠস্বর বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হলো। জবাবে সে তার দাসীদের চিৎকার শুনতে পেল: “আমরা তোমার নারীরা। আমরা আরব বাহিনীর বন্দিতে আছি।” দাহির রাগে পাগল হয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল: “কে তোমাদের বন্দি করেছে? আমি তো এখনো জীবিত আছি!”

এ কথা বলে সে তার হাতিকে ঘুরাল এবং মুসলিম সৈন্যদের ওপর চড়িয়ে দেওয়ার জন্য সামনে বাড়াল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম এটি দেখে নাফতা নিক্ষেপকারীদের ডাকলেন: “হ্যাঁ, এখন এটি তোমাদের কাজের সময়।”

এক নাফতা নিক্ষেপকারী এটি শোনামাত্রই লক্ষ্যভেদ করে রাজা দাহিরের হাতির ওপর অগ্নিবাণ ছুড়ল। তীরটি হাতির হাওদায় গিয়ে লাগল এবং তাতে আগুন ধরে গেল। হাতিটি মাহুতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং হুদে ঢুকে বসে পড়ল। এই সময়ের মধ্যে দাহিরের কিছু দেহরক্ষী তার নিরাপত্তার জন্য হুদের তীরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং কিছু তার সাথে সাথে হুদে নেমে পড়েছিল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আরব অশ্বারোহীরা দ্রুতবেগে সেদিকে এল, যাদের দেখে তীরে দাঁড়িয়ে থাকা দাহিরের দেহরক্ষীরা পালিয়ে গেল। এদিকে দাহিরের হাতি রাওয়ার দুর্গের দিকে মুখ ফেরাল। এটি দেখে একজন দক্ষ লক্ষ্যভেদকারী তাক করে তীর ছুড়ল যা দাহিরের শরীরে বিঁধে গেল এবং সে জ্ঞান হারিয়ে হাতির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। হাতিটি ভয় পেয়ে ঘুরে গেল এবং হুদ থেকে বেরিয়ে এল। সে আতঙ্কের মধ্যে সামনে আসা...

প্রত্যেককে পিষ্ট করতে শুরু করল। দাহিরের অনেক দেহরক্ষী তার পায়ের নিচে পিষ্ট হলো এবং বাকিরা পালিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর দাহিরের জ্ঞান ফিরে এল। সে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য হাতি থেকে নেমে পড়ল। ওদিক থেকে একজন আরব আমার বিন খালিদ তার দেহরক্ষীদের বৃহৎ ভেদ করে সামনে এগিয়ে এল এবং তার ওপর তলোয়ারের এমন এক মারাত্মক আঘাত করল যে, তার মাথা কাঁধ পর্যন্ত দুই টুকরো হয়ে গেল। আমার বিন খালিদ নিজের এই বীরত্বপূর্ণ কাজে গর্ববোধ করে এই কবিতাগুলো আবৃত্তি করলেন, যা দাহিরের শিক্ষণীয় মৃত্যুর পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে:

الْخَيْلُ تَشْهَدُ يَوْمَ دَاهِرٍ وَالْقَنَا ... وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
إِنِّي فَرَجْتُ الْجَمْعَ غَيْرَ مُعَرِّدٍ ... حَتَّى عَلَوْتُ عَظِيمَهُمْ بِمَهْدٍ
فَرَّكَتُهُ تَحْتَ الْعَجَاجِ مُجَدَّلاً ... مُتَعَفِّرِ الْخُلْدَيْنِ غَيْرَ مُوسَدٍ

“অশ্বারোহীরাও সাক্ষী এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদও, যে দাহিরের সাথে যুদ্ধের দিনে আমি ভিড় চিরে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং তাদের বাদশাহর মাথার ওপর হিন্দুস্তানি তলোয়ার তুলে ধরেছিলাম; আমি তাকে ধূলিকণার আড়ালে এমনভাবে ফেলে এসেছি যে, সে কোনো বালিশ ছাড়াই ধুলো ও রক্তে পড়ে ছিল এবং তার গাল মাটিতে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল।” [১]

দাহিরের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার অবশিষ্ট সৈন্য ও দেহরক্ষীরাও পালিয়ে গেল। মুজাহিদগণ তাদের হত্যা করতে করতে রাওয়ার দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। দাহিরের লাশ সেখানেই পড়ে রইল। যুদ্ধক্ষেত্র খালি হওয়ার পর দাহিরের কিছু সঙ্গী যারা তার সাথে হুদে নেমে সেখানে লুকিয়ে ছিল, তারা বাইরে বেরিয়ে এল এবং তার লাশ হুদের তীরের কাদা ও জলাভূমিতে দাফন করে দিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজয়ের পর দাহিরকে খোঁজার নির্দেশ দিলেন। অবশেষে একজন ব্রাহ্মণ তার পরিবার-পরিজনের জন্য নিরাপত্তা চেয়ে সেই জায়গাটি দেখিয়ে দিল যেখানে দাহিরের লাশ লুকানো হয়েছিল। দাহিরের লাশ বের করে আনা হলো এবং তার পালকি থেকে গ্রেপ্তার হওয়া দুই দাসী তাকে চিনে নিল। দাহিরের মাথা কেটে বসরার হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

দাহিরের এক রানী ‘লাডি’ মুসলমানদের হাতে বন্দী হলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম তার অবস্থা লিখে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কাছে পাঠালেন এবং তাকে গ্রহণ করার অনুমতি চাইলেন। হাজ্জাজ খলিফা ওয়ালিদের কাছে জিজ্ঞেস করে অনুমতি দিলেন, যার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম তাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজের স্ত্রী বানিয়ে নিলেন। [২]

[১] আমার বিন খালিদের এই কবিতাগুলোর প্রেক্ষাপট হলো, বসরা থেকে সেনাবাহিনী রওনা হওয়ার সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে বলেছিলেন: “মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং তার সঙ্গীদের সাক্ষী রেখে এসো যে তুমি কী করবে? তুমি কি ভালো কিছু করতে পারবে নাকি পারবে না?” মনে হয় অতীতে আমার বিন খালিদের পারফরম্যান্স হাজ্জাজের ইচ্ছা অনুযায়ী ছিল না, তাই তাকে এই খোটা শুনতে হয়েছিল। তখন আমার বিন খালিদ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তিনি বড় কিছু করে দেখাবেন। তার এই দৃঢ় সংকল্পের ফল এই হলো যে, দাহির তারই হাতে নিহত হলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম তারই হাতে দাহিরের মাথা হাজ্জাজের দরবারে পাঠালেন। তিনি হাজ্জাজের দরবারে পৌঁছে বললেন: “আপনি কি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে আমার ওপর সাক্ষী বানিয়েছিলেন?” হাজ্জাজ বললেন: “হ্যাঁ, এখন বলো তুমি কী করেছ?” তখন আমার বিন খালিদ উল্লিখিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন। (ফাতহ নামা, পৃ. ১৮৪, ১৮৫)। ফুতুহুল বুলদানে ইবনে কালবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, দাহিরের মাথা কর্তনকারী মুজাহিদের নাম ছিল কাসিম বিন সালাবা এবং উল্লিখিত কবিতাগুলো তারই ছিল। কিন্তু এই উক্তিটি দুর্বল (মারজুহ) এবং ফাতহ নামার বর্ণনাটিই অগ্রগণ্য (রাজীহ), কারণ ফাতহ নামায় আমার বিন খালিদের ঘটনাটি যে বিস্তারিত বর্ণনার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, তার ইঙ্গিত খোদ উল্লিখিত কবিতাগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান।

[২] ফাতহ নামা, পৃ. ১৮৬, ১৩৪।

রাওয়ার বিজয়:

দাহিরের পরাজয়ের পর তার ছেলে জয়সিংহ তার ফুফু রানী মাইনের সাথে রাওয়ার দুর্গে অবস্থান গ্রহণ করেন। তবে তার উজির সাকর তাকে ব্রাহ্মণাবাদ চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। অবশেষে জয়সিংহ ব্রাহ্মণাবাদ চলে যান, আর রানী মাইন পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে রাওয়ায়ে অবস্থান করেন। কয়েকদিন পর মুহাম্মদ বিন কাসিম অগ্রসর হয়ে রাওয়ার দুর্গ অবরোধ করেন। এখন অবরোধ যুদ্ধ পূর্ণ তীব্রতার সাথে শুরু হলো। তবে মুসলমানদের ক্রমাগত অগ্নিবর্ষণ ও পাথর নিক্ষেপে দুর্গের বুরুজগুলো ধসে পড়ল। পরাজয় নিশ্চিত দেখে রানী মাইন আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন এবং সতীদাহ প্রথা অনুযায়ী নিজেকে পুড়িয়ে মারেন। অন্যদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম দুর্গ জয় করেন। এখানে ছয় হাজার যোদ্ধা ছিল যাদের হত্যা করা হয়। [১]

বহরুর ও দাহলিলা বিজয়:

এরপর ইসলামী লস্কর ব্রাহ্মণাবাদের দিকে অগ্রসর হলো। রাওয়ার ও ব্রাহ্মণাবাদের মাঝে “বহরুর” ও “দাহলিলা” নামক দুটি দুর্গ ছিল যাতে ষোলো হাজার যোদ্ধা অবস্থান করছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রথমে বহরুর জয় করেন এবং তারপর “দাহলিলা” অবরোধ করেন। দুই মাস পর্যন্ত এই দুর্গের অবরোধ চলতে থাকে। অবশেষে দাহলিলার রাজা প্রতিরোধে হতাশ হয়ে রাতে পালিয়ে যান।

ব্রাহ্মণাবাদে আক্রমণের আগে মুহাম্মদ বিন কাসিম চারদিকে পত্র পাঠিয়ে আনুগত্যের আহ্বান জানান এবং পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জয়সিংহের উজির সাকরও মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে চলে আসেন। তিনি সাথে সেই মুসলিম নারীদেরও নিয়ে আসেন যাদের সিন্ধি জলদস্যুরা লক্ষা (শ্রীলক্ষা) থেকে বসরা যাওয়ার পথে বন্দি করেছিল। সাকর বললেন: “এরাই সেই নারী যারা হাজ্জাজের নামে ফরিয়াদ করেছিল।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম এতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং সাকরকে নিজের বিশেষ পরামর্শদাতা বানিয়ে নেন।

এরপর মুহাম্মদ বিন কাসিম দাহলিলা থেকে ব্রাহ্মণাবাদের দিকে যাত্রা করেন এবং সাথে সাথে জয়সিংহকে আনুগত্যে রাজি করানোর জন্য একজন দূত পাঠান। কিন্তু জয়সিংহ পালিয়ে চোলিষ্টানের মরুভূমির শাসকদের কাছে সাহায্য চাইতে তাদের রাজধানী “ভামিয়া” চলে যান। অবশেষে ইসলামী লস্কর শহরের পূর্বে “নহর জালোয়ালি”র তীরে তাবু ফেলল। [২]

ব্রাহ্মণাবাদ:

ব্রাহ্মণাবাদ সিন্ধু সালতানাতের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ার কারণে সিন্ধুর হৃদপিণ্ড ছিল। এখানে চল্লিশ হাজার সিন্ধি সৈন্য উপস্থিত ছিল এবং প্রাচীরের মজবুতি ও উচ্চতার কারণে এখানে একটি দীর্ঘ যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল, তাই মুহাম্মদ বিন কাসিম...

[১] চচ নামা, পৃ. ১৯৫-১৯৩।

[২] চচ নামা, পৃ. ১৯৮ ও ২০১। ... জল মানে পানি। এই খালের নাম স্থানীয় উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়ে “জেরওয়ারি”, “বেঝর”, “জারি” এবং “জরাজি” হয়েছে। এই নামের একটি গ্রাম শাহদাদপুরের উত্তর-পূর্বে এখনও বিদ্যমান যার সাথে খালের চিহ্ন দেখা যায়। এই খালটি প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা ছিল যা চকরির কাছে সিন্ধু নদ থেকে বের হয়ে মনসুরার কাছে নদীর একটি শাখা ও খালের সাথে মিশে যেত।

পরিখা খনন করে নিজের শিবিরকে সুরক্ষিত করলেন এবং এরপর ১লা রজব ৯৫ হিজরিতে শহরের ওপর আক্রমণ শুরু করলেন। কিন্তু শহরটি ছয় মাস পর্যন্ত বিজিত হলো না। এই সময়ে জয়সিংহ চোলিস্তানের রাজার সাহায্যে মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী ও রসদপত্রের ওপর ক্রমাগত অতর্কিত হামলা চালাচ্ছিল, যার ফলে মুসলমানরা চরম কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছিল। অবশেষে মুহাম্মদ বিন কাসিম মোকো বিন ওয়াসায়োর কাছে দূত পাঠিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন এবং সমাধানের পথ জানতে চাইলেন। মোকো বললেন: “জয়সিংহের আস্তানা খুব বেশি দূরে নয়। আর তার ওপর আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।”

এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম নুবাতা বিন হানজালার নেতৃত্বে কয়েকটি দল প্রস্তুত করলেন এবং তাদের জয়সিংহের পশ্চাদ্ধাবনে পাঠালেন। মোকো বিন ওয়াসায়ো এই দলগুলোর পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছিলেন। জয়সিংহ যখন এই খবর পেলেন, তখন তিনি পরিবার-পরিজনসহ মরুভূমি পাড়ি দিয়ে “চিতোর”-এ চলে গেলেন। [১] সেই সাথে তিনি তার ভাই গোপীকে, যিনি “আরোর”-এ ছিলেন, বার্তা পাঠালেন যেন তিনি “আরোর”-এর পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

ব্রাহ্মণাবাদের অবরোধ এই সময়ে পূর্ণ তীব্রতার সাথে চলতে থাকে। অবশেষে ছয় মাস পর শহরবাসীর মধ্যে আর প্রতিরোধের শক্তি অবশিষ্ট রইল না। এদিকে শহরের চারজন বড় ব্যবসায়ী পরামর্শ করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে বার্তা পাঠালেন যে, আগামীকালের যুদ্ধে তারা শহরের “জারিতরি” নামক দরজার দিকে পিছু হটবেন এবং সেটি খোলা রেখে দেবেন। মুসলমানরা সেখান থেকে আক্রমণ করে শহর জয় করে নেবে। এর বিনিময়ে ওই ব্যবসায়ীরা তাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলেন।

অবশেষে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরের দিন যুদ্ধ শুরু হলে শহরবাসীরা কিছুক্ষণ লড়াই করার পর ওই দরজার দিকে পিছু হটে এবং সেটি খোলা রেখে যায়। এভাবে মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করে শহর দখল করে নেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম আবারও মহানুভবতার পরিচয় দিলেন এবং সশস্ত্র ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে বাকি সকল সাধারণ নাগরিককে নিরাপত্তা প্রদান করলেন, তবে ছয় হাজার সৈন্য নিহত হলো। এছাড়া সাধারণ সশস্ত্র লোকদের গ্রেপ্তার করে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে আনা হতো। তাদের মধ্যে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করত, মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের মুক্তি দিতেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম এখানকার অধিবাসীদের সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করলেন। তাদের ওপর সামান্য জিজিয়া ধার্য করলেন। পূর্বতন ব্রাহ্মণ কর্মকর্তাদের তাদের পদে বহাল রাখলেন এবং তাদের নির্দেশ দিলেন:

“সরকার এবং স্রষ্টার মাঝে সত্যনিষ্ঠার খেয়াল রাখবে। প্রত্যেকের ওপর তার সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য করবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। যার কোনো আবেদন পেশ করার থাকে সে তা পেশ করবে, তা শোনা হবে এবং তার পূর্ণ জবাব দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের ইচ্ছা পূরণ করা হবে।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর মানুষের ধর্মীয় রীতিনীতি ও ইবাদতে কোনো হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়েছে, তাদের নিজের মুসলমান ভাই হিসেবে গণ্য করেছেন। যারা তাদের পৈতৃক ধর্মে অটল ছিল, তাদের ওপরও কোনো জোর-জবরদস্তি করা হয়নি, বরং তাদের সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সালতানাতের উজির সি সাগর-এর সাথে পরামর্শ করে সিন্ধুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত করার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করলেন। সমস্ত

[১] সম্ভবত এর দ্বারা মূলতানের পার্শ্ববর্তী জনপদ চিতোরগড়কে বোঝানো হয়েছে যা একসময় একটি শহর ছিল। এটিও সম্ভব যে এটি রাজপুতানার কোনো শহর।

শহরগুলোতে তিনি তাঁর সেরা কর্মকর্তাদের আমিল (গভর্নর) নিযুক্ত করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হলো।

অরোর বিজয়

এই সময়ে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের একটি পত্র পাওয়া গেল যাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণাবাদে অবস্থানের পরিবর্তে অরোর এবং মুলতানের ওপর আক্রমণ করা হোক। এও বলা হয়েছিল যে, হিন্দুস্তান থেকে চীন পর্যন্ত সমস্ত এলাকা জয় করা তোমার ওপর আবশ্যিক।

অবশেষে ইসলামী লস্কর আবারও যাত্রা শুরু করল এবং ‘সাওয়ান্দারি’ পৌঁছে ‘ডুকার ভার’ হ্রদের তীরে অবস্থান নিল। [২] এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা বাস করত যারা আনুগত্য প্রকাশ করল।

ইসলামী লস্কর যখন ‘সাম্মুন’ এলাকা দিয়ে অতিক্রম করছিল, তখন তারা ঢোল-তবলা বাজিয়ে অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। [৩]

এরপর লস্কর ‘ভারু’ [৪] এবং ‘লোহানা’ [৫] হয়ে ‘সেহওয়ান’ পৌঁছাল।

এভাবে মঞ্জিল দর মঞ্জিল অতিক্রম করে ইসলামী লস্কর স্থানীয় পথপ্রদর্শকদের সহযোগিতায় সিন্ধু সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর ‘অরোর’-এর কাছে পৌঁছে গেল, যেখানে দাহিরের পুত্র গোপী অবরুদ্ধ ছিল। সে তখনও তার সৈন্যদের সাহস জোগানোর জন্য এই বিশ্বাস দিচ্ছিল যে, রাজা দাহির জীবিত আছেন। তার বক্তব্য ছিল: “রাজা হিন্দুস্তান থেকে নতুন সৈন্য আনতে গিয়েছেন যাতে তাদের সাহায্যে আরবদের মোকাবিলা করা যায়।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম ‘অরোর’ থেকে এক মাইল দূরে তাঁবু স্থাপন করলেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে প্রতি জুমায় তাতে খুতবা দেওয়ার নিয়ম চালু করলেন। এক মাস প্রস্তুতির পর ইসলামী লস্কর অরোর আক্রমণ শুরু করল। অরোরে বিভ্রান্ত সৈন্যরা প্রাচীরের ওপর উঠে মুসলমানদের মোকাবিলা করতে লাগল। সেই সাথে তারা চিৎকার করে বলছিল:

“দাহির সাহায্য নিয়ে আসছে। হাতির এক বিশাল বাহিনী তোমাদের পেছন থেকে আসবে এবং আমরা সামনে থেকে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করব। নিজেদের ওপর দয়া করো এবং পালিয়ে যাও।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম আন্দাজ করলেন যে, শহরবাসী ভুল ধারণায় নিমজ্জিত থাকার কারণে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে। তাই তিনি রানী লাডিকে সেই কালো উটের ওপর সওয়ার করালেন যেটিতে তিনি দাহিরের সাথে যুদ্ধের সময় সওয়ার ছিলেন। এরপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি দলের নিরাপত্তায় রানী লাডিকে প্রাচীরের দিকে পাঠালেন। রানী প্রাচীরের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন:

“হে কেল্লাবাসী! তোমাদের মঙ্গলের একটি কথা আছে। তোমরা সামনে এসো তবেই বলব।”

[১] তারিখ, পৃ. ৩০২-৩৫৪।

[২] ‘সাওয়ান্দারি’ এখন ‘সাওড়ি’ নামক একটি গ্রাম। এর থেকে দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পুরনো ‘সাওয়ান্দারি’-র ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই স্থানটি জেলা নবাবশাহ-তে স্টেশন ‘দৌড়’ এবং ‘দৌলতপুর’-এর মাঝে অবস্থিত।

[৩] সাম্মাহ এবং লাখাহ, সাম্মুন এবং লাখাদের বসতি এখনও সিন্ধু নদের এই অঞ্চলের আশেপাশে রয়েছে। সিন্ধু নদ এখানে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হতো। দক্ষিণ দিকের এলাকাগুলোতে এবং লাখাহ শাহদাদপুর তালুকার এলাকাগুলোতে তারা বসতি স্থাপন করে আসছে।

[৪] এই স্থানটি সম্ভবত বর্তমান ‘ভারিয়া’ বা ‘ভালানি’।

[৫] মুসলমানদের আগমনের সময় লোহানা সিন্ধু সাম্রাজ্যের একটি বিশাল প্রদেশ ছিল যা শাহদাদপুর, মানসুরা এবং ‘হালা’-কে পরিবেষ্টন করে ছিল।

আরোরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি দল এটি শুনে এগিয়ে এল। রানী এখন নেকাব সরিয়ে নিজের মুখ দেখালেন এবং বললেন:

“আমি দাহিরের রানী লাডি। দাহির নিহত হয়েছে এবং তার মাথা ইরাকে ও মুকুট রাজধানী (দামেস্ক)-এ পাঠানো হয়েছে।”

কিন্তু আরোরের গণ্যমান্যরা এই কথা বিশ্বাস করল না এবং বলল:

“তুমিও এই গরু-খোর চণ্ডালদের সাথে মিশে গেছ এবং এখন আরবদের শাসনকে প্রাধান্য দিচ্ছ।”

তবে দাহিরের মৃত্যু এমন এক বাস্তবতা ছিল যা বেশিদিন গোপন থাকতে পারেনি। আরোরে এক জাদুকরী বাস করত, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেও দাহিরের মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করল। অবশেষে শহরের নীতিনির্ধারকরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন: “আমরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের ন্যায়বিচার, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং কথার সত্যতা সম্পর্কে শুনেছি এবং এখন নিজের চোখেও দেখছি। এটাই উত্তম যে, নিরাপত্তার শর্তে শহরের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হোক।”

কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই গোপী তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাতারাতি পালিয়ে তার ভাই জয়সিংহের কাছে ‘চিতোর’-এ চলে গেল। দাহিরের আরেক ছেলে ‘ওয়াকায়ো’-ও সেখানেই ছিল।

মুসলমানদেরকে গোপীর পলায়নের খবর আঞ্চলিক পরিবারের এক ব্যক্তি দিয়েছিল যে আরোরে বসবাস করত। সে একটি তীরের সাথে তথ্য সম্বলিত চিরকুট বেঁধে তা মুসলমানদের লশকরে নিক্ষেপ করল। এই খবর পাওয়া মাত্রই মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রাচীরের ওপর এক জোরালো আক্রমণ করলেন। শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল, যা মুহাম্মদ বিন কাসিম এই শর্তে কবুল করলেন যে, এখনই আরোরের সৈন্যরা প্রাচীর থেকে নেমে যাবে। শহরবাসী অবিলম্বে প্রাচীর খালি করে দিল এবং দরজাগুলো খুলে দিল। [১] শহরবাসী এই শর্তে আত্মসমর্পণ করল যে, বুদ্ধের উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করা হবে না। মুহাম্মদ বিন কাসিম আলেমদের সাথে পরামর্শ করে উপাসনালয়টিকে গির্জা ও অগ্নি-উপাসনালয়ের হুকুমে গণ্য করলেন এবং তা বহাল রাখলেন। [২]

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং পূজারি:

শহরে একটি বিখ্যাত মূর্তিশালা ছিল যাকে ‘নওবাহার’ বলা হতো, তাতে এক অশ্বারোহীর মূর্তি ছিল যার পূজা করা হতো। অশ্বারোহীর হাতে সোনার দুটি কঙ্কণ ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম সেই মূর্তিশালায় গিয়ে মূর্তির এক হাত থেকে একটি কঙ্কণ খুলে নিলেন এবং তারপর পূজারিকে ডেকে বললেন: “তোমার মূর্তি কি এটাই?”

পূজারি বলল: “জি হ্যাঁ। কিন্তু এর হাতে দুটি কঙ্কণ ছিল। একটি কঙ্কণ দেখা যাচ্ছে না কেন?”

মুহাম্মদ বিন কাসিম বললেন: “তোমার মাবুদের এতটুকুও খবর নেই যে তার কঙ্কণ কার কাছে আছে?”

পূজারি লজ্জায় মাথা নত করল। মুহাম্মদ বিন কাসিম হেসে কঙ্কণটি তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

[৩]

[১] চচ নামা: ২২৬-২২৭

[২] ফুতুহুল বুলদান পৃ. ৪৩৩

[৩] চচ নামা পৃ. ২২৯

প্রতারক ব্রাহ্মণের সাথে প্রতিশ্রুতি রক্ষা

মুহাম্মদ বিন কাসিমের ইচ্ছা ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফের তাকিদ অনুযায়ী আরোরের সমস্ত সশস্ত্র ব্যক্তিদের হত্যা করা হোক। যাদের হত্যা করার কথা ছিল তাদের মধ্য থেকে একজন ব্রাহ্মণ সামনে এগিয়ে এসে বলল: “যদি পরিবার-পরিজনসহ আমার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমি একটি বিস্ময়কর বস্তু পেশ করব।” মুহাম্মদ বিন কাসিম ধারণা করলেন যে তার কাছে কোনো লুকানো ধনভাণ্ডার আছে। ফলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ লিখিত অভয়পত্রের (আমান নামা) জন্য জেদ ধরল। সেটিও লিখে দেওয়া হলো। এরপর সেই বিস্ময়কর বস্তু চাওয়া হলে সে নিজের দাড়িতে হাত দিয়ে চুলের জটগুলো খুলে দিল। দাড়ি তার পা স্পর্শ করতে লাগল। ব্রাহ্মণ দাড়ির প্রান্ত নিজের পায়ের আঙুলের সাথে বেঁধে নাচতে নাচতে বলতে লাগল: “আজ পর্যন্ত কেউ এমন বিস্ময়কর বস্তু দেখেনি।”

ব্রাহ্মণের এই প্রতারণায় মুসলমানরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলো। প্রায় এমন অবস্থা হয়েছিল যে সৈন্যরা তাকে হত্যা করে ফেলত কিন্তু মুহাম্মদ বিন কাসিম নিষেধ করে বললেন: “কথা কথাই এবং প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই। প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে যাওয়া বড় মানুষদের কাজ নয়।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম সাময়িকভাবে ব্রাহ্মণকে বন্দি করলেন এবং চিঠির মাধ্যমে এই বিষয়টি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে পেশ করলেন। হাজ্জাজ এ বিষয়ে কুফা ও বসরার আলেমদের পরামর্শ নিলেন এবং খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককেও ঘটনাটি লিখে পাঠালেন। অবশেষে আলেমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীদের কর্মপদ্ধতি থেকে দলিল পেশ করে সর্বসম্মতভাবে এই উত্তর দিলেন যে, ব্রাহ্মণ এবং তার সংশ্লিষ্টদের জন্য নিরাপত্তা (আমান) সাব্যস্ত হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে মুহাম্মদ বিন কাসিম ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে দিলেন। [১]

আরোরবাসীদের ওপর দয়া

অন্যান্য লোক যাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তারা নিহত হতে যাচ্ছিল কিন্তু রানী লাডি তাদের জন্য সুপারিশ করলেন। এর ওপর মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদেরও নিরাপত্তা দিয়ে বললেন: “এটি রানী লাডির নির্দেশ।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম কিছু দিন আরোরে অতিবাহিত করলেন এবং সেই সাথে “বাগরার” (ভাক্কার) এর ব্যবস্থাপনাও ঠিক করলেন। এরপর আরোরের শাসনভার বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত আহনাফ বিন কায়েস-এর নাতি “রাওয়াহ বিন আসাদ”-এর হাতে অর্পণ করলেন এবং মুসা বিন ইয়াকুব তায়ীকে জেলার কাজী ও জামে মসজিদের খতিব নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন: “প্রজাদের মন জয় করা আবশ্যিক মনে করতে হবে তবে সৎকাজের আদেশ এবং গুনাহ থেকে বিরত রাখার দায়িত্বও যেন হাতছাড়া না হয়।”

আমির ও কাজীকে জনগণের সাথে ভালো আচরণের নির্দেশ দেওয়ার পর মুহাম্মদ বিন কাসিম মূলতানের দিকে যাত্রা করলেন। [২]

[১] চচ নামা, পৃ. ২২৭, ২২৮। দ্রষ্টব্য: আরোরকে “রোর”ও বলা হতো। আরবরা একে “রুর” বলত এবং কেউ কেউ লাম-তারিফ (নির্দিষ্টকারী অব্যয়) যোগ করে একে “আল-রুর” বলেছে এবং কেউ কেউ একে “আলওয়ার” লিখেছে যার কারণে কেউ কেউ একে ভারতের শহর “আলওয়ার” মনে করে নিয়েছে। অথচ এটি ছিল সিন্ধুর রাজধানী যার ধ্বংসাবশেষ রোহরি থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সিন্ধু নদের একটি শাখা “নারাদওয়াহ”-এর পশ্চিম তীরে এখনও বিদ্যমান এবং সেখানে এখনও আরোর নামক গ্রাম আবাদ আছে। রোহরি থেকে এই ধ্বংসাবশেষের দূরত্ব এগারো কিলোমিটার।

[২] চচ নামা, পৃ. ২৩৪, ২৩৫।

ভাহলিয়ার বিজয়:

ইসলামের লশকর প্রথমে বিয়াস নদীর দক্ষিণে অবস্থিত “ভাহলিয়া” দুর্গে পৌঁছায়, যেখানে দাহিরের চাচাতো ভাই কাসকো বিন চন্দর শাসন করত। [১] কাসকো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিল। সে ইসলামের লশকরের আগমনে আনুগত্য প্রকাশ করে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিম তার গুণাবলী দেখে তাকে নিজের উপদেষ্টা বানিয়ে নেন। [২]

আসকান্দার বিজয়:

এরপর ইসলামী লশকরের অগ্রবর্তী দল জাইদাহ বিন উমাইর তায়ী এবং কাসকোর নেতৃত্বে বিয়াস (শতদ্র) নদী পার হয়ে আসকান্দা (উচ) দুর্গে আক্রমণ করে, যেখানে রাজা মথুরার শাসন ছিল। এখানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে এবং লাশের স্তুপ জমে যায়। অবশেষে জোহরের সময় মুসলমানরা নারায়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে। মুশরিকরা এর মোকাবিলা করতে না পেরে পিছু হটে দুর্গে আত্মগোপন করে। সাত দিন ধরে অপরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলতে থাকে। উভয় পক্ষ তীরের বৃষ্টি এবং মানজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ করতে থাকে। অবশেষে রাজা মথুরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে মুলতানের নিকটবর্তী দুর্গ “সিক্কা”-তে আশ্রয় নেয়। তার পালিয়ে যাওয়ায় শহরবাসীর সাহস ভেঙে যায় এবং তারা আত্মসমর্পণ করে। মুহাম্মদ বিন কাসিম চার হাজার যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করান এবং বাকি সব মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। তিনি উতবা বিন সালামা তামিমিকে শহরের শাসক নিযুক্ত করে “সিক্কা”-র দিকে অগ্রসর হন, যা রাভি নদীর দক্ষিণে একটি বিশাল দুর্গ ছিল। [৩]

সিক্কার বিজয় ও ধ্বংস:

সিক্কায় রাজা মথুরার শাসন ছিল, এবং উচ-এর পলাতক শাসক মথুরাও এখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলামী লশকর এখানে পৌঁছামাত্রই তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সতেরো দিন পর্যন্ত দুর্গবাসীরা অত্যন্ত তীব্রতার সাথে প্রতিরোধ করতে থাকে। ইসলামী লশকরের দুইশত পনেরো জন সৈন্য শহীদ হন, যাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিশ জন শ্রেষ্ঠ অফিসারও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের শাহাদাতে এতটাই ব্যথিত হন যে, এই দুর্গটি মসমার (ধ্বংস) করে দেওয়ার শপথ করেন। অবশেষে দুর্গটি বিজিত হয় এবং তা ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হয়। রাজা মথুরা পালিয়ে মুলতানে চলে যায়। [৪]

মুলতানের বিজয়:

কয়েক দিন পর ইসলামী বাহিনীও রাভি নদী পার হয়ে “মুলতান”-এর সামনে পৌঁছায়, যেখানে দাহিরের দ্বিতীয় চাচাতো ভাই...

[১] এখানে বিয়াস নদী বলতে শতদ্র নদীকে বোঝানো হয়েছে। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিকরা শতদ্র নদীকে “বিয়াস” বলতেন। ভাহলিয়া দুর্গ বলতে সম্ভবত দারাওয়ার দুর্গ বোঝানো হয়েছে, যা বাহাওয়ালপুর থেকে কিছু দূরে চোলিস্তান মরুভূমির পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

[২] চচ নামা, পৃ. ২৩৫, ২৩৬।

[৩] চচ নামা, পৃ. ২৪১ থেকে ২৪৩। ফুতুহুল বুলদান-এ সিক্কাকে “বিয়াস” নদীর তীরে বলা হয়েছে যা সঠিক নয়।

[৪] চচ নামা, পৃ. ২৪৭। মুলতানের আশেপাশে সিক্কা নামক কোনো জনপদ, দুর্গ বা এর ধ্বংসাবশেষের কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। সম্ভবত মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর এটি আর কেউ পুনর্নির্মাণ করেনি, তাই তৃতীয় হিজরি শতকের আল্লামা বালাজুরি-র এই উক্তিটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে: “ওয়াস সিক্কাতুল ইয়াওমা খারাব” (ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৪৩)।

গোর সিং বিন চন্দরের শাসন ছিল। [১]

মুসলমানরা সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মুলতানের সেনাপতি কুভারায় এবং রাজা চচের ভাতিজা মোকাবিলায় বেরিয়ে এল। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড তীর নিক্ষেপের লড়াই চলল কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে পারল না। দ্বিতীয় দিন আবার একইভাবে লাশের স্তুপ জমে গেল। এরপর মুলতানের বাহিনী দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে থাকল। দুই মাস পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত রইল। দুর্গবাসীরা মানজানিক থেকে পাথর এবং বড় ধনুক থেকে তীর বর্ষণ করতে থাকল। তবে এদিকে শহরবাসীর প্রতিরোধের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শহরের শাসক গোর সিং এই পরিস্থিতি দেখে পালিয়ে কাশ্মীরে চলে গেল।

অন্যদিকে ইসলামী লশকর খাদ্যের তীব্র সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সৈন্যরা সওয়ারি ও মালবাহী পশু জবাই করে খেতে বাধ্য হয়েছিল। তবে আল্লাহর গায়েবি সাহায্য নাজিল হলো এবং গোর সিং-এর পলায়নের পরের দিন শহর থেকে এক ব্যক্তি এসে গোপনে মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে দেখা করল এবং তথ্য দিল যে, নদীর তীরে দুর্গের উত্তর দিকের প্রাচীরের একটি স্থান দুর্বল যেখানে সুড়ঙ্গ তৈরি করা সম্ভব। মুহাম্মদ বিন কাসিম এটি শোনামাত্রই সুড়ঙ্গ খননকারীদের সেখানে খননের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে তিন দিন পর সেখান থেকে দুর্গের প্রাচীর ধসে পড়ল এবং ইসলামী লশকর ভেতরে প্রবেশ করে শহর দখল করে নিল। ছয় হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করা হলো এবং বাকিদের নিরাপত্তা দেওয়া হলো। [২]

এই সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিম্নোক্ত পত্রটি পেলেন:

“তোমার লশকর অভিযানের সময় আমি খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিককে জামানত দিয়েছিলাম যে, লশকর অভিযানের সমস্ত ব্যয়ের দ্বিগুণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমার মোট ব্যয়ে ষাট হাজার দিরহাম খরচ হয়েছে। তোমার দায়িত্ব হলো এক লক্ষ বিশ হাজার দিরহাম খেলাফতের রাজধানীতে পাঠানো। সমস্ত প্রাচীন জনপদ এবং বিখ্যাত শহর বা জনপদগুলোতে মসজিদ ও মিন্বর নির্মাণ করাও এবং খলিফার নামে খুতবা ও মুদ্রা জারি করো।” [৩]

মূর্তিপূজার ঘরের ধনভাণ্ডার:

সেই দিনই এক ব্রাহ্মণ এসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের কাছে আরজ করল:

“আমি আপনাকে একটি গোপন কথা বলছি। কোনো এক সময়ে কাশ্মীরের রাজাদের বংশের এক রাজা ‘জোহান’ এখানকার শাসক ছিলেন। তিনি শহরের পূর্ব দিকে একশ বর্গগজ আয়তনের একটি জলাশয় তৈরি করে তার মাঝে পঞ্চাশ বর্গগজ আয়তনের একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং সেখানে লাল স্বর্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং জলাশয়ের চারদিকে ঘন গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি মুলতানের মুরব্বিদের কাছে শুনেছি যে, এই মূর্তির নিচে একটি গোপন ভূগর্ভস্থ কক্ষ রয়েছে যাতে রাজা জোহান তার সমস্ত সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। সেই সম্পদ আমার চল্লিশটি কলসিতে ছিল এবং প্রতিটি কলসিতে তিনশ মণ স্বর্ণ ছিল।”

[১] এতে জানা যায় যে, সেই সময়ে রাভি নদী মুলতানের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হতো। অথচ এখন পশ্চিমে। ফুতুহুল বুলদান-এ এই নদীর নাম ‘বিয়াস’ বলা হয়েছে যা সঠিক নয়।

[২] চচ নামা, পৃষ্ঠা ২৩৭, ২৩৮

[৩] চচ নামা, পৃষ্ঠা ২৪০

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর অফিসারদের সাথে নিয়ে এই মন্দিরে যান যাকে “মনসুরভী মন্দির” বলা হতো। মুহাম্মদ বিন কাসিম ভেতরে প্রবেশ করতেই তাঁর নজরে এমন এক মূর্তি পড়ল যার চোখে ইয়াকুত পাথর বসানো ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম ধারণা করলেন যে এটি কোনো বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং তিনি তলোয়ার বের করে নিলেন। মন্দিরের পুজারি বলল:

“হে আমির! এটি একটি মূর্তি যা রাজা জোবিন তৈরি করিয়েছিলেন।”

মুহাম্মদ বিন কাসিম এই মূর্তিটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সেখান থেকে ধনভাণ্ডার উদ্ধার করলেন। চল্লিশটি কলস ছাড়াও দুইশ মণ সোনা পাওয়া গেল। এটি মোট তেরো হাজার মণ সোনা ছিল। এভাবে রাজধানী অভিমুখে ব্যয়ের চেয়েও দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল। [১]

উল্লিখিত বর্ণনাটি চচনামা-র। অন্যদিকে আল্লামা বালাজুরি বর্ণনা করেন যে, সিন্ধু অভিযানে উমাইয়া রাষ্ট্র ছয় কোটি দিরহাম ব্যয় করেছিল। যখন রাজা দাহিরের মন্তকসহ গনিমতের মাল হাজ্জাজের সামনে রাখা হলো, তখন তিনি গনিমতের মাল গণনা করালেন এবং তা বারো কোটি দিরহামের সমান হলো। হাজ্জাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন:

“আমরা আমাদের প্রতিশোধও নিয়েছি এবং দাহিরের মন্তকও। আর আমরা যা ব্যয় করেছি, আল্লাহ আমাদের তার দ্বিগুণ দান করেছেন।” [২]

বালাজুরির বর্ণনাটিই অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ এত বড় অভিযানের জন্য মাত্র ষাট হাজার দিরহাম অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ। ষাট হাজার দিরহামে তো লস্করের সওয়ারি এবং মালবাহী পশুদের মূল্যও পরিশোধ করা সম্ভব নয়, কারণ সেই যুগে একটি ঘোড়া বা উটের দাম একশ দিরহাম পর্যন্ত হতো। একইভাবে এত বেশি সোনার দামও অবশ্যই এক লাখ দিরহামের চেয়ে অনেক বেশি হবে, বরং তা কয়েক কোটি দিরহামের সমান হওয়া উচিত। এটি নিশ্চিতভাবেই যুক্তিবিরুদ্ধ।

আল্লামা বালাজুরি লেখেন যে, এই পরিমাণ গনিমতের মালের কারণে মুলতানকে “ফারাজ বাইত আল-জাহাব” (স্বর্ণগৃহের সীমান্ত) বলা হতে লাগল। [৩]

মুলতানের ব্যবস্থাপনা:

মুলতান বিজয়ের পর দাহিরের পরিবারের শক্তি পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে গেল। অন্যদিকে মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত এলাকাগুলোর উন্নত ব্যবস্থাপনার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে মুলতানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করালেন এবং দাউদ বিন নাসরকে সেখানকার শাসক নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে মুলতানের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোও বিজিত হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য ইকরামা বিন রেহানকে নিযুক্ত করা হলো। আহমদ বিন খুজাইমা মাদানিকে কারুর (কাহরোর পাঞ্চা) এবং “আশহার”-এর কেব্লা অর্পণ করা হলো। এই সময়ে উত্তর পাঞ্জাব পর্যন্ত ইসলামি বাহিনীর অভিযান অব্যাহত ছিল এবং বিলাম নদীর তীর পর্যন্ত সমস্ত এলাকা মুসলমানদের দখলে চলে এসেছিল। [৪]

[১] চচনামা, পৃ. ২৩৯।

[২] ফুতুহ আল-বুলদান, পৃ. ৪৩৩।

[৩] ফুতুহ আল-বুলদান, পৃ. ৪৩৩।

[৪] এই বিশাল এলাকায় কোনো যুদ্ধের কথা কোনো ইতিহাসে উল্লেখ নেই, যা থেকে বোঝা যায় যে এই উত্তর পাঞ্জাবের পুরো এলাকাটি “শান্তিপূর্ণভাবে” বিজিত হয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেই যুগে মুলতানের এলাকাকে “কাশ্মীর” বা “আলাকিয়া” বলা হতো। সেই যুগে কাশ্মীর ছিল অত্যন্ত বিশাল এলাকা যার সীমানা বিলাম নদীর ওপার থেকে শুরু হতো। অর্থাৎ পোঠোহারও কাশ্মীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুহাম্মদ বিন কাসিম উচ্চ পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপনার জন্য একজন যোগ্য অফিসার খুরাইম বিন আব্দুল মালিক তামীমীকে ব্রহ্ম রাজ্যের ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত “সোপুর” দুর্গে নিযুক্ত করেন। [১] এভাবে শুধু মুলতান নয় বরং পুরো পাঞ্জাবে ইসলামের পতাকা উড়তে শুরু করে।

নতুন ফ্রন্ট:

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সামনে এখন চারটি ফ্রন্ট ছিল:

- মধ্য ভারতের “কনৌজ” রাজ্য: যার সীমানা ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে মিলিত ছিল এবং এখন তা ইসলামের মুজাহিদদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।
- কাশ্মীর: যেখানে দাহিরের কিছু ছেলে আশ্রয় নিয়েছিল।
- কচ্ছের কিছু রাজ্য: যেখান থেকে দাহিরের পরিবার সাহায্য পাচ্ছিল।
- গুজরাটের কীরাজ (কীথরা) রাজ্য: যেখানে রাজা দাহিরের উত্তরসূরি জয় সিংহ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কাশ্মীর সফর:

মুহাম্মদ বিন কাসিম কেন প্রথমে কাশ্মীরের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলেন? কারণ চচনামা অনুযায়ী হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নতুন নির্দেশনা সিন্ধু বিজয়ী বাহিনীকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য দিয়েছিল। এটা স্পষ্ট যে এই পথ কাশ্মীর হয়ে যেত। তবে মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সফরে কাশ্মীরের সীমানা অতিক্রম করেন এবং “পাঞ্জ নাহিয়াত” (শাজ নাহিয়াত) নামক স্থানে সিন্ধু সালতানাত এবং কাশ্মীর রাজ্যের মধ্যকার সীমানা নিশ্চিত ও নবায়ন করার ওপরই সম্ভ্রষ্ট থাকেন। দাহিরের পিতা চচ কয়েক দশক আগে এই স্থানে সীমানা চিহ্ন হিসেবে বেত ও পপলার গাছ লাগিয়েছিলেন। [২] এভাবে রাজা দাহির এবং তার পিতা চচের পুরো এলাকা ইসলামী সালতানাতের অধীনে চলে আসে। [৩]

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যু - গুজরাট অভিযান:

মুহাম্মদ বিন কাসিম কাশ্মীর ও চীন অভিযান স্থগিত করেন। সম্ভবত প্রশাসনিক ব্যস্ততা এবং অন্যান্য ফ্রন্টে আরও সৈন্যের প্রয়োজনের কারণে বিরতি অনিবার্য ছিল। কাশ্মীর সীমান্তে মুলতান থেকে ফেরার পথে মুহাম্মদ বিন কাসিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পান। [৪] এভাবে কাশ্মীর ও চীন অভিযান আরও স্থগিত করার সুযোগ তৈরি হয়।

তবে “কচ্ছ” এবং “গুজরাট” এর দিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল। রাজা দাহিরের পুত্র জয় সিংহকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছিল এবং উমাইয়া রাষ্ট্রের সাথে শত্রুতা...

[১] “সোপুর” ঝিলাম নদীর তীরে উচ্চ পাঞ্জাবে অবস্থিত একটি শহর ছিল। কেউ কেউ মনে করেন “সোপুর” হলো বর্তমান “শাহপুর” যা সরগোধা ও খুশাবের মধ্যবর্তী একটি ছোট শহর।

[২] চচনামা, পৃষ্ঠা ২৪১।

[৩] চচনামা, পৃষ্ঠা ২৪১।

[৪] বালায়ুরীর বক্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতানে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলেন। (ومات الحجاج فأت محمدًا وفاته فرجع من)। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৯৫ হিজরীর রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে ৯৫ হিজরীর শাওয়ালের শুরুতে মুহাম্মদ বিন কাসিম এই সংবাদ পেয়ে থাকবেন।

কেনার সমতুল্য ছিল। তাই মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন যাতে সেখান থেকে “কচ্ছ” এবং “গুজরাট” আক্রমণ করা যায়। মুহাম্মদ বিন কাসিম দ্রুত সিন্ধুর দিকে প্রত্যাভর্তন করলেন এবং “অরোর”-এ অবস্থান করে কচ্ছ ও গুজরাটের সিন্ধু সংলগ্ন শহরগুলোতে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। প্রথমে “হিলমান”-এ একটি বাহিনী পাঠানো হলো যেখানে সেখানকার শাসক যুদ্ধ ছাড়াই সন্ধি করে নিলেন। এরপর “সরস্তু” (সোরঠ-সৌরাষ্ট্র)-এ অভিযান চালানো হলো। এখানে “মেদ” (সম্ভবত মারওয়াড়ি) জাতির লোকেরা বসবাস করত যারা ছিল জলদস্যু এবং বসরার (নৌ) সৈন্যদের সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতো। এখানকার লোকেরাও প্রতিরোধের চেষ্টা করেনি এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিল।

এখন মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজের নেতৃত্বে বাহিনী নিয়ে “কিরজ” আক্রমণ করলেন যেখানে রাজা দ্রোহর রায় জয়সিংহকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দ্রোহর রায় শহরের বাইরে এসে মোকাবিলা করলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। “কিরজ”-এর বাসিন্দারা প্রথমে প্রতিরোধ করেছিল কিন্তু পরে মোকাবিলার শক্তি না দেখে অস্ত্র সমর্পণ করল। সেখানে সশস্ত্র সৈন্যদের গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হলো। দ্রোহর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ এই যে, তিনি শেষ পর্যন্ত নিহত হয়েছিলেন। [১]

কিরজের বাকি লোকদের কেবল নিরাপত্তাই দেওয়া হয়নি, বরং মুহাম্মদ বিন কাসিম তাদের সাথে এমন মহৎ আচরণ করেছিলেন যে সেখানকার মন্দিরগুলোতে এই মুজাহিদ পুরুষের মূর্তি পূজা করা হতে লাগল। [২]

রাজপুতানা অভিযান:

গুজরাট থেকে মুলতান ফেরার পথে মুহাম্মদ বিন কাসিম মধ্য ভারতের রাজ্য “কনৌজ”-এর দিকে অগ্রসর হতে বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। এটি ছিল এক অত্যন্ত শক্তিশালী রাজধানী যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা “হর্ষ” এবং এখন তার বংশধরদের মধ্য থেকে রাজা হরচন্দ্র রায় এখানে সিংহাসনে আসীন ছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম পঞ্চাশ হাজার বাছাইকৃত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে “কনৌজ”-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং আবু হাকিম শাইবানিকে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অগ্রবর্তী দলের সাথে সামনে পাঠালেন।

এই অগ্রবর্তী দলটি “কনৌজ”-এর রাজধানী “উদয়পুর”-এর কাছে পৌঁছে তাবু স্থাপন করল। জায়েদ বিন আমরু কালাবি দূত হিসেবে রাজা হরচন্দ্র রায়ের দরবারে গিয়ে বললেন:

“সমুদ্র উপকূল থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত সমস্ত বাদশাহ ও রাজা ইসলামের পতাকাতলে চলে এসেছে। কেউ ইসলামের ছায়াতলে এসেছে আবার কেউ জিজিয়া দিতে সম্মত হয়েছে। সবাই কাফেরদের পরাজিতকারী আমির ইমাদউদ্দিন মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনুগত হয়ে গেছে।”

[১] ফুতুহুল বুলদান: ৪৩৩। একজন কবির এই কবিতাটিও দ্রোহরের হত্যার দিকে ইঙ্গিত করে: নাহনু কাতালনা দাহিরাঁ ওয়া দুওয়াহারা, ওয়াল খাইলা তারদি মানসারাঁ ফামানসারা।

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৩

রাজা রক্ষ স্বরে উত্তর দিলেন:

“ষোল শতাব্দী ধরে এখানে আমাদের শাসন চলে আসছে। আমাদের সীমানায় হস্তক্ষেপ করার সাহস কারো হয়নি। তোমাদের কী যোগ্যতা যে এমন অসম্ভব কথা মনে আনছ? যদি দূতকে শাস্তি দেওয়া বৈধ হতো, তবে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শন বানিয়ে দেওয়া হতো। তোমার আমিরকে গিয়ে বলো যে, একে অপরের শক্তি পরিমাপ করার জন্য মোকাবিলা জরুরি।”

এই সময়ের মধ্যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে অবশিষ্ট সেনাবাহিনী ‘উদয়পুর’-এর সামনে এসে পৌঁছেছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজার অস্বীকৃতির কথা জানতে পেরে সেনা কর্মকর্তাদের ‘উদয়পুর’ আক্রমণের প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপসারণ:

তবে এর পরের দিন সকালে হঠাৎ রাজধানী দামেস্ক থেকে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ নামক এক কর্মকর্তার আগমন ঘটে। জানা গেল যে, খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যু হয়েছে এবং নতুন খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলগুলোতে ন্যায়বিচার ও দয়ার মাধ্যমে শাসন করে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন, তাই পুরো হিন্দুস্তান বিজয়ী হওয়া অসম্ভব ছিল না, কিন্তু নতুন খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক এই প্রথিতযশা সেনাপতিকে ফিরিয়ে নিলেন। [২]

সিন্ধুর অধিবাসীরা দীর্ঘকাল মুহাম্মদ বিন কাসিমকে স্মরণ করে কাঁদতেন। কাইরাজের হিন্দুরা মন্দিরে তাঁর ছবি ও মূর্তি তৈরি করে তাঁকে দেবতার মর্যাদা দিতে শুরু করে। [৩]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপসারণের কারণ:

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়সমূহ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের শাসনামলে হয়েছিল। ওয়ালিদ তাঁর শেষ দিনগুলোতে তাঁর পিতা আব্দুল মালিকের ওসিয়ত লঙ্ঘন করে ছোট ভাই সুলাইমানের উত্তরাধিকার বাতিল করতে চেয়েছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিরা তাঁর এই চিন্তার সমর্থক ছিলেন, কিন্তু এই চিন্তা বাস্তবায়নের আগেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং এরপর ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক মৃত্যুবরণ করেন এবং আব্দুল মালিকের প্রাচীন ওসিয়ত অনুযায়ী সুলাইমান খলিফা হন। তিনি তাঁর ভাইয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই তিনি ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফের অনুগত সেনাপতিদের কাছ থেকে বিপদ অনুভব করতে শুরু করেন। [৪]

ফলে তিনি প্রথম সুযোগেই সেইসব আমির ও সেনাপতিদের অপসারণ করতে শুরু করেন যারা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘনিষ্ঠ বা ওয়ালিদের বিশেষ অনুগত ছিলেন। ইরাকের আমির ইয়াজিদ বিন আবি মুসলিম হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুলাইমান তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে ইরাকের শাসনভার ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের হাতে তুলে দেন।

[৫]

[১] চচ নামা, পৃ. ২৩১, ২৩২

[২] চচ নামা, পৃ. ২৩৩

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৬৩০, ৬৩১, ত. দারুল কিতাব আল-আরাবি; ফুতুহুল বুলদান: ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯

[৪] তারিখ আবি যুরআ আদ-দিমাশকি, পৃ. ৫১৯; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১২/৬১৩; তারিখ দিমাশক: ৩৯/৩৬৯

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: ৩১৩

কিন্তু যেহেতু ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব সাধারণত পূর্বীয় প্রদেশগুলোর রণাঙ্গনে থাকতেন, তাই সাথে সাথে সালেহ বিন আবদুর রহমানকে অর্থমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক দায়িত্ব দিয়ে ইরাক সরকারের অংশীদার করা হয়েছিল। এভাবে কার্যত ইরাকের সমস্ত ব্যবস্থাপনা সালেহ বিন আবদুর রহমানের হাতে চলে আসে। [১] এই ব্যক্তি আরবি ও ফারসি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং আর্থিক খাতে তার বিশাল অভিজ্ঞতা ছিল। [২] তবে একই সাথে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার পরিবারের প্রতি তার চরম শত্রুতা ছিল, যার কারণ ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খারেজিদের অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। সালেহ বিন আবদুর রহমানের ভাই আদম বিন আবদুর রহমানও খারেজিদের সমমনা ছিলেন, তাই হাজ্জাজ তাকেও হত্যা করিয়েছিলেন। [৩]

এখন সুলাইমান বিন আবদুল মালিক খলিফা হয়ে সালেহ বিন আবদুর রহমানকে বিশেষভাবে এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তিনি যেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিবার আল-আবু আকিলের কর্মকর্তাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করেন, [৪] তাদের ওপর নির্যাতন করেন এবং তাদের হত্যা করেন। [৫]

হাজ্জাজ তার শাসনামলে দীর্ঘ সময় ধরে বনু মুহাল্লাবকে অনেক ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তাদের লাঞ্ছিত করার পেছনে লেগে যান। ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে তিনি পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ ও নির্যাতনের শিকার করেছিলেন। [৬] তাই আল-মুহাল্লাবকেও এই প্রতিশোধ নেওয়ার অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং আবদুল মালিক বিন মুহাল্লাবকে বনু আকিলের বন্দীদের প্রহার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। [৭]

সালেহ বিন আবদুর রহমান ‘এহতেসাব’ এর এই অভিযানের অধীনে মুহাম্মদ বিন কাসিমকেও পদচ্যুত করার পরিকল্পনা করেন এবং সিন্ধু বিজয়ীর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার কথা মাথায় রেখে অনেক সূক্ষ্ম বিষয় বিবেচনায় রাখেন। তিনি আল-মুহাল্লাবকে স্পষ্টভাবে এই কাজে অংশীদার করেন কারণ সেই সময় বনু মুহাল্লাব অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। তাছাড়া তাদের পিতা মুহাল্লাব বিন আবি সাফরা ইতিহাসে একজন মহান তাবেয়ী এবং বিজয়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সুতরাং মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো একজন বিজয়ীর ওপর হাত তোলার জন্য অন্য একজন বিজয়ীর সন্তানদের সাথে রাখা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়েছিল যাতে কিছুটা নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায়।

ফলে সালেহ বিন আবদুর রহমান সিন্ধুর নতুন ব্যবস্থা এভাবে নির্ধারণ করেন যে, সেখানকার সামরিক নেতৃত্ব (ইমারতে হারব) ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের ভাই হাবিব বিন মুহাল্লাবের নামে করে দেন এবং আর্থিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইয়াজিদ বিন আবি কাবশার হাতে ন্যস্ত করেন, অর্থাৎ সিন্ধুর উপ-শাসক তিনিই সাব্যস্ত হলেন। অতঃপর মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেপ্তার করে ইরাকে পাঠানোর কাজও তার ওপর ন্যস্ত করা হলো এবং সালেহ বিন আবদুর রহমান ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেপ্তার করে ইরাকে স্থানান্তর করা হোক। [৮]

[১] তারিখুত তাবারী: ৬/৫২২; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৩১৩

[২] মুখতাসার তারিখু দামেশক: ১১/৩৩

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৪৩

[৪] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৩১৮

[৫] তারিখুত তাবারী: ৬/৫০৬

[৬] আল-মআরিফ লি ইবনে কুতাইবা: পৃষ্ঠা ৩০০; তারিখুত তাবারী: ৬/৪৩৬

[৭] তারিখুত তাবারী: ৬/৫০৬

[৮] তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৩১৮

মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারি এবং কারাবরণ:

যেহেতু মুহাম্মদ বিন কাসিম বিজিত অঞ্চলগুলোতে ন্যায়বিচার ও দয়ার সাথে শাসন করে মানুষের মন জয় করে নিয়েছিলেন, তাই প্রজারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। মুহাম্মদ বিন কাসিমের গুণগ্রাহীরা চেয়েছিলেন যে, তাঁর ফিরে যাওয়া এবং গ্রেফতারির আদেশ যেন পালন না করা হয় এবং এখানেই একটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের জন্য এমনটি করা মোটেও কঠিন ছিল না, কিন্তু এই দূরদর্শী যুবক ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জাতীয় নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং উম্মাহর মধ্যে কোনো গৃহযুদ্ধের কারণ হওয়া পছন্দ করেননি। ইবনে কাসিম মুখ থেকে অস্বীকারের একটি শব্দও উচ্চারণ না করে শুধু এতটুকু বলেছিলেন:

أَضَاعُونِي وَأَيَّيَّ فَتًى أَضَاعُوا ... لِيَوْمِ كَرِيهَةٍ وَسِدَادٍ تُغْرِ

“তারা আমাকে ধ্বংস করে দিল, আফসোস! কেমন এক যুবককে তারা ধ্বংস করল, যে যুদ্ধের দিনে এবং সীমান্ত রক্ষায় তাদের কাজে আসত।” [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেকে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ এবং সেই হাবশি গোলামদের হাতে সঁপে দিলেন যারা খলিফার পক্ষ থেকে এসেছিল। [২] এই কার্যক্রমে সিন্ধুর নতুন আমির হাবিব বিন মুহাল্লাব পুরোপুরি জড়িত ছিলেন। তাঁর আদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে চটের পোশাক পরিয়ে এবং শিকল দিয়ে বেঁধে মুয়াবিয়া বিন মুহাল্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি সিন্ধু বিজয়ীকে নিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। [৩]

ইরাকে সালেহ বিন আবদুর রহমান মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ওয়াসিত-এর কারাগারে নিক্ষেপ করেন, যেখানে বনু আকিলের অন্যান্য লোকেরাও বন্দি ছিল। অন্ধকার প্রকোষ্ঠের শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় মুহাম্মদ বিন কাসিম যে বেদনাদায়ক কবিতাগুলো আবৃত্তি করেছিলেন, সেগুলোর প্রতিটি পঙক্তি হৃদয়ের তন্ত্রীকে নাড়িয়ে দেয়। ইবনে কাসিম বলেছিলেন:

فَلَوْ أَنَّي ثَوِيْتُ بِوَاسِطٍ وَبَارِضَهَا ... رَهْنَ الْحَدِيدِ مُكَبَّلًا مَغْلُولًا

“যদি আজ আমি ওয়াসিত-এর কারাগারে এবং এই ভূমিতে বেড়ি ও শিকলে বন্দি হয়ে থাকি তবে তাতে কী হয়েছে।”

فَلَرُبَّ فَتِيَةٍ فَارِسٍ قَدْ دُعَتْهَا ... وَلَرُبَّ قِرْنٍ قَدْ تَرَكْتُ قَتِيلًا

“আমি কত অশ্বারোহীর জ্ঞান হরণ করেছি এবং কত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করে ফেলে রেখেছি।”

أَتَنَسَى بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي ... وَإِنِّي عَلَى مَا فَاتَنِي لَصَبُورٌ

“বনু মারওয়ান কি আমার আনুগত্য ও বাধ্যতাকে ভুলে গেল, অথচ আমার থেকে কিছু হারিয়ে গেলে আমি তো সবর করতেই অভ্যস্ত।” [৪]

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩২

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩২; চাচনামা: পৃষ্ঠা ২৩৩

[৩] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/৩৩, ৩৪

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩২

“আমি তাদের জন্য সাবুর থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এলাকা বর্শার আঘাতে জয় করে দিয়েছি, যেখানে মানুষ যুদ্ধের এবং অতর্কিত হামলার বিশেষজ্ঞ।”

“যদি আমি (সিন্ধুতে) স্থায়ী হওয়ার সংকল্প করতাম, তবে কতই না নর-নারী মাতম করতে বাধ্য হতো।”

“না সাকাসিকের অশ্বারোহীরা আমার সামরিক শিবিরে প্রবেশ করতে পারত, আর না ‘উক’ গোত্রের কোনো ব্যক্তি আমার ওপর আমার নিযুক্ত হতো।”

“আর না আমি মুজান্নি দাসের অনুগত হতাম। হায়! কাল (সময়) কীভাবে শরীফদের হোঁচট খাওয়ায়।” [১]

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিণতি:

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরিণতি সম্পর্কে তিনটি বর্ণনা রয়েছে:

- প্রথম বর্ণনাটি হলো, সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের কাছে যখন উল্লিখিত কবিতাগুলো পৌঁছাল, তখন তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু বনু মুহাল্লাবের প্রতিশোধের আগুন তখনও নির্বাপিত হয়নি, ফলে মুয়াবিয়া বিন মুহাল্লাব মুহাম্মদ বিন কাসিমের শিরশ্ছেদ করেন। [২]
- দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, সালেহ বিন আব্দুর রহমান মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ওয়াসিতের কারাগারে কঠোর নির্যাতন করে হত্যা করেছিলেন। [৩]
- ইমাম ইবনে হাজম (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের কয়েদখানায় আত্মহত্যা করেছিলেন। [৪]

প্রথম বর্ণনাটি সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের উদারতা ও সচ্চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও এটি অসম্ভব মনে হয় যে, খলিফা মুক্তির আদেশ দেবেন আর অধস্তন কর্মকর্তা নিজ ইচ্ছায় বন্দিকে হত্যা করবেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক দ্বিতীয় বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, যার ভিত্তিতে সালেহ বিন আব্দুর রহমান মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কারাগারে হত্যা করেছিলেন এবং এই বর্ণনাটিই সঠিক বলে মনে হয়।

তৃতীয় বর্ণনাটি বিভ্রান্তির ওপর ভিত্তি করে। আত্মহত্যার ঘটনাটি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নয়, বরং তার পুত্র আমর বিন মুহাম্মদের ছিল, যা সামনে আসছে।

এই দুঃখজনক ঘটনাটি ৯৬ হিজরিতে সংঘটিত হয়েছিল। [৫] এভাবে মুসলিম উম্মাহর একজন অত্যন্ত সাহসী, অত্যন্ত যোগ্য, দয়ালু এবং জনপ্রিয় সেনাপতি আপনজনদের অবমূল্যায়নের শিকার হলেন।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩/৬৩০, ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৩২৪, ৩২৫; মু'জামুশ শুয়ারা লিল মারযুবানি পৃষ্ঠা ৩৮৩, প্রকাশনী: আল-ইলমিয়াহ।

[২] মু'জামুশ শুয়ারা লিল মারযুবানি পৃষ্ঠা ৩৮৩, প্রকাশনী: আল-ইলমিয়াহ।

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৩২৫।

[৪] জামহারাতু আনসাবিল আরব: পৃষ্ঠা ২৬৮।

[৫] নুজহাতুল খাওয়াতির: ১/৩৬।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের বেদনাদায়ক মৃত্যুতে কবির শোকগাথা রচনা করেছেন। একজন কবি বলেছেন:

إِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالسَّمَاةَ وَالنَّدى ... لِمُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
قَادَ الْجُيُوشَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ حِجَّةً ... يَا قُرْبَ ذَلِكَ سُودُودًا مِنْ مَوْلِدِ

“নিশ্চয়ই বীরত্ব, উদারতা ও দানশীলতা মুহাম্মদ বিন কাসিম বিন মুহাম্মদের জন্য। তিনি সতেরো বছর বয়সে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাহবা! জন্মের পর এই নেতৃত্ব কতই না নিকটবর্তী ছিল।” [১]

দাহিরের কন্যাদের গ্রেফতারির বর্ণনা:

চচনামায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারির প্রসঙ্গে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যার কারণে খলিফা হঠাৎ মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারির আদেশ দিয়েছিলেন। চচনামা অনুযায়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরের দুই কন্যা সূর্য দেবী ও পরিমল দেবীকে গ্রেফতার করে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দারুল খিলাফত “বাগদাদ” পাঠিয়েছিলেন। খলিফা “ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক” একদিন তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে এক রাজকুমারী মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে তার বাবার প্রতিশোধ নেওয়ার একটি কৌশল ভাবলেন। তিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর তার শ্রীলতাহানির মিথ্যা অভিযোগ আনলেন। খলিফা এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং এই আদেশ জারি করলেন যে মুহাম্মদ বিন কাসিমকে যেন কাঁচা চামড়ায় বন্দি করে দরবারে খিলাফতে হাজির করা হয়। ফলে মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজেকে কাঁচা চামড়ায় মুড়িয়ে একটি সিন্দুকে বন্দি করে পাঠিয়ে দিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম দুই দিন পর সেই সিন্দুকের ভেতরেই দম বন্ধ হয়ে মারা যান।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর দাহিরের কন্যারা খলিফার সামনে নিজেদের মিথ্যার কথা স্বীকার করে বললেন: “মুহাম্মদ বিন কাসিম আমাদের সাথে ভাইদের মতো আচরণ করেছিলেন। আমরা তার ওপর মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলাম যাতে বাবার রক্তের বদলা নিতে পারি।” এটি শুনে খলিফা অনুশোচনায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি দাহিরের কন্যাদের কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন এবং দুঃখ ও ক্ষোভে নিজের আঙুল কামড়াতে লাগলেন। [২]

[১] তারীখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩০৩; আল-কামিল ফিত-তারীখ: ৪/৬৩; তারীখ দামেশক: ১৯৩/৬৫।

কিছু বর্ণনায় এই কবিতাটি এভাবে আছে:

سَاسَ الرِّجَالَ لِسَبْعِ عَشْرَةَ حِجَّةً ... وَلِدَاتُهُ إِذْ ذَاكَ فِي أَشْغَالِ

(তিনি সতেরো বছর বয়সে পুরুষদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যখন তার সমবয়সীরা খেলাধুলায় মগ্ন ছিল।)

চচনামা অনুযায়ী এই কবিতাগুলো হামজা বিন বিয় বিন হানাফী বলেছেন, যিনি মুহাম্মদ বিন কাসিম যখন পারস্য জয় করেছিলেন তখন তার সাথে ছিলেন। তখন মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স মাত্র সতেরো বছর ছিল। এত অল্প বয়সে এত বড় সাফল্য সত্যিই বিস্ময়কর। (চচনামা: পৃ. ৯২)

বালাজুরি এবং ইবনুল আসির এই কবিতাগুলো হামজা বিন বিয় হানাফীর বলে উল্লেখ করেছেন, তবে তারা এগুলো মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর উল্লেখ করেছেন যা থেকে বোঝা যায় যে সম্ভবত এই কবিতাগুলো তার শোকে বলা শোকগাথার একটি অংশ। আল্লাহই ভালো জানেন। তবে খলিফা বিন খাইয়াত এবং ইবনে আসাকির এগুলো ইয়াজিদ বিন হাকাম (ইবনে আবিল আস)-এর কবিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (তারীখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩০৩; তারীখ দামেশক: ১৯৩/৬৫)।

যাই হোক, এর দ্বারা এটি কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স সিন্ধু অভিযানের সময় সতেরো বছর ছিল। এটি একটি ঐতিহাসিক বিতর্ক যা নিয়ে আমরা তারীখে মিল্লাত তৃতীয় খণ্ডের টীকায় (ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে সিন্ধু বিজয়ের প্রসঙ্গে) আলোচনা করেছি।

[২] চচনামা: ২২২, ২২৩।

চচ নামার এই বর্ণনার ওপর জনাব নবী বখশ খান বালুচ মরহুম কঠোর সমালোচনা করে একে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। লেখক তাঁর গবেষণার সাথে এই পর্যন্ত একমত যে, এই ঘটনাটি হুবহু সঠিক হতে পারে না কারণ চচ নামার লেখক যে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের হত্যার নির্দেশ খলিফা ওয়ালিদের দিকে নিসবত করা হয়েছে, অথচ সেই সময় ওয়ালিদ ইন্তেকাল করেছিলেন। এই বর্ণনায় দারুল খিলাফত বাগদাদ বলা হয়েছে অথচ তখন বাগদাদের অস্তিত্বই ছিল না।

এছাড়াও এই বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন কাসিমকে কাঁচা চামড়ায় মুড়িয়ে সিন্দুকে বন্ধ করার কারণে পথেই মারা যাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বর্ণনার এই অংশটিও সমস্ত ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সুলাইমানের যুগে তাঁর নির্দেশে গ্রেফতার হওয়া এবং ওয়াসিত পর্যন্ত জীবিত পৌঁছানো এবং পরে সেখানে নিহত হওয়া একটি স্বীকৃত বিষয়।

বাকি রইল এই কথা যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম কি দাহিরের কন্যাদের দারুল খিলাফতে পাঠিয়েছিলেন? এটি কি কোনো ঐতিহাসিক আংশিক কোনো ইসলামী হুকুম এবং মুসলমানদের নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক নয়? তাই যদি কেউ এই পরিমাণ কথা গ্রহণ করে নেয় তবে তাতে কোনো আপত্তি থাকবে না।

এখানে দামেস্কের পরিবর্তে বাগদাদ এবং খলিফা সুলাইমানের পরিবর্তে খলিফা ওয়ালিদের উল্লেখ করাকে বর্ণনাকারীর ভুল বা ভ্রম হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। একইভাবে দাহিরের কন্যাদের মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে খলিফাকে উত্তেজিত করাও সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর কারণ তারা তাদের পিতার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যা কিছু করতে পারত। সুতরাং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে খলিফা মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রতি বিরূপ ছিলেন যেখানে এই ভিত্তিতে যে তিনি তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী অর্থাৎ হাজ্জাজ বিন ইউসুফের গোষ্ঠীর লোক ছিলেন, সেখানে তাৎক্ষণিক উত্তেজনার কোনো কারণও থাকতে পারত যা অসম্ভব নয় যে দাহিরের কন্যারা তা উসকে দিয়েছিল। “নিশ্চয়ই তোমাদের কৌশল অত্যন্ত ভয়াবহ।”

একটি কথা বাকি থেকে যায় যে চচ নামার এই বর্ণনায় মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ খলিফার দিকে নিসবত করা হয়েছে, অথচ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে গ্রেফতারির নির্দেশ সালেহ বিন আব্দুর রহমান দিয়েছিলেন যিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরিবর্তে ইরাকের আমির নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাহলে এই বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের সুরত কী হবে?

যদি এই বর্ণনাকে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত করে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তবে এখানে এভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে যে দাহিরের কন্যাদের অভিযোগে খলিফা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তিনি সালেহ বিন আব্দুর রহমানকে এই পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে খলিফা শুধুমাত্র গ্রেফতারির নির্দেশ দিয়েছিলেন, হত্যা করার বা কাঁচা চামড়ায় মুড়িয়ে সিন্দুকে বন্ধ করার নয়। চচ নামার বর্ণনায় যেখানে অন্যান্য গুরুতর ভুল ও সংশয় রয়েছে সেখানে এই ভুলটিও রয়েছে যে গ্রেফতারির নির্দেশের পরিবর্তে এমন নির্দেশ খলিফার দিকে নিসবত করা হয়েছে যা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সমস্ত আলোচনা ও সম্ভাবনাকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে এই বর্ণনায় অনেক কিছু মিশে গেছে। এর কিছু বিষয় অন্যান্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে ভুল এবং কিছু আংশিক বিষয় সঠিক হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এই বর্ণনাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে তবে তারও পূর্ণ অবকাশ রয়েছে যেমনটি জনাব নবী বখশ খান বালুচ মরহুমের অভিমত।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পরবর্তী সিন্ধুর উমাইয়া আমিরগণ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর সিন্ধুতে একে একে উমাইয়া খলিফাদের বেশ কয়েকজন শাসক নিযুক্ত হন, যারা নিম্নরূপ:

ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ (৯৬ হিজরি):

ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহ সেই নায়েবে আমির, যিনি মুহাম্মদ বিন কাসিমকে গ্রেফতার করে ইরাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র আঠারো দিন শাসন করার পর তিনি হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। [১]

উবাইদুল্লাহ বিন আবি কাবশাহ (৯৬ হিজরি):

ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাহর পর জরুরি ভিত্তিতে তার ভাই উবাইদুল্লাহ বিন আবি কাবশাহকে সিন্ধুর ভারপ্রাপ্ত শাসক নিযুক্ত করা হয়। [২]

ইমরান বিন নুমান কালাই (৯৬ হিজরি):

কিছুকাল পর তাকে অপসারিত করে ইমরান বিন নুমান কালাইকে এই পদে ভূষিত করা হয়। [৩]

হাবিব বিন মুহাল্লাব (৯৬ হিজরি থেকে ১০০ হিজরি):

কিছুদিন পর হাবিব বিন মুহাল্লাবকে আমির হিসেবে পাঠানো হয়। [৪]

তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের গ্রেফতারির পর সিন্ধুর কিছু এলাকা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানকার পলাতক রাজারা ফিরে এসে সেগুলোর শাসনভার গ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে রাজা দাহিরের পুত্র জয়সিংহও ছিল, যে ব্রাহ্মণবাদে ফিরে এসেছিল। হাবিব বিন মুহাল্লাব তার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন এবং সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত দুর্গ “রাওয়ার” অবরোধ করে তা জয় করেন এবং শত্রুদের পরাজিত করেন। [৫]

আমর বিন মুসলিম বাহিলি (১০০ হিজরি থেকে ১০১ হিজরি):

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ খলিফা হলে তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের সমস্ত ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধনের চেষ্টা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বনু মুহাল্লাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবকে আর্থিক আত্মসাতের অপরাধে ইরাকের আমীর পদ থেকে...

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪৩৩

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩১৮

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩১৮

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩১৮

[৫] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪৩৩

অপসারিত করে বন্দী করে দেওয়া হলো, [১] তার ভাই হাবিব বিন মুহাল্লাবকেও সিন্ধুর শাসনভার থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো [২] এবং তার স্থলে সিন্ধুতে মাওরাউন নাহরের বিজয়ী কুতাইবা বিন মুসলিমের ভাই আমর বিন মুসলিম বাহিলীকে নিযুক্ত করা হলো, যিনি সিন্ধুর কিছু অঞ্চলে জিহাদ করেন এবং বিজয়ী হন। উমর বিন আব্দুল আজিজ সিন্ধুর বিদ্রোহ দমনের জন্য স্থানীয় সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মন জয়ের পূর্ণ চেষ্টা করেন। তিনি রাজাদের কাছে চিঠি লিখে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাদের নিজ নিজ শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখা হবে। এছাড়া এই নিশ্চয়তাও দেন যে, অন্যান্য মুসলমানরা যেসব অধিকার ভোগ করে, তারাও সেই সব অধিকার লাভ করবে এবং তাদের ওপর কেবল সেই দায়িত্বগুলোই অর্পিত হবে যা অন্য মুসলমানদের ওপর প্রযোজ্য। সিন্ধুর রাজারা উমর বিন আব্দুল আজিজের উত্তম চরিত্র এবং ন্যায়বিচার সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন, ফলে রাজা দাহিরের পুত্র জয় সিংহসহ অনেক হিন্দু রাজা এবং প্রচুর সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরবি নাম গ্রহণ করেন। [৩]

হিলাল বিন আহওয়ায তামিমি: (১০২ হিজরি হতে ১০৫ হিজরি)

হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ.-এর ইন্তেকালের পর ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে সিন্ধুর শাসনভার হিলাল বিন আহওয়ায তামিমির নামে অর্পণ করেন। [৪] এই সময়েই ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাব শক্তি সঞ্চয় করে বিদ্রোহ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে নিহত হন এবং তার পরিবার পালিয়ে গিয়ে কান্দাবিল (বেলুচিস্তান)-এ আত্মগোপন করে। [৫] তবে সিন্ধুর আমির হিলাল কান্দাবিলে আক্রমণ করে মুহাল্লাব পরিবারের পলাতকদের নির্মূল করেন, যাদের মধ্যে আব্দুল মালিক বিন মুহাল্লাব এবং মুয়াবিয়া বিন মুহাল্লাবও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৬] মুহাল্লাব পরিবার যেভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল, তারা নিজেরাও একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর অন্যায়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র সালেহ বিন আব্দুর রহমানের পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়েছিল। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. তার শাসনামলে তাকে ইরাকের শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করেন। [৭] এরপর ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে ইরাকের আমির উমর বিন হুবাইরা কোনো এক বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে হত্যা করেন। [৮] এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের ওপর জুলুমে যারা শরিক ছিল, তারা সকলেই কয়েক বছরের মধ্যেই নিজ নিজ পরিণতির শিকার হয়।

জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান মুররি (১০৭ হিজরি হতে ১১১ হিজরি):

খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের আমলে হিন্দুস্তানের শাসনের জন্য জুনাইদ বিন আব্দুর রহমানকে নির্বাচন করা হয়। জুনাইদ দেবল পৌঁছে সিন্ধু নদের উপকূলের দিকে অগ্রসর হন কিন্তু জয় সিংহ তাকে সিন্ধু নদ পার হতে দেননি এবং বার্তা পাঠান:

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩৩০

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ২২৫

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ২২৫

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ২২৫

[৫] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ১০২ হিজরি

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ১০২ হিজরি

[৭] আল-মাআরিফ লি-ইবনে কুতাইবা: ১/৩৬২

[৮] মুখতাসার তারিখু দামেশক: ১১/২৩

“আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাকে নেক খলিফা (উমর বিন আব্দুল আজিজ) এই ভূখণ্ডের ওয়ালি বানিয়েছিলেন। তোমাদের ওপর আমার আস্থা নেই।”

জুনাইদ পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচনা করে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে কাজ করলেন এবং আলাপ-আলোচনা চালিয়ে গেলেন। অবশেষে স্থির হলো যে, জয়সিংহ খরাজ প্রদান করতে থাকবে এবং সিন্ধুর শাসনভার তার কাছেই থাকতে দেওয়া হবে। অঙ্গীকার দৃঢ় করার জন্য উভয় পক্ষ একে অপরের কাছে কিছু ব্যক্তিকে জামিন হিসেবে রাখল।

কিন্তু আফসোস যে, পারস্পরিক আস্থা বজায় থাকল না এবং উভয় পক্ষ জামিনদের ফেরত দিয়ে দিল। বলা হয় যে, এতে জুনাইদের ভুল ছিল যিনি জয়সিংহের ওপর কোনো অন্যায় করেছিলেন। যাই হোক কারণ যা-ই হোক না কেন, ফলাফল এই দাঁড়াল যে জয়সিংহ বিদ্রোহ করে বসল।

জয়সিংহ হিন্দুস্তান থেকে সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে নিয়ে এল, যাদের নৌবহরের সাহায্যও ছিল। জুনাইদ এই সময়ের মধ্যে কোনোভাবে সিন্ধু নদ পার হয়ে গিয়েছিলেন। অবশেষে নদীর পূর্ব তীরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হলো যাতে জয়সিংহ পরাজিত হলো, সে নৌকায় চড়ে পালিয়ে যেতে চাইল কিন্তু তার নৌকা ডুবে গেল। তাকে ধরে হত্যা করা হলো।

দাহিরের দ্বিতীয় পুত্র ফিফি ভাইয়ের এই পরিণতি দেখে ইরাক অভিমুখে রওনা হওয়ার চেষ্টা করল যাতে বসরার আমিরের কাছে জুনাইদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করতে পারে। তবে জুনাইদ তাকে অনবরত আশ্বস্তকারী বার্তা পাঠাতে থাকল। অবশেষে ফিফি নিজেকে জুনাইদের হাতে সাঁপে দিল কিন্তু জুনাইদ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং আয়ত্তে পাওয়ার পর তাকে হত্যা করল।

এরপর জুনাইদ কচ্ছ এবং গুজরাটে সৈন্য পরিচালনা করলেন যেখানে “কাইরাজ”-এ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। জুনাইদ কঠোরভাবে অবরোধ করে প্রাচীর ধ্বংসকারী যন্ত্রের সাহায্যে শহরের দেয়াল ভেঙে ফেললেন এবং শহর দখলের পর অনেক মানুষকে হত্যা ও গ্রেপ্তার করলেন।

এই বিজয়গুলোর পর জুনাইদ তার বাহিনীকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিলেন এবং তার অফিসারদের পাঠিয়ে মারমাদ, দানাজ, ভারুচ এবং মান্ডাল জয় করলেন। মালওয়া প্রদেশে উজ্জয়িনী একটি শক্তিশালী শহর ছিল। জুনাইদ এটি আক্রমণের জন্য হাবিব বিন মুররাহকে পাঠালেন যিনি “উজ্জয়িনী” এবং মালওয়াকে নিজের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত করলেন। তারপর “ভারাইমাদ” (মারওয়াড়) এর ওপরও হামলা চালালেন এবং এর আশপাশের এলাকা জ্বালিয়ে দিলেন। অন্যদিকে জুনাইদ ফিরে এসে “ভাইলমান”-এর ওপর আক্রমণ করলেন এবং গুর্জরদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। এই যুদ্ধগুলোতে জুনাইদ প্রচুর গনিমতের মাল লাভ করলেন। [১]

কিন্তু হিশাম বিন আব্দুল মালিকের আমলের এই বিজয়গুলো স্থায়িত্ব লাভ করতে পারল না। কারণ এই ছিল যে, এই বিজয়গুলোতে সেনাকর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছিল যা ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী ছিল। রাজনৈতিক ও নৈতিক ভুলগুলো মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিল এবং বিদ্রোহের উত্থান ও সেগুলো দমনের এক দীর্ঘ ধারা শুরু হয়ে গেল।

তামীম বিন যায়েদ কাইনী (১১১ হিজরি থেকে হিজরি):

১১১ হিজরিতে তিনি সিন্ধুর আমির নিযুক্ত হন। অত্যন্ত দানশীল এবং প্রজাবৎসল কিন্তু অসতর্ক ছিলেন। যখন তিনি সিন্ধুর শাসনভার পেলেন তখন এখানকার কোষাগার...

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৫, ৪২৬; নুযহাতুল খাওয়াতির: ৩৩, ৩৪/১

৭৮৮ | তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

সেখানে এক কোটি আশি লক্ষ দিরহাম মজুদ ছিল যা সে দ্রুত খরচ করতে শুরু করে। [১] কিন্তু তামীম স্থানীয় সর্দার ও আমিরদের সম্মুখে রাখতে পারেনি এবং সিন্ধুর আমিরগণ তার আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়। [২]

এই পরিস্থিতির কারণে তামীমের শাসনামলে সিন্ধুর ওপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়ে। তামীম বিন যায়েদ দাইবেলের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি হ্রদের তীরে ইন্তেকাল করেন যাকে “মাউল জাওয়ামিস” অর্থাৎ “মহিষের হ্রদ” বলা হতো। তামীমের আমলে বিজিত প্রদেশগুলোর অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলোর দিকে হিজরত করতে শুরু করে। [৩]

হাকাম বিন আওয়ানা কালবী: (১২২ হিজরি পর্যন্ত)

তামীমের পর হাকাম বিন আওয়ানা নিযুক্ত হন। তিনি যখন সিন্ধু পৌঁছান তখন পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল। হিন্দুরা বিদ্রোহ করছিল। এমনকি অল্প কয়েকজন বাদে সমস্ত রাজা-মহারাজা আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে গিয়েছিল। সিন্ধুর মুসলমানদের জন্য কোনো শহরই নিরাপদ ছিল না। হাকাম বিন আওয়ানার সৌভাগ্য ছিল যে সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিমের পুত্র আমর তার সাথে ছিলেন, যিনি তার পিতার মতোই অত্যন্ত সাহসী, চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। হাকাম বিন আওয়ানা তাকে অসাধারণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন।

হাকাম বিন আওয়ানা সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য একটি সুদৃঢ় ও নিরাপদ শহর নির্মাণ করেন যার নাম দেওয়া হয় “মাহফুজা”। এই শহরকে কেন্দ্র বানানোর পর আমর বিন মুহাম্মদকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়, ফলে তিনি রণাঙ্গনে রওনা হন এবং বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত করে কিছুকাল পর সফল ও বিজয়ী হয়ে ফিরে আসেন। হাকাম বিন আওয়ানার আমলে অধিকাংশ বিজিত এলাকা শত্রুদের থেকে পুনরুদ্ধার করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তাই মানুষ তার শাসনে সম্মুখ ছিল। [৪]

পরিশেষে হাকাম বিন আওয়ানা একটি বড় অভিযানের জন্য বের হন এবং শত্রুর এলাকায় প্রবেশ করতে থাকেন। এই অভিযানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। [৫] এটি ১২২ হিজরির ঘটনা।

মুহাম্মদ বিন আরার কালবী: ১২২ হিজরি

হাকাম বিন আওয়ানার শাহাদাতের পর মুহাম্মদ বিন আরার কালবী, যিনি হাকাম বিন আওয়ানার গোত্র বনু কালবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিমের অনুরাগী ছিল। অবশেষে খলিফা হিশামও তার পক্ষেই ফয়সালা দেন।

আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম: (১২২ হিজরি থেকে ১২৬ হিজরি)

এখন আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দূরদর্শী সেনাপতি। তিনি সিন্ধু নদের...

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৫, ত. আল-হিলাল

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৭

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৫, ত. আল-হিলাল

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৬, ত. আল-হিলাল; আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪/১৬৩; তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৮৪

[৫] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/৬৬

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৩৫৩

মোড় বা বাঁকে একটি নিরাপদ ও সুদৃঢ় শহরের ভিত্তি স্থাপন করা হয় যার নাম দেওয়া হয় ‘মানসুরা’। শতাব্দীকাল ধরে এটিই ছিল সিন্ধুর ইসলামী সরকারের রাজধানী। [১] আমর বিন মুহাম্মদ আমীর হওয়ার পর হিন্দু রাজারা বিপদ অনুভব করে এবং মুসলমানদের এলাকাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরুতে তারা সফল হয় এবং মানসুরা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমর ইরাকের ওয়ালি ইউসুফ বিন ওমরের কাছে সাহায্য চান। তিনি চার হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দেন। এই সাহায্য আসার সাথে সাথেই শত্রু মানসুরার অবরোধ ছেড়ে পিছু হটে যায়।

আমর বিন মুহাম্মদ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নিজের শক্তি সুসংহত করেন এবং এরপর শত্রুর দিকে অভিযান চালান। এই বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব ছিল মা’ন বিন যায়িদা শায়বানীর মতো প্রখ্যাত অফিসারের হাতে। মা’ন বিন যায়িদা রাতারাতি শত্রুর ওপর অতর্কিত হামলা চালান যার পর এক ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। মা’ন বিন যায়িদার সৈন্যরা লাশের পাহাড় জমিয়ে দেয়। অবশেষে ময়দান মুসলমানদের দখলে আসে এবং রাজা অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে পালিয়ে যায়। [২]

আমর বিন মুহাম্মদের এই সাফল্য তাকে অনেক খ্যাতি এনে দেয় কিন্তু হিংসুকরা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে ইয়াজিদ বিন মুহাল্লাবের ছেলে মারওয়ান ছিল অগ্রগণ্য, যে সেই সময় সিন্ধু বাহিনীর একজন বড় অফিসার ছিল। সে আল-মুহাল্লাবের সাথে আল-আকিলের পুরনো শত্রুতাকে আবারও চাঙ্গা করে তোলে। ঠিক সেই সময়ে যখন আমর বিন মুহাম্মদের বাহিনী জিহাদে ব্যস্ত ছিল, সে তার সমর্থক অফিসারদের নিয়ে লস্কর বা ছাউনি লুট করে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও গবাদি পশু নিয়ে পালিয়ে যায়। আমর বিন মুহাম্মদ মা’ন বিন যায়িদাকে সাথে নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করেন। অবশেষে মারওয়ানের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সে নিজে নিহত হয়। আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিম উমাইয়া আমলের সিন্ধুর সফল শাসকদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি ছিলেন। [৩]

রবিউল আখের ১২৫ হিজরিতে খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক ইন্তেকাল করেন এবং তার স্থলে তার অযোগ্য ভাতিজা ওয়ালিদ বিন ইয়াজিদ সিংহাসনে আরোহণ করে, যে তার চাচার পছন্দের কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১২৬ হিজরিতে আমর বিন মুহাম্মদ বিন কাসিমকে বিনা কারণে বরখাস্ত করে সিন্ধুর শাসনভার মুহাম্মদ বিন আরারের হাতে সোপর্দ করা হয়। ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথেই মুহাম্মদ বিন আরার আমর বিন মুহাম্মদকে গ্রেপ্তার করে। আমর বিন মুহাম্মদের আশঙ্কা ছিল যে মুহাম্মদ বিন আরার তাকে কঠোর নির্যাতন করবে, এই ভয়ে তিনি পাহারাদারদের কাছ থেকে তলোয়ার কেড়ে নিয়ে নিজের পেটে ঢুকিয়ে দেন এবং সেই জখমেই তিন দিন পর ইন্তেকাল করেন। [৪]

মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং আমর বিন মুহাম্মদ—পিতা ও পুত্র উভয়েই জিহাদের জযবায় যেমন এক ছিলেন, তেমনি প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায়ও। উভয়ের খেদমতের চরম অবমূল্যায়ন করা হয় এবং উভয়েই এক আক্ষেপজনক পরিণতির শিকার হন।

[১] মানসুরার ধ্বংসাবশেষ শাহদাদপুর (সিন্ধু) থেকে বারো-তেরো কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ‘খওয়াড়’ খালের সাথে সংযুক্ত ‘ডালোর’ টিলার ওপর ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ একে ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবশেষও বলেন, তবে সঠিক হলো এই যে, ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবশেষ সেগুলো যা শাহদাদপুর থেকে কিছুটা দূরে পাক্কি কালারি (তহশিল টাভো আদম)-এর উপকণ্ঠে দেখা যায়।

[২] কোনো ঐতিহাসিক বর্ণনা বা আলামত থেকে এটি জানা যায় না যে সেই রাজা কোন এলাকার ছিলেন। সম্ভবত তার সম্পর্ক ছিল রাজপুতানার সাথে।

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৩২৭, তবা আল-হিলাল

[৪] তারিখুত তাবারী: ৭ / ২৭২

মুহাম্মদ বিন আরার কালবি: (১২৬ হিজরি)

মুহাম্মদ বিন আরার কালবি একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে আঠারোটি যুদ্ধ লড়েছিলেন এবং দেশের শাসনব্যবস্থা বজায় রেখেছিলেন। [১] মুহাম্মদ বিন আরারের শাসনকাল মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী ছিল, এরপর ইরাকের প্রাক্তন গভর্নর মনসুর বিন জুমহুর সিন্ধুতে এসে সমস্ত বিষয় নিজের হাতে তুলে নেন।

মনসুর বিন জুমহুর: (১২৬ হিজরি থেকে ১৩২ হিজরি)

মনসুর বিন জুমহুর একজন ফিতনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ছিলেন। [২] সেই সময় উমাইয়া সাম্রাজ্য পতনের চরম সীমায় ছিল এবং জায়গায় জায়গায় আমিরগণ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে মনসুর বিন জুমহুরও উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন কিন্তু ইরাকে তিনি সফল হতে পারেননি। [৩] অবশেষে তিনি সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওনা হন যেখানে তার আত্মীয় মুহাম্মদ বিন আরার গভর্নর ছিলেন। মনসুর সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনার আশা করেছিলেন কিন্তু যখন তিনি সিন্ধু নদ পার হলেন, তখন মুহাম্মদ বিন আরার, যিনি তার ফিতনা সৃষ্টিকারী স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন, ঘাবড়ে গেলেন এবং তাকে সামনে এগোতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মনসুর জয়ী হন এবং তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মুহাম্মদ বিন আরারকে একটি শুষ্টের মধ্যে জীবন্ত গেঁথে ফেলেন। [৪]

আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠা:

এটি সেই সময় ছিল যখন বনু হাশিমের কিছু রাজনৈতিক নেতা উমাইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে নিজেদের সমর্থক বানিয়ে ফেলেছিলেন। এই আন্দোলনের ভিত্তি হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের নাতি মুহাম্মদ বিন আলী স্থাপন করেছিলেন এবং ১৩৬ হিজরিতে এই আন্দোলন একটি বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে ইরাক, খোরাসান এবং সিন্ধুতে এর অনুসারী প্রচুর সংখ্যায় ছিল। শেষ আব্বাসীয় খলিফা মারওয়ান বিন মুহাম্মদ আল-হিমারের যুগে উমাইয়া বাহিনীর সাথে আব্বাসীয় আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত যুদ্ধ হয় যাতে শেষ পর্যন্ত আব্বাসীয়রা জয়ী হয়। ১৩২ হিজরিতে উমাইয়াদের কেন্দ্র সিরিয়াও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মারওয়ান বিন মুহাম্মদ নিজের পরিবারের সাথে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ানোর পর নিহত হন। এভাবে উমাইয়াদের স্থলে বনু আব্বাসের খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্পেন ব্যতীত সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রথম আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ-এর বায়আত গ্রহণ করা হয়। ১৩২ হিজরিতে শেষ উমাইয়া খলিফা মারওয়ান হিমারের মৃত্যু এবং বনু আব্বাসের খিলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সিন্ধু মনসুরের অধীনে ছিল। [৫]

[১] তারিখ ইয়াকুবি: ৭৯/৩

[২] তারিখ আত-তাবারী: ৪৩৩/৭

[৩] তারিখ আত-তাবারী: ৪৩৩/৭, তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৩৮৩

[৪] তারিখ ইয়াকুবি: ৮০/৩

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: ৪০৬

আব্বাসীয় যুগে সিন্ধুর নায়েবগণ

১৩২ হিজরিতে আব্বাসীয়রা সিন্ধুও দখল করে নেয় এবং এখানে তাদের নায়েব (আমির) নিযুক্ত করে। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ:

আবুল আব্বাস সাফফাহর যুগে

মুসা বিন কাব তামিমি: (১৩২ হিজরি থেকে ১৪১ হিজরি)

আবুল আব্বাস সাফফাহ সিন্ধু দখলের জন্য মুগলিস নামক একজন অফিসারকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মনসুর বিন জমহরের মোকাবিলায় তিনি পরাজিত হন, তাই কিছুকাল পর্যন্ত আব্বাসীয়রা সিন্ধুর দিকে মনোযোগ দেয়নি। [১] যখন আব্বাসীয়রা চারদিকে ভালোভাবে পা জমিয়ে নিল, তখন সাফফাহ ১৩২ হিজরিতে সিন্ধু জয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আল-জাজিরার আমির মুসা বিন কাব তামিমিকে ২০ হাজার সৈন্য দিয়ে সেখানে পাঠালেন।

মুসা বিন কাব অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে কাইকানাইল পৌঁছে অবস্থান করেন এবং এই সময়ে সিন্ধুর রাজধানী মনসুরার আমির ও গোত্রীয় আরব সরদারদের সাথে গোপন বার্তার মাধ্যমে নিজের সাথে মেলানোর চেষ্টা করতে থাকেন। এই প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার পর তিনি লস্কর নিয়ে সিন্ধু নদের তীরে এসে পৌঁছান। ওদিকে মনসুরও মোকাবিলায় বেরিয়ে আসেন। [২]

২৭ রমজান ১৩২ হিজরিতে কুরাইয়িনে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় যাতে মনসুর বিন জমহর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং তার স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে। মনসুর বিন জমহর মরুভূমির দিকে পালিয়ে যান এবং তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা যান। [৩]

এখন সিন্ধুতে খেলাফতে আব্বাসীয়ার পতাকা উড়তে শুরু করে। মুসা বিন কাব মনসুরাকে কেন্দ্র বানান এবং এর জামে মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। [৪] মুসা বিন কাব সফলতার সাথে সিন্ধু ও হিন্দুস্তানি অঞ্চলগুলোতে শাসন করতে থাকেন। অবশেষে খলিফা মনসুর তাকে মাহকামা-এ-শর্তা (পুলিশ)-এর প্রধান অফিসার নিযুক্ত করেন, আর সিন্ধুতে তার ছেলে আইনিয়া তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাজ করতে থাকেন। মুসা ১৪১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। [৫]

[১] আলামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সিন্ধু দখলের এই প্রচেষ্টা সেই সময়ে হয়েছিল যখন আব্বাসীয়রা খোরাসান দখল করে নিয়েছিল কিন্তু তখনও তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

[২] তারিখে ইয়াকুবি: ৯৮/৩

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৭; তারিখে খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৪১৫, ৪১৩

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৭

[৫] তারিখে তাবারী: ৫১১/৭

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মনসুরের যুগে

উয়াইনা বিন মুসা: (১৩১ হিজরি থেকে ১৪২ হিজরি)

মুসার পর তার পুত্র উয়াইনা, যে আগেই কার্যত তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল, সিন্ধুর আমির নিযুক্ত হয়। কিন্তু সে একজন বিচক্ষণ শাসক হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি। যেহেতু সে বনু তামিম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই রাবিআহ-এর নিজারি এবং ইয়ামেনের কাহতানি কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করে। উয়াইনা বিদ্রোহ দমন করে এতে অংশগ্রহণকারী সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এর ফলে আরব গোত্রগুলোর পারস্পরিক গোত্রীয় বিদ্বেষ আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

উয়াইনা তার অসৎ উদ্দেশ্যের আরও প্রমাণ দেয় যখন কিছুকাল পর সে খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। [১] খলিফা মনসুর এ খবর শুনে উমর বিন হাফসকে সিন্ধুতে পাঠান, যিনি তার বীরত্বের কারণে “হাজার মর্দ” নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৪২ হিজরিতে সিন্ধুতে পৌঁছান এবং এগারো মাস অবরোধের পর মানসুরা জয় করে উয়াইনাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হন। তিনি উয়াইনাকে মনসুরের কাছে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সে পথিমধ্যে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। সে সিজিস্তানে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু “রুখ” নামক স্থানে কিছু ইয়ামেনি আরব তাকে হত্যা করে এবং তার মাথা রাজধানী নিয়ে গিয়ে মনসুরের সামনে পেশ করে। [২]

উমর বিন হাফস বিন আবি সুফরা আতাকি, ওরফে হাজার মর্দ: (১৪২ হিজরি থেকে ১৫১ হিজরি)

উমর বিন হাফস বিন আবি সুফরা নয় বছর পর্যন্ত সিন্ধু ও ভারতের জেলাগুলোতে সফলতার সাথে শাসন করেন। এই সময়ে আব্বাসীয় খিলাফতের ধরপাকড় থেকে বাঁচতে বিভিন্ন ফেরকার নেতারা সিন্ধুর দিকে আসছিলেন। ১৩৮ হিজরিতে খারেজিদের একজন দাঈ হাসসান বিন মুজালিদ হামদানি সমুদ্রপথে সিন্ধুতে এসে একে নিজের কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু উমর বিন হাফস তাকে সফল হতে দেননি এবং তিনি ইরাকে ফিরে যান। [৩]

এই সময়েই খলিফা মনসুরকে সাদাতদের বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মুহাম্মদ নাফস জাকিয়া এবং তার ভাই ইব্রাহিম। এই সময়ে মুহাম্মদ নাফস জাকিয়া তার পুত্র আবদুল্লাহ আশতারকে সিন্ধুতে পাঠান যাতে উমর বিন হাফসকে, যিনি সাদাতদের অনুরাগী ছিলেন, সাথে নিয়ে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট খোলা যায়। উমর বিন হাফস আবদুল্লাহ আশতারের দাওয়াত কবুল করেন এবং আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি মদিনা মুনাওয়ারায় মুহাম্মদ নাফস জাকিয়ার শাহাদাতের খবর পান, যার ফলে তিনি থেমে যান।

তিনি আবদুল্লাহ আশতারকে গোপনে একজন হিন্দু রাজার রাজ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। অনেক জাইদি শিয়া খবর পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে সেখানে চলে আসেন। এই লোকেরাই হিন্দুস্তানে প্রথমবারের মতো শিয়া মতবাদের বীজ বপন করেন।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৯২/৫... নিজারি গোত্র নিজার বিন আদনানের সাথে সম্পর্কিত। উভয় আরব গোত্রের পূর্বপুরুষ রাবিআহ এবং মুদার ছিলেন নিজারির সন্তান। কাহতানি বনু কাহতানের বিপরীতে আরব গোত্রগুলোর দ্বিতীয় মূল। কাহতানিরা বেশিরভাগ ইয়ামেনে বসবাস করত, তাই ইয়ামেনি গোত্রগুলো কাহতানি।

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ৪৩৩, তারিখ ইয়াকুবি: ১১২/৩, তারিখ আত-তবারি: ৫১১/৭, ৫১২

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৩৮ হিজরি

১৫১ হিজরিতে খলিফা মনসুরের কাছে এই রহস্য প্রকাশ হয়ে যায়। তিনি ওমর বিন হাফসের পরিবর্তে হিশাম বিন ওমরকে নিযুক্ত করেন। [১]

হিশাম বিন ওমর তাগলিবি: (১৫১ হি. থেকে ১৫৭ হি.)

মনসুর হিশাম বিন ওমরকে সিন্ধুর শাসনভার অর্পণ করার সময় প্রথম এই নির্দেশ দেন যে, আবদুল্লাহ আশতারকে গ্রেফতার করতে হবে। কিন্তু হিশাম বিন ওমর ব্যক্তিগতভাবে সাদাতদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাই তিনি এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত কিছুকাল পর আবদুল্লাহ বিন আশতারের কাফেলার সাথে তার ভাই সালিহ-এর একদল সৈন্যের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সালিহ আক্রমণ করে তাদের সবাইকে হত্যা করেন। হিশাম বিন ওমর যখন এই সংবাদ পেলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। কিন্তু তার ভাই যা করেছিলেন তা খলিফা মনসুরের ইচ্ছানুসারেই ছিল, তাই হিশাম নিজের ভাইকে কিছুই বলতে পারলেন না। খিলাফতের দরবারে এই সংবাদ অত্যন্ত আনন্দের সাথে শোনা হলো। সাথে সাথে এই নির্দেশ পাঠানো হলো যে, প্রতিবেশী হিন্দু রাজার রাজ্যে আক্রমণ করা হোক, কারণ আবদুল্লাহ আশতারের পরিবার-পরিজন এখনো সেখানেই আছে। হিশাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দু রাজার রাজ্যে আক্রমণ করলেন, যাতে রাজা নিহত হলেন। আবদুল্লাহ আশতারের পরিবার-পরিজন, যারা রাজার আশ্রয়ে ছিল, তাদের গ্রেফতার করে খিলাফতের দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, যেখান থেকে তাদের পৈতৃক শহর মদিনা মুনাওয়ারায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [২]

এই ঝামেলা থেকে অবসর হয়ে হিশাম বিন ওমর আরও বিজয়ের দিকে মনোযোগ দিলেন। কিন্দাবিল খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় থেকেই সিন্ধু বা হিন্দুস্তানের সীমান্তের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো, কিন্তু উমাইয়া শাসনের পতনের পর সেখানকার আরব আমিররা স্বাধীন সরকার গঠন করে নিয়েছিল। হিশাম বিন ওমর সৈন্য পরিচালনা করে কিন্দাবিলকে পুনরায় খিলাফতের অধীনে আনতে সক্ষম হন, যার পর অবশিষ্ট আরব আমিরদের সেখান থেকে বহিস্কার করা হয়। [৩]

মুলতানও একটি ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় খিলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই হিশাম বিন ওমরকে তার উপদেষ্টারা সেখানে আক্রমণের পরামর্শ দেন। হিশাম তার ভাই বিসতামকে নায়েব বানিয়ে মুলতানে আক্রমণ করেন এবং তা পুনরায় জয় করেন। [৪]

এরপর তার বাহিনী কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে প্রচুর গনিমতের মাল, গোলাম ও দাসী নিয়ে আসে। [৫]

এই বিজয়ের পর হিশাম বিন ওমরের গুজরাট জয়ের চিন্তা আসে। প্রথমে তিনি ওমর বিন জামাল নামক এক অফিসারের নেতৃত্বে নৌবহর তৈরি করে সেখানে পাঠান। সম্ভবত বাহিনীটি কেবল পর্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিল। [৬]

এরপর তিনি নৌকার একটি বহর তৈরি করে সিন্ধু নদের পথে আরব সাগরে পৌঁছান এবং গুজরাটের বন্দর...

[১] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৫/১৯৬, ১৯৭; তারিখুত-তাবারী, সন ১৫১ হিজরি; আল-মুনতাজাম লি ইবনিল জাওযি, সন ১৫১ হিজরি; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ৪৩৩।

[২] আল-কামিল ফিত-তারিখ: ৫/১৯৮। [৩] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৩৭।

[৪] আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী রহ. বলেন: আমার ধারণা মুলতানের লোকেরা মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর ১৫১ হিজরিতেই স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল এবং যেহেতু ব্রাহ্মণাবাদে হিন্দুরা পুনরায় দখলদার হয়ে গিয়েছিল, তাই মুলতানে বারবার সৈন্য পরিচালনা করতে হয়েছিল। আর হিশামের আগে ইতিহাসে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। (তারিখ-ই-সিন্দ, পৃ. ১৫৭, টীকা)।

[৫] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৩৭। [৬] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৪৩৭।

কান্দাহার (গান্ধার) আক্রমণ করা হয়েছিল যা বৌদ্ধধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। হিশাম বিন আমর বুদ্ধের মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। [১]

হিশাম বিন আমর অত্যন্ত যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে চারদিকে শান্তি ও বরকত বিরাজমান ছিল। ১৫৭ হিজরিতে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি যখন রাজধানী বাগদাদে ফিরে যান, তখন তিনি খলিফা মনসুরের দরবারে এত মূল্যবান উপহার ও দুর্লভ সামগ্রী পেশ করেন যা এর আগে কোনো আমির পেশ করেননি। [২]

মা'বাদ বিন খলিল: (১৫৭ হিজরি থেকে ১৬০ হিজরি)

হিশাম বিন আমরের পর মনসুর আব্বাসি সিন্ধুর শাসনভার মা'বাদ বিন খলিলের হাতে অর্পণ করেন। তিনি খলিফা মাহদির আমল পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। ১৬০ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়। [৩]

মাহদি আব্বাসির আমলে

এখন খলিফা মাহদির শাসনকাল শুরু হলো যা দশ বছর স্থায়ী ছিল অর্থাৎ জিলহজ ১৫৮ হিজরি থেকে মহরম ১৬৯ হিজরি পর্যন্ত। এই দশ বছরে সিন্ধুর ছয়জন আমির পরিবর্তিত হন:

محمد بن معبد بن خليل: (১৬০ হিজরি)

মা'বাদ বিন খলিলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন মা'বাদ আমির হন কিন্তু মাহদি শীঘ্রই তাঁকে পদচ্যুত করেন। [৪]

روح بن حاتم: (১৬০ হিজরি)

মাহদি তাঁর উজির আবু উবাইদুল্লাহর পরামর্শে সিন্ধুর নতুন আমির হিসেবে রুহ বিন হাতিম মুহাল্লাবিকে নিযুক্ত করেন। [৫] কিন্তু এই সময়ে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে বসবাসকারী জাঠরা বিদ্রোহ শুরু করে যা রুহ বিন হাতিম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। ফলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। [৬]

بسطام بن عمرو: (১৬০ হিজরি)

এখন সিন্ধুর শাসনভার বিস্তাম বিন আমরকে দেওয়া হলো যিনি খলিফা মনসুরের আমলের সিন্ধুর সবচেয়ে সফল আমির হিশাম বিন আমরের ভাই ছিলেন এবং তাঁর মুলতান অভিযানের সময় সিন্ধুর নায়েব হাকেম (উপ-শাসক) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সেই হিসেবে তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

[১] ফুতুহুল বুলদান পৃ. ৪৩৭, তারিখ ইয়াকুবি ৩: ১১৩

[২] ফুতুহুল বুলদান পৃ. ৪৩৭, তারিখ ইয়াকুবি ৩: ১১৩

[৩] তারিখুত তাবারি ৮: ৫৩, ১১৭

[৪] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত পৃ. ৪৩১

[৫] তারিখুত তাবারি ৮: ১১৭

[৬] তারিখ ইয়াকুবি ৩: ১৩৯, তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত পৃ. ৪৩১, আল-কামিল ফিত তারিখ ১৬০ হিজরি, আল-কামিল ফিত তারিখ ১৫৯ হিজরি

তবে কিছু দিন পরেই তাকেও বরখাস্ত করা হয়েছিল। [১]

রুহ বিন হাতিম:

বিসতাম বিন আমরের পর রুহ বিন হাতিমকে পুনরায় আমির নিযুক্ত করা হয়। [২]

নাসর বিন মুহাম্মদ আল-আশআছ খুযায়ী: (১৬১ হিজরী)

রুহের পর নাসর বিন মুহাম্মদ আশআছ খুযায়ীকে এই পদ দেওয়া হয়। তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য সিন্ধুতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তার পেছনে পেছনে তার বরখাস্তের ফরমান চলে আসে। [৩]

মুহাম্মদ বিন সুলাইমান এবং আব্দুল মালিক বিন শিহাব: (১৬১ হিজরী)

এবার মুহাম্মদ বিন সুলাইমান বিন আলী হাশেমীকে এই পদ অর্পণ করা হয়। এই আমির সম্ভবত পূর্ববর্তী আমিরদের অবস্থা দেখে নিজে সিন্ধু যাওয়ার কষ্টটুকুও করেননি এবং নিজের পরিবর্তে আব্দুল মালিক বিন শিহাব নামক এক ব্যক্তিকে নায়েবে আমির হিসেবে সিন্ধুতে পাঠিয়ে দেন। [৪]

নাসর বিন মুহাম্মদ - পুনরায়: (১৬২ হিজরী)

আব্দুল মালিক বিন শিহাব বিশ দিনও পূর্ণ করতে পারেননি যে, খিলাফত দরবার থেকে নাসর বিন মুহাম্মদকে পুনরায় আমীর নিযুক্ত করার ফরমান এসে পৌঁছায়। নাসর বিন মুহাম্মদ বরখাস্ত হওয়ার পর সিন্ধুর রাজধানী মানসুরা থেকে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি মাত্র ছয় ফারসাখ (আঠারো মাইল) দূরে পৌঁছেছিলেন যে, তিনি নতুন ফরমান পান এবং ফিরে এসে পুনরায় হুকুমতের মসনদে বসেন। [৫]

যুবায়ের বিন আব্বাস: (১৬২ হিজরী)

মাত্র কয়েক দিন অতিবাহিত হয়েছিল যে, মাহদী আব্বাসীর মনে হলো হযরত কুসাম বিন আব্বাস (রা.)-এর বংশধরদের মধ্যে যুবায়ের বিন আব্বাস এই পদের জন্য অধিক উপযুক্ত। তাকে সিন্ধুর আমির বানিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। [৬]

মুসাতিহ বিন আমর তাগলিবি: (১৬৩ হিজরী থেকে ১৬৫ হিজরী)

কিন্তু যুবায়ের বিন আব্বাস সিন্ধুর রাজধানীতে পৌঁছানোর আগেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যায় এবং মুসাতিহ বিন আমর তাগলিবিকে এই পদ দেওয়া হয়। মুসাতিহ বিন আমর মনসুরের আমলের সিন্ধুর আমির হিশাম বিন আমর তাগলিবির ভাই ছিলেন। তিনি কোনো না কোনোভাবে কিছু সময় অতিবাহিত করেন। [৭]

এই আমিরদের অবস্থা, কর্মতৎপরতা এবং বরখাস্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ইতিহাস একেবারেই নীরব। তবে...

[১] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, আল-কামিল ফিত তারিখ: ১৬০ হিজরী

[২] তারিখুত তাবারী: ১৬০ হিজরী

[৩] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, তারিখুত তাবারী: ১৩০/৮

[৪] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, তারিখুত তাবারী: ১৩০/৮

[৫] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, তারিখুত তাবারী: ১৩০/৮

[৬] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, তারিখুত তাবারী: ১৩০/৮

[৭] তারিখ ইয়াকুবি: ১৩৬/৩, তারিখুত তাবারী: ১৩০/৮

ইয়াকুবী এই সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংকটের দিকে ইঙ্গিত করেছেন:

- এই সময়ে সিন্ধুর আরব আমিরদের মধ্যে গোত্রীয় আভিজাত্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।
- সেই দিনগুলোতে সিন্ধুতে জাঠরা এক বিপর্যয় সৃষ্টি করে রেখেছিল। [১]

সম্ভবত কিছু কর্মকর্তাকে এই সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং কাউকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়নি যাতে তারা কিছু করতে পারেন। কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছিল।

লাইস মাওলা মাহদী: (১৬৫ হিজরি থেকে ১৭০ হিজরি)

বিভিন্ন আমিরকে পরীক্ষা করার পর অবশেষে মাহদী তার গোলাম লাইসকে সিন্ধুর আমির হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি খলিফা মাহদীর কাছ থেকে একটি শক্তিশালী বাহিনী আনিয়ে জাঠদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এই সাফল্যের কারণে তিনি দীর্ঘ সময় শাসন করেন এবং মাহদীর মৃত্যুর পর হারুনুর রশীদের সময় পর্যন্ত সিন্ধুর আমির ছিলেন। [২]

খলিফা মাহদীর খেলাফতকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই হয়েছিল যে, সিন্ধু, হিন্দুস্তান, খোরাসান এবং চীনের বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল এবং এ বিষয়ে পত্র পাঠানো হয়েছিল। এর ফলে পনেরোজন শাসক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, যাদের মধ্যে সিন্ধুর একজন এবং হিন্দুস্তানের একজন রাজাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [৩]

হারুনুর রশীদের যুগে

হারুনুর রশীদের সিন্ধুর গভর্নরগণ নিম্নরূপ ছিলেন:

সালিম ইউনুসী:

হারুন লাইস মাওলা মাহদীকে বরখাস্ত করে সালিম ইউনুসীকে আমির নিযুক্ত করেন। তিনি একজন ভালো শাসক ছিলেন কিন্তু দীর্ঘ সময় শাসন করতে পারেননি।

ইসহাক বিন সুলাইমান হাশেমী: (১৭৪ হিজরি)

তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও নেককার বুজুর্গ ছিলেন। [৪] ১৭৪ হিজরিতে তিনি সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের আমির হয়ে আসেন। [৫] তাদের সিন্ধু...

[১] তারিখ ইয়াকুবী: ৩/ ১৩২

[২] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ৪৩১, আত-তারিখুত তাবারী: সন ১৬১ হিজরি, ১৬৩ হিজরি, তারিখ ইয়াকুবী: ৩/ ১৩৬

[৩] তারিখ ইয়াকুবী: ৩/ ১৩৬

এই রাজাদের সম্পর্কে কোথাও কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না যে তারা কারা ছিলেন এবং কোন কোন অঞ্চলে শাসন করতেন? সিন্ধুর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন লাইব্রেরিগুলোতে শত শত পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর ওপর গবেষণা করে তা প্রকাশের ব্যাপারে কোনো দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান মনোযোগ দিচ্ছে না। যদি এই পাণ্ডুলিপিগুলো প্রকাশিত হয়, তবে আশা করা যায় যে আমরা সেগুলোতে সিন্ধুর ইতিহাসের অনেক হারিয়ে যাওয়া তথ্য খুঁজে পাব।

[৪] তারিখ ইয়াকুবী: ৩/ ১৪২

[৫] তারিখ ইয়াকুবী: ৩/ ১৪৬

...থেকে অপসারণের তারিখ কেউ লিপিবদ্ধ করেনি কিন্তু যাই হোক তিনি দুই তিন বছর অবশ্যই শাসন করেছিলেন।

তৈফুর বিন আবদুল্লাহ বিন মনসুর হিময়ারী:

ইসহাক বিন সুলাইমানের পর তৈফুর বিন আবদুল্লাহ হিময়ারীকে সিন্ধুর ওয়ালী বানানো হয়েছিল। তার নিয়োগের পর সিন্ধুতে ইয়ামানী ও নিযারী বিবাদ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। [১]

কাসীর বিন সালম:

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সিন্ধুর শাসনভার সাঈদ বিন সালম বিন কুতায়বার নামে করে দেওয়া হয়েছিল, যিনি তা তার ভাই কাসীর বিন সালমের হাতে তুলে দেন। কিন্তু কাসীর একজন অযোগ্য শাসক প্রমাণিত হন। [২]

মুহাম্মদ বিন আদী:

এখন হারুন সিন্ধুকে ঈসা বিন জাফর বিন মনসুরের হাতে তুলে দেন। তিনি তার প্রতিনিধি হিসেবে মুহাম্মদ বিন আদী সা'লাবীকে সিন্ধুতে পাঠান। তার মানসুরায় পৌঁছানোর পর আরব গোত্রগুলো আবারও একে অপরের বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়। মুহাম্মদ বিন আদী এটি দেখে মুলতানকে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা করেন কিন্তু পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হন। [৩]

হারুন এরপর আবদুর রহমান (সম্ভবত আবদুর রহমান বিন আবদুল মালিক বিন সালেহ হাশেমী) এবং তারপর আইয়ুব বিন জাফর বিন সুলাইমানকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন। [৪]

দাউদ বিন ইয়াজিদ বিন হাতিম মুহাল্লাবী: (১৮৩ হিজরি থেকে ২০৫ হিজরি)

হারুনুর রশীদ সিন্ধুর আমীরদের রদবদল করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে তিনি আল-মুহাল্লাব পরিবারকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন, যারা উমাইয়া যুগে সিন্ধু ও খোরাসানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ওয়ালী ছিলেন। হারুন তাদের মধ্য থেকে একজন যোগ্য ব্যক্তি দাউদ বিন ইয়াজিদকে বেছে নেন। তিনি সিন্ধুতে গিয়ে অত্যন্ত সাহস ও কৌশলের সাথে সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। কয়েক মাস পর্যন্ত বিরোধী আরব গোত্রগুলোর সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে সিন্ধু ফিতনাবাজ উপাদান থেকে মুক্ত হয় এবং সিন্ধুর শাসনব্যবস্থা নতুন করে সুসংহত হয়। [৫]

দাউদ বিন ইয়াজিদ মামুনুর রশীদের শাসনামলে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। তার শাসনামলে সর্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় ছিল। একুশ বছর এই দায়িত্ব পালন করার পর ২০৫ হিজরিতে সিন্ধুতে তার মৃত্যু হয়। [৬]

[১] তারিখ ইয়াকুবী ৩:১৪২

[২] তারিখ ইয়াকুবী ৩:১৪২

[৩] তারিখ ইয়াকুবী ৩:১৪৬

[৪] তারিখ ইয়াকুবী ৩:১৪৬

[৫] তারিখ ইয়াকুবী ৩:১৪৭

[৬] নুযহাতুল খাওয়াতি ১:৫৩

মামুনুর রশীদের আমল

বিশর বিন দাউদ: (২০৫ হিজরি থেকে ২১৩ হিজরি)

দাউদ বিন ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র বিশর বিন দাউদ সিন্ধুর ওয়ালি হন। তার শুরুর সময়টা ভালোই কেটেছিল। কিন্তু শেষের দিকে তিনি সিন্ধুর খাজনা বাগদাদে পাঠাতে অবহেলা শুরু করেন। [১]

এটি প্রচার হয়ে যায় যে বিশর বিদ্রোহ করেছেন। এর প্রেক্ষিতে মামুন ২১৩ হিজরিতে গাসসান বিন আব্বাদকে সিন্ধুর শাসনের পরোয়ানা দিয়ে সেখানে পাঠান। গাসসান সেখানে পৌঁছে বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি। বিশর বিন দাউদ খিলাফতের দরবারের আদেশের সামনে মাথা নত করে পদটি তার হাতে তুলে দেন। [২]

গাসসান বিন আব্বাদ: (২১৩ হিজরি থেকে ২১৬ হিজরি)

গাসসান বিন আব্বাদ তিন বছর শাসন করেন এবং ভালো পারফরম্যান্স দেখান। [৩] সিন্ধুতে তিনি একবার ময়ূরের মাংস খেয়েছিলেন যা তার কাছে এতটাই পছন্দ হয়েছিল যে, যতদিন তিনি সিন্ধুতে ছিলেন, ময়ূরের মাংসই খেতে থাকেন। তার বক্তব্য ছিল যে, তিনি এর আগে কখনও এমন সুস্বাদু মাংস খাননি। [৪]

মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকি: (২১৬ হিজরি থেকে ২২১ হিজরি)

মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকি ছিলেন বারমাক পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার পিতা হারুনুর রশীদের আমলে সাম্রাজ্যের সর্বসর্বা ছিলেন, কিন্তু হারুনের আমলেই বারমাকিদের সমস্ত পদ থেকে অপসারিত করে হত্যা ও কারাবন্দী করা হয়েছিল।

অবশেষে মামুনুর রশীদের আমলে এই পরিবারের কিছু লোককে পুনরায় মাঝারি মানের পদ দেওয়া হয়, যাদের মধ্যে মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকিও ছিলেন। তিনি সিন্ধুর আমির গাসসান বিন আব্বাদের ডান হাত এবং অত্যন্ত লড়াকু সৈনিক ছিলেন।

যখন গাসসান বিন আব্বাদকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়, তখন সিন্ধুর বিষয়াদি তার হাতে ন্যস্ত করা হয়। তার শাসনকাল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল ছিল। গাসসানের আমলে সিন্ধুর রাজাদের মানসুরায় ডাকা হয়েছিল, কিন্তু একজন শাসক “রাজা বালা” (রাজপাল) অস্বীকার করেছিলেন। মুসা বিন ইয়াহইয়া তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা গ্রেফতার হওয়ার পর নিজের প্রাণের বিনিময়ে পাঁচ লক্ষ দিরহামের প্রস্তাব দেন, কিন্তু মুসা তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে রাজাকে হত্যা করা হয়। [৫]

মুসা বিন ইয়াহইয়ার আমলে সিন্ধুতে কোনো ধরনের অশান্তি ছিল না। সিন্ধু সরকারের সফল কৌশলের কারণে কেবল প্রতিবেশী হিন্দু রাষ্ট্রগুলোই সুসম্পর্ক বজায় রাখেনি, বরং হিজাজি ও নিজারি আরব গোত্রগুলো যারা ইয়ামানি গোত্রগুলোর বিরোধী...

[১] তারিখুত তাবারী, ২০৫ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২০৫ হিজরি

[২] তারিখু ইয়াকুবি: পৃষ্ঠা ১৯৩, ১৯৪

[৩] তারিখুত তাবারী: ২১৩ হিজরি

[৪] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা: পৃষ্ঠা ২২০

[৫] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮

...জাতীয় মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছিলেন। যদিও কিছু আলামত থেকে জানা যায় যে, সেই সময় নিয়ারিরা ভেতরে ভেতরে তাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একত্রিত করতে ব্যস্ত ছিল এবং উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

বনু আব্বাসের চরম উন্নতির যুগের সিন্ধুর শেষ শাসকগণ

ইমরান বিন মুসা বিন ইয়াহইয়া বারমাকি: (২২১ হিজরি থেকে ২২৫ হিজরি)

মুসার ইমারত চলাকালীন ২১৮ হিজরিতে মামুনুর রশিদ ইন্তেকাল করেছিলেন এবং এখন তার ভাই মুতাসিম খলিফা ছিলেন। ২২১ হিজরিতে মুসা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তার ছেলে ইমরানকে উত্তরসূরি বানিয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু মুসার শাসনকাল ভালো কেটেছিল, তাই খলিফা মুতাসিম আব্বাসি তার ছেলের কাছে নিয়োগপত্র পাঠিয়ে দেন। [১]

ইমরান বিন মুসা যখন সিন্ধুর শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বেলুচিস্তানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। কান্দাবিল (গান্ধাওয়া)-এর পাহাড়ে একজন স্বাধীন মুসলিম শাসক মুহাম্মদ বিন খলিল শাসন প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিলেন। ইমরান বিন মুসা আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন এবং কান্দাবিলকে পুনরায় আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে নিয়ে আসেন। ইমরান বিন মুসা বেলুচিস্তানে স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখার জন্য “বুকান” (বোলান)-এ “আল-বাইদা” নামে একটি নতুন শহর নির্মাণ করেন।

সে দিনগুলোতে “মেদ” গোষ্ঠীর জলদস্যুরা সিন্ধু নদের বদ্বীপ থেকে মুলতান পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে দখলদারিত্ব কায়েম করেছিল। ইমরান বিন মুসা এই জাতির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে তিন হাজার মেদ নিহত হয়। [২]

শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ইমরান বিন মুসা আরোর (রোহরি)-এর কাছে সিন্ধু নদের তীরে অবস্থান করেন। ইমরান এখানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করেন যা “সুকারুল মেদ” অর্থাৎ “মেদ ব্যারেজ” নামে পরিচিত হয়। [৩] মেদ জাতির দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলো। ইমরান বিন মুসা সেখানে সামরিক অভিযানের জন্য আরও বেশি প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং...

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪১৯

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮

[৩] وسكر سكرًا يعرف بسكر الميد وعسكر عمران على نهر الرور (ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮)

দ্রষ্টব্য: আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী রহ. “সুকারুল মেদ” বলতে সাক্কার (সুক্কুর) বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন: “অতঃপর ইমরান বারমাকি একটি সেতু তৈরি করেন যার নাম সুকারুল মেদ (মেদ-এর সেতু) রাখেন।” এছাড়াও ঢিকায় লিখেছেন: “খুবই সম্ভব যে আজ যে স্থানকে সাক্কার বলা হয়, এটি সেই স্থানই হতে পারে যাকে তারা ‘সুকারুল মেদ’ মনে করত। সেতু ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে ‘সুকার’ এবং তারপর ‘সুকার’ থেকে ‘সাক্কার’ (সুক্কুর) হয়ে গেছে।” (হাশিয়া তারিখ-এ-সিন্ধু, পৃষ্ঠা ৮৯)

লেখক আরজ করছেন যে, “সুকার” শব্দের অর্থ হলো এমন অস্থায়ী বাঁধ যা নদীর পানি আটকানোর জন্য এবং তা শহরগুলোতে বণ্টন করার জন্য তৈরি করা হয়, যাকে ইংরেজিতে “ব্যারেজ” (Barrage) বলা হয়। وسكر سكرًا: سد فاه، وكل شق سد، فقد سكر، والسكر ما سد به (লিসানুল আরব: খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৭)। যদিও এই বাঁধ থেকে সেতুর কাজও নেওয়া হয়, তবে তা গৌণ।

এর অর্থ দাঁড়ায় যে, “সুকার”-এর মূল অর্থ হলো “ব্যারেজ” এবং এই স্থানে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে ব্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে ধ্বংস হয়ে যায়। এটা খুবই সম্ভব যে এই ব্যারেজের নিকটবর্তী জনবসতিকে “সুকার” বা “সাক্কার” বলা হতে থাকে এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে ব্রিটিশ সরকারের নির্মিত “সাক্কার ব্যারেজ” (যা ১৯২৩ সালে শুরু হয়ে ১৯৩২ সালে সম্পন্ন হয়েছিল) এই স্থানেই বা এর কাছাকাছি নির্মিত হয়েছে। ওয়ালাহু আলামু বিস-সওয়াব।

মেদ জাতির দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা। ইমরান বিন মুসা সেখানে সামরিক অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং প্রথমে জাটদের বশীভূত করে তাদের ওপর জিজিয়া ধার্য করেন।

জাটদের সংগঠিত করার পর এবং তাদের সরদারদের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করার পর ইমরান বিন মুসা মেদ জাতির সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত আস্তানাগুলোর দিকে অগ্রসর হন। মেদদের আস্তানাগুলো ছিল বনের মধ্যে একটি নদীর তীরে। এই নদী থেকেই তারা সুপেয় পানি পেত। ইমরান বিন মুসা জাটদের দিয়ে খনন করিয়ে সমুদ্রের পানিকে এই নদীর সাথে মিশিয়ে দেন, যার ফলে শত্রু চরম কষ্টের সম্মুখীন হয়। এরপর ইমরান তাদের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ শুরু করেন এবং তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেন। [১]

ইমরানের বিজয়াভিযান অব্যাহত ছিল, এমন সময় খোদ সিন্ধুর নিজারি ও ইয়ামানি আরবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। যেহেতু সিন্ধুর আমিরদের নীতি ছিল নিজারিদের দমন করে রাখা, তাই ইমরান ইয়ামানি গোষ্ঠীকে সমর্থন করেন। কিন্তু ততক্ষণে নিজারিরা অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ফলে যুদ্ধের পরিণতিতে ইমরান বিন মুসা নিজারি গোষ্ঠীর সরদার উমর বিন আব্দুল আজিজের হাতে নিহত হন। [২] ইমরানের শাসনামলে সিন্ধু থেকে রাজধানী অভিমুখে যে রাজস্ব পাঠানো হতো, তার পরিমাণ ছিল বার্ষিক দশ লক্ষ দিরহাম। [৩]

২৩৫ হিজরিতে ইমরান বিন মুসার হত্যাকাণ্ডের পর সিন্ধুর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং স্থানে স্থানে দুর্গাধিপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। করদ হিন্দু রাজারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। [৪]

আনবাহ বিন ইসহাক দ্বাব্বি: (২৩৫ হি. হতে ২৪৩ হি.)

ইমরানের হত্যাকাণ্ডের পর সিন্ধুর শাসনভার আনবাহ বিন ইসহাককে অর্পণ করা হয়। তিনি সিন্ধুতে এসে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পূর্ববর্তী আমিরের হত্যাকাণ্ড থেকে সৃষ্ট ফিতনাগুলো দমন করেন। সকল বিদ্রোহী সরদার তার দরবারে উপস্থিত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সবচেয়ে বড় বিদ্রোহী সরদার উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারিও, যে পূর্ববর্তী আমিরকে হত্যা করেছিল, শান্ত থাকে। প্রকৃতপক্ষে হাববারির শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল এবং তার ওপর হাত দেওয়া সরকারের জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারত। এটি নতুন আমিরের বুদ্ধিমত্তা ছিল যে তিনি বিষয়টি অত্যন্ত সুচারুভাবে সামলে নেন, ফলে তার শাসনামল শান্তিপূর্ণ ছিল। তবে উসমান নামক এক সরদার যথারীতি ইবাদতে অনড় থাকায় আনবাহকে তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হয়। [৫]

আনবাহ সেই সময়ে অপরাধীদের তিরস্কার ও দণ্ড প্রদানের জন্য একটি বিশেষ কারাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। [৬] এই উদ্দেশ্যে তিনি দেবল শহরকে নির্বাচন করেন, যেখানে আরবদের আধিপত্য অত্যন্ত সুসংহত ছিল এবং যেকোনো সময় বসরা থেকে সেখানে সাহায্য আনা সম্ভব ছিল। দেবলে কারাগারের জন্য যদি কোনো নতুন ভবন নির্মাণ করা হতো, তবে তাতে প্রচুর

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৮

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৮

[৩] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লি ইবনে খুরদাদবিহ: পৃ. ৫৭

[৪] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২১৩

[৫] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২১৩

[৬] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪৩১

খরচ হতো। তাই আশ্বাসা দাইবেলের বিখ্যাত মন্দিরের মিনারের উপরের অংশটি ভেঙে ফেলেন এবং ছাদ দিয়ে সেটিকে কারাগারে পরিণত করেন। এভাবে কোনো বিশেষ খরচ ছাড়াই বিপজ্জনক অপরাধীদের রাখার জন্য একটি অত্যন্ত নিরাপদ ও মজবুত জায়গা তৈরি হয়ে গেল। মিনারের উপরের অংশ ভেঙে যে পাথর পাওয়া গিয়েছিল, তা এত বেশি ছিল যে তা দিয়ে শহরের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল। [১]

২৩৪ হিজরিতে এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, আশ্বাসাকে খেলাফতের কেন্দ্রের প্রতি নিজের আনুগত্যের প্রমাণ দেওয়ার জন্য সিন্ধুর আমীর পদ নিজে থেকেই ছেড়ে দিয়ে খলিফা মুতাওয়াক্কিলের কাছে যেতে হয়। [২]

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, আশ্বাসা বিন ইসহাক অত্যন্ত কঠোরভাবে সওম ও সালাত পালনকারী ছিলেন। তিনি সেনানিবাস থেকে পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে সালাত আদায় করতেন। তাঁর ন্যায়বিচার ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনি ফরিয়াদিদের সাহায্য করতেন এবং জালিমদের প্রতি বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেন না। রমজান মাসে তিনি নিজে অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সেহরির জন্য জাগিয়ে দিতেন। [৩]

হারুন বিন আবি খালিদ আল-মারওয়াজি: (২৩৪ হিজরি থেকে ২৪০ হিজরি)

মুতাওয়াক্কিল আব্বাসি আশ্বাসার স্থলে হারুন বিন আবি খালিদকে নিযুক্ত করেন, যিনি আশ্বাসার মতো সতর্ক কর্মপন্থা বজায় রাখতে পারেননি এবং তিনি সিন্ধুতে চলমান আরব গোত্রগুলোর দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন। আট বছর শাসন করার পর তিনি ইয়ামানি ও নিজারি গোষ্ঠীগুলোর দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে সিন্ধুতে নিহত হন। [৪]

এই পরিস্থিতিতে নিজারি গোষ্ঠীর নেতা উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারি সিন্ধুতে প্রভাব বিস্তার করেন এবং খলিফা মুতাওয়াক্কিল তাঁকে সিন্ধুর ওয়ালি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। মুতাওয়াক্কিলের জীবনের অবশিষ্ট সাত বছর উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারি সিন্ধুর আমীর ছিলেন। [৫]

২৪৭ হিজরিতে মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার পর হঠাৎ চারদিকে স্বাধীনতার ঢেউ আছড়ে পড়ে এবং সিন্ধুও আব্বাসিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায়। এই কারণেই ২৫৭ হিজরিতে আব্বাসি খলিফা আল-মুতামিদের নায়েব মুয়াফফাক সিন্ধুর শাসনভার সিজিস্তানের নতুন ভাগ্য অন্বেষণকারী ইয়াকুব বিন লাইস সাফফারির জন্য মেনে নেন। [৬]

২৬৫ হিজরিতে বাগদাদ খেলাফত ইয়াকুব বিন লাইস সাফফারির মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরি আমর বিন লাইসকে সিন্ধুর ওয়ালি হিসেবে মেনে নেয়। [৭]

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪৪১

[২] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২১৯

[৩] কিতাবুল উলাত লিল কিন্দি: পৃ. ১৫১

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪৪১, নুযহাতুল খাওয়াতির: ১/৫৬, ৫৮, তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২২১

[৫] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২২১

[৬] তারিখুত তাবারি: ৯/৩৭৯, আল-কামিল ফিত তারিখ: ৬/২৯৮

[৭] তারিখুত তাবারি: ২৬৫ হিজরি, আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৬৫ হিজরি, আমর বিন লাইস যখন শাসক হন তখনও বাগদাদে আব্বাসি খলিফা মুতামিদের যুগ ছিল।

সিন্ধুর স্বায়ত্তশাসিত সরকারসমূহ

সিন্ধু নিজেই একটি অত্যন্ত বিশাল ভূখণ্ড যা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিচিত। তৃতীয় হিজরি শতকের ঐতিহাসিক ইবনে খুরদাদবিহ (মৃত্যু ২৮০ হিজরি) এর মতে, ‘সিন্ধু’র জেলাগুলোর মধ্যে দেবল ও সেহওয়ান ছাড়াও পাঞ্জাবের মুলতান শহর এবং বেলুচিস্তানের মাকরান, খজদার, কান্দাবিল ও কাইকান শহরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া গুজরাটের সানদান, ভরুচ, মাভাল ও খাম্বাত শহরগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো। [১]

এই সমস্ত এলাকা উমাইয়া যুগে জয় করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কিছু বিদ্রোহের কারণে আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ও মাহদীর যুগে এগুলো পুনরায় জয় করা হয়। মুসলমানরা এই ভূখণ্ডকে ঈমান ও ইরফান এবং ইলম ও হিকমত দ্বারা আবাদ করেছিলেন। এই যুগে এখানে মানসুরা ও দেবলের মতো শহরগুলো কুফা ও বসরার সমকক্ষ হতে শুরু করেছিল। এখানকার বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থা এমন ছিল যে, একদিকে বাণিজ্যিক কাফেলাগুলো স্থলপথে খোরাসান, মধ্য এশিয়া, ইরান ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত যেত, অন্যদিকে সমুদ্রপথে বসরা, বাগদাদ, ইয়েমেন ও মিশরের উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এই যুগের আলেমগণ এখানকার প্রতিটি শহর ও গ্রাম সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁরা এই সমস্ত স্থানের ইতিহাস, তাদের অবস্থান, অন্য শহর থেকে দূরত্ব এবং সেখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করতে থাকেন। এখানে আলেম ও ফকিহদের আধিক্যের অবস্থা এমন ছিল যে, আসমাউর রিজালের কিতাবসমূহে সিন্ধুর রাবী, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও হেকিমদের উল্লেখ ঠিক সেভাবেই পাওয়া যায় যেভাবে বাগদাদ, দামেস্ক ও ফুসতাতের ইলম ও ফনুন বিশেষজ্ঞদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুতে মুসলমানদের বড় কেন্দ্র ছিল এই দুটি শহর—মানসুরা ও দেবল, যেখানে উমাইয়া বা আব্বাসীয় খলিফাদের আমির নিযুক্ত হতেন।

তৃতীয় হিজরি শতকে আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্বল হয়ে পড়ার পর কেন্দ্রবিমুখ আন্দোলনগুলো জোরদার হয় এবং এভাবে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ডজন ডজন স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে জাজিরাতুল আরব ও ইরাকের কারামিতা রাষ্ট্র, ইরানের বনু বুওয়াইহ রাষ্ট্র এবং আফ্রিকার বনু উবাইদ রাষ্ট্র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। এই সরকারগুলো কেবল চরমপন্থী শিয়া ছিল না বরং আব্বাসীয় খলিফাদের ঘোর বিরোধীও ছিল। এগুলো ছাড়াও মধ্য এশিয়া ও খোরাসানেও অনেক সরকার গঠিত ও বিলুপ্ত হতে থাকে যাদের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন মূলত অনারব (আজমি)। একইভাবে সিন্ধুতেও স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাদের অধিকাংশই আব্বাসীয় খলিফাদের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য বজায় রাখত, যদিও কিছু রাষ্ট্র খেলাফতের কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল।

[১] আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক: পৃষ্ঠা ৫৮, ৫৯

তারিখে উম্মতে মুসলিমা | খিলাফতে বনু আব্বাস

এগুলোর মধ্যে নিচের ছয়টি সরকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

নম্বর সরকার রাজনৈতিক কেন্দ্র সময়কাল মর্যাদা

১ দৌলতে মাহানিয়া সঞ্জান, গুজরাট ১৯৮ হিজরি থেকে ২২৭ হিজরি আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত

২ দৌলতে হাববারিয়া মানসুরা, সিন্ধু ২৭১ হিজরি থেকে ৪১৬ হিজরি আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত

৩ দৌলতে সামিয়া মুলতান ২৮০ হিজরি থেকে ৩৭০ হিজরি আব্বাসীয় খিলাফতের সাথে যুক্ত

৪ দৌলতে ইসমাইলিয়া মুলতান ৩৭৫ হিজরি থেকে ৩৮৩ হিজরি পুনরায় ৩৯৩ হিজরি থেকে ৪০১ হিজরি বনু উবাইদ (মিশর)-এর সাথে যুক্ত

৫ দৌলতে মা'দানিয়া মাকরান, বেলুচিস্তান ৩৩০ হিজরি থেকে ৪৭১ হিজরি স্বাধীন

৬ দৌলতে মুনতাকিলিয়া মুশকি, বেলুচিস্তান ৩৩০ হিজরি থেকে ৪৭১ হিজরি স্বাধীন

+++

দৌলতে মাহানিয়া, সানজান (গুজরাট)

সানজানকে “সানদান”ও বলা হয়েছে। মরহুম আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভীর মতে, এই স্থানটি কচ্ছ, কাথিয়াওয়ার এবং তৃতীয় দিকে রাজপুতানা ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। [১]

কিন্তু মরহুম কাজী আতহার মুবারকপুরীর মতে, সানদান বোম্বে থেকে উত্তর দিকে ১৪৫ কিলোমিটার এবং সুরাট থেকে দক্ষিণ দিকে ১১৮ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি উপকূলীয় শহর, যাকে বর্তমানে “সানজান” বলা হয়। এখন এর মর্যাদা কেবল একটি সাধারণ রেলওয়ে স্টেশনে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, অথচ মুসলিম যুগে এটি একটি বিশাল বাণিজ্যিক বন্দর এবং জ্ঞান ও গুণাবলির কেন্দ্র ছিল। [২]

দৌলতে মাহানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ফজল বিন মাহান:

সানজানকে মামুনুর রশীদ আব্বাসীর যুগে ফজল বিন মাহান জয় করেছিলেন, যিনি বনু সামার একজন মুক্ত দাস ছিলেন। তিনি মামুনের দরবারে উপহার হিসেবে একটি হাতি পাঠিয়ে আব্বাসী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব প্রদানের আবেদন করেন, যা মামুনুর রশীদ গ্রহণ করেন। ফজল বিন মাহান এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন যেখানে জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবায় মামুনুর রশীদের জন্য দোয়া করা হতো। [৩] এখানে মুসলমান ও হিন্দুরা মিলেমিশে বসবাস করত। এখানে জামে মসজিদও ছিল এবং হিন্দুদের মন্দিরও ছিল। [৪] স্থানীয় লোকেরা লম্বা চুল রাখত এবং প্রায়ই কেবল একটি লুঙ্গি পরিধান করত কারণ এখানকার আবহাওয়া ছিল উষ্ণ। [৫] এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান চাষ করা হতো। [৬] উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে নারিকেল, কলা, মধু এবং আম উল্লেখযোগ্য ছিল। তবে এখানে খেজুর উৎপন্ন হতো না। [৭] এখানকার বনগুলো সেগুন কাঠের জন্য বিখ্যাত ছিল। [৮] এখানকার মরিচও সারা বিশ্বে পছন্দ করা হতো। [৯]

[১] তারিখ-এ-সিন্ধু, আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী, পৃষ্ঠা ১৮৮, ১৮৯

[২] হিন্দুস্তানে আরবদের শাসন, পৃষ্ঠা ৫৩

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৪৯, ৪৪৮

[৪] হুদুদুল আলম মিনাল মাশরিক ইলাল মাগরিব: পৃষ্ঠা ৮৩

[৫] আহসানুত তাকাসিম ফি মা'রিফাতিল আক্বালিম লিল মাকদিসি: পৃষ্ঠা ৩৮১

[৬] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লিল ইস্তাখরি: পৃষ্ঠা ১৭১

[৭] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লি ইবনে খুরদাদবিহ: পৃষ্ঠা ৬৩

[৮] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লি ইবনে খুরদাদবিহ: পৃষ্ঠা ৭১

মুহাম্মদ বিন ফজল

ফজল বিন মাহানের পর তার পুত্র মুহাম্মদ বিন ফজল এই রাষ্ট্রের শাসক হন। তার আমলে এই রাষ্ট্রের শক্তি তুঙ্গে ছিল। তার নৌবহরকে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের শক্তিশালী নৌবহরগুলোর মধ্যে গণ্য করা হতো। সেই সময়ে আরব সাগরে জলদস্যুদের একাধিপত্য ছিল, যারা যাতায়াতকারী জাহাজগুলো লুট করত। মুহাম্মদ বিন ফজল তাদের বিরুদ্ধে এক বিশাল অভিযান শুরু করেন, যার শেষ পর্যায়ে তিনি সত্তরটি যুদ্ধজাহাজের বহর নিয়ে জলদস্যুদের দমনের জন্য বের হন এবং তাদের এমনভাবে নির্মূল করেন যে তারা দীর্ঘকাল আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।

এই বিজয়ের পর মুহাম্মদ বিন ফজল তার রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করেন এবং “ফালি” (পালিথানা)-ও জয় করেন। [১] কিন্তু ঠিক সেই সময়ে যখন মুহাম্মদ বিন ফজলের নেতৃত্বে সিনদান রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হচ্ছিল, তার ভাই মাহান বিন ফজল ক্ষমতার লোভে তার বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহ করে রাজধানী দখল করে নেয়। [২]

+++

মাহান বিন ফজল

ততদিনে খলিফা মামুনের রশিদের মৃত্যু হয়েছিল এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মুতাসিম বিল্লাহ। মাহান বিন ফজল তার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে নিজেকে খেলাফতের কেন্দ্রের অনুগত হিসেবে বিশ্বাস করান এবং খলিফার সন্তুষ্টির জন্য সেগুন কাঠের এমন দীর্ঘ ও চমৎকার কাঠ উপহার হিসেবে পাঠান যার উদাহরণ পৃথিবীতে কোথাও পাওয়া যেত না।

তবে মাহান বিন ফজল তার প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতে পারেননি এবং কিছুকাল পর স্থানীয় হিন্দু কর্মকর্তারা বিদ্রোহ করে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয় এবং শূলে চড়ায়। এই সাফল্যের পর হিন্দু কর্মকর্তারা নিজেরাই সিনদান দখল করে নেয়। যদিও তারা বনু আব্বাস খেলাফতের সাথে উত্তেজনা এড়াতে স্থানীয় মুসলমানদের সাথে সহনশীল আচরণ বজায় রেখেছিল এবং জামে মসজিদ তাদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছিল, কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার ফলে “সিনদান ইসলামি রাষ্ট্র”-এর পতন ঘটে। [৩]

সিনদান রাষ্ট্রের মোট স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় ২৯ বছর। এর সূচনা হয়েছিল মামুনের আমলে এবং সমাপ্তি ঘটে মুতাসিম বিল্লাহর সময়ে।

+++

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮, ৪২৯। মরহুম কাজী আতহার মুবারকপুরীর গবেষণা অনুযায়ী, পালিথানা হলো “সৌরাষ্ট্রের” ঘোগা বন্দরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত দুর্গের নাম। (হিন্দুস্তানে আরবদের শাসন, পৃষ্ঠা ৪৪)

[২] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮, ৪২৯।

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪২৮, ৪২৯।

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমাহ

দৌলতে হাব্বারিয়া, মানসুরা

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে সিন্ধুর ওপর আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল দেখে একজন নিজারি কুরাইশি সরদার উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারি মানসুরাকে কেন্দ্র করে নিজের স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করেন যা “দৌলতে হাব্বারিয়া” নামে পরিচিত হয়। এই সরকার ২৪০ হিজরি থেকে প্রায় ৩০১ হিজরি পর্যন্ত অর্থাৎ দেড় শতাব্দীরও বেশি সময় স্থায়ী ছিল। [১]

বনু হাব্বারের আদি পুরুষ ছিলেন হাব্বার বিন আসওয়াদ (রা.) নামক একজন সাহাবি। তিনি কুরাইশ বংশের বনু আসাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর হাতেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কন্যা সাইয়েদা যয়নাব (রা.) মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার সময় বর্শার আঘাত পেয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর হাব্বার বিন আসওয়াদ খেদমতে আকদাসে উপস্থিত হয়ে তওবা করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) নজিরবিহীন রহমতের আচরণ করে তাঁকে ক্ষমা করে দেন। হাব্বার বিন আসওয়াদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে তাতে অবিচল থাকেন। [২]

সিন্ধু বিজয়ের সময় হাব্বার বিন আসওয়াদ (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কিছু লোক এখানে আসেন। হাব্বারের প্রপৌত্র মুনযির বিন যুবাইর (বিন আব্দুর রহমান বিন হাব্বার) ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুতে সিন্ধুর আমির হাকাম বিন আওয়ানা কালবির সাথে সিন্ধুতে এসেছিলেন। [৩]

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারির উত্থান:

দৌলতে বনু আব্বাস প্রায় সোয়া শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ণ জৌলুসের সাথে বিশ্বের দিগন্তে ছেয়ে ছিল কিন্তু তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এতে গ্রহণ লেগে যায়। এটি ছিল খলিফা ওয়াসিক আব্বাসীয়র যুগ যাতে সিন্ধুর নিজারি এবং ইয়ামানি আরব কর্মকর্তাদের মধ্যে গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই টানাপোড়েনের মধ্যে বনু হাব্বারের একজন কর্মকর্তা উমর বিন আব্দুল আজিজ বিন মুনযির হাব্বারির উত্থান ঘটে যার সম্পর্ক ছিল সিন্ধুর শহর “বানিয়া”র সাথে। [৪]

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাব্বারি নিজারিদের পক্ষ নেন। অন্যদিকে সিন্ধুর আমির ইমরান বিন মুসা আপস-মীমাংসা করার পরিবর্তে পক্ষভুক্ত হয়ে ইয়ামানিদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। পরিশেষে উভয় পক্ষের এই লড়াই ও হত্যাকাণ্ডে ইমরান বিন মুসা নিহত হন। [৫]

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২০ থেকে ৪২৭

[২] আল-ইসতিয়াব: ১৫৩৬/৪, আল-ইসাবাহ: ৩১৩ থেকে ৩১১/৬

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৮

[৪] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লিল ইস্তাখরি: পৃ. ১৭৬। এই ছোট শহরটি রাজধানী মানসুরা থেকে কিছু দূরে পাঞ্জাবের দিকে সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল। (নুযহাতুল মুশতাক: পৃ. ১৭০)

[৫] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৪২৮

এই বিজয় উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারিকে নওয়ারি আরবদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তোলে। তবে বহু বছর পর্যন্ত উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারি নিজের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করেননি। তা সত্ত্বেও তার শক্তি ও মর্যাদা এমন ছিল যে, যখনই আব্বাসীয়দের কোনো ওয়ালি সিন্ধুতে নিযুক্ত হতেন, সেই ওয়ালি প্রথমে এসে উমর হাববারির সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তারপর নিজের অর্পিত শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। [১]

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারির আমীরত্ব:

২৪০ হিজরিতে যখন সিন্ধুর ওয়ালি হারুন বিন আবি খালিদ ইন্তেকাল করেন, তখন উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারি খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলকে পত্র লিখে আবেদন করেন যে, যদি সিন্ধুর শাসনভার তার ওপর অর্পণ করা হয় তবে তিনি এর ব্যবস্থাপনা সুচারুভাবে পরিচালনা করবেন। খলিফা মুতাওয়াঙ্কিল তা মঞ্জুর করেন। এভাবে মুতাওয়াঙ্কিলের অবশিষ্ট শাসনামলে উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারি সিন্ধুর আমীর হিসেবে শাসন করেন। [২]

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারির স্বায়ত্তশাসন:

২৪৭ হিজরিতে বনু আব্বাসের মহান খলিফা মুতাওয়াঙ্কিলের ইন্তেকালের সাথে সাথেই আব্বাসীয়দের উত্থানের যুগ শেষ হয়ে যায় এবং চারদিকে স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রবিমুখতার ঝড় বইতে শুরু করে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারিও সিন্ধুতে নিজের স্বাধীন সরকার কায়েম করেন যার রাজধানী ছিল ‘মানসুরা’। [৩]

হাববারি রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত বনু আব্বাসের সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল এবং এখানে বনু আব্বাসের খলিফাদের নামে খুতবা পাঠ করা হতো। [৪]

আব্দুল্লাহ বিন উমর হাববারি:

উমর বিন আব্দুল আজিজ হাববারির ইন্তেকালের পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ বিন উমর হাববারি শাসনভার গ্রহণ করেন। হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা ও শাসকদের সাথে তার অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল এবং হাববারি রাষ্ট্র তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিত এবং শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত রাখত। [৫]

আব্দুল্লাহ বিন উমর হাববারির যুগে সিজিস্তান ও খোরাসানের নবীন ‘সাফারি রাষ্ট্র’ উন্নতির শিখরে ছিল, তাই ২৫৭ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা মুওয়াফফাক সিন্ধুর শাসনভার তাদের নামে করে দেন [৬] অর্থাৎ সিন্ধুর ওয়ালি আব্দুল্লাহ বিন উমর হাববারি এখন খোরাসানের সাফারি শাসকদের প্রতিনিধি হয়ে যান। যাই হোক, এই অন্তর্ভুক্তি ছিল আনুষ্ঠানিক, এই কারণেই হাববারি রাষ্ট্র নিজের অবস্থানে অটুট ছিল। বনু হাব্বারের এতে এই লাভ হয়েছিল যে, সাফারিরা যারা ঝড়ের মতো খোরাসান, ইরান ও ইরাককে পদানত করে চলছিল, তারা কখনো সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি।

[১] জমহরাতু নাসাবি কুরাইশ লি ইবনে বাক্কার: পৃ. ৫২০

[২] তারিখ ইয়াকুবি: ৩/২২৩, ত. হায়দারিয়া নাজাফ

[৩] জমহরাতু আনসাবিল আরব লি ইবনে হাজম: পৃ. ১১৮, ১১৯

[৪] সুরাতুল আরদ লি ইবনে হাওকাল: পৃ. ৩২০; আহসানুত তাকাসিম: পৃ. ৪৮৫

[৫] হিন্দুস্তান মে আরব কি হুকুমাতেন আয কাজী আতহার পৃ. ৯১ থেকে ৯৩, বরাতে আজায়িবুল হিন্দ আয বুজুর্গ বিন শাহরিয়ার

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: সন ২৫৭ হিজরি

মুসা বিন উমর হাববারি:

আবদুল্লাহ বিন উমর হাববারির পর তার ভাই মুসা বিন উমর হাববারি শাসক হন। ২৭৯ হিজরিতে তিনি আব্বাসীয় খলিফা মুতাদিদ-এর কাছে কিছু উপহার পাঠান, যার মধ্যে একটি বিশাল হাতি ছিল যার কোনো নজির আগে দেখা যায়নি, এটি ছিল কালো রঙের এবং এর আকার ছিল প্রায় একটি গরুর সমান। এ ছাড়া এতে কস্তুরী, আম্বর, রেশম এবং রূপার তিনটি মূর্তিও ছিল। [১]

উমর বিন আবদুল্লাহ বিন উমর হাববারি:

মুসার পর তার ভাতিজা উমর বিন আবদুল্লাহ বিন উমর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সময়কাল ছিল তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর শেষভাগ এবং চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর শুরুর দিকে। তিনি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তার সেনাবাহিনীতে আশিটি হাতি এবং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। [২]

উমর বিন আবদুল্লাহর দুই ছেলে ছিল: মুহাম্মদ এবং আলী। [৩] কোনো ঐতিহাসিক এটি স্পষ্ট করেননি যে তাদের মধ্যে কে তার পিতার উত্তরসূরি হয়েছিলেন। তবে ধারণা করা হয় যে তাদের মধ্যে মুহাম্মদ বিন উমর রাজা হয়েছিলেন কারণ পরবর্তীতে রাজত্ব তার বংশেই চলতে থাকে।

ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ এবং তার নিজের নামে খুতবা জারি করা:

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর শেষার্ধ্বে হাববারিদের একজন শাসক ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ অতিবাহিত হয়েছেন। সম্ভবত তিনি শাহজাদা মুহাম্মদ বিন উমরের ছেলে ছিলেন। পুরো সিন্ধু তার অধীনে ছিল। তিনি নিজের নামে খুতবা জারি করেছিলেন। [৪]

হাববারি রাষ্ট্রে বুওয়াইহি শাসক আযুদুদৌলার খুতবা:

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে পুরো ইরান ও ইরাকে বনু বুওয়াইহ-এর ইসনা আশারি আমিরদের আধিপত্য ছিল। আব্বাসীয় খলিফারা তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন এবং দূরবর্তী রাজ্যগুলোও তাদের থেকে ভীত ছিল। ৩৬৮ হিজরিতে আব্বাসীয় খলিফা তায়ি' বুওয়াইহি শাসক আযুদুদৌলার ইশারায় এই ফরমান জারি করেন যে ভবিষ্যতে আযুদুদৌলার নামে খুতবা পাঠ করা হবে। [৫]

হাববারি পরিবারও বুওয়াইহিদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে এবং সেখানে বুওয়াইহি শাসক আযুদুদৌলার (মৃত্যু ৩৭২ হিজরি) খুতবা পাঠ করা হতে থাকে। তবে পরবর্তীতে তাদের কাছে পুনরায় বনু আব্বাসের খুতবা পাঠ করা শুরু হয়। [৬]

হাববারি রাষ্ট্রের সমাপ্তি:

আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী মরহুমের গবেষণা অনুযায়ী হাববারি রাষ্ট্রের সমাপ্তি ইসমাইলি দাঈদের হাতে হয়েছিল। ৪০১ হিজরিতে তাদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র মুলতান গজনভি বাহিনীর হাতে বিজিত হয়েছিল। যেহেতু ইসমাইলি দাঈরা সর্বদা কোথাও না কোথাও নিরাপদ কেন্দ্র খুঁজতে থাকে, তাই মুলতান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর অনিবার্যভাবে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল মানসুরা, যেখানে ইসমাইলি...

[১] আদ-দাখায়ের ওয়াত তুহাফ লিল কাযী রশিদ বিন জুবায়ের (আল-কারনুল খামিস আল-হিজরি): পৃ: ৭৩, ত: কুয়েত

[২] মুরুজুজ জাহাব: ৪০০/১, ত: লেবানন

[৩] মুরুজুজ জাহাব: ৪০০/১, ত: লেবানন

[৪] মু'জামুল বুলদান: ৪৪৭/৩

[৫] তারিখুল খুলাফা: পৃ: ২৯২

[৬] আহসানুত তাকাসিম লিল বাশারি আল-মাকদিসি: ৩৪০ হিজরি, পৃ: ৪৮৫

দাঈ মানসুরা দখল করে হাববারিদের নির্মূল করেছিলেন, তার নাম ছিল ‘খাফিফ’।

মানসুরা তিনি কবে দখল করেছিলেন? আর হাববারিদের পতন কবে হয়েছিল? এর সঠিক তারিখ জানা সম্ভব হয়নি। যাই হোক, এটি ৪০১ হিজরি থেকে ৪১০ হিজরির মধ্যবর্তী কোনো বছর ছিল।

হাববারি রাষ্ট্র নির্মূলকারী ইসমাইলিদের ওপর সুলতান মাহমুদ গজনভির আক্রমণ:

সুলতান মাহমুদ গজনভি কিছুকাল মানসুরার ওপর ইসমাইলিদের দখলদারিত্বকে উপেক্ষা করেছিলেন। সম্ভবত মানসুরা দখলকারী ইসমাইলিরা সেই সময় পর্যন্ত তাকিয়া অবলম্বন করে তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রকাশ্য প্রচার থেকে বিরত ছিল এবং নিজেদের সাধারণ মুসলমানদের মতো প্রকাশ করছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ল। সুলতান মাহমুদ গজনভি ৪১৬ হিজরিতে যখন গুজরাট আক্রমণ করে সোমনাথ জয় করেন, তখন ফেরার পথে সিন্ধু হয়ে মুলতান যাওয়ার সংকল্প করেন। এই সময়ে সুলতান জানতে পারেন যে, মানসুরার শাসক কারামাতি হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে মানসুরার শাসক ‘খাফিফ’ আগে থেকেই বাতিনি ইসমাইলি ছিল, কিন্তু সুলতান তার বাতিনি হওয়ার কথা ৪১৬ হিজরিতেই জানতে পেরেছিলেন। তাই সুলতান এখন তাকে দমন করতে দেরি করেননি এবং মানসুরা আক্রমণ করেন। মানসুরার শাসক প্রতিরোধের শক্তি না দেখে মেহরান উপকূলের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সুলতানের বাহিনী জঙ্গলটিকে উভয় দিক থেকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে মানসুরার শাসক তার অনেক সঙ্গীসহ নিহত হয়। [১]

এভাবে হাববারি রাষ্ট্রের পতনের পর তা দখলকারী ইসমাইলিরাও শীঘ্রই তাদের পরিণতির শিকার হয়।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৬ হিজরি, তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৪৯৩।

৮১০

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

সামিয়া রাষ্ট্র (বনু মুনাবিহ) মুলতান

মুলতান মূলত সংস্কৃতির দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: “মূল” অর্থাৎ শিকড় এবং “স্থান” অর্থাৎ জায়গা। সুতরাং মুলতানের অর্থ হলো: আদি স্থান। [১] মুহাম্মদ বিন কাসিম ৯৫ হিজরিতে মুলতান জয় করেন, যার পর এই অঞ্চলটি ইতিহাসের ধুলোয় আড়ালে চলে যায় এবং দীর্ঘ সময় ধরে এর সম্পর্কে ইতিহাস নীরব থাকে। এই সময়ে সিন্ধু প্রথমে উমাইয়া এবং পরে আব্বাসীয় আমিরদের শাসনাধীন ছিল, কিন্তু মুলতান বিচ্ছিন্ন ছিল, যা থেকে স্পষ্ট হয় যে সেখানে কোনো পৃথক সরকার ছিল।

মনসুর আব্বাসীর আমলে যখন হিশাম বিন আমরকে সিন্ধুতে নিযুক্ত করা হয়, তখন তার উপদেষ্টারা তাকে বলেছিলেন: “আপনার জন্য মানসুরা যথেষ্ট নয় যখন মুলতান একটি অত্যন্ত বিশাল রাষ্ট্র।” এই প্ররোচনায় হিশাম বিন আমর মুলতান জয়ের চেষ্টা করেন। তার আগমনে মুলতানের শাসক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয় যাতে হিশাম বিজয়ী হন এবং মুলতানের শাসক পালিয়ে যান। হিশাম মুলতান দখল করে সেখানে প্রচুর সংখ্যক মানুষকে বন্দী করেন। [২]

মনে হয় যে শীঘ্রই মুলতান তার স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধার করেছিল কারণ হারুনুর রশিদের আমলে সিন্ধুর আমির মুহাম্মদ বিন আদি মুলতানকে পুনরায় বশীভূত করার চেষ্টা করেছিলেন যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। মুহাম্মদ বিন আদি তার সমস্ত সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মানসুরায় ফিরে আসেন। [৩]

মনে হয় যে মুহাম্মদ বিন আদির শোচনীয় পরাজয়ের পর আব্বাসীয়রা মুলতানের চিন্তা ত্যাগ করেছিল। এই কারণেই প্রায় এক শতাব্দীর জন্য মুলতান আবারও ইতিহাসের পাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যখন আব্বাসীয়দের পতন শুরু হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেই সময়ে আমরা মুলতানে একটি আরব পরিবার বনু সামা বিন লুয়াই বিন গালিবকে শাসক হিসেবে দেখতে পাই এবং ঐতিহাসিক মাসউদির মতে, এই পরিবারের মুলতানে শাসন মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফির পর থেকেই চলে আসছিল।

এই পরিবারটি কারা ছিল?

প্রশ্ন জাগে যে এই পরিবারটি কারা ছিল? এর উত্তরে নিম্নলিখিত সম্ভাবনাগুলো সামনে আসে:

- ১. একটি সম্ভাবনা হলো এটি মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফির পরিবার। মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি সেই আরবদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা...

[১] অতঃপর মুলান্তান অর্থাৎ আদি স্থান, কারণ ‘মূল’ হলো আদি এবং ‘তান’ হলো স্থান। (কিতাবুল হিন্দ: পৃষ্ঠা ২২৩)

[২] তারিখ-এ-ইয়াকুবি: ৩/ ১২৬, ফুতুহুল বুলদান: পৃষ্ঠা ৪৩৭

[৩] তারিখ-এ-ইয়াকুবি: ৩/ ১৪৬

প্রথম হিজরি শতাব্দীতে তারা নিজেদের গোত্রসহ মাকরানে এসেছিলেন। ৭৮ হিজরিতে যখন মাকরানে সাঈদ বিন আসলামের শাসন ছিল এবং তিনি আলাফি পরিবারের কিছু লোককে হত্যা করালেন, তখন আলাফি পরিবার উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং এই পরিবারের একজন প্রধান মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি, যার বংশীয় সম্পর্ক ছিল বনু সামা বিন লুয়াইয়ের সাথে, বিদ্রোহ করে দিলেন এবং সাঈদ বিন আসলামকে হত্যা করে মাকরান দখল করে নিলেন [১]।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অভিযানের আগে মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি পালিয়ে রাজা দাহিরের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং তার বাহিনীর একজন অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সাথে যুদ্ধে রাজা দাহির নিহত হলে তার ছেলে জয়সিংহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। যখন জয়সিংহও পিছু হটলেন, তখন আলাফি কাশ্মীরের রাজার কাছে চলে যান, যিনি তাকে কাশ্মীরের শহরতলী এলাকা “শাকালহার” জায়গির হিসেবে প্রদান করেন [২]। উমাইয়া খলিফারা মুহাম্মদ বিন কাসিমকে অপসারিত করে ইয়াজিদ বিন আবি কাবশাকে বিজিত অঞ্চলগুলোর নায়েব আমির নিযুক্ত করলে তিনি শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করেন এবং এরপর প্রায় দুই দশক পর্যন্ত এখানে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করে। হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজের প্রচেষ্টায় জয়সিংহ বিন দাহিরসহ কিছু হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের আমলে তারা বিদ্রোহ করেন। যদিও জুনাইদ বিন আব্দুর রহমান এসে তাদের দমন করেন কিন্তু তিনি মুলতান পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। এই পরিস্থিতি থেকে ধারণা করা হয় যে, ১১০ হিজরির আগেই মুলতান উমাইয়াদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় এটা অসম্ভব নয় যে, মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি বা তার গোত্র মুলতান দখল করে নিয়েছিল এবং তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে আমরা যে বনু সামা পরিবারকে মুলতানের শাসক হিসেবে দেখি, তারা মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফিরই বংশধর।

একটি সম্ভাবনা এই যে, এরা দাউদ বিন নাসরের বংশধর। দাউদ বিন নাসরকে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান জয় করে এখানকার আমির নিযুক্ত করেছিলেন [৩]। মুহাম্মদ বিন কাসিমের অপসারণ ও গ্রেফতারির পর উদ্ভূত হাঙ্গামাপূর্ণ পরিস্থিতিতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দাউদ বিন নাসর মুলতানে নিজের স্বাধীন সরকার কায়েম করে নেন এবং তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর নথিপত্রে উল্লিখিত বনু সামা মুলতান রাষ্ট্রটি এই দাউদ বিন নাসরেরই বংশধর হবে, কারণ দাউদ বিন নাসরের সম্পর্ক ছিল ওমান থেকে [৪] যেখানে বনু সামা গোত্র বিকশিত হয়েছিল [৫]। এজন্য তাকে যদি দাউদ সামা বলা হয় তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মুলতানের এই শাসকরা “বনু সামা” ছাড়াও “বনু মুনাবিহ” নামেও পরিচিত ছিলেন। এর কারণ হলো তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে এই পরিবারে মুনাবিহ বিন আসাদ নামে একজন শাসক অতিবাহিত হয়েছেন। এই শাসনব্যবস্থা তার বংশধরদের মধ্যেও চলতে থাকে। এজন্য এই লোকদের “বনু মুনাবিহ” বলা হতে থাকে [৬]।

[১] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ. ২৭৭; চচনামা: পৃ. ৮৭, ৮৮।

[২] চচনামা: পৃ. ২০৩। শাকালহার নির্ধারণ করা কঠিন তবে সাধারণ ধারণা এই যে এটি “কালার কাহার” যা পাঞ্জাবের চাকওয়ালের কাছে অবস্থিত।

[৩] চচনামা: পৃ. ২২১।

[৪] চচনামা: পৃ. ২২১।

[৫] আনসাব আল-আশরাফ: ৩৬/১; আল-আনসাব লিস-সামআনি: পৃ. ২০১।

[৬] মুরুজ উজ-জাহাব: ১৯৯/১।

মাসউদী-র বর্ণনাও এই যে, মুলতানের এই শাসনব্যবস্থা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময় থেকেই চলে আসছিল। তিনি লিখছেন:

“মুলতান স্বর্ণের রাজ্য হিসেবে পরিচিত। এর শাসক একজন কুরাইশী ব্যক্তি, যিনি বনু সামাহ গোত্রের। এখান থেকে খোরাসান পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাফেলা যাতায়াত করে। একইভাবে মানসুরার শাসকও কুরাইশী এবং তিনি হাববার বিন আসওয়াদ-এর বংশধর। এই লোকদের শাসন এবং মুলতানের শাসকের শাসন ইসলামের শুরু থেকেই বংশপরম্পরায় চলে আসছে।” [১]

আসাদ বিন মুনাবিহ:

ইতিহাসে বনু সামাহ-র যে শাসকের নাম প্রথমবার স্পষ্টভাবে এসেছে, তিনি হলেন আসাদ বিন মুনাবিহ। ঐতিহাসিক মাসউদী, যিনি ৩০৩ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে হিন্দুস্তানে এসেছিলেন, তিনি তাঁর উল্লেখ এভাবে করেছেন:

“মুলতানের শাসকদের সম্পর্কে আমরা আগেই বলেছি যে, তাঁরা সামাহ বিন লুয়াই বিন গালিব-এর বংশধর। তিনি সৈন্যবাহিনী ও ক্ষমতার অধিকারী একজন শাসক। এই স্থানটি মুসলমানদের একটি বড় সীমান্ত। মুলতানের সীমানায় এক লক্ষ বিশ হাজার গ্রাম গণনা করা হয়। মুলতানে একটি বিখ্যাত মূর্তি রয়েছে। সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের দূরদূরান্তের এলাকা থেকে মানুষ সেখানে আসে এবং ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত ও কস্তুরী ইত্যাদি উৎসর্গ করে। হাজার হাজার মানুষ এটি দর্শন করে। মুলতানের শাসকের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস হলো ‘উদ-ই-কামারী’ নামক সুগন্ধি যা এই মূর্তির ওপর চড়ানো হয়, যার এক আউন্সের দাম দুইশ আশরাফী। এটি এতটাই উন্নত মানের যে, এর ওপর যখন মোহর লাগানো হয় তখন মোমের মতো তাতে চিহ্ন পড়ে যায়। এছাড়া আরও অনেক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর জিনিস এই মূর্তির ওপর চড়ানো হয়। যখন হিন্দুস্তানের রাজা-মহারাজারা মুলতান আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা তাদের মোকাবিলায় অপারগ হয়ে পড়ে, তখন তারা এই মূর্তিটি ভেঙে ফেলার এবং এর চোখ উপড়ে ফেলার হুমকি দেয়, যার ফলে শত্রুবাহিনী বাধ্য হয়ে ফিরে যায়।” [২]

“আমি ৩০০ হিজরীর পর মুলতানে গিয়েছিলাম। তখন সেখানকার শাসক ছিলেন আসাদ বিন মুনাবিহ।” [৩]

এর পর ইবনে হাওকাল (মৃত্যু: ৩৬৭ হিজরীর পর) একই বর্ণনা দিয়েছেন যে, মুলতানের শাসক একজন কুরাইশী। [৪]

এরপর ‘হুদুদুল আলম মিনাল মাশরিক ইলাল মাগরিব’-এর লেখক, যাঁর মৃত্যু ৩৭২ হিজরীর পর, সিন্ধুর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “মুলতানের রাজা কুরাইশী এবং বনু সামাহ গোত্রের।” [৫]

কিন্তু কয়েক বছর পর যখন বাশারী আল-মাকদিসী (মৃত্যু: প্রায় ৩৮০ হিজরী) সিন্ধুতে আসেন, তখন এখানে শিয়াদের প্রাধান্য ছিল, অর্থাৎ পাশা উল্টে গিয়েছিল এবং বনু সামাহ-র পরিবর্তে এখানে ইসমাইলীরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যারা মিশরের বনু উবাইদ রাষ্ট্রের অনুগত ছিল এবং তাদের নামে খুতবা পাঠ করত।

[১] মুরুজুয যাহাব: ১১৩/১

[২] মুরুজুয যাহাব: ১৯৯/১

[৩] সুরাতুল আরদ: ৩২১/২

[৪] হুদুদুল আলম মিনাল মাশরিক ইলাল মাগরিব: পৃ. ৮৫

মুলতানের ইসমাইলি শিয়া সরকার

মুলতানে ইসমাইলি সরকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের ইতিহাসের সেই প্রেক্ষাপটটি মাথায় রাখতে হবে যে, এটি ছিল আফ্রিকায় বনু উবাইদ সাম্রাজ্যের উত্থানের যুগ, যার ইহুদি বংশোদ্ভূত শাসকরা মুসলমানদের আবেগ নিয়ে খেলার জন্য নিজেদের “বনু ফাতিমা” বলে দাবি করত। মিশর দখলের পর বনু উবাইদ নিজেদের বনু আব্বাসের বিপরীতে একটি বিকল্প বিশ্বজনীন খিলাফত হিসেবে পরিচিত করায় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসমাইলি দায়ীরা স্থানে স্থানে নিজেদের আকিদা প্রচার করে। রাফযের এই আন্দোলন দ্বারা যেসব এলাকা প্রভাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে মুলতানও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ইতিহাসে মুলতানের শাসক পরিবার বনু মুনাবিহ-এর পতন এবং ইসমাইলিদের ক্ষমতায় আসার অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বিপ্লবের রূপরেখা কোথাও উল্লেখ নেই। তবে অনুমান করা ছাড়া অন্য কিছু বলা সম্ভব নয় যে, এখানে ইসমাইলি দায়ীরা গোপনে অসংখ্য আমির, সেনা কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষকে নিজেদের সমমনা বানিয়ে নিয়েছিল। ধারণা করা হয়, এই মানসিক প্রস্তুতির সময়কাল অবশ্যই এক থেকে দুই দশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যখন ইসমাইলিদের একটি শক্তিশালী জামাত এখানে তৈরি হয়ে গেল, তখন এই লোকেরাই অভ্যন্তরীণভাবে বিদ্রোহ করে মুলতান দখল করে নিয়েছিল।

মুলতানে ইসমাইলিদের ক্ষমতায় আসার মাস ও বছর কোথাও উল্লেখ নেই, তবে ধারণা করা হয় এটি ৩৭৩ হিজরি থেকে ৩৭৬ হিজরির মধ্যবর্তী কোনো বছর ছিল। কারণ আল-মুত্তাদি (মৃত্যু ৩৮০ হিজরির পর)-এর জীবদ্দশায় এই বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল, অন্যদিকে “হুদুদুল আলম মিনাল মাশরিক ইলাল মাগরিব”-এর লেখক, যার মৃত্যুর সাল ৩৭২ হিজরির পরের কোনো বছর, এখানে বনু মুনাবিহ-এর শাসনের সাক্ষী ছিলেন।

এই বিপ্লব যাদের হাতে এসেছিল, তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলো পাওয়া যায়:

- জলম বিন শায়বান:

সুলতান মাহমুদ গজনভির সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত আল-বিরুনি মুলতানের বিখ্যাত মূর্তির উল্লেখ করে লিখেছেন:

“যখন কারামিতা (যারা ইসমাইলি শিয়াদের একটি দল ছিল) মুলতানের ওপর বিজয়ী হলো, তখন দখলদার জলম বিন শায়বান সেই মূর্তিকে ধ্বংস করে দিল এবং এর পূজারীদের হত্যা করাল।” [১]

এ থেকে জানা গেল যে, মুলতান থেকে বনু মুনাবিহ-এর শাসন খতম করার আন্দোলনের নেতা ছিলেন জলম বিন শায়বান, যিনি একজন কারামতি দায়ী ছিলেন। সম্ভবত মুলতানে জলম বিন শায়বানের শাসন ৩৮০ হিজরির কয়েক বছর পর পর্যন্ত ছিল এবং এই সময়ে রাফয এখানে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ এটি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, এখানে আগে থেকেই শিয়া মতবাদের জন্য মানুষের মন তৈরি করা হয়েছিল।

[১] কিতাবুল হিন্দ: পৃষ্ঠা ৮১

আল-মাকদিসি সম্ভবত এই সময়ে মুলতান সফর করেছিলেন এবং এর সম্পর্কে নিম্নলিখিত অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন:

“মুলতানের কথা বললে, সেখানে ফাতেমীয়দের (বনু উবায়দ) খুতবা পড়া হয় এবং এই লোকেরা তাদের আদেশ ছাড়া কিছুই করে না। তাদের দূত এবং উপহার ক্রমাগত মিশরে পৌঁছাতে থাকে।” [১]

মুলতানে আযান শিয়া মাযহাব অনুযায়ী করে দেওয়া হয়েছিল এবং রাফেযী রীতিনীতি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। যদিও সাধারণ মানুষের মধ্যে আহলে সুন্নাতও প্রচুর সংখ্যায় ছিল এবং তাদের উলামা ও ফুকাহাগণ স্থানে স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। বাশারী আল-মাকদিসি লিখেছেন:

“মুলতানের অধিবাসীরা শিয়া, তারা আযানে ‘হাইয়া আলা খাইরিল আমাল’ বলে এবং ইকামাত পুনরাবৃত্তি করে। এখানকার শহরগুলো হানাফী ফুকাহাদের থেকে শূন্য নয়, এখানে মালিকী, মুতাজিলা এবং হাম্বলী মাযহাবের কোনো অস্তিত্ব নেই।” [২]

শেখ হামিদ লোধি:

জালম বিন শায়বানের পর আমরা হঠাৎ মুলতানে লোধি গোত্রের একজন পাঠান শেখ হামিদকে শাসন করতে দেখি।

ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতার মতে, শেখ হামিদ লোধি একজন আফগান সরদার ছিলেন। সেই সময়ে গজনীতে একজন তুর্কি সরদার সবুত্তুগীন (মাহমুদ গজনভীর পিতা)-এর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি হিন্দুস্তানে আক্রমণ শুরু করেছিলেন এবং উচ্চ পাঞ্জাব এলাকা তার আওতাধীন ছিল। তাই পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের হিন্দু রাজা জয়পাল তাকে প্রতিহত করার জন্য চিন্তিত ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে ভাটনা (ভাওয়ালপুরের নিকটবর্তী ভাইয়া)-এর রাজা জয়পালকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন হিন্দুস্তানের সীমান্ত রক্ষার জন্য আফগান অফিসার শেখ হামিদকে ব্যবহার করেন, যিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

জয়পাল এই পরামর্শ পছন্দ করে শেখ হামিদকে উচ্চ পাঞ্জাব এবং বর্তমান খাইবার পাখতুনখোয়ার শাসক নিযুক্ত করেন। হামিদ সব জায়গায় তার নায়েব অফিসার নিযুক্ত করেন এবং এখান থেকেই প্রথমবারের মতো (হিন্দুস্তানে) আফগানদের শাসনের ধারা শুরু হয়।

শেখ হামিদ একদিকে জয়পালকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং অন্যদিকে সবুত্তুগীনের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাকে বার্তা পাঠান যে, আমরা মুসলমানরা সমধর্মী হওয়ার কারণে এক। সুতরাং আপনার উচিত আফগানদের নিজেদের মনে করা এবং যদি হিন্দুস্তানে আক্রমণ করেন তবে আফগানদের কোনো ক্ষতি না করা। ফলস্বরূপ, যখন সবুত্তুগীন জয়পালের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলেন, তখন তিনি শেখ হামিদকে তার এলাকার (মুলতান ইত্যাদি) শাসনে বহাল থাকতে দেন। [৩]

মুলতানে শেখ হামিদের শাসনের সূচনা সবুত্তুগীনের জীবদ্দশায় হয়েছিল এবং এরপর তিনি সুলতান মাহমুদ গজনভীর যুগেও তার অনুগত হিসেবে এক সময় পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। সবুত্তুগীনের মৃত্যু ৩৮৭ হিজরিতে হয়েছিল, তাই শেখ হামিদ তার দুই-তিন বছর আগে মুলতানের শাসক হয়ে থাকবেন। এভাবে শেখ হামিদের সময়কাল আনুমানিক ৩৮৪ হিজরি থেকে ৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত হয়।

[১] আহসানুত তাকাসিম: পৃ. ৩৮৫

[২] আহসানুত তাকাসিম: পৃ. ৪৮১

[৩] তারিখ-ই-ফিরিশতা উর্দু: পৃ. ৪৮

দাউদ বিন নাসর:

শেখ হামিদের পর তার অযোগ্য নাতি দাউদ বিন নাসর মুলতানের শাসক হন। দুর্ভাগ্যবশত, অজ্ঞতার কারণে তিনি শীঘ্রই ইসমাইলি দাঈদের জালে ফেঁসে যান এবং রাফেজি আকিদা গ্রহণ করেন। এভাবে মুলতানে আবারও ইসমাইলি দাঈদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ফেরেশতা লিখেছেন:

“সুলতান মাহমুদ গজনভি ফিরে এলেন। ৩৯৬ হিজরিতে তিনি পুনরায় মুলতান অভিযানের সংকল্প করেন এবং বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। মুলতানের প্রয়াত শাসক শেখ হামিদ লোদি প্রয়াত আমির সবুত্তাগিনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সব দিক থেকে প্রয়াত আমিরের আনুগত্য ও আত্মবহতা পালন করতেন। শেখ হামিদের পর তার ধর্মত্যাগী নাতি আবুল ফাতাহ মুলতানের শাসক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পর্যন্ত আবুল ফাতাহ তার পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করেন এবং মাহমুদের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মের পাশাপাশি সেবার অধিকার থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেন।” [১]

তারিখ-ই-ফেরেশতার নিম্নোক্ত বক্তব্য শেখ হামিদের চরিত্রকে কলঙ্কমুক্ত করে স্পষ্ট করে দেয় যে, মুলতানে কারামাতিদের দখলের অপরাধী তিনি নন, বরং তার নাতি দাউদ বিন নাসর ছিলেন।

দাউদ বিন নাসর গজনভি সাম্রাজ্যের সাথে তার দাদার চুক্তিকেও বিস্মৃত হন, যার ফলে সুলতান মাহমুদ গজনভি তাকে শিক্ষা দেওয়া জরুরি মনে করেন এবং ৩৯৬ হিজরিতে তার হিন্দুস্তান সফরের সময় মুলতানেও আক্রমণ করেন। দাউদ বাধ্য হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে প্রাণ বাঁচান, কিন্তু কিছুকাল পর তিনি পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেন। অবশেষে ৪০১ হিজরিতে সুলতান মাহমুদ মুলতানে চূড়ান্ত আক্রমণ করেন এবং তা জয় করে এখান থেকে কারামাতি ও ইসমাইলিদের আধিপত্য খতম করে দেন। দাউদ গ্রেপ্তার হন। তাকে গজনির দুর্গে বন্দি করা হয়। দীর্ঘকাল পর বন্দি অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করেন। [২]

মোদাকথা, মুলতানে ইসমাইলি আধিপত্য দুইবার হয়েছিল:

- প্রথমবার হিলম বিন শাইবান-এর হাতে ৩৭৫ হিজরিতে।
- এরপর ৩৮৪ হিজরিতে শেখ হামিদ আসেন যিনি সুন্নি ছিলেন। আনুমানিক ৩৯৩ হিজরি পর্যন্ত তার শাসনকাল ছিল।
- তারপর তার নাতি দাউদ বিন নাসর শাসক হন এবং কিছুকাল পর ইসমাইলি হয়ে যান এবং এভাবে মুলতান আবারও ইসমাইলি শাসনের অধীনে চলে আসে। ৪০১ হিজরিতে তার গ্রেপ্তারের সাথেই মুলতানে “ইসমাইলি রাষ্ট্র”-এর অবসান ঘটে।

মানসুরা ও মুলতান বিজয়ের পর সুলতান মাহমুদ গজনভির মনে সিন্ধুর জাটদের দমনের চিন্তা বারবার আসতে থাকে, কিন্তু এর জন্য অভিযান দীর্ঘকাল পর ৪১৮ হিজরিতে চালানো হয়। সুলতান স্থল ও জল উভয় পথেই তাদের ওপর আক্রমণ করেন। জাটদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও সুলতানি বাহিনী তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

এভাবে গজনি থেকে কনৌজ এবং মুলতান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমস্ত এলাকা গজনভি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। [৩]

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা আজ হিন্দু: ৯৩/১

[২] তারিখ-ই-ফেরেশতা: ৯৮/১

[৩] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪১৮ হিজরি

মাদানিয়া রাষ্ট্র, মাকরান

বেলুচিস্তান প্রদেশ এক সময় একটি বিশাল ও বিস্তৃত দেশ ছিল, যার বড় রাজ্যগুলো ছিল: কিকান, কান্দাবিল এবং মাকরান।

বেলুচিস্তানে মুসলমানদের পদার্পণ প্রথমবার ১৮ হিজরিতে হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে ঘটেছিল। [১]

২৩ হিজরিতে ইসলামী বাহিনী হাকাম বিন উমাইর সা'লাবি (রা.)-এর নেতৃত্বে মাকরানও জয় করে নেয়। [২] হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে তাঁর নির্দেশে ২৯ হিজরিতে উবাইদুল্লাহ বিন মা'মার (রা.)-এর নেতৃত্বে অন্য একটি বাহিনী মাকরান বিজয়ের পূর্ণতা দান করে। [৩]

বেলুচ গোত্রগুলোর সাথে চুক্তি:

মীর নাসির খান আহমদ জাই (যিনি বেলুচিস্তানে উচ্চপদস্থ সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) তাঁর রচিত গ্রন্থ “তারিখ-এ-বেলুচিস্তান ও বেলুচ”-এ স্থানীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কিছু অসাধারণ তথ্য প্রদান করেছেন। এই বর্ণনাগুলোর প্রামাণিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, এই তথ্যগুলো নিজ স্থানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং যদি এগুলো দালিলিকভাবে প্রমাণিত হয় তবে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উপকারী।

এই তথ্যগুলোর সারসংক্ষেপ হলো, খ্রিস্টপূর্ব ৮৫৩ সালে “নাদকরু” গোত্র তাদের সর্দার কায়কোবাদের নেতৃত্বে বেলুচিস্তানে আক্রমণ করে এবং তা জয় করার পর নিজ গোত্রসহ এখানেই বসতি স্থাপন করে। এই লোকগুলোই “আকরাদ-এ-বেলুচ” নামে পরিচিত এবং বেলুচদের বিভিন্ন গোত্র তাদের থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

মীর নাসির খানের মতে, প্রাচীন যুগে বেলুচিস্তানের অধিকাংশ এলাকা দুটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ছিল; পূর্ব অংশ “তোরান” নামে পরিচিত ছিল যার সদর দপ্তর ছিল “কালাত”, আর পশ্চিম অংশ “মাকরান” নামে পরিচিত ছিল।

মীর নাসির খান উল্লেখ করেন যে, হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগে যখন তোরান ও মাকরান বিজিত হয়, তখন এখানকার সকল আকরাদ-এ-বেলুচ সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সাথে এই চুক্তি হয়েছিল যে, তাদেরকে এখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হবে না। এই আকরাদ-এ-বেলুচরা খিলাফতে রাশেদা, উমাইয়া খিলাফত এবং আব্বাসীয় খিলাফতের আমলে আরব থেকে সিন্ধুর দিকে গমনকারী ইসলামী বাহিনীতে দলে দলে যোগদান করতে থাকে এবং বিজিত এলাকাগুলোতে ক্রমাগত বসতি স্থাপন করতে থাকে, যার ফলে আজ সিন্ধুর প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বংশগতভাবে বেলুচ।

[১] তারিখুত তাবারি: ১৮ হিজরি

[২] তারিখুত তাবারি: ২১ হিজরি, ২৩ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২১ হিজরি, ২৩ হিজরি

[৩] তারিখুত তাবারি: ২৯ হিজরি; আল-কামিল ফিত তারিখ: ২৯ হিজরি; তারিখু খলিফা বিন খাইয়াত: পৃষ্ঠা ১৮০

তারিখ উম্মতে মুসলিমা

মীর নাসির খান প্রাচীন বেলুচি ঐতিহ্যের বরাতে বলেন যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে বেলুচিস্তানের অর্ধেক অংশ যাকে মাকরান বলা হতো, মুসলমানরা পুরোপুরি দখল করে নিয়েছিল এবং আরব আমিরদের অধীনে পাঁচজন বেলুচ আমিরের একটি পরিষদ সমস্ত প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করত, যার সদস্যরা ছিলেন: আমির মাদান, আমির খালাফ, আমির আলাক, আমির তাকুল এবং আমির আকুল।

অন্যদিকে সেই সময়ে বেলুচিস্তানের বাকি অর্ধেক এলাকা যাকে তুরান বলা হতো, তা মূর্তিপূজকদের দখলে ছিল যাদের প্রত্যেক শাসককে “সিওয়া” বলা হতো। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এখানে “সিওয়াজোরাক”-এর শাসন ছিল। যদিও আকরাদ বেলুচরা জাতিগতভাবে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা “তোরান”-এ মূর্তিপূজকদের অধীনে বসবাস করত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাদের সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহে নিরপেক্ষ থাকতে হতো যাতে অমুসলিমরা তাদের জানমালের ক্ষতি করতে না পারে। মীর নাসির খানের মতে, সেই সময়ে “তোরান”-এর রাজধানী ছিল “কিকান” (কিকান)। এই এলাকায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে আক্রমণ করা হয়েছিল। [১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে কান্দাবিল এবং কিকান বিজয়:

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে ৩৯ হিজরিতে হারিস বিন মুররাহ-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী কিকান পাহাড়ে (খিরথার পাহাড়) পৌঁছায় এবং শত্রুর ঘেরাওয়ে পড়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। [২]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত পর্যন্ত হারিস বিন মুররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এখানকার ওয়ালি ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ৪২ হিজরিতে তিনি একটি অভিযানে শহীদ হন। [৩]

উমাইয়া যুগে:

৪২ হিজরিতে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষ থেকে রাশিদ বিন আমর জাদিদি এই দায়িত্ব গ্রহণ করে মাকরান হয়ে সিন্ধুর দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত আক্রমণ চালান। [৪]

৪৩ হিজরিতে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু বেলুচিস্তানের আমির হন, যিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কিকান পুনরায় জয় করেন কিন্তু ৪৭ হিজরিতে উপজাতীয় যোদ্ধারা “তুর্কিদের” সাহায্য নিয়ে আবারও বিদ্রোহ করে। এই যুদ্ধে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন এবং মাকরানের ওপারের সমস্ত এলাকায় মুশরিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। [৫]

এখন হযরত সিনান বিন সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বেলুচিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং নিজেকে বিজিত এলাকাগুলোর প্রতিরক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। [৬]

৫০ হিজরিতে বেলুচিস্তানের শাসনভার পুনরায় রাশিদ বিন আমর জাদিদি রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অর্পণ করা হয় যারা এই এলাকাগুলোতে... [৭]

[১] তারিখ বেলুচিস্তান ও বেলুচ ৩/ ১২-১৪

[২] চাচ নামা: পৃ. ৭৭, ৭৮, ৭৯; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: ১৯১; ফুতুহুল বুলদান লিল বালাজুরি, পৃ: ৩১৮, ৩১৭

[৩] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ১৯১; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭, ত. আল হিলাল

[৪] ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৫, ২০৪

[৫] চাচ নামা: পৃ. ৭৯; ফুতুহুল বুলদান, পৃ. ৩১৭, ত. আল হিলাল; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৮, ২০৭

[৬] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ. ২০৯, ২১১; ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৩১৮

যেখান থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছিল এবং যেখান থেকে কর আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা ‘কোহ পায়্য’ এবং ‘কিকান’ পৌঁছে জিজিয়া ও কর আদায় করেন। তবে শেষ পর্যন্ত অমুসলিম গোত্রগুলোর সাথে এক যুদ্ধে রাশিদ বিন আমর তালাতফ শহীদ হন এবং মাকরান ও এর পূর্বদিকের সমস্ত এলাকা মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে যায়। [১]

এখন সিনান বিন সালামা হযালী আরও একবার বেলুচিস্তানের ওয়ালি নিযুক্ত হন। তিনি কিকান এবং মাকরান পুনরায় উদ্ধার করেন। [২]

৫৩ হিজরিতে আব্বাদ বিন যিয়াদকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়, যিনি হেলমান্দ নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং কান্দাহার পুনরায় জয় করেন। [৩]

৬৪ হিজরিতে বেলুচিস্তানের প্রশাসনিক কেন্দ্র মাকরানের পরিবর্তে কান্দাবিলকে নির্ধারণ করা হয় এবং নতুন আমির মুনযির বিন জারুদ সেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করে সেই সমস্ত এলাকা পুনরায় জয় করেন যেখানে সিনান বিন সালামা হযালীর পর লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল। মুনযির এই অভিযানগুলোর চলাকালীনই ইন্তেকাল করেন। [৪]

মুনযিরের পর তার পুত্র হাকাম কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কান্দাবিলে নিজের স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। তার শক্তি চূর্ণ করার জন্য আরও একবার সিনান বিন সালামা হযালীকে পাঠানো হয়। [৫]

উমাইয়া যুগে মাকরান, কান্দাবিল এবং কিকান ইসলামি খিলাফতের অধীনেই ছিল। তবে ৮৭ হিজরিতে একজন পলাতক আরব সর্দার মুহাম্মদ বিন হারিস আলাফি মাকরান পৌঁছে মুসলিম আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং কিছু সময়ের জন্য এখানে স্বাধীন শাসন কায়েম করেন। কিন্তু ৯২ হিজরিতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাকে দমনের জন্য নতুন আমির মুজাআ বিন সা’রকে পাঠালে সে পালিয়ে যায়। [৬]

মুজাআ সামনে অগ্রসর হয়ে কান্দাবিলের কিছু পার্শ্ববর্তী এলাকাও জয় করেন। তবে শীঘ্রই তার মৃত্যু হয় [৭] এবং বেলুচিস্তানের আমীরত্ব মুহাম্মদ বিন হারুন বিন যিরা’ নামারিকে অর্পণ করা হয়। [৮]

৯২ হিজরিতে সিন্ধু অভিযানের জন্য মুহাম্মদ বিন কাসিম সাকাফিকে পাঠানো হয়। এই বাহিনী সিন্ধুতে প্রবেশের আগে ‘পাঞ্জগুর’ এবং ‘লাসবেলা’ জয় করে। এই অভিযানের সময় মুহাম্মদ বিন হারুনের মৃত্যু হয় এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বেলুচিস্তান ও সিন্ধুর শাসনভার মুহাম্মদ বিন কাসিমের নামে করে দেন। [৯] এরপর বেলুচিস্তানের শাসন ব্যবস্থা সিন্ধুর উমাইয়া গভর্নরদের হাতেই থাকে। তবে বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক শাসন কান্দাবিল থেকে পরিচালিত হতো যেখানে সিন্ধুর গভর্নরের প্রতিনিধি শাসন করতেন।

ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের যুগে বনু মুহাল্লাব বিদ্রোহী হয়ে কিছু সময়ের জন্য কান্দাবিল দখল করে নেয়, কিন্তু ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক

[১] চচ নামা: পৃ ৮২-৮১; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ ৩১১-৩০৯; ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৮

[২] চচ নামা: পৃ ৮৩-৮২; ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৮-৩১৭; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত, পৃ ৪১৩-৪১২

[৩] ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ ২১৯

[৪] ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৮; তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ ২৩৬

[৫] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ ২৩২

[৬] ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৯; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩৩৮/৫; চচ নামা: পৃ ৮৭-৮৬

[৭] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ ২৭৮; ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩১৯; আল-কামিল ফিত তারিখ: سنة ৯৭১

[৮] তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত: পৃ ২৭৮; তারিখুল ইসলাম লিজ জাহাবি: ৩৩৮/৫, তাবারী

[৯] চচ নামা: পৃ ৯১ থেকে ১০০; ফুতুহুল বুলদান: পৃ ৩২৩

...এর নির্দেশে সিন্ধুর নতুন গভর্নর হিলাল বিন আহওয়াজ তামিমি কান্দাবিলের ওপর আক্রমণ করে আল-মুহাল্লাব বংশের অবসান ঘটান। [১]

মোটকথা, উমাইয়া যুগে সাধারণত বেলুচিস্তানের জেলাগুলো খিলাফতের অধীনে ছিল এবং সিন্ধুর রাজধানী মানসুরা থেকে সেগুলোর শাসনকার্য পরিচালিত হতো। আব্বাসীয় যুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল।

আব্বাসীয় যুগে ঈসা বিন মাদানের স্বাধীন শাসন:

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বেলুচিস্তানে একজন স্বায়ত্তশাসিত আমির ঈসা বিন মাদান নিজের স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, যিনি আব্বাসীয় খলিফাদের নামে আনুষ্ঠানিক খুতবাও পাঠ করতেন না। হিন্দু ও সিন্ধুবাসীরা ঈসা বিন মাদানকে “মহারাজ” বলত। তার রাজধানী ছিল “কিজ” (কজ), যা মাকরানের নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ঈসা বিন মাদানের শাসনকাল কবে শুরু এবং কবে শেষ হয়েছিল? এ সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তবে ইস্তাখরি (মৃত্যু ৩৩৬ হিজরি) তাকে তার সময়ের মাকরানের শাসক হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা থেকে ধারণা করা হয় যে তার শাসনকাল ৩৩৬ হিজরির কিছু আগে শুরু হয়েছিল। [২]

ঈসা বিন মাদান আরব গোত্র বনু হাম-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার শাসনকাল নিশ্চিতভাবেই দীর্ঘ ছিল কারণ ইবনে হাওকাল (মৃত্যু ৩৬৭ হিজরির পর) যখন “সুরাতুল আরদ” লিখছিলেন, তখনও মাকরানের শাসক এই ঈসা বিন মাদানই ছিলেন। [৩]

মাকরানের ওপর বনু বুওয়াইহ-এর আক্রমণ:

এই সময়েই মাকরান জেলার ওপর বনু বুওয়াইহ আক্রমণ করে, যাদের শাসন সেই সময় সমগ্র ইরাক ও ইরানের ওপর ছিল এবং তাদের আমির আদুদুদৌলা তখন উন্নতির শিখরে ছিলেন। ১৯ রবিউল আউয়াল ৩৬১ হিজরিতে বেলুচ গোত্রগুলোর সাথে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এতে বেলুচদের শক্তি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের সবচেয়ে বড় সরদার ইবনে আবির রিজাল নিহত হন। [৪]

আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. এই ঘটনাগুলো উল্লেখ করার সময় এই যোদ্ধা গোত্রগুলোকে “খারেজি” হিসেবে অভিহিত করেছেন। [৫]

এ থেকে বোঝা যায় যে, এই আক্রমণ মাকরানের মাদানিয়া রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য ছিল না, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলগুলোতে লুকিয়ে থাকা বেলুচ খারেজিদের নির্মূল করা। সম্ভবত এই কারণেই মাদানিয়া রাষ্ট্রকে এর পরেও একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে দেখা যায়। ঈসা বিন মাদানের শাসন কবে শেষ হয়েছিল এবং তার উত্তরসূরি কে ছিলেন? ইতিহাস এখানেও নীরব।

মাদান বিন ঈসা:

তবে আল্লামা ইবনে আসির রহ.-এর একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ৩২২ হিজরিতে মাকরানের একজন শাসকের মৃত্যু হয়েছিল যার নাম ছিল মাদান। হতে পারে এই মাদান ঈসা বিন মাদানের পুত্র ছিলেন। [৬]

[১] ফুতুহুল বুলদান: পৃ. ৩৪৫, আল-কামিল ফিত তারিখ: ১০২ হিজরি

[২] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক লিল ইস্তাখরি: পৃ. ১৭৭

[৩] সুরাতুল আরদ: ২/৩২৫

[৪] তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম লি ইবনে মিসকাওয়াইহ: ৬/৩৩৯ থেকে ৩৪৪, তহরান সংস্করণ ২০০৪ খ্রি.

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩/৪৪৯

[৬] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৩২২ হিজরি

ঈসা বিন মা'দান সানি

মা'দানের দুই ছেলে ছিল: আবুল আসাকির এবং ঈসা। ঈসা ক্ষমতা দখল করে নেন। এতে আবুল আসাকির অসন্তুষ্ট হয়ে খোরাসানে চলে যান এবং সুলতান মাহমুদ গজনভির উত্তরসূরি সুলতান মাসউদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সুলতান তার সাথে একটি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন যাতে ঈসার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আবুল আসাকিরকে দেওয়া যায় অথবা দুই ভাই মিলে গজনভি সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে। কিন্তু ঈসা কোনোভাবেই রাজি হলেন না এবং মোকাবিলার জন্য আঠারো হাজার সৈন্য প্রস্তুত করলেন। কিন্তু ঠিক মোক্ষম সময়ে ঈসার অনেক সৈন্য পালিয়ে আবুল আসাকিরের সাথে যোগ দেয় এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা করে। ঈসা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান কিন্তু কিছুক্ষণ পর কিছু সৈন্য নিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে লড়াই করতে করতে নিহত হন। [১]

এতে বোঝা যায় যে, ঈসা বিন মা'দান সানি অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি গজনভি সাম্রাজ্যের সাথে টক্কর দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

আবুল আসাকির হুসাইন বিন মা'দান:

ঈসা বিন মা'দান সানির মৃত্যুর পর তার ভাই আবুল আসাকির মাকরান দখল করে নেন। তিনি মাকরানবাসীদের ওপর এতই রাগান্বিত ছিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত শহর লুণ্ঠন করতে থাকেন। [২] একটি বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আবুল আসাকিরের আসল নাম ছিল “হুসাইন”। [৩]

তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে গভীর আগ্রহী ছিলেন এবং বিশ্বের প্রখ্যাত চিকিৎসকদের সাথে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতেন। যখন তিনি শরীরের বাম পাশের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন, তখন তিনি প্রখ্যাত মিশরীয় চিকিৎসক আবুল হাসান আলী বিন রিজওয়ান (মৃত্যু ৪৫৩ হিজরি)-এর সাথে তার চিকিৎসার বিষয়ে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন। [৪]

যেহেতু আবুল আসাকিরের শাসন গজনভি সাম্রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই তিনি গজনভি রাজমুকুটের প্রতি পুরোপুরি অনুগত ছিলেন এবং সেখানে সুলতান গজনভি মাসউদ বিন মাহমুদের নামে খুতবা পাঠ করা হতো। [৫]

বনু মা'দানের সমাপ্তি সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব।

[১] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪২২ হিজরি

[২] আল-কামিল ফিত তারিখ: ৪২২ হিজরি

[৩] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা: ৫৬৬

[৪] উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা: ৫৬৬

[৫] তারিখ ইবনে খালদুন: ৩৯৯/৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা | অংশ পঞ্চম | ৮২১

দৌলত-এ-মুশকিয়া

বানু আব্বাসের পতনের যুগে বেলুচিস্তানে মাকরান থেকে কিছু দূরে অবস্থিত “মুশকি” শহরে একটি ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, যার শাসকদের মধ্যে কেবল “মুতাহার বিন রাজা” নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়, যার পূর্বপুরুষদের কোনো অবস্থা কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং তার উত্তরসূরিদেরও না।

ইস্তাখরির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মুতাহার বিন রাজা মাকরানের মা’দানিয়া রাষ্ট্রের প্রতিবেশী এবং ঈসা বিন মা’দানের সমসাময়িক ছিলেন। সেই যুগে স্বায়ত্তশাসিত বাদশাহদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল এবং অধিকাংশ ছোট রাষ্ট্র তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকত, কিন্তু মুতাহার বিন রাজা নিশ্চিতভাবেই একজন অসাধারণ সাহসী ব্যক্তি ছিলেন এবং সম্ভবত তার এলাকাটিও প্রাকৃতিকভাবে বেশ সুরক্ষিত ছিল, তাই তিনি নির্ভীকভাবে কেবল খলিফার নামে খুতবা পাঠ করতেন এবং অন্য কোনো সুলতান বা বাদশাহর নাম খুতবায় নিতেন না। [১]

[১] আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক, পৃষ্ঠা ১৭৭, ১৭৮।

সুমরা

সুমরা সিন্ধুর একটি প্রাচীন জাতি, যারা সিন্ধু, কচ্ছ, কাথিয়াওয়াড়, গুজরাট এবং বেলুচিস্তানে প্রচুর সংখ্যায় বসবাস করে। এই বংশের শাসকরা কখনো শুধু অভ্যন্তরীণ সিন্ধু এবং কখনো পুরো সিন্ধুর ওপর শাসন করেছেন। তাদের শাসনের শুরু হয়েছিল সিন্ধুর শহর “থারি” থেকে। পরবর্তীতে তাদের উন্নতির যুগে সুমরা সরদাররা যেসব স্থানকে কেন্দ্র বানিয়েছিলেন তার মধ্যে মুলতান, উচ (আজ), মুহাম্মদ তুর, অমরকোট, দেবল, সামুই, ব্রাহ্মণাবাদ, অরোড় এবং সেহওয়ান অন্তর্ভুক্ত।

কিছু ঐতিহাসিক সুমরাদের বংশগতভাবে রাজপুত বলে গণ্য করেছেন, কিন্তু আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী মরহুম দীর্ঘ গবেষণার পর এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে তারা আরব ছিলেন। ৪২৩ হিজরিতে তারা বর্তমান “মাতলি” (সিন্ধু)-র কাছে একটি টিলা “থারি” (থারিজি)-তে একটি ছোট রাষ্ট্র কায়েম করেছিল যা আধা-স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং মানসুরার হাববারি রাষ্ট্রের উন্নতির সময় তার সাথে যুক্ত ছিল। যদিও তারা সুন্নি আরব ছিল, কিন্তু হিন্দি ও সিন্ধি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে তাদের নাম স্থানীয় ধাঁচের হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত এই লোকেরা একই সাথে দুটি নাম রাখত। ঘরের নাম আরবি হতো এবং বাইরে যে নামে তাদের ডাকা হতো তা হিন্দি বা সিন্ধি হতো।

প্রায় সোয়া শতাব্দী পর যখন মুলতানে ইসমাইলি দাঈদের জোর বাড়ল, তখন তাদের দাঈরা সিন্ধুতেও সক্রিয় হয়ে উঠল, যার ফলে সুমরা পরিবার তাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিল। শুধু তাই নয়, বরং তারা ইসমাইলি দাঈদের ইশারায় মানসুরার সরকারের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করল।

সুলতান মাহমুদ গজনভি ৪০১ হিজরিতে মুলতান থেকে ইসমাইলি রাষ্ট্রের অবসান ঘটিয়ে এই ফেরকার ওপর বড় আঘাত হেনেছিলেন, কিন্তু এই লোকেরা শেষ হয়ে যায়নি বরং তারা গোপনে নিজেদের আকিদা প্রচার করতে থাকে এবং তাদের জায়গিরদাররা যেমন খফিফ এবং সুমদা নিজেদের এলাকায় সুরক্ষিত ছিল।

খফিফ:

কিছুকাল পর খফিফ হাববারি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মানসুরা দখল করে নেয়। সে সুলতান মাহমুদ গজনভির ভয়ে নিজের বাতেনি ইসমাইলি হওয়ার ওপর তাকিয়ার পর্দা ফেলে রাখে এবং বিরোধিতামূলক আচরণ ও চালচলন থেকে বিরত থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদের কাছে এর হাকিকত প্রকাশ হয়ে যায়, যার পরপরই গজনভি বাহিনী ৪১৬ হিজরিতে আক্রমণ করে মানসুরা দখল করে নেয় এবং খফিফ সংঘর্ষের সময় নিহত হয়।

সুমেরা আউয়াল:

কিছুকাল পর সুমেরা জাতি তাদের এক সর্দারের নেতৃত্বে পুনরায় জেগে ওঠে যার হিন্দি নাম ছিল “অঙ্গ পাল”। সুমেরা জাতির প্রথম বিখ্যাত সর্দার তিনিই ছিলেন, তার উপাধি ছিল সুম রাহ (রায়)। এই “সুম রাহ” সংক্ষিপ্ত হয়ে “সুমেরা” হয়ে যায়। “সুম রাহ”-এর পর তার সন্তানরা “সুমেরা” নামে পরিচিত হতে থাকে এবং তার প্রত্যেক উত্তরসূরি নিজের নামের সাথে এই উপাধি ব্যবহার করতে শুরু করে। তিনি সুলতান মাহমুদ গজনভীর সমসাময়িক ছিলেন। সুলতান মাহমুদ গজনভীর হাতে পরাজয়ের কারণে সুমেরা জাতি সাময়িকভাবে দমে গিয়েছিল, তাই সুমেরা আউয়ালও কোনো বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাকেন। সুলতান মাহমুদ গজনভীর মৃত্যুর প্রায় এক বছর পর ৪২৩ হিজরিতে সুমেরা আউয়ালের মৃত্যু হয়।

রাজে পাল বিন সুমেরা:

সুমেরা আউয়ালের ছেলে যার হিন্দি নাম ছিল “পাল”, তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তাওহীদের অনুসারী ছিলেন এবং সিন্ধুতে ইসমাইলি শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মিশরের দরবারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। তার পদমর্যাদার কারণে সিন্ধুতে তাকে “রাজে” বলা হতো, তাই তিনি “রাজে পাল” নামে পরিচিত হন। তিনি সিন্ধুতে গজনভী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু গজনীর সিংহাসনে সুলতান মাহমুদ গজনভীর পুত্র সুলতান মাসউদ আসীন ছিলেন যিনি একজন শক্তিশালী শাসক ছিলেন, তাই তার প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সুমেরা দুয়াম:

দুই দশক পর যখন শাহজাদাদের গৃহযুদ্ধের কারণে গজনভী শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে, তখন সুমেরা জাতিও সুযোগ বুঝে ৪৪৪ হিজরিতে খারিতে (মাতলি, সিন্ধু) একত্রিত হয়ে তাদের একজন যোগ্য ব্যক্তিকে সিন্ধুর শাসক হিসেবে নির্বাচিত করে যিনি কেবল তার উপাধি “সুমেরা” নামেই পরিচিত হন। সুমেরা দুয়াম সিংহাসনে আরোহণের মাত্র দুই বছর পর শত্রুদের পরাজিত করতে সফল হন। ৪৪৬ হিজরিতে সুমেরা দুয়ামের মৃত্যু হয়।

ভুঙ্গার:

সুমেরা দুয়াম সিন্ধুর এক বড় জমিদারের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন যার নাম ছিল “সাদ”, যার গর্ভে ৪৪৫ হিজরিতে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তার হিন্দি নাম “ভুঙ্গার” নামে পরিচিত হন। সুমেরা দুয়ামের পর ৪৪৬ হিজরিতে এই ভুঙ্গার মাত্র এক বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পনের বছর পর ৪৬১ হিজরিতে ভুঙ্গার ষোলো বা সতেরো বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

দুদা আউয়াল:

ভুঙ্গারের পর তার দুই বছর বয়সী ছেলে “দুদা” সিংহাসনে আরোহণ করেন যার জন্ম ৪৫৯ হিজরিতে হয়েছিল। সম্ভবত তার আসল নাম ছিল দাউদ যা স্থানীয় উচ্চারণে “দুদা” হয়ে গিয়েছিল। তিনি মোট ২৬ বছর হায়াত পেয়েছিলেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত যোগ্য প্রমাণিত হন। তিনি নিম্ন সিন্ধুর পূর্ব অংশও জয় করেন। তিনি ৪৬১ হিজরিতে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৮৫ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়।

বাই:

দুদার মৃত্যুর সময় তার ছেলে সিংঘর তিন বছরের ছিল, তাই দুদার মেয়ে “বাই” নিজেই শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন এবং পনেরো বছর পর্যন্ত শাসন করেন।

সিংঘর:

তার নাম আসলে ছিল সিংহ রায় যা সংক্ষিপ্ত হয়ে “সিংঘার” এবং পরে “সিংঘর” হয়ে যায়। তার জন্ম হয়েছিল ৪৮২ হিজরিতে। ৫০০ হিজরিতে সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং নিজের বোনের কাছ থেকে শাসনভার গ্রহণ করে নিজে পরিচালনা শুরু করে। সে পনেরো বছর শাসন করে এবং ৫১৫ হিজরিতে ৩৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। সে নিজের রাজধানী আরও বিস্তৃত করে মাকরান পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়।

হেমুন-খফিফ:

সিংঘরের কোনো সন্তান ছিল না। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী “হেমুন” তার দুই ভাই: “খফিফ” এবং “আনার”-এর সাহায্যে সালতানাত পরিচালনা করেন। সালতানাতের বিশালতার কারণে হেমুন বড় ভাই খফিফকে নিজের সাথে খারিতে রাখেন এবং আনারকে সালতানাতের অন্য একটি অংশে অবস্থিত শহর “তোর”-এ পাঠিয়ে দেন। সম্ভবত এটি বর্তমানের নিকটবর্তী “আহমদপুর” ছিল। খফিফ ২৩ বছর পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে ৫৩৮ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। সম্ভবত তার বোন হেমুন তার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

আনার (উমর সুমরা প্রথম):

খফিফের মৃত্যুর সময় তার ছোট ভাই আনার ৫১ বছর বয়সের হয়েছিলেন। ভাইয়ের পর তিনিই পুরো সুমরা সালতানাতের মালিক হন এবং আহমদপুর বা তার সংলগ্ন উচ থেকে সমস্ত বিষয়াদি পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি ৫৩৮ হিজরি থেকে ৫৬১ হিজরি পর্যন্ত সিংহাসনে ২৩ বছর অতিবাহিত করেন এবং ৭৪ বছর বয়সে নিজের স্ত্রীর হাতে সেই সময় নিহত হন যখন আফগানিস্তানের ঘুরি শাসকরা হিন্দুস্তানে আক্রমণ করে এবং প্রখ্যাত বিজয়ী শাহাবুদ্দিন ঘুরি উচ আক্রমণ করেন।

যখন কেব্লা জয় করতে দেরি হতে লাগল তখন সুলতানের গোয়েন্দারা তাদের কাজ দেখাল এবং “আনার”-এর ছোট রানির সাথে যোগাযোগ করল যে “আনার”-এর ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। রানি সুলতানের আক্রমণকে ভালো সুযোগ মনে করলেন এবং বিষ খাইয়ে স্বামীকে হত্যা করলেন যার পর যুদ্ধ বন্ধ করিয়ে কেব্লার দরজা খুলে দিলেন। এভাবে সুমরাদের এই সবচেয়ে শক্তিশালী কেন্দ্র ঘুরিদের দখলে চলে এল।

এটি ছিল প্রথম সুমরা শাসক যে উচ-এ বসবাস করত। তার ঘরোয়া নাম “উমর” হওয়া এর প্রমাণ যে সে সুন্নি ছিল ইসমাইলি নয়, কারণ রাফেজিরা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম কখনো গ্রহণ করে না।

উমর সুমরার সুন্নি হয়ে যাওয়া থেকে স্পষ্ট হয় যে ষষ্ঠ হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধুর সুমরাদের মধ্যে সুন্নি আকিদার প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং উচ-এর মাশায়েখদের এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল যাদের সুমরাইরাও ভক্ত ছিল।

এই সময়েই সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি মিসর থেকে বনু উবাইদ-এর অবসান ঘটিয়েছিলেন, এভাবে ইসমাইলি মতবাদের বিশ্ব কেন্দ্র শেষ হয়ে যায়।

...ছিল এবং সারা বিশ্বে তাদের শক্তির ওপর এক মারাত্মক আঘাত হানা হয়েছিল। উমর সুমরা আউয়ালের পর এই নামে সুমরাদের মধ্যে একাধিক শাসক অতিবাহিত হয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে এরপর সুমরাদের মধ্যে সুন্নি আকিদা প্রচারের কাজ উন্নতির দিকে ছিল।

দুদা দ্বিতীয়:

উমর সুমরার মৃত্যুর কিছুকাল আগে দুদা নামক এক সুমরা সর্দার নিম্ন সিন্ধুতে বিদ্রোহ করে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ এবং উচ্চ সিন্ধু থেকে পিছু হটে আসা সুমরা যোদ্ধারা সবাই তার চারপাশে সমবেত হলো। দুদা দেবলকে রাজধানী বানিয়েছিলেন কিন্তু তিনি বেশি সময় পাননি। ৫৭৬ হিজরিতে শিহাবুদ্দিন ঘুরির বিজয়াভিযান নিম্ন সিন্ধুর দিকে মোড় নেয়। ঘুরিরা দেবলে আক্রমণ করে যার ফলে সুমরাদের অবশিষ্ট শক্তিও শেষ হয়ে যায়।

এই সময়েই দেবল থেকে কিছু দূরে ঠাট্টা শহর আবাদ হয়েছিল। দেবলের মানুষ সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং দেবল জনশূন্যতার মধ্য দিয়ে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। দুদার শাসনকাল পাঁচ বছরের বেশি ছিল না।

ভুট্টো:

ঘুরিরা নিম্ন সিন্ধুকে স্থায়ীভাবে অধীনে রাখার কোনো ব্যবস্থা করেনি। ফলে তাদের সেই জোয়ার চলে যাওয়ার কিছুকাল পর পরিস্থিতি অনুকূল দেখে অন্য এক সুমরা সর্দার ‘ভুট্টো’ (যিনি ভুঙ্গারের বংশধর ছিলেন) নতুন করে সিন্ধুর কিছু অংশে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ভুট্টো প্রায় ৩৩ বছর শাসন করে ৬১১ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে সুলতান শিহাবুদ্দিন ঘুরির শাহাদাতের পর পাঞ্জাব ও উচ্চ সিন্ধুতে তার আমির নাসিরুদ্দিন কুবাচা স্বাধীন শাসক হয়ে বসেন। তিনি শীঘ্রই নিম্ন সিন্ধুর বড় একটি অংশও জয় করে নেন। তিনি সুমরাদের শোচনীয়ভাবে পদদলিত করেন এবং তাদের থেকে জায়গির কেড়ে নিয়ে তাদের কেবল চাষাবাদে লাগিয়ে দেন। এভাবে সুমরাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যায়। কেবল ‘জাম’ [১] এ তাদের একটি রাষ্ট্র অবশিষ্ট থাকে।

ঘানরা:

ভুট্টোর পর তার ছেলে ঘানরা সুমরাদের শাসক হন যাকে সংক্ষেপে ‘ঘানরা’ বলা হতো। তিনি ‘জাম’ এ প্রায় ছয় বছর শাসন করেন এবং ৬১৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজা জয় সিং:

এরপর জয় সিং ‘জাম’ এর শাসক হন। এই সময়েই মুসলিম বিশ্বের ওপর চেঙ্গিস খানের আক্রমণ ঘটে। এতে খাওয়ারিজমকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর খাওয়ারিজমি শাসক সুলতান জালালুদ্দিন হিন্দুস্তানে পা রাখার চেষ্টা করেন এবং নাসিরুদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিশাল এলাকা জয় করে নেন। এই সময়ে খাওয়ারিজমি বাহিনী জাম-এর ওপরও আক্রমণ করে। [২] রাজা জয় সিং তার ধনভাণ্ডার এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে নৌকার মাধ্যমে কোনো এক নিরাপদ নদী দ্বীপে আত্মগোপন করেন।

[১] “জাম” সেই এলাকা যাকে ফাতহনামায় “মুজহাম” বা “মুনজাম” বলা হয়েছে। বর্তমান ঠাট্টা জেলার উত্তরে কালরি হ্রদ থেকে শুরু করে ঠাট্টার দক্ষিণে মিরপুর সাকরো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ “জাম” বর্তমান ঠাট্টা জেলার প্রাচীন নাম ছিল।

[২] তারিখ-ই-ফিরিশতা উর্দু ৩/৯২২।

দিল্লির সুলতানদের যুগ | তৃতীয় খণ্ড | সিন্ধুর ইতিহাস

এরপর জয় সিংহের পরিণতি সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

মুহাম্মদ তুর সুমরা:

যদিও খোয়ারিজমি বাহিনী ৬২০ হিজরিতে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু নাসিরুদ্দিন কাবাচাহর তলোয়ার আরও দুই বছর সুমরাদের মাথার ওপর বুলতে থাকে। অবশেষে ৬২২ হিজরিতে নাসিরুদ্দিন কাবাচাহ দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের সাথে যুদ্ধে নিহত হন, যার ফলে মুলতান থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমস্ত বড় শহর এবং নদী উপত্যকা ইলতুতমিশের দখলে চলে আসে।

সুঁমরা জাতি চরমভাবে দমে গিয়েছিল। নিম্ন সিন্ধুতে তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল “জাম”ও তাদের হাতে ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে তাদের একজন সরদার মুহাম্মদ তুর সিন্ধু নদের সেই সবুজ উপত্যকা ছেড়ে দেন যেখানে শক্তিশালী শাসকরা প্রায়ই দখলের জন্য সচেত্ব থাকতেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব সিন্ধুর সীমান্তে খরপারকারে একটি অপরিচিত জায়গা খুঁজে বের করেন যেখানে একদিকে কচ্ছ মরুভূমি এবং অন্যদিকে জয়সলমীর ও যোধপুর রাজ্য ছিল এবং সিন্ধু নদের একটি শাখাও সেখান দিয়ে প্রবাহিত হতো, যার ফলে সেখানে কিছু কৃষি কাজও সম্ভব ছিল।

এখানে তিনি একটি নতুন গ্রাম আবাদ করেন যা তাঁর নামানুসারে “মুহাম্মদ তুর” নামে পরিচিত হয়, যার সিন্ধি উচ্চারণ হলো “মাহাতম তুর”। সুমরা জাতির অনেক লোক এই এলাকায় তাঁর চারপাশে সমবেত হয়।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের সময় পর্যন্ত মুহাম্মদ তুর নিজের আত্মরক্ষাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন, কিন্তু ৬৩৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যুর পরপরই তাঁর দাসীরা দিল্লিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সেখানে বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং সুলতান ইলতুতমিশের উত্তরসূরি সুলতানা রাজিয়া তাঁর পাঠানো দাসী নূর তুর্ককে তাঁর সিন্ধি ও গুজরাটি সঙ্গীদেরসহ ধরে হত্যা করান। উল্লিখিত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মদ তুর ইসমাইলি ছিলেন। অর্থাৎ সপ্তম হিজরি শতকের সুমরা শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্নি ছিলেন এবং কেউ কেউ ইসমাইলি। মুহাম্মদ তুর ৬২০ হিজরি থেকে ৬৩৫ হিজরি পর্যন্ত পনেরো বছর শাসন করে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘান রাদু দ্বিতীয়:

মুহাম্মদ তুরের পর তাঁর পুত্র ঘানরা (ঘান রায়) দ্বিতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র চার বছর শাসন করেন।

দুদা তৃতীয়:

৬৩৯ হিজরিতে তাঁর পুত্র দুদা তৃতীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার ছিল এবং অন্যদিকে তাতাররা বারবার সীমান্তে আক্রমণ করছিল। যুদ্ধের এই ব্যস্ততার কারণে ইসমাইলিদের এই কেন্দ্রের দিকে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সুমরাইরা আবারও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে শুরু করে। এভাবে দুদা তৃতীয় বারো বছর শান্তিতে শাসন করেন। ৬৫১ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাস্ত:

দুদার মৃত্যুর সময় তাঁর সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক ছিল না, তাই সুমরা জাতির এক নারী “বাস্ত”, যিনি সম্ভবত দুদার স্ত্রী বা...

বোন ছিলেন, শাসনভার গ্রহণ করেন এবং পনেরো বছর পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে দেহবলকেও পুনরায় সুমরা রাজধানীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং সেখানে চনেসর নামক একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।

চনেসর:

চনেসর মূলত গণেশ রায়ের বিকৃত রূপ। তিনি সুমরা বা ইসমাইলি ছিলেন না, বরং বংশগতভাবে হিন্দু ছিলেন। তিনি বাই-এর নায়েবে সালতানাত ছিলেন, যিনি বাই-এর মৃত্যুর পর ৬৬৬ হিজরিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং দেহবলকে রাজধানী ঘোষণা করেন।

তিনি ১৮ বছর শাসন করেন এবং ৬৮৩ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ভুঙ্গার দ্বিতীয়:

গণেশ রায়ের মৃত্যুর পর সুমরা বংশের ভুঙ্গার নামক এক ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি পনেরো বছর ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করেন এবং ৬৯৯ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

খাফিফ দ্বিতীয়:

ভুঙ্গারের উত্তরসূরি খাফিফ দ্বিতীয় আট বছর শাসন করেন এবং ৭০৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

দুদা চতুর্থ:

তিনি পাঁচ বছর শাসন করে ৭১২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

দালু রায়:

খাফিফ দ্বিতীয় বা দুদা চতুর্থের সময়েই সুমরাদের আরেক উচ্চাভিলাষী দালু রায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন এবং এক বিশাল এলাকা জয় করে নেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই সুমরাদের বাদশাহ হয়ে যান। বিখ্যাত লোকগাঁথা “সাইফুল মুলুক” তাঁরই আমলের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর শাসন উত্তরে ডেরা গাজী খান থেকে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি সিন্ধু নদের একটি শাখার তীরে অবস্থিত সিন্ধুর প্রাচীন শহর আরোরকে রাজধানী বানান। তিনি অত্যন্ত জালেম শাসক ছিলেন। তাঁর এলাকায় কারও মান-সম্মান নিরাপদ ছিল না। যে বণিক সেখান দিয়ে যেতেন, তাকে লুট করা হতো। তাঁর জুলুমের অশুভ প্রভাবে আরোর জনশূন্য হয়ে পড়ে, যার ফলে দালু রায়কেও আরোর ছেড়ে ব্রাহ্মণাবাদে চলে আসতে হয়। ব্রাহ্মণাবাদে স্থানান্তরের পর তাঁর ছোট ভাই উমরানি নিকটবর্তী আহলে সুন্নাতে বিখ্যাত ইলমি মারকাজ “ভাক্কার”-এ চলে যান এবং সেখানে সুন্নি ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং অবশেষে কুরআন মাজিদ হিফজ করে ফিরে আসেন। এরপর তিনি মক্কায় যান এবং একজন আরব হাফেজা কারিয়াকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে ফিরে আসেন। তিনি তাঁর ভাই দালু রায়কে অনবরত জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকেন, কিন্তু দালু রায়ের ওপর কোনো প্রভাব পড়েনি। অবশেষে উমরানি তাঁর স্ত্রীসহ এই ঘোষণা দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যান যে, এখানে আল্লাহর আজাব আসবে। তিন দিন পর মধ্যরাতে এমন এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় যে পুরো শহর মাটির নিচে দেবে যায়, একটি মিনার ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই দালু রায় তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ মাটির সাথে মিশে যান এবং তাঁর শাসনের নাম-নিশানাও আর অবশিষ্ট থাকেনি।

ওমর সুমরা দ্বিতীয়:

দালুরাই-এর মৃত্যু এবং ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসের কিছুকাল পরে আমরা ইতিহাসের পাতায় ওমর সুমরা দ্বিতীয় নামক একজন সুমরা শাসককে ‘মুহাম্মদ তুর’-কে রাজধানী বানিয়ে শাসন করতে দেখি। [১] ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসের পর তাকেই সুমরাদের শাসক হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তিনি দিল্লির সুলতানদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন। সে সময় দিল্লিতে আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্ব ছিল। ওমর সুমরা তার সুবাদার হিসেবে ‘মুহাম্মদ তুর’ এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে শাসন করতে থাকেন।

ওমর সুমরা স্থাপত্যেরও শৌখিন ছিলেন। তিনি খারপারকার জেলায় বর্তমান মীরপুর খাসের কাছে একটি বিশাল দুর্গ ও শহর নির্মাণ করেন যা ‘ওমরকোট’ নামে পরিচিত হয়। হিন্দুরা একে ‘অমরকোট’ বলে। মুঘল সম্রাট হুমায়ূনের নির্বাসনকালে তার উত্তরসূরি জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবরের জন্ম এই দুর্গেই হয়েছিল। সিন্ধুর লোকগাথা ‘ওমর মারুই’ এই ওমর সুমরার সাথেই সম্পর্কিত। ওমর সুমরার শাসনের অবসান ঘটে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির হাতে, যার আক্রমণে সিন্ধুতে সুমরাদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের পালিয়ে গিয়ে বেলুচিস্তানে আশ্রয় নিতে হয়।

যখন খিলজিদের শাসনের অবসান ঘটে এবং তুঘলক বংশ ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়, তখন পালিয়ে যাওয়া সুমরা জাতির লোকেরা ফিরে এসে সিন্ধু নদের পশ্চিমে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে ওমর সুমরাও ছিলেন যিনি ফিরে এসে সেহওয়ানে অবস্থান গ্রহণ করেন। ওমর সুমরা কিছুদিন পর ‘ভাক্কার’-এ নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। সাম্মারা অনেক শক্তি অর্জন করেছিল এবং বেলুচিস্তান থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ সিন্ধু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের সর্দার ‘কাহাহ বিন তামাচি’ ওমর সুমরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বিজয় লাভ করেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করে নিজের সাথে বাহরামপুরে নিয়ে আসেন যেখানে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে ওমর সুমরা প্রায় ২৫ বছর শাসন করে আনুমানিক ৭৩৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

এই ওমর সুমরা দ্বিতীয়ও নিঃসন্দেহে সুন্নি ছিলেন যেমনটি তার নাম থেকে স্পষ্ট হয়। ধারণা করা হয় যে, অষ্টম হিজরি শতাব্দীতে সুমরাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সুন্নি হয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভবত ওমর সুমরা দ্বিতীয়ের পরে আসা সমস্ত সুমরা শাসকই সুন্নি ছিলেন।

ভুংরা তৃতীয়:

ওমর সুমরার পর ভুংরা তৃতীয় তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং অনুগত সম্পর্ক বজায় রাখেন। যেহেতু সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক অযোধ্যা, বাংলা এবং মালওয়ার বিদ্রোহ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং দুর্ভিক্ষও জেঁকে বসেছিল, তাই ভুংরা তৃতীয় নিজের শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে যান এবং তিনি পূর্ব সিন্ধুও দখল করে নেন যা আলাউদ্দিন খিলজির আমলে সুমরাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ভুংরা তৃতীয় দশ বছর শাসন করেন এবং সুমরাদের আবারও একটি বড় শক্তিতে পরিণত করে দেখান, এমনকি তার শাসন উচ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল যেখানে সেই সময়ে সৈয়দ জালালুদ্দিন বুখারি ওরফে মাখদুম...

[১] লেখকের মতে, এই ওমর সুমরা সম্ভবত সেই ওমরানিরই পুত্র ছিলেন। সম্ভবত ওমরানি ব্রাহ্মণাবাদ ছেড়ে ‘মুহাম্মদ তুর’-এ এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। তাই ওমর সুমরা এই স্থানটিকে নিজের কেন্দ্র বানিয়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

জাহানিয়াঁ জাহান গশত রহ. উচ-এ অবস্থান করছিলেন।

আমির আরমাইল:

সুমিরাদের শেষ শাসক আরমাইল ছিল দুশ্চরিত্র ও জালেম। মানুষ তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। যদিও সম্ভব ছিল যে এই পরিস্থিতিতে সুমিরাদের শাসন আরও কয়েক দশক টিকে থাকত, কিন্তু ফাতেমীয়দের ক্রমাগত আক্রমণ তাদের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

তার এক বোকামির কারণে সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক ৭৫২ হিজরিতে তার কেন্দ্র ঠাট্টায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আকস্মিক অসুস্থতা ও মৃত্যু যুদ্ধকে পিছিয়ে দেয়। তবে সুমিরাই তাদের জুলুমের কারণে রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ের সুমিরা সরদাররা মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। যখনই চাইত সাধারণ মানুষের গবাদি পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেত এবং সেগুলোর কাবাব বানিয়ে মদ্যপানের আসর জমাত।

অবশেষে সাম্মারা অস্ত্র তুলে নেয় এবং ‘উনার বিন বানভিনা’ নামক এক সরদারকে নিজেদের শাসক মেনে তার নেতৃত্বে সুমিরাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। কয়েক দফা যুদ্ধের পর সিন্ধু নদের পূর্ব ও পশ্চিমে সুমিরা পরাজিত হয় এবং সমস্ত শহর তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কয়েক বছরের মধ্যে পুরো সিন্ধুতে সাম্মাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুমিরা জাতি প্রজা হিসেবে রয়ে যায়। যদিও তাদের কাছে জায়গির ও জনবল ছিল, কিন্তু তারা আর কখনও সেই রাজনৈতিক আধিপত্য ফিরে পায়নি এবং ক্ষমতার লাগাম এই জাতির হাত থেকে বেরিয়ে যায়। সুমিরা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বেশিরভাগ চাষাবাদে আত্মনিয়োগ করে।

সুমিরা যুগে সিন্ধুর সরকারি ভাষা ছিল আরবি। সুমিরাদের শাসনের অবসানের সাথে সাথে সিন্ধুর সরকারি ভাষা ফারসি হয়ে যায়।

সুমিরা যুগে সিন্ধুর প্রেমকাহিনী, যুদ্ধের বীরত্বগাথা এবং সাহসী সরদারদের কীর্তি বর্ণনা করার প্রথা চরম শিখরে পৌঁছেছিল। এমনকি কিছু প্রেমকাহিনী সুমিরা যুগেই জন্ম নিয়েছিল।

সুমিরা যুগে অনেক মহান সুফি সাধক অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে মুলতানের খাজা বাহাউদ্দিন জাকারিয়া, পাকপত্তনের বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শকর, উচ-এর সৈয়দ জালালউদ্দিন বুখারি, সেহওয়ানের শেখ উসমান কলন্দর শাহবাজ এবং শেখ হুসাইন, যিনি পীর পাঠো নামে পরিচিত, সবচেয়ে বিখ্যাত। সুমিরা গোত্রের অনেক ব্যক্তি আজও সিন্ধুর জায়গিরদার এবং এই কারণে প্রাদেশিক ও জাতীয় রাজনীতিতে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন দলে থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রাখে।

[১] তারিখ-ই-সিন্ধ, সৈয়দ সুলাইমান নদভী, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৭২।

[২] সুমিরা সরদারদের এই সমস্ত বিবরণ আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভীর তারিখ-ই-সিন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে। আর যেখান থেকেই কোনো উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে তার সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। তারিখ-ই-সিন্ধ-কে মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া সুমিরা সরদারদের শাসনের শুরু ও শেষ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী এ বিষয়ে দীর্ঘ ও সুস্বচ্ছ আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন বর্ণনার তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে যথাসম্ভব সঠিক সালগুলো সামনে এনেছেন। লেখকও তার গবেষণার ওপরই আস্থা রেখেছেন।

সাম্মাদের শাসনকাল

প্রাচীনকাল থেকেই সিন্ধুতে সুমরাদের পাশাপাশি সাম্মারাও বসবাস করত। তারা ছিল জমিদার ও কৃষক এবং একই সাথে যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। জনবল ও সামরিক শক্তির দিক থেকে সুমরাদের পরেই ছিল তাদের অবস্থান। তারা ছিল সুন্নি। সুমরাদের সাথে তাদের বিরোধের একটি কারণ ছিল শিয়া-সুন্নি মতপার্থক্য। তবে শেষ পর্যন্ত সুমারাও আহলে সুন্নাত মতাদর্শ গ্রহণ করেছিল। ফলে শেষ দিকে এই বিরোধ কেবল জাতিগত ও রাজনৈতিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অষ্টম হিজরি শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন সুমরাদের পতন ঘটে, তখন সিন্ধুর শাসনভার সাম্মাদের হাতে চলে আসে। তাদের শাসন সাধারণত দিল্লি ও আগ্রার সুলতানদের অধীনে ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাদের কোনো কোনো সর্দার স্বাধীন হয়ে বিদ্রোহের পতাকাও উত্তোলন করত। সাম্মা সর্দাররা নিজেদের ইরানি বাদশাহ “জমশিদ”-এর বংশধর বলে দাবি করত, তাই তাদের অধিকাংশ সর্দার নিজেদের নামের সাথে উপাধি হিসেবে “জাম” ব্যবহার করত।

প্রথম সাম্মা শাসক: জাম আফজাহ (৭৩৮ হিজরি থেকে ৭৪৪ হিজরি)

তিনি ছিলেন সাম্মাদের প্রথম শাসক যিনি “জাম” উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি তিন বছর ছয় মাস শাসন করেন। তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মানুষ। তার শাসন ছিল একজন সর্দারের মতো। সে সময় সিন্ধুতে প্রধান শক্তি ছিল সুমরাদের।

জাম জুনা (৭৪৪ হিজরি থেকে ৭৫৬ হিজরি)

৭৫২ হিজরির পর সাম্মারা শেষ সুমরা শাসক আরমাইলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং “উনার বিন বানিবাহ”-এর নেতৃত্বে একদিকে ঠাট্টা এবং অন্যদিকে “মুহাম্মদ তুর” দখল করে নেয় এবং এর কাছে “সামুই” নামে আরও একটি শহর আবাদ করে। কিছুকাল পর উনার সিন্ধুর উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোও জয় করে নেন। এভাবে প্রায় সমগ্র সিন্ধুতে সাম্মাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। [১]

উল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী, সাম্মাদের যে শাসক শেষ সুমরা শাসক আরমাইলের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলেন, তার নাম ছিল উনার বিন বানিবাহ। কিন্তু তারিখ-ই-ফেরেশতা অনুযায়ী, এই সময়ের সাম্মা শাসক ছিলেন “জাম জুনা”, যিনি জাম আফজাহ-এর ছোট ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নেককার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক, তিনি চৌদ্দ বছর শাসন করেন। লেখকের মতে, এর সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই উনার-ই “জাম জুনা” উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে বিরোধের অবসান ঘটে।

জাম মানি বিন জাম জুনা (৭৫৬ হিজরি থেকে ৭৭৭ হিজরি)

জাম মানি দিল্লি সালতানাতকে কর দিতে অস্বীকার করেন, যার ফলে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ৭৬৪ হিজরিতে

(১) তারিখ-ই-সিন্ধু, আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী, পৃষ্ঠা ৩৩০ থেকে ৩৩৩।

সিন্ধুর ওপর আক্রমণ করে দিল। জাম মানি একবার রাজকীয় বাহিনীকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণে সে গ্রেফতার হয়ে গেল। ফিরোজ শাহ তুঘলক জাম মানিকে নিজের সাথে দিল্লিতে নিয়ে গেল। সেখানে সে এমন মন-প্রাণ দিয়ে সুলতানের খেদমত করল যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় তাকেই সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত করে দিলেন। জাম মানি পনেরো বছর শাসন করার পর ইন্তেকাল করেন।

জাম তমাচি বিন মানি: (৭৭১ হিজরি থেকে ৭৮৫ হিজরি)

জাম মানির পুত্র জাম তমাচি তেরো বছর এবং কয়েক মাস পর্যন্ত শান্তি ও স্বস্তির সাথে শাসন করেন।

জাম সালাহউদ্দিন: (৭৮৫ হিজরি থেকে ৭৯৬ হিজরি)

জাম সালাহউদ্দিন এগারো বছর শাসন করেন। তার যুগ ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার।

জাম নিজামুদ্দিন বিন সালাহউদ্দিন: (৭৯৬ হিজরি থেকে ৭৯৯ হিজরি)

জাম নিজামুদ্দিন দুই বছর কয়েক মাস পর্যন্ত শাসন করেন।

জাম আলী শের বিন নিজামুদ্দিন: (৭৯৯ হিজরি থেকে ৮০৫ হিজরি)

তার শাসনকাল ছিল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ। চারদিকে শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। চোর-ডাকাতদের পুরোপুরি নির্মূল করা হয়েছিল। মানুষ অত্যন্ত সচ্ছল ও নিশ্চিত ছিল। সে ছয় বছর এবং কয়েক মাস পর্যন্ত শাসন করেছিল। তার মৃত্যুতে সিন্ধুর সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে।

জাম কারান বিন জাম তমাچী: (৮০৫ হিজরি থেকে ৮০৭ হিজরি)

জাম আলী শেরের মৃত্যুর পর জাম তমাচির পুত্র জাম কারান শাসনের ওপর নিজের অধিকার দাবি করে এবং শেষ পর্যন্ত সরদাররা তাকেই মসনদে বসিয়ে দেয়। কিন্তু দেড় বছর পর তার মৃত্যু হয়।

জাম সিকান্দার বিন ফাতহ খান: (৮০৭ হিজরি থেকে ৮২২ হিজরি)

জাম কারানের মৃত্যুতে জাম সিকান্দার বিন জাম ফাতহ খান শাসনভার লাভ করেন। তিনি পনেরো বছর এই পদে আসীন ছিলেন।

জাম তুঘলক বিন জাম সিকান্দার: (৮২২ হিজরি থেকে ৮৫০ হিজরি)

জাম সিকান্দারের মৃত্যুতে তার পুত্র জাম তুঘলক মসনদে বসেন। তিনি ২৮ বছর পর্যন্ত সুশাসন করেন এবং মানুষকে নিজের অনুরাগী করে তোলেন। তবে এখন সাম্রাজ্যের মধ্যে আগের মতো শক্তি ছিল না, তাই জাম তুঘলক গুজরাটের শাসকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অবস্থান মজবুত রাখেন। এরপর সিন্ধুর শাসকরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত গুজরাটের শাহদের থেকে সাহায্য নিতে থাকেন।

জাম মুবারক: (৮৫০ হিজরি)

জাম তুঘলকের পর তার আত্মীয় জাম মুবারক মসনদ গ্রহণ করেন কিন্তু তৃতীয় দিনেই তার মৃত্যু হয়।

জাম ইস্কান্দার বিন জাম ফাতহ বিন জাম সিকান্দার: (৮৫০ হিজরি থেকে ৮৫২ হিজরি)

এরপর জাম ইস্কান্দার, যিনি ফাতহ খান বিন ইস্কান্দারের পুত্র ছিলেন, শাসনভার গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি মাত্র দেড় বছর সময় পান।

জাম সাঞ্জার: (৮৫২ হিজরি থেকে ৮৬০ হিজরি)

এখন রাজপরিবারের একজন যোগ্য ব্যক্তি জাম সাঞ্জারকে পরামর্শের ভিত্তিতে সিংহাসনে বসানো হলো। তিনি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি খুব ভালো শাসক হিসেবে প্রমাণিত হলেন। তিনি আট বছর কয়েক মাস শাসন করেন।

জাম নিজামুদ্দিন ওরফে নান্দা: (৮৬০ হিজরি থেকে ৯৩০ হিজরি)

জাম সাঞ্জারের পর জাম নিজামুদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুলতানের বিখ্যাত শাসক হুসাইন ল্যাঙ্গাহর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সাম্মা বংশের সবচেয়ে দীর্ঘকাল শাসনকারী সর্দার ছিলেন। তিনি ষাট বছর শাসন করেন। তাঁর সময়ে কান্দাহারের শাসক শাহ বেগ আরগুন সিন্ধু দখলের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যান। জাম নিজাম অত্যন্ত তৎপরতার সাথে তাঁর মোকাবিলা করতে থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিন্ধুবাসীদের সাহসের অভাবে শাহ বেগ প্রথমে ভাঙ্কার এবং পরে সেহওয়ানও দখল করে নেন। এই পরাজয় জাম নিজামের ওপর খুব নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তিনি নিজের রাজ্যকে পতনের দিকে যেতে দেখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করেন।

জাম ফিরোজ: (৯৩০ হিজরি থেকে ৯৩৭ হিজরি)

জাম নিজামের পর তাঁর ছেলে জাম ফিরোজ সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে সাম্মা বংশের আরেক সর্দার জাম সালাহউদ্দিন বিদ্রোহ করেন এবং বারবার জাম ফিরোজের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু প্রতিবারই তিনি ব্যর্থ হন। তবে ৯৩৬ হিজরিতে জাম সালাহউদ্দিনের পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং তিনি সিন্ধু দখল করে নেন। জাম ফিরোজ বাধ্য হয়ে কান্দাহারের শাসক শাহ বেগের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি আগে থেকেই সিন্ধু দখলের সুযোগ খুঁজছিলেন, তিনি তাঁর গোলাম সাবিলের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী সিন্ধুতে পাঠান, যার সাহায্যে জাম ফিরোজ জাম সালাহউদ্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সালাহউদ্দিন এবং তাঁর ছেলে নিহত হন এবং সিন্ধু জাম ফিরোজকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিজয় কান্দাহারীদের শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই এটি ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হলো। শীঘ্রই বেগ আরও সৈন্য নিয়ে কান্দাহার থেকে সিন্ধুতে পৌঁছান এবং সেখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ৯৩৭ হিজরির ঘটনা। এর মাধ্যমেই “সাম্মা” শাসনের অবসান ঘটে।

জাম ফিরোজ দুই-তিন বছর সিন্ধুর আশপাশে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ান। তিনি তাঁর শাসন ফিরে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি পরিবার-পরিজনসহ গুজরাটে চলে যান এবং সেখানকার বাদশাহ বাহাদুর শাহের দরবারের সাথে যুক্ত হন। [১]

[১] তারিখ-ই-ফেরেশতা ৪/ ৬৬৩-৬৬৪

নোট: সিন্ধুর সর্দারদের প্রায় সমস্ত বিবরণ তারিখ-ই-ফেরেশতা থেকে নেওয়া হয়েছে। যদি শাহ নওয়াজ অন্য কোনো উৎস থেকে কিছু নিয়ে থাকেন, তবে তার রেফারেন্স উল্লেখ করা হয়েছে। তারিখ-ই-ফেরেশতা থেকে নেওয়া তথ্যের জন্য প্রতি স্থানে রেফারেন্স দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করা হয়নি।

নোট: সিন্ধুর সর্দারদের শাসনের শুরু ও শেষের বছরগুলো তারিখ-ই-ফেরেশতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, বরং সেখানে কেবল এতটুকু বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক সর্দারের শাসন এত বছর ছিল। তবে শেষ শাসকের পরিণতির বছর ৯৩৭ হিজরি উল্লেখ আছে। লেখক শাসকদের শাসনের মেয়াদ থেকে অনুমান করে সিন্ধুর সমস্ত সর্দারদের শাসনের শুরু ও শেষের তারিখগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি একটি অনুমান যা ইনশাআল্লাহ সঠিক বা সঠিকের কাছাকাছি হবে।

উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের প্রভাব

উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এখানকার মানুষ ব্রাহ্মণদের অন্যায় একচেটিয়া আধিপত্যের নিচে পিষ্ট ছিল এবং তাদের সহজাত প্রতিভা মরিচা ধরে গিয়েছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এখানকার শোষণমূলক বর্ণপ্রথার ওপর আঘাত হানা হয় এবং প্রত্যেককে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

বড় বড় মুসলিম আলেম, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি সিন্ধুতে বসতি স্থাপন করেন। মুসলমানরা এখানে শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা খোলেন এবং হিন্দি বইগুলোর আরবি অনুবাদ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার উপকূলগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। নওমুসলিমদের মধ্যে ইলম বা জ্ঞানের এমন এক স্পৃহা জাগ্রত হয় যে, তাদের মধ্যে অনেকে নিজ দেশ ছেড়ে কুফা, বাগদাদ ও সিরিয়ার ইলমি মজলিসগুলোতে পৌঁছে যান। তাদের মধ্যে ইমাম আওয়ামী (মৃত্যু ১৫৭ হিজরি) ছিলেন, যার পরিবারকে সিন্ধু থেকে বন্দী করে সিরিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। ইমাম আওয়ামী সেখানেই লালিত-পালিত হন এবং ফকিহ ও তাবেয়ীদের মজলিস থেকে এমনভাবে ফয়েজ হাসিল করেন যে, ইবনে শিহাব জুহরি এবং আবদুল্লাহ বিন মুবারকের মতো প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণ তার ছাত্র হন। [১]

তাদের মধ্যে আবু মাশার সিন্ধি ছিলেন, যিনি একজন দাসের পুত্র ছিলেন। তিনি হাদিস, সিরাত ও ইতিহাস শেখার জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় চলে যান এবং সেখানে মাগাজি ও সিরাতের বর্ণনায় এমন দক্ষতা অর্জন করেন যে, তিনি এই শাস্ত্রের ইমাম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। ১৭০ হিজরিতে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন খলিফা হারুনুর রশিদ স্বয়ং তার জানাজার নামাজ পড়ান। [২]

আবু মাশারের সাহেবজাদা আবদুল মালিক মুহাম্মদ (মৃত্যু ২২৩ হিজরি) তিনিও অত্যন্ত উচ্চমানের আলেম ছিলেন। আবু নসর ফাতহ বিন আবদুল্লাহও একজন সিন্ধি দাস ছিলেন যিনি ইসলামি উলুম হাসিল করে “আল-ফকিহ আল-মুতাকাল্লিম” উপাধি লাভ করেন। সিন্ধি নওমুসলিমদের মধ্যে আবুল আতা সিন্ধি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আরবি কবি যার কবিতা দিওয়ানে হামাসায় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সিন্ধু থেকে বাগদাদে যাওয়া একজন সিন্ধি সৈনিক বিন শাবাক হারুনুর রশিদের বিশেষ কর্মকর্তার মর্যাদা লাভ করেন। বারমাকিদের ওপর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার জন্য হারুনুর রশিদ সবাইকে ছেড়ে এই সিন্ধি কর্মকর্তার ওপর আস্তা স্থাপন করেন। এরপর এই সিন্ধি জেনারেল... [৩]

[১] ইমাম আওয়ামী সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইমাম আবু জুরআ-এর উক্তি হলো: “তার মূল উৎস সিন্ধুর বন্দীদের মধ্য থেকে।” (তারিখ দামেস্ক: ৩৫/১৫৫)। এ বিষয়ে অন্যান্য উক্তিও রয়েছে।

[২] সিয়রু আলামিন নুবালা: ৭/১০৭, ১০৮, আল-রিসালাহ।

[৩] তাজকিরাতুল হুফফাজ: ১/১১৪।

সন্তানদের মধ্যে আরবের প্রখ্যাত কবি “কুশাজিম” জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া খালাফ বিন সালিম সিন্ধি (মৃত্যু ২৩১ হিজরি), ফজল বিন সাকিন সিন্ধি এবং তাদের মতো আরও অনেক আলেম, ফাজেল, আদীব ও বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাদের থেকে এক বিশ্ব উপকৃত হয়েছে। এই সবই ছিল উপমহাদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফল। [১]

দক্ষিণ ভারতে ইসলাম

সামুদ্রিক বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ ভারতের কেরালা ও শ্রীলঙ্কা রাজ্য। কেরালায় আসা আরব বণিকদের মধ্যে শরফ বিন মালিক, মালিক বিন দিনার এবং মালিক বিন হাবিবের নাম ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, যারা সুযোগ পেলেই ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মালাবারের রাজা চক্রবর্তী এই মহান ব্যক্তিদের থেকে রাসূলুল্লাহ [সা.] -এর মুজিজা সম্পর্কে জানতে পারেন। যখন তাকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার (শাক্কুল কামার) মুজিজার কথা শোনানো হলো, তখন তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং অবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

কিছুকাল পর তিনি ঐ দাঈদের সাথে পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে হিজাজের পথে রওনা হলেন। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছে তিনি এমন কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে বাঁচার কোনো আশা রইল না। মৃত্যুর আগে তিনি ঐ আরব বণিকদের জন্য একটি দলিল লিখে দেন এবং তাদের মালাবারের বিশাল ভূখণ্ডের মালিক বানিয়ে দেন যাতে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করে মসজিদ নির্মাণ করতে পারে এবং ইসলামের প্রচার করতে পারে। ফলে ঐ আরব বণিকরা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, মসজিদ নির্মাণ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। ঐ আরব দাঈদের মধ্যে মালিক বিন হাবিবের কবর উত্তর মালাবারের “কুলানগুর” শহরে আজও বিদ্যমান। [২]

উপমহাদেশে ফেরকাবাজি - ইসলামী শাসনের পতন ও শিয়া মতবাদের প্রসার

উপমহাদেশের মুসলিম এলাকাগুলোতে ফেরকাবাজির বীজ তখনই বপন করা হয়েছিল যখন হিজাজে মুহাম্মদ নফস জাকিয়া আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে...

[১] আল-আনসাব, আল্লামা সামআনী, ৭/২৬৮, ‘সিন্ধি’ পরিচ্ছেদ।

[২] তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ, ডক্টর আব্দুল মুনিম আন-নামর, পৃষ্ঠা ৮৯-৯৩, আল-মুয়াসসাসাতুল জামিইয়াহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি, ১৯৮১। মালাবারের প্রাচীন আলেমদের মতে, যাদের মধ্যে শেখ জয়নুদ্দিন বিন আব্দুল আজিজ আল-মাবারী তার ইতিহাস গ্রন্থ “তুহফাতুল মুজাহিদিন ফি বাদি আখবারিল বুরতুগালিয়িন”-এ এই ঘটনাবলী লিখেছেন। শেখ জয়নুদ্দিনের পিতা আবু ইয়াহইয়াও একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন। তাদের পরিবার আজও মালাবারের মুসলমানদের মধ্যে সুপরিচিত। মালাবারের “পোন্নানি” শহরে শেখের নির্মিত জামে মসজিদটি বিদ্যমান এবং এর প্রাঙ্গণেই শেখ জয়নুদ্দিন ও শেখ আবু ইয়াহইয়ার কবর রয়েছে।

স্থানীয় লোকজন এই বুজুর্গদের “থাঙ্গাল” বলে স্মরণ করে। মালাবারের রাজাদের ইসলাম গ্রহণ সংক্রান্ত কথাগুলো লোকসংগীতে সংরক্ষিত আছে। স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রসিদ্ধ যে, রাজা চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মুজিজা নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে নবী করীম [সা.] -এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন।

এটিও প্রসিদ্ধ যে, মালিক বিন দিনার এবং তার সঙ্গীরা আরবের সাহাবী ছিলেন। তবে সাহাবায়ে কেরামের জীবনীতে এই ব্যক্তিদের এবং এই ঘটনার কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। সঠিক মত হলো এই যে, এই ব্যক্তিরা তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ী ছিলেন এবং রাজার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষভাগে বা দ্বিতীয় হিজরি শতাব্দীর শুরুতে ঘটেছিল। আরব বণিকদের পরিবারগুলো এই সময়েই এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। (কাসাস মিন তারিখিল ইসলাম ফিল হিন্দ)

খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি গোপন আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। এই সময়ে সিন্ধুতেও এই আন্দোলনের সমর্থক তৈরি করা হয়েছিল। তাঁর এক পুত্র আবদুল্লাহ আশতার সিন্ধুতে আশ্রয় নিয়ে এখানে আন্দোলনকে বেগবান করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও আশতারকে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু এই দলের লোকেরা অবশিষ্ট থেকে যায়। সেই সময় পর্যন্ত তাদের অধিকাংশ ছিল একনিষ্ঠ শিয়া বা জায়েদি শিয়াদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে রাফেজি হতে থাকে। অন্যদিকে, একনিষ্ঠ শিয়ারা জমহুর আহলে সুন্নাতের মাযহাবকে তাদের চিন্তা-চেতনা এবং কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়ে তাদের সাথে একীভূত হয়ে যায়। অপরদিকে, যারা রাফযের গণ্ডিতে পা রেখেছিল, তারাও তাদের চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকে। এই লোকেরাই উপমহাদেশে রাফযের প্রসারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আফ্রিকা, মিশর, ইরাক, হিজাজ এবং বাহরাইনে বিভিন্ন শিয়া ফিরকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসমাইলি উবায়দিরা আফ্রিকায়, ইসনা আশারিরা ইরাক ও পারস্যে এবং কারামাতিরা হিজাজ ও বাহরাইনে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে। যেহেতু সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের উপকূল বাহরাইন ও ওমানের নিকটবর্তী ছিল, তাই সেখানকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিপ্লবগুলো খুব দ্রুত এখানেও প্রভাব ফেলে এবং প্রায় ৩৭০ হিজরিতে সিন্ধুর সুমরা গোত্রগুলো ইসমাইলি ধর্ম গ্রহণ করে, আর এই সময়েই মুলতানে কারামাতিরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি কয়েম করে। এভাবে উপমহাদেশ একদিকে ধর্মীয় ফিরকাবাজি এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার আবর্তে আটকা পড়ে যায়।

[১] কিতাবুল হিন্দ, আল-বিরুনি, পৃষ্ঠা ২৯২।

পৃষ্ঠা - ৮৩৬

উন্মতে মুসলিমার ইতিহাস

গ্রন্থপঞ্জি

পঞ্চম খণ্ড

<https://t.me/BoierSomahar>

তারিখ-ই উম্মত-ই মুসলিমা

৮৩৭

ক্রমিক নং গ্রন্থের নাম লেখক

(হরফ আলিফ)

১ আয়না-ই তারিখ প্রফেসর বি. এন. বর্মা কর্তৃক

২ আনসাব আল-আশরাফ আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি

৩ আল-আনসাব আবু সা'দ আব্দুল কারিম বিন মুহাম্মদ আল-সামআনি

৪ আল-আনসাব আবু আল-মুনজির আল-সাহারি

৫ আহসান আল-তাকাসিম ফি মা'রিফাত আল-আকালিম আবু আব্দুল্লাহ আল-বাশারি আল-মাকদিসি

৬ আখবার আল-দুওয়াল ওয়া আসার আল-উওয়াল ফি আল-তারিখ আহমদ বিন ইউসুফ আল-কারমানি কর্তৃক

৭ আল-আমির আব্দুল কাদির রাইদ আল-কিফাহ আল-জাজাইরি ডক্টর ইয়াহইয়া বুআজিজ কর্তৃক

৮ আমির আল-বায়ান শাকিব আরসালান আহমদ শারবাসি কর্তৃক

৯ আমাল আল-আলাম ফিমান বুয়িআ কাবলা আল-ইহতিলাম লিসানুদ্দিন আল-খাতিব

১০ আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা লিসানুদ্দিন আল-খাতিব

১১ আল-আন্দালুসিয়ুন আল-মুওয়্যারাকা ডক্টর আদিল সাঈদ বিশতাউয়ি

১২ আল-ইসাৰা ফি তামিইজ আল-সাহাবা ইবনে হাজার আসকালানি

১৩ আইয়ান আল-আসর ওয়া আওয়ান আল-নাসর সালাহউদ্দিন আইবাক আল-সাফাদি

১৪ আফগানিস্তান দর মাসির-ই তারিখ মীর গোলাম মুহাম্মদ গুবার কর্তৃক

১৫ আল-আলাম খাইরুদ্দিন জিরিকলি

১৬ আল-ইসতিকসা লি-আখবার দুওয়াল আল-মাগরিব আল-আকসা শিহাবুদ্দিন আল-নাসিরি আল-সালাউয়ি

১৭ ইনবা আল-গুমর বি-আবনা আল-উমর ইবনে হাজার আসকালানি

১৮ আল-উনস আল-জালিল বি-তারিখ আল-কুদস ওয়া আল-খলিল আবু আল-ইয়ামান আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ আল-হাম্বলি

১৯ আল-ইসতিআব ফি মা'রিফাত আল-আসহাব ইবনে আব্দুল বার আল-মালিকি

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

আলিফ বর্ণ

উল্লেখ নেই ১ রাম প্রসাদ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক মুদ্রিত, আত্রা ১৯৩৩ খ্রি.

২৭৯ হিজরি ১৩ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৯৬ খ্রি.

৩৯২ হিজরি ১ দাইরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য, ভারত ১৯৬২ খ্রি.

১১৫ হিজরি ১ আল-মাকতাবাতুশ শামিলা উল্লেখ নেই

৩৮১ হিজরি ১ দারু সাদির, বৈরুত ১৩১১ হিজরি

১০১৯ হিজরি / ১৬১০ খ্রি. ২ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রি. / ১৪১৩ হিজরি

উল্লেখ নেই ১ আদ-দারুল আরাবিয়া লিল-কিতাব, তিউনিস ১৯৭৭ খ্রি.

উল্লেখ নেই ১ দারুল কিতাব আল-আরাবি, মিশর ১৯৬৩ খ্রি.

৭৭৬ হিজরি ২ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত ২০০৩ খ্রি.

৭৭৬ হিজরি ৪ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরুত ১৩২৩ হিজরি

উল্লেখ নেই ১ মুতাবিউল ফান্নি জামা আল-কাহিরা ২০০১ খ্রি.

৮৫২ হিজরি ৮ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া ১৩১৫ হিজরি

৭৬৩ হিজরি ৫ দারুল ফিকর আল-মুআসির, বৈরুত ১৯৯৮ খ্রি.

উল্লেখ নেই ১ মারকাজ-ই-নাশর-ই-ইনকিলাব, কাবুল ১৯৭৭ খ্রি.

১৯২৬ খ্রি. ৮ দারুস সালাতিন ২০০৩ খ্রি.

১৩১৫ হিজরি ৩ দারুল কিতাব, আদ-দারুল বায়দা উল্লেখ নেই

৮৫২ হিজরি ৪ লাজনাতু ইহয়াইত তুরাসিল ইসলামি, মিশর ১৯৬৯ খ্রি.

৯২৮ হিজরি ২ মাকতাবাতু দানদিস, আন্মান উল্লেখ নেই

৩২৪ হিজরি ৪ দারুল জিল, বৈরুত ১৯৯২ খ্রি.

তারিখ-ই-মিল্লাত-ই-মুসলিমা ৮৩৯

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

(হরফ ব)

২১ বাবওয়াত মিনাল জানিল ইয়াহুদি লেখক: জোয়াকিম প্রিনজ, অনুবাদক:
খালিদ আসাদ ঈসা

২২ আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব ইবনে ইজারি
আল-মাররাকুশি

২৩ বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি, হায়াত ওয়া ওয়াকিয়াত জুবায়ের গুন্ডুজ আল্প,
মুস্তফা সুঙ্গুর

২৪ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ইবনে কাসির দিমাঙ্কি

(হরফ ত)

২৫ তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ আবদুল মুনিম আন-নামর

২৬ তাজারিবুল উমাম ওয়া তাআকুবুল হিমাম আবু আলী আহমদ বিন ইয়াকুব
ইবনে মিসকাওয়াইহ

২৭ তারিখ-ই-বালুচ ওয়া বালুচিস্তান মীর নাসির খান আহমদজাই কামবরানি বালুচ

২৮ তাজকিরাতুল হুফফাজ শামসুদ্দিন আজ-জাহাবি

২৯ তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়াহ আল-উসমানিয়াহ ফরিদ বে আল-মুহামি

৩০ তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ লেখক: ডক্টর ইলমাজ ওজতুনা,
অনুবাদক: আদনান মাহমুদ সালমান

৩১ তারিখ-ই-উসমানি লেখক: ইসমাইল হাফ্ফি উজুন চারশিলি, অনুবাদক: ডক্টর
ইরাজ নুবখত

৩২ তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ ওয়া আলাকাতুহা আল-খারিজিয়াহ ডক্টর
আলী হাসুন

৩৩ তারিখু সালাতিন বানি উসমান মিন আউয়ালি নাশাতিহিম হাত্তাল আন (তারিখু
সালাতিন আলে উসমান) মুর্তজা ইউসুফ বেগ আসাফ

৩৪ তারিখু আজায়িবিল আসার ফিত-তারাজিম ওয়াল আখবার আবদুর রহমান
বিন হাসান আল-জাবারতি

৩৫ আত-তারিখুল ইসলামি ডক্টর মাহমুদ শাকির

৮৪০ | পঞ্চম খণ্ড | মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

বর্ণ 'ব'

উল্লেখ নেই ১ দার হাসসান লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি, দামেস্ক ১৯৮৩ খ্রি., ১৪০৩ হি.

৬৯৬ হি. ৪ দারুস সাফাহ, বৈরুত ১৯৮৩ খ্রি.

উল্লেখ নেই ১ বাইতুস সালাম ২০১৯ খ্রি.

৭৭৬ হি. ২১ দারুল ফিকর ২০০৩ খ্রি.

বর্ণ 'ত'

১৯৯১ খ্রি. ১ আল-মুয়াসসাসাতুল জামিইয়াহ লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি ১৯৮১ খ্রি.

৩২১ হি. ৭ সুরুশ তেহরান ২০০৩ খ্রি.

উল্লেখ নেই ৩ নুরী নাসির খান মারকাযে ইশাআত, কোয়েটা ১৯৯২ খ্রি.

৪৩৮ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৯৯৮ খ্রি.

১২৩৮ হি. ১ দারুন নাফায়েস, বৈরুত, ১৪০১ হিজরি ১৯৮১ খ্রি.

২০১৩ খ্রি. ২ মুয়াসসাসাতু ফয়সাল, ইস্তাম্বুল ১৯৯০ খ্রি.

১৯৬৭ খ্রি. ৬ তুর্ক তারিখ, আঙ্কারা ১৯৬২ খ্রি.

উল্লেখ নেই ১ আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রি., ১৪১৫ হি.

উল্লেখ নেই ১ মুয়াসসাসাতু হিন্দাউয়ি, মিশর ২০১২ খ্রি.

১২৩৭ হি. মোতাবেক ১৮২২ খ্রি. ৪ দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৯৯৮ খ্রি.

২০১৩ খ্রি. ২২ আল-মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

৩৬ তারিখ আদ-দাওলা আল-উসমানিয়া ডক্টর সাঈদ মুহাম্মদ

৩৭ তামাদুন-এ-আরব লেখক: গুস্তাভ লে বন, অনুবাদক: সৈয়দ আলী বিলগ্রামী

৩৮ তুর্কি ওয়া খাতুল ইরাক খালিদ আবু হুরায়রা

৩৯ আত-তারিখ আল-ইয়াহুদি আল-আম ডক্টর সাবের তুয়াইমা

৪০ আত-তারিখ আল-আন্দালুসি মিনাল ফাতহ আল-ইসলামি ইলা সুকুত গারনাতা

..... আবদুর রহমান আলী আল-হাজ্জি

৪১ আত-তারিখ আল-ইসলামি ডক্টর আহমদ শালবি

৪২ তারিখুল আরব ওয়া হাদারাতুহুম ফিল আন্দালুস ডক্টর খলিল সামাররাই

৪৩ তারিখ ইফতিতাহ আল-আন্দালুস ইবনে কুতায়বা

৪৪ তারিখ উলামা আল-আন্দালুস আবুল ওয়ালিদ ইবনুল ফারদি

৪৫ তারিখুল আদাব আল-আন্দালুসি আসরুত তাওয়াইফ ওয়াল মুরাবিতিন ডক্টর

ইহসান আব্বাস

৪৬ আত-তারিখ আল-ইসলামি আল-আম ডক্টর আলী ইব্রাহিম হাসান

৪৭ তারিখ-এ-সিন্দ আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী

৪৮ তারিখ খলিফা বিন খাইয়াত খলিফা বিন খাইয়াত আল-আসফারি

৪৯ তারিখ ইবনে খালদুন (দিওয়ান আল-মুবতাদা ওয়াল খবর) আবদুর রহমান

ইবনে খালদুন

৫০ তারিখুল ইসলাম তাহকিক আবদুস সালাম তাদমুরি শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৫১ তারিখুল ইসলাম তাহকিক ডক্টর বাশার আওয়াদ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

৫২ তারিখ আফ্রিকা আশ-শামালিয়া লেখক: আন্দ্রে জুলিয়ান, অনুবাদক: মুহাম্মদ

আজালি

৫৩ আত-তাদিল ওয়াত তাজরিহ লিমান খারাজা আনহল বুখারি ফিল জামি আস-

সহিহ সুলাইমান বিন খালাফ আবুল ওয়ালিদ আল-কুরতুবি আল-বাজি

৫৪ তারিখ-এ-হিন্দুস্তান মৌলভি জাকাউল্লাহ দেহলভি

৫৫ তারিখ-এ-হিন্দুস্তান নাউশাতে কদিম ওয়া ইউনানি মুয়াররিখিন জগন্নাথ পুরি

এম.এ.

তারিখে উম্মতে মুসলিমা ৮৪২

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

উল্লেখ নেই উল্লেখ নেই মাকতাবাতুল আদাব, কায়রো ১৪২৮ হিজরি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ ১ আজম প্রেস, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই উল্লেখ নেই ওয়েবসাইট: তুর্কিয়া আল-আন ১লা মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই উল্লেখ নেই দারুল জিল, বৈরুত ১৪১১ হিজরি, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ

২০০০ খ্রিস্টাব্দ ১০ মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ দারুল কুতুব আল-জাদিদাহ আল-মুত্তাহিদা, বৈরুত লেবানন ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

৩৬৭ হিজরি ১ দারুল কিতাব আল-মিসরি, কায়রো ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ

৪০৩ হিজরি ২ মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

১৩৪৩ হিজরি ১ দারুস সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ ১ দারুল ইশাআত, করাচি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ

২৩০ হিজরি ১ দারুল কলম, দামেস্ক; মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত ১৩৯৭ হিজরি

৮০৮ হিজরি ৮ দারুল ফিকর, বৈরুত ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

৭২৮ হিজরি ৫২ দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

৭২৮ হিজরি ১৫ দারুল গারব আল-ইসলামি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ মুয়াসসাসাতু তাদালত আস-সাকাফিয়্যাহ ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ

৩৭৩ হিজরি ৩ ওয়াজিরাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, মরক্কো উল্লেখ নেই

১৯১০ খ্রিস্টাব্দ ১০ ইনস্টিটিউট আলীগড় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ

উল্লেখ নেই ১ নাওয়াল কিশোর প্রেস, লখনউ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ

তারীখে উম্মতে মুসলিমা ৮৪৩

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

৫৬ তারীখে তামাদুনে হিন্দ মুহাম্মদ মুজিব

৫৭ তারীখে হিন্দ থাপার ও রোমিলা

৫৮ তারীখে হিন্দ ডক্টর মুহাম্মদ শেখ ইকবাল, লালা রাম প্রসাদ প্রফেসর হিস্ট্রি
গভর্নমেন্ট কলেজ লাহোর

৫৯ তারীখে ফেরেশতা মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা, অনুবাদক: মুশফিক খাজা

৬০ তারীখে তাবারী মুহাম্মদ বিন জারীর আত-তাবারী

৬১ তারীখে সিন্দ আবদুল হালিম শারার

৬২ তারীখে ইয়াকুবী আহমদ বিন আবি ইয়াকুব

৬৩ তারীখে আবি যুরআ আদ-দিমাশকী আবু যুরআ আদ-দিমাশকী

৬৪ তারীখে দিমাশক আল্লামা ইবনে আসাকির

৬৫ তারীখে ফেরেশতা (উর্দু অনুবাদ) লেখক: মুহাম্মদ কাসিম ফেরেশতা,
অনুবাদক: মুশফিক খাজা

(হরফে জিম)

৬৬ জামেউদ দুওয়াল তারীখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া মুনাজ্জিম বাশি আহমদ
বিন লুতফুল্লাহ

৬৭ জামহারাতু আনসাবিল আরব আল্লামা ইবনে হাযম

৬৮ জামহারাতু আনসাবিল কুরাইশ যুবায়ের বিন বাক্কার

(হরফে চে)

৬৯ চাচনামা ফারসি (ফাতহনামা সিন্দ) কাযী মুহাম্মদ ইসমাইল বিন আলী, আরবি
থেকে ফারসি অনুবাদক: আলী বিন হামিদ আল-কুফি, গবেষণা: ডক্টর উমর বিন দাউদ
পোতা

৭০ চাচনামা উর্দু অনুবাদ অনুবাদক: আখতার রিজভী, গবেষণা: নবী বখশ খান
বালুচ

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

৮৪৪

মৃত্যুর বছর খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের বছর

উল্লেখ নেই ১ কওমি কাউন্সিল বরায়ে ফুরোগ-এ-উর্দু জবান, নয়াদিল্লি ১৯৯৯ খ্রি.

উল্লেখ নেই ১ মারকাজ-এ-তাহকিকাত-এ-রায়ানাহ, ইসফাহান উল্লেখ নেই

.

১ এডুকেশনাল পাবলিশার্স, লাহোর ১৯১৩ খ্রি.

২০০৫ খ্রি. ৪ আল-মিজান, লাহোর ২০০৮ খ্রি.

৩১০ হি. ১১ দারুত তুরাস, বৈরুত ১৩৮৭ হি.

১৯২৬ খ্রি. ১ ওলগাদাজ প্রেস, লখনউ ১৯০৭ খ্রি.

২৯২ হি. ৩ মাকতাবাতুল হায়দারিয়া ১৯৬২ খ্রি.

২৮১ হি. ১ মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া, দামেস্ক

.

৫৭০ হি. ৮০ দারুল ফিকর, দামেস্ক ১৯৯৫ খ্রি.

.

৪ আল-মিজান, লাহোর ২০০৮ খ্রি.

(হরফ সা)

১১৩ হি. - ৭০৩ খ্রি. ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ২০২০ খ্রি.

২৫৬ হি. ১ আদ-দারুল মাসরিয়াহ, কায়রো ১৯৯৬ খ্রি.

২৫৬ হি. ১ মাতবাউল মাদানি ১৩৮১ হি.

(হরফ জিম)

৬১৩ হি. ১ মাতবুআ মারকাজ-এ-তাহকিকাত-এ-রায়ানাহ, ইসফাহান উল্লেখ নেই

.

১ সিন্ধি আদবি বোর্ড, জামশরো ২০০৮ খ্রি.

৮৪৫ | তারিখ উন্মত্তে মুসলিমা

ক্রমিক নং | বইয়ের নাম | লেখক

(বর্ণ: হা)

৭১. হুদুদুল আলম মিনাল মাশরিক ইলাল মাগরিব অজ্ঞাত লেখক

৭২. হাজী সাহেব তুরুংজাই আজিজ জাভেদ

৭৩. আল-হুলালুস সুন্দুসিয়্যাহ ফিল আখবার ওয়াল আসারিল আন্দালুসিয়্যাহ আমির শাকিব আরসালান

৭৪. আল-হুলালুস সিয়রা ইবনুল আব্বার আল-বালানসি

৭৫. আল-হামাসাতুল মাগরিবিয়্যাহ আবুল আব্বাস আহমদ আত-তাদিলি

৭৬. আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ ফি জিকরিল আখবারিল মাররাকুশিয়্যাহ অষ্টম হিজরি শতকের জনৈক অজ্ঞাত আন্দালুসি ঐতিহাসিক

(বর্ণ: খা)

৭৭. খিলাফতে ইসলামিয়া: সুকুত ও ইহয়া হক নেওয়াজ

৭৮. খারিদাতুল আজায়িব ওয়া ফারিদাতুল গারায়িব সিরাজুদ্দিন আবু হাফস ইবনুল ওয়ারদি

৭৯. খারিদাতুল কাসর ওয়া জারিদাতুল আসর (মাগরিব, আন্দালুস, জাজিরা ও শামের কবিদের অংশ) ইমাদুদ্দিন কাতিব আল-ইসফাহানি

(বর্ণ: দাল)

৮০. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ: আওয়ামিলুন নুহয ওয়া আসবাবুস সুকুত ডক্টর আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি

৮১. দাওলাতে উসমানিয়া ডক্টর মুহাম্মদ আজিজ

৮২. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ ফিত তারিখিল ইসলামিল হাদিস ডক্টর ইসমাইল আহমদ ইয়াগি

৮৩. আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আল-মাজহলাহ ডক্টর আহমদ আক গুন্দুজ, ডক্টর সাঈদ ওজতুর্ক

৮৪. আদ-দিমাউদ দাহরা লি-আজমালিল খুতাতি বি-মাযমুন নিগার আজিজ আহমদ

৮৫. দাওরুল ইয়াহুদ ফি ইসকাতিল খিলাফাতিল উসমানিয়্যাহ হাসনা বিনতে মুহাম্মদ আস-সুলামি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা ৮৪৬

ওফাত সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

হরফ হা (ح)

৩২৭ হি. ১ দারুস সাকাফাহ লিন-নাশর, কায়রো ১৩২৩ হি.

১ ইদারা-ই তাহকীক ও তাসনীফ, পাকিস্তান, লাহোর ১৯৮১ খ্রি.

১৯৩৭ খ্রি. ৩ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রি.

২৫৮ হি. ১ দারুল মাআরিফ, কায়রো ১৯৮৫ খ্রি.

২০৯ হি. ২ দারুল ফিকরিল মুআসির, বৈরুত ১৯৯১ খ্রি.

১ দারুল রাশাদ আল-হাদীস ১৯৭৯ খ্রি.

হরফ খা (خ)

১ জুবায়ের পাবলিশার্স, পাকিস্তান

৮৫২ হি.

মাকতাবাতুস সাকাফাহ, কায়রো ২০০৮ খ্রি.

৫৯৭ হি. ১ আদ-দারুত তিউনিসিয়াহ লিন-নাশর ১৯৭২ খ্রি.

হরফ দাল (د)

১ আদ-দারুত তাওযী' ওয়ান-নাশর, মিসর ১৪২১ হি./২০০১ খ্রি.

২ দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমি, আজমগড়, হিন্দুস্তান ২০০৯ খ্রি.

১ মাকতাবাতুল ওবায়কান, সৌদি আরব ১৯৯৮ খ্রি.

১ ওয়াকফ আল-বুহস আল-উসমানিয়াহ, ইস্তাম্বুল ২০০৮ খ্রি.

ওয়েব সাইট: তুর্ক প্রেস (TurkPress.co) ১৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রি.

১ জামিআ উম্মুল কুরা, মক্কা আল-মুকাররামা ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.

৮৪৭ তারীখে মিল্লাত

ক্রমিক নং কিতাবের নাম লেখক

৮৬ দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস মুহাম্মদ আবদুল্লাহ এনান

৮৭ দাইরাতুল মাআরিফ লিল কারনিল ইশরিন মুহাম্মদ ফরিদ ওয়াজদি

৮৮ আদ-দুরারুল কামিনাহ ফি আয়ানিল মায়াতিস সামিনাহ ইবনে হাজার আসকালানি

(হরফ যাল)

৮৯ আয-যাখিরাহ ফি মাহাসিনি আহলিল জাজিরাহ আলী বিন বাসাম আশ-শান্তরিনি

৯০ আয-যাখাইর ওয়াত তুহাফ আল-কাজি রশিদ বিন জুবায়ের

(হরফ রা)

৯১ আর-রাজুলুস সানাম মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক আর্মস্ট্রং, আরবি অনুবাদ: সাঈদ মুহাম্মদ আবদুর রহমান

৯২ আর-রাওদুল মিতার ফি খবরিল আকতার আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল মুনইম আল-হিময়ারি

৯৩ রিহলা ইবনে বতুতা (তুহফাতুন নুজ্জার ফি গারাইবিল আমসার ওয়া আজাইবিল আসফার) মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ ইবনে বতুতা

(হরফ যা)

৯৪ আয-যালাজিল মা'রাকাতুন মিন মা'আরিকিল ইসলাম নাবিল আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মিসরি

(হরফ সিন)

৯৫ আস-সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি আখিরু সালাতিনিল উসমানিয়্যিনাল কিবার ডক্টর মুহাম্মদ হারব

৯৬ সিমতুন নুজুমিল আওয়ালি ফি আনবাইল আওয়াইলি ওয়াত তাওয়ালি আব্দুল মালিক বিন হসাইন আল-ইসামী আল-মক্কি

৯৭ সীরাতে সুলতান টিপু শহীদ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস নদভী

৯৮ আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক তাকিউদ্দিন আল-মাকরিজি

৯৯ সিয়রু আলামিন নুবালা শামসুদ্দিন আয-যাহাবি

১০০ সুনানে তিরমিজি মুহাম্মদ বিন ঈসা সুরা আত-তিরমিজি

তারীখে উম্মতে মুসলিমা | খুতবাতে হাকীম | ৮৪৮

ওফাতের সন খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সন

১৩০৬ হি. ৫ মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো ১৯৯৭ খ্রি.

১৯৫৩ খ্রি. ১০ দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত ১৯৭১ খ্রি.

৮৫২ হি. ৬ মজলিসে দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য ১৯৭৩ খ্রি.

(হরফ যাল)

৫৩২ হি. ৮ আদ-দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব, লিবিয়া ১৯৭৯ খ্রি.

পঞ্চম হিজরি শতাব্দী ১ কুয়েত ১৯৫৯ খ্রি.

(হরফ রা)

.

১ আল-আহলিয়া লিন-নাশর ওয়াত-তাওয়া ২০১৩ খ্রি.

৯০০ হি. ১ মুয়াসসাসাতুন নাসির লিস-সাকাফাহ, বৈরুত ১৯৮০ খ্রি.

৭৭৯ হি. ৫ একাডেমি অফ দ্য কিংডম অফ মরক্কো, রাবাত ১৩৯৭ হি.

(হরফ যা)

উল্লেখ নেই ১ আল-জামিআতুল ইসলামিয়া বিল মদিনাতিল মুনাওয়ারা উল্লেখ নেই

(হরফ সীন)

.

১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৩১০ হি./১৯৯০ খ্রি.

১১১১ হি. ৪ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৯৮ খ্রি.

.

১ মজলিসে তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াতে ইসলাম, লখনউ ১৯৯৬ খ্রি. - ১৪১৭ হি.

৮৩৫ হি. ৭ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ ১৯৯৭ খ্রি.

১৪৮ হি. ২৫ মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ ১৯৮৫ খ্রি.

৭২৯ হি. ৫ মাতবা' মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি, মিশর ১৯২৫ খ্রি.

তারীখে উম্মতে মুসলিমা ৮৪৯

অষ্টম খণ্ড

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

(হরফ শীন)

১০১ শাজারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব ইবনুল ইমাদ আল-আকারি
আল-হাম্বলী

(হরফ সোয়াদ)

১০২ সহীহ আল-বুখারী মুহাম্মদ বিন ইসমাইল আবু আব্দুল্লাহ আল-বুখারী
১০৩ সাহওয়াতুর রাজুলিল মারীয সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি ওয়াল
খিলাফাতুল ইসলামিয়া ডক্টর মুয়াফফাক বনী আল-মারজাহ
১০৪ সিলাতু জাযীরাতিল আন্দালুস আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল মুনইম
আল-হিমযারী
১০৫ সূরাতুল আরদ মুহাম্মদ বিন হাওকাল আল-বাগদাদী আল-মাওসিলী
১০৬ আস-সিরাউ বাইনা ইউসুফ আল-আউয়াল ওয়া আসরুহ ফী ইদআফি
মামলিকাতি গারনাতা ডক্টর নূরা বিনতে মুহাম্মদ বিন আব্দুল আজিজ আত-
তুওয়াইজিরী

(হরফ তোয়া)

১০৭ তাবাকাত ইবনে সাদ (আত-তাবাকাতুল কুবরা) মুহাম্মদ বিন সাদ

(হরফ আইন)

১০৮ উসমানী তুর্ক ডক্টর এহসান আলী
১০৯ আজায়িবুল আসার ফিত তারাজিম ওয়াল আখবার আবদুর রহমান বিন
হাসান আল-জাবারতী
১১০ আল-উসমানিয়্যুন ফিত তারিখ ওয়াল হাদারাহ ডক্টর মুহাম্মদ হারব
১১১ আল-ইবার ফী খবর মান গাবার শামসুদ্দিন আয-যাহাবী
১১২ আহদে ইসলামী কা হিন্দুস্তান মাওলানা রিয়াসাত আলী নদভী
১১৩ আরব ওয়া হিন্দ কে তাআল্লুকাত আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী মরহুম
১১৪ উয়ুনুল আখবার ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী
১১৫ উয়ুনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা ইবনে আবি উসাইবিয়াহ

তারিখ উম্মত-ই-মুসলিমা

মৃত্যুর সন খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সন

হরফ শীন

১০৮৯ হিজরী ১১ দার ইবনে কাসীর, দামেস্ক ১৯৮৬ খ্রি.

হরফ সাদ

২৫৬ হিজরী ৯ দার তরিকুন নাজাত ১৩৩২ হিজরী

• | ১ | মুয়াসসাসাতু সাকরা আল-খালিজ, কুয়েত | ১৯৮৩ খ্রি.

৯০০ হিজরী | ১ | দারুল জিল, বৈরুত | ১৯৮৮ খ্রি.

৩৬৭ হিজরী | ২ | দার সাদির, বৈরুত | ১৯৩৮ খ্রি.

• | ১ | উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িকীতে প্রকাশিত, দশম বর্ষ, পঞ্চদশ সংখ্যা | ১৩৯৭ হিজরী

হরফ ত | | |

২৩০ হিজরী | ৮ | দার সাদির, বৈরুত | ১৯৬৮ খ্রি.

হরফ আইন | | |

• | ১ | কামাল পাবলিশার্স, করাচি | ১৯৯৬ খ্রি.

১২২৪ হিজরী মোতাবেক ১৮২৪ খ্রি. | ৪ | দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো | ১৯৯৮ খ্রি.

• | ১ | আল-মারকাযুল মিসরি লিদ দিরাসাতিল উসমানিয়্যাহ, কায়রো | ১৪১৩ হিজরী/১৯৯৩ খ্রি.

৭৪৮ হিজরী | ৪ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত | উল্লেখ নেই

• | ১ | ইদারা-ই-মুসান্নিফীন, পাটনা | ১৯৫০ খ্রি.

১৯৫৩ খ্রি. | ১ | মাতবুআ দারুল মুসান্নিফীন শিবলী একাডেমি, আজমগড় | ১৯২৯ খ্রি.

২৭৬ হিজরী | ৪ | দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ | ১৩১৮ হিজরী

৬৬৮ হিজরী | ১ | দার মাকতাবাতুল হায়াত, বৈরুত | উল্লেখ নেই

৮৫১ তারীখে উম্মতে মুসলিমা

নম্বর কিতাবের নাম লেখক

(হরফ গাইন)

১১৬ গায়াতুন নিহায়া ফি তাবাকাতিল কুররা শামসুদ্দিন ইবনুল জাযারি

১১৭ গারনাতা ফি জিল্লিল বানি আহমার ডক্টর ইউসুফ শুকরি ফারহাত

(হরফ ফা)

১১৮ ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি আহমদ আবদুর রহিম মুস্তফা

১১৯ ফিকহত তামকিন ইনদা দাওলাতিল মুরাবিতিন আলি মুহাম্মদ আস-সাল্লাবি

১২০ ফুতুহুল বুলদান আহমদ বিন ইয়াহইয়া আল-বালাজুরি

১২১ ফিরোজুল লুগাত ফারসি উর্দু মকবুল বাদাখশানি

(হরফ কাফ)

১২২ কিরাআতুন জাদিদাতুন ফি তারিখিদ দাওলাতিল উসমানিয়া জাকারিয়া সুলাইমান
বাইউমি

১২৩ কদিম তারিখ হিন্দ ভিনসেন্ট এ. স্মিথ, অনুবাদক: মৌলভি জামিলুর রহমান

১২৪ কদিম হিন্দুস্তান কি তারিখ রমা শঙ্কর ত্রিপাঠি, অনুবাদক: সৈয়দ তাকি হাসান নকভি

(হরফ কাফ)

১২৫ কাইফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া সুলাইমান বিন সালেহ আল-খারশি

১২৬ কিতাবুল হিন্দ (তাহকিক মা লিল হিন্দ) আবু রায়হান আল-বিরুনি

১২৭ কিতাবুল উলাত আবু উমর আল-কিন্দি

১২৮ আল-কামিল ফিত তারিখ ইবনুল আসির আল-জাযারি আবুল হাসান

(হরফ লাম)

১২৯ লিসানুল আরব ইবনে মানজুর আফ্রিকি

তারিখে উম্মতে মুসলিমা (পৃষ্ঠা ৮৫২)

মৃত্যু সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশকাল

(বর্ণ গাইন)

৮৩৩ হিজরী ৩ মাকতাবা ইবনে তাইমিয়া ১৩৫১ হিজরী

• ১ দারুল জিল, বৈরুত ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ

(বর্ণ ফা)

• ১ দারুশ শুরুক, কায়রো ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ

• ১ মুয়াসসাসাতু ইকরা লিন-নাশর ওয়াত-তাওজি, কায়রো ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ

২৭৯ হিজরী ১ মাকতাবাতুল হিলাল ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ

• ১ ফিরোজ সন্স, লাহোর ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ

(বর্ণ ক্বাফ)

• ১ আলমুল মারিফাহ, জেদ্দা ১৪১১ হিজরী, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ

• ১ জামিয়া ওসমানিয়া, দাক্ষিণাত্য ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ

• ১ কওমি কাউন্সিল বারায়ে ফুরোগে উর্দু জবান, নয়াদিল্লি -

(বর্ণ কাফ)

• ১ দারুল কাসিম, রিয়াদ ১৪২০ হিজরী

৩৩০ হিজরী ১ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৩ হিজরী

৩৫৫ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ ১৪২৩ হিজরী

৬৩০ হিজরী ১০ দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ

(বর্ণ লাম)

৭১১ হিজরী ১৫ দারু সাদির, বৈরুত ১৪১৩ হিজরী

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

৮৫৩

ক্রমিক নং বইয়ের নাম লেখক

(বর্ণ মীম)

১৩০ মুজাক্কিরাতুস সুলতান আব্দুল হামিদ লেখক: সুলতান আব্দুল হামিদ সানি,
অনুবাদক ও সম্পাদক: ডক্টর মুহাম্মদ হারব

১৩১ মুজাযু তারিখিল ইয়াহুদ মাহমুদ বিন আব্দুর রহমান কদাহ

১৩২ মুসনাদে আহমাদ আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল

১৩৩ মু'জামুল মুফাসসিরিন মিন সদরি ইসলাম হাভাল আসরিল হাযির আদিল
নুওয়াইহিয

১৩৪ আল-মাওসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদিয়ান ওয়াল মাযাহিব ওয়াল আহযাবিল
মুআসিরাহ আন-নাদওয়াতুল আলামিয়াহ লিশ-শাবাবিল ইসলামি - তাহকিক: ডক্টর
মানি' বিন হাম্মাদ আল-জুহানি

১৩৫ মুস্তফা সাবরি আল-মুফাক্কিরুল ইসলামি ডক্টর মুফরিহ বিন সুলাইমান আল-
কওসি

১৩৬ আল-মাওসুআতুল আরাবিয়াতুল আলামিয়াহ

১৩৭ মাওকিফুদ দাওলাতিল উসমানিয়াহ মিনাল হারাকতিস সাহিউনিয়াহ
হাসসান আলি হান্নাক

১৩৮ মুস্তফা কামিল ফি মিয়ানিত তারিখ ডক্টর আব্দুল আজিম রামাদান

১৩৯ আল-মুকতাবিস মিন আনবাউল আন্দালুস ইবনে হাইয়ান আল-কুরতুবি

১৪০ মুরুজুয যাহাব ওয়া মাতাদিনুল জাওহার আলি বিন আল-হুসাইন আল-
মাসউদি

১৪১ আল-মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস মুহাম্মদ বিন ফুতুহ আল-
হুমাইদি

১৪২ আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক আবু উবাইদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজ
আল-বাকরি

১৪৩ আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক উবাইদুল্লাহ ইবনে খুরদাদবিহ

১৪৪ আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব আবুল হাসান আলি বিন মুসা আল-
মাগরিবিল আন্দালুসি

১৪৫ আল-মুতরিব মিন আশআরি আহলিল মাগরিব ইবনে দিহইয়াহ আল-কালবি

১৪৬ আল-মু'জিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব মুহিউদ্দিন আব্দুল ওয়াহিদ
আল-মাররাকুশি

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা | খণ্ড: পঞ্চম | ৮৫৪

মৃত্যুর সাল খণ্ড প্রকাশক প্রকাশের সাল

(ম বর্ণ)

১৯১৮ খ্রি. ১ দারুল কলম, দামেস্ক ১৪১২ হি., ১৯৯১ খ্রি.

• | ১ | কুল্লিয়াতুদ দাওয়াহ ওয়া উসুলুদ্দীন | উল্লেখ নেই

২৩১ হি. | ৪৫ | মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ | ২০০১ খ্রি.

• | ২ | মুয়াসসাসাতু নাওয়াফিজ, বৈরুত | ১৪০৯ হি., ১৯৮৮ খ্রি.

• | ২ | দারুন নাওয়াতুল ইসলামিয়াহ | ১৩২০ হি.

• | ১ | দারুল কলম, দামেস্ক | ২০০৬ খ্রি., ১৪২৭ হি.

• | - | আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ | -

• | ১ | জামিয়াতু বৈরুত আল-আরাবিয়্যাহ, দারুল আহাদ, বৈরুত | ১৯৭৮ খ্রি., ১৩৯৮ হি.

• | ১ | মাকতাবাতুল ইসকান্দারিয়্যাহ | ২০০৩ খ্রি.

৪৬৯ হি. | ১ | আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুউনিল ইসলামিয়াহ, কায়রো | ১৩৯০ হি.

৩৩৬ হি. | ৫ | মানশুরাতুল জামিয়াতুল লুবনানিয়াহ, বৈরুত | ১৯৬৬ খ্রি.

৪৮৮ হি. | ১ | আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ লিত-তালিফ ওয়াত-তারজামাহ, কায়রো | ১৯৬৬ খ্রি.

৪২৭ হি. | ২ | দারুল গারব আল-ইসলামি | ১৯৯২ খ্রি.

২৮০ হি. | ১ | দারু সাদির, বৈরুত | ১৮৮৯ খ্রি.

৬৮৫ হি. | ২ | দারুল মাআরিফ, কায়রো | ১৯৫৫ খ্রি.

২৩৩ হি. | ১ | আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ | -

৬৩৭ হি. | ১ | আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, সিদা, বৈরুত | ২০০৬ খ্রি.

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

বইয়ের নাম, লেখক ক্রমিক নং

মুতাল্লা-এ-পাক-ও-হিন্দ, ডক্টর মাকসুদ চৌধুরী ১৪৭

মু'জামুশ শু'আরা, আবু উবাইদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইমরান আল-মারজুবানি ১৪৮

মা'রিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম আল-আসবাহানি ১৪৯

মুখতাসার তারিখ-ই-দামিশক, ইবনে মানজুর আল-আফ্রিকি ১৫০

আল-মা'আরিফ, ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারি ১৫১

আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক, আবু ইসহাক ইবরাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ফারসি আল-

ইসতাখরি আল-কারখি ১৫২

মু'জামুল বুলদান, ইয়াকুত হামাভি ১৫৩

(হরফ নুন)

নাহনু ওয়াল ভ্যাটিকান ওয়া ইসরাইল, আনিসুল কাসিম ১৫৪

নুজহাতুল খাওয়াতির ওয়া বাহজাতুল মাসামি' ওয়ান নাওয়াজির, হাকিম আব্দুল হাই হাসানি
..... ১৫৫

নাফহত তিব মিন গুসনি আন্দালুস আর-রাতিব, আহমদ বিন আল-মাককারি আত-
তিলিমসানি কর্তৃক ১৫৬

নিহায়াতুল আরাব ফি ফুনুনিল আদাব, শিহাবুদ্দিন আন-নুওয়াইরি ১৫৭

নুজহাতুল মুশতাক ফি ইখতিরাكيل আফাক, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-হাসানি আশ-
শরিফ আল-ইদ্রিসি ১৫৮

নুবজাতুল আসর ফি আহওয়ালি মুলুকি বনি নাসর, নবম হিজরি শতকের একজন অজ্ঞাত
আন্দালুসি ঐতিহাসিক ১৫৯

(হরফ ওয়াও)

ওয়ালিদিস সুলতান আব্দুল হামিদ আস-সানি, শাহজাদী আয়েশা উসমান বিনতে আব্দুল
হামিদ, তুর্কি থেকে আরবি অনুবাদ: সালেহ সা'দাবি ১৬০

ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আনবাউ আবনাউয যামান, শামসুদ্দিন ইবনে খাল্লিকান
১৬১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস | গ্রন্থপঞ্জি | ৮৫৬

মৃত্যুর সাল খণ্ডসমূহ প্রকাশক প্রকাশের সাল

— ১ নশর একাডেমি ১৯৮৬ খ্রি.

৩৮৩ হিজরী ১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৯৮২ খ্রি.

৩৩০ হিজরী ৭ দারুল ওয়াতান, রিয়াদ ১৯৯৮ খ্রি.

১১৭ হিজরী ২৯ দারুল ফিকর লিন-নশর ওয়াত-তাওজি, দামেস্ক ১৯৮৩ খ্রি.

২৭৬ হিজরী ১ আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাহ লিল-কিতাব, কায়রো ১৯৯২ খ্রি.

৩৩৬ হিজরী ১ দার সাদির, বৈরুত ২০০৩ খ্রি.

৬৪৬ হিজরী ৭ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৫ খ্রি.

বর্ণন

— ১ মারকাজ দাইরাতুল মাআরিফ বুজুর্গ ইসলামি, তেহরান —

১৩৩১ হিজরী ৮ দার ইবনে হাজম, বৈরুত ১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ খ্রি.

১০৪১ হিজরী ৫ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৭ খ্রি.

৭৩৩ হিজরী ৩৩ দারুল কুতুব ওয়াল ওয়াসাইক আল-কাওমিয়্যাহ, কায়রো ১৪২৩ হিজরী

৫৬০ হিজরী ২ আলমুল কুতুব, বৈরুত ১৪০৯ হিজরী

— ১ দার ইহসান, দামেস্ক ১৪০৩ হিজরী

বর্ণও

— ১ দারুল বাশির, আম্মান, জর্ডান ১৪১১ হিজরী, ১৯৯১ খ্রি.

৬৮১ হিজরী ৭ দার সাদির, বৈরুত ১৯৯৪ খ্রি.

ইতিহাস উন্মতে মুসলিমা

পঞ্চম খণ্ড

৮৫৭

বইয়ের নাম (লেখক) ক্রমিক নং

(হরফ হ)

হিন্দুস্তানে আরবদের শাসন (মাওলানা কাজী আতহার মুবারকপুরী) ১৬২

হয়ে তুম দোস্ত জিস কে (ডক্টর মুর্তজা হক) ১৬৩

(হরফ ইয়া)

ইহুদ ওয়াদ দাওলাহ (সৈয়দ মুহাম্মদ আলী কুতুব) ১৬৪

আল-ইহুদ ওয়াল মাসুনিয়্যাহ (আল্লামা আব্দুর রহমান আদ-দাওসারী) ১৬৫

তারিখে উন্মতে মুসলিমা ৮৫৮

মৃত্যু সাল | খণ্ড | প্রকাশক | প্রকাশের সাল

হরফ 'হ'

- ১৯৯৬ খ্রি. | ১ | নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লি | ১৯৬৭ খ্রি.
- | ১ | শফিক পাবলিকেশনস, লাহোর | ২০০৭ খ্রি.

হরফ 'ই'

- | ১ | দারুল আনসার | ১৯৭৮ খ্রি.
- | ১ | দারুল ইলম | ১৪১৩ হি. মোতাবেক ১৯৯২ খ্রি.

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা

উপসংহার

মৃত্যু প্রকাশক প্রকাশনা

১৮৫৬ এ.বি ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ১৯ ১৭

১৯৩১ টি. ফিশার আনউইন, লন্ডন ১৮৮৮

ওসিয়ান পাবলিশার্স, গ্লাসগো ১৯৯৩

১৮৮৩ চ্যাটো অ্যান্ড উইন্ডাস লন্ডন ১৯১৩

ম্যাকমিলান কো লন্ডন ১৯৫১

১৫তম সংস্করণ, ৩২ খণ্ড ২০১০

তারিখ-ই-উম্মত-ই-মুসলিমা অংশ পঞ্চম

নং বইয়ের নাম লেখক

১ দ্য কংগ্রেস অ্যান্ড ট্রিটি অফ প্যারিস সেবাস্টিয়ান সোলোন সিম্পসন

২ মুরস ইন স্পেন স্ট্যানলি লেন পুল

৩ হিডেন মেনেস টু ওয়ার্ল্ড পিস জেমস জিববি স্টুয়ার্ট

৪ দ্য মুসলিমস ইন স্পেন রেইনহার্ট ডোজি

৫ হিস্ট্রি অফ আরবস্ ফিলিপ হিট্রি ১৯৭৮

৬ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা

পৃষ্ঠা - ৮৬১

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস

পঞ্চম খণ্ড

উসমানীয় খিলাফত

৮৬১

<https://t.me/BoierSomahar>

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা | পঞ্চম অংশ | ৮৬২

তারিখ-এ-উম্মত-এ-মুসলিমা

প্রথম খণ্ড

গবেষণা:

ইসলামের ইতিহাসবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (মাদাজিল্লুহম)

আল-মানহাল

পাবলিশার্স

ব্লক এ-১, গুলশান-ই-ইকবাল, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯ / ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারীখে উম্মতে মুসলিমা

দ্বিতীয় খণ্ড

গবেষণা:

মুওয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান (দা.বা.)

আল-মানহাল

ব্লক এ-১, পাকিস্তান টাউন, মেইন পিডব্লিউডি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

তারিখে উম্মতে মুসলিমা | খুতবাত্তে হাকীম | ৮৬৪

তারিখে উম্মতে মুসলিমা

ষষ্ঠ খণ্ড

গবেষণা

মুওয়াররিখে ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল রেহান মদদাজিল্লুহ

মুদ্রণাধীন

আল-মানহাল

ব্লক-এ, ১, গুলিস্তান-ই-জওহর, ইউনিভার্সিটি রোড, করাচি।

০৩২১-৩১৩৫০০৯, ০৩২১-২০০০৮৭০

www.almanhalpublisher.com

almanhalpublisher@gmail.com

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের ছয়টি খণ্ড এক নজরে

•

ইতিহাসের মূলনীতি, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সমসাময়িক সাম্রাজ্যসমূহ, ইসলামপূর্ব বিশ্বের অবস্থা, সীরাতুন নবী (সা.), খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ও ঘটনাবলি (হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. থেকে হযরত উসমান গনি রাযি.-এর খিলাফত পর্যন্ত), উম্মাহাতুল মুমিনীন, আশায়ে মুবাশশারা এবং বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের পরিচিতি, ইতিহাসের শিক্ষা।

•

ঐতিহাসিক বর্ণনা যাচাই ও পর্যালোচনার মূলনীতি, মতভেদের যুগ, হযরত আলী মুরতাজা রাযি.-এর খিলাফত, জঙ্গ জামাল, জঙ্গ সিফফিন, হযরত হাসান রাযি.-এর খিলাফত, আমীর মুয়াবিয়া রাযি.-এর খিলাফত, ইয়াজিদ, হযরত হুসাইন রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর সংগ্রাম, কারবালা ও হাররার বিয়োগান্তক ঘটনা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর খিলাফত ও শাহাদাত, ফিতনার যুগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, প্রথম হিজরি শতাব্দীতে উম্মাহর ইলমি ও নৈতিক তরবিতকারী প্রখ্যাত সাহাবী ও তাবয়ীগণের পরিচিতি, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

•

উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফতের সমসাময়িক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ, আইন্মায়ে আরবা এবং মহান মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের কীর্তিগাঁথা, বিভিন্ন ফিরকার উৎপত্তি ও উত্থানের ইতিহাস, বাতিল ফিরকাসমূহের শাসনকাল, গুরুত্বপূর্ণ সংশয়সমূহের নিরসন।

•

সিসিলির ইতিহাস, ক্রুসেড যুদ্ধ, তাতারীদের আক্রমণ, আইয়ুবী সালতানাত, মামলুক সালতানাত, তাতারীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার ও প্রসার, উপমহাদেশীয় ইতিহাস, উসমানীয় সালতানাতের প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ়করণ, আন্দালুসীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ, সুলতানদের যুগ থেকে মুরাবিতুন ও মুওয়াহহিদুন যুগ পর্যন্ত, মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক দিকনির্দেশনা প্রদানকারী ইমাম ও মুজাদ্দিদগণ, ইজতিহাদ এবং সুফীগণের সংগ্রামের আলোচনা।

•

আন্দালুসের ইসলামী রাষ্ট্রের পতন, উসমানীয় সালতানাতের উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত, খিলাফত, ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য, হায়দ্রাবাদ রাজ্য এবং টিপু সুলতান।

•

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, পাকিস্তান আন্দোলন, মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উপমহাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইসলাম, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মুসলমানদের ইলমি ও কারিগরি কীর্তিগাঁথার ওপর এক নজরে আলোচনা।